ভারতী

মাসিক পত্রিকা।

শ্রীহিরণ্ময়ী দেবী ও শ্রীসরলা দেবী—সম্পাদিত।

১৩১৬ সালের বর্ণানুক্রমিক সূচী।

বর্ণানুক্রমিক চিত্র-সূচী।

ভারতী

মাসিক পত্রিকা।

শ্রীহিরণ্ময়ী দেবী ও শ্রীসরলা দেবী—সম্পাদিত।

৩৩ বর্ষ। ১৯০৯, মার্চ্চ ১৩১৬, বৈশাখ।



সচিত্র পত্রিকা।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ভি, পিতে ৩।৵০ বিলে ৩॥৵০। প্রতি সংখ্যা ।০

১৩১৬ সালের বর্ণানুক্রমিক সূচী।

বর্ণানুক্রমিক চিত্র-সূচী ।



হরপার্ব্বতী-সংবাদ

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় কর্ত্তৃক অঙ্কিত মূল চিত্র হইতে

নববর্ষে।

আহ্বান।

টোড়ী—একতালা।

কর, নূতন বর্ষে তোমার স্পর্শ দান
ওহে নাথ করুণা নিদান।
আন, অমৃত কিরণ দীপ্তি, পুণ্য মিলন তৃপ্তি,
দাও মঙ্গল ধ্রুব সম্বল,
হোক্ তিমির রাত্রি ম্লান॥
অরুণ পুষ্প গন্ধে, করুণ ছন্দোবন্দে,
স্তব কল্লোলে প্রেম হিল্লোলে
হোক্ জাগরিত মন প্রাণ॥
দাও, ভেদরহিত বুদ্ধি, প্রীতিপূরিত শুদ্ধি,
দাও মঙ্গল ধ্রুব সম্বল,
হোক্—সব দুখ অবসান॥

। সা সা -া । । { রা মা মা । পা -র্সণা র্সা । ণা দা দা । পা মা পা I মজ্ঞা -া -া ।
ক র ০ নূ ত ন ব ০ র্ষে তো মা র স্প ০ র্শ দা ০ ০

। (জ্ঞদা -পদা -মপা । জ্ঞমা -জ্ঞা -া । রা সা -া) I } মা পা -দপা । মা পা মজ্ঞা ।
০ ০ ০ ০ ০ ন্ ক র ০ ও হে ০ না ০ থ

। -া রা সা I রা -মা -পমা । -গমা -পা মা । পা -া -া । -া ‖ পা পা I মা ণদা দা ।
০ ক রু ণা ০ ০ ০ ০ নি দা ০ ০ ন্ আ ন অ মৃ ত

। { দা দা ণা । দণা -র্সণা র্সা । -া -া -া I ণদা -া ণা । র্সা র্জ্ঞা র্রা ।
কি র ণ দী ০ প্তি ০ ০ ০ পু ০ ণ্য মি ল ন

। র্জ্ঞা র্রা র্জ্ঞর্মর্জ্ঞা । (-া র্ঋা র্ঋা I র্সা ণর্সা দা) । } ।-া র্ঋা র্ঋা I র্সা -া ণা ।
তৃ ০ প্তি ০ আ ন অ মৃ ত ০ দা ও ম ০ ঙ্গ

। দা দা দপা। দা -র্সা ণা। র্সা ণা -দা I পা ণা দা। পা -মা পা। মজ্ঞা -া -া।
ল ক্ষ ব স ০ ম্ব ল হোক্ তি মি র রা ০ ত্রি য়া ০ ০

। ঋা সা জ্ঞা I জ্ঞা -া -র্রা। জ্ঞা জ্ঞর্মা জ্ঞা। ঋা -র্সা ণ। র্সা ণা -দা I পা ণা দা।
ণ দা ও ম ০ ঙ্গ ল ক্ষ ব স ০ ম্ব ল হোক্ তি মি র

। পা -মা পা। মজ্ঞা -া -া। রা সা সা ॥ া া I { সা রা মা। মা -া মা।
রা ০ ত্রি য়া ০ ০ ন্ "ক র" অ রু ণ পু ০ ষ্প

। গমা -পমা পা। -া -া -া I সা সা সদা। দা -া ণদা। পদা -ণদা পা।
গ ০ ন্ধে ০ ০ ০ ক রু ণ ছ ০ ন্দো ব ০ ন্ধে

। (-া -া -া) I } -া পা দা I দা -র্সা র্সা। ণর্সা -ঋর্ঋা -র্সণা। র্সা -া -া।
০ ০ ০ ০ স্তব ক ০ ল্লো লে ০ ০ ০ ০ ০

। ণা ণা ণা I ণা -দা দা। -পদা -ণদা -পমা। -পা -া -া। -া পা দা I দা র্সা ণা।
০ প্রে ম হি ০ ল্লো লে ০ ০ ০ ০ ০ ০ স্ত ব ক ০ ল্লো

। র্সা ণদা ণা। দা পা মা। পা মজ্ঞা -া I মা পা ণা। দা পা মা। মজ্ঞা -া -া।
লে প্রে ম হি ০ ল্লো লে হোক্ জা গ রি ত ম ন প্রা ০ ণ্

। রা সা -া ॥ পা -া I মা -ণদা দা। { দা দা ণা। দণা -র্সণা র্সা। -া -া -া I।
"ক র" ০ । দা ও ভে ০ দ র হি ত বু ০ দ্ধি ০ ০ ০

। ণদা -া ণা। র্সা জ্ঞা র্রা। জ্ঞা -র্রা জ্ঞর্মজ্ঞা। -া ঋা ঋা I (র্সা -ণসা দা)}
প্রী ০ তি পূ রি ত শু ০ দ্ধি ০ দা ও ভে ০ দ

। র্সা ণর্সা ণা। দা দা দপা। দা -র্সা ণা। র্সা ণা -দা I পা ণা দা। পা মা পা।
ম ০ ঙ্গ ল ক্ষ ব স ০ ম্ব ল হোক্ স ব দু খ অ ব

। মজ্ঞা -া -া। ঋা সা জ্ঞা I জ্ঞা -া র্রা। জ্ঞা জ্ঞর্মা জ্ঞা। ঋা -র্সা ণা।
সা ০ ০ ন্ দা ও ম ০ ঙ্গ ল ক্ষ ব স ০ ম্ব

। র্সা ণদা -া I পা ণা দা। পা মা পা। মজ্ঞা -া -া। -রা সা সা ॥
ল হোক্ স ব দু খ অ ব সা ০ ০ ন্ "ক র" ॥

স্বরলিপির ব্যাখ্যা।

১। স, র, গ, ম, প, ধ, ন—সপ্তস্বরের এই সাতটি স্বরাক্ষর।

২। ঋ=কোমল র; জ্ঞ=কোমল গ; ক্ষ=কড়ি ম; দ=কোমল ধ; ণ=কোমল ন।

৩। উচ্চ সপ্তকের স্বরের মাথায় রেফ-চিহ্ন ও খাদ-সপ্তকের নীচে হসন্ত-চিহ্ন থাকে; মধ্য-সপ্তকের স্বরে কোন চিহ্ন থাকে না। যথা প্, ধ্, ন্, স, র, গ, ম, প, ধ, ন, র্স, র্র, র্গ ইত্যাদি।

৪। স্বরোচ্চারণের কাল-পরিমাণকে মাত্রা বলে। এক, উচ্চারণ করিতে যত সময় লাগে, তাহাকে এক মাত্রা; এক, দুই, উচ্চারণ করিতে যত সময় লাগে তাকে দুই মাত্রা; এক, দুই, তিন উচ্চারণ করিতে যত সময় লাগে তাকে তিন মাত্রা বলে; ইত্যাদি ক্রমে মাত্রা যথেচ্ছা বৃদ্ধি করা যাইতে পারে।

মাত্রার চিহ্ন আকার। যথা সা, একমাত্রা; সা -া দুই মাত্রা; সা -া -া তিন মাত্রা ইত্যাদি। দুইটি স্বর একমাত্রার মধ্যে উচ্চারিত হইলে, দুইটি স্বরাক্ষর যুক্ত হইয়া শেষ অক্ষরের গায়ে আকার বসে; যথা, গমা, পধা; এইরূপ স্থলে প্রতি স্বরটি অর্দ্ধমাত্রা। চারিটি স্বর একমাত্রার মধ্যে উচ্চারিত হইলে, চারিটি স্বরাক্ষর যুক্ত হইয়া শেষ অক্ষরের গায়ে আকার বসে; যথা, সরগমা, এই স্থলে প্রত্যেক স্বরটি সিকিমাত্রা। এইরূপ একমাত্রার মধ্যে যতগুলিই স্বর উচ্চারিত হোক্ না কেন, তাহাদের স্বরাক্ষরগুলি যুক্ত হইয়া শেষ অক্ষরের গায়ে আকার বসে। যথা সরগমপধা, মপধনসা ইত্যাদি। অর্দ্ধমাত্রার বিশেষ চিহ্ন=ঃ বিসর্গ।

৫। সাধারণত উপরোক্ত যুক্তস্বরগুলি গড়ানে ভাবেই উচ্চারিত হয়; যদি কোন স্থলে, উহার প্রত্যেক স্বর পৃথক ঝোঁকে উচ্চারণ করিতে হয়, তাহা হইলে শিরোদেশে বিন্দু-চিহ্ন দেওয়া হইয়া থাকে, যথা সরগমা। কোন এক স্বর যখন আর এক স্বরে বিশেষরূপে গড়াইয়া যায়, তখন স্বরের নীচে এইরূপ ‿ চিহ্ন থাকে; যথা, গা -পা।

৬। যখন স্বরাক্ষরের নীচে গানের অক্ষর না থাকে তখন স্বরাক্ষরগুলির মধ্যে হাইফেন - চিহ্ন থাকে এবং গানের পংক্তিতে শূন্য (॰) চিহ্ন দেওয়া হয়।

৭। কোন আনুষঙ্গিক সুর কোন প্রধান সুরকে ঈষৎ ছুঁইয়া গেলে প্রধান সুরের গায়ে ক্ষুদ্র অক্ষরে এইরূপ লিখিত হয়; যথা রসা সার ইত্যাদি।

৮। আস্থায়ীর আরম্ভে,—যেখান হইতে রীতিমত তাল সুরু হয়—সেইখানে এইরূপ ॥ যুগল-ছেদ অথবা যুগল II স্তম্ভচিহ্ন এবং প্রত্যেক কলির শেষে যেখানে থামিয়া আস্থায়ীতে আবার ফিরিতে হয়, সেইখানেও এইরূপ ॥ যুগল-ছেদ অথবা যুগল II স্তম্ভচিহ্ন বসে।

৯। { } = পৌনরুক্তির চিহ্ন; যথা { সা রা গা মা } অর্থাৎ এই অংশ দুইবার আবৃত্তি করিতে হইবে।

১০। ( ) = পুনরুক্তি-কালে লঙ্ঘনের চিহ্ন; যথা { সা রা (গা মা) } পা ধা। অর্থাৎ সা রা গা মা—এই অংশ দ্বিতীয়বার আবৃত্তি করিবার সময় (গা মা) এই অংশ লঙ্ঘন করিয়া একেবারে "পা ধা" এই অংশ ধরিতে হইবে।

১১। প্রতি তাল-বিভাগের পর ছেদ-চিহ্ন বসে; তালের এক আওর্দ্দা পূর্ণ হইলে এই I স্তম্ভ-চিহ্ন দেওয়া হয়।

অর্ঘ্যদান।

নব বর্ষের প্রভাত আলোকে
নব উৎসাহ ঝরে!
এসেছি মা তব মন্দির দ্বারে
নবীন অর্ঘ্য করে।
তুমি হাসিছ মা কমল-আসীনা
মৃদু গুঞ্জনে গুঞ্জরে বীণা;
হের মা মোদের ভক্ত হৃদয়
কাঁপিছে পুলক ভরে!
দূর্ব্বা ও ফুলে বিরচি অর্ঘ্য
এনেছি পূজার তরে।

নাহিক মোদের কাঞ্চন মণি
নাহি মা রত্ন রাজি,
শিশির সজল পুষ্পলতায়
ভরেছি শূন্য সাজি!
আশা আশঙ্কা করিছে দহন
করিবে কি দীন-অর্ঘ্য গ্রহণ,
তুমি হাসিতেছ আশ্বাসি' মাত
অসীম করুণা ভরে!
নব বর্ষের প্রভাত আলোকে
নব উৎসাহ ঝরে!

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

বন্দনা।

নমঃ বীণাপাণি, বিদ্যাদায়িনি, ভারতি, ভারত রাণি!
যুগ যুগান্তে বুধ-বন্দিত তোমারি চরণ খানি।
বসন্ত ঢালে প্রথম অর্ঘ্য তোমারি চরণ তলে!
শরতে, মরতে রচিত আলয় খচিত কমল দলে।
ইন্দুকুন্দ হিমনিন্দিত শুভ্র সুঠাম দেহ।
নয়নে, বয়নে, করুণা বিকাশে, উথলে, উছলে, স্নেহ।
মরাল-তরীতে সরসী-সরিতে বিহরি, বাজাও বীণা।
ফুটে পদতলে শত-শতদল, মাতঃ শতদলাসীনা।
কৈলাশাচল-তল প্রবাহিনী—অলকনন্দা তটে—
তব বীণা-রব-রণিত-রাগিনী—গগনে পবনে রটে।
সে রাগিনী শুনি বাল্মীকি মুনি প্রথমে গাহিল গীত।
ব্যাস, কালিদাস পাইল বিকাশ হেরি ধরা চমকিত!
কবে কোন্ নর হইল অমর কোন্ দেবতায় সেবি?
তব পদ লভি কত কোটি কবি মরতে অমর দেবি!

শ্রীহরিপ্রসন্ন দাসগুপ্ত।

আইনে চীন্‌ই।

যোধপুরের রাওল সুরসিং বিবাহের জন্য ঔরঙ্গজেবের দরবার হইতে ছুটি লইয়া দেশে ফিরিলেন; এই ঘটনার সঙ্গে সোনার খাঁচার পাখিটির মত মোগল অন্তঃপুরে কারুকার্য্য বিচিত্র পাষাণকক্ষে সুখলালিতা সম্রাটকুমারী জেবুন্নেসার মেজাজের হঠাৎ পরিবর্ত্তনের কি সম্বন্ধ তা কে জানে? তবে জেবুন্নেসা যে সে জেবুন্নেসা নাই, কিছু দিন হইতে সাহাজাদীর মেজাজ যে বেশ একটুখানি গরম হইয়াছে সেটা দাসী ও বাঁদী মহলে সকলে বেশ অনুভব করিতেছিল।

বিদুষী এবং স্বভাবতঃ কোমলপ্রাণা জেবুন্নেসার এই আকস্মিক পরিবর্ত্তনে বাদশাও একটু চিন্তিত হইলেন ও নানা উপায়ে কন্যার মনোবিকার অপনোদনের জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে নওরোজ আসিয়া পড়িল। বাদশাহ এবারকার নওরোজ অভাবনীয় ধূমধামের সহিত সম্পন্ন করিতে হুকুম দিয়া, জেবুন্নেসাকে কাছে ডাকিয়া বলিলেন—"এবার নওরোজে রাজ্যের সমস্ত রাণী ও নবাব পত্নী, কি ছোট কি বড়, নিমন্ত্রণ কর। আমি হুকুম দিয়াছি সকলকেই এবার মীনাবাজারে আসিতে হইবে, সকলের আদর অভ্যর্থনার ভার তোমার উপরে দিলাম।" বাদশা বুঝিয়াছিলেন জেবুন্নেসার চিত্ত বিনোদনের জন্য সকালে সন্ধ্যায় তিনি যে সকল আমোদ আহ্লাদ নাচ তামাসার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন সেগুলা তার পক্ষে উৎপীড়ন স্বরূপ হইয়াছিল সেই জন্য মীনাবাজারের ভার লইবার প্রস্তাবটা বাদশা একটু ভয়ে ভয়ে পাড়িয়াছিলেন কিন্তু এ কার্য্যটায় জেবুন্নেসার বরং যেন একটু উৎসাহই দেখা গেল; সুতরাং বাদশাহ অনেকটা প্রফুল্লমনে কন্যার মহল হইতে বিদায় হইলেন।

রৌশনবাঁদী সাহাজাদীর প্রিয় পরিচারিকা এবং বাদশাহের গুপ্তচরও বটে;—নানা সমস্যা কুটীল অন্তঃপুররাজ্যের গোপন সংবাদ হুজুরে পৌঁছিয়া দেওয়া তাহার একটা বিশেষ লাভ-জনক কায ছিল। সে জন্য মীনাবাজারে উপস্থিত হইবার জন্য মোগল অন্তঃপুর হইতে রাণী ও বেগমদিগের নামে পত্র বিলি করিবার সময় যোধপুরের নূতন বৌরাণীর পত্রখানি নিজহস্তে লিখিয়া জেবুন্নেসা যখন রৌশনকে রওয়ানা করিবার জন্য দিলেন তখন সে পত্র-খানি বাদশার হাতে আসিয়া পড়িল। বাদশাহ সেখানি যত্নে খুলিয়া পাঠ করিলেন এবং নিজের লোক দিয়া সেখানি অবিলম্বে যোধপুরে প্রেরণ করিলেন।

পত্র যথাসময়ে ঠিকানায় পৌঁছিল এবং সুরসিংহ নবপত্নীকে লইয়া দিল্লীমুখে রওনা হইলেন। সে বারের নওরোজ যেমন হইতে হয়! দিল্লী সহরে নাচ গান আমোদ আহ্লাদের যেন ফোয়ারা ছুটিয়া গেল। অবিশ্রান্ত আমোদের নেশায় নওরোজের প্রথম আট দিন যেন নিমেষের মধ্যে কাটিয়া গেল। নয়দিনের দিন বৈকালে মীনাবাজার। সে দিন প্রাতঃকাল হইতে রৌশন বাঁদির বিশ্রামের আর অবসর ছিল না, সে দিন সাহাজাদীর সাজিবার সথ এমনি বাড়িয়া উঠিল যে রৌশনবাঁদি নিজে যে একটু সাজিয়া গুজিয়া ফিট্‌ফাট্ হইয়া লইবে

এ অবকাশটুকুও মেলা ভার। সাহাজাদীর এক ছাঁদের পর অন্য ছাঁদে চুল বাঁধিতে, একটার পর আর একটা পেশোয়াজ ওড়নী ও অলঙ্কার প্রভৃতি নানা খুঁটি নাটি বাহির করিতে রৌশন অস্থির হইয়া পড়িল। মহলের দাসী বাঁদিরা আজ সাহাজাদীর সাজ ও ভাবভঙ্গি দেখিয়া অবাক হইয়া গেল ও তাহাদের মধ্যে একটা কাণা-ঘুষা পড়িয়া গেল। সকলে বলাবলি করিতে লাগিল বড় লোকের মেজাজ খুসি হতেও যতক্ষণ আবার খারাপি হতেও ততক্ষণ। দেখ আজ কার কপালে কি আছে? রৌশন জেবুন্নেসার কাছে ছুটি পাইয়া সেই সময়ে সেই দিক দিয়া যাইতেছিল, সে বলিয়া উঠিল—কার কপাল ভেঙেছে আমি জানি। এই বলিয়া রৌশন দেল্‌জানের কানে কানে কি ফিস্‌ফিস্‌ করিয়া মীনাবাজারের দিকে চলিয়া গেল।

মোগল ভাণ্ডারের অমূল্য মণিমাণিক্য ও জরীজরাবতে মণ্ডিতা সাহাজাদী জেবুন্নেসা যখন মীনাবাজারে দর্শন দিলেন তখন মনে হইল আকাশ হইতে হুর কি পরী নামিয়া আসিয়াছে! সে রূপ যে দেখিল সেই বলিল হাঁ বাদশার মেয়ে বটে!

আজ মীনাবাজারে রূপসীর মেলা বসিয়াছে এবং দেশের সুন্দরী একত্র হইলে যাহা হয় অন্য কথা নাই—কেবল রূপেরই চর্চ্চা চলিয়াছে। ও রাণী দেখিতে কেমন ও বেগমের রংটা কি প্রকার, কার গহনার কত মূল্য ইহা লইয়াই তর্ক বিতর্ক চলিয়াছে। সেই সময়ে সাহাজাদী বলিয়া উঠিলেন—"ভাল কথা আমরা তো সব রূপসী এক সঙ্গে মিলিয়াছি এখন বিচার হউক না আমাদের মধ্যে সেরা রূপবতী কে? আমি বাদশাহকে বলিয়া তাঁহাকে আজ পুরস্কার দেওয়াইব।" তখনি সাহাজাদীর পেয়ারের দাসী রৌশন বাদশার হুজুরে পুরস্কারের প্রার্থনা জানাইতে ছুটিল। বাদশা শুনিয়া বলিলেন—"খেলাটা জমিতেছে বটে! ভাল, আমি পুরস্কার দিতে রাজি আছি কিন্তু জেবুন্নেসা যেন সাবধানে থাকেন, রূপের আগুণ লইয়া খেলা কাহারও গায়ে যেন আঁচ না লাগে।" রৌশন বাঁদী মীনবাজারে আসিয়া বাদসাহের মন্‌জুর জানাইবামাত্র সুন্দরী মহলে রূপের পরীক্ষা দিবার জন্য একটা ধূম পড়িয়া গেল। সকলেই পরীক্ষা দিতে অগ্রসর! পরীক্ষা লয় কে? সকলে মিলিয়া জেবুন্নেসাকে রূপের বিচার করিবার জন্য ধরিয়া পড়িল। তখন সাহাজাদী বলিলেন—"বা! সবাই পরীক্ষা দিবে আমি বুঝি ফাঁকে পড়িব, সে হইবে না! এই আমেরের বুড়োরাণী আছেন ইনিই আজ বিচারপতি হউন।"

সর্ব্বনাশ! বাদসাজাদীর সঙ্গে রূপের লড়াই? সাপ লইয়া খেলা! সুন্দরীবৃন্দ একে একে গাঢাকা হইতে লাগিলেন এবং খেলা ভাঙ্গিয়া যায় দেখিয়া জেবুন্নেসাও বিশেষ উৎকণ্ঠিতা হইয়া উঠিলেন। আমেরের বুড়ারাণী জেবুন্নেসার মুখে অসন্তোষের লক্ষণ দেখিয়া বুঝিলেন বাদশাজাদী আজ হয় কোন নবাবপত্নী কি ওমরাহকন্যা অথবা হিন্দু-রাণীকে সকলের সম্মুখে কুরূপা প্রমাণ করিয়া অপদস্থ করিতে চাহেন। অজ্ঞাতনাম্নী মহিলা কেন যে সাহাজাদীর কোপে পড়িলেন এবং কেনই বা জেবুন্নেসা তাহার উপর ঝাল ঝাড়িতে চাহেন তাহা জানিবার উপায় ছিল না। বুড়া রাণী মহাবিপদে পড়িলেন এবং সকলদিক বজায় থাকে এরূপভাবে

সাহাজাদীকে বলিলেন—"লড়ায়ের পূর্ব্বেই সকলে যখন রণে ভঙ্গ দিল তখন এ ক্ষেত্রে বিনাযুদ্ধে বাদশাজাদীরই জয় বলিতে হইবে, তবে নেহাৎ যদি লড়ায়ের সাধ হইয়া থাকে তো আমি আছি, স্বয়ং বাদশা আসিয়া বিচার করুণ আমি সুন্দরী কি সাজাদী সুন্দরী।"

রাণীজীর কথায় সুন্দরীমহলে একটা হাসির রোল উঠিল। সকল সুন্দরী একবাক্যে বলিয়া উঠিলেন—আমরা স্বইচ্ছায় সাহাজাদীর কাছে পরাজয় স্বীকার করিতেছি, বাদশাহের পুরস্কার ইহারই পাওয়া উচিত। বুড়ারাণী এই সুযোগে জেবুন্নেসাকে আরও একটু খুসি করিয়া দিবার জন্য বলিলেন—"দেখ সুন্দরীগণ তোমরা সকলেই আসামী, আর আমাদের সাহাজাদী ফরিয়াদী, আমি হলেম কাজী সাহেব; তোমরা সকলে যখন তোমাদের রূপের দোষ কবুল যাইতেছ তখন সাহাজাদীর পক্ষে একতরফা ডিক্রী দেওয়া গেল ও তোমাদের এই হুকুম দেওয়া যায় যে সকলে একে একে আসিয়া নিজের নিজের নাম ধাম ও পরিচয় দিয়া সাহেনসা ঔরঙ্গজেব বাদশার রূপবতী গুণবতী দয়াবতী দুহিতা কুমারী জেবুন্নেসাকে কুর্ণিশ করিয়া বিদায় হও।"

সুন্দরীরদল বাদশাজাদীকে যথারীতি সেলাম বাজাইয়া দূরে গিয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলেন। সকলের কুর্ণিশ শেষ হইলে বাদশাজাদী বলিয়া উঠিলেন—"কই যোধপুরের বৌরাণীকে দেখিলাম না যে? দেখ্‌তো রৌশন তিনি এসেছেন না?" রৌশন চারিদিক দেখিয়া আসিয়া বলিল—"কই তাঁহাকে তো দেখিলাম না।" সাহাজাদী বলিলেন—"তুই আছেন।" রোশন আবার ছুটিল। আমেরের বুড়ারাণী ব্যাপারটা কতক বুঝিলেন এবং বেচারা যোধপুরণীর জন্য একটু বেশ ভয় পাইলেন; কি জানি কি ঘটে! এদিকে রৌশন এদিক ওদিক দেখিতে দেখিতে দেখিল যোধপুরের বুড়ারাণী এক ঘরে বসিয়া আছেন। সে রাণীকে চিনিত তাড়াতাড়ি গিয়া বলিল—"রাণীমা সাহাজাদী বৌরাণীকে দেখিতে চাহেন কোথায় তিনি?" বলিতে বলিতে বৌরাণী সেখানে উপস্থিত। অপূর্ব্ব সুন্দরী! রৌশন সে রূপ দেখিয়া অবাক হইয়া গেল, মনে মনে বলিল এইবার, এইবার সাহাজাদীর দর্পচূর্ণ দেখ্‌ছি, বড় রূপের দেমাক হয়েছে, এইবার দেখা যাবে! বলা বাহুল্য জেবুন্নেসা রৌশনের খাঁদা নাকের প্রশংসা তাহার সম্মুখে প্রায়ই করিতেন এবং সেজন্য রৌশনও সাহাজাদীর নিকটে বিশেষ বাধিত ছিল।

মীনাবাজারে সকলে যখন উৎকণ্ঠিতা হইয়া ঘন ঘন দ্বারের দিকে চাহিতেছিলেন, সেই সময়ে বৌরাণীকে লইয়া রৌশন সাহাজাদীর সম্মুখে হাজির করিয়া দিয়া সরিয়া দাঁড়াইল। বৌরাণী সসঙ্কোচে ঘোমটায় মুখ ঢাকিয়া বাদশাজাদীকে কুর্ণিশ করিয়া একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিলেন। জেবুন্নেসা বুড়ারাণীর দিকে চাহিয়া বলিলেন—"রাণীজি আসামী হাজির, এখন বিচার করিতে আজ্ঞা হউক—জেবুন্নেসা রৌশনকে ইসারা করিলেন, রৌশন আসিয়া বৌরাণীর অবগুণ্ঠন উঠাইয়া ধরিল। রৌশনের মুখ অতিশয় গম্ভীর কিন্তু তাহার খাঁদা নাকের নথ কেন যে অমন করিয়া দুলিয়া উঠিতেছিল তাহা কে বলিবে!

বিষম সমস্যার কিরূপ মীমাংসা করিয়াছিলেন তাহা জানা যায় না, তবে রৌশন সে রাত্রে সাহাজাদীর শয়ন কক্ষের দ্বারে অনেকক্ষণ কান পাতিয়া দাঁড়াইয়াছিল এবং সে যে অনেক দীর্ঘনিশ্বাস শুনিয়াছিল সে কথা গোপন রাখে নাই। রৌশন সে রাত্রে সাহাজাদীর কক্ষে দুএকবার প্রবেশলাভের চেষ্টাও করিয়াছিল কিন্তু কয়বারই বিফল মনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছিল। জেবুন্নেসা অতি প্রত্যূষে রৌশনকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। রৌশন মীনাবাজার হইতে ফিরিবার সময় সাহাজাদীর মুখের ভাব বিশেষ লক্ষ্য করিয়াছিল এবং বোরাণীর অবগুণ্ঠন খুলিবার কালে তাহার নথের অকারণ চাঞ্চল্যটার প্রতি সাহাজাদীর যে বিলক্ষণ নজর পড়িয়াছিল সেটাও রৌশন জানিত, কাযেই বেচারা একটু বিশেষ চিন্তিত মনে সাহাজাদীর মহলে উপস্থিত হইল।

রৌশন গিয়া সাহাজাদীর মুখে হাসি দেখিবে এটা স্বপ্নেও ভাবে নাই। সেজন্য যখন রৌশন আসিবামাত্র জেবুন্নেসা তাহার খাঁদা নাকে বড় একটা মুক্তার নথ পরাইয়া তাহার হাতে বহুমূল্য একটি চীনদেশীয় আয়না দিয়া বলিলেন—"দেখ দেখি নথটা তোর নাকে মানাইয়াছে কেমন!" তখন রৌশন হতবুদ্ধি হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সাহাজাদী বলিলেন—"জানিস্‌ এই আয়না চীনের রাজা বাদশাকে দিয়াছে। তুই এ খানা যোধপুরের বোরাণীকে দিয়া আসিতে পারিস্‌?" সে যেমন সুন্দরী এ আয়না তারই উপযুক্ত। বলিস্‌ এখানি বাদশার পুরস্কার।" রৌশনের যতটুকু বুদ্ধি ছিল এইবার লোপ পাইল এবং সাহাজাদীকে সেলাম করিয়া খোদার নাম স্মরণ করিতে করিতে কম্পিত চরণে অগ্রসর হইল। রৌশনকে অধিক দূর যাইতে হইল না, মধ্য পথে হঠাৎ বহুমূল্য সেই মুকুর তাহার হস্তচ্যুত হইয়া পাষাণের উপর পড়িয়া চুরমার হইয়া গেল। কাচের ঝণঝণায় সাহাজাদী ছুটিয়া আসিয়া দেখিলেন সেই বহুমূল্য আয়না ভাঙ্গিয়া চুর হইয়াছে। রৌশন সাহাজাদীকে দেখিয়া কপালে করাঘাত করিয়া বলিল—

"অজ্‌কজা আইনে চীন্‌ই শিকস্ত!"

সাহাজাদী প্রথমে কতক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া হঠাৎ করতালি দিয়া বলিয়া উঠিলেন—

"খুব শুদ্‌ আস্বাব খুদ্‌বিনি শিকস্ত"

রৌশন এতক্ষণ মনে মনে পীরের সিরণী মানিতেছিল সাহাজাদীর কথায় অভয় পাইয়া একেবারে দরজার অভিমুখে ছুটিল। আর সাহাজাদীর হুকুমে সিস্‌মহলের কারিগর সেই আয়না চূর্ণ দিয়া দুই ছত্র কবিতা জেবুন্নেসার গৃহদ্বারে লিখিতে বসিল।

"অজ কজা আইনে চীন্‌ই শিকস্ত।
খুব শুদ্‌ আস্বাব খুদ্‌বিনি শিকস্ত॥"

"দর্পণ ভাঙিয়া দেখি চূর্ণ হল আজ।
ভাল হল, না রহিল দর্পের সে সাজ।"

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।



কচ ও দেবযানী।

শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক অঙ্কিত ফ্রেসকো চিত্র হইতে

নিষ্ঠা।

যখন সিদ্ধির মূর্ত্তি কিছু পরিমাণে দেখা দেয় তখন আনন্দে আমাদের আপনি টেনে নিয়ে চলে—তখন থামায় কার সাধ্য! তখন শ্রান্তি থাকে না, দুর্ব্বলতা থাকে না।

কিন্তু সাধনার আরম্ভেই সেই সিদ্ধির মূর্ত্তি ত নিজেকে এমন করে দূর থেকেও প্রকাশ করে না। অথচ পথটিও ত সুগম পথ নয়। চলি কিসের জোরে?

এই সময়ে আমাদের চালাবার ভার যিনি নেন তিনিই নিষ্ঠা। ভক্তি যখন জাগে, হৃদয় যখন পূর্ণ হয় তখন ত আর ভাবনা থাকে না—তখন ত পথকে আর পথ বলেই জ্ঞান হয় না—তখন একেবারে উড়ে চলি। কিন্তু ভক্তি যখন দূরে, হৃদয় যখন শূন্য সেই অত্যন্ত দুঃসময়ে আমাদের সহায় কে?

তখন আমাদের একমাত্র সহায় নিষ্ঠা। শুষ্ক চিত্তের মৃতভারকে সেই বহন করতে পারে।

মরুভূমির পথে যাদের চল্‌তে হয় তাদের বাহন হচ্চে উট। অত্যন্ত শক্ত সবল বাহন—এর কিছুমাত্র সৌখিনতা নেই। খাদ্য পাচ্চে না তবু চল্‌চে। পানীয় রস পাচ্চে না তবু চল্‌চে—বালি তপ্ত হয়ে উঠেছে তবু চল্‌চে—নিঃশব্দে চল্‌চে। যখন মনে হয় সাম্‌নে বুঝি এ মরুভূমির অন্ত নেই, বুঝি মৃত্যু ছাড়া আর গতি নেই তখনো তার চলা বন্ধ হয় না।

তেমনি শুষ্কতা রিক্ততার মরুপথে কিছু না খেয়ে কিছু না পেয়েও আমাদের চালিয়ে নিয়ে যেতে পারে সে কেবল নিষ্ঠা!—তার এমনি শক্ত প্রাণ যে নিন্দাগ্লানির ভিতর থেকে কাঁটাগুল্মের মধ্যে থেকেও সে নিজের খাদ্য সংগ্রহ করে নিতে পারে। যখন মরুবায়ুর মৃত্যুময় ঝঞ্ঝা উন্মত্তের মত ছুটে আসে—তখন সে ধূলোর উপর মাথা সম্পূর্ণ নত করে ঝড়কে মাথার উপর দিয়ে চলে যেতে দেয়। তার মত এমন ধীর সহিষ্ণু এমন অধ্যবসায়ী কে আছে?

একঘেয়ে একটানা প্রান্তর—মাঝে মাঝে কেবল কল্পনার মরীচিকা পথ ভোলাতে আসে—সার্থকতার বিচিত্র রূপ ক্ষণে ক্ষণে দেখা দেয় না। মনে হয় যেন কালও যেখানে ছিলুম আজও সেখানেই আছি। মন দিতে চাই, মন ঘুরে বেড়ায়, হৃদয়কে ডাকাডাকি করি হৃদয় সাড়া দেয় না—কেবলি মনে হয় ব্যর্থ উপাসনার চেষ্টায় ক্লিষ্ট হচ্চি। কিন্তু সেই ব্যর্থ উপাসনার ভয়ানক ভার বহন করে নিষ্ঠা প্রত্যেক দিনই চল্‌তে পারে—দিনের পর দিন, দিনের পর দিন।

অগ্রসর হচ্চেই অগ্রসর হচ্চেই—প্রতিদিন যে গম্যস্থানের কিছু কিছু করে কাছে আস্‌চে তাতে সন্দেহমাত্র নেই। ঐ দেখ হঠাৎ একদিন কোথা হতে ভক্তির ওয়েসিস্ দেখা দেয়—সুদূরপ্রসারিত দগ্ধ পাণ্ডুবতার মধ্যে মধুফলগুচ্ছপূর্ণ খর্জ্জুরকুঞ্জের সুস্নিগ্ধ শ্যামলতা—সেই নিভৃত ছায়াতলে শীতল জলের উৎস বয়ে যাচ্চে। সেই জল পান করে তাতে স্নান করে ছায়ায় বিশ্রাম করে আবার পথে যাত্রা করি। কিন্তু ভক্তির সেই মধুরতা সেই শীতল সরসতা ত বরাবর সঙ্গে সঙ্গে চলে না। তখন আবার সেই কঠিন শুষ্ক অশ্রান্ত নিষ্ঠা। তার একটি

গুণ আছে ভক্তির জল যদি সে কোনো সুযোগে একদিন পান করতে পায় তবে সে অনেকদিন পর্য্যন্ত তাকে ভিতরের গোপন আধারে জমিয়ে রাখ্‌তে পারে—ঘোরতর নীরসতার দিনেও সেই তার পিপাসার সম্বল।

সাধনায় যাঁকে পাওয়া যায় তাঁর প্রতি ভক্তিকেই আমরা ভক্তি বলি—কিন্তু নিষ্ঠা হচ্চে সাধনারই প্রতি ভক্তি। এই কঠোর কঠিন শুষ্ক সাধনাই হচ্চে নিষ্ঠার প্রাণের ধন। এতে তার একটি গভীরতর আনন্দই আছে। সে একটি অহেতুক পবিত্র আনন্দ। এই বজ্রসার আনন্দে সে নৈরাশ্যকে দূরে রেখে দেয়—সে মৃত্যুকেও ভয় করেনা। এই আমাদের মরু-পথের একমাত্র সঙ্গিনী নিষ্ঠা যেদিন পথের অন্তে এসে পৌঁছয় সেদিন সে ভক্তির হাতে আমাদের সম্পূর্ণ সমর্পণ করে দিয়ে নিজেকে তার দাসীশালায় লুকিয়ে রেখে দেয়; কোনো অহঙ্কার করে না, কোনো দাবী করে না—সার্থকতার দিনে আপনাকে অন্তরালে প্রচ্ছন্ন করেই তার সুখ।

নিষ্ঠা যে কেবল আমাদের শুষ্ক কঠিন পথের উপর দিয়ে অক্লান্ত অধ্যবসায়ে চালনা করে নিয়ে যায় তা নয়—সে আমাদের কেবলি সতর্ক করে দেয়। রোজই একভাবে চল্‌তে চল্‌তে আমাদের শৈথিল্য এবং অমনোযোগ আস্‌তে থাকে। নিষ্ঠা কখনো ভুল্‌তে চায় না—সে আমাদের ঠেলে দিয়ে বলে এ কি হচ্চে! এ কি করচ! সে মনে করিয়ে দেয় ঠাণ্ডার সময় যদি এগিয়ে না থাক তবে রৌদ্রের সময় যে কষ্ট পাবে। সে দেখিয়ে দেয় তোমার জলাধারের ছিদ্র দিয়ে জল পড়ে যাচ্চে পিপাসার সময় উপায় কি হবে!

আমরা সমস্ত দিন কত রকম করে যে শক্তির অপব্যয় করে চলি তার ঠিকানা নেই—কত বাজে কথায়, কত বাজে কাজে। নিষ্ঠা হঠাৎ স্মরণ করিয়ে দেয় এই যে জিনিষটা এমন করে ফেলা ছড়া করচ এটার যে খুব প্রয়োজন আছে—একটু চুপ কর, একটু স্থির হও—অত বাড়িয়ে বোলো না—অমন মাত্রা ছাড়িয়ে চোলো না—যে জল পান করবার জন্যে যত্নে সঞ্চিত করা দরকার সে জলে খামকা পা ডুবিয়ে বোসো না। আমরা যখন খুব আত্মবিস্মৃত হয়ে একটা তুচ্ছতার ভিতরে একেবারে গলা পর্য্যন্ত নেবে গিয়েছি তখনো সে আমাদের ভোলে না—বলে, ছি, এ কি কাণ্ড! বুকের কাছেই সে বসে আছে, কিছুই তার দৃষ্টি এড়াতে চায় না।

সিদ্ধিলাভের কাছাকাছি গেলে প্রেমের সহজ প্রাজ্ঞতা লাভ হয়—তখন মাত্রাবোধ আপনি ঘটে—সহজকবি যেমন সহজেই ছন্দোরক্ষা করে চলে আমরা তেমনি সহজেই জীবনকে আগাগোড়া সৌন্দর্য্যের মধ্যে বিশুদ্ধরূপে নিয়মিত করতে পারি—তখন স্খলন হওয়াই শক্ত হয়। কিন্তু রিক্ততার দিনে সেই আনন্দের সহজ শক্তি যখন থাকে না—তখন পদে পদে যতিঃপতন হয়—যেখানে থাম্‌বার নয় সেখানে আলস্য করি, যেখানে থাম্‌বার সেখানে বেগ সামলাতে পারিনে। তখন এই কঠোর নিষ্ঠাই আমাদের একমাত্র সহায়। তার ঘুম নেই সে জেগেই আছে। সে বলে ওকি! ঐযে একটা রাগের রক্ত আভা দেখা দিল! ঐযে নিজেকে একটু বেশি করে বাড়িয়ে দেখাবার জন্যে তোমার চেষ্টা আছে! ঐ যে শক্রতার কাঁটা তোমার স্মৃতিতে বিঁধেই রইল।

কেন, হঠাৎ গোপনে তোমার এত ক্ষোভ দেখি কেন! এই যে রাত্রে শুতে যাচ্চ এই পবিত্র নির্ম্মল নিদ্রার কক্ষে প্রবেশ করতে যাবার মত শান্তি তোমার অন্তরে কোথায়!

সাধনার দিনে নিষ্ঠার এই নিত্য সতর্কতার স্পর্শ ই আমাদের সকলের চেয়ে প্রধান আনন্দ। এই নিষ্ঠা যে জেগে আছেন এইটে যতই জান্‌তে পাই ততই বক্ষের মধ্যে নির্ভর অনুভব করি। যদি কোনোদিন কোনো আত্মবিস্মৃতির দুর্য্যোগে এঁর দেখা না পাই তবেই বিপদ গণি। যখন চরম সুহৃদকে না পাই তখন এই নিষ্ঠাই আমাদের পরম সুহৃদরূপে থাকেন—তাঁর কঠোর মূর্ত্তিই প্রতিদিন আমাদের কাছে শুভ্র সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত হয়ে ওঠে—এই চাঞ্চল্য-বর্জ্জিত ভোগবিরত পুণ্যশ্রী তাপসিনী আমাদের রিক্ততার মধ্যে শক্তি, শান্তি এবং জ্যোতি বিকীর্ণ করে দারিদ্র্যকে রমণীয় করে তোলেন।

গম্যস্থানের প্রতি কলম্বসের বিশ্বাস যখন সুদৃঢ় হল তখন নিষ্ঠাই তাঁকে পথচিহ্নহীন অপরিচিত সমুদ্রের পথে প্রত্যহ ভরসা দিয়েছিল। তাঁর নাবিকদের মনে সে বিশ্বাস দৃঢ় ছিলনা, তাদের সমুদ্র যাত্রায় নিষ্ঠাও ছিল না—তারা প্রতিদিনই বাইরে থেকে একটা কিছু সফলতার মূর্ত্তি দেখবার জন্যে ব্যস্ত ছিল—কিছু একটা না পেলে তাদের শক্তি অবসন্ন হয়ে পড়ে—এই জন্যে দিন যতই যেতে লাগ্‌ল সমুদ্র যতই শেষ হয় না, তাদের অধৈর্য্য ততই বেড়ে উঠতে থাকে। তারা বিদ্রোহ করবার উপক্রম করে, তারা ফিরে যেতে চায়। তবু কলম্বসের নিষ্ঠা বাইরে থেকে কোন নিশ্চয় চিহ্ন না দেখ্‌তে পেয়েও নিঃশব্দে চল্‌তে থাকে। কিন্তু এমন হয়ে এসেছে নাবিকদের আর ঠেকিয়ে রাখা যায় না—তারা জাহাজ ফেরায় বা! এমন সময় চিহ্ন দেখা দিল—তীর যে আছে তার আর কোনো সন্দেহ রইল না—তখন সকলেই আনন্দিত—সকলেই উৎসাহে এগিয়ে যেতে যায়। তখন কলম্বসকে সকলেই বন্ধুজ্ঞান করে, সকলেই তাকে ধন্যবাদ দেয়।

সাধনার প্রথমাবস্থায় সহায় কেউ নেই—সকলেই সন্দেহ প্রকাশ করে, সকলেই বাধা দেয়—বাইরেও এমন কোনো স্পষ্ট চিহ্ন দেখ্‌তে পাইনে যাকে আমার সত্য বিশ্বাসের স্পষ্ট প্রমাণ বলে নিজের ও সকলের কাছে ধরে দেখাতে পারি—তখন সেই সমুদ্রের মাঝখানে, সন্দেহ ও বিরুদ্ধতার মধ্যে নিষ্ঠা যেন এক মুহূর্ত্ত সঙ্গ ত্যাগ না করে। যখন তীর কাছে আস্‌বে—যখন তীরের পাখী তোমার মাস্তুলের উপর উড়ে বস্‌বে, যখন তীরের ফুল সমুদ্রের তরঙ্গের উপর নৃত্য করবে তখন সাধুবাদ ও আনুকূল্যের অভাব থাকবে না—কিন্তু ততকাল প্রতিদিনই কেবল নিষ্ঠা—নৈরাশ্যজয়ী নিষ্ঠা, আঘাত-সহিষ্ণু নিষ্ঠা, বাহিরের উৎসাহ-নিরপেক্ষ নিষ্ঠা, নিন্দায় অবিচলিত নিষ্ঠা—কোনো মতে কোনো কারণেই সেই নিষ্ঠা যেন ত্যাগ না করে—সে যেন কম্পাসের দিকে চেয়েই থাকে—সে যেন হাল আঁকড়ে বসেই থাকে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পাকচক্র।

(প্রহসন)

[কর্ত্তা, গৃহিণী, পুত্র বিনোদ। গৃহিণীর প্রতিপালিতা দরিদ্রা কন্যা শশীমুখী। কর্ত্তার প্রিয় কর্ম্মচারী যুবক চন্দ্রকান্ত। কর্ত্তার দূরসম্পর্কীয়া আত্মীয়া বরদা। ঘটকী, হারুবাবু, মিষ্টান্নওয়ালী প্রভৃতি।]

প্রথম দৃশ্য।

বরদা বসিয়া পান করিতেছেন,
বিনোদের প্রবেশ।

বি। বরুপিসি, তুমি একটা উপায় না করলে কিছুতেই চলছে না—আমি কি চিরদিন ধরে এই রকম শরশয্যায় শুয়ে থাকব নাকি? আমাকে কি ভীষ্ম পেয়েছ?

বরু। আমার কি অসাধ বাবা! তোর মা যে কিছুতেই বোঝে না, কি করি বল না! একটা কাজ যদি করতে পারিস।—

বি। একটা কাজ! লক্ষ কাজ করতে রাজি আছি,—কি বল দেখি।

বরু। ঐ শশী আসছে এখন থাক, পরে বলব।

বি। আঃ আর পারা যায় না। কেবল শশী আর চাঁদ, চাঁদ আর শশী, তবু সন্ধ্যা না হতে হতে বাড়ীটা বেদম অন্ধকার, আচ্ছা আমি বাইরের ঘরে বসছি, তুমি কাজ সেরে এস, আমরা দরজা বন্ধ করে পরামর্শ করব—কাউকে কাউকে ঢুকতে দেব না—কি বল?

[বিনোদের প্রস্থান—শশীমুখীর প্রবেশ ও পান করিতে উপবেশন]

শ। দাদাবাবু কি বলছিলেন? মাগো অত করে সুপুরি দিয়েছ পিসি।

বরু। শোন কথার শ্রী! সুপুরি দেব না তবে ঘাস খাব নাকি! তুই সুপুরি খেতে পারিসনে বলে কি কেউ খাবে না?

শ। তা দাও না—কিন্তু মাসকাবারের আগে সুপুরি ফুরুলে আমার কিন্তু দায় দোষ নেই, আমি বলে খালাস। তা দাদাবাবু কি বলছিলেন?

বরু। হ্যাঁ তোমারই কিনা সব তাতেই দায় দোষ পোয়াতে হয়! দাদাবাবু আর কি বলবে, এই হরিবাবু ভদ্রলোক—মেয়ে নিয়ে সাধাসাধি করছে, অমন সুন্দর মেয়ে, ছেলেরও অত মন, তা বৌদিদির যে কেন মন উঠছে না, এইটেই আশ্চর্য্য! ওমা দারচিনি এলাচ যে সব ফুরিয়ে ফেল্লি।

শ। মাগো! দারচিনি এলাচ না হলে কি পান খাওয়া যায়! তা তারা বাবু—আর একটু উঠুক না, মা ত হক কথাই বলেন, আজ কালকার দিনে ছেলে কি দু পাঁচ হাজারে মেলে! আর অমন পাশ করা ছেলে!"

বরু। আমাদের পানে একখানার বেশী দুখানা সুপুরি খরচ করবার যো নেই, আর তোমার ডালচিনি এলাচ নইলে পান রোচে না,—ধন্যি সোয়াগিনী যাহক! দেখো শেষে গিন্নি যেন আমাকে না ফাঁসান!

শ। না গো না—সে ভয় নেই, বকুনী

থেতে হয় আমিই খাব। তা ওরা আর একটু বাড়ুক না।

বরু। সে কথায় কাজ নেই, আমরা খাব বকুনী আর তুমি খাবে মেঠাই মণ্ডা! কেন বাড়বে! মেয়ে কেমন তাওত দেখতে হবে! অমন সুন্দরী শহরে একটা মেলা দায়!

শ। (পান ধুইবার জলপাত্রের দিকে চাহিয়া ভ্রুভঙ্গী সহকারে) দাদাবাবুর যে কি নজর! সুন্দর অমন ঢের ঢের আছে!

[ঘটকীর গান করিতে করিতে প্রবেশ।]

কে তোরা জামাই নিবি, ওগো কনের মারা—
এনেছি নতুন বর গুণে সেরা, ওগো গুণে সেরা!

বরু। (পান সাজা বন্ধ রাখিয়া) এই যে ঘটক ঠাকরুণ, এস এস—বরের গুণ গুলো ভাল করে বল—শোনা যাক। আমাদের ঘরে যদিও মেয়ে নেই।

ঘ। তবে আর এ গান শুনে কি হবে; বানরানাং কণ্ঠে গজমতিবৎতরলং দাঁড়াবে বই ত নয়।

বরু। তা আমরা বাঁদরই বটে—মুখ্যু সুখ্যু লোক।

শ। নাগো বাঁদর কেন হতে গেলুম—তোমার ইচ্ছা হয় তুমি হও।

(জলে মুখদর্শন)

বরু। হ্যাঁ তুই কাষ্ঠ মাষ্ট কি পড়েছিস বটে।

ঘ। আজ্ঞা তা নয় তা নয়—ও কেবল উপমা উপমেয়শ্চ।

বরু। ঘটকঠাকরুণ, থেমে যাও। শশী আবার মুখ্যু বল্লে রাগ করে। তুমি বরের গুণ গান কর আমরা শুনি।

ঘ। কিন্তু রসমঞ্জন ন্যায়টা না জানা থাকলে গানটার ভাল রস বোধ হয় না, বুঝলেন?

বরু। তা, রাসকীর্ত্তন, মানভঞ্জন এ সব পালা জানা আছে বই কি, তুমি গাও।

ঘ। (হাসিয়া) হা হা—রসমঞ্জন ন্যায় আর রাসকীর্ত্তন এক নয়; তবে বলছেন গাই।

গান।

কে তোরা জামাই নিবি, ওগো কনের মা-রা,
এনেছি নতুন বর গুণে সেরা, ওগো গুণে সেরা।
এ নয় সাধারণ ছেলে
পাশের রাশ সে বইতে নারাজ,
তাই ফেল্ বিএ, এল এ;
গুণের কব কি সীমা, এর নাই জমা জমা,
এযে স্বনামধন্য পুরুষগণ্য বিলাত ফেরা!
ওগো কনের মা-রা—
কে তোদের মেয়ে এমন কপাল জোরা!
লাগবে না টাকা কড়ি সোনাভরি ওজন করা;
শুধু উনিশ কি বিশ, যৌতুকটি দিস
কাগজ ভরা,—ওগো কাগজ ভরা;
অমনি পরবে টোপর, আপনি সে বর দেবে ধরা।

ব। ঐগো গিন্নি আসছেন—

(সকলের পানের দিকে মনোনিবেশ। গৃহিনীর প্রবেশ।)

ঘ। ইনিই গিন্নি?

গৃ। আর গিন্নি! নামে গো নামে, এ সংসারে খাটতেই আমি গিন্নি, কথার বেলা একটা কিন্তু থাকে না।

ঘ। তাইত! অপরন্থা কিং শোচনীয়া—অর্থাৎ এর চেয়ে দুঃখ কি আছে।

গৃ। ঐ যা বল্লে! এর চেয়ে কেউ দুঃখ সয়নি—সবে না। এই দেখ না আমার ছেলে—দুধের ছেলে, এখনো গাল টিপলে দুধ পড়ে—এই বয়সেই দু দুটো পাশ—এমন কেউ কখনো দেখেনি গো শোনেনি। তা—বলে কিনা দু-

পাঁচ হাজার দিয়ে নমো নমো করে সারবে। এখানে কিন্তু কর্ত্তার ইচ্ছা কর্ম্ম হতে দিচ্ছিনে, দশটি হাজারের একটি পয়সা কম নেব না।

ঘ। তা অন্যায় কথা নয়—অন্যায় কথা নয়, ও কথা বলতে পারেন—মহাজনস্ত য পন্থা স গন্তা।

ব। ঘটকঠাকরুণ কি পণ্ডিত গা! সেই অবধি কত ছড়াই বলছেন।

ঘ। হাহা ছড়া! একটু অশ্লীল দোষ ঘোটলো যে! শ্লোক—বুঝলেন, ছড়া নয় আর পণ্ডিত কথাটাও ভুল—পণ্ডিতের স্ত্রীলিঙ্গ পণ্ডিতানী, যেমন মাতুল মাতুলানী।

ব। উঃ কি বিদ্বান! কথা কইতে ভয় হয়।

ঘ। ভয়ের কোন কারণ নেই, তবে স্ত্রীলিঙ্গে বিদ্বান কথাটার প্রয়োগ হয় না। বিদ্বস শব্দে ঈ প্রত্যয় করলে হয় বিদ্বসী বুঝলেন।

গৃ। কি যে বলছ কিছুই ত মাথামুণ্ডু বুঝতে পারিনে! বিয়ের কথা কি বলতে এসেছ তাই বলনা ছাই।

ঘ। তা বলছি। জানেন মেয়ে আছে চার রকম—বিদ্বসী, রূপসী, ধনাবতী ও গুণাবতী,— সচরাচর সকলে বলে থাকে বটে ধনবতী গুণবতী,—কিন্তু সেটা ভুল, ধন শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ ধনা,—আর গুণ শব্দে গুণা—অতএব ধনাবতী ও গুণাবতী;—এর মধ্যে কোনরকম মেয়ে আপনি চান বলুন, আমি তাই এনে দেব।

গান।

আমি কি যেমন তেমন ঘটকী ও গিন্নি।
আমার পায়ে পড়ে আট পহরে—
ভারে ভারে সিন্নি।
রং বেরঙের সুগুণ সুরূপ
এক একটি বর আস্ত তুরূপ
আমার হাত ধরা।
আর-ক'নে সবি হরেক বিবি—
এমন কেউ কখনো পাননি।—

ব। সত্যি ঘটকঠাকরুণ যে রকম বিদ্বান—

ঘ। না না—বিদ্বসী—

ব। ছাই মনেও থাকে না—বি বি—বিলাসী।

ঘ। মহাভারত মহাভারত!

ব। ওটা বুঝি মস্ত ভুল হোল—বি-বি বিদ্যা—হ্যাঁ হ্যাঁ বিদ্যাগজি—এবার ত ঠিক হয়েছে! বিদ্যাগজি ঠাকরুণ—তুমি ঘটকালী না করে পড়াও না কেন?

ঘ। তা ও সম্বোধনটা করতে পারেন—নিতান্ত অশুদ্ধ হবে না। আমার স্বামীর পদবী হচ্ছে,—বিদ্যাদিগ্‌গজ, সংক্ষেপে স্ত্রীলিঙ্গে আমাকে বিদ্যাগজি বলা যেতে পারে।

ব। আঃ বাচলুম।—তা দিগগজি মহাশয়

ঘ। মহাশয় না মহাশয়া—

গৃ। দেখ ঠাকুরঝি বজর বজর ছাড়বে?

ব। আমি বলছি—তাহলে ঘটকালী না করে—মাষ্টারি করলেই ত হয়। আমার মেয়েটিকে কিন্তু পড়াতেই হবে—দিগগজি ঠাকরুণ—আমার ইচ্ছা তাকে ভাল করে নেকাপড়া শেখাই, নিজে ত মুখ্যু হয়েই রইলুম।

ঘ। এ ইচ্ছা স্বাভাবিণী,—কিন্তু এতে আমার ইচ্ছাও যাতে প্রবলিনী-বেগা হয়,—সেটা করা চাই।

ব। আহা কেমন মিষ্ট করে কথাটা বল্লেন! তা আমার মেয়েকে যদি পড়ান আমি মাসে পাঁচ টাকা করে দেব।"

গৃ। তুই যে দেখছি পাগল হলি—মেয়ের পড়ার জন্য পাঁচ পাঁচ টাকা খরচ করবি!

ঘ। ওকথা বলবেন না, আপনারা হলেন আমাদের মহাজনানিচয়া আদর্শিনী দাত্রী—

গৃ। কি বলিস্! আমরা ধাত্রী,—বের করে দে মাগীকে বের করে দে—এমন গাল আমাদের কেউ কখনো দেয় নি।

ঘ। হাঃ হা, গাল নয় মহাজনা—এই আমাদের সহজিনী ভাষায় যাকে বলে দাতা তাই বলছি। স্ত্রীলিঙ্গে দাতা কথাটা অশুদ্ধ—দাত্রীই ঠিক;

গৃ। ধাত্রীই ঠিক! মলো মাগী—দূর হ বলছি।

ঘ। আমি ঠিক বলছি—বার বার পুনর্ব্বার বলছি এ ভাল কথা—গাল নয়, আপনি শিক্ষিতানী নন বলে এর মর্ম্ম বুঝছেন না।

শ। তাই ত এ মাগী দেখছি—বুকে বসে দাড়ী ছিঁড়তে চায়!

ঘ। হায় হায়! এ তুলনাটা নিতান্ত ব্যাকরণ অশুদ্ধ হোল! স্ত্রীলিঙ্গে দাড়ী অসম্ভব,—চুল ছেঁড়ার কথা বল্লে সঙ্গত উপমা হয়।

গৃ। ওমা একি বলে গো—ও যে চুল ধরে টানে। ও কর্ত্তা কর্ত্তা গো—শেষে কি এই দশা হোল আমার! পথের লোক এসে চুল ধরে টানে!

(উচৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে করিতে প্রস্থান।)

শশী। থাম মা থাম,—একি হোল গো।

পশ্চাৎ ধাবমান।

বরু। একি করলে বল দেখি—বিত্যাগজি ঠাকরুণ—

ঘ। হা হা একেই বলে অশিক্ষিতাণী পটুত্বাণী। বিভূতি দাস স্বয়ং যা বলেছেন—তা কি মিথ্যা হয়।—

(নেপথ্যে—ওগো কি হলো গো আমার।)

বরু। চল—আর না—গিন্নি দেখছি ভারী ক্ষাপা হয়েচেন—আর একদিন এসে বিয়ের কথা তুলো— প্রস্থান

ঘ। একটু দাঁড়ান, একটু দাঁড়ান, গানটা একবার শুনে যান।

(ঘটকীর তুড়ি দিয়া গান)

আমি কি যেমন তেমন ঘটকী, ও গিন্নি।
আমার পায়ে পড়ে আট পহরে,
ভারে ভারে গিন্নি!
রং বেরঙের, স্বগুণ স্বরূপ,
এক একটি বর আস্ত তুরুপ,—
আমার হাত ধরা,—
আর কনে সবি, হরেক বিবি—
এমন কেউ কখনো পাননি।
চাও যদি গো গুণের মেয়ে—
তার—না ফুরবে অন্ন দিয়ে,—
আনব—স্বয়ং দ্রৌপদী—
কিম্বা পটল পারা চক্ষু চেরা—
চাও কি রূপের বহ্নি?
নয় যদি চাও টাকার থলে,
তাহাও বল খুলে খেলে
ওগো—বিলাত যাবে—তোমার ছেলে,—
সবাই করবে ধন্যি।
বেশী কথা কি কব আর,
ভবে করি যাত্রী পার—
আমি কাণ্ডারী,
ছেলে মেয়ে, মা বাপেরা,
পার হতে চাও যারা যারা
আঁচল ধরে দাঁড়াও তারা,—
আমি—নহিত সামান্যি।

(গাহিতে গাহিতে প্রস্থান।)

বলেন্দ্রনাথ।

বাঙ্গালা সাহিত্যে বলেন্দ্রনাথের স্থান অতি উচ্চে। ইহা সত্বেও আজি কালিকার সাধারণ পাঠকের যে তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় নাই তাহার কারণ, প্রথমতঃ তাঁহার সহিত ইহলোকের প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ নাই দ্বিতীয়তঃ, তাঁহার রচনাবলী এতদিন মাসিক পত্রিকার ধূলিমলিন পৃষ্ঠায় ইতস্ততঃ প্রক্ষিপ্ত ছিল। সম্প্রতি তাঁহার গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হওয়ায় বাঙালী পাঠকের তাঁহার সহিত সুপরিচিত হইবার অবসর ঘটিয়াছে। দুঃখের বিষয়, তাঁহার গ্রন্থাবলী সুচারুরূপে সম্পাদিত হইতে অবকাশ পায় নাই। তাঁহার রচনাগুলি রচনা-কালানুক্রমে বা বিষয় পর্য্যায়ে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া প্রকাশিত হইলে অনুসন্ধিৎসু ও চিন্তাশীল পাঠকের অনেকটা সহায়তা করিতে পারিত। তথাপি আজ এই সুবৃহৎ, মহামূল্য গ্রন্থাবলী সাধারণে প্রচার করিয়া ইহার প্রকাশক মহাশয় বঙ্গসাহিত্যের একটি গুরুতর অভাব মোচন করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার অকাল তিরোভাবে বঙ্গ সাহিত্যের মর্ম্মস্পর্শী দীর্ঘবিলাপ কোনকালে সমাপ্ত হইবে না।

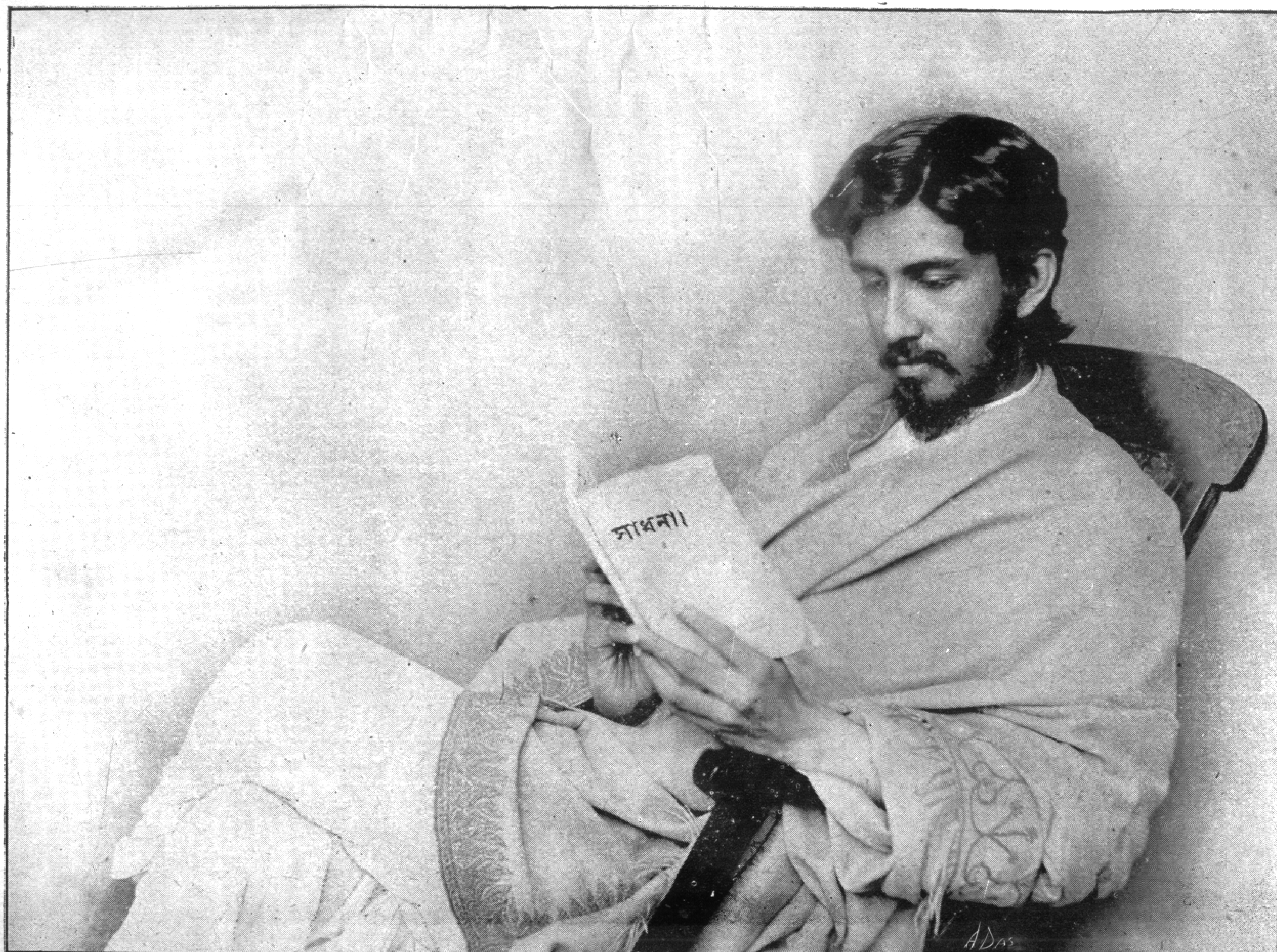
বলেন্দ্রনাথের রচনা তাঁহার ভাষা মাহাত্ম্যে এবং সুমধুর বাক্‌ভঙ্গিতে সাহিত্যজগতের এক অপূর্ব্ব সামগ্রী।

ভাষা সাহিত্যিকের প্রধান অস্ত্র, ভাষার সাহায্যেই সহানুভূতির দ্বার দিয়া তাঁহাকে পাঠকের হৃদয়ে প্রবেশ লাভ করিতে হয়, অমূল্যভাব লইয়া মুক্ত হস্তে অযাচিত দান করিতে বসিলেও কোন পাঠকই বিজ্ঞ ও 'ভাবুক' লোকের নিকটস্থ হইতে ইচ্ছা করেন না। অথচ একজন 'ভাবহীন' লেখক কেবল মাত্র সুন্দর ভাষার সাহায্যে সহজেই পাঠকের হৃদয় অধিকার করিতে পারেন। পাঠকের সহিত লেখকের কোন পূর্ব্ব পরিচয় নাই, আত্মীয়তা নাই। লেখক যদি তাঁহার মধুরচ্ছন্দে ঝঙ্কার তুলিতে না পারিয়া, কেবলই ভাবের গুরুত্ব, চিন্তার ঐশ্বর্য্য দেখাইতে উৎসুক হইয়া বসেন, তবে অপরিচিত পাঠকের এমন কি দায় পড়িয়াছে যে ধৈর্য্য-সহকারে সহানুভূতিকে বিদায় দিয়া কেবল মস্তিষ্কের সাহায্যে তাঁহার ভাবরাশি গলাধঃকরণ করিবে।

এখানে ভাষা অর্থে এমন বলিতেছি না, যে অভিধানের দুরূহ শব্দ সমষ্টি বাছিয়া গ্রথিত করাই ভাষা। ভাষা অর্থে এইরূপ বুঝিতে হইবে, যাহাতে মানবহৃদয়ের অব্যক্ত ভাবটি সরল সুন্দরভাবে ব্যক্ত হইয়া অপর হৃদয়ে সেই প্রকারের একটা ছাপ রাখিয়া যায়।

কিন্তু ঐরূপ ভাষা ব্যবহারে অভ্যস্ত হইতে হইলে কতকটা ছন্দের অধিকারী হইতে হয়। যে শব্দ চয়নে লেখকের মর্ম্ম কথাটি সমগ্রভাবে ফুটিয়া পাঠকের চিত্তে একটি অব্যক্ত মধুর স্থায়ী ছন্দ সৃষ্টি করিতে পারে তাহাই যথার্থ সাহিত্যিক ভাষা।

বলেন্দ্রনাথ সেই ছন্দময়ী ভাষায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাঁহার 'কলবেদনা' পাঠ করিলে সত্য সত্যই মনে হয় পরিপূর্ণ কুম্ভ, বিকশিত যৌবনার পেলব বাহুলতার বন্ধনে একটা অবাক্ত ভাষাহীন বেদনায় মুখের হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার 'সন্ধ্যা' পাঠ করিলে



বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর

সন্ধ্যার মৌনগম্ভীর মহিমা, তাহার প্রেম-সলিল মাধুরী, তাহার সমগ্র সঙ্গীত গুঞ্জন, সমস্তটার একটা মধুর চিত্র, একটা কেমন ছন্দ আমাদের হৃদয়ে অবশেষে থাকিয়া যায়।

ভাষার উদ্দেশ্য আর একটি, যেটি বলেন্দ্রনাথের লেখনীতে চরম সফলতা লাভ করিয়াছে—সেটি স্বাধীন সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি। ভাষায় শুধু একটি সঙ্গীত প্রবাহ বা চিত্রাঙ্কনী রেখাপাত অক্ষুণ্ণ থাকিলেই যথেষ্ট হইল না। ছন্দের ঝঙ্কার ও চিত্রাঙ্কন, উভয়ের সামঞ্জস্যে যে একটি অনবদ্য সৌন্দর্য্য সৃষ্টি হয় তাহা অতি উচ্চশ্রেণীর লেখকের উপযুক্ত।*

এই ভাষাগঠনে বলেন্দ্রনাথের কৃতিত্ব ও বিশেষত্ব অসাধারণ। তাঁহার সেই প্রতিভার মূলে তাঁহার আবাল্য সংস্কৃত শিক্ষা। এ কথাটি তাঁহার গ্রন্থাবলী-প্রকাশক সুলেখক ঋতেন্দ্রবাবু বিশেষভাবেই লক্ষ্য করিয়াছেন। যদি চিত্রের পর চিত্র আঁকিতে হয় ছন্দের পর ছন্দের ঝঙ্কারে অব্যাহত ও গভীরস্বরের সৃষ্টি করিতে হয়, তবে সংস্কৃতের শরণাপন্ন হইতেই হইবে। তাহার কারণ আর কিছুই নয়, সংস্কৃত আমাদের অতি পূর্ব্বপুরুষগণের ভাষা। সে ভাষায় একটি পুরাতন জাতি, বংশপরম্পরায় আপনার হৃদয় ব্যথা ব্যক্ত করিয়া আসিয়াছে, তার এক একটি শব্দের সহিত কতটা স্মৃতি, কতটা নিবিড় অনুরাগ, কতটা গভীর ব্যথা, সুখ দুঃখ জড়িত আছে। বাঙ্‌লা ভাষায় একটা শব্দের বয়স হয়ত পাঁচশত বৎসর, কিন্তু সংস্কৃতে এক একটির বয়স ২।৩ হাজার বৎসর! ভাষার পরমায়ু যত দীর্ঘ, তাহার ইতিহাসও তত দীর্ঘ ও বিচিত্র। উদাহরণ স্বরূপ একটা শব্দ লইয়া দেখা যাউক। 'শঙ্খ'! শঙ্খ বলিলে আমাদের হৃদয়ে একটি বিপুল ও গম্ভীর ধ্বনি আঘাত করিয়া উঠে, মনে হয় যেন কুরুক্ষেত্রে পাঞ্চজন্যের নির্ঘোষে দিঙ্মণ্ডল প্রকম্পিত হইয়া উঠিয়াছে। তাহাতে কেমন একটি গাম্ভীর্য্য, মহিমাময় অথচ পুণ্য-জড়িত ভাব হৃদয়ে ফুটিয়া উঠে। 'শাঁখ' ঐ একই শব্দের রূপান্তর, অথচ উভয়ে কত প্রভেদ! তাহাতে দিঙ্মণ্ডল প্রকম্পকারী নির্ঘোষ নাই, আছে শুধু ক্ষণিকের একটি অল্পস্থায়ী ধ্বনি।

বলেন্দ্রনাথ সংস্কৃতে লব্ধপ্রবেশ ছিলেন। তাই তাঁহার রচনায় অজস্র সমাসের মল্লিকাফুল ফুটিয়া নির্ম্মল শোভা সম্পাদন করিয়াছে। সমাস সংস্কৃতের আকরে শ্রেষ্ঠ রত্ন। তাহা দ্বারা ভাব ও সৌন্দর্য্য এত সহজে আঁকিয়া ফেলে, যে Compound word হাজার স্থিতিস্থাপক হউক, তাহার নিকট পরাস্ত! "বপ্রক্রীড়াপরিণতগজঃ"—হয়ত তেমন শ্রুতিমধুর নয়, কিন্তু কত সহজে একটা মহান চিত্র ফুটাইয়া তুলিয়াছে! বলেন্দ্রনাথের রচনা মনোহারী হইবার আর একটি কারণ তাঁহার ভাষা সমাসে খচিত, কিন্তু কণ্টকিত নহে।

কিন্তু কেবল সংস্কৃত শব্দ-সম্পদে বাঙলা ভাষা পর্য্যাপ্তভূষিতা হইতে পারে না। মানুষের মধ্যে যেমন সমাজ আছে ভাষার মধ্যেও তেমনি স্বভাবগঠিত সমাজ আছে। শব্দ শুধু ধ্বনি মাত্র নহে, তাহারা এক একটি সজীব শরীরী মূর্ত্তি! ঋষিগণ যেরূপ মন্ত্রের মূর্ত্তির

* একটি কথা বলা আবশ্যক মনে করিতেছি। সাধারণে যাহাতে বলেন্দ্রনাথের রচনা বহুল প্রচারিত হয় তজ্জন্য গ্রন্থাবলীর মূল্য যথাসম্ভব সুলভ করা প্রয়োজন। ইহার বর্ত্তমান মূল্য সাধারণের কিঞ্চিৎ ক্ষোভের কারণ হইয়াছে।

দর্শন করিতে পান—কবিও সেইরূপ শব্দের মূর্ত্তি দেখিতে পান। কয়েক শ্রেণীর শব্দ হয়ত রাজৈশ্বর্য্য-ভূষিত, আবার কতক অতি দীনবেশ। সংস্কৃত শব্দে অধিকাংশই সভ্য ভদ্রবেশী। কিন্তু ভিখারীর চিত্র আঁকিতে বাঙলা শব্দই বোধহয় অধিকতর উপযোগী। আমাদের বর্ত্তমানে যেরূপ জীবনসংগ্রাম তীব্র ও কঠোর হইয়া আসিয়াছে তাহাতে বোধ হয়, একমাত্র সংস্কৃত ভাষা আমাদের মানসিক বৃত্তিগুলির যথেষ্ট প্রকাশপথ হইতে পারে না। এজন্য বাঙ্গালা ও সংস্কৃত উভয়ের অন্তর্নিহিত শক্তির মিলনে একটি কার্য্যোপযোগী ভাষা আবিষ্কার করিয়া লইতে হইবে। বঙ্কিমচন্দ্র এই আবিষ্কার কার্য্যে স্বীয় অসামান্য প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন। শিশু বলেন্দ্রনাথও এ বিষয়ে যথেষ্ট কৃতিত্ব ও উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দিয়াছেন। বলেন্দ্রনাথ বাঙলা ও সংস্কৃতে কেবল যান্ত্রিক মিলন না করিয়া আন্তরিক মিলন করিয়া সুন্দর একটি পথ আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন!

বলেন্দ্রনাথ ভাবুক ছিলেন। 'ভাবুক' অর্থে আমি দার্শনিক বা চিন্তাশীল বলিতেছি না। কার্লাইল যে অর্থে ভাবুক, বলেন্দ্রনাথ সে অর্থে নহেন! তিনি তরুণ, তাঁহার হৃদয় আলো ও ফুলের গন্ধের মত লঘু। কঠিন পৃথিবী তাঁহার কোমল চরণে বাজে, ভীষণতার রুদ্রমূর্ত্তি তাঁহার হৃদয় করুণায় কাতর করে!

তিনি ভাবুক—সমস্ত হৃদয়ের সহানুভূতি প্রেমস্নেহ দিয়া তিনি ভাবিতে পারেন! তিনি কবি; দার্শনিক নন্! তিনি শুধু সৌন্দর্য্যের সন্ধানে ফিরেন, আকাশ সাগর তরুলতা ফলফুলে প্রকৃতির বিশালভবনে তিনি অবলীলায় অবাধে গমন করিয়াছেন। তিনি মানুষের হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন একেবারে তাহার মর্ম্মস্থলে,—যেখানে স্তূপীকৃত অশ্রু বিলাপ ও দীর্ঘশ্বাস লইয়া মানুষের ব্যথা বেদনা স্তব্ধ হইয়া আছে। তিনি মানুষের 'গৃহকোণে' যেখানে মানুষ আপনার হাতে ধীরে ধীরে কয়েকটি কুটিকাটি দিয়া ক্ষুদ্র একটি নীড়রচনা করিয়াছে—তাহারি ক্ষুদ্রতম একটি কোণে! যেখানে সুখে-দুঃখে একটি লাজ-ত্রস্ত কাঁকণ, দু'একটি মৃদু নিকণ করিয়া যায়, একটি শুভদীপ অধীর দখিণায় কাঁপিতে থাকে, যেখানে স্নেহ আছে, প্রেম আছে আশীর্ব্বাদ ও মঙ্গলকামনায় পুণ্যসঞ্চিত হইয়া আছে! বলেন্দ্রনাথ তাহাই ভাবিয়াছেন, স্বয়ং সে সৌন্দর্য্য উপভোগ করিয়া সাধারণকে তাহার অংশ দিয়া ধন্য করিয়াছেন!

এ ভাবুকতা বলেন্দ্রনাথের স্বাধীন চিন্তার ফল। তাঁহার চিন্তাপ্রণালী অপূর্ব্ব ও তাঁহার প্রতিভার শাশ্বত কীর্ত্তি। তাঁহার ভাবুকতার মূল, দৃষ্টি বা পর্য্যবেক্ষণ। বলেন্দ্রনাথের দৃষ্টিসম্বন্ধে রামেন্দ্রবাবু গ্রন্থাবলীর ভূমিকায় বলিয়াছেন, যে সৌন্দর্য্য অন্যের চোকে প্রকাশ পাইত না, তিনি তাহা বাহির করিয়া আনিয়া দেখাইয়া দিতেন।' স্বল্পকথায় রামেন্দ্রবাবু যাহা বলিয়াছেন তাহার উপর দীর্ঘ টীকার আবশ্যক করে না। বলাবাহুল্য প্রতিভার লক্ষণই তাই। যে সৌন্দর্য্য এতটুকু একটি ফুলের চারিধার ঘিরিয়া আছে; যে সৌন্দর্য্য শৈবালাচ্ছন্ন একটি 'ভায়লেট'কে লোকচক্ষুর খরদৃষ্টি হইতে আধেক ঢাকিয়া রাখিয়া শুধু তার আধখানি প্রকাশ করিয়া আছে—সে কোমল কোমলতর সৌন্দর্য্য কেবল কবিই দেখাইতে পারেন। বসন্তের ভাঙা-সভায় বাতাসে ঝরেপড়া একটি পাতার যে অস্ফুট-

করুণ মর্ম্মকাতরতার গান সে গান উদার হৃদয় কবি ভিন্ন কে শুনিতে পারে! বলেন্দ্রনাথ এমনি অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সৌন্দর্য্যটুকুও লক্ষ্য করিতে ছাড়েন নাই! ভগ্নকুটিরে জীর্ণ দেওয়ালে এতটুকু একটি সেওলা! বলেন্দ্রনাথের চক্ষে "কবিত্বের মাধুরীর মত, একটুখানি ঘুমন্ত স্বপনের ছায়ার মত"—তাহা অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে! জীর্ণপ্রাচীরগাত্রে প্রতিদিন আমরা কত না 'সেওলা' দেখিয়া যাই, কিন্তু আমরা দেখিয়া যাই কি তাহার কোমল সৌন্দর্য্যটুকু? আমরা শুনিয়া যাই কি তাহার বিলাপ-করুণ সকাতর গান?

আমার মনে হয় প্রথম বয়সে বলেন্দ্রনাথ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সৌন্দর্য্য গুলি লইয়া খেলাঘরের পুতুলের মত খেলা করিয়াছেন! এক ফোঁটা অশ্রুজল, এতটুকু হাসি, তটতরু, ছায়াস্পৃষ্ট নদীর কাণায় ভাঙা ঢেউ, তাহারি রোমাঞ্চিতগায় দশমীর চাঁদের ক্ষণিক চিকিমিকি! বলেন্দ্রনাথ এই সমস্ত পুঙ্খাণুপুঙ্খরূপে নিরীক্ষণ করিয়াছেন! পরিণত বয়সে এই সমস্ত ফুল লইয়া তিনি বড় করিয়া মালা গাঁথিয়াছেন! প্রথম বয়সে ফুলকুড়ানোর কাল অতীত হইলে বলেন্দ্রনাথ তখন সৌন্দর্য্যের খনি সংস্কৃত কাব্যগুলির বৃহত্তর সৌন্দর্য্য লইয়া নাড়াচাড়া করিয়াছেন তাঁহার এ নাড়াচাড়াও নূতন রকমের! সমালোচনার একটা অধিকার সৌন্দর্য্যজ্ঞান পরিণত না হইলে সম্ভব নয়। এককথায় তিনি কালিদাসের সমগ্র ঐশ্বর্য্যের সীমা রচিয়া দিতে পারিয়াছেন। কালিদাস কেবলি আঁকিয়াছেন ছবি; মহাকাব্যে ছবির পর ছবি দিয়া একটি নিগূঢ় সত্যের প্রতিপাদন করিয়াছেন। কালিদাস ছবি ভালবাসেন লাবণ্যবালার রক্তরাগরঞ্জিত চরণনখরের ছবিটি পর্য্যন্ত! ভবভূতি একটি সমগ্র সংহত দৃশ্য-গাম্ভীর্য্যে পাঠককে অভিভূত করিয়া দেন। কালিদাস খণ্ডখণ্ড সৌন্দর্য্য, ভবভূতি সমগ্র সৌন্দর্য্য। ক্ষুদ্র ও খণ্ডকে একসূত্রে গাঁথিয়া একটি সমগ্র সৌন্দর্য্য—এমন সহজ, এমন প্রাঞ্জল মধুর ভাষায় ও ভাবে বলেন্দ্রনাথ ভিন্ন আর কেহ বলিতে সমর্থ হইয়াছেন কিনা সন্দেহ!

বলেন্দ্রনাথের আর একটি গুণ ছিল। তিনি ইতিহাসকে জড়বস্তু মনে করিতেন না। অতীত তাঁহার নিকট বর্ত্তমানের মতই প্রাণময়, চঞ্চল! তিনি যখনি অতীতকে দেখিয়াছেন তখনি বর্ত্তমানকে সঙ্গে লইয়া গিয়াছেন—দুটিতে হাত ধরাধরি করিয়া আঁধার ও আলোকে কেমন সুন্দর খাপ খায় তিনি তাহাই দেখাইয়াছেন! সমস্ত পুলকবেদনা ঢালিয়া দিয়া তিনি অতীতকে অপূর্ব্ব গৌরবে উজ্জ্বল করিয়া দেখাইতে পারিতেন। তাহার উদাহরণ, তাঁহার 'কণারক' বঙ্গসাহিত্যে একটি বহুমূল্য উজ্জ্বল রত্ন। তিনি বর্ত্তমানে 'কণারক' দেখিয়াছেন কিন্তু দেখাইয়াছেন দ্বাদশ শতাব্দী পূর্ব্বেকার! এই দীর্ঘ দ্বাদশ শতাব্দী ধরিয়া কণারক কত সহস্র নরনারীর হৃদয়ব্যথার অবসানে পুণ্যাভিষিক্ত হইয়াছে, তিনি দেখিয়াছেন সেই কণারক! তিনি দেখিয়াছেন, "কণারকে এখন কিছুই নাই, ধু ধু প্রান্তর মধ্যে শুধু একটি অতীতের সমাধি মন্দির—শৈবালাচ্ছন্ন, পরিত্যক্ত জীর্ণ দেবালয় এবং তাহারই বিজন বক্ষের মধ্যে পুরাতন দিনের একটি বিপুল কাহিনী! সেই পুরাতন দিনে যখন এই মন্দির দ্বারে দাঁড়াইয়া লক্ষ লক্ষ শুভ্রকান্তি ব্রাহ্মণযাজক যজ্ঞোপবীত জড়িত হস্তে সাগরগর্ভ হইতে প্রথম সূর্য্যোদয় অবলোকন করিতেন, নীল

জল শুভ্র আনন্দে তাহাদের পদতলে উচ্ছসিত হইয়া উঠিত, এবং নীল আকাশ অবারিত প্রীতি ভরে অনুপম আশীর্ব্বাদ ধারা বর্ষণ করিত। তাম্রলিপ্তির বন্দর হইতে সিংহলে, চীনে এবং অন্যান্য দূরদেশে পণ্য ও যাত্রী লইয়া নিত্য যে সকল বৃহৎ অর্ণবযান যাতায়াত করিত তাহাদের নাবিকেরা এই কোণার্ক মন্দিরের মধুর ঘণ্টারধ্বনি শুনিয়া বহুদিন সন্ধ্যাকালে দূর হইতে দেবতাকে সসম্ভ্রম অভিবাদন জানাইত এবং দেবতার যশ ঘোষণায় তরণীর সুবিস্তৃত চীনাংশুককেতু উড্ডীয়মান হইত। মন্দিরের বহিঃপ্রাঙ্গনের দ্বারের সম্মুখে সিদ্ধ-গন্ধর্ব্ব সেবিত প্রাচীন কল্পবটমূলে শত সহস্র যাত্রী—কত দুরারোগ্য রোগ হইতে মুক্তি লাভ করিতে আসিয়াছে। একবার যদি সূর্য্যদেবের অনুগ্রহ হয় একবার যদি মহাদ্যুতি আপন কনককিরণে সমস্ত জ্বালা যন্ত্রণা হরণ করিয়া লয়েন।"

বলেন্দ্রনাথের মৃত্যুর বহুদিন পরে আর একজন প্রতিভাশালী ফরাসী পর্য্যটক 'বারাণসী' তেমনি করিয়া দেখিয়া গিয়াছেন! সমস্ত হৃদয় দিয়া অতীত ও বর্ত্তমানের এমন সামঞ্জস্য করিয়া দেখা—কয়জন দেখিতে পারিয়াছেন।

বলেন্দ্রনাথ শুধু ভাব লইয়াই মগ্ন ছিলেন না। তিনি একজন নিপুণ সমাজতত্ত্বজ্ঞও ছিলেন। আমাদের সামাজিক প্রাচ্য আদর্শের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ও অনুরাগ প্রবীণের অপেক্ষাও অধিক ছিল। আজ পাশ্চাত্য মোহে আমরা উৎসবঅনুষ্ঠানের মধ্য হইতে যে কল্যাণ ও দিব্য আনন্দটুকু বিসর্জ্জন দিয়া তাহাকে রীতিমত ব্যবসার সামগ্রী করিয়া তুলিতেছি বলেন্দ্রনাথ নিপুণভাবে তাহার প্রতি যে ইঙ্গিত করিয়াছিলেন তাহা নিমেষেই হৃদয়বান ব্যক্তির মর্ম্মস্পর্শ করে! সে আজ বহুদিনের কথা! তখন আমরা আমাদিগের পূজার ফুল ধূলায় লুণ্ঠিত দেখিয়াও বিচলিত হই নাই, আমাদের গৃহের লক্ষ্মীকে বিলাতী নায়িকার বেশে সাজাইবার জন্য ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিলাম, আমাদের ঠাকুরঘরটিকে গোসলখানায় পরিণত করিতেছিলাম, তখন বলেন্দ্রনাথ কাতর ইঙ্গিতে আমাদের চোক ফুটাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। সেই সুদূর অতীতে তিনি ভবিষ্যদ্‌বাণী করিয়াছিলেন।

"একদিন প্রভাতে জগৎ স্তম্ভিত হইয়া শুনিবে ভারতবর্ষের বুকের মধ্য হইতে একস্বরে মায়ের নাম উঠিতেছে—সন্তানেরা মা বৈ আর জানে না, মায়ের নামে সকলেই এক। * * * এখানে আসিয়া সকলে স্বাধীনতা শিক্ষা করিবে—নরহত্যা শিখিবে না। * শিখিবে মায়ের সেবা করিতে। শিখিবে সত্যের সম্মান রাখিতে। ভারতীর বীণাধ্বনি জগতে ব্যাপ্ত হইবে। * * আমাদের গৃহে সে দিন মায়ের প্রতিষ্ঠা।"

আজ যে জাতীয় উদ্বোধনে স্বদেশবাসী আপনাকে কর্ম্মী করিয়া তুলিতেছে সেই উদ্বোধনকল্পে বলেন্দ্রনাথের চেষ্টা অল্প ছিল না। তাঁহার "বেনোজল" প্রবন্ধ পাঠ করিলেই স্বদেশীর প্রতি তাঁহার মমতা সহজেই পরিদৃষ্ট হয়। আক্ষেপের সহিত বলেন্দ্রনাথ একদিন বলিয়াছিলেন, "বিলাতী (বেণ্টউড্‌) চেয়ার কংগ্রেসের প্রত্যেক রেজোল্যুশনকে পরিহাস করিয়া বলে, দেশের টাকা বিলাতে যায় বলিয়া বিদেশী গবর্মেণ্টকে তোমরা যে তিন দিবস ধরিয়া দোষ পাড়, সেই আসনের ইতিহাসটা কি!—সুতরাং এই পরিহাসলাঞ্ছনার আকর্ষণ ইংরাজের দোকান ভিন্ন দেশীয় বিলাতী দোকানেও যথেষ্ট।"

আর একটি নিতান্ত সহজ দৃষ্টান্তের দ্বারা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সামাজিক আদর্শের বিভিন্নতা দক্ষতার সহিত তিনি সকলের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন সেটি আমাদের নিমন্ত্রণ-সভা লইয়া। বলেন্দ্রনাথ বলেন,

"আমাদের নিমন্ত্রণাদিতে প্রভুর আহারের পর ভৃত্যাদিগেরও আহারাদির যথোচিত ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে। আমি যেখানে নিমন্ত্রণে যাই সেখানে আমার পাল্কীবেহারা বা গাড়োয়ানের খোরাকীর জন্য কখনও ভাবিতে হয় না। কারণ তাহারা ক্ষুধিত থাকিলে গৃহস্থের আতিথ্য ক্ষুণ্ণ হয়। এই গেল আমাদের দেশী ব্যবস্থা। * * * ইহার অনতিদূরেই চৌরঙ্গীর ময়দানের সম্মুখে ইংরাজের নিমন্ত্রণভবনের দৃশ্য দেখা যায়। রুদ্ধ সাসীর মধ্যে তাড়িতালোকে যতক্ষণ নানাবিধ উপাদেয় সামগ্রী প্রভুর রসনা তৃপ্তি করিতেছে এবং আমোদপ্রবাহ ডিশের উপর ডিশ্ ছাপাইয়া পড়িতেছে, বেচারা গাড়োয়ান ততক্ষণ দুই সহিস্ সহ নিরাশহৃদয়ে শীত রজনীর হিমভোগ করে মাত্র এবং পার্টি শেষে প্রভুকে লইয়া যথাসময়ে জুড়ী হাঁকাইয়া ঘরে ফিরিয়া আসে। প্রভুর সুখ, দুঃখ বেদনা, আনন্দ উৎসব সমারোহের সহিত, কেবলমাত্র সজ্জার হিসাবে ভিন্ন, ভৃত্যের সেখানে কোন সম্বন্ধ নাই। চাপকান আঁটিয়া ও তক্‌মা পরিয়াই তাহাদের যাহা কিছু সুখ—হৃদ্যতার গণ্ডির মধ্যে তাহারা স্থান পায় না। এই কারণে ইংরাজের নিমন্ত্রণ কলা আমাদের নিকট নিতান্ত নীরস দস্তুর রক্ষা বলিয়া বোধ হয়। তাহা বন্ধ্য আমোদমাত্র, সহৃদয় শুভকর্ম্ম নহে। আমাদের নিমন্ত্রণব্যাপারে গৃহস্থের কত প্রযত্ন ও উদ্যম, কত উদ্বেগ ও পরিশ্রম, কত সংযম ও হৃদ্যতা। বাহিরের জাঁকজমকে ইহার সফলতা নহে।"

হায়! কবির এই সুগভীর দীর্ঘনিশ্বাসের সহিত আজ সমস্ত দেশের দীর্ঘনিশ্বাস কি জড়িত হইবে না?

বলেন্দ্রনাথের রচনায় ব্যঙ্গ ও হাস্যরসেরও অভাব নাই। গাম্ভীর্য্য ও রহস্য এমন পাশাপাশি খাপ খাইয়াছে যে গঙ্গা যমুনা সঙ্গমের ন্যায়ই মনোহারী। বিশদ আলোচনায় প্রয়োজন নাই, একটি স্থলমাত্র উদ্ধৃত করিলেই আমাদের কথা প্রমাণিত হইবে।

"শুনিলে বিশ্বাস করিতে লজ্জা বোধ হয়, আমাদের বসনান্তরালের নিভৃত ঘুন্‌শীটি পর্য্যন্ত এক্ষণে জর্ম্মণী হইতে আমদানী হইতে সুরু করিয়াছে। * * * * বোধ করি এখনও অপেক্ষা করিয়া আছি, ম্যাঞ্চেষ্টার কবে বিভিন্ন গোত্রের জনকতক ব্রাহ্মণের অপভ্রংশ ধরিয়া লইয়া গিয়া, একেবারে বিলাতী কল হইতে সদ্যঃপ্রসূত মন্ত্রপূত উপবীত রপ্তানি সুরু করে, এবং এখানে চৌরঙ্গীর পণ্যশালায়, পগেয়াপটি ও সুতাপটির দোকানে চাঁদনীর পথ পথপ্রান্তে আমাদের গলবন্ধন জন্য এই সূত্রখণ্ড গোত্রীয় নম্বরানুসারে সুলভে বিক্রয় সুরু হয়!

বলেন্দ্রনাথের আর একটি গুণের কথা বলিয়া আমরা প্রবন্ধের উপসংহার করিব। তিনি প্রাচীন সাহিত্যে বা প্রাচীন ভারতের কোন কিছুতে আপাতঃদৃষ্টিতে একেবারে ছিদ্রান্বেষণ করিতেন না। যাহা সকলের চক্ষে এবং যাহা চিরকালই মলিন, তাহাকেও তিনি কখনও উজ্জ্বল বলেন নাই। কণারকের ভাস্কর্য্য সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহা এক বঙ্কিমচন্দ্র ভিন্ন আর কাহারও নিকট পাই নাই, এবং যে মহৎ গুণ তাঁহার হৃদয়কে উদার করিয়াছিল তাহা এই, যে তিনি সকল জিনিসের উচিত মূল্য নির্দ্ধারণ করিতেন এবং অসঙ্কোচে তাহা ব্যক্ত করিবার সাহসও তাঁহার ছিল। তিনি শ্যামাভক্ত রামপ্রসাদকে রামমোহন রায়ের পার্শ্বে বসাইতে দ্বিধা বোধ করেন নাই।

প্রসিদ্ধ ইংরাজ সমালোচক জনসন্ একদিন কবিবর Goldsmith সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন "He left no species of writing untouched and unadorned" আমরাও তেমনি আজ বলেন্দ্রনাথের গ্রন্থাবলী পাঠান্তে অসঙ্কোচে বলিতে পারি,—'কালিদাস' 'ভবভূতি', 'জয়দেব' প্রভৃতি গভীর বিষয়গুলির

ন্যায়, ক্ষুদ্র বিষয়গুলিও তাঁহার কবিহৃদয়ের সহানুভূতিলাভে বঞ্চিত হয় নাই এবং ইহারি ফলে আজ 'চন্দ্রপুরের হাট' 'পুলের ধার' 'গৃহকোণ' ও 'দোলের ছবিটি' পর্য্যন্ত তাঁহার ঐন্দ্রজালিক তুলিকাস্পর্শে অপূর্ব্ব শ্রীমণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে!

শ্রীগোলোকবিহারী মুখোপাধ্যায়।

স্বর্গীয় ত্রিপুরারাজ রাধাকিশোর মাণিক্য।

গতবৎসর আমাদের পক্ষে প্রকৃতই দুর্ব্বৎসর গিয়াছে। প্রজাবিদ্রোহ রাজকোপ দৈবনিগ্রহ সকলে মিলিয়া দেশকে ক্ষতবিক্ষত করিয়াছে। বঙ্গমাতার বিখ্যাতনামা যে সকল সুসন্তান গতবর্ষে অকাল মৃত্যুর কবলে পতিত হইয়া আমাদিগকে শোকনিমগ্ন করিয়া গিয়াছেন, ৺ত্রিপুরারাজ তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বাগ্রগণ্য। এমন দানশীল, সহৃদয়, পরদুঃখকাতর, সরলচেতা অমায়িক রাজা প্রায় দেখা যায় না। সেকালের রাজাদিগের সম্বন্ধে যেরূপ গল্পকথা শুনা যায় ইঁহাতে তাহার প্রত্যক্ষ পরিচয় পাওয়া যাইত। ইনি স্বাধীন রাজা হইয়াও বাঙ্গালীর ঘরের লোক ছিলেন, তিনি শুভকার্য্যের উৎসাহদাতা—গুণগ্রাহী পুরুষ ছিলেন। দেশের লোক সুখে দুঃখে তাঁহার সাহানুভূতি লাভ করিত। তাঁহার দর্শন প্রার্থনায় গিয়া, কাহারও খাতায় নাম লিখিয়া ফিরিয়া আসিতে হইত না—তাহার সংস্পর্শে আসিয়া কেহ বিদেশীয় আদপকায়দায় ভারাক্রান্ত হইত না। সকলকেই যোগ্য সমাদরে তিনি গ্রহণ করিতেন; সকলেই তাঁহার স্নেহ বন্ধুতার অধিকারী ছিলেন। পাছে কাহাকেও মনঃপীড়া প্রদান করেন এই ভয়ে তিনি তাঁহার সামান্য কর্ম্মচারীর নিকটেও যেন সঙ্কুচিত হইয়া থাকিতেন। কোন কর্ম্মচারীও তাঁহার নিকট কখনো রূঢ় সম্ভাষণ পান নাই। অতিরিক্ত কোমলতাই বরঞ্চ তাঁহার স্বভাবের দুর্ব্বলতা স্বরূপ দাঁড়াইয়া ছিল।—

বঙ্গ সাহিত্যের ইনি কিরূপ পৃষ্টপোষক ছিলেন; ইহার উন্নতি সংকল্পে তিনি অকাতরে কিরূপ দান করিতেন তাহা সকলেই অবগত। আজ তাঁহার এই শোচনীয় মৃত্যুতে তাঁহার আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব যেরূপ শোকাকুল দেশও সেইরূপ ক্ষতিগ্রস্ত।—আশা করি তাঁহার রাজ্যের উত্তরাধিকারী—পিতার সদ্‌গুণনিচয়ের উত্তরাধিকারী হইয়া আমাদের এই শোকভার কথঞ্চিৎ প্রশমন করিবেন। মহারাজের গুণাবলী সম্বন্ধে তাঁহার একজন সুপরিচিতা মহিলা যাহা লিখিয়াছেন—তাহা নিম্নে প্রকাশিত হইল। ভারতী সম্পাদিকা।

মহারাজ আমাদের কেবলমাত্র প্রভু ছিলেন না পিতৃস্বরূপ ছিলেন। এই দুর্ঘটনা বজ্রাঘাতের মত আমাদের আহত করিয়াছে।

১৫ই ফাল্গুন অশুভক্ষণে মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্য ত্রিপুরার রাজধানী আগরতলা পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতা যাত্রা করেন। সোমবার প্রাতে কলিকাতা পৌছিয়া মঙ্গলবার

অনেক করণীয় কার্য্য ছিল, ফিরিয়া আসিয়া সম্পূর্ণ করিবেন—আর ফিরিতে হইল না।

পূর্ণ বার বৎসরকাল মহারাজ রাজ্যলাভ করিয়াছিলেন—মহারাজের বুদ্ধি যেমন তীক্ষ্ণ হৃদয় তেমনি উদার ছিল। রাজ্যের উন্নতি করিব বড় ইচ্ছা ছিল, কিন্তু নানা বিঘ্ন বিপত্তির জন্য মহারাজের অনেক সাধ পূর্ণ হয় নাই।



স্বর্গীয় ত্রিপুরারাজ রাধাকিশোর মাণিক্য

সুন্দর প্রাসাদ, হাঁসপাতাল, স্কুল, রাজকুমার-বোর্ডিংআফিস্ প্রভৃতির জন্য পাকা বাড়ী প্রস্তুত হইয়াছে। নূতন রাস্তা, দীঘি, সুন্দর সুন্দর বাংলা ও কর্ম্মচারীদের আলয় প্রভৃতিতে রাজধানীর সৌষ্ঠব বর্দ্ধিত হইয়াছে।

মহারাজের হৃদয় করুণার আধার, দীন দুঃখীর প্রতি তাঁহার অসীম দয়া ছিল। বিকালে মহারাজ প্রতিদিন বায়ু সেবনে বাহির হইতেন—একদিন দেখিলেন একটি রোগ-কাতরা ভিখারিণী পথের ধারে পড়িয়া রহিয়াছে।—মহারাজ তৎক্ষণাৎ গাড়ি হইতে নামিয়া রোষকষায়িত লোচনে ডাক্তারের প্রতি চাহিয়া বলিলেন, "ইহাকে দেখিতেছ, এ কেন এমন করিয়া পড়িয়া আছে—তোমরা আছ কি করিতে।" ডাক্তারের আর সেদিন মহারাজের সহিত বায়ু সেবনে যাওয়া হইল না। অনেক বলা কহায় মহারাজ চলিয়া গেলেন ডাক্তার উপস্থিত থাকিয়া রোগীকে হাঁসপাতালে পাঠাইয়া তাহার ঔষধ পথ্যের ব্যবস্থা করিয়া মহারাজকে জানাইয়া তবে নিষ্কৃতিলাভ করেন।

মহারাজ অতিশয় অমায়িক ও নিরহঙ্কার ছিলেন। কাহাকেও সহজে কঠিন কথা বলিতেন না; নিতান্ত বিরক্ত হইলে কেবল তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতেন না। কর্ম্মচারীদের আদেশ করিতে হইলে বিনীত-ভাবে আদেশ করিতেন। বিশেষ দরকারে একজন কর্ম্মচারীকে লিখিতেছেন—"দুইটি কথা শুনিয়া যেয়ো, আমি অপেক্ষা করিয়া আছি।—কলিকাতা হইতে আসিয়া অবধি তোমায় দেখি না কেন?" তাঁহার খাসের কর্ম্মচারীদের তিনি কিরূপ জ্ঞান করিতেন তাহা তাঁহার নিম্নলিখিত পত্রে জানিতে পারিবেন। "তুমি ত জানই, যিনি বাড়ীর কর্ত্তা, পূজার সময় স্বজন পরিজন-দিগকে এইরূপ কাপড় বা অন্য কোন বস্ত্র দিয়া থাকেন। শ্রীমান শ্রীমতী সহ এইগুলি আমার আশীর্ব্বাদ রূপে গ্রহণ করিয়ো।"

মহারাজার মৃত্যুর তিন চারি দিবস পূর্ব্বে তাঁহার একজন কর্ম্মচারীর কলিকাতায় বসন্ত রোগে মৃত্যু হয়—রোগসংবাদ শুনিয়াই কাশী হইতে মহারাজ টেলিগ্রাফিক মনিঅর্ডার যোগে ২০০৲ পাঠাইয়া দেন—মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া বলেন—"সে গেল—তাহার জন্য বড় বেদনা পাইলাম, সে আমাকে ত প্রভু মনে করিত না, পিতৃস্বরূপ জ্ঞান করিত—তাহার পরিবারের ভরণপোষণের ভার, তাহার সন্তানদের শিক্ষার ভার সকলি আমার। শ্রাদ্ধের সময় স্মরণ করাইয়া দিয়ো খরচ দিতে হইবে।"

মহারাজ ফুল অত্যন্ত ভালবাসিতেন। লিখিতেছেন, "ফুল পাইয়াছি। আমি ফুলের অতিশয় পক্ষপাতী। আমার বিশ্বাস ভগবানের সৃষ্ট পদার্থের মধ্যে ফুলেরই সার্থকতা প্রতি-পাদিত হইয়াছে। আমি অষ্টপ্রহর আমার চতুস্পার্শে ফুল ছড়াইয়া রাখিতে ভালবাসি!" সামান্য উপহার পাইলে আহ্লাদে আটখানা হইতেন—লিখিতেছেন "তোমার প্রেরিত ফুল ও মিষ্টান্ন উপহার পাইয়া অতিশয় আহ্লাদ সহকারে গ্রহণ করিলাম।"

অনেক ভাল ডাক্তারের অপেক্ষা মহারাজ চিকিৎসাবিদ্যায় দক্ষ ছিলেন। ডাক্তারি কবিরাজি ও হোমিওপ্যাথি টোটকা প্রভৃতি নানাপ্রকার ঔষধ সর্ব্বদা যত্নে মহারাজ রক্ষা ও ব্যবহার করিতেন। কর্ম্মচারীদের কাহারও অসুখ হইলে ডাক্তারের উপর ডাক্তার

পাঠাইয়া ঔষধ পথ্য দিয়া অনুসন্ধান লইতেন। ইদানীং মহারাজের স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছিল। লিখিতেছেন "বাস্তবিক আমার ধাতু রোগপ্রবণ হইয়া স্বাস্থ্যভঙ্গের দিকে অগ্রসর হইতেছে এবার শীতারম্ভে দূর স্বাস্থ্যকর স্থানে যাইয়া কিছুকাল বাস করিয়া দেখিব এরূপ মনে করিয়া আছি।" বিদ্যার প্রতি মহারাজের অতিশয় অনুরাগ ছিল। গ্রন্থকারগণ নূতন পুস্তকাদি পাঠাইলে অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া তাঁহাদের সসম্মানে পুরস্কৃত করিতেন।

সাধারণ সভা সমিতিতেও মহারাজ কখনো দানে বিমুখ ছিলেন না। কেহ কোন বিষয়ে প্রার্থনা করিলে মহারাজ কখনো "না" বলিতে জানিতেন না। খেয়ালখাতায় মহারাজকে একবার লিখিতে অনুরোধ করায় মহারাজ লেখেন "ছাত্র জীবনে কবিতা টবিতা লিখিতাম এখন মন কঠিন হইয়া গিয়াছে তোমাদের অনুরোধে দুই ছত্র লিখিয়া দিলাম—

সুখের নিলয় প্রেম সুমধুর
কোন অবাধ্যতা তাহাতে নাই;
আত্ম ভোগ সুখ স্বার্থ অভিমান
প্রেমিক হৃদয়ে না পায় ঠাঁই।

মহারাজ হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। এবার কাশী যাইয়া তিনি সধবা কুমারী পূজাদি করিতে ক্রটি করেন নাই এবং ব্রাহ্মণপণ্ডিত অধ্যাপকদের সসম্মানে বিদায় দান করিয়াছিলেন। অধ্যাপকেরা প্রীত হইয়া মহারাজকে ধর্ম্মার্ণব উপাধি দিয়াছিলেন।

স্বস্তিবিবিধবিরুদাবলীবিরাজমানমানোন্নতমহারাজাধিরাজক্ষত্রিয়কুলতিলকচন্দ্রবংশ.বতংশ-ত্রিপুরা.ধপতিবিষমসমরবিজয়ি শ্রীশ্রীশ্রীশ্রীশ্রীযুতরাধাকিশোরমাণিক্যদেববর্ম্মবাহাদুরমহোদয়শ্রীশ্যামসুন্দরচরণারবিন্দমকরন্দমধুক.রষু। বারাণসেয়বিবুধবৃন্দানাংশুভাশীরাশয়ঃসমুল্লসন্তুতরাম্।

মহারাজ, কালবশাদিদানীং ক্ষীণপ্রায়েষু বর্ণাশ্রমধর্ম্মেষু নষ্টপ্রায়েষু চ দ্বিজকুলপালনৈকব্রতেষু রাজন্যবর্গেষু ভবানেবৈকঃ ক্ষত্রিয়কুলসুধাসলিলনিধেঃ শীতরশ্মির্বর্ণাশ্রমধর্ম্মসংরক্ষণপরায়ণঃ পরিদৃশ্যতে। অতঃ স্মরহরনগরীনিবাসিনো। বয়ং ভবতঃ শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রচরণাম্বুজলোলুপতাং বর্ণাশ্রমধর্ম্মসংরক্ষণতৎপরতাং চ দৃষ্ট্বা সন্তুষ্টহৃদয়াঃ সন্তো বিবিধগুণগণাভিরামং ভবন্তং "ধর্ম্মার্ণব" ইত্যুপাধিনা ভূষয়ামঃ।

আশাস্মহে চ সপরিজনস্য শ্রীমতোমহারাজস্য সকুশলং দীর্ঘমায়ুরিতিশম্। সম্বৎ ১৩১৫ চৈত্র কৃষ্ণদ্বিতীয়ায়াম্।

যে কর্ম্মচারীর যত্নে এই সকল ধর্ম্মকার্য্য সুসম্পন্ন হইয়াছিল তাঁহার প্রতি বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া মহারাজ তাঁহাকে কলিকাতায় আসিয়া বিশেষরূপে পুরস্কৃত করিবেন বলিয়া আশ্বাসিত করিয়াছিলেন।

মহারাজের হৃদয় করুণায় পরিপূর্ণ ছিল, বুঝি তাই জন্য মহারাজ এই শোচনীয়রূপে অকস্মাৎ প্রাণদান করিয়া আত্মীয়, বন্ধু, কর্ম্মচারী, ভৃত্যবর্গের অন্তরে অন্তরে করুণা ঢালিয়া দিয়া গিয়াছেন।

দুর্ঘটনার দুইদিন পূর্ব্ব হইতেই মহারাজ কাশী ত্যাগ করিবার জন্য বিশেষ ব্যস্ত হইয়াছিলেন। রিজার্ভ গাড়ীর অভাবে বিলম্ব হইয়াছিল। শোচনীয় ঘটনার দিন ষ্টেসনে গাড়ী প্রস্তুত—রাত দশটায় মহারাজ ট্রেণে উঠিবেন, সন্ধ্যা ৬টায় এই বিপত্তি—৮টায় সব শেষ।

কাশীতে কর্ম্মচারী ও ভৃত্যবর্গ ব্যতীত মহারাজের পুত্র বা আত্মীয় কেহ সঙ্গে ছিলেন না—রাজ্যেশ্বর রাজ্য ছাড়িয়া কোন্ বিদেশে গিয়া প্রাণ হারাইলেন। রাজাকে বিসর্জ্জন

দিয়ে ভগ্নহৃদয়ে কাঁদিতে কাঁদিতে সকলে আগরতলা ফিরিয়া গিয়াছেন।

অনেকদিন হইল কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্য বাহাদুরকে স্মরণ করিয়া যে গানটী রচনা করিয়াছিলেন তাহা এইখানে তুলিয়া দিলাম।

"রাজ অধিরাজ তব ভালে জয়মালা,
ত্রিপুর পুরলক্ষ্মী বহে তব বরণডালা।
দীনজন দুঃখহরণ অভয় তব বাণী,
ক্ষীণজন ভয়তারণ নিপুণ তব পাণি,
তরুণ তব মুখচন্দ্র করুণরস ঢালা।
গুণি রসিক সেবিত উদার তব দ্বারে—
মঙ্গল বিরাজিত বিচিত্র উপচারে—
গুণ অরুণ কিরণে তব সব ভুবন আলা!"

গানটি লিখিতে লিখিতে যেন মহারাজকে প্রত্যক্ষ দেখিতেছি—আর অধিক কি লিখিব।

শ্রীমতী—

নোটন ষষ্ঠীর ব্রত কথা।

প্রাচীনকালে মহিলারা পুস্তকাদি পাঠ না করিয়াও বিশ্বাস ও ভক্তিশ্রদ্ধা সহকারে ব্রত নিয়মাদি দ্বারা নীতি ও সদাচার পালন করিতেন। স্বামী, পুত্র কন্যা ও পরিবারবর্গের কুশলার্থে তাঁহারা বারমাসই কোন না কোন ব্রতের অনুষ্ঠান করিতেন। এখনকার রমণীগণ ততদূর ব্রতপরায়ণা না হইলেও একেবারে যে ব্রতপালন করেন না তাহাও নহে। এখনো হিন্দুমাতা মাত্রেই ষষ্ঠীব্রত করিয়া থাকেন। সন্তানের মঙ্গল মানসেই ষষ্ঠী দেবীর অর্চ্চনা হইয়া থাকে। শ্রাবণ মাসের কৃষ্ণপক্ষীয় ষষ্ঠীতে ইহা অনুষ্ঠিত হয়। ইহার ব্রত কথা এইরূপ ;—

এক সদাগর থাকেন। তিনি নিঃসন্তান। একদিন মা ষষ্ঠী ছটা পাঁজ, ছতোলা সোনা সকলের বাড়ী নিয়ে নিয়ে বেড়াচ্চেন, কিন্তু কেউ কেটে দিলেনা, সদাগরের বৌ পাঁজ নিয়ে কেটে দিলেন, মা ষষ্ঠী তখন সেই সোনা তাকে দিলেন। সদাগরের বৌ ছতোলা সোনা দিয়ে ছটা 'নোটন' গড়ালেন, তেঁতুল দিয়ে মাজেন, গঙ্গাজল দিয়ে ধোন, বালির নোটন, ক্ষীরের নোটন, সোনার নোটন পুজো করেন। এই দেখে মা ষষ্ঠী বল্লেন "সদাগরের বৌ আমার খুব ভক্ত হয়েছে। সোনা দিলাম গহনা না ক'রে নোটন গড়িয়ে পুজো করছে, তিনি তাকে ছয় ছেলে, বৌ,একটি মেয়ে নাতি এই সব দিলেন। সদাগরের স্ত্রী সুখে ঘরকন্না করছেন এমন সময় তাঁর ব্যামো হল। তিনি বল্লেন আমার মেয়েকে নিয়ে এস, কোন্ দিন মরে যাব দেখতে পাবনা। এই বলার পর মেয়ে এল।

ছয় ছেলেকে বিষয় আষয় সমান ভাগ করে দিলেন। আর নোটন ছটি আমানির হাঁড়ির তলায় লুকিয়ে রাখলেন। এর মধ্যে গিন্নি সেরে উঠলেন দেখে মেয়ে শ্বশুর বাড়ী চলে গেল।

কিছুদিন পরে আবার গিন্নির ব্যারাম হোলো, মেয়েকে আন্‌তে পাঠালেন, মেয়ে এল তখন তার সেবায় সেবারেও সেরে উঠলেন, মেয়ে আবার শ্বশুর বাড়ী ফিরে গেল।

এই রকমে কিছুদিন গেল, সদাগরের স্ত্রীর আবার অসুখ হোলো,মেয়েকে আন্‌তে পাঠালেন,

কিন্তু এবার মেয়ের শাশুড়ি নিজের বৌকে পাঠালেনা, বল্লে "ছোটবৌরে মা নিত্যি নিতে পাঠায়, এবার আর আমি বৌ পাঠাব না"।

এদিকে সদাগরের স্ত্রীর কালপূর্ণ হল, স্বর্গ থেকে রথ এলো, পুষ্পবৃষ্টি হোলো, গিন্নি সোনার 'নোটন' ছটি ছোট বৌকে দিলেন, আর বল্লেন "বালির নোটন নিজে খেও, ক্ষীরের নোটন পরের ছেলেকে আগে খাইয়ে নিজের ছেলেকে পরে খাইও। সোনার 'নোটন' তুলে রেখো, কৃষ্ণপক্ষে নোটন ষষ্ঠীকে পূজো করো।" এই সব বলে কয়ে গিন্নি স্বর্গে গেলেন।

তারপর মা যখন মরে গেলেন, তখন মেয়ে শুনতে পেয়ে কাঁদতে কাঁদতে এলেন। এসে বল্লেন "মা সব জিনিষ ছোট বৌকে দিয়ে গেছেন?" বড় বৌ বল্লেন 'না ঠাকুরঝি, মা সবাইকে সমান দিয়ে গেছেন, ছোট বৌয়ের ধন ফুরোয়নি আমাদের ফুরিয়ে গেছে।

একদিন মেয়ে বল্লেন, 'বড়বৌ, মা গেল বাপ গেল, এখন ভাইদের গেরস্থালি হোল, কোন্‌দিন আর আসব; তাই ইচ্ছা করে তোমাদের ছয়বৌকে নিয়ে একদিন নাইতে যাই।' বড়বৌ বল্লেন 'তার আর কি ঠাকুরঝি কাল সকালে যাব।' বড়বৌ ছোটবৌকে বল্লেন 'ছোটবৌ ঠাকুরঝি বলেছেন কাল আমাদের ছয় যা'কে নিয়ে নাইতে যাবেন'। ছোটবৌ বল্লেন "দিদি ঠাকুরঝির ত নাইতে যাওয়া নয় আমার নোটন ছটি ঐ বলে চুরি করবেন।'

বড়বৌ বল্লেন, 'এক সঙ্গে যাব একসঙ্গে আসব কেমন করে চুরি করবেন? ঠাকুরঝির সাধ হয়েছে আমরা যাই।' তার পরদিন ঠাকুরঝি ছয় ভাজকে সঙ্গে নিয়ে নাইতে গেলেন।

সেখানে গিয়ে বৌয়েরা মাঠে গেলেন, আর মেয়ে ঘাটে এসে নেয়ে, খোল ফেল্লেন, তেল ফেল্লেন, বাড়ী গিয়ে ছোটবৌয়ের ছেলে মেয়েকে বল্লেন, "আমার শ্বশুরবাড়ী থেকে নিতে এয়েছে চল্লুম"—ব'লে আমানির হাঁড়ির তলা থেকে ছটি নোটন তুলে নিয়ে শ্বশুরবাড়ী চলে গেলেন। তারপর বোয়েরা ঘাটে এলে ছোটবৌয়ের এক ছেলে বল্লে, "পিসিমা বাড়ী গেছে তার শ্বশুরবাড়ী থেকে নিতে এসেছিলো।" এই কথা শুনে ছোটবউ বড় বৌকে বল্লেন "দেখলে দিদি ঠাকুরঝির কাজ! সে আমার 'নোটন' নিশ্চয় চুরি করে নিয়ে গেছে।' একথা শুনে বড়বৌ বল্লেন "চল বাড়ী গিয়ে দেখি।" পরে বোয়েরা তাড়াতাড়ি নেয়ে ধুয়ে বাড়ী এসে দেখেন,—আমানি হাঁড়ির তলায় নোটন নেই, ঘরে ঘরে স্বামী পুত্তুর অচৈতন্য হয়ে পড়ে আছেন। এই সকল দেখে শুনে ছোটবৌ কাতর হয়ে বল্লেন, "আমার ছেলেদের কেউ নষ্ট করোনা। পাই ষষ্ঠীর নাগাল আসবো ঘর, না পাইত লাগবে স্ত্রীহত্যার ফল।"

এই বলে বাড়ী থেকে বেরোলেন। যেতে যেতে সমুদ্রের ধারে গিয়ে পড়লেন। সেখানে দেখেন ধর্ম্মরাজের নৌকা যাচ্ছে, তাতে মহাভারত, রামায়ণ, ভাগবতপুরাণ কথা হচ্চে, দেখেই জলে ঝাঁপ দিয়ে নৌকা ধরলেন। তখন নৌকারোহীরা জিজ্ঞাস করলে, "কে নৌকা ধরেছ, ভূত না পেত্নী দৈত্য না দানব কে তুমি রমণী?"

ছোট বউ বল্লেন "সোনা হারায় যার, পুত নষ্ট হয় তার, ইহার বিচার কর যাই ঘর, নতুবা পাবে স্ত্রীহত্যার ফল।" ধর্ম্ম বল্লেন "আমার

নৌকা ছাড় পাছের নৌকা ধর।" তখন ধর্ম্মের নৌকা ছেড়ে দিয়ে পাছের কলির নৌকা চেপে ধরলেন। কলি বল্লেন, "আমার নৌকা ছেড়ে দেও, আমি মন্দর ভাল করি, ভালর মন্দ করি, আমার নাম কলি, আমি স্ত্রীকে মাথায় করেছি মাকে পদতলে রেখেছি; আমার কি এ কাজ? পাছে ষষ্ঠীর নৌকা যায় ধর।" তখন সে নৌক সরে গেল ষষ্ঠীর নৌক এগিয়ে এল।

নৌকার মধ্যে মা ষষ্ঠী পরের ছেলে কোলে করেছেন, নিজের ছেলে পাশে বসিয়েছেন, পরের ছেলেকে ক্ষীরটুক দিয়েছেন আপনার ছেলেকে কলা দিয়েছেন।

গৃহস্থের ছোটবৌ মা ষষ্ঠীর নৌকা ধরে ফেল্লেন। তখন ষষ্ঠী পূর্ব্বের মত প্রশ্ন করলেন "কে নৌকা ধরে? ভূত না পেত্নী দৈত্য না দানব কে তুমি রমণী?" ছোটবৌ উত্তর দিলেন, "সোনা হারায় যার, পুত নষ্ট হয় তার। ইহার বিচার কর যাই ঘর, নতুবা পাবে স্ত্রী হত্যার ফল"। তখন মা ষষ্ঠী একটা পচা বেরালের গায়ে একসরা দই ঢেলে দিয়ে বল্লেন "এটা চেটে তোলো"। বউ সন্তানের মায়াতে তা করলেন। তখন ষষ্ঠী জিজ্ঞাসা করলেন, "কেমন? ক্ষীর না ননি?"

বউ বলিল, ক্ষীর। তখন ষষ্ঠী দেবী বল্লেন "তোর প্রাণে ব্যগ্রতা আছে; সত্যই তবে তুই মা। কেহই তোর নোটন নেয়নি; তোর ননদ চুরি করেছে, ননদের বাড়ী যা, সেখানে গিয়ে নিয়ে আয়"।

তখন বউ ননদের নিকটে গিয়ে নোটন চাইলেন, ননদ দিতে অস্বীকার করলেন। ননদ তখন কাট্‌না কাটছিলেন, বৌ কাট্‌না কাটা সুতো চুরি করলেন। ননদ ভাজের প্রতি সুতো চুরির দোষ দিলে বউ দিব্য করে বল্লে "আমি যদি নিয়ে থাকি তবে ভাগনে ভাগনীর মন্দ হোক যেহেতু আমার ত আর স্বামী পুত্তুর নেই।" তখন ভাগনে ভাগ্‌নী ঢলে পড়লো। ননদ কাঁদতে লাগলেন। তখন বউ ননদকে সান্ত্বনা করে বল্লেন, "কার স্বামী পুত্তুর না যায়, কেবা না খায়, তুমি পাত্ কাট্‌তে যাও আমি ভাত বাড়ি গিয়ে।" সেই অবসরে আমানির হাঁড়ি থেকে ৬টি নোটন তুলে বালির, ক্ষীরের ও সোনার ১২টি নোটন আর খাঁড় বেরালী করে ষষ্ঠীর পূজো করতে লাগলেন। তখন বৌয়ের স্বামী পুত্তুর ভাগনা ভাগনী ও ননদের চেতনা হোল। ছেলেরা সব এসে বল্লে—মাগো মা, ক্ষিদেয় মলুম! এত বেলা হয়েছে, ডাক নাই কেন? বউ বল্লেন, বাছা তোমরা ঘুমোওনি; মা ষষ্ঠীর খেলা হয়েছিল। তখন বউ পৃথিবীতে প্রচার করলেন, "যে পোয়াতি ভক্তিভরে বিপদে মানত করে তাহাকেই "নোটন ষষ্ঠী" রক্ষা করেন।"

আমাদের ইহাদ্বারা, স্বার্থত্যাগ, ধর্ম্মে বিশ্বাস, পরের সন্তানের প্রতি ভালবাসা, শিক্ষা হয়।

শ্রীমতী শশীমুখী দেবী। বেনারস।

একজন বহিষ্কৃতের দৈনিক লিপি।

(ফরাসী হইতে)

শনিবার, ২২ জুন।

খুব শীত ; তুষার-শীতল ফিন্‌-ফিনে বৃষ্টির এরূপ ঝাপ্‌টা আসিতেছে যে ডেকের উপর তিষ্ঠনো ভার। কতকগুলি দীর্ঘকায় কোরীয়, সাদা-ময়লা কাপড় পরিয়া শীতে থর্‌থর্‌ করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে জাহাজে ময়দার বস্তা বোঝাই দিতেছে।

ডেক্‌ হইতে তাড়িত হইয়া আমি সমস্ত দিনটা আমার ক্যাবিনেই কাটাইলাম। এইরূপ বন্দীভাবে থাকা আদৌ সুখের নহে। পশ্চাতে পড়িয়া থাকা,—যে ভ্রমণের বন্দোবস্ত, যে তত্ত্বানুশীলনের সংকল্প পূর্ব্ব হইতেই করা হইয়াছে তাহা পরিত্যাগ করা বড়ই কষ্টকর।...

আমার ব্যাগের মধ্যে কতকগুলি পুস্তক আছে : পুরাতন Zola-র গ্রন্থগুলি পুনর্ব্বার পাঠ করিব বলিয়া মনে করিয়াছি :—"Pot Bouilli", ("L' Assommoir" ; তারপর Anatole France-এর শেষ গ্রন্থখানি ; উহা আমি Kobe-এর কোন জাপানী পুস্তকালয় হইতে, অল্পদিন হইল ক্রয় করিয়াছি। "Monsieur Bergeret a´ Paris"—এই গ্রন্থখানি আমার বড়ই ভাল লাগিতেছে। অ্যানাটোল্‌ ফ্রান্‌সের গল্প-লেখা অপূর্ব্ব সান্ত্বনাজনক...

আমি মনে মনে ভাবি, এখন যে পুস্তকগুলি আমি পাঠ করিতেছি, রুসীয় কর্ত্তৃপক্ষ জানিতে পারিলে উহাদিগকে রুসিয়ার মধ্যে প্রবেশ করিতে দিত কি না। "Monsieur Bergeret a´ Paris" এই গ্রন্থে যেরূপ চমৎকার সাম্য-বাদের কথা আছে, তাহাতে রুস সম্রাটের পর্মিট কর্ম্মচারীরা জানিতে পারিলে যে উহাকে একটা 'সর্ব্বনেশে' গ্রন্থ বলিয়া সম্মানিত করিত তাহাতে সন্দেহ নাই—ঐ গ্রন্থখানি এইরূপ সম্মানেরই যোগ্য বটে। Zolaর উপন্যাসগুলাও বৈপ্লবিক ভাবে পূর্ণ ; L' Assommoir কিম্বা Pot Bouilli এই দুই গ্রন্থকে নিতান্ত নিরীহ করিয়া তুলিতে হইলে, পর্মিটের কর্ত্তৃপক্ষকে উহার কত পৃষ্ঠাই না জানি কাটিয়া ছাঁটিয়া দিতে হয়!—আমি সাধারণ ভাবে এই কথা জিজ্ঞাসা করি :—এই গত দশ বৎসরের মধ্যে যে সকল বড় বড় ফরাসীগ্রন্থকারের গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার কোন একটী গ্রন্থকে রুসীয় পর্মিট্‌-আফিস্‌ বৈধরূপে রুসিয়া-রাজ্যে প্রবেশ করিতে দিতে পারেন কি না? আমাদের এখনকার উৎকৃষ্ট গ্রন্থমাত্রই কোন-না-কোন দিক্‌ দিয়া বৈপ্লবিক ভাব-প্রচার করিয়া থাকে। উহাদের তুলনায়, ঐ একই সময়কার জর্ম্মাণ ও ইংরাজি গ্রন্থগুলি অপেক্ষাকৃত নির্বিষ বলিয়া মনে হয়—স্বেচ্ছাচারতন্ত্রের পক্ষে ঐ সকল গ্রন্থ তেমন ভীতিজনক নহে। এই জর্ম্মাণ জাহাজে বসিয়া ভ্লাডিভষ্টকের সম্মুখে "Monsieur Bergeret a Paris" পাঠ করিয়া ফ্রান্‌সের মৌলিক রচনাশক্তি সম্বন্ধে এই সময়ে আমার যেরূপ দৃঢ় ধারণা হইয়াছে এমন আর কখনো হয় নাই। তাই, ফরাসী চিন্তাপ্রসূত মত-সমূহের প্রচারক বড় বড় গ্রন্থমাত্রেরই প্রবেশ এই কারণেই রুসরাজ্যে নিষিদ্ধ কিম্বা নিষেধযোগ্য।

Liebnecht যে কথাটি আমাকে বলিয়াছিলেন তাহা এখন আমার মনে পড়িতেছে। তিনি আমার নিকট অনেকবার এই কথা বলিয়াছিলেন যে, জর্ম্মাণেরা আসলে শান্ত, সাদাসিধা ও উদারমতাবলম্বী, কেবল প্রসীয়ান্‌রাই নিষ্ঠুর, অত্যাচারী ও যুদ্ধপ্রিয়; কেন না, গোড়া ধরিতে গেলে, উহারা জর্ম্মাণ অপেক্ষা বেশী রুস্; জর্ম্মাণ সাম্রাজ্যে, সামাজিক সাম্যবাদের ভাবী জয়—রুস্-প্রসীয়ভাবের উপর জর্ম্মাণ-ভাবের জয়লাভ ভিন্ন আর কিছুই নহে। একদিন, একটা মান-চিত্রের উপর এল্‌বা নদী দেখাইয়া আমাকে বলিলেন যে, ঐ নদীই ঐ দুই বিভিন্ন ভাবের মধ্যবর্ত্তী সীমা। আরও এই কথা বলিলেন;—"তোমাদের পরম সৌভাগ্য, তোমাদের কতকগুলি পূর্ব্বপুরুষ গ্রীক্ ছিলেন; সেইরূপ আমাদের দুর্ভাগ্য, আমাদের কতকগুলি পূর্ব্বপুরুষ রুস্ ছিলেন। তোমাদের কতকগুলি ভাল-ভাল গুণ তোমরা গ্রীক হইতে পাইয়াছ; আর আমাদের যে সকল খারাপ গুণ তাহা আমরা রুস্ হইতে পাইয়াছি।" ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে ভ্রান্ত হইলেও, নৈতিক হিসাবে কথাটা ঠিক্। Liebnecht এর নিকট, রাজসরকারের রুসিয়া,—বৈপ্লবিক ফ্রান্সের ঠিক্ উল্টা পক্ষ বলিয়া মনে হইয়াছিল .....

এই জর্ম্মাণ জাহাজের জর্ম্মাণ কর্ম্মচারীরা আমার প্রতি খুব সদয়; আমাকে আমোদে রাখিবার জন্য তাহারা যথাসাধ্য চেষ্টা করে; আমাকে তাহাদের সহিত 'বিয়ার' পান করিতে আহ্বান করে, আমাকে কতকগুলি জর্ম্মাণ ও ইংরাজি মাসিক পত্রিকা পড়িতে দেয়; উহাদের মধ্যে একজন, ডাঙ্গায় নামিয়া, কতকগুলি পুরাতন ফরাসী সংবাদপত্র আমার নিকট পাঠাইয়া দিল।—কখন-কখন উহারা ফরাসী-রুসের মৈত্রীবন্ধন লইয়া বিদ্রূপ করিত...আজ রাত্রে, উহাদের আপনাদের মধ্যে Sakhaline সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা হইতেছিল;—এই জাহাজখানা ঐখানেই যাইতেছে; ঐখানে রুস্-রাজ-সরকার যে ভীষণ অত্যাচার করে তাহাই আপনাদের মধ্যে উহারা বলাবলি করিতেছিল; রুস্ রাজসরকার, সেরা বদ্‌মাইস ও ঘোর রাষ্ট্র-বৈপ্লবিকদিগকে এক কারাগারের মধ্যে রাখিয়া রুস্‌জাতির মধ্যে যাহারা হেয় ও যাহারা পূজ্য তাহাদিগকে একসঙ্গে মিশাইয়া, একটা অদ্ভুত অস্বাভাবিক সংমিশ্রণ ঘটাইয়াছেন। এই সকল বীরপ্রকৃতি নাবিকেরা, এই সকল অত্যাচার সম্বন্ধে কেমন সাদাসিধাভাবে, প্রশান্তভাবে কথাবার্ত্তা কহিতেছিল। আমার হৃদয়ে এখনও কড়া পড়ে নাই, ঘৃণা ও ক্রোধে আমার আকণ্ঠ পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে।

*

রবিবার, ২৩ জুন।

সমস্ত প্রাতঃকালটা,—আমার সম্বন্ধে শেষ নিষ্পত্তি কি হইল জানিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া আছি;—একপ্রকার অভূতপূর্ব্ব অবসাদ-দৌর্ব্বল্য অনুভব করিতেছি। ৩টার সময় বন্দরের প্রধান কাপ্‌তেন আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন;—উর্দ্দিপরা, পার্শ্বদেশে তলোয়ার, বক্ষের উপর বিবিধ সম্মান-ভূষণ ঝুলিতেছে। লোকটি প্রিয়ভাষী, খুব ভদ্র, এমনকি সহৃদয়। পেটের্সবর্গে আমার বহিষ্করণের হুকুমটা অনুমোদিত হইয়াছে—এই সংবাদটি তিনি দুঃখের সহিত আমাকে জ্ঞাপন করিলেন। পরবর্ত্তী জাহাজ ছাড়িবার আগে, ডাঙ্গায়

নামিয়া কিছুদিন হোটেলে আমার বাস করাও নিষেধ। খুব সদয়ভাবে তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন -এই দুর্ঘটনার হেতু কি। তিনি বলিলেন "ইংরাজদিগকে, জাপানীদিগকে, রুস্‌রাজ্যে প্রবেশ করিতে অনেক সময়ে নিষেধ করিতে হইয়াছে; তাহারা সেনানায়ক,—আমাদের সামরিক কার্য্যের সন্ধান লইবার জন্য এখানে প্রেরিত হইয়াছে এইরূপ আমরা অনুমান করিয়া থাকি;—কিন্তু তুমি ত সেনা-নায়ক নও, তুমি ত reserve সৈন্যের একজন corporal মাত্র।" তখন আমার অনুমানটা অস্পষ্ট কথায় তাঁহার নিকট ব্যক্ত করিলাম। বন্দরের কাপ্‌তেন আমার অনুমানটা সঙ্গত বলিয়া মনে করিলেন; এবং তখনি এই কথাটিও বলিলেন:—শোন বলি, বিশ্ববিদ্যালয়ের হাঙ্গামা সমস্তই এখন মিটিয়া গিয়াছে: সম্রাট্‌, সকলকেই ক্ষমা করিয়াছেন, সকল দণ্ডই রহিত করিয়াছেন, এবং ছাত্রগণ, যেখানে ইচ্ছা এখন একত্র সম্মিলিত হইতে পারে—এইরূপ অনুমতি দিয়াছেন……" রুস্‌কর্ম্মচারীগণের অপূর্ব্ব মনের ভাব; তাহাদের এই রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থায় তাহারা মনে করে, যাহা তাহারা চাহিয়াছিল তাহাই পাইয়াছে; যখন কোন ভীষণ দুষ্কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয় তখন তাহারা বেশ চোখ বুজিয়া থাকে; আবার যখন অপরিহার্য্য ক্ষমানীতি অবলম্বন করিতে হয়, তখন উহারা সম্রাটেরই দয়াকীর্ত্তন করে। কাল উহারা জাপান-গামী একটা রুস জাহাজে আমাকে উঠাইয়া দিবে। বন্দরের কাপ্‌তেন, ঐ জাহাজ আমাকে

ভাড়া দিবার মত যথেষ্ট টাকা আমার কাছে নাই; তাই তিনি একটা ব্যাঙ্কে আমাকে কাল লইয়া যাইবেন; এবং আমাকে এই সুযোগে সহরটাও দেখাইবেন।—তাছাড়া তিনি আমার প্রতি প্রভূত সম্মান প্রদর্শন করিতেছেন; কোন স্থানে প্রবেশ করিবার সময়, আগে আমাকে পথ ছাড়িয়া দেন, তিনি আমার পশ্চাতে আইসেন, এবং বারম্বার আমার হস্তপীড়ন করেন। এখন হইতে সকল পুলিশ কর্ম্মচারীই —এমন কি, আমার পুলিস-প্রহরীও আমাকে সম্মানের সহিত অভিবাদন করে। বস্তুত এমন ভদ্রতার সহিত বহিষ্কৃত কেহ কখন হয় নাই।

*

সোমবার, ২৪ জুন।

আজ প্রাতে, একজন পুলিস-কর্ম্মচারী আমাকে ডাঙ্গায় লইয়া যাইবার জন্য আসিয়াছে। ডিঙ্গিখানি বন্দরের মধ্যদিয়া চলিল। বন্দরটি জীবন-উদ্যমে পূর্ণ; এখানে কত জাহাজ-টানা জাহাজ, চীন-দেশীয় জাহাজ, রুসীয় যুদ্ধ-জাহাজ; রুসীয়, জর্ম্মাণ ও জাপানী বাণিজ্য জাহাজ।

ডাঙ্গাতেও এইরূপ সজীব ভাব: ফিট্‌ফাট্‌ উর্দ্দিপরা রাজকর্ম্মচারী, সেনানায়ক, সৈনিক, অত্যন্ত অপরিষ্কৃত লাল-কামিজ পরা রুসীয় চাষা, উজ্জ্বল চক্ষুবিশিষ্ট রুসীয় রমণী, চীনেম্যান, জাপানী পুরুষ ও রমণী, কোরীয়। এক অপূর্ব্ব বিশ্বনাগরিক জনতা,—এসিয়া-খণ্ডের সর্ব্বজাতীয় বিপুল জনসঙ্গম। চারিদিকেই ঘর বাড়ী নির্ম্মিত হইতেছে; কত জায়গায় মাটী ওলট-পালট, মাটী খুঁড়িয়া

কাটা, কোথাও বা পাথরের চাক্‌লা, কাষ্ঠখণ্ড, বালুকা বা ইষ্টকের স্তূপ, লোহার রেলখণ্ড-সমূহ ইতস্ততঃ বিকীর্ণ রহিয়াছে;—মনে হয় যেন মাটীর ভিতর হইতে নগরটি বাহির হইয়াছে; মনে হয় যেন একটি ভাবী মহা-নগরীর পত্তন হইতেছে; ইহা একটি উদীয়-মান রাজধানী।

পুলিস প্রহরীর হেপাজতে আমি বন্দর-কাপ্‌তেনের আফিসে উপনীত হইলাম। বন্দর কাপ্‌তেন আমাকে তাঁহার গাড়ীতে লইয়া, নগর দেখাইতে বাহির হইলেন, এবং আমাকে সমস্ত বিষয়ের খোঁজ-খবর দিলেন। ইনি সৌম্য সুজন, জ্ঞানবান, বুদ্ধিমান; সুশিক্ষিত রুস্‌দিগের ন্যায় ইনি পর্য্যায়ক্রমে ফরাসী, জর্ম্মান ও ইংরাজি ভাষায় কথা কহেন। তাঁহার সব কথায় রাজসরকারের অনুকূল ভাবই প্রকাশ পায়। সরকারের সব কাজই তিনি ভাল চোখে দেখেন।

তাঁহার মতে, ভ্লাডিভষ্টকের ডকের শ্রম-জীবিদের যেরূপ ভাল অবস্থা এরূপ আর কোথাও দেখা যায় না। রুস-রাজসরকার এরূপ প্রজাবৎসল যে, কাজ করিতে করিতে যদি কোন শ্রমজীবির অপঘাত মৃত্যু হয়, তাহার পরিবার প্রভূত অর্থ সরকার হইতে প্রাপ্ত হয়… কিন্তু এ বিষয়ে আমার একটু সন্দেহ আছে, কেননা আমি অন্যের নিকট শুনিয়াছি এবং আমি বেশ জানি, যদি এই সব শ্রমজীবিরা ধর্ম্মঘট করে, তাহা হইলে চাবুক মারিয়া উহাদিগকে কাজ করিতে বাধ্য করা হয়; ইহাও বেশ জানি, এই চীনে কুলিরা যদি কাজ করিতে নারাজ হয় তাহা হইলে তাহাদের পরস্পরের বেণীতে বেণীতে বাঁধিয়া সেই সমস্ত কুলিকে একযোগে জলে ডুবাইয়া মারিতেও কর্ম্মাধ্যক্ষেরা কিছুমাত্র ইতস্তত করে না!—সৈনিক ও পুলিসকর্ম্মচারী-দিগের উর্দ্দির প্রাচুর্য্য দেখিয়াই বেশ বুঝা যায়, কিরূপ অত্যাচার উৎপীড়নে এই হতভাগ্য দেশ নিষ্পেষিত হইতেছে: এখানকার রাজসরকার লোকের স্কন্ধে দাসত্বের যে জোয়াল চাপাইয়া-ছেন তাহা এখানে যেরূপ প্রত্যক্ষ দেখা যায় এরূপ আর কোথাও না; ইহা অসহ্য কায়িক কষ্টের সীমা পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছে।

আমরা দুজনে একসঙ্গে রুস্‌ চিনীয় ব্যাঙ্কে গমন করিলাম। আমার দস্তুর মত মাতব্বরী-পত্র (letter of credit) থাকা সত্ত্বেও ব্যাঙ্কওয়ালারা প্রথমেই আমার দেশভ্রমণের ছাড়পত্র দেখিতে চাহিল। ঐ ছাড়পত্র পুলিস আমাকে ফেরৎ দেয় নাই, সুতরাং বন্দরের কাপ্তেনই আমার হইয়া তৎসম্বন্ধে কৈফিয়ৎ দিলেন। তিনি একটু হাসিয়া বলিলেন: "রুসি-য়ায় বিনা ছাড়পত্রে কোথাও যাওয়া যায় না;" ফলত সর্ব্বত্রই উহারা ছাড়পত্র দেখিতে চাহে। হোটেলে যদি থাকিতে চাহ, সেখানেও ছাড়পত্র দেখিতে চাহিবে, রেলষ্টেশনে যদি টিকিট কিনিতে যাও, সেখানেও ছাড়পত্র দেখাইতে হইবে। রুসিয়ায় ইহা একটা চমৎকার পদ্ধতি।

এই সৌম্য সুজন রাজকর্ম্মচারীর নিকট আমি বিদায় লইলাম এবং অন্তরের সহিত তাঁহাকে আমার ধন্যবাদ জানাইলাম:—তিনি বলিলেন:—"এই ঘটনা সম্বন্ধে একটা খারাপ স্মৃতি লইয়া যাইও না; আমার যাহা সাধ্য তাহা আমি করিয়াছি…" একটা ডিঙ্গি করিয়া আমাকে সেই জাপান-গামী জাহাজে লইয়া গেল। আজ এই

জাহাজ, অপরাহ্নে এখান হইতে ছাড়িবে। জাহাজ ছাড়া পর্য্যন্ত, আমার সেই পুলিস্‌-প্রহরী "জেটির" উপর—জাহাজে উঠিবার সিঁড়ির নীচে—সান্ত্রীর মত দাঁড়াইয়া রহিল। সিঁড়ি উঠাইয়া লইবার সময় উহারা আমার ছাড়পত্র আমাকে ফেরত দিল। বিষণ্ণ হৃদয়ে আবার এই ছাড়পত্রখানি আমি পড়িলাম :—

"আমরা ইয়োকোহামাস্থিত ফ্রান্সের কন্সল—আমরা ফরাসী জাতির নামে, সাধারণ তন্ত্র-ফ্রান্সের সহিত মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ দেশ সমূহের রাষ্ট্রিক ও সামরিক বিভাগের রাজকর্ম্মচারীদিগকে অনুরোধ করিতেছি, তাঁহারা Mকে যেন অবাধে তাঁহাদের দেশ দিয়া যাইতে দেন..."

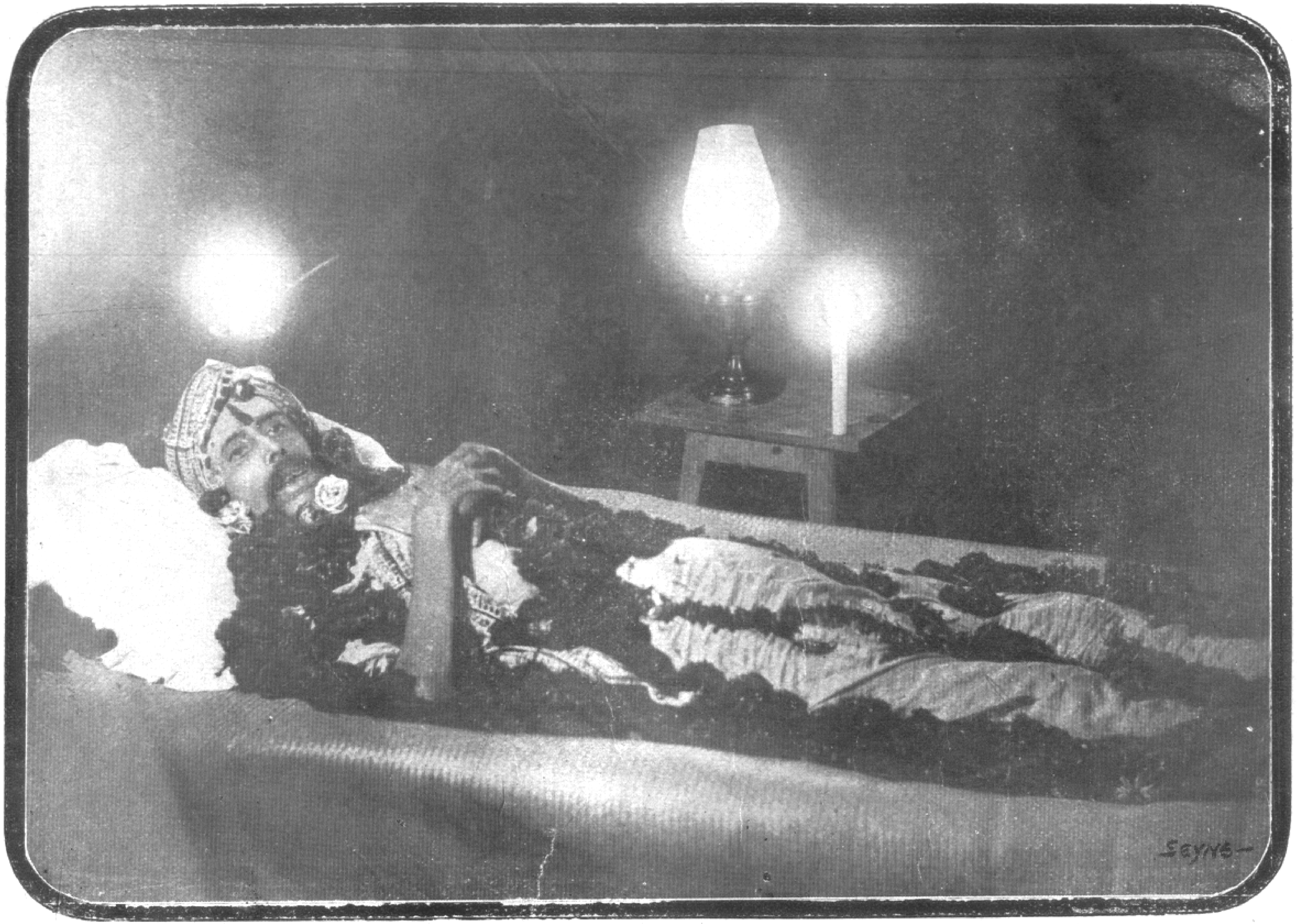
এইবার জাহাজখানা নড়িয়া উঠিয়াছে। এখনি চলিতে আরম্ভ করিবে। আর কএকদিনের মধ্যেই আমরা সিমনোসাকিতে পৌঁছিব। দুঃখিতচিত্তে যে জাপানকে ছাড়িয়া আসিয়াছিলাম, আবার আনন্দের সহিত সেই জাপানে ফিরিয়া যাইব। রুসরাজ্যের সংস্পর্শে আসিবার পর—রুসরাজ্যের সেই অত্যাচারী শাসন, সেই সামরিক দাসত্ব, সেই সর্ব্বদর্শী ও মান পুলিস—এই সকলের সংস্পর্শে আসিবার পর, জাপানীদের সহিত পুনর্ব্বার সাক্ষাৎ হইবে মনে করিয়া আমার কত আনন্দ হইতেছে—সেই জাপানীজাতি যাহারা অতীব চিত্তাকর্ষক, পরিস্কার পরিচ্ছন্ন, আমুদে ও ভদ্র, যাহাদের সভ্যতা চরম উন্নতিলাভ করিয়াছে, যাহাদের শিল্পকলা অতি অপূর্ব্ব ও পরমাশ্চর্য্য। পিটর্স বর্গের বড় বড় প্রাসাদ-শালায় বাস করিয়া রুসের ব্যাপারাদি সম্বন্ধে আমি যত না জানিতে পারিতাম,—ভ্লাডিভষ্টকের সম্মুখে কিছুদিন থাকিয়া তৎসম্বন্ধে—রুসের সরকারী কর্ম্মচারীদিগের সম্বন্ধে—আমি তাহা অপেক্ষা আরও সঠিক ও গভীরতর জ্ঞানলাভ করিয়াছি।

এই জাহাজের উপর, নৌ-কর্ম্মচারীরা নেবু-দেওয়া চা পান করিতে করিতে আমার বহিষ্করণ সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা কহিতেছে; আর পবিত্র পুত্তলিকার সম্মুখে যে একটী ক্ষুদ্র দীপ জ্বলিতেছিল সেই দীপটি জাহাজের চলা-ফেরায় আন্দোলিত হইতেছে। আমার এই ঘটনার কথা শুনিয়া সকলে আমোদিত হইতেছে কিন্তু বিস্মিত হইতেছে না। একজন উদারনৈতিক মার্কিন, আমেরিকার গুণকীর্ত্তন করিতেছে। সায়াহ্নে, একটি মহিলা, ডেকের উপর, আমার নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, রুসীর ব্যাপারে ও রুসীয় লোকের উপর আমার ঘৃণা জন্মিয়াছে কিনা। আমি তাঁহাকে রুস্ রমণী মনে করিয়া ভদ্রতার ভাবে রুসরাজ্য ও রুসের লোক—এই উভয়ের মধ্যে একটা পার্থক্য স্থাপন করিবার চেষ্টা করিলাম। আমি বলিলাম,—যদি রুস রাজ্যকে আমিও যথেচ্ছাচারী বলিয়া মনে করি, কিন্তু কি পুরুষ কি রমণী—রুসের লোকেরা খুবই ভাল। মহিলা উচ্চহাস্য করিয়া প্রস্থান করিলেন: "এই ফরাসীরা, সবাই সমান: খুব ভদ্র কিন্তু আদপে সরল নহে। রুস-লোকের সম্বন্ধে তোমার মতামত আমার কাছে তুমি অসঙ্কোচে বলিতে পার,—কেন না, আমি পোল-রমণী।"

*

টোকিও, ৮ই জুলাই।

জাপান ভ্লাডিভষ্টকের খুব নিকটে। তাই জাপানে অবস্থিত ফ্রান্সের দৌত্যসচিবকে আমি



কবিবর নবীনচন্দ্র সেন।

সাহস করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম,—আমার প্রতি ভ্লাডিভষ্টকের শাসনকর্ত্তা এরূপ অসৎ ব্যবহার কেন করিলেন তাহা আমাদের সেণ্টপিটরবর্গস্থ দৌত্যসচিবকে লিখিয়া তিনি জানিবার চেষ্টা করিতে পারেন কিনা। তিনি বলিলেন, "এ বিষয় সম্বন্ধে তুমি ফ্রান্সের পর-রাষ্ট্র-সচিবকে জানাও, আমি কিছুই করিতে পারিব না।" তাহার পর, তাঁহার নিকট হইতে যখন বিদায় লইয়া আসি, তিনি দ্বারদেশে আরও এই কথা বলিলেন: "যখন হইতে রুস্ সম্রাটকে হত্যা করিবার চেষ্টা হয়, সেই অবধি রুসিয়ায়, বিপ্লবপন্থীদিগকে বড়ই ভয় করে।" আমি বিদায়-নমস্কার করিয়া তাঁহাকে বলিলাম; "দেখুন সচিবমহাশয়, আপনি নিশ্চিত জানিবেন, আমি যখন ভ্লাডি-ভষ্টকে পৌঁছিয়াছিলাম, তখন আমার পকেটেও বোমা ছিল না, আমার ব্যাগের মধ্যেও বোমা ছিল না।" তিনি উত্তর করিলেন "হাঁ, সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নাই।"

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মহানিদ্রায় মহাকবি।

বিশ্বের বরেণ্য কবি প্রতিভার প্রদীপ্ত ভাস্কর,
হের ওই চিরসুপ্ত—যোগমগ্ন তাপস সুন্দর!
প্রশান্ত শান্তির রেখা উদ্ভাসিত প্রসন্ন আননে,
তৃপ্ত যেন পুত আত্মা আজনম সফল-সাধনে!
ভারতের বর পুত্র, জগতের অমর নন্দন,
গীতা বক্ষে যুক্ত-করে করিছেন আত্ম-সমর্পণ!
জীবনের যত কিছু দুঃখ-দৈন্য বেদনা-বিষাদ,
সকলি বিস্মৃত যেন লভি আজি দেব-আশীর্ব্বাদ!
মুক্ত দু'টী আঁখি-তারা বুঝি হেরে অদূরে সম্মুখে
অভীষ্ট আরাধ্য দেবে সুনির্ভরে অক্ষয় কৌতুকে!
অর্দ্ধ-বিকশিত-আস্য করে যেন নীরবে জ্ঞাপন
জন্মভূমি জননীরে অন্তরের শেষ-সম্ভাষণ!
নামাবলী বদ্ধ শিরে, চন্দনের শুভ-টীকা ভালে,
মহা 'বিজয়ার' সজ্জা উপহাস করিতেছে কালে!
নির্ম্মল প্রসূনপুঞ্জে সাজাইয়ে শ্রীঅঙ্গ শোভন
পুষ্পরূপে অশ্রু-অর্ঘ্য করিয়াছে ভক্তে নিবেদন।
বঙ্গের সন্তানবৃন্দ! আর্ত্তনাদ ভুলি' ক্ষণতরে,
হের ওই দিব্য মূর্ত্তি একবার সারা প্রাণ ভ'রে!
নবীন 'ভারত'-স্রষ্টা—কল্পনার অফুরন্ত-গান—
সরল উদার হৃদি, ওইখানে নিয়েছে নির্ব্বাণ!
আবার ভাসিবে বিশ্ব কালি শুভ্র প্রভাত-প্রভায়,—
কবীন্দ্রের মহানিদ্রা আর কভু ভাঙ্গিবেনা হায়!!

শ্রীজীবেন্দ্র কুমার দত্ত।

পোষ্যপুত্র।

ধারাবাহিক উপন্যাস।

(১)

সকাল বেলার ঠাণ্ডা বাতাস খোলা-জানলার মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে প্রবেশ করিল। তরুণ সূর্য্য তাঁহার অরুণনেত্র মেলিয়া সকৌতুকে গৃহের মধ্যে উঁকি দিয়া চাহিলেন, সেই ঝিলমিলে রৌদ্র চোখে পড়িয়া তাহার ঘুম ভাঙ্গাইয়া দিল।

শশব্যস্তে শয্যার উপর উঠিয়া বসিয়া দুই হস্তে চোক্ রগড়াইতে রগড়াইতে শিবানী জানলার মধ্য দিয়া চাহিয়া দেখিল। "উঃ অনেক বেলা হয়ে গ্যাছে"; এই বলিয়া ধড়মড়িয়া উঠিয়া পড়িল। তাড়াতাড়ি বিছানাটা তুলিয়া রাখিয়া ক্ষুদ্র কুশের ঝাঁটা দিয়া ক্ষুদ্র ঘরখানি ঝাঁট দিতে আরম্ভ করিয়াছে এমন সময় নীচে হইতে ডাক পড়িল "শিবি ও শিবি বলি আজ কি তুই উঠ্‌বি নি"?

শিবানী তাড়াতাড়ি গৃহমার্জ্জন সমাপ্ত করিয়া নীচে নামিয়া গেল। উঠানে রাত্রের উচ্ছিষ্ট বাসন পড়িয়া আছে, গরুগুলা এখনও 'জাব' পায় নাই, বাসি ঘর দুয়ার 'ভ্যান ভ্যান' করিতেছে, সে লজ্জিত হইয়া 'গোলা হাঁড়ি' লইয়া প্রথমে রান্নাঘর নিকাইতে আরম্ভ করিল।

শিবানীর মাতা সিদ্ধেশ্বরী কন্যাকে দেখিয়াই বিচালীর ঝুড়ি নামাইয়া বলিয়া উঠিলেন, "হ্যাঁলা, আজ তোকে কুম্ভকর্ণ ভর করেচে নাকি, সকাল বেলা উঠে যে পুজো 'আহ্নিক' কর্ব্বো তার যোটি নেই—চারকাল ধরে খেটেই মরবো"। কন্যা গোময় মৃত্তিকালিপ্ত হাত ধুইতে ধুইতে লজ্জিত ভাবে আস্তে আস্তে বলিল, "তুমি চান্ করতে যাও মা, আমি এখনি সব সেরে ফেলচি।"

মাতা গরুকে সর্ষপখইল মিশ্রিত বিচালী দান করিয়া তেলের বাটি ও গামছা লইয়া স্নান করিতে গেলেন।

বর্ষায় যমুনার চর ডুবাইয়া চড়া ভাঙ্গিয়া ঘাটের কোলে কোলে পুরাতন পাথরের সিঁড়ি পর্য্যন্ত জল আনিয়াছিল। বৃন্দাবনের বস্ত্রহরণ ঘাটের প্রশস্ত সিঁড়ির উপর জনতা করিয়া স্নানার্থীরা কেহ তেল মাখিতেছে, কেহ মৃত্তিকা দ্বারা মস্তক মার্জ্জনা করিতেছে, কেহ কচ্ছপকে ছোলাভাজা খাওয়াইতেছে, কেহ পূজা করিতেছে, সকলেই নিজ নিজ কার্য্যে ব্যস্ত; ঘাটের পাণ্ডারা দস্তুর মত হাঁক দিতেছে, পয়সা লইতেছে, ফোঁটা তিলকদান করিয়া, ঠাকুর দেখাইয়া, অযাচিত অভিজ্ঞতা জন্মাইয়া দিয়া, স্নানার্থী দর্শনার্থীকে ত্রাহি মদূসূদন ডাক ছাড়াইতেছে! চিরন্তন নিয়মানুযায়ী সবি যথাযথ চলিতেছে।

তথাপি সিদ্ধেশ্বরী ঠাকুরাণীর আজ যেন স্নানের অর্দ্ধেকটুকু সুখ চলিয়া গিয়াছিল। বেলা হওয়াতে তাঁহার 'ভাবিসাবির' দল আজ আর কেহ এখানে উপস্থিত নাই। তিনি স্নানাদি সংক্ষেপে সারিয়া কলসী ভরিয়া বাড়ী ফিরিলেন। শিবানী বাসিপাট সারিয়া বাসন মাজিয়া রান্নাঘরের দাওয়ায় সাজাইয়া রাখিতেছিল, মাতার পদশব্দে মুখ ফিরাইল, তাঁহাকে এত

শীঘ্র ফিরিতে দেখিয়া ঈষৎ বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল "তোমার চান হয়ে গ্যাল, এত শীঘ্র ফিরলে যে মা ?"

মাতা কন্যার প্রশ্নের উত্তর না দিয়া ভাণ্ডার ঘরের এক পাশে জলের কলসী নামাইয়া রাখিয়া নিজের পুরাতন পট্ট শাড়ি ও ফুলশূন্য ফুলের সাজি লইয়া বাহিরে আসিলেন, আর্দ্র বস্ত্র রোয়াকের একদিকে লম্বিত বাঁশের উপর ফেলিয়া কন্যাকে ডাকিয়া বলিলেন—"শিবি তুই চট্ করে ডুব দিয়ে এসে রান্না চড়িয়ে দে, শেট্ মন্দিরের ঘড়িতে আট্টার ঘা পড়্লো আমি চল্লাম। নীরোদ আসে তো ভাঁড়ারের তাকের ওপোর মুড়্কি আছে তাই চাট্টি দিস্; না হয়তো পেরদাদি প্যাঁড়া বুঝি আছে একটা, তাই দিস্; বাবুর আবার মুড়্কি রোচে না রোজই পড়ে থাকে দেখ্তে পাই।"

"আচ্ছা" বলিয়া শিবানী তেলের বাটি পাড়িয়া চুল খুলিতে বসিল। সিদ্ধেশ্বরী উঠানের এক পার্শ্বস্থ কৃষ্ণকলি ও টগর গাছ হইতে পুষ্প সংগ্রহ করিতে করিতে "যশোদা রাখিলা নাম যাদু বাছা ধন, শ্রীনন্দ রাখিলেন নাম নন্দেরি নন্দন"—ইত্যাদি রূপ কৃষ্ণমহিমা কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

দ্বিপ্রহরে আহারাদি সমাপ্ত হইলে রান্নাঘরের দাওয়ায় তালপাতার চেটাই পাড়িয়া সিদ্ধেশ্বরী ঠাকুরাণী টেকোয় করিয়া সুতা কাটিতেছিলেন; কাজকর্ম্ম সব সারা হইয়া গিয়াছে, এবেলার জন্য ডাল ও ব্যঞ্জন ঢাকা দিয়া রাখা হইয়াছে, রান্নাঘরে শিকল দিয়া শিবানী নিকটস্থ যমুনার ঘাটে হাত পা ধুইতে গিয়াছে।

বর্ষাকাল হইলেও আজ আকাশে একখণ্ড মেঘ জন্মে নাই; ভাদ্রের 'চড়চড়ে' রৌদ্রে ঘাটের পাথর তাতিয়া উঠিয়াছে, কয়খানা বাসন লইয়া শিবানী ধীরে ধীরে সেই রৌদ্র তপ্ত সোপান অতিক্রম করিয়া জলের ধারে গিয়া দাঁড়াইল। আজ তাহার মনটা কেমন যেন বিমর্ষ বিমর্ষ হইয়া আছে কিছুই ভাল লাগিতেছে না।

ঘাট এখন প্রায় জনশূন্য; দুএক জন ব্রজবাসিনী শুধু তাঁহাদের সুগৌর বর্ণ নীল জলে অর্দ্ধাবরিত করিয়া স্নান করিতেছিলেন, দুএকজন বালক কেবল কচ্ছপকুলের সহিত অত্যন্ত সৌহার্দ্দ্য প্রযুক্ত স্থান ত্যাগ করিতে পারিতেছিল না।

শিবানী বাসন মাজিয়া জলে নামিল। বানরের ভয়ে মার্জ্জিত বাসনের উপর চক্ষু রাখিয়া শীতল কাল জলে গলা ডুবাইয়া বসিয়া রহিল। এইরূপে সময় কাটাইয়া ঘরে ফিরিলে মা বলিলেন; "হ্যাঁলা শিবি! তোর কেমন ধারা আক্কেল বল্ দেখি? গেলি তো আর ফির্তেই চাস্ না! যেখানে যাবি যেন "বাঘের মাসি! কচ্ছিলি কি? রায়েদের বউটো বুঝি এসেছিল?" শিবানী ভিজা কাপড় নিঙ্ড়াইতে নিঙ্ড়াইতে উত্তর করিল "কেউ তো আসেনি মা, কেন আমার কি বেশী দেরি হ'য়ে গ্যাচে?

"কি জানি বাছা নীরোদ্ তো চটেমটে বেরিয়ে গ্যালো। চাবি খুঁজ্লে পেলেনা; পান চাইলে, কে এখন সাজ্তে বসে—বল্লাম, একটা লাগিয়ে নাও, নয়তো সে এসে দেবে একটু দাঁড়াও, এতো তাড়া কিসের—টেরেন ফেল তো হবেনা। তা শোনা হলোনা, বল্লেন "বাজার থেকে কিনে খাবো, বাড়ীর পান আর খাব না।" এমন, মানোয়ারি গোরার' মতন মেজাজ নিয়ে কি বাপু পরের ঘরে চলে।

আমি যাই ভাল মানুষ সাতেও নেই পাঁচেও নেই তাই, আর কেউ হলে টের্‌টি পেতেন। চাকুরী নেই বাকুরী নেই বারমাস ঘরে বসে কুঁড়ো পাথর ঠাস্‌বেন আর পান থেকে চূণ খস্‌লেই অম্‌নি নবাব পুত্তুরের গস্‌গসানী দেখে কে! তবু যদি না পরদোয়ারি হতেন"—

শিবানী আর্দ্রবস্ত্রের অঞ্চলে তাহার অসম্বরনীয় দুই বিন্দু অশ্রুজল নিঃশব্দে মুছিয়া ফেলিল। এ প্রাত্যহিক ব্যাপারে সে ইহার চেয়ে বেশী খরচ করিত না। কণ্ঠোত্থিত একটুখানি দীর্ঘশ্বাস বুকের মধ্যে চাপিয়া ফেলিয়া সে মায়ের কাছে আসিয়া বসিল।

মা তুলার চুপ্‌ড়িটা কন্যার দিকে ঠেলিয়া দিয়া বলিলেন "গোটাকতক পাঁজ পাকিয়ে দেতো মা, আর গুলের কোটটা এগিয়ে দে, বকে বকে মুখটা শুকিয়ে উঠ্‌লো। হরিহে দয়াময়!

"কৈগো শিবুর মা কি করচো?" বলিয়া মাতঙ্গিনী ঠাকুরাণী উঠানে দেখা দিলেন।

"এসো দিদি এসো, এই ভাই তোমারই কথা মনে কচ্ছিলাম" "তবে আমি অনেকদিন বাঁচ্‌বো" বলিয়া মাতঙ্গিনী তাঁহার তামাক পোড়ায় রঞ্জিত দশন প্রকাশ করিয়া সৌজন্যের হাসি হাসিয়া শিবানীদত্ত কুশাসনে তাঁহার বিপুল দেহার্দ্ধ স্থাপন করিলেন।" আঃ রোদটার আজ তেজ দেখ্‌চো, এটুক্‌খানি আস্‌তে যেন পায়ে ফোস্কা পড়ে গ্যাছে। হ্যাঁ গা শিবুর মা, আজ চান্ কত্তে যাওনি, যাত্রা করোনি কেন?"

সিদ্ধেশ্বরী ঠাকুরাণী লাটাইয়ে তৈয়ারী সূতাটুকু জড়াইয়া লইয়া একটু নিশ্বাসের সহিত উত্তর করিলেন "আর দিদি ঘর সংসারের কাজের জ্বালায় তো দুদণ্ড ঠাকুরদেবতাকে ডাক্‌বার অবসর পাবার যো নেই, চিরজন্ম ওই কর্ব্বো।"

মাতঙ্গিনী সে কথায় মাথা নাড়িয়া সায় দিয়া গেলেন "তাইতো, সংসারের কথা আর বলোনা জ্বলে পুড়ে মরেচি।

শিবু! তোমায় আর দেখ্‌তেই পাই না যে মা, আহা বাছা যেন রোগা হয়ে গ্যাছে মুখ্‌টি যেন শুকিয়ে গ্যাছে কেনগা শিবুর মা?" শিবানীর মাতা একবার কন্যার দিকে অগ্রাহ্য ভাবে চাহিয়া দেখিলেন। "আর দিদি ওর কি মনের সুখ আছে যে কসায়ের হাতে পড়েছে চব্বিশ ঘণ্টা তাড়নায় তাড়নায় অমন দশা হচ্চে, নইলে খাবার তো কিছু দুক্ষু নেই অমন চেহারাই বা হয় কেন, জামাই যেন দিন দিন মাথায় উঠে বস্‌চে!"

মাতঙ্গিনী শিবানীর হাত ধরিয়া তাহাকে কাছে বসাইলেন। "আয় মাসি দুগাছা পাকা চুল তুলে দে। তা শিবুর মা, জামাই চাক্‌রী বাক্‌রী করেনা কেন গা? অক্ষয় দিদির নাতি সেদিন বলছেলো তোমার জামাই নাকি ভারি বিদ্বান; সে শশির ছেলের ফাষ্টবুকের মানে বলে দ্যায়, পাঠশালার পণ্ডিতমশাই সেদিন নাকি সট্‌কে না নাম্‌তা কি জেনে নিচ্ছিল?"

সিদ্ধেশ্বরী ঠাকুরাণী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। "আমার কপাল! চাকরী কর্‌লে যে দোষ ধর্‌বার সময় কমে যায়! এই আজ দেখোনা মেয়েটা একবার ঘাটে গিয়েছে—কোথাওতো যায় না—গিয়েছে না হয় আস্‌কই, তা নয় রেগে টং হয়ে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেলেন, জামাই নিয়ে হাড় মাস জ্বলে গেলো

বোন জলে গেল। কোথাকার একটা হাড়হাবাতে লক্ষ্মীছাড়া এসে জুটেচে; মেয়েটাকে হাত পা বেঁধে একেবারে জলে ফেলে দিয়েচি।"

মাতঙ্গিনী শিবানীকে একটু ভাল বাসিতেন; তাহার কষ্ট একটু অনুভব করিয়া এ প্রসঙ্গ চাপা দিয়া প্রস্তাব করিলেন, "আজ গোবিন্দ জিউর মন্দিরে আরতি দেখ্‌তে যাবে গা মাসি?" শিবানী মৃদুস্বরে উত্তর করিল "না"। মা বলিলেন, "কেন যা না কোথাও কি যেতে নেই নাকি? এতোই কি ভয়, তোকে শালে দেবে না শূলে দেবে?"

শিবানীর মুখ ঈষৎ আরক্ত হইয়া উঠিল, সে একটুখানি গর্ব্বের সহিত উত্তর করিল, "তার জন্যে আমি ভয় করি না আমার যেতে ইচ্ছা নেই।"

"এমন জেদী মেয়ে কখনও দেখিনি! এক-গুঁয়ে, মনগুমরে, মনের কথা পাবার যো নেই! ঠাকুরদেবতা সব গেলো কেবল স্বোয়ামি! দেবতার অপমান করে স্বামীভক্তি দেখানো! ওই জন্যেই তো স্বোয়ামির হতচ্ছেদ্দা।"

শিবানী উঠিয়া দাঁড়াইল, খোলা চুল জড়াইয়া ধীরপদে রান্নাঘরের ভিতর প্রবেশ করিল, একটিও কথা কহিল না। প্রৌঢ়াদ্বয় অবাক হইয়া গেলেন, কিছুক্ষণ তাঁহাদের বাক্যস্ফূর্ত্তিই হইল না; তার পর সিদ্ধেশ্বরী গালে হাত দিয়া স্তম্ভিতস্বরে কহিলেন, "দেখলে দিদি ওইতেই তো সে এতো মাথায় চড়েচে। বলি এতোই কি ভালবাসা! আমি মা—আমার পরামর্শ নিবিনে? আমি তোরি ভালর জন্য বলি; আমার কি কর্ব্বি তোরা, আমি কারু পেত্যাশী নই।"

"তা বোন এ কলিকাল! এখন কি আর মা মাসির উপদেশ চলে; এখন নিজেরাই নিজেদের আইন কর্ত্তা।"

"করুক্‌গে নিজেই ভুগবেন! যার জন্যে চুরি করি সেই বলে চোর! তোরি ভালর জন্যে বলে মরি না শুনিস যা খুসী কর। মেয়ে মানুসের একটু তেজ থাকা ভাল, তোরি ভাত খেয়ে, তোকেই যে পায়ে থেঁত্‌লায় তোর সহ্যিই বা হয় কেমন করে? চাক্‌রী করুক ধরে মাল্লেও সবি। তানয়—বিয়ের সঙ্গে খোঁজ নেই কুলোপানা চক্কোর! হরি দয়াময়! চলগো দিদি আমরা যাই চলো।"

(২)

সমুন্নত, মন্দিরচূড়াশালিনী সুষুপ্তা নগরীর পদ ধৌত করিয়া নির্ম্মল যমুনা বহিয়া যাইতেছে। জ্যোৎস্নায় তাহার কাল জলে মাণিক জ্বলিতে ছিল। কোথাও প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মন্দির বা প্রাসাদের ছায়া পড়িয়া নদীবক্ষ আরও অন্ধকার করিয়া রাখিয়াছে—কোথাও পুরাতন বটবৃক্ষ পত্রান্তরালে জ্যোৎস্নালোক জোনাকির মত মিটি মিটি জ্বলিতেছিল। নদীর কোলাহল মুখরিত ঘাটসকল প্রায় নিস্তব্ধ ও জনশূন্য। কচ্চিৎ এক একটা ঘাটে পান্সি বা নৌকার যাত্রীদের মধ্যে কাহারো সাড়া পাওয়া যায়। ক্ষুদ্র গৃহের ক্ষুদ্র বাতায়নের নিকট শিবানী একা বসিয়া যমুনার দিকে চাহিয়া ছিল। জ্যোৎস্নার আলো তাহার সুশ্যাম সুন্দর মুখের গাম্ভীর্য্য সুস্পষ্ট করিয়া তুলিয়াছিল। সাইক্লোনের পূর্ব্বে সমুদ্রের যেমন একটা স্তব্ধ ভাব হয় আজ তাহারো মুখে সেইরূপ ভীম গম্ভীর ভাব। চোখে মুখে কোথাও একটা চাঞ্চল্য বা ক্রোধের লক্ষণ ছিল না।

এক পাশে নীরদ কুমারের আহার্য্য ঢাকা দেওয়া রহিয়াছে। তক্তপোষের উপর মশারি ঢাকা শয্যা; ঘর জ্যোৎস্নালোকে আলোকিত। দূরে দেবালয়ে বারোটা বাজিয়া গেল, শেঠজীর মন্দিরে দ্বিপ্রহরের নহবৎ বাজিয়া উঠিল। নিস্তব্ধ শিবানী স্থিরদৃষ্টিতে জলের উপর চাহিয়া রহিল। একটা, দুইটা, তিনটা, বাজিয়া গেল চাঁদের আলো ক্রমশই অনুজ্জ্বল হইয়া আসিল, শিবানীর মুখের উপর হইতে জ্যোৎস্নালোক সরিয়া গেল, ঘর ক্রমেই অন্ধকার হইয়া আসিতে লাগিল, শিবানী তেমনি স্থিরচক্ষে অন্ধকার যমুনার দিকে চাহিয়া রহিল।

ভোরের নহবৎ মধুর সুরে ভৈরবী রাগিণী আলাপ করিয়া জগতে উষার আগমন জানাইয়া দিল; শিবানীর ক্লান্ত চক্ষু ঘুম ও অবসাদে জড়াইয়া আসিল; সে সেই নীল জলের উপর উষার গোলাপী ক্ষীণ রেখাটুকু হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া উঠিয়া দাঁড়াইবা মাত্র শুনিতে পাইল—কেহ দ্বারে করাঘাত করিয়া দ্রুত কণ্ঠে ডাকিতেছে শিবানী, শিবানী! শিবানী একবার স্থির হইয়া দাঁড়াইল একবার তাহার স্থির চক্ষে একটা আগুণের হল্কা বাহির হইয়া গেল, কিন্তু তারপরই সে আত্মসংবৃত হইয়া মাথায় কাপড় টানিয়া দিল ও দ্বার খুলিয়া ধীর পদে নীচে নামিতে লাগিল কিন্তু তাহার পূর্ব্বেই নীচে সিদ্ধেশ্বরীর গম্ভীর কণ্ঠ বাজিয়া উঠিল।

শিবি এমন সময় কে এলো লো? নীরদ বুঝি?

শিবানী আর নামিল না—সে সেই সিঁড়ির উপরই একটু দাঁড়াইয়া থাকিয়া আবার উপরে উঠিয়া আসিল।

সিদ্ধেশ্বরী বকিতে বকিতে দ্বার খুলিয়া দিলেন। আগন্তুক একটিও কথা না কহিয়া প্রবেশ করিল। সিদ্ধেশ্বরী গর্জ্জিয়া উঠিলেন।

"কে তোমার সাতটা বাঁদি সাতদিকে ঘুরে বেড়াচ্চে যে রাত চারটের সময় উঠে দোর খুলে দ্যায় শুনি! দিনরাত খেটে খুটে যে রাত্তিরটাও একটু নিশ্চিন্দি আছি তাও নয়। সমস্ত রাত্তির যেখানে ছিলে আর দুঘণ্টা সেখানেই থেকে একেবারে সকালে এলেই তো হতো। কোথা থেকে আমার হাড় পোড়াতে একটা বকাটে মাতাল এসে জুটল গা—"?

নীরদ কুমার শ্বশ্রূর বাক্যে একটিও উত্তর করিলেন না। তিনি উপরে উঠিয়া নিজের মুক্তদ্বার শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিয়া ডাকিলেন "শিবানী"!

শিবানী উত্তর দিল না; সে সেই জানলায় তেমনিই স্তব্ধ তেমনিই স্থির বসিয়া রহিল ফিরিলও না। নীরদ চাদর খানা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া তাহার দিকে অগ্রসর হইলেন।

"শিবানী আমার কথা শুনতে পাচ্চো? আমি তোমার কাছে একটা কথা শুনে যেতে চাই"—

কথার স্বরে জড়তা ছিল না—চলনেও মত্ততা ছিল না, শিবানী এক মুহূর্ত্ত ঈষৎ চঞ্চল হইয়া উঠিল, দৃষ্টি ফিরাইয়া সেই আধ আলো আধ অন্ধকারে স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল, তাহার চিত্ত সেই খানেই দ্রবীভূত হইয়া যাইতে উদ্যত হইয়া উঠিল, কিন্তু বর্ষোন্মুখ মেঘ যেমন পশ্চিমে হাওয়ার সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহার শক্তি হ্রাস করিয়া ফেলিতে প্রাণপণ চেষ্টা পায়, শিবানীও তাহার অন্তরস্থ

দৌর্ব্বল্যের সহিত সেইরূপ নিষ্ঠুর ভাবে যুদ্ধ করিতে লাগিল।

নীরদ কাছে আসিয়া শিবানীর একটা হাত ধরিলেন।

"আমি দুর্ভাগ্য, আমি অক্ষম,সবি সত্য তবু তোমার কাছে এব্যবহার আশা করিনা। আমি জানি পৃথিবী আমাকে ঘৃণা করে—শুধু তুমি ছাড়া। তাই আমি পৃথিবীর সঙ্গে সম্পর্ক তুলেও দিয়েছি। শুধু তুমিই আছ, আর তুমিও কি আমায় ঘৃণা কর্চ্চো ?

"হাঁ"।

বৃষ্টির পূর্ব্বে মেঘে মেঘে ঠোকাঠুকি হইয়া যেমন বিদ্যুদগ্নি বর্ষণ করিয়া গর্জ্জিয়া উঠে শিবানীর স্তব্ধ মৌন অধর ভেদ করিয়া আকস্মিক বজ্র উদ্যত হইয়া উঠিল "হাঁ"। নীরদ তাহার দুই হাত দুই হাতে ধরিয়া ব্যাকুল ভাবে তাহার মুখের দিকে চাহিলেন, পূর্ণ অবিশ্বাসে বলিয়া উঠিলেন,—

রাগ করে নয়, তোমার মনের কথা আমি শুন্‌তে চাই ঠিক বলো।

শিবানী হাত সরাইয়া লইল না, সে সেই স্থির দৃষ্টি উন্নত করিয়া স্বামীর মুখে স্থাপন করিল।

"কি শুন্‌তে চাও" ?

"তুমি আমায় ঘৃণা কর কি না ?"

"করি।"

নীরদ শিবানীর হাত ছাড়িয়া দিলেন। পাথরের পুতুলের মুখে যেমন ভাব বদল হয় না তেমনি অপরিবর্ত্তিত ভাবে শিবানী দৃষ্টি ফিরাইয়া অন্ধকারমুক্ত গোলাপী আলোকো-ভাসিত যমুনার দিকে চাহিয়া রহিল।

শিবানী ! আজ থেকে মনে করো তুমি বিধবা; আজ থেকে তোমাদের সব জালা যন্ত্রণার অবসান হয়ে যাক্। আমি একবার মরেছিলেম, এ আবার আমার দ্বিতীয় মৃত্যু ! অনেক সহ্য করেছি, আর না।"

নীরদ কুমার ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন তাঁহার চাদরখানা শুদ্ধ ভূমে পড়িয়া রহিল, উঠাইয়া লইলেন না। শিবানী পূর্ব্বের মত বসিয়া রহিল তাহার পাথরের মত কঠিন মুখে একটিও রেখা পড়িল না।

নীরদ বাটী হইতে বাহির হইয়া গেল দেখিয়া সিদ্ধেশ্বরী বকিতে বকিতে উপরে উঠিয়া আসিলেন।" "শিবি ! ও শিবি ! আবার এখনই গেল কোথা ?" শিবানী উত্তর দিল না। "সকাল সকাল মুখ হাত ধুয়ে দুটো খেয়ে গেলেই হতো, এর দোরে ওর দোরে টোক্‌লা সেধে বেড়াতেই তো ভাল লাগে। বাড়ীর ভাত বেন্নুন তো ভাল লাগে না। তা বারণও ত কল্লিনি ?

শিবানী এবার তাহার গম্ভীর মুখ ফিরাইল। ফাঁসির আসামী যেমন করিয়া নিজের বিচারক জজের পানে তাকায় তেমনি করিয়া মায়ের দিকে চাহিয়া বলিল "না।"

"ধন্যি মেয়ে তুমি বাছা ! কেমনি বা শ্রদ্ধা ভক্তি আর কেমনি বা মায়ামমতা তা কিছু বুঝ্‌তে পারিনে। ঢের ঢের মেয়ে দেখেছি বাবা এমন মেয়ে আমার বাপের জন্মে দেখিনি ! মরুকগে যা খুসী সব করগে; আমার কি ?" বলিতে বলিতে গৃহিণী নামিয়া গিয়া সংবাদটী মিতিন ও মাতঙ্গিনী ঠাকুরাণীর কর্ণগোচর করিবার লোভে সকাল সকাল অঙ্গে তৈল মর্দ্দন করিতে আরম্ভ করিয়া দিলেন।

ক্রমশ

প্রতীক্ষা।

আছে ওগো আছে !
যা' আছে তা' লুকিয়ে আছে
আমার হিয়ার কাছে !
ইচ্ছে করে বাহির করে'
চাইতে মুখের পানে ;
নয়ন দু'টি করতে কাজল
সোহাগ তুলির টানে ;
গুন্‌গুনিয়ে মনের ব্যথা
শোনাতে তার কাণে।
পারি না যে—সে কয় কেঁদে
সদাই আমার প্রাণে
আছে ওগো আছে !
যা' আছে তা' লুকিয়ে আছে
আমার হিয়ার কাছে !
বধূরে মোর আনতে যে চাই
ভিতর হ'তে কাড়ি',
শাঁক বাজিয়ে করবে বরণ
যতেক পুরনারী';
কইব কত গোপন কথা
মনের কথা তারই।
হায় রে সে কয় করুণ সুরে
মুছে নয়ন বারি,
আছি ওগো আছি !
কইব কথা এম্‌নি রব
হিয়ার কাছাকাছি !
জনশূন্য পথে যখন
বাহির হ'লেম সাঁঝে,
বনের ধারে জোনাক-জ্বালা
ঝিঁঝি ডাকার মাঝে ;
সাঁঝের সুরটি ফুটলো যখন
তারার মোহন সাজে,
আমার হিয়ার তন্ত্রি তখন
গুম্‌রে গুম্‌রে বাজে
আছে ওগো আছে !
বিরহের গান গাচ্ছে বসে
তোমার হিয়ার কাছে !
বধূ আমার লুকিয়ে আছে
গোপন হৃদয়পুরে ;
কেমন করে নাম্‌বো সেথা,
সে যে অনেক দূরে !
খুঁজে আমি পাইনা তারে
মরছি মিছে ঘুরে !
শুন্‌ব কবে বাজ্‌বে যবে
বীণা মিলন সুরে,
আছি ওগো আছি !
আমার কণ্ঠে দাও পরা'য়ে
তোমার মালা গাছি !

শ্রীদীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সঙ্কুচিতা।

না, না, সখি, সুধায়োনা কারে ভালবাসি,
মরমে লুকানো থাক্ মরমের বাণী,
ইষ্টমন্ত্র সম তাহা স্মরি এ হৃদয়ে,—
সে মন্ত্র যে প্রকাশিতে মানা আছে শুনি !
কাননে কুসুম কত রয়েছে ফুটিয়া,
কিন্তু হোথা আকাশের নক্ষত্রের পানে

কোন্ 'তারা'টি যে তার উপান্ত জীবনে !
'তারা'ও বোঝেনা তাহা ; ঝরে যায় যূথি ;
ক্ষুদ্র হৃদয়ের তার ক্ষুদ্র সুখদুখ
অসীম রহস্যসম রহে চিরদিন !
আমিও তাহারি মত খুলিব না বুক।
কেহ না জানিবে মোর অন্তরের ব্যথা,

তিনটি কুসুম।

১

কাঁটা-বনে প্রভাত রৌদ্র হাসিতেছে। কাঁটা-গাছের মাঝে মাঝে গোলাপ, জবা, স্থল-পদ্ম প্রভৃতি ফুটিতেছে, ঝরিতেছে, শুখাইতেছে। বটবৃক্ষে বহু কাক বসিয়া কোন বড় লোকের বাড়ীর কোলাহলের ন্যায় গোলমাল করিতেছে।

অদূরে সুন্দর সরোবর। প্রভাতবায়ুতে তাহার নীলজল মৃদু মৃদু তরঙ্গ তুলিয়া নাচি-তেছে। সেই সরসীতে একটি সদ্য প্রস্ফুটিত কমল। স্বচ্ছ জলের উপর মৃদু তরঙ্গ তাহাকে লইয়া ক্রীড়া করিতেছে—কখন নব-লাজে রঞ্জিত নবযুবতীর গণ্ডের মত রক্তদলে চুম্বন করিয়া পলাইতেছে, কমল সোহাগে নাচিয়া উঠিতেছে। প্রফুল্ল কমলের সৌন্দর্য্যে সরোবর-হৃদয় আলোকিত হইতেছে। সেই আলোকে বিশ্বপ্রকৃতি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতেছে।

কানন মধ্যে একটি উন্নত 'সূর্য্যমুখী'। প্রস্ফুটিত হইয়া অবধি সে সূর্য্যের দিকে চাহিয়া আছে। সূর্য্য যেমন আকাশে উঠিতেছে, সূর্য্যমুখীও আপন নয়ন সঙ্গে সঙ্গে ফিরাইতেছে। তাহার সূর্য্যই সর্ব্বস্ব—জগতে আর কিছুর আবশ্যক আছে সে বুঝিতে চাহে না।

ক্ষুদ্র বৃক্ষে, লোক চক্ষুর অন্তরালে একটি 'কুন্দ' কুসুম বর্দ্ধিত হইতেছে।

২

ক্রমে প্রদোষ আসিল। সূর্য্য হইতে নয়ন ফিরাইয়া সূর্য্যমুখী জগৎ অন্ধকার দেখিতেছে। অস্তগতপ্রাণ পতিকে দেখিয়া খণ্ডিতা নায়িকার মত সে মৃত-কল্প হইয়াছে।

সরোবর তীরস্থ যূথি, মল্লিকা মালতী স্ফুটনোন্মুখ হইয়া উঠিল। সেই কুন্দ কুসুমটিও আসন্ন সম্পূর্ণতায় বালিকার প্রথম যৌবন-সঞ্চারের অব্যবহিত পূর্ব্বের মাধুর্য্যে ও সরলতায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। নিশীথ বায়ু নক্ষত্র খচিত আকাশতলে, নক্ষত্র প্রতিফলিত সরো-বরস্থ ইন্দীবর-কোরককে ঈষন্মাত্র বিধূত করিয়া কুন্দকুসুমকে প্রস্ফুটিত করিতে আসিল। তাহার প্রেমস্পর্শে কুন্দ শিহরিয়া উঠিল। বায়ুর অপরিমিত প্রেমপূর্ণ আহ্বানে অপরিস্ফুট প্রেমবাণী, নবপরিণীতা বালিকাবধূর ন্যায়, সেই অমল কোমল ক্ষুদ্র ও সৌরভ নির্ম্মিত কুন্দ, ঈপ্সিত স্পর্শহিল্লোলে তাহার পুষ্পভারাবনত শাখা মৃদু দোলাইয়া যেন লজ্জাবনত মুখে ঘাড় নাড়িয়া কেবল বলিল 'না'। তখন বায়ু সহস্র মুখে কত কথা বলিতে লাগিল, কুন্দ কেবল বলিল 'না'। বায়ু সুশীতল পুষ্করিণী বৃক্ষের ছায়া কাঁপাইয়া তাহার মধ্যে শয়ন করিল।

৩

রাত্রি গভীর। পৃথিবী স্তব্ধ। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। অমল-ধবল যূথিকা-রাজি কল-হাস্যে দিক্ আমোদিত করিতেছে। শুধু কমল এখন মুদিত—সূর্য্যমুখী আঁধারে আবৃত, কুন্দ সবেমাত্র ফুটিয়াছে—এখনও সে অতৃপ্ত।

৪

ঝড় উঠিল। প্রথমে শব্দ, পরে ধূলি পরে গাছের পাতা ছিঁড়িয়া বায়ু স্বয়ং আসিল। শেষে বৃষ্টি। সরোবরের কমলকে তোলপাড় করিল। সূর্য্যমুখী মুমূর্ষু। কুন্দ এখন

বড় মুখরা—সে আপনার সমস্ত হৃদয় খুলিয়া দিয়াছে, আর যে সে সময় পাইবে না।

৫

প্রভাতে আকাশ আবার পরিষ্কার হইল। কমল হাসিল। সূর্য্যমুখীর হৃদয় আবার আলোকিত হইল। গত রাত্রের বৃষ্টি বিন্দু তাহার আননে স্নেহ অশ্রুর মত শোভা পাইতে লাগিল, কাঁটা-বন আবার আনন্দে পুরিয়া উঠিল। কিন্তু তখন সেই অপরিস্ফুট কুন্দ-কুসুম, বায়ুতে একটু সৌরভ রাখিয়া অসময়ে ঝরিয়া পড়িয়াছে।

শ্রীধীরেন্দ্রকৃষ্ণ বসু।

হাফেজ।

(১)

মধুবার সথে কর অবধান,
আপানে করহ পান সন্ধান ;
সুসাধ্য ভাবিনু প্রথমে পীরিতি
এবে প্রেম বাধা উঠে নিতি নিতি।

(২)

রজনী অন্তে খসাবে বাতাস
কস্তুর ঘন সে কুন্তল সুবাস ;
এ আশার আশে প্রেমাহত মন
কি শোণিতধারা করে বিসর্জ্জন।

(৩)

প্রেমাগ্নিহোত্রী গুরু যদি কন
রঞ্জ রাগ রসে হৃদয় আসন
তীর্থকৃৎ তিনি বিদিত সন্ধান
প্রেমতীর্থ পথে কি মত বিধান।

(৪)

পিয়ার এ ভুবন পান্থ নিবাসে
কেমনে আরামে রহিব উল্লাসে
ধ্বনিছে ঘণ্টা যবে অহরহ
এল কাল এল ভার বাঁধি লহ।

(৫)

এ ঘোর নিশায় ভীষণ তরঙ্গে
এ করাল কাল আবর্ত্ত ভঙ্গে
পারগত যারা অতি লঘুভার
কি জানিবে তারা কি দশা আমার।

(৬)

স্বমতে চলিয়া হায় অনুকামী
দুর্ণামভাজন হইলাম আমি ;
গুঢ় প্রেম কভু গুপ্ত রহে আর
ঘরে পরে যদি হইল প্রচার।

(৭)

সে রাজরাজের শুভ দরশনে বাঞ্ছা রাখিস যদি,
রে হাফেজ তবে তাঁহারে ভুলিয়া থাকিওনা ক্ষণবধি।
ভেটিতে যখন যাবে ওরে মন সেই প্রিয়তম প্রভু,
দূরে পরিহার করিবে সংসার দ্বিধা রাখিবে না কভু।

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

নববর্ষে পুরাতন হিসাব।

আজ নববর্ষের প্রথম প্রভাতে আমরা নূতন ও পুরাতনের সন্ধিস্থলে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি। এরূপ স্থলে নূতনকে আবাহন করিবার জন্য একটা আন্তরিক আকুলতা আমাদের স্বাভাবিক। কিন্তু নূতনের প্রতি এ পক্ষপাতিতার কারণ কি। কেবল আশা! সে আমাদের এখনো কিছু দেয় নাই! কিন্তু এতদিন সুখে দুঃখে যে বার মাস আমাদের সঙ্গী ছিল, যে তাহার অন্তরের সর্ব্বস্ব বিলাইয়া দিয়া আজ নিঃস্বের মত নীরবে বিদায় লইল, সে নূতন নহে, সে পুরাতন। অতএব আজ এই অনন্তকালের খণ্ড সীমার মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া সর্ব্বাগ্রে সেই পুরাতন বর্ষের পরিচয় গ্রহণ করাই আমাদের প্রথম কর্ত্তব্য। কিন্তু পরিচয় গ্রহণ করা কাজটা খুব সহজ নহে। বাহিরের বস্তুকে বাহির হইতে দেখিলে তাহার যথার্থ পরিচয় পাওয়া কঠিন। তাহাকে অন্তরের দিক দিয়া পাইলেই তবে তাহার সহিত আমাদের প্রকৃত পরিচয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এইজন্য বাহিরের সহিত অন্তরের এই ঘাত প্রতিঘাতের স্পন্দনের মধ্য হইতে উভয়ের মিলন-স্থানটি আমাদের সন্ধান করিয়া লইতে হইবে।

বাহিরের দিক দিয়া দেখিলে গতবর্ষকে দেশের পক্ষে দুর্ব্বৎসর বলা ভিন্ন উপায় নাই। দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষ ও মহামারী ত আমাদের চিরসঙ্গী হইয়াই দাঁড়াইয়াছে। তাহার উপর মুষ্টিমেয় প্রজার বিদ্রোহিতাচরণের ফলে রাজপক্ষের বজ্রশাসনে সমগ্র দেশ প্রপীড়িত। সবল ও দুর্ব্বল উভয়েই অশান্ত হইয়া উঠিলে দুর্ব্বলের অদৃষ্টে যাহা ঘটিয়া থাকে, আমাদেরও গত বৎসর তাহাই ঘটিয়াছে। কত সংবাদপত্রের সম্পাদক, কত বক্তা লেখক ও গায়ক, কত বৃদ্ধ, যুবা ও বালক যে কারাগারে লৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধ হইল তাহা গণনা করা কঠিন। রাজপক্ষ সর্ব্বস্থলেই রাজদ্রোহের বিভীষিকা দর্শন করিয়াছেন। ফলে দেশের কত নির্দ্দোষ গৃহস্থের গৃহে যে শান্তিরক্ষক শাসনাবতার লালপাগড়ির দল আসিয়া উৎখাত করিল তাহার ইয়ত্তা নাই। গোয়েন্দার অনুসরণ, পুলিসের কৃপাদর্শন হইতে নিরীহ ব্যক্তিরও পরিত্রাণ পাওয়া কেবল তাহার পক্ষে নহে, তাহার পিতৃ-পুরুষেরও সৌভাগ্যের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সন্দেহ হইলেই আর কথা নাই—তৎক্ষণাৎ হাজত। মেদিনীপুরের নিরীহ রাজাটি হইতে সামান্য প্রজাটি পর্য্যন্ত এবং ভট্টপল্লিনিবাসী পঞ্চানন তর্কালঙ্কার প্রমুখ নির্ব্বিবাদী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগুলিও এই অকারণ পীড়ন হইতে রক্ষা পান নাই।

বঙ্গদেশ হইতে সিন্ধুদেশ, কাশ্মীর হইতে কুমারিকা, পর্য্যন্ত এই একই ইতিহাস। রাজদ্রোহের অপরাধে আলিপুরে অরবিন্দ ও অন্যান্য প্রায় পঞ্চাশটি যুবা আজ প্রায় এক বৎসর বন্দী ও বিচারাধীন। চিদাম্বরম পিলে নির্ব্বাসিত, তিলক কারারুদ্ধ, অশ্বিনীকুমার, কৃষ্ণকুমার, সুবোধচন্দ্র ইত্যাদি নয়জন বঙ্গবাসী বিনা অভিযোগে ও বিচারে প্রবাসের কারাগারে অবরুদ্ধ। দেশের সম্বাদপত্র সকল রাজাদেশে ত্রস্ত ও লুপ্ত। দেশের নিঃস্বার্থ সেবারত সমিতিগুলি রাজকোপে দগ্ধ। একদিকে রাজপক্ষে অবিশ্বাস, অনুসন্ধান ও কঠোর শাসন, অপর দিকে প্রজাপক্ষে অশান্তি, অসন্তোষ ও আর্ত্তনাদ।

এই ত গেল রাজা ও প্রজার মধ্যে সম্বন্ধ। তাহার পর নিজেদের মধ্যে গৃহবিবাদেরও অভাব নাই। কয়বৎসর পূর্ব্বে ১৬ অক্টোবরে প্রথম পার্টিসনের দিনে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে ভ্রাতৃভাব জাগ্রত হইয়া দেশে নবআশা সঞ্চার করিয়াছিল। কিন্তু সেই ভ্রাতৃভাব বদ্ধমূল হওয়া দূরে থাক, ক্রমশ এখন উভয়ের মধ্যে একটা বিদ্বেষ ও অবিশ্বাসের ভাবই প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। তাহার উপর আবার চিত্রগুপ্তের হিসাব নিকাশ আছে। স্বাধীনচেতা মহারাজ অমরসিংহ, স্বদেশসেবী মহারাজা সূর্য্যকান্ত আজ মৃত। নবীনচন্দ্রের অমরবাণী আজ চিরদিনের মত নীরব। সাহিত্য সেবায় সর্ব্বত্যাগী যোগেন্দ্রনাথ এবং লব্ধপ্রতিষ্ঠ সম্পাদক নগেন্দ্রনাথ ঘোষ আজ পরলোকগত। সর্ব্বোপরি আমাদের

সহৃদয় স্বদেশভক্ত স্বাধীন ত্রিপুরাধিপতি আজ ইহলোক হইতে অন্তর্হিত।

দুর্ঘটনার তালিকা আরও অনেক দীর্ঘ করা যাইত, কিন্তু গুরুত্বের হিসাবে কেবল এইগুলিই যথেষ্ট বলিয়া এইখানেই শেষ করিলাম। এই ত গেল ক্ষতির হিসাব—এখন গতবর্ষে লাভ পাইলাম কি? প্রথম মিণ্টো ও মর্লির শাসন সংস্কার প্রস্তাব এবং দ্বিতীয় বড়লাটের মন্ত্রণাসভায় অনারেবল এস পি সিংহের নিয়োগ। কালের প্রবাহে দুর্দ্দিনের ও দুর্ঘটনার ক্ষতিচিহ্ন যখন মুছিয়া যাইবে, তখন ইংরাজের এই উদার কীর্ত্তির জন্য বিগত বর্ষ আমাদের স্মরণীয় রহিবে। এইজন্য লর্ড মর্লি এবং লর্ড মিণ্টো উভয়েই সমগ্র ভারতবাসীর কৃতজ্ঞতা ভাজন।

আর একটি আমাদের মহা লাভ,—বৃটিশ পার্লামেণ্টে ভারতের প্রতি সহানুভূতি জাগরণ। আগে পার্লামেণ্টের দুএকজন মেম্বর মাত্র ভারত-প্রসঙ্গে মনোযোগ দান করিতেন; এবার কৃষ্ণকুমার প্রমুখ নয়জন বঙ্গবাসীর অকারণ নির্ব্বাসনে, পার্লামেণ্টের উন্নতিশীল সভ্যগণ অনেকেই এই কার্য্যের প্রতিবাদ আরম্ভ করিয়াছেন।

ইহাই হইল বিগত বর্ষের বাহ্যিক লাভ লোকসানের ইতিহাস। কিন্তু এতগুলি শুভাশুভ ঘটনা, এত গুলি ব্যাঘাত ও বিপদ আমাদিগের মর্ম্ম মধ্যে কি চিহ্ন অঙ্কিত রাখিয়া গেল? আমাদিগের জাতির মধ্যে কোন সম্পদ দান করিয়া গেল? তিন বৎসর পূর্ব্বের ও আজিকার বাঙ্গালীতে কি কিছু প্রভেদ হয় নাই? আজিও বাঙ্গালীর কি সেই ভীরুতা, সঙ্কীর্ণতা, স্বার্থপরতা পরভিক্ষাপ্রবণতা আছে? আজ বেদনার আঘাতে, প্রবলের সহিত সংঘাতে কি বাঙ্গালী পূর্ব্বাপেক্ষা সাহসী, উদার, আত্মত্যাগী ও আত্মনির্ভরশীল হয় নাই? আজ তাহার মর্ম্মমধ্যে সে যে এক নবজীবন স্পন্দন অনুভব করিতেছে তাহা তাহার শিক্ষা, সাহিত্য, শিল্প ও সাধনার মধ্যে বহুমুখী চেষ্টা ও চাঞ্চল্যে পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে। আজ তিন বৎসর মাত্র এই পরমুখাপেক্ষী জাতির মধ্যে স্বতন্ত্র জাতীয় শিক্ষার সূচনা হইয়াছে; যদিও এখনও তাহাকে যথার্থভাবে জাতীয় বস্তু নামে অভিহিত করা যায় না—তথাপি এই অল্প সময়ের মধ্যে বাঙ্গালীর মধ্যে যে এক নূতন আলোক ও আদর্শ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, ধনীলোকের দেশানুরাগ দেশের কর্ম্মে দান যে কতদূর বৃদ্ধি পাইয়াছে,—বালকদিগের স্বাধীন বুদ্ধি, চিন্তা ও কর্ম্মশক্তি যে কতদূর বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে আমাদের জাতীয় বিদ্যালয়গুলিই তাহার জ্বলন্ত প্রমাণ।

আমাদের দেশের অর্থবানগণ গভর্ণমেণ্টের তাড়না এবং উপাধির লোভে ব্যতীত এতদিন দেশহিতকর অনুষ্ঠানে সহজে দান করিতে জানিতেন না, এমন কি কেহ নিঃসন্তান হইলেও তিনি পোষ্যপুত্রগ্রহণে নিজনাম রক্ষা করিবেন সেও স্বীকার তথাপি দেশের কার্য্যে সম্পত্তি দান করিয়া আপনাকে ধন্য মনে করিতে শিখেন নাই। আজ স্বদেশবৎসল জমীদার শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর চৌধুরী জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপন জন্য ৫ লক্ষ মুদ্রা দানে বাঙ্গালীর এ কলঙ্ক দূর করিয়া দেশপূজ্য হইয়াছেন—এবং স্বনামখ্যাত ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত তারকনাথ পালিত মহোদয় বঙ্গীয় শিল্পবিদ্যালয় (Technical Institute) প্রতিষ্ঠা করিয়া, আমাদিগের অন্তরে অমর আসন অধিকার করিয়াছেন। তিনি তাঁহার কষ্টোপার্জ্জিত প্রায় সমস্ত সম্পত্তিই এই শিল্প বিদ্যালয়ের উন্নতিকল্পে তাঁহার 'উইলে' দান করিয়াছেন। স্বজাতির মঙ্গলের জন্য এরূপ সুমহৎ স্বার্থত্যাগ কেবল বাঙালী সমাজে নহে মানবসমাজের ইতিহাসেও বিরল। ইহার পর জাতীয় শিল্পসমিতি। দেশকল্যাণরত শ্রদ্ধাস্পদ যোগেন্দ্রনাথ ঘোষের যত্নে এবং সাধারণের সমবেত সাহায্যের উপর নির্ভর করিয়া ইহা প্রতিবৎসর প্রায় একশত সংখ্যক দেশের শিক্ষিত যুবাকে সভ্যজগতের শিল্প ও বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য ইয়ুরোপ, আমেরিকা ও জাপানে প্রেরণ করিতেছে। এই সকল যুবা বিজ্ঞানে শিক্ষালাভ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে যে

এই পতিত দেশের শিল্পশ্রী আবার সমুন্নত হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আজ যাহারা মসিজীবী একদিন তাহাদিগেরই পিতৃপুরুষের শিল্প প্রতিভা দেখিয়া মানবসমাজ মুগ্ধ হইত। এতদিনের পীড়নে ও পরাধীনতাতেও তাঁহাদিগের সন্ততিগণ যে আজিও সেই পুরাতন প্রতিভা সম্পূর্ণরূপে হারায় নাই এই প্রতিকূল অবস্থাতেও তাহার যথেষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান।

প্রবলের নিকট দুর্ব্বল যখন মর্ম্মে ব্যথা পায় তখন তাহার অভিমান করা ভিন্ন আত্মসম্মানরক্ষার আর অন্য উপায় নাই। এই অভিমানেই আমাদের শিল্পোন্নতির সূচনা। কিন্তু সেই সূচনা হইতে আজ স্বদেশী মন্ত্র ও সাধনা হিমালয়ের পাদমূল হইতে সাগরের উপকূল পর্য্যন্ত সমগ্র জাতির অন্তরকে আশ্চর্য্যরূপে অধিকার করিয়াছে। আজ আর বস্ত্র হইতে বোতামটি পর্য্যন্ত নিত্যব্যবহার্য্য বস্তুর জন্য বিদেশীর নিকট হাত পাতিয়া দীননয়নে চাহিয়া থাকিতে হয় না। একদিন শিল্প গৌরবে জগতে ভারতবর্ষ শ্রেষ্ঠভূমি ছিল। এই জাগরণের ফলে আবার একদিন ভারতবাসী যে তাহার লুপ্তগৌরব পুনরুদ্ধারে সক্ষম হইবে তাহার আশা করা বোধ হয় অসঙ্গত নহে। স্বদেশী আন্দোলনের ফলে দেশীয় শিল্পের যে কতদূর উন্নতি হইয়াছে তাহার সকল প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া বুঝাইতে হইলে, কাজটা বড়ই বৃহৎ হইয়া পড়ে। নিত্যব্যবহার্য্য প্রায় সকল বস্তুই ত এখন আমাদের স্বদেশে প্রস্তুত হইতেছে। গত তিন বৎসরের মধ্যে বোম্বাই প্রদেশের নিকট বঙ্গদেশ প্রথম বৎসর ৫৬ লক্ষ, দ্বিতীয় বৎসর ৬২ লক্ষ, ও তৃতীয় বৎসর ১৬২ লক্ষ টাকার বস্ত্র ক্রয় করিয়াছে। তদ্ভিন্ন বঙ্গদেশের তন্তুবায়গণ স্বদেশী বস্ত্রে ত' দেশ ছাইয়া ফেলিয়াছে। এবং এখানে এক ক্রোড় পঁচিশ লক্ষ টাকা মূলধনের স্বদেশী বস্ত্রের কল খোলা হইয়াছে। বিলাতি বস্ত্রের আমদানিও সেই পরিমাণে কমিয়া গিয়াছে। গত বৎসরের সাত মাসে তৎপূর্ব্ববৎসরের অপেক্ষা তিন কোটী পঞ্চাশ লক্ষ টাকার অধিক মূল্যের বিলাতী বস্ত্রের আমদানি কমিয়া গিয়াছে। স্বদেশী শিল্পের উন্নতি অর্থে যে জাতীয় সম্পদ্‌বৃদ্ধি তাহা বলাই বাহুল্য।

শিল্পের সহিত বিজ্ঞানের অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ। একের উন্নতির উপর অন্যের উন্নতি নির্ভর না করিয়া থাকিতে পারে না। বিজ্ঞানপ্রতিভায় অধ্যাপক জগদীশ বসু এবং প্রফুল্লচন্দ্র রায় কেবল বঙ্গের গৌরব নহেন—জগৎগৌরব। কিন্তু এখনও দেশে অনেক অজ্ঞাত ও অশিক্ষিত ব্যক্তি আছে—যাহাদিগের স্বাভাবিক শিল্প বিজ্ঞান প্রতিভা দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। সংবাদপত্রে দেখিতে পাই শিক্ষা ও আয়োজনের অভাবসত্ত্বেও কেহ পিস্তল, কেহ দূরবীক্ষণ যন্ত্র, কেহ টেলিগ্রাফের কল এরূপ নির্দ্দোষ ও সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরভাবে নির্ম্মাণ করিতেছেন যে শিল্পিগণও তাঁহাদিগের বুদ্ধির প্রশংসা করিয়াছেন। জাতীয় শিল্পের উন্নতিচেষ্টা যে কেবল পুরুষেরই মধ্যে সীমাবদ্ধ হইয়া শেষ হইয়াছে তাহা নহে। দেশের মহিলাগণও এই জাতীয় কর্ম্মে যোগ দান করিয়াছেন। বিধবা দরিদ্রকন্যাগণ যাহাতে শিল্পশিক্ষা করিয়া স্বাধীন জীবিকা অর্জ্জন করিতে সক্ষম হন, এই মহৎ উদ্দেশ্যে কলিকাতায় একটি মহিলা শিল্পসমিতি স্থাপিত হইয়াছে। জাতীয় উন্নতি অর্থে কেবল পুরুষের উন্নতি নহে, রমণীরও সমোন্নতি আবশ্যক।

তাহার পর জাতীয় চিকিৎসা বিদ্যালয় আমাদের ন্যায় দরিদ্র দেশে এই অনুষ্ঠানের উপকারিতা বিশদভাবে বলা অনাবশ্যক। দেশের কৃতবিদ্য চিকিৎসকগণ এই বিদ্যালয়টিকে উন্নত করিয়া তুলিবার জন্য অকাতরে স্বার্থত্যাগ করিয়া ইহার সেবা করিতেছেন।

সর্ব্বশেষে জাতীয় সাহিত্য। সাহিত্যের অন্তর মধ্যেও এই জাতীয় জাগরণের স্পন্দন আমরা বেশ স্পষ্টভাবে দেখিতে পাই। আজকালের সাহিত্যের মধ্যে আমরা আর সে হা হতোস্মি, সে কথার হেঁয়ালি, সে ভাবের খেয়াল দেখিতে পাই না। এখন যাহা কিছু প্রকাশ হয় বেশ স্পষ্ট, সংযত, পরিপুষ্ট ও আত্মসম্মানযুক্ত। সাহিত্যে বাঙ্গালীর আত্মদর্শন ও সাধনার চেষ্টা আরম্ভ

হইয়াছে,—বিধাতার যে বাণী তাহার বক্ষে আসিয়া আঘাত করিয়াছে, তাহারই ক্ষীণ প্রতিধ্বনি তাঁহার চতুর্দ্দিকে আজ ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে। অতএব পুরাতন বৎসরের হিসাব নিকাশে ক্ষতির অপেক্ষা লাভের পরিমাণই আমরা অধিক দেখিতেছি।

সমালোচনা।

Elements of Practical and Scientific Agriculture. Jadunath Sirkar, College of Agricnlture Imperial University. Japan Methodist Publishing House 1908. শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকারের নাম ভারতীর পাঠকের নিকট অজ্ঞাত নহে। তিনি জাপানে থাকিয়া জাপানসম্বন্ধীয় কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন তাহা সাধারণের হৃদয়-গ্রাহী হইয়াছিল। বর্ত্তমান পুস্তকখানি বেশ সরল ইংরাজীতে লিখিত। গ্রন্থকার ভূমি, সার, শাকসব্জী, শস্যাদি ও সাধারণ কৃষি প্রভৃতির সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছেন। যিনি এ বিষয়ে অভিজ্ঞ নহেন তিনি ইহা পাঠ করিয়া বিশেষ জ্ঞান লাভ করিবেন। বৈজ্ঞানিক কৃষিসম্বন্ধে আমাদিগের সাধারণ পাঠকের বোধ হয় বিশেষ কোন ধারণা নাই; আমেরিকায় বৈজ্ঞানিক কৃষি বা নবকৃষির (neo-agriculture) প্রবর্ত্তনে উষরভূমে সোণা ফলাইতেছে; জাপানে মিশিয়া মনসা হইতে পশুজাতির জন্য এমন বীর্য্যকর সুখাদ্য প্রস্তুত হইতেছে যে তাহা শুনিলে বিস্মিত হইতে হয়। ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ। এখানে যদি আবার লক্ষ্মীর প্রতিষ্ঠা করিতে হয় তাহা হইলে কৃষির উন্নতির দ্বারাই হইবে। যদুনাথ বাবুর গ্রন্থখানির উপকারিতা সম্বন্ধে আমাদিগের বিন্দু-মাত্র সন্দেহ নাই। গ্রন্থকার টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষিবিদ্যায় প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন সুতরাং তাঁহার কথাগুলির সারবত্তা আছে। পরিশেষে আমাদের বক্তব্য, গ্রন্থকার যদি গ্রন্থখানির বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেন তাহা হইলে শুধু যে বাঙ্গলা সাহিত্যের উপকার হয় এমন নহে, গ্রন্থখানি ইংরাজী অনভিজ্ঞ কৃষি-অনুরাগী বাঙ্গালীরও বিশেষ উপকারে লাগে।

অঞ্জলি (গীতিকাব্য)।—শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত প্রণীত। কলিকাতা, ৩৬নং বনমালী সরকারের ষ্ট্রীট, কমলা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস হইতে প্রকাশিত ১৩১৪। মূল্য বার আনা মাত্র। এই কবিতাগ্রন্থখানি যদিও লেখকের প্রথম উদ্যম; তথাপি অধিকাংশ কবিতাতেই কবিত্বের আভাষ পাইলাম। এবং "জননী জন্মভূমি" ও "জাতীয় লক্ষ্মী" এই কবিতা দুইটিতে কবিপ্রতিভার সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। তবে লেখকের হাত এখনো বেশ পাকে নাই—ছন্দের সরল সহজ প্রবাহটুকু তিনি সর্ব্বত্র রক্ষা করিতে সক্ষম হন নাই। 'সু-অনিবার' 'সু-বিস্মিত' 'সু-বন্ধুর' প্রভৃতি 'চবৈতুহি'র আমরা কোনকালেই পক্ষপাতী নহি। দু'একস্থলে ভাষাও যেন আড়ষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। এই সকল ত্রুটির দিকে লক্ষ্য রাখিয়া লিখিলে, লেখক ভবিষ্যতে সুকবি হইবেন সন্দেহ নাই।

মাদুলী।—কবিতাপুস্তক। শ্রীশ্রীশগোবিন্দ সেন প্রণীত ও প্রকাশিত। কলিকাতা, ২৫নং রায়বাগান ষ্ট্রীট, ভারতমিহির যন্ত্রে সান্যাল এণ্ড কোম্পানি দ্বারা মুদ্রিত। মূল্য বার আনা। গ্রন্থখানির প্রারম্ভে ১৬ পৃষ্ঠাব্যাপী একটি ভূমিকা। প্রথমটা মনে হইয়াছিল এই 'ভূমিকা'ই বুঝি 'মাদুলী' ধারণের সূত্র। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে! এই ভূমিকাতে লেখক আচার্য্যের মূর্ত্তি ধরিয়া বেদীতে বসিয়া গিয়াছেন এবং এক নিশ্বাসে 'রূপগোস্বামী' 'লালাবাবু' 'বৈষ্ণবধর্ম্ম' 'অদ্বৈতবাদ' 'ত্রিগুণাত্মিকা শক্তি' 'ব্যোম' 'বেদ' 'ব্রহ্ম' 'গীতা' 'গেটে' 'লঙফেলো' সকলের উপর কলম চালাইয়াছেন! কিন্তু এই সাড়ম্বর ভূমিকা পাঠান্তেও পাঠক 'যে তিমিরে,

সে তিমিরে'। যিনি ১৬ পৃষ্ঠায় জ্ঞানের এমন ঝড় বহাইতে পারেন তাঁহার শক্তি অসাধারণ, সন্দেহ নাই। এক্ষণে যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন পুস্তকের বাকী ৩৬ পৃষ্ঠায় আছে কি? আমরা অসঙ্কোচে বলিতে পারি, রাবিশ! 'রাজা রামমোহন,' 'দানবীর বিদ্যাসাগর,' 'নরদেব ভূদেব' 'রাজর্ষি সত্যেন্দ্রনাথ' প্রভৃতি প্রাতঃস্মরণীয় মহাজনবর্গের নামে সনেট লিখিয়া অত্যাচার করিতেও লেখক ছাড়েন নাই। এই সকল ভক্তের হস্তে পড়িলে নিগ্রহের সীমা থাকে না। যাহা হউক আমাদের একটা কথা আছে। শ্রীশগোবিন্দবাবুর সময়ের মূল্য না থাকিতে পারে, কিন্তু সংসারী, বেচারী বাঙ্গালী পাঠকের সময়ের রীতিমত মূল্য আছে, এবং শ্রীশবাবু কি বাঙলা সাহিত্যক্ষেত্রটা 'আস্তাকুড়' ভাবিয়াছেন যে তাহাতে এইরূপ যথেচ্ছভাবে আবর্জ্জনা নিক্ষেপ করিবেন!

বনফুল।—শ্রীমতী প্রতিভাকুমারী দেবী প্রণীত। এলাহাবাদ, পাইওনিয়ার রোড, ইণ্ডিয়ান প্রেসে মুদ্রিত। এখানি কবিতা-গ্রন্থ। লেখিকা বালিকা এবং তাঁহার এই প্রথম উদ্যম। অধিকাংশ কবিতার ভাব ও ভাষা বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য সাময়িক কবির রচনা হইতে গৃহীত হইয়াছে। অবশ্য বালিকার নিকট হইতে আমরা তাঁহার স্বহৃদয়ের গুরুতর ভাবের আশাও করিতে পারি না তবে সেই সকল পুরাতন ভাবই যদি স্থলবিশেষে সংক্ষিপ্ত কিম্বা বর্দ্ধিত করিয়া ভিন্ন ছন্দে রচিত হইত তাহা হইলেই আমরা বিশেষ আনন্দলাভ করিতাম। যাহা হউক বালিকার সাহিত্যচর্চ্চায় আমাদিগের সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে এবং সর্ব্বান্তঃকরণে আমরা তাঁহার সাধনার সাফল্য কামনা করি। গ্রন্থখানিতে মূল্য লিখিত নাই, সুতরাং অনুমান করা যায় ইহা বিক্রয়ের জন্য নহে। গ্রন্থের ছাপা বাঁধাই প্রভৃতি বেশ চিত্তাকর্ষক হইয়াছে।

আদর্শ ভারত গৃহিণী। শ্রীমতী আমোদিনী ঘোষ প্রণীত। শ্রীগোপালদাস ঘোষ প্রকাশিত। ঢাকা, সূত্রাপুর রোড, ১৩১৫। ইহা একখানি প্রবন্ধ-পুস্তিকা। ভূমিকায় প্রকাশক মহাশয় লিখিয়াছেন, লেখিকা এই প্রবন্ধ লিখিয়া বঙ্গ মহিলাগণের রচনার নিমিত্ত বাবু ব্রজমোহনদত্তের নামে স্থাপিত পারিতোষিক প্রাপ্ত হইয়াছেন।' সুখের কথা সন্দেহ নাই। লেখিকার ভাষা সুন্দর হইয়াছে এবং তিনি অনেক প্রয়োজনীয় কথার অবতারণা করিয়াছেন। তবে উক্তিগুলি আরো যুক্তিতর্কের সাহায্যে পল্লবিত করিলেই প্রবন্ধটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইত। আশা করি লেখিকা দ্বিতীয় সংস্করণে আমাদের এ কথাটি রক্ষা করিবেন।

মানসী।—সচিত্র মাসিক পত্র ও সমালোচনী। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য দুইটাকা ছয় আনা। কার্য্যালয়, কলিকাতা, ২৫ চৌরঙ্গী; হাবড়া আপিস ১৫২ পঞ্চানন-তলা রোড। মানসীর প্রধান বিশেষত্ব দেখিলাম, "ইহার সম্পাদনভার কোন একজন বিশিষ্ট সম্পাদকের উপর প্রদত্ত হয় নাই। ইহা মাননীয় (!) সভ্যগণের অনুমত্যানুসারে চারিজন বিশিষ্ট সভ্যের উপর ন্যস্ত করা হইয়াছে" ইত্যাদি। তবে অনেক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট না হয়! বহুদিন হইতে বিজ্ঞাপনের ডঙ্কায় লেখকশ্রেণীর মধ্যে রবীন্দ্রবাবু, দ্বিজেন্দ্রবাবু প্রভৃতি মনস্বীগণের নাম নির্ঘোষিত হওয়ায় সকলেই একটা কিছুর প্রত্যাশা করিয়া বসিয়াছিল। কিন্তু 'সূচনা'তে দেখা গেল রবীন্দ্রবাবু বলিতেছেন—'মানসী'র সম্বন্ধে তিনি কিছুই জানেন না। তিনি শুধু 'দর্শকমাত্র' এবং তাঁহার 'নিকট হইতে স্বভাবতই কেহ কোনো দায়িত্বের প্রত্যাশা করিতে পারেন না!' সুতরাং তিনি শুধু 'একটি অবতরণিকার অবতারণা করিয়া'ই 'বিদায়গ্রহণ' করিবেন। 'মানসী' কিন্তু তথাপি রবীন্দ্রবাবুকে ছাড়িবে না!

তাহার পর মানসীর আত্মকথা—'ইহাদ্বারা নূতন লেখকের সৃষ্টি হইবে' অর্থাৎ যিনি যাহা লিখিবেন তাহাই ছাপা হইবে, 'এবং সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে কোথায় কি ধর্ম্ম, জ্ঞান, বিজ্ঞান, বুদ্ধি শিল্প সাহিত্য' আছে, "তাহার সংবাদ সহজ ও সরলভাবে স্বচ্ছ ভাষায় সাধারণমত করিয়া দিতে মানসী বিন্দুমাত্র আলস্য করিবে না।" তাহার পর 'ভাষার উন্নতি' প্রভৃতি ত আছেই! সুতরাং দেখা যাইতেছে, কিছুরই আর অভাব রহিল না।

আমাদের একটি ক্ষুদ্র নিবেদন আছে, মানসী যদি একটা Order-supply Department খুলিয়া বসেন, তাহা হইলেও সাধারণের অশেষ উপকার হয়।

এই সংখ্যায় শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ের "লক্ষ্মণ সেনের পলায়ন-কলঙ্ক" প্রবন্ধ খণ্ডশঃ প্রকাশিত হইয়াছে। অথচ এই প্রবন্ধই পৌষ সংখ্যা 'বঙ্গদর্শন' ও 'প্রবাসীতে' পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে। এ সংবাদটুকু কি 'মানসীর সেবকগণ' রাখিবার অবসর পান নাই? ইহার কারণ কি? এরূপ নির্লজ্জ আচরণ, কিছুতেই ক্ষমার্হ নহে। বর্ত্তমান সংখ্যায় তিনটি কবিতা, একটি ছোট গল্প, দুইটি সাহিত্যিক সন্দর্ভ একটি ভ্রমণকাহিনী—অর্থাৎ সেই 'থোড় বড়ি খাড়া' যাহা মান্ধাতার আমল হইতে মাসিক-পত্রিকার পৃষ্ঠে স্থান পাইয়া আসিতেছে, তাহাই—আছে! নবীন সহযোগী যদি কোন একটা বৈচিত্র্যের অবতারণা করিতে না পারিলেন, নবীন লেখকগণের চিন্তা ও ভাবের পরিচয় না দিলেন,—সেই পাঁচ সাতটি পুরাতন লেখককে লইয়াই টানাটানি করিলেন, তাহা হইলে তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্রে নামিবার কোনই সার্থকতা নাই! ইহার একটি বিষময় ফল লঘু ও তরল চিন্তার তরঙ্গে সাময়িক সাহিত্যের প্রতি উৎপীড়ন! 'মানসী' নূতন পথ আবিষ্কার করুন, জীর্ণ সাহিত্যসমাজ সংস্কৃত করুন, অকালপক্কতা ত্যাগ করিয়া সাধনার পথ প্রসারিত করুন তবেই মঙ্গল, নচেৎ অন্যান্য নবীন সহযোগী যেমন জলবুদ্বুদের মত উঠিল, ডুবিল, 'মানসী'ও তাঁহাদিগের সহিত সমাবস্থাপন্না হইবেন. এ কথা নিষ্ঠুর হইলেও যে সত্য তাহা সন্দেহ করিবার কারণ নাই।

Svaraj. Edited by Shrijut Bipin Chandra pal. A fortnightly organ of Indian Nationalism and of the General Philosophy of Nationalism as a necessary element in the Evolution of Universal Humanity. 1st March 1909. Vol. I. No. 1. Annual Subscription 9 shillings.

বিপিনবাবু কর্ত্তৃক সম্পাদিত এই পত্রিকাখানি বিলাত হইতে সম্প্রতি আমরা সমালোচনার্থ প্রাপ্ত হইয়াছি। আমরা এই প্রবাসী সহযোগীকে সাদরে আহ্বান করিতেছি। বিপিনবাবুর রাজনীতিক মত সম্বন্ধে এখানে গবর্ণমেণ্ট ও অনেকে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করিয়া থাকেন, এমন কি কেহ কেহ তাঁহার বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগও আনয়ন করেন। তাহার ভিত্তি কিরূপ অসার তাহা এই পত্রিকাখানি পাঠ করিলেই বুঝা যাইবে।

বিপিনবাবুর রাজনীতিক মতের সহিত সর্ব্বত্র আমাদিগের মতের মিল নাই। লর্ড মর্লির সংস্কার সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহার সহিত আমাদিগের কোন সহানুভূতি নাই;—তবে সকলেই আপনার স্বাধীন মত মুক্তকণ্ঠে ব্যক্ত করিবেন ইহাতে কাহার কি বলিবার আছে।

বিলাতপ্রবাসী ছাত্রগণের মধ্যে যাহাতে হৃদ্যতা একতা প্রভৃতি বর্দ্ধিত হয়, যাহাতে তাঁহারা জাতীয়তার চর্চ্চা করিয়া স্বদেশের কার্য্যে ব্রতী হয়েন, এ সম্বন্ধে বিপিনবাবু বিশেষ উদ্যোগ করিতেছেন। তাঁহার কামনা সফল হউক, ইহাই আমাদিগের ঐকান্তিক প্রার্থনা। এবং তাঁহার এই উদ্যোগ অধ্যবসায়ের জন্য তিনি স্বদেশের সকলের ধন্যবাদের পাত্র। স্থানাভাবে আমরা উল্লেখযোগ্য বিষয়াদির উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না; ভবিষ্যতে উদ্ধৃত করিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা।

"ফরাসী দেশের চিত্রশালা।"

যে চিত্রশালাটির কথা আজ লিখিতে যাইতেছি সেটি "মার্সেলের", প্যারী নগরের নহে। খুব বড় না হইলেও ইহাতে বিস্তর ফরাসী, ইতালীয় ও অন্যান্য চিত্র, এবং প্রস্তর এবং অন্যান্য নানা উপকরণে গঠিত বহুরূপ সুন্দর মূর্ত্তিও আছে।

যেদিন মার্সেলে নামি সেই দিনই "হোটেল কন্টিন্যান্টলে"র নিকট অবস্থিত এই স্থানটি দেখিতে যাই। একজন সুইস জাতীয় প্রদর্শক আমাদের সঙ্গে ছিল। সে অনেক প্রকার ভাষা জানে। আর সে দেশের প্রদর্শকেরা ভাল করিয়া দেখাইবার ও বুঝাইবার জন্য শিক্ষা এবং চাপরাস্ পায়।

সমৃদ্ধিশালী ও জনতাপূর্ণ সেই সহরের ভিতর দিয়া খানিকদূর যাইলেই একটি উচ্চ জমীর উপর "প্যানেডি লঙ চ্যাম্প" দেখা যায়। প্রকাণ্ড প্রাসাদটি অতি পরিপাটিরূপে গঠিত। ফরাসী দেশের সকল বাড়িগুলিরই এই গুণ। এই মিউজিয়মটির সম্মুখে একটি বড় হ্রদ।—বাটীটির উপর হইতে স্তূপাকার জলরাশি জলপ্রপাতের মত অনবরত তাহাতে আসিয়া পড়িতেছে। হ্রদটির ধারে ধারে ফুল গাছ। আর চারিদিকের মাঠ সবুজ ঘাস, ডেসি ও লিলি ফুলে ভরা। ঘাসের ভিতর ঝিঁঝিঁ পোকা ডাকিতেছিল, ফুলের মধ্য হইতে গন্ধ ছুটিতেছিল, আর এদিক ওদিকে সুন্দর ছোট প্রজাপতি উড়িতেছিল। ঠিক আমাদের এদেশের দৃশ্যের মত।

উপরকার যে স্থানটি হইতে জল পড়িতে-ছিল সেই উচ্চ স্থানটির দিকে চাহিয়া দেখি সেখানে অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর প্রস্তরমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। মধ্যে অবস্থিতা একটি রমণীমূর্ত্তির দুই পাশে আর দুইটি রমণী সখীরূপে দণ্ডায়-মানা। এই রমণীটিই ফরাসী দেশের সাধারণ তন্ত্রের প্রতিমূর্ত্তি। আর তাঁহার পার্শ্বস্থিত রমণীদ্বয়ের মধ্যে একটি "ন্যায়বিচার" ও অপরটি "দয়ার" প্রতিমূর্ত্তি। সম্মুখে দুইটি মাংসপেশী-বহুল নগ্নদেহ বীরপুরুষ অবস্থিত। একটির হাতে যুদ্ধের অস্ত্র শস্ত্র; অপরটির হাতে একখণ্ড কাগজ। অর্থাৎ ন্যায়, সাম্য, দয়া দাক্ষিণ্য, শৌর্য্য বীর্য্য ও সুনিয়ম সুশাসনের দ্বারা পরিবৃত হইয়া ফরাসী দেশের সাধারণ তন্ত্রের রাজ্যলক্ষ্মী সেই মন্দিরে বিরাজ করিতেছেন। তাঁহারই পদতল হইতে সেই বারিধারা সেই স্রোতের উৎস ছুটিয়াছে। ফরাসী জাতি সাধারণ তন্ত্রের বড়ই পক্ষপাতী। সাধারণ তন্ত্রের সমগ্র, সুব্যবস্থা একত্রে এইরূপে দেখাইয়া তাঁহারা সেই মূর্ত্তিকে দেবীর মত পূজা করেন।

এসব দেশে সরচাচর বাড়ীর সামনের দরজা বন্ধ থাকে। দরজা ঠেলিবামাত্রই একটি রমণী আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিল। আমরা মিউজিয়মটির ভিতর ঢুকিয়া নিম্নতলায় পৌঁছিলাম।

নিম্নতলাটি কেবল প্রস্তর ও ধাতুনির্ম্মিত সুন্দর সুন্দর প্রতিমূর্ত্তিপূর্ণ। তেমন সুন্দর ছবি তার পূর্ব্বে আর কোথাও কখনও দেখি নাই। সবগুলিই এত সুন্দর যে কোনটি ছাড়িয়া কোনটি দেখিব তা স্থির করা যায় না। অধিকাংশই নগ্ন স্ত্রীমূর্ত্তি। ইতালীয় ও ফরাসী দেশের ভাস্কর বিদ্যার ইহা প্রধান অঙ্গ।

দ্বারদেশের প্রথম মূর্ত্তিটি রাণী ক্লিও-"পেট্রা"র। সর্পাঘাতে জর্জ্জরিত হইয়া তাঁহার কোমল শ্যামতনু শিথিল হইয়া ভূতলে পড়িয়াছে। তাঁহার হাতে স্বর্ণবলয় গাছটিও ঠিক সাপের মত জড়ান। আর ভাবমাখা চোখ দুটিও অলস হইয়া পড়িয়াছে। আত্মঘাতিনী রাণীর চারিদিকে সখীরা শোকমগ্না।

ঠিক পাশেই কাঁটাগাছের মুকুট পরা এক মহাপুরুষের জ্যোতির্ম্ময় মস্তক শক্তিহীন হইয়া নত হইয়া পড়িয়াছে। একটি স্ত্রীরূপী স্বর্গীয় দূত আসিয়া স্ত্রীসুলভ একান্ত সহানুভূতিতে নতজানু হইয়া তাঁহার শিথিল মাথাটি তুলিয়া ধরিতেছিলেন। তলায় লেখা—

"Jeasus from the cross"

অর্থাৎ ক্রুশবিদ্ধ হইবার পর যিশু খ্রীষ্টের অবস্থা।

ইহার পাশে এক বিষম মহামারীর ছবি। ৭৩৫ সালে মার্সেল সহরে যে প্লেগ হয় এ তাহারই হৃদয় বিদারক দৃশ্য। অসংখ্য লোক নানাপ্রকার রোগযন্ত্রণায় মুখভঙ্গী-অবস্থায় মৃত, আর তাহাদের আত্মীয়গণ চতুর্দ্দিকে আর্ত্তনাদ-পরায়ণ।

পাশের ছবিখানি আবার নগ্ন রমণী-মূর্ত্তি। পরে পরে আরও অনেকগুলি ঐরূপ মূর্ত্তি। সবগুলিই সুন্দর ছবি।

একখানি "ডেফনীর" ছবি। আপেলোর সঙ্গে বনমধ্যে তাঁর জীবনে যে সকল রহস্য ঘটিয়াছিল এখানিতে তাহারই একটি ঘটনা অঙ্কিত।

ইহার পরে বাইবেলে উক্ত কুমারীগণের প্রতিকৃতি। বরের সঙ্গে যাইবেন মনস্থ করিয়াও যাঁহারা প্রদীপে তেল ভরিয়া রাখেন নাই বলিয়া যাইতে পারেন নাই—বর চলিয়া গেলে তাঁহারা রোদন করিতেছেন। ভিন্ন ভিন্ন ভাবে স্ত্রীসুলভ মধুর ভাব ও একান্ত মনোকষ্টের স্পষ্ট রেখা অতি মনোহারী রূপে অঙ্কিত হইয়াছে।

তাহার পাশে রোমরাজ নীরোর প্রতি-মূর্ত্তি। তিনি সভামধ্যেই একান্ত বশম্বদের মত রাণীর আঁচল ধরিয়া বসিয়া আছেন। এক কৃষ্ণকায় ভৃত্য রাণীর পায়ে জুতা পরাইতেছে,—আর তিনি নিজে বিহ্বলভাবে রাণীর মুখচুম্বন করিতেছেন।

পাশে একটি ভাঙ্গা মন্দির খণ্ড। গ্রীক দেশস্থ কোনও মন্দিরের অংশবিশেষ হইবে। তারপর একটি না-পাখী না-মানুষ—কতকটা আমাদের দেশের গরুড়াবতার। সেটি যে কি তা বুঝা গেল না।

আর একটি সুন্দর ছবি দেখিলাম—তাহাতে মানুষ ও নিম্নশ্রেণীর জীবের সহিত একান্ত সখ্যভাব সন্নিবিষ্ট। এক রমণীর স্কন্ধে বসিয়া একটি ছোট পাখী তাহার হাত হইতে খাদ্য ভক্ষণ করিতেছে। এরূপ একটি দৃশ্য আমি পূর্ব্বেই এক জাপানী চিত্রকরের চিত্রশালায় দেখিয়াছিলাম। পরস্পরের প্রতি প্রগাঢ় বিশ্বাস এই চিত্রে অতি সুন্দররূপে কল্পিত হইয়াছে।

পরবর্ত্তী প্রণয়চিত্রটিও অতি সুন্দর। একটি পুরুষ একটি রমণীকে অতি যত্নে তার নিজের বাঁশিটি বাজাইতে শিখা-ইতেছেন। দুই দিকে দুইটি হাত দিয়া তাঁহার দেহ বেষ্টন করিয়া যন্ত্রটি রমণীর অধরোষ্ঠে তিনি নিজেই ধরিয়া আছেন। রমণী ফুৎকার

দিতেছেন—তিনি পরদা টিপিয়া নানারূপ মধুর সুর বাহির করিতেছেন। যেন দুই জনের অন্তরের সঙ্গীত তাহাতে একত্রে ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি ফরাসী দেশে ও ইতালীয় চিত্রে নগ্ন রমণীমূর্ত্তির বড়ই আদর। কিন্তু মূর্ত্তিসম্বন্ধে একথা যেমন খাটে চিত্র সম্বন্ধে তেমন নহে। ইহার বোধহয় একটি কারণ এই যে—চিত্রে আশপাশের ছবি হইতেও আসল জিনিষটির গূঢ় ভাব প্রকটিত করা যায়—মূর্ত্তিতে সেটি তত সম্ভবপর নহে। তাই ইহাতে নগ্ন দেহের সনাতন অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য্য একেবারে খুলিয়া দিতে হয়। তবে মূর্ত্তিতে বা চিত্রে যে নগ্নভাব তাহা দ্বারা হৃদয়ে কোন মালিন্য স্পর্শ করে না।

একখানি চিত্রে স্বর্গ হইতে বিতাড়িত সয়তান, অতল নরকে পড়িয়া উর্দ্ধদৃষ্টিতে দূরস্থ স্বর্গের আলোকের দিকে চাহিয়া—দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিতেছে—

"Farewell Bright region !"

হে উজ্জ্বল স্থান তোমার নিকট হইতে চির-বিদায়।

ইহার পাশে এপলো অতি কাতরভাবে চোখের জল মুছিতেছেন। সূর্য্যদেবের আবার কিসের অভাব—তিনি যে কাঁদিতেছেন কেন কেহ কি তাহা বুঝিতে পারেন ?

তার পাশের ছবিটি একটি ভিক্ষুকের। লোকটি অনাহারে দুঃখে কষ্টে অকালে বুড়া হইয়া গিয়াছে। তাহার কটিদেশ ভগ্ন, হাতের শিরা সকল বহিষ্কৃত, মাংস লোল, চক্ষু নত। শরীর মনের তেজ নষ্ট হইলে সকলেরই এইরূপ ভাব হইয়া থাকে। যেন নিজের কাছেই নিজে হীন আর সকল বিষয়েই সকলের কাছে ভয়ের ভাব। যখনি আমি কোনও লোকের এরূপ অবস্থা দেখি তখনই আমার চাকাঘুবার কথা মনে আসে,—শুষ্ক ফুলের কথা মনে হয়। যখন ভাগ্যচক্রের পরিবর্ত্তনে অবস্থা হঠাৎ নামে তখন সেজনকে যেন আর চেনা যায় না। রোগশয্যায় এই অবস্থা আমি প্রতিনিয়তই দেখিতে পাই।

একখানি ছবিতে একটি বিষম শোকবার্ত্তা অঙ্কিত। বোধহয় এখানি কোনও ঐতিহাসিক চিত্র হইবে। কোনও দুর্ঘটনায় একত্রে রাজবাটীর অনেকেই মৃত। তন্মধ্যে রাজারাণীর অন্তেষ্টিক্রিয়ার আয়োজন হইয়াছে। দুটি দেহ আলিঙ্গনে বাঁধা; ছোট খোকাটি তাঁহাদের দেহের উপর রক্ষিত—আর চতুর্দ্দিকে চুল ছিঁড়িয়া মাথা কুটিয়া প্রজারা পরিতাপ করিতেছে। এটি বোধহয় আসিয়াভূমির কোনও চিত্র হইবে। নয়ত এত শোকের বাহুল্য ত শীতপ্রধান দেশে দেখা যায় না।

তার পরের ছবিখানি ইতালী দেশের চিত্র। যাকে মধ্যযুগের ইতালিয় পেণ্টিং বলে; সেগুলি অধিকাংশ ধর্ম্মসম্বন্ধীয়। তার মধ্যে খৃষ্টের জন্ম বৃত্তান্ত একটি প্রধান। Madona অর্থাৎ যিশুমাতা বা মাতৃক্রোড়ে যিশুমূর্ত্তি কতভাবেই যে অঙ্কিত তার ইয়ত্তা নাই। বাস্তবিক মানুষের এমন পূজা করিবার সামগ্রী আর ত কিছুই নাই। সকল দেশেই এই মাতৃকল্পনা সকলকে স্বভাবত মুগ্ধ করে। তাই এ মূর্ত্তিটির নানা দেশে নানা ভাবে এত আদর। এক এক খানির দাম এক মিলিয়ন ফ্রাঙ্ক।

তার পাশে আরও অনেকগুলি এই শ্রেণীর চিত্র দেখিলাম। একটি চিত্রে "সেণ্ট সিবাষ্টাইন"

নামক জনৈক খৃষ্ট-ভক্তের উপর লোকের অমানুষিক অত্যাচার অঙ্কিত। এই প্রকারে লোকের দয়া উৎপাদন করা আজকালকার কলাবিদ্যার অনুমোদিত নহে। যেমন অতি চীৎকার গানে, অতিশয় অলঙ্কার সাহিত্যে নিষিদ্ধ তেমনি চিত্রেও অতি অঙ্কন বিধি নিষিদ্ধ। যথার্থ কলাবিদ্যায় মনের উপর ক্ষমতা বিস্তার সম্পূর্ণ অলক্ষিতে হওয়া চাই।

তার পরের ছবিখানি একটি সন্ন্যাসীর ছবি। নত জানু জোড়হাত হইয়া কুমারী মেরীর প্রতিমার তলায় বসিয়া তিনি উপাসনা করিতেছেন। এগুলি ঠিক আমাদের প্রতিমা পূজারই মত। ধর্ম্মের সকল হাবভাবই প্রাচ্য স্থানসমূহ হইতে প্রতীচ্য দেশে অনুকরণ করা হইয়াছে।

একখানি ছবিতে একটি বৃদ্ধা রমণী তাঁর ছোট নাতিটিকে প্রার্থনা করিতে শিখাইতেছেন। শিশু তাঁহাকে কিরূপ সুন্দর অনুকরণ করিতেছে! এই আদি শিক্ষার জোরেই ভালমন্দ সমস্ত বাল্যসংস্কার আমাদের মনে এমন প্রবলভাবে রাজত্ব করে।

পাশে অনেকগুলি ছবি ভাঙ্গা ও অঙ্গহীন। যে অংশগুলি ভাল আছে সেগুলি অতি সুন্দর আর যে গুলি নাই সেগুলি কল্পনায় আরও সুন্দর!

পাশে প্রাচ্য দেশের একটি রাজপুত্রের প্রতিমূর্ত্তি। রাজকুমারের দেহ নানা ভূষণে ভূষিত। মাথায় জড়িবুনা ঝকমকে তাজের উপর উঠপক্ষীর পালক লাগান। গলায় গজ মুক্তার মালা। যত রমণীদের দেখিলাম জনতা সেই ছবিটির কাছে।

একখানি ছবিতে এক রমণী স্নানান্তে দর্পণে আপাদ মস্তক নিজের ছায়া দেখিয়া রূপে এমন মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছেন যে আপনারই ছায়াকে চুম্বন করিতেছেন। প্রকৃত ছবি ও ছায়ার দুটি ঠোঁটের ব্যবধান অতি সুন্দররূপে অঙ্কিত।

ইহা ছাড়া কতকগুলি অতি সুন্দর সুন্দর প্রাকৃতিক চিত্রও দেখিলাম। একস্থানে উচ্চ নিম্ন জমীর উপর একটি বায়ুযন্ত্র (wind mill) অঙ্কিত। সে চিত্রটি এত সুন্দর এত স্বাভাবিক যে দেখিলে ছবি বলিয়া বুঝাই যায় না।

আর একটি কুয়াশার মাঝে সূর্য্যোদয়। সেটির দিকে ক্ষাণিকক্ষণ তাকাইয়া থাকিলে মনে হয় যেন কুয়াশার শৈত্য অবধি অনুভব করিতেছি।

আর একটি চিত্র একটি পুরাতন ফ্যাসানের রাজদুর্গ। ভগ্নচূড় ভীষণ প্রস্তরদুর্গের স্থানে স্থানে এখন গাছ উঠিয়াছে।

একটি ছবি দেখিয়া কিন্তু অবাক হইলাম। এটি ঠিক আমাদের দেশের মৃত্যুকালের অন্তর্জ্জলির দৃশ্য। তখন আমাদেরই দেশের মত সে দেশে রোগীকে অন্তিমকালে বাড়ী হইতে বাহিরে লইয়া যাওয়া হইত। সেই আসন্নকালের বিষণ্ণ দেহকে টানা হেঁচড়া করিয়া হাঁটু গাড়িয়া বসাইয়া উপাসনা করান হইত। হায়! ধর্ম্মের নামে সংসারে কতই অপকর্ম্ম সংঘটিত হয়।

এই ঘটনাটি দেখিয়া আমার মন যেমন অপ্রসন্ন হইয়া গেল, আসিবার পথে আর এক স্থানে একটি ভাঙ্গা মূর্ত্তি দেখিয়া তেমনি কিন্তু প্রসন্ন হইয়া উঠিল। সেটি "Venus of Milo" অর্থাৎ মাইলো নামক আসিয়া মাইনরের একস্থানে প্রাপ্ত শচীদেবীর প্রস্তরমূর্ত্তি। এমন সুন্দর স্ত্রীমূর্ত্তি রচনা কোথাও নাই।

মূর্ত্তিটির খানিক খানিক অংশ ভাঙ্গা; বাকিটুকু এত সুন্দর যে, সকল দেশে সকল শিক্ষা প্রদর্শনীতে এই মূর্ত্তির ছাঁচে মূর্ত্তি গড়া আছে। কি ভাস্কর কি চিত্রকর কি কবি কি বা গায়ক এই মূর্ত্তির অনুকরণে স্ত্রীমূর্ত্তির স্বর্গীয় সৌষ্ঠব কল্পনা করেন।

শ্রীইন্দুমাধব মল্লিক।

চয়ন।

রমণীর রাজনৈতিক অধিকার।—ইংলণ্ডের ইতিহাস খুলিলে দেখিতে পাই সেদেশের পুরুষজাতি রাজনৈতিক অধিকার প্রাপ্তির জন্য কায়মনোবাক্যে রাজশক্তির সহিত অবিরাম যুদ্ধ করিতেছে। অধ্যবসায় ও একাগ্রচিত্ততার বলে তাহারা তিল তিল পরিমাণে রাজশক্তি হরণ করিয়া প্রজাশক্তির পুষ্টিসাধন করিতেছে। রাষ্ট্রীয়-অধিকার লাভের জন্য ইংরাজ সর্ব্বস্ব সমর্পণে প্রস্তুত, সকল প্রকার নির্য্যাতন সহ্য করিতে প্রস্তুত, এমন কি প্রফুল্ল চিত্তে প্রাণ দান করিতে পর্য্যন্ত প্রস্তুত। ইংলণ্ডের ইতিহাসের ইহাই গৌরব ও শিক্ষা।

কিছুকাল হইল ইংলণ্ডের রমণীগণও রাষ্ট্রীয় অধিকার লাভের জন্য প্রাণপণ সংগ্রাম করিতেছেন। তাঁহারা এখনও জয়লাভে সমর্থ না হইলেও, তাঁহাদের দৃঢ়-প্রতিজ্ঞা, একাগ্রচিত্ততা, অধ্যবসায় ও আত্মোৎসর্গ দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। Modern Review নামক পত্রিকায় এই আন্দোলনের একটি সুন্দর ইতিহাস প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা তাহার সারাংশ উদ্ধৃত করিলাম।

১৮৬৭ সালে রমণীগণের রাষ্ট্রীয় অধিকার লাভের আন্দোলনের প্রথম সৃষ্টি হয়। ১৮৩২ সালের পূর্ব্বে ইংলণ্ডের নরনারী সকলেই সমভাবে রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে ভোট দিতে পারিতেন। কিন্তু ঐ বৎসর হইতে রমণীগণ উক্ত অধিকারে বঞ্চিত হন। ১৮৬৭ সালে জন ষ্টুয়ার্ট মিল রমণীগণকে ভোটের অধিকার দান করিবার জন্য পার্লামেণ্টে এক প্রস্তাব করেন। কিন্তু তিনি কৃতকার্য্য হন নাই। ফলে এই অধিকার প্রাপ্তির জন্য রমণীসমাজে এক মহা আন্দোলন উপস্থিত হইল। চতুর্দ্দিকে সহস্র সহস্র নারীসমিতি গঠিত হইল এবং ১৮৭০ সালে একলক্ষ চৌত্রিশ হাজার নারীর সাক্ষরিত এক আবেদন পত্র প্রচারিত হইল। ব্রাইট সাহেব পার্লামেণ্টে এই বিষয় লইয়া পুনরায় প্রস্তাব করেন। এবার সম্ভবতঃ পার্লামেণ্ট ইহার অনুমোদন করিতেন, কিন্তু গ্ল্যাড্‌ষ্টোন সাহেবের চেষ্টায় তাহা ব্যর্থ হইল। ১৮৬৭ হইতে ১৮৮৪ সালের মধ্যে সাতবার পার্লামেণ্টে এ বিষয়ে প্রস্তাব উত্থিত করা হইয়াছে, এবং সাত বারই তাহা ব্যর্থ হইয়াছে।

১৮৮৫ সাল হইতে ১৯০৮ সাল পর্য্যন্ত কেবল এক বৎসর ভিন্ন প্রতি বৎসরই পার্লামেণ্টে এ বিষয়ে প্রস্তাব করা হইয়াছে, এবং প্রতি বৎসরই সভ্যগণ একটা না একটা বাধা দ্বারা তাহা ব্যর্থ করিয়াছেন।

কিন্তু এত ব্যর্থতা সত্ত্বেও ইংলণ্ডের রমণীগণ অপূর্ব্ব অধ্যবসায় ও আত্মোৎসর্গের সহিত এই অধিকার লাভের জন্য সংগ্রাম করিতেছেন। এই কয়বৎসরের মধ্যে তাঁহারা পাঁচ সহস্রের অধিক আবেদন প্রেরণ করিয়াছেন। তাঁহাদের অক্লান্ত চেষ্টা ও অধ্যবসায়ের ফলে তাঁহারা পার্লামেণ্টের ৬৭০ জন সভ্যের মধ্যে ৪২০ জনকে স্বপক্ষ সমর্থনে স্বীকৃত করিলেও কিন্তু রাজমন্ত্রীগণ কিছুতেই তাঁহাদের কথায় কর্ণপাত করিতে স্বীকৃত হন নাই। অবশেষে অন্য কোন উপায় না দেখিয়া রমণীগণ প্রধান মন্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার মানস করেন। তাহাতেও দুই একবার বাধা পাইয়া

অবশেষে তাঁহারা সাক্ষাৎ করিবার অনুমতি পাইলেন। ১৫ লক্ষ নারীর প্রতিনিধিস্বরূপ চারি শত রমণী যাইয়া প্রধান মন্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। কিন্তু এ সাক্ষাতে সহানুভূতিপূর্ণ আশ্বাস ভিন্ন আর কিছুই লাভ হইল না। তিনি বলিলেন তাঁহার সহযোগীগণ সকলে এ কর্ম্মে সম্মত নহে। ইহা শুনিয়া প্রতিনিধিগণ বর্ত্তমান প্রধান মন্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। দুইবার তিনি সাক্ষাতে অস্বীকার করেন। তৃতীয়বার পুলিস আসিয়া চারিজন নেত্রীকে গ্রেপ্তার করে। একজনের দুই মাস ও তিনজনের দেড়মাস করিয়া কারাদণ্ড হইল। সেইদিন ম্যাঞ্চেষ্টার নগরেও তিন জন রমণীর কারাদণ্ড হয়। এই সকল রমণীগণ মুক্তিলাভ করিয়া সহস্র সহস্র সভায় লক্ষ লক্ষ নারীর নিকট তাঁহাদের উদ্দেশ্য ও কর্ত্তব্য সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতে লাগিলেন। এই দলের নেত্রীগণের মধ্যে অনেকেই সুন্দর ও সুমিষ্ট বক্তৃতাদানে সমর্থ।

রাজমন্ত্রীগণের নিকট হইতে রাষ্ট্রীয় অধিকার আদায় করিবার জন্য এই দলের রমণীগণ প্রায়ই পার্লামেণ্ট অবরোধ করেন এবং পুলিস আসিয়া নির্দ্দয়ভাবে প্রহার করিয়া তাঁহাদিগকে রাজপথ হইতে দূর করিয়া দেয়, এবং নেত্রীগণকে গ্রেপ্তার করিয়া কারাগারে নিক্ষেপ করে। কিন্তু কর্ত্তব্যের অনুরোধে কারাগারে যাইতে তাঁহারা প্রফুল্লচিত্তে সর্ব্বদাই প্রস্তুত। অর্থদণ্ড না দিয়া তাঁহারা সহাস্তমুখে কারাগারে গমন করেন। এই আন্দোলনের বিরাটত্ব বুঝাইবার জন্য গ্ল্যাডষ্টোনের মন্ত্রীত্বকালে এলবার্ট হলে যে একটি বিরাট সভার অধিবেশন হয় তাহাতে দশ সহস্রের অধিক রমণী সমবেত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই শিক্ষিতা, উচ্চপদস্থা ও গুণান্বিতা নারী। কিন্তু রাজপক্ষের হইয়া গ্লাডষ্টোন সাহেব বলেন যে, নিজেদের দলের লোক লইয়া হলের মধ্যে সভা করা সহজ, প্রকাশ্যস্থলে পুরুষের ন্যায় সাধারণের সম্মুখে সভা করিলে তবে বুঝা যায় দেশের লোকের এ আন্দোলনে সহানুভূতি আছে কি না। তৎক্ষণাৎ ইংলণ্ডের সামাজিক ও রাজনৈতিক নারীসমিতি লণ্ডনের সর্ব্বাপেক্ষা প্রকাশ্য স্থল হাইড্ পার্কে এক বিরাট সভার আয়োজন করিলেন। সভাস্থলে ৪০টি ব্যাণ্ড্ বাজিতে লাগিল এবং সাত শত পতাকা আকাশে উত্থিত হইয়া নারীর অধিকার ঘোষণা করিতে লাগিল। সভাস্থলে চল্লিশটি বক্তৃতামঞ্চ নির্ম্মিত হইল এবং প্রায় শতাধিক বক্তা বক্তৃতা করিতে লাগিলেন। সমগ্র দেশ হইতে সাতখানি বিশেষ ট্রেণে করিয়া প্রতিনিধিগণ আসিয়া লণ্ডননগরে উপস্থিত হইলেন। সভায় শ্রোতৃসংখ্যা প্রায় আড়াই লক্ষ লোক হইয়াছিল। এরূপ বিরাট সভা ইংলণ্ডে আজ পর্য্যন্ত কখনও হয় নাই। বোধ হয় পৃথিবীর ইতিহাসে এরূপ সভা এই প্রথম। কিন্তু ইহাতেও প্রধান মন্ত্রীর প্রতিজ্ঞা টলিল না। তথাপি রমণীগণ অক্ষুব্ধ চিত্তে ও অমিততেজে তাঁহাদের এই ন্যায় যুদ্ধ আজিও সমভাবেই চালাইতেছেন।

পাশ্চাত্য-নারীর উপজীবিকা।—এ মাসের Modern Review পত্রিকায় উক্ত বিষয়ের একটী সুন্দর বিবরণ বাহির হইয়াছে। আমাদের দেশের রমণীগণের দুরদৃষ্ট সম্বন্ধে যাঁহারা আক্ষেপ ও অভিযোগ করেন, তাঁহাদের নিজেদের দেশের রমণীগণের অবস্থা কিরূপ তাহা জানিবার জন্য আমাদের একটা আগ্রহ হওয়া স্বাভাবিক। আমাদের দেশের নীচজাতীয় রমণীগণের ন্যায় ইয়ুরোপেরও অনেক স্থলে রমণীগণ কৃষিকার্য্য, পশুপালন, কয়লার খনির মজুরি, এবং সূত্রধর, কর্ম্মকার, রাজমজুর ও আবর্জ্জনাপরিষ্কারকের কর্ম্ম করে।

ইংলণ্ডের পশ্চিমপ্রদেশে নারীগণ অনেকে কৃষিকর্ম্ম করে। ফিন্‌ল্যাণ্ড দেশে কৃষিকর্ম্ম মাত্রেই নারীগণ করিয়া থাকে। ত্রয়োদশ বৎসর বয়স হইলেই সে দেশের বালিকা একজন সুদক্ষ কৃষিমজুর হইতে পারে। এই মজুরদের প্রতিদিন ৮ ঘণ্টা করিয়া ক্ষেত্রকর্ম্ম করিতে হয়। আলুর ফসল হইলে ফিন্‌ল্যাণ্ডের বিদ্যালয়ে বালিকা পাওয়া দুষ্কর হইয়া উঠে। সকলেই ক্ষেত্রে মজুরি করিতে যায়। এইরূপ সহস্র সহস্র মজুর এক একজন স্ত্রীলোক বা পুরুষ সর্দ্দারের অধীনে কর্ম্ম করে। স্ত্রীলোকের অপেক্ষা পুরুষ সর্দ্দারের ভাগটাই অধিক। এই

সকল সর্দারের আজ্ঞানুসারে বালিকাগণ প্রাণহীন যন্ত্রের ন্যায় শ্রম করে। ফলে দিন দিন তাহাদিগের দৈহিক ও নৈতিক অবনতি হয়।

জার্ম্মানীতে রমণীগণ কৃষিকার্য্য ভিন্ন নগরের আবর্জ্জনা পরিষ্কার এবং মুটে মজুরের কাজ করে। কুলির কাজ করে। হলাণ্ডে রমণীগণ নৌকার গুণ টানে। বেলজিয়মের রমণীগণের অবস্থা সর্ব্বাপেক্ষা হীন। বেলজিয়ম দেশের অর্দ্ধেক কর্ম্ম তথাকার স্ত্রীলোকেরাই করিয়া থাকে। দশসহস্র স্ত্রীলোক খনিতে কুলির কর্ম্ম করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করে। এই সকল স্ত্রীলোক অশিক্ষিত, হীন ও প্রায়ই অত্যন্ত মাতাল হয়। বেলজিয়মের কোন পুরুষের পক্ষে মুদির বা কোন শুষ্ক দ্রব্যের ব্যবসা করা অত্যন্ত কাপুরুষোচিত ও লজ্জাকর। এই প্রকৃতির ছোট বড় সকল কর্ম্মই স্ত্রীলোকেরা করিয়া থাকে।

প্রজার শিক্ষায় রাজার ব্যয়—১৯০৮ সালের গবর্মেণ্টের আয় ব্যয় আলোচনাকালে বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভায় শ্রীযুক্ত গোখলে ভারত গভর্মেণ্টের প্রত্যেক প্রজার প্রতি শিক্ষাব্যয়ের উল্লেখ উপলক্ষে ইয়ুরোপে ভিন্ন ভিন্ন দেশের এতৎসম্বন্ধীয় যে ব্যয় তালিকা দিয়াছিল তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

প্রত্যেক দেশে প্রজার প্রতি গবর্মেণ্টের শিক্ষা ব্যয়।

ফ্রান্স ৪৲, জর্ম্মানি ৩৲, ইতালি ১।০, অষ্ট্রিয়া ১৸০, নেদারলাণ্ড ৩৷৵০, ভারতবর্ষ /১০।

চিত্র-ব্যাখ্যা।

১। হরপার্ব্বতী-সংবাদ। ইহা তরুণ চিত্রকর শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক অঙ্কিত মূলচিত্রের রঙ্গিন প্রতিলিপি। আমাদের দেশের পুরাণাদিতে কোনো ভবিষ্য-বিষয় বর্ণনা করিতে হইলে পার্ব্বতীকে দিয়া প্রশ্ন করাইয়া শিবকে দিয়া উত্তর দেওয়ানো একটা রীতি পূর্ব্বাপর চলিয়া আসিয়াছে। সেই রীতি অনুসারে বার্ষিক পঞ্জিকার ফলাফল নির্ণয়ের জন্য

"হরপ্রতি প্রিয়ভাষে কন হৈমবতী—
বৎসরের ফলাফল কহ পশুপতি।"

এই বিষয়টি অবলম্বন করিয়া এই চিত্র পরিকল্পিত হইয়াছে। পার্ব্বতী প্রশ্ন করিয়াছেন, শিব উত্তর দিতেছেন।

এই বিষয়টি ভারি কবিত্বময়। ভবিষ্যৎ জানিবার জন্য শক্তি মঙ্গলের নিকট জ্ঞান-প্রার্থনা করিতেছেন। আমাদের দেশের শক্তি মঙ্গলের অনুবর্ত্তিনী সহচরী, তাহা কথনোই উচ্ছৃঙ্খল নহে। আমাদের মঙ্গল—ত্যাগে সুমহান, জ্ঞানে গরীয়ান, প্রেমে পরিপূর্ণ। শক্তির হস্তে লীলা কমল তাঁহার নির্ম্মল পবিত্রতার পরিচয় দিতেছে, শক্তিও আপনাকে ত্যাগের দ্বারা মহিমান্বিতা বিশ্ববন্দিতা করিয়াছে। শিবশক্তির বাসভূমি অত্যুন্নত কৈলাসশিখর, তাহা অমল ধবল, তাহা আকাশচুম্বী—তাহা অকলুষ উন্নতির উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহা মহেশ্বরের ললাটশোভী চন্দ্রকদ্যুতিতে নিত্য উদ্ভাসিত।

এই চিত্রখানি ভারতীয় চিত্রকলা পদ্ধতি অনুসারে অঙ্কিত। মহাদেবের ধ্যানস্তিমিত অথচ জ্ঞানগরিষ্ঠভাব এবং পার্ব্বতীর শ্রবণ-তন্ময়তা এবং উভয়ের মুখেই দেবভাব শিল্পী চমৎকার প্রকাশ করিয়াছেন। পার্ব্বতীর স্বল্প বেশ তাঁহার ত্যাগ ও আত্মসুখস্পৃহাশূন্যতা জ্ঞাপন করিতেছে। ভূষণ ও পরিচ্ছদ প্রাচীন অজণ্ডাগুহালিখিত বেশভূষার মত করিবার চেষ্টা হইয়াছে। হরপার্ব্বতীর মস্তকোপরি চন্দ্রকলা ও পশ্চাতে কৈলাসের চূড়া সুন্দর হইয়াছে।

বৎসরের আরম্ভসূচনায় ভারতীর এই চিত্রখানি প্রকাশ করা উপযুক্ত হইয়াছে। মহেশ্বর করুন আমাদের শক্তি এমনি শিব-সম্মিলিতা হউক, বৎসর শুভফল দান করুক।

২। কচ ও দেবযানী। শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের ফ্রেস্কো চিত্রের প্রতিলিপি। এই চিত্রের উপাখ্যান অনেকেই জানেন, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের "বিদায় অভিশাপ" নামক চমৎকার কাব্যকথাটি এই উপাখ্যান লইয়াই বিরচিত, তথাপিও সংক্ষেপে ইহা বলিতেছি—

দেবাসুরে বহুকাল হইতে যুদ্ধ চলিতেছিল, দেবতার সহিত যুদ্ধে হত অসুরগণকে অসুরগণের গুরু শুক্রাচার্য্য মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্র দ্বারা পুনর্জ্জীবিত করিয়া দিতেন। দেবগণ তখনো অমর হন নাই, সমুদ্র মন্থন করিয়া তখনো অমৃত পাওয়া যায় নাই, এবং সুরগুরু বৃহস্পতি মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা জানিতেন না, সুতরাং দেবতার বলক্ষয় হইতে লাগিল। দেবগণ সভা করিয়া রেজল্যুশন পাশ করিলেন যে অসুরপুরে গিয়া শুক্রাচার্য্যের নিকট হইতে মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা শিখিয়া আসা হউক। কিন্তু শত্রুপুরীতে সাহস করিয়া কে যাইবে, এবং শুক্রাচার্য্যই বা শত্রুকে এ বিদ্যা শিখাইবেন কেন? বৃহস্পতির পুত্র কচ এই বিদ্যা শিক্ষা করিয়া আসিতে স্বীকার করিলেন। তিনি শত্রুপুরীতে আসিয়া নানাবিধ বিপদ উত্তীর্ণ হইয়া সহস্র বৎসরের কঠোর সাধনায় সেই বিদ্যা আয়ত্ত করিলেন। এই গুরুগৃহপ্রবাসকালে শুক্রাচার্য্যদুহিতা দেবযানী কচের প্রতি আসক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। কচ বিদ্যালাভ করিয়া বিদায় লইতে চাহিলে দেবযানী নানাবিধ প্রলোভন দেখাইয়া কচকে স্বর্গে ফিরিতে নিষেধ করিলেন। কচ সকল স্বার্থ ত্যাগ করিয়া স্বজাতির কল্যাণ সাধনের প্রতিজ্ঞা পালন করিতে কৃতসঙ্কল্প ছিলেন, তিনি দেবযানীর সকল প্রলোভন প্রত্যাখ্যান করিলেন। তখন ক্রুদ্ধা দেবযানী কচকে বলিলেন—

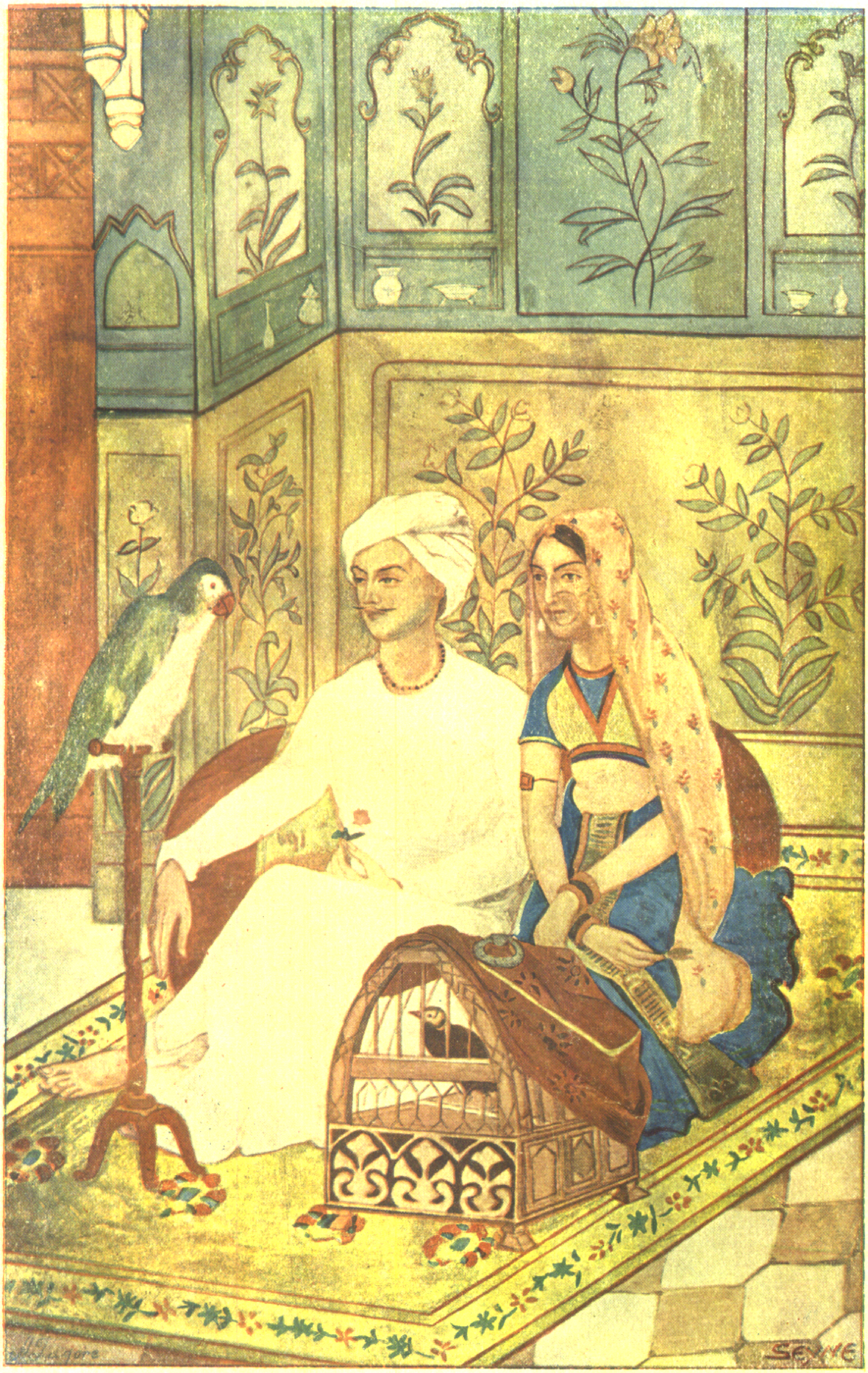
"তোমাপরে
এই মোর অভিশাপ—যে বিদ্যার তরে
মোরে কর অবহেলা, সে বিদ্যা তোমার
সম্পূর্ণ হবে না বশ; তুমি শুধু তার
ভারবাহী হয়ে রবে, করিবে না ভোগ,
শিখাইতে পারিবে না করিতে প্রয়োগ!"

কচ দেবযানীর এই বিদায় দৃশ্য চিত্রে অঙ্কিত হইয়াছে। তপঃকৃশ স্বার্থত্যাগী প্রতিজ্ঞাপালনপরায়ণ কচ অভিমানিনী প্রেমার্থিনী দেবযানীকে সান্ত্বনা দিয়া, সকল কথা বুঝাইয়া বিদায় চাহিতেছেন। যিনি রবিবাবুর "বিদায় অভিশাপ" পড়িয়াছেন তিনি এই চিত্রের মাধুর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হইবেন। এই চিত্রখানি অবনীন্দ্রবাবুর একখানি শ্রেষ্ঠ সুন্দর চিত্র। কয়েকটি প্রস্তরখণ্ড ও তরুগুল্ম দ্বারা চিত্রের perspective বড় চমৎকার প্রকাশ পাইয়াছে।

৩। কবিবর নবীনচন্দ্র সেন মৃত্যুর প্রাক্কালে বলিয়াছিলেন "আজ আমার বিজয়া, আমায় ফুল দিয়া সাজাইয়া দেও।" এই ইচ্ছা অনুসারে তাঁহাকে ফুল দিয়া সাজাইয়া কবির মৃত্যুটিকে সুন্দর মধুর করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। ভক্ত কবির বিজয়া কবিত্বময়ই হইয়াছে। নামাবলীর পরিচ্ছদ ও পুষ্পসজ্জা তাঁহার অন্তরের ভক্তি ও কবিত্ব প্রকাশ করিয়াছে।

শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

কলিকাতা, ২০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত ও ৪৩, ওল্ড বালিগঞ্জ রোড হইতে



শুকশারিকার কলহ

শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক অঙ্কিত মূল চিত্র হইতে

মঙ্গল।

মঙ্গল সাধনাই মানুষের সাধনা। মঙ্গল লাভ করাই মানুষের আসল উদ্দেশ্য। নানা আকারে, নানা ভাবে, নানাজন, নানা দেশে, নানা কালে,—জেনে না জেনে এই মঙ্গলের সাধনাই যে চিরকাল ক'রে আসছেন তার আর ভুল নাই। ভগবানের ইচ্ছা বা সৃষ্টির আনন্দ এই মঙ্গলকে, মানুষ মাত্রেই জন্মের সঙ্গে সঙ্গে সংস্কাররূপে লাভ করেন। এটী বিশেষভাবে মানুষেরই সংস্কার। মানুষ ছাড়া আর কোন জীবের এ সংস্কার নেই। ছোট বড়, শিক্ষিত, অশিক্ষিত, সকল মানুষের মধ্যেই, এ সংস্কার, ন্যূনাধিক পরিমাণে, স্বভাবতই বর্ত্তমান। এই মঙ্গল সংস্কারই মঙ্গলশক্তি বা মনুষ্যত্বের গোড়ার কথা বা বীজ। এই সংস্কারই সাধনা বা চর্চ্চার দ্বারা সংস্কাররূপ ত্যাগ করে সজ্ঞান শক্তিরূপ ধারণ করে এবং তার ফলে মঙ্গল ব্যবহারগত হয়। এ'কে রক্ষা করা, পোষণ করা ও চালনা করাই এর চর্চ্চা বা সাধনা। নিজের ও অন্যের মধ্যস্থিত এই মঙ্গল সংস্কারকে আঘাত বা পীড়িত না করাই এর রক্ষা, নিজের ও অন্যের মধ্যস্থিত এই মঙ্গল-সংস্কারকে তৃপ্ত করাই এর পোষণ এবং এই উপায়ে সকলের সঙ্গে যোগযুক্ত হওয়াই এর শক্তিরূপে বিকাশ বা ব্যাপ্তি।

চেতনের কষ্ট নিবারণ ও আনন্দ বর্দ্ধনে মঙ্গলের প্রকাশ। মঙ্গলের প্রকাশ প্রত্যক্ষ মাত্র আনন্দিত হওয়া বা যোগ অনুভব করা মঙ্গল সংস্কারের স্বভাব বা ধর্ম্ম। এই স্বভাব বা ধর্ম্ম থেকে ভ্রষ্ট হওয়াকেই অমঙ্গল বলে। আপন স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকাই স্বধর্ম্মে রক্ষা পাওয়া। মঙ্গল সংস্কারই মনুষ্যের প্রকৃত স্বধর্ম্ম ও এই স্বধর্ম্মের সাধনাই মনুষ্যের সত্য সাধনা। মঙ্গলের সাধনা ব্যতীত সত্যের ধারণা হয় না; সত্যের ধারণা ব্যতীত ভগবানকে দেখা যায় না। সত্য বোধের অভাবেই ভগবান অদৃশ্য; মঙ্গলের সাধনা ত্যাগেই মানুষ ভ্রষ্ট বা পীড়িত। সত্যকে যিনি জেনেছেন তিনিই ভগবানকে দেখেছেন, মঙ্গলকে যিনি পেয়েছেন তিনিই মানুষকে চিনেছেন। তিনি জানেন, যার নাম মনুষ্য তারই নাম মঙ্গল, যার নাম ভগবান তারই নাম সত্য। তিনি জানেন সত্য বা ভগবান বা যিনি আছেন তাঁর ইচ্ছা বা শক্তি, প্রথমে এই মঙ্গল-সংস্কাররূপে মনুষ্যে বর্ত্তমান থেকে মনুষ্যের বা জগতের মুক্তি বা আনন্দকে জননীর ন্যায় গর্ভে ধারণ ক'রে রক্ষা করেন ও শেষে মঙ্গলশক্তিতে পরিণত হ'য়ে সত্য মঙ্গলের যোগফল পরমানন্দ প্রসব করে জগৎকে আনন্দিত ও মনুষ্যকে কৃতার্থ করেন।

শ্রীহেমলতা দেবী।

পুরাতন ও নূতন।

বর্ষ-শেষ।

কর্ম্ম-ক্লান্ত বৎসরের শেষ রশ্মি-শিখা
অস্তে গেল! ঊর্দ্ধে হের কা'র অনামিকা-
অঙ্গুলি ফিরিল আজি পূর্ব্বাচল পানে!
আজিকার বিদায়ের রাত্রি অবসানে
আসিবে অতিথি দ্বারে; তা'রি তরে হিয়া
আকুল-বিস্ময়-ভরে আছে প্রতীক্ষিয়া!
সারা বিশ্বে অশ্রু-ঘেরা শুদ্ধ আয়োজন
শেষ অর্ঘ্য রচিবারে! ওগো পুরাতন
নিত্য নব নব রূপে তোমার প্রকাশ;
চিরন্তন লীলা, মাঝে নাহি অবকাশ!
তবু বিশ্ব মিলনের পূর্ণতার তরে
বিদায়ের অশ্রু ঢালে ঋতু সম্বৎসরে।
সব শূন্য করে' আমি রচি' দিনু স্থান,
ব্যর্থ-আশা জীবনের চরম সম্মান!

নববর্ষ।

কল্যাণের শুভ-স্পর্শে হোক্ সুপ্রভাত;
ভগ্ন-হৃদয়ের দ্বারে পুণ্য-রশ্মি-পাত!
দীপ্ত নীলাম্বরে আজি পূর্ণ মহিমায়
প্লাবিয়া নিখিল বিশ্ব কি আনন্দভায়!
সারা বর্ষ খেলিয়াছি স্বপনের খেলা,
যারে চাহি তারে শুধু করি' অবহেলা!
সংশয় করিতে দূর জালে পড়ি ধরা,
রুদ্ধ ঘরে ছিনু বসে অন্ধকারে ভরা।
দূর কর আজি প্রভু মায়া কুহেলিকা;
জ্বালাও, জ্বালাও চিত্তে নবদীপ-শিখা!
সব দ্বন্দ্ব ঘুচি' পথ হউক সরল,
মুক্ত হোক্ এ কঠিন স্বার্থের শিকল;
নবপ্রাণ সঞ্চারিত হোক্ ধরাতলে,
ঝরুক্ অমৃত-ধারা তব জলে-স্থলে!

শ্রীদীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ভিখারী।

যে গৃহ ভাঙ্গিয়া তুমি দিয়াছ আমার,
জীবনের বিনিময়ে কভু কি আবার
ফিরায়ে পাইব, নব বর্ষের মতন?
চাহিনা নূতন কিছু সব পুরাতন
দেও দেব, সেই হাসি চির সমুজ্জ্বল,
সেই প্রেম জাহ্নবীর সঙ্গম কল্লোল
অনন্ত প্রবাহে, স্নিগ্ধ পরশহিল্লোলে
কত যুগযুগান্তের হৃদি উৎস জলে
উঠিত ভরিয়া সুখ প্লাবন উচ্ছ্বাসে;
ছয়ঋতু সঞ্চারিয়া বরষে বরষে,
তোমার মহিমা প্রাণে দিত জাগাইয়া
মূর্ত্তিমান করি তোমা, পূজিবারে হিয়া!
পরিপূর্ণ জীবনের সেদিন হেলায়
কাড়িয়া লয়েছ, আজি নাহিক হেথায়
অতীতের সুখ চিহ্ন, শুধু স্মৃতি তার
বহিয়া এমন করি কতদিন আর
রহিব তোমার বিশ্বে তোমারে ভুলিয়া;
আপনার শোক দুঃখে এমনি ডুবিয়া?
অসীম করুণা তব ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া
জীবে শান্তি প্রদানিছে বরষ আনিয়া,
সেই নব-বর্ষে আজ শান্তির ভিখারী
আসিয়াছি তব কাছে, শোক তাপহারী!

শ্রীপ্রসন্নময়ী দেবী।

দিদিমা।

নামাবলীখানি গায়ে দিয়া আমার দিদি-শাশুড়ী যখন গঙ্গাস্নান করিয়া বাড়ী ফিরিতেন তখন বেলা ৮টা। আমি পানের বাক্স লইয়া পান সাজিতাম। তিনি গঙ্গাজলের ঘটিটি ও নামাবলীখানি যথাস্থানে রাখিয়া একটা বড় পিতলের ঢাকা খুলিয়া আমাদের খাবার দিতেন। তাঁহার আদেশে পান সাজা রাখিয়া আমাকেও জলযোগ করিতে হইত। "আহা তাড়াতাড়ি করে আস্‌ছি, আহা তোদের কত ক্ষিদে পেয়েছে।" খাবার দিয়া তসর কাপড় ছাড়িয়া তিনি বাজারের হিসাব পত্র লইতেন ও তাড়াতাড়ি "ঝোলের আনাজ" লইয়া রান্নাঘরের উঠানে যেখানে ঝি মাছ কুটিতেছে সেখানে গিয়া, "ও ঝি ঝোলের মাছটি আগে ধুয়ে দাও ত মা" বলিয়া ঝিকে তাড়া দিতেন।

গয়লা বৌএর কাছে দুধ মাপিয়া লইয়া তাহার ঘরের কুশল সংবাদ লওয়া হইলে বলিতেন, বাচ্ছাকাচ্ছার দুধটুকু ভাল দিস্ মা—একটু সকাল করে আসিস গো।" দুধের কড়া চড়াইয়া দিয়া "মাছের ঝোল নামলো গা?" বলিতে না বলিতে স্কুল আফিসের যাত্রীরা "দিদিমা, মা, ভাত," বলিয়া কেহ গামছা লইয়া চৌবাচ্ছায় ঝাঁপাইয়া পড়িতেন কেহ বা পি ড়িতে বসিয়া, দিদিমার কাছে তেল চাহিয়া লইয়া তেল মাখিতেন ও গল্প করিতেন। দিদিমা "এই যে ভাত হয়েছে" "বামন মেয়ে ভাত বাড় মা"—"এই নাও দাদা তেল"—বলিয়া তেলের বাটী দিতেন পরে খোরায় খোরায় দুধ জুড়াইয়া আহারের স্থলে লইয়া রাখিতেন। বড় বড় পিঁড়ি পাতিয়া একতলার দালানে আহারের ঠাঁই হইয়াছে—একে একে সকলে আহার করিতে আসিলেন। কেহ জিজ্ঞাসা করিলেন "আজ গঙ্গার ঘাটে কার কার সঙ্গে দেখা হল"—কেহ জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজকের খবর কি দিদিমা?" কেহবা জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভঁাড়ারের কিছু আনাতে হবে কি?" দিদিমা হাসিমাখা মুখে সকলের প্রশ্নের উত্তর দিতে লাগিলেন। এমনি করিয়া স্কুল আপিসের তাড়নার সঙ্গে সঙ্গেই প্রশান্তভাবে হাসি গল্পের সহিত "বাবুদের" স্নানাহার সমাধা হইলে দিদিমা সকলের হাতে হাতে পান দিলে সকলে বাহির বাড়ী চলিয়া গেলেন। তখন একটু নিশ্চিন্ত হইয়া দিদিমা অবশিষ্ট দুধ জাল দিতে লাগিলেন। কাহারও ঘন কাহারও বক্কা বাটী বাটী রাখা হইল। দুধ জাল দেওয়া শেষ হইলে নিরামিষ রান্নার বক্‌মোটী চড়াইয়া তরকারী কুটিয়া চাল ধুইয়া নিরামিষের সমস্ত যোগাড় করিতে ব্যস্ত হইলেন। এক একদিন আমি 'তরকারী কুটিব' বলিয়া ধরিয়া বসিলে 'আচ্ছা তুমি এই আলু পটলগুলি ছাড়াও' বলিয়া বঁটী ছাড়িয়া দিতেন। ইতিমধ্যে বাহির বাড়ি হইতে ভৃত্যেরা বারম্বার আসিতেছে ও "বড় বাবুর জামাটা ছেঁড়া আর একটা দিন,—মেজবাবু ও কাপড় পরবেন না—ধোয়া বার করে দিন,—ছোট বাবুর এ চাপকানের বোতাম নেই সেরে দিতে হবে,—পান কই,—জল দিয়ে যান;" এই প্রকার কত কি বাহানা লইয়া দিদিমাকে ব্যস্ত করিতেছে। দিদিমার বিরক্তি নাই, ধীরভাবে সকল ফরমাস সম্পন্ন করিতেছেন। তখন তিনি রন্ধনে নিযুক্ত

এজন্য বাক্স, পেঁড়া, ধোয়া কাপড় চোপড় কিছুই স্পর্শ করিবেন না, চাবি দিয়া আমাদের বাহির করিয়া দিতে আদেশ দিতেন। আমরা তাঁহার উপদেশ মত কাপড় চোপড় বাহির করিয়া দিতাম। ভৃত্যদের সমুখে আমরা বাহির হইতাম না, ভৃত্যেরা বাড়ির ভিতর প্রায় আসিত না; যখন আসিত সাড়া পাইলেই ঘরে লুকাইতাম। ঘোমটা দিয়া শ্বশুর ভাশুরের সমুখে কখনো কখনো যাইয়া জল কি পান দিয়া আসিতে হইত; কিন্তু ভৃত্যদের কিছু দিতে হইলে দাসী দ্বারা বা ছোট মেয়ের দ্বারা পাঠাইতাম। ভৃত্যেরা একতলার ভিতর বাড়ীতে আনাগোনা করিত দোতলায় কদাচিৎ যাইত। আমরা সকালে আসিয়া একতলার ভাঁড়ারে ঢুকিতাম—রান্না ও ভাঁড়ার ঘর পাশাপাশি সুতরাং আমাদের গণ্ডি রান্না ও ভাঁড়ার ঘরের মধ্যে। তার বাহিরে যাইতে হইলে দাসী হাঁকিত 'সরে যাও বৌঠাক্‌রুণ যাচ্ছেন।' সময়ের কি বিচিত্র গতি আজ আমাদেরই বাড়ী একটিও দাসী নাই ভৃত্যেরাই সকল কার্য্য নির্ব্বাহ করে। যা হোক্ বাবুরা স্কুল আপিস চলিয়া গেলে আমরা হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিতাম।

বাহির বাড়ীতে ভৃত্যেরা "রাম রাজত্ব" করিত। দাসীরা কাজ সারিয়া তেল মাখিতে বসিত। যেমন যেমন আহার হইয়া যাইত— অমনি বাসন ধুইয়া ফেলিতে হইত।' "এঁটো চণ্ডী" দেবতাটী বড়ই "বিঘ্নকারিণী"। বাড়ীতে যে, বেলা ২টা পর্য্যন্ত "শকড়ি" পড়িয়া থাকিবে তার যো নাই—তা হলে "এঁটো দেবী" ত্বরিত গতিতে গিয়া স্কুল আপিসের যাত্রীদের কার্য্যে বিঘ্ন ঘটাইবে—সুতরাং বাসন কোসন পরিষ্কার না করিলে দাস দাসী কেহই অবসর পাইত না। বাড়ীর মধ্যে প্রচুর স্থান থাকা সত্ত্বেও দাসীরা বাসন মাজিতে ও স্নান করিতে বাহির বাটীতে যাইত। সে সময়টা তাহারা নানা হাস্যালাপে বাড়ীটা মুখরিত করিয়া তুলিত।

ওদিকে যেমন ভৃত্যদের সমুখে আমাদের বাহির হইবার নিয়ম ছিল না দাসীরাও তেমনি বাবুদের সহিত কথাটি পর্য্যন্ত কহিত না; এক হাত ঘোমটায় মুখ ঢাকিয়া কাজ করিত। বাবুদের সন্নিকটে জল কি পানটি পর্য্যন্ত লইয়া যাওয়ার তাহাদের অধিকার ছিল না, তাই দিদি-মার অনুপস্থিতিতে আমরা বৌয়েরা বাবুদের সম্মুখে যাইতাম। সেখানে কোন ভৃত্য উপ-স্থিত থাকিলে সে অমনি সরিয়া যাইত। ভৃত্যের সমুখে আবশ্যক হইলেও কোন বৌ ঘোমটা দিয়াও স্বামীকে জল বা পান কিছুই দিত না। তিনি যে কোন প্রকারে তাহা সংগ্রহ করিয়া লইতেন। তখন আমাদের বাড়ীর অবিবাহিত মেয়েরা সবে মাত্র বেথুন স্কুলে পড়িতে যাইতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহারা ৮টার সময়— হয়ত দিদিমা গঙ্গাস্নান করিয়া আসার পূর্ব্বেই ডাল, আলুভাতে, ডিমসিদ্ধ মাছভাজা, মাখন, কাঁচা দুধ ও মিষ্ট দিয়া আহার সমাধা করিয়া কাপড় চোপড় পরিয়া সদর দরজায় গাড়ীর অপেক্ষায় বই সেলেট হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া আছে—তাহারা ঘরের কোন কাজ করিতে অবসর পায় না।

দশটা সাড়েদশটা বাজিলেই দিদিমা রান্নাঘরে আমাদের ভাত দেওয়াইতেন। রান্নাঘরটা খুব বড় ছিল; একদিকে আমিষ রান্না ও আর এক দিকে নিরামিষ রান্না হইত। এ সকল হইয়াও যথেষ্ট স্থান ছিল আমরা সেইখানেই প্রায় আহার করিতাম। "আঁশ হেঁসেলে" প্রায়

এইরূপ রান্না হইত। মুগ, খাঁড়ীমসুর—হয় পেঁয়াজ দিয়া না হয় টক দিয়া ও কখনো মাসকলাইএর ডাল; ইহা ছাড়া মাছের ঝোল হাঁসের ডিম সিদ্ধ বা ভাজা বা ডাল্‌না, লাউ-কাঁকড়া বা লাউচিংড়ি, আলু পটলভাজা, মাছ ভাজা, মাছের অম্বল, কখনো কখনো চিংড়ী মাছ দিয়া পুঁইশাক চচ্চড়ি, কুমড়ো চিংড়ী এই সব অদল বদল করিয়া হইত। অড়হর, ছোলা, মটর প্রভৃতি ডাল দিদিমা রাঁধিয়া খানিকটা 'ওবেলার জন্য' রাখিতেন; বাবুদের গরম করিয়া দেওয়া হইত।

দিদিমার রান্না খাবার জন্য বাড়ীর সকলে অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। তাই প্রত্যহই দিদিমা কিছু কিছু ব্যঞ্জন স্বতন্ত্র পাথরের পাত্রে ঢালিয়া রাখিতেন। দিদিমাকে অনেক রাঁধিতে হইত—বাড়ীতে বিধবা ৩।৪ জন ছিলেন—দিদিমাই সকলের রাঁধিতেন—তাঁহারা যোগাড় দিতেও বড় একটা অবসর পাইতেন না। তাঁহাদের আহ্নিক পূজা সারিতে ১১।১২টা বাজিত। তাঁহারা নিজেদের ঘরের কাজকর্ম্ম, পুত্র পৌত্রাদির পরিচর্য্যা করিয়া স্নান আহ্নিক করিতে যাইতেন। আর সকল সময় তাঁহারা সবাই কলিকাতার "বাসায়" থাকিতেনও না। দুজন বা দুমাস আছেন—আবার দেশে গেলেন—সেখানে বা দুমাস রহিলেন অন্যেরা আসিলেন এইরূপ চলিত। বধূরা কখনো কখনো দেশে বা পিত্রালয়ে যাইত—কেবল "বাবুরা" পূজার সময় বা স্ত্রী দেশে থাকিলে কোন এক শনিবারে দেশে যাইতেন। বাবুদের মা ছয়মাস দেশে থাকিলেও কেহ দেশে যাইতেন না—কিন্তু স্ত্রীটি ছয় দিনের জন্য গেলেও বাবুর অমনি মাছ ধরা বা আম খাওয়ার সখ্‌ পড়িয়া যাইত। শুনিয়া দিদিমা মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসিতেন—পাছে কেহ লজ্জা বোধ করেন তাই নিজে উপযাচক হইয়া বাড়ীর ছেলেদের দেশে পাঠাইতেন। অনেক সময় বধূরা পিত্রালয়ে থাকিলেও যদি শশুর শাশুড়ী জামাতাকে লইতে লোক না পাঠাই-তেন—তবে দিদিমা গঙ্গা স্নানের ফেরত হয় ত কুটুম বাড়ী গিয়া ইঙ্গিতে জামাই লইয়া যাইতে উপদেশ দিয়া আসিতেন। বলিতেন আহা এই ওদের আমোদ প্রমো-দের সময়—এর পর যখন সংসার ঘাড়ে পড়বে তখন কি আর ধূলো খেলার অবসর পাবে।" কিন্তু শশুর বাড়ী শনিবার গিয়া সোমবার ভোরেই ফিরিতে হইত—অথবা কখনো কখনো রবিবার সকালেই আসিবার আদেশ দেওয়া হইত—বিশেষ আগ্রহ না দেখাইলে—রবিবার থাকিতে দেওয়া হইত না। ছেলেদের পরীক্ষার সময় এবিষয়ে কর্ত্তা বড় অধিক কড়াকড় করিতেন—কিন্তু দিদিমা অত ভাল বাসিতেন না। তিনি বলিতেন "আহা বৌএর মুখখানি মধ্যে মধ্যে না দেখলে ওদের পড়া শুনায় উৎসাহ হবে কেন।" দিদিমা যে ব্যবস্থা করিতেন তাহাতে কেহ দ্বিরুক্তি করিতেন না, সকল কার্য্য তাঁহার অনুমতি ও উপদেশ লইয়াই নিষ্পন্ন হইত। এমন কি প্রত্যেকে প্রত্যহ আপিস স্কুল যাত্রার সময় "দিদিমা আসি—পিসিমা আসি, জেঠাই মা আসি, ইত্যাদি বলিয়া তবে যাইতেন। দিদিমা হাতের কায রাখিয়া প্রত্যেকের সমুখে আসিয়া 'এস দাদা, এস বাবা' বলিয়া শুভ কামনা করিতেন।

দিদিমা রাঁধিতেন—আমরা ভাত খাইতাম। বাড়ীর অনেক বধূ তাহার শাশুড়ীর সহিত কথা কহিত না—কিন্তু দিদিমার সহিত কথা কহিত।

দিদিমা বলিতেন আমাব সহিত কথা কহিতে আছে। যদি কোন বধূর কাযে বা কথায় কোন ত্রুটি হইত—দিদিমা একটু অল্প হাসিয়া বলিতেন "ছিঃ ও কথা বল্‌তে নাই—অথবা এমন কায আর কোর' না।" দিদিমার এই টুকু কথায় আমরা যেরূপ শাসিত হইতাম—অন্য গৃহিণীদের সারাদিন বকুনির ঝড় বহিলেও সেরূপ হইত না—বরং বকুনির চোটে কাঁদিয়া কাটিয়া অস্থির করিয়া তুলিতাম। বেচারা দিদিমা এমন অবস্থায় বড় বিপদে পড়িতেন। গৃহিণীকে বলিতেন "আহা, ছেলে মানুষ বুঝতে পারেনি, আহা আর করবে না।" বধূকে বলিতেন কাঁদ্‌তে নেই—আমরা না শেখালে তোমরা শিখবে কেন দিদি।" আমরা বলিতাম "আপনি বারণ করলেই ত আমরা শুনি—তবে উনি অত বকছেন কেন।" দিদিমা বুঝাতেন, "আহা ওর শোক তাপের শরীর" কখনো বলিতেন "আহা ও একটু রাগী মানুষ—সকলের কি স্বভাব সমান হয়—তা বলে বৌ মানুষকে কাঁদ্‌তে নেই সব সইতে হয়।" আমাদের ভাত খাওয়ার সময় দিদিমা নানা প্রকার গল্প করিতেন, যাহার যে ত্রুটি সংশোধন করিতেন। যে বধূ যে নিরামিষ তরকারী ভাল-বাসে তাড়াতাড়ি তাহাকে সেই তরকারীটি রাঁধিয়া দিতে প্রয়াস পাইতেন। "দিদি বসে খাও—এই ঝালের ঝোল হল' বলে"। প্রত্যেককে দিদিমা সমভাবে যত্ন করিতেন প্রত্যেককেই মিষ্ট কথায় বশীভূত করিয়াছিলেন।

আমাদের আহার শেষ হইলে "বামন মেয়ে" লোকজনদের ভাত দিত—সে আমাদের স্বজাতি,তাই দিদিমার হাতের ব্যঞ্জনাদি খাইত। কিন্তু সিদ্ধ চাল খাইত বলিয়া সে তাহার ভাত নিজে স্বতন্ত্র রাঁধিত। দিদিমা ও অন্য গৃহিণীরা আতপ চাল খাইতেন—অন্য গৃহিণীরা রাত্রে লুচি ও আলুনি ভাজা খাইতেন, কিন্তু দিদিমা দুগ্ধ ফল ও সন্দেশ ছাড়া অন্য কোন জিনিস খাইতেন না। যদি কোনদিন লুচি খাইতে সাধ হইত তবে দুপুর বেলা ভাতের সহিত খাইতেন। দিদিমার আহারাদি শেষ হইতে বেলা প্রায় ২॥০টা বাজিয়া যাইত। ইতিমধ্যে আমরা পুতুল খেলিয়াছি—কেহ বা এক ঘুম ঘুমাইয়াছি—এবং যে কেহ একজন নজর রাখিয়াছি দিদিমা কখন আহারে বসেন। দিদিমার আহারের সময় প্রায় আমি চেলির বা গরদের সাড়ী পরিয়া দুধটুকু জলটুকু দিবার জন্য প্রস্তুত থাকিতাম। সে সময়ে আমিই বাড়ীর সর্ব্ব কনিষ্ঠ বধূ। সুতরাং পাকা চুল তোলার ভার আমার ছিল। আহারান্তে দিদিমা যখন দোতলার দালানে আঁচল পাতিয়া একটু "গড়াইতেন", তখন পাকা চুল তুলিতাম। দিদিমা বলিতেন, আহা নাতবৌয়ের হাত যে—মাথায় হাত দিলেই ঘুম পায়। বলিতে না বলিতেই দিদিমা নিদ্রার কোলে গা ঢালিয়া দিতেন। নাতবৌএর হাতের গুণে যে এত শীঘ্র নিদ্রাকর্ষণ হইত তা ঠিক নয়। রাত্রি ১১।১২ টার সময় দিদিমা শয্যাগ্রহণ করিতেন; আর ২।৩ টায় তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইত। এক ঘুমের পর নিদ্রাভঙ্গ হইলে তিনি আর শয্যায় থাকিতেন না। তপ জপে নিযুক্ত হইতেন। সুতরাং নিদ্রার দোষ কি! আদেশ ছিল যে নিদ্রাকর্ষণ হইলেই যেন আমি উঠিয়া যাই। দিদিমা বলিতেন—"আহা ওরা ছেলে মানুষ খেলা করবে, ওরা কি চুপ করে ঘোমটা দিয়ে বসে থাকতে পারে।" এক ঘণ্টার মধ্যে দিদিমার নিদ্রাভঙ্গ হইত; দিদিমা একবাটী দুধ

গরম করিয়া নিজের হাতে আমাকে খাওয়াইতেন। পরে চুল বাঁধিয়া দিয়া কাপড় ছাড়িতে পাঠাইয়া সকলের জলযোগের ব্যবস্থা করিতেন। এ সকল হইয়া গেলে নিজে কাপড় ছাড়িয়া মালা হাতে করিয়া বসিতেন। তখন তাঁহাকে আমার রামায়ণ বা মহাভারতের কোন স্থান হইতে পড়িয়া শুনাইতে হইত। কখনও বা কোন প্রতিবাসীর বা আত্মীয়স্বজনের বাড়ী কথকতা হইতেছে সন্ধান পাইলে তাঁহার দৈনিক নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিত। সে সময় দিদিমা চুলবাঁধা প্রভৃতির ভার অপর কোন গৃহিণীর উপর দিয়া মালা হাতে করিয়া তিনটার পূর্ব্বেই "কথা" শুনিতে যাইতেন। সন্ধ্যায় সময় দিদিমা সন্ধ্যা বন্দনা সারিয়া লুচি রুটি করিতেন। রাঁধুনি তরকারী রাঁধিত। গৃহিণীরা নিজেরা ময়দা মাখিতেন। লুচি ভাজা ও রুটি সেঁকার ভার দিদিমাই গ্রহণ করিতেন;—দাস দাসী ব্যতীত রাত্রে প্রায় কেহই ভাত খাইত না।

সকলকে আহারাদি করাইয়া প্রাতঃকালের জন্য ভাঁড়ার বাহির করিয়া এবং কিছু কিছু তরকারী কুটিয়া রাখিয়া নিজে যৎকিঞ্চিৎ জলযোগ করিবার পর দিদিমা যখন বিছানায় যাইতেন প্রায় রাত্রি ১২টা বাজিত। আবার ৩টা বাজিলেই প্রায় উঠিয়া বিছানায় বসিয়া যোড়হাত করিয়া ধ্যান করিতেন। ভোর ৪টার সময় হাত মুখ ধুইয়া গো-সেবা করিতেন। ৫টার সময় ঘটী, নামাবলী, তসর কাপড় ও পুষ্পপাত্র হাতে করিয়া "ওমা বামন মেয়ে ও দিদি নাতবৌ ওঠো দিদি—বৌমা ওঠো মা বেলা হয়েছে—আমি তবে এখন আসি," বলিয়া গঙ্গাস্নান করিতে বাহির হইতেন। আমারও ঘুম ভাঙ্গিয়া যাইত—শুনিতাম বৈষ্ণব ভিখারী গাহিতেছে—

হরি কোথা হে—তুমি কোথা হে
ও বিপদের কাণ্ডারি— তুমি কোথা হে—?

ক্ষেত্রব্রতের কথা।

পূর্ব্ব বাঙ্গালার পল্লীগ্রাম সমূহে এখনও "ক্ষেত্তর ঠাকুরের" প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ আছে। নববধূ শ্বশুরালয়ে আসিয়া অনভ্যাস বা অসাবধনতা বশতঃ বেগুন ভাজিতে ভাজিতে দৈবাৎ একখানা উনোনে ফেলিয়া দিলে গিন্নি বধূকে তিরস্কার না করিয়া "ক্ষেত্তর ঠাকুরের" ভোগে লাগিয়াছে বলিয়া বরং আনন্দ প্রকাশই করিয়া থাকেন। ক্ষেত্র ঠাকুরের এই মধ্যস্থতায় অনেক অসাবধানা বধূ শাশুড়ীর তিরস্কার হইতে রক্ষা পাইয়া যান। এই ক্ষেত্র ঠাকুরটী যে কে তাহা ব্রতকারিণীগণ ঠিক বলিতে পারেন না, অনেকে অগ্নিদেবকেই ক্ষেত্রঠাকুর বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, আর কেহ কেহ বলেন সূর্য্যদেবই ক্ষেত্র ঠাকুর। আমার শেষেরটিই সত্য বলিয়া মনে হয়। কেননা সূর্য্য হইতেই আমরা খাদ্যাদি পাইয়া থাকি। আর রাখাল বালকদিগকে উদর পূরিয়া ছাতু ভক্ষণ করান এবং ক্ষেত্রস্থিত কীট পতঙ্গের আহারের সংস্থান করাই ক্ষেত্রব্রতের প্রধান অঙ্গ। অগ্রহায়ণ বা পৌষ মাসে কদলী, এবং খেজুরে গুড় প্রভৃতি উপকরণ দ্বারা গৃহের বাহিরে কুলগাছের নীচে ব্রত করিবার

নিয়ম। ব্রত শেষে ব্রতের উপকরণ ছাতু প্রভৃতি উপস্থিত রাখাল বালকদিগকে বণ্টন করিয়া দিতে হয়। অবশিষ্ট দ্রব্য গৃহে ফিরাইয়া নেওয়া নিষিদ্ধ, উহা পূর্ব্বোক্ত কুল গাছের নীচেই ফেলিয়া যাওয়া ঠাকুরের অভিপ্রেত।

চারি পাঁচ বা ততোধিক মহিলা একত্র হইয়া ব্রত করিয়া থাকেন এবং প্রত্যেকে সাধ্যানুযায়ী উপকরণ সামগ্রী সংগ্রহ করেন বলিয়া ব্রতস্থানটী একটী দস্তুরমত ভাণ্ডার রূপে পরিণত হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য ব্রত সৃষ্টি সময়ে আধুনিক মেঠাইয়ের চলন ছিল না, পাড়াগাঁয়ে এখনও নাই; সুতরাং পল্লী বালকদের নিকট ছাতু চিঁড়েই বিশেষ উপাদেয় এবং এই লোভে ব্রতস্থানটি বালক বালিকার কলরবে আমোদিত হইয়া পড়ে। ব্রতারম্ভে সমাগতা মহিলাদের মধ্যে একজন নিম্নলিখিত কাহিনীটি বলেন।

এক যে রাড়ীর পুত মইল্লা * তার সংসারে কেউ নাই কেবল এক মা। এরা ভারী গরীব একদিন খাবার যোটে তো একদিন যোটে না। মা নিজের জন্য ভাবেন না, বিধবা হবার পর যে ছেলেটীকে বুকে ধরে মানুষ করেছেন, সময় মত তার মুখে দুটো ভাত দিতে পারেন না, এ কষ্ট আর রাখবার স্থান নেই। লক্ষ্মী ঠাকরুণের বরে মইল্লার মামাদের খুব কপাল। তাই তার মা ভাবলেন, ছেলেকে সেখানে পাঠিয়ে দেওয়া যাক্, সেখানে কত চাকর বাকর খাট্‌ছে মইল্লা তো আপনার লোক, গরুটা বাছুরটা রাখবে আর তিন বেলা পেট ভরে খেতে পাবে। এইরূপ ভেবে মা ছেলেকে ভাইদের বাড়ীতে পাঠিয়ে দিলেন। মামারা মইল্লাকে দেখে খুসী হয়ে বল্লে "এতদিন আসিস্ নি কেন? কত লোক আমাদের এখানে খাচ্ছে, আর তুই আমাদের ভাগ্নে এতদিন খেতে পরতে এত কষ্ট পেয়েছিস্! তা আমাদের এখানে থাক্, গরু বাছুর রাখবি, আর ক্ষেতে আমাদের জন্য লাস্তা (কৃষকদের প্রাতর্ভোজন) নিয়ে যাবি। এখানে খেতে পর্‌তে কোন কষ্ট হবে না, দিদিকেও মাঝে মাঝে খোরাক পাঠিয়ে দিব।" মইল্লা এখানে বেশ সুখেই রইল। কিন্তু কোন কোন মেয়ে মানুষের কেমন স্বভাব, পরের ভাল চখে সয়না, মইল্লার মামীদের সে দুচক্ষের বিষ হল, তারা মইল্লাকে পাতের এঁটো কাঁটা দিতে লাগলো। সে পেটের দায়ে কিছু কিছু খেত, আর সব ঢেঁকি ঘরের পিছনে মাটীর নীচে পুঁতে রাখ্‌তো। এইরূপে কিছুদিন যায়, একদিন মইল্লা মামাদের জন্য লাস্তা নিয়ে যাচ্ছে, এমন সময় শুন্‌তে পেলে কে যেন একটা ঝোপের নীচে থেকে তাকে ডেকে বল্‌ছে "মইল্লা তুই যে তোর মামাদের জন্য খাবার নিয়ে যাচ্ছিস্ তা থেকে সব রকমের কিছু কিছু এখানে রেখে যা; তোর ভাল হবে।" মইল্লা বল্লে, "বাপ্‌রে তাও কি হয়! তা হলে কি আর মামীরা আমাকে আস্ত

* অনেক সন্তান নষ্ট হইবার পর যে সন্তানটী জন্মিয়া জীবিত থাকে তাহাকে পূর্ব্ববঙ্গে "মইল্লা" বলে। যম অঙ্গহানি বিশিষ্ট সন্তান গ্রহণ করিবেন না এই বিশ্বাসে ইহার কাণে খুব বড় ছিদ্র করিয়া দেওয়া হয়; কখনও বা নিতান্ত তুচ্ছ জিনিস এই ভাবে ইহাকে অন্য কাহাকেও দান করিয়া ফেলিয়া আবার একটা কাণা

রাখবে? ঝাঁটাপেটা করে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেবে।” ঝোপের নীচে থেকে আবার সেইরূপ শব্দ হল—“তোর কোন ভয় নেই, তুই আমার কথা শোন, তোর ভাল হবে”। মইল্লা তখন মাথা থেকে খাবারের ভাঁড় নামিয়ে সব রকমের কিছু কিছু খাবার সেখানে রেখে মামাদের কাছে গেল। ফিরে আস্‌বার সময় ঝোপের নীচে থেকে আবার শব্দ হল, “মইল্লা তুই বড় ভাল ছেলে, আমি তোর উপর বড় খুসী হয়েছি। তুই সন্ধ্যাবেলা এখানে এসে মাটী খুঁড়লে এক কলসী মোহর পাবি, তাই নিয়ে যাস্ তা হলেই তোদের কপাল ফিরবে।” মইল্লা সেদিন মামার বাড়ীতে গিয়ে বিকালবেলা মামাদের বল্লে, “মাকে দেখবার জন্য মন বড় ব্যস্ত হয়েছে আমি ঘরে যাবো” মামারা ভাবলে “হবেও বা, ছেলে মানুষ কত দিন ধরে মা ছেড়ে এসেছে”! তারা তাকে যেতে দিলে। মইল্লা সন্ধ্যাবেলা সেই ঝোপের মাটী খুঁড়তে খুঁড়তে সত্যি সত্যি এক কলসী চক্‌চকে মোহর পেলে, তার আর আহ্লাদ ধরে না। বাড়ীতে এসে মাকে কলসীটী দিলে, এবং সেদিন থেকেই তাদের কপাল ফিরে গেল। দেশে বিদেশে তাদের ঐশ্বর্য্যের কথা রাষ্ট্র হল, মইল্লা নাম ঘুচে গিয়ে তখন তার নাম হল “নতুন রাজা”। দীন দুঃখীর প্রতি নতুন রাজার অসীম করুণা, তাঁর সুখ্যাতির কথা আর লোকের মুখে ধরে না। নতুন রাজার একদিন ইচ্ছে হল দীঘি কাটাবেন, দেশে বিদেশে ঢোল পিটিয়ে দিলেন “নতুন রাজা দীঘি কাটাচ্ছেন, যে যত ওড়া (ঝোড়া) মাটী কাটবে, সে তত ওড়া কড়ি পাবে।” দেশ বিদেশ থেকে দীনদুঃখী লোক মাটী কাটতে আস্‌তে লাগলো, রাজা তাদের কড়ি বুঝিয়ে দেবার জন্য একজন সরকার রেখে বলে দিলেন, যত মজুর আস্‌বে, আগে সবাইকে একবার তাঁর কাছে হাজির কর্‌তে হবে, তারপর মাটী কাটবে।

এদিকে হয়েছে কি, নতুন রাজার মামাদের আর কষ্টের সীমা নেই; সব দিন খাওয়াও যোটেনা। তখন একদিন মামারা বল্লে “শুনলুম কে এক নতুন রাজা দীঘি কাটাচ্ছেন, মজুরেরা যত ওড়া মাটী কাটে তত ওড়া কড়ি পায়, একবার সেখানে গিয়ে দ্যাখ না।” তারা ভাবলে “মন্দ নয় কয়েক ওড়া মাটী কাটলে কিছুদিনের খাবার যোগাড় হবে। তখন মামারা দুই ভাইয়ে নতুন রাজার বাড়ীতে গেল, তাদের ভাগ্নে মইল্লাই যে নতুন রাজা হয়েছে তা তারা জানতো না। রাজবাড়ীতে যেতেই সরকার তাদের রাজার কাছে নিয়ে গেল, রাজা তাদের চিনতে পাল্লেন কিন্তু তারা চিন্তে পার্‌লে না। রাজা সরকারকে বল্লেন “এদের এখন মাটী কাটতে হবে না, নতুন কাপড় এনে দাও, আর স্নানের যোগাড় করে দাও।” মামাদের তো একথা শুনে ভয়ে “আত্মাপুরুষ” উড়ে গেল। “নতুন পুকুরে শুনেছি নরবলি দিতে হয়, তবে কি আমাদেরই বলি দিবে।” স্ত্রীদের মনে মনে গালাগালি করে তারা ভয়ে ভয়ে স্নান টান কর্‌লে; কিন্তু দেখে রাজা তাদের উপর কোনই দুর্ব্যবহার করেন না। অন্দর মহলে খাবার জায়গা হয়েছে সেখানে গিয়ে তারা রাজাকে দেখলে, কথাও যেন চেনা লোকের মত মনে হোল, ব্যাপার কি? তারপর খেতে বসে নতুন রাজা মামীদের দুর্ব্যবহারের কথা গোপন করে, সব খবর বল্লেন, এবং মামী

দেরও আনার জন্য পাল্কী ঘোড়া পাঠিয়ে দিলেন।

মামীরা এলেন, কিন্তু এখন ভাগ্নের প্রতি তাদের ভালবাসা উথলে উঠল। ভাগ্নেকে নিজের হাতে খেতে না দিলে আর তাঁদের মন ওঠেনা। দুধের সর প্রভৃতি ভাল জিনিষ সবই ভাগ্নের পাতে দেন। এক দিন মামা-ভাগ্নে খেতে বসেছেন, মামীরা পরিবেশন কচ্ছেন, আর ভাল খাবার গুলি সবই ভাগ্নের পাতে ঢেলে দিচ্ছেন। ভাগ্নে তখন একটু হেসে বল্লেন—

"সেই মামা সেই মামী পুকুর পাড়ে ঘর,
ক্যানলো মামী নড় চড় হাতে রেখে সর ?"

মামারা একথার অর্থ কি জিজ্ঞেস করতে, নতুন রাজা তখন মামীদের ব্যবহারের কথা বল্লেন। তারা তো রেগে স্ত্রীদের মারধোর করতে যায় কিন্তু নতুন রাজা বল্লেন "এদের কি দোষ আমার কপালে দুঃখ ছিল বলেই ওদের ওরূপ মতি গতি হয়েছিল, আবার অদৃষ্টের সঙ্গে সঙ্গেই মতি গতি ফিরেছে।"

এইরূপে দুঃখী বিধবার ছেলে মইল্লা ক্ষেত্র ঠাকুরের বরে রাজা হয়ে সুখে সংসার করতে লাগল।

কাহিনী শেষ হইলে সমাগতা মহিলাগণ হুলু ধ্বনি করেন, এবং তৎপরে উপস্থিত বালক বালিকাদিগকে খাদ্য দ্রব্য সকল বণ্টন করিয়া দেওয়া হয়। এখন বালক বালিকাদের উপযোগী উপদেশপূর্ণ বহু পুস্তক রচিত হইতেছে, সেকালে অবশ্যই এত বিদ্যালয় বা পুস্তকের বাহুল্য ছিল না, কিন্তু এই সকল ব্রত পার্ব্বণের কাহিনী সেই অভাব পূরণ করিত। যে দেব অথবা দেবীর উদ্দেশে ব্রতাদি করা হয়, তিনি একটু কোপন স্বভাব হইলেও বালক বালিকা বা নিরাশ্রয়া রমণীদের প্রতি তাঁহার অসীম করুণার পরিচয় পাওয়া যায়। পল্লীগ্রামের সংবাদ যাঁহারা রাখেন, তাঁহারা অবশ্যই জানেন, অবস্থাপন্ন গৃহস্থের ঘরেও নববধূদের অদৃষ্টে ভাল খাদ্য সব সময় যোটেনা। সংসারে দাসী বৃত্তি করা ভিন্ন পুত্রবধূর যে আর কোনও আবশ্যকতা আছে, এখনও অনেকের এরূপ ধারণা নাই। সর্ব্বপ্রকার নিন্দা তিরস্কারে নীরব থাকিবে, ভাত ব্যঞ্জন কম হইলেও তুষ্ট থাকিবে ইহাই আদর্শ পুত্রবধূর লক্ষণ। এরূপ অবস্থায় আমরা যখন দেখিতে পাই, দেবতাদের ভয়ে শাশুড়ী ব্রতপ্রতিষ্ঠা উপলক্ষে বধূকে পরের বাড়ীতে যাইতে দিয়া বাহিরের মুক্ত বাতাস সেবনের সুবিধা দেন, —এবং কখন বা মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিয়া বধূকে উদর পূরিয়া খাইতে দেন তখনই ব্রতের দেব দেবীর চরণে আমাদের প্রাণের কৃতজ্ঞতা উথলিয়া উঠে।

শ্রীমতী শতদলবাসিনী বিশ্বাসজায়া।

আধখানি।

মিশ্র ভৈরবী।

আমি, আধখানি গাঁথি
তুমি, তারে কর সায়!
আমি, ফুল করি জড়
তুমি, ডোরে বাঁধো তায়!

আমি কথা বলে যাই,
তুমি সুরে গাঁথ তাই,
গান গাহি দুজনায়।

মেঘনাদ বধ

ও

চিত্রাঙ্কনী-প্রতিভা।

['মেঘনাদ বধ' সম্বন্ধে বর্ত্তমান প্রবন্ধলেখক যে সকল মতামত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার সহিত সর্ব্বত্র আমাদের মিল নাই। অনেক স্থলেই লেখক মহাকবির প্রতি অযথা দোষারোপ করিয়াছেন। পাঠক পাঠিকা প্রবন্ধটি পাঠ করিলে সহজেই তাহা বুঝিতে পারিবেন। এ সম্বন্ধে আমাদিগের বক্তব্য ভবিষ্যতে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

ভারতী সম্পাদিকা।

চিত্রাঙ্কন কবিদিগের চির-প্রিয়। কবি কল্পনা অনেক সময় চিত্রাঙ্কনী প্রতিভাকে আশ্রয় করিয়া বিকাশলাভ করে। বৈচিত্র্যময়ী প্রকৃতি, জগতের কবিকুলকে চিরদিন প্রলুব্ধ করিয়াছে ও করিবে। কিন্তু মনুষ্য ব্যতিরেকে প্রকৃতির শোভাও খর্ব্ব হয়, তাই মনুষ্য সৌন্দর্য্যও কবিদিগের স্পৃহনীয় ও বর্ণনীয়। প্রকৃতির এই পরিবর্ত্তনশীল মূর্ত্তি ও তাহার সহিত প্রকৃতিললামভূতা মনুষ্যমূর্ত্তির সজীব চিত্র আঁকিবার ক্ষমতা এবং কল্পনার বলে যাহা অপ্রকৃত তাহাকেও প্রকৃতবৎ চিত্রিত করিবার শক্তিকে মনীষীগণ চিত্রাঙ্কনী প্রতিভা নাম দিয়াছেন। মেঘনাদ বধে মধুসূদনের এই ক্ষমতার কতদূর স্ফূর্ত্তি হইয়াছে, অতঃপর আমরা তাহাই দেখিতে প্রবৃত্ত হইব।

বলা বাহুল্য যে, চিত্রাঙ্কনী-প্রতিভা আপাততঃ আমি বাহ্যপ্রকৃতির চিত্র অঙ্কন ক্ষমতাকেই বলিতেছি। মনুষ্যচরিত্র আঁকিবার ক্ষমতাও এই প্রতিভারই পূর্ণতম বিকাশমাত্র। সে বিষয়ে পরে প্রস্তাব করিবার ইচ্ছা রহিল। কিন্তু ইহাও বলা আবশ্যক যে যথার্থ চিত্রাঙ্কনী-প্রতিভা প্রকৃতির অনুবাদেই পর্য্যবসিত থাকে না, সে প্রকৃতির ভিতর ...

প্রতিষ্ঠা করিয়া সেই সজীব প্রকৃতির মর্ম্মস্থল পর্য্যন্ত দেখিতে পায় ও দেখায়। কালিদাসের সেক্ষপীয়রের ও অন্যান্য মহাকবিগণের চিত্রাঙ্কনী-প্রতিভা এই প্রকারের। কালিদাসের কাছে প্রকৃতির কোনও অংশই নির্জীব নহে, নিরর্থক নহে। কবে কোন আষাঢ়ের প্রথম দিনে কালিদাস একখণ্ড মেঘ দেখিয়াছিলেন—যে মেঘমালা আমাদিগের চক্ষের সম্মুখেও কত সহস্রবার পড়িয়াছে, অথচ আমরা তাহার প্রতি এতটুকুও মনোযোগ করি নাই,—সেই দৃষ্টির ফলস্বরূপ অপূর্ব্ব কাব্য "মেঘদূতের" সৃষ্টি হইল। কবি শেলির চক্ষে একটী সামান্য লজ্জাবতী লতাও কত গভীর ভাবময়ীরূপে প্রতিভাত হইয়াছে। যে প্রতিভাবলে প্রকৃতির এই অন্তর্নিহিত রহস্য নিচয়, প্রকৃতির এই অন্তঃপ্রাণতা, এই অপূর্ব্ব সজীবতা আমাদের গোচরীভূত হয় তাহাই যথার্থ ও উচ্চাঙ্গের চিত্রাঙ্কনী-প্রতিভা।

Emerson কহিয়াছেন—"Shakspere, Homer Dante, Chaucer saw the splendour of meaning that plays over the visible world; knew that a tree had another use than for apples, and corn another than for

tillage and roads: that these things bore a second and a finer harvest to the mind, being Emblems of its thought and conveying in all their natural history a certain mute commentary on human life."

প্রকৃতিকে এইরূপ ভাবে দেখিতে হইলেই প্রতিভার আবশ্যক হয়। যথাযথ প্রকৃতির অনুবাদের জন্য প্রখর দৃষ্টিশক্তি ও সহানুভূতি আবশ্যক হইলেও প্রতিভার আবশ্যক করে। Thompson প্রণীত Seasons এই দরের কাব্য। যখন প্রকৃতিকে অন্তঃসারময় বলিয়া জানিতে হইবে তখন যে তাহার সমস্ত সত্ত্বাও অনুভব করিতে হইবে তাহা বলা বাহুল্যমাত্র। মহাকবিগণ যখন প্রকৃতির কোনও চিত্র উদ্‌ঘাটন করেন তখন তাহার সবটাই দেখান ও আঁকেন। এখানে একটু, ওখানে একটু, এরূপ করিয়া চিত্র অসম্পূর্ণ রাখেন না। তাঁহাদের ঐন্দ্রজালিক তুলিকাস্পর্শে সমগ্র সম্পূর্ণ সজীব একখানি চিত্র আমাদের নয়নের সমক্ষে উপস্থিত হয়। কালিদাসের হিমালয় বর্ণন, সমুদ্রবর্ণন, ও কৈলাসে বসন্ত বর্ণন এইরূপ সম্পূর্ণ চিত্র। ইহাদের কোনও অঙ্গে হানি নাই, প্রত্যেক দ্রষ্টব্য ও বক্তব্য বিষয় কবি দেখাইয়াছেন ও বলিয়াছেন; ছোট বড় কিছুই বাকী রাখেন নাই। শুধু তাহাই নহে, ইহাদের সুখদুঃখ, আমোদ উপভোগ সকলই তিনি দেখিয়াছেন ও বলিয়াছেন। প্রকৃতি শুধু মানুষের উপভোগের উপযুক্ত একটী নির্জীব সামগ্রী, যেমন লোকে ঘরে ছবি সাজায় সেইরূপ বিশ্বসংসারের সজ্জামাত্র এই ভাবিয়া যাঁহারা প্রকৃতির বর্ণনায় প্রবৃত্ত হন তাঁহাদের প্রকৃতি বর্ণনায় প্রাণ নাই, তাহা কেবল সে ভাবের বর্ণনার পক্ষপাতী নহেন। প্রকৃতির অস্তিত্ব তাঁহাদের কাছে একটা স্বতন্ত্র অস্তিত্ব। তাই কালিদাস শকুন্তলাকে পতিগৃহপ্রস্থান কালে সকল আত্মীয়ের কাছে বিদায় লওয়াইয়াই ক্ষান্ত হন নাই, মহর্ষি কণ্বদ্বারা বলাইয়াছেন :—

ভো ভো সন্নিহিত বনদেবতাস্তপোবনতরবঃ।
পাতুং ন প্রথমং ব্যবস্যতি জলং যুষ্মাস্বসিক্তেষু যা
নাদত্তে প্রিয়মণ্ডনাপি ভবতাম্ স্নেহেন যা পল্লবম্।
আদৌ বঃ কুসুম-প্রবৃত্তি সময়ে যস্যা ভবত্যুৎসবঃ
সেয়ং যাতি শকুন্তলা পতিগৃহং সর্ব্বৈরনুজ্ঞায়তাম্॥

তাই তিনি শকুন্তলাকে বিদায়কালীন আশ্রমের বৃক্ষলতার কাছ হইতে বিদায় লওয়াইয়াছেন। তাহার কাছে লতা কেবল মানুষের নয়ন মনোরম নির্জীব পদার্থ নহে, তাহারও প্রাণ আছে, তাহারও ভালবাসিবার ক্ষমতা আছে, ভালবাসাইবার ক্ষমতা আছে :—

পর্য্যাপ্তপুষ্প স্তবক স্তনাভ্যঃ
স্ফুরৎ প্রবালোষ্ঠমনোহরাভ্যঃ।
লতাবধূভ্য স্তঃবোপ্যবাপুঃ
বিনম্রশাখা ভুজবন্ধনানি॥

এইরূপ তাঁহার কাছে নদ নদী বন পর্ব্বত সমুদ্র লতা পাতা সকলই প্রাণময় সুখদুঃখময়, কেবল মৃত নির্জীব দৃশ্যমাত্র নহে।

এইরূপ চিত্রাঙ্কনী-প্রতিভার সৃষ্টির জন্য কল্পনাশক্তির তত আবশ্যক না থাকিতে পারে, কিন্তু সেই বৃক্ষটীর অথবা সেই ফুলটুকুর ভিতর কতখানি জীবনীশক্তি আছে তাহা ধরিতে হইলে কল্পনার সাহায্য চাই। যদি প্রকৃতির সমগ্র সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে হয় তাহা হইলে তাহাকে কেবল জড় পদার্থ ভাবিয়া তাচ্ছিল্য করিলে চলিবে না। অথবা প্রকৃতির উপর সর্ব্বদা কবির নিজ ভার অর্পণ অথবা

করিলেও তাহার প্রতি যথেষ্ট অত্যাচার করা হয়। আমার মনে সুখ নাই অতএব আমি লিখিব যে প্রকৃতিও যেন ম্লানমুখী হইয়া রহিয়াছে; ইহা করিলে মনে হয় যেন প্রকৃতির সৃষ্টি মানুষের মন যোগাইবার জন্যই হইয়াছিল! প্রকৃতির প্রতি নিজ ভাবারোপ (ইংরাজিতে যাহাকে Pathetic fallacy বলে) স্বার্থপরতার নিদর্শন। প্রকৃতিকে নিঃস্বার্থভাবে ভালবাসা, প্রকৃতিকে তাহারই জন্য ভালবাসা —ইহাই উচ্চাঙ্গের কল্পনার কার্য্য। যখন কবির মনে এই নিঃস্বার্থভাবের উদয় হয় তখন আর তিনি প্রকৃতিকে স্বীয়ভাবচালিত পদার্থমাত্র বলিয়া ভাবিতে পারেন না। ইংরাজ কবি স্কট সম্বন্ধে রস্কিন যাহা বলিয়াছেন তাহা খাঁটি সত্য। তিনি বলিয়াছেন:—

And first observe Scott's habit of looking at nature neither as dead or merely material in the way that Homer regards it, nor as altered by his own feelings in the way that Keats and Tennyson regard it, but having an animation and pathos of *its own,* wholly irrespective of human presence and passion—an animation which Scott loves and sympathises with, as he would with a fellow creature, forgetting himself altogether and subduing his own humanity before what seems to him the power of the landscape.

Modern Painters vol. III. p. 256.

নিজের অথবা নিজসৃষ্ট চরিত্রের সুখ-দুঃখানুসারে প্রকৃতিরও সুখ দুঃখ নিয়ন্ত্রিত হইবে এরূপ সর্ব্বদা যে কবি মনে করেন অন্ততঃ তাঁহার প্রকৃতির সহিত সহৃদয় সহানুভূতি নাই তাহা ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইবার প্রয়োজন নাই। তাহাতে স্বার্থপরতার নিদর্শন এত অধিক পাওয়া যায় যে তাহার ভিতর কবিত্ব থাকিলেও মহত্ত্বের অভাব পরিস্ফুট হইয়া পড়ে। সীতা-বিরহ-বিধুর রামচন্দ্র পম্পা নদীর শোভা দেখিয়া কহিয়াছিলেন:—

মাল্ত শোকাভিসন্তপ্তমাধবঃ পীড়য়ন্তি বৈ।
ভরতস্য চ দুঃখেন বৈদেহ্যা হরণেন চ॥
শোকার্ত্তস্যাপি মে পম্পা শোভতে চিত্রকাননা।
ব্যবকীর্ণা বহুবিধৈঃ পুষ্পৈঃ শীতোদকা শিবা॥

আর্য্য রামায়ণম্, কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডম্ ১ম সর্গঃ।

তৎপরে মহর্ষি বাল্মীকি পম্পার সমগ্র শোভা রামচন্দ্রের মুখ দিয়া প্রকাশিত করিয়াছেন।

স্কট-কৃত Greta নামক স্থানের ঠিক এইরূপ একটি বর্ণনাকে লক্ষ্য করিয়া রস্কিন কহিয়াছেন,—

"Is Scott or are the persons of his story gay at this moment? Far from it. Neither Scott nor Risingham are happy but the Greta is; and all Scott's sympathy is ready for the Greta on the instant.

Observe therefore this is not pathetic fallacy; for there is no passion in Scott which alters nature. It is not the lover's passion making him think the larkspurs are listening for his lady's foot &c. Modern Painters Voll. III. Pp. 256-57.

পুনশ্চ—This feeling is quite universal with us, only varying in depth according to the greatness of the heart that holds it; and in Scott, being more than usually intense and accompanied with infinite affection and quickness of sympathy, it enables him to conquer the pathetic

fallacy and instead of making nature anywise subordinate to him he makes himself subordinate to her, follows her lead simply—does not venture to bring his own cares and thoughts into her pure and quiet presence—paints her in the simple and universal truth adding no result of momentary passion and fancy and appears therefore at first shallower than other poets being in reality wider and healthier.

Modern Painters vol. III. P. 257.

এইরূপ নিঃস্বার্থ ও বিনয়নম্র ভাবে প্রকৃতিপ্রেমিক হওয়ার ফল স্কটের পক্ষে কি হইয়াছিল তাহা রস্কিন প্রকাশ করিয়াছেন,—

"And in consequence of this unselfishness and humility, Scott's enjoyment of nature is incomparably greater than that of any other poet I know".

Modern Painters vol. III. 258.

রস্কিন যে মত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহার যাথার্থ্য আমাদিগের সকল মহাকবিগণের প্রকৃতি-চিত্র হইতে উপলব্ধি করিতে পারা যায়। বিরহ-ক্লিষ্ট যক্ষের মুখে কালিদাস প্রকৃতির যেরূপ চিত্র আঁকিয়াছেন, এবং রামায়ণ হইতে পূর্ব্বে যে চিত্র উদ্ধৃত করিয়াছি তাহা হইতেই তাহা বেশ বুঝা যাইবে। এখানে উদাহরণ বাহুল্যের প্রয়োজন নাই। পরে আরও দুএকটা চিত্র আমাদিগকে তুলনার্থ উদ্ধৃত করিতে হইবে।

মাইকেল মধুসূদনের মেঘনাদ-বধে এই হিসাবের প্রকৃতি চিত্র কতখানি আছে তাহাই আমরা এইবার দেখিতে চেষ্টা করিব। মেঘনাদবধে প্রকৃতি-চিত্র অনেক আছে তাহা সকলেই জানেন। অনেক স্থলেই চিত্রগুলি মন্দ নহে তাহাও স্বীকার করিতে বাধা নাই। কিন্তু তথাপি আমি যতদূর বুঝিতে পারি তাহাতে আমার মনে হয় যেন মাইকেলের সেই সকল চিত্রগুলির সহিত মাইকেলের অথবা তৎসৃষ্ট চরিত্রগুলির যথার্থ সহানুভূতি নাই। তিনি কিম্বা তাঁহার চরিত্রগুলি যেন প্রকৃতির সর্ব্বাঙ্গীন সৌন্দর্য্য বা তাহার চির-বৈচিত্র্যময় রূপ হৃদয়ে প্রতিফলিত করিতে পারেন না। তাই তাঁহার প্রকৃতির চিত্রেও বৈচিত্র্য আদৌ বিদ্যমান্ নাই। কথাটা পরিষ্কার করিবার জন্য কতকগুলি উদাহরণের প্রয়োজন হইবে।

কিন্তু তাহার পূর্ব্বে আর একটা কথা বলিয়া রাখিতে ইচ্ছা করি। মাইকেলের প্রকৃতিচিত্রে বৈচিত্র্যের যেমন অভাব, বিরাটত্বেরও তেমনি সম্পূর্ণ অভাব। শুধু তাহাই নহে তাঁহার প্রকৃতিচিত্রেও অবিবেকের যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইবে। মাইকেল মেঘনাদবধে প্রকৃতির বিরাট মূর্ত্তির ছবি তুলিবার অবকাশ পাইয়াছিলেন কিন্তু তাহা তিনি করেন নাই। তাঁহার চিত্রগুলি সকলই খণ্ডচিত্র। মেঘনাদ-বধে কোথাও আকাশের বিরাট মহত্ত্ব প্রতিফলিত দেখিতে পাই না, সমুদ্রের চিত্র আছে বটে কিন্তু তাহাতে সমুদ্রের বিশালত্ব আমরা অনুভব করিতে পারি না।

তাঁহার রামসেতু-সমন্বিত সমুদ্রের চিত্র এই :—

এইরূপে আক্ষেপিয়া রাক্ষস-ঈশ্বর
রাবণ ফিরায়ে আঁখি দেখিলেন দূরে
সাগর-মকরালয়। মেঘশ্রেণী যেন
অচল, ভাসিছে জলে শিলাকুল বাঁধা
দৃঢ় বাঁধে। দুই পাশে তরঙ্গনিচয়
ফেনাময়, ফণাময় যথা ফণিবর
উথলিছে নিরন্তর গম্ভীর নির্ঘোষে।

অপূর্ব্ব বন্ধন সেতু, রাজ-পথ-সম
প্রশস্ত ; বহিছে জলস্রোতঃ কলরবে
স্রোত পথে জল যথা বরিষার কালে।

এই চিত্রে সমুদ্রের ভীষণ অথচ মনোহর মহত্ত্বের কিছুমাত্র পরিচয় নাই। তাহা তো নাইই তদ্ভিন্ন চিত্র উপমার লঘুত্বে অত্যন্ত খর্ব্ব হইয়া পড়িয়াছে। অবান্তর হইলেও এখানে একটা বিষয়ের উত্থাপন করিয়া রাখা প্রয়োজন মনে করিতেছি। কাব্যে অলঙ্কারের প্রয়োজন হয় কেন ? কাব্যের স্বাভাবিক শোভা বর্দ্ধন করিবার জন্য। কাব্যাদর্শে আছে অলঙ্কার কাব্যশোভাকর ধর্ম্ম। অলঙ্কারের সমীচীন ব্যবহারে কাব্যের শোভা বর্দ্ধিত হয় ইহা কেহই অস্বীকার করিতে সাহসী হইবেন না। জগতের সকল মহাকবিই অলঙ্কারের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু অলঙ্কার সর্ব্ব সময়েই শোভা-পরিপুষ্টির জন্যই ব্যবহৃত হওয়া উচিত, স্বাভাবিক শোভা ঢাকিবার বা খর্ব্ব করিবার জন্য অলঙ্কার ব্যবহৃত হওয়া কদাপি বিধেয় নহে। ইহা একটী সহজ সত্য। যে অলঙ্কারের দ্বারায় ভাব বা চিত্র বিশদ ও পরিস্ফুট হয় তাহা আদরের জিনিষ, যাহা তাহার বিপরীত তাহা সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়। অলঙ্কারের মধ্যে উপমা একটি শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার ও কবিগণ অধিকাংশ স্থলেই উপমার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত কহিয়াছেন—"উপমা কাব্যের অলঙ্কার ; যেমন রত্ন ভূষণে সুন্দরীকে আরও সুন্দর দেখায়, সেইরূপ উপমায় সুন্দর কাব্য আরও সুন্দর হয়।" শুধু তাহাই নহে ; উপমা সাদৃশ্য-প্রকাশক অলঙ্কার ; অতএব উপমাদ্বারা কবিগণ চিরদিন বর্ণনীয় বস্তুকে সুন্দরতর ভাবে প্রকাশিত ও পরিস্ফুট করিবার [illegible] পাইয়াছেন। একটী বিরাট বস্তুর সহিত অপর একটী বিরাট-বস্তুর তুলনা করিলে তবে সে তুলনা সুন্দর হয়, ও ভাবব্যঞ্জক ও মহত্ত্বপ্রকাশক হয়। একটী মাত্র উদাহরণে কথাটি পরিষ্কার বুঝা যাইবে।

রঘুবংশের ত্রয়োদশ-সর্গে কালিদাস রাম-সেতুবিভক্ত সমুদ্রের বর্ণনা করিয়াছেন। সেই বর্ণনার অবতারক শ্লোক এই :—

বৈদেহি পশ্চামলয়াদ্ বিভক্তম্
মৎসেতুনা ফেনিলমম্বুরাশিম্।
ছায়াপথেনেব শরৎপ্রসন্ন
মাকাশমাবিষ্কৃত চারুতারম্॥

এই একটি উপমায় সমুদ্রের সৌন্দর্য্য, বিশালত্ব, গভীর রহস্যাত্মিকতা কেমন ফুটিয়া উঠিয়াছে ! উপমার ইহাই সার্থকতা। আপনারা দেখিবেন যে কালিদাস সমুদ্রের সহিত কেবল তারকাময় আকাশের তুলনা করিয়াছেন—চন্দ্রমা-শোভিত আকাশের সহিত তুলনা করেন নাই, কারণ তাহা হইলে আকাশের গাম্ভীর্য্য থাকিত না। মাইকেল মধুসূদন দত্ত ঠিক এমনি স্থলে কি করিয়াছেন ? "ছায়াপথেনেব শরৎপ্রসন্নমাকাশমাবিষ্কৃত চারুতারম্" ইহার পরিবর্ত্তে রাজপথ ও তাহার পার্শ্বস্থ দীপমালা আনিয়া ফেলিয়াছেন ও সমুদ্রের সহিত অবিরোধে সেই স্রোতঃপথের ও সেতুর সহিত রাজ-পথের তুলনা করিয়া বসিয়াছেন। এই উপমাদ্বারা সেতু-বদ্ধ সমুদ্রের চিত্র যে কতদূর খর্ব্ব হইয়াছে, তাহা কাহাকেও বুঝাইয়া দিবার আবশ্যক করে না। এই একটী চিত্রেই মধুসূদনের অবিবেকিত্ব ও বিরাট চিত্র ধারণ করিবার অক্ষমতা জাজ্জ্বল্যমান হইয়াছে !

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে মাইকেলের চিত্র অধিকাংশই খণ্ডচিত্র। শুধু খণ্ড নহে এই

চিত্রগুলি প্রায়ই অসম্পূর্ণ চিত্র। মধুসূদন যখন রাত্রিবর্ণনা করেন তখন শুধু রাত্রিইবর্ণনা করেন, রাত্রিকালের আকাশের মূর্ত্তি বর্ণনা করেন না। যতটুকু বর্ণনা করেন, ততকুটু মন্দ হয় না—

"আইলা সুচারু তারাশশী সহ হাসি
শর্ব্বরী, সুগন্ধবহ বহিল চৌদিকে,
সুস্বনে সবার কাছে কহিয়া বিলাসী
কোন্ কোন্ ফুল চুম্বি কি ধন পাইলা।"

কিন্তু ইহা নিশাক্রান্তা প্রকৃতির খণ্ডচিত্র মাত্র, ইহাতে রজনীর মূর্ত্তি বর্ণনা নাই, আকাশের মূর্ত্তি বর্ণনা নাই, চন্দ্রালোকে প্রকৃতির কি রূপান্তর হয় তাহারও কোনও ইঙ্গিত নাই, কোন ফুলেরও বর্ণনা নাই!

তাঁহার ঊষা বা গোধূলি বর্ণনাও এই ধরণের,—সুন্দর কিন্তু অসম্পূর্ণ। তাঁহার পঞ্চবটী-চিত্রও এইরূপ। তাহাতে আমরা পঞ্চবটীর বনত্ব দেখিতে পাই না, সেই বনের মধ্যে যে একটাও বড় গাছ আছে তাহাও বুঝিতে পারিনা, তাহা যেন একটী উপবন—বেশ সাজান গোজান একখানি বাগান, বড় বাগান বটে! রামায়ণে সেই

শালৈস্তালৈস্তমালৈশ্চ খর্জ্জুরৈঃ পনসদ্রুমৈঃ।
নীবারৈ স্তিনিশৈশ্চৈব পুন্নাগৈশ্চোপশোভিতাঃ॥

বন ও পর্ব্বতভূমির সাক্ষাৎ পাইবার কোনও সম্ভাবনা এখানে নাই। মাইকেল মধুসূদন অরণ্যাণী বা অরণ্যাণী সমাকুল পর্ব্বতাবলীর উদ্দাম দৃশ্য কল্পনার বলে মনশ্চক্ষে দেখিতে পাইতেন না। তাই তিনি কেবল কৃত্রিম উদ্যানবর্ণন করিয়াছেন—সেবর্ণনায় ফুল আছে, ফুলের পরিমল আছে, চাঁদ আছে, মলয়মারুত সব সময়েই বর্ত্তমান আছে, ভ্রমর গুঞ্জন আছে, পাখীর ডাক 'রাতবিরেতে' যখনই তাঁহার প্রয়োজন তখনই আসিয়া পড়িয়াছে, এ সকলের সঙ্গে সঙ্গে একটী করিয়া ফোয়ারাও, আছে, কিন্তু কোনটিতেই প্রাণ নাই; তাই বৈচিত্র্যও নাই। সেই কথা এখন প্রমাণ করিবার সময় আসিয়াছে।

মেঘনাদবধের প্রথম সর্গে ইন্দ্রজিতের প্রমোদকানন বর্ণনা যথা—

চারিদিকে রম্য বনরাজি—
নন্দন-কানন যথা। কুহরিছে ডালে
কোকিল; ভ্রমরদল ভ্রমিছে গুঞ্জরি;
বিকশিছে ফুলকুল, মর্ম্মরিছে পাতা;
বহিছে বসন্তানিল, ঝরিছে ঝর্ঝরে নির্ঝর।

দ্বিতীয় সর্গে উমার আগমনে শিবের তপোভূমির রূপান্তর—

"অমনি চৌদিকে
প্রফুল্লিল ফুলকুল, মকরন্দ লোভে
মাতি শিলীমুখবৃন্দ আইল ধাইয়া
বহিল মলয় বায়ু, গাইল কোকিল;
নিশার শিশিরে ধৌত কুসুম-আসার
আচ্ছাদিল শৃঙ্গবরে!

তৃতীয় সর্গে কানন বর্ণনা—

এতেক কহিয়া দোঁহে পশিলা কাননে
যথায় সরসীসহ খেলিছে কৌমুদী
হাসাইয়া কুমুদীরে, গাইছে ভ্রমরী—
কুহরিছে পিকবর; কুসুম ফুটিছে;
শোভিছে আনন্দময়ী বনরাজি ভালে
মণিময় সিঁথীরূপে জোনাকের পাঁতি;
বহিছে মলয়ানিল, মর্ম্মরিছে পাতা।

তৃতীয় সর্গে প্রমীলা লঙ্কায় ইন্দ্রজিৎ-ভবনে আসিতে না আসিতেই—

ভুলি নিজ দুঃখ পিঞ্জর-মাঝে
গায় পাখী, উথলিল উৎস কলকলে
সুধাংশুর অংশু-স্পর্শে যথা অম্বুরাশি!
বহিল বসন্তানিল মধুর স্বননে;

পঞ্চম সর্গে

গাইছে জাগিয়া
তরুশাখে মধুসখা, খেলিছে অদূরে
জলযন্ত্র, সমীরণ বহিছে কৌতুকে
পরিমল-ধন লুটি কুসুম-আগারে।

এইরূপ মধুসূদনের জন্য সর্ব্বদাই পাখীর গান, বসন্তানিল, ফুলকুল ও জলযন্ত্র প্রস্তুত আছে। রঙ্গ-ভূমিতে দর্শক তাড়াইবার জন্য প্রতি অঙ্কের পর যেমন ঐক্যতান বাদ্য নামক একরকম গণ্ডগোল উপস্থিত হয়, সেইরূপ মেঘনাদ বধেও "কূজনিল পাখী আর বসন্তানিল" দেখা দেয়। ইহার কারণ আর কিছুই নহে, কেবল প্রকৃতির সহিত মধুসূদনের যথার্থ সহানুভূতির অভাব।

মেঘনাদ বধের প্রকৃতিবর্ণনায় আর একটী বিষয় চোখে পড়ে। মাইকেল নিজের মনের ভাব অথবা নিজসৃষ্ট চরিত্রের মনের ভাব প্রায়ই প্রকৃতির উপর অর্পণ করেন। উৎপ্রেক্ষা অথবা pathetic fallacy কাব্যালঙ্কার বটে, কিন্তু প্রকৃতিবর্ণনে মহাকবিগণ উপমার ব্যবহার ভালবাসেন, উৎপ্রেক্ষার আশ্রয় গ্রহণ করেন না। কখন কখন প্রকৃতির বর্ণনা ফুটাইবার জন্য উৎপ্রেক্ষার প্রয়োজন হয় বটে, কিন্তু তাহা দ্বারা বর্ণিত বিষয়ের স্বাভাবিকতা নষ্ট হয় না। বরং তাহাতে তাহাদের সজীবতা উৎকর্ষ লাভ করে; যথা—

শ্রুতিসুখ ভ্রমর-স্বনগীতয়ঃ
কুসুম-কোমল দন্তরুচো বভুঃ
উপবনান্তলতাঃ পবনাহতৈঃ।
কিসলয়ৈঃ সাগরৈরিব পাণিভিঃ॥

মাইকেলের উৎপ্রেক্ষা এরূপ প্রথার অনুসারী নহে; কোথায় রাক্ষস সৈন্য সাজিতেছে আর অমনি "গর্জ্জিলা বারীশ রোষে"; প্রমীলা যেই সঙ্গিনীসহ বাহির হইলেন, অমনি "টলিল কনক-লঙ্কা, গর্জ্জিল জলধি।" যেই ইন্দ্রজিতের পতন হইল, অমনি "থর থরি কাঁপিলা বসুধা, গর্জ্জিলা উথলি সিন্ধু! ভৈরব আরাবে সহসা পূরিল বিশ্ব।" লঙ্কার বিপদ ভাবিয়া—

গম্ভীর নির্ঘোষে দূরে ঘোষিলা সহসা
ঘনদল, বৃষ্টিছলে গগন কাঁদিলা,
কল্লোলিলা জলপতি, কাঁপিলা বসুধা
আক্ষেপে, রে রক্ষঃপুরি তোর এ বিপদে,
জগতের অলঙ্কার তুই স্বর্ণময়ি!

রাবণের সৈন্য সাজিতেছে—"অমনি কল্লোলিলা উথলিয়া সভয়ে জলধি।" অধীর ভূধর-ব্রজ—যেই দেবসৈন্য ও রাক্ষস সৈন্য যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন অমনি—টলটলে টলিল কনক লঙ্কা-গার্জ্জিলা জলধি। এইরূপ মাইকেলের প্রয়োজন মত 'জলধির গর্জ্জন' মেঘনাদবধে সর্ব্বদাই মজুত আছে। মলয়ানিলের তো কথাই নাই। মেঘনাদ বধে সকলকার জন্যই যখন তখন বসন্তানিল বহিতেছে। মেঘনাদের কাছে প্রমীলা আসিলেন, তাঁহারা খুব সুখী হইলেন, বামাদল নাচুক গাহুক; যন্ত্রীরা বাজনা বাজাক আপদ চুকিয়া যাক্, তা নয় পিঞ্জরের পাখীর নিজ দুঃখ ভুলিয়া না গাইলে নিস্তার নাই; তাহাও না হয় হইল, কিন্তু উৎস বেচারার উপর নিগ্রহ কেন? কেহ যদি কল টিপিয়া দিত তাহা হইলে তাহার নাচাকুঁদা বেশ বুঝা যাইত, কিন্তু এখানে তা নয়, যেমন সমুদ্রের জল চাঁদ দেখিলে উচ্ছলিত হয়, তেমনি উৎসও আপনা আপনি উছলিয়া উঠিল! বসন্তানিল তো আছেনই!

ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে মাইকেলের হস্তে পড়িয়া প্রকৃতি সুন্দরী নিতান্ত পরাধীনা হইয়া পড়িয়াছেন। তাহার নিজের

সুখদুঃখ এমন কি অস্তিত্ব পর্য্যন্ত মেঘনাদবধ কাব্যের পাত্রগুলির ইচ্ছা বা সুখদুঃখের অধীন। ইহাকে প্রকৃতির প্রতি অত্যাচার বা অবিচার বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। আমার বক্তব্য যে কবি প্রকৃতির নিজমূর্ত্তি চিত্রিত করুন, মানুষের সুখ দুঃখের সহিত প্রকৃতির মূর্ত্তির পরিবর্ত্তন স্বাভাবিক বা সত্য নহে; সেই স্বাভাবিক মূর্ত্তির অস্বাভাবিক বিকৃতি দেখিলে ভাল লাগে না।

আর একটা উদাহরণ দিয়া এই কথাটা বুঝাইবার প্রয়াস করিব। লঙ্কার অশোক বন—অনন্ত সৌন্দর্য্যময় অশোকবন, সেই অশোকবনে রাবণ সীতাকে প্রলুব্ধ করিবার মানসে রাখিয়াছিল। সেই অশোকবন কত সুন্দর তাহা মহর্ষি বাল্মীকি রামায়ণের সুন্দর-কাণ্ডে পঞ্চদশ সর্গে সবিস্তার বর্ণন করিয়াছেন —দীর্ঘ বলিয়া তাহা এখানে উদ্ধৃত করিবার লোভ সম্বরণ করিলাম। সেই বর্ণনার আরম্ভ ও শেষ এই :—

সন্তানক লতাভিশ্চ পাদপৈরুপশোভিতাম্।
দিব্যগন্ধরসোপেতাং সর্ব্বতঃ সমলঙ্কৃতাম্॥
তাংস নন্দনসঙ্কাশাং মৃগপক্ষিভিরাবৃতাম্।
হর্ম্ম্যপ্রাসাদসম্বাধাং কোকিলাকুল নিস্বনাম্॥

* * * *

দ্বিতীয়মিবচাকাশং পুষ্পজ্যোতির্গণায়ুতম্।
পুষ্পরত্নশতৈশ্চিত্রং পঞ্চমং সাগরং যথা॥
সর্ব্বর্ত্তু পুষ্পৈ র্নিচিতং পাদপৈর্ম্মধুগন্ধিভিঃ।
নানানিনাদৈরুদ্যানং রম্যং মৃগগণদ্বিজৈঃ॥
অনেকগন্ধপ্রবহং পুণ্যগন্ধং মনোহরম্।

এই বর্ণনার মধ্যে পশু পক্ষী বৃক্ষ লতা পুষ্প কেহই নিজ কার্য্য ভুলিয়া সীতার দুঃখে কাঁদিতেছে না, সকলেই নিজ নিজ কার্য্য করিয়া সেই বনস্থলীকে অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে বিভূষিত করিয়া রাখিয়াছে। কিন্তু সোনার পিঞ্জরে থাকিয়াও বিহঙ্গিনী সুখিনী হয় না তাই সেই নন্দনকানন তুল্য অশোক বনে থাকিয়াও সীতাদেবী পতিবিরহ ব্যথায় মুহ্যমানা। সেই শোককর্ষিতা দেবীমূর্ত্তি মহর্ষি তদীয় পুণ্যতুলি-কার স্পর্শে আমাদের নয়নের সমক্ষে যেন জীবন্ত করিয়া ধরিয়াছেন। আমরা সে মূর্ত্তি যেন স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করিতে পারি।

মেঘনাদবধের বর্ণনা সম্পূর্ণ অন্যরূপ। সে বর্ণনায় সীতাদেবীর শোককর্ষিতা মূর্ত্তি তো ফোটেই নাই, তা ছাড়া তেমন যে মনোরম অশোকবন, তাহাও যেন মেঘে ঢাকা পড়িয়াছে।

স্বনিছে পবন দূরে রহিয়া রহিয়া,
উচ্ছ্বাসে বিলাপী যথা। নড়িছে বিষাদে
মর্ম্মরিয়া পাতাকুল। বসেছে অরবে
শাখে পাখী! রাশি রাশি কুসুম পড়েছে
তরুমূলে; যেন তরু তাপি মনস্তাপে,
ফেলিয়াছে খুলি সাজ! দূরে প্রবাহিনী
উচ্চ বীচি-রবে কাঁদি, চলিছে সাগরে
কহিতে বারীশে যেন এ দুঃখ-কাহিনী!
না পাশ সুধাংশু-অংশু সে ঘোর বিপিনে।

মহর্ষি বাল্মীকি যে চক্ষে অশোকবন দেখিয়াছিলেন তাহা প্রকৃতি সুন্দরীর প্রতি ভালবাসার চক্ষে। মাইকেল যে চক্ষে সে দৃশ্য দেখিয়াছেন তাহাতে সীতা দেবীর সহিত যথেষ্ট সহানুভূতি প্রকাশ পাইয়াছে, সন্দেহ নাই; কিন্তু প্রকৃতির সহিত সহানুভূতি তাহাতে আদৌ প্রকাশ পায় নাই। মাইকেলের উৎপ্রেক্ষায় যে কবিত্ব নাই, তাহা আমি বলিতেছি না, কিন্তু এ কবিত্ব এত উর্দ্ধগামী নহে, যাহাতে কবিকে বলিতে হয়,—

What am I? that I should trouble

this sincere nature with my thoughts. I happen to be feverish and depresed and I could see a great many sad and stange things in these wave and flowers, but I have no business to see such things."

—Ruskin Modern Painters, Vol. III. 257.

এই উচ্চ ভাব মাইকেলের প্রকৃতি চিত্রে আদৌ বর্ত্তমান নাই। তাঁহার মেঘনাদবধ কাব্যে প্রকৃতি, তৎসৃষ্ট চরিত্র গুলির খেলিবার সামগ্রী মাত্র। তাহাদের যখন প্রয়োজন হয় তখন প্রকৃতি হাসে, তাহাদের যখন মনে সুখ নাই তখন প্রকৃতি কাঁদে, তাহাদের যখন আবশ্যক তখন প্রকৃতি শান্তমূর্ত্তি ধারণ করে, আবার তাহাদেরই প্রয়োজনমত প্রকৃতিকে জোর করিয়া রাগ করিতে হয়। যেই চিত্র-রথের চুপি চুপি লঙ্কায় আসা প্রয়োজন হইল, অমনি,

হুহুঙ্কারি বায়ুকুল বাহিরিল বেগে
যথা অম্বুরাশি, যবে ভাঙ্গে আচম্বিতে
জাঙ্গাল, কাঁপিল মহী গর্জ্জিল জলধি!
তুঙ্গশৃঙ্গধরাকারে তরঙ্গ-আবলী
কল্লোলিল, বায়ু সঙ্গে মাতি!
ধাইল চৌদিকে মন্দ্রে জীমূত, হাসিল
ক্ষণপ্রভা, কড়মড়ে নাদিল দম্ভোলি
পলাইলা তারানাথ তারাদল লয়ে,
ছাইল লঙ্কায় মেঘ পাবক উগরি,
রাশি রাশি বনে বৃক্ষ পড়িল উপড়ি
মড়মড়ে, মহাঝড় বহিল আকাশে
বর্ষিল আসার যেন সৃষ্টি ডুবাইতে
প্রলয়। বৃষ্টিল শিলা তড়-তড়-তড়ে।

এই বর্ণনাটী শুনিতে খুব জম্‌কালো হইয়াছে, বোধ হয়; কিন্তু একটু অনুধাবন করিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে যে ইহার সহিত মাইকেলের সহানুভূতি নাই, তিনি ইহাতে এক কথাই বার বার বলিয়াছেন। ধাইল চৌদিকে মন্দ্রে জীমূত, কড়মড়ে নাদিল দম্ভোলি, ছাইল লঙ্কায় মেঘ পাবক উগরি,' এক কথার পুনরাবৃত্তি মাত্র।

আমি নির্ভীক চিত্তে বলিতে পারি যে, ইহা অপেক্ষা আমাদিগের গ্রাম্যকবি কবিকঙ্কণের 'ঝড়' বর্ণনা অধিকতর স্বাভাবিক। মাইকেলের বর্ণনা প্রাণহীন হইবার আর একটা কারণ এই যে এ বর্ণনা তাঁহার নিজস্ব নয়, এই স্থলে তিনি সম্পূর্ণরূপে Virgil এর নিকট ঋণী। পর্ব্বতের একটা গহ্বরের ভিতরে বায়ুকুল রুদ্ধ থাকে ইহা এক অদ্ভুত কল্পনা; কিন্তু অদ্ভুত ও অস্বাভাবিক হইলেও ইহা গ্রীকগণ কর্ত্তৃক কল্পিত ও Virgil কর্ত্তৃক বর্ণিত; অতএব মাইকেলের পক্ষে সে বর্ণনার প্রতি-চ্ছায়া গ্রহণের লোভ অসম্বরণীয়! কিন্তু ইহাই ইহার অস্বাভাবিকতার একমাত্র কারণ নহে, তাহার প্রধান কারণ, মাইকেলের প্রকৃতিকে নিজের ইচ্ছাধীন করিবার বাসনা। যতক্ষণ চিত্ররথের সুবিধার জন্য ঝড় বহিবার প্রয়োজন, ততক্ষণই মাইকেলের ঝড় বহিবে, আর যেই চিত্ররথ অস্ত্রদিয়া প্রস্থান করিলেন, অমনি—

থামিল তুমুল ঝড়, শান্তিলা জলধি
হেরিয়া শশাঙ্কে পুনঃ তারাদল সহ
হাসিল কনক লঙ্কা।

তারকাসুরের পুরে প্রকৃতি সুন্দরীর যেমন দুর্দ্দশা, মেঘনাদবধ কাব্যেও তাহার তেমনই দুরবস্থা। এবং এই জন্যই আমি মেঘনাদ বধের প্রকৃতি চিত্রের সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিতে না পারায়, অন্তরের সহিত প্রশংসা করিতে পারিলাম না।

সাগর উদ্দেশে।

সীমাহীন ওগো পারাবার,
বহু বর্ষ পরে আজি হ'ল যদি দেখা,
শোন তবে একবার, শুধু একবার,
পদ-প্রান্তে দাঁড়াইয়া ভ্রস্তভক্ত একা
ক্ষীণ বিকম্পিত কণ্ঠে করে দীন যেই নিবেদন,—
হে অনন্ত, হে ভয়াল, হে সুন্দর, করহ শ্রবণ!

হেরিতেছি উদ্দাম উল্লাস,
সেই দৃপ্ত আস্ফালন তব নিরবধি!
আজো অনাহত গর্ব্বে তুমি বারমাস
প্রমত্ত তরঙ্গ-ভঙ্গে বহিছ জলধি!
কালের প্রভাব বলে আজো তুমি হও নাই নত;
সৃষ্টির আদিম ক্ষণে যাহা ছিলে, আজো সেই মত!

কিন্তু, হায়—হে দেব মহান,
পঞ্চদশ বর্ষ পূর্ব্বে আমারে যখন
প্রথম দেখিয়াছিলে—লঘু, স্বচ্ছ-প্রাণ,
—ওই তব হাস্যোজ্জ্বল লহরী মতন—
তব এই উপকূলে, কোথা মোর অহো সেইদিন!
—আজি আমি অবসন্ন, সুখহারা, কলঙ্ক-মলিন!

সংসারের মোরা তুচ্ছ প্রাণী
পদে পদে নিয়তির নির্ম্মম পেষণে
দলিত, বিধ্বস্ত হ'য়ে পরাজয় মানি'
তিলে তিলে লভিতেছি সঙ্কীর্ণ মরণে!
আর তুমি? হাহাকারে নিরন্তর মত্তবেগে ধাও,
দুর্দ্দম উৎসাহে ক্ষুব্ধ; কি করিবে ভাবিয়া না পাও।

কি করিবে পার না বুঝিতে?
স্বার্থের সংঘর্ষে নিত্য যবে বসুন্ধরা
—আপনার পাপ-ভার না পারে বহিতে—
হ'য়েছে বিদ্বেষ-হিংসা-প্রবঞ্চনা ভরা।
পার নাকি তাহে এবে গ্রাসিবারে অম্বুরাশি দিয়া?
পার নাকি একেবারে এ যাতনা দিতে জুড়াইয়া?

আছাড়িয়া পড়ি'ছ নিয়ত
ধরিত্রীর প্রান্তে তবে কেন বারম্বার?
রোগ-শোক-দুঃখ তা'র হেরি অবিরত
অনুকম্পা জেগেছে কি অন্তরে তোমার?
তাই যদি,—হে বারিধি, এ জ্বালার কর অবসান,
—তোমার শীতল অঙ্কে এ মহীরে দেহ তবে স্থান!

কিম্বা তুমি প্রচণ্ড আগ্রহে,
দুরন্ত প্রণয় বশে, প্রেমিক প্রধান,—
(হেরি' বেদনার বিষে বিশ্ব সদা দহে,)
কহিছ কলঙ্কী-জীবে করিয়া আহ্বান—
'সঙ্কীর্ণতা পরিহরি' অসীমের লইতে সংবাদ
আয় মোর উপকূলে, নিয়ে যা রে মোর আশীর্ব্বাদ'!

ব্যথাতুর এ বিরস হিয়া
তাই হে পাথার, আজি তোমারি চরণে
এনেছি বহিয়া আমি, দেহ জুড়াইয়া
জীবনের সর্ব্ব জ্বালা তরঙ্গ-প্লাবনে!
অন্ধ আমি; তোমাতেই হেরিতেছি মহিমার আলো!
ক্ষুদ্র আমি; তবু তোরে হে অনন্ত, বাসিয়াছি ভালো!

শ্রীদেবকুমার রায়চৌধুরী।



...ণের শক্তিশেল

স্বর্গীয় ত্রিপুরাধীশ্বর।

মহারাজ রাধাকিশোর দেববর্ম্ম ধর্ম্মার্ণব মাণিক্য বাহাদুর।

সম্প্রতি ভারতের পূর্ব্বাকাশ হইতে একটী সমুজ্জ্বল নক্ষত্র অকালে অস্তমিত হইয়াছে। ত্রিপুরার অধীশ্বর মহারাজ রাধাকিশোর দেববর্ম্ম "ধর্ম্মার্ণব" মাণিক্য বাহাদুর; মোটর গাড়ীর দুর্ঘটনায়, বিগত ২৮শে ফাল্গুন রাত্রি ৮ ঘটিকার সময় নিজের প্রজাবর্গ, কর্ম্মচারিবর্গ এবং পরিজনবর্গকে অকূল শোকসাগরে নিমগ্ন করিয়া ৺ কাশীধামে মানবলীলা সংবরণ করিয়াছেন। আজ, ত্রিপুরার গৃহে গৃহে আর্ত্তনাদ—গৃহে গৃহে হাহাকার!

স্বর্গীয় ধর্ম্মার্ণব মাণিক্য বাহাদুর অনন্তগুণের আকর ছিলেন। তাঁহার অলোকসামান্য-গুণাবলীর স্নিগ্ধোজ্জ্বল প্রভা যখন চারিদিক্ উদ্ভাসিত করিতেছিল এবং ৺কাশীবাসী বিবুধ-মণ্ডলীকে বিমুগ্ধ করিতেছিল, তখনই বিশ্বেশ্বরও যেন গুণাকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে নিজের শরীরে মিলাইয়া লইলেন! স্বর্গের দেবতা পুণ্যধাম স্বর্গে চলিয়া গিয়াছেন, তাই আজ হতভাগ্য ত্রিপুরাবাসিগণ এবং মহারাজের স্বজনবর্গ ও আশ্রিত কর্ম্মচারিগণ অজস্র অশ্রুধারা বর্ষণ করিয়া হৃদয়ের তাপ শান্ত করিতেছেন!

এমন রাজার অনুগ্রহে যাহারা বঞ্চিত হয়, তাহাদের পাপের ফল বা দুর্ভাগ্যের প্রভাব কখনই কম নহে। মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্য বাহাদুর নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, দরিদ্রের বন্ধু, বিপন্নের উদ্ধারকর্ত্তা এবং সনাতন আর্য্য-ধর্ম্মের সংরক্ষক ছিলেন। বারাণসীস্থ পণ্ডিত মণ্ডলী মহারাজের ধর্ম্মৈকনিষ্ঠতাদর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া মৃত্যুর কয়েক দিন পূর্ব্বে তাঁহাকে ধর্ম্মার্ণব উপাধি দ্বারা ভূষিত করিয়াছিলেন। যাঁহারা এই ধর্ম্মরত্নাকর হারাইয়াছেন, তাহাদের প্রাণের যাতনা কি বলিয়া প্রকাশ করিব জানি না; ভুক্তভোগী মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন, বর্ণনা করিয়া অন্যকে বুঝান অসম্ভব। আশৈশব সুখের কোলে লালিত, রাজভোগে পরিপুষ্ট, দেবসেবায় পবিত্রীকৃত রাজদেহ অকালে বিশ্বে-শ্বরপুরীর মণিকর্ণিকার ঘাটে মহাশ্মশানে ভস্মাবশেষ হইয়া গিয়াছে; গঙ্গাতরঙ্গ সেই পবিত্র চিতাভস্ম বুকে লইয়া কুলু কুলু রবে পুণ্যের প্রভাব কীর্ত্তন করিতে করিতে কিরূপে সগর্ব্বে চলিয়াছিল, তাহা আমরা কল্পনায় অনু-ভব করিতে পারি।

মৃত্যু সময়ে মহারাজের বয়স ৫৩ বৎসর মাত্র ছিল। মহারাজের জীবনের প্রতিকার্য্যে, তাঁহার অনন্যসাধারণ গুণাবলীর পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। শৈশব হইতে তাঁহার শিক্ষা বিষয়ে অত্যন্ত আসক্তি ছিল। নূতন কোন বিষয় পাইলে তিনি বিশেষ আগ্রহের সহিত তাহা আয়ত্ত করিতে চেষ্টা পাইতেন। রামায়ণ মহাভারত এবং পুরাণাদি ধর্ম্মশাস্ত্রে তাঁহার অসাধারণ পরিদর্শিতা ছিল। সাময়িক পত্রাদি পাঠেও তাঁহার অনুরাগের অভাব লক্ষিত হয় নাই। বাঙ্গালাভাষায় মহারাজের প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি দেখিয়া অনেক লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক পর্য্যন্ত বিস্মিত হইতেন। সংস্কৃত, ইংরেজি এবং উর্দ্দু ভাষাতেও তাঁহার যথেষ্ট

অধিকার ছিল। এতদ্ব্যতীত সঙ্গীত ও চিত্র প্রভৃতি কলাবিদ্যায় তিনি বিশেষ নিপুণতা লাভ করিয়াছিলেন। মহারাজের রচিত মধুর, প্রাঞ্জল ও ভাবপূর্ণ কবিতা পাঠ করিয়া অনেক সময়ে আমরা মুগ্ধ হইয়াছি। আমাদের ভাগ্য দোষে আজ সমস্ত গুণের আধার সেই মহারাজকে হারাইয়া দুঃখের সাগরে ভাসিতেছি। ১৩০৬ ত্রিপুরাব্দের ২৮শে ফাল্গুন মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্য বাহাদুর ত্রিপুরার রাজপদে অভিষিক্ত হন। তদবধি মৃত্যু সময় পর্য্যন্ত ধরিলে, তিনি বারবৎসর কাল রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার শাসন সময়ে ত্রিপুরারাজ্যের সর্ব্ববিষয়েই উন্নতি হইয়াছে। শাসন ও বিচার বিভাগে সুশিক্ষিত, লব্ধপ্রতিষ্ঠ লোক নিযুক্ত করিয়া তিনি উক্ত বিভাগ গুলির উৎকর্ষ সাধনে প্রভূত পরিমাণে যত্ন করিয়াছেন। শিক্ষা ও চিকিৎসা বিষয়ে অকাতরে অর্থব্যয় করিয়া লোকের ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। আগরতলার "ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়েল হস্পিটাল", "উড্‌বর্ণ আর্টিজান্ স্কুল" "আগরতলা এন্ট্রান্স স্কুল," এবং "ঠাকুর বোর্ডিং" ও "কুমার বোর্ডিং" যতকাল বর্ত্তমান থাকিবে, ততকাল মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্যের কীর্ত্তি ঘোষিত করিবে।

মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্যের দেবোপম মূর্ত্তি, অনুপম স্বর্গীয় গুণপরম্পরায় বিভূষিত ছিল। তাঁহার স্বভাবে এমন গাম্ভীর্য্য, কার্য্যে এমন দূরদর্শিতা, লোকচরিত্র জ্ঞানে এমন অভিজ্ঞতা এবং ব্যবহারে এমন গুণপক্ষপাতিতা ও বিনয়নম্র শিষ্টতা ছিল যে, তাহা অন্যত্র নিতান্তই দুর্লভ বলিলে কোনরূপে অত্যুক্তি হইবে না। তাঁহার ভাষা বিশুদ্ধ, মার্জ্জিত, সংহত এবং সর্ব্বথা অননুকরণীয় ছিল। তাঁহার পরলোকগমনে আমরা একটী গুণগ্রাহী দেবতা হারাইয়াছি!

আমরা লোকের আকৃতি দেখিয়া, বিলাপ শুনিয়া এবং গতিবিধি লক্ষ্য করিয়া বুঝিতে পারিতেছি যে, এক মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্যের অভাবে কেহবা পিতৃহীন হইয়াছে, কেহবা অভিভাবকহীন হইয়াছে, আবার কেহবা আশ্রয়হীন হইয়াছে। পরের দুঃখ দেখিলে দয়ায় যাঁহার হৃদয় গলিয়া যাইত, দুঃস্থের দুরবস্থা মোচনে যাঁহার বদান্যতা সর্ব্বদা উদ্দামভাব ধারণ করিত, আশ্রিতের সংরক্ষণে যাঁহার করুণাধারা শতমুখী হইয়া গঙ্গাস্রোতের ন্যায় প্রবাহিত হইত, সেই নরদেবতা আজ কোথায়? প্রজার ঘরে ঘরে আজ যে ক্রন্দনের রোল উঠিয়াছে তাহা তাঁহার শ্রুতিমূলে উপস্থিত হইতে সমর্থ হইবে কি?

আমরা যেদিকে চাই—৺মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্যের কীর্ত্তিকলাপ দেখিতে পাই। আগরতলার "উজ্জয়ন্তরাজপ্রাসাদ" তাঁহার অতুলনীয় কীর্ত্তি। আগরতলার ইদানীন্তন শোভাসম্পদ দেখিয়া অনেকেই বলিয়া থাকেন যে, রঘুনন্দন পর্ব্বতের অভ্যন্তরে মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্য, ইন্দ্রালয় নির্ম্মাণ করিয়াছেন। বাস্তবিক রাজপ্রাসাদের উভয় পার্শ্বস্থিত দীর্ঘিকাদ্বয়, নগরের নানাস্থানে নির্ম্মিত রমণীয় সৌধাবলী, বৈদ্যুতিক আলোকমালা এবং বহুসংখ্য সুপ্রশস্ত রাজপথ স্বর্গীয় মাণিক্য বাহাদুরের রাজত্বসময়ে নির্ম্মিত হইয়া এই পার্ব্বত্যনগরকে স্বর্গীয় শোভা প্রদান করিয়াছে।

প্রত্যেক রাজকার্য্যে স্বর্গীয় মহারাজ অভি-

জ্ঞতা, দূরদর্শিতা, প্রজারঞ্জনতৎপরতা ও অসাধারণ বুদ্ধিকৌশলের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। দিল্লিদরবারের সময়ে, আগরতলায় ছোটলাট ফ্রেজার মহোদয়ের আগমন কালে, এবং মণিপুরাধিপতির ত্রিপুরারাজধানীতে শুভাগমন উপলক্ষে আমরা মাণিক্য বাহাদুরের বহুদূরপ্রসারিণী রাজনীতির প্রমাণ পাইয়াছি। মহারাজের সহিত যে সকল মহাত্মার সম্মিলন হইয়াছে, তাঁহারা সকলেই মুক্তকণ্ঠে তাঁহার উদারতা ও সামাজিকতার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। মণিপুর মহারাজের শুভাগমনে আগরতলায় নিমন্ত্রিত মহারাজের তালুকদার প্রজাগণ তাঁহার সৌজন্যের যে পরিচয় পাইয়া গিয়াছেন,—তাঁহার লোকান্তরগমনে সেই অনুপম সৌজন্যই তাঁহাদের অপরিসীম মনোবেদনার কারণ হইয়াছে। মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্যের দানের কথা বর্ত্তমান সময়ে উপন্যাসের কাহিনী বলিয়া অনুমিত হইবে। বস্তুতঃ "মুক্তহস্তে অজস্র দান" বলিলে যাহা বুঝায়, তাহা আমরা একমাত্র স্বর্গীয় মাণিক্য বাহাদুরের নিকটেই প্রত্যক্ষ করিয়াছি।

ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল। তিনি সচরাচর বলিতেন,—ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট ভারতীয় ভূপতিবর্গের প্রকৃত বন্ধু। তাঁহাদের মঙ্গল ভিন্ন ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট কখনও অমঙ্গল চিন্তা করেন না। সেই জন্য গবর্ণমেণ্টের সহিত সর্ব্ববিষয়ে সৌহার্দ্দ্য রক্ষা তাঁহার রাজনীতির মূলমন্ত্র ছিল।

মহারাজ রাধাকিশোর দেববর্ম্ম "ধর্ম্মার্ণব" মাণিক্য বাহাদুর সংসারের বন্ধন ছিন্ন করিয়া, পুত্রকলত্রের স্নেহমমতা ত্যাগ করিয়া, প্রজারক্ষার গুরুভার তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র বর্ত্তমান মহারাজ পঞ্চশ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকিশোর দেববর্ম্ম মাণিক্য বাহাদুরের উপর ন্যস্ত করিয়া ভগবৎসদনে গমন করিয়াছেন। বহু পুণ্যফলে যাহাকে আমরা পাইয়াছিলাম সেই পুণ্যক্ষয়ে পুণ্যক্ষেত্র বারাণসীধামে তাঁহাকে হারাইয়াছি! এখন ভগবানের নিকট কৃতাঞ্জলিপুটে প্রার্থনা,—ভগবান আমাদিগের সেই সৌভাগ্য প্রদান করুন, যেন আমরা মহারাজ পঞ্চশ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকিশোর দেববর্ম্ম মাণিক্য বাহাদুরকে দীর্ঘজীবী এবং সমস্ত পিতৃগুণে বিভূষিত দেখিয়া বিমল আনন্দের অধিকারী হইতে পারি।

পাকচক্র প্রহসন।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

গৃহিণীর কাঁদিতে কাঁদিতে প্রবেশ।

গৃ। উঃ গেলুম যে, মলুম যে, বড় জ্বালা,—ও কর্ত্তা গো—বলি—

(শশিমুখীর দ্রুত প্রবেশ ও করযোড়ে)

শ। হেঁই মা ও কথা বলো না গো,—আমরা তোমার বালাই নিয়ে মরি, তুমি মরবে কেন, জন্ম জন্ম বেঁচে থাক—পাকা মাথায় সিঁদুর পর—এই—এই

গৃ। শশিমুখি, তুই কি বলিস! বড় যে জ্বালা; চুল ধরে টান্! ওরে—প্রাণের টানের চেয়ে বেশী যে! কর্ত্তা গো—এ সময় তুমি চেয়ে দেখবে না গো! (ফুঁপাইয়া ক্রন্দন ও শশীরও তথাকরণ)

শ। (গৃহিণীর চোখ মুছাইতে মুছাইতে) আহা! একি হোল গো,—বুক যে যায়! থাম থাম—তোমার এ চোখের জল কি জল গো,—এক এক ফোঁটা জল—যেন পাহাড় ভাঙ্গা এক একখানা টুকরো,—বুকে পড়ে আর হাড়গুলো ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়।

গৃ। শশীর গলা জড়াইয়া ধরিয়া) তুই ত ও কথা বল্লি—আমার দুঃখে আর কার কি বল? বলি ও কর্ত্তা মরবার সময়ও কি একবার দেখা দেবে না,—হায় হায়! কি কপাল করেই জন্মেছিলুম গো।—

আবার উচ্চ ক্রন্দন—শশীর তাঁহাকে অনুকরণ।

চন্দ্রকান্তের প্রবেশ।—

চ। বাইরে লোক এসেছে,—কর্ত্তামশায় একটু আস্তে কথা কইতে বলছেন।

গৃ। কি বল্লে! লোকে এসে গাল দেবে—চুল ছিঁড়বে; আর আমি আস্তে কথা কইব! হুকুম জারি শোন! কে এত মস্ত লোকটা এসেছে শুনি?

চ। হরিবাবু। দাদাবাবুর বিয়ের পাকা-কথা কইতে এসেছেন।

গৃ। (সহসা শান্ত ভাবে) তা কি দেবে ঠিক হোল?

চ। সেকথা এখনো হয়নি,—যা বলেন জানিয়ে যাব এখন।

প্রস্থান।

গৃ। অমনি কথার ছিরি! জানিয়ে যাব এখন! আমি যেন হাত পেতে ভিক্ষে চাচ্ছি। যাত শশি, তুই একবার দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে কথাবার্ত্তা গুলো শুনে আয় দেখি। উনি যে অমনি দুপাঁচ হাজারে সেরে ফেলবেন, সেটী হচ্চে না। যেন আমার ছেলে না—ওনারি ছেলে! হায়রে আমার কপাল!

(কপালে করাঘাত)

শ। আহা আহা কর কি মা! তার চেয়ে আমাকে ধরে মার না। (কপালে হাত বুলাইয়া) মরে যাই! কতই লাগলো! মরেযাই!

গৃ। তুই ছাড়া আর ত কেউ নেই আমাকে দরদ করতে! তা যা বাছা—একবার কথাগুলো শুনে আয়।

শ। তা যাচ্চি—সব শুনে আসছি—কিন্তু কিন্তু হেঁই মা আর ওরকম করোনা; তাহলে নিশ্চয় আমি—আমি—গলায় দড়ি দেব—

প্রস্থান।

গৃ। ভাগ্যিস শশীকে পেয়েছিলুম—তাই বেঁচে একটু সুখ আছে। নইলে কি দশাই হোত। সবই এক যোট। আমি যেন—চাল ঝাড়তে ভাঙ্গা কুলো।—

কর্ত্তার প্রবেশ।

ক। দেখ গিন্নি—আজ বিকালে হরি-বাবুরা আসবেন—একটু যেন—

গৃ। বিকালে—হরিবাবু! এই সকালে এলেন—আবার বিকালে! এত ঘন ঘন আসার মানেটা কি বলদেখি?

ক। (মাথা চুলকাইয়া) মানেটা কি? তা বলছি,—আজ বিকালটা হলেই সব একরকম চুকে যাবে,—বিকালেই পাকা দেখা হয়ে যাবে।

গৃ। এদিকে কিছু ঠিক হবার আগেই

পাকাদেখা! আমি কিন্তু ১০টি হাজারের কম নেব না; এইটি মনে রেখে যা করার কোরো।

ক। হবে হবে,—অত ক্ষ্যাপো কেন?

(কাছে আসিয়া চিবুক ধরিয়া) আমার ক্ষেপি, আমার পাগলি—চিরদিনই একরকম।

গি। (নাকিসুরে) যাঁও, আর অত সোহাগিপনা করতে হবেনা—আমি কিন্তু হাতে দশটি হাজার পাব—তবে বিয়ে হবে।—এই বুঝে যা হয় কোরো।

ক। (স্বগত) মজালে দেখছি! কি করে বাগাই—এদিকে ভদ্র লোককে আসতেও বলেছি। যা আছে অদৃষ্টে হবে,—দুর্গা বলে ত এখন ঝুলে পড়া যাক্। (দীর্ঘ নিশ্বাস সহকারে) তা গিন্নি—

গি। বল না—আমি ত কালা হইনি—

(আদর করিয়া)

ক। বলি—

গিন্নি আমার সোনামণি গিন্নি আমার ধন
গিন্নি নইলে কে বুঝ্‌বে এ হৃদয় বেদন!

গি। (হাসিয়া ঠেলিয়া দিয়া) যাঁও,—এখন নাকি কান্না কাঁদতেও পার! আর ভোলাতে হবে না—

ক। তোমার কাছে না কাঁদলে আর কার কাছে কাঁদি বল? হাঁসি দেখে তবু বুকটা ফুলে উঠলো—

ফুলে ফুলে ঢলে ঢলে বহেকিবা মৃদুবায়;
তটিনী হিল্লোল তুলে কল্লোলে বহিয়া যায়!

গিন্নির হাসিতে যেন মতি ঝরে।—দেখ গিন্নি, পাঁচ হাজার আদায় করে নিয়েছি—বল ত এখনি এনে দিই।

গি। পাঁচ হাজার—শুধু পাঁচহাজার! কি সর্ব্বনাশ! দেখলে কীর্ত্তি! আমাকে না বলে কয়ে পাঁচ হাজার নিয়ে বসে আছেন! কিছুতেই আমি রাজি হব না—দেখব দিকি—এ বিয়ে কে দেয়!

ক। (স্বগত—কিছুতেই ত পেরে উঠলুম না—অন্য পথে যেতে হোল দেখছি) তার জন্য ভাবনা কি—আজই সে সব ঠিক হয়ে যাবে—আগে টাকা—তারপর দেখা! বুঝলে গিন্নি, অত নিশ্বাস ফেলো না। তোমার নিশ্বাস যে সাপের বিষের চেয়েও আমাকে জর জর করে ফেলে!

গি। অত হেঁয়ালি গাইতে হবে না,—কাজের কথাটা ভাল করে বুঝে নেও তাপর বাজে কথা। ১০টি হাজার নইলে—

ক। বুঝেছি বুঝেছি আর বলতে হবে না, সে সবই ঠিক হবে।—এবার হোল ত? তা বিকালে তারা আসবে—একটু খাবার উদ্যোগ রেখো।

গি। খাবার উদ্যোগ! যেমন দেবে তেমনি রাখব।

ক। আমি ত আগে থাকতে শ্রীচরণে সবই দিয়ে রেখেছি—যেমনই মাইনেটি পাই অমনি এনে দিই।

গি। শোন কথার ছিরি। কুড়ি টাকা করে হাত খরচ কে দেয়?

ক। (স্বগতঃ—পঞ্চাশ টাকা করে মাইনে বেড়েছে সেটা যদি একবার প্রকাশ পায় তাহলেই গেছি।) তা গিন্নি আমার ত খরচও আছে—২০টাকা আর কত বল?

গি। তোমার খরচটা কি এত শুনি! সবই ত আমিই যোগাচ্চি। কেবল জামা খানা, কাপড় খানা; তেলটা সাবানটা, নাপিতটা আসটা—বইত নয়! তা আজকাল যে তুমি বেলেল্লা

হয়েছ—তা আমি দেখতে পাচ্ছি বটে,—যখন তখন কাপড়ে খোসবাই এর গন্ধ পাই,—

ক। বটে বটে! নিজের মাথার তেলের গন্ধটা দেখছি নাকে লেগে থাকে,—

গি। তাই ত! আর সেদিন যে দরজি এক কাঁড়ি পাঞ্জাবী দিয়ে গেল,—তাও কি আমার জন্যে নাকি?

ক। তার থেকে—ছেলের জন্য কটা দখল করলে সেটা বল দেখি?

গি। ছেলেকে দুট জামা দিয়েছি—অমনি গায়ে লেগেছে,—ভ্যালা যাহক! নবাবীপনা দেখে আর বাঁচিনে! সেদিন দেখলুম নাপতেটা চুল ছেঁটে চার চারটে পয়সা নিয়ে যাচ্ছে। কখনো জন্মেব কালে ত তা শুনি নি, নখ কাটলে এক পয়সা চুলছাঁটায় দু পয়সা এই ত চিরদিন জানি।

ক। (স্বগত—পেরে উঠব না দেখছি,—সেই হার মানতে হবে, আগে থাকতে সন্ধি করাই ভাল।) তা গিন্নি আমিই মিষ্টি আনিয়ে দেব এখন, তাহলেই ত হোল।

গি। কি আনবে বল দেখি?

ক। যা বলবে। (অঙ্গুলি গুণিয়া) এই নোন্তার মধ্যে কচুরি নিমকি সিঙেড়া ডালপুরি—ভাজাভুজি,—আর মিষ্টি হোল, রসগোল্লা, পান্তুয়া, সন্দেশ—মেঠাই—

গি। কি বল তুমি! অত কেন? টাকা হাতে পেয়ে তুমি দেখছি বড় বাড় বেড়ে উঠেছ!

ক। তবে কি আনব তুমিই বল। কচুরি সিঙ্গেড়া রসগোল্লা পান্তুয়া হলেই যদি চলে যায়; সে ত খুবই ভাল! ঘরে খানকতক লুচি ভাজি তরকারী আর রাবড়িটা করে দিও।—

(শশী আস্তে আস্তে গিন্নির পিছন দিকে আসিয়া কানে কানে)

মিষ্টান্ন বেশী কিছু আসে ভালই ত; অনেকদিন ছোট মাসীমার বাড়ী তত্ত্ব যায়নি।

গি। স্বগত। বেশ বলেছে, ভাগ্যিস শশী ছিল! সত্যিই ত—টাকা বাঁচলে ত আর আমার লাভ নেই।

ক। তাহলে অল্প স্বল্পই আনা যাবে কি বল?

গি। হ্যাঁ—অল্প স্বল্প আনা যাবে! কি কথাই বল! পাকা দেখতে আসছে, এ সময় লোকে কত ধুমধাম করে খাওয়ায়—আর তুমি দুখানা কচুরী ও দুট রসগোল্লা দিয়ে সারবে? কথার ছিরি শোন!

ক। (মাথা চুলকাইয়া) তাত ঠিক! এপথও জানি—ওপথও জানি,—তবে কি বলব—মরে আছি।

গি। আমার অকল্যাণ করছ! আমি কিন্তু মাথা মুড় খুঁড়ে মরব।

ক। বালাই বালাই! ষেটের বাছা ষষ্ঠীর দাস,—তবে কি আজ্ঞে কর।

নি। (শশীর প্রতি আস্তে আস্তে) কি বলি?

শশী পিছন হইতে তাঁহাকে পরামর্শ দিতে লাগিল গিন্নি বলিয়া যাইতে লাগিলেন।

গি। নোন্তা আনাও,—কচুরী—নিমকি, সিঙ্গেড়া, ডালপুরি, রাধাবল্লভি, পাঁপড়, ঝুরি-ভাজা, ডালভাজা, পাঁচভাজা—সাতভাজা—

ক। ও বাসরে!

গি। এর মধ্যেই—বাস! কি কিপ্টেই হয়ে দাঁড়িয়েছ! বাপরে!

ক। আচ্ছা—বল বল।

গি। মিষ্টি আনবে, রসোগোল্লা, পান্তুয়া, খাজা গজা লেডিক্যানিং লর্ডক্যানিং, কাঁচা গোল্লা, আবারখাব, বরফি-সন্দেশ আম সন্দেশ প্রভৃতি—

ক। আর ত পারিনে!

গি। ছেলের বিয়ে—না পারলে চলবে কেন বল! মিহিদানা, বড় দানা, বঁদে—(শশির প্রতি। আর কি?) ক্ষীর দই—রাবড়ি—ছানার পায়স—

ক। হয়েছে হয়েছে—ময়দার দোকান শুদ্ধ যে উঠে এল,—

গি। (পুনরায় শশীকে) হয়েছে ত?

শ। তা চলবে।

গি। আচ্ছা ওতেই হবে।

ক। বাঁচা গেল!

গি। কজন আসবে?

ক। বাইরে দুজন, আর হরিবাবুর পিসতত বোন তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসবেন। তিনজনের মত আয়োজন করলেই হবে।—

গি। কথা শোন! আর ঘরের লোকরা কি মুখে তুলো গুঁজে থাকবে। বাড়িতে একটা আয়োজন হচ্চে বাড়ীর ছেলে মেয়ে চাকর বাকর সকলকেই ত কিছু কিছু দিতে হবে।

ক। বেশ বেশ, ময়রার দোকান শুদ্ধ আমি তুলে আনব এখন, তাহলে ত তুমি তুষ্ট হবে? তাতেই আমার প্রাণ ঠাণ্ডা।

প্রস্থান।

গি। ভাগ্যিস মনে করিয়ে দিলি—শশি, কেবল হুকুকে না—বোসেদের বাড়ীও পাঠান চলবে—সেদিন আমাকে ওরা তত্ত্ব পাঠিয়েছিল। তা আয় এখন বাসন কোসন সব ঠিক করতে হবে। প্রস্থান।

গৃহিণী চলিয়া গেলেন কি না—শশীর উঁকি মারিয়া দর্শন—তার পর দাঁড়াইয়া গান, ও মাঝে মাঝে উঁকি প্রদান।

গান।

মরি কি বাহাদুরি—বলিহারি যাই!
কিবা কর্ত্তা গিন্নি কিবা,—মুটোতে সবাই;
আমার মুটোতে সবাই।
ছড়াই যেমন সরষে পড়া, মানুষ বনে গরু ভেড়া,
কলের মত চলে তারা; যেদিকে চালাই।
সাবাস তুমি বুদ্ধি খানি, বাণীর জোরে ধন্য মানি,
রাজা নেই যে একাই রাণী;—দুঃখ কেবল তাই!
ইঃ! দুঃখটা কি! বাজাই তুড়ি—কোথায় আছে
এমন জুড়ি!
ঘরের কোনে আপন মনে জয় জয় গাই,
জয় জয়, জয় জয়—জয় জয় গাই!

ক্রমশঃ

ব্যথা।

চন্দন কাঠে ঘষিয়া তবে
গন্ধ ছড়াতে হয়,
তন্ত্রী-পীড়নে বাদ্য-যন্ত্রে
সংগীত ধারা বয়।

হৃদয়-ক্রমে পেষহ রুদ্র,
ছুটিবে গন্ধ-ভার,
বক্ষ-কুহরে আঘাত কর
ঝরিবে গীতের ধার।

ভারতবর্ষে।

মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ কোলাস্‌কর।

(Felicien challaye-র ফরাসী হইতে)

বোম্বাই ৮।২৩ জানুয়ারী ১৯০০।

শিল্প ও ধর্ম্মের হিসাবে, অতীত ভারত যেরূপ চিত্তাকর্ষক,—রাষ্ট্রনীতি ও সমাজের হিসাবে বর্ত্তমান ভারত সেইরূপ কৌতূহল জনক।—ইণ্ডিয়া বলিলে, আত্মচেতনাবান একটি সমগ্র জাতি বুঝায় না;—অবশ্য কতকগুলি হিন্দুর ইচ্ছা যে ঐরূপ জাতিতে পরিণত হয়। এই কথার ভিতরেই ভারতের সমস্ত সমস্যাটি রহিয়াছে।

ইণ্ডিয়া—একটি সমগ্র জাতি নহে; উহা একটি মহাদেশ।—বৃহৎ আয়তনের হিসাবেই মহাদেশ; জন সংখ্যার হিসাবেই মহাদেশ। ২৭ কোটি ৮০ লক্ষ লোক ইঙ্গ-ভারতে; ২৮ কোটি ২০ লক্ষ লোক সমস্ত ভারতে। উহার একটা প্রদেশ বাঙ্গলা, গ্রেট-ব্রিটেন অপেক্ষা বড়; মেক্সিকো সমেত যুক্তরাজ্য অপেক্ষা উহার জনসংখ্যা অধিক।—এই মহাদেশে কত বিভিন্ন জাতি বাস করে। উত্তরে মোগলমিশ্র জাতি;—উহাদের নাক ছোট ও চ্যাপ্‌টা, চোখ্‌ সরু। দক্ষিণে দ্রাবিড়ীয় জাতি;—উহাদের রং নিগ্রোর মত কালো, মুখাবয়বগুলা ভারী-ভারী, নাক বড় ও চওড়া, ঠোঁট মোটা। মধ্যদেশে আর্য্যগণ; উহাদের মুখ লম্বা ও সমপরিমাণ, রং ফর্সা, নাক সোজা ও সরু। এই সকল জাতির মধ্যে আবার, বিভিন্ন অনুপাতে বহুল মিশ্রণ ঘটিয়াছে; এই মিশ্রজাতিদিগেরও রং ও মুখাবয়ব বিভিন্ন। এই সকল জাতির মধ্যে, কোন জাতিরই প্রকৃতরূপে জাতীয়তার জ্ঞান নাই। ইহারা যেন কতকগুলি মণ্ডলীমাত্র—যাহাদের মধ্যে কতকগুলি বিভিন্ন ভাষা ও উপভাষা প্রচলিত। ইণ্ডিয়ায় প্রায় একশত ভাষা ও অসংখ্য উপভাষা; সংস্কৃত সুধু শিক্ষিত লোকদিগের ভাষা;—বিজ্ঞান ও দর্শনের ভাষা। আর ধর্ম্মের কথা যদি বল,—ধর্ম্ম সমস্ত লোককে কোথায় এক করিবে, না ধর্ম্মই উহাদিগকে বিভক্ত করিয়া রাখিয়াছে। জাতীয় বিভিন্নতা, যুরোপীয়দের পরস্পরের মধ্যে যত না বিপক্ষতা ও পরকীয়ভাব আনিয়াছে, ধর্ম্মের বিভিন্নতা, ভারতবাসীদিগের মধ্যে, তাহা অপেক্ষা আরও অধিক পরিমাণে ঐ ভাব আনিয়াছে। প্রায় ২০৭৭০০০০০ হিন্দু ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মাবলম্বী; ৫৭৩০০০০০ লোক মহম্মদীয় ধর্ম্মাবলম্বী; ৯৩০০০০০ লোক অতীব স্থূল ধরণের পৌত্তলিক; ৭১০০০০০ বৌদ্ধ (ব্রহ্মদেশীয় বৌদ্ধগণ ইহারই অন্তর্ভুক্ত); ২৩০০০০০ খৃষ্টান; ১৯০০০০০ শিখ, ১৪০০০০০ জৈন, ৯০০০০ পার্শি, ১৭০০০ ইহুদি ইত্যাদি, ইত্যাদি। অনেক সময়ে এই সকল ধর্ম্ম পরস্পরের প্রতি দারুণ প্রতিকূলতাচরণ করিয়া থাকে; ভারত কেবল ব্রিটিশ শাসনাধীনেই শান্তি ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় স্বাধীনতা উপভোগ করিতে সমর্থ হইয়াছে।—জাতিতে বিভক্ত, ভাষায় বিভক্ত, বিশেষত ধর্ম্মে বিভক্ত এই হিন্দুরা কি-করিয়া প্রকৃতরূপে একটি সমগ্র জাতিতে পরিণত হইবে?

জনসাধারণের মধ্যে কোনপ্রকার জাতীয় ভাব আদৌ নাই। তা ছাড়া, অধিবাসীদিগের শতকরা ৯৫ জন একেবারেই নিরক্ষর; তাহারা যে একটি পৃথক জাতি, এ ধারণা তাহাদের জন্মিতে পারে না, যেহেতু তাহারা স্বদেশের ইতিহাস জানে না। স্মৃতি যেমন ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে, ইতিহাস তেমনি জাতিবিশেষের পক্ষে;—পৃথক-সত্তার ভাব উৎপাদনের উহাই একমাত্র হেতু। বস্তুতঃ ভারতবিজেতারাই (পূর্ব্বে মোগলেরা এবং এক্ষণে ইংরাজেরা), ভারতের একতা সম্পাদন করিয়াছে। উহারাই এ দেশের নাম দিয়াছে। পূর্ব্বে এ দেশের কোন ভাষাতেই এ দেশের সাধারণ একটা নাম ছিল না। গ্রীক ও পারসিকেরাই সিন্ধু নদীর নামে এই দেশকে অভিহিত করে।—এই জাতীয় ভাবের অভাবেই, জাতীয় শাসনের অভাবেই, জাতীয় গর্ব্বের অভাবেই, এ দেশকে বিজেতৃগণ এত সহজে জয় করিতে সমর্থ হইয়াছে। একজন ইংরাজ লেখক বলেন;—"মূল-কথা, বৈদেশিকের প্রতি ইণ্ডিয়ার কোন বিদ্বেষই ছিল না, যেহেতু মূলে, ইণ্ডিয়াই ছিল না; সুতরাং যাহাকে প্রকৃতপক্ষে বৈদেশিক বলে, সেই বৈদেশিকই ছিল না।"

অধুনা, ইণ্ডিয়া একটি সমগ্র জাতি নহে বলিয়া কতকগুলি হিন্দুর মনোবেদনা উপস্থিত হইয়াছে। কতকটা ইউরোপীয় শিক্ষালাভ করায়, এখন তাহারা বুঝিয়াছে,—কোন দেশের লোক একটি প্রবল জাতিরূপে প্রতিষ্ঠিত হইলে, তদন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তি কতটা বল লাভ করে। পরিবারের মধ্যে বদ্ধ যে জনসমাজ তাহা অতীব সংকীর্ণ এবং বিশ্বমানবের মধ্যে অধিষ্ঠিত যে জনসমাজ তাহা অতীব বিশাল; অতএব এই উভয়ের মধ্যবর্ত্তী একটি জনসমাজ থাকা আবশ্যক এবং সেই জনসমাজই জাতীয় সমাজ। যে দেশানুরাগ অধিকাংশ য়ুরোপীয়ের হৃদয়ে প্রজ্জ্বলিত রহিয়াছে তাহা আপনার দেশভাইদের মধ্যে না থাকায়, হিন্দুরা বড়ই দুঃখিত। তাই তাহারা জাতিসংগঠনের জন্য এবং রাষ্ট্রিক স্বাধীনতা,—সর্ব্বপ্রকার প্রকৃত স্বাধীনতা লাভের জন্য উৎসুক। তা'ছাড়া, স্বকীয় ইষ্ট সাধনের উদ্দেশেই তাহারা ইংরাজ-শাসনের প্রতিবাদ করিতেছে। তাহারা এই বলিয়া আক্ষেপ করে যে, দেশীয় লোকের নিকট, শাসনকার্য্যের দ্বার প্রায় রুদ্ধ বলিলেই হয়; ইংলণ্ডে না গেলে সিভিল সার্ভিসের পরীক্ষা দেওয়া যায় না। তাহারা, ইংলণ্ড ও ভারত উভয় স্থানেই এককালে পরীক্ষা দিবার নিয়ম প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য দাবী করে। তাহারা আক্ষেপ করে,—ইংলণ্ডের কর-ভারে ভারত নিষ্পেষিত হইতেছে। উহারা হিসাব করিয়া দেখিয়াছে, যে ভারতের লোক অতি দরিদ্র তাহাদিগকে ইংলণ্ড অপেক্ষা তিনগুণ অধিক কর দিতে হয়, অথচ ভারতের রাজস্ব, ইংলণ্ড অপেক্ষা ১৯ গুণ কম। যে সকল খরচ ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের ন্যায্য খরচ, যাহা ইংলণ্ডের রাজ-কোষ হইতে দেওয়া উচিত, তাহা ভারতের স্কন্ধে চাপানো হইয়া থাকে। অনেক সময় পরদেশ আক্রমণের ব্যয় ভারতকে বহন করিতে হয়—শুধু এই ব্যপদেশে যে ভারতের সৈন্য ঐ যুদ্ধে নিযুক্ত হইয়াছে! বিশেষত ভারতের কর হইতে, মোটা-মোটা বেতনের ইংরাজকর্ম্মচারীকে নিযুক্ত করা হয়—তাহারা

তাহাদের অধিকাংশ অর্থ, স্ত্রী পুত্রাদির জন্য, এবং পরে অবসর গ্রহণ করিয়া আপনাদের জন্য ইংলণ্ডেই খরচ করে। ইহার উপর যদি, ইংরাজ-মূলধনের দরুণ ভারত-প্রদত্ত সুদ ও ডিভিডেণ্ট আদি ধরা যায়, তাহা হইলে ভারত ইংলণ্ডকে প্রতি বৎসর কি বিপুল কর প্রদান করে তাহা বুঝিতে পারা যায়। এই দরিদ্র ভারতবাসীদিগের দারিদ্র্য উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতেছে। এ কথাটা বড়ই সাংঘাতিক। এই দারিদ্র্য হইতেই নিত্য-নিয়ত দুর্ভিক্ষ উৎপন্ন হইয়া, দেশের কোন কোন অংশকে ছারখার করিয়া দিতেছে। অনেকেই বলে, ভারতে খাদ্যের অপ্রতুল হয় না; দুর্ভিক্ষের সময় ধান্য চাউল আদি অপেক্ষাকৃত সমৃদ্ধ প্রদেশ হইতে খরিদ করিতে পারা যায়; কিন্তু আসল কথা, যে স্থানে দুর্ভিক্ষ হয়, সে স্থানের লোকেরা ধনের অভাবেই খাদ্যসামগ্রী কিনিতে পারে না। প্রতি বৎসরেই শত সহস্র লোক এইরূপে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। অবশ্য শ্রমশিল্পের উন্নতি করিয়া ভারত সমৃদ্ধি লাভ করিতে পারে। অতএব নবপ্রসূত দেশীয় শ্রমশিল্পকে উৎসাহ দেওয়া আবশ্যক; কিন্তু তাহা দূরে থাকুক, তাহাকে কোনপ্রকারে রক্ষা না করিয়া, ইংরাজ-শ্রমশিল্পের প্রবল প্রতিযোগিতার মুখে তাহাকে নিক্ষেপ করা হইয়াছে। এমন কি, পূর্ব্বে বিলাতী তুলার কাপড়ের উপর যে শুল্ক ছিল তাহা রহিত করা হইয়াছে এবং ল্যাঙ্কেশিয়ারের প্রভূত লভ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, দেশী কাপড়ের উপর excise-শুল্ক স্থাপিত হইয়াছে। এই সমস্ত ভাবমূলক ও স্বার্থমূলক কারণবশতই তাহাদের জাতীয় স্বাতন্ত্র্য-জ্ঞানের উন্মেষ হয় এবং ভবিষ্যতে ভারতবাসীরা পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করিতে সমর্থ হয়।

এই উদ্দেশেই উহারা নব্যভারত সংগঠনের উদ্যোগ করিতেছে। উহারা বলে, তাহাদের যে কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে তাহা সুসিদ্ধ হইতে এখনও বহু শতাব্দী লাগিবে। এই উদ্দেশ্য সাধনের প্রকৃষ্ট উপায় কি, সেই বিষয়ে উহাদের মধ্যে সর্ব্বদাই আলোচনা হইয়া থাকে। উহাদের মধ্যে কতকগুলি লোক কেবল ধর্ম্মসংস্কার লইয়াই ব্যাপৃত। তাহারা আশা করে,—হয় ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের প্রবল শক্তি, সমস্ত ভারতের একতা সম্পাদন করিবে—কেননা, ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন ধর্ম্ম, নয় মুসলমান ধর্ম্মের প্রবল শক্তি সমস্ত ভারতকে একসূত্রে বদ্ধ করিবে—কেননা, মুসলমানধর্ম্ম সর্ব্বাপেক্ষা সাম্যমূলক,—উহার মধ্যে কোন জাতিভেদ নাই। আবার কেহ কেহ ভাবে, সামাজিক সংস্কারই দেশের লোকের—বিশেষত নারীজাতির জ্ঞান ও নীতির উন্নতি সাধন পক্ষে বিশেষরূপ আবশ্যক। তাহাদের মতে, শিক্ষাই তাহার প্রকৃষ্ট উপায়। আবার কেহ কেহ কেবল আর্থিক উন্নতিরই আকাঙ্ক্ষী। অবশ্য, জ্ঞান ও নীতির উন্নতি হইলে, জাতীয় ভাবের উন্মেষ আপনা হইতেই হইবে। আবার কেহ কেহ রাষ্ট্রনৈতিক উদ্যমের একান্ত পক্ষপাতী। এই উদ্দেশে, ভারতীয় সভা-সমিতির নির্ব্বাচিত কতকগুলি প্রতিনিধি, প্রতি বৎসরে, ভারতের কোন-না-কোন প্রান্তে ন্যাসানাল-কংগ্রেসে একত্র সমবেত হইয়া থাকে। এই জাতীয় পরিষদের সহিত ইংরাজ-

ভাবী হিন্দু-পার্লেমেন্টের ভ্রূণ বলিলেও হয়। হিন্দুদের মধ্যে যাহারা সর্ব্বাপেক্ষা কৃতবিদ্য ও সুশিক্ষিত তাহারাই এই জাতীয় পরিষদে, লোকের দুঃখদুর্দ্দশা সম্বন্ধে ইংরাজি-ভাষায় বক্তৃতা করে; রাজ-নৈতিক সংস্কার,—এমন কি সামাজিক সংস্কারের আবশ্যকতা প্রতিপাদন করে;—এইরূপে উহারা ভারতের নবোদিত লোকমতের ব্যাখ্যা করিয়া থাকে। যাহারা এইরূপ রাষ্ট্রনৈতিক চেষ্টায় ব্যাপৃত, তাহাদের অন্তর্ভূত কতকগুলি হিন্দু যুবকের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছে। তাহারা খুব উচ্চতর য়ুরোপীয় শিক্ষা লাভ করিয়াছে, তাহারা ইংরাজি-ভাষায় বেশ অনর্গল কহিতে ও লিখিতে পারে। তাহারা, উদারমতাবলম্বী ইংরাজ ও ফরাসী তত্ত্ববেত্তাদিগের গ্রন্থ সকল খুব আগ্রহ সহকারে পাঠ করে, ইংরাজী ও ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবের বৃত্তান্ত সমস্তই জানে, এবং কখন কখন সাম্যবাদী সোস্যালিষ্ট সম্প্রদায়ের মত ও বিশ্বাসের প্রতি অনুরাগ প্রদর্শন করে। কোন স্বাধীন জাতির অন্তর্ভুক্ত নহে বলিয়া তাহারা বড়ই ক্ষুণ্ণ। তাহাদের মধ্যে একজন আমাকে বলিল; "আমরা স্বাধীন মনুষ্য নহি;—আমরা মনুষ্যই নহি।" তাহাদের মধ্যে অনেকেই ইংরাজ-জাতির উদারতার পক্ষপাতী হইয়াও, ইংরাজ-রাজপুরুষদিগের বিদ্বেষী; তাহাদের মতে ইংরাজ রাজপুরুষগণ ভারতের উপর অত্যাচার করে। ঠিক এই সময়ে, (জানুয়ারী ১৯০০) সপ্তাহে-সপ্তাহে তাহারা দক্ষিণ আফ্রিকায় ইংরাজের আকস্মিক পরাজয়ের সংবাদ প্রাপ্ত হইতেছে; বোয়ারদের জয়ে এই হিন্দু যুবকেরা আনন্দ প্রকাশ করিয়া থাকে। জাপানের উপর তাহাদের খুব ভক্তি। তাহারা মনে করে:—জাপানীরা আপনাদের স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছে, শক্তিশালী হইয়াছে,—ভবিষ্যতে উহারাই এসিয়াকে উদ্ধার করিবে। ধর্ম্মের কথা যদি বল, অনেকেই প্রাচীন ধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস হইতে আপনাকে বিনির্ম্মুক্ত করিয়াছে; তবে, যুবকদিগের স্বধর্ম্মে অবিশ্বাস যে খুব দৃঢ় তাহাও বলা যায় না। উহাদের মধ্যে একজন, আমার একটি বন্ধুর নিকট বলিয়াছিল;—আর কোন দেবতাকে সে বিশ্বাস করে না, কেবল বিশ্বাস করে সে দুর্গাকে; এই দুর্গা সম্বন্ধে তার কোনপ্রকার সংশয় নাই—দুর্গা মাঠ ময়দানে বিচরণ করেন; একদিন সে রাস্তার মোড়ে তাঁকে দেখিতে পাইয়াছিল…

এই সকল যুবকদিগের মধ্যে, বোম্বাইনগরে, কোলাস্‌কর নামক একটি সৌম্য হিন্দু যুবকের সহিত আমার পরিচয় হয়। এই যুবকটি ব্রাহ্মণ—উকীল। ইনি উৎকৃষ্ট ইংরাজী শিক্ষা পাইয়াছেন; ইহার অনেকগুলি পত্নী, তাহার মধ্যে একটি পাঁচ বৎসরের বালিকা।

ইনি য়ুরোপীয় ধরণে কাপড় পরেন, এবং মস্তকে তাঁহার জাতি-সূচক উষ্ণীষ ধারণ করেন।

তিনি বলেন,—তিনি সমস্ত ধর্ম্মবিশ্বাসের বন্ধন কাটাইয়া উঠিয়াছেন। তাই আমাদের হোটেলে তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিতে সাহস পাইলাম। একজন ব্রাহ্মণ, ক্রিয়ানিষ্ঠ ভক্তিমান্ ব্রাহ্মণ,—অন্য বর্ণের সহিত—বিশেষত য়ুরোপীয়দিগের সহিত একত্র ভোজন করিতে পারে না; কিন্তু কোলাস্কর অনেক সময় আমাদের নিকট বলিয়াছেন—তিনি দেশের প্রাচীন প্রথাসমূহের বন্ধন একেবারে ছিন্ন

করিয়াছেন। কিন্তু তবু তিনি অনেকটা ইতস্তত করিতে লাগিলেন। অবশেষে স্বকীয় পরিবারবর্গের মত না লইয়াও আমার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন; কিন্তু এইটুকু আমাকে অনুরোধ করিলেন, আমি যেন তাঁহাকে গো-মাংস না খাওয়াই; গরু—পবিত্র পশু; একজন অবিশ্বাসী হিন্দুর পক্ষেও গোমাংস ভক্ষণ করাটা অতীব জঘন্য ব্যাপার। চিনিতে পারিলে স্বজাতের নিকট পাছে অপদস্থ হইতে হয়, এই ভয়ে তিনি মুসলমানী টুপি পরিয়া আসিয়াছিলেন।

আমাদের বন্ধুটি আমাদের ভদ্রতার শোধ দিতে চাহিলেন; তাঁহার বাটীতে ভোজন করিবার জন্য আমাদিগকে নিমন্ত্রণ করিলেন। তাঁর এই নিমন্ত্রণ উপলক্ষে, তাঁর মার সহিত তাঁহার একটু বচসা হইয়াছিল। ভারতে, বিধবারা পুত্রের আজ্ঞাধীন; কিন্তু গৃহের মধ্যে ম্লেচ্ছদের আনিয়া গৃহকে অপবিত্র করা হইবে—এই কল্পনাটি তাঁহার মাতার বড়ই খারাপ লাগিল। তিনি কিছুতেই রাজি হইলেন না। শেষে এইটুকু সম্মতি দিলেন যে, তাঁহার পুত্র সাহেবদের খানা দিন, কিন্তু তাঁহাদের সহিত একসঙ্গে বসিয়া আহার করিতে পারিবেন না।

ব্রাহ্মণ চাকরেরা খাদ্য পরিবেষণ করিতে অস্বীকৃত হইল। তাহারা বরং চাক্‌রী ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে তবু এ কাজ করিবে না। তাই পরিবেষণের জন্য মুসলমান খানসামা আনিতে হইল।

আমরা মেদি-দেওয়া সূপ, জাফ্রান্‌-দেওয়া ভাত,আমের পিঠা খাইলাম—পরিশেষে পানের বীড়া চিবাইতে লাগিলাম। আর, কোলাস্‌কর অনশন থাকিয়া কেবল দর্শন করিতে লাগিলেন। যখন আহার করিয়া চলিয়া যাইতেছি তখন দেখিলাম, একটা সরু ঢাকা-বারাণ্ডা-পথের দূর প্রান্তে একটি বৃদ্ধা রমণী,—শুভ্র শোক-বস্ত্রে আবৃতা,—বিহ্বল ও হতাশ ভাবে এক কোণে দাঁড়াইয়া আছেন। ইনিই আমাদের বন্ধুর জননী। আমরা অনেকবার নতশিরে তাঁহাকে নমস্কার করিলাম, কিন্তু তিনি প্রতিনমস্কার করিলেন না। ম্লেচ্ছস্পর্শে গৃহ অপবিত্র হওয়ায় সিঁড়িতে একপ্রকার হল্‌দেটে দুর্গন্ধ তরল পদার্থ ছড়ানো হইয়াছে। জিনিসটা কি আমরা বুঝিতে পারিলাম, কেননা, আমরা জানি, ভারতবর্ষে গরু অতীব পবিত্র···

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বসন্ত বায়ু।

চারিদিকে ঝরে পড়ে বসন্তের ফুল,
আকুল বকুল চাঁপা গোলাপ পারুল;
সমীরণ ধেয়ে চলে যায়!
সে কভু গাঁথেনা মালা, আনমনে সারাবেলা
পরে না গলায়;
সে কভু রাখেনা স্মৃতি সযতনে নিতি নিতি
বুকের তলায়;

বসন্তের সব স্মৃতি চলে উড়াইয়া;
ধরণীর চারিদিকে দেয় ছড়াইয়া—
কত গন্ধ কত পুষ্প দল,
কত বিহগের গান, মধুপের মধুতান,
পরশ শীতল;
সহসা সবার মনে জাগে সুখ অকারণে
জাগে অশ্রুজল;

পাওয়া ও হওয়া।

সেই পাওয়াতেই মানুষের মন আনন্দিত যে পাওয়ার সঙ্গে না-পাওয়া জড়িত হয়ে আছে।

যে সুখ কেবলমাত্র পাওয়ার দ্বারাই আমাদের উন্মত্ত করে তোলে না—অনেকখানি না-পাওয়ার মধ্যে যার স্থিতি আছে বলেই যার ওজন ঠিক আছে—সেই জন্যেই যাকে আমরা গভীর সুখ বলি—অর্থাৎ, যে সুখের সকল অংশই একেবারে সুস্পষ্ট সুব্যক্ত নয়, যার এক অংশ নিগূঢ়তার মধ্যে অগোচর, যা প্রকাশের মধ্যেই নিঃশেষিত নয়, তাকেই আমরা উচ্চ শ্রেণীর সুখ বলি।

পেটভরে আহার করলে পর আহার করবার সুখটা সম্পূর্ণ পাওয়া যায়;—দর্শনে স্পর্শনে ঘ্রাণে স্বাদে সর্ব্বপ্রকারে তাকে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করা হয়। সে সুখের প্রতি যতই লোভ থাকুক্ মানুষ তাকে আনন্দের কোঠায় ফেলে না।

কিন্তু যে সৌন্দর্য্যবোধকে আমরা কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়বোধের দ্বারা সেরে ফেল্‌তে পারিনে—যা বীণার অনুরণনের মত চেতনার মধ্যে স্পন্দিত হতে থাকে, যা সমাপ্ত হতেই চায় না সে আনন্দকে আমরা আহারের আনন্দের সঙ্গে এক শ্রেণীতে গণ্যই করিনে। কেবলমাত্র পাওয়া তাকে অপমানিত করে না, না পাওয়া তাকে গৌরব দান করে।

আমরা জগতে পাওয়ার মত পাওয়া তাকেই বলি যে পাওয়ার মধ্যে অনির্ব্বচনীয়তা আছে। যে জ্ঞান কেবলমাত্র একটি খবর, তার মূল্য অতি অল্প—কেন না, সেটা একটা সঙ্কীর্ণ জানার মধ্যেই ফুরিয়ে যায়। কিন্তু যে জ্ঞান তথ্য নয়, তত্ত্ব, অর্থাৎ যাকে কেবল একটি ঘটনার মধ্যে নিঃশেষ করা যায় না—যা অসংখ্য অতীত ঘটনার মধ্যেও আছে এবং যা অসংখ্য ভাবী ঘটনার মধ্যেও আপনাকে প্রকাশ করবে—যা কেবল ঘটনাবিশেষের মধ্যে ব্যক্ত বটে কিন্তু অনন্তের মধ্যে অব্যক্তরূপে বিরাজমান সেই জ্ঞানেই আমাদের আনন্দ; কেবলমাত্র বিচ্ছিন্ন তুচ্ছ খবরে নিতান্ত জড়বুদ্ধি অলস লোকের বিলাস।

ক্ষণিক আমোদ বা ক্ষণিক প্রয়োজনে আমরা অনেক লোকের সঙ্গে মিলি—আমাদের কাছে তারা সেইটুকুর মধ্যেই নিঃশেষিত। কিন্তু যে আমার প্রিয় কোনো এক সময়ের আলাপে আমোদে কোনো এক সময়ের প্রয়োজনে তার শেষ পাইনে। তার সঙ্গে যে সময়ে যে আলাপে যে কর্ম্মে নিযুক্ত আছি, সে সময়কে সেই আলাপকে সেই কর্ম্মকে বহুদূরে ছাড়িয়ে রয়েছে। কোনো বিশেষ দেশে বিশেষ কালে বিশেষ ঘটনায় আমরা তাকে সমাপ্ত করলুম বলে মনেই করতে পারিনে—সে আমার কাছে প্রাপ্ত অথচ অপ্রাপ্ত—এই অপ্রাপ্তি তাকে আমার কাছে এমন আনন্দময় করে রেখেছে।

এর থেকে বোঝা যায় আমাদের আত্মা যে পেতেই চাচ্চে তা নয় সে না পেতেও চায়। এই জন্যেই সংসারের সমস্ত দৃশ্যস্পৃশ্যের মাঝখানে দাঁড়িয়ে সে বল্‌চে কেবলি পেয়ে পেয়ে আমি শ্রান্ত হয়ে গেলুম—আমার না-পাওয়ার ধন কোথায়? সেই চিরদিনের না-পাওয়াকে পেলে যে আমি বাঁচি;—

যতোবাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ
আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কদাচন—

বাক্য মন যাঁকে না পেয়ে ফিরে আসে সেই আমার না-পাওয়া ব্রহ্মের আনন্দে আমি সমস্ত ক্ষুদ্র ভয় হতে যে রক্ষা পেতে পারি।

এই জন্যেই উপনিষৎ বলেছেন "অবিজ্ঞাতম্ বিজানতাং বিজ্ঞাতম্ অবিজানতাম্"—যিনি বলেন আমি তাঁকে জানিনি তিনিই জানেন, যিনি বলেন আমি জেনেছি তিনি জানেন না।

আমি তাঁহাকে জান্তে পারলুম না এ কথাটা জানবার অপেক্ষা আছে। পাখী যেমন করে জানে আমি আকাশ পার হতে পারলুম না তেমনি করে জানা চাই—পাখী আকাশকে জানে বলেই সে জানে যে আকাশ পার হওয়া গেল না। আকাশ পার হওয়া গেল না জানে বলেই তার আনন্দ—এই জন্যেই সে আকাশে উড়ে বেড়ায়—কোনো প্রাপ্তি নয়, কোনো সমাপ্তি নয়, কোনো প্রয়োজন নয়, কিন্তু উড়েই তার আনন্দ।

পাখী আকাশকে জানে বলেই সে জানে আমি আকাশকে শেষ করে জানলুম না এবং এই জেনে না জানাতেই তার আনন্দ—ব্রহ্মকে জানার কথাতেও এই কথাটাই খাটে। সেই জন্যেই উপনিষৎ বলেন:—"নাহং মন্যে সুবেদেতি নো ন বেদেতি বেদ চ"—আমি যে ব্রহ্মকে বেশ জেনেছি এও নয় আমি যে একেবারে জানিনে এও নয়।

কেউ কেউ বলেন আমরা ব্রহ্মকে একেবারেই জান্তে চাই—যেমন করে এই সমস্ত জিনিষপত্র জানি নইলে আমার কিছুই হ'ল না।

আমি বলচি আমরা তা চাইনে। যদি চাইতুম তাহলে সংসারই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট ছিল। এখানে জিনিষপত্রের অন্ত কোথায়? এর উপরে আবার কেন? নীড়ের পাখী যেমন আকাশকে চায় তেমনি আমরা এমন কিছুকে চাই যাকে পাওয়া যায় না।

আমার মনে আছে, যাঁরা ব্রহ্মকে চান তাঁদের প্রতি বিদ্রূপ প্রকাশ করে একজন পণ্ডিত অনেকদিন হ'ল বলেছিলেন—একদল গাঁজাখোর রাত্রে গাঁজা খাবার সভা করেছিল। টীকা ধরাবার আগুন ফুরিয়ে যাওয়াতে তারা সঙ্কটে পড়েছিল। তখন রক্তবর্ণ হয়ে চাঁদ আকাশে উঠ্‌ছিল। একজন বল্লে, ঐ যে, ঐ আলোতে টীকা ধরাব। ব'লে টীকা নিয়ে জানলার কাছে দাঁড়িয়ে চাঁদের অভিমুখে বাড়িয়ে ধ'রলে। টীকা ধ'রল না। তখন আর একজন বল্লে, দূর চাঁদ বুঝি অত কাছে! দে আমাকে দে! বলে সে আরো কিছু দূরে গিয়ে টীকা বাড়িয়ে ধরলে—এমনি করে সমস্ত গাঁজাখোরের শক্তি পরাস্ত হল—টীকা ধ'রলনা।

এই গল্পের ভাবখানা হচ্চে এই, যে, যে ব্রহ্মের সীমা পাওয়া যায় না তাঁর সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ স্থাপনের চেষ্টা এই রকম বিড়ম্বনা।

এর থেকে দেখা যাচ্চে কারো কারো মতে সাংসারিক প্রার্থনা ছাড়া আমাদের মনে আর কোনো প্রার্থনা নেই। আমরা কেবল প্রয়োজন সিদ্ধিই চাই—টীকেয় আমাদের আগুন ধরাতে হবে।

এ কথাটা যে কত অমূলক তা ঐ চাঁদের কথা ভাব্‌লেই বোঝা যাবে। আমরা দেশলাইকে যে ভাবে চাই চাঁদকে সে ভাবে চাইনে—চাঁদকে চাঁদ বলেই চাই—চাঁদ আমাদের বিশেষ কোনো সঙ্কীর্ণ প্রয়োজনের অতীত বলেই তাকে চাই। সেই চির-অতৃপ্ত

অসমাপ্ত পাওয়ার চাওয়াটাই সব চেয়ে বড় চাওয়া। সেই জন্যেই পূর্ণচন্দ্র আকাশে উঠ্‌লেই নদীতে নৌকায়, ঘাটে, গ্রামে, পথে, নগরের হর্ম্যতলে গাছের নীড়ে চারিদিক থেকে গান জেগে ওঠে—কারো টীকেয় আগুন ধরে না বলে কোথাও কোনো ক্ষোভ থাকে না।

ব্রহ্ম ত তাল বেতাল নন যে তাঁকে আমরা বশ করে নিয়ে প্রয়োজন সিদ্ধি করব। কেবল প্রয়োজন সিদ্ধিতেই পাওয়ার দরকার—আনন্দের পাওয়াতে ঠিক তার উল্টো। তাতে না-পাওয়াটাই হচ্চে সকলের চেয়ে বড় জিনিষ। যে জিনিষ আমরা পাই তাতে আমাদের যে সুখ সে অহঙ্কারের সুখ। আমার আয়ত্তের জিনিষ আমার ভৃত্য আমার অধীন—আমি তার চেয়ে বড়।

কিন্তু এই সুখই মানুষের সব চেয়ে বড় সুখ নয়। আমার চেয়ে যে বড় তার কাছে আত্মসমর্পণ করার সুখই হচ্চে আনন্দ। আমার যিনি অতীত আমি তাঁরই, এইটি জানাতেই অভয়, এইটি অনুভব করাতেই আনন্দ। যেখানে ভূমানন্দ সেখানে আমি বলি, আমি আর পারলুম না, আমি হাল ছেড়ে দিলুম, আমি গেলুম! গেল আমার অহঙ্কার, গেল আমার শক্তির ঔদ্ধত্য! এই না পেরে ওঠার মধ্যে এই না পাওয়ার মধ্যে নিজেকে একান্ত ছেড়ে দেওয়াই মুক্তি।

মানুষ ত সমাপ্ত নয়—সে ত হয়ে বয়ে যায়নি—সে যেটুকু হয়েছে সে ত অতি অল্পই। তার না-হওয়াই যে অনন্ত। মানুষ যখন আপনার এই হওয়া-রূপী জীবের বর্ত্তমান প্রয়োজন সাধন করতে চায় তখন প্রয়োজনের সামগ্রীকে নিজের অভাবের সঙ্গে একেবারে সম্পূর্ণ করে চারিদিকে মিলিয়ে নিতে হয়—তার বর্ত্তমানটি একেবারে সম্পূর্ণ বর্ত্তমানকেই চাচ্চে। কিন্তু সে ত কেবলি বর্ত্তমান নয়—সেত কেবলি হওয়া-রূপী নয়, তার না-হওয়ারূপী অনন্ত যদি কিছুই না পায় তবে তার আনন্দ নেই। পাওয়ার সঙ্গে অনন্ত না-পাওয়া তার সেই অনন্ত না-হওয়াকে আশ্রয় দিচ্চে খাদ্য দিচ্চে। এই জন্যেই মানুষ কেবলি বলে অনেক দেখ্‌লুম, অনেক শুন্‌লুম, অনেক বুঝ্‌লুম—কিন্তু আমার না-দেখার ধন, না শোনার ধন, না বোঝার ধন কোথায়? যা অনাদি বলেই অনন্ত, যা হয় না বলেই যায় না—যাকে পাইনে বলেই হারাইনে, যা আমাকে পেয়েছে বলেই আমি আছি, সেই অশেষের মধ্যে নিজেকে নিঃশেষ করবার জন্যেই আত্মা কাঁদ্‌চে। সেই অশেষকে সশেষ করতে চায় এমন ভয়ঙ্কর নির্ব্বোধ সে নয়। যাকে আশ্রয় করবে তাকে আশ্রয় দিতে চায় এমন সমূলে আত্মঘাতী নয়।

পাওয়া মানেই আংশিকভাবে পাওয়া। প্রয়োজনের জন্যে আমরা যাকে পাই তাকে ত কেবল প্রয়োজনের মতই পাই তার বেশি ত পাইনে। অন্ন কেবল খাওয়ার সঙ্গে মেলে, বস্ত্র কেবল পরার সঙ্গেই মেলে, বাড়ি কেবল বাসের সঙ্গে মেলে। এদের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ ঐ সকল ক্ষুদ্র প্রয়োজনের সীমাতে এসে ঠেকে, সেটাকে আর লঙ্ঘন করা যায় না।

এই রকম বিশেষ প্রয়োজনের সঙ্কীর্ণ পাওয়াকেই আমরা লাভ বলি। সেই জন্যে ঈশ্বরকে লাভের কথা যখন ওঠে তখনও ভাষা

এবং অভ্যাসের টানে ঐ রকম লাভের কথাই মনে উদয় হয়। সে যেন কোনো বিশেষ স্থানে কোনো বিশেষ কালে লাভ—তাঁকে দর্শন মানে কোনো বিশেষ মূর্ত্তিতে কোনো বিশেষ মন্দিরে বা বিশেষ কল্পনায় দর্শন।

কিন্তু পাওয়া বল্‌তে যদি আমরা এই বুঝি তবে ঈশ্বরকে পাওয়া হতেই পারে না। আমরা যা কিছুকে পেলুম বলে মনে করি সে আমাদের ঈশ্বর নয়—তিনি আমাদের পাওয়ার সম্পূর্ণ অতীত—তিনি আমাদের বিষয় সম্পত্তি নন্!

ও জায়গায় আমাদের কেবল হওয়া—পাওয়া নয়। তাঁকে আমরা পাব না, তাঁর মধ্যে আমরা হব। আমার সমস্ত শরীর মন হৃদয় নিয়ে আমি কেবলি হয়ে উঠ্‌তে থাকব। ছাড়তে ছাড়তে বাড়তে বাড়তে মরতে মরতে বাঁচতে বাঁচতে আমি কেবলি হব। পাওয়াটা কেবল এক অংশে পাওয়া, হওয়াটা যে একেবারে সমগ্রভাবে হওয়া—সে ত লাভ নয় সে বিকাশ।

ভীরু লোকে বল্‌বে, বল কি! তুমি ব্রহ্ম হবে! এমন কথা তুমি মুখে আন কি করে!

হাঁ, আমি ব্রহ্মই হব। এ কথা ছাড়া অন্যকথা আমি মুখে আন্‌তে পারিনে—আমি অসঙ্কোচেই বল্‌ব, আমি ব্রহ্ম হব। কিন্তু আমি ব্রহ্মকে পাব এতবড় স্পর্দ্ধার কথা বল্‌তে পারিনে।

তবে কি ব্রহ্মেতে আমাতে তফাৎ নেই? মস্ত তফাৎ আছে। তিনি ব্রহ্ম হয়েই আছেন, আমাকে ব্রহ্ম হতে হচ্চে। তিনি হয়ে রয়েছেন, আমি হয়ে উঠ্‌ছি আমাদের দুজনের মধ্যে এই লীলা চল্‌চে। হয়ে থাকার সঙ্গে হয়ে ওঠার নিয়ত মিলনেই আনন্দ।

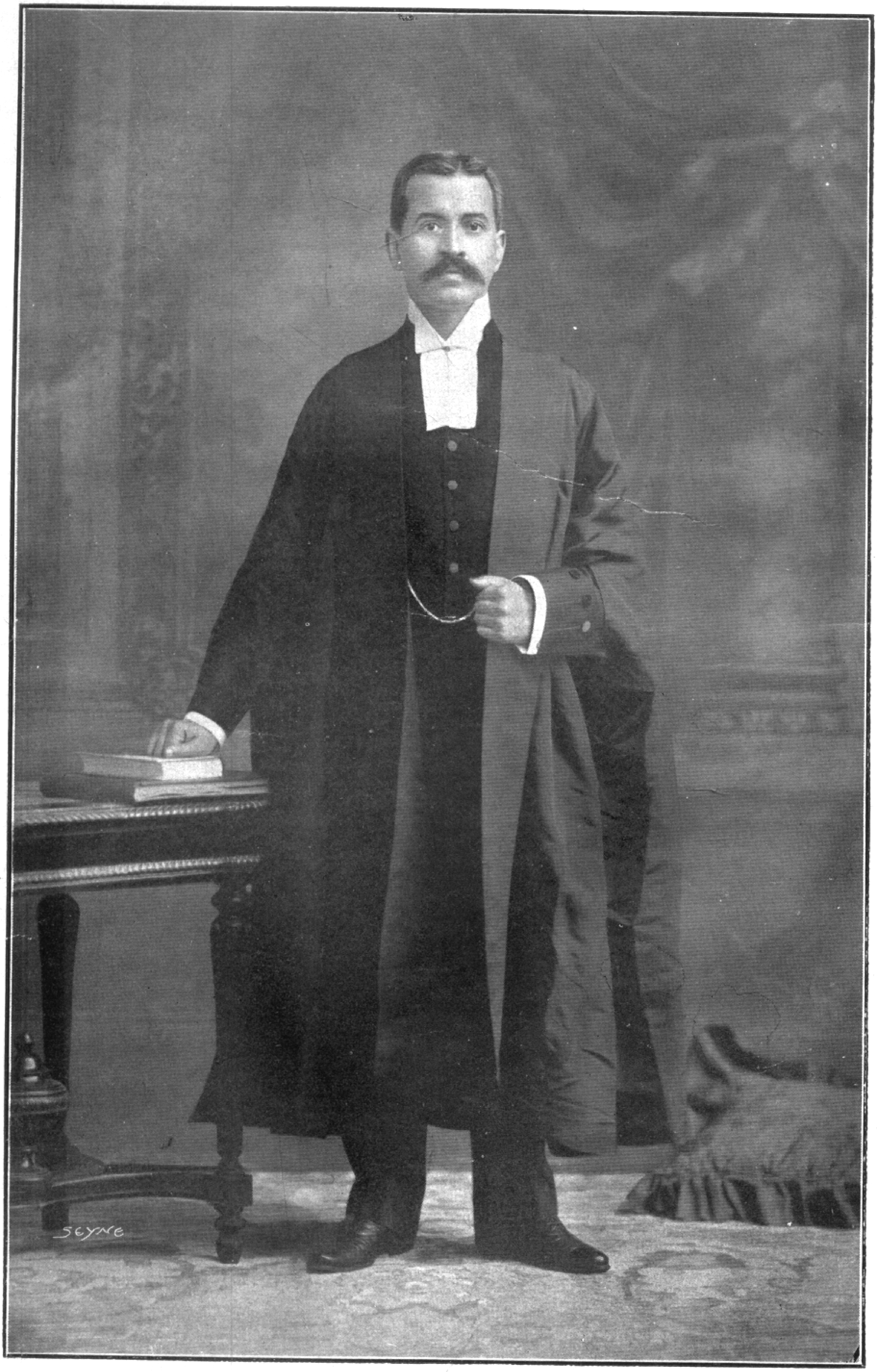
নদী কেবলি বল্‌চে আমি সমুদ্র হব। সে তার স্পর্দ্ধা নয়—সে যে সত্য কথা, সুতরাং সেই তার বিনয়। তাই সে সমুদ্রের সঙ্গে মিলিত হয়ে ক্রমাগতই সমুদ্র হয়ে যাচ্চে—তার আর সমুদ্র হওয়া শেষ হল না।

বস্তুত চরমে সমুদ্র হতে থাকা ছাড়া তার আর গতিই নেই। তার দুই দীর্ঘ উপকূলে কত ক্ষেত কত সহর কত গ্রাম কত বন আছে তার ঠিক নেই—নদী তাদের তুষ্ট করতে পারে পুষ্ট করতে পারে, কিন্তু তাদের সঙ্গে মিলে যেতে পারেনা। এই সমস্ত সহর গ্রাম বনের সঙ্গে তার কেবল আংশিক সম্পর্ক। নদী হাজার ইচ্ছা করলেও সহর গ্রাম বন হয়ে উঠ্‌তে পারে না।

সে কেবল সমুদ্রই হতে পারে। তার ছোট সচল জল সেই বড় অচল জলের একই জাত। এই জন্যে তার সমস্ত উপকূল পার হয়ে বিশ্বের মধ্যে সে কেবল ঐ বড় জলের সঙ্গেই এক হতে পারে।

সে সমুদ্র হতে পারে কিন্তু সে সমুদ্রকে পেতে পারে না। সমুদ্রকে সংগ্রহ করে এনে নিজের কোনো বিশেষ প্রয়োজনে তাকে কোনো বিশেষ গুহা গহ্বরে লুকিয়ে রাখ্‌তে পারে না—যদি কোনো ছোট জলকে দেখিয়ে সে মূঢ়ের মত বলে, হাঁ সমুদ্রকে এইখানে আমি নিজের সম্পত্তি করে রেখেছি তাকে উত্তর দেব, ও তোমার সম্পত্তি হতে পারে কিন্তু ও তোমার সমুদ্র নয়। তোমার চিরন্তন জলধারা এই জলটাকে চায় না, সে সমুদ্রকেই চায়। কেন না সে সমুদ্র হতে চাচ্চে সে সমুদ্রকে পেতে চাচ্চে না।

আমরাও কেবল ব্রহ্মই হতে পারি আর



শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ

কিছুই হতে পারিনে। আর কোনো হওয়াতে ত আমরা সম্পূর্ণ হইনে। ধনী হওয়া মানী হওয়া বিদ্বান হওয়া কিছুতেই আমরা টিঁকে থাকিনে—সমস্তই আমরা পেরিয়ে যাই; পেরতে পারিনে ব্রহ্মকে। ছোট সেখানে বড় হয়। কিন্তু তার সেই বড় হওয়া শেষ হয়না—এই তার আনন্দ।

আমরা এই আনন্দেরই সাধনা করব। আমরা ব্রহ্মে মিলিত হয়ে অহরহ কেবল ব্রহ্মই হতে থাক্‌ব। যেখানে বাধা পাব সেখানে, হয় ভেঙে নয় এড়িয়ে যাব। অহঙ্কার, স্বার্থ এবং জড়তা যেখানে নিষ্ফল বালির স্তূপ হয়ে পথ রোধ করে দাঁড়াবে সেখানে প্রতিমুহূর্ত্তে তাকে ক্ষয় করে ফেলব।

একটু রস, একটু ভাব, একটু চিন্তাই ব্রহ্ম নয়। সমস্ত দিন সমস্ত চিন্তায় সমস্ত কাজে একেবারে সমগ্র নিজেকে ব্রহ্মের অভিমুখে চালনা কর—উল্টোদিকে নয়, নিজের দিকে নয়—কেবলই সেই ভূমার দিকে, শ্রেয়ের দিকে, অমৃতের দিকে। সমুদ্রে নদীর মত তাঁর সঙ্গে মিলিত হও—তাহলে তোমার সমস্ত সত্তার ধারা কেবলি তিনিময় হতে থাকবে, কেবলি তুমি ব্রহ্ম হয়ে উঠ্‌বে। তাহলে তুমি তোমার সমস্ত জীবন দিয়ে সমস্ত অস্তিত্ব দিয়ে জান্‌তে পারবে ব্রহ্মই তোমার পরমা গতি, পরমা সম্পৎ, পরম আশ্রয়, পরম আনন্দ, কেননা তাঁতেই তোমার পরম হওয়া।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ।

ভারত শাসনে প্রথম ভারতবাসী।

গত ১৯শে এপ্রিল অনারেবল এস্ পি সিংহ মহোদয় বড়লাটের মন্ত্রণা সভার সভ্যপদের কর্ম্মভার গ্রহণ করিয়াছেন। ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের শাসন কর্ত্তৃগণের গুপ্তমন্ত্রণাসভার গণ্ডির মধ্যে ভারতবাসীর এই প্রথম প্রবেশ। এরূপ উচ্চ সম্মান ও পদ লাভ করিয়া সিংহ মহোদয় কেবল যে বাঙ্গালীর মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন, তাহা নহে, তিনি আজ সমগ্র ভারতের গৌরবস্বরূপ। তাঁহার জীবনী দেশের প্রায় সকল পত্রেই প্রকাশিত হইয়াছে, তথাপি আমরা তাঁহার জীবনের একটা সংক্ষিপ্ত ইতিহাস প্রকাশ করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না।

বীরভূম জেলার রায়পুর নামে এক ক্ষুদ্র গ্রামে ১৮৬৩ সালের ২৪শে মার্চ্চ সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা সিতিকণ্ঠ সিংহের তিনি কনিষ্ঠ পুত্র ছিলেন। দুর্ভাগ্য বশতঃ দুই বৎসর বয়সের পূর্ব্বেই তিনি পিতৃহীন হন। কিন্তু তাঁহার মাতা ও শিক্ষকের যত্নে তাঁহার বাল্যশিক্ষার কোন অভাব হয় নাই। সেই অল্প বয়স হইতেই তিনি অক্লান্ত শ্রম ও অচল অধ্যবসায়ের সাধনা শিক্ষা করিয়াছিলেন। এখানে বিশ্ববিদ্যালয় হইতে কোন উপাধি গ্রহণ করিবার পূর্ব্বেই তিনি ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শিক্ষা সমাপ্তির জন্য ইংলণ্ডে গমন করেন। তথায় সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন আইন বিভাগে প্রবেশ করিয়া অল্পকালের

মধ্যেই আপন প্রতিভার পরিচয় দান করেন। তাঁহার অসাধারণ বুদ্ধি দেখিয়া তথাকার কর্তৃপক্ষ এতদূর মুগ্ধ হইয়াছিলেন, যে তিনি শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পূর্ব্বেই তাঁহারা তাঁহাকে ব্যারিষ্টার করেন। ১৮৮৬ সালের নভেম্বর মাসে তিনি কলিকাতা হাই-কোর্টে প্রবেশ করেন। এবং অসাধারণ ধীশক্তির পরিচয়দানে ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে ষ্ট্যাণ্ডিং কাউন্সিলের পদে এবং ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে এড্‌ভোকেড জেনারেলের পদে নিযুক্ত হন। ইতি পূর্ব্বে কোন ভারতবাসীই এড্‌ভোকেট জেনারেল হন নাই। তাহার পর আজ তিনি যে উচ্চপদে আরোহণ করিয়াছেন, তাহা ভারতের ইতিহাসে এক যুগান্তরের প্রবর্ত্তক বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

সাধারণ ইংরাজের ক্রুদ্ধ প্রতিবাদ সত্ত্বেও তাঁহাকে এই অভূতপূর্ব্ব সম্মান ও শক্তি প্রদান করিয়া লর্ড মিণ্টো এবং লর্ড মর্লি যেরূপ সহৃদয়তা ও মানসিক বলের পরিচয় দিয়াছেন—তাহাতে ভারতবাসী মাত্রেই মুগ্ধ ও কৃতজ্ঞ। অনেক মাতব্বর ইংরাজই নানা তর্ক যুক্তি-দ্বারা এইরূপ প্রমাণ করিতে চাহেন যে ভারত-বাসীকে এই পদ দান করিয়া গভর্ণমেণ্ট নিতান্তই নীতিবিগর্হিত কার্য্য করিয়াছেন—এ সম্বন্ধে পার্লামেণ্ট সভায় আর্ল পার্সির সহিত প্রধান মন্ত্রী অ্যাস্‌কুইথের যে বাদানুবাদ চলিয়াছে আমরা দৃষ্টান্ত-স্বরূপ তাহাই মাত্র উদ্ধৃত করিলাম।

আর্ল পার্সির কথা—"বড়লাটের মন্ত্রণাসভায় ভারতবাসীকে প্রবেশাধিকার দানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিবার পূর্ব্বে আমি তিনটী প্রশ্ন করিতে চাই। প্রথমতঃ বিভাগ বিশেষের কর্ম্মে অভিজ্ঞ ও দক্ষ ভারতবাসী মেলা সম্ভব হইলেও তাহার আপন গণ্ডির বাহিরের বিষয়ে অভিজ্ঞ ও দক্ষ ভারতবাসী পাওয়া কি সম্ভব? দ্বিতীয়ত, এরূপ ভারতবাসী পাওয়া সম্ভব হইলেও বিভিন্ন জাতি, ধর্ম্ম ও স্বার্থের সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অপক্ষপাত ও সমদর্শী কোন ভারতবাসী পাওয়া কি সম্ভব? এই সকল গুণে কি কোন ভারতবাসী ইংরাজের সমকক্ষ হইতে পারিবেন? তৃতীয়তঃ, দুই এক জন এরূপ উপযুক্ত ব্যক্তি পাওয়া সম্ভব হইলেও দেশে কি এরূপ লোকের সংখ্যা এত অধিক যে আমরা কোন জাতি বা সম্প্রদায় বিশেষের প্রতি পক্ষপাতিতা প্রদর্শনের অপবাদ হইতে আত্মরক্ষা করিয়া, সকল প্রদেশ ও সম্প্রদায় হইতে সভ্য নির্ব্বাচনে সমর্থ হইব?"

সাধারণ ইংরাজ আমাদিগকে কিরূপ হীন দৃষ্টিতে দেখেন এই উক্তিই তাহার পরিচয় প্রদান করিতেছে।

প্রধান মন্ত্রী এসকুইথ্ উত্তর দিতেছেন—

"তাঁহার প্রথম প্রশ্নের উত্তরে আমি এইমাত্র বলিতে চাই যে; কোন দেশেই দেশের শাসন কর্ম্মে নিযুক্ত হইবার পূর্ব্বে কোন ব্যক্তির সর্ব্ব বিষয়ে অভিজ্ঞ হওয়া সম্ভব নহে। আমাদের দেশে যিনি সর্ব্বপ্রথম মন্ত্রিত্বে নিযুক্ত হন তিনি কি তৎপূর্ব্বে এরূপ কর্ম্মে অভিজ্ঞতালাভের সুযোগ পান? কিন্তু মন্ত্রিপদারূঢ় হইবামাত্র তিনি রাজ্যের নানারূপ গুপ্তবিষয়ে হস্তক্ষেপ ও ব্যবস্থা করিতে বাধ্য হইয়া ক্রমশঃ অভিজ্ঞতালাভ সহকারে দক্ষতার সহিত রাজকর্ম্ম পরিচালনা করিয়া থাকেন।

হিন্দু বা মুসলমান যে কোন ভারতবাসী তাঁহার অসাধারণ বিদ্যা বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতায় অন্যান্য ইয়ুরোপ-বাসী ও ইংরাজের সহিত প্রতিযোগিতায় জয়ী হইলেও কেবলমাত্র ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণের অপরাধেই তিনি চিরদিনের জন্য এরূপ দায়ীত্বপূর্ণ কর্ম্মে নিযুক্ত হইবার অযোগ্য, আর্ল পার্সি যদি এ কথা না বলেন তাহা হইলে এরূপ পদ হইতে ভারতবাসীকে দূরে রাখিবার অন্য কোন কারণ আমি দেখিতে পাই না! পূর্ব্ব অভিজ্ঞতার বিষয় বলিলে আমি জিজ্ঞাসা করি, আমরা যে সকল ইংরাজকে ভারতের শাসন-কর্ম্মে এতদিন ধরিয়া প্রেরণ করিয়া আসিতেছি, এবং যাঁহারা তাঁহাদের দক্ষতা ও উচ্চ গুণপণার বলে

আমাদের নির্ব্বাচনের সার্থকতা প্রমাণ করিয়া আসিতেছেন তাঁহাদের মধ্যে কয় জন পূর্ব্ব হইতে ভারত সম্বন্ধে অভিজ্ঞ? অধিকাংশ স্থলেই আমরা ভারতের আইন ও অর্থ সচিব এখান হইতে পাঠাইয়া থাকি এবং তাঁহারা তৎপূর্ব্বে ভারতবর্ষে কখনও পদার্পণ করেন নাই এবং ভারতের জটিল সমস্যা সকল সম্বন্ধে কখন চিন্তামাত্র করেন নাই। এরূপ স্থলে মিষ্টার সিংহের ন্যায় সম্ভ্রান্ত, উচ্চ শিক্ষিত, আইন ব্যবসায়ের সর্ব্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠিত এবং আইনের বিভিন্ন বিভাগে ব্যুৎপন্ন, যে ব্যক্তি ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ও ভারতেই প্রতিপালিত, এরূপ লোকের সম্বন্ধে কি প্রকারে বলা সম্ভব যে তিনি বড়লাটের আইন সচিবের পদ প্রাপ্তির উপযুক্ত নহেন? আমি জোর করিয়া বলিতে পারি যে এই পদের জন্য এই হিন্দুর অপেক্ষা উপযুক্ততর কোন ব্যক্তি ইংলণ্ডে পর্য্যন্ত পাওয়া সম্ভব নহে। আমার জিজ্ঞাস্য এই যে, মহারাণী ভিক্টোরিয়া হইতে রাজার ঘোষণা সত্ত্বেও, আপনারা চাহেন যে, কি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে এই সঙ্কীর্ণ নীতির সমর্থন করিতে সিংহের ন্যায় অসাধারণ গুণান্বিত ব্যক্তিকেও কেবলমাত্র তিনি ভারতবাসী ও আমাদিগের স্বজাতি নহেন বলিয়া, এরূপ অধিকার হইতে বঞ্চিত রাখাই আমাদের কর্ত্তব্য?"

প্রধান মন্ত্রীর এই উদার উক্তিতে ভারতবাসী মাত্রেরই অন্তর কৃতজ্ঞতায় অভিভূত সন্দেহ নাই এবং বঙ্গবাসী যদি ইহাতে একটু বিশেষ গৌরব অনুভব করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে বিশেষ দোষী করা যায় না।

পোষ্যপুত্র।

(৩)

বৃষ্টি ধৌত গাছ পালার উপর দিয়া ফুরফুরে হাল্কা বাতাস ধীরে ধীরে বহিয়া গেল। রজনীনাথের বৃহৎ উদ্যানে যুঁই কুঁড়িগুলি ফুটিয়া উঠিল ও ম্লান ফুলগুলি ঝরিয়া পড়িল। প্রাচীরের ধারে ধারে আম গাছে সবুজ আম, লাল লিচুর ঝাড় আর প্রশস্ত উদ্যান ব্যাপিয়া নানাবিধ প্রস্ফুটিত অর্দ্ধস্ফুট পুষ্পের শোভা; মধ্যে মধ্যে লাল কঙ্করময় পথ, দুই ধারে ক্ষুদ্রজাতীয় পুষ্পের পাড় ও মধ্যে মধ্যে সুনির্ম্মিত লতাকুঞ্জ এবং স্থানে স্থানে কোথাও লৌহাসন কোথাও বা সুন্দর মর্ম্মরাসন।

এই মনোহর উদ্যানের মধ্যে একটি শ্বেত সুন্দর অট্টালিকা নিজ সৌন্দর্য্যে ও ঐশ্বর্য্যে যেন গর্ব্বিত ও স্ফীত হইয়া দাঁড়াইয়া আছে।

সম্মুখের থামগুলা লতাজড়িত এবং তাহাদের উপরিস্থিত পরীশিশুবাহন পক্ষীরাজগণ অত্যন্ত সুন্দররূপে গঠিত হইয়াছিল। বাস্তবিকই রজনীনাথের বাড়ীখানি একখানি সুচিত্রিত ছবির মতন দেখাইতেছিল।

উদ্যানের লৌহ বেঞ্চে গৃহস্বামী ও তাঁহার একজন মক্কেল বসিয়া কথোপকথন করিতেছিলেন।

অল্প দূরে লৌহ রেইল্ বেষ্টিত শ্যামল তৃণাবৃত স্থানে দুইটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, চঞ্চলনেত্র হরিণশাবক লাফাইয়া লাফাইয়া খেলিয়া বেড়াইতেছিল আর তাহাদেরি মত কৃষ্ণোজ্জল নয়না একটি বালিকা তাহার চঞ্চলগতি ভাইটির সহিত তাহাদের ক্রীড়া দেখিতেছিল। বালক দিদির হাত হইতে কোমল হরিৎ দূর্ব্বা লইয়া তাহাদের মুখের নিকট ধরিতেছে, এবং তাহাদের সহিত তাহাদেরি মত উল্লাসে লাফাইতেছে, ছুটিতেছে, আবার আসিয়া

দিদির কাছে চুপটি করিয়া দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া তাহাদের খেলা দেখিতেছে। অনেকক্ষণ পরে বালকের আর ভাল লাগিল না সে দিদির হাত ধরিয়া টানিল। "দিদি পায়রাগুলোকে বুঝি খেতে দিতে হবে না?

ভাই ভগিনী দুইটি তখন তাহাদের কুশের ডালা দুখানি উঠাইয়া লইয়া পায়রার খোপের নিকটে গিয়া তাহাদের আহার্য্য প্রদান করিতে লাগিল।

শস্য কণিকার লোভে দলে দলে ঘুঘু্‌র পাঁরা সাদা কালো পাটল বিবিধ বর্ণে চিত্রিত সুন্দর সুন্দর পারাবতগুলি তাহাদের খোপ ছাড়িয়া উড়িয়া আসিয়া চারিদিক হইতে ভাই বোন দুটিকে যেন ঘিরিয়া ফেলিল।

"দিদি দিদি নতুন লক্কাটা তোমার কাঁধে গিয়ে বসলো দেখো; ঐ যা উড়ে গেল! দিদি তোমার হাত থেকে গ্রাবাজটা কেমন খায়! আমি ধরতে গেলে ও পালিয়ে যায়, আসেনা! বাঃ বাঃ বেশ মজা হয়েছে মুক্ষিটা বাবার কাছে উড়ে গ্যালো।"

বালক সুপ্রকাশ এই রূপে পক্ষীদের আনন্দ ভোজের আনন্দ আরও বাড়াইয়া তুলিতেছিল। তাহার দিদি মধ্যে মধ্যে হাসি-মাখা কালো চ'খের স্নিগ্ধ ছায়া-ঢাকা দৃষ্টি তাহার দিকে ফিরাইয়া তাহার উৎসাহোৎফুল্ল মুখের মিষ্ট হাসি দেখিতেছিল, আবার কর্ত্তব্য পরায়ণা জননীর মত গম্ভীরমুখে নিবিষ্টচিত্তে তাহার পালিত সন্তানগুলিকে আহার্য্য প্রদান করিতেছিল।

রজনীনাথ ও তাঁহার অতিথি তাঁহাদের আলোচনায় গাঢ় নিমগ্নচিত্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। অনেকক্ষণ কথা বার্ত্তার পর আলোচ্য বিষয়ের মীমাংসা হইয়া গেলে প্রবীণ অভ্যাগত নবীন গৃহস্বামীকে বলিলেন—"তাহলে এই মাস থেকেই ওটা আরম্ভ করা যাক্—কি বলো?"

"হাঁ বৃথা সময় নষ্ট করে লাভ কি—এবার যেদিন আস্‌বেন সে ডকুমেণ্টখানা সঙ্গে করে আন্‌বেন, একবার দেখে শুনে দেওয়া যাবে। রজনীনাথ কলিকাতা হাইকোর্টের এক প্রধানতম উকিল এবং এই প্রবীণ লোকটি তাঁহার একজন পুরাতন ধনী মক্কেল লক্ষ্মীপুরের জমীদার শ্যামাকান্ত চৌধুরী।

কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া রজনীনাথ সহসা ঈষৎ সঙ্কোচের সহিত ধীরে ধীরে জিজ্ঞাসা করিলেন "তারপর বিনোদের কোন খবর পেলেন?"

শ্যামাকান্ত অন্যমনস্ক ভাবে গোধূলীর গোলাপী ও ধূসর মিশ্রিত বর্ণ পূর্ব্বাকাশের দিকে চাহিয়া কি ভাবিতেছিলেন রজনীনাথের প্রশ্নে অকস্মাৎ যেন চমকিয়া উঠিলেন। তাঁহার অকাল বার্দ্ধক্য রেখাঙ্কিত ললাট আরও কুঞ্চিত হইয়া আসিল। দৃষ্টি ফিরাইয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া অস্ফুটস্বরে উত্তর দিলেন "কিছু না।" সঙ্গীর মুখের শোচনীয় ভাব পর্য্যবেক্ষণ করিয়া রজনীনাথ আর কোন কথা বলিতে সাহসী হইলেন না।

সন্ধ্যার নির্ম্মল আকাশে দুএকটি মিট্‌মিটে তারা নববধূর সরম রাগজড়িত অর্দ্ধ নিমীলিত চাহনির মত নীল ঘোমটার মাঝখান হইতে ধীরে ধীরে চাহিয়া দেখিতে আরম্ভ করিয়াছে, মর্ম্মর আসনের উপর বসিয়া ভাই বোনে উর্দ্ধে চাহিয়া তারা গণিতেছে। "আমি দুটো দেখ্‌তে পেয়েছি।" "আমি তো একটা বই



শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ ও তাঁহার পত্নী

দেখ্‌তে পাচ্চি না ?" ঐ যে ঠিক ঝাউ গাছের মাথায় ঐ ছোট্ট।" "কই দিদি আমি ত দেখ্‌তে পাচ্ছি না।"

রজনীনাথের কাণে হঠাৎ তাহাদের কণ্ঠস্বর ও হাসির তরল শব্দ বাজিয়া উঠিল ; তিনি শব্দানুসরণ করিয়া মুখ ফিরাইলেন—ডাকিলেন "শান্তি !"

"কি বাবা ?" বলিয়া শান্তি ও সুপ্রকাশ পিতার নিকট ধীরে ধীরে আসিয়া দাঁড়াইল।

রজনীনাথ শান্তির দিকে চাহিয়া আজ্ঞা করিলেন—"তোমার জ্যেঠা মহাশয়কে প্রণাম করো। সুকু তুমি কর্‌লে না ?" প্রণাম করিয়া দাঁড়াইলে শ্যামাকান্ত বালকবালিকার ললাটে চুম্বন করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। তাঁহার ক্লান্ত হৃদয় সেই স্নেহের পুতুল দুটীকে স্পর্শ করিয়া যেন অনেকটা সবল হইয়া উঠিল। রজনীনাথও তাহা বুঝিলেন।

শ্যামাকান্ত স্নিগ্ধদৃষ্টিতে তাহাদের দেখিতে দেখিতে রজনীনাথকে বলিলেন "কই এদের তো আর বারে এসে দেখিনি ?" "বোধহয় এখানে ছিল না ; শান্তির মায়ের অসুখের জন্য তখন ওদের দার্জ্জিলিং পাঠিয়েছিলাম। শান্তি যখন খুব ছোট্ট তখন আপনি ওকে দেখেছিলেন ; মনে নেই আপনার ? সেই যখন জয়নারাণের কেস্‌টার জন্য আস্‌তেন ?"

শ্যামাকান্ত পূর্ব্বকথা স্মরণ করিবার জন্য কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া রহিলেন ; তার পর ধীরে ধীরে নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—"হাঁ" মনে পড়্‌চে। সেইবারে তুমি বলেছিলে যদি শান্তিকে বদ্‌লে আপনার ছেলেটী আমায় দেন তা হলে ওকে ভাল করে পড়িয়ে শুনিয়ে বিলেতে পাঠাই। সেই শুনেই তো জেদ ধর্‌লে।" শ্যামাকান্ত আবার গভীর দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। রজনীনাথ ক্ষোভের সহিত নিরুত্তর হইয়া রহিলেন ; পুত্রহারা পিতার নিকট নিজেকে অপরাধী বলিয়া মনে হইতে লাগিল।

পরক্ষণেই শ্যামাকান্ত সহসা আত্মসম্বরণ করিয়া লইলেন। নিজের গভীর দুঃখের ঘন ছায়া অপরের মুখের আলো নষ্ট করিতেছে দেখিয়া ঈষৎ যেন লজ্জিত হইলেন। শান্তি ও সুপ্রকাশ পিতার গায়ে ঘেঁসিয়া দাঁড়াইয়া বিস্ময়ের সহিত অপরিচিত বৃদ্ধ ব্যক্তিটীকে পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিল। তাঁহার প্রচুর শুভ্র কেশ, কুঞ্চিত ললাট, বিশাল দেহ,শুভ্র সুগৌরব বর্ণ শান্তির মনে তাঁহার জ্যেঠামহাশয়ত্বে বিন্দুমাত্র সংশয় উপস্থিত করে নাই ; কিন্তু সুপ্রকাশ কিছু গোলযোগে পড়িয়াছিল কারণ বাকুলার জ্যেঠামহাশয়ের যে মস্ত সাদা দাড়ি আছে ইনি যদি জ্যেঠামহাশয় তাহলে এঁর দাড়ি কোথা গেল ?

শ্যামাকান্ত সস্নেহে শান্তির হাত ধরিয়া তাহাকে নিজের কাছে বসাইলেন—জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার পুরো নাম কি মা—শান্তিসুধা ?"

শান্তি তাহার কাল চোখের তারা ভূমিলগ্ন করিয়া ধীরে ধীরে উত্তর করিল "না শান্তিলতা"।

"সত্য সত্যই তুমি শান্তিলতা। তোমার নামটি কি বাবা ?" সুপ্রকাশ পিতার জানুর উপর কনুইএ'র ভর রাখিয়া তাঁহার কোলের উপর শুইয়া পড়িয়াছিল কিন্তু তাহার চঞ্চল চোখের বিস্মিত দৃষ্টি বরাবরই অপরিচিতের উপর সংবদ্ধ ছিল ; এখন নাম জিজ্ঞাসিত হইয়া সে পিতার জানুর উপর হইতে উঠিয়া সোজা

হইয়া দাঁড়াইল; গম্ভীর মুখে উত্তর দিল "শ্রীসুপ্রকাশচন্দ্র মৈত্র।"

"সুপ্রকাশ, বেশ নাম। আমার কাছে এসো ; শান্তিলতা, তুমি পড়্তে জানো ?"

শান্তি নীরবে পিতার দিকে চাহিল। রজনীনাথ তাহার মৌন আবেদন বুঝিয়া তাহা মঞ্জুর করিলেন "ও মহাকালী পাঠশালায় পড়ে, শান্তি সেদিন যে স্তবটা শিখেছো সেটা তোমার জ্যেঠামশাইকে শোনাও না ?"

শান্তি ঈষৎ সঙ্কুচিত হইয়া সুপ্রকাশের দিকে চাহিল, তারপর আবার পিতার দিকে ফিরিয়া আস্তে আস্তে বলিল, "সুকুও জানে বাবা ও বলবে ?" শ্যামাকান্ত বলিলেন "দুজনেই বল।"

সুপ্রকাশ সমধিক গম্ভীর হইয়া দিদির পাশটিতে আসিয়া দাঁড়াইল ; শান্তির সহিত কণ্ঠ মিলাইয়া শ্লোক আবৃত্তি করিল। পাঠ সমাপ্ত হইলেও বহুক্ষণ মুগ্ধ শ্রোতা ভাব-বিভোর হইয়া রহিলেন, তারপর তাঁহার সজল নেত্রদ্বয় তুলিয়া রজনীনাথের মুখে স্থাপন করিয়া বলিলেন "পরের সুখে হিংসা করা উচিত নয়, আমি হিংসা করি নাই, কিন্তু বাস্তবিক তুমিই সুখী ; আমার যদি এমন একটি মেয়েও থাকতো।"

শ্যামাকান্ত আবার বলিতে লাগিলেন "সেই একজন হতেই আমি সব পেতে পার্তেম, ওঃ অকৃতজ্ঞ আমার দিকে একবার চাইলে না ! বৃদ্ধ বয়সে আমায় একা ফেলে চলে গ্যালো ! যাক্ আমার যতদিন কর্ম্মভোগ আছে যক্ষের ধন আগ্‌লাই তার পর যেদিন ডাক আস্‌বে সেদিন চলে যাব।" গভীর হইতে গভীরতর

নীরবে বহুক্ষণ শূন্যচক্ষে চাহিয়া রহিলেন। তারপর শুষ্ক ওষ্ঠে একটু ক্ষীণ হাসি আনিয়া তাঁহার নূতন বন্ধুকে কহিলেন, "শান্তিলতা তুমি গল্প বল্‌তে পার না ? রাজার গল্প জানো ? না, শিয়ালের গল্প জানো ?"

গল্পের কথায় সুপ্রকাশের উৎসাহ সমস্ত বাধা বিপত্তি কাটাইয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল সে তাড়াতাড়ি তাঁহার কাছে আসিয়া সাগ্রহে বলিয়া উঠিল "দিদি রাজা—আর 'দো' 'সো' দুই রাণীর—আর শেয়ালের গল্প সবই জানে, জ্যেঠামশাই ! আর আমিও ঢেঁকি চিংড়ির পিঠে খাওয়ার গল্প শিখেছি।"

উভয়েই হাসিলেন। শ্যামাকান্ত বালকের সুগোল বাহু দুইটী ধারণ করিয়া তাহাকে কোলের উপরে টানিয়া বসাইলেন।

যে কয়দিন মোকদ্দমার জন্য শ্যামাকান্ত চৌধুরীর কলিকাতায় থাকিতে হইল সে কয়দিন তাঁহার ভাঁটা পড়া জীবন নদীতে যেন একটা বর্ষার বন্যা একটা উচ্ছ্বাসের জোয়ার আসিয়াছিল।

বৈকালে কোর্ট হইতে ফিরিয়াই প্রলুব্ধ-ভাবে দ্বারের দিকে চাহিয়া থাকিতেন। কতক্ষণে দুগাছি প্লেন বালাপরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হস্ত সাবধানে একখানি প্রস্তর রেকাব বহন করিয়া আনিবে ! মনে পড়িত সেই ছেলে বেলা স্কুল হইতে ফিরিয়া এমনি আগ্রহে খাবারের অপেক্ষা করিতেন ! সেও এক স্নেহময়ী রমণী ক্ষুধিত বালকের নিমিত্ত আহার্য্য আনিয়া এমনি স্নেহে কাছে বসিয়া তাঁহাকে আহার করাইতেন; এমনি স্নেহে নিজের আঁচল দিয়া ললাটের ঘাম মুছাইয়া দিতেন ; এমনিই আগ্রহে দিবসের

শ্যামাকান্ত বড় হইলেন, নূতন লোক আসিল, নূতন জীবনে নূতনতর স্রোত বহিল, প্রভাত মধ্যাহ্নে পরিণত হইবার সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির মতনই অন্তরে বাহিরে সমস্ত পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গেল।

কিন্তু আবার এই শ্যামা সন্ধ্যায় জীবনের এই অপরাহ্নে একি মায়ামন্ত্রে অতীত তাহার স্বপ্ন স্মৃতি লইয়া ধীরে ধীরে মুদ্রিত প্রায় হৃদয় প্রান্তে সোণালী আলোক জ্বালাইয়া তুলিতেছে। সারা মধ্যাহ্নের ধূলিরৌদ্রমাখা আশা নিরাশার অবিরত সংঘর্ষে ক্ষত বিক্ষত শ্রান্ত হৃদয়ে একি নূতন মোহ। নূতন সাধ! অস্ত গমনোন্মুখ রবি যেমন আর একবার তাহার দাহকারী শক্তি সম্বরণ করিয়া প্রভাত কিরণের মতই স্নিগ্ধকর ও নির্ম্মল আলোক প্রদান করিয়া যায় তাঁহার ভাগ্যও কি সেইরূপ আর একবার এই মরণ নদীর কূলে আনিয়া তাঁহাকে তাঁহার সেই শৈশবের স্বপ্ন দেখাইতেছে! একি শুধু নিবিবার পূর্ব্বক্ষণে দীপ-শিখার ক্ষণিক হাসি, বিদ্যুতের চপল খেলা!

বৃদ্ধ শ্যামাকান্ত এই ক্ষুদ্র বালিকার মধ্যে তাঁহার বহুদিন গত প্রৌঢ়া জননীর স্নেহময়ী মূর্ত্তি দেখিতে পাইতেন। বালিকার স্নেহপূর্ণ কালো চোখে, সূক্ষ্ম গোলাপী অধরে, কোমল বাহুলতায় অপূর্ব্ব মাতৃস্নেহ অনুভব করিতেন। মনে মনে তাঁহার এই ক্ষুদ্র জননীটিকে একটু একটু শ্রদ্ধা করিতেন প্রকাশ্যে তাহাকে একটুকু ভয়ও করিতেন। যখন সে গম্ভীর হইয়া তাঁহাদের খাওয়াইতে বসিত এবং ঈষৎ ভর্ৎসনার সহিত অনুযোগ করিত 'জ্যেঠামশাই তুমি কিছু খাচ্ছ না'—অমনি শ্যামাকান্তকে তাঁহার ক্ষুদ্র মায়ের মনোরঞ্জন করিবার জন্য আবার মাছের ঝোল বা অম্বলের বাটি টানিয়া দুটি ভাত ভাঙ্গিতেই হইত, অন্ততঃ দুধের বাটিতে ভাত না তুলিলে রক্ষা থাকিত না।

সন্ধ্যায় যখন রজনীনাথ তাঁহার মক্কেল বেষ্টিত হইয়া আইন চর্চ্চা করিতে ব্যস্ত থাকিতেন তখন এই তিনটি প্রাণী মিলিয়া তাহাদের সবটুকু অভিজ্ঞতা খরচ করিয়া সন্ধ্যাটিকে মধুরতর করিয়া তুলিত। বাঘের গল্পে শিয়ালের গল্পে রাখালের গল্পে তাহাদের আসরটি গম গম করিতে থাকিত; প্রাণের অনবরত উৎসারিত কলহাস্য, পোষা পাখীর বুলির মত মিষ্ট কথাগুলি সংসারতাপ-জর্জ্জরিত বৃদ্ধের মসিমলিন চিত্তের সমস্ত কালীর রেখা যেন মুছাইয়া ফেলিত। তাহাদের সহিত তিনিও যে হাসি হাসিতেন তাহা সত্য সত্যই তাঁহার সেই শুষ্ক হৃদয় হইতেই উৎসারিত হইয়া উঠিত; তাহার মধ্যে কোথায়ও একটু বিষাদের সুর ঝঙ্কার দিয়া উঠিত না; বাস্তবিকই বৃদ্ধ শ্যামাকান্ত তাঁহার মোকর্দ্দমার দিন কয়টা বড়ই আনন্দে যাপন করিতেছিলেন।

মেঘমুক্ত ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় পাটি পাড়া বিছানায় বসিয়া তিনটি সঙ্গিতে গল্প চলিতেছিল। তখন তাহাদের রাখালের গল্প শেষ হইয়া আসিয়াছে। রাখাল তখন রাক্ষসী বধূর কাপড় গহনা পরিয়া ঘোমটা টানিয়া বধূ সাজিয়াছে এবং নিমন্ত্রিতদের প্রতারণাদ্বারা পরিবেষণ করিতেছিল। সুপ্রকাশ বহু বার শ্রুত গল্প রুদ্ধ নিশ্বাসে শুনিতেছিল। গল্প শেষ হইলে আনন্দে করতালি দিয়া হাসিয়া উঠিল। কেমন মজা হলো; বুড়ী খুব জব্দ হয়ে গ্যাছে।"

শান্তি হাসিয়া বলিল "জানো জ্যেঠামশায়!

স্নকু ভাবে গল্প গুলো যেন সত্যি হয় তাই রাখালের মত পিটে-গাছ কর্ব্বার জন্য ও মাটিতে একটা পিটে পুঁতে দিয়ে রোজ জল দিত।”

শ্যামাকান্ত হাসিলেন। সু-প্রকাশ ঈষৎ অপ্রতিভ হইল কিন্তু হাস্যাস্পদ হওয়ায় একটু রাগিয়াও গেল, বড় বড় চোখ বিস্তৃত করিয়া বলিল—

“হ্যাঁ তুমি বুঝি সত্যি ভাব না? হরিশ্চন্দ্র রাজার ছেলে মরে গেল তুমি কাঁদোনি? মা বল্লেন গল্প শুনে কাঁদ্‌তে নেই তবু তুমি বুঝি চুপ করে ছিলে?”

শান্তি তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল “আহা রুহিদাস যে মরে গেছলো, মানুষ মরে গেলে কান্না পাবেনা জ্যেঠামশাই? তখন তো জানিনা যে আবার সে বাঁচবে।”

শ্যামাকান্ত বালিসের উপর ভরদিয়া উঠিয়া বসিলেন; প্রস্ফুট জ্যোৎস্নায় শান্তির মুখের দিকে চাহিলেন। মৃদুস্বরে কহিলেন “মা পরের জন্য কাঁদতে শেখো, সংসারে পরের কথা ভাব্‌তে সবাই শেখেনা।

তিনি একটী গভীর নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। শান্তি নিজের মনেই বলিয়া যাইতে লাগিল, “স্নকু—জানো জ্যেঠামশাই ছোট বেলায় চাঁদ ধরবার জন্য কাঁদ্‌তো; চাঁদকে আয় আয় বলে হাত নেড়ে ডাক্‌তো; আর চাঁদ যেই আসতো না আর অমনি কেঁদে রেগে ভূঁয়ে শুয়ে পড়তো। ছোট বেলায় স্নকু বড্ড বোকা ছিল; মাটির হাতীর মুণ্ডু ভেঙ্গে খেয়েছিল তাই বাবা ওকে মাটির পুতুল দিতে বারণ করে দিয়েছিলেন। কানাই কম্বল মুড়ি দিয়ে জুজুবুড়ি সেজে ওকে ভয় দেখাতো আর ও ভয়েতে চুপ করে দুধ খেয়ে নিতো, একটুও কাদ্‌তো না; আমি কিন্তু একটুও ভয় পেতাম না। হাঁ জ্যেঠা মশাই জুজুবুড়ি বুঝি আবার থাকে?”

সুপ্রকাশ অবিশ্বাসে মাথা নাড়িয়া উঠিয়া বলিল। “আছে আছে জুজুবুড়ি আছে; কল্‌কাতায় নেই—কিন্তু মোক্ষদার দেশে পুকুরে জুজুবুড়ি আছে”—

শান্তি তাহার নির্ব্বোধ ভাইটির ভুল তৎক্ষণাৎ সংশোধন করিয়া বলিল “আঃ সেতো জুজুবুড়ি নয় সেতো জটে বুড়ি। হ্যা জ্যেঠা মশাই তুমি জটে বুড়ি দেখেছ? তাদের পায় কি শেকল বাঁধা থাকে? তারা ছেলেদের ধরে সেই শেকলে বেঁধে পুকুরের মধ্যে টেনে নিয়ে যায়?

শ্যামাকান্ত হাসিয়া বলিলেন “না মা আমি কেবল আকাশবুড়ি দেখেছি; আর আমাদের বাড়ী একজন গয়লা বুড়ি ঝি আছে তাকে দেখেছি তা ছাড়া অন্য কোন বুড়ির সঙ্গে আমার জানা শোনা নাই। আর এই একটি ছোট্ট বুড়িকে এখন দেখছি।”

“আকাশবুড়ি যে চাঁদের মধ্যে বসে সুতো কাটে? আমিও দেখেছি আবার এক একদিন তুলো পিঁজে আকাশময় ছড়িয়ে দ্যায়। আচ্ছা ওযে রোজই সুতো তৈরি করে তা সে সুতগুলো কি হয়?

শ্যামাকান্ত একটু ভাবিয়া বলিলেন “কাপড় হয়?”

“কাপড় কারা পরে? দেবতারা বুঝি? আচ্ছা নক্ষত্রগুলো কি চাঁদের ছেলে মেয়ে? তবে সূর্য্যির কেন নক্ষত্র থাকে না?

বাবা বলেন নক্ষত্র গুলো নাকি এক একটা পৃথিবী, হ্যাঁ জ্যেঠা মশাই?

গরুড় চাঁদ থেকে কি করে সুধা চুরি করলে? সেই জন্যেই ত ইন্দ্রর সঙ্গে তার যুদ্ধ হয়। আচ্ছা জ্যেঠা মশায় অশ্বত্থামা হনুমান আর বিভীষণ এখন কোথায় আছে বলোনা?"

শ্যামাকান্ত কি উত্তর দিবেন ভাবিয়া আকুল, কিন্তু তাহার উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই আবার প্রশ্ন উঠিল: আচ্ছা জ্যেঠা মশাই মহাভারতে সাত সমুদ্রের কথা আছে সাত সুমুদ্দুর কোথায়? আচ্ছা ক্ষীর সাগরটা কি সত্যিকারের দুধের ক্ষীর? সে জলে তাহলে জাহাজ চলে কি করে? সেখানকার লোকেরা বুঝি ভাত রাঁধে না খালি ক্ষীর খায়?" সুপ্রকাশ মুখ গম্ভীর করিয়া মত প্রকাশ করিল "আর হয়তো পায়েস খায়, ক্ষীর দিয়ে ভাত রাঁধলেই তো পায়েস হয়ে যাবে! আমি বড় হলে সেই দেশে চাকরী কর্ত্তে যাবো; দিদি তুইও ভাই সঙ্গে যাবি কেমন?" এমন সময় সহাস্য মুখে রজনীনাথ আসিয়া সেইখানে দাঁড়াইলেন। হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কি হচ্চে?"

শান্তি ও সুপ্রকাশ সমস্বরে প্রশ্ন করিয়া উঠিল, "হ্যাঁ বাবা ক্ষীর সুমুদ্দুর কোন দেশে? আমরা দেখবো বাবা?" রজনীনাথ হাসিয়া বলিলেন "সে দেশে তোর শ্বশুর থাকে লতি?"

শান্তি শ্বশুরের কথায় ঈষৎ লজ্জিত হইয়া ভাইটির দিকে চাহিয়া বলিল—"আয় সুকু খাবার ঠিক করিগে—বাবা এসেছেন।

উহারা চলিয়া গেলে শ্যামাকান্ত একটা ক্ষুদ্র নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—

"ভাই অনেক করছো আর একটা উপকার করো। শান্তির এখন বিয়ে দিওনা।"

রজনীনাথনিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। শ্যামাকান্ত আবার মৃদুস্বরে কহিলেন "সে আমার কাছে ফিরে আসবে এ আশা এখনও আমার যায় নি। যদি আসে যদি তাকে ফিরে পাই তা হলে তখন তোমার শান্তিকে আমায় দিতে হবে।"

রজনীনাথ স্বভাবতই কোমল প্রকৃতির লোক! আহতকে এই প্রার্থনার অসঙ্গতি দেখাইয়া পুনরাহত করিতে তাঁহার ক্লেশ ও লজ্জাবোধ হইতে লাগিল। তিনি কেবল বলিলেন—

"যদি ঈশ্বর সে দিন দেন তাহলে শান্তি আপনার বৌ হবে সেত সৌভাগ্যেরই কথা; এখনও আমি তার বিবাহের জন্য কিছুই স্থির করিনি; শান্তি এখনও তেমন বড় হয়নি তো!"

শ্যামাকান্ত কৃতজ্ঞদৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিলেন কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই একটা গভীর হতাশায় তাহার হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিল। হায়! তাহার হারাণ রতন আর কি খুঁজিয়া পাইবেন? যদিই বা বনবাসী রামচন্দ্র চৌদ্দবৎসর পরে ফিরিয়া আসেন দুর্ভাগ্য দশরথ তাহাকে কি আর দেখিতে পাইবে?

(ক্রমশ)

ভারতের আধুনিক শিল্পবিজ্ঞান।

পাশ্চাত্য জাতির মধ্যে নূতন সত্য আবিষ্কারের সতত একটা সর্ব্বান্তঃকরণ চেষ্টা দেখিয়া আমরা নিজেদের প্রতি চাহিয়া আক্ষেপ না করিয়া থাকিতে পারি না। জগতের ভাণ্ডারে নূতন জ্ঞান সঞ্চয়ের জন্য তাঁহারা সর্ব্বদাই প্রাণপণে সচেষ্ট। কোথায় দক্ষিণমেরুতে পৃথিবীর অবস্থা কিরূপ, কোথায় সূর্য্যের মধ্যে উত্তাপের অবস্থা কিরূপ; কোথায় জ্যোতিষ্ক মণ্ডলীর মধ্যে নূতন গ্রহ আসিয়া দেখা দিল, পৃথিবীর কোন্ দেশে কি নূতন রোগ আসিয়া উপস্থিত, তাহার প্রতিকার কি, বিভিন্ন গ্রহে জল ও স্থলের পরিমাণ কিরূপ ও জীবের অবস্থা ও ভাষা কিরূপ ইত্যাদি অসংখ্য বিষয় লইয়া তাঁহারা সর্ব্বদাই ব্যস্ত। এরূপ সত্য আবিষ্কারের জন্য তাঁহারা যে কত বিপদ ও কষ্টকে অসঙ্কোচে বরণ করেন, তাহা দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। পৃথিবীর মেরুস্থলে উপস্থিত হইবার জন্য তাঁহারা যেরূপ অশ্রুতপূর্ব্ব কষ্ট স্বীকার করিতেছেন, তাহা পাঠ করিলে আমাদিগের নিকট তাহা উপন্যাস ভিন্ন আর কিছুই মনে হয় না। এই এক মেরুস্থল আবিষ্কার উদ্দেশ্যে কত লোক প্রাণ দিতেছে, কত আয়োজন ব্যর্থ হইতেছে, আবার তৎক্ষণাৎ নবোৎসাহে এক নূতন দল এই কার্য্যে আত্মোৎসর্গ করিতেছে। এইরূপ সকল বিষয়েই তাঁহাদের মধ্যে একটা আলোচনা, অনুসন্ধান ও অধ্যবসায় আমরা দেখিতে পাই। কেবল যে বিজ্ঞানে তাহা নহে, ক্রীড়া হইতে শিল্প ইতিহাস ও রাজনৈতিকাদি যিনি যে বিষয়ে লিপ্ত আছেন, তিনিই সর্ব্বান্তঃকরণে তাহার উন্নতি সাধনে প্রাণপণে সচেষ্ট। সিদ্ধিলাভের প্রতি এইরূপ সজীব অনুরাগ না থাকিলে, কোন জাতিরই উন্নতি হওয়া সম্ভব নহে। আর সকল সিদ্ধির মূলেই আন্তরিক আকুলতা আবশ্যক। অবশ্য জাতীয় স্বাধীনতা ইয়োরোপে এইরূপ কর্ম্মের প্রধান সহায়ক। দেশের মধ্যে বিজ্ঞানমঠ, পরীক্ষামন্দির, অনুশীলনের সুযোগ ও গ্রাসাচ্ছাদনের নিশ্চিন্ততা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠিত না হইলে ইয়োরোপের ন্যায় আমাদের মধ্যে সে আকুলতার পূর্ণ জাগরণ সম্ভব নহে। ইহা সত্ত্বেও শিল্প বিজ্ঞানে অধুনা ভারতবর্ষ যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে এমন কি অশিক্ষিতগণের মধ্যেও আমরা মাঝে মাঝে যেরূপ বিজ্ঞান প্রতিভা দেখিতে পাই, তাহা নিতান্তই বিস্ময়জনক ও আশাপ্রদ। ইয়োরোপের বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান ও আবিষ্কার সমূহের সহিত সাধারণের যদি অনবরত পরিচয় ঘটান যায়—তাহা হইলে এই অনুরাগ যে ক্রমশ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিবে তাহাতে সন্দেহ কি। এবং কে বলিতে পারে এই অনুরাগই একদিন সমস্ত প্রতিকূল অবস্থা সত্ত্বেও আপনার পথ বাহির করিয়া লইবে না?

ফেব্রুয়ারি মাসের ডন্ পত্রিকায় ভারতবাসীর নিম্নলিখিত আবিষ্ক্রিয়া গুলি প্রকাশিত হইয়াছে—

বম্বে নগরের অধ্যাপক এস্, এ, ভিসে মুদ্রাযন্ত্রের অক্ষর নির্ম্মাণের একটি কল আবিষ্কার করিয়াছেন। আজ পর্য্যন্ত যত কল বাহির হইয়াছে তাহাতে মিনিটে এক সহস্রের অধিক অক্ষর নির্ম্মাণ করা যায় না। অধ্যাপক ভিসের কলের সাহায্যে মিনিটে ২৪০০ অক্ষর নির্ম্মিত হইতে পারিবে।

লুধিয়ানার মিষ্টার আকবার আলি নামে একব্যক্তি একটি অতি সহজ ও সুন্দর তাঁত আবিষ্কার করিয়াছেন। তাঁতটি সামান্য চেষ্টায় আপনি চলে। একটি বালকও সারাদিন ধরিয়া তাঁতটি চালাইলে ক্লান্তি বোধ করে না।

অমৃতসহরের শিবনাথ নামে একজন পাঞ্জাবী আসল ও নকল সোনা নিরূপক একটি তুলাদণ্ড আবিষ্কার করিয়াছেন। জিনিষটি এত সুন্দর হইয়াছে যে শুনিতেছি গোয়ালিয়ারের মহারাজা নয়-সহস্র মুদ্রা দিয়া কলটি কিনিয়া লইয়াছেন।

বসুমতীতে প্রকাশ নলডাঙ্গার রাজা নাকি একটি মোটর গাড়ী নির্ম্মাণ করিয়া যশোহরের শিল্পপ্রদর্শনীতে প্রেরণ করিয়াছেন। ষ্টীমারের যন্ত্রাদি তিনি নিজেই নির্ম্মাণ করিয়া থাকেন।

ভারতে চিত্রবিদ্যা—কোক্কা নামক জাপানী

পত্রে কলিকাতার ভূতপূর্ব্ব জজ উড্রফ্‌ সাহেব ভারতীয় চিত্রকলা সম্বন্ধে একটি সুন্দর প্রবন্ধ বাহির করিয়াছেন। বিদেশীর নিকট আমাদের অজ্ঞাত ও অনাদৃত চিত্র সকল কত গৌরবান্বিত, ভারতীর পাঠক পাঠিকাকে তাহার আভাষ দিবার জন্য আমরা তাঁহার প্রবন্ধের সারাংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

শিল্পকলা মানবচিত্তের ভাবপ্রকাশের একটি ভাষা মাত্র; সুতরাং শিল্প মাত্রই জাতিবিশেষের শিক্ষা ও ভাবের অনুযায়ী হওয়া আবশ্যক। দুর্ভাগ্যবশতঃ ভারতে আধুনিক শিল্পিগণ নিকৃষ্ট পাশ্চাত্য শিল্পের অসম্পূর্ণ অনুকরণ করিয়া আপন জাতীয় শিল্পমাধুর্য্যকে নষ্ট করিতেছেন এবং বিকৃত রুচির ফলে তাঁহারা তাঁহাদের প্রাচীন শিল্পমাহাত্ম্য ও গৌরব পর্য্যন্ত উপলব্ধি করিতে অক্ষম। এই কারণেই শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিত্র সকল ভারতের শিল্পিগণ অপেক্ষা পাশ্চাত্য শিল্পিগণের নিকট অধিকতর আদৃত। ভারতের মৌলিক শিল্পসৌন্দর্য্য সম্বন্ধে দেশবাসীর জাগরণ অনেকটা পাশ্চাত্য শিল্পিগণের উৎসাহ ও আন্দোলনের ফল। এ সম্বন্ধে কলিকাতার শিল্পবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ হাভেল সাহেবের চেষ্টাতেই ভারতে স্বদেশী শিল্পের প্রতি দৃষ্টি ও অনুরাগ জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে।

শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৌলিক চিত্রগুলিই এই নব জাগরণের সর্ব্বপ্রথম ও শ্রেষ্ঠ ফল। ভারতবাসী তাহার আপন শক্তি ও সৌন্দর্য্য বোধের ক্ষমতা উপলব্ধি করিলে পৃথিবীকে কি অমূল্য বস্তু দান করিতে পারে অবনীন্দ্রের চিত্র সৌন্দর্য্য তাহারই প্রমাণ মাত্র। তাঁহার চিত্রের নিপুণত্ব, কবিত্ব এবং মৌলিকত্ব সম্বন্ধে ১৯০২ সালে প্রথম আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। ১৯০৩ সালে দিল্লী প্রদর্শনীতে তিনি যে সকল চিত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহা সকলেরই মনোযোগ ও প্রশংসা আকর্ষণ করিয়াছিল। তাঁহার মেঘদূত, বুদ্ধ ও শ্রীকৃষ্ণের চিত্র সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ কলাবিদ ডাক্তার কুমার স্বামী যথার্থই বলিয়াছেন—

"এই সকল চিত্রের কোমলতা, মাধুর্য্য ও অননুকরণীয় মৌলিকত্ব ভাষায় অবর্ণনীয়। চিত্রগুলি সার্ব্বজনীন ভাষায় ভারত-চিত্তের পরিপূর্ণ প্রকাশ। যাঁহাদের দেখিবার ও শুনিবার শক্তি আছে তাঁহাদের নিকট ইহারা ভারতের আর্য্যগণের আত্মাকে অবাধে ও অসঙ্কোচে প্রকাশ করে। এরূপ চিত্র যে কেবল ভারতের আধুনিক জাতীয়তার ভাবটিকে যথার্থভাবে প্রকাশ করিয়াছে তাহা নহে ইহারা ভারতের পুরাতন ভাবটিকেও পুষ্পের ন্যায় পরিস্ফুট করিয়া তুলিয়াছে; এ পুষ্প যে কেবল অতীত সৌন্দর্য্য ও মাধুরী ঘোষণা করিতেছে তাহা নহে ইহা ভবিষ্যতে ফললাভেরও যথেষ্ট আশা দান করিতেছে। যদি সাধনায় সকল বিভাগেই ভারতবর্ষ এরূপে পরিবর্ত্তিত ও পুনর্জীবিত হইতে পারিত তাহা হইলে ভারতের গৌরব অচিরেই জগতের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিত।"

চয়ন।

ভারতবর্ষ ও ফিলিপাইন—প্রায় দেড়শত বৎসর হইল ভারতবর্ষ ইংরাজের অধীন হইয়াছে। এ দেশে ইংরাজ আসিবার পূর্ব্বেও যে ভারতবাসী শিক্ষিত, সভ্য ও স্বায়ত্তশাসনে সুনিপুণ ছিল, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কিন্তু সেই ভারতবাসী দেড়শত বৎসর ধরিয়া পাশ্চাত্য শিক্ষা, সভ্যতা ও সুশাসন লাভ করিয়া আজিও স্বায়ত্তশাসন লাভের অনুপযুক্ত ইহাই সাধারণ ইংরাজের ধারণা। জলে না পড়িয়া সন্তরণপটু হইতে উপদেশ দেওয়া যেরূপ যুক্তিযুক্ত, ইংরাজের ভারতবাসীকে স্বদেশ শাসনের সকল ক্ষমতা হইতে বঞ্চিত করিয়া স্বায়ত্তশাসনের যোগ্যতা লাভ করিতে উপদেশ দেওয়াও সেইরূপ। এতদিনে লর্ড মিণ্টো ও লর্ড মর্লির প্রসাদে ভারতবাসী শাসনক্ষেত্রে যৎকিঞ্চিৎ অধিকার লাভ করিয়াছেন কিন্তু আজ কয় বৎসর মাত্র ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ আমেরিকার অধীন হইয়াছে,—ফিলিপাইনবাসীরা

ভারতবাসীর ন্যায় উচ্চ শিক্ষিত বা সভ্যজাতি নহে; তথাপি উক্ত দ্বীপ অধিকার করার অব্যবহিত পরেই আমেরিকা ফিলিপাইনবাসীকে স্বেচ্ছায় স্বায়ত্তশাসন দান করিয়াছেন। উচ্চ ও নিম্ন দুই প্রতিনিধি সভা দ্বারা দ্বীপপুঞ্জ শাসিত হয়। নিম্ন প্রতিনিধিসভা ফিলিপাইনবাসীদিগের দ্বারা নির্ব্বাচিত ৮০ জন সভ্যের দ্বারা গঠিত। প্রধান বিচারপতি একজন ফিলিপাইন বাসী এবং প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাদিগের মধ্যে অধিকাংশই ফিলিপাইনবাসী। আমেরিকার এই উদারনীতি অবলম্বনে ভবিষ্যত সুফল সম্বন্ধে অনেকেই ভীত ও সন্দিগ্ধ হইয়াছিলেন। আজ যাহারা অস্ত্র ধরিয়া যুদ্ধ করিতেছে, কাল তাহারা স্বায়ত্তশাসন পাইলে কি অনিষ্টই না ঘটাইবে, এইরূপ আশঙ্কাই অনেকের মনে প্রবল হইয়াছিল। কিন্তু ফলে দেখা গেল তাঁহাদের সে আশঙ্কা নিতান্তই অমূলক। স্বায়ত্তশাসন পাইবামাত্র বিদ্রোহীরা অস্ত্রত্যাগ করিল, দেশে শান্তি স্থাপিত হইল ও সুশৃঙ্খলায় শাসনকার্য্য পরিচালিত হইতে লাগিল। এবং ক্ষমতা লাভ করিয়া আমেরিকার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা বা অস্ত্রগ্রহণের ব্যবস্থা করা দূরে থাকু দ্বীপবাসীগণ আমেরিকার নিকট তাহাদের বশ্যতা ও কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়া ঘোষণাপত্র প্রচার করিল।

প্রেমের দ্বারা, দানের দ্বারা, মহত্ত্বের দ্বারা জয়ই প্রকৃত জয়। অস্ত্রের দ্বারা নষ্ট করা সহজ, ভয়ে বশীভূত করিয়া রাখাও সম্ভব, কিন্তু তাহাদ্বারা স্বেচ্ছাকৃত আত্মদান লাভ করা অসম্ভব।

সিংহলে আলস্যলোপ—এসিয়াটিক কোয়াটার্লি' নামক সংবাদপত্রে সিংহলবাসীগণকে বলপূর্ব্বক শ্রমজীবী হওয়ায় বাধ্য করার ব্যবস্থা সম্বন্ধে কিছুদিন হইল একটি প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল।

সিংহল দ্বীপের গবর্ণর সাহেব তথাকার চা-কর দিগের সহায়তা করিবার জন্য দ্বীপবাসিগণকে বলপূর্ব্বক তাঁহাদের বাগানে ক্ষেত্রে শ্রমজীবির কর্ম্ম করাইবার ইচ্ছাটা প্রকাশ্যেই প্রচার করিয়া থাকেন। এই উপায়ে দ্বীপবাসিগণের অবস্থার উন্নতি করিবার ও

হইতে উদ্ধার করিবার অভিপ্রায় তিনি দুইবার প্রকাশ্য ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। উপস্থিত সময়ে দ্বীপবাসীগণ চা-করগণের উদ্যানে বাধ্য হইয়া শ্রম করার মাহাত্ম্য এত অল্প বুঝে যে প্রায়ই তাহারা তাহাদের অন্নদাতার সদয় আশ্রয় ত্যাগ করিয়া পলায়ন করে। তাহাদের এই দুর্ব্বুদ্ধি দূর করিবার জন্য গবর্ণর সাহেবের ইচ্ছা যে যাহাতে পলাতক ব্যক্তিকে শীঘ্রই বাহির করা যায় এরূপ একটা ব্যবস্থা করা হয়। তাঁহার মতে চা বাগানে নিযুক্ত সকল শ্রমজীবিরই একটি করিয়া বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের ছাপ লওয়া আবশ্যক। বোধহয় এ অভিজ্ঞতাটুকু তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় অবস্থানকালে পাইয়া থাকিবেন। তাঁহার এই সহৃদয়তায় উৎসাহিত হইয়া একজন প্রধান চা-কর নাকি শ্রমজীবি সরবরাহ করিবার একটা আড়ত খুলিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন; প্রত্যেক গ্রামের মোড়লের উপর আজ্ঞা বাহির হইয়াছে যে তাহার এলাকার মধ্যে কত পুরুষ, স্ত্রীলোক ও বালক কর্ম্মহীন জীবন যাপন করে তাহার এক তালিকা প্রস্তুত করিয়া যেন সে আড়তে প্রেরণ করে। তাঁহাদিগকে মাসিক কড়ারে কর্ম্মে নিযুক্ত করা হইবে, এবং বাৎসরিক "কুটির টেক্স" দিয়া তাহাদিগকে সাহেব গণের কর্ম্মে নিযুক্ত হইতে উৎসাহিত করা হইবে; দ্বীপবাসিগণ এরূপ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করিতেছেন।

আর্থিক অধীনতা ও জাতীয় স্বাধীনতা—আমেরিকার এরিনাপত্রে জাতীয় স্বাধীনতার ভিত্তি সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে! এ সম্বন্ধে স্বাধীন জাতির মতটা আমাদের চিন্তার অনেক সহায়তা করিবে বলিয়া আমরা নিম্নে তাহার মর্ম্ম দিলাম।

দেশের জনসাধারণের অধীনতাই যথেচ্ছাচার-শাসনের ভিত্তি। যতদিন দেশের জনসাধারণ অর্থাগমের জন্য অপরের নিকট অধীন' ততদিন সে জাতির স্বাধীনতা লাভের আশা দুরাশা বা দুঃস্বপ্নমাত্র। যে ব্যক্তি তাহার গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য অপরের ইচ্ছার অধীন, সে ব্যক্তি কোন মতেই স্বাধীন নহে ও হওয়া সম্ভব নহে। তুমি তাহাকে বিদ্যা শিক্ষা' রাজনৈতিক

অধীন, শক্তিহীন ও শ্রমদাস ভিন্ন আর কিছুই নহে। দাসত্ব করিয়া এক টাকা পাইল কি লক্ষ্য টাকা পাইল, তাহাতে কোনও প্রভেদই নাই। বা তাহার জীবিকা-নির্ব্বাহের জন্য সে একজনের দাসত্ব করিল কি দশ-জনের দাসত্ব করিল, তাহাতেও বিশেষ আসিয়া যায় না। তাহার দাসত্বটা অল্পবিস্তর আত্মসম্মানের আবরণে আবৃত মাত্র। জাতীয় স্বাধীনতার যথার্থ ও প্রকৃত ভিত্তি আর্থিক স্বাধীনতা। মনুষ্যপদবাচ্য সকল জাতিরই মুখ্য উদ্দেশ্য স্বাধীনতা লাভ। সেই জন্যই গবর্ণমেণ্টের প্রতিষ্ঠা। স্বাধীন জাতির স্বাধীনতা রক্ষা বা চেষ্টাবান্ জাতিকে স্বাধীনতা লাভে সহায়তা করিবার জন্যই গবর্মেণ্টের আবশ্যক।

ভারতে স্বদেশী শিল্পের উন্নতি—ম্যাঞ্চেষ্টারের বণিক সমিতির বাৎসরিক অধিবেশনে সভাপতি অ্যাশওয়ার্থ সাহেব বলিয়াছেন—১৯০৭ সালের তুলনায় "১৯০৮ সালের ছয় মাসের মধ্যে ভারতে তিন ক্রোড় নব্বই লক্ষ টাকার কম বিলাতি বস্ত্র রপ্তানি হইয়াছে। কিন্তু ঐ সালের শেষ ছয় মাসে আরও সর্ব্বনাশ হইয়াছে। এই কয়মাসে ম্যাঞ্চেষ্টার প্রায় ১৯ ক্রোড় দশ লক্ষ টাকার ক্ষতি স্বীকার করিয়াছে। এ বৎসরের অবস্থা আরও শোচনীয়।

নূতন গ্রহের আবিষ্কার—এতদিন জ্যোতির্ব্বিৎগণের ধারণা ছিল শনিগ্রহের পর আমাদের সূর্য্যমণ্ডলে আর কোন বৃহৎ গ্রহ নাই। কিন্তু এক্ষণে অধ্যাপক পিকারিং আবিষ্কার করিয়াছেন যে শনির পরে আরও একটি বৃহৎ গ্রহ আছে। অধ্যাপক ফর্ব্‌স্ (Forbes) বহুদিন হইতেই এ বিষয়ে এইরূপ অনুমান করিতেছিলেন।

সূর্য্যের প্রকৃতি—সম্প্রতি বিলাতের রয়েল ফটোগ্রাফিক্ সোসাইটিতে কোনল্ সাহেব বলিয়াছেন যে; সূর্য্যের যে দাগটি সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র, সেটিও পরিধিতে পৃথিবী অপেক্ষা দুই তিন শত গুণ বৃহত্তর। সূর্য্যের মধ্যে যে সকল উচ্চস্থান আছে, সে সকল পঞ্চাশ হইতে ষাট হাজার মাইল উচ্চ। এই সকল উচ্চস্থান অতি অল্প সময়ের মধ্যেই বাড়িয়া উঠিতে দেখা যায়। একটি উচ্চস্থান প্রত্যেক সেকেণ্ডে তিন শত মাইল

অম্লজানের উপকারিতা—অম্লজান বাষ্প যে মানুষকে কত শক্তি প্রদান করে তাহার পরীক্ষা করিয়া বিলাতের একজন ডাক্তার তাঁহার অভিজ্ঞতার বিষয় প্রকাশ করিয়াছেন। কোনও ব্যায়ামের পূর্ব্বে কিছুক্ষণ অম্লজানের নিঃশ্বাস লইলে মানুষ আর সহজে ক্লান্ত হইয়া হাঁপাইয়া পড়ে না। অধিকন্তু বক্ষে অসাধারণ বল লাভ করে।

চাউল ও দৈহিক বল—বিলাতের এক সংবাদপত্রে একজন লিখিয়াছেন যে চাউলের ন্যায় উপকারক ও সুবিধাজনক খাদ্য আর নাই। অন্যান্য খাদ্যমাত্রেই জীর্ণ হইতে আড়াই ঘণ্টা হইতে সাড়ে চার ঘণ্টা সময় লাগে। কিন্তু চাউল এক ঘণ্টার মধ্যেই জীর্ণ হইয়া যায়। বাজারে যে মাজা চিক্কণ চাউল বিক্রয় হয়, তাহাতে চাউলের পুষ্টিকর ভাগ অত্যন্ত কমিয়া যায়। চাউল কলে মাজিয়া চিক্কণ করিতে প্রায় শতাংশের নব্বই ভাগ সারাংশ নষ্ট হইয়া যায়। তিনি বলেন জাপানীরা যে এত বলিষ্ঠ ও কষ্টসহিষ্ণু তাহার এক প্রধান কারণ এই যে, তাহারা মাজা চাল খায় না।

ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে ভেতো বাঙ্গালীর অপরাধটা ঠিক ভাতের নহে।

দুগ্ধ ও মেদ—আমরা চিরদিন দুগ্ধ স্থূলতাবৃদ্ধি-কারক বলিয়াই জানি। কিন্তু সম্প্রতি ডাক্তার এফ্, মরিজ্‌ক্ বলিয়াছেন যে, দুগ্ধ অতিরিক্ত মেদ নষ্ট করিবার প্রধান ঔষধ। দুগ্ধের ব্যবহারে রোগী ক্ষুধা ও তৃষ্ণা হইতে কষ্ট পায় না এবং অনাহারে রাখিবার বিপদের সম্ভাবনাও ইহাতে নাই। ডাক্তারের এক রোগীর মেদ এতাদৃশ বর্দ্ধিত হইয়াছিল যে ওজনে সে প্রায় সাড়ে তিন মন দাঁড়াইয়াছিল। তাঁহার দেহের স্বাভাবিক ওজন প্রায় দুই মন হওয়া উচিত ছিল। ডাক্তার রোগীর পথ্যস্বরূপ প্রত্যহ প্রায় দুই সের করিয়া দুগ্ধের ব্যবস্থা করিলেন। ৮১ দিন এই পথ্যে থাকিবার পর তাহার প্রায় ২০ সের ওজন কমিয়া গেল। ডাক্তার হিসাব করিয়া দেখিলেন এই কয়দিনে তাহার প্রায় ৬৭০৬ গ্র্যাম (gram) মেদ কমিয়া গিয়াছিল।

শিক্ষিতা জাপানী নারী ইংলণ্ডের ও জাপানের রমণীগণের প্রেম সম্বন্ধে তুলনা করিয়া বলিয়াছেন—

এখানকার মত জাপানে যুবতীগণের আপনার প্রেমের কথা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করিয়া বলিবার অধিকার নাই। এইজন্য তাহারা তাহাদের অন্তরের প্রেম গোপন রাখিয়া কষ্টভোগ করে। সাধারণতঃ জাপানী রমণী প্রেম প্রকাশ করা অপেক্ষা মৃত্যুকে বরণ করা সহজ মনে করে। এ ভাবটা এখানে খুব আশ্চর্য্য বলিয়া বোধ হইতে পারে, কিন্তু সেখানে পুরুষ ও স্ত্রীলোকের মধ্যে এরূপ স্বাধীনভাবে মেশামেশি নাই বলিয়াই রমণীগণের প্রকৃতি ঐরূপ হইয়া দাঁড়ায়।

জাপানে রমণীগণ পুরুষের সম্মুখে উপবেশন করিবার অধিকারটুকু হইতেও বঞ্চিত। বালক বালিকা সাত বৎসর বয়স অতিক্রম করিলেই, এই নিয়মে চলিতে বাধ্য।

জাপানে রমণীগণের প্রেম উন্নত, গভীর ও পবিত্র। জাপানে দুইজনে পরস্পরকে একবার ভাল বাসিলে কোটী মুদ্রাতেও আর তাহাদের মনকে পরিবর্ত্তিত করা সম্ভব নহে। তাহাদের মস্তকের উপর ঘাতকের অসি লম্বমান থাকিলেও তাহারা প্রেমপ্রতিজ্ঞা বিস্মৃত হয় না।

জাপানে রমণীগণের প্রেম যথার্থভাবে আন্তরিক। তাহারা অর্থ বা পদের মোহে প্রেমার্থিনী হয় না।

জাপানে রমণীগণ সাধারণ সময়ে যদিও অত্যন্ত শান্ত ও কোমল কিন্তু যুদ্ধের সময়ে তাহারা তাহাদের রাজাদেশ বা স্বামীর জন্য প্রাণদান করিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত। সাধারণতঃ জাপানী স্ত্রীলোকগণ যেরূপ পরিশ্রম করে সেরূপ পরিশ্রমে পুরুষগণও ক্লান্ত হইয়া পড়ে।

সমালোচনা।

ইংরাজ-বর্জ্জিত ভারতবর্ষ।—পিয়ের লোটির ফরাসী হইতে **শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর** কর্ত্তৃক ভাষান্তরিত। প্রকাশক, **শ্রীচারুচন্দ্র** বন্দ্যোপাধ্যায়, ইণ্ডিয়ান পাব্লিশিং হাউস, কলিকাতা। কান্তিক প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য ১॥০ টাকা।

পাশ্চাত্য ভূখণ্ডের একশ্রেণীর ভ্রমণবৃত্তান্ত লেখক আছেন, যাঁহারা বিজ্ঞতার একটা কঠিন বর্ম্মে আপনাদিগকে আবৃত করিয়া, চক্ষে কালো চশমা, হাতে নোটবুক ও হৃদয়ে বিরাট অবজ্ঞা লইয়া দেশভ্রমণে বহির্গত হন এবং যাহা দেখেন তাহাতেই একটা বর্ব্বরতার কৃষ্ণ চিহ্ন দেখিতে পান। দেশ দেখিতে হইলে যে সার্ব্বজনীন উদারতা, সহানুভূতি ও সূক্ষ্মদৃষ্টির প্রয়োজন সেগুলির একান্ত অভাবে তাঁহাদের গ্রন্থাবলী বিশ্বের সাহিত্যভাণ্ডারের কোণৈকদেশও পূর্ণ করে না, কেবল আবর্জ্জনা বৃদ্ধি করে মাত্র। পিয়ের লোটি এ শ্রেণীর অন্তর্গত নহেন! তিনি এই প্রাচীন দেশ ও তাহার অধিবাসীগণের প্রতি অনেকখানি শ্রদ্ধা, সহানুভূতি ও সহৃদয়তা লইয়াই ভ্রমণে আসিয়াছিলেন, এবং তাহার ফলে যে গ্রন্থ তিনি রচনা করিয়াছেন তাহা লোকসাহিত্যে চিরদিন একটি বিশিষ্ট আসন অধিকার করিয়া থাকিবে। তাঁহার গ্রন্থ সাড়ম্বর আত্মকথায় পূর্ণ নহে; তিনি যাহা দেখিয়াছেন, সাতিশয় দক্ষতার সহিত তাহারি নিখুঁৎ ছায়াচিত্র পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন! লেখকের যেমনি সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি, তেমনি সরল সহানুভূতি! কেমন করিয়া দেশ দেখিতে হয়, গ্রন্থখানি পাঠ করিলে তাহার একটা ধারণা হয়! লেখকের ঐন্দ্রজালিক তুলিকাস্পর্শে অনেক গুপ্ত সৌন্দর্য্য প্রকাশ পাইয়াছে, এইজন্যই গ্রন্থখানি উপন্যাস অপেক্ষাও উপভোগ্য! জ্যোতিরিন্দ্রবাবু অনুবাদে সিদ্ধহস্ত, একথা নূতন করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই, সংস্কৃত সাহিত্যে যতগুলি উল্লেখযোগ্য কাব্য নাটক আছে তাহার সবগুলিই আজ জ্যোতিবাবুর অনুগ্রহে বঙ্গভাষায় অনুবাদিত হইয়া বঙ্গসাহিত্যের গৌরববর্দ্ধণ করিতেছে। অনুবাদে এমন অক্লান্ত অধ্যবসায় ও একাগ্রতা জগতের ইতিহাসে বিরল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। প্রতিবৎসর সুপাঠ্য অনুবাদ গ্রন্থে তিনি বঙ্গসাহিত্যের যে শ্রীবৃদ্ধি

করিতেছেন তাহাতে তিনি সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিমাত্রেরই বিশেষ কৃতজ্ঞতা ভাজন। বারান্তরে তাঁহার অনুবাদ সম্বন্ধে সবিস্তার আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

তাঁহার বর্ত্তমান সুনিপুণ অনুবাদে পিয়েরলোটির মৌলিক সৌন্দর্য্য সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ আছে, একথা আমরা অসঙ্কোচে বলিতে পারি। এই অনুবাদের ভাষায় এমন একটি মধুরতা আছে, একটা আকর্ষণী প্রভাব আছে, যে তাহা চুম্বকের ন্যায় নিমেষেই পাঠকের চিত্তকে আকৃষ্ট করে! জ্যোতিবাবু বর্ত্তমান অনুবাদে বাঙলার সাহিত্য ভাণ্ডারে যে শুধু রত্ন সংগ্রহ করিয়া দিলেন তাহা নহে, বাঙলার ভ্রমণবৃত্তান্ত-লেখকগণের সম্মুখে একটি আদর্শও উপস্থিত করিলেন। লেখকের সূক্ষ্মদৃষ্টি ও অনুবাদকের নিপুণ অনুবাদের দৃষ্টান্তস্বরূপ গ্রন্থের একটি স্থল উদ্ধৃত করিবার প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারিলাম না। লেখক দুর্ভিক্ষের চিত্র আঁকিয়াছেন,—

"গ্রামের প্রবেশপথে রাস্তার চৌমাথায় কতকগুলি শিশু—কতকগুলি ক্ষুদ্র নরকঙ্কাল বলিলেও হয়—দুই হাতে আপনাদের উদর ধরিয়া একটা-কি গান গাহিতেছে, অথবা চীৎকার করিয়া কি বলিতেছে। উহাদের উদর ভিতরদিকে ভয়ানক ঢুকিয়া গিয়াছে; চামড়ার থালি বোতলের মত কুঁচকিয়া চুপসিয়া গিয়াছে; বড় বড় চক্ষু;—কেন এত দুঃখ যন্ত্রণা সহিতে হইতেছে ভাবিয়াই যেন বিস্ময়-বিস্ফারিত।" কি মর্ম্মস্পর্শী জীবন্ত চিত্র! পরিশেষে বক্তব্য, গ্রন্থের বহিরবয়বও সুন্দর হইয়াছে।

সিদ্ধিতত্ত্ব বা কর্ম্মপথ।—শ্রীকুমুদিনীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত। কলিকাতা, ৬৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট হইতে ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্‌স্ প্রকাশিত। কমলা প্রিণ্টিং ওয়ার্কসে মুদ্রিত। মূল্য এক টাকা।

গ্রন্থখানি শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী মহোদয়ের গৌরবান্বিত নামে 'উৎসর্গীকৃত'। গ্রন্থের নাম শুনিয়া যদি কেহ ভাবিয়া থাকেন, ইহা একটা রীতিমত গবেষণাত্মক দার্শনিক গ্রন্থ, তবে তাহা ভুল। গবেষণার সহিত ইহার কোন সম্পর্ক নাই। "প্রকৃত মানবত্বকামীর জীবন কোন্ পথ অবলম্বন করিবে, জীবন-সংগ্রামের ভীম ঝঞ্ঝায়—দৈন্যে, নৈরাশ্যে কোন্ আলোকের দিকে চাহিয়া মানব বল পাইবে—তাহার চিত্র দেখাইতে" লেখক "যথাশক্তি প্রয়াস পাইয়াছেন।" ইংরাজী সাহিত্যে স্মাইল্‌সের Self-Help বা ব্ল্যাকির Self-Culture গ্রন্থের অনুকরণে বর্ত্তমান গ্রন্থ লিখিত। ক্ষুদ্র গ্রন্থে লেখক অনেক সত্যের অবতারণা করিয়াছেন, তবে বিশেষ যুক্তিতর্কের সাহায্যে সেগুলি পল্লবিত করেন নাই। ভাসা-ভাসা ভাবে তিনি কতকগুলি জীবন সমস্যার রহস্যউদ্ঘাটনে প্রয়াস পাইয়াছেন তাহার ফলে গ্রন্থখানি সুখপাঠ্য হইয়াছে কিন্তু উদ্দেশ্যের সফলতার পক্ষে তাহা পর্য্যাপ্ত নহে। লেখকের মতের সহিত সর্ব্বত্র আমাদিগের মতের মিল নাই। 'বলজাক' 'ইউজিনির' আদর্শ দেশকালপাত্রভেদে আমাদের দেশের ঠিক উপযোগী নহে। লেখক যদি একটু কষ্টস্বীকার করিয়া আমাদের দেশের বর্ত্তমান মহৎ চরিত্রের আদর্শও পাঠকের সম্মুখে উপস্থিত করিতেন তাহা হইলে তাহার অবতারণা অধিকতর সার্থক হইত। গ্রন্থের আর একটি ত্রুটি, মধ্যে মধ্যে ভাষার গ্রাম্যতা দোষ। এ সকল ত্রুটিসত্ত্বেও লেখকের উদ্যম ও প্রয়াস প্রশংসনীয়। এবং গ্রন্থের উপকারিতা সম্বন্ধেও আমাদের সন্দেহ নাই। ঠিক এ শ্রেণীর শিশুপাঠ্য গ্রন্থ যত অধিক রচিত হয়, ততই মঙ্গল!

লেখা।—শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী প্রণীত। উইলকিন্‌স্ প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য এক টাকা। এখানি কবিতাগ্রন্থ এবং 'কবিগুরু শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ে'র নামে উৎসর্গীকৃত। 'ভারতী'র পাঠকবর্গের নিকট যতীন্দ্রবাবুর পরিচয় নূতন নহে। তাঁহার রচিত 'লেখা'র অন্তর্ভুক্ত অধিকাংশ কবিতাই ইতিপূর্ব্বে 'ভারতী'তে প্রকাশিত হইয়াছিল। এই কবিতার দুর্ভিক্ষের দিনে যতীন্দ্রবাবুর 'লেখা' পাঠ করিলে আনন্দলাভ হয়, ইহা অল্প সৌভাগ্যের কথা নহে! ভাবের স্নিগ্ধতা, ছন্দের সহজপ্রবাহ এবং শব্দের মাধুর্য্যে 'লেখা'র কবিতাগুলি শিশিরস্নাত পুষ্পের ন্যায় ঝলমল করিতেছে। গ্রন্থের পরিপাটি ছাপা, ও গরদের বাঁধাই সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ

করে। আমরা যতীন্দ্রবাবুর সাধনার সাফল্য কামনা করি।

রাখী-কঙ্কণ।—(স্বদেশী উপন্যাস) প্রথম খণ্ড। শ্রীগঙ্গাচরণ নাগ প্রণীত। বরিশাল হইতে গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত। উইলকিন্স মিসন প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য দশ আনা মাত্র। দুঃখের সহিত স্বীকার করিতে হইতেছে, যে গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া আমরা সুখী হইতে পারিলাম না। স্বদেশী প্রচার কল্পে এই উপন্যাসের সৃষ্টি; কিন্তু লিপিকৌশলের অভাবে গ্রন্থখানি সুপাঠ্য হয় নাই—অথচ আখ্যানভাগটুকু মন্দ ছিল না।

শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা

হাফেজ।

ওগো মনোহর চন্দ্রের চন্দ্রিমা,
চির প্রভাস্বর ও মুখ মহিমা,
শোভন সুবর্ত্ত চিবুকে তোমার
লালিত্যে করিল লাবণ্য সঞ্চার!

দরশনে তব করিবে প্রয়াণ,
প্রভু ওষ্ঠাগত হল তাই প্রাণ,
চলিবে কি গৃহ করিবে প্রতীক্ষা
কেবল তোমারি আদেশ অপেক্ষা।

তুমি যদি আস, এসো সন্তর্পণে,—
শোণিত কর্দ্দম না ছোঁয় বসনে,
কেননা এ পথে হ'ল বলিদান,
তোমারি উদ্দেশে বহু শত প্রাণ!

জ্বলে গেল প্রাণ দেখি দিনে দিনে
সে প্রেমময়ের কৃপাবারি বিনে;
দোহাই কে আছ মরমী এমন
প্রাণেশে এ দশা কর নিবেদন!

কটাক্ষে তোমারি সদা সচঞ্চল
হেরি যে নিখিল বিশ্ব শতদল!
বিকায়ে সরম তবে হত মন
প্রেমহাটে তব ল'ক দাসীপণ।

সুপ্তি নিষণ্ণ অদৃষ্ট আমার,
প্রসন্ন নয়নে চাহিবে আবার,
—আঁখিপাতে তার যবে সুধা বিন্দু
সিঞ্চিল তোমার প্রেমমুখ ইন্দু।

মধুমারুতে পাঠাও তোমার
কপোলাহৃত রক্ত পুষ্পভার,
তোমারি নিকুঞ্জ ফুল রেণু মাঝে
যদিবা তোমার পরিমল রাজে!

অমরাবতীর অমৃত ভাণ্ডারী
অমর রহিও কামনা আমারি,
অমৃত উৎসবে যদিও তোমার
শূন্য থাকিল মোর পানাধার।

পবন আজিকে করহ বহন,
সুরলোকে মোর এই নিবেদন,—
সতেরি চরণে অধম অসৎ
দি'ক নিজ তুণ্ড কন্দুকবৎ।

শুধু এই দেহ পড়ে আছে দূরে,
মন নিত্য তব কাছে কাছে ঘুরে;
জগত নিধান! সেবক সন্তান
সদা করি মোরা তব গুণগান।

ওহে মহাভাগ! ওগো রাজ রাজ!
মহান আশ্বাস দেহ মোরে আজ;—
আকাশের মত রহিব নিয়ত
তব গৃহাঙ্গণ ধূলিতে বিতত।

হাফেজের শুন প্রার্থনা বচন,
এবমস্তু কহ স্বস্তি বচন,
—মধুত্রয় হোক্ জীবনে আমার
মধুর অধর অমৃত তোমার!

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্বরলিপি।

বাউলের সুর—একতালা।

আমি কি যেমন তেমন ঘটকী, ও গিন্নি।
আমার পায়ে পড়ে আট পহরে,
ভারে ভারে সিন্নি!
রং বেরঙের, সুগুণ সুরূপ,
এক একটি বর আস্ত তুরূপ,—
আমার হাত ধরা,—
আর কনে সবি, হরেক বিবি—
এমন কেউ কখনো পাননি!
চাও যদি গো গুণের মেয়ে—
তার - না ফুরবে অন্ন দিয়ে,—
আনব—স্বয়ং দ্রৌপদী;—
কিম্বা পটল পারা চক্ষু চেরা—
চাও কি রূপের বহ্নি?
নয় যদি চাও টাকার থলে,
তাহাও বল খুলে খেলে
ওগো—বিলাত যাবে—তোমার ছেলে,—
সবাই কবে ধন্যি।
বেশী কথা কি কব আর,
ভবে করি যাত্রী পার—
আমি কাণ্ডারী,
ছেলে মেয়ে, মা বাপেরা,
পার হতে চাও যারা যারা
আঁচল ধরে দাঁড়াও তারা,—
আমি—নহিত সামান্যি!

শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী।

গগা গা ॥ গা গা-মা। মা পা-া। -া -া পা। না ধা পা I মপা -া মা। -গা গগা গা।
আমি কি যে ম ন্ তে ম ন ০ ০ ঘ ট কী ও গি ০ ন্নি ০ আমি কি

। গা গা মা। মা পা -া II -া -া -া। -া পর্সা র্সা। র্সা র্সা -া। র্সা র্সা -া I র্সা না র্রা।
যে ম ন তে মন ০ ০ ০ ০ ০ আ মার পা য়ে ০ প ড়ে ০ আ ট্ প্র

। র্সা নর্সা -র্রা। সর্রর্সা -না -া। -া -া -া I {না র্সা -া। র্সা র্সা -না। ধনা -া পা।
হ রে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ভা রে ০ ভা রে ০ সি ০ ন্নি

। (-া না না)I} -া মমা গা ॥ মা -া পধা। ধা ধা না। না র্সা -া। র্রা র্সা -া I
০ ও গো ০ "আমি কি" রং ০ বে র ঙে র্ সু গুণ ০ সু রূপ ০

I না না -র্রা। র্সা র্সা -র্রর্সা। না -র্সা না। ধা পা ধপা I মা গা মগা। রা -পা মা।
এক এক ০ টি বর ০ আ ০ স্ত তু রূ প্ আ মা র্ হা ত্ ধ

। পা -া -া। -া -া না I {না র্সা -া। র্সা র্সা -া। র্সা নর্সা র্রা। (র্সা না না I)}
রা ০ ০ ০ ০ আর ক নে ০ স বি ০ হ রে ক্ বি বি আর

। র্সা না ননা I {না -া র্সা। র্সা র্সা -না। ধনা -া পা। (-া না না)} I -া মমা গা ॥
বি বি এমন কেউ ক খ নো ০ পা ন নি ০ ও গো ০ "আমি কি"

I সা -া গা। গা গা -মা। মা পা -া। ধা পা পা I মা -ধা ধা। পা পা -ধপা।
চা ও য দি গো ০ গু ণে র্ মে য়ে তার না ০ কু র বে ০

। মা -গা পা। মা মা মপা I গা -গা মগা। রা -পা মা। পা -া -া। -া না না I
অ ০ ন্ন দি য়ে আনব স্ব য়ং ০ দ্রৌ ০ প দী ০ ০ ০ কি ম্বা

I{না র্সা -া। র্সা র্সা -া। র্সা -না র্রা। র্সা না -া I} {না র্সা র্সা। র্সা র্সা -না।
প টল ০ পা রা ০ চ ০ ক্ষু চে রা ০ চা ও কি রূ পে র্

। ধনা -া পা। (-া না না) I} -া মমা গা ॥ {সা -া গা। রা গা -া। সা সা রা।
ব ০ ন্তি ০ ও গো ০ "আমি কি" ন য় য দি চা ও টা কা র্

। সা ন্া -া I সা সা -মা। গা রা -া। রা রা -পা। (মা গা -া) I} মা গা পপা I
থ লে ০ তা হা ও ব ল ০ খু লে ০ খে লে ০ খে লে ওগো

I পা পা -া। ধা ধা -া। না র্সা -া। র্রা সা -া I না ধা -া। না না -া। র্সা -া -া।
বি লা ত যা বে ০ তো মা র ছে লে ০ স বা ই ক বে ০ ধ ০ ০

। র্সা না ধা I না -া -া। -া -া র্সা। র্সা -া সর্রা। র্সা -না -া I গা ধা -া।
ন্তি ম রি হায় ০ ০ ০ ০ ০ হায় ০ রে ০ ০ ০ বিলাত ০

। ধা ধা না। না র্সা -া। র্রা র্সা -া I না ধা -া। না না -া। র্সা -া র্সা। -া -া -া I
যা বে ০ তো মা র ছে লে ০ স বাই ০ ক বে ০ ধ ০ ন্তি ০ ০ ০

I র্সা র্সা -া। না না -া। ধা ধা -া। পা পা -া I মা মা -ধা। পা পা ধপা।
বে শি ০ ক থা ০ কি বল্ ০ ব আ র ভ বে ০ ক রি ০

। মা গা পা। মা -া পমা I গা গা- মগা। রা- পা মা। পা -া- া- -া - -া -া I
যা ০ ত্রী পা ০ র আমি ০ কা ০ ণ্ডা রী ০ ০ ০ ০ ০

I সা গা -া। গা গা -মা। মা পা -া। ধা পা -া I I মা -া পা। ধা ধা -র্সা।
ছে লে ০ মে য়ে ০ মা বা ০ পে রা ০ পা র হ তে চা ও

। না ধা -া। পা পা ধা I {র্সা র্সা -া। র্সা র্সা -া। । র্সা -নর্সা -র্রা।
যা রা ০ যা রা ০ আঁ চল ০ ধ রে ০ দাঁ ড়া ও

। (র্সা না -ধনর্সা) I} র্সা না মনা I {না র্সা -া। র্সা র্সা না। । ধনা -া পা।
তা রা ০ তা রা আমি ন হি ০ ত সা ০ মা ০ ন্তি

। (-া না না) I} -া মমা গা ॥
০ আ মি ০ "আমি কি"

শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী।

চিত্র-ব্যাখ্যা।

শুক-শারিকার কলহ।—এই চিত্রখানি শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক বেতাল পঞ্চবিংশতি গ্রন্থের চতুর্থ উপাখ্যান অবলম্বনে লিখিত। সংক্ষেপে গল্পাংশটুকু এইরূপ :—

ভোগবতী নগরীর অধীশ্বর প্রসিদ্ধ অনঙ্গ পালের চূড়ামণি নামে এক ত্রিকালজ্ঞ শুকপক্ষী ছিল; মগধাধিপতি রাজা বীরসেনের কন্যা চন্দ্রাবতীরও মদনমঞ্জরী নামে এক ত্রিকালজ্ঞা শারিকা ছিল। অনঙ্গপালের সহিত চন্দ্রাবতীর বিবাহের পূর্ব্বে উভয়েই স্ব স্ব শুকশারিকার নিকট হইতে জানিতে পারেন যে তাঁহাদের পরস্পরে বিবাহ হইবে। বিবাহ হইলে চন্দ্রাবতী অনঙ্গপালকে একদিন কথাপ্রসঙ্গে বলিলেন—"আমাদের ত বিবাহ হইয়া গেল, পক্ষী দুটা একা থাকে কেন?" তখন শুকের সহিত শারিকার বিবাহ দেওয়া হইল। বিবাহ হইল বটে; কিন্তু উভয়ের মিলন কিছুতেই হইল না। তখন রাজা একদিন শারিকাকে তাহার অপ্রণয়ের জন্য অনুযোগ করিলেন। শারিকা কহিল—"পুরুষের সহিত প্রণয় সঙ্গত নয়, পুরুষ বড় শঠ, কপট ইত্যাদি। শুকও নীরবে সহিবার পাত্র নহে, সেও উত্তর দিল "নারী চপলা কুটিলা, বিশ্বাসঘাতিনী!" শারিকা তখন রাজা ও রাণীর উদ্দেশে পুরুষের শঠতা সম্বন্ধে এক গল্প বলিতে বসিল।

ইহাই চিত্রের বর্ণনীয় বিষয়। চিত্রখানিতে অবনীন্দ্রবাবুর লিপিকুশলতা বিশেষ প্রকাশ পাইয়াছে। রাজা ও রাণীর মুখে-চোখে—বিস্ময় কৌতূহলের ভাবটুকু এবং তাহার সহিত পক্ষী দুটির প্রতি প্রগাঢ় স্নেহ এমন সুন্দর ফুটিয়াছে যে তাহা আর ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইবার বোধ হয় প্রয়োজন হইবে না। চোখদুটি যে পুতুলের 'চিত্রকরা' চোখ নয় তাহা দেখিলেই বুঝা যায় এবং পাখী দুটিও শুধু চিত্রের সৌষ্ঠব বর্দ্ধনার্থ অঙ্কিত শোলার পাখী নহে। তাহাদের যে প্রাণ আছে তাহা চিত্রকর অতি নিপুণভাবেই অঙ্কিত করিয়াছেন।

আর একটি প্রধান বিশেষত্ব, রাজারাণীর পরিচ্ছদে স্বল্পের মধ্যেও ঐশ্বর্য্যের যে আড়ম্বর আছে,—রাণীর ওড়না গালিচা প্রভৃতিতেও—এবং চতুষ্পার্শ্বের যে দৃশ্যটুকু তাহা ভারতবর্ষের সম্পূর্ণ নিজস্ব! তাহার 'মডেল' বিদেশের আমদানী নহে।

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় অঙ্কিত "লক্ষণের শক্তিশেলের" উপাখ্যান বাঙালী পাঠক কাহারো অজ্ঞাত নহে। চারিদিকে গম্ভীরভাব—সমুদ্রের উচ্ছল বারিরাশিও আজ নীরবে বেলাভূমিতে আসিয়া প্রতিহত হইতেছে, কোথায়ও আর জনপ্রাণী নাই—সাড়া শব্দ নাই! এই নির্জ্জন ছায়াচ্ছন্ন সমুদ্র-তীরে লক্ষ্মণের দেহ,—সম্মুখে রামের শোক-কাতর মূর্ত্তি, নয়নে বিষাদ ও হতাশার করুণ ভাব চিত্রকর দক্ষতার সহিত চিত্রিত করিয়াছেন। চারিধারে মৌনভাব রামের অসহায় হৃদয়ের মৌন কাতরতার সহিত কি সুন্দর খাপ খাইয়াছে! রামের বীরভাব এ অবস্থার চিত্রাঙ্কণে সঙ্গত নহে এ কথা কাহাকেও আশা করি বলিয়া দিতে হইবে না।

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

অরবিন্দ ঘোষ।

এতদিন পরে গত ৬ই মে তারিখে আলিপুরে বোমার মকদ্দমা শেষ হইল। ৩৬ জন বিচারাধীনের মধ্যে ১৭ জনকে মুক্তিদান করিয়া বিচারপতি বিচ্‌ক্রফ্‌ট দেশের আবালবৃদ্ধ সকলেরই ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। অনেক বালককেই যে পুলিশ এই মকদ্দমায় বৃথা জড়িত করিয়াছে;—বিশেষতঃ অরবিন্দ যে সম্পূর্ণ নিরপরাধ এই বিশ্বাসে এতদিন দেশের সকলেই ভগবানকে আকুলভাবে ডাকিয়া, এই বিচার নিষ্পত্তির দিকে উদ্‌গ্রীবভাবে চাহিয়া ছিলেন। এই আকুল প্রার্থনা গ্রাহ্য হইল, আজ আমাদের আনন্দের দিন। বিধাতা অরবিন্দকে অগ্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করিয়াছেন। তিনি যাহাকে ভালবাসেন তাহাকে কষ্ট দিয়া নিজের কাছেই টানিয়া লন। অরবিন্দের বিদ্যাবুদ্ধি অপরিসীম; তিনি ইচ্ছা করিলে, সুখে স্বচ্ছন্দে মহাসম্মানে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিতেন। সকলেই জানেন তিনি সিভিল সার্ভিশে পাশ হইয়াছিলেন কেবল অশ্ব-পরিচালনে ফেল হওয়াতে সে কর্ম্ম লাভ করেন নাই। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও গভর্ণমেণ্ট ইহাকে অন্য উচ্চপদ দান করিতে চাহেন। অরবিন্দ তাহা গ্রহণ না করিয়া প্রথমে বরদারাজ-কর্ম্মচারী হইয়া পরে দেশের কাজে পূর্ণভাবে জীবনদান বাসনায় সে কর্ম্মও ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আগমন করেন। এখানে শত কষ্টকে তুচ্ছজ্ঞান করিয়া মাতৃপূজায় আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন। তাঁহার আদর্শ তাঁহার শিক্ষা কেবল বঙ্গদেশের মধ্যে নহে—ভারতবর্ষে নবধর্ম্ম নবযুগ, নবজীবন সঞ্চার করিয়াছে।—তাঁহার জীবন ভারতে অতুলকীর্ত্তি। মাতৃভূমি ইঁহার নিকট জড়পদার্থ নহে, আত্মাবস্তু পদার্থ। তিনি তাঁহার পত্নীকে একখানি পত্রে এসম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহা অতি সুন্দর। স্থানাভাবে আমরা তাহার কিয়দংশ মাত্র উদ্ধৃত করিয়া দেখাইতেছি;— "* * *

অন্য লোকে স্বদেশকে একটা জড় পদার্থ, অতগুলা মাঠ, ক্ষেত্র, পর্ব্বত, নদী বলিয়া জানে, আমি স্বদেশকে মা বলিয়া জানি, ভক্তি করি, পূজা করি। মার বুকের উপর বসিয়া যদি একটা রাক্ষস রক্তপানে উদ্যত হয় তাহা হইলে ছেলে কি করে? নিশ্চিন্ত ভাবে আহার করিতে বসে, স্ত্রী পুত্রের সঙ্গে আমোদ করিতে বসে, না মাকে উদ্ধার করিতে দৌড়িয়া যায়? আমি জানি এই পতিত জাতিকে উদ্ধার করিবার বল আমার আছে, শারীরিক বল নাই, তরবারি বা বন্দুক নিয়া আমি যুদ্ধ করিতে যাইতেছি না, ক্ষত্রতেজ একমাত্র তেজ নহে, ব্রহ্মতেজও আছে, সেই তেজ জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত, এই ভাব নূতন নহে, আজ-কালকার নহে, এই ভাব নিয়া আমি জন্মিয়াছিলাম, এই ভাব আমার মজ্জাগত, ভগবান এই মহাব্রত সাধন করিতে আমাকে পৃথিবীতে পাঠাইয়াছিলেন, চৌদ্দ বৎসর বয়সে বীজটা অঙ্কুরিত হইতে লাগিল আঠার বৎসর বয়সে দৃঢ়-প্রতিষ্ঠ ও অচল হইয়াছিল। * *"

তাঁহার মুক্তির পরদিন কলিকাতার ছাত্রগণ অরবিন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার দেহ মনের অবসন্নতাবশতঃ তিনি ছিতলের বারাণ্ডা হইতে ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া বলিয়াছিলেন যে "তাঁহার বিপদ ও দুর্গতির দিনে তাঁহার স্বদেশবাসীর স্নেহ ও সহানুভূতি হইতে যে তিনি মুহূর্ত্তের জন্যও বঞ্চিত হন নাই, ইহাই তিনি পরম সৌভাগ্য বলিয়া জ্ঞান করেন এবং ইহাতেই তিনি সকল কষ্ট ও লাঞ্ছনার মধ্যে অপূর্ব্ব আনন্দ ও শান্তি অনুভব করিয়াছেন।" আমরাও তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছিলাম। ইঁহার সৌম্য-মূর্ত্তি দর্শনে হৃদয় আনন্দপূর্ণ হয়। এক বৎসর ধরিয়া জেলে কত না কষ্ট ভোগ করিয়াছেন, তজ্জনিত দেহ ক্লান্ত মন অবসন্ন তথাপি মুখে প্রফুল্ল ভাব—অধরে বালকের ন্যায় সরল হাস্য বিরাজিত দেখিলাম।—বিচারে যাঁহারা দণ্ডনীয় হইয়াছেন হাইকোর্টে তাঁহাদের আপিল হইতেছে। আশা করি জষ্টিস মহোদয় এই অর্ব্বাচীন বালকদিগের প্রতি দয়াধর্ম্ম প্রকাশে প্রকৃত ন্যায়নীতিরই প্রতিষ্ঠা করিবেন।

কলিকাতা, ২০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত ও ৪৪, ওল্ড বালিগঞ্জ রোড হইতে শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।



বিরহী যক্ষ

শ্রীযুক্ত যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়ের মূল চিত্র হইতে

শিল্পের ত্রিধারা।

এক নিশ্বাসে সাত কাণ্ড রামায়ণ বলিতে যাওয়াও যা আর ক্ষুদ্র প্রবন্ধে বৌদ্ধ শিল্পসম্বন্ধে বলাও কতকটা সেইরূপ; কেননা সেটার ইতিহাস এত জটিল ও বৃহৎ যে প্রাচ্য জগতের সমস্ত শিল্প ইতিহাস তাহার ভিতরে আসিয়া পড়ে। অতএব এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সেই শিল্পের একটা ছায়াচিত্র মাত্র দিবার চেষ্টা করিব। জগৎ শিল্পে আমাদের ভারত বা বৌদ্ধশিল্পটা কোন স্থান অধিকার করে, আশা করি, সেটা আমাদের হৃদয়ে মুদ্রিত হইবে।

হিন্দুকুশ হইতে সিংহল, উদয়গিরি হইতে গির্ণার পর্ব্বত, এই বিশাল ভারতখণ্ডের সমস্ত হৃদয়ের প্রেমরসে সিঞ্চিত হইয়া বোধি-ধর্ম্মদ্রুম—পূর্ব্বমুখে প্রশান্তমহাসাগরের পরপার, উত্তরমুখে চীন তাতারের শেষসীমা, পশ্চিমে তুরস্ক স্থানের মরুপ্রান্তর, দক্ষিণে ভারতসমুদ্রের দ্বীপপুঞ্জের উপরে ছায়া বিস্তার করিয়া দণ্ডায়মান আছে; আর সেই ধর্ম্মকল্পতরুকে পরিবেষ্টন করিয়া আমাদের শিল্পলতিকা মর্ত্ত্যে পারিজাত সুষমা বিস্তার করিয়া প্রকাশ পাইতেছে! ভারতের জাতীয় জীবনের এই প্রকাণ্ড; প্রশান্ত, প্রফুল্ল ছবি যে পুণ্যচরিত্র সাধু মহাত্মাগণ স্বচক্ষে দর্শন করিয়া গিয়াছেন তাঁহারা ধন্য; আর আজ সহস্র সহস্র বৎসর পরে সেই পবিত্র চিত্র যদি আমাদের মনশ্চক্ষে প্রতিভাত হয় তবে আমরাও ধন্য হইব।

তথাগত ভগবান বুদ্ধের জন্মলাভ, বুদ্ধত্ব তিনিই লাভবান হইয়া গিয়াছেন তাহা নয়, তিনি নিজের লাভ আমাদের মধ্যে বণ্টন করিয়া গিয়াছেন। তিনি যে ধনের যে স্পর্শমণির অধিকার পাইয়াছিলেন, তাহা তিনি একা না রাখিয়া আমাদেরও তাহার ভাগ, তাহার অধিকার দিয়াছেন; সেইজন্য তিনি জগতের নমস্য, আর সেই কারণে সহস্র সহস্র বৎসরের কালান্ধকার ছিন্ন করিয়া সেই নিষ্কলঙ্ক পূর্ণচন্দ্র জগৎ-জনের হৃদয়াকাশ আলোকিত করিয়া চিরদিন অক্ষয় শোভায় বিরাজিত আছেন।

জগতে ধর্ম্মবীরগণ ধর্ম্মচক্র অনেক প্রকারে পরিবর্ত্তিত করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু এমনটি করিয়া কেহ নয়। উচ্চ নীচে, বিশ্বাসী অবিশ্বাসীতে একান্ত সমতা ও প্রীতি তাঁহার প্রধান অস্ত্র। বুদ্ধদেব তাঁহার প্রচারক শিষ্যগণের নাম দিয়াছিলেন ভিক্ষু; ভগবানের চিহ্নিত নয়, জগতের শিক্ষাগুরুও নয়!

তাঁহার শিষ্যগণ যখন দেশে বিদেশে তাঁহারই অমৃত বাণী বহন করিয়াছিলেন তখন সেই স্বর্ণ-কাষায়-বাস মহাত্মাগণের পুণ্যকর্ম্মের ছন্দানুবর্ত্তী হইয়া ধর্ম্মযুদ্ধের বিকট কবন্ধ নৃত্য করিতে করিতে চলে নাই; চলিয়াছিল জ্ঞানের থরকরজাল, শিল্পসৌন্দর্য্যের আনন্দ দুন্দুভি, আর করুণার অপ্রতিহত শক্তি! জ্ঞান ও করুণার মন্ত্রে ক্লেশ ভুজঙ্গকে তাঁহারা আমাদের ইচ্ছাধীন করিয়া দিয়াছেন, আর শিল্পসৌন্দর্য্যের পূর্ব্ববাতায়নপথে তাঁহারা আমাদের গৃহে পারিজাত সুরভি আনিয়া

বিশুদ্ধ বৌদ্ধ শিল্পকে জগতে আর সমস্ত শিল্প হইতে উর্দ্ধে বহন করিয়া লইয়াছে।

সেই সময়ের সামান্যমাত্র শিল্প চর্চ্চা করিলে দেখিতে পাই যে সে যুগের শিল্পীরা শুধু যে নিপুণ কারিগর ছিলেন তাহা নয়, তাঁহারা সাধক ছিলেন, কবিও ছিলেন। সেদিনও নেপালের ধর্ম্মরাজগণ যে হাতে আশীর্ব্বাদ করিয়া গেছেন সেই হাতেই তুলিও ধরিয়া গেছেন। এই সকল সাধক শিল্পীর করস্পর্শে গিরিতুল্য বজ্রকঠিন প্রস্তরখণ্ডসকল দেব দুর্ল্লভ বুদ্ধমূর্ত্তিতে, সুকুমার পদ্মগুচ্ছে প্রফুল্লিত হইয়া উঠিবে তাহা আর আশ্চর্য্য কি?

আমরা আজকাল যে সকল মন্দিরে উপাসনা করি, যে সকল সভাগৃহে সম্মিলিত হই সেইগুলার সঙ্গে গিরিগুহা-খোদিত যে কোন-একটি ক্ষুদ্রায়তন বৌদ্ধবিহারের সহিত তুলনা করিয়া দেখুন। আমাদের বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকাগুলা প্রস্তুত করিতে যে অর্থব্যয় হইয়াছে, গিরিগুহাটি ভিক্ষুগণের বাসোপযোগী করিতে যে তাহার অধিক ব্যয় হইয়াছিল এমন মনে হয়.না। তবে কেন একটা সহস্র বৎসরের পরে ভগ্নদশাতেও সুন্দর, আর কেনইবা অন্যটা সদ্য নূতন অবস্থাতেও তাহার একটুকরা প্রস্তরেরও সমতুল্য নয়? যে শিল্পীগণ গিরিগুহাগুলা কাটিয়া মন্দির বিহার নির্ম্মাণ করিয়াছিল তাহারা আনন্দের খাতার হিসাব চুকাইয়াছিল বলিয়াই বোধ হয়,—ব্যাঙ্কের খাতার নয়।

অনেক ইউরোপীয় পণ্ডিত বৌদ্ধ-শিল্পটাকে ভারতে গ্রীকসভ্যতা ও গ্রীক-প্রভাবের ফল বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে চাহেন, কিন্তু যে সভ্যতা বা যে মনোভাবের উপরে গ্রীক পার্থিনানের ভিত্তি, আর যাহার উপরে অশোক-স্তম্ভের ভিত্তি তাহার পার্থক্য অনুধাবন করিলেই সকল সন্দেহ দূর হয়। আমরা দেখিতে পাই, গ্রীক শিল্প, মানব-সৌন্দর্য্য, মানব ঐশ্বর্য্যের চিহ্নস্বরূপ, তাহার কীর্ত্তিস্তম্ভশিখরে, হয় কোন গ্রীক দেবতা বা গ্রীক বীরের, নয়তো কোন উর্ব্বশী মূর্ত্তি লইয়া দণ্ডায়মান; আর অশোকস্তম্ভগুলা মস্তকে অশোকমূর্ত্তির পরিবর্ত্তে গুরুজনে ভক্তি, সর্ব্বভূতে দয়া ইত্যাদি শাসনবাণী, আনন্দের অক্ষর বা ধর্ম্মচক্র লইয়া শোভা পাইতেছে। এই জন্যই আমি বলিয়াছি বৌদ্ধ শিল্প ধর্ম্মকল্প-তরুকে আশ্রয় করিয়া বাড়িয়া উঠিয়াছে, গ্রীসের ঐহিক সৌন্দর্য্যধ্বজাকে বেষ্টন করিয়া নয়।

কথাটা আর একটু পরিষ্কার করিয়া দেখা কর্ত্তব্য; কেননা এই ব্যবধানটুকু পরিষ্কার করিয়া না বুঝিলে পাশ্চাত্য শিল্পের সঙ্গে প্রাচ্য শিল্পের প্রভেদটা আমরা ধরিতে পারিনা; এবং সেইজন্যই ইউরোপীয় শিল্পের তুলনায় প্রাচ্য শিল্পটা পাশ্চাত্য-রোগগ্রস্ত আমাদের চক্ষে ভ্রমপ্রমাদ পরিপূর্ণ ও অপরিণত বয়স্কের ছেলেখেলা বলিয়া ঠেকে। মানব জীবনে আমরা তিন অবস্থা দেখিতে পাই,—বাল্য, যৌবন ও বয়স্থ। শিল্পেরও তেমনি তিনটা স্তর,—আদিম, মধ্য ও চরম। অবশ্য এখানে মানবজীবন বলিতে আদর্শ মানব বলিয়া বুঝিতে হইবে। শিশুকালে মানব সরল, আনন্দময়; যৌবনে সে ভোগসুখে, ঐশ্বর্য্যে মণ্ডিত; আর বয়স্থকালে জ্ঞানগভীর জীবনের আনন্দ নিবিড়তর হইয়া মানুষ ক্রমে যেন পুনর্বাল্যে উপনীত হয়। সে সময় লোকটির চালচোল, ধরণধারণ মধ্য বয়সের মত নির্দোষ

ঠিক্‌ঠাক্ থাকেনা ; হয়তো বা লোকটা কাশীর তৈলঙ্গ স্বামীর মত অশোভন আদুল গায়ে ধূলাকাদা মাখিয়া প্রচলিত সভ্যতার সমস্ত নিয়মবিরুদ্ধ অবস্থায় ঠিক পাঁচবৎসরের শিশুর খেলা সদানন্দমনে খেলিতেছে দেখি। শিল্পও তেমনি আদিম অবস্থাটায় বাঁধানিয়ম দস্তর বেদস্তর, শোভন কি অশোভন, এসকলের ধার ধারে না,—দুই চারিটি কালির আঁচড় কি, এক পোঁছ রং লইয়াই তাহার আনন্দ এবং বালকচেষ্টিতের মত মনোহর। মধ্য অবস্থায় শিল্প বাঁধানিয়মে টেরী বাগাইয়া, প্রচলিত দস্তরমত সাজগোজে ফিট্‌ফাট হইয়া, সুনিয়মিত ভঙ্গিতে, সুপুরুষ বেশে দেখা দেয়। আর বয়স্থ বা চরম শিল্পটা, ভোলা-মূর্ত্তি নিয়মবন্ধনমুক্ত মহানন্দে মগ্ন দিগম্বর মুক্ত পুরুষ! এই চরম অবস্থায় যখন কোন শিল্প উপনীত হয় তখন তাহার নির্গুণত্বই গুণ হইয়া দাঁড়ায়। তখন যাহারা সে অবস্থার মর্ম্ম বোঝে না, তাহারা উপহাস করিয়া পাগলাটে বলিয়া মুখ ফিরায় ; আর যাহারা বোঝে তাহারা শিল্পের সেই ভোলানাথ মূর্ত্তি দেখিয়া কৃতার্থ হয়।

আমার একথাটা শুনিয়া হঠাৎ এরূপ মনে হইতে পারে, দেশীয় শিল্পটার দোষগুলা সমর্থন করিবার জন্য নির্গুণত্বই-গুণ-গোছের একটা বেশ ন্যায়ের ফাঁকি বাহির করিয়াছি। কিন্তু তাহা নয়। শিশুর বাল্যভাবে যে অক্ষমতার লক্ষণ, মহাজ্ঞানী প্রাতঃস্মরণীয় মহর্ষিগণের বাল-স্বভাবে কি সেই অক্ষমতার লেশমাত্র দেখিতে পাই? তেমনি আফ্রিকার আদিম শিল্পে যে অক্ষমতা ভারতবর্ষের আর্য্যগণের শিল্পে কি সেই অক্ষমতা? আমাদের শিল্পে যে বালকত্ব দেখা যায় তাহা শিল্পীগণের নিপুণতার অভাবে নয়, কলালক্ষ্মীর একান্ত সাধনার ফলেই সেরূপটা ঘটিয়াছে। রুচিভেদে, জাতিভেদে শিল্পের এই ভোলারূপ নয়ন তৃপ্তিকর না হইতে পারে, কিন্তু যে শিল্প যখনই শিল্পের উর্দ্ধতম লোকে উন্নীত হইবে তাহারই এই দশা ঘটিবে। Art seems to reach its highest and to go deepest when all that is small and common is excluded. হাভেল সাহেব বলিতেছেন,—"শিল্প তখনই চরম অবস্থায় উন্নীত হয় এবং তখনই তাহাতে গভীরতা আসে যখন তাহা হইতে যা কিছু সাধারণ প্রচলিত ও সঙ্কীর্ণ তাহা দূর হয়।"

রাস্কিন্ সাহেব বলিয়াছেন,—'Men who have no imagination, but have learned merely to produce a spurious resemblance of its results by the recipes of composition, are apt to value themselves mightily on their concoctive science; but the man whose mind a thousond living imaginations haunt, every hour, is apt to care too little for them; and to long for the perfect truth which he finds is not to be come at so easily.'

"যাহাদের কল্পনাশক্তির অভাব কিন্তু যাহারা কতকগুলা প্রচলিত নিয়মের প্রক্রিয়া দ্বারায় কল্পনাপ্রসূত পদার্থের একটা মেকি বানাইতে শিক্ষা করিয়াছে, তাহারা নিজেদের সেই মেকি প্রস্তুত প্রকরণ ও প্রণালীগুলাকে মূল্যবান জানিয়া গর্ব্ব অনুভব করে; আর যাহাদের মন কল্পনার লীলাভূমি, প্রকরণ-প্রণালীর উপরে তাহাদের আস্থা থাকে না;

তাহাদের মন দুর্লভ সত্যের দিকেই ধাবিত হয় এবং তাহারা জানে প্রকরণপ্রণালীর সহজ উপায়ে সেটাকে ধরিবার উপায় নাই।"

সত্য শিল্পে যে নিয়মের বন্ধন, দস্তুরের সঙ্কীর্ণতা না থাকাই শ্রেয় একথা কি রাস্কিন্, কি হাভেল, কি আর কেহ সকলেই এক-বাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। কেবল আমরাই হায় রে Perspective, হায় রে Anatomy, কোথায় Reality করিয়া মরিতেছি!

বৌদ্ধযুগের পূর্ব্বে ভারতশিল্পটা কোন অবস্থায় ছিল তাহা জানিবার উপায় নাই কেননা তাহার পূর্ব্বেকার কোন মন্দির, মূর্ত্তি কিম্বা চিত্র এপর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে বলিয়া মনে পড়ে না; কিন্তু সে শিল্প যে আদিম, মধ্য, ও বৌদ্ধযুগে চরম অবস্থায় ক্রমোন্নতি লাভ করিয়াছে, এটা অস্বীকার করিবার কোন কারণ দেখি না।

অনেকে মনে করেন যে বৌদ্ধযুগের শিল্প প্রাচীন ভারতশিল্প হইতে একটা পৃথক বস্তু; কিন্তু আমি তাহা বলি না। একই মানুষ যেমন প্রথমে শিশু পরে রাজা শেষে শিশুর ন্যায় সরল, মুক্ত, সদানন্দ, দিগম্বর, ভোলানাথ, ঋষি মূর্ত্তিতে রূপান্তরিত হইতেছে দেখিতেছি, তেমনি একই ভারতশিল্প ক্রমোন্নতির নিয়মে শিল্পের এই চরম অবস্থায় না আসিয়াছে তাহাই বা কে বলিবে? তা ছাড়া কি ইউরোপীয়, কি ভারতবাসী, যিনিই ভারত-শিল্পের সবিশেষ চর্চ্চা করিয়াছেন তিনিই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে হস্তের নিপুণতায় ভারতশিল্পী জগতের কোন শিল্পীরই কাছে হার মানে না! তবেই দেখা যাইতেছে যে আমাদের শিল্পে ফিট্‌ফাট্ গঠনের অভাবের কারণ অনৈপুণ্য নয়, অন্য কিছু। সেই অন্য কিছুটা কি? ইউরোপীয় জাতিতত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন, প্রাচ্যজাতি মাত্রেরই কেমন একটা মানসিক বৈকল্য আছে, যাহাতে করিয়া সৌন্দর্য্যের যে স্তরে একজন গ্রীক্ বা পাশ্চাত্য শিল্পীর মন পৌঁছিতে পারে সে স্তরে প্রাচ্য শিল্পীর মন উন্নীতই হইতে পারে না। এই যুক্তিটার যেমন এ-পিঠ আছে তেমনি ও-পিঠও আছে। পশ্চিমের দিক দিয়া দেখিলে আমরা দেখি, গ্রীক্ শিল্পের কাছে আর্য্যশিল্প ঘেঁষিতে পারিতেছে না; আবার পূবের দিক দিয়া দেখিলে দেখি, গ্রীক্ শিল্প আর্য্যশিল্পের ত্রিসীমানায়ও আসিতে অক্ষম। এখন বিচারের বিষয় দাঁড়াইতেছে, শিল্পের কোন স্তরটা ঊর্দ্ধতন বা লোভনীয়। অবশ্য পশ্চিমের লোকেরা গ্রীক শিল্পটাকে শিল্পের চরম বলিয়া নির্দ্দেশ করেন; কিন্তু আবার ইহাও দেখি, জগতের বারো আনারও অধিক লোক এই প্রাচ্য শিল্পটার দিকে! দলে ভারি যে আমরা তাহার সন্দেহ নাই। এখানে পশ্চিমের লোকেরা বলিবেন,—'একশ্চন্দ্র স্তমোহন্তি, ন চ তারাগণৈরপি', এবং পূর্ব্বের গ্রীক্‌গ্রস্ত লোকেরাও ঐ এক যুক্তিতেই আমাদের মুখ বন্ধ করিতে প্রয়াস পাইবেন। কিন্তু তারাগণ কি এরূপ বলিতে পারে না?—দেখ, চন্দ্রটা তোমাদের নিকট আত্মীয়, তাহার আলোকটাও তোমাদের কাছে অধিক পৌঁছিতেছে; আর আমরা, তুমি যে লোকের জীব সেখান হইতে কোটী কোটী যোজন দূরে, অবস্থিত; আমরা আলোকও দিতেছি লোকান্তরে; কাযেই তোমাদের চক্ষে তারাগণের জ্যোতি ক্ষীণবোধ হওয়া অসম্ভব নয়; কিন্তু

বল দেখি, আজ যদি সমস্ত তারা মুছিয়া গিয়া আকাশ চন্দ্রময় হইয়া যায়, তবে বিশ্বশিল্পীর শিল্পরচনায় সৌন্দর্য্য ও বিচিত্রতার ব্যাঘাত ঘটে না কি? তোমার রুচি অনুসারে তুমি চন্দ্রময় দ্যুলোকের মত শিল্পাকাশটা গ্রীক্‌ মূর্ত্তিময় দেখিলে খুসি হইতে পার, কিন্তু লোকাঃ যে ভিন্ন রুচি শিল্পও যে বিচিত্রতামূলক, তাহার কি করিলে? অতএব ভারতশিল্প গ্রীকশিল্পের সহিত বা প্রাচ্য শিল্পীর মনের গতি পাশ্চাত্য শিল্পীর মনের গতির সহিত তুলনা করিয়া ছোটবড় বিকল অবিকলের হিসাব করিতে যাওয়াও যা, আর রাজদর্শনের পর সন্ন্যাসী মহাপুরুষের দর্শনে তাঁহার গায়ে রাজবেশের পরিবর্ত্তে বাঘছাল, চন্দনের পরিবর্ত্তে শ্মশান-ভস্ম, রত্নমালার স্থানে হাড়-মাল এবং ভোগপুষ্ট নধর গঠন, কেতা-দোরস্ত চালচোল ভাবভঙ্গীর পরিবর্ত্তে কাষ্ঠবৎ দেহ-গঠন, অশোভন ভাবভঙ্গী দেখিয়া মহাপুরুষকে ধিক্কার দিয়া ফিরিয়া যাওয়াও তা। ইহাতে আর কাহারও কিছু ক্ষতি হইল না তুমিই দেবদুর্লভ দর্শনে বঞ্চিত হইলে।

রজোগুণ আর সত্ত্বগুণে যে প্রভেদ পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যশিল্পে ঠিক সেই প্রভেদ। সেইজন্য রজোগুণপ্রধান পাশ্চাত্যশিল্প অবয়বের বাঁধন, কেতাদোরস্ত চালচোলের নিয়ম মানিয়া চলে। আর সত্ত্বগুণপ্রধান ভারত বা বৌদ্ধ শিল্পের ও সকল নিয়ম মানিয়া চলার দিকে দৃক্‌পাতও নাই। লক্ষ্য হিসাবে দেখিতে গেলে বৌদ্ধশিল্প, শিল্পের উচ্চতর লোকে অবস্থিত বলিয়াই বোধ হয়; কেননা কি কাব্যে, কি শিল্পে, কি মানবের চরিত্রে সাত্ত্বিকভাবেরই প্রাধান্য চিরদিন পণ্ডিতগণ স্বীকার করিয়া আসিতেছেন। সৃষ্টিসংস্থাপনের জন্য যেমন সত্ত্ব রজঃ তমঃ তিন গুণই অত্যাবশ্যক, শিল্পের পক্ষেও ঐ গুণত্রয়ের তেমনি প্রয়োজন। কিন্তু জগতে কোন এক শিল্পে এই ত্রিগুণের একত্র সমাবেশ এ পর্য্যন্ত দেখা যায় নাই। হর-গৌরী, হরি-হর এইরূপ দুইগুণে একত্র সমাবেশ শিল্পে ঘটিয়াছে, কিন্তু হরি-হর-ব্রহ্ম শিল্পে এরূপটা আমার চক্ষে এপর্য্যন্ত পড়ে নাই; তবে জগতের সমস্ত বিচ্ছিন্ন শিল্পের একত্র চর্চ্চা করিতে করিতে শিল্পের ঐ বিরাট মূর্ত্তির ছায়া মনে উপলব্ধি করা সম্ভব হইতে পারে।

আমাদের শিল্পকারগণ প্রতিমা সকলের তিন লক্ষণ নির্দ্দেশ করেন,—"সাত্ত্বিকী রাজসী দেবপ্রতিমা তামসী ত্রিধা।" সাত্ত্বিকী প্রতিমা হচ্চেন, 'যোগমুদ্রান্বিতা'; রাজসী 'নানাভরণ-ভূষিতা' আর উগ্ররূপধরা হচ্চেন তামসীপ্রতিমা।

এই তিন গুণ যেমন পৃথক পৃথক প্রতিমায় দেখা যায়, তেমনি দেখি জগতের প্রাচীনতম তিনটা শিল্প,—ইজিপ্ত, ভারত, আর গ্রীক এই তিন গুণের সুস্পষ্ট তিনটা মুদ্রা প্রকাশ করিয়া আমাদের সম্মুখে বিদ্যমান রহিয়াছে।

প্রাচীন ইজিপ্তের যে সভ্যতা সর্ব্বগ্রাসী কালের সম্মুখে দম্ভভরে রাজদণ্ড উত্তোলন করিয়া মৃতদেহকে অবিনশ্বরতা প্রদানের ব্যবস্থা করিয়া, কালের প্রতাপকে রাজ-প্রতাপের কবলে আনিয়া মর্ত্ত্যকে অমরত্ব দিবার প্রস্তাব করিতেও কুণ্ঠিত হয় নাই, সেই প্রভুত্ব-তামস প্রাচীন সভ্যতার শিল্প-নিদর্শন নীলনদাতীরে নির্ব্বাপিত ইজিপ্ত রাজশ্রীর মরুশ্মশানে কালবিজয়িনী বিভীষণা বিস্ময়করী নারিসিংহের তামসী মূর্ত্তি!

আর যে গ্রীক সভ্যতা কুস্তিগিরের খেলাকে (olympic games) অমর লোকের ক্রীড়া নাম দিত; ভোগানন্দে যে গ্রীক্ জাতি নরদেহে ইন্দ্রের ঐশ্বর্য্য ভোগ করিয়াছে তাহাদের শিল্প ইন্দ্রাণীতুল্য, শুভ্র মর্ম্মরে রাজসী মুর্ত্তিতে বিরাজিতা।

আর যে ভারত বৌদ্ধ বা প্রাচ্য সভ্যতা মায়ার মূল, দুঃখের মূল, আসক্তির বন্ধন ছিন্ন করিয়া পরমানন্দ সাগরে নির্ব্বাণ-লাভ করিতে ব্যস্ত; যে যুদ্ধ করিয়া ইতিহাস লিখিবার বেলায় তারিখ, সৈন্যসংখ্যা, হতাহতের তালিকা ঠিক না রাখিয়া অভিরাম দেবচরিত্র বর্ণন করিয়া যায়; যে একচ্ছত্রী সম্রাটের প্রতিমুর্ত্তি না রাখিয়া, করুণার অনুশাসন ধর্ম্মের অসংখ্য কীর্ত্তিস্তম্ভে জগতের বৃহত্তর সাম্রাজ্যখণ্ডকে নিরবচ্ছিন্ন মণ্ডিত করিয়া তোলে তাহার আর্য্য শিল্পের সকল প্রকার বন্ধনমুক্ত ভাবঘন ধ্যানস্তিমিত সাত্বিক মূর্ত্তি পার্থিব সৌন্দর্য্য ও ঐশ্বর্য্যের পদ্মাসনে চরণ স্থাপন করিয়া প্রকাশিত আছেন। তিন প্রাচীন শিল্পের ঐ ত্রিধারা যে আবহমানকাল আপনার বিশুদ্ধতা রক্ষা করিয়া চলিয়াছে এমন নয়; দেশকালভেদে সেটাতে অল্পবিস্তর সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে দেখা যায়,—যেমন রাজসিক গ্রীক্ শিল্পে প্রথমে তামসিক রোমান, পরে সাত্বিক খৃষ্টীয়, শেষে জড়প্রধান ইউরোপীয় শিল্প; সত্বগুণপ্রধান আর্য্যশিল্পে তামসী তান্ত্রিক ও রাজসিক মোগল শিল্প আসিয়া মিলিয়াছে।

এই ত্রিগুণের কষ্টিপাথরে তাবৎ শিল্পকে কষিয়া দেখিলে মোটামুটি দরের হিসাবটা এইরূপ দাঁড়ায়!—

ইজিপ্ত শিল্প=বিশুদ্ধ তামসিক, দর ১৬৲ টাকা। যে খনিতে এ সোনা জন্মিত তাহা এখন বর্ত্তমান নাই, নীল নদীর চড়ায় ঢাকা পড়িয়াছে, তবে ভারতের বিশুদ্ধ তান্ত্রিক সোনাটা ইহার সমতুল্য।

গ্রীক শিল্প=বিশুদ্ধ রাজসিক দর ১৬৲ টাকা। রোম্যান আমলে উক্ত সোনা তমাশ্রিত রাজসিক দর ১২৲ টাকা। খৃষ্টীয় শতাব্দীতে উহা রজাশ্রিত সাত্বিক ও সাত্বিক দর ১৬॥০ ও ১৮॥০ টাকা। অধুনাতন উহা রজতামসী, কেমিকেল বা নিকেল, দর এক কড়া।

আর্য্যশিল্প :—পহিলা থানের সোনা অপ্রাপ্ত। বৌদ্ধযুগে অতিবিশুদ্ধ সাত্বিক, দর ২০৲। ব্রহ্মণ্য যুগে শুদ্ধ সাত্বিক ও তামস সাত্বিক দর ১৮॥০ টাকা। মোগল আমলে রজাশ্রিত সাত্বিক ও তমাশ্রিত রাজসিক দর ১৬॥০ ও ১২৲ টাকা।

অধুনাতন, এদেশের লোক ইউরোপ হইতে কেমিকেল আনাইয়া ব্যবহার করিতে শিখিয়া আর নিজের খনিতে কাষ করিতে চাহে না,—বিশেষ যাহারা সভ্য হইয়াছে; কেননা তাহাদের জ্ঞান সেরূপ করিলে সভ্যতা রক্ষা হয় না। অতএব সোনা এখন এদেশে দুষ্প্রাপ্য।

বৌদ্ধশিল্পটা কোনভাবে অনুপ্রাণিত তাহা আমরা দেখিয়াআসিয়াছি এবং সেটাকে কোন দিক দিয়া বুঝিতে হইবে তাহাও বুঝিতে বাকি নাই। এখন ভারতবর্ষে এই বৌদ্ধ শিল্পের মন্দিরাদির একটা চুম্বক তালিকা ও তাহাদের স্থানকাল নির্দ্দেশ করিয়া প্রবন্ধ শেষ করিব।

প্রথমে স্তম্ভ বা লাঠ। বৌদ্ধপ্রভাবের সময়ে এগুলির উপরে অনুশাসন লিপি;—শিখর

দেশে চারি সিংহমূর্ত্তি,—যেন পশুস্বভাব ছাড়িয়া তাহারাও করুণার মহিমা কীর্ত্তন করিতে শিখিয়াছে। জৈন ধর্ম্মে এইগুলি দীপদান-স্বরূপ কল্পিত; ভাবটা ধর্ম্মের জ্যোতি মর্ত্ত্যলোক আলোকিত করিয়া যেন দেবতাগণকেও আলোক প্রদান করিতেছে। বৈষ্ণবেরা এই লাঠস্তম্ভের শিখরে গরুড়মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া এটাকে গরুড়স্তম্ভ বা ভগবৎ প্রেমে দাস্য ভাবের আদর্শ মূর্ত্তিরূপে কল্পিত করিয়া মন্দির সম্মুখে স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। অতএব দেখিতেছি, তিন কালে উক্ত তিন ধর্ম্মই লাঠস্তম্ভের লক্ষ্য বজায় রাখিয়াছে।

ধর্ম্মাশোকের বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণের ৩১ বৎসরে এই লাঠস্তম্ভসকল ভারতের নানা স্থানে প্রথম প্রোথিত হয়। দিল্লীতে ফিরোজ সাহের কবর সম্মুখে একটি ধাতু নির্ম্মিত ২৩ ফিট উচ্চ স্তম্ভ আছে, সেটি খৃষ্টীয় ৩০০-৪০০ শতাব্দিতে রচিত। এই লাঠে খোদিত লিপি হইতে জানা যায় সেটা একটা গরুড়স্তম্ভ; ইহার গঠন পারিপাট্য চমৎকার। ইউরোপ ধাতু নির্ম্মিত এতবড় স্তম্ভ অতি অল্প দিনই হইল গড়িতে সক্ষম হইয়াছে।

প্রয়াগের দুর্গমধ্যে যে ৩৩ ফিট্ উচ্চ প্রস্তরগঠিত অশোকস্তম্ভ আছে সেইটাই সর্ব্বাপেক্ষা অভগ্ন অবস্থায় বিদ্যমান। তাহার উপরে ৩৮০-৪০০ খৃ অব্দে সমুদ্র গুপ্তের এবং ১৬০৫ খৃ অব্দে জাহাঙ্গীর বাদসাহের জয়গাথা ধর্ম্মাশোকের অভয় বাণীকে আচ্ছন্ন করিয়াছে; এবং গান্ধার দেশের গ্রেকো-রোম্যান বা তমাশ্রিত রাজসিক-শিল্প Honey Suckle মধুলতিকার মাল্যদাম ইহার শিরোভূষণে জড়াইয়া গিয়াছে।

কাবুলের সুরুখ্ মিনার পুরীর গরুড়স্তম্ভ, হিমালয়ের পার্ব্বত্যপ্রদেশে ভুটিয়াদের পতাকা ও মন্ত্রপত্রিকা পরিশোভিত বংশদণ্ডগুলি এই লাট স্তম্ভেরই পরিবার।

তাহার পরে চৈত্য ও বিহার। চৈত্যগুলা উপাসনা বা সভাগৃহ; আর বিহারগুলা ভিক্ষুগণের আবাসস্থানরূপে কল্পিত। ক্রীশ্চিয়ানদিগের চার্চ্চগুলির যে কাজ চৈত্যেরও সেই কাজ এবং খৃষ্টীয় convent বা monastery গুলির যে কাজ বিহারগুলিরও সেই কাজ ছিল। এই চৈত্য ও বিহারগুলি নির্ম্মাণ সাদৃশ্যে খৃষ্টীয় গির্জ্জা ও convent গুলার সহিত হুবহু মেলে। যদিচ খৃষ্টানদিগের গির্জ্জা হইতে সেগুলা নকল করা হয় নাই। এইরূপ চৈত্য ও বিহার ভারতবর্ষে অসংখ্য। উদয়গিরির রাজরাণী গুম্ফা প্রাচীনতম, ও অজন্তা, ইলোরা, কারলী প্রভৃতি বোম্বাই অঞ্চলের বিহারগুলি শিল্পহিসাবে শ্রেষ্ঠতম বলা চলে। এইগুলির রচনাকাল খৃষ্টীয় ৫ হইতে ৭ শতাব্দির মধ্যে ধরা যায়। এই অজন্তা বিহারের চিত্রাঙ্কন প্রথা, আর বুদ্ধের ধর্ম্মরাজ্যের প্রায় শেষ সীমা জাপানের 'নারা' মন্দিরের ভিত্তি চিত্রণপ্রণালী এবং আন্দাজ ৫০ বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আমাদের বঙ্গদেশে পুঁথি-আচ্ছাদনের জন্য সে কাষ্ঠ পাটা বা ফলক সকল ব্যবহৃত হইত তাহার রঞ্জন ও চিত্রণ একই। সহস্র বৎসর অতীত হইয়া গেছে অথচ সেদিনও বাঙ্গালী সেই অজন্তা প্রথামত ছবি লিখিয়াছে, আজিও নেপাল তাহার শিক্ষা মানিতেছে, জগতে কোন চিত্র-শিল্পের এ জীবনীশক্তি দেখা যায় না। বৌদ্ধ-কলা-লক্ষ্মী অনেকদিন আমাদের পল্লীকুটীরে বাস

করিয়া গেছেন; তাঁর সহস্র দল পদ্মাসনের স্ু-বর্ণ দলটি আমাদের পিতামহেরা লক্ষ্মীর ঝাঁপিতে অনেকদিন যত্নে রাখিয়াছিলেন;— যতদিন না আমরা লক্ষ্মীপূজার কড়ি বন্ধ করিতে এবং ঝাঁপিটাকে waste paper basket রূপে ব্যবহার করিতে শিখিয়াছিলাম।

বৌদ্ধযুগের স্তূপ ও মন্দির সকল ভগবান বুদ্ধের দেহ অস্থি রক্ষণের ও তাঁহার চরণ-ধূলিতে পবিত্র তীর্থস্থান সকলকে স্মরণীয় রাখিবার জন্য নির্ম্মিত হয়। তাহার মধ্যে বুদ্ধগয়ার মন্দির, বরহাট স্তূপ খৃষ্টপূর্ব্ব ২০০-২৫০ বৎসরে নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই দুই মন্দিরে গ্রীক্ বা রোমক্ শিল্পের গন্ধমাত্র নাই। তাহার পরে প্রথম খৃঃ অব্দে সাঞ্চি স্তূপ, তাহার ৫০০ বৎসরের মধ্যে গান্ধার, এবং ৪০০ হইতে ৫০০ খৃঃ অব্দে অমরাবতী স্তূপ নির্ম্মিত হয়।

এই বরহাট ও সাঞ্চি স্তূপের কারুকার্য্য হইতে বেশ বুঝা যায় যে, বৌদ্ধেরা তখনও বুদ্ধমূর্ত্তির স্থাপনা করেন নাই। সে সময়ের শিল্পীরা বুদ্ধচরণ, ধর্ম্মচক্র, এমন কি নানা হিন্দু দেবদেবীর মূর্ত্তি দিয়া স্তূপদ্বয়ের শোভাবর্দ্ধন করিয়াছেন, কুমার সিদ্ধার্থের জীবনের ঘটনাও খোদিত করিয়া গেছেন কিন্তু কোথাও উপাসিত বুদ্ধমূর্ত্তি স্থাপন করেন নাই। সাঞ্চিস্তূপে বুদ্ধজাতক সকল চিত্রিত করিয়া প্রাচীরগাত্রে জীবজন্তু পশুপক্ষী এমন সুন্দর করিয়া খোদিত আছে যে ইউরোপীয় পণ্ডিতগণও একবাক্যে স্বীকার করেন যে জগতের কোন দেশের প্রস্তর-উৎকীর্ণ পশুপক্ষীগুলি ইহার সমতুল নয়।

খৃঃ অব্দ চারি কি পাঁচশত বৎসরের মধ্যে অমরাবতীর স্তূপ গঠিত হয়। এই স্তূপে আমরা বুদ্ধমূর্ত্তি সকলের প্রথম দর্শন-লাভ করি। শিল্প হিসাবে ভারতে যত স্তূপ আছে তাহার মধ্যে অমরাবতী স্তূপই শ্রেষ্ঠ আক্ষেপের বিষয় কৃষ্ণানদীতীরে এই স্তূপটি যেমন ভগ্নদশা প্রাপ্ত হইয়াছে এমন আর কোনটিই নয়। মান্দ্রাজ ও ইউরোপের শিল্পশালাসমূহে ইহার যে খণ্ড প্রস্তর সকল রক্ষিত আছে তাহা কি অপূর্ব্ব সুন্দর! মনে হয়, বরহাট ও সাঞ্চি স্তূপে শিল্প, আনন্দের কাকলী মাত্র সুরু করিয়াছে, এইখানে সে একেবারে শঙ্খঘণ্টারবে মহা বন্দনা জুড়িয়া দিয়াছে! এতদিন তাহার উপর দিয়া স্বর্গের পরিমল বহিয়া যাইতেছিল এইবার যেন দেবতা আসিয়া তাহাতে অধিষ্ঠান করিলেন। ভারতশিল্পের এই পরমানন্দের বিরাট উচ্ছ্বাস সাগরাম্বরা যবদ্বীপের সপ্ততল বরভূধর স্তূপের সুষমায় প্রাচ্যশিল্পের কেন্দ্রস্থল স্পর্শ করিয়াছে। চিত্রশিল্পে অজন্তাগুহা আর ভাস্কর্য্যে এই বরভূধর স্তূপ, বৌদ্ধশিল্প বা প্রাচ্যশিল্প বা আর্য্যশিল্পের চন্দ্রসূর্য্যপ্রভ মুকুটমণি, নয়নের দুই তারা অথবা হরগৌরী যুগল সাত্ত্বিকীমূর্ত্তি।

এই সপ্ততল প্রকাণ্ড বরভূধর স্তূপের তলদেশ হইতে শিখর পর্য্যন্ত প্রত্যেক প্রস্তর খণ্ডে ভগবান বুদ্ধের সমস্ত জাতক, জন্ম বিবরণ সুনিপুণ ভাস্করগণ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া তীর্থযাত্রীগণের শিক্ষালাভের জন্য উৎকীর্ণ করিয়া গিয়াছেন। ইহার এক একখানি প্রস্তরখণ্ড পরে পরে সাজাইয়া গেলে, সেগুলি লম্বে দেড় ক্রোশ স্থান অধিকার করিয়া থাকে। সমস্ত পাশ্চাত্য ভাস্কর্য্য শিল্পের কেন্দ্রস্থলে যেমন গ্রীক পার্থিনানের পার্থিবরূপ, বিরাট প্রাচ্য শিল্পের মধ্যে বর-



অথার্দ্ধরাত্রে স্তিমিতপ্রদীপে

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় কর্ত্তৃক অঙ্কিত মূল চিত্র হইতে

ভূধরের বররূপ সেইপ্রকার সুমেরুর ন্যায় দণ্ডায়মান। ইহার বর্ণনে বাক্য হার মানে, দর্শনে চক্ষু সার্থক হয়।

ভারতবর্ষের বাহিরে তিব্বত, ব্রহ্মদেশ, চীন, জাপান ও দক্ষিণ আমেরিকার মেক্সিকো পর্য্যন্ত বৌদ্ধ শিল্প কি প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল তাহার ইতিহাস একটা অষ্টাদশ পর্ব্ব মহাভারত! এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাহার আলোচনা অসম্ভব; কেবল ভারত চীন ও জাপান এই তিন দেশের ধর্ম্ম, সভ্যতা ও শিল্পের কি নিকট সম্বন্ধ তাহা জাপানের আবালবৃদ্ধবনিতার মুখে প্রচলিত একটি ক্ষুদ্র গল্প হইতে বেশ বুঝা যাইবে।

"লোয়াং নামক স্থানে তিন তীর্থযাত্রীর দেখা। তাঁহাদের মধ্যে প্রথম মহাত্মা ভারত-সন্তান, দ্বিতীয় জাপানবাসী আর তৃতীয় চীন হইতে আগত। তিন মহাত্মার যখন দেখা তখন চীনদেশীয় মহাপুরুষ বলিয়া উঠিলেন,—"দেখ এই যে আমাদের মিলন এটি দেখিতে হইয়াছে ঠিক যেন জাপানী বন্ধুর হাতের পাখাখানি! চীনটা যেন পাখার কাগজ, ভারতবর্ষ হইয়াছে যেন পাখাখানির ঠাট বা পঞ্জরের কাঠিগুলি, আর ছোট দেখিতেছ এই যে জাপান উনি হচ্ছেন এই পাখার খিল্ বা ক্ষুদ্র বাঁধন;—দেখিতে ছোট কিন্তু কাজে খাট নন।

বিনা কাগজে শুধু কাঠি পঞ্জর বাতাস দেয় না, বিনা কাঠিতে শুধু কাগজ উড়িয়া ছিঁড়িয়া যায়, আর বিনা খিলে পাখা খানা এলাইয়া পড়ে ও কাজেই আসে না।"

চীনের এই লোয়াং সহরে এককালে তিন সহস্র বৌদ্ধ ভিক্ষু এবং দশ সহস্র ভারতীয় গৃহস্থ বাস করিতেন। ইহাদেরই প্রভাবে শব্দতত্ব চীন ভাষায় প্রথম প্রচলিত হয় এবং তাহারই ফলে ৪০০ খৃঃ অব্দে আধুনিক জাপানী ভাষার সৃষ্টি। এই ত্রয়োদশ সহস্র ভারতবাসী সে সময়ের চীন শিল্পে যে কি প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল তাহা জাপানের প্রসিদ্ধ শিল্পাচার্য্য শ্রীমৎ ওকাকুরা সুন্দর করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

নালন্দা বিক্রমপুর প্রভৃতি স্থানে যে সকল বৌদ্ধ শিল্পবিদ্যালয় ছিল সেখানে যেমন শাস্ত্রের চর্চ্চা, তেমনি শিল্পেরও চর্চ্চা চলিত। সেখানকার আচার্য্যগণ শিল্প সম্বন্ধে যে সকল শাস্ত্র ও ব্যবস্থা প্রচলন করিতেন তাহা প্রাচ্য জগতে সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণের দ্বারাই প্রসার লাভ করিত। সেকালের বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্বের জ্ঞান চর্চ্চার স্থান ছিল; সে সময়ের art facultyতে artটা এখনকার মত একটা optional বা খামখেয়ালী অস্থায়ী পদ অধিকার করিয়া ছিল না।

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কবির নৈরাশ্য।

শব্দ-কল্প-তরু হ'তে করি আহরণ
চারুতর কথাগুলি করিয়ে চয়ন,
সুপ্রয়োগে রচি তায়, জানাই তোমায়

এ মোর হৃদয়াবেগ বড় ইচ্ছা হায়!
কিন্তু নারি প্রকাশিতে বিন্দুমাত্র তার,
শব্দগুলি ভেঙ্গে পড়ে শতচূর্ণ ধার!

প্রতিঘাত।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

কথাটা ভাল করিয়া বুঝিতে হইলে নলিনের বাল্যজীবনের ইতিহাস একটু অনুসন্ধান করিতে হয়।

নলিন তখন স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ে। স্কুলের পাঠ্যপুস্তকগুলার সহিত তাহার পরিচয় কিরূপ ছিল সে কথা খুলিয়া না বলিলেও চলে। তবে পাঠ্য ও অপাঠ্য বাঙ্‌লা কবিতাপুস্তকগুলা তাহার হাতে পরিত্রাণ পাইত না। সেই সকল পুস্তকের ভাবরস যেটুকু পাওয়া যাইত, তাহার সবটুকুই সে একেবারে মজ্জাগত করিয়া ফেলিত। ইহার ফলে প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইবার সময় গণিতে কোনমতে পাশ নম্বর পাইলেও, সে ক্লাশে সহপাঠিবর্গের মধ্যে কবি বলিয়া রীতিমত খ্যাতিলাভ করিল।

ক্লাশে টিফিনের ছুটির সময় যখন অপর ছাত্রেরা 'কুলের আচার' 'চিনাবাদাম' 'লাটিম' প্রভৃতি লইয়া বিশ্বসংসার ভুলিবার উপক্রম করিত, নলিন তখন সেই সমস্ত কোলাহল হইতে আপনাকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র রাখিয়া গণিতের খাতা খুলিয়া অনির্দ্দিষ্টা নায়িকার উদ্দেশ্যে কবিতা লিখিতে বসিত, "কোথা আছ, মনহরণি, কবে আসি মোর জীবনের কূলে ভিড়িবে তোমার তরণী!" কখনো বা একধারে দাঁড়াইয়া গুণগুণ স্বরে আপনার মনে গাহিত, "দিবস রজনী আমি যেন কার আশায় আশায় থাকি!"

এতটা কবিত্ব ও প্রেমের স্বপ্নবিহ্বলতায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সরস্বতী যখন তাহাকে প্রবেশ-দ্বারে ছাড়পত্র দিতে অসম্মত হইলেন, তখন তাহার অভিভাবকগণের রুদ্র শাসন তাহার বিরুদ্ধে বজ্রের ন্যায় উদ্যত হইয়া উঠিল। বাড়ীতে রীতিমত পাহারা লাগিল। নূতন মাষ্টার মহাশয়টি অতিরিক্ত পঠনোৎসাহে তাহার কবিত্বকুঞ্জে দুরন্ত পবনস্বরূপ হইয়া উঠিলেন। অবশেষে তাঁহারি চেষ্টায় নলিন দুই বৎসরকাল সকল সাধ-আশায় জলাঞ্জলি দিয়া প্রবেশিকার অর্গল খুলিয়া এবার কলেজ-জীবনে অধিকার পাইল!

বয়সের সঙ্গে কাব্যচর্চ্চাটা না কমিয়া ভিতরে ভিতরে বাড়িয়াই উঠিতেছিল, অভিভাবকগণের পক্ষে সে সংবাদটুকু রাখিবার সুবিধা ঘটিয়া উঠে নাই! মস্তকে দীর্ঘকেশ কুঞ্চিত করিয়া রাখিয়া, পৌষের দারুণ শীতেও সূক্ষ্ম পাঞ্জাবীমাত্র গায়ে দিয়া, বুটের পরিবর্ত্তে লপেটা ব্যবহার করিয়া এবং গোপনে "সুধাংশু-দীপিকা" পত্রিকার সম্পাদকী করিয়া, অর্থাৎ এমনি নানাবিধ প্রচলিত উপায়ে বন্ধুবর্গের মধ্যে সে আপনার কবিখ্যাতি-টুকু সমধিক প্রসারিত করিয়া ফেলিল!

এ কয় বৎসরে তাহার চিত্তে আর একটু পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল! "সুধাংশু-দীপিকা" পত্রিকায় 'লিরিক' প্রকাশ করিয়া প্রায়ই সে কোন আকুলা নায়িকার সুরঞ্জিত পত্রের প্রতীক্ষা করিত! এবং যে দিন পত্রিকা-পৃষ্ঠায় তাহার ফ'টো প্রকাশিত হয়, সেইদিন হইতে পথে চলিবার সময় তাহার মনে হইত, বুঝি কোন বাতায়ন হইতে কোন লজ্জাশীলা

নায়িকার করচ্যুত পুষ্পমাল্য তাহার কবিকণ্ঠ ভূষিত করে! কিন্তু বাঙ্‌লা দেশের কাব্য-রসানভিজ্ঞা সঙ্কুচিতা নায়িকাগণ একদিনও তাহার প্রতি ফিরিয়া চাহে নাই, ইহা দেশের পক্ষেও অল্প দুর্ভাগ্যের বিষয় নহে! এই সময় আবার তাহার অকবি বন্ধুগণের একে একে বিবাহ হইতে লাগিল; কিন্তু তাহার হইল না। কারণ, নলিনের নিষ্ঠুর পিতা দৃঢ়পণ করিয়াছিলেন যে এফ, এ, পাশের পূর্ব্বে কিছুতেই পুত্রের বিবাহ দিবেন না! নলিনের মাতার অভিমান ও অশ্রুসিক্ত কাতর অনুরোধ, কন্যাদায়গ্রস্ত পিতৃগণের নির্ব্বন্ধাতিশয্য, বন্ধুবর্গের লোভপ্রদর্শন—কোনটিই নলিনের হৃদয়হীন পিতাকে টলাইতে পারে নাই। অবশেষে তিন চারিবার ফেল হইয়া নলিন যখন রীতিমত প্রমাণ করিল, যে সে এফ, এ, পাশ করিবে না, তখন একদিন আলো, বাজনা ও পুষ্পসুরভির সমারোহের মধ্যে বিবাহ করিয়া সে নববধূ গৃহে আনিল। এবং ইহার ঠিক এক বৎসর তিন মাস সতের দিন পরে নলিনের পিতা ইহলোক ত্যাগ করিয়া নলিনকে কাব্যচর্চ্চায় অখণ্ড অবসর দান করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

স্ত্রীকে লইয়া নলিন একটু বিপদে পড়িয়াছিল। মানসরাজ্যের শ্রেষ্ঠতম অর্ঘ্যস্বরূপ প্রণয়-গদ্‌গদ ভাষা লইয়া সে যখন প্রভাকে সম্ভাষণ করিত, তখন প্রভা এমনি সহজ সরল হাস্যের ফুৎকারে সেগুলি উড়াইয়া দিত যে নলিনের পক্ষে গাম্ভীর্য্য ও ক্রোধ কোনটাই সম্বরণ করা দুঃসাধ্য হইয়া পড়িত। এক একবার তাহার মনে হইত—স্ত্রী ও সংসার সব ফেলিয়া কোথাও চলিয়া যায়! কাহাকেও কোন সংবাদ দিবে না, গৈরিকবসনে দেশ পর্য্যটন করিবে, মস্তকে বিপুল জটাভার ধারণ করিবে! অবশেষে কোন এক দুর্দ্দিনে সুমধুর গীতোচ্ছ্বাসে প্রভার ভগ্নহৃদয় স্পর্শ করিবে! প্রভা তখন তাহার পায়ে ধরিয়া ক্ষমা চাহিবে—তবু সে আপনার সঙ্কল্প অটল রাখিবে! এমনি একটা উদ্ভট উপায়ে সে প্রভার নিষ্ঠুরতা ও তাচ্ছল্যের প্রতিশোধ লইবে! কিন্তু উপায়-অবলম্বনেও অনেকখানি বিঘ্ন ছিল! প্রভার সুন্দর মুখখানিতে এমন একটা মোহ ছিল, যাহা নলিনকে সম্পূর্ণভাবে আবিষ্ট করিয়াছিল। প্রভাকে ছাড়িয়া নলিন কোথায়ও থাকিতে পারিত না! সুতরাং ইচ্ছা সত্ত্বেও বেচারা নিতান্ত নিরুপায় চিত্তে আপনার হৃদয়ের উপর এই সকল ক্রূর অত্যাচার নীরবে সহ্য করিত!

* * * *

সেদিন বন্ধুগৃহে সান্ধ্যভোজে গানের মজলিস বেশ জমিয়া উঠিয়াছিল। ললিতকণ্ঠে মধুর সঙ্গীতালাপ, আতর-গোলাপের স্নিগ্ধ সুরভি সমস্ত মিলিয়া নলিনের মনে একটা মাদকতার সঞ্চার করিয়া তুলিয়াছিল! বিবিধ প্রণয়-সঙ্গীতে তাহার কবিহৃদয় মুগ্ধ ও আর্দ্র হইয়া পড়িয়াছিল, তাই সে আজ গৃহে ফিরিয়াই প্রিয়ার ভুজবন্ধনের আশায় উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিল!

বসন্তের স্নিগ্ধ 'দখিণা' বহিতেছে! চাঁদের জ্যোৎস্নায় চারিধার ভরিয়া গিয়াছে! নলিনের গৃহের সম্মুখে বারাণ্ডার টবে একরাশ বেলফুল ফুটিয়া উঠিয়াছে! পথে আসিবার সময় সে দুইটা ছোট ফুলের তোড়াও সংগ্রহ করিতে

ভুলে নাই! নলিন কক্ষে আসিতেই প্রভা আসিয়া কহিল—"জেঠাইমার বড় অসুখ করেছে!" কথাটা কাণে না তুলিয়াই নলিন প্রভাকে বুকের মধ্যে টানিয়া মৃদুকণ্ঠে ডাকিল "প্রভা!" "আঃ, ছাড়ো—কি কর! জেঠাইমার অসুখ; আমি তাঁর কাছে রাত্রে থাক্‌ব, তাই বল্‌তে এলুম। তুমি শুয়ে পড়, আমি মশারিটা ফেলে দিয়ে যাই!" নলিন প্রভাকে বুকে টানিয়া চুম্বন করিয়া কহিল, "হোক্‌গে অসুখ! এমন জ্যোৎস্নারাত্রি রোগীর সেবার জন্য নয়। প্রভা! এসো, এই জ্যোৎস্নায় খানিক বসি দুজনে! তুমি ঐ বকুল ফুলগুলো নিয়ে একটা মালা গাঁথো, আমি তোমার কোলে মাথা রেখে শুয়ে থাকি! কি সুন্দর আজ দেখাচ্ছে তোমাকে, প্রভা!"

প্রভা স্বামীর আলিঙ্গন হইতে আপনাকে মুক্ত করিয়া কহিল, "না, ছিঃ, আমি জ্যেঠাইমার কাছে না থাক্‌লে চল্‌বে না! তুমিও একবার তাঁকে দেখ্‌বে চল! এসো, লক্ষ্মীটি!"

নলিন বিরক্ত হইয়া গম্ভীরকণ্ঠে ডাকিল, "প্রভা!"

প্রভা কহিল, "কি?"

নলিন কহিল, "তুমি এখন যেতে পাবে না! এসো এই ফুলটি তোমার খোঁপায় পরিয়ে দি! সে গানটা মনে আছে,—

"অলকে কুসুম না দিয়ো,
শিথিল কবরী বাঁধিয়ো!"

প্রভা একদৃষ্টে স্বামীর প্রতি চাহিয়াছিল! এমন সময়ে ঝি ডাকিল, "বৌদিদি"! "ছাড়, আমি যাই" বলিয়া প্রভা তাড়াতাড়ি চলিয়া গেল! তাড়াতাড়িতে নলিনের সযত্ন-দত্ত প্রণয়োপহার ফুলটি তাহার শিথিল কবরীচ্যুত হইয়া ধূলায় লুটাইল!

নলিন কিয়ৎক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া রহিল। তাহার চক্ষে জ্যোৎস্না ম্লান হইয়া আসিল! সে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বারাণ্ডায় আসিয়া দাঁড়াইল! রাগে, অভিমানে তাহার সর্ব্বশরীর জ্বলিতেছিল! সে একবার ভাবিল, ঐ বড় ফুলের টবটা তুলিয়া আপনার মস্তকে প্রচণ্ড আঘাত করে! রক্তস্রোতে একটা বিপর্য্যয় কাণ্ড বাধাইয়া দেয়! প্রভা আসিয়া দেখে, তাহার উপেক্ষিত হৃদয়বান স্বামীর অন্তিমকাল উপস্থিত! আবার মনে হইল, বারাণ্ডা হইতে নীচে লাফাইয়া পড়িয়া এখনি আত্মহত্যাদ্বারা প্রভার এই নিষ্ঠুর উপেক্ষার চূড়ান্ত প্রতিশোধ লয়! সমস্ত প্রকৃতিটা তাহার নিকট আগুনের মত তপ্ত বোধ হইতেছিল! শুধু সে ভাবিতেছিল, কি করিয়া প্রতিশোধ লওয়া যায়!

অনেকক্ষণ ধরিয়া সেই স্থানেই সে দাঁড়াইয়া রহিল। ভাবিল, প্রভা নিশ্চয় আসিবে! সে কি এতটা তাচ্ছল্য করিতে পারে? নলিনের হৃদয়ের বেদনাটা সে কি একটুও বুঝিবে না? সত্যই কি এমন অরসিকার হস্তে সে আত্মসমর্পণ করিয়াছে?

কিন্তু, হায়, সব বৃথা হইল! প্রভা ফিরিল না! নলিনের মাথাটা দপ্ দপ্ করিতেছিল। সে বারাণ্ডার মেজেতেই শুইয়া পড়িল!

অনেক ভাবিয়া-চিন্তিয়া প্রতিশোধ গ্রহণের একটা উপায় সে আবিষ্কার করিয়া ফেলিল। ভাবিল, তাহার প্রেম একনিষ্ঠ, প্রভাকে এতটা সে ভালবাসে, এই জন্যই প্রভা তাহাকে অবজ্ঞা করে! এবার হইতে সে-ও

প্রভার প্রতি তাচ্ছল্য প্রকাশ করিবে! সে কোন নায়িকার উদ্দেশ্যে বাহির হইবে, এবং প্রভা যখন তাহারি প্রতীক্ষায় বাতায়নপার্শ্বে বসিয়া বিনিদ্র বিভাবরী যাপন করিয়াও তাহার সাক্ষাৎ পাইবে না, তখনি এই সকল অবজ্ঞা ও অপমানের কড়ায়-গণ্ডায় প্রতিশোধ হইবে!

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

পরদিন প্রত্যূষে রাগটা একটু নরম পড়িলে নলিন পা টিপিয়া তাহার জ্যেঠাইমার কক্ষের সম্মুখে আসিয়া দেখে, কক্ষমধ্যে তাহার জ্যেঠাইমা নিদ্রিতা এবং তাঁহারি বুকের কাছে প্রভা জড়সড় ভাবে শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে! রাগে তাহার শরীর আবার জ্বলিয়া উঠিল! বটে! এইরূপেই প্রভা রোগীর শুশ্রূষা করিতেছে! কেন, জ্যেঠাইমা যখন নিদ্রিতা হইলেন, তখন আর কাহাকেও তাঁহার কাছে রাখিয়া, সে কি স্বামীর নিকট আসিতে পারিত না! কেবল বাহাদুরি লইবার জন্যই প্রভার এতটা আগ্রহ! নলিনের প্রতি তাহার কি বিন্দুমাত্রও কর্ত্তব্য নাই! হায়!

প্রভার হাতটা ধরিয়া প্রবলভাবে নাড়িয়া নলিন তীব্রস্বরে কহিল, "এই বুঝি সেবা হচ্ছে! বেশ!" কথাটার সহিত হৃদয়ের সমস্ত বিষ ঢালিয়া দিয়া নলিন প্রভার উত্তরের অপেক্ষামাত্র না করিয়া একেবারে নীচে নামিয়া আসিল। সেখানে ইজিচেয়ারে পড়িয়া, কপালে হাত দিয়া, চক্ষুদুটা মুদ্রিত করিয়া সে কি ভাবিতে লাগিল!

এমন সময়ে বন্ধু অক্ষয় আসিয়া কহিল, "অজয়ের বিয়ের ত সব কাল ঠিক হয়ে গেল হে!" অজয় অক্ষয়ের ভ্রাতা!

নলিন চক্ষু খুলিতেই অক্ষয় কহিল, "কিহে, চোখদুটো যে লাল হয়ে রয়েছে! ঘুমোওনি কাল রাত্রে?"

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া নলিন কহিল, "আমার মত লক্ষ্মীছাড়ার আবার ঘুম!"

অক্ষয় হাসিয়া কহিল, "ইস, মাথাশুদ্ধ খারাপ দেখছি যে! চা-টা ফরমাস কর! সব সাফ্ হয়ে যাবে!"

"নাঃ, চা খাব না!"

অক্ষয় কাছে আসিয়া মৃদুকণ্ঠে কহিল, "তাইত, ব্যাপার কি? প্রভার সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে বুঝি!"

নলিন গতরাত্রের বৃত্তান্ত বিবৃত করিয়া কহিল, "আর পারি না আমি! এবার তাকে রীতিমত শিক্ষা দোব!"

চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া অক্ষয় কহিল, "অর্থাৎ?"

নলিন কহিল, "অর্থাৎ, তাকে বোঝাব আমিও তাকে অবহেলা করতে জানি! সে আমাকে ভালো না বাসলে আমারো তাতে কিছু আসে-যায় না!"

অক্ষয় কহিল, "এঃ, তুমি একবারে আস্ত একটি নায়ক হয়ে উঠলে! মাথা ঠাণ্ডা কর হে, মাথা ঠাণ্ডা কর!"

নলিন কহিল, "মাথা ঠাণ্ডা বেশ আছে! আমি কি করব, তা তোমাকে বরং বলে রাখি! বাঁ হাতে একখানি প্রেমপত্র আমি লিখবো—যেন কোন স্ত্রীলোক আমাকে লিখছে! তারপর সেই চিঠিখানা যাতে প্রভার হাতে কোনমতে পড়ে, তার বন্দোবস্ত করব! সে পড়ে জ্বলতে থাকবে, আর নিশ্চয় আমার

পায়ে লুটিয়ে পড়বে, তখন একবার তাকে আমিও দেখে নোব!"

অক্ষয় হাসিয়া কহিল, "মতলবটা মন্দ নয়! বেশ একখানা কমেডি লিখে ফেলা যায়! আঃ, যদি একটুও লেখবার ক্ষমতা থাকত! মোদ্দা, অমন কাজটি করোনা দাদা! আমাদের বাঙালীর মেয়েগুলো, ঠাট্টাই বল আর গাঁট্টাই বল, সব বেমালুম হজম করতে পারে, কেবল এইটি ছাড়া! এইটিতে তার বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পাওয়াটা ভারি স্বাভাবিক! এটা তাদের মর্ম্মান্তিক লাগে!"

অক্ষয় অনেক বুঝাইল! কিন্তু ভীষ্মের ন্যায় আজ নলিনের সঙ্কল্প অটল, স্থির!

সেদিন রাত্রে অক্ষয় যখন আপনার পত্নীর কাছে নলিনের সঙ্কল্পের কথা জ্ঞাপন করিল, তখন সরযূ কহিল, "কি বুদ্ধি! আর তোমরা পুরুষজাতটা এমনি! আমরা তোমাদের একটা আদরের কথার জন্য প্রাণ দিতে পারি, আর তোমরা আমাদের সঙ্গে এমনি নিষ্ঠুর কৌতুক কর!"

অক্ষয় সরযূর নাসিকাটি ঈষৎ নাড়িয়া কহিল, "ও কথা বলোনা, সর! নলিনটা বদ্ধ পাগল! পাগলের কথা কি ধরে?"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

অজয়ের বিবাহের গোল চুকিলে সরযূ একদিন স্বামীকে কহিল, "কিগো, নলিনবাবুর সে চিঠির খবর কি?"

অক্ষয় হাসিয়া কহিল, "তুমিও যেমন! সে ঐ মুখের কথা শুধু! নলিন ভুলে বসে আছে, আর কি!"

সরযূ মৃদু হাসিয়া কহিল, "তুমি মনে পাড়িয়ে দিয়োনা, একবার! মজাটা দেখা যায় বেশ!"

অক্ষয় কহিল, "বটে, তুমি মজা দেখ! কারো পৌষমাস, কারো সর্ব্বনাশ!"

*   *   *   *

মধ্যাহ্নে প্রভা লাইব্রেরী হইতে আনীত উপন্যাসখানি খুলিবামাত্র তাহার মধ্য হইতে নারী-হস্তলিখিত এক পত্র পাইল! পত্রখানি এইরূপ—

"প্রিয়তমেষু,

নলিনবাবু, সেদিন আসিব বলিয়া চলিয়া গেলেন, কিন্তু আসিলেন না। এ তিনদিন আপনার অদর্শনে আমি চাতকিনীর মত পথ চাহিয়া বসিয়া আছি, কিন্তু প্রত্যহই নিরাশ হইতেছি! অত ভালবাসা, অত সোহাগ আদর, সে কি শুধু ছলনা? না, নলিনবাবু, আপনি জানেন না—আপনাকে না দেখিতে পাইলে আমার চিত্ত কত অশান্ত হয়। তা যদি আপনি বুঝিতেন! আমার যদি পাখীর মত ডানা থাকিত, ত উড়িয়া গিয়া দেখিয়া আসিতাম! প্রভা দেবী বুঝি পথ আগুলিয়া রাখিয়াছেন!

"আপনাকে আসিতেই হইবে, আজ—নিশ্চয়! নহিলে আজ রাত্রে বিষের জ্বালায় হৃদয়ের জ্বালার নিবৃত্তি করিব। তখন দোষ দিতে পারিবেন না যে আপনার শৈ আপনাকে না বলিয়া মরিয়াছে!

আমার প্রাণ ফাটিয়া যাইতেছে! আজ আসিবেন,—নহিলে এই শেষ!

কি করিব, নলিনবাবু, আপনাকে দেখিলে

যে আবার মরিতেও ইচ্ছা হয় না, নহিলে এ কয়দিন কি না মরিয়া থাকি ?

আপনারি
পদাশ্রিতা দাসী শৈ—"

পত্রখানি প্রভা একবার, দুইবার, তিনবার পাঠ করিল! সহসা বাহিরে নলিনের পদশব্দ শুনিয়া চিঠিখানা তাড়াতাড়ি পুস্তকের মধ্যে রাখিয়া দিল!

নলিন কক্ষে প্রবেশ করিয়াই জামার পকেট, বালিস প্রভৃতি নাড়াচাড়া করিতে লাগিল; যেন কি একটা প্রয়োজনীয় সামগ্রীর অনুসন্ধান করিতেছে!

প্রভা থাকিতে পারিল না, কহিল, "কি খুঁজছ ?"

মুখটা যথাসম্ভব বিবর্ণ করিয়া নলিন কহিল, "কিছু না—এই—এই—"

প্রভা কাছে আসিয়া কহিল, "কি, বল না! বলবে না ?"

"এ-একটা চিঠি!" "খুব দরকারী চিঠি নাকি ?" "অ্যাঁ—হ্যাঁ দরকারী।" "এটা নয় তো ?" বলিয়া পুস্তকের মধ্য হইতে 'শৈ'-স্বাক্ষরিত পত্রখানা প্রভা বাহির করিয়া দিল। নলিন ক্ষিপ্র হস্তে পত্রখানা লইয়া কহিল, "এইটেই বটে! তুমি দেখনি ত ?"

প্রভা উত্তর না দিয়া একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া রহিল। "প্রভা" বলিয়া নলিন তাহার হাত ধরিল। "যাঃও—আমি সব জানি! ছাড়" বলিয়া প্রভা দ্রুতপদে কক্ষ হইতে প্রস্থান করিল।

নলিনের মনে অত্যন্ত আনন্দ হইল! সে ভাবিল, এবার খুব শাস্তি দিয়াছে সে! জয়ের আনন্দে একেবারে সে নীচে নামিয়া গেল!

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

কবিতার প্রুফ সংশোধন করিবে বলিয়া সবে-মাত্র তাড়াটি খুলিয়া বসিয়াছে, এমন সময় চাঁপা ঝি শশব্যস্তে আসিয়া কহিল, "দাদাবাবু গো, সর্ব্বনাশ হয়েছে!"

নলিনের বুকটা ধড়াস করিয়া উঠিল, "কেন রে, কি হয়েছে ?"

"বৌদিদি কেমন করছে! শীগগির এসো গো, দাদাবাবু" বলিয়াই চাঁপা উর্দ্ধশ্বাসে অন্তঃপুরাভিমুখে ছুটিল!

ত্রস্ত চরণে কক্ষে প্রবেশ করিয়াই নলিন দেখে, প্রভা শুইয়া রহিয়াছে, মাথার চুলগুলি এলাইয়া পড়িয়াছে, চক্ষুদুটি মুদ্রিত, মুখ বিবর্ণ!

কম্পিতকণ্ঠে নলিন ডাকিল, "প্রভা!"

প্রভা চোখ চাহিতে চেষ্টা করিল। নলিন তাড়াতাড়ি পাশে বসিয়া ঝুঁকিয়া পড়িয়া ডাকিল, "প্রভা, এমন কচ্ছ কেন ?"

চাঁপা রুদ্ধস্বরে ফোঁপাইতে ফোঁপাইতে কহিল, "বৌদিদি বিষ খেয়েছে! কি হবে, দাদাবাবু ?" নলিন চমকিয়া উঠিল। "এঁ্যা, সে কি!" বলিয়া তাড়াতাড়ি সে দোয়াত কলম লইয়া বন্ধু পরেশ ডাক্তারকে পত্র লিখিল, "এখনি এস! বিশেষ বিপদ!"

বাহিরে আসিয়া ভৃত্যকে ডাকিয়া কহিল, "শীঘ্র পরেশবাবুর বাড়ী যা—এখনি তাঁকে নিয়ে আসবি—ছুটিয়া যা,—গাড়ী ভাড়া করেই যা"—

ভৃত্য পত্র লইয়া ডাক্তারের উদ্দেশ্যে ছুটিল।

ফিরিয়া আসিয়া প্রভার মস্তক আপনার ক্রোড়ে তুলিয়া নলিন ডাকিল, "প্রভা!" প্রভার মুখ আরো বিবর্ণ হইয়া আসিতেছিল!

অর্দ্ধোন্মীলিত নেত্রে মৃদুকণ্ঠে প্রভা কহিল, "ডাকছ? কেন?"

নলিন কহিল, "এ কি করেছ, প্রভা? একেবারে এমন শাস্তি দিতে হয়?"

প্রভা কহিল, "বেঁচে কি সুখ! আমি সব জানি!"

রুদ্ধ কম্পিতস্বরে নলিন কহিল,"কি জান, প্রভা?" নলিনের চক্ষু হইতে দুই বিন্দু অশ্রু গড়াইয়া প্রভার গণ্ডে পড়িল। প্রভা কহিল, "না, কেঁদোনা! আমি তোমাকে একটুও সুখী করতে পারিনি, ক্ষমা করো!"

নলিন প্রভার অধরে চুম্বন করিয়া কহিল, "তোমাকে পেয়ে যে আমি স্বর্গ পেয়েছি, প্রভা! তোমায় কত ভালোবাসি, তা কি জান না?"

প্রভা কহিল, "যাকে পেয়ে সুখী হয়েছ"—

নলিন কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল, "ক্ষমা কর, প্রভা, ক্ষমা কর আমাকে! সে সব মিথ্যা! সে চিঠি আমি নিজে বাঁ হাতে লিখেছিলুম শুধু একটু তামাসা করবার জন্য। অক্ষয় জানে—উঃ, আমি কি করেছি!"

প্রভা কহিল, "না, ছিঃ, কেঁদোনা—ভাবনা কি? এক প্রভা গেলে লক্ষ প্রভা হবে।"

নলিন কহিল "না, না, আমার প্রভার তুলনা নেই!"

প্রভা কহিল, "যদি বাঁচি ত আর কথনো অনাদর করবে না?"

নলিন কহিল,"আবার যদি পাই তোমাকে —তা হলে মাথায় করে রাখবো!"

প্রভা কহিল, "না, ছিঃ, ও কথা বলতে নাই! তবে আমি বাঁচলে যদি তুমি সুখী হও ত আবার আমার বাঁচতে ইচ্ছা হয়!"

কথাটা বলিয়াই প্রভা উঠিয়া বসিল। নলিন কহিল, "ওকি? না, না, শোও; কষ্ট হবে যে তোমার!"

প্রভা কহিল, "কষ্ট কিসের? তুমি ঠিক বলছ, চিঠিখানা মিথ্যা?"

নলিন কহিল, "আগাগোড়া মিথ্যা! এই তোমার গা ছুঁয়ে বলছি!"

প্রভা স্বামীর পায়ে মাথা রাখিয়া কহিল, "ক্ষমা কর আমাকে! তোমাকে অনর্থক কষ্ট দিলুম! আমার এ বিষ-খাওয়াও মিথ্যা!"

নলিন কহিল, "সে কি?" "হাঁ! অক্ষয়-বাবুদের বাড়ী বিয়েতে সেদিন যখন নিমন্ত্রণে যাই, সরযূ তখন আমাকে সব কথা বলে! তাই আমিও একটু রঙ্গ করলুম! আর তোমার এমনি ধারা কাব্য ভালোও লাগে ত! চাঁপাও এর কতক-কতক জানে! আমি বিষ খাইনি, এবং কখনো খাবনা—এ তুমি ঠিক জেনো!"

নলিন কহিল, "আঃ, তাই বল! আমার এমন ভয় হয়েছিল! তবে তোমায় যে অরসিকা বলে জানতুম, আমার সে ভুলটা যে ভাঙ্‌ল, তাতেই সব দুঃখ দূরে গেছে, প্রভা!

এমন সময় ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল, "ডাক্তারবাবু এসেছেন!"

নলিন কহিল, "দেখ দেখি এখন উপায়! ছি, ছি, রীতিমত কেলেঙ্কারি! কি মনে করবে?"

প্রভা কহিল, "আঃ, কিছু ভাবনা নেই! বলগে 'একটু রঙ্গ করে ডাকা গেছে। অনেক দিন আসোনি' তার পর সন্ধ্যাবেলা খাবার নিমন্ত্রণ করো—"

নলিন বাহিরে আসিতেই পরেশ কহিল,

"কি হে ব্যাপার কি? তোমার চাকর যে ক'রে গিয়ে পড়ল, ভাবলুম না জানি কি বিপদ—তা—"

নলিন হাসিতে হাসিতে কহিল, "আজ ১লা এপ্রিল, না? তাই তোমাকে 'এপ্রিল ফুল' করা গেল! তা ওবেলা এখানে খেয়ো হে—আমার স্ত্রীর নিমন্ত্রণ!"

পরেশ। (হাসিয়া) "তা হলে 'ফুল'টা হোল কে? জানইত 'ডিনার' দেয় কারা, আর খায় কারা?

* * * *

সেদিন রাত্রে অন্যান্য কথার পর নলিন স্ত্রীকে বলিয়াছিল, "যাহোক বিষপানের অভিনয়টা তুমি যে রকম দক্ষতার সঙ্গে সম্পন্ন করেছিলে, তেমন আমাদের থিয়েটারের ষ্টেজেও কখনো দেখিনি!"

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

জন্মভূমি।

(পল্লি-ছবি)

ঐ যে গাঁটি যাচ্ছে দেখা আইরি ক্ষেতের আড়ে,—
প্রান্তটি যার আঁধার করা সবুজ কেয়া ঝাড়ে,
পূবের দিকে আম কাঁঠালের বাগান দিয়ে ঘেরা,
জটলা করে যাহার তলে পাড়ার বালকেরা;—
ঐটি আমার দেশ—আমার কাম্য স্বর্গপুরী,—
ঐখানেতে হৃদয় আমার সবটা গেছে চুরি।
বাঁশবাগানের পাশটি দিয়ে পাড়ার পথটি বাঁকা,
পথের ধারে গলাগলি সজ্‌নে গাছের শাখা,
গোরুর গাড়ীর চাকায় পথে শুকায় না ক কাদা,
কোথাও বা তার বেড়ার পাশে ঘুঁটে ছায়ের গাদা!
ঐটি আমার জন্মভূমি—সাধের স্বর্গপুরী,—
বিশ্বশোভা ঐখানেতে যত গেছে চুরি।
যত দেশের যত পাখী ঐ গাঁয়ে কি আছে!
ঝোপে ঝাড়ে বেড়ায় উড়ে বাসার কাছে কাছে;
পথের পাশে গাছের ডগা নুইয়ে পড়ে গায়ে,
চল্‌তে গেলেই শুক্‌নো পাতা গুঁড়োয় পায়ে পায়ে;
বনে ভরা এমনি ধারা আমার স্বর্গপুরী;—
তবু আমার হৃদয় চিত্ত সেথায় গেছে চুরি।
পদ্মদীঘি কোথায় পাব—পদ্ম নাইক মোটে;
চৈৎ বোশেখে শুকিয়ে ওঠে, জলটুকু না জোটে;
পানায়-মরা ডোবায় ভরা পিদ্ধি গাছে ছাওয়া,
ভাঁট-পিটুলির-জঙ্গলেতে হাঁপিয়ে ওঠে হাওয়া;
এমনি আমার স্বর্গছাড়া স্বর্গসেরাপুরী,—
জন্ম থেকে সেথায় আমার হৃদয় গেছে চুরি।
পাঠশালাটি নাইক গাঁয়ে, নাইক ডাকের ঘর,
বদ্যি সেথায় বড়ই কম্‌তি,—নাইক তবু জ্বর!
রাজার বাড়ী নাইক গাঁয়ে ধনীর দেবালয়,
লজ্জাহীনের লজ্জা নাইক, দারিদ্র্যে নাই ভয়;—
বিভব সম্পদহীন এমনি আমার স্বর্গপুরী,
সকল অভাব দৈন্য তবু সেথায় গেছে চুরি।
তবু ওঠে কুমোরপাড়ায় কদমতলার ধারে
সংকীর্ত্তনের মিলন ধ্বনি সান্ধ্য অন্ধকারে;
সবাই যেন স্বাধীন সুখী বাধা বাঁধনহারা,
আবাদ করে, সুবাদ করে বিবাদ করে তারা;—
এমনি আমার সাদাসিধে সাধের স্বর্গপুরী,—
তাইত সেথায় চিত্ত আমার সত্য গেছে চুরি।
শোভা বল স্বাস্থ্য বল আছে বা না আছে,
বুকটি তবু নেচে ওঠে এলে গাঁয়ের কাছে;
ঐখানেতে সকল শান্তি, আমার সকল সুখ,
বাপের স্নেহ, মায়ের আদর, প্রিয়ার হাসিমুখ;
তাইত আমার জন্মভূমি স্বর্গসেরাপুরী—
যেথায় আমার হৃদয়খানি সবটা গেছে চুরি।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী।

শনি ব্রত

বা

চট্টগ্রামের সান্ধ্য-সম্মিলন।

কেহ কেহ মনে করিতে পারেন ইভনিং পার্টি বা সান্ধ্য সম্মিলন প্রথা ভারতে ইংরেজের অনুকরণে সৃষ্ট নূতন জিনিষ; বস্তুতঃ ইহা ভারতের অনেক প্রাচীন সম্পত্তি। এদেশে যত উৎসব, যত ব্রত, যত আমোদ প্রমোদ প্রচলিত সাধারণতঃ সান্ধ্য সম্মিলনেই তাহার পর্য্যাপ্তি। কোন কোন স্থলে যদিও এইরূপ মিলন-উৎসব দিবসেও হইয়া থাকে কিন্তু চট্টগ্রামের শনিব্রত একটি প্রকৃত সান্ধ্য-সম্মিলন। এই ব্রত আদি যুগ হইতে এই অঞ্চলে প্রচলিত। ইংরেজ রাজত্বে শনি-বাসরীয় ছুটীর প্রথা থাকাতে ইহাতে মণিকাঞ্চনের যোগ হইয়াছে। শনিবারে আফিসাদির বন্ধ হয়—এই সময় বাড়ী গিয়া বন্ধু বান্ধবদিগকে লইয়া সান্ধ্য সম্মিলনে জলযোগ করা কত আমোদের তাহা ব্যক্তিমাত্রেই অনুভব করিতে পারেন। অনেক ঘরেই প্রতি শনিবারে এই পূজার অনুষ্ঠান হয়।

শ্রীবৎস রাজার উপর শনির কোপ মহাভারতের এক বিশেষ বর্ণনীয় বিষয়। পুজারম্ভে এই সম্বন্ধীয় যে পুস্তিকাখানি পাঠ করা হয় তাহার ভিন্ন ভিন্ন অংশ উদ্ধৃত করিয়া শনিব্রতের প্রণালী বুঝাইয়া দিব। গ্রন্থারম্ভে লিখিত হইতেছে—

"সরস্বতী পাদযুগে করি নমস্কার,
ভূমিগত হয়ে বন্দন জগত সংসার।
সিংহ বাহনে বন্দন উমা মহেশ্বর,
গরুড় বাহনে বন্দন গোলোক ঈশ্বর।

উক্তরূপ বন্দনার পর বর্ণন করা হইতেছে—

"পূর্ব্বে এক হরিনামে বৈদিক ব্রাহ্মণ;
সুশর্ম্মা নামেতে হৈল তাহার নন্দন।
দেশ দেশান্তর পঠি বিদ্যা হৈল তার,
তাহার রাশিতে শনি হৈল অধিকার।
দশা যোগে হৈল তার পিতার মরণ,
দেশে দেশে ভিক্ষা করি মাগয় ব্রাহ্মণ।
আর দিন গেল বিপ্র রাজার গোচর,
ন্যায়বান রাজা সেই চম্পক ঈশ্বর।
দয়া ধর্ম্মে দান কর্ম্মে সদা অকাতর,
তার সম রাজা নাহি পৃথিবী ভিতর।"

তৎপর দরিদ্র ব্রাহ্মণকে দেখিয়া রাজা তার পরিচয় লইলেন। ব্রাহ্মণ রাজার দয়া প্রাপ্তির আশায় অশ্রুপূর্ণ কাতর বচনে বলিলেন—

"বিদ্যা উপার্জ্জিনু আমি সুখের কারণ,
ললাটে লিখন দুঃখ না যায় খণ্ডন।
পণ্ডিত দেখিয়া দয়া জন্মিল রাজার,
পাঠশালা করাই দিল শিশু পড়াইবার।
এক বেলার তণ্ডুল রাখি শনৈশ্চরে হরে,
অন্নে বড় দুঃখ পায় সুশর্ম্মা দ্বিজবরে।"

এইরূপে ব্রাহ্মণকে কষ্ট দিয়া শনিদেব যে বিশেষ সন্তুষ্ট ছিলেন তাহাও নয়,—জগতে কাহাকেও কষ্ট দিয়া কেহ সুখী হইতে পারে না, বিশেষতঃ এ ক্ষেত্রে শনির একটা বিশেষ মতলবও ছিল। কথিত আছে অবশেষে শনিদেব উক্ত দরিদ্র ও কষ্ট নিষ্পেষিত ব্রাহ্মণ সন্নিধানে উপনীত হইয়া বলিলেন "তুমি আমা হইতে অভীষ্ট বর গ্রহণ করিয়া পৃথিবীতে আমার পূজা প্রচার কর'। এই কথার উত্তরে ব্রাহ্মণ বলিলেন "যদি বর দান করিবেন তবে এই বর দিন যেন আপনার দশা আমার উপর না থাকে।"

শনিদেব উত্তর করিলেন, আপনার রাশিতে দশ বৎসর আমার ভোগফল ছিল, এখন মাত্র আট বৎসর পূর্ণ হইয়াছে, আরও দুই বৎসর কাল আপনার উপর আমার দশার স্থিতিকাল, কিন্তু আপনি যদি আমার প্রস্তাবে সম্মত হন তবে এই দুই বৎসরের ভোগকাল দশদণ্ডের মধ্যে হরণ করিব। শনিবার সায়ংকালে ভাগীরথী সৈকতে সমাসীন হইয়া উক্ত দশদণ্ডকাল

বিশ্বপাতা বিধাতা নারায়ণের ধ্যান করিলে উক্ত দশা খণ্ডিত হইবে।

কিন্তু ব্রাহ্মণ গঙ্গাতীরে গিয়া আট দণ্ড জপ করিয়া জপ হইতে বিরত হইল। তখন—

"শনি বলে সাক্ষী হও প্রভু নারায়ণ
দেখ দুঃখ পায় দ্বিজ বিফল কারণ।
সূঁচ রন্ধ্রে দিতে পারি কুঠার গাঁথিয়া,
চলিলেন শনৈশ্চর আনন্দিত হৈয়া।
মিলিলেক গিয়া প্রভু চম্পক নগর,
পথেতে মিলিল দুই রাজার কুমার।"

তৎপরে শনিদেব ব্রাহ্মণের উরুতে রাজপুত্রদ্বয়ের মুণ্ড স্থাপন করিয়া রাখে, লোক জন রাজাকে গিয়া বলে,—

"তুমি যে রেখেছ রাজা ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ,
মন দিয়া শুন কহি তার বিবরণ,
তব দুই পুত্র বিপ্র খেয়েছে সত্বর,
দুই মুণ্ড রাখিয়াছে উরুর উপর।"

* * *

রাজার পাইয়া আজ্ঞা কোতোয়াল ধায়,
দ্বিজেরে বাঁধিয়া আনে রাজার সভায়।
"কাঁদে রাজা নরেশ্বর— কোথা গেল পুত্র মোর—
কিরূপে বঞ্চিব আমি ঘরে!
ললাট লিখন ছিল, দুই পুত্রে দ্বিজে খে'ল
বৃদ্ধকালে কে চাবে সংসারে?"

এদিকে কারাগারে ব্রাহ্মণ নানারূপ কষ্ট ভোগ করিয়া শনিদেবকে ডাকিতে লাগিলেন, শনি দর্শন দিয়া তাঁহার কারাদুঃখ বিমোচন করিলেন ও পুত্রশোকাকুল রাজাকে দর্শন দিয়া নবনীত সুকোমল পুত্রদ্বয় সমর্পণ করিলেন।

"অঙ্গে নাহি দেখে মাত্র দেখিলা রাজন,
হস্ত জোর করি রাজা করিলা স্তবন।"
"নমোনীলাঞ্জন বরপ্রক্ষ্যং রবিসুতো মহা গ্রহং
ছায়য়া গর্ভ সম্ভূতং বন্দ্যে ভক্ত্যা শনৈশ্চরম্।"
শনৈশ্চর দেখি রাজা হৈলা হরষিত,
প্রণাম করিলা রাজা লুটাইয়া ভূমিত।
শনি বলে বাক্য মোর শুনহ রাজন,
তোমার সম্মুখে দুঃখ পাইল ব্রাহ্মণ।
মর্ম্ম জানি যেবা মোর নাহি করে পূজা,
সর্ব্বনাশ করি তারে দিয়া নানা সাজা।
রাজা বলে কহ প্রভু কিরূপে সেবন?
কোন দ্রব্যে তুষ্ট হও, দয়ার নন্দন।
শনি বলে শুন রাজা পূজার বিধান
বিচারিয়া বলিলাম তোমার সদন।"

(পূজা প্রণালী)

"শিলাচক্র আনি তথা করিবে স্থাপন,
বিবিধ নৈবেদ্য আদি করিবে বরণ।
চক্রাভাবে ঘট তথা করি নিরূপণ
আমাকে আনিবে তথা করি আবাহন।—
"ইক্ষু তিল আদি রম্ভা মিষ্ট নারিকেল,
আম্র, কণ্টকী আর মধুফল বেল,"
সোয়া সের আটা আর সোয়া সের গুড়,
দধি দুগ্ধ ঘৃত চিনি তাম্বুল কর্পূর
প্রমাণের মত দ্রব্য আনিতে না পারে,
তথাপি করিবে সেবা ভক্তি অনুসারে"।

আধুনিক সান্ধ্য সমিতিতে শ্বেতাঙ্গদলের অনুকরণে চা ও বিসকুট্ মাত্র দেওয়া হয় আমাদের স্বদেশীয় সান্ধ্য সমিতিতে—তাহা অপেক্ষা কত উৎকৃষ্ট খাদ্য দ্রব্য দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছে তাহা পড়িয়া দেখুন। আটা খুব পুষ্টিকর খাদ্য, তা ছাড়া, দধি, দুগ্ধ ঘৃত, চিনি, আম্র, কণ্টকী, নারিকেল বেল সকলই উপাদেয় দ্রব্য। কলা ও নারিকেল এই দুইটী ফল এই সিন্নির এক বিশেষ অঙ্গীভূত উপাদান। জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় মাসে প্রচুর আম্র ও কাঁঠালের রস দিয়া এবং শীতকালে খর্জ্জুর রসের সহিত দধি দুগ্ধ আটা এবং পক্ক কদলী মিশ্রিত করিয়া এই মুখরোচক সিন্নি প্রস্তুত করা হয়। জলযোগের এই সুন্দর ব্যবস্থা আমার মতে আজ সমস্ত বঙ্গদেশে বিস্তৃত হওয়া উচিত।

তৎপর—পূজা-পদ্ধতি কেবল হইতেছে—

"যার যেই উপযুক্ত কহি বিবরণ,
আমা সেবা করিবেক একচিত্ত মন—।
আদি অন্ত এই কথা পাঞ্চালী পড়িয়া

পূজা দ্রব্য নিবেদিবে আমা উদ্দেশিয়া।
শনিবারে সন্ধ্যাবেলা পূজা নিরূপণ,
ইষ্টমিত্র বন্ধু জ্ঞাতি আইসে যতজন
অনাহুত যেই আসে করিবে স্থাপন,
পূজার প্রসাদ খেয়ে যাবে লোকজন।

* * * *

এইরূপে ভক্তি করি পূজে যেই ব্যক্তি,
গ্রহ দোষে তারে আমি করি অব্যাহতি।
ঐশ্বর্য্য অপার করি বাড়াই সম্পদ,
চিরকাল সুখে রাখি করি নিরাপদ।

* * * *

শনিবার ধনে জনে বৃদ্ধি হয় তার
এই মতে ধরণীতে পূজার প্রচার।"

দ্বিতীয় প্রবন্ধে এক সদাগরের কথা—

"বিজয় নগরে সাধু নামে শুদ্ধ-মতি—
বাণিজ্যেতে লভ্য নাহি দুঃখ পায় অতি।
সপ্ত পঞ্চ নৌকা লৈয়া বাণিজ্যেতে যায়—
থাকুক বাণিজ্য কার্য্য মূলেতে হারায়"॥

তৎপর এক বিপ্রকে শনিগ্রহের পূজা করিতে দেখিয়া—তাহা হইতে পূজাপ্রণালী সংগ্রহপূর্ব্বক সাধু নিজে যখন পূজা আরম্ভ করিল,—তখন শনি প্রভাবে চতুর্গুণ লাভ হইল। তৎপরে একদিন ভ্রমবশতঃ পূজা করিল না, সেইদিন আবার শনির কোপদৃষ্টিতে নিপতিত হইল।

"মত্তহস্তী প্রায় হৈল বহুলাভ পাইয়া;
না পূজেন শনিদেবে মনে পাশরিয়া।
শনি বলে "সদাগর, দর্প হৈল মনে,
কিছু শাস্তি দিয়া দর্প ভাঙ্গিমু এক্ষণে।
পূর্ব্বদিন রাজবাড়ী চোর কৈল চুরি,
পরদিন সাধু স্থানে বিক্রি কৈল ঝাড়ি।
শনি ক্রোধে সাধু দুঃখ পান অতিশয়
দুঃখ হেতু সদাগর ঝাড়ি কিনি লয়।"

* * * *

নিদারুণ কোতোয়াল রাজ-আজ্ঞা পাইয়া
হস্তপদ লৌহ দিয়া রাখিল বাঁধিয়া।"

তৎপরে শনিদেবকে উক্ত সওদাগর নানারূপ স্তুতি করিল।

"নিবেদন করি শুন গ্রহ শনিবর,—
নিগড় বন্ধন হৈতে মোরে রক্ষা কর।
ধনে প্রাণে প্রভু মোরে নেও নিজ ঘর,
সহস্র মুদ্রা আন্তি পূজা করিব তোমার।
"স্তবন শুনিয়া দেবে দয়া উপজিল,
নিদ্রাতে রাজারে গিয়া স্বপ্ন দেখাইল।
শুন শুন মহারাজ আমার বচন,
ঝাড়ি কিনি চোর হইল সাধুর নন্দন,
কলুকা প্রভাতে পুত্র না ছাড় আমার—
ছার খার হবে তব সমস্ত সংসার।

* * *

আমার স্বপ্নেতে রাজা যদি না দেও মন
সপ্তদিন মধ্যে রাজা হইবে নির্ধন।

তৎপরে স্বপ্নেতে নরনাথ চৈতন্য লাভ করিয়া নিগৃহীত সেই সওদাগরকে কারামুক্ত করতঃ তাঁহার সহিত মিত্রতা পাশে আবদ্ধ হইলেন এবং তাঁহা হইতে পূজার বিধি লইয়া শনিদেবের পূজা করিলেন ও পূজা প্রভাবে অতুল বিভবের অধিকারী হইলেন।

এই পূজা একদিকে স্বল্প ব্যয় সাপেক্ষ অন্যদিকে সমাজের নিম্নতর শ্রেণীর লোক হইতে উচ্চতম শ্রেণীর লোক পর্য্যন্ত এই শুভ মিলনকেন্দ্রে যোগ দিতে পারেন।

এই ব্রত স্থানে দেশের আপামর সর্ব্বসাধারণ মিলিয়া একত্রে উপবেশন করে। যখন, ব্রাহ্মণ নৈবেদ্য ও সিন্নি তৈয়ার করিতে থাকেন সেই অবসরে সমাগত লোকগণ নানারূপ আলাপের সুখে নিমগ্ন হন। তৎপরে পূজার পুঁথিপাঠ, ধূপ ধূনার সুগন্ধ, শঙ্খ ঘণ্টার ধ্বনি সমাগত ব্যক্তিদের প্রাণে একটী গভীরগম্ভীর ধর্ম্মভাব সঞ্চারিত করিতে থাকে।

সচরাচর দরিদ্র লোকেরা যেরূপে শনি-সেবা নির্ব্বাহ করে তাহাতে ৩।৪টাকার অধিক খরচ পড়েনা। অথচ ১০০।১৫০ লোক—কোন

কোন স্থলে ৩০০।৪০০ লোকও—তৃপ্তির সহিত প্রসাদ উপভোগ করে। এইরূপ সরল হৃদয়ের অকৃত্রিম প্রীতি প্রবাহিত উৎসবে একদিকে সমাজের উচ্চশ্রেণীর লোকের—সহিত নিম্নতম শ্রেণীর লোকের হৃদয় ভাবের আদান প্রদানের সুবিধা হয় অন্য দিকে বাড়ীতে বাড়ীতে মহিলাদের জন্যও সিন্নি প্রেরণে প্রত্যেক পরিবারের প্রীতিবন্ধন দৃঢ়ীভূত হয়। শনিপূজাতে কোন কোন সম্ভ্রান্ত ধনী লোক ৫০।৬০ টাকা হইতে ১০০।১৫০ টাকা পর্য্যন্ত ব্যয় করেন।

সিন্নি প্রদানের প্রণালীও অতীব সরল সুন্দর। গৃহস্থ দিনের বেলা কটোরার আকৃতি বিশিষ্ট পদ্মপত্র রাশি অথবা কদলী পত্রসমূহ সংগ্রহ করিয়া রাখেন। পদ্মপত্রের বাটীগুলি আর শিলাই করিতে হয় না। কদলী পত্রের বাটী তৈয়ার করিতে হইলে উহার চারি কোণায় খরিকা বিদ্ধ করিয়া দেওয়া হয়।

পূজার পরে উপস্থিত প্রত্যেক ধনী নির্ধন, বিদ্বান মূর্খ সকলের হাতে এইরূপ এক একটী পত্রকটোরা প্রদত্ত হয় এবং তাহাতে প্রথমতঃ কাটা আখ, নারিকেল কোরা, ছোলা বা মুগ ভিজা, তিলের লাড়ু, চিনি আম্র কাঁটাল প্রভৃতি ফল প্রদত্ত হয়।

সেই সমস্ত নিঃশেষিত হইলে সমুদ্রমথনে উত্থিত অমৃতের মত সিন্নি কাহাকেও দেড় পোয়া কাহাকেও অর্দ্ধসের করিয়া দেওয়া হয়।

সিন্নি প্রস্তুত প্রণালী।

প্রথমতঃ ৩০০।৪০০ কদলী ফলকে চালুনী দ্বারা তালের মাড়ের মত সংগ্রহ করা হয়। উক্ত কদলী মণ্ডে অতি সূক্ষ্ম তণ্ডুল চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া তাহাতে নারিকেল কোরা ও আম্র কাঁটালের রস, দুগ্ধ, দধি খর্জ্জুর রস, গুড় কিম্বা চিনি মিশান হয়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বাজারের মিষ্টান্ন কিম্বা চা বিস্কুটের ব্যবস্থা অপেক্ষা ইহা অনেক পরিমাণে উৎকৃষ্ট,—একদিকে সহজ লভ্য, অন্যদিকে তৃপ্তিকর খাদ্য। এই প্রসাদ ভক্তিভাবেই খাইতে হয়। ইহাতে আবার আরও এক সুন্দর ব্যবস্থা আছে,—

"সভায় খাইবে প্রসাদ, গৃহে নাহি নিবে"।

এই প্রসঙ্গে হিন্দু মুসলমানের এই মিলন দিনে সত্যপীরের সিন্নির কথা কিছু অলোচনা করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। হিন্দু কবিবর ভারতচন্দ্র সত্যপীরের বর্ণনায় লিখিয়াছেন—

দ্বিজ ক্ষৈত্র বৈশ্য শূদ্র কলি যুগে ক্রমে ক্ষুদ্র
যবনে করিতে বলবান,
ফকির শরীর ধরি, হরি হৈলা অবতরি,
একবৃক্ষ তলে কৈলা স্থান।
নম্রমান দাড়ি গোঁপ, গায়ে কাঁথা শিরে টোপ
হাতে আসা কাঁধে ঝোলে ঝুলি,
তেজঃপুঞ্জ যেন রবি, মুখেবাক্য পীরনবি
নমাজে দগার চুমে ধূলি।
বাহির কিরূপে হবে কারে বা কিরূপে কবে
ভাবেন বৃক্ষের তলে বসি,—
ঈশ্বর ইচ্ছায় কিন্তু বিপ্র এক নামে বিষ্ণু
সেইখানে উত্তরিলা আসি।
দ্বিজ বলে হরি বিনে পূজি নাহি অন্য জনে
কি বলে ফকির দুরাচারি!
ফকিরের অঙ্গে চায় অদ্ভুত দেখিতে পায়
শঙ্খচক্র গদাপদ্মধারী।

সম্ভ্রমে প্রণতি করি উঠি দেখে নাহি হরি
শূন্যে শুনে সিন্নি ইতিহাস !
ক্ষীর চিনি আটা কলা পানতুয়া—পুষ্পমালা,
মোকামে পীরের পায় বাস।
দ্বিজ আসি নিজালয়ে— আনি দ্রব্য সমুদয়ে
নিবেদন কৈল সত্যনামে ;
পূজার প্রসাদ গুণে ধন্য হৈলা ত্রিভুবনে
অন্তে গেলা শ্রীনিবাস ধামে।

এখন আমরা বলিতে চাহি এই চির-প্রচলিত পূজায় ভিতর কি কোন অর্থ নাই ! অবশ্যই আছে। ঐরূপে সত্যপীরের পূজা হিন্দুমুসলমানের মিলন উপায় মাত্র ! এই পূজাপদ্ধতি অবলম্বিত সান্ধ্যভোজে হিন্দুমুসলমানের মধ্যে সম্প্রীতি বর্দ্ধিত হইত।

আমি বলি, যাহা আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ হিন্দুমুসলমানের মিলনের কেন্দ্রীভূত উপায় ভাবিয়া স্থাপন করিয়াছিলেন তাহা এখন পরিত্যাগ করা কোনরূপেই কর্ত্তব্য নয়।

শ্রীশ্যামাচরণ—

মোক্ষের আভাস।

মনুষ্য মাত্রেই আমরা জানি বুঝি ও স্বীকার করি যে যার মনুষ্যত্ব আছে সেই মানুষ। মানুষের বিশেষত্বের নামই মনুষ্যত্ব। এখন মানুষের বিশেষত্ব কি ? না আত্মা। অতএব আত্মার যোগ বা মনুষ্যত্ব একই কথা। ইহাও আমরা জানি বুঝি ও স্বীকার করি কিন্তু এই যোগ বা ঐক্য যে কি জিনিষ ও তাহা কি ভাবে বর্ত্তমান সেটী সবাই পরিষ্কার জানি না।

শারীরিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক তিন অবস্থার যোগে মনুষ্য। যার নাম শরীর তারই নাম স্থূল, তারই নাম কার্য্য, যার নাম মন তারই নাম সূক্ষ্ম তারই নাম ভাব, যার নাম আত্মা তারই নাম কারণ তারই নাম প্রজ্ঞা বা জ্ঞান। যার শরীর নাই তার মনুষ্য নাম নাই, যার মন নাই তার আনন্দের বোধ নাই, যার প্রজ্ঞা বা জ্ঞান নাই তার সম্যক দৃষ্টি . পূর্ণধারণা বা আত্মার বোধ নাই। আমাদের যে অবস্থায় এই তিন ভাবের ক্রিয়া একযোগে ঘটে বা প্রকাশিত থাকে সেই অবস্থাতেই মনুষ্যত্ব বা আত্মা আমাদিগেতে প্রত্যক্ষ হন। যাহাতে এক অবস্থা আছে অপর অবস্থা নাই তাহা প্রকৃত আত্মার ভাব বা মনুষ্যত্ব নয় তাহা বিকৃতি বা বিকার।

ভাব কার্য্য বর্জ্জিত কারণ সম্বন্ধীয় বোধ বা জ্ঞান প্রকৃত জ্ঞান নহে—অজ্ঞানতা বা অহঙ্কার ; জ্ঞান কার্য্য বর্জ্জিত ভাব মায়া বা কল্পনা, জ্ঞান ভাব বর্জ্জিত কার্য্য মূঢ়তা বা পশুত্ব। জ্ঞান ভাব বর্জ্জিত কার্য্য যে মূঢ়তা বা পশুত্ব এটী আমরা সকলেই জানি বুঝি ও স্বীকার করি কিন্তু ভাব কার্য্য বর্জ্জিত জ্ঞান ও জ্ঞান কার্য্য বর্জ্জিত ভাব যে কি বস্তু তাহা যে কি দুর্গতি সেটী সবাই পরিষ্কার জানি না। যে জ্ঞানে দয়া নাই ও যে দয়ায় দুঃখ মোচন-রূপ ইচ্ছা, শক্তি, চেষ্টা বা উত্তম নাই সেই শক্তিশূন্য দয়ার ভাব ও জ্ঞানের বোধ বস্তুটা কি ? শক্তি নাই অথচ শক্তির ভাব অনুভব কেই অহঙ্কার বলে কি না ?

এই অহঙ্কাররূপ মোহ বা মূঢ়তা হইতে মুক্ত না হইলে মনুষ্যত্বরূপী-শক্তি বা আত্মা বা ভগবান লাভের কোন উপায় নাই এবং মনুষ্যত্ব-রূপী-শক্তি বা আত্মা বা ভগবান লাভ ব্যতীত যখন শান্তি আনন্দ ও কল্যাণের কোন সম্ভাবনা নাই তখন এই দুর্গতি হইতে উদ্ধারের জন্য আমাদের সকলেরই বিশেষ যত্নবান হওয়া কর্ত্তব্য—নতুবা দুঃখ অমঙ্গলের সীমা কোথায়?

এই মনুষ্যত্বের বিকাশ বা আত্মার প্রকাশই বুদ্ধের নির্ব্বাণ, যীশুখ্রীষ্টের পরিত্রাণ, সাংখ্যের কৈবল্য, বেদান্তের মুক্তি, ব্রাহ্মণের ব্রহ্মজ্ঞান, বৈষ্ণবের বৈকুণ্ঠপুরী। এই মনুষ্যত্বের উদ্বোধনই ইতিহাসের মূল তত্ত্ব। এই মনুষ্যত্বের বিকাশ বা আত্মার প্রকাশচেষ্টাই জগতের চিরন্তন সাধনা। এই মনুষ্যত্বের বিকাশেই সকল তাৎপর্য্যের মীমাংসা সকল ধর্ম্মের সমন্বয়। এই মনুষ্যত্বের বিকাশ বা আত্মার প্রকাশেই ভগবান প্রত্যক্ষ।

যিনি বা যাহা আছেন তিনি বা তাহা সর্ব্বাবস্থায়, সর্ব্বরূপে, সর্ব্বভাবে বর্ত্তমান আছেন, স্থূল অর্থাৎ কার্য্যরূপেও আছেন, কারণ অর্থাৎ বস্তু বা কর্ত্তারূপেও আছেন। যাহা নাই তাহা কোনভাবেই নাই। যাহা স্থূল অর্থাৎ কার্য্যে নাই তাহা সূক্ষ্ম অর্থাৎ শক্তিতে, কারণ অর্থাৎ বস্তু বা কর্ত্তাতেও নাই, তাহা মিথ্যা বা কল্পনা মায়া বা ভ্রান্তি।

যিনি বা যাহা জ্ঞানের দ্বারা আত্মারূপে অনুভূত তিনি বা তাহাই মনের দ্বারা ভাবরূপে ও ইন্দ্রিয়ের দ্বারা স্থূলরূপে অনুভূত। যে শক্তিতে এই সমষ্টি একীভূত তিনি বা তাহাই আকাশে তেজোরূপে প্রকাশিত মনুষ্যে চৈতন্যরূপে অনুভূত।

যাবতীয় সৃষ্টি এই তেজসূত্রে বাঁধা, যাবতীয় বোধ এই চৈতন্যসূত্রে গাঁথা, চৈতন্য বিনা বোধ নাই, তেজ বিনা সৃষ্টি নাই, সৃষ্টি বিনা মনুষ্য নাই, মনুষ্য বিনা মনুষ্যত্ব কোথায়? এই তেজের প্রকাশ বা অভিব্যক্তি বা আবির্ভাবের নামই জ্ঞান বা বোধ বা চৈতন্যের উদয়। আত্ম-চৈতন্যকে এই তেজোরূপে প্রত্যক্ষ করিয়া জগতের বা মনুষ্যজাতির আদিগুরু ঋষিগণ ইঁহাকে বরণ বা পূজা করিয়াছেন, ভারতের বা ভারতীয় সভ্যতার আদিম আচার্য্য ব্রাহ্মণগণ ইঁহাকে ধারণা বা ধ্যান করিয়াছেন। ঋষিগণের বরণীয়, ব্রাহ্মণগণের ধারণীয় এই প্রত্যক্ষ প্রকাশমান তেজই জীবমাত্রের মস্তিষ্কে ও হৃদয়ে শক্তিরূপে বিরাজমান। এই যোগ বা বোধ চেতনাতেই মনুষ্যের মনুষ্যত্ব ও সমষ্টির একত্ব বা ভগবানের পূর্ণত্ব মনুষ্যেতে অনুভূত। ইহাতেই ভগবান বা আত্মা বা বস্তু প্রত্যক্ষ। এই অনুভূতিই পরমপদ বা মোক্ষ।

এই মোক্ষই ভারতবর্ষের অক্ষয় সৌন্দর্য্য, এই মোক্ষই ভারতবাসীর অক্ষয় ঐশ্বর্য্য। জানিয়া না জানিয়া জগৎ ইহারই অপেক্ষা করিয়া আছে, বুঝিয়া না বুঝিয়া মনুষ্য ইহারই প্রতীক্ষা করিতেছে, ইহারই অভাবে জগতে এত দুঃখ মনুষ্যের এত যাতনা। ইহার ফলে ভারত মুক্ত, জীব আনন্দিত, জগৎ শান্তিময়।

শ্রীহেমলতা দেবী।

পরলোকগত সেনাপতি সুরেশ বিশ্বাস।

দক্ষিণ আমেরিকার রায়ও ডি জেনেইরো নগরে ব্রেজিল সাধারণ তন্ত্রের প্রসিদ্ধ সেনাপতি কর্ণেল সুরেশচন্দ্র বিশ্বাসের মৃত্যুসংবাদ আমরা এতদিন পরে পাইলাম। ১৯০৫ সালের ২২শে সেপ্টেম্বরে ৪৫ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়।

নদীয়া জেলার কৃষ্ণগঞ্জ থানার অন্তর্গত নাথপুর গ্রামের প্রসিদ্ধ বিশ্বাসবংশে ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা গিরীশচন্দ্র কলিকাতায় আগমন করিয়া, গবর্ণমেণ্টের অধীনে একটি কর্ম্ম পাইয়া এইখানেই বাস করিতে আরম্ভ করেন। গিরীশচন্দ্র এক্ষণে পরলোকগত। ভবানীপুরের এল, এম্, এস, কলেজের বোর্ডিংএ সুরেশ এণ্ট্রান্স পর্য্যন্ত পাঠ করিয়া ত্রয়োদশ বৎসর বয়সেই বিদ্যালয় ত্যাগ করেন। এই সময়ে তাঁহার জীবনে যে একটি মহান ঘটনা ঘটে—তাহার ফলেই বঙ্গদেশ চিরদিনের জন্ম সুরেশচন্দ্রকে হারাইল এবং সুরেশচন্দ্রের জীবনও বিচিত্র ও বীরত্ব-পূর্ণ হইয়া উঠিল। মিশনরি কলেজে পাঠারম্ভ করিয়া তাঁহার মনে খৃষ্টধর্ম্ম ও পাশ্চাত্য জীবনের প্রতি একটা প্রবল অনুরাগ জন্মিতে আরম্ভ হয়। পিতা ইহা জানিতে পারিয়া পুত্রকে সংশোধন করিবার জন্য প্রহার করিয়া বলেন "তুমি যদি স্বধর্ম্ম ত্যাগ কর, ত' আমিও তোমা'কে ত্যাগ করিব। কিন্তু উহাতে হিতে বিপরীত হইল। সুরেশচন্দ্রের পিতা স্নেহের দ্বারা পুত্রকে বশীভূত করিবার চেষ্টা না করিয়া এক মহা ভুল করিলেন। "বাপকা বেটা সিপাইকা ঘোড়া, কুছ নেই ত থোরা থোরা।" বাড়ী হইতে এই ব্যবহার পাইয়া বালক সুরেশচন্দ্র কলেজে আসিয়া খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। তাহার পরেও যদি তাঁহার পিতা তাঁহাকে গ্রহণ করিতেন, তাহা হইলেও হয়ত সুরেশচন্দ্রকে স্বদেশ হইতে চিরদিনের জন্ম নির্ব্বাসিত হইতে হইত না। কিন্তু হিন্দুত্বের অভিসম্পাৎই এই যে—একবার এ ধর্ম্ম ত্যাগ করিলে আর ইহাতে প্রবেশ করা যায় না। এই অল্পবয়সে আশ্রয়হীন হওয়ায়, সুরেশচন্দ্রকে নিজের জীবিকা উপার্জ্জন করিবার চেষ্টা করিতে হইল। অনেক চেষ্টার পর ইনি কলিকাতার এক হোটেলে একটি সামান্য কর্ম্ম লাভ করিলেন। এই সময়ে তাঁহার মাতা তাঁহাকে গোপনে সাহায্য করিতেন। কিন্তু এইরূপে সন্তুষ্টচিত্তে জীবনযাপন করা সুরেশচন্দ্রের ন্যায় ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব নহে। কিছুদিন পরে কলিকাতার কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া তিনি ভারতের নানা প্রদেশে ভ্রমণ করিয়া পঞ্চদশ বৎসর বয়সে ইংলণ্ডের একটি জাহাজের প্রধান খানসামার (Steward) কর্ম্ম লইয়া ইংলণ্ডে যাত্রা করিলেন। তিনি কয়মাস জাহাজে কর্ম্ম করিয়া যাহা কিছু উপার্জ্জন করিয়াছিলেন লণ্ডনে নামিয়া এক রাত্রেই কুসঙ্গের কুহকে পড়িয়া সমস্ত নষ্ট করিয়া ফেলিলেন। তারপর-দিন হইতেই তিনি আবার ভিখারী। কিন্তু সেখানে ভিক্ষা ভারতের ন্যায় সহজলভ্য নহে। অগত্যা কিছুদিন তাঁহাকে মুটে, ফিরিওয়ালা ইত্যাদি অনেক প্রকার কর্ম্ম করিয়া জীবনধারণ করিতে হইয়াছিল। অবশেষে তাঁহার দীক্ষাগুরু য়্যাশটন সাহেবের সাহায্যে লণ্ডনের পশুশালায় একটি সামান্য কর্ম্ম লাভ করিয়া কিছুকালের মধ্যেই অসাধারণ বুদ্ধি ও অধ্যবসায়ের ফলে তিনি তথাকার প্রধান তত্ত্বাবধারকের পদে উন্নীত হইলেন। এই কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিয়া তিনি বন্যপশু বশীকরণ বিদ্যায় এমন পারদর্শিতা লাভ করেন যে, কয়েক মাস পরেই তিনি সে কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া এক সার্কাসের নেতা হইয়া ইয়ুরোপ ভ্রমণে নির্গত হইলেন। তিনি ইয়ুরোপের সর্ব্বপ্রকার প্রচলিত ভাষায় অনর্গল কথোপকথন করিতে ও পত্র লিখিতে পারিতেন। ইয়ুরোপ ভ্রমণের পর তিনি তাঁহার সার্কাসের দল লইয়া দক্ষিণ আমেরিকা যাত্রা করেন। পথিমধ্যে তাঁহার বন্যপশুগণের অধিকাংশই মরিয়া যায়, রায়ও ডি জেনেইরো নগরে উপস্থিত হইয়া তাঁহার পশুক্রীড়ায় অর্থ উপার্জ্জনের আশাকল্পনা ত্যাগ করিতে হইল।



সেনাপতি সুরেশ বিশ্বাস ও তাঁহার পুত্রগণ

সেই সময়ে ব্রেজিল রাজ্যে ভয়ঙ্কর বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছিল। রাজপক্ষ ও সাধারণ তন্ত্রীগণের মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ চলিতেছিল। যুবা সুরেশের পক্ষে এরূপ সুযোগ অপরিহার্য্য। তিনি তৎক্ষণাৎ সামান্য সৈনিকের কর্ম্ম স্বীকার করিয়া সাধারণ-তন্ত্রীগণের সহিত যুদ্ধে যোগদান করিলেন এবং তাঁহার অসাধারণ প্রতিভা ও আত্মোৎসর্গের ফলে তিনি সামান্য সৈনিকের পদ হইতে ক্রমে সেনাপতির পদে উন্নীত হইলেন। ইহার পর তথায় এক ভদ্র মহিলার পাণিগ্রহণ করিয়া সম্মান ও সুখের সহিত কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

তাঁহার অসাধারণ বীরত্বের কথা তাঁহার পত্রাদিতে তিনি নিজে কিছু উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু তাঁহার একজন ব্রেজিলবাসী বন্ধু সুরেশচন্দ্রের পিতাকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে আমরা তাহার পরিচয় পাই। তাঁহার বন্ধু লিখিতেছেন—

"আপনার পুত্র—অবশ্য আপনি জানেন যে ব্রেজিল গবর্মেণ্টের অধীনে একজন সৈনিক ছিলেন। তিনি একটি পদাতিক দলের সেনাপতি পদে উন্নীত হইয়াছিলেন এবং এখনও সেই পদেই প্রতিষ্ঠিত আছেন। সম্প্রতি নিথেরয়ের যুদ্ধে তিনি অসাধারণ সাহস, আত্মোৎসর্গ ও বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। নিথেরয়ের যুদ্ধের সেই ভীষণ রাত্রে যখন নগর শত্রুগণ দ্বারা অবরুদ্ধ এবং অসংখ্য কামানের অগ্নি-বর্ষণে পীড়িত, সেই সময়ে আপনার পুত্রকে পঞ্চাশটি পদাতিক লইয়া সেই প্রবল শত্রুর গতিরোধ করিবার জন্য প্রেরণ করা হইল। শত্রুগণ অবিলম্বেই তাঁহাকে লক্ষ্য করিল এবং তৎক্ষণাৎ এক প্রশ্নস্বর আসিয়া তাঁহার কর্ণকুহরে আঘাত করিল—"কে ওখানে?" মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব না করিয়া সুরেশচন্দ্র উত্তর দিলেন—"সাধারণ তন্ত্রের বীর সেনা।" শত্রুর উত্তর আসিল—"আত্মসমর্পণ কর, নচেৎ মৃত্যু।" অসংখ্য শত্রুর সম্মুখে মুষ্টিমেয় সৈন্য লইয়া দণ্ডায়মান হইয়াও সুরেশচন্দ্রের বীরহৃদয় টলিল না। তিনি বীরভাবে উত্তর করিলেন—"সাধারণ-তন্ত্রের বীরসেনা আত্ম-সমর্পণ করে না।"

তৎক্ষণাৎ পশ্চাৎ ফিরিয়া আপনার পুত্র সুরেশচন্দ্র তাঁহার পঞ্চাশটি পদাতিককে সবেগে শত্রুর প্রতি ধাবিত হইতে আজ্ঞা প্রদান করিলেন। কিন্তু শত্রু-পক্ষ তাহাদের প্রতি গোলাবর্ষণ করিতে লাগিল। সেই অন্ধকার ও বিপদের মধ্যে মৃত্যুর সম্মুখে দাঁড়াইয়া নির্ভীক সুরেশচন্দ্র বলিলেন—"বন্ধুগণ, শত্রুর কামান আমাদের নিকটেই রহিয়াছে, এ কামানের গোলায় আমাদের কোন ক্ষতিই করিতে পারিবে না। প্রিয় ব্রেজিলের সন্তানগণের বীরহৃদয় জীবনদানে কুণ্ঠিত নহে, এবং আজ তোমরা দেখিবে—পবিত্র হিন্দুস্থানের সন্তান কিরূপে পাঁচ মিনিটের মধ্যে শত্রুর কামান সকল অনায়াসে অধিকার করিয়া লয়—প্রস্তুত হও।" কয়েকবার আনন্দধ্বনি করিয়া তিনি বলিলেন—"আমাকে অনুসরণ কর",—এবং প্রবলবেগে শত্রুর কামানের উপর গিয়া পড়িলেন। সেখানে উপস্থিত হইবামাত্র তিনি কামানগুলি অধিকার করিয়া লইলেন। তাহার পর রক্তস্রোত বহিল এবং নিথেরয়ের যুদ্ধে সুরেশচন্দ্র জয়ী হইলেন।" এই বীরত্ব ও আত্মোৎসর্গ দ্বারা তিনি সমগ্র মানব সমাজের মধ্যে স্বকীয় গৌরব প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু হায়! কেবল তাঁহার জন্মভূমি—এই হতভাগ্য বঙ্গদেশে তাঁহার স্থান হইল না! এই যুদ্ধ সম্বন্ধে তিনি নিজে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার গর্ব্বহীন বিনয়ের আমরা যথেষ্ট পরিচয় পাই। তিনি লিখিতেছেন—

"আপনার পত্র পাইয়া জানিলাম আমার সামরিক সাহস ও বীরত্বে আমার স্বদেশবাসী আনন্দিত হইয়াছেন। আমার পক্ষে বলিতে হইলে আমি যাহা করিয়াছি তাহাতে অসাধারণ কিছুই দেখিতে পাই না, কারণ আমার তদানীন্তন অবস্থায় ওরূপ আচরণ এতই স্বাভাবিক। আমি গত ৮ বৎসর সামরিক বিভাগে প্রবেশ করিয়াছি এবং এতাবৎকাল সামান্য সৈনিকের কর্ম্মই করিতেছিলাম। অনেক সময়েই আমার উন্নতির প্রস্তাব শুনিতে পাইতাম, কিন্তু বিদেশী বলিয়া আমার নাম কাটিয়া দেওয়া হইত। নিথেরয়ের যুদ্ধে আমি যে সেনাপতির অধীনে কর্ম্ম করিয়াছিলাম

তিনি অতি উদার ও গুণগ্রাহী। যুদ্ধকালে তিনি আমার যুদ্ধনীতি ও শত্রুর গোলার সম্মুখে নির্ভীক চিত্তে অগ্রসর হওয়ার কথা প্রধান সেনাপতিকে লেখেন ও আমি লেফ্‌টেনাণ্ট পদে উন্নীত হই। কিন্তু আপনারা যেন মনে করিবেন যে এ পদ আমি সহজে লাভ করিয়াছি।" এখান হইতে অনেক যুবা তাঁহার সৈন্য দলভুক্ত হইবার আকাঙ্ক্ষায় তাঁহাকে পত্র লিখিতেন। উত্তরে তিনি নিজের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া তাহাদিগকে নিরস্ত ও নিষেধ করিতেন। তাঁহার জীবনে যে তিনি কত দুঃখ ও দুর্দ্দশা ভোগ করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার একখানি পত্র হইতে আমরা বেশ বুঝিতে পারি। তিনি লিখিতেছেন—

"বাল্যকালের অনভিজ্ঞতা বশতঃ আমার কঠোর সংসারের কোন ধারণাই ছিল না। তখন মনে করিতাম এ সংসারে বুঝি সবই সহজ লভ্য। আজ এই পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়া, এই বেদনাপীড়িত অন্তর এবং অভিজ্ঞতা পূর্ণ মস্তিষ্ক লইয়া, আমি আর কাহাকেও আমার পথের অনুসরণ করিতে বলি না। কিন্তু অন্তরে যার বাসনার দাবাগ্নি জ্বলিয়া উঠে, তাহার পক্ষে নিশ্চেষ্ট থাকা অসম্ভব। আমার নিজের সম্বন্ধে এই পর্য্যন্ত বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে এজীবনে অনেক-দিন আমি অপরিসীম দুঃখে অতিবাহিত করিয়াছি। বহুদিন বিদেশে ক্ষুধাতৃষ্ণা ও শীতে কাতর হইয়া নিরাশ্রয় ও নিঃসম্বল অবস্থায় পথে পথে ঘুরিয়াছি। অনেকবার আত্মহত্যা করিবার কল্পনা করিয়াছি। মনের এইরূপ শোচনীয় অবস্থা হইলে সমুদ্রতীরে বা পর্ব্বত চূড়ায় ভ্রমণ করিতে যাইতাম। সেখান হইতে দিগন্তের প্রতি চাহিয়া আমি সর্ব্বসময়েই আকাশের গাত্রে ধবল রেখা দেখিতে পাইতাম এবং অন্তরে সাহস ও আশা লাভ করিতাম।"

সুরেশচন্দ্রের মাতৃভক্তি কিরূপ প্রবল ছিল তাহা আমরা তাঁহার পত্র হইতে বুঝিতে পারি। তিনি তাঁহার খুল্লতাতকে লিখিয়াছিলেন—

"আমি কপর্দ্দকহীন অবস্থায় বাটী হইতে বাহির হইয়াছিলাম। প্রায় উলঙ্গ অবস্থায় বাটী ত্যাগ করিয়া-ছিলাম। আমার মনে প্রবল ইচ্ছা ছিল যে আমার জননীর শিরোদেশ হীরকহারে মণ্ডিত করিয়া দিব। যদি তিনি জীবিত থাকিতেন, আমি এতদিনে সে সাধ পূর্ণ করিতাম। কিন্তু বিধাতার ইচ্ছা অন্যরূপ হইল—আমি এজীবনে আর আমার জননীর স্নেহ মুখ দেখিতে পাইব না।"

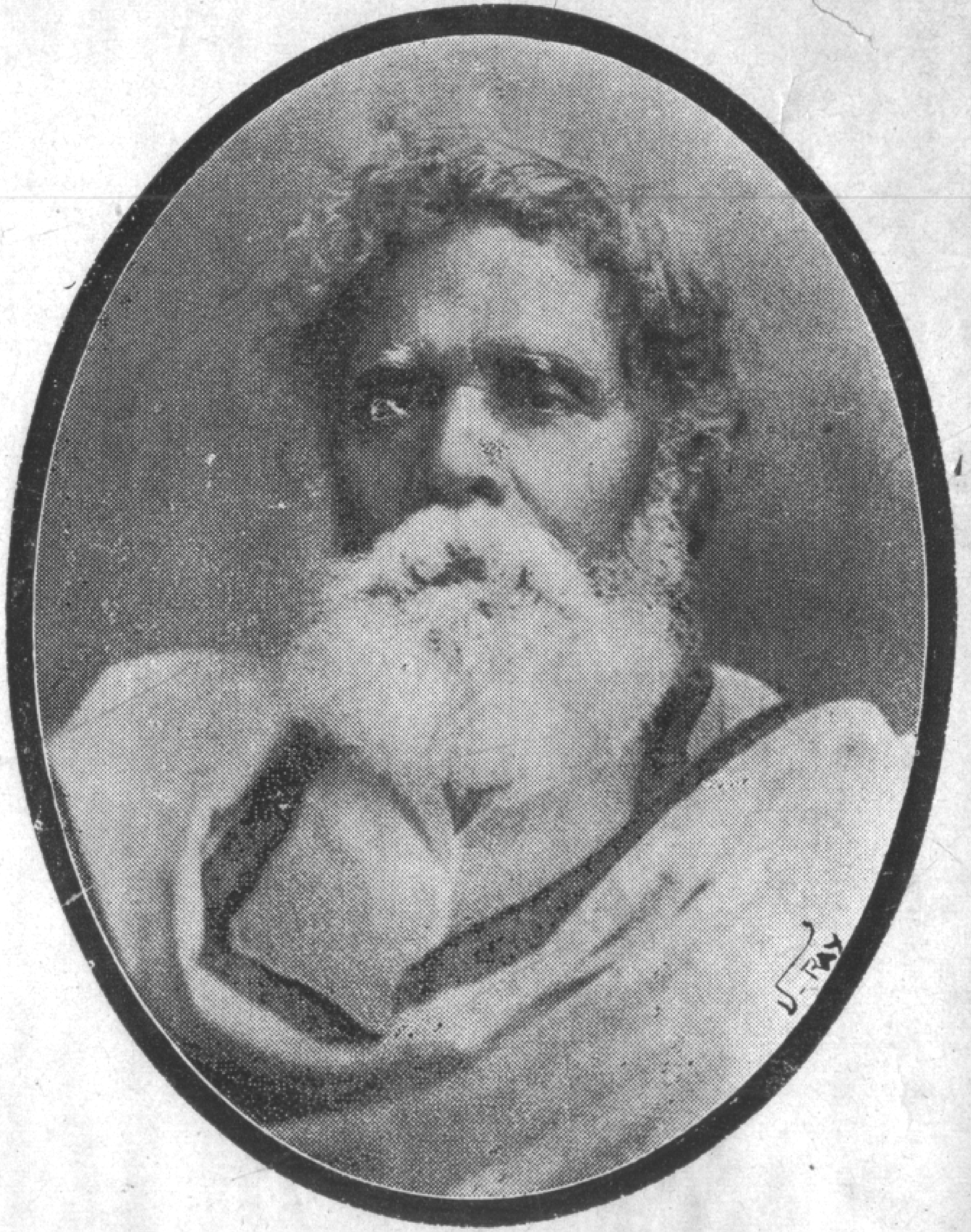
আর এক পত্রে তিনি লিখিতেছেন—

"আমি এ সংসারে চিরদিন একাই ছিলাম এবং আজিও একাই দাঁড়াইয়া আছি। আমার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমি চিরদিনই উদাসীন। হায় বিধাতার অনন্ত রাজ্য মধ্যে স্নেহময়ী জননী প্রকৃতির শোভা সন্দর্শন করিয়া একাকী স্বাধীনভাবে ভ্রমণ করাই আমার জীবনের চরম সুখ। যথার্থ বন্ধুত্ব ও প্রেম এ জগতে নাই; সেইজন্যই ঋষিগণ বলেন এ সংসারে জীবনযাপন করা অর্থে অপর লোকে নবজীবন গঠন করা মাত্র। আমি আমার সেই নবজীবন সৃষ্টি করিতেছি, এবং একদিন সেই স্থানে যাইয়া উপস্থিত হইব, যেখানে আমার সেই চিরপ্রিয় জননীর স্নেহমুখ দেখিতে পাইব। এ সংসারে একমাত্র জননীই আমাকে আন্তরিক স্নেহ করিতেন।"

জননীর মৃত্যু সংবাদ পাইয়া তিনি লিখিয়াছিলেন—

"পিতৃদেব আমাকে কলিকাতায় যাইয়া সকলের সহিত সাক্ষাৎ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। দুঃখের বিষয় আমি তাহা করিতে অক্ষম—কারণ মাতৃহীন কলিকাতায় আমার আর কোন আকর্ষণই নাই। যাঁহাকে আমি চিরদিন ভাল বাসিতাম এবং বাসি এবং যিনি আমাকে চিরদিন স্নেহ করিতেন ও করিবেন—তিনি আর তথায় নাই। এখন আমি স্বর্গের দ্বারে আমার জননীর সহিত যুক্ত হইবার জন্য অপেক্ষা করিয়া দিনপাত করিব। মাতা সেখানে আমার জন্য অপেক্ষা করিয়া আছেন।"

তিনি তাঁহার নিজের একটি জীবনী লিখিয়া যাইবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ তিনি তাহা সম্পন্ন করিতে সক্ষম হন নাই। এরূপ প্রতিভাবান ব্যক্তির বিচিত্র জীবনী কেবল যে আমাদের আদরের ও গৌরবের সামগ্রী হইত তাহা নহে, তাহাতে আমাদের অনেক চিন্তার ও শিক্ষার বিষয়ও থাকিত সন্দেহ নাই।




রাজনারায়ণ বসু ও তাঁহার পত্নী

পাদ্‌শা।

(ফেলিসিয়াঁ শ্যালের ফরাসী হইতে। বোম্বাই, ৮-২৩ জানুয়ারী ১৯০০)

ভারতবর্ষের পার্সিরাই য়ুরোপ ও এসিয়ার প্রকৃত মধ্যস্থপদের একমাত্র অধিকারী। আসলে উহারা প্রাচ্যদেশীয়—কেননা, বিজেতা মুসলমানকর্ত্তৃক যে সকল পারসীক পারস্তদেশ হইতে দূরীভূত হয় উহারা তাহাদেরই বংশোদ্ভূত,—কিন্তু এখন উহারা অন্য ভারতবাসী অপেক্ষা সমধিক য়ুরোপীয় ভাবাপন্ন।

শিল্পবাণিজ্যে, বুদ্ধিবিদ্যায়, সামাজিক অবস্থায়, উহারা খুব উচ্চ আসন অধিকার করিয়া আছে। বোম্বাই নগরের প্রধান প্রধান কাপড়ের কলকারখানা উহাদেরই। তত্রত্য প্রধান প্রধান ব্যাঙ্কের উহারাই কর্ত্তা। উহাদের মধ্যে অনেকেই 'স্বাধীন' ব্যবসায়ে নিযুক্ত। আবার অনেকগুলি লোক রাষ্ট্রনৈতিক কার্য্যে উদ্যমের সহিত ব্যাপৃত।

পার্সিদিগের মধ্যে, শতকরা ২২ জন পুরুষ ও শতকরা ৫০ জন রমণী অনক্ষর, পক্ষান্তরে হিন্দুদের মধ্যে শতকরা ৯০ জন পুরুষ, ও শতকরা ১০০ জন রমণী অনক্ষর; এবং মুসলমানদিগের মধ্যে শতকরা ৯৩ জন পুরুষ ও শতকরা ১০০ জন রমণী অনক্ষর। একটা লক্ষ্য করা যায়,—পার্সিদের মধ্যে প্রায় অর্দ্ধাংশ রমণী কিছু না কিছু শিক্ষালাভ করিয়া থাকে। যুবকদিগের মধ্যে অনেকেই শুধু ইংরাজি শিক্ষা নহে—প্রভূত পরিমাণে য়ুরোপীয় শিক্ষাও লাভ করিয়া থাকে। অনেকেই ফরাসী ভাষায় কথা কহিতে পারে; বোম্বাই-নগরে, "Cercle litteraire franco-parsi" নামে একটা ফরাসী-পার্সি সাহিত্যিক মণ্ডলী আছে।

সচরাচর, পুরুষেরা য়ুরোপীয় ধরণে পোষাক পরে; কিন্তু প্রায় সকলেই উহাদের পুরাতন শিরোবেষ্টন—একপ্রকার কালো ধুচুনী-টুপী—বজায় রাখিয়াছে। রমণীরা তাহাদের পুরাতন পরিচ্ছদ পরিধান করে;—পরিচ্ছদটি বড়ই শোভন। একটা দীর্ঘ স্বচ্ছ রেশমি অবগুণ্ঠন খোঁপা হইতে কাঁধ পর্য্যন্ত আসিয়া পড়ে, উহার দ্বারা সমস্ত শরীর আবৃত হয়, ও ঘাগ্‌রার আকার ধারণ করে। উহাদের ঘর-বাড়ী একেবারেই পাশ্চাত্য ধরণের এবং উহারা পাশ্চাত্যধরণেই জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে। উহারা বেশ অন্তরের সহিত য়ুরোপীদিগকে গৃহে আহ্বান করে। বোম্বাই নগরে পার্সিদের এইরূপ কতকগুলি জাঁকাল নিমন্ত্রণ-মজ্‌লিসে আমি উপস্থিত ছিলাম:—বড় বড় বৈঠকখানা, সুরভিত ও আলোকিত উদ্যান, উৎকৃষ্ট সঙ্গীত, বৃহৎ ভোজের আয়োজন, বিচিত্র লোকের সমাগম! সচরাচর কোর্ত্তা-পরা কিংবা উর্দ্দি-পরা ইংরাজ রাজপুরুষ; স্বচ্ছ সাজসজ্জায় ভূষিত পার্সি মহিলা; হীরক-ভূষিত-অঙ্গুলি হিন্দুমহিলা; মাথায় পাগ্‌ড়ী-পরা সকল ধর্ম্মাবলম্বী দেশীয় লোক; য়ুরোপীয় ধরণে অর্দ্ধবক্ষ অনাবৃত,সুশুভ্র-গাউন-পরা, সুশ্যামল-স্কন্ধ পার্সি নবযুবতীদিগের বাহু ধারণ করিয়া, জেসুইট্‌ বাবাজিরা পায়চালি করিতেছেন...তাহাদের কথাবার্ত্তা অতি আধুনিক ধরণের; একটি রূপসী পার্সি-

মহিলা আমাকে বলিলেন, তিনি নর্‌ওয়ে হইতে সম্প্রতি প্রত্যাগত হইয়াছেন; তিনি নিশীথ-সূর্য্য দেখিবার জন্য সেখানে গিয়াছিলেন। আর একটি মহিলা আমাকে বলিলেন, তিনি সঙ্গীত লইয়া খুব ব্যাপৃত থাকেন; সর্ব্বাপেক্ষা (Gounod) গুনোর সাঙ্গীতিক রচনা তাঁহার ভাল লাগে। একটি রূপসী পার্সি ললনা যিনি দুই বৎসর ধরিয়া প্যারিসে চিত্রবিদ্যা শিক্ষা করিয়াছেন, তিনি আমাকে একটা কোণে টানিয়া লইয়া খুব মৃদুস্বরে বলিলেন! "Jaures ও Dreyfus-এর সমস্ত ব্যাপার আমাকে বলুন দেখি!"...

পার্সিদের মধ্যে অনেকেই ধর্ম্মসম্বন্ধে উদাসীন হইলেও, তাহাদের প্রাচীন অন্ত্যেষ্টি অনুষ্ঠানটা তাহারা ঠিক বজায় রাখিয়াছে; উহাদের মৃতদিগকে উহারা গোরও দেয় না, দাহও করে না;—শকুনী ও কাকের মুখে নিক্ষেপ করে। বোম্বায়ের যেটি সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর স্থান সেই ম্যালাবার-হিলের সন্নিকটে, একটি সুন্দর উদ্যানের মধ্যে কতকগুলি উচ্চ স্তূপ উঠিয়াছে,—সেইগুলিই "নিস্তব্ধতার স্তূপ"; দূর হইতে দেখা যায়, উহার উপরে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শকুনী বসিয়া আছে; ঐ খানেই পার্সিরা উহাদের শবদিগকে ফেলিয়া রাখে; শকুনীরা শীঘ্রই তাহাদের কাজ শেষ করে, বোধ হয়, পোয়া ঘণ্টারও কম সময়ের মধ্যে, উহাদের কঙ্কাল ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। একটি পার্সিযুবক আমাকে একদিন আমাকে বলিয়াছিলেন:—তোমাদের মৃতদিগকে তোমরা যে কৃমিদিগের উদরসাৎ করাও—এ পদ্ধতিটা আমাদের নিকট অতীব জঘন্য বলিয়া মনে হয়।..."

এই বোম্বাই-পার্সিদিগের মধ্যে একটি লোক আমি আবিষ্কার করিয়াছি; ইনি যেমন বুদ্ধিমান, তেমনি সহৃদয়;—মানবজাতির একটি উৎকৃষ্ট আদর্শ; ইহাঁর নাম পাদ্‌শা।

ইনি জাতিতে পার্সি; ইনি ইংরাজিধরণে শিক্ষিত। ইনি ইংলণ্ড ও ফ্রান্‌সে ভ্রমণ করিয়াছেন। ইংরাজ উদারনৈতিক দলের মধ্যে ইহার অনেকগুলি বন্ধু আছে। বোম্বাই নগরে সুশিক্ষিত দেশীয় যুবকদিগের একটি অতীব মনোরম সম্মিলনী আছে, সেই সম্মিলনী-সভায় তিনি সর্ব্বদাই যাতায়াত করেন। তাঁহার বাড়ীতে, কতকগুলি হিন্দুর সহিত, কতকগুলি পার্সির সহিত, এবং দুই জন উচ্চশ্রেণীয় মুসলমান-মহিলার সহিত আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। এই দুই মুসলমান মহিলা সর্ব্বপ্রথমে লোক-সমাজে পরপুরুষের সমক্ষে অনবগুণ্ঠিত হইয়া বাহির হইয়াছেন। উহাদের মধ্যে একজন স্বীকার করিলেন, তাহাদের এই প্রাচীন প্রথা ভঙ্গ করিতে কেমন একপ্রকার কষ্ট হয়, কেবল তাঁহার স্বামীর অনুনয়ক্রমেই এই কাজে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, নচেৎ পুরুষ-সমাজে তাঁহারা এখনও সহজভাবে বিচরণ করিতে পারেন না, কেমন বাধো-বাধো ঠেকে; I do not feel at home...

বোম্বায়ের একজন প্রধান শ্রমশিল্প-নায়ক, বড় বড় তুলার কলকারখানার মালিক,—তাতা, তাঁহারই সেক্রেটারি—পাদ্‌শা। ইনি এই নবজাত শ্রমশিল্পের কাজ খুব উদ্যমের সহিত ও বুদ্ধির সহিত চালাইতেছেন। এমন কি, নিয়মিতরূপে কাজ করিতে মজুরদিগকে বাধ্য করিয়া, উহাদের খাটুনীর দিনের দীর্ঘতা কমাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু

মজুরেরা ধর্ম্মঘট করিয়াছে; তারা সমস্ত দিনের মধ্যে অনেকক্ষণ ধরিয়া কাজ করিতে চাহে, কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যে বেশী খাটিতে চাহে না!

পাদ্‌শার কার্য্যোদ্যম শুধু তাঁহার নিজের ব্যবসাতেই সীমাবদ্ধ নহে। তিনিও একটি নব্যভারত গঠন করিবার জন্য সচেষ্ট। তাঁহার মতে, একটা ধর্ম্মবিপ্লবের দ্বারা (যাহা ততটা সম্ভব নহে) কিংবা রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলনের দ্বারা (যাহা ততটা গভীর নহে) এই সমস্যার সমাধান হইবে না, পরন্তু বিদ্যা-শিক্ষা ও জ্ঞানোপদেশের দ্বারা সমস্ত লোকের মন যখন রূপান্তরিত হইবে তখনই এই সমস্যার সমাধান হইবে। সুশিক্ষার দ্বারাই জাতীয় ভাব উদ্বোধিত হইবে। বিদ্যাশিক্ষার দ্বারাই কতকগুলি বাছাবাছা পণ্ডিত, বাছাবাছা শ্রমশিল্পনায়ক, বাছাবাছা রাজ্যশাসনকর্ত্তা তৈয়ারী হইবে; তখন ইংলণ্ড বাধ্য হইয়া তাহাদিগকে কাজে নিযুক্ত করিবে। পাদ্‌শা একটী দেশীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগে ব্যাপৃত আছেন—সেই বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দু-দিগকে সর্ব্বপ্রকার উচ্চশিক্ষা দেওয়া হইবে।

পাদ্‌শার কার্য্যকরী বুদ্ধি অপেক্ষাও আর একটা জিনিসের জন্য পাদ্‌শার উপর আমার ভক্তি হয়—তাঁহার দয়ার জন্য। সে দয়া স্মিতহাস্যময়ী, প্রশ্রয়দায়িনী, সৎসাহস ব্যঞ্জনী—সে দয়া বাস্তবিকই সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ। পশুপূজা তাঁহার ধর্ম্মের অঙ্গ নহে; কিন্তু নিজ ধর্ম্মের দ্বারা বাধ্য না হইলেও, পশুদিগের প্রতি তিনি নৈতিকভাবে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া থাকেন—সে শ্রদ্ধা কতকটা হিন্দু ও বৌদ্ধদিগের পশুপূজার কাছাকাছি। পশুদিগকে কষ্ট দিবার কোন অধিকার মানুষের নাই,—নিজের কাজে খাটাইবারও কোন অধিকার নাই। পাদ্‌শা একজন খাঁটি নিরামিষাশী; তাঁহার সমস্ত পরিচ্ছদ উদ্ভিদ পদার্থে নির্ম্মিত; তাঁহার জুতা রবারের,—জুতার তলাটা কাঠের। তাঁহার ভগিনী—সৌম্যদর্শন ও সুশীলা; বোম্বায়ের উচ্চতম সমাজে তিনি যাতায়াত করেন; পাদ্‌শার মতে দীক্ষিত হইয়া তিনিও পাদশার ন্যায় হাস্যজনক ভারী জুতা—ধর্ম্মবুদ্ধির খাতিরে—প্রতিদিন পরিয়া থাকেন। দৈনিক জীবনের এই বীরত্বের দৃষ্টান্ত কি অতীব বিরল নহে? গাড়ী টানাইবার জন্য কিংবা বহনের জন্যও তিনি পশুদিগকে খাটাইতে চাহেন না। যন্ত্রচালিত কোন যান না পাইলে তিনি পদব্রজেই যাতায়াত করেন। তিনি হাসিতে হাসিতে আমাকে বলিলেন, প্যারিসে ঘোড়ার ছক্কর গাড়ী কিংবা অম্‌নিবাস্ গাড়ী ব্যবহার করিতেন না বলিয়া, বাধ্য হইয়া তাঁহাকে পায়ে হাঁটিয়া অনেক দূর যাতায়াত করিতে হইত।

আমি পাদ্‌শাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, মানুষের দুঃখ যন্ত্রণা লাঘব করিবার কাজ যখন এত পড়িয়া আছে তখন পশুর দুঃখ লাঘব করিবার কাজে ব্যাপৃত থাকিবার কাহারও অধিকার আছে কি না? মানুষের দুঃখ নাশ করাই মানুষের প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম—য়ুরোপের সোশ্যালিষ্ট ও অ্যানার্কিষ্ট-সম্প্রদায়ের এই যে মত, এই মতের তিনি কি অনুমোদন করেন না? পাদ্‌শা উত্তর করিলেন,—"বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে থাকিয়া লোকের কর্ত্তব্য বিভিন্ন হইয়া থাকে; ভারতে আমাদের

রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতা না থাকায়, মানব-দুঃখ নিবারণের অমোঘ উপায় আমাদের হাতে নাই; তাই, পশুদিগের দুঃখ নিবারণে ব্যাপৃত থাকাই আমাদের পক্ষে শ্রেয়। তা ছাড়া, মানুষ অপেক্ষা পশুরাই বেশী দয়ার পাত্র। কষ্ট পাইলে মানুষ তাহা কথায় প্রকাশ করিতে পারে; বেশী কষ্ট পাইলে আত্মহত্যাও করিতে পারে। পশুরা আত্মহত্যাও করিতে পারে না—মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতেও পারে না। এইজন্যই মানুষের চেয়ে পশুর উপরেই আমার বেশী দয়া হয়।”......

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পাকচক্র।

তৃতীয় দৃশ্য।

গৃহের এক দিকে একখানি আসন পাতা; তাহার নিকট একটি কাঁসার গ্লাস ও দুই তিন খানি মাটির খুরি সজ্জিত। অন্যদিকে তিন খানা কাঁসার থালা ও মিষ্টান্নের ঝুড়ি ইত্যাদি লইয়া শশী ও বরদা থালায় মিষ্টান্ন সাজাইতে বসিয়াছেন।

বরু। থালে অত ক'রে ক'রে মিষ্টি দিচ্ছিস্, গিন্নি নিশ্চয় আমাকে দুষবে—

শশী। মাগো—পাকা দেখতে আস্‌বে—একটু পাত সাজিয়ে না দিলে চলবে কেন? বাড়ীর যাতে নিন্দে হবে—এমন কাজ আমা দ্বারা হবে না—তা যাই বল।

বরু। তবে চপপট হাত চালিয়ে নে—ঐ আস্‌ছে রে।

শ। সত্যি নাকি?

(শশীর তাড়াতাড়ি তাহার থালা হইতে কতকগুলো মিষ্টান্ন ঝুড়িতে নিক্ষেপণ। গিন্নির প্রবেশ ও মিষ্টান্নের থালার প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া)

গি। বলি ও ঠাকুর ঝি? করেছ কি? দু দুটো করে সন্দেশ—দু দুটো পান্তুয়া—দু দুটো মেঠাই,—মানুষে কি অত খেতে পারে?

বরু। পারুক না পারুক আজকের দিনে একটু পাত সাজাতে হয়।

গি। তা শশী কি সাজায় নি—দেখ দেখি, ও কেমন দিয়েছে।

ব। আচ্ছা আমিও কিছু কিছু তুলে নিচ্ছি। তুমি যাও—তাঁকে একলা ফেলে আসাটা ভাল দেখায় না। পাত সাজান হলেই আমরা ডাকব।—

গি। তা যেন ডাকবে! কিন্তু আগে যদি একবার না আসতুম তাহলে যে সর্ব্বনাশ হোয়েছিল! তাকে এখানে আনলে ত আর মিষ্টি ওঠাতে পারতুম না।

ব। তা যাও যাও—এই দেখ তুলে রাখছি—এবার হোল ত—এখন তাকে গিয়ে নিয়ে এস।

গি। তা যাচ্ছি। দেখ্ বাছা শশি—বরু ঠাকুরঝি যেন আর বেশী করে মিষ্টি না দেয়।

শ। সে কথা বল্‌তে হবে না; আমার দেহে যতক্ষণ প্রাণ আছে তোমার কোন

দ্রব্যি অপচয় হবে না; তুমি যাও মা আমি আছি—একটুও ভাবনা কোরো না।

গি। তোকে পেয়েই ত আমি নিশ্চিন্ত আছি, শীগ্র গোছ করে ফেল—

শ। এই এক্ষণি আমি সব ঠিক করে ফেলেই তোমাকে খবর পাঠাচ্ছি,—তুমি যাও মা,—ঠাকরুণটি একলা আছেন।

গি। তা যাচ্ছি। পাঁপড় কিন্তু অত করে দিসনে—বুঝলি ত? (প্রস্থান)

বরু। আচ্ছা মেয়ে যাহোক! তুই সব পারিস্?

শ। এ রকম না হলে কি চলে পিসি? যে যাতে বোঝে তাকে সেই রকম করে বোঝাতে হয়। এখন চটপট সব ঠিক করে ফেলা যাক,—কথার বড় সময় নেই। হয়েছে—এইবার থালা দুখানা আমার হাতে তুলে দাও আমি বাইরে দিয়ে আসি।

(থালা লইয়া প্রস্থান)

(বরদা হাসিতে হাসিতে অন্য থালাখানি সাজাইতে আরম্ভ করিয়া)

"ভ্যাল্লা মেয়ে যাহক! বৌকে এক হাতে কেনে এক হাতে বেচে! তা যেমন কুকুর—তেমনি মুগুর না হলে চলেও না বটে! এমন না হলে কি এ বাড়ীতে টিঁকতে পারত!

(গিন্নির প্রবেশ।)

"কই গো এখনো হ'ল না।"—

বরু। এবার জল দিলেই হয়।

(গ্লাসে জলপ্রদান)

গি। পাঁপড় ভেঙ্গে তুলে রেখেছ ত? কই তেমনিই ত আছে দেখছি,—আমি মনে জানতুম—ভাঙ্গবে না,—ভাঙ্গ ভাঙ্গ,—পাঁপড় কি কেউ কখনো অত করে দেয়! শশী গেল কোথায়!

বরু। বাইরের থালা গুলো দিতে গেছে। তা পাঁপড় ত সেই দিয়ে গেছে—বেশী আর কি? আধখানা বইত না।—

গি। সে দিয়ে গেছে, বল্লেই হোল!—যাহক এখন তাজন ভজনের সময় নয়—অর্দ্ধেকটা ভেঙ্গে রাখ।

(আধখানা পাঁপড় ভাঙ্গিবামাত্র তাহার নীচে দুই রকম সন্দেশ দেখিয়া)

গি। "করেছ কি? রসগোল্লা পান্তয়া আবার দু দু রকম সন্দেশ? দু দু রকম মেঠাই? একটা করে রাখ দেখি;—এই যে শশি—শশি তুই একদণ্ড কোথাও গেলে আমার চলে না। দেখিছিস্; ঠাকুর ঝি কি কাণ্ড করে বসেছে—আবার বলে কিনা শশি করেছে!

শ। (হাসিয়া) সত্যি নাকি? বরু পিসি—তোমরা দেখছি আস্ত মানুষকে ভেড়া বানাতে পার? মাগো ধন্যি? তা বলুকগে মা,—তুমি যাও, তাঁকে আনগে আমি সব ঠিক করে দিচ্ছি।

গি। দেখ্—অত রকম মিষ্টি আছে—সব এক একটা করে দেবার দরকার নেই—দুট চারটে কমিয়ে দিস্—বুঝলি ত?

শ। ঠিক বলেছ। মানুষ ত আর সত্যি রাক্ষস নয় যে অত খাবে। তুমি নিয়ে এসগে।—

(গিন্নির প্রস্থান।)

বরু। ধন্যি তুমি!!

(কনের পিসিঠাকুরাণীকে লইয়া গৃহিণীর প্রবেশ।)

সকলে। বসুন বসুন—এই আসনে বসুন।

কনের পিসি। (উপবিষ্টা হইয়া) এ কি! এত সব কেন?

গৃ। (স্বগতঃ) তাইত! তবুও শশী ঢের দিয়েছে— বটে, আমি থাকলে আরো কমিয়ে দিতুম—ছেলেমানুষ বুঝতে পারেনি!

ব। অ্যাত আর কি দিয়েছি? ও রকম বল্লে চলবে না, খান।—

পিসি। এ রকম সময় ত খাওয়া অভ্যাস নেই!

বরু। খান খান—ও কথা বল্লে শুনব না।

গৃ। দেখ ঠাকুরঝি—অত পীড়াপীড়ি করোনা। বাস্তবিক অসময়ে খেলে যদি সহ্য না হয়—

বরু। তুমি বৌ থাম—

গি। থামব কেন বল দেখি! তোর যেমন কথা! লোকের খেলে অসুখ হবে—তবু তাকে ধরে বেঁধে খাওয়াতে হবে। অম্বলের জ্বালা যে কি রকম তা আমিই জানি।

পিসি। তা অম্বল টম্বল আমার হয় না, —তবে এত গুলো—

বরু। এত গুলো আর কি বল! এক একটার বেশী করে কিছুই দিই নি—

গি। তা না হয় দুএকটা করে তোমরা উঠিয়েই নাওনা বাপু—কিছুতেই যখন খেতে চাচ্ছেন না।

বরু। না—খাবেন না কেন? এমন কি বেশী দিয়েছি? না হয় পাতে কিছু পড়ে থাকবে।

গি। আচ্ছা বলছেন বাপু তুলেই নাওনা, অত তক্রাতক্রি—নাই করলে। আজকাল মেয়েরা যে কি হয়েছে, বড়লোকের সঙ্গে কেবলি তক্র। দেখছ ত উনি তোমার মার বয়সি? আচ্ছা আমি তুলে নিচ্ছি।—

(সন্দেশ মেঠাই ও রসগোল্লা তুলিয়া)

এবার ত হোল—এবার খাও।

পিসি। না অমৃতিখানা আর আবার-খাবটাও তুলে নেও।—

গৃহিণীর তথাকরণ।

বরু। (রাগ করিয়া) কি আর রইল!

পিসি। লুচি খানকতক উঠিয়ে নেও অত পারবনা।

গৃ। আচ্ছা তা নিচ্ছি—রাবড়িও দেখছি বেশী দিয়েছে—বেয়ান আমাদের যে রকম নিখাকী—এও না হয় খানিকটা ঢেলে নিচ্ছি।—ছানার পায়স টুকু খেয়ে ফেল।

পিসি। না না রাবড়ি অতটা আছে আবার ছানার পায়স কেন!

গৃ। সত্যি! ওমা ওটাও খাবে না?

(খুরি সরাইয়া লইয়া)

এইবার তবে বস।—

নেপথ্য হইতে—ওগো বাবুরা তাড়াতাড়ি করছেন—ঠাকরুণকে খাইয়ে শীঘ্র পাঠিয়ে দাও।

গি। এত কি তাড়াতাড়ি বাপু! তোরা কি লোককে খেতেও দিবিনে ছাই!

পিসি। না আমি উঠি—বাড়ীতে একটা কাজ আছে,—তা ছাড়া আমার আজ মোটেই ক্ষিদে নেই; একটু অম্বলের ভাবও দেখছি।

বরু। কক্ষণো অম্বল হয় না বল্লেন—আজ যে হঠাৎ অম্বলও হোল দেখছি!

পি। (মৃদু হাস্যে) সময় বুঝে সব উপদ্রবই যোটে,—সত্যি—বুকটা খুঁচিয়ে উঠ্‌ছে।

গৃ। তাইত! তবে আর কি বলব—

বর। উটি হবে না একটু মিষ্টিমুখ করতেই হবে—

পি। বেয়ান দেখেই প্রাণ মিষ্টি হয়ে গেছে - মুখের দেবার আর দরকার কি ?

গি। তাহলে কিন্তু আর একদিন এসে খেতে হবে। ঠাকুরঝি একটা পান দাও ত। নিতান্ত অসুখ করেছে—আর খেতে বলিই বা কি করে!

বরু। (রাগিয়া) তুমি পান দাও না, আমি পারব না। (প্রস্থান)

গি। ও ঐ রকম রাগী মানুষ! বিধবা হয়ে পর্য্যন্ত ছোট বেলা থেকেই এখানে আছে—আমি অনেক সহ্য করে চলি—

পি। তা ত দেখতেই পাচ্ছি। তবে ভাই আজ আসি—

গি। হাঁ চল যাই—পাল্কীতে তুলে আসি। কত সাধ্যসাধনা করলুম—কিছুতেই ত ধর্ম্মুর্ভঙ্গপণ খসলোনা,—একটু কিছু মুখে দিলে না। এত সাধলে শিবের মাথার ফুলও পড়তো। বিয়ে যদি হয় তখন বেয়াইএর কাছে এ দুঃখ গাইব। যাহক কত ত্রুটি হোল কিছু মনে কর না।

পি। রামঃ! এমন অমায়িক লোক আমিত দুটি দেখিনি! (দুজনের প্রস্থান।)

(শশীর হাসিতে হাসিতে) "আচ্ছা কাণ্ড হোল! বেচারীকে কিছু খেতে দিলে না; আহা! লোকটা খেতে বসে খালি হাতে উঠলো গো। মায়া করছে! একটা সন্দেশ খেয়ে দুঃখটা নিবৃত্তি করি! (সন্দেশটা শেষ করিয়া) আর একটা নিলে বোধ হয় ধরা পড়ব! রসগোল্লা পান্তুয়া গুলোও লোভনীয় মনে হচ্ছে,—দুএকটা চাকা যাক না! (খাইতে খাইতে)—হিহি—তা বেশ হোল—এখন কেউ না এসে পড়ে! (উঁকি দিয়া নিরীক্ষণ করিতে করিতে ও এক একটি মিষ্টান্ন মুখে দিতে দিতে হিহি করিয়া হাস্য।—সহসা পশ্চাদ্দিকে চন্দ্রকান্তের প্রবেশ।)

চ। এত হাসি কেন আজ! এত কিসের উল্লাস! মিষ্টির ঝুড়ি সামনে করে কি কেবল হাসিই ছড়াবে—মিষ্টি কিছু পাব না? (সামনে আসিয়া) একি গাল যে ভরা দেখছি—হাহা—হাহা—তা বেশ করেছ—খাই না খাই দেখেও প্রাণ ঠাণ্ডা!

শশী। (চটপট গিলিয়া ফেলিয়া) দেখলে দেখলে—এত মিথ্যা বলতে পার ছিছি! আর ঠাট্টায় কাজ নেই—কি খাবে বল দেখি ?

চ। এত ভয় পাচ্ছ কেন শশিমুখি—তোমার হাতে অনিষ্ট হয় – সে কথা কি চন্দ্রকান্ত প্রাণ থাকতে প্রকাশ করতে পারে! খাও খাও আর একটি সন্দেশ খাও,—

শ। এত রঙ্গও জান তুমি! তুমি রসগোল্লা খেতে ভালবাস—এই নেও ধর,—চটপট খেয়ে সরে পড়—এখনি কেউ এসে পড়বে—

চ। আগে তুমি সন্দেশটি খাও—আহা মুখের গ্রাস নষ্ট করেছি বুকটা ফেটে যাচ্ছে। —মাথা খাও, যদি না খাও—

শ। আচ্ছা বাবু খাচ্ছি—তাহলে তুমি যাবে ত ? এই নাও, ধর—

(উভয়ের মিষ্টান্ন ভক্ষণ—বরদার প্রবেশ।)

ব। একি হচ্ছে! দুজনে যে আচ্ছা ভোজ লাগিয়েছিস!

শ। আমি না—আমি না—এই চাঁদা দুষ্টুটা—

চ। হা হা—ওকথা বল্লে চলবে না—কার মুখ নড়ছে দেখাই যাচ্ছে—

বরু। তোমরা যা খুসী কর আমি এসব অনাচার দেখতে পারিনে। (এক দিক দিয়া প্রস্থান ;—অন্য দিক দিয়া গৃহিণীর প্রবেশ)

গৃ। এই যে চন্দ্রকান্ত,—কি খাওয়া হচ্ছে ?

চ। কিছুনা—এই একটা পান পড়ে ছিল—তাই তাই—

[বলিতে বলিতে দ্রুতগমনে গ্রাস ফেলিয়া—মিষ্টান্নের ঝুড়ি উল্টাইয়া পলায়ন।]

গৃ। দেখলে দেখলে সব ভাঙ্গলে? সব ছড়ালে! এমন লক্ষ্মীছাড়া হতভাগা লোকও দেখিনি? কর্ত্তা দুধ দিয়ে কালসর্প পুষেছেন গো! শশি মিষ্টি গুলো তুলে থালা সাজাও বাবা—দুবাড়ী তত্ব পাঠাই।—

(শশী মিষ্টান্ন তুলিতে লাগিল—গৃহিণী গুণিতে লাগিলেন।)

গৃ। একি আর সব কোথা গেল! এত কম যে! চন্দ্রটা বুঝি খেয়ে গেল! তাই বটে মুখ নড়ছিল! বল্লে কিনা পান খাচ্ছি! হাড় মাস জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খেলে! আমি কর্ত্তার কাছে চল্লেম—ও যাবে কি আমি যাব। মানুষ আর কত সহ্য করতে পারে! (প্রস্থান।)

শশা। হি হি হি হি কি মজা!—

গান।

তোম তোম তানা নানা! মজাদার দুনিয়া খানা!
উঃ—আস্ত মটর বড়ই কঠোর
চাই—চানাচুর নকলদানা!
চাই,—এক নয়নে মধুর হাসি
এক নয়নে কান্না?
চাই—আধো পাতে পান্তা বাড়া
আধো পাতে রান্না?—
চাই—দুহাত ভরা মুটো মুটো—
গিল্টি করা রঙ্গিন ঝুটো?
চাই—আসল খাঁটি—একটা দুটো?—নানানা।

(মাঝে মাঝে হি হি করিয়া হাসি,—মাঝে মাঝে কেহ আসিতেছে কিনা উঁকি দিয়া দেখিতে দেখিতে হাততালি দিয়া গান।)

যবনিকা পতন।

স্বরলিপি।

মিশ্র খাম্বাজ—দাদ্রা।

গা। রা সা -ন্‌া ॥ সা -া মা। -গা মা -া I পা -া ||পা। পা পা -ধপা I
তো ম্ তো ম্ তা • না ০ না • না • ম জা দা র্

I মা া পা। -ধপা -মা -া I গা -া গা।। -রা সা -ন্‌া ॥ া। -া -া পা I
দু ০ নিয়া ০ খা • না • "তো ম্ তোম্" • ০ • উঃ

I{র্সা -া র্সা। র্সা র্সা -র্রা I। র্সা ণা -া। ধা পা -া I} র্সা -া র্সা।
আ ০ ত্ত ম ট র ব ড়ই ০ ক ঠোর ০ চাই ০ চা

। র্সা মা -া I। মা -া পা। -ধপা মা -া I গা -া গা। -রা সা ন্া ॥ া। { -া পা -া I
না চুর্ ০ ন ০ ক ০ ল্ দা ০ না ০ তো ম্ তো ম্ ০ চাই

I সমা -া মা। মা মা -া I পা পা -া। পা পা -া I পদা -া দা। দা মা -া I
এক ০ ন য় নে ০ ম ধুর ০ হা সি ০ এক ০ ন য় নে ০

I পা -া পা}। {-া পা ধা I ধর্সা র্সা -া। -র্সা র্সা -র্রা I র্সা -া ণা।
কা ০ ন্না ০ চা ই আ ধো ০ পা তে ০ পা ০ ন্তা

। ধা পা -া I পদা দা -া। পা মা -া I পা -া পা }। -া পা -া I
বা ড়া ০ আ ধো ০ পা তে ০ রা ০ ন্না ০ চাই ০

I{মা পধা- া। ধা ধা -না I না র্সা -া। র্রা র্সা -া I না - সর্রা। র্সা র্সা -র্রর্সা I
ছু' হাত ০ ভ রা ০ মু ঠো ০ মু ঠো ০ গি ০ ল্টি ক রা ০

I না র্সা -না। ধা পা -া I} {-া -া র্সা। র্সা র্সা র্রা I র্সা -া ণা।
র ঙীন ০ ঝু টো ০ ০ ০ আ সল খাঁ টি এক ০ টা

। ধা পা -া I} মা -া -া। পা -ধা -পা I মা -া গা। -রা সা -ন্া ॥
ছু' টো ০ না ০ ০ না ০ ০ না ০ "তো ম্ তো ম্" ॥

শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী।

যক্ষের নিবেদন।

(মন্দাক্রান্তা ছন্দের অনুকরণে)

পিঙ্গল বিহ্বল ব্যথিত নভতল, কই গো কই মেঘ উদয় হও,
সন্ধ্যার তন্দ্রার মূরতি ধরি' আজ মন্দ্র-মন্থর বচন কও ;
সূর্য্যের রক্তিম নয়নে তুমি মেঘ! দাও হে কজ্জল পাড়াও ঘুম,
বৃষ্টির চুম্বন বিথারি' চলে যাও অঙ্গে হর্ষের পড়ুক্ ধূম।

বৃক্ষের গর্ভেই রয়েছে আজো যেই,—আজ নিবাস যার গোপন-লোক,—
সেই সব পল্লব সহসা ফুটিবার হৃষ্ট চেষ্টায় কুসুম হোক্ ;

গ্রীষ্মের হোক্ শেষ, ভরিয়া সানুদেশ স্নিগ্ধ গম্ভীর উঠুক্ তান,
যক্ষের দুঃখের কর হে অবসান, যক্ষ-কান্তার জুড়াও প্রাণ।

শৈলের পইঠায় দাঁড়ায়ে আজি হায় প্রাণ উধাও ধায় প্রিয়ার পাশ,
মূর্চ্ছার মন্তর ভরিছে চরাচর, ছায় নিখিল কার আকুল শ্বাস!
ভরপুর অশ্রুর বেদনা-ভারাতুর মৌন কোন্ সুর বাজায় মন,
বক্ষের পঞ্জর কাঁপিছে কলেবর, চক্ষে দুঃখের নীলাঞ্জন!

রাত্রির উৎসব জাগালে দিবসেই, তাইতো তন্দ্রায় ভুবন ছায়,
রাত্রির গুণ সব দিনেরে দিলে দান, তাইতো বিচ্ছেদ দ্বিগুণ, হায়;
ইন্দ্রের দক্ষিণ বাহু সে তুমি দেব! পূজ্য! লও মোর পূজার ফুল,
পুষ্কর বংশের চূড়া যে তুমি মেঘ! বন্ধু! দৈবের ঘুচাও ভুল!

নিষ্ঠুর যক্ষেশ, নাহিক কৃপালেশ, রাজ্যে আর তাঁর বিচার নেই,
আজ্ঞার লঙ্ঘন করিল একে, আর শাস্তি ভুঞ্জান্ দুজনকেই!
হায় মোর কান্তার না ছিল অপরাধ, মিথ্যা সয় সেই কতই ক্লেশ,
দুর্ভর বিচ্ছেদ অবলা বুকে বয়, পাংশু কুন্তল, মলিন বেশ।

বন্ধুর মুখ চাও, সখা হে সেথা যাও, দুঃখ দুস্তর তরাও ভাই,
কল্যাণ-সংবাদ কহিয়ো কাণে তার, হায়, বিলম্বের সময় নাই;
বৃন্তের বন্ধন আশাতে বাঁচে মন, হায় গো, বল্ তার কতই আর?
বিচ্ছেদ-গ্রীষ্মের তাপেতে সে শুকায়, যাও হে দাও তায় সলিল্-ধার।

নির্ম্মল হোক্ পথ,—শুভ ও নিরাপদ, দূর-সুদুর্গম নিকট হোক্,
হ্রদ, নদ, নির্ঝর, নগরী মনোহর, সৌধ সুন্দর জুড়াক্ চোক্;
চঞ্চল খঞ্জন্-নয়না নারীগণ বর্ষা-মঙ্গল করুক্ গান,
বর্ষার সৌরভ,—বলাকা-কলরব, নিত্য উৎসব ভরুক্ প্রাণ!

পুষ্পের তৃষ্ণার কর হে অবসান, হোক্ বিনিঃশেষ যূথীর ক্লেশ,
বর্ষায় হায় মেঘ প্রবাসে নাই সুখ,—হায় গো নাই নাই সুখের লেশ;
যাও ভাই একবার মুছাতে আঁখি তার, প্রাণ বাঁচাও মেঘ! সদয় হও,
"বিদ্যুৎ-বিচ্ছেদ জীবনে না ঘটুক্" বন্ধু বন্ধুর আশিষ লও।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

কারাগৃহ ও স্বাধীনতা।

মনুষ্যমাত্রেই প্রায় বাহ্য অবস্থার দাস, স্থূলজগতের অনুভূতির মধ্যেই আবদ্ধ। মানসিক ক্রিয়াসকল সেই বাহ্যিক অনুভূতিকেই আশ্রয় করে, বুদ্ধিও স্থূলের সংকীর্ণ সীমা লঙ্ঘন করিতে অক্ষম; প্রাণের সুখদুঃখ বাহ্য ঘটনার প্রতিধ্বনি মাত্র। এই দাসত্ব শরীরের আধিপত্যজনিত। উপনিষদে বলা হইয়াছে, "জগৎস্রষ্টা স্বয়ম্ভূ শরীরের দ্বারসকল বহির্ম্মুখীন করিয়া গড়িয়াছেন বলিয়া সকলের দৃষ্টি বহির্জগতে আবদ্ধ, অন্তরাত্মাকে কেহও দেখে না। সেই ধীরপ্রকৃতি মহাত্মা বিরল যিনি অমৃতের-বাসনায় ভিতরে চক্ষু ফিরাইয়া আত্মাকে প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়াছেন।" আমরা সাধারণতঃ যে বহির্ম্মুখীন স্থূলদৃষ্টিতে মনুষ্যজাতির জীবন দেখি, সেই দৃষ্টিতে শরীরই আমাদের মুখ্য সম্বল। য়ুরোপকে যতই না জড়বাদী বলি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মনুষ্যমাত্রই জড়বাদী। শরীর ধর্ম্মসাধনের উপায়, আমাদের বহু অশ্ব-যুক্ত রথ, যে দেহ রথে আরোহণ করিয়া আমরা সংসার পথে ধাবিত হই। আমরা কিন্তু দেহের অযথার্থ প্রাধান্য স্বীকার করিয়া দেহাত্মকবুদ্ধিকে এমন প্রশ্রয় দিই যে বাহ্যিক কর্ম্ম ও বাহ্যিক শুভাশুভ দ্বারা সম্পূর্ণরূপে আবদ্ধ হইয়া থাকি। এই অজ্ঞানের ফল জীবনব্যাপী দাসত্ব ও পরাধীনতা। সুখদুঃখ শুভাশুভ সম্পদবিপদ আমাদের মানসিক অবস্থাকে নিজের অনুযায়ী করিতে সচেষ্ট ত হয়ই, আমরাও কামনার ধ্যানে সেই স্রোতে ভাসিয়া যাই। সুখলালসায় দুঃখভয়ে পরের আশ্রিত হই, পরের দত্ত সুখ, পরের দত্ত দুঃখ গ্রহণ করিয়া অশেষ কষ্ট ও লাঞ্ছনা ভোগ করি। কেন না, প্রকৃতি হৌক বা মনুষ্য হৌক, যে আমাদের শরীরের উপর কিঞ্চিন্মাত্র আধিপত্য করিতে পারে কিম্বা নিজশক্তির অধিকারক্ষেত্রে আনিতে পারে, তাহারই প্রভাবের অধীন হইতে হয়। ইহার চরম দৃষ্টান্ত শত্রুগ্রস্ত বা কারাবদ্ধের অবস্থা। কিন্তু যিনি বন্ধুবান্ধববেষ্টিত হইয়া স্বাধীনভাবে মুক্ত আকাশে বিচরণ করেন, কারাবদ্ধের ন্যায় তাঁহারও এই দুর্দ্দশা। শরীরই কারাগৃহ, দেহাত্মকবুদ্ধিরূপ অজ্ঞানতা কারারূপ শত্রু।

এই কারাবাস মনুষ্যজাতির চিরন্তন অবস্থা। অপরপক্ষে সাহিত্য ও ইতিহাসের প্রত্যেক পৃষ্ঠায় মনুষ্যজাতির স্বাধীনতালাভার্থ অদমনীয় উচ্ছ্বাস ও প্রয়াস দেখিতে পাই। যেমন রাজনীতিক বা সামাজিকক্ষেত্রে, তেমনি ব্যক্তিগত জীবনে যুগে যুগে এই চেষ্টা। আত্মসংযম, আত্মনিগ্রহ, সুখদুঃখবর্জ্জন, Stoicism, Epicureanism, asceticism, বেদান্ত, বৌদ্ধধর্ম্ম, অদ্বৈতবাদ, মায়াবাদ, রাজযোগ, হঠযোগ, গীতা, জ্ঞানমার্গ, ভক্তিমার্গ, কর্ম্মমার্গ,—নানা পন্থা একই গম্যস্থান। উদ্দেশ্য শরীর জয়, স্থূলের আধিপত্য বর্জ্জন, আন্তরিক জীবনের স্বাধীনতা। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিদ্‌গণ এই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে স্থূলজগৎ ভিন্ন অন্য জগৎ নাই, স্থূলের উপর সূক্ষ্ম প্রতিষ্ঠিত, সূক্ষ্ম অনুভব স্থূল অনুভবের প্রতিকৃতি মাত্র, মনুষ্যের স্বাধীনতা-প্রয়াস ব্যর্থ; ধর্ম্মদর্শন বেদান্ত অলীক কল্পনা, সম্পূর্ণ

ভূতপ্রকৃতি-আবদ্ধ আমাদের সেই বন্ধনমোচনে বা ভূতপ্রকৃতির সীমা উল্লঙ্ঘনে মিথ্যা চেষ্টা। কিন্তু মানবহৃদয়ের এমন গূঢ়তর স্তরে এই আকাঙ্ক্ষা নিহিত যে সহস্র যুক্তিও তাহা উন্মূলন করিতে অসমর্থ। মনুষ্য বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তে কথনও সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না। চিরকাল মনুষ্য অস্পষ্ট রূপে অনুভব করিয়া আসিতেছেন যে স্থূল-জয়ে সমর্থ সূক্ষ্মবস্তু তাহার অভ্যন্তরে দৃঢ়ভাবে বর্ত্তমান, সূক্ষ্মময় অধিষ্ঠাতা নিত্যমুক্ত আনন্দ-ময় পুরুষ আছেন। সেই নিত্যমুক্তি ও নির্ম্মল আনন্দলাভ করা ধর্ম্মের উদ্দেশ্য। এই যে ধর্ম্মের উদ্দেশ্য, সেই বিজ্ঞানকল্পিত evolutionএরও উদ্দেশ্য। বিচারশক্তি ও তাহার অভাব পশু মনুষ্যের প্রকৃত ভেদ নহে। পশুর বিচারশক্তি আছে, কিন্তু পশুদেহে তাহার উৎকর্ষ হয় না। পশু মনুষ্যের প্রকৃত ভেদ এই যে শরীরের নিকট সম্পূর্ণ দাসত্ব স্বীকার পাশবিক অবস্থা, শরীর জয় ও আন্তরিক স্বাধীনতার চেষ্টাই মনুষ্যত্ববিকাশ! এই স্বাধীনতাই ধর্ম্মের প্রধান উদ্দেশ্য, ইহাকেই মুক্তি বলে। এই মুক্ত্যর্থে আমরা অন্তঃকরণস্থ মনোময় প্রাণশরীরনেতাকে জ্ঞানদ্বারা চিনিতে কিম্বা কর্ম্মভক্তিদ্বারা প্রাণ মন শরীর অর্পণ করিতে সচেষ্ট হই। "যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মণি" বলিয়া গীতার যে প্রধান উপদেশ এই স্বাধীনতাই সেই গীতোক্ত যোগ। আন্তরিক সুখদুঃখ যখন বাহ্যিক শুভাশুভ সম্পদবিপদকে আশ্রয় না করিয়া স্বয়ংজাত, স্বয়ং প্রেরিত, স্বসীমাবদ্ধ হয়, তখন মনুষ্যের সাধারণ অবস্থার বিপরীত অবস্থা হয়, বাহ্যিক জীবন আন্তরিক জীবনের অনুযায়ী করা যায়, কর্ম্মবন্ধন শিথিল হয়। গীতার আদর্শ পুরুষ কর্ম্মফলে আসক্তি ত্যাগ করিয়া পুরুষোত্তমে কর্ম্মসন্ন্যাস করেন। তিনি "দুঃখেষনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ" আন্তরিক স্বাতন্ত্র্য লাভ করিয়া আত্মরতি ও আত্মসন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। তিনি প্রাকৃত লোকের ন্যায় সুখলালসায় দুঃখভয়ে কাহারও আশ্রিত হন না, পরের দত্ত সুখদুঃখ গ্রহণ করেন না, অথচ কর্ম্মভোগ করেন না। বরং মহাসংযমী মহাপ্রতাপান্বিত দেবাসুরযুদ্ধে রাগভয় ক্রোধাতীত মহারথী হইয়া ভগবৎপ্রেরিত যে কর্ম্মযোগী রাষ্ট্রবিপ্লব ধর্ম্মবিপ্লব অথবা প্রতিষ্ঠিত রাজ্য ধর্ম্ম সমাজ রক্ষা করিয়া নিষ্কাম ভাবে ভগবৎকর্ম্ম সুসম্পন্ন করেন, তিনিই গীতার শ্রেষ্ঠ পুরুষ।

আধুনিক যুগে আমরা নূতন পুরাতনের সন্ধিস্থলে উপস্থিত। মানুষ বরাবরই তাঁহার গন্তব্যস্থানে অগ্রসর হইতেছেন, সময়ে সময়ে সমতল ভূমি ত্যাগ করিয়া উচ্চে আরোহণ করিতে হয়, এবং সেইরূপ আরোহণ সময়ে রাজ্যে সমাজে ধর্ম্মে জ্ঞানে বিপ্লব হয়। বর্ত্তমানকালে স্থূল হইতে সূক্ষ্মে আরোহণ করিবার উদ্যোগ চলিতেছে। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণ স্থূলজগতের পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা ও নিয়ম নির্দ্ধারণ করায় আরোহণ-মার্গের চতুঃপার্শ্বস্থ সমতল ভূমি পরিষ্কার হইয়াছে। সূক্ষ্মজগতের বিশাল রাজ্যে পাশ্চাত্য জ্ঞানীদিগের প্রথম পদক্ষেপ হই-তেছে, অনেকের মন সেই রাজ্য জয়ের আশায় প্রলুব্ধ। ইহা ভিন্ন অন্য অন্য লক্ষণ দেখা হইতেছে—যেমন অল্প দিনে থিয়জফির বিস্তার, আমেরিকায় বেদান্তের আদর, পাশ্চাত্য দর্শনশাস্ত্রে ও চিন্তাপ্রণালীতে ভারতবর্ষের পরোক্ষভাবে কিঞ্চিৎ আধিপত্য

ইত্যাদি। কিন্তু সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লক্ষণ ভারতের আকস্মিক ও আশাতীত উত্থান। ভারতবাসী জগতের গুরুস্থান অধিকার করিয়া নূতন যুগ প্রবর্ত্তন করিতে উঠিতেছেন। তাঁহার সাহায্যে বঞ্চিত হইলে পাশ্চাত্যগণ উন্নতি-চেষ্টায় সিদ্ধকাম হইতে পারিবেন না। যেমন আন্তরিক জীবনবিকাশের সর্ব্বপ্রধান উপায়-স্বরূপ ব্রহ্মজ্ঞান তত্ত্বজ্ঞান ও যোগাভ্যাসে ভারত ভিন্ন অন্য কোন দেশ উৎকর্ষলাভ করে নাই, তেমনই মনুষ্যজাতির প্রয়োজনীয় চিত্তশুদ্ধি ইন্দ্রিয়সংযম ব্রহ্মতেজ তপঃক্ষমতা ও নিষ্কাম কর্ম্মযোগশিক্ষা ভারতেরই সম্পত্তি। বাহ্য সুখদুঃখকে তাচ্ছিল্য করিয়া আন্তরিক স্বাধীনতা অর্জ্জন করা ভারতবাসীরই সাধ্য, নিষ্কাম কর্ম্মে ভারতবাসীই সমর্থ, অহঙ্কার-বর্জ্জন ও কর্ম্মে নির্লিপ্ততা তাঁহারই শিক্ষা ও সভ্যতার চরম উদ্দেশ্য বলিয়া জাতীয় চরিত্রে বীজরূপে নিহিত।

এই কথার যাথার্থ্য প্রথম আলিপুর জেলে অনুভব করিলাম। এই জেলে প্রায়ই চোর ডাকাত হত্যাকারী থাকে। যদিও কয়েদীর সঙ্গে আমাদের কথা কহা নিষিদ্ধ, তথাপি কার্য্যতঃ এই নিয়ম সম্পূর্ণ পালন করা হইত না, তাহা ছাড়া রাঁধুনি পানিওয়ালা ঝাড়ুদার মেহতর প্রভৃতি, যাহাদের সংস্রবে না আসিলে নয়, তাহাদের সঙ্গে অনেক সময় অবাধে বাক্যালাপ হইত। যাঁহারা আমার এক অপরাধে অপরাধী বলিয়া ধৃত, তাঁহারাও নৃশংস হত্যাকারীর দল প্রভৃতি দুঃশ্রাব্য বিশেষণে কলঙ্কিত ও নিন্দিত। যদি কোনও স্থানে ভারতবাসীর চরিত্র ঘৃণার চক্ষে দেখিতে হয়, যদি কোন অবস্থায় তাহার নিকৃষ্ট অধম ও জঘন্য ভাবের পরিচয় পাওয়া সম্ভব হয়, তবে আলিপুর জেলই সেই স্থান, আলিপুরে কারাবাসই সেই নিকৃষ্ট হীন অবস্থা। আমি এই স্থানে এই অবস্থায় বার মাস কাটাইলাম। এই বারমাস অনুভবের ফলে, ভারতবাসীর শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে দৃঢ় ধারণা, মনুষ্য চরিত্রের উপর দ্বিগুণ ভক্তি এবং স্বদেশের ও মনুষ্যজাতির ভবিষ্যৎ উন্নতি ও কল্যাণের দশগুণ আশা লইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে ফিরিয়া আসিয়াছি। ইহা আমার স্বভাবজাত optemism অথবা অতিরিক্ত বিশ্বাসের ফল নহে। শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল বক্‌সার জেলে ইহা অনুভব করিয়া আসিয়া-ছিলেন, আলিপুর জেলে ভূতপূর্ব্ব ডাক্তার ডেলি সাহেবও ইহা সমর্থন করিতেন। ডেলি সাহেব মনুষ্যচরিত্রে অভিজ্ঞ সহৃদয় ও বিচক্ষণ লোক, মনুষ্য চরিত্রের নিকৃষ্ট ও জঘন্য বৃত্তি সকল প্রত্যহ তাঁহার সম্মুখে বিদ্যমান, অথচ তিনি আমাকে বলিতেন "ভারতের ভদ্রলোক বা ছোটলোক, সমাজের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বা জেলের কয়েদী যতই দেখি ও শুনি, আমার এই ধারণা দৃঢ় হয় যে চরিত্রে ও গুণে তোমরা আমাদের চেয়ে ঢের উঁচু। এই দেশের কয়েদী ও য়ুরোপের কয়েদীতে আকাশ পাতাল তফাৎ। এই ছেলেদের দেখে আমার এই ধারণা আরও দৃঢ় হয়েছে। এদের আচরণ চরিত্র ও নানা সদ্‌গুণ দেখে কে কল্পনা করতে পারে যে এরা Anarchist বা হত্যাকারী। তাদের মধ্যে ক্রূরতা উদ্দাম-ভাব অধীরতা বা ধৃষ্টতা কিছুমাত্র না দেখে সব উল্টাগুণই দেখি।" অবশ্যই জেলে চোর

ডাকাত সাধুসন্ন্যাসী হয় না। ইংরাজের জেল চরিত্র শুধরাইবার স্থান নহে, বরং সাধারণ কয়েদীর পক্ষে চরিত্রহানি ও মনুষ্যত্ব-নাশের উপায়মাত্র। তাহারা যে চোর ডাকাত খুনী ছিল, সেই চোর ডাকাত খুনীই থাকে, জেলে চুরি করে, শক্ত নিয়মের মধ্যেও নেশা করে, জুয়োচুরি করে। তাহা হইলে কি হইবে, ভারতবাসীর মনুষ্যত্ব গিয়াও যায় না। সামাজিক অবনতিতে পতিত, মনুষ্যত্ব নাশের ফলে নিষ্পেষিত, বাহিরে কালিমা কদর্য্যভাব কলঙ্ক বিকৃতি, তথাপি ভিতরে সেই লুপ্তপ্রায় মনুষ্যত্ব ভারতবাসীর মজ্জাগত সদ্‌গুণে লুকাইয়া আত্মরক্ষা করে, পুনঃপুনঃ কথায় ও আচরণে তাহা প্রকাশ পায়। যাঁহারা উপরের কাদাটুকু দেখিয়া ঘৃণায় মুখ ফিরাইয়া লন, তাঁহারাই বলিতে পারেন যে ইহাদের মধ্যে মনুষ্যত্বের লেশমাত্র দেখিতে পাই নাই। কিন্তু যিনি সাধুতার অহঙ্কার ত্যাগ করিয়া নিজ সহজসাধ্য স্থিরদৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করেন, তিনি এই মতে কখনও মত দিবেন না। ছয় মাস কারাবাসের পরে শ্রীযুত বিপিনচন্দ্র পাল বক্‌সার জেলের চোর ডাকাতের মধ্যেই সর্ব্বঘটে নারায়ণকে দর্শন করিয়া উত্তর পাড়ার সভায় মুক্তকণ্ঠে এই কথা স্বীকার করিয়াছিলেন। আমিও আলিপুর জেলেই হিন্দু ধর্ম্মের এই মূলতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলাম, চোর ডাকাত খুনীর মধ্যে সর্ব্বপ্রথম মনুষ্য দেহে নারায়ণকে উপলব্ধি করিলাম।

এই দেশে কত শত নিরপরাধ ব্যক্তি দীর্ঘকাল জেলরূপ নরকবাস ভোগ দ্বারা পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত দুষ্কর্ম্মফল লাঘব করিয়া তাঁহাদের স্বর্গপথ পরিষ্কার করিতেছেন। কিন্তু সাধারণ পাশ্চাত্যবাসীগণ যাঁহারা ধর্ম্মভাব দ্বারা পূত ও দেবভাবাপন্ন নহেন তাহারা এইরূপ পরীক্ষায় কতদূর উত্তীর্ণ হয়, যাঁহারা পাশ্চাত্য দেশে রহিয়াছেন বা পাশ্চাত্য চরিত্র-প্রকাশক সাহিত্য পড়িয়াছেন, তাঁহারাই সহজে অনুমান করিতে পারেন। এরূপ স্থলে হয়ত তাহাদের নিরাশাপীড়িত, ক্রোধ ও দুঃখের অশ্রুজলপ্লুত হৃদয় পার্থিব নরকের ঘোর অন্ধকারে এবং সহবাসীদের সংস্রবে পড়িয়া তাহাদেরই ক্রূরতা ও নীচবৃত্তি আশ্রয় করে;—নয়ত দুর্ব্বলতার নিরতিশয় নিষ্পেষণে বল বুদ্ধি হীন হইয়া তাহাতে মনুষ্যের নষ্টাবশেষ মাত্র অবশিষ্ট থাকে।

আলিপুরের একজন নিরপরাধীর কথা বলি। এব্যক্তি ডাকাতীতে লিপ্ত বলিয়া দশ বৎসর সশ্রম কারাবাসে দণ্ডিত। জাতে গোয়ালা, অশিক্ষিত, লেখাপড়ার ধার ধারে না, ধর্ম্ম-সম্বলের মধ্যে ভগবানে আস্থা ও আর্য্যশিক্ষা-সুলভ ধৈর্য্য ও অন্যান্য সদ্‌গুণ ইহাতে বিদ্যমান। এই বৃদ্ধের ভাব দেখিয়া আমার বিদ্যা ও সহিষ্ণুতার অহঙ্কার চূর্ণ হইয়া গেল। বৃদ্ধের নয়নে সর্ব্বদা প্রশান্তসরল মৈত্রীভাব বিরাজিত, মুখে সর্ব্বদা অমায়িক প্রীতিপূর্ণ আলাপ। সময় সময় নিরপরাধে কষ্টভোগের কথা পাড়েন, স্ত্রীছেলেদের কথা বলেন, কবে ভগবান কারামুক্তি দিয়া স্ত্রীছেলেদের মুখ দর্শন করাইবেন, এই ভাবও প্রকাশ করেন, কিন্তু কখনও তাঁহাকে নিরাশ বা অধীর দেখি নাই। ভগবানের কৃপাপেক্ষায় ধীর-ভাবে জেলের কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া দিন যাপন করিতেছেন। বৃদ্ধের যত চেষ্টা ও ভাবনা নিজের জন্যে নহে, পরের সুখ সুবিধা সংক্রান্ত।

দয়া ও দুঃখীর প্রতি সহানুভূতি তাঁহার কথায় কথায় প্রকাশ পায়, পরসেবা তাঁহার স্বভাব-ধর্ম্ম। নম্রতায় এই সকল সদ্‌গুণ আরও ফুটিয়া উঠিয়াছে। আমা হইতে সহস্রগুণ উচ্চ হৃদয় বুঝিয়া এই নম্রতায় আমি সর্ব্বদা লজ্জিত হইতাম, বৃদ্ধের সেবা গ্রহণ করিতে সংকোচ হইত, কিন্তু তিনি ছাড়েন না, তিনি সর্ব্বদা আমার সুখসোয়াস্তির জন্যে চিন্তিত। যেমন আমার উপর তেমনই সকলের উপর—বিশেষ নিরপরাধ ও দুঃখীজনের প্রতি তাঁহার দয়াদৃষ্টি বিনীত সেবাসম্মান আরো অধিক। অথচ মুখে ও আচরণে কেমন একটি স্বাভাবিক প্রশান্ত গাম্ভীর্য্য ও মহিমা প্রকাশিত। দেশের প্রতিও ইঁহার যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। এই বৃদ্ধ কয়েদীর দয়াদাক্ষিণ্য পূর্ণ শ্বেতশ্মশ্রু-মণ্ডিত সৌম্যমূর্ত্তি চিরকাল আমার স্মৃতিপটে অঙ্কিত থাকিবে। এই অবনতির দিনেও ভারতবর্ষের চাষার মধ্যে—আমরা যাহাদের অশিক্ষিত ছোটলোক বলি,—তাহাদের মধ্যে এইরূপ হিন্দু সন্তান পাওয়া যায়, ইহাতেই হিন্দু ধর্ম্মের গৌরব, আর্য্যশিক্ষার অতুল গুণ প্রকাশ এবং ইহাতেই ভারতের ভবিষ্যৎ আশাজনক। শিক্ষিত যুবকমণ্ডলী ও অশিক্ষিত কৃষক সম্প্রদায় এই দুইটী শ্রেণীতেই ভারতের ভবিষ্যৎ নিহিত, ইহাদের মিলনেই ভবিষ্যৎ আর্য্যজাতি গঠিত হইবে।

উপরে একটি অশিক্ষিত চাষার কথা বলিলাম, এখন দুইজন শিক্ষিত যুবকের কথা বলি। ইঁহারা হ্যারিসন রোডের কবিরাজ দ্বয়, নগেন্দ্রনাথ ও ধরণী। ইঁহারা সাত বৎসর সশ্রম কারাবাস দণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন। ইঁহারাও যেরূপ শান্তভাবে, যেরূপ সন্তুষ্টমনে এই আকস্মিক বিপত্তি, এই অন্যায় রাজদণ্ড সহ্য করিতেন, তাহা দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হইত। কখনও তাঁহাদের মুখে ক্রোধ দুষ্ট বা অসহিষ্ণুতা-প্রকাশক একটীও কথা শুনি নাই। যাঁহাদের দোষে জেলরূপ নরকে যৌবনকাল কাটাইতে হইল, তাঁহাদের প্রতি যে লেশমাত্র ক্রোধ তিরস্কার ভাব বা বিরক্তি পর্য্যন্ত আছে, তাহার কোন লক্ষণ কখনও দেখিতে পাই নাই। তাঁহারা আধুনিক শিক্ষার গৌরবস্থল পাশ্চাত্য-ভাষায় ও পাশ্চাত্য-বিদ্যায় অভিজ্ঞতা-বঞ্চিত, মাতৃভাষাই ইঁহাদের সম্বল, কিন্তু ইংরাজী-শিক্ষালব্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে তাঁহাদের তুল্য কম লোক দেখিয়াছি। দুজনেই মানুষের নিকট আক্ষেপ কিম্বা বিধাতার নিকট নালিস না করিয়া সহাস্য মুখে নতমস্তকে দণ্ড গ্রহণ করিয়াছেন। দুটী ভাইই সাধক কিন্তু প্রকৃতি বিভিন্ন। নগেন্দ্র ধীর প্রকৃতি, গম্ভীর বুদ্ধিমান। হরিকথা ও ধর্ম্মবিষয়ে আলাপ অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। যখন আমাদিগকে নির্জ্জন কারাবাসে রাখা হইল তখন জেলের কর্ত্তৃপক্ষ জেলের খাটুনি সমাপ্তে আমাদিগকে বই পড়িবার অনুমতি দিলেন। নগেন্দ্র ভগবদ্‌গীতা পড়িতে চাহিয়া বাইবেল পাইয়াছিলেন। বাইবেল পড়িয়া তাঁহার মনে কি কি ভাবের উদয় হয়, কাঠগড়ায় বসিয়া আমার নিকট তাহার বর্ণনা করিতেন। নগেন্দ্র গীতা পড়েন নাই, তথাপি আশ্চর্য্যের সহিত দেখিলাম বাইবেলের কথা না বলিয়া গীতার শ্লোকার্থ বলিতেছেন।—এমন কি এক একবার মনে হইত যে ভগবদ্‌গুণাত্মক মহৎ উক্তি সকল কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ-মুখ-নিঃসৃত

উক্তিগুলি সেই বাসুদেব মুখপদ্ম হইতে এই আলিপুরের কাঠগড়ায় আবার নিঃসৃত হইতেছে। গীতা না পড়িয়া বাইবেল গীতার সমতাবাদ, কর্ম্মফল ত্যাগ, সর্ব্বত্র ঈশ্বর দর্শন ইত্যাদি ভাব উপলব্ধি করা সামান্য সাধনার লক্ষণ নহে। ধরণী নগেন্দ্রের ন্যায় বুদ্ধিমান নন, কিন্তু বিনীত ও কোমল প্রকৃতি, স্বভাবতঃই ভক্ত। তিনি সর্ব্বদা মাতৃধ্যানে বিভোর, তাঁহার মুখের প্রসন্নতা, সরল হাস্য ও কোমল ভক্তিভাব দেখিয়া জেলের জেলত্ব উপলব্ধি করা কঠিন হইয়া পড়িত। ইঁহাদের দেখিয়া কে বলিতে পারে বাঙ্গালী হীন অধম? এই শক্তি এই মনুষ্যত্ব এই পবিত্র অগ্নি ভস্মরাশিতে লুকায়িত আছে মাত্র।

ইঁহারা উভয়েই নিরপরাধ। বিনা দোষে কারাবদ্ধ হইয়াও নিজগুণে বা শিক্ষাবলে বাহ্য সুখ দুঃখের আধিপত্য অস্বীকার করিয়া আন্তরিক জীবনের স্বাধীনতা রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছেন। কিন্তু যাঁহারা অপরাধী, তাঁহাদের মধ্যেও জাতীয় চরিত্রের সদ্‌গুণ বিকাশ পাইত। বার মাস আলিপুরে ছিলাম, দুয়েকজন ভিন্ন যত কয়েদী, যত চোর ডাকাত খুনীর সঙ্গে আমাদের সংস্রব ঘটিয়াছিল, সকলের নিকটেই আমরা সদ্ব্যবহার ও অনুকূলতা পাইতাম। আধুনিক-শিক্ষা-দূষিত আমাদের মধ্যে বরঞ্চ এসকল গুণের অভাব দেখা যায়। আধুনিক শিক্ষার অনেক গুণ থাকিতে পারে কিন্তু সৌজন্য ও নিঃস্বার্থ পরসেবা সেই গুণের মধ্যগত নহে। যে দয়া সহানুভূতি আর্য্যশিক্ষার মূল্যবান অঙ্গ, তাহা এই চোর ডাকাতের মধ্যেও দেখিতাম। মেহতর ঝাড়ুদার পানিওয়ালাকে বিনা দোষে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে নির্জ্জন কারাবাসের দুঃখ কষ্ট কতকপরিমাণে অনুভব করিতে হইত, কিন্তু তাহাতে একজনও আমাদের উপর অসন্তুষ্টি বা ক্রোধ প্রকাশ করে নাই। দেশী জেলরক্ষকদের নিকট তাহারা মাঝে মাঝে দুঃখ প্রকাশ করিত বটে কিন্তু প্রসন্নমুখে আমাদের কার্য্য করিয়া যাইত, এবং ভগবানের নিকট আমাদের কারামুক্তি প্রার্থনা করিত। একজন মুসলমান কয়েদী অভিযুক্তদিগকে নিজের ছেলেদের ন্যায় ভালবাসিতেন, বিদায় লইবার সময় তিনি অশ্রুজল সম্বরণ করিতে পারেন নাই। দেশের জন্যে এই লাঞ্ছনা ও কষ্টভোগ বলিয়া অন্য সকলকে দেখাইয়া দুঃখ করিতেন, "দেখ, ইঁহারা ভদ্রলোক, ধনী লোকের সন্তান, গরীবদুঃখীকে পরিত্রাণ করিতে গিয়া ইঁহাদের এই দুর্দ্দশা।" যাঁহারা পাশ্চাত্য সভ্যতার বড়াই করেন, তাঁহাদের জিজ্ঞাসা করি, ইংলণ্ডের জেলে নিম্নশ্রেণীর কয়েদী চোর ডাকাত খুনীর এইরূপ আত্ম-সংযম দয়াদাক্ষিণ্য কৃতজ্ঞতা পরার্থে ভগবৎভক্তি কি দেখা যায়! প্রকৃতপক্ষে য়ুরোপ ভোক্তৃ-ভূমি, ভারত দাতৃভূমি। দেব ও অসুর বলিয়া গীতায় দুই শ্রেণীর জীব বর্ণিত আছে। ভারতবাসী স্বভাবতঃ দেবপ্রকৃতি, পাশ্চাত্যগণ স্বভাবতঃ অসুর প্রকৃতি। কিন্তু এই ঘোর কলিতে পড়িয়া তমোভাবের প্রাধান্যবশত আর্য্য-শিক্ষার অবলোপে দেশের অবনতি, সমাজের অবনতি, ও ব্যক্তিগত অবনতিতে, আমরা নিকৃষ্ট আসুরিকবৃত্তি সঞ্চয় করিতেছি আর পাশ্চাত্যগণ অন্যদিকে জাতীয় উন্নতি ও মনুষ্যত্বের ক্রমবিকাশের গুণে দেবভাব অর্জ্জন করিতেছেন। ইহা সত্ত্বেও তাহাদের দেব-

ভাবে কতকটা আসুরত্ব এবং আমাদের আসুরিক ভাবের মধ্যেও দেবভাব অস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান। তাঁহাদের মধ্যে যে শ্রেষ্ঠ, সেও অসুরত্ব সম্পূর্ণ হারায় না। নিকৃষ্টে নিকৃষ্টে যখন তুলনা করি, ইহার যথার্থতা তখন অতি স্পষ্টরূপে বোঝা যায়।

এই সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিবার আছে, প্রবন্ধের অতিদীর্ঘতার ভয়ে লিখিলাম না। তবে জেলে যাঁহাদের আচরণে এই আন্তরিক স্বাধীনতা দর্শন করিয়াছি, তাঁহারা এই দেবভাবের চরম দৃষ্টান্ত। এই সম্বন্ধে পরবর্ত্তী প্রবন্ধে লিখিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ।

হাফেজ।

আজি প্রেমরসরাগে হৃদ্‌-পানাধার,
কর রাগোজ্জ্বল কর, এ সখে আমার;
রটহ সুকণ্ঠে যত সুভট সুজন,
সংসারের কায হল সুখে সমাপন।

পানপাত্র পূর্ণ হ'লে বিমল সুধায়
প্রিয় মুখচ্ছবি মোরা হেরিয়াছি তায়।
মধুস্বাদ, ভাগ্যহীন, যদি নাহি নিবে,
পানের আনন্দ তবে কেমনে বুঝিবে!

ঋজু তনুলতাখানি তত্ত দিন রবে,
হানিয়া কটাক্ষ বাণ রূপের গরবে,
—যেন চারু দেবদারু প্রেম-তরুবর—
যতদিন নহে পিয়া নয়ন গোচর।

প্রেমেতে সজীব যার হইল হৃদয়
তার কাছে কোথা আছে, বল মৃতুভয়?
—প্রেমিক বলিয়া যবে লিখন পড়িল,
জগতে অমর খ্যাতি বিদিত রহিল।

সদা মধুপায়ী আমি প্রেমী নির্ব্বিচার;
হবিষ্যান্নভোজী তুমি সাধু শুদ্ধাচার;
ধর্ম্মরাজের স্থির তুলাদণ্ড পরে
কি প্রেমিক, কি ধার্ম্মিক, তুল্য মূল্য ধরে।

হে বাতাস, তুমি যদি বহ কোন দিন
পিয়ার নিকুঞ্জবন, করি প্রদক্ষিণ;
কহিও, কহিও তুমি, করিয়া যতন,
শ্রীচরণে অধীনের প্রেম আবেদন।

এখনি কেন হে তুমি স্মরণ হইতে
যতন করিছ মোর এ নাম মুছিতে?
নির্ব্বাণ আসিবে যবে চিরদিন পরে,
আপনি মুছিবে স্মৃতি জগত ভিতরে।

বাঁধিল এ প্রাণ যেবা নিজ প্রেমপাশে,
মত্ততা হেরিতে সে যে বড় ভালবাসে;
তাই মোর শুভাদৃষ্ট প্রসন্ন হইয়া
প্রমত্তের দলে মোর দিয়াছে ছাড়িয়া।

অসীম সুনীল এই গগন বিস্তার,
ভাসমান তরিসম শশীকলা আর,
নিখিল সে, নিমজ্জিত গুরু কৃপাবলে
স্বচ্ছ সুবিমল এই পানপাত্র তলে!

শিশির বাতাসে যথা কমল মুদিল,
প্রাণ যদি প্রেমাবেশে তেমনি হইল,
মানস-মরাল, হৃদ্‌ পদ্মবনে কবে,
প্রণয়-মৃণাল-পাশে ধরা দিবে তবে!

হাফেজ, প্রেমাশ্রুধারা কর বরিষণ,
—ব্যাধ যথা শস্যকণা করে বিকীরণ;
সে প্রেম বিহঙ্গরাজ হয়তো দেখিবে,
[illegible]

৺রাজনারায়ণ বসু।

সুখের বিষয়, বঙ্গসাহিত্যে জীবনচরিতের অভাব ক্রমশঃ দূরীভূত হইতেছে। এমন কি দুএকখানি উল্লেখযোগ্য 'আত্ম-চরিত'ও প্রকাশিত হইয়া বঙ্গসাহিত্যের গৌরব বৃদ্ধি করিতেছে। তন্মধ্যে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের 'আত্মচরিত' সর্ব্বাগ্রগণ্য। সম্প্রতি রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের আত্মচরিত প্রকাশিত হইয়াছে। এ প্রবন্ধে উহাই আমাদের সমালোচ্য বিষয়। 'রাজনারায়ণ' বসুর নাম জানেনা এমন লোক অল্পই আছে। 'একাল সেকালের' রাজানারায়ণ,—কবিবর মধুসূদনের 'প্রিয়রাজ,' ব্রাহ্মসমাজের উজ্জ্বলরত্ন রাজনারায়ণ বসুকে বাঙালীকে আর চিনাইয়া দিতে হইবে না। অরবিন্দ ও বারীন্দ্র তাঁহারই দৌহিত্র এবং সুপ্রভাত মাসিক পত্রের সম্পাদিকা কুমারীরত্ন কুমুদিনী মিত্র তাঁহারই দৌহিত্রী।

সংক্ষেপে তাহার জীবনী নিম্নে প্রদত্ত হইল। ১৭৪৮ শকে (ইংরাজী ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে ২৪ পরগণার অন্তর্গত বোড়াল গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ বেশ বর্দ্ধিষ্ণু লোক ছিলেন। হেয়ার স্কুলে তাঁহার ইংরাজি পাঠাভ্যাস আরম্ভ হয়—পরে তিনি হিন্দু স্কুলে প্রবেশ করেন। সকলেই জানেন তিনি একজন মেধাবী ছাত্র ছিলেন। তাঁহার বাল্য সঙ্গীগণ পরে এক এক দিকপাল হইয়াছিলেন। মাইকেল মধুসূদন দত্ত, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর, প্যারিচরণ সরকার প্রভৃতি এই সময়কার ইতিহাসখানি অতি সুন্দর ভাবে প্রস্ফুট করিয়াছেন! জন ষ্টুয়ার্ট মিল তাঁহার আত্মচরিতে লিখিয়াছেন; তাঁহার জীবনীতে তাঁহার বাল্যকালের ইতি-হাসটা বর্ণনা করা প্রয়োজন, কারণ ঐ সময়-কার শিক্ষাপ্রণালী চিন্তার বিষয়! বাস্তবিক রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের শৈশবে কিরূপ শিক্ষাপ্রণালী প্রচলিত ছিল—তাহার ফলাফলই বা কিরূপ হইয়াছিল, তাহা বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসের বিষয়। সেই সময় ইংরাজি শিক্ষা-স্রোতে যেমন নূতন জ্ঞান আসিয়াছিল—তেমনি সঙ্গে সঙ্গে সেই স্রোতের উপর অনেক আবর্জ্জনা আসিয়া বঙ্গদেশ কলুষিত করিয়া ফেলিয়াছিল। মদ্যপান ও আনুসঙ্গিক বৈদেশিক রুচি, আচার ব্যবহার তখনকার সভ্যতার একটা অঙ্গ ছিল! কিন্তু তখনকার দিনে যেরূপ জ্ঞানপিপাসা ছিল এখন সেরূপ দেখা যায় না। তখন ছাত্রাবস্থায় অনেকে অতি সুকঠিন দর্শনগ্রন্থ পাঠ করিয়া ফেলিতেন এবং তাহা লইয়া আলোচনা করিতেন।

ছাত্রাবস্থায় রাজনারায়ণ "পবলিক্ স্পিরিটের" পরিচয় দিয়াছিলেন। হেয়ার স্কুলে পড়িবার সময় তিনি স্বয়ং হস্তযন্ত্রে মুদ্রিত একটি সংবাদ পত্র প্রতি সোমবার বাহির করিতেন। ছাত্রজীবনে তিনি যে সকল মনস্বী শিক্ষকের অধীনে বিদ্যাভ্যাস করিয়াছিলেন, তাঁহারা অনেকেই "সংশয়বাদী" ছিলেন। শিক্ষকের প্রভাব ছাত্রগণের উপর যথেষ্ট কার্য্য করিয়াছিল। তাঁহার সহধ্যায়ী জ্ঞানেন্দ্রমোহন ও মধুসূদন খ্রীষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করেন। রাজনারায়ণও প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মে ভক্তিবান্ ছিলেন না।

আমরা শুনিয়াছি লালাবাবু দিনান্তে এক-দিন সামান্য এক ফকিরের গান শুনিয়া সহসা সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ

ঘটনাক্রমে উপনিষদের একখানা ছেঁড়া পাতা পড়িয়া ধর্ম্মজীবনে প্রবেশ লাভ করেন। রাজনারায়ণও Cyruse's Travel by Chevalier Ramsay পাঠ করিয়া পৌত্তলিক ধর্ম্মের উপর অবিশ্বাসী হইয়া উঠেন। তৎপরে মহাত্মা রামমোহন রায়ের appeals to the Christian Public in favour of the Precepts of the Jeasus; এবং Channing এর গ্রন্থ পাঠ করিয়া তিনি মনে মনে Unitarian ভাবাপন্ন খ্রীষ্টান হন। তৎপরে সেল সাহেবের কোরাণ ও গিবনের রোম রাজ্যের ইতিহাসের কয়েক অধ্যায় পাঠ করিয়া মুসলমান ধর্ম্মের অনুকূলে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন তিনি প্রথমে মুসলমানধর্ম্মের ভান্ করিয়াছিলেন কিন্তু পরে যথার্থই মুসলমানধর্ম্মের পক্ষপাতী হন। ইনি কলেজ ছাড়িবার প্রাক্কালে হিউম পাঠ করিয়া 'সংশয়বাদী' হন এবং সর্ব্বশেষে কলেজ পরিত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রথম প্রচারক, লালা হাজারিলালের সংসর্গে আসিয়া ১৮৪৬ সালের প্রারম্ভে যথারীতি প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করেন। এই সময় হইতে তিনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সহিত ঘনিষ্ঠরূপে পরিচিত হইয়া ব্রাহ্মসভার কার্য্যে যোগদান করিতে আরম্ভ করেন।

১৮৪৮ সালের প্রথমে সমাজের কার্য্যালয়ের সহিত—কার্য্যের সহিত নহে—সম্পর্ক পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। তৎপরে ১৮৪৯ সালের মে মাসে সংস্কৃত কলেজের দ্বিতীয় ইংরাজি শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন। ১৮৫১ সালে ফেব্রুয়ারী মাসে সংস্কৃত কলেজ হইতে মেদিনীপুর জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া দীর্ঘ ১৫ বৎসর ধরিয়া যশের সহিত ঐ কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। পরে শিরঃপীড়া রোগে আক্রান্ত হওয়ায় তাঁহাকে ঐ কার্য্য পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইতে হয়। ঐ সময়ে তিনি যে যে কার্য্য করেন তাহা সংক্ষেপে নিম্নে লিখিত হইল।

(১) মেদিনীপুর ব্রাহ্মসমাজের পুনঃ সংশোধন ও উন্নতি সাধন।

(২) জাতীয় গৌরব সম্পাদনী সভা-সংস্থাপন।

(৩) সুরাপান নিবারণী সভা স্থাপন।

(৪) বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা।

(৫) বক্তৃতা প্রদান, ধর্ম্মতত্ত্বদীপিকা ও ব্রাহ্মধর্ম্মসাধন গ্রন্থ প্রচার।

(৭) Defence of Brahmoism and The Brahmo Samaj নামক বক্তৃতা প্রণয়ন।

মেদিনীপুরে থাকিয়া তিনি যেরূপ পরিশ্রম করিতেন তাহার বিস্তৃত কাহিনী তাঁহার গ্রন্থে বর্ণিত আছে। বলা বাহুল্য, শুধু ধর্ম্ম কেন, তিনি এদেশের সামাজিক ও শারীরিক উন্নতি কল্পেও যথেষ্ট সচেষ্ট ছিলেন। মেদিনীপুরে থাকিতেই তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বীগণের মধ্যে একটি নূতন প্রথা প্রবর্ত্তিত করেন—সেটি নৈসর্গিক শোভার মধ্যে কখনো কখনো উপাসনা! বসন্তকালে গো গিরিতে তাঁহাদের বসন্তোৎসব হইত। এই উপলক্ষে তিনি প্রতি বৎসর যে সকল বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহা "বসন্তকুজন" নামে পরে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। মেদিনীপুর পরিত্যাগ করিয়া তিনি যে সকল কার্য্য করিয়াছিলেন তাহার প্রধান কয়েকটী নিম্নে উল্লিখিত হইল।

(১) ব্রাহ্মদিগের নরপূজা নিবারণ।

(২) হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা বিষয়ে বক্তৃতা।

(৩) বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা।

(৩) 'বৃদ্ধ হিন্দুর আশা' নামক পুস্তক প্রণয়ন।

(৫) সেকাল ও একাল বিষয়ক বক্তৃতা।

১৮৫৬ সালে বিধবা-বিবাহের আন্দোলন উঠে। তৃতীয় ও চতুর্থ বিধবাবিবাহ তাঁহার জাঠতুতো ভাই দুর্গানারায়ণ বসু ও তাঁহার সহোদর মদনমোহন বসু করেন। সংস্কার সম্বন্ধে তাঁহার কার্য্যতঃ সহানুভূতি ইহাপেক্ষা আর অধিক কি হইতে পারে? বলা বাহুল্য এইজন্য তাঁহাকে যথেষ্ট নির্য্যাতন সহ্য করিতে হইয়াছিল—কিন্তু কিছুতেই তিনি বিচলিত হন নাই।

পরে স্বাস্থ্য উন্নতির আশায় উত্তর পশ্চিম প্রদেশে ভ্রমণ করিতে গিয়া এলাহাবাদ লক্ষ্ণৌ, কানপুর প্রভৃতি স্থানে তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মের কল্যাণকল্পে যথেষ্ট কার্য্য করেন। তিনি যখন কানপুরে অবস্থিতি করিতেছিলেন,—তাহার কিছু পূর্ব্বে মহাত্মা কেশবচন্দ্র আদি ব্রাহ্মসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়েন। এ সময় আদি ব্রাহ্মসমাজ ও ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম-সমাজ উভয়ের মধ্যে বিলক্ষণ বিরোধ চলিতে-ছিল। ঐ বিরোধের কারণ এখন ঐতিহাসিক তথ্য হইয়া পড়িয়াছে এ বিষয়ে আলোচনা অনাবশ্যক। ইহার পর আলোচ্য গ্রন্থে তাঁহার জীবনী ধারাবাহিক বর্ণিত হয় নাই। প্রসঙ্গতঃ দু একটী কার্য্যের উল্লেখ আছে। এবং গ্রন্থখানিও অসম্পূর্ণ।

রাজনারায়ণ বাবু যে সময়ে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা যেন সত্যযুগ বলিয়া মনে হয়। রামগোপাল ঘোষ, রামতনু লাহিড়ি, "রাজেন্দ্র মিত্তির" দ্বারিক মিত্র, বিদ্যাসাগর, কৃষ্ণদাস পাল, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র ইহারাই সে যুগের মনস্বী। এখন এ যুগে আর এরূপ বিশাল প্রকৃতি ও বুদ্ধিমান লোক জন্মিতেছে না! শৈশব হইতে রাজনারায়ণ চিন্তাশীল। কালসহকারে সেই বৃত্তি পরিপুষ্ট হইয়া তাঁহাকে গভীর চিন্তাশীল করিয়াছিল। তিনি চিরদিনই স্বজাতি ও স্বদেশী ভাবের পক্ষপাতী—তখনকার দিনে যখন মাতৃভাষা ব্যবহার ঘৃণার কথা ছিল তখন তিনি খাঁটি বাংলা ভাষা ব্যবহার করিতেন। শিক্ষক রূপে কত ছাত্রকে স্বদেশী ভাবাপন্ন করিয়াছেন কে জানে! তাঁহার নীরব প্রভাব সমাজের উপর কতদিকে কত ভাবে কাজ করিয়াছে আমরা তাহা সম্পূর্ণ ভাবে জানিতে বা বুঝিতেও পারি না। সত্যের প্রতি তাঁহার সুগভীর অনুরাগ অনেক সময় তাঁহাকে লোক গঞ্জন-ভাগী করিয়াছে তথাপি তিনি সত্যের পথ হইতে কখনও বিচলিত হন নাই। এ বিষয়ে তিনি বন্ধুবান্ধবের মুখাপেক্ষী ছিলেন না; সত্যের অনুরোধে অনেক সময় বন্ধুদের নিকটও তাঁহাকে অপ্রিয় হইতে হইয়াছে। তাঁহার আত্মচরিত আমরা দেশের আবালবৃদ্ধবনিতাকে পড়িতে অনুরোধ করি।

পোষ্যপুত্র।

পূর্ব্বে যে শোকসন্তপ্ত অকালবৃদ্ধ শীতল প্রকৃতি শ্যামাকান্ত চৌধুরীর সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হইয়াছে তিনি চিরদিন এমন ছিলেন না। এমন একদিন গিয়াছে যেদিন এই জমীদার চৌধুরীর নামে তাহার অধীনস্থ সাতখানা তালুকের লোকে থরহরি কম্পিত হইত। "তাঁহারনামে বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খাইত বলিয়া" এখনও একটা অবিশ্বাস্য প্রবাদ কথা দেশে চলিত আছে। শ্যামাকান্তের অনেক-গুলি পুত্র কন্যার মধ্যে অবশিষ্ট একমাত্র পুত্র বিনোদ কুমারকে স্বামীর হস্তে সমর্পণ করিয়া বিনোদের মা যখন তাঁহার সাধের সংসার পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান তখন সে দশ বৎসরের বালক মাত্র।

জমীদারের একমাত্র পুত্র তাহাতে আবার মাতৃহীন হইল—মাসী পিসি ও পাড়াপড়সী সকলকার অপর্য্যাপ্ত আদরে সে একেবারে মাথায় চড়িয়া বসিল। প্রথমে বেশি আদর দিয়া ফেলিয়া পিতাও অবশেষে অনুতপ্ত হইয়া উঠিলেন।

তাঁহার ইচ্ছা পুত্র কলেজের ছেলেদের মধ্যে প্রথম শ্রেণীর আসন গ্রহণ করে। কিন্তু পুত্র লেখাপড়ার প্রতি ঔদাসিন্য প্রদর্শন করিয়া গরীব প্রজাদের ঘরে, তাঁতিজোলার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতে ভালবাসে। কেমন করিয়া ন্যাস' ও যোগ' করিতে হয় আচার্য্য মহা-শয়ের নিকট তাহারি তত্ত্বানুসন্ধান করিতে যায়। সমস্ত মোহমুদ্গারটা মুখস্থ করিয়া আবৃত্তি করিয়া বেড়ায় কিন্তু স্কুলের পড়ার বেলায় মাষ্টার একটু পীড়াপিড়ি করিলেই তাঁহার সহিত তর্ক করিয়া বলে, ওসব ছাই ভস্ম পড়ে কি হবে। দেখিয়া শুনিয়া ক্ষুন্ন পিতা রাগিয়া একদিন পুত্রকে অত্যন্ত ভর্ৎসনা করিলেন বলিলেন "যদি ফেল হোস্ তো আমি কাশী চলে যাবো"। বিনোদ পিতার ভয়ে পাঠাভ্যাস করিতে লাগিল। তাহার বুদ্ধির অভাব ছিল না, কয় মাস পরে সম্মানের সহিত সে পরীক্ষোত্তীর্ণ হইল। শ্যামাকান্ত পরীক্ষার ফল জানিতে স্বয়ং কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। পিতা পুত্র উভয়েই এসময় নিমন্ত্রিত হইয়া রজনীনাথের বাড়ী বাস করিতেছিলেন।

আজি কালিকার দিন ব্যবসা বাণিজ্য শিক্ষার জন্য বিলাত যাত্রা উচিত কিনা একদিন সন্ধ্যায় এই বিষয়ে তাঁহাদের মধ্যে একটা তর্ক উঠিল। শ্যামাকান্ত এই অনার্য্য মতের বিরুদ্ধে তীব্রকণ্ঠে প্রতিবাদ করিয়া উঠিলেন। উভয় পক্ষে বেশ একটি বাক্য যুদ্ধ বাধিয়া গেল। রজনীনাথ ধীরভাবে কহিলেন "আপনাদের মধ্যে কেহই বোধ হয় অস্বীকার করিবেন না যে আমাদের দেশে সম্যক্‌রূপে বিজ্ঞান চর্চ্চার প্রয়োজন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমাদের মধ্য হইতে বুদ্ধিমান যুবক নির্ব্বাচিত হইয়া ইউরোপ ও আমেরিকায় বিজ্ঞানশিক্ষা করিতে যাওয়া কর্ত্তব্য।

"কিন্তু বিজ্ঞান শিক্ষার আবশ্যকতার জন্য দেশত্যাগ করিবার আবশ্যক কি? দেশে থাকিয়াও কি বিজ্ঞান চর্চ্চা করা চলে না? কেন ইউরোপ হইতে শিক্ষিত লোক আনিয়া যদি বড়লোকেরা কল কারখানা স্থাপন করিয়া শিক্ষার উপায় করিয়া দেন তাহা হইলে

তো চলিতে পারে। তবে শিক্ষার ছল করিয়া শাস্ত্র বিগর্হিত পথাবলম্বনে প্রয়োজন কি ?" রজনীনাথ অতিশয় উত্তেজিত ভাবে ইহার প্রতিবাদ আরম্ভ করিলেন।

এইরূপে উভয় পক্ষে বাদানুবাদ চলিতে লাগিল, বিনোদকুমার একপাশে বসিয়া অত্যন্ত আগ্রহের সহিত সমস্ত শুনিতে লাগিল এবং প্রস্তরে যেমন চিরস্থায়ী চিহ্ন অঙ্কিত হইয়া যায় তেমনি করিয়া রজনীনাথের সত্যকথা গুলা তাহার মস্তিষ্কের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া বসিতেছিল। যথাসময়ে তাঁহাদের বাদানুবাদ শেষ হইল। রজনীনাথের কথাই যুক্তিপূর্ণ, কিন্তু যুক্তি শ্যামাকান্তের মর্ম্মস্পর্শ করিল না, তিনি হার মানিতে চাহিলেন না, অসার তর্কে স্বপক্ষ সমর্থনে প্রবৃত্ত হইলেন, রজনীনাথ গতিক বুঝিয়া ক্রমশ অন্য কথা পাড়িলেন। শ্যামাকান্ত ভাবিলেন—তাঁহারই জয়। কিন্তু বালক বিনোদের বিচারে পিতা সম্পূর্ণ পরাজিত হইলেন। বিনোদ রজনীনাথের সমস্ত কথা গুলি একান্ত সত্য বলিয়া গ্রহণ করিল। সে ভাবিল সত্যই শিল্পবিজ্ঞানশিক্ষাই আমাদের পতিত জাতির উদ্ধারের একমাত্র পথ—ইংরাজ-বণিকগণ বিদেশীয় দ্রব্য আনিয়া আমাদের মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইতেছে আর আমরা তাহার প্রতিকার চেষ্টা না করিয়া কেবলি হাহাকার করিতেছি অথচ ইহার প্রতিকার কত সহজ।

পরদিন কোর্টের কাজটুকু সারিয়া শ্যামাকান্ত চৌধুরী রজনীনাথের সহিত তাঁহার গৃহে ফিরিয়া যখন জলযোগে বসিয়াছেন এমন সময় গৃহস্বামীর পাঁচ ছয় বৎসরের কন্যা শান্তিলতা তাহার ক্ষুদ্র নীলাম্বরী সাড়ির অঞ্চলে মাথার কালোচুল ঢাকিয়া মোটা মোটা শুভ্রহস্তে পানের ডিবে লইয়া তাঁহাদের সম্মুখীন হইল।

বালিকার অম্লান কচি মুখখানিতে স্বর্গের জ্যোতি, পুষ্পপুট তুল্য অধর প্রান্তে মধুর হাসি। রজনীনাথ কন্যাকে কোলে বসাইলেন, সে পিতার অঙ্ক হইতে আস্তে ব্যস্তে নামিয়া দাঁড়াইয়া চুপি চুপি পিতাকে একটু ধমক দিল "আমি এখন বড় মেয়ে হয়েছি কোলে বস্‌বো কি, কাজ কর্ব্বো না ?"

শুনিয়া শ্যামাকান্ত হাসিয়া উঠিলেন, "সত্যিই তো মস্ত মেয়ে হয়েছে যে, বাঃ আবার ঘোমটা দেওয়া হয়েছে! এস তো বুড়ি কেমন বউ হয়েছ দেখি"—সপ্রতিভ বালিকা সচ্ছন্দে অপরিচিতের নিকট গিয়া দাঁড়াইল; শ্যামাকান্ত সস্নেহে হাসিয়া বলিলেন "বাপের উপযুক্ত মেয়ে বটে! রজনীবাবু আপনার মেয়ে ত বড় সুন্দরী! যাদের বৌ হবে তাদের ঘর আলো কর্ব্বে। হাঁগা লক্ষ্মী তুমি আমার বউমা হবে ?

পার্শ্বোপবিষ্ট বিনোদ কুমারের মুখ লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল সে এতক্ষণ নিঃসঙ্কোচে ক্ষুদ্র বালিকাকে দেখিতেছিল কিন্তু এখন বাধ্য হইয়া তাহাকে মাথা নীচু করিতে হইল। যদিও সে জানিত তাহার পিতার এ তামাসার মধ্যে একবিন্দুও সত্যের আলোক নাই কেননা সে অষ্টাদশ বৎসরের যুবক এবং রজনীনাথের কন্যা ছয় বৎসর বয়স্কা বালিকা মাত্র।

রজনীনাথ সকৌতুকে হাসিয়া বলিলেন "বেশ তো আপনি আমার মেয়েটী নিয়ে আপনার ছেলেটি আমায় দিন না, আমি ওকে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং শিখতে বিলেত

পাঠাই। এমন বুদ্ধিমান উন্নতিশীল ছেলেই তো আমাদের ভবিষ্যৎ ভরসা।"

এ তামাসা প্রৌঢ় জমীদারের ভাল লাগিল না তিনি ইহাতে কান না দিবার ভাণ করিয়া শান্তির সুগোল নরম হাতখানি ধরিয়া তাহাকে কাছে টানিয়া লইলেন। "কেমন বুড়ি আমার বৌমা হবে তো? আমার বাড়ী গিয়ে আমায় পান সেজে দিতে পারবে?"

নির্লজ্জা বালিকা পিতার সম্মুখেই অপরিচিতের প্রস্তাব অনুমোদন করিয়া খুসী হইয়া বলিল "হবো, আমি পান সাজতে পারি, কমলানেবু ছাড়াতে পারি, কলাই সুঁটী ছাড়াতে পারি, সব পারি।"

উভয়ে হাসিয়া উঠিলেন। বিনোদ ঈষৎ হাসিল কিন্তু তাহার মন তখন চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল; সে ভারি অন্যমনা হইয়া ভাবিতে ছিল "রজনী বাবু যা বল্লেন বাবাতো তা কানেও তুল্লেন না, বোধ হয় তামাসা বলে গ্রাহ্যই কল্লেন না। কিন্তু আমি এই প্রতিজ্ঞা কল্লেম আমি বিলেত যাবই যাবো; আর এসে রজনী বাবু যেমন বলচেন তেমনি করে দেশের উপকার করবো, এতে আমার যতো বাধা বিঘ্ন ঠেলতে হয় সব তাতেই আমি প্রস্তুত আছি। সত্য, আমরা কি মানুষ! নিরুদ্যম নিরুৎসাহ শেকলবাঁধা কুকুরের মত জীবন—এ কি মানুষের জীবন!"

শ্যামাকান্ত বলিলেন "রজনীবাবু বিনোদের উপযুক্ত একটী পাত্রী স্থির করে দিতে পারেন? বিনোদের বিয়ের জন্য আমি বড় ভাবনায় পড়েছি; ঘটক ব্যাটারাও জ্বালাচ্চে, একটী সুন্দরী মেয়ে পেলে শীঘ্রই বিয়ে দিয়ে ফেলি, আমার তো জানেন ঘর দ্বার সব শূন্য—বৌমা না হলে আর মানায় না। লক্ষ্মীহীন সংসার যেন শ্মশান হয়ে আছে।

রজনীবাবু একটু হতাশভাবে বলিয়া উঠিলেন "বিয়ে! এখন কেন? এত অল্প বয়সে বিয়ে দেওয়া উচিত নয়। বিনোদের মত ছেলের এখন অনেক উন্নতির আশা আছে; অসময়ে বিবাহ দিলে সমস্তই ধুলিসাৎ হয়ে যাবে।"

"না হে না তোমরা নব্য তন্ত্রের লোক তোমরা এখন সাহেবদের মতন বুড় করে ছেলে মেয়ের বে দেওয়া ভালবাসো; সেটা মহৎ অনিষ্টকারক; আমাদের সেই সাবেক চালই ভাল। আমার যখন বিবাহ হয় তখন আমার বয়স বার বৎসর আর বিনোদের গর্ভধারিণী তখন সাত বৎসরের। আমি যদিও নিতান্ত বালিকা পছন্দ করি না; দশ এগারো বৎসরের একটী ভদ্র ঘরের মেয়ে চাই। কিন্তু মেয়েটী খুব সুন্দরী হওয়া চাই"—বলিয়া ক্রোড়স্থা শান্তিকে চুম্বন করিলেন, "এই এমনি বউটী আমি চাই, পাবোনা? আহা বুড়ি যদি দু বছর আগে আসতিস্?" রজনীনাথ ঈষৎ স্নেহগর্ব্বে কন্যার দিকে একবার নেত্রপাত করিয়া মৃদু হাসিলেন; "কেন পাবে না আচ্ছা আমি দেখবো, জগৎপুরের ভাদুড়ীরা আমার মক্কেল তাদের বাড়ি একটী মেয়ে আমি একবার দেখেছিলাম সেটি আমার লতির চেয়েও সুন্দর।"

"এর চেয়ে সুন্দর কি আছে রজনীবাবু!"

বিনোদ পিতার এই অসময়োপযোগী প্রস্তাবে মনে মনে একটু বিরক্ত হইয়া উঠিতেছিল। কিন্তু তাঁহার বালিকার

প্রতি অত্যধিক আকর্ষণের উক্ত কথায় ঈষৎ কৌতূহলের সহিত গোপন কটাক্ষে একবার তাহার দিকে চাহিল। বালিকা তাহার পিতার ক্রোড়ে বসিয়া তাঁহার চেইন ধরিয়া নাড়া চাড়া করিতেছে, তাহার মাথার কাপড় খসিয়া পড়িয়াছে; গুচ্ছ গুচ্ছ কালো চুলের মধ্যে প্রফুল্ল সুন্দর মুখটী সবুজ পাতার মাঝখানে গোলাপের মত যেন ফুটিয়া রহিয়াছে। বিনোদের মনে একটা স্নেহের ভাব উদয় হইল।

বাড়ী গিয়াই বিনোদ বিলাত যাইবার কথা পাড়িল। একপক্ষে অনুনয় উপরোধ অন্যপক্ষে তিরস্কার তাড়না চলিল। ইহার শেষ ফল ফলিল বিনোদ দৃঢ়ভাবে বলিল, "সে বিলাত' যাইবেই; পিতা হইয়া পুত্রের উন্নতিতে বাধা দেওয়া তাঁহার উচিত নয়।" পুত্রের ধনুর্ভঙ্গ পণ দেখিয়া পিতা রাগিয়া তাহাকে যথেচ্ছ কটু ভাষা প্রয়োগ করিলেন; "যদি তুই এমন বেল্লিক-মত না ছাড়িস তো আমার বাড়ি থেকে দূর হয়ে যা, আজ থেকে আমি তোর মুখ দেখবো না; তুই আমার ত্যজ্য পুত্র! তোর জন্য আমি জাত হারাবো? তার চেয়ে অপুত্রক হওয়াও ভাল।" বিনোদও দৃঢ়সংকল্প। সে সেইদিনই পিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। নবীন জীবনে লোকে সুদূর অন্ধকার কল্পনা করিতে পারে না— আশার সূর্য্যালোকে তাহার প্রাণমন এমনি আলোকিত করিয়া রাখে! বিনোদ ভাবিল সে যেমন করিয়াই হোক বিলাত যাইবে। এবং যখন কৃতকার্য্য হইয়া দেশে ফিরিবে তখনই পিতার সহিত দেখা করিবে, তাহার পূর্ব্বে নহে।

সমালোচনা।

স্বদেশ-কুসুম। বঙ্গলক্ষ্মী সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুধাকৃষ্ণ বাগচি প্রণীত। কলিকাতা, ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য দুই আনা মাত্র। গ্রন্থখানি স্বদেশী ছড়ার সমষ্টি! লেখকের উদ্দেশ্য সাধু এবং অভিনব তজ্জন্য তিনি সকলের ধন্যবাদের পাত্র। তবে গ্রন্থখানিতে লেখকের অক্ষমতা প্রতিপত্রে জাজ্বল্যমান হইয়া উঠিয়াছে। ছন্দের সরলতা ও সরসতাই ছড়ার প্রাণ, কিন্তু স্বদেশ-কুসুমের ছড়াগুলিতে না আছে ছন্দ, না আছে সরসতা। 'স্বদেশীর' ধুয়া-ধরা রচনামাত্রই যে সাহিত্যে স্থান পাইবে, এমন কথা নাই। এই শ্রেণীর লেখকগণ সে কথাটি মনে রাখেন না বলিয়াই 'স্বদেশীর' নামে বাঙলা সাহিত্যে আজ রাশি-রাশি আবর্জ্জনা জমিয়া উঠিতেছে। ইহা স্বদেশী বা সাহিত্য কাহারো পক্ষে গৌরবের কথা বলিয়া মনে হয় না! "জন্মভূমির সেবা খোকা করবে সব সময়। আর করিবে দেশের যাতে মহান্ উপকার হয়!" "ছিলেন রাণীগঞ্জে রমাকান্ত রায় মহাশয়; সব আগে বাঙলাদেশে তিনিই সৃজন করে গ্যাছেন জাতীয় বিদ্যালয়।" প্রভৃতি ছড়া যে শুধু 'দংষ্ট্রচূর্ণকারী' তাহা নহে, ভাষা ও সাহিত্যের প্রতিও রীতিমত অত্যাচার!

বিবাহ-মঙ্গল। শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম, বোলপুর। প্রকাশক, শ্রীযুক্ত মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়। ২০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কান্তিক প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য ।৵০ ছয় আনা মাত্র। ঋগ্বেদসংহিতা, ব্যাসসংহিতা, অথর্ব্ববেদ, মনু প্রভৃতি হইতে বিবাহের মন্ত্র, বরবধূর আশীর্ব্বাদ, প্রার্থনা, পতিপত্নীর সম্পর্ক ইত্যাদির নিপুণ অনুবাদ সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় গ্রন্থখানিতে সংগৃহীত ও লিপিবদ্ধ হইয়াছে। প্রতি-

শেষে কবিবর রবীন্দ্রনাথ রচিত বিষয়োপযোগী তিনটি সঙ্গীতও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সংস্কৃতের অনুবাদগুলি বালিকানববধূরও সুবোধ্য। গোলাপী মলাটে লাল শিল্কের বাঁধাই, ও লালকালিতে পরিষ্কার ছাপাটুকু উৎসবের মঙ্গল আলোকচ্ছটার ন্যায় বিবাহিত জীবনের স্থায়ী মঙ্গলের শুভসূচনা করিতেছে। বন্ধুবান্ধব বা আত্মীয় স্বজনের শুভপরিণয়ে উপহার প্রদানের নিমিত্ত অনেকে মনোজ্ঞ গ্রন্থের অন্বেষণ করিয়া থাকেন, এই গ্রন্থখানি সেই সময় উপহার দিবার পক্ষে যে সম্পূর্ণ উপযোগী, তাহা আমরা অসঙ্কোচে বলিতে পারি।

সারস্বতকুঞ্জ। গদ্যসাহিত্য। শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মজুমদার, এম, আর, এস। কুন্তলীন প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য আট আনা। রাজসংস্করণ এক টাকা। লেখক অতিসংক্ষেপে এই গ্রন্থে বাঙালা গদ্য সাহিত্যের পরিচয় দিয়াছেন। গ্রন্থের প্রথমাংশে গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস-বর্ণমালার সৃষ্টি হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক সাহিত্য পর্য্যন্ত—২৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হইয়াছে ও শেষাংশে ২১ পৃষ্ঠায় অক্ষয়কুমার, ঈশ্বরচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র প্যারীচাঁদ, দীনবন্ধু, ভূদেব, দ্বিজেন্দ্রনাথ, ও কালীপ্রসন্নের অতি সংক্ষিপ্ত জীবনী ও গ্রন্থ পরিচয়! এরূপ 'চুট্‌কি' রচনার বিশেষ সার্থকতা না থাকিলেও ইহা দ্বারা প্রধান প্রধান সাহিত্যিকদিগকে আমরা জানিতে পারি;—তাহাও কম কথা নহে। তবে লেখকের ভাষা স্থানে স্থানে নিতান্তই উদ্ভট। দৃষ্টান্তস্বরূপ দু একটির উল্লেখ করা যাইতে পারে—"জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের কোলাহলের ভিতরে কথিত ভাষার জন্ম। ইহা ব্যস্ততার সময় মুখ হইতে বহির্গত হইয়া একের মনের ভাব অন্যের নিকট ব্যক্ত করে।" ভাষার প্রতি আজিকালিকার লেখক সম্প্রদায়ের বড়ই ঔদাসীন্য লক্ষিত হইতেছে,—ইহার কারণ কি?

দেবালয়। মাসিকপত্র ও সমালোচন। প্রথম ভাগ বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৬। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১।০ মাত্র। কার্য্যালয় ২১০।৩।২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। 'সূচনাতে' শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় বলিতেছেন, "ধর্ম্মেও সকল মানুষের একত্রে দাঁড়াইবার সাধারণ ভূমি আছে। ইহাতেও সহযোগিতা সম্ভব। এই সত্যের উপর দেবালয় সমিতি প্রতিষ্ঠিত। 'দেবালয়' নামক মাসিকপত্র দেবালয় সমিতিরই মুখপত্র। সকল সম্প্রদায়ের লোকে দেবালয়ের উদ্দেশ্য স্মরণ রাখিয়া ইহাতে ধর্ম্ম বিষয়ক নানা প্রসঙ্গের আলোচনা করিতে পারিবেন। এরূপ একখানি পত্রিকার প্রয়োজনীয়তা বিশেষরূপে অনুভূত হইতেছিল। ধর্ম্মকথা বলিতে হইলে প্রচারক বা শিক্ষক এমনি গম্ভীর হইয়া বসেন যে সাধারণের পক্ষে তাহার মর্ম্মগ্রহণ করা দুঃসাধ্য ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায়। 'দেবালয়ে' বেশ সহজ কথায় সরলভাবে নানাবিধ ধর্ম্মের আলোচনা ভবিষ্যৎ শুভফলের সূচনা করিতেছে। পূর্ব্বে যাত্রা কথকতা প্রভৃতির মধ্য দিয়া ধর্ম্মালোচনা সাধারণের পক্ষে যেমন সুবোধ্য তেমনি সুলভও ছিল। আজ তাহা আর নাই—যাঁহারা কথকতা প্রভৃতি করিতে বসেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই হাত নাড়িয়া বাজে কথারই ঝড় উড়াইয়া যান, ইহার ফলও তেমনি হইতেছে। সুতরাং 'দেবালয়ের' প্রতিষ্ঠায় বিশেষ উপকারের সম্ভাবনাই মনে করি। তবে একটি বিনীত নিবেদন, দেবালয়ের লেখকগণ ধর্ম্মালোচনা কালে সকল প্রকার সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ যেন পরিত্যাগ করেন। যাঁহারা লোকশিক্ষা কার্য্যে ব্রতী হইবেন তাঁহাদিগের হৃদয়ে উদারতার অভাব ঘটিলে সকল কার্য্যই বিড়ম্বনা হইয়া পড়ে। বিদ্বেষ সমাজের নিম্নস্তরের লোকের মধ্যে আবদ্ধ থাকিলে সেরূপ ক্ষতির সম্ভাবনা নাই, কিন্তু উর্দ্ধস্তরে উঠিলেই আশঙ্কার কারণ ঘনীভূত হইয়া উঠে।

একটি কথা, শান্তিময়ীর পরিচয় প্রদানের জন্য লোকের নিকট আমরা কৃতজ্ঞ। শান্তিময়ীর কবিতার উদ্ধৃত অংশসমূহ বিশেষ উপভোগ্য। আশা করি শান্তিময়ীর কবিতাগুলি শীঘ্র প্রকাশিত হইয়া কাব্যামোদীর চিত্তরঞ্জন করিবে ও কাব্য সাহিত্যেও আপনার উপযুক্ত স্থান সংগ্রহ করিয়া লইবে।

শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা।

চিত্র-ব্যাখ্যা।

বিরহী যক্ষ—শ্রীযুক্ত যামিনী প্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় কর্ত্তৃক অঙ্কিত চিত্র হইতে। মেঘদূতের বিরহী যক্ষের বিষয় সকলেরই সুপরিজ্ঞাত। নির্ব্বাসিত যক্ষ "আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে" মেঘ দেখিয়া উদ্‌ভ্রান্ত চিত্তে অচেতন মেঘকে প্রিয়ার নিকট দৌত্যে প্রেরণ করিতেছেন।

"প্রত্যাসন্নে নভসি দয়িতাজীবিতালম্বনার্থী
জীমূতেন স্বকুশলময়ীং হারয়িষ্যন্ প্রবৃত্তিম্।
স প্রত্যগ্রৈঃ কুটজকুসুমৈঃ কল্পিতার্ঘায় তস্মৈ
প্রীতঃ প্রীতিপ্রমুখবচনং স্বাগতং ব্যাজহার।"

সদ্য প্রস্ফুটিত কুটজকুসুমদ্বারা অর্ঘ্য রচনা করিয়া পর্ব্বতসানুসংলগ্ন মেঘকে যক্ষ সম্বোধন করিতেছেন। ইহাই শিল্পীর পরিকল্পনা।

অর্দ্ধরাত্রে স্তিমিত প্রদীপে—শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় কর্ত্তৃক অঙ্কিত চিত্র হইতে। শ্রীরামচন্দ্র স্বর্গ-প্রস্থিত হইলে তদীয় পুত্র কুশ উত্তরাধিকারী মনোনীত হন। তিনি তৎকালে অযোধ্যা হইতে কুশাবতী নামক নগরে অবস্থিতি করিতেছিলেন। একদিন অর্দ্ধরাত্রে স্তিমিত-প্রদীপে শয্যাগৃহে কুশ জাগ্রত হইয়া দেখিলেন এক অদৃষ্টপূর্ব্বা রমণী প্রোষিত ভর্ত্তৃকার বেশে কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করিতেছেন। কুশ (পূর্ব্বার্দ্ধ-বিসৃষ্টতল্পঃ) উর্দ্ধশরীর উন্নত করিয়া শয্যায় উঠিয়া বসিয়া তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে রমণী বলিলেন "আমি অযোধ্যা নগরীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। আমার শোচনীয় দশা উপস্থিত। আপনি অযোধ্যাতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া আমাকে সনাথা করুন।" এই উপাখ্যান রঘুবংশের ষোড়শ সর্গে বর্ণিত হইয়াছে। তদনুসারে এই চিত্র পরিকল্পিত। অযোধ্যাধিষ্ঠাত্রী দেবতার অস্পষ্টতা ও কুশের বিস্ময়ভাব সহজেই অনুমেয়।

রাজ্যের কথা।

আমাদের নূতন বিচারপতি।—আমাদের দেশে কথায় বলে যে, পাপের নৌকা যখন ভরিয়া উঠে তখন বিধাতা তাহার দর্পচূর্ণ করিবার জন্য পৃথিবীতে একজন বিশেষ ব্যক্তিকে পাঠাইয়া দেন। আমাদের দেশের বর্ত্তমান সঙ্কট সময়ে প্রধান বিচারপতি জেঙ্কিন্স সাহেবকে সেইরূপ বিধাতাপ্রেরিত বলিয়াই মনে হয়। তিনি তাঁহার কর্ম্মভার গ্রহণ করিয়াই যেরূপ স্বাধীনতা, অপক্ষপাতিতা, ন্যায়-পরায়ণতা ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠা দেখাইয়াছেন, তাহা আজ [illegible]

তাঁহার সুবিচারে বহুা ডাকাতির মামলা হইতে মেদিনীপুর বোমার মামলায় পর্য্যন্ত যেরূপ পুলিস কলঙ্ক ও অত্যাচার কাহিনী প্রকাশ পাইয়াছে, তাহাতে আমরা আশা করিতে পারি যে এতদিনে গবর্মেণ্টের চক্ষু ফুটিবে। পুলিসের প্রতি উক্তরূপ অন্ধবিশ্বাসে যে কেবল প্রজারই অমঙ্গল হইতেছিল তাহা নহে, গবর্মেণ্ট নিজেরও অমঙ্গল ডাকিয়া আনিতেছিলেন মাত্র। জেঙ্কিন্স সাহেব আসিয়া রাজা প্রজা উভয়কেই রক্ষা করিতেছেন।

ডাকাতি ও মেদিনীপুর আপিল।—

আলিপুরে বোমার মামলার পর হইতেই আমরা দেশের বালকগণের নামে অনেক অভিযোগ শুনিলাম। শুধু শুনিলাম এমন না, অনেক অভিযোগে অনেকের অনেক প্রকার কঠিন দণ্ড হইয়া গেল। কিন্তু এ দেশের অভিযোগ ও দণ্ডবিধি যে কি প্রহসন তাহা আমরা মনে মনে বুঝিলেও, এতদিনে তাহা আমাদের প্রধানবিচারপতি জেঙ্কিন্স্ সাহেবের অপক্ষপাত বিচারে জগতের সম্মুখে প্রমাণিত হইল। পরে পরে তিনটি মামলায় আমরা দেখিলাম, দেশের নিরপরাধ বালকগণ পুলিসের ষড়যন্ত্রে অভিযুক্ত ও বিচারকের বিচারভ্রমে দণ্ডিত। বহ্না ডাকাতির পর পুলিশ কয়েকটি বালককে গ্রেপ্তার করিয়া ডাকাত বলিয়া চালান দেয়। অভিযোগ শুধু ডাকাতি নহে, ডাকাতেরা আত্মরক্ষা করিবার জন্য চারি পাঁচজন গ্রামবাসীকে হত্যা পর্য্যন্ত করিয়াছিল। সুতরাং আইন অনুসারে ইহারা প্রাণদণ্ডে দণ্ডনীয়। জেঙ্কিন্স সাহেব বিচার করিয়া যে রায় দিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে আশ্চর্য্য হইয়া ভাবিতে হয় যে আমাদের পুলিস যে কেবল পীড়ণ করিতেই প্রস্তুত তাহা নহে, তাহারা নিরপরাধ ব্যক্তিগণের প্রাণবধেও কুণ্ঠিত নহে। জেঙ্কিন্স সাহেব অভিযুক্তগণকে মুক্তি দিয়া স্পষ্টই বলিয়াছেন; পুলিস যে সকল সাক্ষী ও প্রমাণ উপস্থিত করিয়াছে তাহা অবিশ্বাসযোগ্য এবং এই ব্যাপারের মধ্যে পুলিসের যেরূপ সংস্রব ও কার্য্যনীতি প্রকাশ পাইয়াছে তাহা নিতান্ত অসঙ্গত ও অন্যায়। অথচ এইরূপ অন্যায় নীতি অবলম্বন ও কতকগুলি অবিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ ও সাক্ষী সংগ্রহ করিয়া পুলিস কয়েকটি বালককে প্রাণদণ্ড বা দীপান্তরের জন্য পাঠাইয়াছিল!

তাহার পর নাটোরের মেল ডাকাতির মামলা। ইহাও কেবল ডাকাতি নহে, ডাকাতি ও নরহত্যা। পুলিস যে কয়েকজনকে অপরাধী বলিয়া উপস্থিত করিয়াছিলেন, ন্যায়পরায়ণ জেঙ্কিন্স সাহেব তাহাদিগকে নির্দ্দোষ বলিয়া মুক্তিদান করিয়াছেন।

সর্ব্বশেষে মেদিনীপুরের বোমার মামলা। এ সকলেই জানেন। ইহার রায় শুনিবার জন্য নিরতিশয় ঔৎসুক্যের সহিত দেশের লোক প্রতীক্ষা করিয়া ছিলেন। এ মামলার বিশেষত্ব এই, এক্ষেত্রে যে কেবল পুলিসই সন্তোষ, সুরেন্দ্র ও যোগজীবনকে অপরাধী বলিয়া চালান দিয়াছিলেন তাহা নহে, মেদিনীপুরের সেশন জজ তাহাদিগকে যথার্থ অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া একজনকে দশ বৎসর ও দুই জনকে সাত বৎসর করিয়া সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছিলেন। জেঙ্কিন্স্ সাহেব আপিলে তাহাদিগকে মুক্তি দিয়া তাঁহার রায়ে বলিয়াছেন যে; সন্তোষ ও সুরেন্দ্র যে তাহাদের অপরাধ স্বীকার করিয়াছিল তাহা কেবল পুলিসের তাড়নায় ও ম্যাজিষ্ট্রেটের প্ররোচনায়। ম্যাজিষ্ট্রেট ওয়েষ্টন ও নেলসন সাহেবেরও অনেক অসঙ্গত ও আইন বহির্ভূত কর্ম্ম প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। এ প্রহসন ও অত্যাচারের প্রধান অভিনেতা স্বনামধন্য মৌলবী ও সব্ইন্‌স্পেক্টর লালমোহন।

বাঙ্গালী বালক।—বঙ্গচ্ছেদের পর হইতে আমরা আমাদের দেশের বালকদিগের বিরুদ্ধে অনেক প্রকার অভিযোগ শুনিয়া আসিতেছি। ডাকাতি হইতে রাজদ্রোহিতা পর্য্যন্ত সকলপ্রকার অপরাধেই তাহারা অভিযুক্ত হইয়া আসিতেছে। এ সকল অভিযোগ কতদূর সত্য ও সঙ্গত তাহা বিচারসাপেক্ষ, কিন্তু তাহারা দেশের জন্য যে সকল মহৎ কর্ম্ম ও আত্মোৎসর্গ করিয়াছে তাহা আমরা এবং গবর্মেণ্ট উভয়েই স্বীকার করিতে বাধ্য। কলিকাতায় অর্দ্ধোদয় যোগের সময়ে আমরা আমাদের বালকদের দেশসেবা ও আত্মোৎসর্গের পরিচয় পাইয়াছিলাম এবং গবর্মেণ্টও মুক্তকণ্ঠে তাহাদিগের প্রশংসা করিয়াছিলেন। সেদিন বাজিতপুরের বালকগণ যে একটি মহৎ দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছে তাহা আরও অসাধারণ। গ্রামে জলকষ্ট নিবারণের জন্য নিজেরা মাটি খুঁড়িয়া, পাঁক তুলিয়া একটি বৃহৎ পুষ্করিণীর সংস্কার করিয়াছে। বঙ্গের গ্রামে গ্রামে বালকগণ বাজিতপুরের পদানুসরণ করিলে দেশের

জৈন নারী সম্মিলন।—জাতিগত চরিত্র ও উন্নতির উপর নারীগণের প্রভাব সামান্য নহে। আমাদের দেশের নারীগণ তাঁহাদের অতীত উচ্চ আদর্শ হইতে স্খলিত হইয়া পড়িয়াছেন বলিয়াই আমাদের দেশের এত দুর্গতি! কিন্তু বিধাতার বরে ভারতের নারীগণের মধ্যে আমরা আজকাল আবার একটা জাগরণের ভাব দেখিতে পাইতেছি। যে বঙ্গরমণীকে সকলে এতদিন অত্যন্ত দুর্ব্বলচিত্ত ও ভীরুস্বভাব বলিয়া জানিত, দেশের বর্ত্তমান সঙ্কট সময়ে আজ তাঁহারা অনেকে রাজপুত রমণীর ন্যায় স্বামী পুত্র ভ্রাতাকে দেশের কর্ম্মে প্রাণ পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিতে উৎসাহিত করিয়াছেন এবং সকলেই অন্তরের সহিত স্বদেশের মঙ্গলসাধনে যোগদান করিয়াছেন। বস্তুতঃ বঙ্গনারীর সহায়তা না পাইলে আজ এ দেশে স্বদেশী ও জাতীয়ভাব কি এত প্রবলভাবে প্রচলিত হইতে পারিত! নারী সমাজের এ নবজাগরণ কেবল বঙ্গদেশের মধ্যেই আবদ্ধ নহে। পশ্চিম ভারতেও আমরা ইহার তরঙ্গাঘাত দেখিতে পাইতেছি। সেদিন পুনানগরে জৈন নারীগণের এক বৃহৎ সম্মিলন হইয়া গিয়াছে। সহস্র সহস্র অন্তঃপুরস্থা ও উচ্চপদস্থা নারী এই সম্মিলনে যোগদান করিয়া স্থির করেন যে দেশের মঙ্গলের জন্য তাঁহাদের সমাজস্থ নারীগণের শিক্ষা, চরিত্র ও জীবনকে উন্নত করিবার চেষ্টা করা কর্তব্য। দেশের পক্ষে ইহা কিরূপ শুভলক্ষণ তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন!

বৈদেশিক সংবাদ।

আমরা গত বৈশাখে অতীত বর্ষের আলোচনা-কালে কেবল ভারতবর্ষের কথাই বলিয়াছিলাম। জগতে যখন একটা যুগান্তর আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন তাহার শক্তি একটা দেশ বা জাতীয় গণ্ডীর মধ্যে বদ্ধ থাকিয়াই নিঃশেষ হইয়া যায় না। আসিয়া মহাদেশের মধ্যে এ যুগান্তর প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে প্রথমে জাপানে আসিয়া দেখা দেয়। বিধাতার প্রেরিত সেই আশীর্ব্বাদের স্পর্শমাত্রেই জাপান আত্মোন্নতি আরম্ভ করিল এবং আশ্চর্য্য অল্প সময়ের মধ্যে জগতের উন্নত জাতিগণের মধ্যে প্রধান স্থান অধিকার করিয়া লইল। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের রুষজাপান যুদ্ধে জাপানীর জয় একটি প্রসিদ্ধ এবং আশ্চর্য্য ঘটনা। তাহার পর ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে সেই যুগান্তরের তরঙ্গ পারস্যে গিয়া আঘাত করিল। পারস্যের শাহ অর্থাৎ রাজার একাধিপত্যে ও যথেচ্ছ শাসনে প্রবল প্রতাপ পারস্য জাতি—দিন দিন হীন বল ও অধঃপতিত হইতেছিল। ক্রমে দেশের অবস্থা এত শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল যে শাহ নামেমাত্র

কার্য্যতঃ কর্ত্তা হইয়া উঠেন। এইবার স্রোত ফিরিল। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রজাগণ বিদ্রোহী হইয়া রাজার একাধিপত্য নষ্ট করিয়া আপনাদের প্রতিনিধি গঠিত পার্লামেণ্ট প্রতিষ্ঠায় বদ্ধপরিকর হইল। নিরুপায় দেখিয়া শাহ দেশে পার্লামেণ্ট স্থাপনে স্বীকৃত হইলেন। পার্লামেণ্ট বসিল, শাহের একাধিপত্য ও রুষ ইংরাজের শক্তি নষ্ট হইল। কিছু দিন সকল কাজ বেশ সুশৃঙ্খলায় চলিল, কিন্তু আবার বিদ্রোহ-বহ্নি জ্বলিয়া উঠিল। কারণ বর্ত্তমান বৎসরের প্রথমেই শাহ পার্লামেণ্ট উঠাইয়া দিয়া পুনরায় আপন একাধি-পত্য স্থাপনের চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তাঁহার এ চেষ্টা সফল হইল না। বলের সাহায্যে আজিও কোথাও কোন রাজা শান্তিস্থাপনে সক্ষম হন নাই। সন্তোষ হইতেই শান্তির উৎপত্তি। প্রভুত্বের মদে মত্ত হইয়া আপনার স্বদেশবাসী ও প্রজার রক্তে রাজকর রঞ্জিত করিয়া শাহ তাঁহার শক্তির উপর বিধাতার অভিশম্পাত ডাকিয়া আনিলেন মাত্র। সৌভাগ্যের বিষয় শাহ এ অনিবার্য্য সত্য উপলব্ধি করিয়া সম্প্রতি প্রজাগণকে পুনরায় স্বায়ত্ত শাসন দান করিয়াছেন।

পুনরায় এক পার্লামেণ্ট গঠিত হইয়াছে এবং দেশে শান্তি স্থাপিত হইয়াছে।

পারস্যের ন্যায় তুরস্কেও প্রজাবৃন্দ স্বায়ত্তশাসন লাভের জন্য উন্মত্ত হইয়া উঠে। তাহা দেখিয়া সুচতুর সুলতান বিনা যুদ্ধে ও রক্তপাতে ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহাদিগকে স্বায়ত্ত শাসনে অধিকার দান করিয়াও মনে মনে কিন্তু আপন শক্তি পুনঃ প্রতিষ্ঠার সুযোগ অনুসন্ধান করিতেছিলেন। গৃহবিচ্ছেদের এই অবসরে যখন অষ্ট্রিয়া তুরস্কের দুইটি বৃহৎ প্রদেশ আত্মসাৎ করিলেন, তুরস্কের অধীন বুলগেরিয়া প্রদেশ আপনার স্বাধীনতা ঘোষণা করিল; ইয়ুরোপীয় শক্তিসমূহ যখন অষ্ট্রিয়া ও বুলগেরিয়ার পক্ষ হইয়া অর্থবিনিময়ে তুরস্ককে এই কয়টি প্রদেশ ত্যাগ করিতে বাধ্য করিলেন; তখন নব প্রতিষ্ঠিত প্রজাশক্তিকে দলনের সুযোগ বুঝিয়া সুলতানও আপনার বেতনভুক্ত সৈন্যগণকে ও দলভুক্ত প্রজাগণকে স্বায়ত্তশাসন তন্ত্রীগণের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া উঠিতে উত্তেজিত করিলেন, দেশময় বিদ্রোহবহ্নি জ্বলিয়া উঠিল। প্রজাপ্রতিনিধি সমিতির কয়েকজন প্রধান সভ্যকে বিদ্রোহীগণ হত্যা করিল। কিন্তু স্বায়ত্তশাসন-তন্ত্রীগণও নগণ্য নহেন, তাঁহারা তুরস্ক মধ্যে—সর্ব্বস্থানে বিস্তৃত ও মহা শক্তি সম্পন্ন। এবং সর্ব্বপ্রথম যখন স্বায়ত্ত-শাসনের দাবী করেন, তখনই তাঁহারা এ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিলেন। সুতরাং অচিরেই স্বায়ত্তশাসনতন্ত্রী সহস্র সহস্র সেনা আসিয়া রাজধানীতে উপস্থিত হইল। উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ চলিল। সুলতানের সৈন্য পদে পদে পরাজিত হইতে লাগিল। সুলতান বেগতিক বুঝিয়া দুর্গমধ্যে আশ্রয় লইলেন। জয়োন্মত্ত প্রজাবৃন্দ দুর্গ আক্রমণ করিল। উভয় পক্ষে ঘোর যুদ্ধ বাধিল, কিন্তু অবশেষে প্রজাগণই জয়ী হইল এবং সুলতান বন্দী হইলেন। এরূপ অবস্থায় অন্য দেশ হইলে কত রক্তপাত অত্যাচার ও অবিচারই হইত। কিন্তু তুরস্কের প্রজাবৃন্দ দেখাইয়াছেন যে তাঁহারা কেবল যুদ্ধ জয়েই সক্ষম নহেন, আত্ম জয়েও তাঁহারা অতুলনীয়। রাজধানী অধিকারের পরেই প্রজা-প্রতিনিধিসভায় সুলতান বিচারাধীন হইলেন। যে সুলতান এতদিন সম্মান, শক্তি ও পদমর্য্যাদায় সমগ্র মুসলমান সমাজের সর্ব্বময় প্রভু ছিলেন, যিনি আত্মশক্তি অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য স্বজাতি স্বধর্ম্মী প্রজার রক্তে হস্ত কলুষিত করিতে কিঞ্চিন্মাত্রও কুণ্ঠা বোধ করেন নাই, আজ সেই সর্ব্বশক্তিমান প্রভু সামান্য প্রজার নিকট পরাজিত ও বন্দী হইয়া প্রাণ ভিক্ষা করিতেছেন! এ বিচার প্রজার নহে, ইহা বিধাতার! সুলতানের অপরাধ সপ্রমাণ হওয়ায় প্রজাসমিতি তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া, তাঁহার ভ্রাতাকে সম্প্রতি সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করিয়াছেন। তাড়িত সুলতান তাঁহার পরিবার লইয়া রাজধানী হইতে দূরে এক দুর্গমধ্যে নজরবন্দি অবস্থায় বাস করিতেছেন।

ভারতেও এ নবজীবনের তরঙ্গ আসিয়া আঘাত করিয়াছে। কিন্তু এ দুর্ভাগা দেশের অদৃষ্টে যে এ তরঙ্গ আমাদের কোথায় লইয়া গিয়া দাঁড় করাইবে, তাহা আমরা এক্ষণে বুঝিতে অক্ষম।

চয়ন।

পৃথিবী হইতে মার্স গ্রহে সংবাদ প্রেরণ।—মিষ্টার ডব্লিউ, এইচ্, পিকারিং নামক আমেরিকার এক প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ বহুদিন হইতে মার্স গ্রহে সংবাদ প্রেরণ করিবার চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহার বিশ্বাস পৃথিবী হইতে উক্ত গ্রহে সংবাদ প্রেরণ করা সম্ভব। তিনি সম্প্রতি একটি যন্ত্র নির্ম্মাণ করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন। যন্ত্রটি নির্ম্মাণ করিতে তিন ক্রোড় টাকা আবশ্যক। আগামী জুলাই মাসের মধ্যে মার্স গ্রহ তাহার স্বাভাবিক স্থান হইতে পঞ্চাশ লক্ষ মাইল পৃথিবীর নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইবে

সেই সময়ই এই যন্ত্রটি নির্ম্মাণের উপযোগী সময়। তিনি বলেন পৃথিবীর মেরুদণ্ডের অবস্থিত সমান্তরাল একটি রেখায় তিনি বহুসংখ্যক আয়না যোজনা করিবেন। আয়না গুলি সকলে কলের সাহায্যে ২৪ ঘণ্টায় একবার করিয়া যন্ত্রটির চতুর্দ্দিকে সম্পূর্ণভাবে প্রদক্ষিণ করিবে। সেই আয়না সকল হইতে একটি উজ্জ্বল আলোক প্রতিফলিত হইয়া মার্স গ্রহে গিয়া পড়িবে। মার্সবাসীগণ অবশ্য সহজ চক্ষে তাহা লক্ষ্য করিতে পারিবে না সত্য, কিন্তু দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে তাহারা সহজেই তাহা লক্ষ্য করিতে সক্ষম হইবে এবং যদি তাহারা বুদ্ধিমান হয়, তাহা হইলে এই সঙ্কেত বুঝিয়া তাহারা আমাদিগকে সঙ্কেত প্রেরণের চেষ্টা করিবে। এবং এইরূপে ক্রমে সঙ্কেতের সাহায্যে পৃথিবী ও মার্সের মধ্যে সংবাদের আদানপ্রদান চলিতে পারিবে। একবার আমরা মার্স গ্রহ হইতে এইরূপ উত্তর পাইয়াছিলাম। সুতরাং ভবিষ্যতেও যে উত্তর পাওয়া যাইবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

প্রাচীন গ্রীকস্তম্ভের আবিষ্কার।—সম্প্রতি গোয়ালিয়র রাজ্যের দক্ষিণে ভিলসা নগরের নিকটে বেশনগর নামক স্থানে একটি বিচিত্র আবিষ্ক্রিয়া হইয়াছে। বেতোয়া নদীর এক শাখার তীরে একটি পুরাতন স্তম্ভ ছিল। ১৮৭৭ সালে কানিংহাম্ সাহেব ইহা লক্ষ্য করেন, স্তম্ভটির তলদেশ অষ্টকোণ বিশিষ্ট এবং মধ্যস্থলে একটি প্রস্তরমালার দ্বারা স্তম্ভটি দুইভাগে বিভক্ত। সর্ব্বোপরি তালপত্রের আকারবিশিষ্ট একটি খোদিত শিলাখণ্ড দ্বারা আচ্ছাদিত। বহুকাল হইতে তত্রত্য হিন্দুগণ এই স্তম্ভটিকে পূজা করিতেছেন এবং তাহার সর্ব্বাঙ্গে সিন্দুর লেপন করিয়া আসিতেছেন। সিন্দুর প্রলেপের ফলে তাহার গাত্রে কিছু খোদিত ছিল কি না তাহা নির্দ্দেশ করিবার উপায় ছিল না। সম্প্রতি গোয়ালিয়র রাজ্যের এঞ্জিনিয়ার লেক সাহেব লক্ষ্য করেন যে স্তম্ভটির তলদেশে কি খোদিত রহিয়াছে। সিন্দুর প্রলেপ মুছিয়া ফেলিবামাত্র দেখা গেল যে সেই স্মৃতিস্তম্ভটি বিষ্ণুর সম্মানার্থে ভিয়নের পুত্র বিষ্ণুসেবক হেলিয়ডরাস রাজা য়্যাণ্টিয়াল্‌কিডাসের রাজত্বকালে নির্ম্মাণ করেন। হেলিয়ডরাস গ্রীস দেশের টাক্সিলা দেশে জন্মগ্রহণ করেন। য়্যাণ্টিয়াল্‌কিডাসের নাম হইতে আমরা স্তম্ভটির নির্ম্মাণসময় নিরূপণ করিতে পারি; তিনি খ্রীষ্টপূর্ব্ব ১৫০ সালে রাজত্ব করিতেন। ইহা হইতে আমরা ভারতে গ্রীক প্রভাব ও গ্রীকগণের হিন্দুদেবের পূজার পরিচয় পাই।

দীর্ঘ জীবন লাভের উপায়।—লণ্ডন নগরের ডাক্তার সলিচির মতে নিম্নলিখিত নিয়মগুলি পালন করিলে সকলেরই শতবর্ষ পরমায়ু হওয়া সম্ভব। আপন আহার বিহারের জন্য প্রতিদিন ছয় আনা করিয়া ব্যয় করিবে, এবং তাহা নিজে উপার্জ্জন করিবে। নিতান্ত দরিদ্র ভিন্ন প্রায় সকলেই আমরা আবশ্যকের অধিক আহার করিয়া থাকি। আনন্দ, পানাহারে সংযম ও বিশ্রাম এই তিনটি লাভ করিতে পারিলে অধিকাংশ রোগের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। মানসিক অবসাদই আমাদের মৃত্যুর কারণ। প্রত্যেক আনন্দ আমাদের পরমায়ুকে বৃদ্ধি করে। পরিশ্রম করিলে মনুষ্যের যৌবন সহজে নষ্ট হয় না। বয়সের কর্ম্মহীনতাই মানুষকে শীঘ্র জরাগ্রস্ত করিয়া ফেলে। বালকদিগের সহিত আলাপ ও বাস করিবে। নিঃসন্তানদিগের অপেক্ষা সংসারে জনকজননীর পরমায়ু অধিক হইয়া থাকে। বালকদের দেখিলে, তাঁহাদিগের সহিত সহানুভূতি সূত্রে আবদ্ধ থাকিলে এবং সময়ে সময়ে তাহাদিগের সহিত বালকোচিত ক্রীড়ায় যোগদান করিলে মনুষ্যের যৌবন অধিকদিন স্থায়ী হয়। কখনও আশা ও উৎসাহ ত্যাগ করা কর্ত্তব্য নহে। অতীত বা মৃতের বিষয় লইয়া মনকে ভারাক্রান্ত করা কর্ত্তব্য নহে। আমরা আপন ধারণানুযায়ী বৃদ্ধ হইয়া পড়ি। মনের বার্দ্ধক্য উপস্থিত হইলে দেহেরও বার্দ্ধক্য আসিয়া উপস্থিত হয়। যতদিন সম্ভব বালক থাকিবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

কলিকাতা, ২০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত ও ৪৪, ওল্ড বালিগঞ্জ রোড হইতে



বিরহিণী যক্ষ-পত্নী

জাপানী চিত্রকর কাৎস্নুতা অঙ্কিত চিত্র হইতে

সাধনের সত্য ॥

ভগবদ্গীতায় আছে ঃ—

"মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিৎ যততি সিদ্ধয়ে" মনুষ্যসহস্রের মধ্যে এক আধ জন সিদ্ধির জন্য যত্ন করেন। মনুষ্যের মধ্যেই যখন সাধন এইরূপ বিরল তখন পশ্বাদি জন্তুদিগের তো কথাই নাই। এটাও কিন্তু দেখিতেছি যে, সাধন না করে এমন জীবই নাই;—জীবমাত্রই সাধনে রত। কুক্কুরদের কর্ত্তব্য কুক্কুরেরা সাধন করে; বায়সদের কর্ত্তব্য বায়সেরা সাধন করে; পিপীলিকাদের কর্ত্তব্য পিপীলিকারা সাধন করে; মৌমাছিদের কর্ত্তব্য মৌমাছিরা সাধন করে; পশু পক্ষী কীট পতঙ্গ সকলেই স্ব স্ব জাতির প্রকৃতি অনুযায়ী কর্ত্তব্য সাধন করে; শুধু যে সাধন করে তাহা নহে—সর্ব্বপ্রযত্নে সাধন করে—প্রাণপণে সাধন করে। এমন কি ক্ষুদ্র মৌমাছিরাও ভবিষ্যৎ বংশের মঙ্গলার্থে প্রত্যেকে আপনার সমস্ত জীবন, সমস্ত পরিশ্রম, এবং সমস্ত ধন সম্পত্তি অকাতরে উৎসর্গ করিয়া যায়। মনুষ্য-প্রহরী রাত্রি-কালে দ্বারে পাহারা দিতে দিতে ঘুমাইয়া পড়িতে পারে; কিন্তু কর্ত্তব্যসাধনের মাঝ-পথে ঘুমাইয়া পড়া কুক্কুর-প্রহরীর শাস্ত্রে আদৌ লেখে না। কর্ত্তব্য-সাধনে কুক্কুর-প্রহরী যেমন সজাগ, কোনও পুলিসের চৌকিদার তেমন নহে। তবে কেন আমরা কুক্কুরদিগের কৃত কর্ত্তব্য-অনুষ্ঠানকে সাধন বলি না? যদি বল' যে কুক্কুরেরা অগ্রপশ্চাৎ ভাবিয়া বিচারপূর্ব্বক কার্য্য করে না এটা যখন স্থির, তখন তাহাতেই প্রমাণ হইতেছে যে, তাহাদের ব্রতানুষ্ঠান অন্ধসংস্কারমূলক জাতিধর্ম্ম বই আর কিছুই নহে;—তাহা তুমি বলিতে পার না; কেন না, এটা সকলেরই দেখা কথা যে, পশু পক্ষীরাও ন্যূনাধিক পরিমাণে বিচারপূর্ব্বক কার্য্য করে। বানরেরাও যা তা ভক্ষণ করে না, পরন্তু খাদ্যাখাদ্য বিচারপূর্ব্বক যাহাতে তাহা-দের শরীর ভাল থাকে তাহাই ভক্ষণ করে। পক্ষীরাও স্থানাস্থান এবং কালাকাল বিচার-পূর্ব্বক নীড় নির্ম্মাণ করে; বিশেষতঃ রাজহংসেরা সময় বুঝিয়া ঝাঁকে ঝাঁকে মানসসরোবরে যাত্রা করে, এবং সময় বুঝিয়া সেখান হইতে প্রত্যাগমন করে। কুক্কুরেরাও পাত্রাপাত্র বিচার করিয়া অভ্যাগত অতিথিগণের কাহুকে দেখিয়া ক্রোধে গোঙ্রাইতে থাকে, কাহুকে দেখিয়া আহ্লাদে ল্যাজ নাড়িতে থাকে। কুক্কুরাদি জন্তুগণ পাত্রাপাত্র কালাকাল এবং স্থানাস্থান বিচার করে তা' তো জানি, কিন্তু এ কথা তো তুমি মানো যে তাহারা মূঢ় জীব? তা যদি তুমি মানো, তবে তাহাতেই তোমার প্রকারান্তরে বলা হইতেছে যে, কুক্কুরাদি জন্তুদিগের বিচার-কার্য্যও অন্ধসংস্কারের প্রবর্ত্তনা বই আর কিছুই নহে। বড় শক্ত সমস্যা! মস্ত একটা গোলের কথা এখানে এই যে, পশ্বাদি জন্তুদিগের জ্ঞান যে মূলেই নাই এ কথা তুমি বলিতে পার না; যেহেতু তাহারা সচেতন জীব। উহাদের অল্পই হো'ক্ আর অধিকই হো'ক্—জ্ঞান যখন আছে, তখন উহাদিগকে

মূঢ়জীব না বলিয়া জ্ঞানবান্ জীব বলা'ই উচিত। তুমি তো বলিলে "উচিত"! কিন্তু আমার মন যে তাহা বলে না! মন তো বলেই না, তা ছাড়া, বুদ্ধিবিবেচনাও ও-কথাটা গ্রাহ্যের মধ্যেই আনে না। সুবিখ্যাত রসায়ণ-বেত্তা স্যার্ হম্‌ফ্রে ডেবী বরফের গুণাগুণ বিধি-মতে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন যে, বরফের ভিতরেও উত্তাপ আছে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও সকলেই আমরা বলি যে বরফ শীতল পদার্থ; কেহই আমরা বলি না যে বরফ উষ্ণ পদার্থ। যে কারণে আমরা বরফের ভিতরে উত্তাপ আছে জানিয়াও বরফ'কে উষ্ণ পদার্থ না বলিয়া শীতল পদার্থ বলি, সেই কারণে আমরা পশ্বাদি শ্রেণীর জীবদিগের মনোমধ্যে চেতন জাগিতেছে জানিয়াও উহাদিগকে জ্ঞানবান্ জীব না বলিয়া মূঢ়জীব বলি। সে কারণ এই যে, বরফের ভিতরে উত্তাপ আছে সত্য, কিন্তু বরফের অন্তর্নিগূঢ় সে যে উত্তাপ তাহা উষ্ণতা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতে পারিবার মতো উত্তাপ নহে; তেম্নি, পশ্বাদি জন্তুদিগের মধ্যে চেতন জাগিতেছে সত্য, কিন্তু পশ্বাদি জন্তুদিগের অন্তর্নিগূঢ় সে যে চেতন তাহা জ্ঞান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতে পারিবার মতো চেতন নহে। তাহা জ্ঞান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতে না-পারিবার প্রধান কারণ এই যে, এটা যদিচ খুবই সত্য যে, পশ্বাদি জন্তুরা স্বাস্থ্যোপযোগী খাদ্যাখাদ্য বিচার করে, বাসোপযোগী স্থানাস্থান বিচার করে, অনুষ্ঠিতব্য কার্য্যের কালাকাল বিচার করে, দাম্পত্য বন্ধনের পাত্রাপাত্র বিচার করে; কিন্তু তথাপি প্রকৃত বিচার যাহাকে বলে,—কি? না সত্যাসত্যের বিচার, তাহা তাহাদের মনের ত্রিসীমার মধ্যেও স্থান পাইতে দেখা যায় না, আর, সেই জন্য পশ্বাদি জন্তুরা জ্ঞানবান্ জীবের কোটায় কোনো ক্রমেই অধিকার পাইতে পারে না। অতএব এটা স্থির যে, পৃথিবীতে যদি এমন কোনো শ্রেণীর জীব থাকে যাহার নাম দেওয়া যাইতে পারে জ্ঞানবান্ জীব, তবে তাহা মনুষ্য।

মনুষ্য মাতৃগর্ভ হইতে জ্ঞানবিন্দু হইয়া ভূমিষ্ঠ হয়। তাহার পরে জলবিন্দু যেমন জল আকর্ষণ করে, জ্ঞানবিন্দু তেম্নি জ্ঞান আকর্ষণ করিয়া ক্রমশ বাড়িয়া উঠিতে থাকে। মনুষ্য যদি গোড়ায় জ্ঞানবিন্দু হইয়া না জন্মি'ত, তবে শেষে কস্মিন্‌কালেও জ্ঞান উপার্জ্জন করিতে পারিত না। শুকপক্ষী সহস্র শাস্ত্রবচন কণ্ঠস্থ করিলেও তাহার জ্ঞান একতিলও বাড়ে না কেন? তাহার জ্ঞান না বাড়িবার কারণ আর কিছু না—শুকপক্ষী মনুষ্য-শিশুর মতো জ্ঞান-বিন্দু হইয়া জন্মগ্রহণ করে না, আর সেই জন্য সে শ্রুতবচনের মধ্য হইতে জ্ঞান আকর্ষণ করিতে পারে না।

মানবচৈতন্যের এ-পারে হওয়া-জ্ঞান বা জন্মগত জ্ঞান; ওপারে পাওয়া-জ্ঞান বা উপার্জ্জিত জ্ঞান; মাঝে সাধনের সেতু। হওয়া-জ্ঞান সাধনের বীজ; পাওয়া-জ্ঞান সাধনের ফল। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে বীজ অগ্রে না ফল অগ্রে? ইহার উত্তর এই যে, দুইই সত্য—(১) একবারকার আমের আঁটি আরবারকার আমের বীজ, এটাও সত্য; আবার (২) একবারকার আমের বীজ আরবারকার আমের আঁটি, এটাও সত্য।

একটি কচি বালকের মনোমধ্যে ভাষা-

জ্ঞান প্রথমে বীজরূপে মাটিচাপা থাকে; এটা তাহার জন্মগত জ্ঞান, বা সহজাত জ্ঞান বা সহজ জ্ঞান; আর, তাহাকেই আমি বলিতেছি হওয়া-জ্ঞান। তাহার পরে সেই বালক কপ্‌চাইতে কপ্‌চাইতে মাতৃভাষা উপার্জ্জন করে; এবারকার এ জ্ঞান সাধনের মধ্যদিয়া পাওয়া বলিয়া ইহাকে আমি বলিতেছি পাওয়া-জ্ঞান। তাহার পরে বালকটি বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইয়া ব্যাকরণ অলঙ্কার এবং সাহিত্যাদির যোগে পুনরায় যখন নূতন করিয়া ভাষা শেখে, তখন, প্রথমবারের সেই যে তাহার অবলীলাক্রমে হাত বাড়াইয়া পাওয়া একমেটে ভাষাজ্ঞান, সেই পূর্ব্বার্জ্জিত একমেটে ভাষাজ্ঞানই তাহার এবারকার (অর্থাৎ দ্বিতীয়বারের) হওয়া-জ্ঞান; আর, অপেক্ষাকৃত কঠিন সাধনের মধ্যদিয়া পাওয়া-হইয়া-থাকে যে দোমেটে ভাষাজ্ঞান, তাহাই পড়ুয়া বালকদিগের দ্বিতীয় বারের পাওয়া-জ্ঞান। উপমাচ্ছলে বলা যাইতে পারে যে, প্রথমবারের হওয়া-জ্ঞান জ্ঞানের বীজ; প্রথমবারের পাওয়া-জ্ঞান জ্ঞানের নবোন্মেষিত পত্রচূড়া; প্রথমবারের সাধন—বীজ হইতে পত্রচূড়ার বৃন্তাগ্র পর্য্যন্ত অঙ্কুরের প্রসারণ। দ্বিতীয়বারের হওয়া-জ্ঞান কি? না পূর্ব্বোন্মেষিত সেই যে জ্ঞানের পত্রচূড়া (একমেটে ভাষাজ্ঞান), তাহাই দ্বিতীয়বারের হওয়া-জ্ঞান; দ্বিতীয়বারের পাওয়া জ্ঞান—জ্ঞানের পুষ্প-বিকাশ (ব্যাকরণাদি-পরিপুষ্ট দোমেটে ভাষাজ্ঞান); দ্বিতীয়বারের সাধন—পূর্ব্বোন্মেষিত পত্রচূড়ার বৃন্তমূল হইতে নবোন্মেষিত পুষ্পমঞ্জরীর বৃন্তমূল পর্য্যন্ত শাখাপল্লবের বিস্তার।

পাখীদেরও ভাষা আছে কিন্তু তাহা একপ্রকার অ-শেখা ভাষা। পাখীদের ভাষা যেমন তাহাদের অভিলষিত ভাবজ্ঞাপনের প্রথম উদ্যমেই কণ্ঠকুহর হইতে গজাইয়া ওঠে, মনুষ্যের কণ্ঠকুহর হইতে মাতৃভাষা তেমন সহজে গজাইয়া ওঠে না। মনুষ্যের ভাষা প্রকৃতপ্রস্তাবেই সাধনের ধন। মনুষ্যের ভাষা প্রথমে যখন অন্তঃপুরের লালন-ক্ষেত্রে অঙ্কুরিত হয়, তখন তাহা সাধনের মধ্যদিয়াই অঙ্কুরিত হয়; তাহার পরে যখন সেই অঙ্কুরিত ভাষাজ্ঞান অন্তঃপুরের লালন-ক্ষেত্র হইতে উন্মূলিত হইয়া বিদ্যালয়ের অনুশাসন-ক্ষেত্রে রোপিত হয়, আর, কিয়ৎ পরে যখন তাহা শাখাপ্রশাখা বিস্তার করিয়া পরিবর্দ্ধিত হয়, তখন তাহা সাধনের মধ্যদিয়াই পরিবর্দ্ধিত হয়; আবার, আর কিছুকাল পরে যখন কবিত্বরসের বারিসিঞ্চনে সেই শাখা-প্রশাখায় ফুল ধরে, এবং জ্ঞানালোকের রশ্মি পতনের গুণে তাহাতে ফল ফলে, তখন, তাহা সাধনের সোপান মাড়াইয়াই সিদ্ধিমঞ্চে আরূঢ় হয়।

মনুষ্য যখন যে কার্য্যের সাধনে উদ্যোগী হয়, তখন সাধিতব্য কার্য্যটি কিরূপ কার্য্য এবং কিসের উদ্দেশে তাহাতে প্রবৃত্ত হওয়া হইতেছে, তাহা এক মহাপুরুষ আড়ালে থাকিয়া দর্শন করেন। স্থূলদর্শী লোকেরা মনকেই জানে সাক্ষী পুরুষ, তাই বলে যে মনের অগোচর পাপ নাই। কিন্তু প্রকৃত সত্য এই যে, ঐ মহাপুরুষটি ভাবনাচিন্তারও—মনেরও—সাক্ষী। সূক্ষ্মদর্শী বৈদান্তিক পণ্ডিতেরা তাই মহাপুরুষটির নাম দিয়াছেন সাক্ষী-চৈতন্য। সাক্ষীচৈতন্য যে অংশে জ্ঞান-

ক্রিয়া এবং জ্ঞেয় বিষয়ের সাক্ষী, সেই অংশে দর্শনশাস্ত্রে তাঁহার নাম দেওয়া হয় সম্বিৎ, অর্থাৎ ইংরাজিভাষায় যাহাকে বলে consciousness; আর, সাক্ষীচৈতন্য যে অংশে পুণ্যপাপ-দর্শী, সেই অংশে ধর্ম্মশাস্ত্রে তাঁহার নাম দেওয়া হয় অন্তরাত্মা অর্থাৎ ইংরাজিতে যাহাকে বলে conscience; তার সাক্ষী ঃ—

"যৎকর্ম্ম কুর্ব্বতোঽস্যস্যাৎ
পরিতোষোঽন্তরাত্মনঃ।
তৎপ্রয়ত্নেন কুর্ব্বীত বিপরীতন্তু
বর্জ্জয়েৎ ॥

যেরূপ কর্ম্মের সাধনে অন্তরাত্মা (conscience) প্রসন্ন হ'ন সেইরূপ কর্ম্ম করিবে, তাহার বিপরীত কর্ম্মের পথ বর্জ্জন করিবে।" এটাও কিন্তু দেখিতে পাওয়া যায় যে, সাক্ষী-চৈতন্য সকলের মনে সকল সময়ে জাগ্রত থাকেন না; প্রত্যুত, অনেকের মনে অনেক সময়ে প্রসুপ্ত থাকেন। আবার, এটাও দেখিতে পাই যে, সাক্ষী-চৈতন্য নিদ্রিতই থাকুন্ আর জাগ্রতই থাকুন্—কাজ ভোলেন না। নিদ্রা-কালে তাঁহার অর্দ্ধোন্মীলিত চক্ষুগোলকে দ্রষ্টব্য বিষয়-সকলের ছবি পড়ে; তাহার পরে তিনি যখন জাগিয়া ওঠেন, তখন সেই ছবিদৃষ্টে অতীত কালের হইয়া-যাওয়া ব্যাপারগুলা অবগত হ'ন। তার সাক্ষী—কোনো ক্ষমতাপন্ন কর্ম্মাধ্যক্ষ যখন রাগের মাথায় কোনো নিরপরাধী অধীন কর্ম্মচারীর প্রতি কঠিন দণ্ড সমর্পণ করিয়া ফ্যালেন, তখন তিনি কি যে কুকার্য্য করিলেন তাহা জানিতে পারেন না—যেহেতু তখন তাঁহার অন্তরাত্মা মোহনিদ্রায় অভিভূত; কিয়ৎপরে তাঁহার ক্রোধ নরম প য়া আসিলে তাঁহার অন্তরাত্মা যখন জাগিয়া ওঠেন, তখন তিনি "কি কুকার্য্যই করিলাম" বলিয়া আক্ষেপ করিতে থাকেন।

তুমি বলিতেছ যে, সাক্ষীচৈতন্য আড়ালে থাকিয়া সাধকের মনের ভাব এবং হাতের কাজ দুইই দেখেন। ইহাতে এইরূপ দাঁড়াইতেছে যে, সাধন যেন একটা ভাউলে, আর সেই ভাউলের নাবিক যেন তিন ভাই—বড় ভাই সাক্ষীচৈতন্য বা দ্রষ্টা পুরুষ, ইনি কর্ণধার; মেজো ভাই ভাবনা-চিন্তা বা মানসিক জ্ঞানক্রিয়া; আর ছোটো ভাই হাতের কার্য্য বা শারীরিক বলক্রিয়া; এ দুই ভাই ভাউলের দাঁড়ি। আর, তা ছাড়া, মেজো ছোটো'র উপরে বড়র চক্ষু রহিয়াছে সর্ব্বদা সজাগ। তা যদি হয় তবে সাধককে এক ব্যক্তি না বলিয়া তিন ব্যক্তি বলাই তো ভাল! ইহার উত্তরে আমি বলি এই যে, সত্য যদি বলিতে হয় তবে সাক্ষী চৈতন্য আপনারই আপনি দ্রষ্টা—দোস্‌রা কোনো ব্যক্তির নহে। দাঁড়ি-মাঝির উপমা ঐ যাহা তুমি দেখাইলে, উহার একটি জুড়ি-উপমা আমার কাছে আছে; সেইটিই বর্ত্তমান স্থলের সবিশেষ উপযোগী; তাহা এই ঃ—মনের ভাব আর হাতের কাজ দুই রকমের দুইটা দর্পণ; মনের ভাব জলের মতো তরল দর্পণ, হাতের কাজ আয়নার মতো স্থির দর্পণ। এই দুই দর্পণ সম্মুখে স্থাপন করিয়া সাক্ষী চৈতন্য তাহার মধ্যে আপনাকে দর্শন করেন; আর, সেই জন্য, ঐ দুই দর্পণ যখন কলুষে আক্রান্ত হয় তখন সাক্ষীচৈতন্য আপনাকে কলুষিত দেখেন, আর, জল-দর্পণটা, কিনা

মনটা, যখন ইতস্তত বিচলিত হয়, তখন সাক্ষীচৈতন্য আপনাকে ইতস্তত বিচলিত দেখেন। অতএব এটা স্থির যে সাক্ষীচৈতন্য দেখেন—দর্পণ দুটা'কে নহে পরন্তু আপনাকে; দর্পণ দুটা উপলক্ষ মাত্র। অতএব এটা স্থির যে, দর্পণধারী সাক্ষীচৈতন্য, দুইও নহেন, তিনও নহেন। সাক্ষীচৈতন্য একই অভিন্ন পুরুষ। সাক্ষীচৈতন্য সাধক নিজে। প্রকৃত কথাটা তবে তোমাকে বলি—প্রণিধান কর :—

সত্য এক বই দুই নহে। কিন্তু তথাপি আমাদের ব্যবহারকার্য্যের সুবিধার জন্য আমরা যেমন টাকা ভাঙাইয়া চৌষট্টি পয়সা করিয়া লই, তেম্নি, বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা তত্ত্বনির্দ্ধারণ-কার্য্যের সুবিধার জন্য এক সত্যকে নানাশ্রেণীতে বিভক্ত করেন; আর, তাহা যখন করেন তখন সেই সঙ্গে তাঁহাদের জ্ঞানের প্রকরণ-পদ্ধতিও নানা শাখায় বিভক্ত হইয়া যায়। একই সত্য একদিকে যেমন যন্ত্রবিদ্যার যান্ত্রিকী সত্য, জ্যোতির্বিদ্যার জ্যোতিষী সত্য, রসায়ণ-বিদ্যার রাসায়নী সত্য; এইরূপ নানা বিদ্যার নানা সত্য; আর এক দিকে তেম্নি বেদোপনিষদের এক অদ্বিতীয় সত্য। একই ষোলো আনা একদিকে যেমন একটাকা, আর এক দিকে তেম্নি চৌষট্টি পয়সা; প্রভেদ কেবল এই যে, এক টাকা মোট ষোলো আনা, চৌষট্টি পয়্সা ভাঙা ষোলো আনা। মনে কর একজন জহরী মস্ত এক মহাজনের নিকট হইতে একটি বহুমূল্য হীরা ভাঙাইয়া আনিয়া রাশীকৃত মোহরের তোড়া গৃহের এক অন্ধিসন্ধি-প্রদেশে গর্ত্ত খুঁড়িয়া পুঁতিয়া রাখিল; এক ঝুড়ি টাকার তোড়া লোহার সিন্দুকে চাবি দিয়া পুরিয়া রাখিল; আর, চল্‌তিগোচের খরচপত্র নির্ব্বাহের জন্য দুই চারি মুঠা আদুলি সিকি দো-আনি পয়সা ক্যাষ্‌বাক্সের খোপেখাপে সাজাইয়া রাখিল। মণিমুক্তার জহরীর এ যেমন ধনরক্ষণের বিধিব্যবস্থা দেখা গেল, অবিকল সেইরূপ প্রণালীতে বিদ্যারত্নের জহরীরা দর্শনের ভগ্নাবশিষ্ট পুরাতন চণ্ডীমণ্ডপে গর্ত্ত খুঁড়িয়া রাশি রাশি দার্শনিক সত্য পুঁতিয়া রাখেন; রাশি রাশি জ্যোতিষী সত্য জ্যোতির্বিদ্যার মানমন্দিরে পুঁজি করিয়া রাখেন; রাশি রাশি যান্ত্রিকী সত্য যন্ত্রবিদ্যার যন্ত্রাগারে পুঁজি করিয়া রাখেন; রাশি রাশি রাসায়নী সত্য রসায়ন বিদ্যার সাধনাগারে (Laboratoryতে) পুঁজি করিয়া রাখেন। আবার আটপহুরিয়া ব্যবহারের জন্য দুই চারি মুঠা জ্যোতিষী সত্য নূতন পঞ্জিকায়, দুই চারি মুঠা যান্ত্রিকী সত্য যন্ত্রদীপিকায়, দুই চারি মুঠা রাসায়নী সত্য দ্রব্যগুণদীপিকায়—এইরূপ রকমওয়ারি ভাঙা সত্য, আবশ্যক হইলেই হাতবাড়াইয়া পাওয়া যাইতে পারিবার মতো করিয়া, আশপাশের কুলঙ্গীতে সাজাইয়া রাখেন। আবার, সময়ে সময়ে পৃথিবীমণ্ডলে আশ্চর্য্য প্রভাবান্বিত ক্ষণজন্মা ধনী মহাজনের আবির্ভাব হয়। ইঁহাদের এক এক মহাপুরুষ এক এক বিশেষভাবের সাধন দ্বারা এক এক দেবদুর্ল্ভ মহারত্ন হাতের মুঠার মধ্যে প্রাপ্ত হ'ন; আর, যাহা তাঁহারা হাতের মুঠার মধ্যে প্রাপ্ত হ'ন তাহা লোহার সিন্দুকে চাবি দিয়া রাখেন না। তাঁহারা বড় বড় দৃঢ়ভিত্তি সাধারণ ধনাগার বা 'ব্যাঙ্ক্' স্থাপন করিয়া তাঁহাদের মহামূল্য সাধনের ধন সেই ব্যাঙ্কে খাটাইয়া

রাজ্যের লোহা তাঁবা এবং শীষার মধ্য হইতে সোণা ফলাইয়া তোলেন। তাঁহাদের ব্যাঙ্কের হিরণ্ময়-কোষের অর্থাৎ সোণার সিন্দুকের টাকা এক দ্বার দিয়া যেমন জনসমাজে ছট্‌কিয়া বাহির হয়, আর এক দ্বার দিয়া তেমি সুদের উপর সুদে স্ফীত হইয়া ঘরে প্রত্যাগমন করে। ব্যাঙ্কের টাকা তো আর ব্যাঙ্কাধ্যক্ষের শুধু কেবল নিজের টাকা নয়—তাহা পৃথিবী সুদ্ধ লোকের টাকা; আর, যে অংশে তাহা পৃথিবীসুদ্ধ লোকের টাকা সেই অংশে তাহা হ্রাসবৃদ্ধিবিহীন। কিন্তু যে সকল মহাজনের কথার উল্লেখ করিলাম তাঁহাদের হিরণ্ময় কোষের টাকা নিখিল বিশ্বভুবনের মোট সত্য,—সত্যং জ্ঞানমনন্তং; তাঁহার হ্রাসও নাই বৃদ্ধিও নাই, উদয়ও নাই অস্তও নাই, তিনি যাহা আছেন তাহাই আছেন।

বাইবেলের কোনো কোনো স্থানে মোট সত্যের নাম দেওয়া হইয়াছে আল্‌ফা এবং ওমেগা। ইহার কারণ এই যে, গ্রীকভাষার আদি অক্ষর আল্‌ফা কিনা অকার এবং শেষাক্ষর ওমেগা কিনা ওকার। সমস্ত বিশ্বভুবনের আদি অন্ত জুড়িয়া যে এক অখণ্ড মোট সত্য সর্ব্বত্র বিদ্যমান, আল্‌ফা এবং ওমেগা বলিলে সেই মোট সত্যের প্রতি সাধকের দৃষ্টি পড়ে। আমাদের দেশের সাধনের প্রধান মন্ত্র ওঙ্কার। এই মন্ত্রটি সর্ব্বসাধারণ মনুষ্যজাতির ভাষার খনি হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে, তা বই, কোনো বিশেষ জাতির বিশেষ ভাষার বর্ণমালা হইতে নহে। মনুষ্য-মাত্রেরই বাক্যস্ফূর্ত্তির আরম্ভ স্থান কণ্ঠকুহর এবং সমাপ্তিস্থান ওষ্ঠাগ্র। অ কণ্ঠ হইতে বাহির হয়, উ মধ্যপথে প্রবাহিত হয়, ম ওষ্ঠাগ্রে পর্য্যবসিত হয়। অ গোমুখীর বিজৃম্ভন, উ গঙ্গার প্রবাহ, ম সাগরে পর্য্যবসান। সাধকের কণ্ঠবদন হইতে ওঙ্কার শব্দ যখন উচ্চারিত হয় তখন তাহা উচ্চারণ-পথের আদি অন্ত এবং মধ্য ব্যাপিয়া এবং পূরণ করিয়া ধ্বনিত হয়। অতএব, সৃষ্টির আদি অন্ত এবং মধ্য যাঁহাতে একীভূত সেই এক অদ্বিতীয় অখণ্ড সত্যের নাম যদিচ সাধকের বাক্যমনের অতীত, আর, সেইজন্য সাধক শ্রদ্ধা ভক্তি এবং প্রীতিপূর্ব্বক যে নামে তাঁহাকে সম্বোধন করেন তাহাই যদিচ তাঁহার নাম; কিন্তু তথাপি ওঙ্কারের মতো অমন আর একটি পরিপাটী এবং বিশুদ্ধ অর্থব্যঞ্জক ঈশ্বরবাচক শব্দ পৃথিবীতে দুর্ল্লভ। পাতঞ্জল দর্শনের সমাধি-পাদের ২৭ সূত্র দেখ;—সে সূত্র এই যে, তস্য বাচকঃ প্রণবঃ, ঈশ্বরের বাচক শব্দ ওঙ্কার।

আমাদের দেশের সাধনের প্রধানমন্ত্র যেমন ওঙ্কার; সাধনের প্রধান লক্ষ্য তেমনি সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম, অর্থাৎ মোট সত্য। মনুষ্যের অন্তরে এক প্রকার মোট জ্ঞান আছে; সেই মোট জ্ঞানেই মোট সত্যের উপলব্ধি হয়। অর্থাৎ জ্যোতির্বিদ্যায় যেমন জ্যোতিষী সত্যের উপলব্ধি হয়, যন্ত্রবিজ্ঞানে যেমন যান্ত্রিকী সত্যের উপলব্ধি হয়, রসায়ন বিদ্যায় যেমন রাসায়নী সত্যের উপলব্ধি হয়, মোট জ্ঞানে তেমি মোট সত্যের উপলব্ধি হয়।

একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, মোটজ্ঞান এবং মোট সত্য বস্তু একই। অন্ততঃ এটা আমরা বুঝিতে পারি যে, সত্যজ্ঞানই জ্ঞান, এবং জ্ঞানগর্ভ সত্যই

সত্য; তবেই হইতেছে যে, সত্য এবং জ্ঞান একেরই এপিট-ওপিট।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, মনুষ্যশিশু জ্ঞানবিন্দু হইয়া জন্মগ্রহণ করে। সে জ্ঞানবিন্দু পদার্থটা কি? তাহা আর কিছু না—সম্বিৎ, অর্থাৎ ইংরাজিতে যাহাকে বলে Consciousness। সম্বিৎই মনুষ্যের মোটজ্ঞানের বীজ, অথবা যাহা আরো ঠিক্—বীজভাবের মোটজ্ঞান; আর, বিশুদ্ধ সত্তা—খাঁটি সত্তা—সার সত্তা, অর্থাৎ ইংরাজি ভাষায় যাহাকে বলে Pure Being, তাহাই সেই বীজজ্ঞানের বীজসত্য। খুব পাৎলা কাগজের এক পিঠের অক্ষর যখন আর এক পিঠে ফুটিয়া বাহির হয়, তখন দুই পিঠের অক্ষর কিছু আর দুই অক্ষর নহে; অক্ষর তা-সে এপিঠেও যা ওপিঠেও তা; প্রভেদ কেবল এই যে, এপিঠে তাহা সোজা ভাবে বসানো, ওপিঠে পাশ ফিরাইয়া বসানো। তেম্নি সেই যে বীজজ্ঞান সম্বিৎ, আর, সেই যে বীজ সত্য বিশুদ্ধ সত্তা, তাহা একেরই দুই পিঠ; তা বই, তাহা প্রকৃত পক্ষে দুই নহে। ফলকথা এই যে, বীজজ্ঞান বা সম্বিৎ বিশুদ্ধ সত্তার প্রকাশ; বিশুদ্ধ সত্তা বীজজ্ঞানের প্রকাশ্য বস্তু। বস্তু এবং বস্তুর পূর্ণ-প্রকাশের মধ্যে ব্যবধান কোথায়?

এখন দেখিতে হইবে এই যে, বীজজ্ঞান বা সম্বিৎ আর কিছু না—পূর্ব্বে যাহাকে আমি বলিয়াছি আদিম হওয়া-জ্ঞান তাহা সেই হওয়া-জ্ঞান। তাহা সর্ব্বপ্রথমে সাধনের মূলে বীজরূপে অন্তর্নিগূঢ় থাকে, এবং সর্ব্বশেষে সাধনের মধ্য দিয়া ফলরূপে আলোকে বিনির্গত হয়; আর তাহা যখন হয় তখন তাহার নাম হয় প্রজ্ঞা।* তেম্নি যে-সত্য সাধনের পূর্ব্বে সম্বিতের ক্রোড়ে বিশুদ্ধ সত্তারূপে অন্তর্লীন থাকেন, সেই একই সত্য সাধনের মধ্য দিয়া দৃশ্যমান বিশ্বভুবনের বাস্তবিক সত্তারূপে প্রজ্ঞাতে (অর্থাৎ প্রবুদ্ধ জ্ঞানে) ভাসমান হইয়া ওঠেন। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, নবপ্রসূত শিশু এক রত্তি জ্ঞানবিন্দু। কিন্তু বিন্দু সে তো সামান্য বিন্দু নয়—বিন্দুর মধ্যে সিন্ধু রহিয়াছে চাপা দেওয়া! সিন্ধু সে অন্ধকারময় অদৃশ্য জগতের অতলস্পর্শ এবং অপার সত্তাসিন্ধু; তাহা বিশুদ্ধ সত্তা—খাঁটি সত্তা—সত্তাই কেবল। সেই অদৃশ্য জগতের বিশুদ্ধ সত্তাই যে, দৃশ্যমান বিশ্বভুবনের বাস্তবিক সত্তা, তাহার প্রমাণ এই যে, যাহাকে আমরা বস্তুসকলের বাস্তবিক সত্তা বলিয়া প্রবুদ্ধ জ্ঞানে উপলব্ধি করি তাহার ব্যাপ্তি এবং তন্ময়তা দৃশ্যাদৃশ্য সমস্ত বস্তুতেই

* কেহ মনে করিতে পারেন যে, প্রজ্ঞা শব্দ Reason শব্দের অনুবাদ; তাহা যদি কেহ মনে করেন, তবে পাতঞ্জল দর্শনের সমাধিপাদের ৪৮ সূত্র দেখিলেই তাঁহার ভুল ভাঙিয়া যাইবে; সে সূত্র এই:—

"তত্র ঋতম্ভরা প্রজ্ঞা"

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত কালীবর বেদান্ত বাগীশ উহার টীকা এবং ভাষ্যের তাৎপর্য্য রীতিমত অনুধাবন করিয়া উহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন এইরূপ:—

"তৎকালে যে উৎকৃষ্ট ও নির্ম্মল প্রজ্ঞা অর্থাৎ জ্ঞানালোক আবির্ভূত হয়, তাহার নাম……ঋতম্ভরা প্রজ্ঞা। এ প্রজ্ঞা কেবল ঋত অর্থাৎ সত্যকেই প্রকাশ করে। তৎকালে ভ্রমের ও প্রমাদের লেশও থাকে না। যোগিগণ এই ঋতম্ভরা প্রজ্ঞার দ্বারা সমুদায় বস্তু যথাবৎ সাক্ষাৎকার করিয়া থাকেন এবং উৎকৃষ্টতম চরমযোগ লাভ করিয়া মুক্ত হ'ন।

সমান। যদিচ নবপ্রসূত শিশুর মাসেক দুমাস পরে চক্ষু ফুটিলে সে দৃশ্যমান বস্তু সকলেরই বাস্তবিক সত্তা উপলব্ধি করে; কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, বাস্তবিক সত্তা শুধুই কেবল দৃশ্যমান বস্তুতে আবদ্ধ নহে; পরন্তু দৃশ্যাদৃশ্য সমস্ত বস্তুই বাস্তবিক সত্তার মুঠার মধ্যে কবলিত রহিয়াছে। আমি এক্ষণে কলিকাতা নগরীর বক্ষোপরি দণ্ডায়মান একটা কোটাবাড়ির দোতালার বৈঠক ঘরে বসিয়া শুধু কেবল দেয়াল কড়িকাট টেবিল চৌকি দেখিতেছি বলিয়া পৃথিবীর মধ্যে ঐগুলাই যে কেবল বাস্তবিক পদার্থ, আর, আমি বড়বাজার দেখিতেছি না, চৌরঙ্গী দেখিতেছি না, বাগবাজার দেখিতেছি না বলিয়া শেষোক্ত প্রদেশগুলা যে অবাস্তবিক পদার্থ, তাহা তো আর নহে। দৃশ্যমান দেয়াল কড়িকাট টেবিল্ চৌকিও যেমন, আর, অদৃশ্য বড়বাজার চৌরঙ্গী বাগবাজারও তেম্নি, সবই সমান বাস্তবিক; তা ছাড়া, অদৃশ্য গঙ্গাসাগর, মহাসমুদ্র, চীন জাপান ইউরোপ আমেরিকা, গ্রহ নক্ষত্র, সবই সমান বাস্তবিক। দেয়াল কড়িকাট প্রভৃতি যে-কয়েকটা বস্তু এক্ষণে আমার চক্ষে দেখা দিতেছে, সেগুলার প্রত্যেকেই একতালার মধ্যদিয়া বাড়ির ভিত্তিমূলের সহিত বাঁধা রহিয়াছে; একতালার ঘরদরজা ভিত্তিমূলের মধ্যদিয়া রাস্তাঘাটের সহিত বাঁধা রহিয়াছে; রাস্তাঘাট গঙ্গার মধ্যদিয়া পূর্ব্বসমুদ্রের সহিত বাঁধা রহিয়াছে; গঙ্গানদী পূর্ব্বসমুদ্রের মধ্য-দিয়া বর্ম্মা প্রভৃতি দেশবিদেশের সহিত বাঁধা রহিয়াছে; পূর্ব্ব সমুদ্র বর্ম্মা প্রভৃতি দেশ-বিদেশের মধ্য দিয়া পাসিফিক মহাসাগরের সহিত বাঁধা রহিয়াছে; বর্ম্মা চীন জাপান-সম্বলিত আসিয়াখণ্ডের পূর্ব্বকিনারা পাসিফিক মহাসাগরের মধ্যদিয়া আমেরিকার সহিত বাঁধা রহিয়াছে, পাসিফিক মহাসাগর আমেরিকার মধ্যদিয়া আট্‌লান্টিক মহাসাগরের সহিত বাঁধা রহিয়াছে, আমেরিকা আট্‌লান্টিক মহাসাগরের মধ্য দিয়া ইউরোপ আফ্রিকার সহিত বাঁধা রহিয়াছে; সসাগরা পৃথিবীমণ্ডল বায়ুমণ্ডলের মধ্য দিয়া ঈথরের সহিত বাঁধা রহিয়াছে; সবায়ুসাগরা পৃথিবী ঈথরের মধ্য দিয়া গ্রহ উপগ্রহ এবং সূর্য্যমণ্ডলের সহিত বাঁধা রহিয়াছে; নিখিল বিশ্বভুবনের বাস্তবিক সত্তা সমস্তের মধ্য দিয়া সমস্তের সহিত বাঁধা রহিয়াছে; আকাশের মধ্য দিয়া মহাকাশের সহিত বাঁধা রহিয়াছে; অণুর মধ্য দিয়া পরমাণুর সহিত বাঁধা রহিয়াছে। প্রজ্ঞাতে অর্থাৎ প্রবুদ্ধ জ্ঞানে এই যে এক ধ্রুব বাস্তবিক সত্তা দৃশ্যাদৃশ্য সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড একীভূত করিয়া প্রকাশমান, ইহার গোড়ার কথাটি সম্বিতের গায়ে পূর্ব্ব হইতেই স্পষ্টাক্ষরে লেখা রহিয়াছে; সে কথা এই যে "আমি আছি"। সাধনের মূলাধিষ্ঠিত এই যে সাক্ষী-চৈতন্য সম্বিৎ, ইনি আপনার সমস্ত চিন্তা এবং কার্য্যদর্পণে "আমি আছি" এই বিশুদ্ধ সত্যটি দেখিতেছেন; আর, যাহাকে আমি বলিতেছি সম্বিতের সবেমাত্র ধন বিশুদ্ধ সত্তা তাহা আর কিছু না—সেই আমি আছি'র আছিত্ব। সাধন দ্বারা সম্বিৎরূপী বীজজ্ঞান ফলে পরিণত হইয়া যখন প্রজ্ঞামূর্ত্তি ধারণ করে, তখন, দাড়িমবৃক্ষের মূলাধিষ্ঠিত বীজ যেমন দাড়িম ফলের অন্তর্ভূত সমস্ত বীজকোষের সমস্ত-গুলিতে শতধা প্রবিষ্ট হয়, সেইরূপ গোড়ার

সেই "আমি আছি" বা বিশুদ্ধ সত্তা নিখিল বিশ্বভুবনের মর্ম্মে মর্ম্মে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে প্রবিষ্ট হইয়া সর্ব্বজগতের ধ্রুব বাস্তবিক সত্তারূপে প্রজ্ঞাতে ভাসমান হইয়া ওঠে; আর, তাহা যখন হয়, তখন অভাবান্বিত ক্ষুদ্র আমি-আছিটি প্রভাবান্বিত বৃহৎ আমি-আছিকে পাইয়া সেই ধন প্রাপ্ত হয়—

"যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাঽপি
বিচাল্যতে॥"

যাঁহাকে লাভ করিলে অপর কোনো লাভকেই তদপেক্ষা অধিক বলিয়া মনে হয় না, যাঁহাতে স্থিত হইলে গুরুতর বিপদেও সাধক বিচলিত হয় না!

গোড়ার সেই যে "আমি আছি" বা বিশুদ্ধ সত্তা, যাহা সম্বিতের সবেমাত্র ধন, তাহা শিশুর ন্যায় সরল এবং নির্ম্মল। মাতা যেমন শিশুর একমাত্র বল, তা ছাড়া, তাহার আর কোনও বল নাই, তেম্নি, সেই গোড়ার আমি-আছি'র একমাত্র বল সত্যের বল, তা ছাড়া আর কোনো বল নাই। আবার, মাতার বলকে শিশু যেমন মাতার বল বলিয়া জানে না পরন্তু তাহা যেন তাহার আপনারই বল এইরূপ মনে করিয়া নির্ভয়ে বিচরণ করে; তেম্নি, সম্বিতের আমিআছি-বালকটি সত্যের বল'কে সত্যের বল বলিয়া জানে না, পরন্তু তাহা যেন তাহার আপনারই বল এইরূপ মনে করিয়া সাধনে প্রবৃত্ত হয়। তাহার পরে সাধনের চরম সীমায় সম্বিৎ যখন জাগ্রত হইয়া উঠিয়া প্রজ্ঞা মূর্ত্তি ধারণ করে, তখন সাধক বুঝিতে পারে যে সিন্ধুর বলই বিন্দুর বল; তখন জানিতে পারে যে, সমস্ত বল-ক্রিয়া এবং জ্ঞানক্রিয়া সেই অদ্বিতীয় অখণ্ড পরিপূর্ণ সত্যে কেন্দ্রীভূত; আর, সাধক তখন বলে এই যে, "পূর্ব্বে আমি মনে করিয়া ছিলাম যে, সাধনের বল ব্যষ্টি চৈতন্যেরই বল! কি আশ্চর্য্য! এই সোজা সত্যটি তখন আমি দেখিয়াও দেখি নাই যে, এই সমষ্টি চৈতন্যের বলই এই ব্যষ্টিচৈতন্যের বল; এই সমষ্টিচৈতন্যের জ্ঞানই এই ব্যষ্টিচৈতন্যের জ্ঞান; এই সমষ্টি-চৈতন্যই এই ব্যষ্টিচৈতন্য! সাধকের সম্বিৎ-রূপী বীজজ্ঞান যখন সাধনের মধ্য দিয়া জাগিয়া উঠিয়া প্রজ্ঞামূর্ত্তি ধারণ করে, তখন সাধকের মোটজ্ঞান মোটসত্যকে পাইয়া আশ্চর্য্যরসে দ্রবীভূত হয় এবং আনন্দে ভাসিতে থাকে। এই মোট সত্যই সাধনের সত্য। আমাদের দেশের ভক্তিভাজন আদিম মহর্ষি-গণের একটি সার উপদেশ এই যে, একভাবে মোটসত্য নামরূপের অতীত, আরএক-ভাবে নিখিল বিশ্বচরাচর মোটসত্যের নামরূপ। মনুষ্যের স্বরোচ্চারণ-পথের আদি হইতে মধ্যপথের মধ্য দিয়া অন্তপর্য্যন্ত, অ হইতে উএর মধ্য দিয়া ম পর্য্যন্ত, যত প্রকার ধ্বনি উচ্চারিত হইতে পারে সমস্তের ঐকতানিক সমষ্টিসার যেমন ওঙ্কারধ্বনি, ভূলোক হইতে ভুবলোকের মধ্য দিয়া স্বর্লোক পর্য্যন্ত যতপ্রকার লোক-লোকান্তর আছে সমস্তের তেজঃপুঞ্জ সমষ্টিসার তেম্নি ভর্গো দেবস্য, জগৎ প্রসবিতা পরম দেবতার বরণীয় ভর্গ, অর্থাৎ তেজোময় জ্যোতি অথবা যাহা একই কথা শক্তিময় জ্ঞান। শক্তিময় জ্ঞানই বলি, আর, মঙ্গলময় সত্যই বলি, অর্থ একই; কেননা মঙ্গলশক্তিই শক্তি এবং সত্যজ্ঞানই জ্ঞান। আমাদের দেশের প্রাচীন তত্ত্বজ্ঞান-শাস্ত্রের

মোট সিদ্ধান্ত এই যে, (১) বাচক ধ্বনি ওঙ্কার, (২) ধ্যেয় রূপ ভূর্ভুবঃ স্বঃ বরণীয় ভর্গঃ, (৩) ওঙ্কারধ্বনি যে-এক নিস্তব্ধতা-সাগরে বিলীন, (৪) বরণীয় তেজোময় জ্যোতি যে এক অরূপসাগরে বিলীন, সমস্ত লইয়া যে এক অখণ্ড পরিপূর্ণ সমগ্র সত্য—সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম—তিনিই সাধনের সত্য।

শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ফরাসী বিপ্লবের একটি চিত্র।

মারকুইস ডি ল্যান্সির পত্নী এডেল অত্যন্ত ব্যস্তভাবে গৃহমধ্যে পাদচারণা করিতেছিলেন, এবং মধ্যে মধ্যে গবাক্ষের নিকট গমন করিয়া ইতস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া মনে হইতেছিল যেন তিনি কাহারও আগমন প্রতীক্ষায় অত্যন্ত উদ্বিগ্নভাবে সময় কাটাইতেছেন।

ফ্রান্সে তখন ঘোরতর রাষ্ট্রবিপ্লব চলিতেছে, সাধারণতন্ত্রীদিগের তখন পরিপূর্ণ প্রভাব। তাহারা দলে দলে সর্ব্বত্র যাতায়াত করিতেছে ও সাঙ্গীন হস্তে নগরের দ্বারে দ্বারে পাহারায় থাকিয়া অভিজাতদিগের ইচ্ছামত গমনাগমনে বাধা দিতেছে। "সাম্য, স্বাধীনতা মৈত্রী—অথবা মৃত্যু" তখন তাহাদের মূলমন্ত্র। তাহারাই তখন ফ্রান্সের শাসনকর্ত্তা। অভিজাতদিগের প্রতি প্রতিহিংসাপরায়ণ হইয়া তাহারা পশুর ন্যায় হিংস্র হইয়া উঠিয়াছে। রাজতন্ত্রীদিগের উচ্ছেদ সাধনই তখন তাহাদের একমাত্র লক্ষ্য। তাহাদের সন্ধান পাইলেই বন্দী করিয়া আনিয়া হত্যা করিতেছে। নির্দ্দোষী পুরুষ, অসহায়া স্ত্রীলোক, ছোট ছোট বালকবালিকা কাহাকেও রক্ষা করিতেছে না। পিতার অপরাধে পুত্রকে; স্বামীর অপরাধে স্ত্রীকে; ভ্রাতার অপরাধে নির্দ্দোষী ভ্রাতাকে এবং অন্য লোকের অভাবে ছোট ছোট বালকবালিকাকে হত্যা করিতেছে। বহুকাল ধরিয়া আঘাতের উপর আঘাত পাইয়া, আজ তাহারা অঙ্কুশাহত মাতঙ্গের ন্যায়, পদাহত সর্পের ন্যায় উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে। সম্রাট এবং জমীদারগণের বিশাল ব্যসন যোগাইবার জন্য, আজ দুই শত বৎসর ধরিয়া তাহারা অনশনে, অর্দ্ধাশনে, অক্লান্ত পরিশ্রমে শরীরের রক্ত জল করিয়া তাঁহাদের দাসত্ব করিয়াছে। তাহার প্রতিদানে তাহারা কি পাইয়াছে? অপমান! অত্যাচার! নিষ্ঠুরতা!

আজ তাহাদের দিন ফিরিয়াছে। প্রায় তিন লক্ষ প্রজা ফ্রান্সের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছে। আজ তাহারাই ফ্রান্সের রাজা; তাহাদের প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি তাহারা চরিতার্থ করিবে না? কে তাহাদিগকে বাধা দিবে? তাহাদের ভীষণ হত্যাকাণ্ড অবিশ্রান্তভাবে চলিতেছে। তাহার ভিতর দয়া নাই, মায়া নাই, বিশ্রাম নাই, শ্রান্তি নাই, শান্তি নাই, সময়ের হিসাব নাই। দিনের পর রাত্রি, রাত্রির পর দিন আসিতেছে; ইহা ভিন্ন সময়ের কোন হিসাব নাই। স্বয়ং সম্রাট হইতে আরম্ভ করিয়া সামান্য মারকুইস পর্য্যন্ত কেহ রক্ষা পাইতেছে না। যেখানে

তাঁহাদের সন্ধান পাইতেছে বন্দী করিয়া, কাহাকেও বিনা বিচারে, কাহাকেও বিচারের ভাণমাত্র করিয়া কারাগারে প্রেরণ করিতেছে, এবং পরিশেষে "ম্যাডাম গিলোটিনের" * করালকবলে প্রেরণ করিয়া তাহাদের সকল সুখ সকল সাধ জন্মের মত নির্ম্মূল করিয়া দিতেছে। এইরূপে প্রত্যহ কত নরনারী পিতৃপিতামহের অত্যাচারের ঋণ আপন আপন জীবন দ্বারা শোধ করিতেছে।

সম্রাট সপ্তদশ লুইএর বিচার এবং প্রাণদণ্ড হইয়া গিয়াছে। সুন্দরী শ্রেষ্ঠা সাম্রাজ্ঞী মারী এন্‌টয়্‌নেটও আর ইহজগতে নাই। এখনও প্রত্যহ ৪।৫টি "টাম্‌ব্রিল" পূর্ণ (শকট-বিশেষ) বন্দী বধ্যভূমিতে নীত হইয়া ঘাতকহস্তে প্রাণদান করিতেছে। এই হত্যাকাণ্ডে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীলোকগণ অধিক উৎসাহী। তাহারাও ভিন্ন ভিন্ন দলগঠন করিয়া অভিজাত ও রাজতন্ত্রীদিগের সন্ধান করিতেছে। বধ্যভূমিতে এই ভীষণ দৃশ্য দেখিবার জন্য তাহারাই বেশী উৎসুক! সম্রাটের ছিন্নমস্তক দেখিয়া তাহারাই ঘন ঘন করতালি দিয়াছে; আবার দীর্ঘকাল কারারুদ্ধা, বৈধব্যক্লিষ্টা সাম্রাজ্ঞীর শুভ্রমস্তক ঘাতক হস্তে দেখিয়া আনন্দে নৃত্য করিয়াছে। তবু তাহাদের শোণিত পিপাসা মিটে নাই। তবু "মার মার" "কাট কাট" শব্দ ভিন্ন তাহাদের মুখে অন্য কোন কথা নাই।

এডেলের স্বামী মারকুইস ডি ল্যান্সি একজন অভিজাত এবং রাজতন্ত্রী। এই উন্মত্ত জনতার নিকট তাঁহার পরিত্রাণ নাই জানিয়া তাঁহারা অদ্য রাত্রেই সামান্য কৃষকের বেশে প্যারিস পরিত্যাগ করিয়া ইংলণ্ডযাত্রা করিবেন ঠিক করিয়াছেন; এবং এডেলের ধাত্রী ম্যাডাম গেবেলের গৃহে একদিনের জন্য আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। ম্যাডাম যদিও একজন সাধারণতন্ত্রী কিন্তু স্তন্যদুগ্ধদ্বারা পালিতা কন্যার ক্রন্দন উপেক্ষা করিতে পারেন নাই। এডেলের স্বামী তাঁহাদের নির্ব্বিঘ্নে যাত্রার পাশ সংগ্রহ করিবার জন্য সহরে গিয়াছেন; এডেল তাঁহারই আগমন প্রতীক্ষায় অত্যন্ত ব্যস্তভাবে সময় কাটাইতেছেন।

ম্যাডাম গেবেল এই সময়ে গৃহপ্রবেশ করিলেন। তাঁহার বয়ঃক্রম অনুমান পঞ্চাশৎ বৎসর; কিন্তু শারীরিক শ্রমে ও মানসিক ক্লেশে তাঁহাকে বয়স অপেক্ষা বৃদ্ধা বোধ হয়। তিনি এডেলের ব্যস্তভাব দেখিয়া রুক্ষস্বরে বলিলেন,—"ব্যস্ত হইয়া লাভ কি? বিপদের সময় অধৈর্য্য হওয়া মূর্খের লক্ষণ।"

এডেল ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন,—"মা, আমার স্বামীর পদে পদে এমন বিপদ আমি কি করিয়া ধৈর্য্য ধারণ করিব?"

ম্যাডাম কহিলেন,—"তোমার স্বামীর কোন বিপদ ঘটিলে তাহা তার উপযুক্ত শাস্তিই হইবে। একমাত্র তোমার জন্যই আমি তোমাদের আশ্রয় দিয়াছি তাহা না হইলে তোমার স্বামীকে এক্ষণি ধরাইয়া দিতাম।" এডেল শিহরিয়া উঠিয়া কহিলেন,—"মা, কেন এমন নিষ্ঠুর কথা বলিতেছ? তোমাদের কি দয়া মায়া নাই?" ম্যাডাম গর্জ্জন করিয়া উঠিয়া কহিলেন,—

* গিলোটিন—অস্ত্রবিশেষ,—যাহাদ্বারা বন্দীগণকে হত্যা করা হইত।

"দয়া মায়া? তোমরা আবার দয়া মায়ার কথা বল? তোমাদের লজ্জা নাই? আমাদের উপর যখন অমানুষিক অত্যাচার করিয়াছ তখন তোমরা কি দয়া মায়া দেখাইয়াছ? কি অত্যাচার না করিয়াছ? আমাদের স্বামী পুত্রদের পশুর ন্যায় গাড়ীতে জুড়িয়া সারাদিন ঘুরাইয়াছ; রাত্রে তোমাদের নিদ্রার ব্যাঘাত হইবে বলিয়া ব্যাঙ্ তাড়াইবার জন্য সারারাত তাহাদের পাহারায় নিযুক্ত করিয়াছ; বিনা বেতনে ক্রীতদাসের ন্যায় খাটাইয়াছ; আমাদের শস্যে নিজেদের পালিত সখের পশু পক্ষীর আহার যোগাইয়াছ—নিজেদের জন্য একটি শস্য রাখিতে পারি নাই। যদি কোন দিন নিজেদের জন্য লুকাইয়া সামান্য কিছু রাখিয়াছি, তোমরা দেখিলে তাহাও কাড়িয়া লইবে বলিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া আহার করিয়াছি। আমাদের বয়স্থা কন্যাদের বলপূর্ব্বক ধরিয়া লইয়া গিয়া তোমাদের স্বামী পুত্রেরা তাহাদের বিলাসের সামগ্রী করিয়াছে—তাহাতে কেহ বাধা দিতে গেলে তাহাকে হত্যা করিতে পর্য্যন্ত কুণ্ঠিত হয় নাই। কেন? না উহাদের অধিকার বলিয়া। আজ কোন লজ্জার মাথা খাইয়া দয়া মায়ার কথা বলিতে আসিয়াছ? এডেল—এডেল"—

এডেল এই সময়ে ভীতস্বরে বলিয়া উঠিলেন,—

"ক্ষমা কর—ক্ষমা কর, আমার অপরাধ হইয়াছে।"

ম্যাডাম একটু শান্ত হইলেন। উল ও কাঁটা বাহির করিয়া মোজা বুনিতে লাগিলেন। এডেল গবাক্ষের নিকট দাঁড়াইয়া বাহিরের অন্ধকার গাঢ়তম হইয়া আসিল। উজ্জ্বল আকাশে দু'একটী নক্ষত্র ফুটিয়া উঠিল। মারকুইস এখনও আসিতেছেন না। এডেল সময় কাটাইবার জন্য একখানা চেয়ার টানিয়া ম্যাডামের নিকট বসিয়া গল্প আরম্ভ করিলেন,—

"আচ্ছা! ম্যাডাম গেবেল, তুমি কি মনে কর আমরা নির্ব্বিঘ্নে ইংলণ্ডে পৌঁছিতে পারিব?"

ম্যাডাম বলিলেন,—

"অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার—খুব সাবধান হওয়া প্রয়োজন। পাহারা ক্রমেই বেশী হইতেছে।"

আচ্ছা ম্যাডাম, আমার সমবয়স্কা তোমার যে একটি মেয়ে ছিল তাহার কি বিবাহ হইয়া গিয়াছে?"

ম্যাডাম গম্ভীরস্বরে বলিলেন,—"আমার কন্যা নাই।"

এডেল অত্যন্ত দুঃখিতস্বরে বলিলেন,—

"আহা! তোমার সে মেয়েটি বড়ই সুন্দর ছিল। কবে তাহার মৃত্যু হইল?"

ম্যাডাম পূর্ব্ববৎ স্বরে বলিলেন,—"তাহার মৃত্যু হয় নাই?"

এডেল একটু আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—

"তাহার মৃত্যু হয় নাই? তবে সে কোথায়?"

ম্যাডাম এবার গর্জ্জিয়া উঠিলেন,—"সে কোথায়? মারী কোথায়? তাহা আমাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া তোমাদের ঘৃণিত অভিজাতদিগকে জিজ্ঞাসা কর। তাহার মৃত্যু হইলে আমার দুঃখ ছিল না,—কিন্তু ইহা

তারপর এডেলের সোৎসুকদৃষ্টি দেখিয়া ম্যাডাম বলিতে লাগিলেন,—"তাহার কি হইয়াছে সে কথা শুনিতে চাও? তবে শোন:—মারী বড়ই সুন্দর ছিল। তাহার যখন ষোড়শ বৎসর বয়স তখন তাহার দিকে চাহিলে কেহ চক্ষু ফিরাইতে পারিত না। গোলাপ ফুলের মত রং; বড় বড় টানা টানা চোক দুটি; ভুরু দুটি যেন তুলি দিয়া আঁকা; বাঁশীর মত নাকটি; লাল টুকটুকে পাতলা ঠোঁট দুখানি; কোঁকড়া কোঁকড়া এক ঝাঁক চুল কতক পিঠে, কতক কপালে, কতক কাঁধের উপর আসিয়া পড়িয়াছে; উজ্জ্বল চক্ষুদুটি সর্ব্বদাই হাসিতেছে,—সে এক অপূর্ব্ব শ্রী! তাহার এই সৌন্দর্য্যই তাহার কাল হইল। আমি তাহাকে রক্ষা করার চিন্তায় সর্ব্বদাই বিব্রত থাকিতাম। নিজের শত পরিশ্রম হইলেও তাহাকে কোথাও কাজে পাঠাইতাম না। কিন্তু আমার অদৃষ্ট বাদ সাধিল; মারীর পিতা রুগ্ন শয্যায় পড়িলেন; আমি তাঁহার সেবা করিয়া অন্য কোনও কাজ করিবার সময় পাইতাম না। কে তখন তাঁহার ঔষধ পথ্য ও আমাদের আহার যোগায়? মারী বেশ সুন্দর সেলাই করিতে পারিত—আমাদের এই গৃহের নিকটেই একটি দরজির কারখানা ছিল, মারী সেখানে কর্ম্মে নিযুক্ত হইল। হায়! কেন তাহাকে সেখানে পাঠাইলাম? কেন নিজে উপবাস করিয়া, ভিক্ষা করিয়া স্বামীর ঔষধ পথ্যের যোগাড় করিলাম না?" ম্যাডাম চুপ করিলেন। এডেন উৎসুকভাবে বলিলেন,—"তারপর?"

"একদিন এক জমীদার পুত্র সেই দোকানে কাপড় ফরমাইস দিতে আসিল। তাহার দৃষ্টি মারীর উপর পড়িল। সেদিন ছুটি হইলে মারী বাহিরে আসিয়া দেখিল সেই যুবকটি দাঁড়াইয়া আছে। সে মারীকে দু একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিল,—মারীও উত্তর দিয়া চলিয়া আসিল। এইরূপে প্রত্যহ ছুটির পর মারীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া দুরাত্মা ক্রমে ক্রমে মারীর উপর তাহার মোহজাল বিস্তার করিল। মারীও তাহার সুন্দর চেহারা দেখিয়া ভুলিয়া গেল। আমি হতভাগিনী রুগ্ন স্বামী লইয়া ব্যস্ত থাকায় ইহার কিছুই জানিলাম না। একদিন সে মারীর নিকট বিবাহের প্রস্তাব করিল।"

ম্যাডাম চুপ করিলেন—কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া আবার বলিতে লাগিলেন,—

"মারী যখন হাসিতে হাসিতে আসিয়া আমাকে সেই বিবাহের প্রস্তাবের কথা বলিল, আমার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। আমি ত এই প্রস্তাবের অসম্ভাবিত্ব সম্বন্ধে অনেক করিয়া বুঝাইলাম—বোধ হইল যেন সে আমার কথা বুঝিল। সে সেই যুবকের সহিত আর বাক্যালাপ করিবে না এইরূপ প্রতিজ্ঞাও আমার নিকট করিল। এইরূপে প্রায় দুই মাস কাল গত হইলে আমি তাহার সম্বন্ধে একটু নিশ্চিন্ত হইলাম। সহসা একদিন বজ্রাঘাত হইল—মারী রাত্রে গৃহত্যাগ করিল।"

ম্যাডাম আবার নীরব হইলেন। তাঁহার দৃষ্টি উদাস; তিনি যেন বর্ত্তমান ভুলিয়া সেই অতীতের সব ঘটনা প্রত্যক্ষ করিতেছেন। এইরূপ কিছুকাল নীরব, নিস্পন্দ থাকিয়া তিনি হঠাৎ চমকিয়া উঠিলেন,

চারিদিকে চাহিয়া আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন,—

"এক বৎসর পরে একদিন সন্ধ্যার সময় মারী ফিরিয়া আসিল। পাপিষ্ঠ তাহাকে ছিন্ন বস্ত্রের ন্যায় ত্যাগ করিয়াছে। হতভাগিনী তখন আসন্নপ্রসবা। আমার স্বামীর তাহার কিছুদিন পূর্ব্বে মৃত্যু হইয়াছিল। দুঃখে অনুতাপে, লজ্জায় ম্রিয়মান হইয়া বালিকা মাতার বক্ষে শান্তি পাইবার জন্য আসিয়াছিল, কিন্তু পাপীয়সী মাতা তাহাকে তীব্র ভর্ৎসনা করিল। অভিমানে দুঃখিনী সেই রাত্রেই আবার আমার গৃহ ত্যাগ করিয়া গেল। সেই অবধি, আজ দশ বৎসর, অনেক অনুসন্ধান করিয়া কোথাও তাহার সন্ধান পাই নাই। এডেল,—এডেল! কেন তুমি আমার সেই স্মৃতি আবার জাগরিত করিলে? যাহা কত যত্নে, কত কষ্টে হৃদয় হইতে নির্ব্বাপিত করিবার চেষ্টা করিতেছি কেন পুনরায় তাহাতে অগ্নি সংযোগ করিলে? এডেল! তুমি বুঝিতেছ না—নিজের কি সর্ব্বনাশ করিতেছ। আমার প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি একবার জাগিয়া উঠিলে তোমাদের আর রক্ষা নাই!"

এডেল ম্যাডামের গলদেশ দুই হস্তে বেষ্টন করিয়া ধরিয়া তাঁহার মুখ চুম্বন করিয়া কহিলেন,—"ম্যাডাম তুমি এত সহ্য করিয়াও আমাদের যে আশ্রয় দিয়াছ আমি ইহাতে বড়ই আশ্চর্য্য হইতেছি, আর কৃতজ্ঞতাভারে আমার হৃদয় অবনত হইয়া পড়িতেছে। আমি না জানিয়া তোমার মনে কত কষ্ট দিলাম—আমাকে ক্ষমা কর।"

ম্যাডাম গেবেল পালিতাকন্যার মুখের প্রতি চাহিলেন। তাঁহার কঠোর দৃষ্টি একটু কোমল হইল। তিনি সস্নেহে এডেলের মুখখানি ধরিয়া তাহার প্রতি চাহিয়া বলিলেন,—

"আমি এই কোমল হৃদয়খানি জানি বলিয়াই নিষ্ঠুর হইতে পারি নাই।"

২

এই সময়ে কৃষকবেশী মারকুইস ডি ল্যান্সি গৃহপ্রবেশ করিলেন। তাঁহার দীর্ঘগঠন আয়ত চক্ষু, সুগঠিত নাসিকা, উন্নত ললাট সকলই সুন্দর; কিন্তু সে চক্ষুতে গভীর ভাবের একান্তই অভাব। তাঁহাকে দেখিয়া ম্যাডাম ভ্রু কুঞ্চিত করিলেন। এডেল দৌড়িয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"কি হইল হেনরী?"

হেনরী উত্তর করিলেন,—

"সব প্রস্তুত—আমরা আর এক ঘণ্টার মধ্যেই এই গৃহ ত্যাগ করিব,—তুমি প্রস্তুত হইয়া এস।"

ম্যাডাম গেবেল এডেলকে কৃষকপত্নীর বেশে সজ্জিত করিয়া দিলেন। এডেল তখনই প্রস্থান করিবার জন্য ব্যস্ত হইল। কিন্তু কিছু আহার করিয়া লওয়া যুক্তি সঙ্গত বোধে ম্যাডাম কিছু আহার্য্য আনিয়া দিলেন।

আহার করিতে করিতে হেনরী কি করিয়া পাশ সংগ্রহ করিয়াছেন, কত কষ্ট কত প্রবঞ্চনা করিতে হইয়াছে, একবার প্রায় ধরা পড়িতে পড়িতে বাঁচিয়া গিয়াছেন, ইত্যাদি সব গল্প করিতেছিলেন। এমন সময় পথে অত্যন্ত কোলাহল শ্রুত হইল। তাঁহারা সকলে গবাক্ষের নিকট গিয়া এক ভীষণ দৃশ্য দেখিলেন। দুইটি বন্দী

পূর্ণ "টামব্রিল" ঘিরিয়া প্রায় একশত জন লোক অত্যন্ত কোলাহল করিতে করিতে চলিতেছে। সেই "টাম্‌ব্রিলে" প্রায় পঞ্চাশৎ বন্দী কারাগারে নীত হইতেছে। কেহ বা মস্তক অবনত করিয়া বসিয়া আছে—কেহ বা একটু সহানুভূতির জন্ত কাতরনয়নে চারি দিকে চাহিতেছে; কেহ কেহ বা কিছু মাত্র ভ্রুক্ষেপ না করিয়া পরস্পর বাক্যালাপ করিতেছে; আবার কেহ বা বদ্ধাঞ্জলী হইয়া প্রার্থনা করিতেছে। সকলের অগ্রে, অগ্রে, সেই জনতাকে উৎসাহিত করিতে মশাল হস্তে এক বিকটমূর্ত্তি রমণী চলিতেছিল। তাহার পরিধানে ছিন্নবস্ত্র, রুক্ষকেশ বাতাসে উড়িতেছে; অঙ্গ ধূলিময়—কিন্তু তাহার ভ্রুক্ষেপ নাই! বিকট শব্দে জনতাকে উৎসাহিত করিয়া চলিয়াছে। তাহার উত্তেজনায় সকলে উন্মত্তপ্রায় হইয়া পৈশাচিক নৃত্য করিতেছে। এই দৃশ্য দেখিয়া এডেল শিহরিয়া ফিরিলেন। ম্যাডাম বলিলেন,—

"ঐ যে রমণীমূর্ত্তি দেখিতেছ উহাকে সকলে "প্রতিহিংসা" বলে। প্রায় দুই মাস হইল এই প্যারিস সহরে উহার আবির্ভাব হইয়াছে—ও যে কে, কোথা হইতে আসিয়াছে কেহ জানে না। শিকারী কুকুর যেমন শিকার খুঁজিয়া বাহির করে, ঐ রমণী অভিজাত ও রাজতন্ত্রীদিগকে সেই মতই খুঁজিয়া বাহির করে। উহার হাত এড়ান বড়ই কঠিন।"

ক্রমে সেই জনতা দৃষ্টিপথের অতীত হইয়া গেল। মারকুইস পুনরায় আহারে প্রবৃত্ত হইলেন। এডেল আর আহার করিতে পারিলেন না। কি যেন অমঙ্গল আশঙ্কায় তাঁহার হৃদয় থাকিয়া থাকিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিল।

সহসা বাহিরে পদশব্দ শ্রুত হইল, এবং অনতিবিলম্বে কে দ্বারে করাঘাত করিল। ম্যাডাম গেবেল কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। এডেল দৌড়িয়া তাঁহাকে বাহু দ্বারা বেষ্টন করিয়া অস্ফুট ভীতস্বরে কহিল,—

"রক্ষা কর, ম্যাডাম গেবেল, রক্ষা কর।"

বাহির হইতে পুনরায় শব্দ হইল,—

"রিপাবলিকের নামে আজ্ঞা করিতেছি দ্বার খোল।"

এই আজ্ঞা লঙ্ঘন করিবার শক্তি ম্যাডাম গেবেলের ছিল না। তিনি কঠোরভাবে এডেলকে সরাইয়া দিয়া দ্বারোন্মোচন করিলেন। দেখিলেন সেই প্রতিহিংসা দ্বারে দণ্ডায়মান। সে কহিল,—"আভিজাত্যের গন্ধ পাইয়া আসিয়াছি—তাহারা কোথায়?" ম্যাডাম কোন উত্তর করিলেন না। বোধ হইল সে কথা তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল না। তিনি স্থির দৃষ্টিতে সেই রমণীর মুখের প্রতি চাহিয়া ছিলেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি "মারী" "মারী" বলিয়া ক্রন্দন করিয়া উঠিয়া তাহাকে বুকে টানিয়া লইলেন। মারীও অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। মাতা কন্যার মিলনের দৃশ্য দেখিয়া কোমলপ্রাণা এডেলের চক্ষেও অশ্রু ফুটিয়া উঠিল। কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া ম্যাডাম বলিলেন,—

"মারী! এতদিন কোথায় ছিলে? তোমার জন্য কত ক্লেশ পাইয়াছি তুমি কল্পনাও করিতে পার না। মাগো! তোমার

এ বেশ এ চেহারা কেন? মাতা অপরাধ করিলে কি তাহাকে এ রকম করিয়াই শাস্তি দিতে হয়?"

মারী বলিল,—

"মা সে অনেক কথা—পরে বলিব। এখন যে কাজের জন্য দল ছাড়িয়া ফিরিয়া আসিয়াছি তাহা সম্পন্ন না করিয়া অন্য কিছুতে এক মুহূর্ত্তও নষ্ট করিতে পারি না। সংবাদ পাইলাম দুইজন রাজতন্ত্রী এই গৃহে লুকায়িত আছে—তাহাদের সন্ধানে আসিয়াছি।" তার পর হেনরী ও এডেলের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"ইহারা কাহারা?"

ম্যাডামের উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই মারী হেন্‌রীর দিকে অগ্রসর হইতে হইতে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল,—"মহাশয় সেই দুর্বৃত্ত কয়েকজন কোথায় আপনি জানেন কি? যদি আপনি তাহাদের সন্ধান,"—

মারী কথা শেষ না করিয়াই হঠাৎ চীৎকার করিয়া উঠিল,—

"মা—মা—এডেল কৃষক নয়! এই দুরাত্মাই বিবাহের প্রলোভন দেখাইয়া আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছিল।"

ম্যাডাম সর্পদংষ্ট্রের ন্যায় চমকিয়া উঠিলেন,—

"কি বলিলে? এই পাষণ্ডই তোমার এই অবস্থার কারণ?" তারপর অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া বলিতে লাগিলেন,—"হায়! হায়! স্নেহ মোহে ভুলিয়া এই দুরাত্মাকেই রক্ষা করিতে যাইতেছিলাম! কিন্তু আর নয়—যাও দূরে মায়া,—যাও স্নেহ মোহ, যাও ভালবাসা—সব যাও! আজ শুধু প্রতিহিংসা সার।"

এডেল মারীকে দেখিয়া অবধি ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া গিয়াছিল। এতক্ষণে একটু সাহস সংগ্রহ করিয়া কহিতে লাগিল,—"রক্ষা কর—রক্ষা কর—চিরজীবন তোমাদের দাসত্ব করিয়া এই ঋণ শোধ করিব। আমার প্রতি দয়া করিয়া আমার স্বামীকে ক্ষমা কর।"

এডেলের দুই গণ্ড বাহিয়া অশ্রু উছলিয়া পড়িতেছিল। মারী সেই অশ্রুরাশি দেখিয়া আনন্দে করতালি দিয়া উঠিল,—

"হাঃ হাঃ হাঃ চোখে জল! প্রবল পরাক্রান্ত মহামান্য মারকুইস ডি ল্যান্সির পত্নীর চোখে জল! সে একজন ঘৃণিত শ্রমজীবির কন্যার নিকট কৃপাভিখারী! এত আনন্দ আমার অদৃষ্টে ছিল! আজ আমার সব কষ্ট সার্থক হইল! হাঃ হাঃ হাঃ—মা তুমি শীঘ্র যাও লোকজন লইয়া এস—আমি ইহাদের পাহারা দিতেছি।"

ম্যাডাম প্রস্থান করিলেন। এডেল মারীর নিকট নতজানু হইয়া পুনঃ পুনঃ ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। মারী বিরক্তভাবে তাঁহাকে সরাইয়া দিতে গেল। হঠাৎ তাহার হস্ত এডেলের বক্ষ বিলম্বিত একটি রৌপ্য নির্ম্মিত ক্রুশের উপর পড়িল। তাহা তুলিয়া ধরিয়া দেখিবামাত্র সে চমকিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—

"ইহা কোথায় পাইলে? এডেল বলিলেন,—

"একটি দুঃখিনী বালিকাকে একবার মহাপাপ হইতে নিরস্ত করিয়াছিলাম—সে ইহা আমায় দিয়াছিল।"

মারী পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল,—

"কত দিন হইল ইহা পাইয়াছ?" এডেল

বলিতে লাগিলেন,—"প্রায় দশ বৎসর হইল। আমার তখনও বিবাহ হয় নাই। আমি সন্ধ্যার সময় নদীতীরে ভ্রমণ করিতে বড় ভাল বাসিতাম। পিতার একমাত্র সন্তান ছিলাম—স্নেহবশে তিনি আমার কোন ইচ্ছায় বাধা দিতেন না। একদিন সন্ধ্যার সময় আমার সঙ্গিনীগণ ও ভৃত্যগণ সহ নদীতীরে বেড়াইতে গিয়াছিলাম। সেখানে একজন গণকের সহিত সাক্ষাৎ হইল। আমার সঙ্গের লোকজন তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া নানা রকম প্রশ্ন করিতে লাগিল। আমি একাকী হাঁটিতে হাঁটিতে অনেক দূর গিয়া পড়িলাম। তখন সন্ধ্যা গাঢ় হইয়া আসিয়াছে——ফিরিব ফিরিব মনে করিতেছি এমন সময় দেখিলাম একটি রমণীমূর্ত্তি ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া নদীতে নামিতেছে। এই সন্ধ্যার সময় কে স্নান করিতে আসিল? আমি একটু কুতূহলী হইয়া দেখিতে গেলাম। কাছে গিয়া দেখিলাম স্নান নয়—রমণী আত্মহত্যা করিবার চেষ্টা করিতেছে। আমি পশ্চাৎ হইতে তাহার স্কন্ধে হস্তার্পণ করিলাম। সে চমকিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইলে দেখিলাম একটি অপূর্ব্ব সুন্দরী বালিকা।"

মারী এই সময়ে ব্যগ্রভাবে বলিয়া উঠিল,—

"বলিয়া যাও—বলিয়া যাও।"

এডেল বলিতে লাগিলেন,—"আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম সে কেন এই মহাপাপে প্রবৃত্ত হইতেছে। সে উত্তর করিল "হৃদয়ের জ্বালা জুড়াইতে।"

আমি তখন ধীরে ধীরে তাহাকে আত্ম-হত্যা যে মহাপাপ—তাহা করিবার অধিকার যে আমাদের নাই তাহা বুঝাইতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ পরে সে যেন বুঝিতে পারিল। এখন সে——"

মারী এই সময়ে বাধা দিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—

"তাহার পরিধানে ধূসর বর্ণের পোষাক ছিল?" "হ্যাঁ।"

"তাহার বক্ষে একটি রৌপ্যনির্ম্মিত ক্রুশ ছিল?" "হ্যাঁ"

"তাহার কোলে একটি ছোট শিশু ছিল?"

এডেল ক্রমেই আশ্চর্য্য হইতেছিলেন। এবার বলিলেন,—"হ্যাঁ—কিন্তু তুমি কি করিয়া জানিলে?"

"সে কথায় প্রয়োজন নাই তারপর কি হইল বলিয়া যাও।"

"তার পর সে আমাকে তাহার জীবনের কাহিনী বলিল। সে সব কথা শুনিয়া আর কি করিবে? এই টুকু মাত্র বলি সে এক জনের কুহকে ভুলিয়া বিবাহের আশায় গৃহ-ত্যাগ করিয়াছিল। তার পর প্রতারিত হইয়া আত্মহত্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল। সে আমার নিকট আর সব কথাই বলিল কিন্তু তাহার পিতার নাম কিছুতেই বলিল না। জিজ্ঞাসা করাতে বলিল "সে পবিত্র নামে কলঙ্ক আরোপ করিয়াছি, তাহা আর উচ্চারণ করিব না।" আমার সঙ্গে কিছু মুদ্রা ছিল—তাহার শিশুটির জন্য তাহা তাহার হস্তে দিলাম এবং প্রয়োজন হইলে আবার আমাকে জানাইতে বলিয়া আমি সে স্থান ত্যাগ করিলাম। এক মাস পরে সে এক খানা পত্র লিখিয়া তাহার শিশুর স্মরণ চিহ্ন স্বরূপ এই ক্রুশটি আমায় পাঠাইয়া দিল।

পত্রে শিশুর মৃত্যু সংবাদ ছিল। আমি সেই অবধি আজ পর্য্যন্ত এই ক্রুশটি এক মুহূর্ত্তের জন্যও ত্যাগ করি নাই।"

মারী এতক্ষণ উৎকর্ণ হইয়া এডেলের কাহিনী শুনিতেছিল। তাঁহার বাক্য শেষ হইলে ধীরে ধীরে কহিল,—

"আমিই সেই রমণী।"

এডেল চমকিয়া উঠিলেন। সেই সুন্দর বালিকা মূর্ত্তি আর এই ভীষণ রমণী মূর্ত্তি! কি পরিবর্ত্তন! মারী অবনত মস্তকে কিছুক্ষণ কি চিন্তা করিল। তার পর দ্রুতপদে গিয়া গৃহ গাত্রের এক স্থান টিপিয়া ধরিল—একটী গুপ্ত দ্বার খুলিয়া গেল। সেই দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া মারী কহিল,—

"এই গুপ্ত দ্বার সম্বন্ধে আমার মাও কিছু জানেন না। আমি একবার দৈবাৎ টের পাইয়া ছিলাম। রাত্রে সকলে নিদ্রিত হইলে ঐ পাপিষ্ঠের প্রবেশের জন্য এই দ্বারই প্রত্যহ খুলিয়া দিতাম। যাও—তোমার পাষণ্ড স্বামীর হস্ত ধারণ করিয়া ঐ দ্বার দিয়া পলায়ন কর। একবার তুমি একটি অসহায়া বালিকাকে মহাপাপ হইতে রক্ষা করিয়াছিলে—তাহার সহিত সস্নেহ ব্যবহার করিয়াছিলে—সে আজ সেই ঋণ শোধ করিল। যাও—আমার প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি ফিরিয়া আসিবার পূর্ব্বে পলায়ন কর"।

এডেল কৃতজ্ঞতাভরে মারীকে আলিঙ্গন করিয়া তাহার মুখ চুম্বন করিল। হেনরী এতক্ষণ নীরবে গবাক্ষের নিকট দাঁড়াইয়া সব দেখিতে ছিলেন। একটি কথা বলিতেও সাহস কুলায় নাই। বিদায়ের সময় মারীর দিকে অগ্রসর হইয়া কৃতজ্ঞতা জানাইতে উদ্যত হইলে, মারী ঘৃণাভরে তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়া কহিল,—

"পত্নীর পুণ্য ফলে রক্ষা পাইলে কৃতজ্ঞতা তাহাকে জানাও"।

প্রস্থান করিবার সময় এডেল আবার কৃতজ্ঞতাপূর্ণ দৃষ্টিতে মারীর মুখের প্রতি চাহিল। মারী নীরব নিশ্চল প্রতিমার মত দাঁড়াইয়া রহিল।

ম্যাডাম গেবেল দলবল সহ ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন "শিকার পলাইয়াছে। আর মারী নতজানু ও বদ্ধাঞ্জলি হইয়া প্রার্থনা করিতেছে।

নারী মঙ্গল।

কি মোহ মদিরা, কি অমৃত অয়ি রমণি,
দিলে তুমি দিলে বিশ্ব নিখিলে বিথারি।
পুলকাঞ্চিত পলে পলে সারা ধমনী,
স্থান নাহি আজি, স্থান নাহি কোন দ্বিধা-রি।

কি মহাতীব্র অনল উগ্র ঝলিছে;
রাশি রাশি তব লীলা চঞ্চল নয়নে;
লক্ষ মদন পুলকে পলকে জ্বলিছে,
স্বর্ণ সবিতা উজ্জ্বল চিতা শয়নে।

নিমিষে আবার সজল জলদ বরষে
মমতার ধার,—ঝর ঝর ওকি ঢালকি?
কোটি জীবন জাগিছে ও কোন পরশে?
দুলিছে স্বর্গ নরের মর্ত্ত্য আলোকি।

কি মোহ মদিরা, কি অমৃত অয়ি রমণী,
দিলে তুমি দিলে বিশ্ব নিখিলে বিথারি।
পুলকাঞ্চিত পলে পলে সারা ধমনী;
স্থান নাহি আজি, স্থান নাহি কোন দ্বিধা রি।

সুনিবিড় দুটি সুন্দর ভুজ বন্ধনে
স্নেহ-বিমল বিপুল মুক্তি ক্ষরিছে।
পায়ের মুখর নূপুরের মৃদু ক্রন্দনে
গরবে নীরবে নিখিলের ব্যথা ঝরিছে।
চরণের তলে স্থান লভি' সারা ধরণী
লভিছে সম্মান মানিছে ধন্য আপনা।
নিজ বুক দিয়া ঢাকি কণ্টক-সরণী,
জাগিয়া করিছ আঁধার যামিনী যাপনা।

কি মোহ মদিরা, কি অমৃত অয়ি রমণি,
দিলে তুমি দিলে বিশ্ব নিখিলে বিথারি।
পুলকাঙ্কিত পলে পলে সারা ধমনী,
স্থান নাহি আজি, স্থান নাহি কোন দ্বিধা-রি।

হৃদয়ে পুষ্প উঠিয়াছে হের মুঞ্জরি,
নিভৃত মর্ম্ম আসিয়াছে ছুটি বাহিরে।
শত চুম্বন অধরের মূলে গুঞ্জরি'
শিহরি উঠিছে মর্ম্মের গাথা গাহিরে।
অঙ্কের পরে নিখিল বিশ্ব বিকাশে;
দীপ্ত দামিনী অধর দুয়ারে সঞ্চলে,
ঘন কেশ পাশ উড়িছে উদার আকাশে,
মুগ্ধ পবন উছলিছে নীল অঞ্চলে।

কি মোহ মদিরা, কি অমৃত অয়ি রমণি,
দিলে তুমি দিলে বিশ্ব নিখিলে বিথারি।
পুলকাঙ্কিত পলে পলে সারা ধমনী,
স্থান নাহি আজি, স্থান নাহি কোন দ্বিধা-রি।

ললিত করুণা গলিত কি ধরা উরসে,—
বুকে লয়ে চির নন্দন মধু গরিমা?
কাহার স্বর্ণ জীয়ন কাঠির পরশে
দূরে চলে গেছে মৃত্যুর জড় জড়িমা?
মাতা হয়ে আছ শিশুটিরে কোলে সাপটি,
বধূ হ'য়ে আছ স্তম্ভিত হৃদি মিলয়ে,
কন্যার বেশে পড়িতেছ বুকে ঝাপটি,
ঘুড়িয়া বসেছ মানবের দিক্ বলয়ে।

কি মোহ মদিরা, কি অমৃত অয়ি রমণি,
দিলে তুমি দিলে বিশ্বনিখিলে বিথারি।
পুলকাঙ্কিত পলে পলে সারা ধমনী,
স্থান নাহি আজি, স্থান নাহি কোন দ্বিধা-রি।

শ্রীহেমেন্দ্রলাল রায়।

ডায়িরি প্রসঙ্গ।

The English Diary of an Indian Student. By Rakhal Das Halder with an Introductin by Harinath De M. A. of the Indian Educational Service, Dacca, Ashutosh Library.—নিতান্ত অসহায় অবস্থায় পড়িয়া একজন বঙ্গসন্তান কিরূপ অসীম ধৈর্য্য ও অধ্যবসায়বলে সুদূর পাশ্চাত্যভূমে বিদ্যালাভ করিয়াছিলেন এবং দৈন্যের মধ্যেও পড়িয়া কিরূপে আপনার নৈতিক চরিত্র অবিচলিত রাখিয়াছিলেন, ডায়িরিখানি পাঠ করিলে আমরা তাহার পরিচয় পাই। প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে ভারতবাসী বৈদেশিক সমাজে কিরূপ সমাদৃত হইতেন, মহাপ্রাণ পাশ্চাত্য মনীষীগণ প্রাচ্যজাতির প্রতি কিরূপ শ্রদ্ধাবান ছিলেন তাহারও নিখুঁত চিত্র ইহাতে দেখিতে পাওয়া যায়। তদ্ভিন্ন অনেক বিস্মৃত সামাজিক ও ঐতিহাসিক তথ্য কৌতুহলী পাঠকের চিত্ত আকৃষ্ট করে। গ্রন্থখানি উপন্যাসের ন্যায়ই সুখপাঠ্য হইয়াছে।

উক্ত ডায়িরি গ্রন্থখানি ভিন্ন উঁহার রচিত "শ্রীরামচরিত" গ্রন্থও আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে। কাব্যাংশের আড়ম্বর আলোচনা না করিয়া লেখক ইতিহাসের দিক দিয়া রামচরিত্রের আলোচনা করিয়াছেন। আলোচনা সংক্ষিপ্ত হইলেও মনোজ্ঞ। সিপাহি বিদ্রোহের পূর্ব্বে এই গ্রন্থ প্রথম প্রকাশিত

হয়। পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে বাঙালী কেমন বিশুদ্ধ ভাষায় বাংলা লিখিতেন ও তাঁহার ভাবের গাম্ভীর্য্যও কিরূপ ছিল এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি পাঠ করিলে তাহার সম্যক ধারণা হয়। শ্রীরামচরিত্রের বিশালতা ও উদারতা, লক্ষণের সৌভ্রাত্র, ভরতের ধর্ম্মনিষ্ঠা, সীতা-দেবীর অতুলনীয়, 'স্বামিপরায়তা' ও তাহারি সহিত রামচন্দ্রের সমসাময়িক ভারতবর্ষ ও সন্নিহিত প্রদেশ-সমূহের সভ্যতার একটা সংক্ষিপ্ত আভাষ গ্রন্থে সুপরিস্ফুট। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে লেখক রামচন্দ্রের কালনিরূপণ করিতে যাইয়া বহুবিশেষজ্ঞের মতের আলোচনা করিয়া নিজের মত সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। লেখকের মতে "দুর্য্যোধনের ৭২৫ বৎসর পূর্ব্বে রামচন্দ্র প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। পুরাণের মতে দুর্য্যোধন বিক্রমাদিত্যের প্রায় ১৮৫৯ বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন। তাহার সহিত ৭২৫ যোগ করিলে ২৫৮৪ বৎসর হয়। সৈংহল পুরাবৃত্তানুসারে বিক্রমাদিত্যের ২৩৩০ বৎসর পূর্ব্বে রাবণের মৃত্যু হয়।" ৫৪ বৎসর পূর্ব্বে লেখক এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। তাঁহার পক্ষে আলোচনার সৌকর্য্যার্থে যে সকল প্রমাণ দুষ্প্রাপ্য ছিল, আজ তাহা সুলভ হইয়াছে সন্দেহ নাই। পরবর্ত্তী মতানুক্রমে তাঁহার ধারণা ভ্রান্ত হইতে পারে, তাহা বিশেষজ্ঞের বিচার্য্য; সে সম্বন্ধে আমাদিগের বিশেষ বক্তব্য না থাকিলেও, তাঁহার পক্ষে যেটুকু প্রমাণ সম্ভবপর হইয়াছিল তিনি যে তাহার সদ্ব্যবহার করিয়াছিলেন, ইহাই আনন্দের বিষয়।

এই প্রসঙ্গে রাখালদাসবাবুর জীবনী সম্বন্ধে সংক্ষেপে একটু আলোচনা করিলে নিতান্ত অসঙ্গত হইবে না বলিয়া মনে করি।

ইংরাজী ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ভাটপাড়ার নিকটবর্ত্তী জগদ্দল গ্রামে রাখালদাসের জন্ম হয়। রাখালদাসের পিতা নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন। রাখাল-দাস মহর্ষির অনুবর্ত্তী সংস্কারক দলে যোগ দেন ও সমাজে ধর্ম্মবিষয়ক বক্তৃতা করিতেন। বাঙলা ভাষার প্রতি বাল্যকাল হইতেই তাঁহার অনুরাগ ছিল। সংবাদপ্রভাকর, সমাচারচন্দ্রিকা, সোমপ্রকাশ প্রভৃতিতে তাঁহার রচনাদি প্রকাশিত হইত। ল্যাম্বের লিখিত সেক্সপীয়রের কয়েকটি উপাখ্যানের ও রাজা রামমোহন রায় রচিত Precepts of Jesus গ্রন্থের তিনি বঙ্গানুবাদ করেন। উপরিতন কর্ম্মচারীর সহিত মতান্তর হওয়ায় তিনি কটকের স্কুল ইনস্পেক্টরের কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে বিলাতযাত্রা করেন। জাহাজে প্রসিদ্ধ মার্কিন পাদরী ডল সাহেবের সহিত আলাপ হয়। বিলাতে লণ্ডন ইউনিভারসিটি হলে অবস্থানকালে ডল সাহেব তাঁহাকে ইউনিটারিয়ান খ্রীষ্টানধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার প্রয়াস পাওয়ায় ডলের সহিত তাঁহার বিরোধ ঘটে। বিলাতে নূতন বিশ্ব-বিদ্যালয়ে বাঙলা ও হিন্দুস্থানী ভাষায় তিনি কিছুকাল শিক্ষকতা করেন। এই সময়ে চার্লস ডিকেন্স সম্পাদিত All the year Round পত্রিকায় ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তিনি প্রবন্ধাদিও লিখিতেন। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে Juris produceএ প্রশংসাপত্র লাভ করিয়া তিনি কিছুকালের জন্য আয়র্লণ্ড ও ফ্রান্স ভ্রমণে বহির্গত হন। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন।

স্বদেশে ফিরিয়া তিনি হাইকোর্টে কিছুকাল ওকালতি করেন পরে ওকালতি ছাড়িয়া চাকুরি গ্রহণে বাধ্য হন। তদানীন্তন ছোট লাট সার সিসিল বীডন তাঁহাকে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ প্রদান করেন। জীবনের শেষ ছয় বৎসর তিনি ছোটনাগপুরে কোর্ট ওয়র্ডাস এষ্টেটের ম্যানেজার ছিলেন। রাজকার্য্যে তাঁহার দক্ষতা সম্বন্ধে চীফ সেক্রেটারি এডগার সাহেবের পত্র নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"The Lieutenant Governor also acknowledge the valuable assistance given to you by Rakhaldas Halder, who was the manager of the Chota Nagpur Estate; and takes this opportunity of placing on record his sense of the loss which the Government has sustained by the death of this excellent officer"—Extract from a letter to Commissioner Chota Nagpur Division, No. 51 J dated the 9th January, 1881.

১৮৮৭ সালের নবেম্বর মাসে রাখালদাসের মৃত্যু হয়। রাখালদাসের অনেকগুলি পুত্র কন্যা। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ ডেপুটিম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত সুকুমার হালদার অনেকেরই সুপরিচিত।

রাখালদাসের শ্রীরামচরিত্রের রচনা সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বলেন "গ্রন্থের ভাষা তৎকালিক সাধুভাষার উৎকৃষ্ট উদাহরণ * * কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আমাদের শিক্ষিত সমাজের চিন্তাপ্রণালীর আদর্শ এই গ্রন্থ হইতে অনেকটা পাওয়া যায়।"

গদ্যরচনাগুলি ভিন্ন তাঁহার রচিত অপ্রকাশিত একখানি নাতিবৃহৎ কবিতাগ্রন্থও আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে। ইহা হইতেও তাঁহার চিন্তাশীলতা ও স্বদেশের প্রতি গভীর অনুরাগের সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

বিলাতপ্রবাসীদিগের মধ্যে অনেকেরই মুখে শুনিয়াছি "বিলাত দেশটা" এক অপূর্ব্ব স্থান সেস্থান হইতে ফিরিতে মন ত চাহেই না। কিন্তু রাখাল হালদারের বিলাতে অবস্থান কালে মন স্বদেশের জন্য কি পরিমাণে আকুল হইত তাহা নিম্নোদ্ধৃত রচনাংশ হইতেই সকলে বুঝিতে পারিবেন। ইহা অবশ্য 'স্বদেশী'-আন্দোলনের বহু পূর্ব্বেকার কথা।।

"কিনা দিতে পারি ভাই! যদি একবার
হেরি স্বদেশের মুখ?
সুহৃদের শুভদৃষ্টি ক্ষিতিসুখসার
পেলে পাশরি অসুখ!
* * * *
জননীর কোলে জন্মভূমি কোলে আর
নহে অধিক বিশেষ;
হেন স্বর্গ ছাড়ি আইলাম সিন্ধুপার
তাই দুখ একশেষ।
* * * *
গৃহ! গৃহ! গৃহ! ধ্বনি সদা শ্রুতি গেহে
আর নাহিক বিরাম;
আর কি পাইব গৃহসুখ এই দেহে
মোর গৃহ অভিরাম!
লণ্ডন, ২১ ফাল্গুন, ১৭৮৩ শকাব্দা।

উক্ত উদ্ধৃত অংশে বাক্যের অপূর্ব্ব বিন্যাস বা ছন্দের তেমন সলিল সহজ প্রকৃতি না থাকিলেও কথাগুলি অন্তরের নিভৃততম প্রদেশ হইতে উঠিয়াছে। আজকাল তাই 'সাজা' কবির 'মাজাঘসা' কৃত্রিম উচ্ছাস হইতে মধুর।

তাঁহার রচিত 'সতী' কবিতাটি আমুল উদ্ধৃত করিয়া আমাদিগের বক্তব্য সমাপ্ত করিলাম।

সতী।

করোনা, করোনা সবে মোরে নিবারণ
আমি পাগলিনী নহি বটি অভাগিনী,
ক্ষীণ দেহ হীন বস্ত্র দরিদ্র লক্ষণ,
ব্রাহ্মণ মরেছে করো মোরে অনাথিনী।

চিতায় উঠিব এই শরীর ছাড়িব,
কারে বলে সুখ কভু নাহি জানি আমি,
ইহকাল গেল দুখে, পরেতে ভুঞ্জিব
যাব অমরের পুর যথা গেল স্বামী।

নির্ধন নির্দোষ ছিল জনক আমার,
স্নেহেতে দেখিত মোরে পরম সুন্দরী,
তাই দেখি শুনি বড় ঘরে ব্যবহার
বাঁধিয়া দিলেন কন্যা সমর্পণ করি।

পতি হল অন্যমন দুখিনীর প্রতি,
না জানি দেখিল মোরে কি অশুভক্ষণে,
সুখ, দুখ, হর্ষ, শোক, অদৃষ্টের গতি।
পাঠাইয়া দিল মোরে পিতার ভবনে।

পিতার কুটিরে আসি করিলাম বাস
(ক'দিন ছিলাম আমি শ্বশুরের ঘরে?)
যত পড়সিনীগণ করে উপহাস,
কতরূপ অপবাদ উঠাইল পরে।

জনক আমার ছিল বিগত যৌবন
সতত ব্যাধির কোপ তাঁহার শরীরে,
সেবিলাম যত্নে. হ'লে বিগত জীবন,
ভাসাইনু তাঁর ভস্ম ব্রাহ্মণীর নীরে।

বিধাতা হইলে বাম কেবা রাখে আর,
পৃথিবী হইল শত্রু, আমি অকিঞ্চন,
চাহিলে না দেয় ভিক্ষা করে "মার ! মার !"
ফল মূল খেয়ে কাটি ঘৃণিত জীবন।

মোরে ত্যজি স্বামী অন্য করিল গৃহিণী ;
তনয় তনয়া তার হল অতঃপর,
কিছুদিন সুখভোগে বাহিল সতিনী,
ভাগ্যবতী রাখি পতি গেল লোকান্তর।

আমি পুন দাঁড়াইনু প্রাণনাথ পাশে,
করিনু বিনয় স্তুতি করিতে গ্রহণ
পায়ে ধরি মাথাখুড়ি ; স্বামী মোর হাসে,
কহে"লো প্রেতিনী যাও যমের সদন।"

এবে, পূর্ণ বয়স পাইয়া প্রাণনাথ
ধন পুত্র রাখি পাছে গেছে স্বর্গপুর ;
আমি তার আদি ভার্য্যা, যাব পতি সাথ,
দেহ মোরে তৈল, নব বসন, সিন্দুর।'

শুনি মহিলার বাণী বিস্মিত সকলে
আনি দিল দ্রব্য সব যথা প্রয়োজন ;
আত্ম অভিষেক সতী করি নদী জলে,
করে অঙ্গরাগ নব বরিকা যেমন।

উঠিল চিতায় ধনী সহাস্য বদনে
জড়াইল বাহুপাশে নিরদয় শব,
অধরে অধর দিল ; অনল দহনে
হ'ল ভস্মে একীভূত ধন্য লোকে রব।

পাকচক্র। চতুর্থ দৃশ্য।

কর্ত্তা ও চন্দ্রকান্তের প্রবেশ।

কর্ত্তা। দেখ চন্দ্রকান্ত,—কি উপায় বল দেখি? আমি হলুম উন্নতিবিধায়িনী সভার প্রেসিডেণ্ট, কাগজকলমে লিখে প্রতিজ্ঞা করেছি বিয়েতে টাকা নেবওনা দেবওনা ; এখন—

চ। কাজটা ভাল করেননি।

ক। তাত এখন বুঝছি। তখন ত জানতুম না বিনোদের বড় দুটি বোন শিশু-কালে মারা যাবে। যাহ'ক বুঝে না বুঝে একটা প্রতিজ্ঞা যখন করেই ফেলেছি—তখন ছেলের বিয়ের বেলা সেটা ভেঙ্গে ১০ হাজার টাকা কি ক'রে চেয়ে বসি বল দেখি? তাও কি হয় চন্দ্রকান্ত,—তুমিই বল?

চ। আজ্ঞে তা আর কি করে হবে—

ক। তুমি ত বল্লে কি করে হবে—কিন্তু গিন্নি যে বেঁকে বসেছেন,—আর সব পারা যায়—গিন্নিকেত পারার যো নেই। তুমি যদি কোন উপায় করতে পার চন্দ্রকান্ত তবেই রেহাই পাই!

চ। দাঁড়ান একটু ভাবতে দিন।

ক। আঃ ভাব ভাব,—বেশ করে ভাব—তুমি ভাবতে ভাবতে শুখনো নদীতেও বাণ ডাকাতে পারবে—তা আমি বেশ জানি! দোহাই তোমার—তুমিই আমার আশা,—তুমিই আমার ভরসা—আমি তোমাকেই এই ভবসাগরের কাণ্ডারী বলে জানি।—

চ। আমি ত একটা খুব সহজ উপায় দেখতে পাচ্ছি—

ক। বল বল চন্দ্রকান্ত—তোমার দুটি পায় পড়ি—বল—বাঁচাও।

চ। আপনি কি যে বলেন!—আমি বলি বিয়েটা ভেঙ্গেই দিন না—আপনি হলেন বরের বাপ—কন্যাদায় ত আপনার না,—কনে অমন ঢের জুটবে।—

ক। হায় হায়! তা যদি পারতেম! কিন্তু বলব কি দুঃখের কথা—তুমি যেটা ভাবছ সহজ—সেইটেই সব চেয়ে কঠিন—(কাছে মুখ আনিয়া মৃদুস্বরে) তোমাকে খুলে বল্লে ত আর প্রকাশ হবে না—জান চন্দ্রকান্ত বেজায় জড়িয়ে পড়েছি, হরিবাবুর কাছে পাঁচ হাজার ধার নিয়েছিলুম—যদি বিয়েটা না দিই এক্ষণি তাহলে সে টাকাটা দিতে হয়।

চ। আর বিয়েটা হলে?

ক। তাহলে ধারটাও শোধ যাবে—নগদ ৫ হাজারও ঘরে আসবে।—

চ। বটে! তাহলে যেমন করেই হোক বিয়েটা হওয়া চাই-ই।

ক। এই যা বল্লে! কিন্তু গিন্নি রাজি না হলে ত কিছুই হচ্চে না।

চ। এটা আর এত মুস্কিল কি? গিন্নি ত ১০ হাজার চাচ্চেন—তারা ত আসলে তাই দিচ্ছে—সেইটে আর গিন্নিকে বোঝাতে পারবেন না।

ক। তা পারি কই? নগদ ত পাঁচ হাজারের বেশী তাঁকে দিতে পারছি না,—তিনি চান—পুরো দশ।

চ। এতক্ষণে সব বুঝলুম। তা আছে—আছে, একটা উপায় আছে,—শশীকে যদি হাত করতে পারা যায়—তাহলে আর ভাবনা নেই।

ক। মন্দ বলনি—ঠিক ঠিক। সাধে কি বলি এত কাঁচা বয়স ও এত পাকা মাথা—আর জুটি মেলে না! কিন্তু তাকে হাত করাও ত সহজ না,—তবে তোমায় অসাধ্য কিছুই নেই—এই যা!

চ। আপনিও একবার চেষ্টা করুন না? শেষে আমি ত আছিই।

ক। আমার চেষ্টা করতে হবে? মজালে দেখছি! তা কি করতে হবে বল!

চ। এই পাঁচরকম মিষ্টি বোল চাল ঝাড়বেন—আর গহনা গাঁটির লোভও দেখাবেন।

ক। তুমি ভাবছ সেটা ভারী সহজ—কিন্তু আমার তাকে দেখলেই ঠোঁটের মিষ্টি-গুলো সব টক হয়ে পড়ে। যা'হক যা করতে হবে তা শীঘ্রই করাই ভাল একবার তাকে ডেকে আন, দেখি কতদূর কৃতকার্য্য হই।

(চন্দ্র প্রস্থানোদ্যত)

ক। দেখ' গিন্নি যেন টের না পান; যদি দেখ গিন্নি রান্না ঘরে কাজে আছেন তবেই আস্তে আস্তে শশীকে ডেকে এন বুঝলে?

চ। যে আজ্ঞে।—

(প্রস্থান)

ক। আঃ ভাগ্যিস চন্দ্রকান্ত ছিল! নইলে কি দশাই হোত! কত পুণ্যির যে ফল! সে আমার সমুদ্রের তরী—ডাঙার গাড়ী—শীতের আগুণ—বর্ষার বাড়ী!

গৃহিণীর প্রবেশ।

গৃ। বলি তুমি আমাকে চাও না চন্দ্র-কান্তকে? এইটে স্পষ্ট করে খুলে বল দেখি?

ক। স্বগত—আমার কথা শুনতে পেয়েছেন না কি ?

প্রকাশ্যে—কি হয়েছে—কি হয়েছে—কেন কেন ?

গৃ। যা হয়েছে তা আর বলার না—এত খরচপত্র করে মিষ্টান্ন সব আন্‌লে, সেগুলো সব চাঁদাটা ছড়িয়ে খেয়ে এঁটো করে একসা করে এসেছে।

ক। এই! (হাসিয়া) সেজন্য আর ভাবনা কি! আবার আমি তোমাকে মিষ্টি আনিয়ে দিচ্ছি।

গি। বটে! ভারী যে দাতা দেখছি! চন্দ্রকান্ত খাবে বলে বুঝি? আমাদের জন্য বল্লে ত এক কাণাকড়ির মিষ্টি আসে না! আমার শশী যদি এ রকমটা করত তাহলে কি হোত বল দেখি ?

ক। আমার কিন্তু সন্দেহ জন্মাচ্ছে! শশী নিজে খেয়ে ত চন্দ্রকান্তের নামে দোষ দিচ্চে না ?

গৃ। দেখলে দেখলে! আমি আর কিছুতেই এবাড়ীতে থাকব না। তুমি চন্দ্রকে নিয়ে রাজত্ব কর আর আমি শশীকে নিয়ে চলে যাই।

(প্রস্থানোদ্যম)

ক। না গিন্নি না না,—আমি চন্দ্রকান্তকে এখনি খুব সাজা দিয়ে দিচ্ছি।

(কর্ত্তার হাত ছাড়াইয়া গৃহিণীর পলায়ন চেষ্টা; কর্ত্তার তাঁহাকে ধরিয়া আনিয়া)

ক। আমার সাধের পূর্ণিমার চাঁদ
ছি ছিঃ —এত কেন মান!
ম্লান দেখলে হৃদয় আমার—
ভেঙে শত খান।

গৃ। যাঁও, আর সোহাগ করতে হবে না।

ক। আমি ঠিক বলছি গিন্নি—তোমার সাক্ষাতে আজ চন্দ্রকান্তের নাক কাণ কাট্‌ব—তবে তাকে ছাড়ব। এখন লক্ষ্মীমণি চাঁদ-বদনী প্রসন্ন হও—আমার তাপিতপ্রাণে বরফ জল সিঞ্চন কর।

গি। আর আদরে কাজ নেই—যেদিন থেকে চন্দ্রকান্ত এসেছে—সেদিন থেকে আমার আদর গেছে।

ক। তিন সত্যি করে বলছি—তা না গিন্নি—তুমি আমার চাঁদবদনী
জীবন মরণ কাটি
ক্ষেণেক তোমার অদর্শনে
মরিলো দম ফাটি।

গি। তা না ত আরো কত! সে সব দিন অনেক দিন চলে গেছে—এখন আমার আর কেউ নেই গো!—কেউ নেই!

উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন—

ক। আহা আহা কর কি গিন্নি—বুক যে যায়! গেল গেল,—বিদীর্ণ হয়ে গেল! একবার হাত দিয়ে দেখ!—

(হাত ছাড়াইয়া লইয়া গৃহিণীর প্রস্থান।)

ক। যেয়োনা যেয়োনা—রাগ করে যেয়োনা। নিশ্চয় বলছি আমি এখনি চন্দ্রকান্তের গর্দ্দান নিয়ে তোমার হাতে দেব।

অনুগমন।

কিছু পরে হাত ধরাধরি করিয়া
উভয়ের পুনঃ প্রবেশ।

ক। কোথায় যে গেল চন্দ্রকান্ত! বলি ও চন্দ্রকান্ত ?

গি। সুর যে ক্রমেই নরমে পড়েছে।

আমি বেশ বুঝছি কোথাকার জল কোথা গড়াবে। তাকে দেখলে আর একটা কথা ফুটবে না।

ক। কি যে বল—পাগল নাকি?

গি। আচ্ছা দেখতেই ত পাব?

ক। এখন তাকে যে দেখতে পেলে হয়? (না পেলেই ভাল!) বেটার ছেলেকে একবার মজাটা দেখিয়ে দিই। নিশ্চয় জানে কিনা রেগে কেটে দু আধ খানা করে ফেলব,—তাই বেদম কোথায় ডুব মেরেছে!

গি। ঐ যে কোনের বারান্দায় কারা কথা কচ্ছে না?

ক। (উঁকি মারিয়া) একি ব্যাপার। শশী ও বিনোদ যে! কি বলছে শুনি?

(নেপথ্যে) "তুমি যদি রক্ষা কর শশিমুখি, তবেই বাঁচি! তোমার উপরই আমার একান্ত আশা একান্ত ভরসা—তোমার হাতেই আমার জীবন মরণ! একি মা বাবা যে! (নেপথ্যে শশী।) তাইত আমাদের দেখেননি ত! এখন পালান যাক!

ক। শুনলে ত! এর পরেও তুমি শশীকে ঘরে রাখবে!—এখনি বিদায় কর—এখনি; নইলে আমি ছেলে নিয়ে বিবাগী হব।

গৃ। স্বগত—তাইত? কি ব্যাপার! হঠাৎ যে উল্‌ট উৎপত্তি হোল!

ক। চুপ করে রইলে যে! অন্য সময় মুখে যে লঙ্কার ফোড়ং ফোটে! এখন একেবারে চুপ! আমি কিন্তু আর চুপ করে থাকতে পারছিনে। হয় শশীকে তাড়াও নয় আমি এই চল্লুম। জীবন থাকতে ওর সঙ্গে ছেলের বিয়ে দিতে পারব না। (প্রস্থানোদ্যত।)

গি। ও কর্ত্তা শোন শোন মাথা খাও দাঁড়াও।

ক। যতক্ষণ শশী আছে ততক্ষণ আমি দাঁড়াব? এ শর্ম্মাকে তেমন পাওনি।

গি। ওগো কথা শোন—একটু খানি দাঁড়াও; মাথায় একটু ঠাণ্ডা জল দিই—রাগটা পড়ে যাক। (প্রস্থান।)

শশীর গান করিতে করিতে প্রবেশ।

গান।

প্রাণের উচ্ছ্বাস বাঁধতে নারি
হায় কি করি হোল একি!
হাসির তুফান অধর পুটে
আকুল বেগে আপনি ছুটে,
নয়ন কোনে ব্যঙ্গ লুটে;
　অঙ্গে রঙ্গ মাখামাখি!
যতন করে যতই চাপি,
হৃদয় বাপী, ততই যেন উঠে ফাঁপি,
একূল ওকূল দুকূল ছাপি;
　কেমন করে ধরে রাখি!

গ্রন্থ লেখা।

গ্রন্থ লেখা—সেটা এমন কঠিন কিছু নয়,
(শুধু) খাতাখানি বেঁধে পাতা ভ'রিয়ে যেতে হয়।
　ভরাবে যে, চাইত কিছু? ভাবনা করোনাক;
　আবোল-তাবোল মনে এলেই অমনি লিখে রাখো।
　ছেপে বাহির করো, দাদা, কিছু নাইক ভয়।
　ছাপাখানাই গ্রন্থকারের জন্মক্ষেত্র জেনো।
　সমালোচকেরেই 'হর্ত্তা'-'কর্ত্তা' বলে মেনো।
(এখন) কেষ্ট বিষ্ণুর সময় গেছে, শীতলারি জয়!
　অর্থ যদি থাকে তা'লে চলে যাবে সাফ্‌
　প্রথমশ্রেণীর লেখক, তা ছাই লেখ ছুঁচো-সাপ
　এসে যাবেনাক; অর্থেই লেখার পরিচয়।
　বাঙলা দেশে যতই আকাল হোক না কেন, তবু
　গ্রন্থকারের অভাব, দাদা, ঘটছে নাক কভু!
　ছাপা, কাগজ শস্তা যখন, মগজে কি হয়?

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

ভারতে চিত্র-কলা।

জনসন চিত্রের সংজ্ঞা-নিরূপণ করিয়াছেন।

"Painting is an art, which could illustrate, but could not inform." "তাহাকেই চিত্র বলে যাহা আঁকিতে পারে, কিন্তু ব্যাখা করিতে অসমর্থ।"—

এরূপ সংজ্ঞায় শিল্পের স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হয় না। রুষীয় সুপণ্ডিত কাউণ্ট টলষ্টয় বলেন,—

"যে শিল্প আপনাকে সব-চেয়ে বেশী মাত্রায় প্রকাশ করিতে পারে, তাহা আধুনিক। যে শিল্প পারে না, তাহা গতকালিক। তাহা পরিবর্জ্জনীয়।"

কথাটা অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার হইল বটে, কিন্তু আরও বিশদ হওয়া চাই। বিলাতের প্রখ্যাত চিত্রকর স্যর্ জস্থুয়া রেণল্ড্ বলেন,—

"যাহা প্রকৃতির অপেক্ষা উচ্চ বর্ণবিশিষ্ট, যাহা নিত্য দৃষ্ট হয় না, তাহাই চিত্রকরের অঙ্কনীয়।"

মিঃ হ্যারিসন বলেন,—

"সুমহান সত্য এবং কুৎসিৎ বিষয়ের অনুবর্ত্তী হইয়া, স্বভাবের নগ্ন দৃশ্য দেখান'ই চিত্রকরের উদ্দেশ্য।"

আর একজন বিখ্যাত চিত্র-সমালোচক বলেন,—

"But art is not nature, on it would not be art."

বঙ্গসাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র বলেন,—

"যাহা প্রকৃতির প্রতিকৃতিমাত্র, সে সৃষ্টিতে তাদৃশ গৌরব নাই। তাহার কারণ, সে কেবল প্রতিকৃতি—অনুলিপি মাত্র—তাহাকে সৃষ্টি বলা যায় না। যাহা সত্যের প্রতিকৃতিমাত্র নহে—তাহাই সৃষ্টি।"

দেখা যাইতেছে, অনেকেই প্রকৃতির হুবহু নকল করাকে প্রশংসনীয় বিবেচনা করেন না। এই আদর্শ ধরিয়া, বিচার করিতে বসিলে, বলিতে হয়, আর্য্য-চিত্রশিল্প ধ্রুব-আদর্শানুসারী।

বাস্তবিক, প্রকৃতির লীলাবিচিত্র রম্যশ্রী আমরা ত রোজই দেখিতেছি। তাহার নিমিত্ত আবার কৃত্রিম চিত্রের দরকার কি? এস্থলে ফটোগ্রাফের উপযোগিতা অস্বীকার্য্য নয়,—কিন্তু চিত্রের সাফল্য বিভিন্ন মার্গে।

মিঃ বেনস্ বলেন,—

"ভারতীয় চিত্র-কলার বিশেষত্ব আছে।"

সে বিশেষত্ব আর কিছুই নয়, তাহা আর্য্যাঙ্কিত চিত্রের প্রকৃতি-বিমুখতা।

স্মরণাতীতকাল হইতেই, ভারতের চিত্র-বিদ্যা বিখ্যাত। কিন্তু অনেকেই পূতভূমির এই শাশ্বত অমৃত-ভাণ্ডারের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান। আলোচনা না করিয়া, কোন বিষয়ে বিজ্ঞোচিত মত প্রকাশ করা বুদ্ধিমানের কাজ বলিয়া মনে করি না।

প্রথমেই, আমাদের দৃষ্টি, "উত্তর রাম-চরিতের" প্রতি আকৃষ্ট হয়। শ্রীরামচন্দ্র ও সীতাদেবী লক্ষ্মণ আনীত বিষয়বহুল চিত্র সকল দেখিতেছেন। স্বামীর চিত্র দেখিয়া বসুধাকন্যা বলিতেছেন,—

"আহা আর্য্যপুত্রের কি সুন্দর চিত্র! প্রফুল্ল-প্রায় নবনীলোৎপলবৎ শ্যামলস্নিগ্ধ কোমলশোভাবিশিষ্ট কি দেহ সৌন্দর্য্য! কেমন অবলীলাক্রমে হরধনু ভাঙ্গিতে-ছেন, মুখমণ্ডল কেমন শিখণ্ডে শোভিত! পিতা বিস্মিত হইয়া, এই সুন্দর শোভা দেখিতেছেন। আহা কি সুন্দর!" (বঙ্কিমচন্দ্রের উত্তররামচরিতের সমালোচনা দেখ।)

আর একখানি চিত্র দেখিয়া শ্রীরামচন্দ্র বলিতেছেন,—

"প্রিয়ে, এই সেই সকল গিরিতরঙ্গিণী তীরবর্ত্তী তপোবন। গৃহস্থগণ বাণপ্রস্থধর্ম্ম অবলম্বনপূর্ব্বক,

সেই সেই তপোবনের তরুতলে কেমন বিশ্রাম সুখ-সেবায় সময়াতিপাত করিতেছেন।" লক্ষ্মণ বলিলেন; "আর্য্য, এই সেই জনস্থান মধ্যবর্ত্তী প্রস্রবন গিরি। এই গিরির শিখরদেশ, আকাশপথে সতত সঞ্চরমান জলধরমণ্ডলীর যোগে নিরন্তর নিবিড় নীলিমায় অলঙ্কৃত; অধিত্যকাপ্রদেশ ঘন সন্নিবিষ্ট বিবিধ বনপ্রদেশ সমূহে আচ্ছন্ন থাকাতে সতত স্নিগ্ধ শীতল ও রমণীয়; পাদদেশে প্রসন্নসলিলা গোদাবরী তরঙ্গবিস্তার করিয়া প্রবলবেগে গমন করিতেছে।"

সীতার বনবাস।

চিত্রের এরূপ সুন্দর বর্ণনাপাঠ করিলে, আর্য্যচিত্র কিরূপ উন্নত ছিল, তাহা চিন্তা করিয়া মানস চমৎকৃত হয়।

কালিদাসের প্রথম রচনা, "মালবিকাগ্নি মিত্র" পাঠ করিলেও, তাৎকালিক চিত্রশিল্পের কথা জানা যায়।

রাজা অগ্নিমিত্র আর্য্য গণদাস অঙ্কিত নবযৌবনভারাক্রান্তা সর্ব্বসৌন্দর্য্যশালিনী তন্বঙ্গী মালবিকার চিত্র দর্শন করিয়া তৎপ্রতি অনুরক্ত হইয়াছিলেন। সমুদ্রগৃহে রাজা অগ্নিমিত্রের আলেখ্যদর্শন করিয়া, মালবিকা চিত্রলিখিত রাজাকে চিনিতে পারিয়াছিলেন।

কালিদাসের "শকুন্তলা" নাটকে আলোক-ছায়া সমাবেশিত চিত্রের কথা উল্লিখিত আছে। 'রঘুবংশ' প্রভৃতিও চিত্রকথা শূন্য নয়।

প্রাচীনকালের "পঞ্চদশী" নামধেয় পুস্তকেও চিত্রপ্রসঙ্গ পাওয়া যায়। যথাঃ

"যথা চিত্রপটে দৃষ্টমবস্থানাং চতুষ্টয়ং।

* * * *

যথা ধৌতঘট্টিতশ্চ লাঞ্ছিতোরঞ্জিতঃ পটঃ" প্রভৃতি।

বাল্মিকী-প্রণীত রামায়ণে, হনুমান, লঙ্কাপুরে "কোথাও বিচিত্র লতাগৃহ * কোথাও চিত্রশালা"এবং "কুট্টিমতলে সুবিস্তীর্ণ চিত্রকম্বল আস্তীর্ণ"—দেখিয়াছিলেন।

বহু প্রাচীন পুস্তকেও চিত্র-প্রসঙ্গের অভাব নাই। এবিষয়ে বহু পুস্তক আছে, সকল গুলির পরিচয় দেওয়া আমার সাধ্যাতীত,—তবে কতকগুলির উক্তি উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

১। চিত্রং সংক্রীড়মানাস্তা ক্রীড়ানৈর্বিবিধৈ স্তথা।—(রামায়ণ)

২। "শিল্পী চিত্রবিনির্মানং বর্দ্ধ কিস্ত"

(ক্রীড়াশীলায়াং)

"অলকাবত্রিয়ারক্তং সর্ব্বচিত্রাদিসম্মতম।"

(বিশ্বকর্ম্মীয়)

৩। "অভূন্মুহূর্ত্তং স্তিমিতং সর্ব্বং তত্রাজমণ্ডলম—
তুষ্ণীংভূতে ততস্তস্মিন পটে চিত্রমিবার্পিতম।"

(ভারত)

"উৎকলের কটকজেলাস্থ কপিলেশ্বর মন্দিরগাত্রে অঙ্কিত মথোদক চিত্র অতি সামান্যভাবে, প্রাচীন হিন্দুচিত্রের নিদর্শন প্রকাশ করিতেছে।" (বিশ্বকোষ)

কপিলেশ্বর মন্দিরের ভিত্তিচিত্র সম্বন্ধে রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রও বলিয়াছেন,—

"* * The last has some fresco paintings of a modern dates, and very questionable character.

মথুরা ও কান্যকুব্জনগরে অনেক প্রাচীন দেবালয় দণ্ডায়মান থাকিয়া উক্ত স্থানদ্বয়ের শোভা বৃদ্ধি করিত। পররাজ্যপিপাসু মামুদ উক্ত দুই স্থানে, ছাব্বিশ হাজার দেবালয় ধ্বংস করেন। ঐ সকল দেবালয়ের গাত্রে হিন্দুগণের উপাস্য দেব দেবীর প্রতিমূর্ত্তি, বৈজয়ন্ত দেবসভা (Pantheon) প্রভৃতি অঙ্কিত ছিল। মন্দির বিধ্বংসস্তূপে পরিণত

হওয়াতে, সেগুলিও মানবচক্ষুর অন্তরালে গমন করিয়াছে।

সিংহলেও আর্য্য চিত্রশিল্পের বহু নিদর্শন বর্ত্তমান ছিল। অধুনা ঐ সকল চিত্রের অধিকাংশই বিলুপ্ত হইয়াছে। কারণ, পর্ত্তুগীজগণের প্রবল আক্রমণের মুখ হইতে সেগুলি রক্ষা করে, এমন ক্ষমতাবান লোক তখন ছিলেন না। ক্ষুধিত আক্রমণকারীরা চিত্রগুলিকে প্রায় নষ্ট করিয়া ফেলেন। ধ্বংসাবশিষ্ট যাহা,—অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে,—সেগুলিকে নবীকৃত করিতে পারেন এমন সৌন্দর্য্যাভিজ্ঞ কারিকরেরও এখন একান্ত অভাব।

সিংহলদ্বীপান্তর্গত শিগিরি নামধেয় গুহাভ্যন্তরে অঙ্কিত চিত্রসকল দর্শনপূর্ব্বক, দর্শকমাত্রেই শতমুখে প্রশংসাবাদ করিয়া থাকেন। সিংহলদ্বীপাবস্থিত বৌদ্ধ মঠসমূহের মধ্যেও নানাবিধ প্রাচীনচিত্র অদ্যাপি নয়নগোচর হয়। বিদেশীর প্রবল আক্রমণ ও অত্যাচারের পরেও, আজ তাহারা ভারতের প্রাচীনগৌরবের কাহিনী বক্ষে লইয়া বিরাজ করিতেছে। সর্ব্বধ্বংসী কালের ক্ষতে, যদিও আজ তাহারা জীর্ণ—যদিও সেই ক্ষতে এপর্য্যন্ত কেহ উপযুক্ত প্রলেপ দান করেন নাই,—তথাপি তাহাদের প্রত্যেক অংশে, আর্য্যের শাশ্বত ধ্যানধারণার যে অন্তর্মুখী ভাব, যে অপার্থিব কল্পনারম্য সৌন্দর্য্য সগৌরবে ফুটিয়া আছে, তাহার সম্মুখে, সকলকেই মুগ্ধভাবে স্তব্ধ হইয়া থাকিতে হয়! মিঃ বেল বলিয়াছেন ঃ—

"A procession of the queens and princess of Cassyapa's court, with their attendants on their way to worship of the Buddhist viharat 'Pinchura-gala' the hill lying about a mile to the north of Sigireya."

শিগিরির ছবিগুলি আ-নাভি। তাহার পর মেঘপ্রতিম রেখা-পাতে চিত্রের প্রান্তভাগ রঞ্জিত। এই এক দোষ ছাড়া, ঐ সকল চিত্রের অঙ্কনকর্ম্মীগণ অজন্তাগুহাচিত্রের শিল্পিবৃন্দের অপেক্ষা কোন অংশে নিকৃষ্ট ছিলেন না। ছবিগুলির আঙুল, দেহ ও মুখের ভঙ্গিমা উপভোগ্য। প্রত্যেক চিত্রের রেণু পরিমাণ অংশেও, প্রাচ্য আদর্শের নবভাব যেন সানন্দে ক্রীড়া করিতেছে! (আমাদের চোখে নব! আমরা চক্ষুসত্বেও অন্ধ!)

তিব্বতের একটি মন্দিরের পতাকার উপরে, একটি অতি সুন্দর চিত্র আছে। সে চিত্রে যে কিরূপ নিপুণতা, কিরূপ সূক্ষ্মসৌন্দর্য্যপ্রেক্ষিতা প্রকটিত, তাহা মুখে অকথনীয় এবং ভাষায় অবর্ণনীয়। হ্যাভেল সাহেব তাঁহার নব প্রকাশিত পুস্তকে উক্ত চিত্রের একখানি প্রতিলিপি প্রকাশ করিয়াছেন। সকলকেই তাহা দেখিতে অনুরোধ করি।

প্রাচীন চৈনিক ভ্রমণকারী হু' এনথ্ সং তাঁহার ভারত ভ্রমণ কাহিনীতে তদানীন্তন চিত্রশিল্পীগণের বিষয়ে কয়েকটী কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। পাদটীকায় তাহা উদ্ধৃত হইল। *

আর একজন প্রসিদ্ধ চীন দেশীয় ভ্রমণ-

* "Huen Thsang, the Bhuddist pilgrim from China who visited India in the Seventh Century, says that artists from Baktria were employed to paint the Bhudda monastries during the time of Kaniska, king of Gandhara, about the first century of over era and that the comment of Serika ;was famous for its mural paintings."

কারী,—ফা হিয়ান ভারতভ্রমণে আগমন করিয়া, কপিলবস্তু দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। সেখানে তিনি একখানি চিত্র দর্শন করিয়া, তাহার বিবরণ আপনার বিখ্যাত ভ্রমণ-কাহিনীর মধ্যে সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন। ঐ চিত্রখানি মহারাজ শুদ্ধোদনের ভগ্ন প্রাসাদাভ্যন্তরে রক্ষিত ছিল। বুদ্ধদেবের মাতা দণ্ডায়মানা। শ্বেত ঐরাবতে আরোহণ করিয়া, বুদ্ধদেব মাতার গর্ভ হইতে বাহির হইতেছেন!

সুপ্রসিদ্ধ অজন্তা (Ajanta) গুহায় অনেক ভিত্তিচিত্র (wall-painting) আছে। ছবিগুলি সুরঞ্জিত। এ সম্বন্ধে পুরাতত্ত্বজ্ঞগণ অনেক আলোচনা করিয়াছেন। ভারতের প্রাচীন চিত্রাবলী অধিকাংশ স্থলে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। তাহার প্রথম কারণ, কাল-মাহাত্ম্য; দ্বিতীয় কারণ, অযত্ন; এবং তৃতীয় কারণ, অনভিজ্ঞ মূর্খ দর্শকগণের অত্যাচার। যে দুই এক স্থানে এই সকল পুরাকীর্ত্তি অদ্যাপি বিদ্যমান আছে, তাহাদের মধ্যে অজন্তাই প্রধানতম।

প্রসিদ্ধ কাচের প্রসাদে (Crystal Palace) দ্বাবিংশখানিরও অধিক চিত্র,—অজন্তা হইতে সংগৃহীত হইয়া, রক্ষিত হইয়াছিল। দুর্ভাগ্যবশতঃ অগ্নিকাণ্ডে সেই সমস্ত চিত্র ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে। বিনষ্ট চিত্রাবলীর প্রতিলিপির অভাব ছিল; অগ্নির লেলিহান জিহ্বায় নিঃশেষে ভস্মসাৎ হওয়াতে এখন আর তাহা দেখিবার সুযোগ নাই। তবে শুনা যায় ছবিগুলি বড় চমৎকার ছিল।

গুহায় চিত্রখোদনের পূর্ব্বে পর্ব্বতের বন্ধুরপৃষ্ঠ আগে সরল করিয়া লওয়া হইত। তাহার পর চিক্কণ করিবার জন্য একরূপ প্রলেপ (Paster) ব্যবহৃত হইত। ঐ প্রলেপে অতি সূক্ষ্ম রেণুকণা ও ইষ্টকচূর্ণ প্রভৃতি মিশানো থাকিত। তাহার পর ভিত্তিগাত্র চিত্রাঙ্কনের উপযুক্ত হইয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইত।

গুহাবাসী বাদুড়েরা চিত্র সমুদায়ের উপরে নখরপাতে নানারূপ চমৎকার কারু-কার্য্য করিয়াছে। তাহাদের আরব্ধকার্য্য সম্পূর্ণ করিবার নিমিত্ত ভিত্তিরন্ধ্রগত সলিল রাশি আপনার শক্তি প্রয়োগ করিয়াছে। এক এক স্থানের চিত্র ঘোর কৃষ্ণবর্ণের হইয়া পড়িয়াছে। ধ্বংসের জন্য এত অপূর্ব্ব যত্নসত্ত্বেও চিত্রগুলি আজ পর্য্যন্ত যে টিকিয়া আছে, তাহাই আশ্চর্য্য এবং আমাদের পরমসৌভাগ্য বলিতে হইবে। মেজর আরগিল ঐ সকল চিত্ররক্ষণ সম্বন্ধে বলিতেছেনঃ

> "আর কয়েক বৎসর পরে, এই মূলছবি গুলি একেবারে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। তবে, এখনো যদি ইহাদের প্রতি মনোযোগ দেওয়া যায়, তবেই ছবিগুলি টিঁকিয়া যাইবে। * * * এই সকল চিত্রকর, শোভন কলাবিদ্যার চরম জ্ঞান, সম্পূর্ণরূপে অন্তরঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।"
> Indian Antiquary—By James Burgess 1874.

অজন্তা গুহার অর্দ্ধাংশে কোনরূপ চিত্র নাই। তদ্ভিন্ন, এক এক স্থানে অসম্পূর্ণ চিত্রাবলীও সামান্য নয়। কিন্তু অপর সপ্ত গুহা ভিত্তিতে যতগুলি ছবি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা সাতিশয় চিত্তাকর্ষক। প্রথম, দ্বিতীয়, নবম, দশম, ষষ্ঠদশ ও সপ্তদশ-সংখ্যক গুহার চিত্র সমুদয়ই সমধিক উল্লেখ যোগ্য।

ঐ চিত্র সকল যে, কতদিন চিত্রকর-গণের তুলিকা-রেখাপাতে গিরিপৃষ্ঠে ফুটিয়া

উঠিয়াছিল, তাহা সংশয়হীন হইয়া বলা দুষ্কর। কারণ চিত্রগুলি এক সময়ে অঙ্কিত হয় নাই। তবে, নবম গুহাভিত্তিতে, দ্বারশীর্ষে যে ছবি আছে তাহা দেখিয়া বলা যায়, সেটী অপরাপর গুহাচিত্রের আগে আঁকা হইয়াছে। প্রথম গুহার সম্মুখে দেওয়ালে যে ছবি-দুটী আছে, তাহাই সর্ব্বশেষে অঙ্কিত হইয়াছে। প্রথম, দ্বিতীয়, ষষ্ঠদশ ও সপ্তদশ গুহার চিত্রাবলী ষষ্ঠ শতাব্দীতে আঁকা হইয়াছে বলিয়াই স্থির হইয়াছে। এই সকল ছবিতে যেরূপ ধাঁজের বর্ণমালা দেখা যায়, তাহা দ্বারাই চেষ্টা করিলে কাল নির্ণয় করা যায়। অন্যান্য ছবি সপ্তম খৃঃ অব্দে অঙ্কিত হইয়াছে। নবম ও দশম গুহার ছবিগুলি বৌদ্ধধর্ম্মের পৃষ্ঠ-পোষক আন্ধ্রাদিত্যের আবির্ভাবকালে, তৃতীয় খৃঃ অব্দের কিছু পূর্ব্বে বা মধ্যে চিত্রিত হইয়াছে।

(Cave Temples of India. By J. Furgusson. p. p. 234)

অজন্তার গুহা সমুদায়ের মধ্যে নবমগুহা প্রাচীনতম। ইহার চৈত্য ৪৬ ফিট গভীর, ২৩ ফিট দুই ইঞ্চ লম্বে এবং ২২ ফিট নয় ইঞ্চ চওড়ায়।

প্রথম গুহায় যে সব ছবি আছে তাহার এক একটী মূর্ত্তি (Figure) সাধারণ দৃষ্ট মানুষের অপেক্ষা বৃহৎ। অধুনা,—ঐ সকল মূর্ত্তি যদিও প্রথম অঙ্কনকালীন মূর্ত্তির ছায়াধারী মাত্র,—তাহা হইলেও এখনো উহা সাতিশয় চিত্তাকর্ষক।

অজন্তাচিত্র, কি অঙ্কনকৌশলে, কি মাল মশলায়, কি আদর্শে—সর্ব্ববিষয়েই ইউরোপীয় আদর্শ হইতে বিভিন্ন। প্রতীচ্যদেশে পেশী বদ্ধ (muscular) মূর্ত্তি সকলের আদর যথেষ্ট; কিন্তু প্রাচ্য শিল্পী সে আদর্শের ছায়াও মাড়ান নাই। অজন্ত গুহার চিত্রলিখিত পুরুষদিগের কি উর্দ্ধতন, কি নিম্নতন পদবীর লোক নির্ব্বিশেষে,—সকলেরই হাঁটুর উপরে কাপড়। এই সকল গুহা চিত্রে অনেক নাগ-নাগিনীর মূর্ত্তি অছে। ইহারা, মানুষেরই মত দেখিতে। নাগিনীরা অনেক যায়গায় মানুষের মত, আবার অন্যস্থলে,—যেখানে যেখানে তাহারা সলিলবিহারিণী—সেখানে তাহাদের নিম্নার্দ্ধ সর্পবৎ এবং উপরার্দ্ধ মানবানুকারী! অজন্তায় এই শ্রেণীর অনেক ছবি দেখা যায়। নাগের মাথায় একাধিক সর্প এবং নাগিনীদের শিরে একটীর বেশী সাপ নাই। মানুষের চোখগুলি একটু স্বভাবাতিরিক্তরূপে দীর্ঘতর। হাতগুলি সুন্দর ভঙ্গিমাবিশিষ্ট। আঙুল গুলিরই বা কত রকম ভঙ্গী! কেবল পায়ের বেলাই যত গোল! ক'এক যায়গায় বেশ ভাল পা দেখা যায়। কিন্তু সর্ব্বস্থলে নহে। রমণীর স্তনগুলি অতিরিক্ত উন্নত। পরিচারিকাদের বস্ত্র চিত্রে দেখা যায়,—কিন্তু উচ্চপদস্থা রমণীগণের অঙ্গ-ধৃত বসন এতই সূক্ষ্ম যে ছবিতে তাহা নজরেই পড়ে না। কবরী বিন্যাস নানাশ্রেণীর আছে। একালে, সে আদর্শের আদর নাই। অনেক পুরুষের কাপড় ডোরা কাটা। পুরুষ ও রমণী,—সকলেরই কর্ণালঙ্কার আছে। কাণের সেই গহনাগুলি এতই ভারি বলিয়া বোধ হয়, যে আজকালকার কোন ভামিনী,যদি সেই শ্রেণীর গহনা দিয়া, কানের শোভা বাড়াইতে যান তবে তাঁহাকে কাণের মায়া ত্যাগ করিতে

হইবে। কোন কোন কর্ণালঙ্কার এতই বড়, যে তাহা স্কন্ধে আসিয়া ঠেকিয়াছে!

(Bhuddha Rock-cut Temples cf Ajanta their paintings and Sculptures &c.)

অজন্তার চিত্রাবলীতে কতরকম প্রাচীন অস্ত্র শস্ত্র, কতরকম পাত্র, পরিচ্ছদ, এবং কতরকম বিচিত্র গঠনের অলঙ্কার দেখা যায়,—তাহার ইয়ত্তা নাই। অজন্তাচিত্রের পোষাক পরিচ্ছদ রত্নাভরণগুলি দর্শন করিলে, সাঞ্চীর আদর্শের কথা মনে পড়িয়া যায়। কারলির বারান্দা এবং নাসিক ও মথুরায় আবিষ্কৃত মূর্ত্তিগুলির পরিচ্ছদ ও অলঙ্কার ঐ একই শ্রেণীর। ইহা দ্বারাও অনেকটা কাল নির্ণয় করা যায়।

আগামী বারে অজন্তার চিত্র সম্বন্ধে বিশদরূপে ব্যাখ্যা করিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

পোষ্যপুত্র।

(৬)

যেদিন কলিকাতার উকিল বাড়ি হইতে শ্যামাকান্ত লক্ষীপুরে ফিরিয়া আসিলেন সেদিন আবার নূতন করিয়া তিনি যেন পুত্রশোক অনুভব করিতে লাগিলেন। দেওয়ানের সহিত বৈষয়িক কার্য্যালোচনার পর যখন তিনি তাঁহার জাজিম পাতা বিছানা ছাড়িয়া বাহিরের বাতাসে আসিয়া দাঁড়াইলেন তখন সবে মাত্র সন্ধ্যার ধূসর আকাশে কলিকাতা বাজারের কুমড়ার ফালির মত ক্ষীণ অর্দ্ধচন্দ্র উঠিতেছিলেন। একটা গন্ধরাজ ফুলের গাছ হইতে অপর্য্যাপ্ত পুষ্পগন্ধ উত্থিত হইয়া বাতাস সুগন্ধিময় করিয়া তুলিয়াছে, ফুটন্ত ফুলের মত আকাশ ভরা নক্ষত্রগুলা ঝিকিমিকি জ্বলিতেছিল।

শ্যামাকান্ত ধীরে ধীরে সোপানের উপর আসিয়া দাঁড়াইলেন। ফুলের গন্ধ ভরা সন্ধ্যার বাতাস তাঁহার চিন্তারেখাঙ্কিত ঘর্ম্মাক্ত ললাট শীতল করিয়া দিয়া গেল, সোপান পার্শ্বস্থ সেফালি গাছ হইতে টুপটাপ করিয়া গোটাকতক ফুল বৃক্ষতলে খসিয়া পড়িল, ক্ষীণ চন্দ্র একটুখানি উজ্জ্বল হইয়া উঠিলেন। শ্যামাকান্তের মনে হইল যেন সেই স্নিগ্ধ স্পর্শ যেন সেই মিষ্ট গন্ধ শান্তির হস্তের, শান্তির অঙ্গের; তাই সেই মৃদু মৃদু স্নিগ্ধস্পর্শ তাঁহার সমস্ত শরীরটাকে কণ্টকিত করিয়া তুলিল। সে আনন্দ মনে মনে বহুক্ষণ অনুভব করিবার লোভে তিনি সেইখানে বসিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিলেন।

তাঁহারই দেবালয়ে সন্ধ্যারতির কাঁসর ঘণ্টা বাজিতে লাগিল। অদূরস্থিত নদী আপনার সেই একঘেয়ে কলকলধ্বনিতে বহিয়া যাইতে লাগিল, কল্পনা-বিহ্বল বৃদ্ধের কর্ণে সেই চিরপরিচিত শব্দ যেন আজ অন্যপ্রকার শুনাইতেছিল! জাগ্রত স্বপ্ন-বিঘোরচিত্তে যেন দুইটি প্রীতিকোমল বাহুস্পর্শ সর্ব্বাঙ্গে অনুভব করিতে করিতে তাহার মধুর কণ্ঠের অস্ফুট কলধ্বনিই তিনি শুনিতেছিলেন। সেই আগড়ম বাগড়ম ছাইপাঁশ যাহা তাঁহার মুগ্ধচিত্তে বেদবেদান্ত শ্রুতিস্মৃতির চেয়েও মূল্যবান বলিয়া মনে হইত সেই সকল শুনিতে শুনিতে তাঁহার সর্ব্বশরীর পুনঃ পুনঃ

রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিতে লাগিল। বৃদ্ধ বহুক্ষণ কল্পনা স্বর্গে স্তব্ধস্থির হইয়া বসিয়া রহিলেন। একবার হস্তদ্বারা বুকটা চাপিয়া ধরিলেন, যেমন সেই বুকের উপর শান্তির ক্ষুদ্র মুখখানা পূর্ব্বের মত চাপিয়া ধরিতে গেলেন অমনি তাঁহার সব স্বপ্ন টুটিয়া গেল, কল্পনার ইন্দ্রজাল ফুরাইল।

শ্যামাকান্ত চমকিয়া চারিদিকে চাহিলেন, কই কে কোথায়? কেহ নাই; কেহ নাই; বাতাসে মাথা তুলাইয়া গাছগুলা যেন বিদ্রূপ-চ্ছলে হাসিয়া উঠিল, প্রতারক বাতাসটা যেন তীব্র ব্যঙ্গস্বরে হাসিয়া হাসিয়া বলিতে লাগিল 'কেহ নাই, কেহ নাই।' ব্যাকুল হইয়া তিনি আকাশের চাঁদের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, কিরণপ্রদীপ্ত পূর্ণচন্দ্রও যেন সে কথার পোষকতা করিয়া বলিল,—

"কেহ নাই কেহ নাই"।

গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া শ্যামাকান্ত উভয় জানুর মধ্যে অবসন্ন মস্তক রক্ষা করিলেন। সত্য, এতো বড় পৃথিবীটার মধ্যে তাঁহার কেহই নাই; এতো বড় জগৎটার মধ্যে তিনি একেবারে একা অসহায়।

কি লজ্জা! এই সুবিস্তৃত অসীম নীলাকাশ, এই সুবর্ণোজ্জ্বল পূর্ণচন্দ্র, এই অগণ্য নক্ষত্র, এই সমুন্নত শীর্ষ বৃক্ষশ্রেণী, ওই ফুলে ভরা গন্ধামোদিত তরুলতা, এই ইতস্তত ভ্রমণকারী গর্ব্বিত পবন সকলেই তাঁহার দিকে দয়ার্দ্র-নেত্রে চাহিয়া দেখিতেছে, সকলেই যেন তাঁহার নিঃসঙ্গ অসহায় অবস্থায় সঙ্গদান করিতে ব্যগ্র হইয়া তাঁহাকে অনুগৃহীত করিতে চাহিতেছে, সকলেই যেন তাঁহার অন্তরের দৈন্য বুঝিয়া ব্যথিত হইয়া সান্ত্বনা বর্ষণ করিতেছে। ওরে নিষ্ঠুর বিনোদ! দেখে যা তুই তোর বাপের কি শোচনীয়অবস্থা করে গেছিস্ দেখে যা। শুধু তোরি জন্য সে আজ জড়প্রকৃতির নিকটেও কতখানি দয়ার্হ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, দেখে যা শুধু তোরি জন্য রে শুধু তোরি জন্য আজ তার বুকের মধ্যে কি হাহাকার! সে রাত্রে শ্যামাকান্ত একবারও নিদ্রা যাইতে পারিলেন না; যেমনি একটুখানি ঘুম আসে অমনি কোথা হইতে যেন কাণের মধ্যে সঙ্গীতস্বরে বাজিয়া উঠে "জ্যেঠা মশাই!" অনেকবার তিনি চমকিয়া "কেন মা?" বলিয়া শয্যার উপর উঠিয়া বসিয়াছেন, অনেকবার ব্যাকুলনেত্রে চারিদিকে চাহিয়া দেখিয়াছেন, অবশেষে বিছানার মধ্যে থাকা অসহ্য হওয়াতে উঠিয়া জানলার নিকট আসিয়া কৌচখানার উপর বসিয়া পড়িলেন। জানলার নীচে পুষ্পোদ্যান তারপর জ্যোৎস্নালোক উজ্জ্বলিত নদীর জল! জ্যোৎস্নারাত্রে ঘুমন্ত নদীবক্ষ আলোড়িত করিয়া জেলেডিঙ্গি বাহিয়া ধীবরেরা মাছ ধরিতে ধরিতে চলিয়াছে। তীরে দুএকখানা বালী চূণ বোঝাই করা মহাজনী নৌকা বাঁধা রহিয়াছে, তাহাদের মধ্যে একখানা নৌকা হইতে একটা বিনিদ্র মাঝি শুইয়া শুইয়াই চট্টগ্রামিস্বরে গান ধরিয়া দিয়াছিল, তাহা ভিন্ন অন্য কোথাও মানুষের সাড়া নাই।

শ্যামাকান্ত বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন। বিনোদকুমার পলাইবার পরে তাহার অনুসন্ধানের ত্রুটি হয় নাই, কলিকাতায় সমস্ত ছাত্রাবাস, ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা এবং জাপান পর্য্যন্ত রজনীনাথ সন্ধান লইয়াছিলেন; কিন্তু কোনই সন্ধান পাওয়া যায় নাই। পিতা গভীর

মর্ম্মবেদনায় আকুল হইয়া ভাবিতে লাগিলেন —কেন তাহার বিলাতগমনে আপত্তি করিয়াছিলেন। জীবনে কি এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার আর অবসর পাইবেন? তিনি সকল প্রাণে সেই প্রায়শ্চিত্ত কামনা করিয়া ভগবানকে ডাকিয়াছেন আজও ডাকিতে লাগিলেন। কিন্তু সে ডাকে তাঁহার সাড়া পাইলেন না। আবার তাঁহার মনে শান্তি জাগিয়া উঠিল।

শ্যামাকান্ত জোর করিয়া উঠিয়া বসিলেন। যখন তাকে ছেড়ে এতোদিন বেঁচে আছি তখন আর কেন? আর কিসের মায়া!

শ্যামাকান্ত শয্যার উপর পড়িয়া প্রাণপণে চোখ মুদিয়া রহিলেন, বুঝি চাহিলেই তাঁহার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা ভার হইয়া উঠিবে। কিন্তু একি! আবার যে সেই সুর সেই কণ্ঠ কাণে বাজিয়া উঠে "জ্যেঠা মশাই!"

শ্যামাকান্তের মুদিত চক্ষের সম্মুখে সেই মায়ামূর্ত্তি ভাসিয়া উঠিল। মায়াবিনী যেন তাঁহার দুই কোমল বাহুদ্বারা, তাঁহার কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া তাঁহার মুখের কাছে প্রফুল্ল পদ্মের মত মুখটি আনিয়া বীণাধ্বনির মত স্বরে ডাকিল "জ্যেঠামশাই?" আর তাঁহার প্রতিজ্ঞা রক্ষা হইল না। ত্বরিৎবেগে উঠিয়া বিছানার উপর বসিলেন। রুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন "হরি একি মায়ায় আমায় বদ্ধ করলে দয়াময়, মাগো জগদম্বে আমায় নিয়ে তুই কি খেলা খেলছিস্ মা!"

তখন প্রভাত হইতে বিলম্ব ছিল না। পাণ্ডুবর্ণ চাঁদ অস্ত যাইতেছেন, নদীর অল্প ছায়ান্ধকার বক্ষে জেলেডিঙ্গিগুলার মধ্য হইতে একখানা খেয়া নৌকা আরোহী লইয়া পারে যাইতেছিল, জোয়ারের মুখে মহাজনী নৌকা কয়খানা ভাসিয়া চলিয়াছে।

শ্যামসুন্দরের পুরোহিত হরিনারায়ণ ভট্টাচার্য্য প্রাতঃস্নান করিয়া নামাবলী অঙ্গে সাজি হস্তে পুষ্পচয়ন করিতে করিতে গাহিতেছিলেন,—

"সকলি তোমারি ইচ্ছা
ইচ্ছাময়ী তারা তুমি,
তোমার কর্ম্ম তুমিই করো মা
লোকে বলে করি আমি।"

মোহমুগ্ধবৎ ভক্ত শ্যামাকান্ত স্থির কর্ণে দৈববাণীর মত সেই প্রভাত সঙ্গীত শ্রবণ করিতে করিতে উচ্ছ্বসিতস্বরে গদ্‌গদ্ কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন "ঠিক কথা মা, আমি কে? আমি কি কর্ত্তে পারি? আমার সাধ্য কি তারা! তোর খেলা তুইই খেলাচ্চিস আমি তাই খেলে যাচ্চি। সেদিন ভট্টাচার্য্য মশাই গেয়েছিলেন "পুতুল নাচের পুতুল মোরা যেমন নাচাস তেমনি নাচি। যখন মারিস তখন মরি, 'ওমা বাঁচাস যখন তখন বাঁচি।' তবে তোর মনে যা আছে তাই আমায় করা, তাই আমায় করা।"

(৭)

সন্ধ্যার ধূসর ছায়া আশে পাশে লুকাইয়া ফিরিতেছিল। বৃহৎ পাষাণ চত্বর ও প্রশস্ত দালান আলোকাকীর্ণ। দেওয়ালগিরি ও ঝাড়ের আলোকে পুষ্পমাল্যে সুরভিত ধূপধুনার গন্ধে এবং সুমধুর নহবতের ইমনকল্যাণ রাগিণীতে, দেবভূমি স্বর্গভূমির মত প্রতীয়মান হইতেছিল। দালানের প্রত্যেক খিলানে খিলানে, প্রতি প্রস্তর স্তম্ভের গাত্রে গাত্রে মন্দিরের দ্বারে দ্বারে বিবিধ বর্ণের পুষ্পমাল্য

অল্প অল্প বাতাসে দুলিতেছে। ফুলের গন্ধের সহিত ধূনা গুগ্‌গুল মিশ্রিত একটা স্নিগ্ধ পবিত্র গন্ধ উঠিয়া তাহা চারিদিকের জনসমূহের মনে প্রাণে যেন কি একটা অপূর্ব্ব আনন্দ জন্মাইয়া দিতেছিল।

শত শত দর্শনার্থী মন্দিরের যবনিকা-শূন্য মুক্তদ্বারের উপর ঝুঁকিয়া পড়িল। প্রতিদিন যাহারা দর্শন করিতে আইসে তাহারাও নূতন দর্শনার্থীগণের মত আগ্রহান্বিত; কেহই দেবদর্শনে বিলম্ব করিতে স্বীকৃত নহে। সেইজন্য দেবদ্বারের জনতার মধ্যে একটা ধাক্কাধাক্কি ও সোর গোল পড়িয়া গেল। দ্বারের একপার্শ্বে একজন প্রৌঢ়ার হাত ধরিয়া একটি রমণী দাঁড়াইয়া ছিল। জনতা বাড়িতেছে দেখিয়া তাহারা দ্বারসান্নিধ্য ছাড়িয়া একটু সরিয়া গেল। প্রৌঢ়া সঙ্গিনীর বামহস্ত দৃঢ় করিয়া দক্ষিণহস্তে ধরিয়া রাখিয়াছিলেন, উভয়ে জনতারন্ধ্র ভেদ করিয়া প্রকাণ্ড দালানের এক প্রান্তে গিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহাদের ইচ্ছা ভিড় কমিলে দেবদর্শন করিবেন। আরতি আরম্ভ হইল; রাধাকৃষ্ণের মহিমাময় যুগলমূর্ত্তি যেন ভক্তের আরাধনায় সজীব হইয়া উঠিয়া ভক্তবৃন্দের প্রতি চাহিয়া মধুর হাসি হাসিতেছিলেন। লোকের ভিড় কমিয়া আসিলে রমণীদ্বয় আবার মন্দিরদ্বারে আসিয়া দাঁড়াইলেন। প্রৌঢ়া সঙ্গিনীর হাত ছাড়িয়া দিয়া গললগ্ন বস্ত্রে চৌকাটের উপর মাথা ঠেকাইয়া সুদীর্ঘ প্রণাম করিলেন। কিন্তু তাঁহার অল্পবয়স্কা সঙ্গিনী সহসা প্রণাম না করিয়া বহুক্ষণ পলকহীন নেত্রে মন্দিরাভ্যন্তরস্থ দেবপ্রতিমার দিকে চাহিয়া দেবপ্রতিমারই মতন স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। তখন আরতি শেষ হইয়া গিয়াছে। আরতি প্রদীপ নির্ব্বাপিত ও শঙ্খ ঘণ্টার মঙ্গলবাদ্য থামিয়াছে। দেবসেবকগণ ব্যস্তভাবে মন্দির পরিষ্কার পূর্ব্বক প্রস্থানোদ্যম করিতেছিল। অপর্য্যাপ্ত পুষ্পমাল্যবিভূষণের মধ্য হইতে দেবতা হাসিহাসি করুণচোখে চাহিয়াছিলেন, আর তাঁহার দ্বারে মলিনবসনা গম্ভীরবদনা রমণী একজন স্থির নেত্র তাঁহার মুখের উপর স্থাপিত করিয়া নীরবে দাঁড়াইয়াছিল। চারিদিকের জয় জয় ধ্বনি ও বন্দনা গানের মধ্যে তাহার ভাষাহীন নীরব প্রার্থনা কোথায় যেন ডুবিয়া পড়িয়াছিল, তাহার দৃঢ়বদ্ধ ওষ্ঠাধর একবারও কম্পিত হয় নাই। নীরব কামনা নীরবেই কি সর্ব্বান্তর্যামীর পদতলে পৌঁছাইল না এ জগতে এই বয়সেই তাহার সকল সাধ ফুরাইল কে জানে!

একে একে মন্দির দালানের আলোক নির্ব্বাপিত হইতে লাগিল। দর্শনার্থীগণ চলিয়া যাইতে লাগিল। দেখিয়া প্রৌঢ়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। রমণী তবু নড়িল না, তেমনি অঞ্জলীবদ্ধ করে স্থির চক্ষে চাহিয়া রহিল। দেখিয়া তাহার সঙ্গিনী বলিলেন "রাত হলো শিবু পেরণাম করে নাও মা।" ধ্যানমগ্না শিবানীর যেন ধ্যান ভাঙ্গিয়া গেল, একবার পূর্ণদৃষ্টিতে যুগলমূর্ত্তির দিকে চাহিয়া সে গলায় অঞ্চল দিয়া দেবোদ্দেশে নেতা হইল। পুজারি ঠাকুর দুখানি চন্দনচর্চ্চিত তুলসী পত্র ও দুইখণ্ড বরফি প্রসাদ তাহাদের হস্তে দিয়া প্রণামী কুড়াইয়া লইলেন। মার্ব্বেলমণ্ডিত বহিচর্ত্বরে তখনও বড় ধূম! সেখানে তখনও আলোক অনির্ব্বাপিত, পুষ্প অম্লান ও কোলাহল অপ্রতিহত। বড় বড়

ওস্তাদগণ বাঁয়াতবলায় চাঁটি দিয়া মিঠে কড়া আওয়াজ বাহির করিয়াছেন, বেহালা তানপূরায় সুমধুর ঝঙ্কার তুলিয়াছেন এবং সুশিক্ষিত কণ্ঠ হইতে "নন্দকি নন্দন যশোদা কুয়ঁার, বংশীবটতটচারী" গান উঠিয়াছে। রমণীদ্বয় পাশ কাটাইয়া বাহিরে আসিলেন।

পথে যাইতে যাইতে কেহ কোন কথা কহিল না। বৃন্দাবনের রাজপথ তখনও জনাকীর্ণ। উভয় পার্শ্বস্থ ঠাকুরবাড়ির মধ্যে কোন কোনটিতে আরতির বাদ্য তখনও থামে নাই। কোথাও সংকীর্ত্তনের করতালধ্বনির সহিত বহুকণ্ঠ মিলিত গান, দূর হইতে বায়ুস্রোতের মধ্য দিয়া অস্পষ্টভাবে ভাসিয়া আসিতেছে। কোথাও পানোল্লোসিত মাতালের চীৎকার পথিকদিগকে সহসা চমকিত করিয়া তুলিতেছে।

বড় রাস্তা ছাড়াইয়া একটি গলির মধ্যে মাতঙ্গিনী ও শিবানীর কাছাকাছি বাসা। ক্ষীণ জ্যোৎস্নালোকে গলির খানিকদূর পর্য্যন্ত একধারের বাড়িগুলির ছায়া পড়িয়াছিল। রুদ্ধদ্বার কৃষ্ণবর্ণ পুরাতন বাড়িগুলা অপরিস্ফুট ক্ষীণালোকে যেন পর্ব্বত শ্রেণীর মতন দুই পার্শ্বে বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে। কোথায়ও যেন মনুষ্য বাসের চিহ্ন পাওয়া যায় না সব নিস্তব্ধ! মাতঙ্গিনী শিবানীকে তাহার বাড়ী পৌঁছিয়া দিয়া গেলেন।

নীচের ঘরে মার কাছে খোকা ঘুমাইয়াছিল। সিদ্ধেশ্বরী নিকটে বসিয়া গরমের জন্য পাখার বাতাস দিতেছিলেন। শিবানী গৃহে ফিরিয়া সন্তর্পণে তাহাকে কোলে করিয়া উপরে লইয়া গেল। তাহাকে শয্যার শুয়াইয়া পুনরায় নীচে আসিলে—সিদ্ধেশ্বরী বলিলেন "দুটো মুড়ি নিয়ে খানা, গাছের বেশ ঝাল ঝাল লঙ্কা আছে।" শিবানী মায়ের মসারিটা বাতাস দিয়া ফেলিতে ফেলিতে অত্যন্ত সংক্ষেপে কহিল 'না, মা।' "ঐতো তোর রোগ, ঐ জন্যইতো রাগ ধরে! দুটো মুড়ি তেল নুন মেখে নে, জ্বালাসনি বাপু কথা শোন।" শিবানী কথা কহিল না, কেবল ঘাড় নাড়িল, "না"। সিদ্ধেশ্বরী কন্যার অবাধ্যতায় রাগিয়া গেলেন, কিন্তু এখন রাগ হইলেও সময় বিশেষে তিনি একটু আধটু আত্মসংযম করিয়া চলিবার চেষ্টা করিতেন। বলিলেন "নিত্যি নিত্যি রাতউপোসি থাকিস নি; কচি ছেলের মা এতে ছেলের অকল্যাণ হয়। লক্ষ্মী মা আমার কথা শোন।"

শিবানী এরূপ বিষয়ে সাধারণতঃ মাতার আজ্ঞা পালন করে না। কিন্তু আজ সে তাঁহার অনুরোধ অবজ্ঞা করিল না। অনিচ্ছাসত্ত্বেও অগত্যা ক্ষুদ্র কুশের থালায় আহার্য্য লইয়া বলিল "ওপোরে যাই খোকা যদি উঠে কাঁদে!" সিদ্ধেশ্বরী কহিলেন "তা যা, কিন্তু মুড়ি কটা খেয়ে ফেলিস্, ফেলে রাখিস্নে।"

ক্ষুদ্র কক্ষের একপার্শ্বে সেই পূর্ব্ব পরিচিত ক্ষুদ্র বিছানায় আজ একটি ক্ষুদ্র শিশু অকাতরে নিদ্রা যাইতেছে। একপাশে মৃন্ময় প্রদীপ তৈল ও সলিতাভাবে নির্ব্বাণোন্মুখ। শিবানী ঘরে ঢুকিয়াই প্রথমে শিশুর নিকটে গেল! কিছুক্ষণ তাহার সুষুপ্ত স্থির মুখের দিকে উৎসুকনেত্রে চাহিয়া রহিল। তারপর ছোটরকম একটা নিশ্বাস ফেলিয়া আস্তে আস্তে সরিয়া আসিল!

নির্ব্বাপিত প্রায় দীপশিখার ক্ষীণ প্রাণটুকু

বারকয়েক শেষ ঔজ্জল্য দেখাইয়া ধীরে ধীরে অনন্তকালের মত অন্ধকারে ডুবিয়া গেল। শিবানী দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া শেষমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত দীপশিখার অকাল মৃত্যু সন্দর্শন করিল, বাধা দিল না, রক্ষা করিল না। যতক্ষণ পর্য্যন্ত না তাহার শেষ অগ্নিকণিকাটি পর্য্যন্ত লয় হইয়া গেল ততোক্ষণ সে আপনার তীক্ষ্ণোজ্জ্বল পলকহীন দৃষ্টি তাহার উপর স্থাপিত করিয়া রাখিল। ক্ষুদ্র জানলাটা খোলাই ছিল, তাহার মধ্য দিয়া অল্প অল্প একটু মিট্‌মিটে জ্যোৎস্না ও মৃদু মৃদু বাতাস ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিতেছিল। জানলার নিকটে আসিতেই নদীতীরস্থ অশোক গাছের মধ্যে একটা পুষ্প-খচিত শাখা নাড়া দিয়া একটা মত্ততা-পূর্ণ সুরভি ছড়াইয়া বাতাস ছুটিয়া আসিল, বাতাসে আন্দোলিত শাখা হইতে গোটাকতক শুষ্কপত্র সর সর করিয়া খসিয়া পড়িল। যমুনার স্থির জলে নক্ষত্রের ছায়াগুলা একটু কাঁপিয়া ভাঙ্গিয়া তরঙ্গায়িত হইয়া উঠিল।

মুড়ির ডালাখানা ঘরের মেজের একপার্শ্বে রাখিয়া দিয়া অঞ্চলে স্বেদাক্তললাট মুছিয়া শিবানী সেই জানলার নিকট বসিল, এমনিই সে প্রতিদিন বসিত। ঘরে অন্ধকার, বাহিরে অন্ধকার, নদীর বক্ষ অন্ধকার, ওপারে অন্ধকার আরো নিবিড়তর। ঘন বিন্যস্ত বৃক্ষশ্রেণী সেই নিবিড় অন্ধকারের মধ্যে অভেদ্য দুর্গপ্রকারের মত সুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। দুএকটা তালগাছ সেই বৃক্ষপ্রাকারের উপর দিয়া তাহাদের অন্ধকারময় সুদীর্ঘ মস্তক ঊর্দ্ধে উত্তোলনপূর্ব্বক দাঁড়াইয়া আছে। সহসা তাহাদের দিকে চাহিলেই মনে হয় তাহারা বুঝি কোন প্রেত-লোকের প্রাণী, বুঝি ঐ অন্ধকার রাজ্যের অন্ধতমসাবৃত দুর্গের অজেয় প্রহরী।

প্রখর গ্রীষ্মতাপে ইংরাজ রাজ্যের খালের কৃপায় চঞ্চল গতিশালিনী নির্ম্মলসলিলা যমুনা শুখাইয়া গিয়াছেন। তাঁহার যৌবনমাধুরী, পূর্ণ ললিত দেহলতা যেন বার্দ্ধক্যের অবসাদময় জরায় ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। আর সে স্বচ্ছ শীতল কূলে কূলে ভরা উছলিত উথলিত হাস্যময়ী কৌতুকময়ী নবীনামূর্ত্তি নাই। যৌবনের সে চাপল্যময় লীলা চঞ্চল গতি অবিরাম কল কল হাস্যস্রোত, সে অকারণে হাসিয়া হাসিয়া ছলাৎ ছলাৎ করিয়া বৃন্দাবনের তটে লুটাপুটি খাওয়া সে সব এখন গিয়াছে। এখন জীর্ণাঙ্গী সশঙ্কিতা চিন্তামগ্না প্রবীণা উভয় বালুকাতীরের মধ্য দিয়া নিঃশব্দে বহিয়া চলিয়াছিল। অন্ধকাররাত্রে দূরের জলরেখা স্থানে স্থানে নক্ষত্র ছায়ালোকপাতে ঈষৎমাত্র উজ্জ্বল, মৃদুমন্দ পবনে ঈষৎমাত্র স্পন্দিত, নতুবা নদীর বালুতীর হইতে পরপারে লতাগুল্ম সমাকীর্ণ ঘন শাখা-পল্লবে সমাবৃত বনাকীর্ণ তটপ্রান্ত পর্য্যন্ত যেন একখানা মিস কালো কাপড় বিছানো বলিয়া মনে হইতেছে। শিবানী সেই অন্ধকারের দিকে চাহিয়া রহিল।

ক্ষণস্থায়ী শুক্লা চতুর্থীর ক্ষীণজ্যোৎস্না ডুবিয়া গিয়াছে। যে মেঘখানা এতক্ষণ ঈশানের একটা কোণে পড়িয়াছিল, সে এবার তাড়াতাড়ি অগ্রসর হইয়া আসিয়া প্রায় অর্দ্ধেকটা আকাশ ঢাকিয়া ফেলিল। জরীর কাজকরা আঙ্গিয়া ও নিলাম্বরী সাড়ি পরিলে কৃষ্ণাঙ্গিনীকে যেমন মানায় প্রকৃতি ঠাকুরাণী-কেও তেমনি দেখাইতে লাগিল। গ্রীষ্মের মৃদু স্নিগ্ধ বাতাসটুকু এতক্ষণ রহিয়া রহিয়া

থামিয়া, থামিয়া, যেন মুমূর্ষুর শেষ নিশ্বাসের মত অত্যন্ত ধীরে ধীরে, মধ্যে মধ্যে বহিতেছিল। এখন সহসা সেটুকু পর্য্যন্ত থামিয়া পড়িয়া দারুণ গুমোট করিয়া উঠিল।

শিবানী বসিয়া রহিল। এই যে চারিদিকে বিরাট বিশ্বব্যাপ্ত অন্ধকার, এর কি কোথাও গেলে শেষ পাওয়া যায় না? ঐ যে আকাশে বাতাসে, জলেস্থলে দ্যুলোকে ভূলোকে ভাষা হীন, শব্দহীন অনন্ত নীরবতা স্তব্ধ হইয়া রহিয়াছে, এর কি সমাপ্তি নাই!

শিবানী স্তব্ধ হইয়া ভাবিতে লাগিল। যে দিন সহসা অপ্রত্যাশিতভাবে নীরদকুমার তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন, তারপর প্রায় দেড় বৎসর হইতে চলিল। সেই রাত্রের পর এ পর্য্যন্ত আর তাঁহার কোন সংবাদই নাই। সংবাদ পাইবার উপায়ও নাই। তাহার নিরুদ্দিষ্ট স্বামীর জন্মভূমি কোথায় বা তাহার কেহ আছে কিনা সে কিছুই জানে না। সেই গাঢ় অন্ধকারে ডুবিয়া সে কেবল ভাবিতে ছিল, —"চলে গেলে, কেমন করে মনে করলে সত্য সত্যই আমি তোমায় ঘৃণা করি? যখন একথা বিশ্বাস করতে পারলে তখন কেন রাক্ষসীর বুকে একখানা ছুরি বসিয়ে দিয়ে গেলে না। সকলে তোমার কুৎসা করে সেই প্রাণের জ্বালায় যে আমি রাগ করে ওকথা বলেছিলেম কেন তুমি তা বুঝলে না। ওগো তুমি ফিরে এসো একবার মাত্র এসে শুনে যাও আমি তোমায় ঘৃণা করি নাই। একবার এসে দেখে যাও আমার কি দশা করে গেছ।

সহসা কড়মড়নাদে বজ্র ডাকিয়া উঠিল। নিবিড় কৃষ্ণ মেঘে সমাচ্ছন্ন আকাশখানাকে দুই অংশে বিভক্ত বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিয়া পুনঃ পুনঃ বিদ্যুৎ খেলিয়া যাইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে ঝড় উঠিল। শিবানী সহসা সুগভীর চিন্তা হইতে যেন ধ্যান ভঙ্গে চমকিয়া উঠিল।

ঘরে হুহু শব্দে বাতাস প্রবেশ করিতেছিল, বালি উড়িয়া আসিয়া শিবানীর মাথামুখ ভরাইয়া দিল, তথাপি তাহার যেন উঠিবার শক্তি ছিল না। এইরূপ একটি অন্ধকার গভীর দুর্য্যোগ রাত্রিতেই তাহাদের সাক্ষাৎ হইয়াছিল—আজও কি সেদিনের মত তাহাদের ঐ জীর্ণ ক্ষুদ্র দ্বারটিতে তেমনিতর একটি ব্যগ্র আহ্বান সে শুনিতে পাইবে না? ঐ না কে ডাকিতেছে "শিবানী দ্বার খোল" ঐ না তাহারি ব্যগ্র করের আঘাত শুনা যাইতেছে? চমকিয়া শিবানী উঠিয়া পড়িল, ব্যগ্রকণ্ঠে আকুল স্বরে বলিয়া উঠিল "যাই", বলিয়াই সে আপনার কণ্ঠস্বরে আপনিই শিহরিয়া জাগিয়া উঠিল। কই, কোথায় আহ্বান, কেহ তো ডাকে নাই!

সমস্ত রাত্রি ধরিয়া ভয়ানক দুর্য্যোগ চলিল। বৃষ্টি কিম্বা ঝড় একেবারে থামিল না। সমস্ত রাত শিবানী তাহার উৎকণ্ঠিত কর্ণ স্থির করিয়া সেই নির্জ্জন ঘরের মধ্যে একা জাগিয়া বসিয়া রহিল। যেমনি ঝড়ের বেগে জীর্ণ দ্বার নড়িতে থাকে অমনি সে চমকিয়া উঠে। বাতাস থাকিয়া থাকিয়া আর্ত্ত স্বরে কাঁদিয়া উঠে অমনি সে শিহরিয়া উঠিয়া দাঁড়ায়। এমনি করিয়াই তাহার এ দীর্ঘ দিবসের প্রতীক্ষাপূর্ণ দিন কাটিতেছিল,

এমনি করিয়াই সমস্ত রাত্রি গত হইল। শেষরাত্রে বৃষ্টির শব্দ কমিয়া আসিলে যমুনার বিলাপ গান ও বাতাসের বিজয় সঙ্গীত শুনিতে শুনিতে অবসন্ন শরীরে সে মেজের উপর লুটাইয়া পড়িল। ক্লান্তচোখ তাহার অজ্ঞাতসারে কোন সময়ে যে মুদিয়া আসিল তাহা সে জানিতেও পারিল না।

হাফেজ।

ওহে নিষ্ঠাবান, এস হে তৃষ্ণিত,
আছে পানাধার অতি পরিষ্কৃত ;
অনুরাগ সুরা স্ফটিক তলে
মণিরাগে দেখ কেমন জ্বলে !

সে যে বারঙ্ক ধারণা অতীত,
সে কি কারো জালে পড়ে কদাচিৎ!
রহিলি অবোধ কি লাগি বসিয়া
বাতাসের ফাঁদ আকাশে কসিয়া!

পুণ্য বশেতে স্বরগ যেমন,
করগত সুখ ভুঞ্জ তেমন ;
—নন্দনধারা শুখাবে যেমনি
দু দিনেরি বাসা উঠাবে তেমনি !

মধু মহোৎসবে মানব জীবনে
পাত্র দুই মধু লও বঁধু সনে ;
তদন্তে চলরে অনন্ত পথে
ক্ষণিক মিলন-রজনী গতে।

গেল যৌবন জীবনে ও মন,
না করিলি প্রীতি কুসুম চয়ন !
—বয়সে মাথা যে হইল পক্ক,
নামার্জ্জনে কি হবিনা দক্ষ!

মন অসংযত, মত্ত উল্লাসে
গুঢ় রহস্য জান তারি পাশে।
—নিত্য সংযত বিজ্ঞ যাহারা
মনেরি মর্ম্ম খোলে কি তাহারা !

দুয়ারে তোমার অসম্পন্ন
সেবাব্রত মোর আছে অগণ্য ;
তাই বারেবার, মাগি পরিহার,
দাসে ও চরণে রাখ অনিবার।

আমি সেই হ'তে ভরসা ছাড়িয়া
সুখে জলাঞ্জলি বসিয়াছি দিয়া,
সাধ করে প্রাণ যে হ'তে আমার
পড়েছে প্রেমের করেতে তোমার।

অমরাবতীর অমৃত আধার
হাফেজ লইল দীক্ষা তাহার।
দাসের প্রণাম বহুক পবনে
অমৃতাস্পদ নায়ক সদনে।

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।



মন্দিরপথে

শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদার কর্ত্তৃক অঙ্কিত চিত্র হইতে

বেহরামজি ম্যালাবারি

(ফেলিসিঁয়া শালের ফরাসী হইতে)

আগ্রা ৫-৭ ফেব্রুয়ারি ১৯০০।

ভারতে যাত্রা করিবার পূর্ব্বে, আমার ফরাসী ও ইংরাজ বন্ধুদিগের নিকট হইতে, বেহরামজি মালাবারির নামে ৫।৬ খানা পরিচয়পত্র পাইয়াছিলাম। প্রাচ্যদিগের মধ্যে যাঁহারা য়ুরোপে সুবিদিত,—এই সংবাদ পত্র পরিচালক-পার্সি ম্যালাবারি তাঁহাদের মধ্যে একজন।—মালাবারি সচরাচর বোম্বাই নগরেই বাস করেন; কিন্তু আমি যখন বোম্বায়ে ছিলাম, তখন তিনি ভারতের উত্তরাঞ্চলে বেড়াইতে গিয়াছিলেন; আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছুক—এই কথা জানিতে পারিয়া তিনি সদাশয়তার পরিচয় দিয়া আমার উদ্দেশে আগ্রাতে থামিলেন। সেইখানে আমি তাঁহার সহিত দুই দিন সুখে অতিবাহিত করিয়াছি।

ক্ষুদ্রকায়, প্রায় সেমেটিক-জাতীয় ধরণের মুখ, বুদ্ধিব্যঞ্জক জ্বলজ্বলে চোখ্—এই পার্সিকে দেখিয়া আমার একজন পরিচিত জর্ম্মনদেশীয় ইহুদিকে মনে পড়িল;—সেই সাম্যবাদী Edward Bernstein, যাঁহাকে লণ্ডনে অনেকবার দেখিয়াছি। একই প্রকার কার্য্যকরী বুদ্ধি উভয়েরই মুখমণ্ডলে ও আচরণে প্রকাশ পায়।

মালাবারির বিশ্বাস,—রাষ্ট্রনৈতিক সংস্কারের পূর্ব্বে সামাজিক অবস্থার সংস্কার হওয়া আবশ্যক। তাঁহার বিবেচনায়,—বর্ত্তমানে এবং আরও বহুকাল পর্য্যন্ত, য়ুরোপের সহযোগিতা, আশ্রয় ও পরিচালনা ভারতের পক্ষে নিতান্তই আবশ্যক, তাহা ছাড়িয়া চলা ভারতের পক্ষে অসম্ভব। য়ুরোপের কেবল একটি মাত্র রাজশক্তি, ভারতের শান্তি—বিশেষতঃ ধর্ম্মঘটিত শান্তি রক্ষা করিতে সমর্থ। ইংলণ্ডের রক্ষণশীলতা ও উদারতা একসঙ্গে থাকায়—য়ুরোপের সমস্ত রাজশক্তির মধ্যে ইংলণ্ডই এই কার্য্য সাধন করিবার উপযুক্ত পাত্র। মালাবারি তাঁহার প্রসিদ্ধ কথাটি আবার আমাকে বলিলেন;—"যদি ইংরাজেরা ভারতবর্ষ ছাড়িয়া যাওয়া স্থির করেন,—তাঁহারা দেখিবেন, ফিরিবার জন্য অনুনয় করিয়া হিন্দুরা তাঁহাদিগকে এডেনে টেলিগ্রাম করিবে।"

মালাবারির মতে,—প্রথমত শ্রমশিল্পের পরিপুষ্টি করিয়া, দেশের ধন বাড়াইতে হইবে। দেশীয় যুবকদিগকে ব্যবহারিক ও ব্যবসায়িক শিল্প সম্বন্ধে এরূপ সারবান্ শিক্ষা দিতে হইবে যে দেশের লোকেরা তাহাদের হস্তে মূলধন অর্পণ করিতে একটুও ইতস্ততঃ করিবে না। এইরূপে ভারত-সমস্যার সমাধান হইবে।

কিন্তু সমস্ত সামাজিক সমস্যার মধ্যে নারী জাতির অবস্থা সম্বন্ধীয় সমস্যাই সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর। মালাবারি আমাকে বলিলেন, "দাস-রমণী হইতে কোন বীরপুরুষ কখনই প্রসূত হইতে পারে না; আর, ভারতবর্ষে নারীই দাসের অধম।

জন্মাবধি কন্যাসন্তান অনাদরের পাত্র। শিশু ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্ব্বে, পিতা আত্মীয়দিগকে আহ্বান করেন; যদি পুত্র সন্তান হয় তবে

ভোজ-উৎসবাদির দ্বারা তাহাদিগকে আপ্যায়িত করেন, আর যদি কন্যাসন্তান হয়, তাহাদিগকে বলা হয়, "এ কিছুই না"; তখন আত্মীয় স্বজন স্বস্বগৃহে প্রস্থান করে। ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র যে কন্যাসন্তানের প্রতি এইরূপ অনাদর, সে চিরজীবন দুঃখভোগ করিয়া থাকে। হিন্দুদের মধ্যে সাধারণতঃ এইরূপ একটা সংস্কার আছে যে, কন্যা অবিবাহিতা থাকিলে তাহার পিতা অবমানিত হয় এবং জন্মান্তরে হীন যোনীতে জন্মগ্রহণ করে; অতএব যত শীঘ্র পারা যায় কন্যার বিবাহ দেওয়া আবশ্যক। কিন্তু আপনার বর্ণের বাহিরে ও গোত্রের ভিতরে—কি স্ত্রী কি পুরুষ—কোন হিন্দুর বিবাহ হইতে পারে না। কাজেই, বিবাহের ক্ষেত্র অতীব সংকীর্ণ ও সীমাবদ্ধ। কন্যা ভূমিষ্ঠ হইবা মাত্রই, তাহার পিতা, তাহার জন্য একটি বরের সন্ধান করিতে থাকেন, এবং সেই বর নির্ব্বাচনে রূপ গুণ বয়স সম্বন্ধে কিছুমাত্র বিচার করা হয় না। কন্যার বয়স ৫।৬ বৎসর হইলেই, যত শীঘ্র সম্ভব তাহার বিবাহ দেওয়া হয়। বিবাহ হইয়া গেলে বালিকা পিতৃগৃহেই বাস করে। কিন্তু বিবাহিতা বলিয়া সে আর খেলাধূলা করিতে পায় না,—তখন সে ঘরকন্নার কাজেই ব্যাপৃত থাকে। তাহার পর, 'বয়ঃপ্রাপ্তা' হইলে পিতা তাহাকে তাহার স্বামীর হস্তে সমর্পণ করেন। স্বামীর প্রায়ই অনেকগুলি স্ত্রী থাকে, এবং সেই স্ত্রীদিগের উপর তাঁহার সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব।

বিধবার অবস্থা আরও শোচনীয়। পূর্ব্বে, বিধবাকে স্বামীর চিতায় দগ্ধ হইতে হইত। আজিকার দিনে বিধবা সন্ন্যাসিনী ভাবে অবস্থিতি করে, চিরজীবন শোকবস্ত্র পরিধান করে, এবং এই হেতু তাহাকে সকলে 'অলক্ষণে' বলিয়া মনে করে,—কোন উৎসবে সে যোগ দিতে পারে না। অনেক সময়ে, পতিগৃহে তাহার দাসীর কাজ করিতে হয় এবং যে সকল কাজ খুব কষ্টকর, সেই সব কাজই তাহার জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। কখন কখন তাহার অবস্থা এরূপ অসহ্য হইয়া উঠে যে সে জীবিকার জন্য বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করিতে বাধ্য হয়। সচরাচর বিধবারা পুনর্ব্বিবাহ করিতে পায় না। এইরূপ শোনা যায়, একজন উদারচেতা হিন্দু অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, তাঁহার দেশ-ভাইদিগের মধ্যে যে সর্ব্বপ্রথমে বিধবা বিবাহ করিবে তাহাকে তিনি বারো হাজার টাকা দান করিবেন; কিন্তু ধনলাভের এমন অবসর পাইয়াও কেহ বিধবাবিবাহ করিতে সাহস পাইল না। আরও ভয়ানক কথা,—যে সকল বালিকা বিবাহ-অনুষ্ঠানকালে শুধু একবার তাহাদের স্বামীর মুখদর্শন করিয়াছে, হিন্দুরা স্বামীর মৃত্যুর পর সেই সকল বালিকাকেও বিধবার মধ্যে পরিগণিত করে: অন্য বিধবার ন্যায় বালবিধবারাও অবজ্ঞার পাত্র, তাহাদেরও প্রতি একইরূপ কঠোর ব্যবহার করা হয়।

বিগত লোকগণনার তথ্যতালিকায় প্রকাশ—ভারতবর্ষে, পাঁচ বৎসর বয়সের নীচে, ১০৩০০০ বালক ও ২৫৮০০০ বালিকা বিবাহিত; ৫ হইতে ১০ বৎসরের মধ্যে, ৬৯০০০০ বালক ও ২২০১০০০ বালিকা বিবাহিত; ৫ বৎসরের নীচে, ১৩০০০০ জনেরও অধিক এবং ৫ হইতে ১০ বৎসর বয়সের মধ্যে ৬৪০০০ জনেরও অধিক বিধবা।

এই বিষম রোগের প্রতীকারার্থ

মালাবারি কিরূপ ঔষধ প্রয়োগের প্রস্তাব করেন?

প্রথমে তিনি চাহিয়াছিলেন,—বিবাহের বৈধ বয়স ১৪ বৎসর নির্দ্ধারিত হয়—যাহা হউক, এক্ষণে বিবাহের বৈধ বয়স ১২ বৎসর নির্ব্বাচিত হইয়াছে। ১২ বৎসরের বালিকা বিবাহযোগ্য বয়সপ্রাপ্ত হয় এবং তাহার বুদ্ধিবৃত্তিও যথেষ্ট পরিণতিলাভ করে; তখন সে কিয়ৎ পরিমাণে স্বয়ং পতি নির্ব্বাচনে সমর্থ হয়। এই সংস্কারটি প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য, ভারতে ও ইংলণ্ডে স্বমত প্রচার করিয়া তাঁহাকে প্রাণপণে যুঝিতে হইয়াছিল; মালাবারি বলেন, বিশেষত ব্রাহ্মণদিগের জাতিভেদের বিরুদ্ধে তাঁহাকে অজস্র সংগ্রাম করিতে হইয়াছিল। এই ব্রাহ্মণ পুরোহিতেরা স্ত্রীলোকদিগের অজ্ঞতার সুযোগ পাইয়া, অতিসহজে তাহাদিগের দ্বারা নিজ দুরভিসন্ধি ও উচ্চাভিলাষ পূর্ণ করিয়া লয়। তাছাড়া, যাঁহারা বিবাহের বৈধ বয়স ১৬ বৎসর হইবার জন্য প্রার্থনা করিতেছিলেন, সেই বাল-বিবাহের উৎকট শত্রুদিগের বিরুদ্ধেও তাঁহাকে যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। তাঁহার সুদক্ষ সংস্কার-কুশলতার দ্বারা তিনি—কি রক্ষণশীল, কি বিপ্লবশীল—উভয় পক্ষেরই উপর জয়লাভ করিয়াছেন; তিনি সেইরূপ উন্নতিরই পক্ষ-পাতী, যাহা ক্রমশঃ বিস্তৃত হইয়া স্থায়িত্ব লাভ করে। আজকাল এই মুলতত্বটি স্থাপন করিতে দেখা যায়, ধর্ম্মসম্বন্ধীয় যে সকল প্রথা অতীব দুর্নীতিমূলক তাহা, রহিত করিবার জন্য, বিশ্বমানবের হিতকল্পে, রাজসরকারের হস্ত-ক্ষেপ করা উচিত। এই মূলতত্ত্বটিকে যদি বিস্তৃতভাবে কার্য্যে প্রয়োগ করা যায় তাহা হইলেই হিন্দুসমাজ কিয়ৎপরিমাণে রূপান্তরিত হইতে পারে।

অধুনা ম্যালাবারি "বৈবাহিক অধিকারের পুনঃস্থাপন" নামক যে আইন প্রচলিত আছে—যাহার বলে, স্বীয় ইচ্ছার বিরুদ্ধেও স্ত্রী, স্বামীর সহিত সহবাস করিতে বাধ্য হয়,—সেই আইনটি রহিত করিবার জন্য প্রার্থনা করিতেছেন। ম্যালাবারি বলেন, এই আইন-টির উৎপত্তি রোমীয় ব্যবস্থাবলী হইতে—হিন্দু ব্যবস্থাবলী হইতে নহে। ইংরাজেরাই এই আইন ভারতে প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন বটে, কিন্তু উহা কার্য্যে প্রয়োগ করিতে তাঁহারা এখন সাহস পান না।

ব্যক্তিগত চরিত্রের হিসাবে, ম্যালাবারি বিধবা বিবাহের অনুমোদন করেন না। কিন্তু তিনি ইহাও স্বীকার করেন না যে, বিধবা বিবাহ নিষেধ করা সমাজের কর্ত্তব্য। তিনি বিশেষরূপে ইহাই চাহেন যে,—স্বামীর মৃত্যুর পূর্ব্বে পরিবারের মধ্যে স্ত্রীর যে পদমর্য্যাদা ছিল, মৃত্যুর পরেও সেই পদমর্য্যাদা বজায় থাকে। তাঁহার ইচ্ছা,—বিধবারা শিক্ষা লাভ করে, স্বাধীনভাবে কাজ করিতে পারে, আত্মবিনোদন করিতে পারে। তিনি এখন এই মতটি প্রচার করিতেছেন যে, বালবিধবা-দিগের প্রতি মহাপরাধীর ন্যায় ব্যবহার করা অতীব গর্হিত কার্য্য; যখন বাল্যবিবাহ উঠিয়া যাইবে, তখন বালবিধবা আর থাকিবে না।

পরিশেষে, মালাবারি সাধারণত ইহাই চাহেন যে স্ত্রীশিক্ষার উত্তরোত্তর উন্নতি হয়। এই উদ্দেশ্য সাধনার্থ ইংরাজদিগের ঔদাসীন্য এবং হিন্দু ও মুসলমানদিগের বিপক্ষতার বিরুদ্ধে তাঁহাকে নিয়ত সংগ্রাম করিতে হইতেছে।

সর্ব্বত্র বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করিবার জন্য তিনি এখন তাঁহার সমস্ত চেষ্টা উদ্যম নিয়োগ করিতেছেন। কয়েক বৎসরের মধ্যে, এই সম্বন্ধে প্রভূত উন্নতি—বিশেষত পার্সিদিগের মধ্যে প্রভূত উন্নতি সংসাধিত হইয়াছে।

ম্যালাবারির মতে, সর্ব্বদেশে শিক্ষাই, সমস্ত রাষ্ট্রনৈতিক এবং সামাজিক সমস্যা সমাধানের মুখ্য উপায়।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সমালোচনা।

সিন্ধু গৌরব। (ইতিহাস অবলম্বনে) উপন্যাস। শ্রীযুক্ত কুমুদিনীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়, বি, এ প্রণীত। রাজসিংহ, মৃণালিনী প্রভৃতি ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া সিন্ধু-গৌরবের সৃষ্টি! তবে জেবুন্নিসার নব সংস্করণ 'সিন্ধুগৌরবে'র জোবেদী "অগ্নিময়ী দৃষ্টিতে" দরিয়া-ছায়া "মর্জ্জিনাকে হিড়হিড় করিয়া টানিয়া লইয়া" যায়। এইটুকুই নূতন বিশেষত্ব! ইহার শাহজাদী তাঞ্জামে চড়িয়া অভিসার যাত্রা করেন; দৌবারিকের প্রতীক্ষায় কালিফ, কাশেম ও মহম্মদ প্রভৃতি "নিঃশ্বাস বন্ধ করিয়া চক্ষু যথাসাধ্য বিস্ফারিত করিয়া প্রবেশ দ্বারের দিকে চাহিয়া" থাকেন (কি ভীষণ!); আরো ইহাতে আছে,—ভবানী মন্দির,কহ্লন ঠাকুর, দীর্ঘিকা—তাহাতে "রাজহংস দলে দলে সাঁতার কাটে"—কিশোরী প্রেমিকার ভৃত্যবেশে প্রেমাস্পদের পরিচর্য্যা, উদিপুরীর অনুরূপ সুলতানা বেগমের 'সরাব পান', হিন্দু মুসলমানের ভীষণ যুদ্ধ, বিশ্বাসঘাতকতা, শিবির, রাজসভা, বিষপান, নিরাশ প্রণয়, অস্ত্রাঘাত, 'জলে ডুবি' স্বদেশ প্রেমের দীর্ঘ বক্তৃতা, 'ছি ছি' 'হা হা হা হি হি হি'-অট্ট-হাসি, দীর্ঘ নিশ্বাস ইত্যাদি। এত উপাদান সত্ত্বেও যদি উপন্যাস রচনা না হয়, তবে ত গ্রন্থকার নাচার! ইহার উপর "পশ্চাদ্দিকে মস্তকটি নিক্ষেপ করিয়া" "ছোঁকড়া" "জোড় (জোর) করে" প্রভৃতিতে ভাষারও সপিণ্ডকরণ আছে! অর্থাৎ যাহা কিছু উদ্ভট অস্বাভাবিক, সামঞ্জস্যহীন, গ্রন্থকার তাঁহার 'ঐন্দ্রজালিক' তুলিকাস্পর্শে সকলগুলিকেই একত্র করিয়া গ্রন্থমধ্যে স্থান দিয়াছেন। এই ঘোরতর জীবনসংগ্রামের দিনে যিনি এমন উপন্যাস রচনা করিতে পারেন, তাঁহার রীতিমত 'বাহাদুরি' ও প্রচুর অবসর আছে, স্বীকার করি; তবে বেচারা আমাদিগের বিনীত নিবেদন, তাঁহার অখণ্ড অবসর তিনি সুখনিদ্রায় অতিবাহিত করুন, কিন্তু দোহাই, এমনভাবে উপন্যাস লিখিয়া আমাদিগের প্রতি তিনি আর নিষ্ঠুরতা করিবেন না, করিবেন না!

হরিবল্লভের স্নেহ। (সামাজিক উপন্যাস) শ্রীযুক্ত অমরচন্দ্র দত্ত প্রণীত। 'সিন্ধু-গৌরবের' রৌরব ছাড়িয়া 'হরিবল্লভের স্নেহের' মধ্যে আসিলে মন অনেকটা স্নিগ্ধ হয়। ঘটনা-সমাবেশে লেখকের তেমন কৌশল না থাকিলেও রচনাপ্রণালীটি সুন্দর, হৃদয়গ্রাহী! ভাষাটিও সুন্দর হইয়াছে। এখানিকে ঠিক উপন্যাস না বলিয়া 'চিত্র' বলিলেই বোধ হয় নামকরণটুকু সার্থক হয়! গ্রন্থখানি পাঠ করিবার সময় শ্রীযুক্ত শিবনাথ শাস্ত্রী রচিত 'নয়নতারা' উপন্যাসের কথা আমাদিগের মনে পড়িয়াছে। হরিবল্লভ 'নয়নতারার' পিতা রায় মহাশয়ের, ও গ্রন্থের নায়িকা পাখী অর্থাৎ 'বাসনা' নয়নতারার অনুরূপ হইলেও রায় মহাশয় ও নয়নতারায় হৃদয়ের যে উদারতা ও বিশালতা দেখিয়াছি,হরিবল্লভ ও পাখীতে তাহার অভাব। প্রভার মাতা ও ভ্রাতার সহিত পরামর্শান্তে, তাহার পিতার সম্পূর্ণ অজ্ঞাতে, প্রভাকে লইয়া ব্রাহ্মধর্ম্মে-নবদীক্ষিত নরেন্দ্রনাথের প্রচারকের সহিত কলিকাতায় পলায়নের সহিত গ্রন্থকারের সহানুভূতি থাকিলেও তাহার সহিত আমাদিগের কোন সহানুভূতি নাই। এরূপ আচরণ নিতান্ত ঘৃণার্হ ও সমাজের অনিষ্টকর, এবং ইহা নিতান্ত নিকৃষ্ট গৃহের

চিত্র। প্রভার অষ্টাদশবর্ষের দোহাই দিয়া আইনের হাত এড়ানো নরেন্দ্রের পক্ষে কঠিন না হইলেও সামাজিকের কশা তাঁহার পৃষ্ঠে পড়িবার জন্য সর্ব্বদা উদ্যত থ কিবে এ কথা প্রবীণ গ্রন্থকারও যেন স্মরণ রাখেন। প্রেমিক অমৃতলালের সন্ন্যাসীবেশে দার্জ্জিলিঙে পাখীর 'বালিশ' 'গেলাশ' প্রভৃতি চুরি করা নিতান্তই হাস্যোদ্দীপক। লোকচরিত্রাঙ্কনে লেখকের অক্ষমতা অনেক স্থলেই লক্ষ্য হইল। আর একটী বিষম ত্রুটি, লেখকের অতিরিক্ত ব্রাহ্ম গোঁড়ামি। "ওরা যে হিঁদু" প্রভৃতি কথা অনেকবার অবজ্ঞার সহিত উল্লিখিত হইয়াছে। ব্রাহ্ম ও হিন্দুকে গ্রন্থকার দস্তুরমতভাবে পৃথক্ করিতে চাহেন কি? গোঁড়ামি মানুষকে অন্ধ করে,তাই বলিয়া উপন্যাসের মধ্যে এরূপ গোঁড়ামি একেবারেই অসহ্য। আরো একটি কথা, পাখীর মৃত্যুর সহিত গ্রন্থ সমাপ্ত হইলেই ঠিক হইত, কারণ তাহার পরবর্ত্তী অংশটুকু নিতান্তই যেন জোর করিয়া গ্রন্থের নামের সহিত সামঞ্জস্য রাখিবার জন্যই অবতারিত হইয়াছে; সেটুকুতে বর্ণনার ভঙ্গিমা থাকিলেও তাহা নিতান্ত একঘেয়ে হইয়াছে। যাহা হউক, গ্রন্থকারের লিখিবার শক্তি আছে এবং এই অসার উপন্যাসের তাণ্ডব নৃত্যের দিনে তাঁহার নিকট হইতে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষবর্জ্জিত প্রকৃত উপন্যাসের আশা করি বলিয়াই ত্রুটিগুলি এমন বিশদ ভাবে দেখাইয়া দিলাম। প্রবীণ গ্রন্থকার, আশা করি, কথাগুলি একবার বুঝিয়া দেখিবেন।

অশ্রু। (গীতিকাব্য)। শ্রীবিজয়কৃষ্ণ ঘোষ প্রণীত। শ্রীসুরেশচন্দ্র নন্দী সম্পাদিত। শ্রীপ্রমথনাথ মিত্র প্রকাশিত। এখানি যে গীতিকাব্য সে কথা বলা বাহুল্যমাত্র। 'চাহিনা' 'স্বপ্নে' 'আশার কুহক' 'নীরবে' 'যাও' প্রভৃতি শীর্ষক ৪৪টি কবিতায় 'অশ্রুর' পৃষ্ঠা পূর্ণ। লেখক 'চাহিনা' শীর্ষক কবিতায় বলিতেছেন, "রবি উঠে খেটে খুটে, ডুবে যায় পুনঃ উঠে * * বলে যায়—ম্রিয়মান পরার্থে আপন প্রাণ দিতে সদা বলিদান।" কিন্তু 'অশ্রু'র কবি শ্রান্ত রবির সে অমূল্য উপদেশটুকু লিপিবদ্ধ করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন, তদনুযায়ী কার্য্য করিলে, 'পরার্থে' অন্ততঃ গ্রন্থপ্রচার হইতেও তিনি নিবৃত্ত হইতেন। আসল কথা, কতকগুলি কবিতা অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত হইলেও 'অশ্রু'র কবি অনেকগুলি কবিতায় ছন্দ মিলাইয়াছেন, অতএব গ্রন্থ ছাপিতে হইবে! কিন্তু শুধু ছন্দ মিলাইলেই ত' কবিতা হয় না। এদিকে বেচারা ভাব —মাথায় লাঠি মারিলেও যে 'সাড়া দেয় না'! ১০৮ পৃষ্ঠা ব্যাপিয়া তিনি যে এই হাহাকার করিয়া গিয়াছেন, তাহা অরণ্যে রোদনমাত্র! আমাদিগের অনুরোধ, তিনি আর এমন করিয়া কাঁদিয়া হৃদয় শ্মশান করিবেন না, অতিরিক্ত ক্রন্দনে স্বাস্থ্যহানির বিশেষ সম্ভাবনা; তাহা ছাড়া সাহিত্যের পথ তাঁহার 'অশ্রুতে' রীতিমত পিচ্ছিল হইয়া পড়িলে ভবিষ্যৎ কবিগণ এ পথে আসিলে 'কদলীবৃক্ষ যেন চৈত্র মাসের ঝড়ে' তদ্বৎ পপাতে আঘাত পাইবেন!

রাজকাহিনী।—(মেবার) প্রথম খণ্ড। শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। প্রকাশক, শ্রীমনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, হিতবাদী লাইব্রেরী, ৭০, কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। কান্তিক প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য বার আনা। 'শিলাদিত্য', 'গোহ', 'বাপ্পাদিত্য' 'পদ্মিনী' এই চারিটি কাহিনী বর্ত্তমান গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। কাহিনীগুলি বহুকাল পূর্ব্বে 'ভারতী'তে প্রকাশিত হইয়াছিল—বহু পাঠক গল্পগুলি স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে পাইবার জন্য উদ্গ্রীব ছিলেন—আজ তাঁহাদের সে সাধ পূর্ণ করিয়া গ্রন্থকার ও প্রকাশক সকলেরই ধন্যবাদের পাত্র। বিচিত্র শব্দ-চিত্র-কুশলী অবনীন্দ্রবাবুর ভাষার মধুরতা তাঁহার নিজস্ব—এ বিষয়ে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বীহীন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। গ্রন্থপাঠকালে কাহিনীগুলি আগাগোড়া কৌতূহল জাগাইয়া রাখে—রাজপুতের ঐশ্বর্য্য, সম্পদ, শৌর্য্য বীর্য্যের ছায়া হৃদয়ে রীতিমত প্রস্ফুট হইয়া উঠে। তাহার উপর লেখকের অসাধারণ ক্ষমতা —ছোট কথায়—ছোট-একটু ইঙ্গিতে বিপুল সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি! আল্লাউদ্দীন পদ্মিনীর দর্শনাকাঙ্ক্ষা করিলে "রাণা ভীম * * প্রকাণ্ড একখানা আয়নার সম্মুখ থেকে একটি পর্দা সরিয়ে নিলেন; কাকচক্ষু জলের মত নির্ম্মল সেই আয়নার ভিতর পদ্মিনীর রূপের ছটা, হাজার হাজার বাতির আলো যেন আলো-

ময় করে প্রকাশ হল। বাদশা দেখতে লাগলেন ;— সে কি কালো চোখ। সে কি সুটানা ভুরু। পদ্মের মৃণালের মত , কেমন দুখানি হাত। বাঁকা মলপরা কি সুন্দর ছোট দুখানি রাঙা পা। ধানী রংএর পেশোয়াজে মুক্তোর ফুল, গোলাপী ওড়নায় সোনার পাড়, পান্নার চুড়ী, নীলার আংটি, হীরের চিক। বাদশা আশ্চর্য্য হয়ে ভাবলেন,—'এ কি মানুষ না পরী' !"

কাহিনীগুলির আরো বিশেষত্ব বীর, করুণ প্রভৃতি নানা রস ইহাতে বেশ সুন্দর খাপ খাইয়াছে। গ্রন্থখানি শুধুই যে উপন্যাসের ন্যায় উপভোগ্য, তাহা নহে, কল্পনা-বিকাশের পক্ষে সুদক্ষ সহচরও বটে ! পাঁচখানি উৎকৃষ্ট চিত্র, সুন্দর শিল্পে বাঁধাই ও এণ্টিক কাগজে ছাপা, সমস্তই এই গ্রন্থের বিশেষত্বটুকু বজায় রাখিয়াছে !

শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা।

স্বরলিপি।

ভৈরবী—দাদ্‌রা।

ও যে মানে না মানা ! আঁখি ফিরাইলে "বলে—না ! না ! না !"
যত বলি "নাই রাতি, মলিন হয়েছে বাতি"
মুখ পানে চেয়ে বলে "না, না, না !"
বিধুর বিকল হয়ে ক্ষ্যাপা পবনে
ফাগুন করিছে হাহা ফুলের বনে !
আমি যত বলি—"তবে এবার যে যেতে হবে"
দুয়ারে দাঁড়ায়ে বলে—"না ! না ! না !"

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

১´ ০ ১´ ০ ॥ ১´ ০
দা ণ্‌া II ণ্‌া সা -ঋা। মমা -জ্ঞজ্ঞা ঋা I সা -া -া। -া -া -া I -া -া সা। জ্ঞা রা জ্ঞা I
ও যে মা নে ০ না ০ ০ ০ মা না ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ আঁ থি ফি রা

১´ ০ ১´ ০ ১´ ০
। রা জ্ঞা -া। রা মমা -জ্ঞজ্ঞা I দা -া -া। দণ্‌া -া -সা I সঋা -জ্ঞা -জ্ঞঋা I -সা দা ণ্‌া II
ই লে ০ ব লে ০ ০ ০ না ০ ০ না ০ ০ ০ না ০ ০ ০ ০ ০ "ও যে"

১´ ০ ১´ ০ ১´ ০ ১´
II -া -া সা। দা দা পা I পা -া -া I পা পা -া I -দা -া পা। মা মা মা I মপা মপমা
০ ০ য ত, ব লি না ০ ই রা তি ০ ০ ০ ম লি ন, হ য়ে ০ ছে ০

০ ১´ ০ ১´ ০
-জ্ঞজ্ঞা। জ্ঞরা জ্ঞা -ঋসা I -া -া সা। জ্ঞা রা জ্ঞা। রা জ্ঞা -া। রা মমা -জ্ঞজ্ঞা I
০ ০ বা ০ তি ০ ০ ০ ০ মু খ পা নে চে য়ে ০ ব লে ০ ০ ০

১´ ০ ১´ ০ ১´ ০

। দ্া -া -া । দ্ণ্া -া -সা I সঋা -জ্ঞা -জ্ঞঋা । -সা দ্া ণ্া II {-া -া সা । সা সা ঋা I

না ০ ০ না ০ • ০ না ০ ০ • ০ ০ "ও যে" • ০ বি ধু র বি

১´ ০ ১´ ০ ১´ ০

। জ্ঞা মা -া । মা মজ্ঞা -দা I -া -া পা । পমা জ্ঞা জ্ঞরা I জ্ঞা -ঋসা সা । জ্ঞা রা জ্ঞা I

ক ল • হ য়ে ০ • ০ ০ ক্ষ্যা পা ০ প ব ০ নে ০ ০ ফা গু ন ক

১´ ০ ১´ ০ ১´ ০

। রা জ্ঞা -া । জ্ঞমা জ্ঞমা -া I -সা -া সজ্ঞা । জ্ঞা রজ্ঞা ঋা I সা -া -া । -া -া -া} I

রি ছে • হা হা ০ ০ • ফু লে র ব নে ০ • ০ ০ ০

১´ ০ ১´ ০ ১´ ০

। -া -া সা । দা দা পা I পা পা -া । পা পা-দা I -া -া পা । মা -া মা I

• ০ আ মি য ত ব লি ০ ত বে • • • এ বা র্ যে

১´ ০ ১´ ০ ১´

। মপা মপমা -জ্ঞজ্ঞা । জ্ঞরা জ্ঞা -ঋসা I -া -া সা । জ্ঞা রা জ্ঞা I রা জ্ঞা -া ।

যে • তে • • • হ০ বে ০০ ০ ০ দু য়া রে দাঁ ড়া য়ে •

০ ১´ ০ ১´ ০

। রা মমা -জ্ঞজ্ঞা I দ্া -া -া । দ্ণ্া -া -সা I সঋা -জ্ঞা -জ্ঞঋা । -সা দ্া ণ্া II II

ব লে ০ ০০ না ০ • না ০ ০ • না ০ ০ • ০ • "ও যে" ॥

তবু।

ফুরালে বসন্ত শুষ্ক বন মাঝে
তবুও কুহরে পাখী ;
ঝরে গেলে ফুল, তবুও বোঁটাটি
শাখায় থাকে ত লাগি।
শুখালে তটিনী সৈকত চরণে
তবুও রেখাটি রহে,
থেমে গেলে ঝড় তবুও মেদিনী
নিস্তব্ধ নীরব নহে।
জীর্ণ বীণা যবে তবুও ভুলেনা
গাহিতে মধুর গান ;
ভগ্ন প্রাসাদে বেড়ে থাকে তবু
বিগত গৌরব-মান !

শ্রীমতী লজ্জাবতী বসুকন্যা।

বিভিন্ন দেশের ইতিহাসে ভারতের কথা।

তারিখ সালসিলাটুট। সদাগর সুলেমান এই পুস্তকের প্রথম খণ্ডের প্রণেতা। ৮৫১ খৃষ্টাব্দে বাণিজ্যব্যপদেশে ইনি প্রথম ভারতবর্ষে আইসেন। ভারত সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে আর কোন বৈদেশিক কোন গ্রন্থ রচনা করেন নাই। ১৭১৮ খৃষ্টাব্দে মসিয়ো রেনড্ কর্তৃক ফরাসীভাষায় এই গ্রন্থ অনুবাদিত হয়। রেনড সাহেব এই পুস্তককে "Anciennes Relations des Indes et de la china de deux voyageurs Mahometans quiy allerent dans leix siecle de notre era" নামে অভিহিত করেন। সিরাফ নগরীর আবু-জায়দুল হোসেন নামক এক গুণজ্ঞ ব্যক্তি কর্তৃক এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড পরে লিখিত হয়। আবু-জায়দুল হোসেন নিজে কোন দেশ পরিভ্রমণ করেন নাই কিন্তু তিনি অনেক পর্য্যটনকারী এবং সদাগরের নিকট হইতে সমস্ত বিষয় জ্ঞাত হইয়া লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

এই পুস্তক হইতে আমরা ভারতবর্ষ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বৃত্তান্ত অবগত হই। ভারতবর্ষে বহ্লরাজগণ প্রবলপরাক্রান্ত রাজা; এবং ভারতবাসীরা তাঁহার আধিপত্য স্বীকার করেন *। মানকির নগরীতে ইহাদের রাজধানী এবং ইহারা ক্ষত্রিয়। কনৌজের সহিত ইহারা ঘনিষ্ঠসম্বন্ধে আবদ্ধ এবং রাজা ধ্রুবভট্ট শিলাদিত্যের জামাতা। দক্ষিণে তাপ্তি ও উত্তরে আরাবল্লী পর্ব্বতশ্রেণী পর্য্যন্ত ইহাদের রাজত্ব বিস্তৃত।

ভারতবর্ষের নৃপতিবর্গ স্ব স্ব প্রধান কিন্তু প্রত্যেকেই বল্লভীকে শ্রেষ্ঠাসন প্রদান করেন। বল্লভীরাজ প্রেরিত দূতেরা সর্ব্বত্রই সম্মানিত হয়। বল্লভীরাজ তাঁহার সৈন্যদিগকে নিয়মিত বেতন প্রদান করেন এবং ইঁহার অনেক অশ্ব ও হস্তী আছে। ইঁহার অর্থও যথেষ্ট।

এই রাজ্যের নিকটেই জুর্জ্জু রাজ্য †। ইহারও অপরিমিত সৈন্যসংখ্যা এবং ভারতবর্ষের অন্য কোন রাজার এরূপ অশ্বারোহী সৈন্য নাই। ইনিও অনেক ধনশালী এবং ইঁহার অনেক উষ্ট্র ও অশ্ব আছে। এই প্রদেশে কাহারো চৌর্য্য বা দস্যুতার অপবাদ নাই এবং শুনা যায় এখানে অনেকগুলি খনি আছে। রৌপ্য ও স্বর্ণ (Gold dust) বিনিময়স্বরূপ ব্যবহৃত হয়।

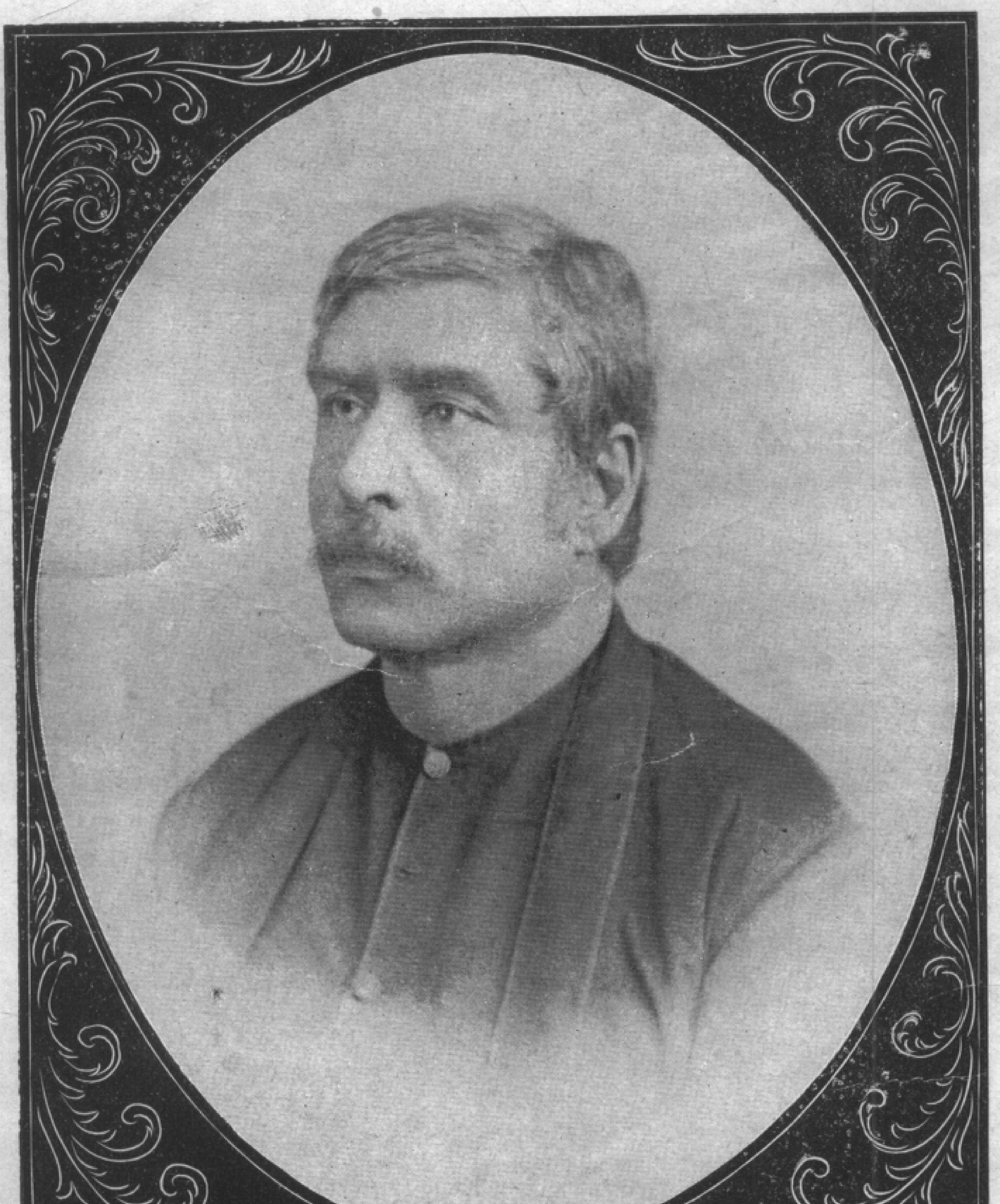
তাফাক রাজা এই রাজ্যেরই নিকট ‡।

---

* This is identified with the dynasty at Ballabhi-pura, the princes of which were the founders of the Ballabhi era and were probably known as the Ballabhi or Ballabh Rajas." সপ্তম শতাব্দীতে হুয়েনসাং বল্লভীতে আগমন করিয়াছিলেন। টড সাহেবের মতে পার্থিয়ান ও হূনেরা পঞ্চম শতাব্দীতে এই রাজ্য বিধ্বংস করে।

† "Jurz resembles Guzerat and the horses of kattiwar are still famous" Eliot. হুয়েনসাংয়ের ভ্রমণবৃত্তান্তে এই গুর্জর দেশের কথা পাওয়া যায়।

‡ এই রাজ্য আরাবল্লী পর্ব্বতশ্রেণীর নিকটবর্ত্তী ছিল। রাজ্যের অন্তর্গত তাইফা দুর্গ ১০২৩ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ গজনী অধিকার করেন।



রাখালদাস হালদার

এই রাজ্য অতি ক্ষুদ্র। এস্থানের স্ত্রীলোকেরা অত্যন্ত সুন্দরী; ভারতবর্ষের মধ্যে এরূপ সৌন্দর্য্য দেখা যায় না। রাজার সৈন্যসংখ্যা অতিশয় অল্প এবং সেই জন্যই রাজ্যে শান্তির কখনো বিঘ্ন হয় না।

উপরোক্ত তিনটী রাজ্যের নিকটে রুমি রাজার রাজ্য। দুঃখের বিষয় রাজা সেরূপ জনপ্রিয় নহেন। বল্লভী এবং জুর্জ্জু উভয়ের সহিতই তাঁহার বিবাদ। ইঁহার সৈন্যসংখ্যা অত্যধিক এবং ইঁহার পাঁচ লক্ষ হস্তী আছে। কথিত আছে যে দশ সহস্র হইতে পঞ্চদশ সহস্র লোক রাজসৈন্যের বস্ত্র ধৌত করণেই ব্যাপৃত থাকে। এই বস্ত্র এত সূক্ষ্ম যে একটী অঙ্গুরীর মধ্যদিয়া অনায়াসে ইহাকে গলানো যাইতে পারে। কড়িই এদেশের মুদ্রা। *

এই রাজ্যের পরেই কসবিন দেশ। এ দেশের অধিবাসীবর্গ শ্বেতবর্ণের এবং ইহারা কর্ণ বিদ্ধ করে। স্ত্রীলোকেরা সুন্দরী এবং পর্ব্বতকন্দরই ইহাদিগের বাসস্থান। †

ইহাদের পর গ্রন্থকার স্বর্ণদ্বীপের কথা লিখিয়াছেন। এ দ্বীপের প্রথা এই যে, রাজার দেহত্যাগ হইলে একখানি শকটে করিয়া তাঁহার মৃতদেহ শ্মশানে আনীত হয়। শকটখানি এমনি ভাবে প্রস্তুত যে, মৃত ব্যক্তিকে এই গাড়ীতে রাখিলে তাঁহার মস্তক ভূমি স্পর্শ করে। শকটের পশ্চাতে একটী স্ত্রীলোক সম্মার্জ্জনী হস্তে মৃতদেহের অনুসরণ করে এবং উক্ত সম্মার্জ্জনী দ্বারা মৃতের মুখে অনবরত ধূলা দিতে থাকে। মধ্যে মধ্যে সে চীৎকার করিয়া বলে, "হে মনুষ্যগণ! দেখ! কাল এই ব্যক্তি তোমাদের রাজা ছিল; এ তোমাদের উপর প্রভুত্ব করিত এবং তোমরা ইহার আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে। দেখ, আজ ইহার কি দশা! ইনি তোমাদের নিকট বিদায় লইয়াছেন এবং যম ইহার আত্মাকে অধিকার করিয়াছে। সাবধান! কেবল সুখের আশাতেই কালাতিপাত করিও না। সাবধান!" মৃতের দাহই এদেশের প্রথা।

ভারতবর্ষে একপ্রকার লোক আছে যাহারা কেবলমাত্র বনে এবং পর্ব্বতেই ভ্রমণ করিয়া বেড়ায়। ইহাদিগের অপর কোন কার্য্য নাই। অনেক সময় ইহারা কেবলমাত্র বনজ ফলমূলেই জীবন ধারণ করে। কেহ বা নগ্ন অবস্থাতেও থাকে। ষোড়শ বৎসর পূর্ব্বে একটী লোককে ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধান করিয়া সূর্য্যের দিকে চাহিয়া থাকিতে দেখিয়াছিলাম। আজও তাহাকে ঠিক সেই ভাবেই দেখিলাম।

এই সকল রাজ্যে সম্ভ্রান্ত বংশীয়েরাই

---

* যতদূর বোঝা যায় গ্রন্থকার কামরূপ বা আসাম রাজ্যের কথা উল্লেখ করিতেছেন, "The accounts of this Kingdom and of Kamrup were probably gathered by the Arab-writers from mariners who had visited the ports in the Bay of Bengal and their ignorance of the interior of the Country, led them to infer that the territories of the Ballabha on the western Coast were conterminous with those of Rahma or Ruhmi on the eastern side"......Elliot.

† টিড সাহেব এই রাজ্যকে কচ দেশ বলেন। ফরাসী গ্রন্থকার রেনড ইহাকে মহীশূর বলেন।

(nobility) পরাক্রান্ত। নৃপতিগণ নিজেরাই উত্তরাধিকারী নির্ব্বাচিত করেন। পণ্ডিত এবং চিকিৎসকসম্প্রদায়ের মধ্যেও এইরূপ ব্যবস্থা। এই সকল ব্যবসায়গুলি বংশ-পরম্পরাগত।

ভারতবাসীরা মদ্য স্পর্শ করে না। যে রাজা মদ্যপান করেন তিনি রাজ্য শাসনের উপযোগী নহেন বলিয়াই তাহাদিগের ধারণা। * ভারতবাসীরা তেমন যুদ্ধপ্রিয় নহে। অনিবার্য্য কারণে যদি কোন রাজা নিকটবর্ত্তী অপর রাজাকে যুদ্ধে পরাজিত করেন, তবে জয়ী রাজাকে পরাজিত রাজবংশীয় কাহারও হস্তে রাজ্যভার প্রদান করিতে হয়। ইহার বিপরীত ব্যবস্থায় প্রজাবর্গের অসন্তোষের কারণ হইয়া উঠে।

সাধারণতঃ ভারতবর্ষের রাজারা সৈন্যদিগকে বেতন দেন না। ধর্ম্মযুদ্ধ হইলে ধর্ম্মের নামে তিনি তাহাদিগকে আবাহন করেন। অমনি সৈন্যেরা যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইয়া আইসে।

দ্বিতীয় খণ্ড।

এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ড সিরাফ নগরবাসী আবু জায়দুল হাসেনের লিখিত।

ইনি কুমারদেশের নৃপতির কথা লিখিয়াছেন। এই দেশের জনসংখ্যা অত্যধিক দেশের লোকেরা মদ্য স্পর্শ করে না। অশ্লীলতার প্রতি ইহাদিগের বিশেষ বিদ্বেষ। নদীর জল সাতিশয় সুস্বাদু।

এই দেশের রাজার সম্বন্ধে গ্রন্থকার একটী গল্প বলিয়াছেন। রাজা একদিন জারজ দেশের রাজার মুণ্ড দেখিতে চান। লোকমুখে এই সংবাদ সেই দেশের নৃপতির কর্ণে পৌছিলে, তিনি কুমার দেশের রাজার বিরুদ্ধে এক সহস্র রণতরীসহ † যুদ্ধযাত্রা করেন। মহারাজা এবং তাঁহার নাবিকগণ সকলেই 'দন্তধাবনী' (Tooth brush) ব্যবহার করিত এবং প্রত্যহ কয়েকবার করিয়া দন্ত প্রক্ষালন করিত। কুমার দেশের রাজা এই অভিজানের জন্য আদৌ প্রস্তুত ছিলেন না সুতরাং সহজেই পরাজিত হইলেন। তাঁহার মুণ্ড মহারাজ সমীপে আনীত হইল। মহারাজ কুমার দেশের মন্ত্রীকে বলিলেন যে, তুমি যথার্থই এরাজ্যের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী সুতরাং উপযুক্ত লোককে এই সিংহাসন প্রদান কর। পরে মহারাজ সৈন্যসামন্ত সমভিব্যাহারে স্বদেশে প্রত্যাগত হইলেন। কুমার দেশের কোন দ্রব্য স্পর্শও করিলেন না।

---

* "How can a man who inebrates himself conduct the business of a kingdom." বস্তুতঃ মদ্যপান ভারতবর্ষে বরাবরই নিষিদ্ধ ছিল। প্রবন্ধান্তরে এ বিষয়ের আলোচনা করিবার আমাদিগের ইচ্ছা আছে।

† অতি প্রাচীনকাল হইতেই যে ভারতবর্ষে রণপোতের ব্যবহার ছিল তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। বস্তুতঃ কি আগ্নেয়াস্ত্র কি রণতরী কোন বিষয়েই পূর্ব্বদেশ পশ্চিমদেশ অপেক্ষা ন্যূন ছিল না।

* এই কয়েক স্থলেই দেখা যাইতেছে যে রাজা অর্থলিপ্সু হইয়া যুদ্ধার্থী হইতেন না; ধর্ম্মযুদ্ধ ব্যতীত সাধারণতঃ অন্য যুদ্ধ ছিল না। কুমার দেশের রাজার বিরুদ্ধে অভিজান অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্যই হইয়াছিল। স্পষ্টতই দেখা যাইতেছে যে মহারাজা রাজ্যবৃদ্ধির জন্য যুদ্ধযাত্রা করেন নাই। কুমার দেশই পরে কুমারীকা অন্তরীপ নামে খ্যাত।

ভারতবর্ষের কোন কোন রাজা রাজত্বে অধিকারী হইলেই প্রচুর অন্ন বিতরণ করেন। কদলী পত্রে এই অন্ন সংরক্ষিত হয়। রাজা সামান্যই ভোজন করিয়া আপনার তিনচারিশত পার্শ্বচরকে ভোজনে আদেশ করেন। যাহারা এই অন্ন ভোজন করে, রাজা মৃত বা যুদ্ধে হত হইলে তাহাদিগকে তাঁহার সহিত সহমরণে যাইতে হয়। এ নিয়মের ব্যত্যয় হয় না।

কোন পুরুষ বা স্ত্রীলোক বৃদ্ধ হইলে অথবা চলচ্ছক্তি রহিত হইলে তাহার পরিবারস্থ যে কেহ তাহাকে অগ্নিতে অথবা জলে নিক্ষেপ করে। তাহাদের বিশ্বাস এরূপ করিলে তাহারা পুনরায় "ফিরিয়া" আসিতে পারিবে।

স্বর্ণদ্বীপে মূল্যবান প্রস্তর ও বহুতর মুক্তা পাওয়া যায়; এখানে অনেক ইহুদী এবং মুসলমানের বাস।

ভারতবর্ষে একশ্রেণীর লোক আছে যাহারা কেবল মাত্র ধর্ম্মকার্য্যেই জীবন অতিবাহিত করে। এতদ্ব্যতীত কবি, নৈয়ায়িক, দার্শনিক, জ্যোতির্ব্বিদও বিস্তর।

ভারতবর্ষীয় রাজারা কর্ণে মণিময় কুণ্ডল পরিধান করেন। তাঁহারা মূল্যবান মণিমুক্তা খচিত কণ্ঠহারও ব্যবহার করিয়া থাকেন।

ভারতবর্ষে স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে অবরোধ-প্রথা প্রচলিত নাই।

(ক্রমশঃ)

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার।

সেনাপতি সুরেশ বিশ্বাসের পত্র।

সহযোগী বেঙ্গলী পত্রে কর্ণেল বিশ্বাসের একখানি পত্র প্রকাশিত হইয়াছে—এ পত্রখানি তিনি তাঁহার প্রিয়বন্ধু বেত্তিয়া-রাজ-এঞ্জিনিয়ার শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে লিখিয়াছিলেন। ইহাই তাঁহার শেষ পত্র। এই পত্র হইতে স্পষ্টরূপে বুঝা যায় যে, তিনি পরিণত বয়সে ভারত ধর্ম্মকেই শ্রেষ্ঠধর্ম্ম জ্ঞান করিয়াছিলেন এবং বহুদিন স্বদেশ হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াও মাতৃভূমিকে ভুলিতে পারেন নাই।

"প্রিয় পূর্ণ, তোমার ৯ই জানুয়ারি ১৯০৫ তারিখের পত্র পাইয়া কি পর্য্যন্ত আহ্লাদিত হইলাম বলিতে পারি না। এই দূর প্রবাসে স্বদেশী বাল্যবন্ধুর স্নেহসম্ভাষণে মনে যে কি অভূতপূর্ব্ব আনন্দের সঞ্চার হয় তাহা তুমি বুঝিতে পারিবে না—তুমি ত কখনো আত্মীয় স্বজন হইতে বিযুক্ত হও নাই। লণ্ডনে আসিয়া পৌঁছিয়াই আমি তোমাকে পত্র লিখিয়াছিলাম, কোন উত্তর পাই নাই—বারবার লিখিয়াও কোন ফল হয় নাই। আমার জীবনধারা তাপযন্ত্রের পারদের ন্যায় কেবলি উঠিয়াছে নামিয়াছে, তাই বলিয়া আমি কখনো পরাভব মানি নাই—পরাভবের জন্য আমার জন্ম হয় নাই। * * * *

জীবনের অতীত সময়ে এমন দিনও গিয়াছে—যেদিন সমুদ্র উন্মাদের ন্যায় তর্জ্জন করিয়াছে—প্রচণ্ড ঝটিকা হুহুঙ্কার করিয়া ছুটিয়াছে, উন্মুক্ত প্রান্তরে ক্ষুৎপিপাসায় কাতর, আহত, মৃতস্তূপের মধ্যে পরিত্যক্ত—আমি পড়িয়া রহিয়াছি; কখনো বা পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহের সহিত যুদ্ধ করিয়াছি, কখনো বা যুদ্ধক্ষেত্রে জয়লাভ করিয়া সম্মান ও অপূর্ব্ব সুখ সম্ভোগ করিয়াছি কিন্তু কখনই আমার প্রিয়জনদিগকে ভুলিতে পারিনাই। অতীতের স্মৃতিই আমার বর্ত্তমান জীবনকে গঠন করিয়া তুলিয়াছে, ভবিষ্যৎ চিরকালই স্বপ্নের রাজ্য ছিল, এখনো তাহাই আছে। এ পৃথিবী বড় কঠিন স্থান, তবুও ইহার উপর চলিবার পথ করিয়া ইহাকে আয়ত্ত করিতে হয়—কিছুতেই

হার মানিও না, কিছুতেই নিজের অধিকার ত্যাগ করিও না—মরিবার সময়ও মৃত্যুর ভয়ে কাতর হইয়া তাহার পায়ে গড়াইয়া পড়িও না, নিজের একটু বল দেখাইও—পারতো অন্ততঃ একটা গান গাহিয়া লইও। অবিরত অধ্যবসায় কখনই বিফল হয় না, একদিন না একদিন কাম্যধন লাভ হয়।

লণ্ডনে আসিয়া পৌঁছিয়া কিছুকাল অসহ্য কষ্টে দিন কাটাই—পরে একটি সার্কাসের দলে সিংহদিগের আহার দিবার ভার আমার উপর পড়ে, অল্পদিনের মধ্যেই আমি ইহাদিগকে বশ করিতে শিখি। পশুরাজ সিংহকে সম্পূর্ণ বশ করিবার ক্ষমতা লাভ করিয়া আমি প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করি এবং ইউরোপের সর্ব্বত্রই আমার খ্যাতি বিস্তার হয়—কতবার রাজা, মহারাজা, সম্রাটের সহিত একত্র ভোজন করিবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছিল—এক কথায় বলিতে গেলে আমারই কথা তখন সাধারণ ও অভিজাতবর্গের একমাত্র আলোচ্য বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। আমার ভাগ্যের এবং অবস্থার এমন আকস্মিক উন্নতিসত্ত্বেও আমার মনের প্রবাস-দুঃখ কিছুমাত্র দূর হয় নাই। কখনো কখনো এমনই মনে হইত যেন আমি পাগল হইয়া যাইব। ইহার কিছু দিন পরে আমি দক্ষিণ আমেরিকায় আসি এবং সৈন্য দলভুক্ত হইব বলিয়া মনস্থির করি। যদিচ এজীবনের কষ্ট, নিয়ম ও শাসন কত কঠিন তাহা আমি জানিতাম তবুও কিছুকালের মধ্যেই আমি সুযশ ও উচ্চপদ অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইলাম। এই দেশেই বিবাহ করিয়াছি—এখন আমার চারিটি পুত্র এবং একটি কন্যা। অবিশ্রাম জীবনসংগ্রামে আজ আমার মাথার সব চুলগুলি শাদা হইয়া গিয়াছে কিন্তু দৈহিক বলের কিছুমাত্র হ্রাস হয় নাই। * * * *

আমার মনের যখন উক্তরূপ শোচনীয় অবস্থা সেই সময় একদিন রাত্রে আমি ঘোড়ায় চড়িয়া কিছুদূরে একটি সৈন্য নিবাস পর্য্যবেক্ষণ করিতে যাইতেছিলাম। পথের একটি বাড়ী হইতে মূর্চ্ছাহত রমণীর আর্ত্তকণ্ঠস্বর শুনিয়া সেইখানে ঘোড়া থামাইয়া, নামিয়া বাড়ীর ভিতর গেলাম। সেখানে গিয়া দেখি গৃহসজ্জা সমস্ত বিপর্য্যস্ত, দুতিনটি স্ত্রীলোক ব্যাকুলভাবে এদিকে ওদিকে দৌড়াদৌড়ি করিতেছে। আমাকে দেখিয়া তাহারা বলিল "গৃহস্বামী অনুপস্থিত, তাঁহার কন্যা কিছুদিন হইল অত্যন্ত পীড়িত। তিনি সমস্ত দিন কিছুই খান নাই—বিছানার উপর একভাবে একদৃষ্টে পড়িয়া আছেন, কিছুক্ষণ হইল হঠাৎ এমন অস্থির হইয়া পড়িয়াছেন যে তাঁহাকে কোনমতে বিছানায় ধরিয়া রাখা যাইতেছে না।" আমি তাঁহাকে দেখিবার অনুমতি প্রার্থনা করিলাম। তাঁহার ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম তিনি মাটীতে পড়িয়াই গড়াগড়ি দিতেছেন। আমাকে দেখিবামাত্র বলিয়া উঠিলেন, "সত্যই কি আপনি আসিয়াছেন! আমি আপনার প্রতীক্ষায় ছিলাম"। অন্য স্ত্রীলোক কয়টি এই কথায় আশ্চর্য্য হইয়া আমাকে দেখিতে লাগিলেন। আমি তাঁহাদের প্রতি কোন মনোযোগ না করিয়া একেবারে সেই ভদ্রমহিলাটির বিছানার পাশে গিয়া দৃঢ়ভাবে তাঁহার দুখানি হাত ধরিলাম, এবং তাঁহাকে মাটী হইতে উঠিতে বলিলাম—তিনি তৎক্ষণাৎ উঠিয়া বলিলেন "আপনি আমাকে যেখানে যাইতে বলিবেন সেইখানেই আপনার সহিত যাইব।" পূর্ব্বে তুমি বোধ হয় জানন। আমি সম্মোহন বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী; বহুকাল ইহা যত্নের সহিত অভ্যাস করিয়াছিলাম। আমি তাঁহার মাথার উপর আমার দক্ষিণ হস্ত রাখিয়া বলিলাম "এখন একটু নিদ্রা যাও তাহার পর আমি তোমায় লইয়া যাইব।" কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি মাটীর উপর শুইয়া গভীর নিদ্রামগ্ন হইলেন। তখন তাঁহাকে বিছানায় তুলিয়া শোয়াইতে ও তাঁহাকে স্বেচ্ছামত ঘুমাইতে দিতে বলিয়া আমি চলিয়া আসিলাম। তাহার পর আর সেদিকে যাই নাই।

দুই মাস পরে একজন প্রৌঢ় সুশ্রী ভদ্রলোক আমার বাসায় আসিয়া তাঁহার কন্যাকে আরোগ্য করার জন্য অনেক ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন "যদিও তুমি বাহ্যিক সুখস্বচ্ছন্দে আছ তবুও যে মানসিক কষ্টে নিতান্ত পীড়িত হইতেছ তাহা নিবারণের অমোঘ উপায় বলিয়া দিতে পারি।" আমি এই কথায় বড়ই

আশ্চর্য্য হইলাম কিন্তু মুখে কিছু বলিলাম না। বুঝিলাম আমি সম্মোহিত করিবার সময় তাঁহার কন্যা আমার যে মানসিক অবস্থা ছবির ন্যায় সুস্পষ্টভাবে দেখিয়াছিলেন তাহাই পরে পিতাকে জানাইয়াছেন। আমি তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া বলিলাম, যদি এ উপকার করেন তবে চিরকৃতজ্ঞ থাকিব। আমার কথায় তাঁহার মুখের ভাবের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইল—তাঁহার মুখ পাণ্ডুর হইল। তিনি গম্ভীরস্বরে বলিলেন "তুমি যেদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ—সেই প্রাচীন আর্য্যবংশের আভিজাত্য-চিহ্নে তোমার উন্নত প্রশস্ত ললাট শোভিত। তুমি জান মৃত্যু বলিয়া কিছুই নাই; তাহা দেহান্তরগ্রহণ, পরিবর্ত্তন মাত্র। তোমার গম্ভীর কৃষ্ণতার চক্ষু দেখিয়া বুঝিতে পারিতেছি
৫৬ আত্মা কত উদার কত দয়াশীল। নিজে ক্ষুধায় কাতর থাকিয়া অন্যের ক্ষুধা তৃষ্ণা দূর করিয়া থাক—দুঃখ দূর করিয়া ক্ষান্ত হওনা—আবার গোপনে তাহাদের জন্য তোমার চোখে জল পড়িতে থাকে। কেমন আমি ঠিক বলি নাই?" আমি কোন উত্তর করিলাম না। তিনি জর্ম্মান কবি সিনারের একটি কবিতা আবৃত্তি করিয়া তাহার ভাবার্থ বুঝাইয়া দিলেন। বলিলেন "অজ্ঞানতাই জীবন, জ্ঞানই মৃত্যু—যদি সেই জ্ঞানের অন্তরালে বিপদ লুকাইয়া থাকে। যদি তুমি অপরের জন্য অত অধিক ভাবনাচিন্তা কর তাহা হইলে একদিন তুমি জীবন কিম্বা জ্ঞান হারাইবে—কেননা ইহাতে তোমার জীবনীশক্তি তোমার শরীর মনকে ত্যাগ করিয়া তাহাদের দিকেই প্রবাহিত হইতেছে, ইহাতে তাহাদের লাভ হইতেছে কিন্তু তোমার সমূহ ক্ষতি।" আমি বলিলাম,আমি আপনার কথা বুঝিতে পারিয়াছি। কিন্তু ইহার কোন উপায় নাই আপনি যদি আমার স্মৃতি উচ্ছেদ করিতে পারেন তবেই আমার মনের শান্তিলাভ হয়;—কিন্তু স্নেহ প্রীতি ভিন্ন কি জীবনধারণ কখনো সম্ভব হয়? সূর্য্য ভিন্ন এই সৌর জগৎ যেমন মুহূর্ত্ত মাত্র জীবিত থাকে না প্রেম ভিন্ন মানবজীবনও তেমনি মুমূর্ষু হইয়া পড়ে।" তিনি বলিলেন তুমি তোমার মহৎ জাতির যোগ্য কথাই বলিয়াছ—তবে অহং অর্থাৎ আমিই সর্ব্বপ্রথম; প্রকৃতির নিয়ম তাহার মুখে অন্নপান যোগাইয়া তবে অপরের কথা ভাবিতে হইবে। প্রকৃতির নিয়ম লঙ্ঘন করিলে সে কখনো মার্জ্জনা করে না। স্মৃতির উচ্ছেদ তুমি না করিলে আর কাহারও করিয়া দিবার সাধ্য নাই—তবে সর্ব্বদাই দুঃখের কথা ভুলিয়া থাকিতে সচেষ্ট থাকিবে। তোমার অবসর কালে আরাম করিয়া বসিয়া অতি অল্প সময়ের জন্য মন একেবারে শূন্য চিন্তাচেষ্টাহীন করিবে; এই উপায়ে তুমি মানসিক শক্তি সঞ্চয় করিতে পারিবে—এই উপায়েই তোমাদের গুরু এবং সন্ন্যাসীরা নির্ব্বাণ লাভ করিয়া থাকেন।" এই বলিয়া তিনি বিদায় গ্রহণ করিলেন।

আজ অনেক লিখিয়াছি আর অধিক লিখিব না। এবার পত্রে আমার ও তোমার আত্মীয় বন্ধু সকলের কথা লিখিও—তোমার মাকে আমার পদ মানের কথা বলিও, তিনি সুখী হইবেন।

তাঁহাকে বলিও, আমি আর গৃহহীন নিরাশ্রয় পর্য্যটক নহি;—আমার গৃহ দ্বার সবই হইয়াছে—সে গৃহ সুখময়, প্রিয়পরিজনে পূর্ণ—এই দূরদেশে প্রবাসী হইয়াও আজ আমি একজন সম্মানিত সঙ্গতিপন্ন গৃহস্থ। আমি সৈন্যদলের নেতা, আমার পরিচ্ছদ রাজকীয় বেশের ন্যায় সুন্দর ও কারুকার্য্য খচিত,আমার বাহন দৃপ্ত যুদ্ধের অশ্ব;—কামানের গোলা যখন চতুর্দ্দিকে মৃত্যুবর্ষণ করে তখনও আমি তাহার সম্মুখে অগ্রসর হইতে ভীত নহি। তোমার মা আমার সুখসৌভাগ্য ও পদগৌরবের কথা শুনিলে সুখী হইবেন তাই এত করিয়া লিখিলাম—শুধু তোমার মা কেন আমার বিশ্বাস এমন ভারতবাসী কেহ নাই যাহার মন স্বদেশী ভ্রাতার এই পদগৌরবের কথা শুনিয়া উৎফুল্ল হইবে না।

অতীতের কথা কতবার ভাবি—কেবল আমার মায়ের কথা ভাবিতে বুক ফাটিয়া যায়, যেদিন প্রথম সংবাদপত্রে তাঁহার মৃত্যুর কথা জানি সেদিন আর মনে করি নাই, আমি বাঁচিব। তিন দিন, তিন রাত শয্যাত্যাগ করি নাই কিম্বা অন্ন জল স্পর্শ করি নাই। আমার মুখে এক বিন্দু জল দিতে তখন কেহই ছিল না, তবু মরি নাই, বাঁচিয়া আছি।

তুমি জিজ্ঞাসা করিয়াছ আমি ভারতবর্ষে ফিরিয়া যাইব কি না? নিশ্চয়ই যাইব—আমাকে যাইতেই হইবে। ভারতভূমি, মাতৃভূমির মুখ না দেখিলে আমার মরা হইবে না। আমার শরীর ও মনের অর্দ্ধেক অংশ যেন সেখানে ছাড়িয়া আসিয়াছি—সেখানে ফিরিয়া না গেলে আমার সম্পূর্ণতা লাভ হইবে না।"

হায়! এ আশা তাঁহার পূর্ণ হইল না!!!

চয়ন।

শারীরবিজ্ঞান।

স্বাস্থ্য-চিহ্ন।—আধুনিক চিকিৎসকগণের মতে চক্ষু বা দেহের বর্ণ অপেক্ষা নখের দ্বারা মনুষ্যের স্বাস্থ্যের অবস্থা আরো সহজে বুঝা যায়। যাহাদের নখ অতি শীঘ্র বৃদ্ধি পায় এবং বেশ চিক্কণ, তাহাদের সাধারণ স্বাস্থ্যের অবস্থা ভাল বলিয়া বুঝিতে হইবে।

উপবাস ও স্বাস্থ্য।—আধুনিক পাশ্চাত্য চিকিৎসকগণ বলিতেছেন যে উপবাসে অনেক রোগের উপশম হয়। স্নায়বীয় রোগের পক্ষে উপবাস বিশেষ ফলপ্রদ। বার্লিন নগরে একটি স্ত্রীলোক বহু বৎসর হইতে স্নায়বিক পীড়ায় কষ্ট পাইতেছিলেন, অবশেষে উপবাস করিয়া তিনি আরোগ্য লাভ করিয়াছেন। একজন বিজ্ঞ চিকিৎসক বলেন, স্বপ্ন আমাদের উদরের অবস্থা-বিশেষ হইতে উৎপন্ন হয়। সহস্র সহস্র ব্যক্তি কুস্বপ্ন দেখিয়া কষ্ট পান ও তাহাতে তাঁহাদের স্নায়বিক শক্তির হ্রাস হয়। উপবাসই এ সকল রোগের শ্রেষ্ঠ ঔষধ। ভারতের ব্যবস্থাপকগণ ইহা বহুপূর্ব্বেই বুঝিতেন।

দধি ও রোগের বীজাণু।—অধ্যাপক মেচনিকফ (Professor Mechnikoff) আমাদের দেহের বার্দ্ধক্য নাশ করিবার এক উপায় আবিষ্কার করিয়াছেন। তিনি বলেন প্রত্যহ দধিভক্ষণ করিলে দেহের যাবতীয় রোগের বীজাণু নষ্ট হইয়া যায় এবং দেহ সুস্থ ও সবল থাকে। যে সকল কারণে বার্দ্ধক্যে দেহে জরা আসিয়া উপস্থিত হয়, নিয়মিত দধিভক্ষণে সে সকল কারণ দূরীভূত হইতে পারে।

এত সহজ উপায়ে যদি সুস্থ দেহ ও দীর্ঘজীবন লাভ করা সম্ভব হয়, তাহা হইলে আর ভাবনা কি! সকলেই এখন নিয়মিতরূপে প্রত্যহ দুই তিনবার করিয়া দধি ভক্ষণ করিতে থাকুন।

তিনি আরও বলেন যে, দুগ্ধকে বিশুদ্ধ ভাবে পাইতে হইলে গাভীর মুখ, দাঁত ও দেহ বিশেষভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা কর্ত্তব্য। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বিষময় রোগের বীজাণু দেখিয়া যেরূপ আতঙ্ক প্রকাশ আরম্ভ করিয়াছেন, তাহাতে অনেক সময়ে আমাদের হাস্য সম্বরণ করা কঠিন হইয়া উঠে। শুনিতে পাওয়া যায় আমাদের স্বর্গীয় মহেন্দ্রলাল সরকার একবার তাঁহার একটি রোগীর সর্দ্দির অন্য কোনরূপ কারণ না পাইয়া এইরূপ কারণ নির্দ্দেশ করেন যে, দুগ্ধদোহনকারী গয়লা আর্দ্র বসনে দুগ্ধ দোহন করিয়াছিল সেই দুগ্ধ পানেই রোগীর সর্দ্দি হইয়াছে। এই গল্পটি নানাপ্রকার হাস্যকর ভাবে আমাদের মধ্যে প্রচলিত আছে। কিন্তু মেচনিকফের উক্ত সিদ্ধান্তের পর আর মহেন্দ্রলালের এ কথায় হাসিবার ত বিশেষ কোন কারণ দেখিতে পাই না। কে বলিতে পারে যে গয়লার সেই আর্দ্র বস্ত্র হইতে সর্দ্দির বীজাণু বাহির হইয়া দুগ্ধের সহিত রোগীর দেহে প্রবেশ করে নাই!

চর্ব্বণ ও স্বাস্থ্য।—আহারে নহে, পরিপাকের উপরই যথার্থভাবে আমাদের স্বাস্থ্য নির্ভর করে। চর্ব্বণ আমাদের জীর্ণশক্তির সহায়ক। ভাল করিয়া খাদ্যদ্রব্য চর্ব্বণ করিলে মুখের মধ্যেই তাহা অর্দ্ধেক জীর্ণ হইয়া যায়, এবং উদরে গিয়া অতি সহজেই পরিপাক হইয়া দেহে রক্ত উৎপাদন করে। আধুনিক চিকিৎসকগণের মতে কোন খাদ্যদ্রব্য চর্ব্বণ দ্বারা মুখের মধ্যে একেবারে মাখনের মত করিয়া ফেলিয়া

তবে গলাধঃকরণ করা উচিত। তাঁহারা আরও বলেন যে, জল দুধ ইত্যাদি তরল পদার্থও ঢক ঢক করিয়া পান করা ঠিক নহে। জলীয় দ্রব্যাদিও একটু করিয়া মুখে লইয়া ধীরে ধীরে চর্ব্বণ করিয়া অর্থাৎ উত্তমরূপে মুখের লালা মাখাইয়া পান করা কর্ত্তব্য। আমাদের দেশে এক নিশ্বাসে এক ঘটি জল পানের যে প্রথা প্রচলিত আছে, তাহা অতি অস্বাস্থ্যকর।

মনুষ্যের আকার বৃদ্ধি।—আমেরিকার হারভার্ড ও ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণের মধ্যে আকার বৃদ্ধির চেষ্টা করিয়া দেখা গিয়াছে যে তাহারা তাহাদিগের পিতা ও পিতামহের অপেক্ষা অধিক দীর্ঘকায় হইয়াছে। ছাত্রগণের মধ্যে সাধারণতঃ সকলেই পাঁচ বৎসরের মধ্যে প্রায় দেড় ইঞ্চি দৈর্ঘ্যে ও ১০ সের ওজনে বাড়িয়াছে। জাতিগত ভাবে এরূপ চেষ্টা করিতে থাকিলে এক সময়ে সমগ্র জাতির আকার ও বল বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া তাঁহাদিগের বিশ্বাস। জাপানিগণ ত আপনাদের আকার বৃদ্ধি করিবে বলিয়া স্থিরসঙ্কল্প।

অন্তঃপুর।

চলন।—আমাদের দেশের কাব্যে সুন্দরী রমণীর গমনের নানারূপ বর্ণনা পাঠ করি, যেমন মরাল-গমন, গজগমন ইত্যাদি। কালিদাস বসন্ত পুষ্পাভরণা উমাকে সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতার সহিত তুলনা করিয়াছেন। এই প্রত্যেকটি গতির সহিত এক একটি সুন্দর ছবি মনে আসে, মরালগমন বলিলেই ঈষৎ চঞ্চল চকিতগতি কিশোরীকে মনে পড়ে, আবার গজগমন শুনিলে, সাম্রাজ্ঞীর ন্যায় মহিমান্বিতা পূর্ণযৌবনা নারীকে যেন দেখিতে পাই। সুন্দর গতি সৌন্দর্য্যকে যে অধিকতর মনোহর করে তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই, একটু অভ্যাস ও যত্ন করিলে আমরা সকলেই সুন্দর করিয়া হাঁটিতে পারি। হাঁটিবার সময় মাথা একটু পিছনে হেলাইয়া শরীরের ভার নিক্ষিপ্ত পদে রাখিয়া হাঁটিলে গতি সুশ্রী হয়। মাথার উপর একখানি বই রাখিয়া একেবারে সোজা হইয়া হাঁটিতে অভ্যাস করিলে গমন সহজ ও সুন্দর হয়। হিন্দুস্থানী মেয়েরা মাথার উপর কলসী রাখিয়া কেমন সুন্দর উন্নত ও ঈষৎ আন্দোলিত গতিতে অবলীলা-ক্রমে হাঁটিয়া যায়। ভাল করিয়া হাঁটিতে শিখিলে অনেক পরিশ্রমের কাজও বেশ সংক্ষে সাধিত হয়।

কণ্ঠস্বর। ইচ্ছা এবং অভ্যাসের দ্বারা আমরা যেমন আমাদের গতি সুশ্রী করিতে পারি, কণ্ঠস্বরও তেমনি সুমধুর করিতে পারি। কোমল মধুর কণ্ঠস্বর নারী সৌন্দর্য্যের একটি প্রধান অঙ্গ, কর্কশ কণ্ঠ তেমনি এবং ধীরে ধীরে বলি তাঁহা হইলে কণ্ঠস্বর কর্কশ হইবার অবসর পায় না। সকল কবি, তাঁহার কাব্যের নায়িকার বর্ণনায় তাহাকে মধুরকণ্ঠী বলিয়াছেন।

প্রসাধন।—ইংরাজেরা বলেন; ভূষি ভিজান জলে বাদাম বাঁটা গুলিয়া তাহাতে মুখ ধুইলে রং বেশ চকচকে হয়। আমাদের দেশে বর্ণ চাকচিক্যের জন্য রূপটান প্রসিদ্ধ। স্নানের সময় ও বিকালে মুখ প্রক্ষালনের সময় রূপটান মাখিলে মুখের চর্ম্ম সুন্দর লাবণ্যযুক্ত হইতে দেখা যায়। বাদাম ও কমলালেবুর খোসা একত্র বাঁটিয়া তাহাতে সর ও ময়দা মিশাইলেই রূপটান প্রস্তুত হয়। দিনের মধ্যে দুইবার না পারিলেও অন্ততঃপক্ষে প্রত্যহ স্নানের সময় একবার করিয়া রূপটান মাখা ভাল। তবে যাঁহাদের প্রতিদিন রূপটান প্রস্তুত করিয়া লওয়া অসুবিধা তাঁহারা অভাবপক্ষে সর মাখিতে পারেন। রূপটান বা সর মাখার পর মিহি বেশন বা বাদামের সাবানে মুখ ধুইয়া টর্কিস তোয়ালে বা কোন নরম কাপড় দিয়া বেশ ভাল করিয়া মুখ মুছিয়া ফেলিতে হইবে। মুখে যেন একটুও জল না থাকে। সকালে উঠিয়া শুধু ঠাণ্ডা জলে মুখ ধুইয়া ফেলাই ভাল। রূপটান বা সর মুখে মাখিতে যেদিন সুবিধা না হইবে সেদিন মিহি বেশনে, একটু বাদাম বাঁটা মিশাইয়া মুখ ধুইলেও চলে।

ব্যায়াম।—সব দেশেই বিশেষতঃ আমাদের দেশে অবস্থাপন্ন ঘরের মেয়েরা একটা বয়সের পর

কায়িক পরিশ্রম। হাঁটিয়া বেড়ান বেশ একটি সহজ ব্যায়াম। কিন্তু এদেশে ভদ্রঘরের মেয়েদের হাঁটিয়া বেড়াইবার সুবিধা নাই। তাই প্রতিদিন প্রাতে উঠিয়া কিম্বা রাত্রে শুইতে যাইবার পূর্ব্বে তাঁহারা কিছুক্ষণ যদি ঘরের মধ্যে নিম্নলিখিতরূপ লঘু ব্যায়াম করেন তো যথেষ্ট উপকার পাইবেন।

প্রথম। দুইখানি বাহু একই সময়ে শরীরের উভয় পার্শ্বে বৃত্তাকারে দশবার ঘুরাইবে। হাত দুখানি সম্মুখে ঋজুভাবে স্কন্ধের সহিত সমান রাখিয়া দশবার বাড়াইয়া দিবে—দশবার মাথার উপর উঁচু করিয়া তুলিয়া আবার সমান ভাবে হাঁটু পর্য্যন্ত নামাইবে, দশবার সোজা সম্মুখে দুখানি হাত জোড় করিয়া খুলিয়া উভয় পার্শ্বে যতদূর পার বিস্তার করিবে।

দ্বিতীয়। এক একখানি পা যতদূর সম্ভব শরীরের সহিত সমকোণে (rigth angles) রাখিয়া সোজাভাবে দশবার বাড়াইয়া দিবে ও নোয়াইবে।

তৃতীয়। এক একখানি পা দশবার বাড়াইয়া দিবে ও দশবার নোয়াইবে। প্রতিহাঁটু দ্রুতভাবে ১৫ বার নোয়াইবে।

চতুর্থ। করাত দিয়া কাঠ কাটিবার সময় শরীর যেমন ভাবে চালনা করিতে হয় সেইরূপ ভাবে ১৫ বার চালনা করিবে। তরবারি খাপ হইতে খুলিয়া লইতে হইলে যেমন ভাবে হস্ত চালনা করিতে হয়, ১৫ বার সেই ভাবে উভয় হস্ত চালনা করিবে।

পঞ্চম। একেবারে তীরের মত সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া হাত দুখানি মাথার উপর তুলিয়া আবার মাটীতে ছোঁয়াইবে, হাঁটু যেন না নোয়।

ষষ্ঠ। কোমরের দুই দিকে দুখানি হাত রাখিয়া একই স্থানে দ্রুতভাবে এক শত কিম্বা দুই শত বার পা উঠাইবে এবং নামাইবে।

সপ্তম। শরীরটি সোজা রাখিয়া কোমরের দুই দিকে দুখানি হাত রাখিয়া সমান ও হাল্কা ভাবে ২৫ হইতে ৫০ বার পর্য্যন্ত লাফাইবে।

প্রাতে কিম্বা রাত্রিতে শুইতে যাইবার পূর্ব্বে এই ব্যায়াম অভ্যাস করিবে। যে ঘর কিম্বা বারান্দার চারিদিক হইতে বিশুদ্ধ বাতাস চলাচল করিতে পারে সেইখানে ব্যায়াম করিবে। পনের কিম্বা বিশ মিনিটের অধিক পরিশ্রম করিবে না। এই সময় কোনরূপ আঁট কাপড় পরিবে না এবং যখনই শ্রান্ত বোধ হইবে তখনি ইহা বন্ধ করিবে, এই সময় যাহাতে ঠাণ্ডা বাতাস না লাগে তাহাই করিবে—ব্যায়াম হইয়া গেলে ভিজা গামোছা দিয়া গা মুছিয়া ফেলিবে এবং অল্পক্ষণ বিশ্রাম করিবে।

মান্দ্রাজে নারীসমিতি।—বঙ্গের পুরুষগণ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের মধ্যে যেরূপ সহৃদয়তা ও স্বজাতীয়তা সৃষ্টি চেষ্টায় অগ্রগণ্য হইয়াছেন, বঙ্গরমণী-গণও সেইরূপ বিভিন্ন প্রদেশের নারীসমাজে একটা নবজীবন সঞ্চারের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন দেখিয়া আমরা যারপরনাই আনন্দ বোধ করিতেছি। পঞ্জাবে শ্রীমতী সরলা দেবী ও হায়দ্রাবাদে শ্রীমতী সরোজিনীর এইরূপ কর্ম্মোদ্যমের কথা সকলেই জানেন। মান্দ্রাজের নরসাপুর নগরে তথাকার ম্যাজিষ্ট্রেট যতীন্দ্রনাথ রায়ের পত্নী শ্রীমতী বিভাবতী একটি নারী সমিতি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ইনি কাশ্মীরের ডাক্তার আশুতোষ মিত্রের কন্যা। সেদেশের নারীগণের মধ্যে শিক্ষা, জ্ঞান ও সদ্ভাবের প্রচার করাই এই সমিতির উদ্দেশ্য। আজ এক বৎসর হইল এই সমিতি গঠিত হইয়াছে। এই অল্প সময়ের মধ্যেই তথাকার নারী সমাজ এই সমিতিতে যোগদান করিয়া মিসেস রায়ের শুভচেষ্টাকে সার্থক করিয়াছেন। এই সমিতির একখানি ছবি ভারতীতে প্রকাশিত হইল।

জাপান রাজপ্রাসাদে রমণী।—জাপান সম্রাটের প্রাসাদে প্রায় তিন শত রমণী সহচরী আছে। তাহারা পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত। তাহাদের মধ্যে যাহারা প্রধান তাহাদের "দানা-সান" (প্রভু) বলে এবং তাহাদের অধীনস্থ সকলকে 'শিমিও' বা সহচরী বলে। দানাদের প্রত্যেকের পাঁচটি হইতে আটটি গৃহ আছে, এবং প্রত্যেকের চারিজন করিয়া 'শিমিও' বা অধীনা সহচরী আছে।

কতকগুলি 'দানা'কে প্রভাত ৮টা হইতে রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত সম্রাট ও সম্রাজ্ঞীর কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিতে হয় এবং তাঁহাদের নিকট উপস্থিত থাকিতে হয়। এই

সকল 'দাদা'দিগের নিত্য জীবন এত কঠোর নিয়ম ও শাসনের অধীন যে তাহারা বন্দিনীর অপেক্ষাও পরাধীন।

'শিমিও'গণ অতি প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ করিয়া গৃহসকল পরিচ্ছন্ন করিয়া, স্নানের ও বেশ পরিবর্তনের সমস্ত আয়োজন ঠিক করিয়া রাখে। 'দাদা'গণ শয্যাত্যাগ করিয়া এক ঘণ্টাকালের মধ্যে স্নানাদি সম্পন্ন করিয়া আহার করিতে বসেন। রাজপ্রাসাদের রমণীগণ যথেচ্ছ সকল বস্তুই আহার করিতে পারেন, কেবল পলাণ্ডু ভক্ষণ নিষেধ। পলাণ্ডুর গন্ধটা তাঁহাদের নিকট বড়ই অপ্রীতিকর। পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার প্রতি ইঁহাদের বিশেষ দৃষ্টি। রাজপ্রাসাদে নিযুক্ত হইবার পক্ষে দুইটি বিশেষ গুণ থাকা আবশ্যক—অধ্যবসায় ও আত্মসুখ ত্যাগ। নীচ বংশে জন্মগ্রহণ করিলে কোনও ক্ষতি হয় না। সেলাই করা, পাঠ করা, রন্ধন করা, পুষ্পগুচ্ছ প্রস্তুত করা এবং রাজোদ্যানে ভ্রমণ করা তাহাদের নিত্য বিশ্রাম ও ব্যায়াম।

রাজ্যের কথা।

ভারতের কলঙ্ক।—ইংলণ্ডে সে দিন মদনলাল ধিঙরা নামে একটি পাঞ্জাবী বালক সার কর্জ্জন-উইলিকে ভারতসভায় অধিবেশন স্থলে গুলি করিয়া হত্যা করিয়াছে। সার উইলিকে রক্ষা করিতে গিয়া লালকাকা নামে একটি বম্বের পার্সী ডাক্তারও হত হইয়াছেন। ছল বলে শত্রু নিধনও আর্য্য ধর্ম্ম নহে। যুদ্ধের সময়েও ভারতবাসী চিরদিনই ধর্ম্মযুদ্ধ করিয়াছেন। হিংসার সম্মুখেও ধর্ম্মকে আদর্শ রাখিয়া কতবার ভারতবাসী তাহার রাজ্য, ধন ও জীবন পর্য্যন্ত অকাতরে দান করিয়াছেন। হায়! সেই ধর্ম্মপ্রাণ ভারতসন্তান আজ কিনা চিরন্তন আদর্শ ধর্ম্ম বিস্মৃত হইয়া এরূপ কাপুরুষোচিত অধর্ম্মাচরণে ভারতের শুভ্রোজ্জ্বল যশোরাশিকে কলঙ্কিত করিল! আরো দুঃখের বিষয়—অ্যানার্কিষ্ট বালকগণ এইরূপ হত্যাকে অধর্ম্ম বলিয়াই মনে করে না। বিচারস্থলে ধিংরা বলিয়াছে এই হত্যা খুননামে অভিহিত হইতে পারে না। ধিংরার পকেটেও নাকি এই মর্ম্মের একখানি কাগজ পাওয়া গিয়াছে যে ইংরাজ ন্যায়পরায়ণ রাজা নহেন,—অতএব যে কোন উপায়ে হউক ভারতহিতৈষী মাত্রেরই তাহাদের দেশ তাড়িত করিতে চেষ্টা করা উচিত। এরূপ বদ্ধমূল অন্ধ বিশ্বাসের নিকট ধর্ম্মনীতি স্থান পাইতে পারে না। এই প্রসঙ্গে একটি গল্প বলিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিতেছি না। একবার শাক্ত-বৈষ্ণবে মাছ মাংস ভক্ষণ সম্বন্ধে একটি বিষম তর্ক বাধিয়া যায়। বৈষ্ণব বলিল, মাছ মাংস ভক্ষণ অত্যন্ত মন্দ।

শাক্ত। আমরা বলি খুব ভাল।

বৈষ্ণব। শাস্ত্রে ইহা নিষিদ্ধ।

শাক্ত। আমাদের শাস্ত্রে ইহা বিহিত।

বৈষ্ণব। মাছ মাংস ভক্ষণে পরলোকে তোমার নিশ্চয় অধোগতি হইবে।

শাক্ত। আমরা বেশ জানি ইহাতেই আমাদের সুগতি হইবে।

এইরূপ কথা কাটাকাটির পর শাক্ত বলিলেন "দেখ তোমার শাস্ত্রে যাহা নিষিদ্ধ, আমার শাস্ত্রে তাহাই প্রসিদ্ধ, তোমার শাস্ত্রে যাহা পাপ আমার শাস্ত্রে তাহাই পুণ্য—অতএব ঐ তর্কে পরলোক আমাদের উভয়ের পক্ষেই সমান আশাজনক, তবে অধিকন্তু মাছ মাংস ভক্ষণে ইহলোকের সুখেও আমি বঞ্চিত নহি, ইহা প্রত্যক্ষ সুখ—ইহাতে মতভেদ নাই।

আমরাও বলি, উক্তরূপ হত্যার পরোক্ষ ফল যাহাই হউক প্রত্যক্ষ ফল আমরা কি দেখিতেছি? দেখিতেছি তাহা দেশের পক্ষে অতিশয় অমঙ্গলজনক। সেই হত্যার সময় যখন সকলে লর্ড উইলির জন্য হাহুতাশ করিতেছিলেন, সেই সময় একটি ভারতবাসী ছাত্র বলিয়া উঠিয়াছিল,—উহার জন্য হাহুতাশ করিতেছ কেন? যদি কাঁদিতে হয় ত ভারতবাসীর জন্য কাঁদ। কথাটা অত্যন্ত ঠিক। এইরূপ এক একটি কার্য্যে

আমাদের দেশমঙ্গল আরও সুদূরপরাহত হইয়া পরিতেছে।

লর্ড রিপনের পরলোক গমন।—ভারতবর্ষের লক্ষ কোটি নরনারীর হৃদয় শোকাভিভূত করিয়া গত ১১ই জুলাই ভারতের ভূতপূর্ব্ব রাজপ্রতিনিধি লর্ড রিপন পরলোক গমন করিয়াছেন। পৃথিবী হইতে আজ আমরা তাঁহাকে হারাইয়াছি বটে, কিন্তু ভারতবাসীর অন্তর মধ্যে তাঁহার আসন অমর অক্ষয়রূপে চিরস্থাপিত। তাঁহার শুভ ইচ্ছা সার্থক না হইলেও তাঁহার উদারতা, ন্যায়পরায়ণতা ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠার গুণে, তাঁহার শাসনকাল ভারতবর্ষের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত। বেণ্টিঙ্ক ও ক্যানিংএর পর তাঁহার ন্যায় উচ্চপ্রাণ রাজপ্রতিনিধি আর কেহ ভারতে পদার্পণ করেন নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ভারতশাসন হইতে অবসরগ্রহণ করার পর হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তিনি সকল সময়েই ভারতের ত্রিশকোটী নিঃসহায় প্রজার যথার্থ মঙ্গল-চেষ্টায় রত ছিলেন। তাঁহার ন্যায় তেজস্বী ও ধর্ম্মপ্রাণ বন্ধুর স্মৃতি ভারতবাসী কখনও বিস্মৃত হইবে না। এক্ষণে তাঁহাকে হারাইয়া আমরা তাঁহার সেই পবিত্র স্মৃতিকে হৃদয়ের ভক্তি ও ভালবাসার অর্ঘ্য-প্রদান করিব।

চিত্র-ব্যাখ্যা।

বিরহিণী যক্ষ-পত্নী। জাপানী চিত্রকর শ্রীযুক্ত কাৎসুতা কর্ত্তৃক অঙ্কিত চিত্রের প্রতিলিপি।

"দূর বাতায়নে যথা
বিরহিণী ছিল শুয়ে ভূতল-শয়নে
মুক্তকেশে, ম্লানবেশে, সজল নয়নে"—

এবং তাঁহার

"হস্তন্যস্তং মুখমসকলব্যক্তি লম্বালকত্বাৎ"

অবস্থা চিত্রকর চিত্রিত করিয়াছেন। হস্তন্যস্ত মুখের উপর আগুলম্ব রুক্ষ অলক ঝুলিয়া পড়িয়াছে; যদি স্বপ্নেও কোনো প্রকারে প্রিয়মিলন হয় এই আশায় নিমীলিতাক্ষী বিরহিণী নিদ্রা আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন।

এই চিত্রে একটি বিরহজাগরক্লিশ ভাব-তন্ময় সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠিয়াছে। রূপসী যক্ষ-নারী "জাতাং মন্যে শিশিরমথিতাং পদ্মিনীং বান্যরূপাম্।" যক্ষনারীর পশ্চাতে সূক্ষ্ম তিরস্করিণীর ভিতর দিয়া মুক্ত বাতায়ন দেখা যাইতেছে। বিরহী-যক্ষ এই বাতায়ন পথেই—

"বন্ধন-বিহীন
নবমেঘ-পক্ষ-পরে করিয়া আসীন
পাঠাতে চাহিয়াছিল প্রেমের বারতা
অশ্রু-বাষ্পভরা।"

যক্ষনারীর অযত্নবিক্ষিপ্ত বসনের কুঞ্চিত স্তরনির্দ্দেশ (drapery) চিত্রখানিকে একটি বিচিত্র সৌন্দর্য্য দান করিয়াছে।

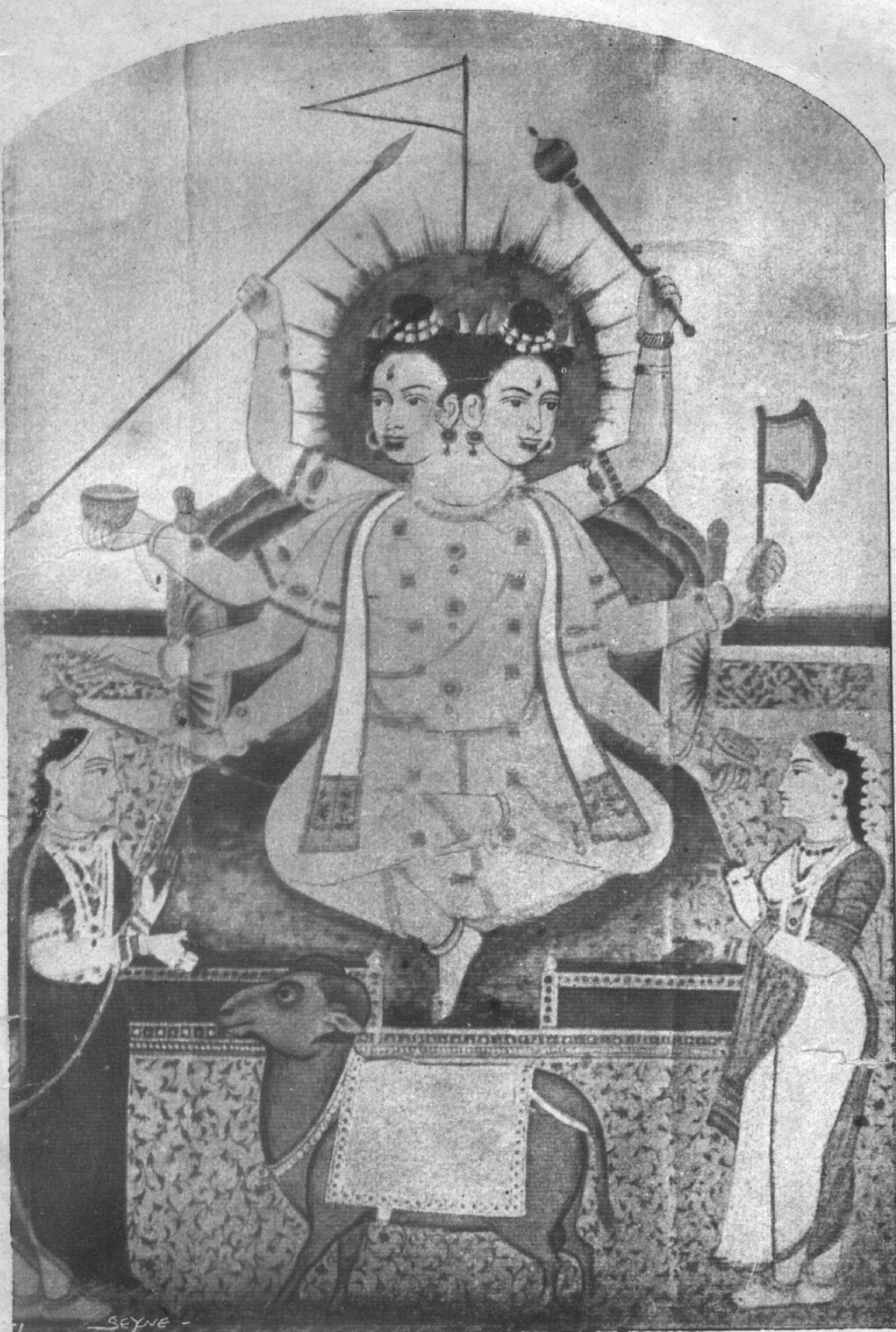
"বর্ষা এলায়েছে তার মেঘময় বেণী"—

এমনি দিনে কত বর্ষ পূর্ব্বে একজন কবি বিশ্বের বিরহ ব্যথাকে ভাব-মূর্ত্তি দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন আর আজ কতকাল পরে একজন শিল্পী সেই কবির পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া সেই ভাবকে রূপ দিবার চেষ্টা করিয়াছেন।

মন্দির-পথে—শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদার কর্ত্তৃক অঙ্কিত চিত্রের প্রতিলিপি। একটি শুচিস্নাতা তরুণী ভক্তিগদ্গদমুখে পূজাসম্ভার লইয়া মন্দিরসোপানে উঠিতেছেন—দূরে দিকচক্রবালে প্রভাতের মেঘস্তর ভেদ করিয়া অরুণ উদিত হইতেছে। আকাশে বিশ্বেশ্বরের আরতি-প্রদীপ জ্বলিয়া উঠিয়াছে, আলোকে পুলক জাগিয়াছে, বাতাসে বেণু বীণা বাজিয়া উঠিয়াছে, নিখিল জগতের ভক্তি মূর্ত্তিপরিগ্রহ করিয়া বিশ্বমন্দিরে প্রবেশ করিতেছেন, ইহাই শিল্পীর বর্ণনীয় বিষয়।

শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

কলিকাতা, ২০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত ও ৪৪, ওল্ড বালিগঞ্জ রোড হইতে শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।



ব্রহ্মরূপ অগ্নিদেবতা



চৈতন্য

শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু কর্ত্তৃক অঙ্কিত চিত্র হইতে

আর্য্য আদর্শ ও গুণত্রয়।

আষাঢ় মাসের ভারতীতে কারাগৃহ ও স্বাধীনতা-শীর্ষক প্রবন্ধে আমি কয়েকজন নিরপরাধী কয়েদীর মানসিক ভাব বর্ণনা করিয়া ইহাই প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছি যে, আর্য্যশিক্ষার গুণে কারাবাসেও ভারতবাসীর আন্তরিক স্বাধীনতারূপ মহামূল্য পৈতৃকসম্পত্তি বিনষ্ট হয় না—উপরন্তু ঘোর অপরাধীর মধ্যেও সেই সহস্রবর্ষ সঞ্চিত আর্য্য-চরিত্রগত দেবভাবও ভগ্নাবশিষ্টরূপে বর্ত্তমান থাকে। আর্য্যশিক্ষার মূলমন্ত্র সাত্ত্বিক ভাব। যে সাত্ত্বিক, সে বিশুদ্ধ। সাধারণতঃ মনুষ্যমাত্রেই অশুদ্ধ। রজোগুণের প্রাবল্যে, তমোগুণের ঘোর নিবিড়তায় এই অশুদ্ধি পরিপুষ্ট ও বর্দ্ধিত হয়। মনের মালিন্য দুই প্রকার,—জড়তা, বা অপ্রবৃত্তিজনিত মালিন্য; ইহা তমোগুণপ্রসূত। ২য়;—উত্তেজনা,বা কুপ্রবৃত্তি-জনিত মালিন্য; ইহা রজোগুণপ্রসূত। তমোগুণের লক্ষণ অজ্ঞানমোহ, বুদ্ধির স্থূলতা, চিন্তার অসংলগ্নতা, আলস্য, অতিনিদ্রা, কর্ম্মে আলস্যজনিত বিরক্তি, নিরাশা, বিষাদ, ভয়, এক কথায় যাহা কিছু নিশ্চেষ্টতার পরিপোষক তাহাই। জড়তা ও অপ্রবৃত্তি অজ্ঞানের ফল, উত্তেজনা ও কুপ্রবৃত্তি ভ্রান্ত জ্ঞানসম্ভূত। কিন্তু তমোমালিন্য অপনোদন করিতে হইলে রজোগুণের উদ্রেকদ্বারাই তাহা দূর করিতে হয়। রজোগুণই প্রবৃত্তির কারণ এবং প্রবৃত্তিই নিবৃত্তির প্রথম সোপান। যে জড়, সে নিবৃত্ত নয়,—জড়ভাব জ্ঞানশূন্য; আর জ্ঞানই নিবৃত্তির মার্গ। কামনাশূন্য হইয়া যে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, সে নিবৃত্ত; কর্ম্মত্যাগ নিবৃত্তি নয়। সেই জন্য ভারতের ঘোর তামসিক অবস্থা দেখিয়া স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন, "রজোগুণ চাই, দেশে কর্ম্মবীর চাই, প্রবৃত্তির প্রচণ্ড স্রোত বহুক। তাহাতে যদি পাপও আসিয়া পড়ে, তাহাও এই তামসিক নিশ্চেষ্টতা অপেক্ষা সহস্রগুণে ভাল।"

সত্যই আমরা ঘোর তমোমধ্যে নিমগ্ন হইয়া সত্ত্বগুণের দোহাই দিয়া মহাসাত্ত্বিক সাজিয়া বড়াই করিতেছি। অনেকের এই মত দেখিতে পাই যে, আমরা সাত্ত্বিক বলিয়াই রাজসিক জাতি সকলদ্বারা পরাজিত, সাত্ত্বিক বলিয়া এইরূপ অবনত ও অধঃপতিত। তাঁহারা এই যুক্তি দেখাইয়া খৃষ্টধর্ম্ম হইতে হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করিতে সচেষ্ট। খৃষ্টান জাতি প্রত্যক্ষফলবাদী, তাঁহারা ধর্ম্মের ঐহিক ফল দেখাইয়া ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করেন; তাঁহারা বলেন—খৃষ্টান জাতিই জগতে প্রবল অতএব খৃষ্টান ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। আর আমাদের মধ্যে অনেকে বলেন—ইহা ভ্রম; ঐহিক ফল দেখিয়া ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা নির্ণয় করা যায় না, পারলৌকিক ফল দেখিতে হয়; হিন্দুরা অধিক ধার্ম্মিক বলিয়া, অসুরপ্রকৃতি বলবান পাশ্চাত্যজাতির অধীন হইয়াছে। কিন্তু এই যুক্তির মধ্যে আর্য্যজ্ঞানবিরোধী ঘোর ভ্রম নিহিত। সত্ত্বগুণ কখনই অবনতির কারণ হইতে পারে না, এমন কি সত্ত্বপ্রধান জাতি দাসত্ব-শৃঙ্খলিত

হইয়া থাকিতে পারে না। ব্রহ্মতেজই সত্ত্বগুণের মুখ্য ফল, ক্ষত্রতেজ ব্রহ্মতেজের ভিত্তি। আঘাত পাইলে শান্ত ব্রহ্মতেজ হইতে ক্ষত্রতেজের স্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়, চারিদিক জ্বলিয়া উঠে। যেখানে ক্ষত্রতেজ নাই, সেখানে ব্রহ্মতেজ টিঁকিতে পারে না। দেশে যদি একজন প্রকৃত ব্রাহ্মণ থাকে সে একশ ক্ষত্রিয় সৃষ্টি করে। দেশের অবনতির কারণ সত্ত্বগুণের আতিশয্য নয়, রজোগুণের অভাব, তমোগুণের প্রাধান্য। রজোগুণের অভাবে আমাদের অন্তর্নিহিত সত্ত্ব ম্লান হইয়া তমোমধ্যে গুপ্ত হইয়া পড়িল। আলস্য, মোহ, অজ্ঞান, অপ্রবৃত্তি, নিরাশা বিষাদ নিশ্চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে দেশের দুর্দ্দশা অবনতিও বৰ্দ্ধিত হইতে লাগিল। এই মেঘ প্রথমে লঘু ও বিরল ছিল, কালের গতিতে ক্রমশ এতদূর নিবিড়তর হইয়া পড়িল, অজ্ঞান অন্ধকারে ডুবিয়া আমরা এমন নিশ্চেষ্ট ও মহত্তাকাঙ্ক্ষাবৰ্জ্জিত হইয়া পড়িলাম যে ভগবৎপ্রেরিত মহাপুরুষগণের উদয়েও সেই অন্ধকার পূর্ণ তিরোহিত হইল না। তখন সূর্য্য ভগবান রজোগুণ জনিত প্রবৃত্তিদ্বারা দেশরক্ষার সংকল্প করিলেন।

জাগ্রত রজঃশক্তি প্রচণ্ডভাবে কার্য্যকরী হইলে তমঃ পলায়নোন্মত হয় বটে কিন্তু অন্যদিকে স্বেচ্ছাচার, কুপ্রবৃত্তি ও উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খলতা প্রভৃতি আসুরিক ভাব আসিবার আশঙ্কা। রজঃশক্তি যদি স্ব স্ব প্রেরণায় উন্মত্ততার বিশাল প্রবৃত্তির উদরপূরণকেই লক্ষ্য করিয়া কার্য্য করে, তাহা হইলে এই আশঙ্কার যথেষ্ট কারণও আছে। রজোগুণ উচ্ছৃঙ্খল ভাবে অগ্রগামী হইলে অধিককাল টিঁকিতে পারে না, ক্লান্তি আসে, তমঃ আসে, প্রচণ্ড ঝটিকার পরে আকাশ নির্ম্মল পরিষ্কার না হইয়া মেঘাচ্ছন্ন বায়ুস্পন্দন রহিত হইয়া পড়ে। রাষ্ট্রবিপ্লবের পরে ফ্রান্সের এই পরিণাম হইয়াছে। সেই রাষ্ট্রবিপ্লবে রজোগুণের ভীষণ প্রাদুর্ভাব, বিপ্লবান্তে তামসিকতার অল্পাধিক পুনরুত্থান, আবার রাষ্ট্রবিপ্লব, আবার ক্লান্তি, শক্তিহীনতা, নৈতিক অবনতি, ইহাই গত শতবর্ষে ফ্রান্সের ইতিহাস। যতবার স্বাধীনতা সাম্য মৈত্রীরূপ আদর্শজনিত সাত্ত্বিক প্রেরণা ফ্রান্সের প্রাণে জাগিয়াছে, ততবারই ক্রমশ রজোগুণ প্রবল হইয়া সত্ত্বসেবাবিমুখ আসুরিক ভাবে পরিণতিলাভ করিয়া স্বপ্রবৃত্তিপূরণে যত্নবান হইয়াছে। ফলতঃ, তমোগুণের পুনরাবির্ভাবে ফ্রান্স তাহার পূর্ব্ব সঞ্চিত মহাশক্তি হারাইয়া মৃয়মাণ বিষম অবস্থায় হরিশ্চন্দ্রের মত না স্বর্গে না মর্ত্ত্যে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। এইরূপ পরিণাম এড়াইবার একমাত্র উপায় প্রবল রজঃশক্তিকে সত্ত্বসেবায় নিযুক্ত করা। যদি সাত্ত্বিক ভাব জাগ্রত হইয়া রজঃশক্তির চালক হয়, তাহা হইলে তমঃগুণের পুনঃ প্রাদুর্ভাবের ভয়ও নাই, উদ্দামশক্তিও শৃঙ্খলিত নিয়ন্ত্রিত হইয়া উচ্চ আদর্শের বশে দেশের ও জগতের হিতসাধন করে। সত্ত্বোদ্রেকের উপায় ধর্ম্মভাব;—স্বার্থকে ডুবাইয়া পরার্থে সমস্ত শক্তি অর্পণ,—ভগবানকে আত্মসমর্পণ করিয়া সমস্ত জীবনকে এক মহা ও পবিত্র যজ্ঞে পরিণত করা। গীতায় কথিত আছে সত্ত্বরজঃ উভয়ে তমো নাশ করে; একা সত্ত্ব কখন তমঃকে পরাজয় করিতে পারে না। সেই জন্য ভগবান অধর্ম্ম ধর্ম্মের পুনরুত্থান করাইয়া

আমাদের অন্তর্নিহিত সত্ত্বকে জাগাইয়া পরে রজঃশক্তিকে দেশময় ছড়াইয়া দিয়াছেন। রামমোহন রায় প্রভৃতি ধর্ম্মোপদেশক মহাত্মাগণ সত্ত্বকে পুনরুদ্দীপিত করিয়া নবযুগ প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। ঊনবিংশ শতাব্দিতে ধর্ম্মজগতে যেমন জাগরণ হইয়াছিল, রাজনীতি বা সমাজে তেমন হয় নাই। কারণ ক্ষেত্র প্রস্তুত ছিল না, সেই জন্য প্রচুর বীজ বপিত হইয়াও শস্য দেখা দেয় নাই। ইহাতেও ভারতবর্ষের উপর ভগবানের দয়া ও প্রসন্নতা বুঝা যায়। রাজসিক ভাব প্রসূত জাগরণ কখনও স্থায়ী বা পূর্ণকল্যাণপ্রদ হইতে পারে না। তৎপূর্ব্বে জাতির অন্তরে কতকাংশে ব্রহ্মতেজ উদ্দীপিত হওয়া আবশ্যক। সেইজন্য এতদিন রজঃশক্তির স্রোত রুদ্ধ ছিল। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে রজঃশক্তির যে বিকাশ হইয়াছে তাহা সাত্ত্বিক ভাব পূর্ণ। এই নিমিত্ত ইহাতে যে উদ্দামভাব দেখা গিয়াছে তাহাতেও আশঙ্কার বিশেষ কারণ নাই, কেননা ইহা রজঃসাত্ত্বিকের খেলা; এ খেলায় যাহা কিছু উদ্দাম বা উচ্ছৃঙ্খল ভাব তাহা অচিরে নিয়মিত ও শৃঙ্খলিত হইবেই। বাহ্যশক্তি দ্বারা নহে ভিতরে যে ব্রহ্মতেজ, যে সাত্ত্বিকভাব, তাহাদ্বারাই ইহা বশীভূত ও নিয়মিত হইবে। ধর্ম্মভাব প্রচার করিয়া আমরা সেই ব্রহ্মতেজ ও সাত্ত্বিকভাবের পোষকতা করিতে পারি মাত্র।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি পরার্থে সর্ব্বশক্তি নিয়োগ করা সত্ত্বোদ্রেকের এক উপায়। আর আমাদের রাজনীতিক জাগরণে এই ভাবের যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু এই ভাব রক্ষা করা কঠিন। যেমন ব্যক্তির পক্ষে কঠিন জাতির পক্ষে আরও কঠিন। পরার্থের মধ্যে স্বার্থ অলক্ষিতভাবে ছুটিয়া আসে এবং যদি আমাদের বুদ্ধি বিশুদ্ধ না হয়, এমন ভ্রমে পতিত হইতে পারি যে আমরা পরার্থের দোহাই দিয়া স্বার্থকে আশ্রয় করিয়া পরহিত, দেশহিত, মনুষ্যজাতির হিত ডুবাইব অথচ নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিব না। ভগবৎসেবা সত্ত্বোদ্রেকের অন্য উপায়। কিন্তু সেই পথেও হিতে বিপরীত হইতে পারে, ভগবৎসান্নিধ্যরূপ আনন্দ পাইয়া আমাদের সাত্ত্বিক-নিশ্চেষ্টতা জমিতে পারে, সেই আনন্দের আস্বাদ ভোগ করিতে করিতে দুঃখকাতর দেশের প্রতি ও মানবজাতির সেবায় পশ্চাৎমুখ হইতে পারি। ইহাই সাত্ত্বিকভাবের বন্ধন। যেমন রাজসিক অহংকার আছে, তেমনি সাত্ত্বিক অহঙ্কারও আছে। যেমন পাপ মনুষ্যকে বদ্ধ করে, তেমনই পুণ্যও বদ্ধ করে। সম্পূর্ণ বাসনা শূন্য হইয়া অহঙ্কার ত্যাগ পূর্ব্বক ভগবানকে আত্মসমর্পণ না করিলে পূর্ণ স্বাধীনতা নাই। এই দুটী অনিষ্ট ত্যাগ করিতে হইলে প্রথম বিশুদ্ধ বুদ্ধির দরকার। দেহাত্মক বুদ্ধি বর্জ্জন করিয়া মানসিক স্বাধীনতা অর্জ্জন করাই বুদ্ধি শোধনের পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থা। মন স্বাধীন হইলে জীবের আয়ত্ত হয়, পরে মনকে জয় করিয়া বুদ্ধির আশ্রয়ে মানুষ স্বার্থের হাত হইতে অনেকটা পরিত্রাণ লাভ করে। ইহাতেও স্বার্থ সম্পূর্ণভাবে আমাদিগকে ত্যাগ করে না। শেষ স্বার্থ মুমুক্ষুত্ব, পরদুঃখকে ভুলিয়া নিজের আনন্দে ভোর হইয়া থাকিবার ইচ্ছা। ইহাও ত্যাগ করিতে হয়। সর্ব্বভূতে নারায়ণকে উপলব্ধি করিয়া সেই সর্ব্বভূতস্থ নারায়ণের সেবা ইহার ঔষধ; ইহাই সত্ত্বগুণের পরাকাষ্ঠা। ইহা হইতেও উচ্চতর অবস্থা আছে, তাহা সত্ত্বগুণকেও অতি-

ক্রম করিয়া গুণাতীত হইয়া সম্পূর্ণভাবে ভগবানকে আশ্রয় করা। গুণাতীত্যের বর্ণনা গীতায় কথিত আছে, যেমন

নান্যং গুণেভ্যঃ কর্ত্তারং যদা দ্রষ্টানুপশ্যতি।
গুণেভ্যশ্চ পরং বেত্তি মদ্ভাবং সোঽধিগচ্ছতি॥
গুণানেতানতীত্য ত্রীন্ দেহী দেহসমুদ্ভবান্।
জন্মমৃত্যুজরাদুঃখৈর্বিমুক্তোঽমৃতমশ্নুতে॥
প্রকাশঞ্চ প্রবৃত্তিঞ্চ মোহমেব চ পাণ্ডব।
ন দ্বেষ্টি সংপ্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাঙ্ক্ষতি॥
উদাসীনবদাসীনো গুণৈর্যো ন বিচাল্যতে।
গুণা বর্ত্তন্ত ইত্যেবং যোঽবতিষ্ঠতি নেঙ্গতে॥
সমদুঃখসুখঃ স্বস্থঃ সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ।
তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ো ধীরস্তুল্যনিন্দাত্মসংস্তুতিঃ॥
মানাপমানয়োস্তুল্যস্তুল্যো মিত্রারিপক্ষয়োঃ।
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে॥
মাঞ্চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে।

"যখন জীব সাক্ষী হইয়া গুণত্রয় অর্থাৎ ভগবানের ত্রৈগুণ্যময়ী শক্তিকেই একমাত্র কর্ত্তা বলিয়া দেখে এবং এই গুণত্রয়েরও উপর শক্তির প্রেরক ঈশ্বরকে জানিতে পারে, তখন সে-ই ভগবৎসাধর্ম্ম্য লাভ করে। তখন দেহস্থ জীব স্থূল ও সূক্ষ্ম এই দুই প্রকার দেহসম্ভূত গুণত্রয়কে অতিক্রম করিয়া জন্ম মৃত্যু জরাদুঃখ হইতে বিমুক্ত হইয়া অমরত্ব ভোগ করে। সত্ত্বজনিত জ্ঞান, রজোজনিত প্রবৃত্তি বা তমোজনিত নিদ্রা নিশ্চেষ্টা ভ্রমস্বরূপ মোহ আসিলে বিরক্ত হয় না, এই গুণত্রয়ের আগমন নির্গমনে সমান ভাব রাখিয়া উদাসীনের ন্যায় স্থির হইয়া থাকে, গুণগ্রাম তাহাকে বিচলিত করিতে পারে না, এই সবই গুণের স্বধর্ম্মজাত বৃত্তি বলিয়া দৃঢ় থাকে। যাহার পক্ষে সুখদুঃখ সমান, প্রিয়াপ্রিয় সমান, নিন্দাস্তুতি সমান, কাঞ্চন লোষ্ট্র উভয়ই প্রস্তরের তুল্য, যে ধীরস্থির নিজের মধ্যে অটল, যাহার নিকট মান অপমান একই, মিত্রপক্ষ ও শত্রুপক্ষ সমান প্রিয়, যে স্বয়ং প্রেরিত হইয়া কোনও কার্য্যারম্ভ করে না, সকল কর্ম্ম ভগবানকে সমর্পণ করিয়া তাঁহারই প্রেরণায় কর্ম্ম করে, তাহাকেই গুণাতীত বলে। যে আমাকে নির্দ্দোষ ভক্তিযোগে সেবা করে, সেই এই তিন গুণকে অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপযুক্ত হয়।" এই গুণাতীত অবস্থা লাভ সকলের সাধ্য না হইলেও তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থা লাভ সত্ত্বপ্রধান পুরুষের অসাধ্য নহে। সাত্ত্বিক অহংকারকে ত্যাগ করিয়া জগতের সকল কার্য্যে ভগবানের ত্রৈগুণ্যময়ী শক্তির লীলা দেখা ইহার সর্ব্বপ্রথম উপক্রম। ইহা বুঝিয়া সাত্ত্বিক কর্ত্তা কর্তৃত্ব-অভিমান ত্যাগে ভগবানে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক কর্ম্ম করেন।

গুণত্রয় ও গুণাতীত্য সম্বন্ধে যাহা বলিলাম, তাহা গীতার মূল কথা। কিন্তু এই শিক্ষা সাধারণতঃ গৃহীত হয় নাই, আজ পর্য্যন্ত যাহাকে আমরা আর্য্যশিক্ষা বলি, তাহা প্রায় সাত্ত্বিক গুণের অনুশীলন। রজোগুণের আদর এই দেশে ক্ষত্রিয়জাতির লোপে লুপ্ত হইয়াছে। অথচ জাতীয় জীবনে রজঃশক্তিরও নিরতিশয় প্রয়োজন আছে। সেইজন্যে গীতার দিকে লোকের মন আজকাল আকৃষ্ট হইয়াছে। গীতার শিক্ষা পুরাতন আর্য্যশিক্ষাকে ভিত্তি করিয়াও অতিক্রম করিয়াছে। গীতোক্ত ধর্ম্ম রজোগুণকে ভয় করে না, তাহাতে রজঃশক্তিকে সত্ত্বসেবায় নিযুক্ত করিবার পন্থা আছে, প্রবৃত্তিমার্গে মুক্তির উপায় প্রদর্শিত আছে। এই ধর্ম্ম অনুশীলনের জন্যে জাতির মন

কিরূপে প্রস্তুত হইতেছে, তাহা জেলেই প্রথম হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলাম। এখনও স্রোত নির্ম্মল হয় নাই, এখনও কলুষিত ও আবিল, কিন্তু অতিরিক্ত বেগ যখন অল্প প্রশমিত হইবে, তখন তাহার মধ্যে যে বিশুদ্ধ শক্তি লুক্কায়িত, তাহার নিখুঁত কার্য্য হইবে।

যাঁহারা আমার সঙ্গে বন্দী ও এক অভিযোগে অভিযুক্ত, তাঁহাদের মধ্যে অনেকে নির্দ্দোষী বলিয়া মুক্তি পাইয়াছেন, আর সকলে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত বলিয়া দণ্ডিত, কিন্তু মোকদ্দমা আপীলে বিচারাধীন। তাঁহাদের দোষের সম্বন্ধে কোন বিচার করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। মানবসমাজে হত্যা হইতে গুরুতর অপরাধ হইতে পারে না। জাতীয় স্বার্থপ্রণোদিত হইয়া যে হত্যা করে, তাহার ব্যক্তিগত চরিত্র কলুষিত না হইতে পারে কিন্তু তাহাতে সামাজিক হিসাবে অপরাধের গুরুত্ব লাঘব হইল না। ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে হত্যার ছায়া অন্তরাত্মায় পড়িলে মনে যেন রক্তের দাগ বসিয়া থাকে, ক্রূরতার সঞ্চার হয়। ক্রূরতা বর্ব্বরোচিত গুণ, মনুষ্য উন্নতির ক্রমবিকাশে যে সকল গুণ হইতে অল্পে অল্পে বর্জ্জিত হইতেছে, সেই সকলের মধ্যে ক্রূরতা প্রধান। ইহা সম্পূর্ণ বর্জ্জন করিতে পারিলে মানবজাতির উন্নতির পথে একটী বিঘ্নকর কণ্টক উন্মূলিত হইয়া যাইবে। বিচারাধীন আসামীর দোষ ধরিয়া লওয়া অন্যায় সেইজন্যে এইমাত্র বলিয়া ক্ষান্ত হইলাম যে যদি এই দোষ প্রমাণিত হয়, তাহা হইলেও ইহা বুঝিতে হইবে যে, ইহা রজঃশক্তির ক্ষণিক উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খলতা মাত্র। তাহাদের মধ্যে এমন সাত্ত্বিক শক্তি নিহিত যে এই ক্ষণিক উচ্ছৃঙ্খলতার দ্বারা দেশের স্থায়ী অমঙ্গল সাধিত হইবার কোনও আশঙ্কা নাই।

অন্তরের যে স্বাধীনতার কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি, আমার সঙ্গীগণের সে স্বাধীনতা স্বভাবসিদ্ধ গুণ। যে কয়েকদিন আমরা এক সঙ্গে এক বৃহৎ দালানে রক্ষিত ছিলাম, আমি তাঁহাদের আচরণ ও মনের ভাব বিশেষ মনোযোগের সহিত লক্ষ্য করিয়াছি। দুইজন ভিন্ন কাহারও মুখে বা কথায় ভয়ের ছায়া পর্য্যন্ত দেখিতে পাই নাই। প্রায় সকলেই তরুণ বয়স্ক, অনেকে অল্প বয়স্ক বালক, যে অপরাধে ধৃত-সাব্যস্ত হইলে তাহার দণ্ড যেরূপ ভীষণ তাহাতে দৃঢ়মতি পুরুষেরও বিচলিত হইবার কথা। আর ইহারা বিচারে খালাস হইবার আশাও বড় রাখিতেন না। বিশেষতঃ ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্টে সাক্ষী ও লেখাসাক্ষ্যের যেরূপ ভীষণ আয়োজন জমিতে লাগিল, তাহা দেখিয়া আইন অনভিজ্ঞ ব্যক্তির মনে সহজেই ধারণা হয় যে নির্দ্দোষীরও এই ফাঁদ হইতে নির্গমনের পথ নাই। অথচ তাঁহাদের মুখে ভীতি বা বিষণ্ণতার পরিবর্ত্তে কেবল প্রফুল্লতা, সরল হাস্য, নিজের বিপদকে ভুলিয়া ধর্ম্মের ও দেশের কথা। আমাদের ওয়ার্ডে প্রত্যেকের নিকটে দুই চারিখানি বই থাকায় একটী ক্ষুদ্র লাইব্রেরী জমিয়াছিল। এই লাইব্রেরীর অধিকাংশই ধর্ম্মের বই, গীতা, উপনিষদ, বিবেকানন্দের পুস্তকাবলী, রামকৃষ্ণের কথামৃত ও জীবনচরিত, পুরাণ, স্তবমালা, ব্রহ্মসঙ্গীত ইত্যাদি। অন্য পুস্তকের মধ্যে বঙ্কিমের গ্রন্থাবলী, স্বদেশী গানের অনেক বই, আর য়ুরোপীয় দর্শন, ইতিহাস ও সাহিত্য বিষয়ক ...

সকালে কেহ কেহ সাধনা করিতে বসিত, কেহ কেহ বই পড়িত, কেহ কেহ আস্তে গল্প করিত। সকালের এই শান্তিময় নীরবতায় মাঝে মাঝে হাসির লহরীও উঠিত। "কাচেরী" না থাকিলে কেহ কেহ ঘুমাইত, কেহ কেহ খেলা করিত—যে দিন যে খেলা যোটে; আসক্তি কাহারও নাই। কোন দিন মণ্ডলে বসিয়া কোন শান্ত খেলা;—কোন দিন বা দৌড়াদৌড়ি লাফালাফি। দিনকতক ফুটবল চলিল, ফুটবলটা অবশ্য অপূর্ব্ব উপকরণে গঠিত।—দিন কতক কানামাছিই চলিল। এক এক দিন ভিন্ন ভিন্ন দল গঠন করিয়া একদিকে জুৎজিৎষুশিক্ষা, অন্য দিকে উচ্চ লম্ফ ও দীর্ঘ লম্ফ আর একদিকে drafts বা দশ-পঁচিশ। দুই চারি জন গম্ভীর প্রৌঢ়লোক ভিন্ন সকলেই প্রায় বালকদের অনুরোধে এই সকল খেলায় যোগ দিতেন। দেখিলাম ইহাদের মধ্যে বয়স্ক লোকেরও বাল-স্বভাব। সন্ধ্যাবেলায় গানের মজলিস জমিত। উল্লাস, শচীন্দ্র, হেমদাস, যাহারা গানে সিদ্ধ, তাহাদের চারিদিকে আমরা সকলে বসিয়া গান শুনিতাম। স্বদেশী বা ধর্ম্মের গান, ব্যতীত অন্য কোনরূপ গান হইত না। এক এক দিন কেবল আমোদ করিবার ইচ্ছায় উল্লাসকর হাসির গান অভিনয়, Ventriloquism, অনুকরণ বা গেঁজেলের গল্প করিয়া সন্ধ্যা কাটাইত। উল্লাসকরের ন্যায় অদ্ভুত ক্ষমতাশালী ও অপূর্ব্ব চরিত্র লোক আমি আর কখনো দেখি নাই। শুনিয়াছিলাম বটে এমন লোক মাঝে মাঝে জন্মায় যাহার অন্তরাত্মায় মায়ার প্রভাব এত শিথিল যে সামান্য দেহের ধর্ম্ম ব্যতীত তাহার অন্য কোন বন্ধন নাই। "লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা"। এই উক্তির যাথার্থ্য ও প্রকৃত মর্ম্ম এবার উল্লাসকরের আচরণে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিলাম। সামান্য মানুষের ন্যায় কর্ম্ম করেন, হাসেন, গল্প করেন, খেলেন, ভুল করেন, ন্যায় করেন, অন্যায় করেন, অথচ ভিতরে সেই নির্ম্মল দেবভাব। গায়ে হাজার কাদা পড়িলেও তাহা গায়ে লাগিয়া থাকে না। আমাদের রাগ সুখ দুঃখ ভয় স্বার্থ হিংসা দ্বেষ তাঁহার জন্যে সৃষ্ট হয় নাই। তাহাঁর আছে প্রেম আনন্দ, হাস্য, পরোপকার, পরসেবা, ফুলের স্বভাবসিদ্ধ স্বচ্ছতা ও প্রফুল্লতা। উল্লাসকর এই প্রকৃতি বিশিষ্ট লোক। তাহার মধ্যে আমি কখনও লেশমাত্র ক্রোধ, দুঃখ, দৈন্য, বিকার, বিষণ্ণতা দেখি নাই। কিছুতেই আসক্তি নাই। তাঁহার নিকট যে যাহা চাহিত তাহা তাহাকে বিলাইয়া দিতেন, নিজের যেন কিছুই নহে। কোনও ভাবেও তিনি বদ্ধ নন। এইমাত্র সকলের মনোরঞ্জনার্থ হাসি তামাসা করিতেছিলেন, পরমুহূর্ত্তে দেখিলাম হঠাৎ ধ্যানমগ্ন হইয়া সব ভুলিয়া গিয়াছেন। কেহ ধ্যানভঙ্গ করিলেও তাহার আসে যায় না। হাসি মুখে তাহার আব্দার সহ্য করিতেন। সবই তাহার পক্ষে লীলা, যেমন সংসার, তেমনই জেল, যেমন নিবৃত্তি তেমনই প্রবৃত্তি। ভেদ নাই, বিকার নাই। এতদূর সাত্ত্বিক স্বাধীন ভাব অন্য সকলের মধ্যে না থাকিলেও প্রায় সকলেরই অল্পবিস্তর ছিল। মোকদ্দমায় কেহ মন দিত না, সকলেই ধর্ম্মে বা আনন্দে দিন কাটাইত। এই নিশ্চিন্তভাব কঠিন কুক্রিয়াভ্যস্ত হৃদয়ের পক্ষে অসম্ভব; তাহাদের মধ্যে কাঠিন্য,

ক্রূরতা, কুক্রিয়াসক্তি, কুটিলতা লেশমাত্র ছিল না। কি হাস্য কি কথা কি খেলা তাহাদের সকলই আনন্দময়, পাপহীন, প্রেমময়।

এই মানসিক স্বাধীনতার ফল অচিরে বিকাশপ্রাপ্ত হইতে লাগিল। এইরূপ ক্ষেত্রেই ধর্ম্মবীজ বপন হইলে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ফল সম্ভবে। যীশু কয়েকজন বালককে দেখাইয়া শিষ্যদিগকে বলিয়াছিলেন "যাহারা এই বালকদের তুল্য, তাঁহারাই ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন।" জ্ঞান ও আনন্দ সত্ত্বগুণের লক্ষণ। যাঁহারা দুঃখকে দুঃখ জ্ঞান করেন না, যাঁহারা সকল অবস্থায় আনন্দিত ও প্রফুল্লিত, তাঁহাদেরই যোগে অধিকার। জেলে রাজসিক ভাব প্রশ্রয় পায় না, আর নির্জ্জন কারাগারে প্রবৃত্তির পরিপোষক কিছুই নাই। এই অবস্থায় অসুরের মন চিরাভ্যস্ত রজঃশক্তির উপকরণের অভাবে আহত ব্যাঘ্রের ন্যায় নিজেকে নাশ করে। পাশ্চাত্য কবিগণ যাহাকে Eating one's own heart বলেন,সেই অবস্থা ঘটে। ভারতবাসীর মন সেই নির্জ্জনতায়, সেই বাহ্যিক কষ্টের মধ্যে চিরন্তন টানে আকৃষ্ট হইয়া ভগবানের নিকট ছুটিয়া যায়। আমাদের ইহাই ঘটিয়াছে। জানি না কোথা হইতে একটি স্রোত আসিয়া সকলকে ভাসাইয়া নিয়া গেল। যে কখনও ভগবানের নাম করে নাই, সেও সাধনা করিতে শিখিল। আর যেই পরমদয়ালুর দয়া অনুভব করিয়া আনন্দমগ্ন হইয়া পড়িল! অনেক দিনের অভ্যাসে যোগীর যাহা হয়, এই বালকদের দু চারি মাসের সাধনায় তাহা হইয়া গেল। রামকৃষ্ণ পরমহংস একবার বলিয়াছিলেন, "এখন তোমরা কি দেখছ—ইহা কিছুই নয়, দেশে এমন স্রোত আসছে যে, অল্প বয়সের ছেলে তিন দিন সাধনা করে সিদ্ধি পাবে।" এই বালকদিগকে দেখিলে তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণীর সফলতা সম্বন্ধে সন্দেহমাত্র থাকে না। ইহারা যেন সেই প্রত্যাশিত ধর্ম্ম প্রবাহের মূর্ত্তিমন্ত পূর্ব্বপরিচয়; এইসাত্ত্বিকভাবের তরঙ্গ কাঠগড়া বহিয়া চার পাঁচজন ভিন্ন অন্য সকলের হৃদয় মহানন্দে আপ্লুত করিয়া তুলিত। ইহার আস্বাদ যে একবার পাইয়াছে সে কখনও তাহা ভুলিতে পারে না এবং কখনও অন্য আনন্দকে ইহার তুল্য বলিয়া স্বীকার করিতে পারে না। এই সাত্ত্বিক ভাবই দেশের উন্নতির আশা। ভ্রাতৃভাব, আত্মজ্ঞান, ভগবৎপ্রেম যেমন সহজে ভারতবাসীর মনকে অধিকার করিয়া কার্য্যে প্রকাশ পায়; আর কোনও জাতির তেমন সহজে হওয়া সম্ভব নয়। চাই তমোবর্জ্জন, রজোদমন, সত্ত্বপ্রকাশ। ভারতবর্ষের জন্যে ভগবানের গূঢ় অভিসন্ধিতে তাহাই প্রস্তুত হইতেছে।

শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ।

স্বামী শীলানন্দ।

(ফেলিসিয়াঁ শালের ফরাসী হইতে)

কান্দি, সিংহল, ১০ই মার্চ ১৯০০।

একটি রমণীয় ক্ষুদ্র হ্রদ; এই হ্রদের গঠন অনুসরণ করিয়া, তাল-তরুছায়াচ্ছন্ন একটি সুন্দর লাল-বালির রাস্তা চলিয়াছে। স্বামী শীলানন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য, এই রাস্তা দিয়া আমি বৌদ্ধমঠে উপনীত হইলাম। আমার কার্ড ও একখানি পরিচয়-পত্র তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিলাম। লোকটির এখনও যুবা বয়স, মস্তক সম্পূর্ণরূপে মুণ্ডিত, বিপুল পীতবস্ত্রে দেহ আচ্ছাদিত।

আমার প্রদত্ত সাক্ষাৎকারের নাম-পত্র-খানি হস্তে ধারণ করিয়া এইভাবে কথার সূত্রপাত করিলেন:—"আপনি দর্শনের অধ্যাপক, পুনর্জন্মের সমস্যাটা কি আপনি ভাল করিয়া আলোচনা করিয়াছেন?" এই প্রশ্নে আমি একটু বিস্মিত হইলাম এবং স্বীকার করিলাম, এই গুরুতর সমস্যাটি আমাদের আলোচ্য তালিকার বহির্ভূত। এই কথায় শীলানন্দও বিস্মিত হইলেন। এই বিষয় সম্বন্ধে তাঁহার মতামত আমার নিকট ব্যাখ্যা করিতে আমি তাঁকে অনুরোধ করিলাম। তিনি প্রচলিত বৌদ্ধমত আমার নিকট বিবৃত করিলেন।

আমরা পূর্ব্বেও জন্মগ্রহণ করিয়াছি, আরও আমাদের অসংখ্যবার জন্মগ্রহণ করিতে হইবে। আমাদের জন্মিবার বাসনা, আমাদের জন্মের সহিত অনুস্যূত; মরিয়া আমরা পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করি, এবং পুনর্জন্মগ্রহণের জন্যই আবার আমরা মরি। কিরূপ যোনীতে আমরা জন্মগ্রহণ করিব তাহা আমাদের কর্ম্মের দ্বারাই নির্দ্ধারিত হয়। এই ভূলোকে কিংবা স্বর্গ-লোকে, আমরা উৎকৃষ্ট যোনীতে কিংবা নিকৃষ্ট যোনীতে জন্মগ্রহণ করিতে পারি। কি স্বর্গ, কি নরক—উভয়ই কিয়ৎকালের জন্য; উহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া আবার আমাদের নূতন জন্মগ্রহণ করিতে হইবে।

কিন্তু জন্মমাত্রেই দুঃখভোগ অনিবার্য্য। জন্মিলেই রোগগ্রস্ত হইতে হইবে, জরাগ্রস্ত হইতে হইবে, মরিতে হইবে। জীবনের অনিত্যতাবশতঃ আমাদিগকে দারুণ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। এই দুঃখযন্ত্রণা কিরূপে এড়াইতে পারা যায়? আত্ম-হত্যার দ্বারা নহে;—আত্মহত্যার দ্বারা পুনর্জন্ম নিবারিত হয় না; তপশ্চর্য্যার দ্বারা এবং জীবনের তৃষ্ণা বিসর্জ্জনের দ্বারাই পুনর্জন্ম নিবারিত হইতে পারে। অনাসক্তি ও বৈরাগ্যই মুক্তির প্রকৃত পন্থা। যে ব্যক্তি সম্পূর্ণরূপে বাসনাশূন্য তাহারই আমিত্ব বিনষ্ট হয় এবং সেই সঙ্গে তাহার দুঃখনাশও হইয়া থাকে; সে পূর্ণতায় মধ্যে বিলীন হইয়া নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়।...

এইরূপে স্বামী শীলানন্দ, বৌদ্ধমঠের তালতরুতলে বসিয়া আমাকে উপদেশ দিলেন। আমি ভক্তিসহকারে তাঁহার কথা শুনিলাম। আমার মৌন অনুমোদনে, সরলহৃদয় বৌদ্ধসন্ন্যাসী পরিতুষ্ট হইয়াছেন বলিয়া মনে হইল। তখন তাঁহার একটা মহৎ সঙ্কল্পের কথা আমার নিকট তিনি

প্রকাশ করিলেন। কি দুঃখের বিষয়, এরূপ উচ্চ মতবাদ অধিকাংশ য়ুরোপীয়ের নিকট এখনও অজ্ঞাত। য়ুরোপকে বৌদ্ধমতে দীক্ষিত করা আবশ্যক। শীলানন্দ একটি বিদ্যালয় স্থাপন করিতে চাহেন—সেখানে বৌদ্ধধর্ম্ম এবং ইংরাজি, ফরাসী ও জর্ম্মানভাষা ছাত্রদিগকে শিক্ষা দেওয়া হইবে; তাহা হইলে তিনি পাশ্চাত্য বিজয়ের জন্য, তাঁহার পীতবসনপরিহিত প্রচারকদিগকে য়ুরোপে পাঠাইতে পারিবেন। আমার নূতন বন্ধুটি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই প্রচেষ্টা সম্বন্ধে আমার কি অভিপ্রায়। ভদ্রতা ও অকপটতা—এই দুই দিকই রক্ষা করিয়া—আমি তাঁকে বলিলাম, "আপনার এই সঙ্কল্প, য়ুরোপে নিশ্চয়ই আগ্রহের সহিত গৃহীত হইবে; কিন্তু একথাও বলি, বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে য়ুরোপ বোধহয় একটু ইতস্তত করিবে। যদি য়ুরোপ কখন নিজ ধর্ম্ম পরিত্যাগ করে,—সে অন্য ধর্ম্ম গ্রহণ করিবে বলিয়া নহে···। আমার মনে হইল, এই সংশয়বাদের কথা শুনিয়া সিংহল-সন্ন্যাসী একটু অসন্তুষ্ট হইলেন। ইহা সত্ত্বেও তিনি কালেজ স্থাপনের জন্য একটা চাঁদার খাতা আমার নিকট অর্পণ করিলেন। পাশ্চাত্যখণ্ডের অবিশ্বাসীদিগের মধ্যে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের জন্য কিছু টাকা আমি স্বেচ্ছাক্রমে দান করিলাম···।

ভাই শীলানন্দ স্বামী! তোমার সঙ্কল্পের কথা শুনিয়া আমার একটু আমোদ বোধ হইতেছে! তুমি ভুলিয়া যাইতেছ, য়ুরোপে আমরা সবাই উত্তরোত্তর বেশী মাত্রায় প্রত্যক্ষবাদী (positivist) হইয়া পড়িয়াছি। এখন আর আমরা সেই সকল সমস্যার কথা আলোচনা করিতে চাহি না—যাহা বিজ্ঞানের অতীত, যাহা অহংজ্ঞানের অতীত, যাহা প্রকৃতির শৃঙ্খলাবদ্ধ পর্য্যবেক্ষণের অতীত, যাহা অন্তর্দৃষ্টির অতীত।

খ্রীষ্টধর্ম্মের স্রষ্টাসম্বন্ধীয় মতের ন্যায়, অনন্ত ভবিষ্যৎ-জীবন সম্বন্ধীয় মতের ন্যায়—বৌদ্ধধর্ম্মের এই জন্মান্তরবাদ ও যোনিভ্রমণবাদও অতিভৌতিক, অযৌক্তিক, ও অগ্রাহ্য। তাহা হইলেও, শাক্যমুনির উচ্চ নীতিবাদ য়ুরোপের নিকট প্রকাশ করিলে সেখানে খুব কৌতূহল উদ্রেক্ করিবে সন্দেহ নাই। যেমন খ্রীষ্টধর্ম্মের মতগুলিতে বিশ্বাসস্থাপন না করিয়াও খ্রীষ্টকে ভালবাসা যাইতে পারে, সেইরূপ বৌদ্ধমত বিশ্বাস না করিয়াও বুদ্ধকে ভালবাসা যাইতে পারে।

মানুষের তাত্ত্বিক জীবনকে বিজ্ঞান উত্তরোত্তর অধিকার করিয়া লইতেছে; সেই তাত্ত্বিক জীবনের মধ্যে ধর্ম্ম যদিও না স্থান পায়, মানুষের ভাব-জীবনের মধ্যে ধর্ম্ম এখনও অনেককাল পর্য্যন্ত—হয়ত চিরকাল—অবস্থান করিবে। ধর্ম্ম এখন আর জ্ঞানের রূপ ধারণ করিতে পারিবে না, এখন ধর্ম্ম, প্রীতিরূপেই প্রকাশ পাইবে; কতকগুলি লোক, বোধ হয়, কোন মহর্ষি কিংবা মহামুনির প্রতিই প্রীতি স্থাপন করিবে। সকল জাতির মধ্যেই কতকগুলি উচ্চাধিকারসম্পন্ন মহাপুরুষ আছেন,—যাঁহারা সুধু প্রেমের বলে, জগতের গূঢ়রহস্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন। তাঁহারা আবিষ্কার করিয়াছেন,—সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতির সহিত মানব-প্রকৃতির যে স্বাভাবিক সম্বন্ধ, অসীম বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সহিত সসীম ব্যক্তির যে স্বাভাবিক সম্বন্ধ—তাহাই

ধর্ম্মনীতি। এই নৈতিক প্রচেষ্টার ফলে, তাঁহারা আমাদের আধ্যাত্মিক ভয় হইতে, সংশয় হইতে, নৈরাশ্য হইতে, বাস্তবিকই আমাদিগকে উদ্ধার করিয়াছেন; তাই তাঁহাদের নামে আমরা একএকটি ধর্ম্মকে উৎসর্গ করিয়া থাকি—এবং বাস্তবিকই তাঁহারা সে সম্মানের যোগ্য। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে শুধু একজনের নামেই কেন আমরা ধর্ম্মবিশেষকে উৎসর্গ করি? মানবধর্ম্মনীতির যাঁহারা উচ্চ আদর্শ—সেই সমস্ত মহাপুরুষের নামেই কেন আমরা ধর্ম্মকে উৎসর্গ করি না? পরস্পর সকল ধর্ম্মের মধ্যেই বিরোধ ও অনৈক্য; প্রত্যেক ধর্ম্মই দাবী করে যে, সেই ধর্ম্মই সমগ্র সত্যের একমাত্র প্রকাশক; পক্ষান্তরে এই সমস্ত ধর্ম্ম প্রেমের সমষ্টিরূপে, সদ্ভাবের সমষ্টিরূপে, মানব-চৈতন্যে মিশিয়া যাইতে পারে। কতকগুলি অতিপ্রাচ্যদেশীয় লোক, যাহারা সকল ধর্ম্মকেই সমদৃষ্টিতে দেখে,—এমন একদিন আসিবে যখন তাহাদের এই সমদৃষ্টি ও উদারতা, য়ুরোপীয়দের ও হিন্দুদের রুদ্ধদ্বারিতা ও সংকীর্ণতা অপেক্ষা বিশ্বমানবের অধিকতর হৃদয়গ্রাহী হইবে। তখন সূক্ষ্মদর্শী দার্শনিক, দর্শনের ইতিহাস হইতে, সবিশেষ-ঈশ্বরের বিশ্বাসকে বাদ দিয়া, দেবোপম মহাপুরুষদিগের জীবনীর সদ্‌ব্যাখ্যা করিবেন এবং সেই সমস্ত জীবনী হইতে ধর্ম্মজীবনের একটা বিপুল সারসংগ্রহ প্রস্তুত করিয়া ভবিষ্য মানবমণ্ডলীর নিকট অর্পণ করিবেন।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

নিবেদন।

জননি!
অখিল মাঝে বিফল-কাজে
ছড়িয়ে পড়া আমারে
এনেছি আজ কুড়ায়ে,—
নয়ন-জলে চরণ তলে
সঁপিব বলে তাহারে
অমর-করা ধূলায়-এ!
সকল বুকে ভরেছে দুখে
সয়েছি বহু যাতনা
তোমারে শুধু ভুলিয়া;—
ডেকেছ তুমি জনম ভূমি,
করেছ কত সাধনা,
দেখিনি আঁখি তুলিয়া!
আমারে কভু রোষ' নি তবু
দোষ' নি চির-অধমে
করুণাময়ী জননি!
বেসেছ ভালো, জেলেছ আলো
আমার সারা জনমে
যেখানে গেছি যখনি!
আজিকে তোমা চিনেছি ওমা,
যাব না আর ছাড়িয়া,
উরসে ওই লুটাব!
পরাণ খানি চরণে দানি,
ভাবনা রাশি নাশিয়া
অধরে হাসি ফুটাব!

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত।

দিদিমার বিরক্তি।

(জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার অনুবৃত্তি।)

দিদিমা আমার শাশুড়ীঠাকুরাণীর মাতাও নহেন শাশুড়ীও নহেন—শাশুড়ীঠাকুরাণীর মাসী ছিলেন। দিদিমা বাল-বিধবা চিরদিন পিত্রালয়ে বাস করিতেন। তাঁহার অল্প কিছু জমী জমা ছিল—তাহার আয় হইতেই তাঁহার ধর্ম্ম-কর্ম্ম, ব্রত-নিয়ম প্রভৃতির খরচ পত্র চলিত—হাতখরচের জন্য কখনো দিদিমাকে কাহারও কাছে হাত পাতিতে হইত না। এমন তীর্থ ছিল না যাহা দিদিমা উদ্‌যাপন করেন নাই। আজিও সকলে একবাক্যে বলেন যে দিদিমার পুনর্জ্জন্ম কখনই হইবে না।

আমি যখন তাঁহাকে দেখিলাম, তখন তিনি ইহলোকের সকল কার্য্য সমাধা করিয়া পরলোকের দিকে চাহিয়া আছেন—কিন্তু তা বলিয়া তিনি নিষ্কর্ম্মা হইয়া বসিয়া থাকিতেন না। আমাদের শাশুড়ীঠাকুরাণী অনেকগুলি অপোগণ্ড শিশুসন্তান লইয়া অল্পবয়সে বিধবা হইয়া কায়ক্লেশে যখন সন্তানদের মানুষ করিয়া তুলিয়াছেন—কন্যা ও পুত্রদের বিবাহ দিয়াছেন—মনে করিতেছেন এইবার আমি একটু নিশ্চিন্ত হইয়া বসিব—এমন সময় অকস্মাৎ তাঁহার ডাক পড়িল তিনি চলিয়া গেলেন। পুত্রেরা একমাত্র মাতাকেই পিতা মাতা উভয়ই জানিতেন—বধূরা নিতান্ত বালিকা—অকস্মাৎ এই দুর্ঘটনায় নাবিকহীন তরীর মত সকলে অকূল সমুদ্রে ভাসিতেছেন—শুনিয়া করুণাময়ী দিদিমা আসিয়া তাঁহাদিগকে স্নেহবক্ষে তুলিয়া লইলেন। আমাদের শাশুড়ী ছিলেন না কিন্তু জাঠশাশুড়ী খুড়শাশুরী ছিলেন এবং যথেষ্ট যত্ন আদর করিতেন—কিন্তু তবুও অভিভাবক হইলেন দিদিমা;—তাঁহাকে নহিলে চলিত না—দিদিমাও আনন্দের সহিত আত্মদান করিলেন। তাঁহার পিত্রালয়ে তিনিই গৃহিণী ছিলেন—এখানেও তিনি গৃহিণী। ঘরে গাড়ী ছিল, কিন্তু দিদিমা কোন দিন গাড়ী করিয়া গঙ্গাস্নানে যাইতেন না। অমাবস্যা পূর্ণিমা একাদশী প্রভৃতি বিশেষ পর্ব্বে অন্য গৃহিণীরা গঙ্গাস্নানে বা কালীঘাটে গাড়ীতে যাইতেন—কিন্তু দিদিমার সেই নিয়মিত ব্যবস্থা। প্রতি অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় কালীদর্শন করিতেনই—প্রত্যূষে উঠিয়া পদব্রজে কালীঘাটে যাইয়া আদিগঙ্গায় স্নান করিয়া কালীদর্শন, সন্ধ্যাবন্দনা সমাপন করিয়া বেলা ১১টায় গাড়ীতে ফিরিয়া আসিতেন। বলিতেন "বর্ষা বা শীতের দিনে 'আমি অনায়াসে পায়ে হেঁটে কালীঘাট থেকে আস্‌তে পারি—কিন্তু অনেক বেলা হয়ে যাবে—অনেক খাবার করা আছে—ওরা কখন করবে, আহা পেরে উঠ্‌বে না—তাই তাড়াতাড়ি করে আস্‌ছি।" অমাবস্যা পূর্ণিমায় বিধবারা কেহই ত ভাত খান না, কাযেই ঐদিন বিস্তর রুটী লুচি তৈয়ারি হইত।

গৃহিণীরা কালীঘাটে গঙ্গাস্নানে সর্ব্বদা যাইতেন—আর কাঠের পুতুল, পুঁথির মালা পিতলের খেলেনা, কাঠের খেলেনা—সংসারের কাযের উপযোগী হাতা বেড়ি প্রভৃতি কেনা

নোড়া বোক্‌নো হাঁড়ী চাটু কড়াই কত কি কিনিয়া আনিতেন—দেখিয়া দেখিয়া আমাদের কালীঘাট ও গঙ্গাস্নানে যাওয়ার জন্য প্রবল ইচ্ছা হইত—কিন্তু কিছুতেই বাবুদের মত হইত না। বাবুরা তখন সবে এম্ এ বি এ পাশ করিয়াছেন। আমাদের বাহির হইবার হুকুম ছিল না। আবার সাবেক নিয়মে তখন কাশীপুর বরানগর যাইতেও পাল্কিতে অথবা নৌকায় যাইতে হইত—গাড়ী চড়িতে পাইতাম না। ভাড়াটে গাড়ী ত নয়ই—নিতান্ত কোনদিন পাল্কি-বিভ্রাট ঘটিলে ঘরের গাড়ীতে চড়িয়া যাওয়া চলিত। এইরূপ পাল্কি-বিভ্রাট একদিন আমার অদৃষ্টে ঘটায় দিদিমা আমার উপর বিরক্ত হইয়াছিলেন।

আমার পিতামহাশয় বিদেশে কায করিতেন—মাতাও পিতার নিকট বিদেশে,সুতরাং আমাকে পিত্রালয়ে পাঠাইবার আবশ্যক ছিল না। জ্যেঠা খুড়া যদি লইয়া যাইতেন—এক বেলার জন্ম পাঠান হইত। একদিন গঙ্গাস্নান হইতে ফিরিয়া আসিয়া দিদিমা বলিলেন—"নাতবৌ তোমাকে এতদিন বলি নাই দিদি,—আহা ছেলে মানুষ ভাবনা চিন্তা করবে—তোমার জাঠতুত ভাইটির বড় অসুখ—আহা বাঁচবার কিছু ছিল না—অনেক চিকিৎসায় হরির কৃপায় প্রাণ পেয়েছে তুমি একদিন যাও তাকে দেখে এস। আমি প্রতিদিন গঙ্গাস্নানের ফেরত তাকে দেখে আসি—এখন প্রাণের আশা হয়েছে তাই তোমায় বল্‌ছি। তাঁদের এখন তোমায় নিয়ে যাবার সময় নয়—তুমি আপনি যাও।

আমি তখন নিতান্ত বালিকা এগার বৎসর মাত্র বয়স—দিদিমা আমাকে তাই জন্ম বিশেষ যত্ন করিতেন। আমার বেশ মনে পড়ে আমাদের ননদদিগকে কেহ আনিতে না গেলেও তাঁহারা মধ্যে মধ্যে নিজেরাই আমাদের এখানে অর্থাৎ পিত্রালয়ে আসিতেন। আমি ভাবিতাম আমি কবে অমনি ইচ্ছা করিলেই পিত্রালয়ে যাইতে পাইব। তাই আজ দিদিমা যেই বলিলেন "তুমি আপনি যাও"—আমি ভাবিলাম আমিও তবে একজন। ২।৪ দিন পরে দিদিমা একদিন বলিলেন যে "আজ তুমি ভাত খেয়ে যাও—অসুখের বাড়ী না খেয়ে গিয়ে ব্যস্ত কোরে কায নাই।" আর কোথায় আনন্দ রাখি—অসুখ দেখতে যাওয়ার ত ভারি ভয় ভাবনা—অকস্মাৎ যে গিয়ে পড়ে সকলকে বিস্মিত করে দিব এই আনন্দ! সমবয়স্কা এক ভাশুরঝি ও একটী ছোট ভাগিনেয়ী ধরিল আমরাও যাইব। সে ত আরও ভাল। নিজেরাই সব পরামর্শ আঁটিলাম,নিজেরাই ঠিকঠাক হইলাম—দিদিমার অনুমতি নেওয়াও নেই, কিছুই না। দিদিমা বলিয়া দিয়াছিলেন পাল্কি ডাকাইয়া লইয়ো। পিত্রালয় হইতে লইতে আসিলে অর্থাৎ পূর্ব্বদিন যদি কেহ আসিয়া বলিয়া যাইত "কাল দিন ভাল আছে অমুককে পাঠাইয়া দিতে হবে"—তবে অনেক সময় দিদিমা বলিতেন "তোমাদের আর কাকেও আসতে হবে না—আমি এখান থেকেই পাঠাইয়া দিব।" আর ইহাও বলিয়া দিতেন যে "এত দিন রাখিয়ো।" তাই যে বধূ যখন যাইত, প্রস্তুত হইয়া পাল্কি আনাইত, যাবার সময় সকলকে প্রণামাদি করিয়া বিদায় লইয়া যাইত। আজ আমি যখন প্রস্তুত হইয়া পাল্কি আনাইতে পাঠাইলাম—তখন গৃহিণীরা

সকলে আহারে বসিয়াছেন—আমি আনন্দে এমনি বিহ্বল যে তাঁহাদের আহার শেষ হওয়ার বিলম্ব সহে না;—সহিবেই বা কি করিয়া—২টা বাজে—কখন যাইব;—সন্ধ্যায় ফিরিতে হবে—কতটুকু সময় আর আছে? কাজেই খুব তাড়া দিয়া ঝিকে পাঠাইয়াছি। এখন ঝি মহাশয়া বাহিরে চাকরদের কিছু না বলিয়া নিজেই গজেন্দ্রগমনে গিয়া এক ভাড়াটে গাড়ী ডাকিয়া আনিয়াছেন। আমরা যাত্রীদল প্রস্তত—একজন পিত্রালয়ের ঝি—একজন শ্বশুরালয়ের;—তারপর আমি ও ভাগিনেয়ী ও ভাশুরঝি চলিয়াছি;—রান্নাঘরের দরজায় গিয়া "দিদিমা আমরা যাচ্ছি" বলিতেই দিদিমা উন্মুখ হইয়া বলিলেন "পাল্কি এসেছে?" আমি "পাল্কি নয় গাড়ী" বলিতে বলিতে অন্তঃপুরের দ্বার ছাড়াইয়াছি;—দিদিমা আর কি করিবেন "ও মা ও ঝি সাবধানে নে যাস্ আর রাত করিস্‌নে; বেলাবেলি এস মা"—এইরূপ বলিতে লাগিলেন—আমরা শুনিতে শুনিতে গেলাম। গাড়ীতে উঠিয়া বলিলাম "কই চাকর নিলিনে"—ঝিয়েরা বলিল আমরা দুজন আছি আর চাকর কেন। আমি বলিলাম "গাড়ী আন্‌লি কেন?" ঝি বলিল "আড়ায় পাল্কি ছিল না, দেরি হয়ে যাচ্ছে তাই গাড়ী আনলুম—দেখ দেখি কেমন মজা—বেশ সবাই গাড়ীতে যাচ্ছি—পাল্কি হলে তোমরা ত সুখে যেতে আমাদের ভাত খেয়ে ছুট্‌তে ছুট্‌তে প্রাণ যেত।" তারপর বেশ সুখেই কয়েক ঘণ্টা কাটান গেল! কোথায় বা বেলাবেলি আসা—যার নাম রাত নটা। সকলেই প্রফুল্লমনে—আবার এক ভাড়া গাড়ী চড়িয়া আসিয়া হাজীর। ঝম ঝম মলের শব্দে ছিছি রবে—বাড়ী জাগাইয়া আমরা আসিলাম—আমি বধূ,—দিদিমাকে প্রণাম করিতে গেলাম। দিদিমা তখন নাতিদের পরিবেষণ করিতেছেন—রাত্রে দোতালার একটা ঘরে খাওয়া হইত—ঘর হইতে দিদিমা বাহিরে আসিলে প্রণাম করিলাম—তখন দিদিমাকে স্পর্শ করিব না—গাড়ীর কাপড়—পদধূলি লইলাম না। দিদিমা কিছু বলিলেন না দেখিয়া বিস্মিত হইয়া মুখের দিকে চাহিয়া দেখি দিদিমার মুখ অসম্ভব গম্ভীর। ঘর হইতে কর্ত্তা বলিলেন "দিদিমা কার হুকুমে গাড়ী চড়ে যাওয়া হয়েছিল।" কোথায় গেল সে আনন্দস্রোত—বুকটা ধড়াস্ করিয়া উঠিল—ওদিকে অন্য গৃহিণীরা ঝিয়েদের উপর ঝঙ্কার দিতেছেন—গাড়ী চড়ে নিমন্ত্রণ খেতে গেছলি—কায কর্ম্ম সব পড়ে আছে—রঙ্গ করে সব এলেন!"

কর্ত্তা যাই বলিলেন "দিদিমা কার হুকুমে যাওয়া হয়েছিল," অমনি দিদিমা তটস্থ হইয়া বলিলেন "থাক্ থাক্ ছেলে মানুষ বুঝতে পারেনি ও কথা পরে হবে"—দিদিমার সেই বিরক্তির ভাব দূরে গেল, মুখচ্ছবি করুণায় ভরিয়া উঠিল।" কর্ত্তা বলিতে লাগিলেন "কনে বৌ না বলা না কওয়া গাড়ী ডাকিয়ে বেড়াতে যায় এ কি রকম!" দিদিমা চুপ করিয়া রহিলেন—তখন কর্ত্তাতে ও অন্য গৃহিণীগণে ঝিয়ের আদ্যশ্রাদ্ধ করিতে লাগিলেন। ঝি বলিল—"আড়াতে পাল্কি ছিল না—তাই গাড়ী এনেছি।" কর্ত্তা বলিলেন "তবে রাত্রে কেন গাড়ীতে আসা হল?" আর উত্তর নাই। "দরওয়ান বা চাকর নেওয়া হয়নি কেন?" উত্তর নাই—"এত রাত কেন" উত্তর নাই। "অসুখের

বাড়ী তা ত বৌমা জানেন তিনি মেয়েদের কেন নিয়ে গেলেন, কার হুকুমে নিয়ে গেলেন —কাকে বলে নিয়ে গিয়েছেন। উনি যাচ্ছেন ওঁর বাপের বাড়ী এ বাড়ীর মেয়েরা কেন গেল।” আমি কাঁদিতে কাঁদিতে বিছানায় গিয়া শুইলাম—খাওয়ার দরকার ছিল না; পিত্রালয় হইতে খাইয়া আসিয়াছিলাম —নচেৎ সে রাত্রে আর খাওয়া হইত না। এই একটি দিন মাত্র এক মুহূর্ত্তের জন্য দিদিমার মুখে আমার প্রতি বিরক্তির ভাব প্রকাশিত হইতে দেখিয়া ছিলাম।

দিদিমা সদাপ্রসন্ন, বর্ণ গৌর, পরিপাটী গঠন, দীর্ঘাঙ্গী, মাথার চুলছাঁটা। আঁধা কাঁচা আধা পাকা ছোট ছোট কোঁকড়া কোঁকড়া চুলে দিদিমাকে অনেকটা পুরুষ মানুষের মত দেখাইত। অত্যন্ত বিরক্ত হইলে দিদিমা টেপা ঠোঁট আরও দৃঢ়ভাবে টিপিয়া থাকিতেন —পাছে কোন কঠিন কথা বাহির হইয়া পড়ে তাই যেন অত্যন্ত সাবধান হইতেন।

একদিন রাঁধুনির অসুখ। বাড়ীতে পরিবার সে সময় বেশি ছিল না—আমিষ রান্না দিদিমাকেই রাঁধিতে হইবে। দিদিমা সকল কার্য্য করিতেন—কিন্তু আমিষ রান্না রাঁধিতেন না—রাঁধুনির অসুখ হইলে বধূদের মধ্যে কেহ একজন মাছের ঝোল ভাত রাঁধিত। সেদিন আমি ছাড়া আর কোন বধূ ঘরে ছিল না—আমি ছেলে মানুষ দিদিমাই রাঁধিবেন। দিদিমা গঙ্গাস্নানে গিয়াছেন—ঠিক ফিরিয়া আসার সময় ভয়ানক বৃষ্টি আরম্ভ হওয়াতে তাঁহার আসিতে বিলম্ব হইতে লাগিল। রান্না ঘরে উনুন জ্বলিয়া যাইতেছে। থরে থরে সমস্ত গুছাইয়া ঘর বার করিতেছে কতক্ষণে দিদিমা আসেন—বড় বাবুর আবার সেদিন তাড়াতাড়ি বাহির হইতে হবে।

আমার পান সাজা হইয়া গেল—তথাপি দিদিমা আসিলেন না দেখিয়া বুড়ো ঝি আসিয়া বলিল “বৌমা-রান্না ঘরে চল আমি দেখিয়ে দেব এখন, তুমি ভাতের হাঁড়ীটা বসিয়ে ভাতটা চড়িয়ে দাও, ভাত হতে হতে মাঠাকরুণ এসে পড়বেন।” আমি ভাতের হাঁড়ী নামাইতে গিয়া প্রথমেই একখানা সরা ভাঙ্গিয়া ফেলিলাম্—ঝি বলিল—“তা যাক্ গে, :তুমি হাঁড়ীটা বসিয়ে দাও, বড় বাবুর আজ বড় তাড়া।” ঝি অন্য কাযে গেল, আমি ভাতের হাঁড়ী চড়াইয়া হাঁড়ী পূরিয়া জল দিয়া সরা চাপা দিয়া উপরে চলিয়া গেলাম। একটা বিড়ালের শাদা ধবধবে মোটা সোটা একটা বাচ্ছা হইয়াছিল— সেটাকে লইয়া খেলিতে লাগিলাম। অনেকক্ষণ পরে চৈতন্য হইল যে হাঁড়ীতে ত চাল দেওয়া হয় নাই অতএব এইবার যাওয়া যাক্। পুরুষেরা অন্দর মহলে কেহ নাই, গৃহিণীরা দেশে গিয়াছেন একা দিদিমা আছেন—তাঁর অত আঁটা আটি ছিল না—আমি ঝমঝম দুড় দুড় করিতে করিতে বেরালছানা নাচাইতে নাচাইতে বলিতে বলিতে চলিয়াছি—“চল' তোমাকে ভাতে দিই গে যাই, চল তোমাকে ভাতে দিই গে যাই।” সিঁড়ি হইতে দালানে পড়িতেই দেখি ভাশুরমহাশয় ও দিদিমা। অমনি লজ্জাশীলা বধূ একহাত ঘোমটা টানিয়া এক দৌড়ে ছুটিয়া রান্না ঘরে প্রবেশ

মরি কি লজ্জা দেখ। ভাশুর মহাশয় বলিলেন "দিদিমা আজ নাকি বৌমা রাঁধ্‌ছেন" দিদিমা বলিলেন, "হাঁ ঐ যে বেরালছানা ভাতে দিতে আস্‌ছে। ভাশুর হো হো করিয়া হাসিয়া বলিলেন "বুড়ো ঝি বল্লে—আমার তাড়াতাড়ি তাই সে বৌমাকে দিয়ে ভাত চড়িয়েছে। আমি ভাবিলাম—ছেলেমানুষ কি করেছে দেখে আসি।" দিদিমা বলিলেন —"তা হলেই আজ ভাত খেয়েছিলে আর কি, এক হাঁড়ী জল চড়িয়ে সরা ঢাকা দিয়ে উপরে বসে আছে। আমি এসে শুনি ভাত চড়ান হয়েছে, তো বলি বেশ হয়েছে আর আর সব গুছিয়ে গাছিয়ে আসি—নাত বৌকে খাবার দিয়ে আসি—তা ঝি বল্লে মা ভাত হয় ত হয়ে এসেছে দেখুন দেখি—ওমা সরা খুলে দেখি টগ বগ করে জল ফুটছে যেখানকার চাল সেইখানে মজুত আছে। তখন হাঁড়ীর জল কতকটা ফেলে চাল দিই—দিয়ে এই উপরে যাচ্ছি। আহা কতখানি বেলা হয়েছে খাবার পায়নি—কত ক্ষিদে পেয়েছে। তা যাও দাদা স্নান করে এস' বেরাল ভাতে ভাত কখনো খাওনি—আজ ভাদ্র বৌ খাওয়াবে।" আমি ত রান্নাঘর থেকে সব শুনিতেছি—ভাশুর মহাশয় বাহিরে গেলে দিদিমাকে বলিলাম "জল না গরম হলে কি করে চাল দিব তাই জল গরম করতে দিয়ে গিয়েছিলাম। দিদিমা মুচকি হাসিয়া বলিলেন "এক হাঁড়ী জল দিয়েছ চাল ধরত কোথায়—আজ যে পুড়ে খুন হও নাই এই রক্ষে।" তারপর আমাকে খাবার দিয়া অবসর মত আস্তে আস্তে বলিলেন "শ্বশুর ভাশুরের কারো সাম্‌নে পড়লে ঘোমটা দিয়ে ঘাড়টী হেঁট করে আস্তে আস্তে চলে যেতে হয়—যেন মলের শব্দটী না হয়—অমন করে ছুটে যেতে নেই। তোমার শ্বশুর বাড়ীর বড় আঁটাআঁটি—তোমার দাদাশ্বশুর গোষ্ঠীপতি ছিলেন—শ্বশুর শাশুড়ী ত চিন্‌লে না দিদি কত বড় ঘরের বৌ তুমি কিছুই জান না! সেদিন যে বকুনি খেলে তা ঐ ভাড়াটে গাড়ী চড়েছিলে বলে। এ বাড়ীর বৌরা কখনো গাড়ী চড়ে নাই তোমার শ্বশুরের এমনি রাসভারী ছিল—আর এমন নিয়ম ছিল যে ৫ বছরের মেয়েটি পর্য্যন্ত বাহির বাড়ীতে যেতে পেত না। —এখন এই দেখ ১০।১১ বছরের মেয়েরাও স্কুলে যাচ্ছে। তবু তোমরা বৌ মানুষ তোমাদের সাবধান করে দিই। আর খেলা ধূলা যা করবে ঘরে কোরো—ছাতে উঠো না জানলা খুলে রেখো না—পাড়াপ্রতিবাসী না দেখ্‌তে পায়।" দিদিমা কখনো ভৎর্সনা করিতেন না। মিষ্ট ভাষায় হাসি মুখে এমন করিয়া বলিতেন যে কষ্ট হইত না, কিন্তু শিক্ষা হইত। দিদিমার দুই চারি দিনের কথা তাই আমার বিশেষ করিয়া মনে আছে। আর একদিন দেশ হইতে ধোপা আসিয়াছে যখন, তখন হেঁসেল উঠিয়াছে, রাঁধুনি বেড়াইতে বাহির হইয়াছে—দিদিমা সবে একটু ঘুমাইয়াছেন—বুড়ো ঝি বলিল "বৌমা হাঁড়িতে ভাত তরকারি সব আছে এস ধোপাকে চারটি বেড়ে দিবে"—কায করিতে বলিলে আমার মহা উৎসাহ—অমনি চলিলাম—গিয়াই যেমন সরাখানা ধরিয়া টানা—অমনি খানিকটা ঝোল গায়ে ফেলা। বেশ মনে আছে সেদিন একখানি নূতন ধোয়া লাল ভোমরাপেড়ে শাদা খড়কে ডুরে পরিয়া-

ছিলাম তাই গায়ে কাপড়ে ঝোলের প্রবাহ বহিয়া যাওয়ায় বড়ই ক্ষুণ্ণ হইলাম—আধ ঘণ্টা মাত্র পরিয়াই কাপড়খানা ধোপাকে ধুইতে দিতে হইবে কম দুঃখ! ধোপাকে ত ভাত দিলাম—এমন সময় দিদিমা আসিয়া আমার মূর্ত্তি দেখিয়া অবাক্। মুচ্‌কি হাসিয়া বুড়ো ঝিকে বলিলেন—"আমায় ডাকৃতে হয় মা—ওকি কিছু পারে, দেখ দেখি এই গা ধুয়ে এসেছে আবার গা ধুতে চল্লো—অসুখ না হলে হয়।" বুড়ো ঝি বলিল "তা মা বৌঝি এসব না করলে কি হয়।" দিদিমা বলিলেন "বয়স হইলেই সব শিখ্‌বে, নাতবৌ আমার আদরের মেয়ে কিনা তাই একটু চঞ্চল—জল গড়াতে গেলে ঘর ময় জল ঢালে, বেগুন কুটতে হাতে ফালা দেয়,—ও সব সেরে যাবে—বয়স হলেই ঘরকন্না ঘাড়ে পড়লেই সব শুধরে যাবে। নাতবৌএর সকল কাযে মন আছে, সময়ে সব শিখ্‌বে।" আমার মনে আছে এই দিন হইতে আমি শিখিলাম যে আমি সকল কার্য্যে অপারক কেন,—কেন আমাকে কোন কায দিয়া দিদিমা নিশ্চিন্ত হইতে পারেন না—না আমি ভারী চঞ্চল ;—আমি সাবধান হইতে শিক্ষালাভ করিলাম। আমি যেরূপ অভিমানী ছিলাম তাহাতে দিদিমা যদি এই ভাবে আমাকে শিক্ষা না দিয়া তিরস্কার করিতেন; তা হইলে উল্টা ফল হইত। আমি বোধ হয় তিরস্কৃত হইয়া প্রতিবাদের পর প্রতিবাদ করিতাম—নিজের দোষ দেখিয়া লজ্জিত হইতাম না।

তখন দিবসে স্বামীর সহিত দেখা সাক্ষাৎ হওয়া বড় লজ্জার বিষয় ছিল। দিদিমা কিন্তু আমাদের এই নিলর্জ্জতায় বিশেষ প্রশ্রয় দিতেন। ছুটীর দিনে "নাতিরা" ঘরে থাকিলে, নানা অছিলায় নাতবৌদের ঘরে পাঠাইতেন। "যাও জল দিয়ে এস'—পান দিয়ে এস', ঘর গুছিয়ে এস'।" প্রথম প্রথম আমি একহাত ঘোমটা দিয়া ঘরে "প্রবেশ ও প্রস্থান" করিতাম—ক্রমে ক্রমে বেশ অভ্যাস হইয়া গেল—পান জল দিতে গিয়া ঘণ্টা খানেক কাটিত—ঘর গুছাইতে সারা দুপুর লাগিত। পরে জানিতে পারিয়াছিলাম অন্য গৃহিনীরা এজন্য দিদিমাকে তিরস্কার করিতেন—আমার সহজ বালিকাভাব দেখে ত তাঁরা "অবাক্" হইতেনই। কেননা তাঁহাদের নিকট উহাই "বেহায়াপনা"। দিদিমা বলিতেন "আহা ওরা ছুটীতে হাসে খেলে আমি দেখে বড় তৃপ্ত হই।" অনেক সময় দিদিমা নিঃশব্দে আসিয়া ঘরে প্রবেশ করিতেন ও মুচ্‌কি মুচকি হাসিতেন—আমি অমনি এক হাত ঘোমটা টানিয়া বাহির হইয়া যাইতাম। দিদিমা ও নাতিতে হাসিতেন ও বলিতেন "ওঃ! কি লজ্জা!" অনেক সময় দরজা খোলা আছে—আমার মাথায় কাপড়ও নাই—স্বামী ঘরে আছেন—দিদিমা দুধের বাটী হাতে করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন, তাঁহার দিকে আমার দৃষ্টি পড়িলেই ইঙ্গিতে ডাকিবেন ;—স্বামী দিদিমাকে দেখিতেছেন ও হাসিতেছেন,—আমি বক্তৃতা করিয়াই যাইতেছি, অকস্মাৎ দিদিমার দিকে দৃষ্টি পড়িল—সর্ব্বনাশ একি! দিদিমার মুখে হাসি, মাথা নাড়িয়া ডাকিলেন। একদিন—বলিলাম"দিদিমা এ রকম করলে হবে না—আপনি কেন সাড়া দিয়ে আসেন না।" দিদিমা বলিলেন"তোমরা হাস' কথা কও আমি যে বড় দেখ্‌তে ভালবাসি। আহা ছোট নাতি,

আমার বোনঝির কোলের ছেলে ;—মা-হারা হয়ে পর্য্যন্ত বাছা আমার হাসেনি, কথা কয়নি। তোমার সঙ্গে হাসে কথা কয় দেখে প্রাণ ঠাণ্ডা হয়।" কিন্তু ক্রমে ক্রমে এমন হইল যে আমি ঘরে প্রবেশ করিলেই বাড়ীর কেহ না কেহ "আড়ি" পাতিতেন—এবং আমার ছেলেমানষী সরলতার শতধারে আলোচনা করিতেন। একদিন গম্ভীর মুখে দিদিমা বলিলেন, "নাতবৌ যখন ঘরে যাবে দরজা বন্ধ করে দিও"—বলিয়া আমার ঘরের সমস্ত জানালা দরজার ছিদ্রগুলি পর্য্যন্ত বন্ধ করিয়া দিলেন। এই দিন দিদিমার মুখ অসম্ভব গম্ভীর দেখিয়াছিলাম। বিরক্ত হইলে দিদিমার মুখের প্রসন্ন ভাব টুকু চলিয়া যাইত। তাহা ব্যতীত কথায় বা ব্যবহারে বিরক্তি প্রকাশ পাইত না। দিদিমা কখনো কাহারও ঘরে "আড়ি পাতিতেন" না। নিঃশব্দে আমার ঘরে যে আসিতেন—কেবল এক নজরে দেখিতেন আমরা আনন্দে আছি কিনা। অন্য কেহ আড়ি পাতিলে তাঁহার ভাল লাগিত না।

এখন আমি বেশ বুঝিতে পারি যে যদিও দিদিমা সকলকেই সমভাবে দেখিতেন—তবুও যে কারণেই হোক্ আমার প্রতি যেন ঈষৎ পক্ষপাতী ছিলেন। আমি ছেলেমানুষ বলিয়া বোধ হয় আমাকে বেশি আদর দিতেন।

আমি পিতা মাতার একমাত্র সন্তান ছিলাম—এজন্য সাধারণ ভাবে প্রতিপালিত হই নাই। অনেক বয়স পর্য্যন্ত প্রচুর দুধের বরাদ্দ ছিল। "শ্বশুর বাড়ী যাইয়া মেয়ে আমার দুধ পাবে না ;"—মাতা ঠাকুরাণী এই চিন্তায় কাতর হইয়াছেন শুনিয়া দিদিমা বলিয়া পাঠাইলেন; মাকে বলো যে, সে ভাবনা যেন না করেন।

দিদিমা নিঃশব্দে নিয়মিত সময়ে ঠিক আমার মাতার মত দুধের বাটীটা আনিয়া আমার মুখে ধরিতেন। এবং সমস্ত নিঃশেষ করাইয়া তবে ছাড়িতেন। তিনি বুঝিয়া লইয়াছিলেন, তা না হইলে বিড়ালবাচ্ছা অর্দ্ধেক ভাগ পাইবে। জলপানী পয়সা আমার হাতে প্রচুর থাকিত, কোন ফেরিওয়ালা হাঁকিলেই সমবয়স্কা ভাশুরঝি ভাগ্নীরা তাহাকে ডাকিত ; আমি পয়সা দিতাম। বাড়ীর মহিলারা বিশেষ প্রাচীনারা নিন্দা করিতেন—দিদিমা বলিতেন "আমার নাত বৌ যে "দো-চোখোর" ব্রত করিয়াছে, তাই যা দেখে তাই কেনে ;" বলিয়া একটু হাসিতেন। এই সকল সরল বালিকা সুলভ ব্যবহারে দিদিমা কখনই বাধা দিতেন না।

মিথ্যা কথা প্রবঞ্চনাকে দিদিমা অতিশয় ঘৃণা করিতেন। সদাসর্ব্বদা সকলের নিকট বলিতেন" নাতবৌ আমার মিথ্যা কথা কাকে বলে তা জানে না,—নাতবৌএর আমার পেটে একখানা মুখে একখানা নেই।" পূর্ব্বেই বলিয়াছি আমার পিতা মাতা বিদেশে থাকিতেন—এবং আমিই একমাত্র সন্তান। সুতরাং আমি একা একা মানুষ হইয়াছিলাম—সংসারের কোন সংবাদ রাখিতাম না। নিজের পুতুল, ঘুড়ি, ফুলপাতা লইয়া একা একা খেলা করিতাম। দশ বৎসর বয়সে বিবাহ হইল। এগার বৎসর বয়সে শ্বশুরবাড়ী গিয়া বৎসরেক কাল রহিলাম—এই নিতান্ত বালিকা বয়সে যদি দিদিমার যত্ন না পাইতাম—অন্য অন্য বালিকা বধূদের মত শ্বশুরবাড়ীর কঠোরতার

মধ্যে পড়িতে হইত,—তবে আমার জীবন বোধ হয় আর এক ধারায় প্রবাহিত হইত। সত্যপ্রিয়তা সরলতা চঞ্চলতা মুখরতা আমার স্বভাবে বিলক্ষণ প্রকাশ হইয়া পড়িত। দিদিমা গুণের প্রশ্রয় ও দোষের সংশোধন করিতেন। কিন্তু কখনই তিরস্কার করিতেন না। তাই দিদিমার কথায় বিশেষ ফল হইত।

এগার বৎসরের বালিকার পক্ষে একাদিক্রমে বৎসরেক কাল শ্বশুরালয়ে কালযাপন করা কতখানি কষ্টকর তাহা বোধ হয় প্রত্যেক মহিলাই বুঝিতে পারিবেন। বিশেষতঃ আমাদের পশ্চিমাঞ্চলে বাস ছিল বলিয়া বেড়াইবার খুব সুবিধা ছিল। প্রতিদিন সকাল বিকাল মাঠে ও বাগানে বেড়াইতাম; মিউজিয়াম চিড়িয়াখানা সার্কাস দেখা সদা সর্ব্বদাই ঘটিত। বিবাহের পর একেবারে সে সব বন্ধ। দশ বৎসরের বালিকাকে একেবারে অবগুণ্ঠিতা বধূ হইতে হইল। এই পরিবর্ত্তনে পিত্রালয়েই বিষম কষ্ট হইত—তার পর সুদীর্ঘ এক বৎসরকাল শ্বশুরালয়ে বাস। একদিন বিকাল বেলা অকস্মাৎ তিন চারজন দাস দাসী সন্দেশ ফুলকপি বাঁধাকপি কমলা লেবু বাদাম পেস্তা আঙ্গুর প্রভৃতি লইয়া আসিয়া সংবাদ দিল,—আমার মা আসিয়াছেন,—কাল প্রাতে পাল্কি আসিবে আমি পিত্রালয়ে যাইব;—সে কি আনন্দ! ঝিয়েদের ধরিয়া বসিলাম যে,—কেন এখনি নিয়ে যাবিনে—কেন কালকের কথা বল্লি;—মায়ের উপর খুব রাগ করিলাম,—কাঁদিয়া দিদিমাকে বলিলাম আমাকে এখনি পাঠাইয়া দিন! দিদিমা বুকে টানিয়া লইয়া সজল নয়নে বলিলেন,—আহা যাবে বইকি—আজ অবেলা-দিন ভাল নয়—পুরুষেরা কেউ বাড়ী নেই—একবার তাদের বলি;—কাল ভোরেই পাঠিয়ে দেব—কেঁদো না দিদি চুপ কর। একটা রাত বইত—নয়—আর কি এই ত চল্লে—আবার কতদিনে আসবে।” আমি শান্ত হইলে মুচকি হাসিয়া বলিলেন “আমার নাতিকে যে ফেলে যাবে—তোমার মন কেমন করবে না?” আমি হাসিতে লাগিলাম—ভাবটি এই যে,—এ কথার কোনই মূল্য নাই। পরদিন তাড়াতাড়ি শয্যা ত্যাগ করিতে চাহি—দিদিমার নাতি তাহাতে বাধা দিলেন। বিদায় গ্রহণের সময় দেখিলাম তাঁহার চোখে জল পড়িতেছে—মনে একটা বিষাদের ছায়া আসিয়া পড়িল।

পাল্কি আসিয়াছে, আমি “জলখাবার” খাইয়া প্রস্তুত হইয়া আছি—দিদিমা গঙ্গাস্নান করিয়া ফিরিলেই পাল্কিতে উঠিব। নিয়মিত যে সময়ে তিনি আসেন তাহার অপেক্ষা তাড়াতাড়ি আসিবেন বলিয়া গিয়াছেন—আমার আর বিলম্ব সহে না—বলিতে লাগিলাম “দিদিমা ত এখনও আসিলেন না—আমি তবে যাই। একটী ভাগিনেয়ী যাইয়া বাহির বাটিতে প্রচার করিল—ছোট মামিমা এখনি চলে যেতে চাচ্ছে—ঝি-মা (দিদিমা) এখন কত বেলায় আসবেন কে জানে। শুনিয়া ভাশুর মশায় বাড়ীর মধ্যে আসিয়া এক ধমক দিয়া বলিলেন—“ছোট বৌমা কি বলছেন—দিদিমা না এলে যাওয়া হবে না—এ বেলা পাল্কি ফিরিয়া যাক্।” সর্ব্বনাশ, আমি কাঁদিয়া ফেলিলাম।—সেই মুহূর্ত্তে মূর্ত্তিময়ী করুণা স্বরূপ দিদিমা বলিতে বলিতে আসিতেছেন, “আমি তাড়াতাড়ি করে আসছি, বেলা হয়ে গেলে

নাত-বৌ আমার ব্যস্ত হয়ে পড়বে—তোরা ওকে আজ কি বলে বক্‌লি—আহা কতদিন মাকে দেখেনি—ব্যস্ত হবে না—আহা কাঁদ্‌ছে। দেখ দেখি আজ কি না কাঁদালি।” ভাশুর মহাশয় অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন “কেন বৌ-মা কাঁদছেন কেন—আমি বেশি ত কিছু বলি নাই”—বলিতে বলিতে তিনি সরিয়া পড়িলেন। দিদিমা আমাকে শান্ত করিয়া পাল্কিতে তুলিয়া দিতে দিতে—বলিলেন “আমার নাতি একলা রইল—শীঘ্র করে এস,—এই তোমার ঘর বাড়ী। জন্ম এয়োস্ত্রী হয়ে জন্ম জন্ম এই ঘর কর।” দিদিমার চোখে জল পড়িতেছিল।

হর্ষবিষাদ পূর্ণ হৃদয়ে চোখে জল ঠোঁটে হাসি লইয়া পিত্রালয়ে উপস্থিত হইলাম। মাকে প্রণাম করিয়া মুখ তুলিতেই মা বলিলেন “তুই কেঁদেছিস্ তোর বুঝি আসতে ইচ্ছা ছিল না।” অবরুদ্ধ স্রোত যেমন বাঁধ ভাঙ্গিয়া ছুটিয়া বাহির হয়—আমি মায়ের কোলে বসিয়া তেমনি করিয়া খুব কাঁদিলাম, মা কেবল বলিতেছেন—“আরে একি কাঁদিস কেন?” বলিতে পারি না কেন কাঁদিতেছি বা কাহার জন্য কাঁদিতেছি—অশ্রুস্রোত কিছুতেই রোধ করিতে পারিতেছি না যে!

ডেনমার্কে কৃষকদের উচ্চশিক্ষা।

ইয়োরোপে জনশিক্ষার সুবন্দোবস্ত খুব বেশীদিনের ব্যাপার নহে। এমন অনেক লোক আছে, বিশেষতঃ কৃষকশ্রেণীর মধ্যে, যাহারা বাল্যকালে শিক্ষালাভে সুযোগ পায় নাই। কিন্তু এখন ইয়োরোপের সর্ব্বত্রই এই শ্রেণীর লোকের শিক্ষার নানাপ্রকার চেষ্টা চলিতেছে ও অনেকস্থলে তাহা আশ্চর্য্য ফলপ্রসব করিয়াছে। এবিষয়ে ডেনমার্কের কার্য্যকলাপ অত্যন্ত শিক্ষাপ্রদ এবং বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা তাহারই আলোচনা করিব। সম্প্রতি ইংলণ্ডে প্রকাশিত Cornhill Magazineএ এবিষয়ে একটী মনোজ্ঞ প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে, তাহা হইতে কিছু সঙ্কলন করিলাম।

শীতের এক প্রাতঃকালে টেষ্ট্রাপ (Testrup) উচ্চবিদ্যালয়ের হলঘরে প্রায় নব্বই জন লোক বসিয়াছিল। দিনটা বড়ই কন্‌কনে ঠাণ্ডা; বাহিরে সমগ্র গ্রাম্যপ্রদেশটী সমুদ্র-তীর পর্য্যন্ত বরফে ঢাকা। বাহ্যপ্রকৃতিতে যেন কেমন একটা শূন্যতা ও প্রাণহীনতা প্রকাশ পাইতেছিল। কিন্তু স্কুলঘরে চারিদিকে তেমনই সজীবতা ও আনন্দতরঙ্গ প্রবাহিত। ব্যগ্র কথা, সাদর অভিবাদন, উপহাস ও হাস্যালাপে ঘরটী মুখরিত। একটা জীবন্ত ভ্রাতৃভাব ক্ষেত্রের মালিক ও চাষীকে এক করিয়াছিল।

বক্তৃতার ঘরটী বেশ বড়, বায়ু ও আলোকপূর্ণ। দেয়ালে কয়েকখানা সুন্দর ছবি ঝুলান রহিয়াছে। দুই একটী ছোট প্রস্তর-মূর্ত্তি, ফুলের ও চারা গাছের টবগুলি ঘরটীকে একটী মার্জ্জিত ভাব প্রদান করিয়াছে। লোকগুলি দেখিতে ঠিক খাঁটী কৃষকেরই মত। প্রায় $\frac{3}{4}$ অংশ ছাত্র কৃষক বা ক্ষেতের মজুর,

তাহাদের পরিচ্ছদও তদনুরূপ,—দেখিলে মনে হয়, তাহারা এইমাত্র যেন লাঙ্গল ছাড়িয়া আসিয়াছে। ছয়জন ছাত্র ছোট জমিদার আর ছয়জন শাকশব্জীর মালী,—কয়েকজন ফেরিওয়ালা, কয়েকটী মৎস্যজীবি, দুইজন নাবিক, একটী গ্রাম্য পুরোহিতপুত্র, আর একজন গ্রাম্য পণ্ডিত, ইহারাই বিদ্যালয়ের ছাত্র। অধিকাংশ ছাত্রের বয়স ২০ হইতে ৩০, কয়েকজন ৪০, ও একজন ৬০ বৎসরেরও ঊর্দ্ধ বয়স্ক। অদ্ভুত দৃশ্য! এই দাড়ীগোঁফ-ওয়ালা, রুক্ষ বদন, প্রকাণ্ডকায় লোকগুলি জীবনের মধ্য সময়ে পাঠশালার বেঞ্চে বসিয়া বিদ্যাভ্যাস করিতেছে! তাহাদের আঙ্গুল-গুলি পেন্সিল বা কলম ধরিবার পক্ষে অসম্ভব মোটা, যেন একাজের জন্য তাহাদের সৃষ্টি হয় নাই। তাহাদের চেহারা রৌদ্র ঝটিকা-হত ও কঠোর পরিশ্রমের চিহ্নযুক্ত। কয়েকজনের চক্ষে দারিদ্র্যকষাঘাত চিহ্ন দীপ্যমান।

তাহারা যখন বিদ্যালয় গৃহে আসিতেছিল, তাহাদের শারীরিক গঠন মনোরম বলিয়া বোধ হইল। দেখিতে চটপটে এবং অনেকের চক্ষু বেশ উজ্জ্বল, কিন্তু সাধারণতঃ কাহাকেই বিশেষ বুদ্ধিমান বলিয়া মনে হয় না, এমন কি কেহ কেহ যেন একবারে ভাবশূন্য ও নিদ্রাবিষ্ট। কিন্তু যেমন বক্তৃতা আরম্ভ হইল, দেখিলাম আমার ধারণা সম্পূর্ণ ভুল।

সেদিন ডেনমার্কের একজন বিখ্যাত বক্তা সেখানে বক্তৃতা করিতেছিলেন। বিষয়, আলেকজাণ্ডার ও তাঁহার প্রাচ্য-বিজয়। তিনি উজ্জ্বল বর্ণে আলেকজাণ্ডারের বিজয়-কাহিনী বর্ণনা করিতেছিলেন আর সেই লোকগুলি মন্ত্রমুগ্ধবৎ তাহা শুনিতেছিল।—বক্তৃতান্তে কথাপ্রসঙ্গে বক্তা আমাকে বলিলেন যে, ইহারা ইতিহাস সম্বন্ধীয় কথায় অন্ধভাবে বিশ্বাস স্থাপন করিবে কিন্তু ইহাদের রাজ-নৈতিক মতামত লইয়া আলোচনা করিতে আমি সাহসী নহি।

"আর একদিন নরওয়ের "গ্রাম্য কথা" বিষয়ে বক্তৃতা হইতেছিল এবং এ বিষয়ে ইহা-দের অধিকতর উৎসাহ দৃষ্ট হইল। কেননা ইহা তাহাদের পরিচিত বিষয়; ইহার অনেক 'কথাই' তাহারা মাতৃস্তন্যের সহিত পান করিয়াছে। তাহাদের সহিত সাহিত্য বিষয়ে আলাপ করিয়াও কিছু বিস্মিত হইলাম। দেখিলাম যে তাহাদের কর্ম্মকঠোর জীবনের বিরল অবসরে তাহারা অনেক পড়িয়াছে ও নানা বিষয়ে যথেষ্ট চিন্তা করিয়াছে! তাহারা যে কেবল তাহা-দের জাতীয় সাহিত্যের রত্নরাজির সহিত পরিচিত এখন নহে—তাহারা প্রীতিপূর্ণ যত্নের সহিত সেক্সপীয়র অধ্যয়ন করিয়াছে এবং Ibsen, Bjornson, Goethe ও Schiller ও তাহাদের অপরিচিত নহে।

বস্তুতঃ ইতিহাস ও সাহিত্যই ইহাদের প্রিয় বিষয়—বিশেষতঃ ডেনমার্কের ইতিহাস ও সাহিত্য। কারণ ইহারা জাতীয় ভাবে পূর্ণ। তবুও তাহারা ভূগোল, অঙ্ক ও হস্তাক্ষর শিক্ষায় যথেষ্ট সময় দান করে। তাহাদের শাসন ও স্বত্ব-সম্বন্ধীয় আইনও কিছু কিছু শিক্ষা দেওয়া হয়। সরলবিজ্ঞান ও স্বাস্থ্য বিষয়ে যে বক্তৃতা হয় তাহা এবং কৃষিবিষয়ক সহজ বৈজ্ঞানিক তথ্য সকল তাহারা অত্যন্ত মনোযোগের সহিত শ্রবণ করে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে একটী সমিতি দ্বারা কতকগুলি স্বল্পমূল্য সরলবিজ্ঞান-

পাঠ প্রকাশিত হইয়াছিল। কৃষকগণ তাহা অত্যন্ত আগ্রহের সহিত ক্রয় করিয়াছিল!

প্রাতে ৮½ টার সময় বক্তৃতা আরম্ভ হয় আর সন্ধ্যা ৬টায় স্কুলের কাজ একরকম শেষ হইয়া যায়। তাহার পর সকলে ব্যায়ামাগারে যাইয়া ব্যায়াম করে। এই ব্যায়াম বৈজ্ঞানিক প্রণালীসম্মত ও ইহাতে শরীরের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি সাধিত হয়। প্রায় সকলেই অত্যন্ত আনন্দের সহিত ইহাতে যোগদান করে। তাহারা বলে এই একঘণ্টা ব্যায়াম না করিলে আমরা কখনই আমাদের মস্তিষ্ক চালনা করিতে পারিতাম না।

সন্ধ্যার সময় আবার সকলে একত্র সমবেত হয় ও কোন শিক্ষক তাহাদের নিকট কবিতা পড়েন—কোন কোন দিন কবিতার বদলে সঙ্গীত হয়। তাহাদের মধ্যেই ওস্তাদ বাদক বা গায়ক আছে। তারপর ধূমপান ও গল্পগুজব—ইহা অত্যন্ত আনন্দের সময় —কারণ ইহারা যেন একটী বৃহৎ পরিবার-বিশেষ,—এই সময় শিক্ষক ছাত্রে একত্র বসিয়া নানাপ্রকার রহস্যালাপে তাহাদের ভ্রাতৃভাবের পরিচয় দিয়া থাকে। রাত্রি দশটার সময় তাহারা শয়ন করিতে যায় এবং সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই শয্যাত্যাগ করে। গ্রীষ্মকালে ইহা মেয়েদের স্কুলে পরিণত হয় এবং তাহারাও সংখ্যায় ও আগ্রহে পুরুষদিগকে পশ্চাতে ফেলিতে সক্ষম হয়।

এই স্কুলে ছাত্রগণ কঠোর পরিশ্রম করে, কারণ ইহা পাঁচ মাস মাত্র স্থায়ী—আর এই পাঁচ মাসের মধ্যে সমগ্র জীবনের শিক্ষা আয়ত্ত করিয়া লইতে হয়। দ্বিতীয়বার স্কুলে আসা অনেকের ভাগ্যেই হইয়া উঠে না। একবার আসিতে পারিলেই তাহারা পরম ভাগ্য মনে করে—কারণ তাহাদের ক্ষেতের কার্য্য অন্যের হাতে ফেলিয়া আসিতে হয় এবং বিদ্যালয়ে আসা তাহাদের পক্ষে যথেষ্ট ব্যয়সাধ্য কার্য্য। ১৮৪৪ হইতে ১৮৯৬ সালের মধ্যে ১২০,০০০ ছাত্র-ছাত্রী ডেনমার্কের এইরূপ উচ্চ বিদ্যালয় সমূহে শিক্ষালাভ করিতেছে এবং বর্ত্তমান সময়ে ডেনমার্কের প্রায় এক চতুর্থাংশ কৃষিজীবি পাকে প্রকারে এই সব বিদ্যালয়ে একবার করিয়া প্রবেশ করে।

স্কুলের গৃহস্থালী বন্দোবস্ত অত্যন্ত সাদাসিধা। খাদ্য সুপাচ্য, পুষ্টিকর ও প্রচুর হইলেও যথাসাধ্য সাধারণ এবং শয়নের বন্দোবস্তও আড়ম্বরহীন। কারণ খরচ কম না হইলে এস্থানে কৃষকদের শিক্ষালাভ করা অসম্ভব। এই বিদ্যালয়টীতে সকলেই নিজ নিজ ব্যয় বহন করে। ডেনমার্কে একজন কৃষকের বাৎসরিক আয় প্রায় ৪৫০৲ টাকা। এই স্কুলের ব্যয় জনপ্রতি ১৫০৲ টাকা। গবর্ণমেণ্ট হইতে ৩০৲ টাকা করিয়া দেওয়া হয় সুতরাং প্রত্যেকের ১২০৲ টাকা করিয়া খরচ করিতে হয় এবং তাহারা সানন্দে এই খরচ বহন করে। কিন্তু ইহার জন্য তাহাদিগকে অসম্ভব পরিশ্রম করিতে হয়। হয়ত বহুবৎসর ধরিয়া সামান্য সামান্য সুখস্বাচ্ছন্দ্য হইতে নিজেকে বঞ্চিত করিয়া অর্থ জমাইয়া প্রৌঢ় বা বৃদ্ধ বয়সে স্কুলে আসিতে সক্ষম হয়! এই সকল ছাত্র যখন গৃহে প্রত্যাগমন করে তাহারা নূতন চিন্তা, নূতন ভাব লইয়া আসে এবং শীঘ্রই তাহা চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়ে।

ডেনমার্ক এই প্রকার বিদ্যালয়ের জন্য তাহার একজন বিখ্যাত কবি-ধর্ম্মযাজকের নিকট ঋণী। এই মহাত্মা (Nicolai Grundtrig) বিগত শতাব্দির মধ্য ভাগে এই জাতীয় কার্য্যের সূচনা করেন। ডেনমার্ক তখন মৃতপ্রায়, দারিদ্র্য-পীড়িত ও হীনবুদ্ধি। এই দুঃসময়ে এই কবি বাগ্মী ও স্বজাতিপ্রেমিক অসাধারণ যুবক অদম্য উৎসাহ লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। দেশের সর্ব্বস্থান তাঁহার উদ্দীপনাপূর্ণ বক্তৃতায়, জাতীয় সঙ্গীতে ও পূর্ব্বপুরুষের গৌরবকাহিনীতে নবজীবন লাভ করিতে লাগিল।

আশ্চর্য্যের বিষয় ইহাদ্বারা দেশের কৃষকগণই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিল। তাহারা একবাক্যে প্রশ্ন করিল, দেশকে রক্ষা করিতে হইলে আমাদের কি করিতে হইবে?" সেই মহাত্মা উত্তর করিলেন, "শিক্ষালাভ কর"। তিনি নিজেই বিদ্যালয়ের নিয়মাবলী লিপিবদ্ধ করিয়া কৃষকদের জন্য স্থানে স্থানে বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন। মৌখিক শিক্ষার নিয়ম তিনিই প্রচলন করিলেন। কিছুদিনের মধ্যে কৃষকদের চেষ্টায় নানা স্থানে তাঁহার আদর্শানুযায়ী স্কুল সমূহ স্থাপিত হইল। যুদ্ধ বিগ্রহাদির দরুণ কিছুদিন শিক্ষাকার্য্য স্থগিত রহিল। কিন্তু এই যুদ্ধে ডেনমার্কের কতকাংশ জার্ম্মেণীর করায়ত্ত হওয়াতে তাহারা একবারে নিরুৎসাহ হইয়া পড়িল, তাহাদের সমস্ত আশা ভরসা নির্ম্মূল হইবার উপক্রম হইল। এই সময়ে Dr. Norregaard নামক একটী উচ্চশিক্ষিত, ধনী যুবক তাঁহার উচ্চ পদমর্য্যাদাকাঙ্ক্ষা পরিহার করিয়া এক সীমাহীন বিজন গ্রাম্য প্রদেশে কৃষকদের মধ্যে জীবন উৎসর্গ করিলেন। তিনিই প্রথমে এই Testrup বিদ্যালয় স্থাপন করেন ও বহু বৎসর পর্য্যন্ত নিজে ইহার সমস্ত ব্যয়ভার বহন করেন। ক্রমে তাঁহার দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইয়া কৃষকগণ আবার জাগিয়া উঠিল। সর্ব্ব স্থানেই স্কুল সমূহ স্থাপিত হইল। বর্ত্তমান সময়ে ডেনমার্কে ৭৫টী উচ্চ বিদ্যালয় কৃষকদের শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত করিয়া রহিয়াছে।

প্রথমে অনেকে আশঙ্কা করিয়াছিলেন যে এইরূপ বিদ্যালয়ে বুঝি সব কৃষক পণ্ডিত হইয়া তাহাদের চাষবাসের কাজ ছাড়িয়া দিবে। কিন্তু কৃষকগণ ইহার যে উত্তর দিয়াছিল তাহা অত্যন্ত শিক্ষাপ্রদ। "তাহারা ইহা বুঝিতে চায় যে শরীরের সহিত তাহাদের মন ও আত্মা বলিয়া আরও দুইটী জিনিষ আছে। তাহাদের ক্ষেতের বাহিরের বিষয়ও তাহারা জানিতে চায়। তাহারা একবার তাহাদের মস্তক চালনা করিতে শিখিলে নিজেরাই হস্ত চালাইতে শিখিবে। একবার প্রকৃত ভাবে চিন্তা ও বিচার করিতে শিখিলে, ভাল করিয়া চাষ করিতেও শিখিবে।" তাহাদের কথায় যাথার্থ্য কার্য্যতই তাহারা সপ্রমাণ করিয়াছে। এই শিক্ষার ফলে তাহারা কৃষি বিষয়ে নানাপ্রকার উন্নতি লাভ করিয়া ইয়োরোপের কৃষককুলের মধ্যে বরণীয় হইয়াছে।

এ স্থানে প্রসঙ্গ ক্রমে ডেনমার্কের কৃষি বিষয়ক অন্যান্য অনুষ্ঠানের কথা কিছু বলিতে ইচ্ছা করি। ১৮৬০ সালে জার্ম্মেণীর সহিত

যুদ্ধে ডেনমার্কের সর্ব্বাপেক্ষা উর্ব্বর ও মূল্যবান দুইটী প্রদেশ তাহাদের হস্তচ্যুত হয়। বাকি যে ক্ষুদ্র অংশ তাহাদের হস্তে রহিল তাহার অধিকাংশই জলাভূমি ও বালুকাপ্রদেশ। আর সেই স্থানে উত্তর সমুদ্রের প্রচণ্ড ঝটিকা ও প্রবল বাত্যা সর্ব্বদা মনুষ্যশক্তির সহিত সংগ্রাম করিতেছে। কৃষির অবস্থাও তখন অত্যন্ত শোচনীয়। তখন আমেরিকার শস্য ইয়োরোপের শস্য-ব্যবসায়কে প্রায় নির্ম্মূল করিয়াছে। এই সময় আবার জার্ম্মেণী অকস্মাৎ বিদেশী পণ্য দ্রব্যের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল। এই দুর্দ্দিনে ডেনমার্ক তাহার জাতীয় অস্তিত্ব লোপের আশঙ্কায় ত্রস্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু যে অমানুষিক উৎসাহ ও চেষ্টা দ্বারা উক্ত অবস্থা অতিক্রম পূর্ব্বক ক্রমশ তাহারা আজ অনেক শক্তিশালী জাতির সমকক্ষ হইয়া উঠিয়াছে—কেবল তাহাই নহে ব্যবসায় ক্ষেত্রে তাহাদিগকে পশ্চাতে ফেলিয়াছে তাহা আমাদের এই দুঃসময়ে অত্যন্ত শিক্ষাপ্রদ।

১৮৬৬ সালে Colonal Dalgas নামক এক স্বজাতিবৎসল মহাত্মা ডেনমার্কের পতিত ও জলাভূমি সকলের উন্নতি বিধান করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। তাঁহার স্থাপিত সমিতির চেষ্টায় রাস্তা ঘাট ও রেলপথ সকল নির্ম্মিত হইতে লাগিল, জলপ্রবাহের বন্দোবস্ত হইল, ৩০০,০০০ বিঘা বালুকাময় ভূমি উর্ব্বর ভূমিতে পরিণত হইল, এবং দুইটী কৃষি-বিষয়ক পরীক্ষাগার ও চারি শত পরীক্ষা ক্ষেত্র স্থাপিত হইল!

চতুষ্পার্শ্বস্থিত দেশের প্রতিযোগিতায় তাহাদের ব্যবসাসমূহ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল। মাখনের ব্যবসায়ে অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইলে তাহারা এক নূতন উপায় উদ্ভাবন করিল। স্থানে স্থানে কৃষকগণ একত্র হইয়া স্বস্ব গৃহোৎপন্ন নবনীত একস্থানে মাখনে পরিণত করিতে লাগিল। ইহাতে খরচ ও সময় উভয়ই অনেক সংক্ষেপ হইল। এই সমবেত চেষ্টায় উন্নত প্রণালীর ব্যয় সাধ্য মাখন প্রস্তুতের ঘূর্ণন যন্ত্র ক্রয় করিয়া একই স্থানে তাহারা অনেক মাখন প্রস্তুত করিতে লাগিল। জাতীয় শিক্ষা, কৃষিশিক্ষা ও অধ্যাপকগণের বৈজ্ঞানিক গবেষণা তাহাদের সহায় হইল। এই সময়ে (১৮৮২) কৃষকগণ স্থানে স্থানে Co-operative Dairy সকল স্থাপন করিতে আরম্ভ করিল। হয়ত ১৫০ কৃষক মিলিয়া প্রত্যেকে ১২০, টাকা করিয়া চাঁদা উঠাইয়া dairy স্থাপন করিল। এই dairyতে তাহাদের ৮৫০, হইতে ১০০০ গাভীর দুগ্ধ আনীত ও মাখনে পরিণত হইতে লাগিল। মধ্যবর্ত্তী মহাজনদের হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার নিমিত্ত তাহারা মাখন বিক্রয়ের সমিতি স্থাপন করিল। এই সমিতি হইতে নিযুক্ত লোকেরা মাখনের গুণাগুণ বিচার, দুগ্ধের তারতম্য বিচার, অসাধু কৃষককে শাস্তি দান, রুগ্ন গাভীকুলের চিকিৎসা ও দুগ্ধ দোহন নিবারণ এবং দেশ বিদেশে মাখন প্রেরণ প্রভৃতির সুবন্দোবস্ত করিতে লাগিল। এই চেষ্টার ফলে এখন সমগ্র ডেনমার্কে যে ১০৫০টী dairy স্থাপিত হইয়াছে, ইহার কৃষক সভ্যের সংখ্যা ১৪৮,০০০, এবং দেশের মোট ১,০৬৭,০০০ গাভীর মধ্যে ৭৫০,০০০ গাভীর দুগ্ধ এই স্থান সমূহে সংগৃহীত হয়! ১৯০২ সালে এই দেশ হইতে ইংলণ্ডে প্রায় ১৪ কোটী মুদ্রার মাখন রপ্তানি

হইয়াছে! এবং ইহা কেবল কৃষকদের সমবেত চেষ্টার ফল!

এই সমবেত চেষ্টায় কৃষকগণ অন্যান্য অনেক ব্যবসায়েও বিশেষ লাভবান হইতেছে। বীজ, পশুর আহার, সার, যন্ত্রাদি ও অন্যান্য আবশ্যকীয় বস্তু সকলই তাহারা একত্র হইয়া ক্রয় করিয়া থাকে, ও এই প্রকারে অনেক ব্যয় সংক্ষেপ করে। কৃষি সম্পর্কীয় সর্ব্বপ্রকার ব্যবসায়ই তাহারা সমবেত যত্ন ও চেষ্টায় এমন উন্নত ও লাভবান করিয়া তুলিয়াছে যে ইয়োরোপের নানা স্থানে তাহাদের এই প্রণালী অনুসৃত হইতেছে। এই বিষয়ে আরও বিশেষ করিয়া কেহ জানিতে ইচ্ছা করিলে Report on Co-operative Agriculture and Rural Condition in Denmark নামক পুস্তকে জানিতে পারিবেন। উক্ত পুস্তক—Secretary Department of Agriculture and Technical Instruction for Ireland, Dublin. ঠিকানায় প্রাপ্তব্য।

এই প্রসঙ্গে আমাদের দেশ সম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিব। কিছুদিন পূর্ব্বে রবি বাবু তাঁহার "স্বদেশী সমাজে" ও পাবনা বক্তৃতায় আমাদের গ্রাম্য বিভাগের কার্য্য প্রণালীর বিষয় কতকটা আলোচনা করিয়াছিলেন। 'বন্দে মাতরম্' পত্রিকাতেও কয়েকটী প্রবন্ধে ইহার ইঙ্গিত ছিল। এ বিষয়ে আমাদের দেশে বিস্তৃত আলোচনার বিশেষ প্রয়োজন। আমরা অনেক সময়ে ভুলিয়া যাই যে দেশের কৃষকগণ জাতীয় শরীরের মজ্জা স্বরূপ। তাহাদের অবস্থার

আকৃষ্ট হয় নাই। গবর্ণমেণ্টের সাহায্য ব্যতিরেকেও,—নানা বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও আমাদের এ বিষয়ে অনেক কাজ করিবার আছে। আজকালকার গ্রাম্য জীবন শুষ্ক ও প্রাণহীন। সেই ঘনিষ্ঠ ও কোমলতা পূর্ণ জীবন আর নাই। সহরগুলি অনেক পরিমাণে গ্রামের শক্তি হরণ করিয়াছে, কিন্তু গ্রামের সে সহজ সারল্য কোথায় পাইবে? গ্রামের গৃহ পরিত্যাগ করিয়া আমরা গৃহশূন্য ভিখারী সাজিয়াছি। জাতীয় জীবনকে শক্তিশালী করিতে হইলে সর্ব্ব প্রথমে আমাদিগকে গৃহ খুঁজিয়া লইতে হইবে। ভারতের প্রতি পল্লির প্রত্যেক পর্ণকুটীর আমাদিগকে আহ্বান করিতেছে—একই গৃহের সহস্র দ্বারপথ হইতে যে কাতরতাপূর্ণ অনাহারক্লিষ্ট ক্ষীণ আহ্বান আসিতেছে আমরা তাহা কবে শুনিব? সেই দ্বারপথে প্রবেশ করিয়া নিজের গৃহকে আবার বরণ করিয়া লইব কবে?

আমরা 'স্বদেশ' 'স্বদেশ' বলি। কিন্তু এই স্বদেশ কি কেবল শ্যামল শস্যক্ষেত্র, প্রান্তর, পর্ব্বত, নদনদী ও কতিপয় শিক্ষিত (?) লোক লইয়া? না আমাদের রুগ্না মাতৃস্বরূপা জন্মভূমির স্তন্যপায়ী কোলের ছেলে, তাঁহার হৃদয়ের অতি সন্নিকটবর্ত্তী অতিপ্রিয়, তাঁহার জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি যাহারা সেই কোটী কোটী কৃষক লইয়া? আমরা শিক্ষিত সমাজ দূর হইতে এই জননীর ভরণপোষণের ব্যবস্থা করি কিন্তু যুগযুগান্তরের উপেক্ষিতা এই জননীর দারিদ্র্য ও হৃদয় বেদনা ইহাতে নিবারিত হয় না। আমরা ত আহার বিহারে এক প্রকারে জীবন কাটাই, কিন্তু এই

তাঁহার প্রাণস্বরূপ সহস্র সহস্র পুত্র কন্যা প্রতিদিন এক মুষ্টি অন্নাভাবে প্রাণত্যাগ করিতেছে, তাঁহার দুঃখ ঘুচিবে কি করিয়া ?

আমাদিগকে গ্রামের শ্যামল ধরণী বক্ষে—জননীর হৃদয় সন্নিকটবর্ত্তী স্নেহক্রোড়ে ফিরিয়া যাইতে হইবে—সেখানে মান সম্ভ্রম প্রতিপত্তি নাই কিন্তু স্নেহ ও ভালবাসার উৎস সেখানে খুলিয়া যাইবে। কৃষকের পর্ণকুটীরকে আমাদের গৃহ করিয়া লইতে হইবে, প্রাণের প্রত্যেক অণুতে অণুতে তাহাদিগকে ভাই বলিয়া অনুভব করিয়া তাহাদের শিক্ষা ও উন্নতির জন্য জীবন উৎসর্গ করিতে হইবে। পল্লী জীবনেই ভারতের সভ্যতা ও জীবনী শক্তি বিকাশ পাইয়াছিল, আবার এই পল্লিই আমাদের অধঃপাতের কারণ হইয়াছিল। যে দিন হইতে আমরা ভারতের জাতীয় জীবন হইতে পল্লীগুলিকে বিচ্ছিন্ন করিয়া—বাহ্য জগতের সহিত সম্পর্ক শূন্য হইয়া পল্লীর রুদ্ধ ও অস্বাস্থ্যকর ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আমাদের জীবনকে আবদ্ধ করিয়া, জনসাধারণের শিক্ষা ও উন্নতির দ্বার সঙ্কীর্ণ করিলাম সে দিন হইতে আমাদের অধঃপতন আরম্ভ হইল। সমগ্র ভারতের জাতিধর্ম্ম ভুলিয়া গিয়া এক মহান ও বিশাল জাতীয় জীবনের অংশ স্বরূপ আমাদের পল্লীগুলিকে আবার গঠিত ও অনুপ্রাণিত করিয়া তুলিতে হইবে। আমরা উচ্চ সমাজের লোক নিম্ন সমাজের প্রতি আমাদের কর্ত্তব্য সম্পূর্ণরূপে পালন করি নাই তাই আজ যুগযুগান্তরের অবহেলা ও অপমানের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ আমাদের হৃদয়ের সমস্ত স্নেহ ভালবাসা দ্বারা সেই কর্ত্তব্য পালন করিতে হইবে। চিন্তা করিলে আমরা বুঝিতে পারিব ইহাই ভারতীয় সভ্যতার আদর্শ। আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ সমগ্র ভারতবাসীকে এই সভ্যতা দানে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। আজ সময় আসিয়াছে, তাঁহাদের আরব্ধ কার্য্য আমাদিগকে সম্পূর্ণ করিতে হইবে।

শিক্ষার এক প্রধান উদ্দেশ্য মানুষের ভাব গ্রহণ ক্ষমতা ফুটাইয়া তোলা। কেবল পুস্তক দ্বারাই বিদ্যাশিক্ষা হয় না। ধর্ম্মপ্রচারের মত সাধারণ জ্ঞানও সহজ ও সরল কথায় জনসমাজে বিস্তৃতি লাভ করে। আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় জনসাধারণের জন্য সম্পূর্ণ সুপরিচালিত বিদ্যালয় হওয়া অসম্ভব,—কিন্তু তাই বলিয়া সাধারণ জ্ঞান লাভের পথ রুদ্ধ থাকিবে কেন ? গ্রীষ্মের ছুটিতে পল্লীগ্রামে অনেক অবসরবহুল ছাত্র ও শিক্ষিত লোকের সমাগম হয়। প্রতি বৎসর এই কয় মাসের জন্য আমরা যদি সন্ধ্যাকালে গ্রামের কৃষকগণকে একত্র করিয়া স্বদেশের ও বিদেশের ভূগোল ইতিহাস ও বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে সহজ ও সরল কথায় আলোচনা করি তবে ভবিষ্যৎ শিক্ষার ভিত্তি স্থাপন হইতে পারে ; আমাদের পরস্পরের মধ্যে ব্যবধান দূর হইয়া জাতীয় জীবনকে শক্তিশীল করিয়া তুলিতে পারে। ক্রমে ক্রমে এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মিলন ক্ষেত্র গুলিকে আমরা বিদ্যালয়, কৃষি সমিতি বা Co-operative society তে পরিণত করিয়া পল্লিজীবনকে গড়িয়া তুলিতে পারি। কৃষি বিষয়ক উন্নতিচেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃষি ব্যবসার উন্নতির সমবেত চেষ্টাও চলিতে পারে। কৃষি বিদ্যায় পারদর্শী বিদেশ প্রত্যাগত ছাত্রগণ এবং জাপানে

শিক্ষিত শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয় ও আমেরিকা প্রত্যাগত শ্রীযুক্ত দ্বিজদাস দত্ত মহাশয় প্রভৃতি মহোদয়গণ সময় ও সুযোগ মত নিমন্ত্রিত হইলে যে তাঁহারা সানন্দ চিত্তে এইরূপ পল্লীসম্মিলনে যোগদান করিয়া ইহার মঙ্গল উদ্যোগের সহায়ক হইবেন তাহাতে সন্দেহ নাই। দূরদেশ হইতে কার্য্য-প্রণালীর বিষয় অধিক লেখা অসঙ্গত হইবে। কিন্তু আমার বিনীত প্রার্থনা এই দেশের সাময়িক পত্রিকা সকল এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করুন।

কোন আমেরিকা প্রবাসী—বিদ্যার্থী।

বিধবাবিবাহ ও হিন্দুপত্রিকা।

বিধবার বিবাহ লইয়া আমাদের কায়স্থ সমাজে সম্প্রতি মহা আন্দোলন উপস্থিত। কি উপলক্ষ্য লইয়া এই আন্দোলন তাহা সংবাদপত্রের পাঠকমাত্রেই জানেন।

দুই তিন বৎসর পূর্ব্বে এক সম্ভ্রান্ত কায়স্থ গৃহে একটি বালবিধবা কন্যার বিবাহ হইয়া গিয়াছে। তখন কায়স্থসমাজ এসম্বন্ধে নীরব ছিলেন,—সমাজের মান্যগণ্য অনেকেই বরঞ্চ বিবাহ সভায় উপস্থিত থাকিয়া সহানুভূতি জ্ঞাপন করিয়াছেন। আজ সেই ঘরেরই একটি কুমারী কন্যার বিবাহের সময় তাঁহাদের কর্ত্তব্যজ্ঞান সহসা এমন সর্ব্বনাশতৎপর উন্মত্ত ভাবে কেন যে জাগরিত হইয়া উঠিল— তাহা সহজবুদ্ধিতে বুঝিয়া উঠা দুষ্কর।

পরদুঃখকাতর স্বাধীনচেতা বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন দেশের লক্ষ লক্ষ লাঞ্ছিতা অসহায়া বালবিধবার নিত্য যন্ত্রণা নিবারণ সংকল্পে শাস্ত্রের প্রমাণানুসারে সমাজে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত করিবার প্রয়াস পান—তখন কিছুদিন বঙ্গসমাজে এইরূপ শোচনীয় দৃশ্যের তাণ্ডব অভিনয় হইয়াছিল। কিন্তু সে আজ অনেক দিনের কথা। ইতিমধ্যে আমাদের সমাজে অনেক ভ্রান্ত সংস্কারের সঙ্কীর্ণ গণ্ডী ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, অনেক প্রচলিত কুরীতি অজ্ঞাতসারে ধীরে ধীরে লুপ্তপ্রায় হইয়াছে, অনেক বিষয়ে আমরা সমধিক উদার ও বিবেচক হইতে শিখিয়াছি। অন্ততঃ ইহা বলিয়া আমরা গর্ব্ব করিয়া থাকি। কিন্তু আজ পরীক্ষাস্থলে আমাদের সে গর্ব্ব যে শতচূর্ণ হইয়া গেল! আর যে বিষয়েই সমাজ উন্নতি পথে অগ্রসর হউক না, রমণীগণের মনুষ্যোচিত সুখ শিক্ষা ও সর্ব্বাঙ্গীন বিকাশ বিধানে তাহার স্বার্থ খড়্গ এখনো বজ্ররূপে উদ্যত। অবশ্য সমাজে কোন নূতন প্রথা প্রবর্ত্তিত করিবার পূর্ব্বে তাহার শুভাশুভ ফল সম্বন্ধে বিচার করিয়া দেখিবার অধিকার সকলেরই আছে। কিন্তু সেজন্য বিচারকের সর্ব্বতোভাবে নিঃস্বার্থ ও নিরপেক্ষ হওয়া আবশ্যক। বিধবাবিবাহের বিপক্ষীয়গণ সেরূপ উদার ও উন্নত বিচারের পরিবর্ত্তে যেরূপ হৃদয়হীন দ্বন্দ্বকুশলতার পরিচয় দিয়াছেন এ ক্ষেত্রে তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষোভের কারণ। মান্ধাতার আমল হইতে প্রচলিত যে কয়েকটি অতি পুরাতন প্রতিবাদ-শর তাঁহাদের ঝুলিতে জীর্ণ হইয়া পড়িয়া ছিল

সেইগুলিকে যথাসাধ্য শাণ দিয়া প্রবলবেগে শত্রুসন্ধান করিয়াই তাঁহারা ক্ষান্ত হন নাই, কলির ধর্ম্মে শত্রুস্পর্শে তাহাদিগকে খণ্ড বিখণ্ড হইতে দেখিয়া অবশেষে "জাতঃপাত"রূপ ভয়-প্রদর্শন ব্রহ্মাস্ত্রে বিপক্ষ পক্ষকে সমূলে নিপাতোদ্যত হইয়াছেন।

এই বিবাহে যিনি ইঙ্গিতেও সহানুভূতি ব্যক্ত করিয়াছেন—কেবল তিনি নহেন,—তাঁহার সুদূর সম্ভাবিত অজাত বংশধরটি পর্য্যন্ত উক্ত ব্রহ্মাস্ত্রের লক্ষ্যভূত হইয়াছেন। শ্রীযুক্ত ভবনাথকে "একঘরে" করিবার জন্য কিরূপ প্রলয়োদ্যোগ চলিয়াছিল সকলেই জানেন। সভাসমিতিতে বক্তৃতা করিয়া, resolution পাশ করিয়া,সকলের বাড়ী বাড়ী গিয়া নিষেধ করিয়াও ইঁহারা সন্তুষ্ট হন নাই; শেষে শ্রাদ্ধের দিনে নিমন্ত্রিতগণের বাড়ীতে হ্যাণ্ডবিল ফেলিয়া তাঁহা-দিগকে নিরস্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। সেন মহাশয়ের এই মাত্র অপরাধ, তিনি তাঁহার উদারচরিত্রা সর্ব্বজনসম্মানীয়া সাধ্বী পত্নীর শ্রাদ্ধ উপলক্ষে—বিধবা বিবাহের স্বপক্ষ বিপক্ষ নির্ব্বিচারে বন্ধুবান্ধব, পরিচিত সকলকেই আহ্বান করিয়াছিলেন। তাঁহাদের বিরোধ কীর্ত্তির ইহাই চরম দৃষ্টান্ত নহে। শুনিতে পাওয়া যায় বিবাহ ভাঙ্গাইবার উদ্দেশ্যে কেহ কেহ নাকি বরকর্ত্তার নিকট ধন্না দিতেও ছাড়েন নাই। নিরপরাধ অবলা বালিকার চির সুখশান্তি হরণ করিয়া কি ইঁহারা পরম পুরুষার্থ লাভ করিতেন। উপন্যাসেও এরূপ নির্য্যাতনের কথা পড়িলে যে অতিরঞ্জিত মনে হইত। আর ইহাও আজ আমাদের শিক্ষিতাভিমানী হিন্দুসমাজের পক্ষে নিন্দনীয় কার্য্য নহে। কোন ভাল কাজের জন্য এতটা যত্ন পরিশ্রম করিলে যে বঙ্গজননীর মুখোজ্জ্বল হইত। এই ত হিন্দু বিধবাদিগের জন্য হিন্দু ধর্ম্মানুমোদিত একটি আশ্রম স্থাপিত হইয়াছে, তাহার সাহায্যে ইঁহারা কয়জন অগ্রসর? পশুদিগের দুঃখ কষ্টে—লোকের যে বেদনাটুকু আছে—স্ত্রীলোকের দুঃখে ইঁহাদের প্রাণ ততটুকু কাতর নহে। হায় হায়,—আর ইঁহারাই ইংরাজের জাতিগত অসমদর্শিতা ও পক্ষপাতিতা দর্শনে ক্রোধান্ধ হইয়া উঠেন!

আমাদের সমাজের শীর্ষস্থানীয় লোক-দিগের এইরূপ শোচনীয় আচরণ দেখিয়া যখন হৃদয় ক্ষোভে দুঃখে মুহ্যমান সেই সময় হিন্দু পত্রিকার বিধবাবিবাহ শীর্ষক প্রবন্ধটি পড়িয়া ক্ষত স্থানে যেন প্রলেপ সিঞ্চিত হইল। এ সম্বন্ধে এমন যুক্তিপূর্ণ অথচ নিরপেক্ষ প্রবন্ধ অনেক দিন পড়ি নাই। এই খানেই আর্য্য হৃদয়ের প্রকৃত উদারতা পরিব্যক্ত। প্রবন্ধটির কতক কতক আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।—

বিধবাবিবাহের বিপক্ষীয়দিগের প্রথম অস্ত্র এই যে হিন্দুসমাজে বিধবাবিবাহ প্রচলিত হইলে, হিন্দুসমাজ অচিরে ধ্বংস হইয়া যাইবে। ইহার উত্তরে হিন্দু পত্রিকা লিখিয়া-ছেন—"এস্থলে স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে, এক বঙ্গদেশ ব্যতীত, ভারতবর্ষে হিন্দুসমাজের মধ্যে বিধবাবিবাহ আবহমান কাল চলিয়া আসিতেছে। যুক্তপ্রদেশ অর্থাৎ, কাশী, প্রয়াগ, লক্ষ্ণৌ, দিল্লী প্রভৃতি স্থানে কতিপয় উচ্চবর্ণ ব্যতীত প্রায় সকল আচমনীয় ও অনাচমনীয় বর্ণের মধ্যে বিধবাবিবাহ প্রচলিত আছে। কুমারীদিগের বিবাহে যেরূপ মন্ত্রাদি

পঠিত হয়, উহাতে তাহা হয় না বটে, কিন্তু এইরূপ বিবাহ সমাজের অনুমোদিত। বোম্বে, মান্দ্রাজ, উড়িষ্যা, বিহার, ছোট নাগপুর, পঞ্জাব, আসাম প্রভৃতি স্থানেও ঐরূপ কতিপয় উচ্চবর্ণ ব্যতীত অন্যান্য বর্ণের মধ্যে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত থাকায়, হিন্দুসমাজের কিছু আসে যায় নাই। তাহা হইলে, বঙ্গদেশে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হইলে হিন্দুসমাজের কি বিশেষ অনিষ্টপাত হইতে পারে, তাহা সকলেরই বিবেচ্য। অধুনা মাদ্রাজ বোম্বে, পাঞ্জাব, যুক্তপ্রদেশেও উচ্চবর্ণের মধ্যে বিধবাবিবাহ হইতেছে।” বস্তুতঃ হিন্দুসমাজ বলিতে যে কেবল বাঙ্গালী সমাজকে বুঝায় না, সেটা বোধ হয় বিধবাবিবাহের বিপক্ষীয়েরাও অস্বীকার করিবেন না। সুতরাং বিধবাবিবাহ প্রচলিত থাকিয়া ভারতের বিভিন্ন হিন্দুসমাজ যদি ধ্বংসপ্রাপ্ত না হইয়া থাকে, তাহা হইলে অভাগা বাঙ্গালীরই অদৃষ্টে যে কি কারণে তাহার ধ্বংসপ্রাপ্তি ঘটিবে, তাহা আমাদের সহজ বুদ্ধির অতীত।

বিপক্ষীয়গণের দ্বিতীয়অস্ত্র—বিধবাবিবাহ শাস্ত্রসম্মত নহে। এ স্থলে শাস্ত্র অর্থে তাঁহারা কি বুঝেন তাহা আমরা জানি না, তবে আমাদের বিশ্বাস যে, কোন সমাজের সাময়িক অবস্থা ও সভ্যতা অনুসারে তদানীন্তন সমাজ রক্ষার যে সকল নিয়ম প্রবর্ত্তিত হয়, তাহাই সমাজের সময়োচিত বিধি বা শাস্ত্র। শাস্ত্র বলিতে চিরন্তন অপরিবর্ত্তনীয় কোনও সমাজ-বিধি বুঝায় না। আজ যে সকল রীতিকে আমরা শাস্ত্র বিরুদ্ধ বলিতেছি, একদিন এই হিন্দুসমাজেই তাহা শাস্ত্রসম্মত ছিল। আবার আজ আমাদের মধ্যে যাহা সমাজসম্মত হইয়াছে, একদিন তাহাই শাস্ত্র ও সমাজ বিরুদ্ধ ছিল। বিভিন্ন বর্ণের মধ্যে বিবাহ, সমুদ্র যাত্রা, যুবতী কুমারী বা বিধবার বিবাহ একদিন এই ভারতবর্ষেই শাস্ত্রানুগত সমাজ প্রচলিত ক্রিয়া ছিল। কিন্তু মধ্যে রীতির অভাবে তাহা বন্ধ হইয়া যাওয়ায় আজ এরূপ কোন কথা শুনিবামাত্র আমরা ধর্ম্মহানি বা “জাতঃপাতের” আশঙ্কায় আরক্ত নয়নে চীৎকার করিতে ও শাস্ত্রকে সাক্ষী মানিয়া আত্মসমর্থনের চেষ্টা করিতে কিঞ্চিন্মাত্রও লজ্জাবোধ করি না। বিধবাবিবাহ যে একদিন ভারতে শাস্ত্র সম্মত ভাবে প্রচলিত ছিল, তাহা বোধ হয় বিপক্ষীয়দিগের কেহই অস্বীকার করিতে অগ্রসর হইবেন না। তবে আজ শাস্ত্রের দোহাই দিয়া পথে পথে এ চীৎকার কেন? বস্তুতঃ নিজেদের নিত্য-জীবনে যাঁহারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে সাময়িক আত্মসুখের জন্য সনাতন শাস্ত্র বেচারার দৈনিক শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পন্ন করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করেন না, অনাথিনী বালবিধবার বিবাহ প্রস্তাব শুনিলেই যখন তাঁহারা শাস্ত্রের দোহাই দিয়া রক্তচক্ষু হইয়া চীৎকার করিতে থাকেন, তখন আমাদের লজ্জা ও ক্ষোভ সম্বরণ করা কঠিন হইয়া উঠে।

তাঁহাদের তৃতীয় অস্ত্র এই যে—শাস্ত্রসম্মত হউক আর না হউক, বিধবা বিবাহ আমাদের দেশে প্রচলিত হওয়া কল্যাণকর কি না? কথাটা বিশেষ ভাবিয়া দেখিবার বিষয় সন্দেহ নাই। এ সম্বন্ধে কোন মীমাংসায় উপনীত হইবার পূর্ব্বে পৃথিবীর অন্যান্য সমাজের অবস্থার বিষয় একটু পরিচয় লওয়া আবশ্যক। এ বিষয়ে হিন্দু পত্রিকা লিখিতেছেন—“সমগ্র

পৃথিবীতে তিন শত কোটি মানব বাস করিতেছে। তন্মধ্যে ভারতবর্ষে ত্রিশ কোটি, তাহার মধ্যে শিখ, বৌদ্ধ ও নিম্ন শ্রেণীস্থ হিন্দুর সংখ্যা বাদ দিলে, অতি মুষ্টিমেয় ব্যক্তিদিগের মধ্যে বিধবা-বিবাহ অপ্রচলিত দেখা যায়। ব্রাহ্মণাদি যে কতিপয় উচ্চবর্ণের মধ্যে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত তাহাদের সংখ্যা অত্যল্প। খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ, মুসলমান, য়িহুদি, পারসিক প্রভৃতি সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যেই বিধবা-বিবাহ প্রচলিত দেখা যায়।" এতগুলি বিভিন্ন সমাজের পক্ষে যাহা ক্ষতিকর হয় নাই, নিম্নশ্রেণীস্থ হিন্দুদিগের মধ্যেও যাহা ক্ষতিকর হয় নাই, বঙ্গের উচ্চবর্ণের মধ্যে প্রচলিত হইলেই যে তাহা সমাজের সর্ব্বনাশ সাধন করিবে, এ কথার কোনও অর্থ নাই। আর তাহা ছাড়া দেশে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হইলেই যে বিধবামাত্রেই বিবাহের জন্য অগ্রসর হইবেন তাহাও নহে। হিন্দু পত্রিকা ইহা উদাহরণদ্বারা বেশ স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন। "যে সমস্ত সম্প্রদায় বা জাতির মধ্যে বিধবাবিবাহ প্রচলিত আছে, তাহাদের মধ্যে সমস্ত বিধবারাই যে পত্যন্তর গ্রহণ করেন, তাহা নহে। কন্যা বিধবা হইলেই যে তাহার বিবাহ দিতেই হইবে, এমন নহে। সকল সমাজেই বিধবার পত্যন্তর গ্রহণ নানাবিধ ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে। স্মরণ রাখা উচিত যে ভারতবর্ষে হিন্দুদিগের মধ্যে যেরূপ বালিকাদিগের বিবাহ হয়, অন্যান্য দেশে তাহা হয় না। ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে আমাদের মধ্যে কন্যার বিবাহ না দিলে যেরূপ গ্লানি হয়, অন্য দেশে তাহা হয় না। সুতরাং অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেক স্ত্রীলোক চিরজীবন অনূঢ়াও থাকিয়া যান, এবং অনেক বিধবারও বিবাহ হয়। তবে ইহা দেখা যায় যে যাঁহারা বয়স্থা কিম্বা যাঁহাদিগের সন্তানাদি থাকে, কিম্বা যাঁহারা অত্যন্ত উচ্চপদস্থা কিম্বা যাঁহারা পূর্ব্ব পতির প্রতি অত্যন্ত অনুরক্তা তাঁহারা পুনর্ব্বার পতি গ্রহণ করেন না। * * কেবল আমাদের মধ্যে পুরুষের বিবাহ সম্বন্ধে যে অধিকার, অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐ অধিকারটি স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েরই আছে।"

* * * *

"যাঁহারা ব্রহ্মচর্য্যের দোহাই দেন, তাঁহাদের মতে যেন ব্রহ্মচর্য্য কেবল স্ত্রীলোকের পক্ষেই, আর পুরুষের পক্ষে স্বেচ্ছাচারিতা। পুরুষ দশবার স্ত্রী মরিলে দশবারই বিবাহ করিতে পারিবে, সন্তান থাকিলেও পারিবে। কিন্তু স্ত্রীলোকে একবার স্বামী মরিলে বিবাহ করিতে পারিবে না, সন্তান না থাকিলেও পারিবে না। এরূপ বিধান ন্যায়সঙ্গত বলিয়া প্রতিপালন করা কঠিন। (নানাপ্রকার গুপ্তপাপ) হইতে বিধবাবিবাহ কি নিন্দনীয়?" উপসংহারে হিন্দু-পত্রিকা যাহা বলিয়াছেন তাহা প্রতি ছত্রে ছত্রে এরূপ সতেজ সত্য ও সহজ জ্ঞানে পরিপূর্ণ এবং তাঁহার কথাগুলি আমাদের অন্তরের কথার সহিত এতই একভাবাপন্ন যে আমরা তাঁহারই কথায় এ প্রবন্ধের শেষ করিলাম।

"আমাদের মতে বর্ত্তমানে বিধবাবিবাহে সমাজের কোন বাধা দেওয়া উচিত নহে। কিম্বা খুব প্রশংসার কার্য্য বলিয়াও ঘোষণা করা উচিত নয়। অল্প বয়স্ক কন্যাদিগের বিবাহপ্রথা উঠাইয়া দেওয়া উচিত। উহা হইলে সমাজ অনেক কষ্টকর দশা হইতে

পরিত্রাণ পাইবে। বয়স্থা বিধবারা স্বীয় স্বীয় কর্ত্তব্য, আত্মমর্য্যাদা বুঝিতে পারিবেন। এবং তাঁহারা যদি পুনর্ব্বার বিবাহ করিতেই ইচ্ছুক হন তাহাতেও বাধা দেওয়া উচিত নহে। শত শত বিধবা আজীবন ব্রহ্মচর্য্য অববম্বন করিয়া জীবন যাপন করিতে সমর্থ হইতেছেন, তাহা আমরা স্বচক্ষে দেখিতেছি। কিন্তু তাই বলিয়া, সকলেই সমান হইতে পারে না। কি পুরুষ কি স্ত্রী উভয়ের পক্ষেই উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট অধিকারের ব্যবস্থা থাকা কর্ত্তব্য। পুরুষ যেরূপ সকলেই ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিতে পারে না, স্ত্রীলোকেরাও সেইরূপ। সমাজে তাহার বব্যস্থা না করিলে সমাজ সুন্দরভাবে চলিতে পারে না। পুরুষের চক্ষে যেরূপ এক পত্নী গ্রহণ উচ্চাধিকারের কথা, সেইরূপ স্ত্রীলোকের পক্ষেও এক পতি গ্রহণ উচ্চাধিকারের কথা। পুরুষের চক্ষে যেরূপ কেবল উচ্চাধিকার প্রথা প্রবর্ত্তিত থাকিলে নিম্ন অধিকারীদিগের নানারূপ পাপে পতিত হইতে হয়, স্ত্রীলোকের পক্ষেও তদ্রূপ। (বিশেষতঃ আমাদের দেশের ভদ্র স্ত্রীলোকগণের জীবিকা উপার্জ্জনের পথ নাই বিবাহই এখানে ভদ্র স্ত্রীলোকের জীবিকা। সেই জন্য এদেশে বিধবাদিগের কষ্ট এত অধিক।) এই সমুদয় বিবেচনা করিয়া যাঁহারা স্বীয় আত্মীয়াদিগের দুঃখ দেখিতে না পারিয়া, তাহাদিগের পুনর্ব্বার বিবাহ দেন, তাহাদিগের প্রতি কোনরূপ কঠোর ব্যবহার করা উচিত নহে। যে গৃহে স্ত্রী বা পুরুষের মধ্যে ব্যভিচার আছে জানিয়াও আমরা স্বচ্ছন্দে সেই গৃহে পান ভোজন করিয়া থাকি, তখন কেহ স্বীয় বিধবা কন্যার বিবাহ দিয়াছেন বলিয়া তাহাকে সমাজচ্যুত করা কতদূর সঙ্গত, তাহা সমাজের চিন্তা করা উচিত। ব্রহ্মচর্য্য চিরদিনই হিন্দু গৃহে আদর্শ থাকিবে। কিন্তু যাহারা এই উচ্চ আদর্শ পালন না করিয়া কোন মধ্যম পন্থা অবলম্বন করিতে চাহেন, তাহাদিগকে একেবারে পরিত্যাগ করিলে, সমাজে অত্যন্ত নিকৃষ্ট পন্থা অবলম্বনেরই প্রশ্রয় দেওয়া হইবে।”

ত্রিপুরার গল্প।

পার্ব্বত্য ত্রিপুরার পর্ব্বতে পর্ব্বতে অনেক গুলি কুকি রাজা আছে। তাহারা সকলেই ত্রিপুরার রাজার অধীন। পূর্ব্বকালে মধ্যে মধ্যে তাহারা বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়া মহারাজের সীমার মধ্যে আসিয়া লুটপাট করিয়া পুরবাসীদের উত্যক্ত করিয়া যাইত। তখন ত্রিপুরা-রাজকে বিদ্রোহ দমনের জন্য যুদ্ধ যাত্রা করিতে হইত।

একবার একজন রাজা কুকিদিগের এক সহস্র প্রধান ব্যক্তিকে বিদ্রোহ অপরাধে বন্দী করিয়া আনেন। “পরদিন প্রাতে বন্দীগণের প্রাণদণ্ড হইবে”—এই সংবাদ রাজ-অন্তঃপুর পর্য্যন্ত যাইয়া পৌঁছিল।

মহারাণী অত্যন্ত করুণাময়ী ছিলেন—এক সহস্র ব্যক্তি এককালে পরদিন প্রাতে প্রাণ হারাইবে শুনিয়া তিনি বিহ্বল হইয়া পড়িলেন।

যথা সময়ে রাজা অন্তঃপুরে আহার করিতে আসিলে, রাণী রাজার দুই চরণ জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া বলিলেন "রক্ষা কর মহারাজ রক্ষা কর।" রাজা বিস্মিত হইয়া "কি মহারাণী কি হইয়াছে" বলিয়া রাণীর হাত ধরিয়া তুলিয়া বসাইয়া শান্ত করিলেন।

রাণী। মহারাজ কাল প্রাতে নাকি সহস্র মানুষের জীবন বধ করিবে?

রাজা। বিচারে বিদ্রোহীদের প্রাণদণ্ড বিধান করিয়াছি।

রাণী। দয়া কর মহারাজ, তাহাদের ক্ষমা কর। তাহারা আমার সন্তান।

রাজা। মহারাণি, তাহারা বিদ্রোহী তাহারা রাজ্যের ঘোরতর অনিষ্ট করিয়াছে।

রাণী। তাহারা আমার প্রজা তাহারা আমার সন্তান। আমি জামিন রহিলাম, আর তাহারা তোমার রাজ্যে কোন প্রকার উৎপাত উপদ্রব করিবে না। 'রণে বনে' তাহারা তোমার সহায় হইবে—ক্ষমা কর।

রাজা। ক্ষমা করিলাম। কিন্তু আজ হইতে ত্রিপুরা রাজ্যের শুভাশুভের দায়ী মহারাণী স্বয়ং।

রাণী সহর্ষে কহিলেন "তোমার জয় হোক্ মহারাজ। একটী ভিক্ষা,—রাত্রি দ্বিপ্রহরের মধ্যে এক সহস্র সোণার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাত্র আমাকে প্রস্তুত করিয়া দিতে আজ্ঞা হোক্।

রাজা সাদরে কহিলেন—তাহাও পাইবে। —তোমাকে আমার অদেয় কি আছে মহারাণি!

দ্বিপ্রহর রাত্রি—চারিদিক নিস্তব্ধ; রাজমহিষী দুইটি মাত্র দাসীর সহিত রাজপুরী হইতে বাহির হইলেন। একজন দাসীর হাতে একটী ডালায় সহস্র স্বুবর্ণ পাত্র, আর একজনের হাতে প্রজ্বলিত মশাল।

মহারাণী ধীরে ধীরে যাইয়া বন্দীশালার দ্বার মুক্ত করিলেন প্রহরীরা বিস্মিত হইয়া সসঙ্কোচে দ্বারের পার্শ্বে সরিয়া দাঁড়াইল।

রাণী কারাগারে প্রবেশ করিলে বন্দীগণ সচকিত হইয়া উঠিয়া বসিল—তাহাদের শৃঙ্খল ঝণঝণ শব্দে রজনীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিল।

মহিষী নিজহস্তে এক একজনের শৃঙ্খল মোচন করিয়া দিয়া বলিলেন "বাছারা, আমি তোদের মা—এই নে আমার স্তন্য, তোরা পান কর।" বলিয়া প্রত্যেক স্বুবর্ণ পাত্রে দুই চারি বিন্দু স্তনদুগ্ধ দিয়া এক একটী পাত্র এক একজন বন্দীর হাতে দিতে লাগিলেন।

দ্বার মুক্ত পাইয়াও তাহারা পলায়ন করিল না—বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া একে একে সকলে মহারাণীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিতে লাগিল; পরে সহস্র কণ্ঠে বলিয়া উঠিল "মহারাণী মায়ের জয় জয়কার হোক্"।

শুনা যায় এখনও রাজমহিষী প্রদত্ত স্বুবর্ণ পাত্র সেই বিদ্রোহী কুকিদের বংশধরদিগের গৃহে দেখিতে পাওয়া যায়। তাহারা সেই পাত্রকে গৃহপ্রতিষ্ঠিত বিগ্রহের ন্যায় এখনও পূজা করে এবং বিদ্রোহী বন্দীরা বা তাহাদের বংশধরেরা কোন প্রকার উৎপাত করিয়া ত্রিপুরার কোন রাজাকে বিরক্ত করে নাই। তাহারাই ত্রিপুরা রাজের বিশ্বস্ত অধীন; "রণে বনে" তাহারাই তাঁহাদের প্রধান সহায়।

পাকচক্র।

পঞ্চম দৃশ্য।

(গৃহিণী পদচারণা করিতে করিতে)

"তাই ত! একি কাণ্ড দাঁড়াল! আমি কোথা ভাবছি বেশ চেপে ধরেছি—ওমা আমাকেই কিনা হঠাৎ পেড়ে ফেল্লে! কি করা যায়! বিধবা—এইটেই হয়েছে মুস্কিল! কিন্তু ছেলে আবার তাকেই পণ করেছে? কি করি! তা আজ কাল, অমন ঢের হচ্ছেও! জজ ম্যাজিষ্টরের ঘরেও ত বিধবা বিয়ে চলেছে—আর আমাদের দিলেই কি দোষ! আমি ত দোষ দেখিনে, হলে ত ভালই। শশিমুখীর মত মেয়ে আর কোথায় পাব,—আর তাকে নইলে আমার ঘরই বা চলে কি করে?

বরদার প্রবেশ।

ব। বৌদিদি আর একগুঁয়েমি ক'রোনা। টাকাই তোমার এত বড় হোল? ছেলের সুখটা দেখবে না?

গৃ। (স্বগতঃ—ঠাকুরঝিরও দেখছি মত আছে—ভালই হোল!) তা বোন তোমরা সকলে যখন বলছ আমি আর রাজি না হয়ে কি করি বল!

ব। বৌদিদি আমার লক্ষ্মী!

গি। কিন্তু একটা ভাবছি লোকে কি বলবে?

ব। লোকে ভালই বলবে! দাদা হলেন উন্নতি-বিধায়িনীর সভাপতি—তাঁর কাজে কথায় এক হলে লোকে ত বাহবাই দেবে।

গি। তাহলে তোর মনে হচ্ছে—বিয়েটা হলে ভাল?

ব। খুব ভাল। তা আর একবার করে বলতে। আমি এক্ষণি বিনোদকে বলে আসি। আহা কতদিন ধরে যে বাছা তোমাকে তার হয়ে বলার জন্য আমাকে সাধছে।

বরদার প্রস্থান। কর্ত্তার প্রবেশ।

গি। স্বগতঃ, (আমার আর যেতে হোলনা—আপনিই ঘুরে ফিরে এসে পড়েছেন দেখছি!) আহা! এখনো কি মাথাটা ধরে আছে? একটু অডিকলম দিয়ে দেব? (কোলঙ্গার কুঁজা হইতে একটা গ্ল্যাসে জল ঢালন)

ক। না না আমার একটুও মাথা ধরেনি।

(এক গ্লাস জলে এক ফোঁটা অডিকলম ঢালিয়া)

গি। আহা দিই না একটু অডিকলম,—নিশ্চয় মাথা ধরেছে তুমি বলছ না,—মুখখানা যেরকম বিমর্ষ দেখছি! আমার কাছে কি কিছু লুকোবার যো আছে!

(মাথায় মুখে জলের ছিটা প্রদান)

ক। দোহাই তোমার! আর না, আর না,—আমি বেশ সেরে উঠেছি—বেশ তাজা মনে হচ্ছে—নিশ্চয় করে বলছি—আর একটুও বিমর্ষ নেই।

গি। ঠিক বলছ ত? তা দেখলে অডিকলম দিতেই কেমন মাথাটা সেরে গেল,—আর একটু দিয়ে দিই—তাতে ত আর দোষ নেই—

(গ্লাসের জলটা মাথায় ঢালিতে ঢালিতে)

আর গরম মনে হচ্ছে না? বেশ আরাম করছে?

ক। কর কি কর কি? গরম—! শীতে কাঁপছি—

গিঁ। সে আবার কি? কুইনিনের শিশিটা আনব নাকি! ভয় করে যে,—জ্বরটর ত হবে না—

ক। নাগো না—রক্ষা কর—আমি বেশ আছি—আস্ত মানুষটাকে তুমি দেখছি গঙ্গা-যাত্রা করাবে!

গি। শুনলে কথার ছিরি! ওরকম করে গালাগালি দিওনা বলছি। তাহলে একাদশী কে করবে শুনি! তুমি না আমি? গায়ের গহনা মাথায় সিঁদুর খসবে কার? তোমার না আমার? ভাল কথা বল্লেও আজকাল দোষ! হায়রে—এত দুঃখও অদৃষ্টে ছিল?

কপালে করাঘাত করিয়া ক্রন্দন।

ক। ঘাট হয়েছে—ঘাট হয়েছে—এমন কথা আর বলব না—থাম থাম—

(চক্ষু মুছাইতে মুছাইতে)

তুমি আমার তালুক মুলুক তুমি টাকার তোড়া!
তুমি চেলি বারাণসী তুমি শালের জোড়া।
হেসে হেসে কাছে এসে—সকল দুঃখ ঘুচো,
অধীন তোমার দাসানুদাস—শ্রীচরণের ছুঁচো।

গি। (হাসিয়া হাত ঠেলিয়া) স'র' কথা শুনলে লোকে ভাববে যেন কতই ভালবাস; কিন্তু—

ক। ভাল বাসিনে?

কি বলব গো চাঁদবদনী কত ভালবাসি!
তোমার ঐ একনয়নে মধুর ধারা—
এক নয়নে হাসি!

গি। দেখ তুমি একশবার চাঁদবদনী—চাঁদবদনী ক'র না, চাঁদ নামটা শুনলেও আমার গা জ্বলে যায়।

ক। আচ্ছা এবার থেকে আমি তোমাকে কৃষ্ণবদনী বলতেও রাজি আছি—তোমারও কিন্তু শশীকে বিদায় করতে হবে।

গি। আমি ভেবে দেখছি সে কাজটা ঠিক হবে না। ছেলের যখন অত মন পড়েছে—তখন আমাদের নারাজ হওয়াটা কি ভাল? তাতে নিশ্চয়ই উল্ট উৎপত্তি হবে।

ক। কি সর্ব্বনাশ তুমি ওর সঙ্গে ছেলের বিয়ে দিতেও রাজি! তুমি দেখছি সব পার সব পার!

গৃ। তা কেন দেব না? অমন মেয়ে আর কোথায় পাব বলদেখি? আর তুমি যে সভায় প্রতিজ্ঞা করেছ বিয়েতে টাকা নেবে না,—সেদিকেও এতে পণ বজায় থাকবে,—সভাপতির উপযুক্ত কাজ করা হবে।

ক। কিন্তু ও যে বিধবা?

গি। কেন আজ কাল ত বিধবার বিয়ে শাস্ত্রর সম্মত হয়েছে, কত বড় বড় লোকে মেয়ের আবার বিয়ে দিচ্ছে।

ক। ওগো সে ত নিজের মেয়ের। বিধবা মেয়েকে ত কেউ ঘরে আনছেনা।

গি। তা না হয় তুমিই আনবে—তুমিই পথ দেখাবে; তাতে তোমার কত নাম হবে বল দেখি? সবাই ধন্যি সভাপতি বলবে।

ক। এটা যে কলিযুগ গো গিন্নি? তুমি একে সত্যযুগ বলে বিশ্বাস করলে ত চলবেনা। এখনি ঠেলা খেয়ে জেগে উঠতে হবে।—খবরের কাগজ পড় না—তাইত হয়েছেগোল!

গি। জানিগো জানি সব জানি—খবরের কাগজ না পড়েও জানি। এখন আর এক-

ঘরের ভয় নেই—ঠেলা খেয়ে না হয় লোকে একঘর থেকে আর একঘরে গিয়ে দাঁড়াবে। এখন দুনৌকয় পা দিয়েও বেশ চলে যাওয়া যায়, কেবল যদি মনের বলটুকু থাকে।

ক। দেখ—

গি। আমি বেশ দেখছি। তোমরাই আমাদের বেলা চোখ থাকতেও কানা, আর প্রাণ থাকতেও মড়া; ১০।১২ বছরের ছোট ছোট মেয়েগুলো যদি বিয়ের পরদিনই বিধবা হোল তবু তার আবার বিয়ের নাম মুখে আনলেও জাত যায়—আর আমি যদি আজ মরি—তাহলে তুমি—

ক। (কর্ণে অঙ্গুলি দিয়া) রাম রাম! ওকথা বলতে আছে। নিশ্চয় বলছি আমি তাহলে সহমরণে যাব!

গি। দেখ মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা দিওনা বলছি। এ পোড়া দেশে মেয়ের জন্ম কেন যে ভগবান দেন তা বুঝতে পারিনে। এমনি অদৃষ্ট—একজন যদি তাদের দুঃখে চোখের জল ফেল্লে-ত অমনি দশজনে হাঁ হাঁ করে তাকে মারতে ছুটবে!

ক। তোমার দুটি চরণে ধরি—দোহাই তোমার থামবে!

গি। থামব কেন? দেখে শুনে সর্ব্বশরীর জলে গেল! যে জাত মেয়েদের এত দুঃখ দেয়—তার মঙ্গল নেই—নেই—এই আমি তোমাকে বলে দিলুম।

ক। আচ্ছা আমি তোমাকে অনুমতি দিয়ে যাব;—আমি মরলে তুমি আবার বিয়ে করতে পার এমনতর উইল করেও যাব,—তাহলেই ত সব দুঃখ ঘুচবে?

গি। দেখ, দুঃখের সময় ঘাঁটিয় আরো

প্রাণ জলে? তুমি কি ভাব, বিধবাদের বিয়ে চলিত হলেই সব বিধবারা অমনি বিয়ে করতে যাবে! মেয়েদের পুরুষের মত পাওনি গো—কুমারীরাই বিয়ে করতে চায় না—তা বিধবা! তবে কেবল একটা পথ খুলে রাখা;—মেয়েরা অসহায় জাত—তেমন কষ্টকর অবস্থায় কেউ যদি চায়—ত বিয়ে করাই ভাল। কিন্তু তাদের কষ্টে রেখেই তোমাদের যত ধর্ম্ম যত পুণ্যি,—হায় হায়! বলিহারী যাই! আর এদিকে সব উন্নতিবিধায়িনীর সভাপতি, সম্পাদক,—সহকারী এই সব!

ক। দেখ অনেকক্ষণ ধরে তোমার গাঁজাখুরী বেলেল্লাগিরি কথা শুনেছি—আর পারিনে। তোমার মাথা দেখছি একেবারে গেছে। যতক্ষণ শশী এ বাড়ীতে আছে—ততক্ষণ তুমি দেখছি কবন্ধ হয়েই থাকবে। ওকে না তাড়িয়ে আমি জলগ্রহণ করছি নে।

গি। কি! তোমার দেখছি যত বড় মুখ না তত বড় কথা! আগে তোমার চন্দ্রকে তাড়াও দেখি।

ক। আমার চন্দ্র ত কোন দোষ করেনি। সে ত আর তোমার শশীকে বিয়ে করতে চায়নি?—

গি। ওঃ তুমি বুঝি তাই চাও? বুঝেছি তোমার মৎলবখানা,—আর বলতে হবে না! সেইজন্যই দেখছি যত হেঙ্গাম! কিন্তু প্রাণ থাকতে আমি তা হতে দিচ্ছিনে। হতভাগা, লক্ষ্মীছাড়া সে আমার শশীকে বিয়ে করবে!

ক। দেখ অমন করে গাল দিওনা বলছি! জান সে আমার সম্পর্কীয় লোক—আমার—আমার আপনার অন্তরঙ্গ আত্মীয়!

গি। হি হি হি হি—তোমার আপনার অন্তরঙ্গ—আত্মীয়!

ক। কি হাসিরই ছিরি। আমার আত্মীয় না ত কি? আমার ভগিনীপোতের শালার পোষ্যপুত্র—

গি। আর শশী যে আমার তার চেয়েও আপনার,—আমার বোনের সইএর পাতান মেয়ে! তোমার সম্পর্ক বড় না আমার?

ক। আচ্ছা বাজি?

গি। কত?

ক। দশ টাকা।

গি। বেশ দাও,—আমার জিৎ—আমি ঠিক বলছি।

ক। তুমি বল্লেই ত হবে না—

গি। আচ্ছা সালিসি মান—

ক। কাকে?

(বরদার প্রবেশ)

আচ্ছা বেশ, বরুকেই সালিসি মানা যাক।

গি। আচ্ছা ঠাকুরঝি তুমিই বল, চন্দ্রকান্ত হোল ওঁর ভগিনীপতির শালার পোষ্যপুত্র—আর শশী হোল আমার বোনের শ্বাশুড়ির সইএর পাতান মেয়ে; কে বেশি আপনার বল দেখি?

ব। তাইত—আমি ঠিক বলতে পারছিনে—সমস্যা বটে! টোলের মত নেও।—

ক। তবু 'কমন সেন্সে'—এই সহজ বুদ্ধিতে কি বলে—তাই বল্‌না ছাই!

ব। দাদারই যেন বেশী আপনার মনে হচ্ছে। চন্দ্রকান্ত হোল দুপুরুষে আর শশী হচ্ছে—তিন পুরুষে তফাৎ।

গি। পক্ষপাতিনী! চন্দ্রর সঙ্গে ভগিনী-পতের সম্পর্ক ধরে সম্পর্ক, আর শশীর সম্পর্ক হচ্ছে বোন থেকে। চন্দ্রকান্ত কর্ত্তার ভগিনীপতির শালার পুষ্যি। আর শশী হোলো আমার বোনের শ্বাশুড়ির সইএর পুষ্যি! ভগিনপত আপনার না বোন আপনার? সব বুঝেছি সব বুঝেছি, সবাই মিলে আমাকে ভগবান ভূত করে চন্দ্রকান্তের সঙ্গে ওর বিয়ে দেবেন এই চেষ্টা। তা আমি প্রাণ ধরে কখনই দেব না। ও আমার শশিমুখীরে—সোনারমণি দধির খনি, প্রাণ জুড়ান ধনরে,—তোকে আমি প্রাণ থাকতে আর কাউকে দিতে পারব না।

ক্রন্দন করিতে করিতে পলায়ন।

ব। দাদা ব্যাপারখানা কি?

ক। কি বলব—সর্ব্বনাশ উপস্থিত। বিনোদটা দেখি শশীর হাত ধরে বলছে তুমি আমাকে রক্ষা কর—তুমি আমার জীবনমরণ এই সব।

ব। ওঃ বুঝেছি! তাই ভয় পেয়েছ? ঠাণ্ডা হও। সে আমিই শিখিয়ে দিয়েছিলুম। বল্লুম শশীকে গিয়ে ধরে পড়—সে যদি মনে করে হরিবাবুর মেয়ের সঙ্গে এখনি বিয়ে হয়ে যাবে।

ক। তাই বটে! আঃ বাঁচলুম। মাথা থেকে যেন পাহাড় নামল! সকল মুনিরই তাহলে দেখছি একরকম যুক্তি। চন্দ্রকান্তও আমাকে ঐ পরামর্শ দিয়েছে। আমার ইচ্ছা কিন্তু শশেটাকে দেশছাড়া করি।

ব। তার হচ্ছে সোজা উপায়—

ক। কি কি—বল বল—আঃ বাঁচাও—

ব। চন্দ্রকান্তের সঙ্গে শশীর বিয়েটা দিয়ে দাও সব ল্যাঠা চুকে যাবে।

ক। কি সোজা উপায়ই বল্লে মরে

যাই!—চন্দ্রটা শুদ্ধ তাহলে হাতছাড়া হয়ে যাবে। সে আমি কিছুতেই পারছিনে—তার চেয়ে গিন্নি ছেলের সঙ্গে তার বিয়ে দিতে চান তা দিন।

ব। কি যে দাদা বল! চন্দ্রর সঙ্গে বিয়ে হলে শশী এমন মুটোর মধ্যে হবে—যে তখন তার টুঁ শব্দটিও থাকবে না।

ক। বটে? আমি ত চিরদিন উল্টোটাই দেখছি। বিয়ে হলে চন্দ্ররই ভেড়া বনার বেশী সম্ভাবনা।

ব। তোমার মতন কিনা সবাই! তাহলে আর সংসার এমন হোত না।

ক। দেখি চন্দ্রকে বলে। কিন্তু গিন্নি রাজি হবেন না— (মাথা নাড়িতে নাড়িতে) সে আমি বেশ বুঝেছি।

ব। রাজি হবেন না? আচ্ছা দাদা দেখে নিও।

ক। (দীর্ঘনিশ্বাস সহকারে) তবে তাই হোক্; যা ভাল বোঝ তাই কর।

প্রস্থানোদ্যত।

ব। দেখ দাদা, একটু শক্ত হোয়ো! অত নরম হলে সংসার চলে না।

ক। (ফিরিয়া দাঁড়াইয়া) নরম! ঘা খেয়ে খেয়ে মনটার আগাগোড়া ঘাঁটা পড়ে গেছে। যাহক, দেখি কোথাকার জল কোথায় গড়ায়!

উভয়ের প্রস্থান এবং গান গাহিতে গাহিতে কর্ত্তার পুনঃ প্রবেশ।

কোথা তুমি প্রাণেশ্বরি!
ঘোর—বিরহ তুফান—গরজে কামান—
অভয় কর দান—কর্ণে ধরি!
দোষ করে থাকি রোষ ভুলে যাও,
গজেন্দ্র চরণে স্থান তবু দাও,—
দীন অভাজনে বারেক ফিরে চাও,
অন্তিমে কাতরে স্মরি।
এস—ভ্রুকুটি লোচনে—প্রাণ চমকিয়া
এস—প্রখর বচনে কান মুখরিয়া
এস—নিম-অধরে—ভীম হাসিয়া
দেখি দুনয়ন ভরি!

গাহিতে গাহিতে প্রস্থান।

ঝড়ের রাতে।

ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার,
পরাণ সখা বন্ধু হে আমার!

আকাশ কাঁদে হতাশ সম,
নাই যে ঘুম নয়নে মম,
দুয়ার খুলি, হে প্রিয়তম,
চাই যে বারেবার!
পরাণ সখা বন্ধু হে আমার!

বাহিরে কিছু দেখিতে নাহি পাই,
তোমার পথ কোথায়, ভাবি তাই!

সুদূর কোন্ নদীর পারে,
গহন কোন্ বনের ধারে,
গভীর কোন্ অন্ধকারে
হতেছ তুমি পার—
পরাণ সখা বন্ধু হে আমার!

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।



শঙ্করাচার্য্যের দর্পচূর্ণ

শ্রীযুক্ত ভেঙ্কটাপ্পা কর্ত্তৃক অঙ্কিত চিত্র হইতে

বৃষ্টি।

(চীন গল্পের ইংরাজী হইতে)

ঈশ্বরের পুত্র! তাঁর নামের জয় বিশ্বময় ব্যাপ্ত হোক্! সম্রাট লি-ও-এ মর্ম্মর প্রাসাদের বাতায়নে দাঁড়াইয়া ছিলেন।

বয়স তাঁর অল্প, মনটী কাজেই করুণায় ভরা! চারিদিকে অতুল ঐশ্বর্য্য প্রমোদ বিলাস, তবু তার মধ্যেও তাঁর মন থেকে দীনদুঃখীর কথাটুকু কখনো সরে যেত না!

বৃষ্টি পড়িতেছিল! মুষলধারে অবিশ্রান্ত বৃষ্টি! আকাশ যেন কাঁদিতেছিল, চারিধারে গাছপালা ফুলপল্লবও যেন তারি সঙ্গে চোখের জল ফেলিতেছিল!

সম্রাটের হৃদয় করুণায় আর্দ্র হইয়া আসিল। পথের দিকে চাহিয়াই তিনি কহিলেন, "আহা, ঐ লোকটির কি কষ্ট! এই অবিশ্রান্ত বৃষ্টিতে পথে চলেছে, মাথায় একটা টুপিও নাই!" পশ্চাতে ফিরিয়া বয়স্যকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "আমি জানিতে চাই আমার পিকিনে এমন হতভাগা ক'জন আছে—মাথায় একটা টুপি দিবারও যাদের সামর্থ্য নাই?"

জানু নত করিয়া অবনত শিরে সুঙ্-হি-সাঙ্ উত্তর দিল,—"সূর্য্যের ন্যায় ভাস্বর, সর্ব্বশক্তিমান, রাজরাজেশ্বর, আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য! সূর্য্যাস্তের মধ্যেই, হে চরাচরের ভাগ্য বিধাতা, এ সংবাদ রাজগোচরে আসিবে!"

সম্রাটের মুখে মৃদু হাসি দেখা দিল; এবং সুঙ্-হি-সাঙ্ নিমেষে প্রধান মন্ত্রী সান-চি-সানের সম্মুখে উপস্থিত হইল, তখনো তাঁহার কথা কহিবার শক্তি ছিল না—ব্যস্ততা নিবন্ধন শ্বাস রুদ্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছিল—প্রধান মন্ত্রীর প্রাপ্য ন্যায্য সম্মানটুকুও তাঁহাকে প্রদান করিতে রাজবয়স্য ভুলিয়া গিয়াছিল!

অতিকষ্টে নিশ্বাস ফেলিয়া সুঙ্-হি-সাঙ্ কহিল—"বিশ্বের আনন্দ, আমাদিগের সর্ব্বময় প্রভু বিরক্ত হইয়াছেন! এত বড় বেয়াদব এই লোকগুলা, মাথায় টুপি না দিয়া পথে চলে! সম্রাট তাদের ব্যবহারে বিরক্ত হইয়াছেন! তিনি জানিতে চান, এমন লোক পিকিনে কতগুলা আছে?"

"এতদুর আস্পর্দ্ধা তাদের?" সান্-চি-সান্ ক্রোধে কাঁপিয়া উঠিলেন; সেনাপতি পি-হি-ভো'র তখনি তলব পড়িল।

পি-হি-ভো নতশিরে মন্ত্রীকে অভিবাদন করিয়া সম্মুখে দাঁড়াইলে মন্ত্রী কহিলেন, "প্রাসাদে দুঃসংবাদ! প্রভু রাজ্যে বিশৃঙ্খলা লক্ষ্য করিয়াছেন!"

বিস্ময়-স্তম্ভিত পি-হি-ভো উত্তর করিল, "সে কি? এমন একটা ছায়া-নিবিড় কানন নাই যা' পিকিনের পথ ও প্রাসাদের মধ্যে একটা আবরণের সৃষ্টি করে?"

সান-চি-সান্ কহিলেন, "কেমন করিয়া এ ব্যাপার ঘটিল আমি ঠিক বলিতে পারি না। কিন্তু এই যে লোকগুলা মাথায় টুপি না দিয়া পথে চলে, ইহাদিগের জন্যই আমাদিগের সম্রাট আজ বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছেন!

পিকিনে এমন বদমায়েশ লোক কতগুলা আছে, তিনি আজই জানিতে চাহেন। ব্যবস্থা কর।"

মুহূর্ত্তে স্বস্থানে ফিরিয়া পি-হি-ভো অনুচর বৃন্দকে আদেশ করিল, "ডাকো সেই বুড়া কুকুর জুর-সাঙ্‌টাকে! এখনি!"

নগর-রক্ষক বৃদ্ধ জুর-সাঙ্‌ কম্পিত দেহে শঙ্কিত মনে সেনাপতির সম্মুখে আসিয়া যখন তাঁহার পদপ্রান্তে আশ্রয় প্রার্থনা করিয়া দাঁড়াইল তখন পি-হি-ভো তাহাকে তিরস্কার বাণে রীতিমত জর্জ্জরিত করিয়া তুলিল।

"বেয়াদপ্, পাজী, বিশ্বাসঘাতক, তোমার জন্য কি আজ আমরা সকলে রাজরোষানলে দগ্ধ হব?"

কাঁপিতে কাঁপিতে জুর-সাঙ্‌ কহিল, "হুজুরের ক্রোধের কারণ জানিলে সমস্ত নিবেদন করিতে পারি। নচেৎ আপনার কথার মর্ম্ম ঠিক গ্রহণ করিতে পারিতেছি না ত'!"

"বুড়া কুকুর, এত বড় নগররক্ষা কি তোমার কাজ? কতকগুলা শূকরের পাল চরাও গিয়া! চীন-সম্রাট স্বয়ং নগরে বিশৃঙ্খলা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন! পথে কতকগুলা বেয়াদপ ঘুরিয়া বেড়ায়—মাথায় টুপিও জোটে না! সন্ধ্যার পূর্ব্ব অবধি সময় দিলাম—এমন বেয়াদপ পিকিনে কতগুলা আছে, সংবাদ আনো!"

ভূমিতে তিনবার শিরস্পর্শ করিয়া জুর সাঙ্‌ কহিল, "এখনি প্রভুর আজ্ঞা পালিত হবে।" বলিয়া জুর-সাঙ্‌ নিমেষেই সে স্থান ত্যাগ করিল এবং অবিলম্বে বৃহৎ ঘণ্টায় চৌকিদারদিগের তলব পড়িল।

"হতভাগা ভূতের দল, তোমাদিগকে জীয়ন্তে পুড়াইয়া মারিলেও রাগ মেটে না। এমন করিয়া তোমরা সহর চৌকি দাও! বৃষ্টিতে লোকগুলা মাথায় টুপি না দিয়া পথ চলে? যাও, যাদের মাথায় টুপি নাই, এখনি এক ঘণ্টার মধ্যে তাদের ধরিয়া আমার সামনে হাজির কর!"

চৌকিদারের দল গালি খাইয়া বাহির হইয়া পড়িল এবং চকিতে পিকিনের পথে পথে টুপি-হীন লোক ধরিবার জন্য রীতিমত হুলস্থূল পড়িয়া গেল।

"ধর! পাকড়াও" শব্দে সকলে শশব্যস্ত হইয়া উঠিল। বিড়ালে যেমন করিয়া ইন্দুর ধরে, তেমন করিয়াই এই চৌকিদারগুলা লোক ধরিতে লাগিল! বাড়ীর প্রাচীরের পার্শ্ব, বাগানের বেড়ার পশ্চাৎ, নদীর ধার, বৃক্ষের শাখা যেখানে বেচারারা লুকাইয়াছিল সে সকল স্থানও চৌকিদারদিগের তীব্র দৃষ্টি অতিক্রম করিতে পারিল না। আধ ঘণ্টার মধ্যে পিকিনের কারাপ্রাঙ্গণ এই সকল টুপি-হীন অভাগাদের করুণ আর্ত্তনাদে পূর্ণ হইয়া গেল!

জুর-সাঙ্‌ সগর্ব্বে জিজ্ঞাসা করিল, "গুণ্‌তিতে কত হবে?" চৌকিদারেরা কহিল, "বিশহাজার আট শ একাত্তর জন!" জুরসাঙ্‌ হুকুম দিল, "সবার মাথা কাটো!" আধ-ঘণ্টার মধ্যে কারাপ্রাঙ্গণে বিশহাজার আট শ' একাত্তরটি হতভাগা চীনবাসীর শিরহীন দেহ গড়াগড়ি যাইতে লাগিল। সংবাদ লইয়া জুর-সাঙ্‌ পি-হি-ভোর সম্মুখে উপস্থিত হইল। পি-হি-ভো আসিয়া সান-চি-সান্‌কে, ও সান্‌-চি-সান স্যুঙ্‌-হি-সাঙ্‌কে সংবাদ-জ্ঞাপন করিল।

* * *

তখন সন্ধ্যা নামিয়া আসিতেছিল! নম্র শান্ত সন্ধ্যা! বৃষ্টি থামিয়া গিয়াছিল। বায়ুস্পর্শে বৃক্ষপত্র ঝির ঝির করিয়া কাঁপিতেছিল এবং পল্লব হইতে হীরার টুকরার মত বৃষ্টি বিন্দু ভূমিতে গড়াইয়া পড়িতেছিল। স্নিগ্ধ সূর্য্যের আলোকে, পাখীর গানে ও মধুর পুষ্পসুরভিতে সারা আকাশ ভরিয়া গিয়াছিল।

সমস্ত বাগানখানি যেন স্নান করিয়া উঠিয়াছিল! কেমন-একটা ঔজ্জ্বল্য, কেমন-একটা আনন্দ যেন ঠিকরিয়া পড়িতেছিল! ঈশ্বরের পুত্র ও প্রতিনিধি স্বয়ং সম্রাট লি-ও-এ বাতায়নে দাঁড়াইয়া এই অপূর্ব্ব শোভা দেখিতেছিলেন। চারিধারে এত শোভা, এত সৌন্দর্য্য দেখিয়াও তিনি সেই হত-ভাগ্যদের কথা ভুলিতে পারেন নাই!

সুঙ্-হি-সাঙের দিকে ফিরিয়া তিনি বলিলেন,"ভাল কথা! সেই অভাগাদের সংবাদ নিয়াছিলে—আহা, বেচারারা একটা টুপি অবধি মাথায় দিতে পায় না?"

মস্তক নত করিয়া সুঙ্-হি-সাঙ্ কহিল, "ভৃত্যগণ প্রভুর আজ্ঞা তখনি পালন করিয়াছে!"

"এমন অভাগা ক'জন আছে? সত্য করিয়া বল, মিথ্যা বলিয়ো না।"

"সারা পিকিনে একটিও এমন হতভাগা নাই, যার একটী টুপি মাথায় দিবার সামর্থ্য নাই! স্বয়ং প্রভুর সম্মুখে শপথ করিয়া এ কথা বলিতে পারি!" সুঙ্-হি-সাঙ্ এক হাত আপনার বক্ষে রাখিয়া অপর হাত আকাশের দিকে তুলিয়া অকম্পিত কণ্ঠে স্পষ্ট স্বরে এই কথাগুলি বলিলেন।

অপূর্ব্ব উল্লাসে, অপূর্ব্ব পুলকহাস্যে সম্রাটের প্রশান্ত বদন সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল! তিনি মুগ্ধকণ্ঠে কহিলেন,—

"সুখের রাজ্য! সোনার দেশ! আর কি সুখী আমি যে আমার রাজ্যে দৈন্য নাই, দারিদ্র্য নাই, দুঃখ নাই! প্রজার দুঃখ-ক্লেশ ইঙ্গিতে দূর হয়!"

সুঙ্-হি-সাঙ্ বারবার আভূমি প্রণত হইয়া সম্রাটকে সম্মান প্রদর্শন করিল।

সম্রাটের মুখে হাসি দেখিয়া প্রাসাদের সকলে আজ আনন্দ লাভ করিয়াছে!

প্রজাবর্গের প্রতি সমধিক স্নেহানুরাগের পুরস্কার-স্বরূপ সান-চি-সান, পি-হি-ভো ও জুর সাঙ্ বিশিষ্ট রাজোপাধিতে ভূষিত হইলেন। সমগ্র নগরে বিরাট আনন্দোৎসব পড়িয়া গেল! বিংশসহস্রাধিক নরকঙ্কালে সারা পিকিনের আনন্দ কোলাহল এতটুকু রোধ করিতে পারিল না!

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

স্বরলিপি। মিশ্র বাগেশ্রী—খেমটা।

মনের উচ্ছ্বাস বাঁধতে নারি,
হায় কি করি হোল একি!
হাসির তুফাণ অধর পুটে,
আকুল বেগে আপনি ছুটে
নয়ন কোণে ব্যঙ্গ লুটে—
অঙ্গে রঙ্গ মাখামাখি।
যতন করে যতই চাপি, হৃদয় বাসী—
ততই যেন ওঠে ফাঁপি
একূল ওকূল দুকূল ছাপি,
কেমন করে ধরে রাখি!

॥ সা সা-মা। মা মা -া। মা -া ধা। ধা পা-া I মা-জ্ঞা জ্ঞা। জ্ঞা রজ্ঞা-মা।
ম নে র্ উ চ্ছাস ০ বাঁধ্ ০ তে না রি ০ হায় ০ কি ক রি ০

। রা রা -া। সা সা -া ॥ {মা মা -া। ধা ধা -না। না র্সা -র্রর্সা। না র্সা -া I
হ ল ০ এ কি ০ হা সি র তু ফান্ ০ অ ধ র্ পু টে ০

। র্সা র্সা -না। র্সা র্সা-র্রা। ণর্সা -া ণা। ধা পা -া I} {-া -া ধণা। ণা ধা ণা।
আ কু ল্ বে গে ০ আ প নি ছো টে ০ ০ ০ ন য়ন কোণে

। ধা র্সা ণা। ধা পা -া I} মা -া ধা। পা -া পা। মা মজ্ঞা -া। রা সা-ন্া ॥
ব্য ০ ঙ্গ লো টে ০ অ ০ ঙ্গে র ০ ঙ্গ মা খা ০ মা খি ০

। সা সা -মা। মা মা -া। মা পা -া। পা পা -া I মা ধা -া। ধা ধা -ণা। ণা র্সা -া।
য তন ০ ক রে ০ য তই ০ চা পি ০ হৃ দয় ০ বা পী ০ ত তই ০

। র্সা র্সা -র্রা I ণর্সা -া ণা। ধা পা -া। -া -া -া। -া -া -া I {-া -া ধণা। ণা ধা ণা।
যে ন ০ ও ০ ঠে ফাঁ পি ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ এ কূল ও কূল

। ধা র্সা ণা। ধা পা -া I} -া -া মা। ধা পা পা। মা মজ্ঞা -া। রা সা ন্া ॥
দু ০ কূল ছা পি ০ ০ ০ কে ম ন করে ধ রে ০ রা খি ০ ॥

সমালোচনা।

ভারতীয় বিদুষী। শ্রীযুক্ত মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য দশ আনা মাত্র। প্রকাশক শ্রীমনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, হিতবাদী লাইব্রেরী ৭০, কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। কান্তিক প্রেসে শ্রীহরিচরণ মান্না কর্ত্তৃক মুদ্রিত। গ্রন্থসন্নিবিষ্ট অনেকগুলি আখ্যায়িকা পূর্ব্বে "ভারতী" পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল; তখন ইহা শুধু বাঙ্গালাদেশে নহে, সুদূর মান্দ্রাজ বোম্বাই প্রভৃতি প্রদেশেও সমধিক সমাদর লাভ করিয়াছিল। 'ভূমিকা'য় গ্রন্থকার যথার্থই বলিয়াছেন, "ভারতীয় নারীসমাজ চিরদিন এমনই উপেক্ষিত, অবরোধের মধ্যে বহির্জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন ও অজ্ঞ হইয়া ছিলেন না। তাঁহারাও বিদ্যায়, জ্ঞানে কর্ম্মে পুরুষের সমকক্ষতা করিতেন এবং তাঁহাদের সেই প্রচেষ্টা ধৃষ্টতা বলিয়া ধিক্কৃত হইত না। যতদিন ভারতবর্ষ জ্ঞানগরিষ্ঠ বলিয়া পূজিত ততদিন পর্য্যন্ত দেখা যায় ভারতীয় নারীসমাজও সেই অর্ঘ্যের অংশ লইয়াছেন। এবং যখনই নারীসমাজ অবরুদ্ধ উপেক্ষিত ও শিক্ষাহীন তখনই ভারতও হীন হইয়া শুধু প্রাচীন কালের দোহাই দিয়া কোনোমতে টিঁকিয়া থাকিবার চেষ্টা করিতেছে।" আজকাল 'স্ত্রীশিক্ষা' বলিলেই তাহার সহিত যেন অনেকখানি তর্ক, অনেকখানি সমস্যা মিশ্রিত আছে বলিয়া মনে হয় কিন্তু পুরাকালে সেরূপ ছিল না। "কন্যাপ্যেব পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ!" অনেকে যে আপনাদিগের জননী, ভগ্নী, পত্নী প্রভৃতিকে তেমন শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতে পারেন না, স্ত্রীশিক্ষার অভাবই তাহার

অন্যতম কারণ। কথাটা শুনিতে রূঢ় হইলেও যে সত্য সে সম্বন্ধে সংশয় করিবার কারণ নাই। যে শিক্ষা হৃদয়ের সমস্ত সঙ্কীর্ণতা দূর করে, জ্ঞানে যে হৃদয়কে উন্নত করে সেই শিক্ষা-জ্ঞান প্রবর্ত্তিত না হইলে আমাদিগের নারীসমাজ শ্রদ্ধা হারাইয়া নিজের অস্তিত্ব অবধি হারাইয়া ফেলিবেন; এবং ইহার জন্য পুরুষই সর্ব্বাপেক্ষা দায়ী। সুমাতা না হইলে সুসন্তানের আশা বাতুলতা মাত্র, এ কথা জগতের সকল জাতিই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। শিক্ষার প্রণালী সম্বন্ধে মতভেদ থাকিলেও শিক্ষা যে সর্ব্বথা প্রয়োজনীয়, সে সম্বন্ধে শিক্ষিত সমাজের মতদ্বৈধ হইতেই পারে না। সেই সুদূর অতীত যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান যুগের প্রারম্ভ কাল অবধি ভারতীয় নারী বিদ্যা ও জ্ঞানে আপনাকে কিরূপ মহীয়সী করিয়া তুলিয়াছিলেন, আপনার গৃহধর্ম্মের গণ্ডী অতিক্রম না করিয়াও জ্ঞানে কিরূপে পুরুষের সমকক্ষতা করিয়াছিলেন, বর্ত্তমান গ্রন্থে তাহার বিশদ আভাষ পাওয়া যায়।

সেই প্রাচীন কালে নারীগণ বেদমন্ত্র অবধি রচনা করিতেন। বিশ্ববারা, ইন্দ্রমাতৃগণ বাক্, অপালা, অদিতি প্রভৃতির কাহিনী তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। গ্রন্থখানির আরো কয়েকটি বিশেষত্ব আমরা লক্ষ্য করিয়াছি; প্রথম, গ্রন্থকার কল্পনার তুলি লইয়া বক্তব্যটুকু অতিরঞ্জিত করেন নাই—যাঁহার সম্বন্ধে যেটুকু পরিচয় পাইয়াছেন অবিকৃতভাবে পাঠককে তাহাই তিনি উপহার দিয়াছেন—কল্পনাবিকাশের লোভ সম্বরণের ফলে গ্রন্থখানি প্রামাণ্যস্বরূপ গ্রহণ করা যাইতে পারে; দ্বিতীয়তঃ, কাহিনীগুলি এমনই হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে যে পাঠ করিবার সময় প্রাচ্যজ্ঞানের প্রতি গভীরতম শ্রদ্ধায়, এবং উৎসাহে ও আনন্দে হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠে, অবসন্ন মন সঞ্জীবিত হয়, ভবিষ্যতের আশা দুরাশা মনে হয় না। হায়, কবে আবার আমাদিগের বাঙ্গালার মাতা ভগ্নী পত্নীগণ এই সকল মহিমান্বিতা দেবীগণের অংশসম্ভূতা বলিয়া জগতের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিবেন? পরিশেষে বক্তব্য, গ্রন্থের ছাপা কাগজ বহিরবয়বও সুন্দর হইয়াছে। এই গ্রন্থ বাঙ্গালার গৃহে গৃহে বিরাজ করুক, ইহাই আমাদিগের প্রার্থনা।

কেশব-জ্যোতি। নিস্তারিণী দেবী মনোজবা রচয়িত্রী। কুন্তলীন প্রেসে শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। গ্রন্থখানি শোক-কাব্য। 'জ্যোতিন্দ্রপ্রসাদ সান্যালে'র অকালমৃত্যুতে শোক-বিহ্বলা আত্মীয়ার আক্ষেপ। স্বর্গীয় আত্মা ভগবানের চরণে বিরামলাভ করুক, শোকার্ত্ত গৃহ শান্ত হউক, ইহা ভিন্ন আমাদিগের আর কি বক্তব্য থাকিতে পারে? গ্রন্থখানি বিক্রয়ের জন্য কি না, তাহা জানি না, তবে বিষয়বোধে সমালোচনার সামগ্রী নহে।

সাজি। প্রথম স্তবক। শ্রীহিমাংশুপ্রকাশ রায়। বারগণ্ডা, গিরিডি। কুন্তলীন প্রেসে শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত। (সন ১৩১৫ সাল।) মূল্য দুই আনা। লেখক 'নিবেদনে' বলিতেছেন, "কবি রবীন্দ্রনাথ তাঁহার 'কণিকা' পুস্তকে যে পথ আবিষ্কার করেন সেই পথ ধরিয়া গদ্যে সামান্য কিছু লিখিবার চেষ্টা করিলাম।" কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহার চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে!

সহধর্ম্মিণী। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ভোলানাথ কবিরত্ন ভট্টাচার্য্য সম্পাদিত। প্রকাশক শ্রীহরিপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় ও শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সিংহ। ৺কাশীধাম, ১৩১৫ সাল। মহালক্ষ্মী প্রেসে শ্রীঅক্ষয়কুমার মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত। মূল্য আট আনা মাত্র। গ্রন্থখানির বিস্তৃত সমালোচনার আবশ্যক দেখি না—ইহার ভূমিকা হইতেই পাঠক পুস্তকের পরিচয় পাইবেন। "'সহধর্ম্মিণী'র ভূমিকা বিষয়ে পাঠক-পাঠিকাবর্গের কিছু জানিবার থাকিলেও সম্পাদকের যুক্তিযুক্ত ঔদাসীন্যপ্রযুক্ত তাহা একেবারেই না হইবার কথা (অর্থ কি!)। কারণ এই সহধর্ম্মিণীকে বাস্তবিক যাঁহারা সহধর্ম্মিণী জ্ঞানে আদর এবং যত্ন করিবেন তাঁহারা ইহার ভূমিকা বা গৌরচন্দ্রিকায় কোনরূপ প্রয়োজন মনে করিবেন বলিয়া বোধ হয় না। ধর্ম্মপ্রাণ মানববৃন্দের সহধর্ম্মিণীই জন্মে জন্মে প্রতিকর্ম্মে ধর্ম্মের একমাত্র সহায় এবং সম্পৎ। বিশেষতঃ সহধর্ম্মিণী প্রজাপতিনির্ব্বন্ধে অর্দ্ধাঙ্গিনী হইয়া প্রতি প্রণয়ীজীবনকে আত্মোন্নতিরূপ অত্যুচ্চ হিমগিরির তুঙ্গশৃঙ্গে আরোহণের সরল সোপানা-

বলীতে সমারোহী করিয়া পরমানন্দপূর্ণ পরম লক্ষ্য বস্তুকে পর্য্যন্ত প্রদান করিতে পারে। * * * এইক্ষণ, সহধর্ম্মিণীর এই প্রথম প্রকাশ যদি কোন জীবনের বিন্দুমাত্রও উন্নতির সাধন হয় তাহা হইলে আমি আমার এই ক্ষুদ্র জীবনকে কৃতকৃতার্থ জ্ঞান করিব। যেহেতু বিশ্বনিয়ন্তা পরমমঙ্গলস্বরূপ ইচ্ছাময় সর্ব্বশক্তিমান ভগবান মাদৃশ নিরক্ষর অজ্ঞজনকে এতাদৃশ গুরুতর কার্য্যে নিয়োজিত করিয়াছেন। আমাদ্বারা কোটিকল্পকালেও সহধর্ম্মিণীর সর্ব্বাঙ্গসুন্দর প্রকাশ কখনই সম্ভবপর হয় না। তথাপি যে আমার ইহাতে অতদূর আগ্রহ তাহার কারণ—সেই করুণাময়ের অপার করুণা * *" এমন স্পষ্টবাদিতা একালে বিরল। গ্রন্থকার গ্রন্থে নাম প্রকাশ না করিয়া ভালই করিয়াছেন।

শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা।

মেঘের প্রতি।

ওগো কালো মেঘ! বাতাসের বেগে যেয়োনা, যেয়োনা,
যেয়োনা ভেসে;
নয়ন জুড়ানো মুরতি তোমার, আরতি তোমার
সকল দেশে,
আকাশের পথে ক্ষণেক দাঁড়ায়ে পিপাসা বাড়ায়ে
যেয়োনা চ'লে,
গদ গদ ভাষে কি কহ?—আভাষে পারি না বুঝিতে,
যাওগো ব'লে।
কি বেদনা মরি গুমরি' গুমরি' উঠিছে তোমার
হৃদয়-দেশে?
তৃষিত ফুলের তৃষ্ণা জুড়াও দাঁড়াও ভুবন-
ভুলানো বেশে।
করুণ তোমার কালো আঁখি হ'তে দুটি ফোঁটা জল
পড়িল ঝ'রে!—
ব্যথা পাও যদি, তবে, কেন যাও? দাঁওগো মোদের
পরাণ ভ'রে।
আঙুর-দোলানো অলকে তোমার লেগেছে স্বপন-
বুলানো হাওয়া,
হে চির-শরণ! জীবন-মরণ! তোমার পানে যে
যায় না চাওয়া!
হের পাণ্ডুর বনভূমি আজ, পাখীদের সুরে
কত কাকুতি,
বজ্রের ভয় রাখেনা কেবল কামিনী. কদম,
কেতকী, যূথি!
ওগো কালো মেঘ দাঁড়াও, দাঁড়াও,—বারেক দাঁড়াও
যেয়োনা ভেসে,—
ধূলায় মলিন, পিপাসায় ক্ষীণ দগ্ধ-জীবন-
দিনের শেষে।
কদম আবার উঠুক্ পুলকি', কেতকী উঠুক্
কণ্টকিয়া,—
কামিনীর শাখে যে স্বপন জাগে তাহারে সফল
কর গো পিয়া!
গভীর তোমার কাজল নয়নে ছলছলি' জল
পড়িছে এসে,
তপ্ত বনানী ডাকিছে তোমায়,—দাঁড়াও ক্ষণেক
ফুলের দেশে।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

বিভিন্ন দেশের ইতিহাসে ভারতের কথা।

কিতাব উল মাসালিক ওয়াল মামালিক। এই পুস্তকের রচয়িতার নাম ইবন। ইনি কালিফদিগের অধীনে উচ্চ রাজকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন এবং অবসর মত নানা স্থানের ভৌগোলিক এবং ঐতিহাসিক বিবরণ সংগ্রহ করিতেন। ইনি হিজিরা ৩০০ বৎসরে (৯১২ খৃষ্টাব্দে) এই বিবরণী লিপিবদ্ধ করেন। পুস্তকের নাম দিয়াছিলেন "পথ ও রাজত্বের বহি।" "(Book of Roads and Kingdoms).

পরস্ত্রীগমন ও মদ্যপান প্রভৃতি হিন্দুস্থানের রাজাপ্রজা সকলেরই নিকট নিতান্ত দূষনীয়। হস্তী রাজাদিগের অত্যন্ত প্রিয় এবং স্বর্ণের বিনিময়ে হস্তীর ক্রয় বিক্রয় চলে। হস্তীরা সাধারণতঃ নয়হাত উচ্চ। তবে আনাব (সিংহল) দেশের হস্তী ১০।১১ হাত পর্য্যন্ত উচ্চ হয়।

বল্বরা দেশের রাজারাই বিশেষ পরাক্রমশালী। রাজার হস্তে একটী অঙ্গুরী আছে তাহাতে লেখা আছে "দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়া যে কার্য্য আরম্ভ করা যায়, তাহাতে নিশ্চয়ই সফলতা লাভ হয়।" (what is began with resolution ends with Success)

হিন্দু জাতির মধ্যে সাতটি শ্রেণিবিভাগ আছে। প্রথম সবকুফরিয়া। ইহাদের মধ্য হইতে রাজা মনোনীত হন্। দ্বিতীয় ব্রহ্ম,—ইহারা মদ্য বা উত্তেজনাকারী কোন দ্রব্যই স্পর্শ করেন না। তৃতীয় কটারিয়া— ইহারা তিন পেয়ালার অতিরিক্ত মদ্য পান করেন না। দ্বিতীয় শ্রেণীর হিন্দুরা তৃতীয় শ্রেণীর কন্যাগ্রহণ করেন কিন্তু তৃতীয় শ্রেণীর হিন্দুরা দ্বিতীয় শ্রেণীর কন্যাগ্রহণে অধিকারহীন। চতুর্থ শূদ্র ইহারা কৃষিজীবী। পঞ্চম বৈস্থরা ইহারা কারিকর ও শিল্পী। ষষ্ঠ চণ্ডাল।—ইহারা নীচ কার্য্য করে। সপ্তম লাহাং ইহারা বাজীকর ও ঐন্দ্রজালিক; ইহারা দেশ দেশান্তরে ভ্রমণ করিয়াও বেড়ায়।*

ভারতবর্ষে বিয়াল্লিশ রকমের জাতি আছে। কতক হিন্দু, কতক মুসলমান এবং কতক বা নাস্তিক।

মারুজল জাহাব। স্বর্ণক্ষেত্র (Meadows of Gold) প্রণেতা আলমশৌদি তাঁহার সমগ্র জীবন প্রায় ভ্রমণেই অতিবাহিত করেন। তিনি স্পেন, মরক্কো, চীনদেশ অবধি পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। হিজিরা ৩৩০ (৯৪০ খৃষ্টাব্দে) এই বৃত্তান্ত তিনি লিপিবদ্ধ করেন।†

লণ্ডনে ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে ডাক্তার স্প্রেনজার এই পুস্তকের কিয়দংশ ইংরাজীতে ভাষান্তরিত করেন। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে ফরাসী দেশে ইহার সমগ্র অনুবাদ প্রকাশিত হয়।

ভারতবর্ষে ব্রহ্ম নামে এক রাজা ছিলেন।

---

* কাটারিয়া—ক্ষত্রিয়। বৈস্থরা বৈশ্য।

† ঐতিহাসিক হিসাবে এ পুস্তকের মূল্য কত তাহা পাঠকগণই বিবেচনা করিবেন।

তিনি ৩৬৬ বৎসর রাজত্ব করেন। তাঁহারই সময়ে সিদ্ধান্ত রচিত হয়। তাঁহার সন্তান সন্ততিগণ অদ্যাপি ব্রাহ্মণ নামে অভিহিত। তাঁহারা সকলেরই সম্মানভাজন। ব্রাহ্মণেরা নিরামিষাশী এবং স্ত্রীপুরুষ উভয়েই গলদেশে পীতবর্ণ যজ্ঞসূত্র ধারণ করেন। ব্রহ্মের পরে তাঁহার পুত্র বাবুদ একশত বৎসর রাজত্ব করেন। তৎপরে জাসন প্রায় পঞ্চাশ বৎসর রাজত্ব করিয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলে পোর বা পোরণ রাজা হন। তিনি ১৪০ বৎসর রাজত্ব করেন এবং পরিশেষে গ্রীস দেশীয় আলেকজাণ্ডারের সহিত যুদ্ধে হত হন। তাহার পর কলিয়াদমন প্রণেতা দাবাসহিল ১১০ বৎসর কাল রাজত্ব করেন। ইঁহার পরে যিনি রাজা হন তিনি ৮০০ বৎসর সিংহাসনাধিকারী ছিলেন। তৎপরে হর্ষ রাজা। ইনি নূতন ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করেন। ইনি ১২০ বৎসর রাজা ছিলেন তাঁহার মৃত্যুর পর, তাঁহার রাজ্য সিন্ধু, কনোজ ও কাশ্মীরে প্রসারিত হইয়া পড়ে এবং মানকীর নগর ও তৎসহ সমস্ত রাজ্যই বল্লরের হস্তে পতিত হয়। অদ্যাবধি তিনিই রাজত্ব করিতেছেন।

ভারতবর্ষ এক বিস্তৃত দেশ। এখানে ৪০ বৎসর বয়স না হইলে কেহই রাজা হইতে পারেন না। রাজা সকল সময়েই প্রজার সম্মুখে বাহির হন না। সময় বিশেষে সাধারণের সম্মুখে বাহির হন এবং রাজ কার্য্য পরিদর্শন করেন। রাজ্যাধিকারের প্রথা বংশ পরম্পরাগত।

হিন্দুরা মদ্যপায়ী নন্। যাহারা মদ্য পান করে তাহারা অত্যন্ত ঘৃণার্হ। ইহাতে বুদ্ধি হানি হয় বলিয়া তাহারা মদ্য স্পর্শও করে না। যদি কোন রাজা মদ্য পান করেন, তবে তিনি সিংহাসনচ্যুত হন। কারণ মন স্থির না হইলে রাজ্য পরিচালনা সম্ভব হইতে পারে না।

মুলতান মুসলমান অধিকারভুক্ত। মুলতানের নিকট দ্বাদশ সহস্র নগরী আছে। এইখানে একটী দেবমূর্ত্তি বা প্রতিমা আছেন। সিন্ধু এবং হিন্দু স্থানের অনেক লোক এখানে তীর্থ করিতে আসেন। তাহারা মূল্যবান প্রস্তর, মুসব্বর প্রভৃতি আনয়ন করিয়া থাকে। এক মণ মুসব্বরের (aloe-wood) মূল্য ২০০ দিনার। যখনই হিন্দুরা মুলতান অধিকার করিতে আইসে তখনই মুসলমানেরা প্রতিমা চূর্ণ করিয়া দিবে বলিয়া ভয় প্রদর্শন করে। সুতরাং বাধ্য হইয়া হিন্দুকে পশ্চাৎপদ হইতে হয়।

কিতাবুল আকালিম। Book of climates প্রণেতা আবু ইসাক, ইস্তাফার (পার্সিপোলিস) নিবাসী। ইনি দশম শতাব্দীর মধ্য ভাগে এই পুস্তক লেখেন। ইনি অনেক দেশ ভ্রমণ করেন এবং ভারতবর্ষ হইতে আটলাণ্টিক সমুদ্র ও পারস্যোপসাগর হইতে কাম্পিয়ান সমুদ্র পর্য্যন্ত বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।

বহ্লরে অনেক মুসলমান আছে। মনসুরের অধিবাসীরা সকলেই মুসলমান। এখানে অনেক খর্জ্জুর বৃক্ষ জন্মে। এই ভারতবর্ষেই আম্র হয়। মূল্য অত্যন্ত সুলভ এবং ফলও প্রচুর পরিমাণে জন্মে।

মুলতানে হিন্দুদিগের একটী মন্দির আছে। মন্দিরটী নগরের মধ্যে স্থাপিত। প্রতিমা মনুষ্যাকার এবং ইট ও সুরকীর

প্রস্তুত বেদীর উপর আসীন। (The idol has a human shape and is seated with its legs bent in a quadrangular posture on a throne made of brick and mortar). এই প্রতিমার সকল শরীরই আবৃত কেবল মাত্র চক্ষু দেখা যায়। মূর্ত্তি কিসের প্রস্তুত তাহা জানা যায় না। ইহার গাত্রাবরণ খোলা নিষেধ সুতরাং জানিবার কোন উপায়ও নাই। চক্ষু দুইটী বহু মূল্যবান প্রস্তর দ্বারা নির্ম্মিত এবং মস্তকে একটী সোণার মুকুট আছে। মুলতান খলিফার অধিকৃত। অধিবাসীরা পাজামা পরিধান করে এবং পারস্য ও সিন্ধু দেশের ভাষায় কথোপকথন করে।

আসাকুল বিলাদ। এই পুস্তক বোগদাদ নিবাসী মহম্মদ আবুল কাসিম রচিত। হিজিরা ৩৬৬ (৯৭৬ খৃষ্টাব্দে) এই পুস্তক রচিত হইয়াছিল।

সমুদ্র হইতে তিব্বত তিন মাসের পথ। সিন্ধু দেশের মুদ্রা কান্দাহারে প্রস্তুত হয়। এক একটী মুদ্রা ৫ দারহামের সমান। এখানে দিনারও প্রচলিত।

গ্রন্থকার তৎপর মূলতান ও তাহার মন্দির ও প্রতিমার বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

নুজাহাটল মুসটক্। "Delight of those who seek to wander through the regions of the world" নামক পুস্তক প্রণেতা আলইদ্রিসি একাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে মরক্কো প্রদেশের কেউটা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইদ্রিসি ইউরোপে ভ্রমণ করিয়াছিলেন এবং সিসিলির রাজা দ্বিতীয় রোজারের আদেশে তাঁহার পুস্তক প্রণয়ন করেন। ১৫৯২ খৃষ্টাব্দে পুস্তক তরজমা হয়। ইদ্রিসি একজন সংগ্রহকারক মাত্র।

ভারতবাসীরা সপ্ত জাতিতে বিভক্ত। প্রথম সাক্রিয় ইহারা উচ্চ বংশ সম্ভূত এবং ইহাদের মধ্য হইতেই রাজাদিগকে মনোনীত করা হয়। দ্বিতীয় ব্রাহ্মণ (Religious class) ইহারা ব্যাঘ্র চর্ম্ম পরিধান করে। কোন কোন সময়ে তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ হস্তে যষ্টি লইয়া উপস্থিত জনমণ্ডলীর নিকট ভগবানের নাম কীর্ত্তন করে। ইহারা কথনও মদ্য স্পর্শ করে না। ইহারা পৌত্তলিক। তৃতীয় ক্ষত্রিয়। ইহারা মাত্র তিন পাত্র মদ্য পান করিতে পারে। ইহারা ব্রাহ্মণদের কন্যা বিবাহ করিতে পারে কিন্তু ব্রাহ্মণেরা ইহাদের কন্যা বিবাহ করিতে পারে না। * পরে শৌদ্র ইহারা কৃষিজীবি। বৈশ্যেরা শিল্পী এবং চণ্ডালগণ গায়ক। চণ্ডালদের স্ত্রীলোকেরা অত্যন্ত সুন্দরী।

ভারতবর্ষে ৪২ রকমের জাতি আছে। কেহ পৌত্তলিক। কেহ পাথর পূজা করে; এই প্রস্তরের উপর মাখন ও ঘৃত দেওয়া হয়। ইহাদের মধ্যে অগ্নি উপাসকও আছে। কেহ সূর্য্যের উপাসনা করে; কেহ বৃক্ষ পূজা করে। এখানে নাস্তিকেরও অভাব নাই।

বাণিজ্য সম্বন্ধে গ্রন্থকার বলিতেছেন যে অনেক রকম দ্রব্য আমদানি ও রপ্তানি হয়। ভারতবর্ষ হইতে সম্ভার পরিপূর্ণ জাহাজ দেবল নগরীতে যাতায়াত করে।

মনসুরা নগরী সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে

* এটী কতদূর সত্য তাহা লেখা নিষ্প্রয়োজন।

এখানে বাণিজ্যের বিশেষ প্রভাব দেখা যায়। বাজার লোক পরিপূর্ণ। রৌপ্য ও তাম্র মুদ্রা ব্যবহৃত হয়। মৎস্য প্রচুর, মাংস অত্যন্ত সুলভ এবং দেশী ও বিদেশী অনেক রকম ফল প্রচুর পরিমাণে বাজারে পাওয়া যায়।

মুলতান সম্বন্ধে বলিতেছেন যে এখানে খাদ্য দ্রব্য অত্যন্ত সস্তা। এখানে রাজকর (tax) অত্যন্ত কম এবং সেই জন্য নগর-বাসীরা অত্যন্ত সুখে কালাতিপাত করে।

গ্রন্থকার কামবয়া নামক আর একটী নগরীর উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা সমুদ্র হইতে ৩ মাইল দূরে এবং দেখিতে অত্যন্ত সুন্দর। ইহা একটী Naval Station ; সকল দেশ হইতেই এখানে পণ্যাদি আমদানী হয় এবং এখান হইতে অন্যত্র প্রেরিত হয়।

ভারতবাসীরা স্বভাবতঃই ন্যায়-প্রিয় (Lover of Justice) এবং কোন প্রকারেই সত্য হইতে বিচলিত হয় না। তাহাদের সত্য লিপ্সা, সাধুতা এবং কথামত কার্য্য করা সকলেই বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত আছেন এবং সেই জন্য সকলেই ইহাদের দেশে বাণিজ্যার্থ গমনাগমন করে। এই সমস্ত কারণে দেশেরও এত উন্নতি। পাপের প্রতি তাহাদের কিরূপ ঘৃণা তাহা নিম্নলিখিত ঘটনা হইতে বেশ বোধগম্য হইবে। যখন একের অন্যের নিকট কিছু পাওনা থাকে, তখন পাওনাদার মাটীতে কেবল মাত্র একটী বৃত্ত অঙ্কিত করিয়া তাহার মধ্যে দেনদারকে প্রবেশ করিতে বলে। দেনদার পাওনাদারকে সন্তুষ্ট না করিয়া কিছুতেই এ স্থান পরিত্যাগ করে না।

ইহারা জীবহিংসা করে না। ষণ্ডকে ইহারা অত্যন্ত ভক্তি করে এবং তাহাদের মৃত্যু হইলে মাটিতে পুঁতিয়া রাখে। এই সমস্ত ষাঁড় বৃদ্ধ হইয়া কার্য্যে অকর্ম্মণ্য হইলে হিন্দুরা আমৃত্যু পর্য্যন্ত তাহাদিগকে খাইতে দেয়।

বহুলার দেশে বিবাহিতা স্ত্রীলোক ব্যতীত সকলেরই সহিত সহবাসের অনুমতি আছে।

আরস্থলবিলাদ। Monuments of Countries and Memories of Men নামক গ্রন্থপ্রণেতা পারস্য সহরের কাজওয়ালী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। গ্রন্থ-কারের নাম ঝাকারিয়া। ইনি "wonders of things created and Marvels of things existed" নামক পুস্তকও প্রণয়ন করিয়াছেন।

ইনি কুলাম নামক নগরীর বৃত্তান্তে লিখিয়াছেন ;—ভারতবর্ষে কেবলমাত্র এই নগরীতেই চিকিৎসক আছেন। এখান-কার বাড়ীগুলি কিছু নূতন রকমের। মৎস্যের আইস হইতে বাড়ীগুলির স্তম্ভনির্ম্মিত। এই নগরবাসীরা মৎস্য খায় না কিংবা জীব-হত্যাও করে না কিন্তু মৃতপশুর মাংস খায়।

সোমনাথ ও তথাকার মন্দিরের কথা ইনি এইরূপ লিখিয়া গিয়াছেন। মন্দিরস্থ মূর্ত্তি মন্দিরের মধ্যে দোলায়মান অবস্থায় আছে এবং দেখিলেই আশ্চর্য্য হইতে হয়। গ্রহণের সময় কোটী কোটী লোক এখানে সমবেত হয়। এই প্রতিমাপূজার জন্য দশসহস্র গ্রামের আয় ব্যয় হয়। গঙ্গা হইতে জল আনিয়া প্রত্যহ এই প্রতিমা ও মন্দির ধৌত করা হয়। সহস্রাধিক ব্রাহ্মণ দেবতার পূজা করেন এবং পাঁচশত যুবতী মন্দিরের দ্বারে দেবতার তুষ্টির জন্য নৃত্যগীত করে।

এই পূজক পরিচারক ও পরিচারিকাগণ মন্দিরের আগ্নেই জীবনাতিপাত করে। ৫৬টী স্তম্ভের উপর মন্দির স্থাপিত ও মণিমুক্তা-খচিত ঝাড়লণ্ঠনে মন্দির সুশোভিত *

তারিকুল হিন্দ। আবুরিহান অলবেরুণি কর্ত্তৃক এই পুস্তক বিরচিত। আলবেরুণি স্বনামখ্যাত ব্যক্তি। তিনি একাধারে জ্যোতির্ব্বিদ, জ্যামিতিক, ঐতিহাসিক এবং নৈয়ায়িক। কথিত আছে "He never had a pen out of his hand, nor his eye off a book, and his thoughts were always directed to his studies, with the exception of two days in the year, namely Nawraz and Mihijan, when he was occupied with the command of the Prophet, in procuring the necessaries of life on such a moderate scale as to afford him bare sustenance and clothing"। অলবেরুণী ভারতবর্ষের অনেকগুলি দেশভ্রমণ করিয়াছিলেন এবং সেই সেই দেশের অনেক লোকের সহিত তাঁহার সখ্যতা ছিল। রসিদুদ্দিন নামা তৎসাময়িক একজন গ্রন্থকার বলিয়াছেন যে আলবেরুণি ভারতবর্ষের ধর্ম্ম ও ন্যায়শাস্ত্রেও বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। আলবেরুণীর পুস্তক অত্যন্ত মূল্যবান।

কনোজের রাজা কাবুলের অধিপতি কনককে অত্যন্ত অপমান করাতে কাবুলাধিপতি কনোজাধিপতিকে শাসন করিবার জন্য সসৈন্যে অগ্রসর হইতে থাকেন। শেষোক্ত ভূপতি এ সংবাদ অবগত হইয়া অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত হন এবং তদীয় মন্ত্রীর পরামর্শ চাহেন। মন্ত্রী উত্তর দেন যে আপনি বিনাকারণে এক প্রবল পরাক্রান্ত নরপতিকে অপমান করিয়াছেন ; এইক্ষণ এক উপায় ব্যতীত আমি আর অন্য উপায় দেখিতেছি না। সেটী এই ; আপনি আমার নাসাকর্ণ ছেদন করিয়া দেন ; আমি একবার চেষ্টা করিয়া দেখি কিছু করিতে পারি কিনা। অগত্যা কনোজাধিপতি মন্ত্রীর নাসাকর্ণ ছেদন করিয়া দিলে মন্ত্রী কাবুলাধিপতির সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন যে, তিনি সহস্র চেষ্টাতেও কনোজের পাপমতি রাজাকে কাবুলাধিপতিকে অপমান হইতে বিরত করাইতে পারেন নাই এবং সেই জন্যই তাঁহার প্রভু তাঁহার নাসাকর্ণ ছেদন করিয়া দিয়াছেন। এইক্ষণ সেই অপমানের প্রতিশোধ কামনায় আপনার সাহায্যার্থে অগ্রসর হইয়াছি। আমি যে পথে আপনাকে যাইতে বলি, আপনি আমার সহিত সেই পথে অগ্রসর হউন। মন্ত্রী এই বলিয়া কাবুলাধিপতিকে একটী মরুভূমির মধ্য দিয়া লইয়া যাইতে লাগিলেন। কনকের সহিত যে জল ছিল তাহা শীঘ্র

* কথিত আছে মহম্মদ গজনী প্রথমতঃ এই প্রতিমার দোলায়মান অবস্থা দেখিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হন। তাঁহার অনুচরগণ কেহই ইহার কারণ অনুধাবন করিতে পারে না। অবশেষে একজন চুম্বক ও লৌহের আকর্ষণী শক্তিদ্বারা এরূপ হইয়াছে প্রস্তাব করাতে প্রতিমার উপরিস্থ কয়েকখানি টালি সরান হয়। তখন দেখা যায় যে উপরে চুম্বকের টালি এরূপভাবে দেওয়া হইয়াছে যে লৌহনির্ম্মিত প্রতিমাটি মধ্যস্থলে ঠিক ভাবে থাকে।

ফুরাইয়া গেল এবং আর কত দিনে তিনি কনোজ পৌঁছিতে পারিবেন মন্ত্রীকে ইহা জিজ্ঞাসা করিলে মন্ত্রী উত্তর করিলেন যে আমি আমার প্রভুকে রক্ষা করিবার জন্য এরূপ প্রবঞ্চনা করিয়াছি। এইক্ষণ আপনার যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন কিন্তু এ মরুভূমিতে আপনার জল পাইবার কোনই সম্ভাবনা নাই। এই কথা শুনিবামাত্র রাজার পার্শ্বচরগণ মন্ত্রীকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলে কনক তাহাদের নিষেধ করিয়া নিকটবর্ত্তী নিম্নভূমিতে হস্তস্থিত বল্লম প্রোথিত করায় সেই স্থান হইতে জল নির্গত হইতে লাগিল। মন্ত্রী তখন বলিলেন যে আমি মনুষ্যের সহিতই প্রতারণা করিতে আসিয়াছিলাম, দেবতার সহিত আসি নাই। আপনি দেবতা; সুতরাং আপনি আমার অপরাধ মার্জ্জনা করুন। দেবতার লোভ বা ক্রোধ থাকাও উচিত নয় সুতরাং আপনি আমার প্রভুকেও মার্জ্জনা করুন। কাবুলাধিপতি প্রত্যুত্তরে বলিলেন যে আমি মার্জ্জনা করিলাম কিন্তু তোমার প্রভু তাহার কার্য্যোচিত শাস্তি পাইয়াছেন। কনক দেশে প্রত্যাগমন করিলেন; মন্ত্রীও স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন যে, যে মুহূর্ত্তে কনক মৃত্তিকায় তাহার বল্লমপ্রোথিত করিয়াছিলেন তন্মুহূর্ত্ত হইতেই কনোজাধিপতির হস্তপদ জড়ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে।

অলবেরুণী অন্য ঘটনার মধ্যে আনন্দপাল রাজার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। আনন্দপাল কাবুলের অধিপতি আমির মহম্মদকে পরাজিত করেন কিন্তু যখন তুর্কীরা আমির মহম্মদের রাজত্ব আক্রমণে উদ্যত হয় তখন আনন্দপাল কাবুলাধিপতিকে লিখিয়া পাঠান যে যদি প্রয়োজন হয় তবে আমি পাঁচ হাজার অশ্বারোহী, দশসহস্র পদাতিক ও একশত হস্তী লইয়া সাহায্য করিতে পারি অথবা যদি তুমি পছন্দ কর, তবে আমার পুত্রের সহিত ইহার দ্বিগুণ সৈন্য পাঠাইতে পারি। যদিও আমি তোমাকে পরাজিত করিয়াছি তথাপি আমার ইচ্ছা না যে আমা ব্যতীত অন্য কাহারও নিকট তুমি পরাজিত হও।*

তারিফ ইয়ামানি বা কিতাবুল ইয়ামুনি। ইহা আল উৎবি অথবা আবুনছর মহম্মদ ইবন আল জব্বরুল উৎবি প্রণীত। এই গ্রন্থে মহম্মদ গজনী ও জয়পাল ইত্যাদির বর্ণনা আছে। এ বৃত্তান্ত সকলেই অবগত আছেন সুতরাং ইহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

তারিবস্ সবক্তজীন। ইহা আবুল-ফজল আলবৈহাকীর প্রণীত এবং ৩০ খণ্ডে লিখিত।

আমির মন্সুরের সেনাপতি আমদ নিয়াল টোগিন ১০৩৩ খৃষ্টাব্দে মুলতানে সেনাপতি নিযুক্ত হইয়া আইসেন। তিনি ভাগীরথী উত্তীর্ণ হইয়া বারাণসীক্ষেত্রে উপস্থিত হন। ইতিপূর্ব্বে আর কোন মুসলমান সৈনিক এখানে উপস্থিত হয়েন নাই। সৈন্যেরা ইচ্ছা-

---

* এই বর্ণনা হইতে ভারতবর্ষের তদানীন্তন রাজাদের পরাক্রমের বৃত্তান্ত বেশ পরিষ্কাররূপে অবগত হওয়া যায়।

মত স্বর্ণ, রৌপ্য, মণিমুক্তা অনেক লুঠ করিয়াছিল।

নিয়ালটগিনের ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইয়া আমির মামুদ হিন্দুস্থানবাসী তিলককে সেনাপতি করিয়া মুলতানে প্রেরণ করেন। এই তিলক পরামাণিক জাতীয় কিন্তু দেখিতে অতি সুশ্রী ও বিশেষ বিদ্বান ছিলেন। হিন্দু ও পার্শী ভাষায় তাঁহার অত্যন্ত দখল ছিল। তিলক নিজ বুদ্ধিবলে মামুদের মন্ত্রী খাজা আহম্মদ-হোসেনের প্রিয়পাত্র হইয়া তাঁহার "সেক্রেটারী"র পদ লাভ করিয়া ক্রমে হিন্দু সৈন্যের সেনাপতি হয়েন। তাঁহার কার্য্যে প্রীত হইয়া আমীর তাঁহাকে পোষাক, মুক্তার মালা তাম্বু ও ছত্র উপহার প্রদান করেন।

তিলক আহাম্মদ নিয়ালটগিনকে যুদ্ধে পরাজিত করেন; নিয়াল টগিন এই যুদ্ধে হত এবং তাঁহার পুত্র বন্দী হন। বলা বাহুল্য আমীর তিলককে তাঁহার এই বীরত্বের জন্য বিশেষ রূপে পুরস্কৃত করেন।

ইহার কিছুদিন পরে আমির মামুদ নিজেই ভারতবর্ষ আক্রমণে অগ্রসর হয়েন। প্রথম বৎসর তিনি কাশ্মীরের অন্তর্গত সারসুতীর দুর্গ অধিকারান্তে নিজ রাজ্যের অশান্তি নিবারণের জন্য স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। পর বৎসর, ফিরিয়া আসিয়া তিনি হালসির দুর্গ অধিকার করেন। এযাবৎ অন্য কেহই এ দুর্গ অধিকার করিতে পারেন নাই এবং সেই জন্য পূর্ব্বাপর ইহা কুমারী (Virgin) নামে অভিহিতা ছিল। পরে তিনি গজনী প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

জামিয়াল হিকায়ৎ। মহম্মদ আফি এই গ্রন্থ রচয়িতা। তিনি ভারতবর্ষের সাধুতা সম্বন্ধে একটী সুন্দর দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। একদা এক ব্যক্তি তাঁহার গৃহ ও তৎসংলগ্ন জমী অপর ব্যক্তিকে বিক্রয় করে। ক্রেতা ঐ জমী খননে অনেক অর্থ পাইয়া বিক্রেতাকে সেই মুদ্রা প্রত্যর্পণ করিতে যান। ক্রেতা বলেন যে তিনি কেবল বাড়ী ও জমী কিনিয়াছেন কিন্তু জমির মধ্যস্থিত ধন ত আর তিনি ক্রয় করেন নাই। বিক্রেতা বলেন যে তিনি যখন বাড়ী ও তৎসহ জমী বিক্রী করিয়াছেন তখন গুপ্ত ধনও অবশ্য বিক্রয় করিয়াছেন। উভয়ের কেহই এই ধন গ্রহণে অস্বীকৃত হইয়া তাঁহারা তদ্দেশীয় অধিপতিকে ইহা গ্রহণে অনুরোধ করিলেন। তিনিও ইহা তাঁহার নহে বলিয়া গ্রহণ করিলেন না। অবশেষে ক্রেতার পুত্র ও বিক্রেতার কন্যার বিবাহ স্থির হইয়া যৌতুকস্বরূপ বরকন্যাকে এই ধনরাশি উপহার দেওয়া হইল।

রাজা প্রজাকে আদৌ উৎপীড়ন করিতেন না। "The King from an innate sence of Justice would not suffer the skirt of his robes of equity and righteousness to be soiled by the dirt of oppression and dishonesty."

তাবাক্ত নছরী। মিনহাজুসিরাজ প্রণীত এই গ্রন্থ তেইশ খণ্ডে বিভক্ত এবং ১২৫৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইহাতে ঘটনা বিবৃত হইতেছে। এ পুস্তকের বিষয় প্রায় সকলেই অবগত আছেন সুতরাং এসম্বন্ধে আর কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন।

শ্রীযোগীন্দ্র সমাদ্দার।

পোষ্যপুত্র।

পরদিন প্রভাতে শিশুর ক্রন্দনে শিবানীর যখন ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, তখন বেলা হইয়াছে ঝড় ঝাপটা কাটিয়া পুঞ্জ পুঞ্জ সাদা মেঘের স্তর ভেদ করিয়া চৈত্রের সূর্য্য তখন পবনান্দোলিত তালগাছগুলার মাথায় চড়িয়া বসিয়াছেন। অশোক গাছের ফুলেভরা ডালগুলা ঝড়ের আক্রমণে ভাঙ্গিয়া পড়িয়া তাহাকে যেন সদ্য বিধবার অলঙ্কারহীন হস্তের মত দেখাইতেছে। বৃষ্টির জল তখনও অশ্রুজলের মত বাতাসের দোলার সঙ্গে সঙ্গে ঝর্ ঝর করিয়া পাতা হইতে ঝরিয়া পড়িতেছিল। শিবানী উঠিয়া পুত্রকে কোলে তুলিয়া লইল। সারারাত্রি সে তাহাকে বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিল।

দ্বিপ্রহরে আহারান্তে সিদ্ধেশ্বরী তাঁহার বাতযুক্ত পদদ্বয়ে ধুতুরা প্রলেপ লাগাইয়া দাওয়ায় বসিয়া চরকায় সুতা কাটিতেছিলেন। নিকটে দৌহিত্র বসিয়া একটা কাঠের লাল ঝুমঝুমি দুই হস্তে মুখের মধ্যে পুরিয়া অপূর্ব্ব ভোজ্যজ্ঞানে ব্যগ্রচিত্তে আয়ত্ত করিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেছিল। নাপারিয়া এক একবার চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া অনায়ত্ত দ্রব্যটা মাটিতে ঠুকিতেছিল আবার কিছুক্ষণ পরে দ্বিগুণ অধ্যবসায়ের সহিত সেই লালাসিক্ত কাঠখণ্ডটা ভোজনের চেষ্টায় মনোনিবেশ করিতেছিল। সিদ্ধেশ্বরী মধ্যে মধ্যে মুখ তুলিয়া শিশুর দিকে চাহিয়া তাহাকে আদর করিতেছিলেন, অমনি ভোজনব্যাপার স্থগিত রাখিয়া সে খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিয়া কত কি অশ্রুতপূর্ব্ব শব্দ উচ্চারণ করিতেছিল। শিবানী রান্নাঘরের উনানে পুত্রের জন্য দুধ গরম করিতেছিল। দুধের বাটি ও ঝিনুকখানা হাতে করিয়া দু-পা অগ্রসর হইতেই বাহির দিক হইতে একটা অপূর্ব্বশ্রুত শব্দ তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল "চিঠ্‌ঠি।"

শিবানীর সর্ব্ব শরীর থরথর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল, হাত হইতে গরম দুধের বাটিটা পায়ের উপর পড়িয়া গেল। সে সেদিকে লক্ষ্যমাত্র না করিয়া একপ্রকার ছুটিয়াই বাহিরে আসিল। সিদ্ধেশ্বরী শব্দ পাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "পড়ে গেলি। হাত পা একটু স্থির করে তো কাজ কর্ম্ম করতে জানিসনে, ফেল্লি কি? দুধটা নাকি? এখন ছেলেটাই বা খায় কি?" সে কথা শিবানীর কানেও প্রবেশ করিল না। সে উত্তেজিত আবেগে ছুটিয়া আসিয়া "রুদ্ধপ্রায় নিশ্বাসে পিয়নকে জিজ্ঞাসা করিল "কার চিঠি?" পিয়ন বলিল "মায়ি শিবানী দেবী কাহার নাম? রেজিষ্ট্রী চিঠি আছে।"

শিবানীর সর্ব্ব শরীরের রক্তটা টগবগ করিয়া ফুটিয়া উঠিল, সে কম্পিত হস্তে চিঠিখানা লইয়া উত্তর করিল "আমিই শিবানী দেবী।"

"মায়িজি, এ রেজিষ্টরি চিঠি এইখানে সহি করে দিতে হবে।"

শিবানী পিয়নের প্রদত্ত পেন্সিলটা লইয়া কোনরূপে রসিদটা সই করিয়া উঠানের ভিতর প্রবেশ করিল এবং একপ্রান্তে প্রাচীরের ধারে বসিয়া খামটা খুলিয়া চিঠিখানা টানিয়া বাহির করিল। তাহার মধ্যে একটুকরা চিঠি ও কয়েকখানা নোট ছিল, দেখিয়া

শিবানীর পাংশুমুখ লাল হইয়া উঠিল, সে চিঠি এইরূপ।

"শিবানি! বিধাতার অলঙ্ঘ্য লিপি মানুষের সাধ্য কি যে খণ্ডন করে। সেদিন আসিবার সময় বলিয়া আসিয়াছিলাম, আজ থেকে মনে করো তুমি বিধবা, আজ বুঝি সেই অভিশাপ ফলিতে চলিল। মৃত্যুশয্যায় শুইয়া এ পত্র লেখাইতেছি। ভীষণ কলেরা রোগে পড়িয়া আছি। বুঝিতেছি বাঁচিবার আর আশা নাই। আমার মৃত্যুর পর যখন এ পত্র পাইবে তখন ঘৃণা করিয়া এপত্র পড়িবে কিনা জানি না; কিন্তু তখন আমি কাহারো নিকট ঘৃণ্য জীবন বহন করিতেছি না, এই শান্তি। টাকা কয়টা তোমার মাকে দিও, তাঁহার অনেক ঋণী আছি কিছু শোধ করিয়া যাই।" "শ্রীনীরদকুমার চৌধুরী।" শিবানীর শিথিল অঙ্গুলিমধ্য হইতে স্খলিত হইয়া সেই ভয়ানক সংবাদবহ পত্রখানা মাটিতে পড়িয়া গেল।

সিদ্ধেশ্বরী বহুক্ষণ ধরিয়া অনেক ডাকাডাকিতেও কন্যার সাড়াশব্দ না পাইয়া বাতগ্রস্ত পা টানিয়া টানিয়া বিকৃতমুখে যন্ত্রণাসূচক ধ্বনি করিতে করিতে বিরক্তমনে তাহার খোঁজ লইতে আসিলেন।

প্রাঙ্গণের একপার্শ্বে ফুলশূন্য করবী গাছের কাছে প্রাচীরে ঠেসদিয়া শিবানী বসিয়া আছে দেখিয়াই তাঁহার রাগ বাড়িয়া উঠিল। বলিলেন "ওখানে বসে কি ধ্যান কচ্ছিস? এতো যে ডাকছি তাকি কানেও যায় না? ধন্যি মেয়ে যাহক"—বলিতে বলিতে কন্যার নিকটে গিয়া চমকিয়া থামিয়া গেলেন—চিঠি নাকি? কে লিখেছে নীরদ বুঝি? ওমা কথা কোস্‌নে কেন গো? ওমা আমার কি হলো গো! ওমা আমি কোথা যাই গো! ওরে নীরদ বাবারে! ওরে আমার মাণিক রে, ওরে আমি পোড়া কপালি তোকে কেন বকেছিলুম রে, ওরে একবার আয় রে, ইত্যাদি শব্দে কাঁদিতে কাঁদিতে তিনি সেইখানে বসিয়া পড়িলেন।

তৎক্ষণাৎ পাড়া ঝাঁটাইয়া সকলে তাঁহার বাড়িতে আসিয়া উপস্থিত হইল। সকলেই ব্যাপার কি জানিবার প্রয়োজন না দেখিয়া তাঁহার কান্নার বিনানি শুনিয়া নীরদকুমারের মৃত্যুর সম্বন্ধে নিঃসংশয় হইয়াছিল। অনেকেই তাঁহার সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করিল, অনেকেই অকৃত্রিম চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে তাঁহাকে সান্ত্বনা প্রদান করিতে লাগিল—আহা কি কপাল গো জামাইতো নয় যেন সাক্ষাৎ ময়ূর ছাড়া কার্ত্তিক, স্বভাবটিই বা কি মিষ্ট ছিল এমন জামাই যে তপস্যায় পায় না গা। আহা বাছা রাগ করে কোথায় গেল, কেই বা যত্ন আর্ত্তি করলে, বিঘোরে প্রাণটা নষ্ট করলে গা! আহাহা!" আবার কেহ বা বলিলেন "তা আর কেঁদে কি কর্ব্বে বলো শিবুর মা; সেতো তোমার গিয়েইছিল, পিত্তোশ তো কিছুই ছিল না, তবে মেয়েটার মাছ ভাতটাই যা বন্ধ হলো; তা এমন কাণ্ড কোথায় হলো?" এমনি কিছুক্ষণ কান্না কাটনার পর কোথা হইতে হঠাৎ একটা প্রশ্ন উঠিল "খপরটা দিলে কে? কোথা হইতে খপর পেলে?" তখন উচ্চচীৎকারপরায়ণা সিদ্ধেশ্বরীর হুঁষ হইল "ওমা তাইতো, তাতো জানি না, চিঠিখানা দেখে ও শিবির রকমে মনটা কেমন হয়ে

গেল।" শুনিয়া সকলকারই দৃষ্টি সেই ভূমে পতিত পত্রখানার প্রতি আকৃষ্ট হইল, একজন পাঠক্ষম যুবতী সেখানা তুলিয়া লইয়া পাঠ করিল, এবং বলা বাহুল্য যে ইহার পর হইতে সিদ্ধেশ্বরীর রোদন প্রায় গগনভেদ করিবার উপক্রম করিয়া তুলিল, কিন্তু ছঁষিয়ার মানুষ নোট কয়খানা অঞ্চলে বাঁধিতে ভুলিলেন না। এমন সময় মাতঙ্গিনী আসিয়া তাড়াতাড়ি শিবানীর নিকট ছুটিয়া গেলেন। তাহার স্পন্দনহীন দেহ স্পর্শ করিয়াই তিনি সিদ্ধেশ্বরীর কাছে আসিয়া তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিয়া কহিলেন "পোড়ারমুখী পরের ছেলের জন্য চেঁচিয়ে মচ্চো তোমার নিজের মেয়ে যে এ দিকে যায়, মেয়ে বাঁচাতে চাওতো চুপ করো।" পরের ছেলের যে কতখানি দরদ তাহা সিদ্ধেশ্বরী এখন হাড়ে হাড়ে বুঝিয়াছিলেন তিনি সখীকে দেখিয়া 'ওগো দিদি, নীরদ যে আমার রাগ করে চলে গেছলোগো! ওগো বাছা আমার সেই রাগ নিয়েই চলে গেল দিদি"। বলিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন।

পাড়া পড়সীতে দিনের বেলায় এমন বিপদের দিনে যথেষ্ট আত্মীয়তা দেখাইয়া আপ্যায়িত করিতে পারেন, কিন্তু তাঁহারা রাত্রের প্রয়োজনে কেহই অগ্রসর হইতে চাহেন না। একা মাতঙ্গিনী দুইটি শোকার্ত্তা রমণীকে লইয়া বিব্রত হইয়া পড়িলেন। তাহার উপর আবার একটি কচি ছেলে আছে। বোসেদের বাড়ির মেজ বধূ শিবানীর সই ছেলেটিকে সমস্ত দিন কোলে লইয়া দুধ খাওয়াইয়াছে, ভুলাইয়া রাখিয়াছে, কিন্তু এখন শ্বাশুড়ির আজ্ঞায় তাহাকেও তো গৃহে ফিরিতেই হইবে, ঘুমন্ত শিশুকে মাতঙ্গিনীর কাছে দিয়া সে অনিচ্ছুক পদে চলিয়া গেল।

শিবানী যখন রাত্রে চোখ চাহিল তখন ঘরের মধ্যে সিদ্ধেশ্বরী মাটিতে আঁচল বিছাইয়া শুইয়া পড়িয়া অনুচ্চ স্বরে কাঁদিতেছিলেন। চীৎকার করিবার শক্তি হ্রাস হইয়াছিল বলিয়া নয়, নাতির ঘুম ভাঙ্গিবে এই ভয়েই তাঁহাকে সাবধানতা অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। মাতঙ্গিনী ভূমিলুণ্ঠিতা শিবানীর মাথাটা কোলে তুলিয়া লইয়া ধীরে ধীরে তাহার গায়ে মাথায় হাত বুলাইয়া দিতেছিলেন, মধ্যে মধ্যে চোখের জল মুছিতে মুছিতে ডাকিতেছিলেন 'শিবু, শিবু ওমা, কথা কনা মা'—সংজ্ঞাপ্রাপ্ত শিবানী একবারমাত্র চাহিয়া দেখিল! তখনও সে কথা কহিবার শক্তি ফিরিয়া পায় নাই। একটা অনিশ্বসিত যন্ত্রণার রুদ্ধ বাষ্পে তাহার বুকটা ফুলিয়া ফুলিয়া প্রাণটা যে কণ্ঠের কাছ পর্য্যন্ত ঠেলিয়া আসিতেছিল। সে একবার বুক ফাটিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া হৃদয়ভার লঘু করিতে চাহিল, কান্না বাহির হইল না অশ্রুজল প্রবাহ দুই চোখের প্রান্তে আসিয়া আটকাইয়া গেল। মাতঙ্গিনী স্নেহ কোমল স্পর্শে তাহার কপালে চোখে জলসিক্ত ঠাণ্ডাহস্ত বুলাইয়া দিয়া কানের কাছে নত হইয়া ডাকিলেন "শিবানী, মা" শিবানী সজোরে একটা নিশ্বাস টানিয়া লইয়া ক্লান্ত ভাবে বলিয়া উঠিল "মাগো;—" সেই নিশ্বাসের সহিত তাহার বুকের উপরকার পাষাণখানাও যেন কতোকটা নড়িয়া উঠিল।

মাতঙ্গিনী খোকার ঝিনুকে করিয়া একটু জল লইয়া তাহার শুষ্ক ওষ্ঠে প্রদান করিলেন, সেই জলবিন্দু পান করিয়া সে আবার দীর্ঘ

নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া চোখ চাহিল, রাত্রি বাড়িয়া যাইতে লাগিল। চাঁদ ডুবিয়া চারিদিক অন্ধকার হইয়া আসিল, অদূরে নদীর চরে শৃগাল ও রাস্তায় কুকুরগুলা ডাকিয়া উঠিল, এবং অন্ধকার স্তব্ধরাত্রি কেবলমাত্র ঝিল্লির একঘেয়ে ঝিঁঝিরবে জাগ্রত হইয়া রহিল, ঘরের মধ্যে সিদ্ধেশ্বরীর নিদ্রাতুর ক্লান্ত কণ্ঠ মৃদু হইতে মৃদুতর হইতে হইতে, অল্পক্ষণ মাত্র থামিয়া গিয়াছে। শিবানী ডাকিল "মাসিমা"।

মাতঙ্গিনী একটা নিশ্বাস ফেলিয়া উত্তর করিলেন "কি মা"? "মাসিমা, আমি বিধবা? তিনি যা বলে গিয়েছিলেন সেই শাপই ফল্লো! এতো ব্যাকুল প্রার্থনা মদনমোহন কেমন করে অগ্রাহ্য করলে মাসিমা?—"

মাতঙ্গিনী কাঁদিয়া ফেলিলেন "কলিকাল যে মা"! তারপর তিনি ক্ষীণজ্যোৎস্নায় তাহার মুখের পানে চাহিয়া আশ্চর্য্য হইয়া চুপ করিলেন, সভয়ে ডাকিলেন "শিবু!"

ধীরভাবে শিবানী উত্তর দিল "কি মাসিমা?" মাতঙ্গিনী দেখিতে শুনিতে চালচলনে সকল দিকেই নিতান্ত সাধারণ প্রকৃতির লোক হইলেও তাঁহার নিরপত্য শূন্যবুকটার যে স্থানটা দিয়া তিনি এই ধীর স্বভাব ধ্যানপরায়ণা বালিকাকে অনুভব করিতেন সেইখান হইতেই তিনি তাহার এই অদ্ভুত ধৈর্য্যের মর্ম্মও বুঝিলেন। এতোটুকু আশা থাকিতে মানুষ এমন পাষাণে পরিণত হইয়া যাইতে পারে না। তাই একটু ভীত হইয়া তাহাকে বক্ষে টানিয়া লইয়া কাতর কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন "একবার প্রাণ খুলে কাঁদনা মা, নীরদ যে আমাদের জন্মের মতন ছেড়ে গেছেন তাঁর মুখখানা মনে করে একবার কাঁদনা মা"! গতরাত্রে ঝড়বৃষ্টি বজ্রপাতের মধ্যে বিদ্যুতের হাসি যেমন ভয়ঙ্কর দেখাইয়া ছিল, ঠিক তেমনি হাসি হাসিয়া সে প্রবলবেগে মাথা নাড়িয়া বলিল "আর কাঁদবো কেন মাসিমা? যতোদিন আমার মনে একবিন্দুও আশা ছিল কারুকে কি বলতে হয়েছে মানুষে যতো কাঁদতে পারে তা আমি কেঁদেছি, শুধু প্রার্থনা করেছি এই অভিশাপ যেন পূর্ণ না হয়। আর কেন? আর কারজন্য কাঁদবো মাসিমা? খোকা আমার মায়ের থাক; আমি আর কারুকে চাই না মাসিমা, আমার সব ফুরিয়েছে"। বলিতে বলিতে শিবানীর যে অশ্রু এতোক্ষণ পড়িতে পারে নাই সহসা তাহা বন্যার প্রবাহের মত শত ধারে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। মাতঙ্গিনী বুঝিলেন তাহার যন্ত্রণা এতোক্ষণে সীমার মধ্যে পৌঁছিয়াছে। তাহাকে বাধা না দিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। সেখানে আলোকের কিছুমাত্র রেখা পড়িলে দেখা যাইত তাঁহারও চক্ষু শুষ্ক ছিল না।

কিন্তু শিবানী জানিত না সে যখন মনে করিতে ছিল তাহার সব ফুরাইয়াছে ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই অলক্ষ্যে আবার তাহার জন্য নূতন চিন্তা নূতন কার্য্য সঞ্চয় হইতে ছিল। সে জানে না যে এখানে কিছুই ফুরাইবার নয়, কিছুই ফুরায় না।

(৮)

যেদিন শ্রাবণের অবিশ্রান্ত বর্ষণের মধ্যে ঘনঘটার ঘোর আবির্ভাবের ভিতরে একজন গৃহহারা শ্রান্ত পথিক আসিয়া তাঁহাদের রুদ্ধ দ্বারে আঘাত করিয়া ডাকিয়া বলিল "কে আছগো আমায় এরাত্রের মত আশ্রয় দাও"

সেদিন সিদ্ধেশ্বরী বাড়ি ছিলেন না। ঝুলন দেখিতে মাতঙ্গিনীর সঙ্গে মথুরায় গিয়াছিলেন। বালিকা শিবানী প্রতিবেশিনী কৈবর্ত্তর মেয়ে হারানের মার সহিত বাড়ির ভিতর একা। সে দেখিল পথিকের জামা কাপড় সমস্ত ভিজিয়া একেবারে স্থপ স্থপ করিতেছে। নিংড়াইলে জল পড়ে। সে তাঁহাকে মায়ের একখানা থান আনিয়া দিল এবং হারানের মা নীচের ঘরের তক্তোপোষে উপর হইতে কর্ত্রীর বিছানাটা আনিয়া পাতিয়া দিল, ঘরের গরুর দুধ আনিয়া খাওয়াইল, ক্লান্ত অতিথি সেরাত্রে নূতন আশ্রয়ে নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাইয়া পড়িলেন। পরদিন অনেক বেলা হইলেও অতিথি শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিল না। প্রতীক্ষা করিতে করিতে শেঠ মন্দিরের ঘড়িতে দশটা বাজিয়া গেল। শিবানী বলিল "হারানের মা দেখোদেখি মানুষটীর অন্যায়! মা যদি এখুনি এসে পড়েন তো বকুনি খেয়ে আমার প্রাণ যাবে। সকাল বেলা উঠেই ও কেন চলে গেল না?"

হারাণের মা, অতিথিকে বিদায় করিতে যাইতে উদ্যত হইলে সে হঠাৎ তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল "নানা একটু খানি দাঁড়াও হারাণের মা, লোককে কি অমনি যেতে বলতে আছে একবাটি দুধ আর দুখানা বাতাসা নিয়ে যাও, আহা দুটি ভাত দিতে পারিলেই বেশ হতো কিন্তু কি করি মা যদি এসে পড়েন কাজ নাই।"

হারাণের মা গিয়া দেখিল তাহাদের অতিথি বিছানায় উঠিয়া বসিয়া আছে। তাহার মুখ ভারি স্ফীত ও আরক্ত হইয়া উঠিয়াছে, সে যেন বিছানা ছাড়িয়া উঠিতে পারিতেছে না।

হারাণের মা তাহার নিকটে দুধের বাটিটা নামাইয়া দিয়া তাহার দিকে চাহিয়া বলিল "এই যে তুমি উঠেছো" তা দেখো বাপু মুখ হাত ধুয়ে দুধটুকু খেয়ে নাও, তারপর যদি ইচ্ছে করো তাহলে এখন তো আপনি এসতে পারো"।

অতিথি কম্পিত কণ্ঠে কহিল "অনেকক্ষণ হইতেই যাইবার চেষ্টা করিতেছি কিন্তু আজ আর আমার দাঁড়াইবার সাধ্য নাই, আমি যেন চোখে কিছুই দেখিতে পাইতেছি না, যদি আজও আমায় অনুগ্রহ করিয়া একটু স্থান দেন—"

হারাণের মা রাগিয়া বলিল, তুমি তো ভাল লোক বাপু! 'খেতে পেলে যে শুতে চাও' নানা সে-সব হবে টবে না, গিন্নি যদি এসে পড়ে তাহলে মেয়েটাকে আস্ত রাখবে না, নিজেও অপমানিত হবে, তার চেয়ে এই বেলা পথ দেখে নাও।" অতিথি মুহূর্ত্ত মধ্যে উঠিয়া দাঁড়াইল, কম্পিত অধরে কি একটা বলিতে গিয়া হঠাৎ মুখ ফিরাইয়া লইল। এমন সময়ে হঠাৎ দ্বার খুলিয়া দ্রুতপদে শিবানী সেই ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তিরস্কার পূর্ণ স্বরে হারাণের মাকে বলিয়া উঠিল "ছিছি হারাণের মা রুগ্নলোককে কি বিদায় করে দিতে আছে?" তারপর প্রস্থানোদ্যত অতিথিকে মিনতি পূর্ণ স্বরে কহিল "নানা আপনি যাবেন না ওর কথায় কিছু মনে করবেন না; বুড় মানুষ ওর মাথার ঠিক নাই"।

অতিথি চমৎকৃত হইয়া অনুরোধকারিণী বালিকার দিকে এক দৃষ্টে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিল, মৃদু কণ্ঠে কি যেন একটা কৃতজ্ঞতার কথা বলিতে গিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল।

দিনরাত্তের মধ্যে আর একেবারো চোখ চাহিল না।

শিবানার মা আসিয়া যখন তাঁহার পঞ্চমে বাঁধা কণ্ঠ সপ্তমে চড়াইয়া কন্যাকে যা খুসী বলিয়া তিরস্কার করিতে লাগিলেন, তখন শিবানীর সজলচক্ষু মুহুর্মুহু তাহার অচেতন অতিথির রোগযাতনা প্রকটিত মুখের উপর ফিরিতে লাগিল। আহা যদি সে শুনিতে পায়! যদি বুঝিতে পারে? তাহা হইলে এ অবস্থায় তাহার কতোখানি আঘাত লাগিবে! আহা মা কেন ওর অসহায় অবস্থার কথা একটু ভাবিয়া দেখিতেছেন না!”

কিন্তু তখন আর সেই জ্ঞানশূন্য বিকারের রোগীকে বিদায় করিবার উপায় নাই। অগত্যা সিদ্ধেশ্বরী রাগে গরগর করিতে করিতে বোসেদের নূতন জামাইকে ডাকিয়া আনিতে গেলেন—যদি হাসপাতালে পাঠাইবার কোন ব্যবস্থা করিতে পারেন। শরৎ লাহা মেডিকেল কলেজে ফোর্থ ইয়ারে পড়ে স্ত্রীর অসুখের সংবাদ পাইয়া এখানে আসিয়াছে। শরৎ বিশেষ যত্ন করিয়া রোগীর চিকিৎসা করিতে লাগিল। সে এখনও ব্যবসাদার হইয়া দাঁড়ায় নাই; শিক্ষার্থীর আগ্রহ ও মানব স্বভাব সূচক কোমলতা তাহার হৃদয়ে এখনো প্রবল। শিবানী আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া বিপন্ন রোগীর সেবা করিতে লাগিল। সিদ্ধেশ্বরী প্রথমে তাহাকে হাসপাতালে পাঠাইতে চাহিলেও শেষটা আর তাহা পাঠাইলেন না। রোগী জীবন মৃত্যুর মহাসমরে জয়ী হইয়া উঠিল। সিদ্ধেশ্বরী তাহাকে যে গৃহে স্থান দিলেন তাহার প্রধান কারণ, তিনি শরতের কাছে শুনিলেন, তাঁহাদের রোগী প্রলাপের মধ্যে বড় বড় ইংরেজি কোটেশন বলিতেছে, সে নিঃসন্দেহ বি এ এমে ক্লাশের ছাত্র। এবং সে যে অসামান্য ঘরের সন্তান তাহার প্রমাণ তাহার অঙ্গুলিস্থিত একটি অঙ্গুরী।

একদিন সন্ধ্যার অন্ধকারে দিবসের শেষ আলোটুকু শ্রান্ত হইয়া মিলাইয়া পড়িলে রোগী তাহার রোগশয্যা ছাড়িয়া বাহিরের অঙ্গনে শিবানী দত্ত পিঁড়ির উপর বসিয়াছিল। শুক্ল চতুর্দ্দশীর চাঁদ এরি মধ্যে দেখা দিয়াছেন, শুভ্র জ্যোৎস্নাজাল রোগীর রক্তহীন পাণ্ডুমুখকে পাণ্ডুরতর করিয়া দিয়াছিল। মৃদু বাতাসে নিমগাছের শাখা অল্প অল্প দুলিতেছে; সিদ্ধেশ্বরী পায়ের কাপড় একটু গুটাইয়া শুচিতা রক্ষা করিয়া মালা ফিরাইতে ফিরাইতে আসিয়া অনতিদূরে দাঁড়াইলেন; “আজ কেমন আছ গা?”

“ভাল আছি” বলিয়া অতিথি অন্যমনস্কভাব হইতে মন ফিরাইয়া লইয়া তাঁহার দিকে চাহিল। সিদ্ধেশ্বরী সাবধানে সেইখানে বসিলেন, একটু থামিয়া একটি ছোট রকম নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন “ভাল হয়েছ তাই ভাল বাছা। যে দায়ে ফেলেছিলে—ভয়ে আর বাঁচিনে! বলি কোথাথেকে আমার এ গোরো’ জুটলো! যদি কিছু ভালমন্দ হয় তাহলে আমি কার সাহায্য নিয়ে কি করবো! যাহোক গে টাকার ঘণ্ট করে, গতরের শ্রাদ্ধ করে এখন যে তোমায় বাঁচিয়ে তুলেছি তাই আমার ভাগ্যি। তা তোমার বাড়ি কোথা গা! একলা এমন করে পথে পথে ঘুরছিলে কেন? তোমার কে আছে?

অতিথি গভীর দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলেন “আমার বাবা আছেন। আমি পশ্চিম বেড়াতে

এসেছিলুম।" তা বলে কি এমন টো 'টো' করেই ফিরতে হয়! তোমরা কি জাত গা? তোমার নামটী কি?" "আমি ব্রাহ্মণ নাম নীরদকুমার চৌধুরী" "চৌধুরী! তোমরা রাঢ়ী না বারেন্দ্র?" বারেন্দ্র শুনিয়া আনন্দে সিদ্ধেশ্বরীর চোখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সাগ্রহে বলিলেন "তা বাছা তুমি কেন আমার বাড়ি থাক না! আমারোতো আর ঐ একটি মেয়ে বই আর কেউ নেই। আর তুমি তো শিবুকেও দেখছো সে কিছু আর অপছন্দ কর্ব্বার মতন মেয়ে নয়। দেখলে তো শুধু শুধু তোমার কি সেবাটাই না করলে! এমন লক্ষ্মী মেয়ে বাছা আর তুমি কোথাও পাবে না, তা আমি জাঁক করে 'বলতে পারি। বিদেশ বিভুঁই তিন পুরুষে আমরা দেশ ছাড়া; কে খোঁজে দেখে, তাই একটি ঘর জামাই চাইছি। নৈলে আমার মেয়ে এমন কিছু ফেল্‌না নয় যে যাকে তাকে ধরে দিই। সেদিন পেসন্ন দিদি দেশ থেকে এসেছিল সে বল্লে, চাঁদপাড়ার বাবুরা শিবুকে দেখে গিয়েছিল তাদের ভারি সাধ ওকে বউ করে, আমি বাবু তাতে রাজি হলাম না। বাপরে! আমার ঐ একটি মেয়ে, ওখানে হলেতো আমি তাকে আর দেখতে পাবো না, কাজনেই আমার অমন রাজ্যভোগে।" নীরদকুমার হাঁ না ভালমন্দ কিছুই বলিলেন না।

পরদিন সিদ্ধেশ্বরী ফুলশূন্য সাজি হাতে নামাবলি গায়ে মাথায় জড়াইয়া অমুচ্চ কণ্ঠে "জয় জয় গোপাল গোবিন্দ গদাধর, কৃষ্ণচন্দ্র করো কৃপা করুণা সাগর' ইত্যাদি শ্লোক আওড়াইতে আওড়াইতে বাড়ি ঢুকিয়া ডাকিলেন "শিবি সাজিটা নে আমি একবার বেগুন ফুলের ভাজের ব্যায়রাম হয়েছে তাকে দেখে আসি।" শিবানী রান্নাঘর হইতে বাহির হইবার পূর্ব্বেই রোয়াকের উপর হইতে নীরদকুমার নামিয়া আসিলেন, ধীরে ধীরে কাছে আসিয়া বিনীত ভাবে বলিলেন "মা আপনাদের অনেক কষ্ট দিয়াছি আর দিতে ইচ্ছে' করি না। আজ আমায় আপনারা বিদায় দিন।" নীরদ বাড়ী হইতে পলাইবার সময় পাথেয় সামান্যই যাহা আনিয়া ছিলেন প্রায় ফুরাইয়া আসিয়াছিল;—পকেটে কেবল দুখানি ২০ টাকার নোট ছিল—তাহারি একখানি এবং হাতের আংটিটা দিয়া বলিলেন,—"এই আংটিটা পূর্ব্বে বহুমূল্য ছিল, এখনও ইহার বোধ হয় কিছু মূল্য আছে। ডাক্তারের ভিজিট ও ওষুধপত্রের দামটা বিক্রি করিয়া চুকাইয়া দিবেন।" আংটিটি তাঁহার মাতার; অন্যকে দিতে কষ্ট হইতে লাগিল.—কিন্তু উপায়ান্তর ছিল না।

সিদ্ধেশ্বরী আংটিটার ঔজ্জ্বল্য দেখিয়া তাহার মূল্য সম্বন্ধে কোন প্রকার সন্দিহান হইলেন না। তিনি এই গৃহহীন যুবাকে পূর্ব্ব হইতেই কোন ছদ্মবেশী রাজপুত্র বলিয়া সন্দেহ করিতেছিলেন। এমন সস্তাদরে এমন জিনিষ খরিদ করিবার সুযোগ সহজে ছাড়িতে ইচ্ছা হয় না। মনটা চটিয়া উঠিল, মুখভার করিয়া বলিলেন "আমরা কি বাছা তোমার আংটির লোভেই এতোটা সেবা যত্ন করলাম? না হয় শ দুই টাকাই আমার গেল তাতে আমার ক্ষতি হবে না, হরিহে তোমারি ইচ্ছা! এ কলিকাল কিনা হাজার কর কেউ বোঝে না"! নীরদ ব্যস্ত হইয়া বলিলেন "সেকি আমার জন্য আপনারা কেন এতো খরচ

করবেন, আমি আপনাদের কে ?" "তাইতো বলছি বাছা আপনার কেন হওনা ? শিবুও তো তোমার অযুগ্যি নয়"। নীরদের পাণ্ডুমুখ হঠাৎ লাল হইয়া উঠিল, সে রাগ করিয়া কি বলিতে গেল কিন্তু বলা হইয়া উঠিল না। এই সময়ে শিবানী একটা মিক্সচারের শিশি ও একটা রেকাবে চারিটি ভিজাছোলা মুন ও আদার কুচি আনিয়া ধীরে ধীরে তাহার সম্মুখে দাঁড়াইল। ছোট একটা পাথর বাটিতে এক দাগ ঔষধ ঢালিয়া তাহার অচঞ্চল চোখের দুটি কালোতারা তাহার মুখে স্থাপিত করিয়া মৃদু স্বরে বলিল "এটা খেয়ে নিন"। নীরদকুমার একটু অপ্রতিভ হইয়া তাহার মুখের দিকে একবার চাহিলেন, সে মুখখানা সকল সময়েই একরকম, পাথরের মূর্ত্তির মতন, তাহাতে কোন সময়েই বড় একটা ভাবের রেখা পরিবর্ত্তিত হয় না। নীরদকুমারের ওষুধ খাওয়া হইলে পাত্র হস্তে সে আবার আস্তে আস্তে চলিয়া গেল। নীরদকুমার একটা ক্ষুদ্র নিশ্বাস ফেলিলেন। প্রকাশ্যে সিদ্ধেশ্বরীর দিকে ফিরিয়া কহিলেন, আমি ওবেলা আপনাকে ঠিক করে বলবো।

অপরাহ্নে নদীর ঘাটে সিদ্ধেশ্বরীর মকর, মিতিন ও বেগুনফুল জানিলেন অগ্রহায়ণ মাসেই শিবানীর বিবাহ।

রাজ্যের কথা।

নূতন পুলিস আইন। বহুদিন হইতেই আমরা গবর্মেণ্টকে আমাদের অভাব ও আকাঙ্ক্ষা জ্ঞাপন করিয়া আসিতেছি। দেশে এইরূপ নৈরাশ্যপ্রসূত অশান্তি স্থায়ী হইলে যে বিপৎপাতের সম্ভাবনা তাহা নির্দ্দেশ করিয়া দিতেও আমরা অবহেলা করি নাই। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ গবর্মেণ্ট সে কথায় কোন দিন কর্ণপাত করেন নাই। ফলে আমাদের দেশের দুই চারিটি অপরিণত বুদ্ধি যুবকের মধ্যে পাশ্চাত্য দেশের ন্যায় রাজপুরুষ হত্যা প্রবৃত্তি আসিয়াও দেখা দিল। ইহাতে শান্তির সহজ উপায় পরিত্যাগ করিয়া গবর্মেণ্ট একের দোষে সহস্রের প্রতি কঠোর নীতি অবলম্বন করিলেন। সস্নেহের স্থানে তাঁহারা সবলে প্রজাশাসন আরম্ভ করিলেন ফলে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা খর্ব্ব করা হইল, সম্পাদকগণকে কারাগারে প্রেরণ করা হইল, সাধারণের সভাগঠনের অধিকারের প্রতি হস্তক্ষেপ করা হইল, বালক ও যুবকগণ কর্তৃপক্ষের বিষদৃষ্টিতে পড়িয়া নিপীড়িত হইতে লাগিল, স্বদেশ সেবক সমিতিগুলির অস্তিত্বলোপ হইল এবং পরিশেষে এমন কি দেশের বৃদ্ধ রাজভক্ত নেতৃগণকে পর্য্যন্ত বিনা অভিযোগে ও বিনা বিচারে কারারুদ্ধ করা হইল! রাজপুরুষগণকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য পুলিস যে প্রজার প্রতি কিরূপ অত্যাচার করিয়াছে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। বগুড়া, নাটোর ও মেদিনীপুর মামলায় পুলিসের অত্যাচার কাহিনী প্রকাশ পাওয়ার পর আমরা আশা করিয়াছিলাম যে রাজপুরুষগণ অন্ততঃ তাঁহাদের নিজেদের সুনাম রক্ষার জন্যও এইবার বঙ্গে পুলিসসংস্কারে প্রবৃত্ত হইবেন। কিন্তু ফলে দেখিতেছি ঠিক তাহার বিপরীত ব্যবস্থারই আয়োজন হইতেছে। বেকার সাহেবের অনুমোদনে পুলিসের হস্তে যেরূপ অভূতপূর্ব্ব অসীম ক্ষমতা দানের ব্যবস্থা হইতেছে, তাহাতে এদেশে শীঘ্রই ব্রিটিশরাজের স্থানে পুলিসরাজ প্রবর্ত্তিত হইবে বলিয়া আশা করা যায়। এই নূতন পুলিস আইনের সর্ত্তগুলি সকলেই পাঠ করিয়াছেন সন্দেহ নাই।

ইহার বলে ভবিষ্যতে যে কোন পুলিস কর্ম্মচারী আমাদের সকল কর্ম্মেরই সর্ব্বময় প্রভু হইয়া দাঁড়াইবে। প্রকাশ্য স্থলে কোন উচ্চধ্বনি বা সঙ্গীত করিবার পর্য্যন্ত অধিকার হইতে আমরা বঞ্চিত হইব। শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা অর্থাৎ কল্পনা করিবামাত্র তাহারা আমাদের সকল কর্ম্মের উপর হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে। এতদিন পুলিস যে এরূপ পীড়ন করিতেন না তাহা বলিতেছি না, তবে এইবার তাঁহাদের পীড়নটাকে আইনসঙ্গত করা হইল, আমাদের প্রতিবাদ করিবার শক্তিটুকু পর্য্যন্ত রহিল না।

বেকার সাহেবের শাসন। বিলাতে সার কর্জ্জন উইলিকে হত্যা প্রসঙ্গে সেদিন বেকার সাহেব বলিয়াছেন যে এরূপ কর্ম্ম যাহাতে ভবিষ্যতে আর না হয়, তাহার জন্য সকলেরই এক্ষণে গবর্মেণ্টের সহিত যোগদান করা কর্ত্তব্য, নচেৎ গবর্মেণ্ট যখন শাসনক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইবেন তখন দেশবাসীর নিকট তাহা প্রীতিকর না হওয়াই সম্ভব, এবং শাসনকালে তাঁহাদের পক্ষে দোষী ও নির্দ্দোষীর মধ্যে সূক্ষ্ম ভেদবিচার রক্ষা করিয়া কার্য্য করা অসম্ভব হইয়া উঠিবে। বেকার সাহেবের ন্যায় সদ্বিবেচক শাসনকর্ত্তার নিকট এরূপ কথা শুনিয়া আমরা যথার্থই বিস্মিত হইয়াছি। পাঞ্জাবের এক যুবা বিলাতের একজন ইংরাজকে অজ্ঞাতকারণে হত্যা করিয়াছে বলিয়া বঙ্গবাসীর যে অপরাধ কোথায় তাহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে অক্ষম। আর এরূপ দুই একটি বিকৃতমস্তিষ্ক উন্মাদের দুষ্কর্ম্মের জন্য তাহার স্বদেশী সমাজ যে কি প্রকারে দায়ী হইতে পারে, তাহাও আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। যাহাই হউক বিদেশী রাজপুরুষের মুখে এরূপ কথা শুনা কষ্টকর হইলেও বিস্ময়জনক নহে। কিন্তু এই উপলক্ষে গোখেলের ন্যায় স্বদেশীর মুখে যখন শুনিতে পাই যে আমাদের পক্ষে স্বাধীনভাব প্রচার করা অন্যায় এবং দাসানুদাস হইয়া থাকাই আমাদের একমাত্র বাঞ্ছনীয় অবস্থা, তখন যে কেবল বিস্মিত হই তাহা নহে, আমাদের মর্ম্মপীড়া অসহ্য হইয়া উঠে।

ইঁহাদের প্রতিবাদে সেদিন কলিকাতার কলেজ উদ্যানে শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ যে কথাগুলি বলিয়াছেন তাহা সমগ্র দেশের শিক্ষিত ব্যক্তির মর্ম্মবাণী বলিলে অত্যুক্তি হয় না। তিনি বলিয়াছেন—

বঙ্গদেশে যে হত্যাপরাধগুলি সাধিত হইয়াছে তাহা যে বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিগত ব্যাপার তাহা বিচারালয়ে বার বার প্রমাণিত হইয়াছে। কেবল একটি মাত্র ক্ষেত্রে গুটিকয়েক ব্যক্তির মধ্যে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ চলিতেছে। এরূপ অবস্থায় বেকার সাহেব আমাদের নিকট কি প্রকার সহায়তা প্রাপ্তির প্রার্থনা করেন? এ সকল অপরাধীকে ধিক্কার দিয়া আমরা তাহাদিগের নিকট হইতে যথাসম্ভব দূরে থাকিলে তিনি সন্তুষ্ট হওয়া সম্ভব নহে। এরূপ স্থলে তাঁহার অভীপ্সিত সহায়তার নাম ও প্রকৃতি কি তাহা প্রকাশ করিয়া বলা আবশ্যক। আজ কাল অনেকস্থলেই আমাদের দিক হইতে গবর্মেণ্টকে সহায়তা করার কথা শুনিতে পাই। একপক্ষে আমাদের সমগ্র জাতি স্বায়ত্তশাসন লাভের জন্য দাবী করিতেছে, অপর পক্ষে দেশের বর্ত্তমান গবর্মেণ্টের কর্ম্মের সহিত আমাদের কোন সহযোগিতাই নাই এবং তাহার কর্ম্মচারীগণের উপরও আমাদের কোন প্রকার শাসনাধিকারই নাই। * * অতএব ছোটলাট সাহেব যে বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন, আমাদের ন্যায় অবস্থাপন্ন জাতির পক্ষে সেরূপ বিষয়েও সহায়তা করা যে কি প্রকারে সম্ভব তাহা আমরা ভাবিয়া উঠিতে পারি না। তৎসত্ত্বেও আমি একটি প্রস্তাব নিবেদন করিতে চাহি। * * পুনায় শ্রীযুক্ত গোখেলে সেদিন যে বক্তৃতা করিয়াছেন বঙ্গের শাসনকর্ত্তা তাহার উল্লেখ করিয়া যথেষ্ট সুখ্যাতি করিয়াছেন। এই বক্তৃতায় শ্রীযুক্ত গোখেলে বলিয়াছেন যে বিকৃতমস্তিষ্ক ভিন্ন ভারতে স্বাধীনতার আদর্শ অন্তরে পোষণ করা সম্ভব নহে। তাঁহার মতে বিনা রক্তপাতে স্বাধীনতা লাভ অসম্ভব এবং যে সকল ব্যক্তি সহনশীল প্রতিরোধের (Passive resistance) সমর্থন করেন, তাঁহারা কেবল ভীরুতা বশতঃ তাঁহাদের অন্তরের যথার্থ কথা প্রকাশ করিয়া বলিতে সঙ্কুচিত হন মাত্র। স্বাধীনতার আদর্শবাদীগণের প্রতি গবর্মেণ্ট যে কঠোর

ও নির্ম্মম নীতি অবলম্বন করিয়াছেন; গোখেলে তাহার সমর্থন করিয়া বলিয়াছেন যে গবর্মেণ্টের পক্ষে এরূপ পন্থা অবলম্বন ভিন্ন গত্যন্তর নাই। এ সম্বন্ধে একটি ইংরাজ সংবাদপত্র পর্য্যন্ত বলিতে বাধ্য হইয়াছেন যে এরূপ নীতি অবলম্বন করা বৃথা, কারণ কোন জাতির ভাব বা আদর্শকে শাসিত করা অসম্ভব। শান্তির পথে স্বায়ত্তশাসন লাভ করা সম্ভব নহে, শ্রীযুক্ত গোখেলের পক্ষে এরূপ নীতি প্রচার করা নিতান্ত বিপজ্জনক হইয়াছে সন্দেহ নাই। তিনি জানেন যে ভারতে সহস্র সহস্র ব্যক্তির অন্তরে এই স্বায়ত্তশাসনের আদর্শ বদ্ধমূল হইয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই সকল আবেগপূর্ণ অন্তরের নিকট তিনি বলিতেছেন যে রক্তপাত ভিন্ন স্বাধীনতালাভ সম্ভব নহে। যদি কোনও বক্তা কথনও বস্তুতঃ ভারতের পক্ষে বিপজ্জনক কথা প্রচার করিয়া থাকেন, তাহা হইলে শ্রীযুক্ত গোখেলে নিজেই তাহা করিয়াছেন। আমরা দেশবাসীর নিকট প্রচার করিয়াছি যে শান্তির পথ অবলম্বন করিয়া তোমরা যে কোন প্রকারের স্বাধীনতা লাভ করিতে সক্ষম। আমরা দেশের যুবকদিগকে সর্ব্বদাই বলিয়াছি—"নিজেদের শিল্পের উন্নতি কর, নিজেদের স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠা কর এবং নিজেদের কলহ নিজেরাই নিষ্পত্তি কর। তোমরা সর্ব্বদাই শুনিতে পাও যে তোমরা স্বায়ত্তশাসন লাভের উপযুক্ত নহ। অপরের উপর নির্ভর না করিয়া আত্মনির্ভর দ্বারা আত্মোন্নতি করিয়া দেখাও যে তোমরা স্বায়ত্তশাসন লাভে উপযুক্ত।" তাহার পর সহনশীল প্রতিরোধ (Passive resistance)। ইহার দুই অর্থ। এক যে, যতক্ষণ না গবর্মেণ্ট আমাদিগকে আমাদের ন্যায্য অধিকার দান করেন, ততক্ষণ কতকগুলি বিষয়ে আমরা গবর্মেণ্টের সহিত যোগদান করিব না। এবং অপর অর্থ এই যে যদি আমরা পীড়িত হই, যদি শাসনবজ্র আমাদের শিরে আসিয়া পতিত হয়, তাহা হইলে আমরা যে খড়্গহস্তে তাহার সম্মুখীন হইব তাহা নহে, আমরা আইন সঙ্গত উপায়ে তাহা সহ্য করিব ও ভোগ করিব। আমরা আমাদের যুবকগণকে এমন কথা বলি নাই যে তোমরা রাজপক্ষের নিকট হইতে কঠোর ব্যবহার পাইলেই তাহার প্রতিশোধ লইবে,—আমরা তাহাদিগকে নীরবে সহ্য করিবার উপদেশই দান করিয়াছি। অনেকে বলেন যে এই শিক্ষা দ্বারাই আমরা তাহাদিগকে আইনের অসম্মান করিতে ও রাজশক্তির বিদ্রোহী হইতে উৎসাহিত করিতেছি। যথার্থপক্ষে আমরা তাহার ঠিক বিপরীত কর্ম্মই করিয়া আসিতেছি। সহনশীল প্রতিরোধ (Passive resistance) প্রচার করিয়া আমরা দেশবাসীকে আইনসঙ্গত শান্ত উপায়ে তাহাদিগের অভিপ্সীত ন্যায্য আকাঙ্ক্ষা পূরণ করিবার পথ প্রদর্শন করিতেছি মাত্র। দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করিবার জন্য আমরা গবর্মেণ্টের সহিত কেবল এই উপায়েই সহযোগিতা করিতে সক্ষম। তাহার পরিবর্ত্তে আমরা ছোটলাট সাহেব ও গবর্মেণ্টের নিকট এই সহায়তা প্রাপ্তির আশা করি যে তাঁহারা এদেশবাসীর স্বাভাবিক অধিকারগুলির প্রতি সম্মানপ্রদর্শন করিয়া চলিবেন, অর্থাৎ তাঁহারা দেশবাসীর সাধারণ সভা আহ্বানের ক্ষমতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও সমবেত কর্ম্মের অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিবেন। যদি তাঁহারা এই সকল কর্ম্মে প্রজার সহায়তা করেন, তাহা হইলে আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি যে দেশে শান্তিভঙ্গ হইবার সম্ভাবনা আর থাকিবে না, এবং বর্ত্তমানের বিপদ সকল চিরদিনের জন্য লুপ্ত হইয়া যাইবে।

* * আজকাল আমাদিগকে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে যে রাজপুরুষগণ দৈবশক্তিসম্পন্ন ও অভ্রান্ত এবং প্রজাগণ জড়ভাবে তাঁহাদের সকল নীতির সমর্থনে বাধ্য। এরূপ নীতি আধুনিক কোন জাতিই স্বীকার করিতে অক্ষম। আধুনিক কোন জাতিই তাহার ন্যায্য ও স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিতে সম্মত হওয়া সম্ভব নহে। যেদিন বিদেশী গবর্মেণ্ট স্বদেশী হইবে, অর্থাৎ গবর্মেণ্ট এরূপ নীতি অবলম্বন করিবেন যে তাহা দ্বারা কালে দেশের গবর্মেণ্ট দেশবাসীর গবর্মেণ্টে পরিণত হইবে, সেই দিন হইতে আমাদিগের পক্ষ হইতে গবর্মেণ্টকে সহযোগিতা দান করা সম্ভব। ইহার অভাবে সহ-

যোগিতা অর্থে উপহাস বা আকাশকুসুম ভিন্ন আর কিছুই বুঝায় না। বর্ত্তমান সহযোগিতা অর্থে এক পক্ষ কর্ম্ম করিবে ও অপর পক্ষ কেবল 'হাঁ' বলিবে। এরূপ সহযোগিতা প্রদর্শন করিতে আমরা অক্ষম।

৭ই আগষ্ট। কেন এ বিড়ম্বনা। গোখলে ত মন্দ কথা বলেন নাই। আমাদের রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা সমস্ত বিসর্জ্জন দেওয়াই শ্রেয়। অন্য দেশে রাজাই প্রজার স্বাধীনভাব—স্বাধীন চিন্তা স্ফূর্ত্তির সহায়ক। আমাদের দুর্ভাগ্য এমনি যে—আমরা যদি লাঠি লইয়া উচ্চরবে একটা শৃগাল কুকুর তাড়না করি তাহাও সিডিসন্—আর পাঁচজনে মিলিয়া কোন নির্দ্দোষ আলোচনা করি তাহাও সিডিসন।

৭ই আগষ্ট গভর্ণমেণ্ট হুকুম জারি করিলেন—যেন ছেলেরা মিটিংএ না যায়,—যেন তাহা হইলেই ব্রিটিশ রাজ্য রসাতলে যাইবে—হায় হায়! এ অবস্থায় সভাপতি মহাশয়ের অপরাহ্ন ছয়টা পর্য্যন্ত অর্থাৎ সন্ধ্যারম্ভ পর্য্যন্ত বক্তৃতা না করিলেই বা চলে কই! নহিলে অরবিন্দ বাবু বক্তৃতামঞ্চে উঠিলে যে রক্ষা থাকিবে না! তিনি যত নির্দ্দোষ কথাই বলুন না কেন —তাহা দোষের কথা দাঁড়াইবে! এত সাবধানতা সত্বেও ষ্টেট্‌স্‌ম্যান বলিতে ছাড়ে নাই—"সর্ব্বনাশ উপস্থিত—ছেলেরা মিটিংএ উপস্থিত ছিল।" সর্ব্বৈব মিথ্যা হইলেও—এ কথা ধ্রুব সত্য। হয়ত ইহার ফলে কাহারো ডিপোর্টেসন হয় বা!

এমন মিটিংএ কাজ কি তবে! আমি বলি—এস আমরা সকলে কথাবার্ত্তা,—মিলন মিটিং ছাড়িয়া ঘরে বসিয়া নীরবে ধ্যান করি।—ইহাতে জড় হইয়া পড়ি—ভাল—বিনায়াসে নির্ব্বাণ মুক্তি;—আঘাতের দুঃখ কষ্ট সকলি চলিয়া যাইবে। আর ধ্যানে যদি বুদ্ধিবৃত্তি পরিষ্কার হয়—কার্য্য প্রবৃত্তি যদি নীরবে বাড়িয়া ওঠে,—তবে এইরূপেই আমাদের মনুষ্যত্ব জাগরূক হইয়া উঠুক—বুঝিব ইহাই বিধাতার মঙ্গল আশীর্ব্বাদ!!!

চয়ন।

বুদ্ধদেবের ভস্মাবশেষ। প্রত্নতত্ত্ববিভাগ সম্প্রতি একটি আশ্চর্য্য আবিষ্ক্রিয়া করিয়াছেন। পেশোয়ারের নিকট একটি পুরাতন বৌদ্ধস্তূপ বাহির হইয়াছে, তন্মধ্যে একটি প্রস্তর পাত্রের ভিতরে বুদ্ধদেবের চিতাভস্ম রক্ষিত রহিয়াছে। প্রায় দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যীশুখৃষ্টের জীবন সময়ে পেশোয়ারের নিকটবর্ত্তী স্থানে কণিষ্ক নামে এক বৌদ্ধ রাজা ছিলেন। প্রস্তরপাত্রটির উপর কণিষ্কের শীলমোহরের চিহ্ন আজিও সুস্পষ্ট। বুদ্ধদেব ও কণিষ্কের মূর্ত্তিখোদিত তাম্র ও টিন মিশ্রিত ধাতুর (Bronze) একটি কৌটার মধ্যে উক্ত পাত্রটি সুরক্ষিত। চীনপরিব্রাজক হুয়েন স্তাঙ ঠিক এই স্থানটিতেই বুদ্ধদেবের ভস্ম রক্ষার বিষয় উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

কৌতূহলোদ্দীপক। যীশুখৃষ্টের মৃত্যুর পরেই যে সকল চীন পরিব্রাজক ভারতভ্রমণে আগমন করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই এই বিরাট বৌদ্ধমন্দির ও মঠের বিষয় উল্লেখ করিয়াছিলেন। কিন্তু গজনীর মামুদের ভারত আক্রমণের কাল হইতে আজ পর্য্যন্ত তাহার আর কোনও সন্ধান পাওয়া যায় নাই। হুয়েন স্তাঙ এই বৌদ্ধমন্দির ও মঠকে তৎকালীন বৌদ্ধ ভারতে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও আশ্চর্য্য ব্যাপার বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছিলেন সম্রাট কণিষ্কের বৌদ্ধ সাম্রাজ্যের রাজধানী পুরুষপুরের পূর্ব্বদিকে এই বিরাট মন্দির ও মঠ অবস্থিত, এবং এই মঠেই বুদ্ধদেবের ভস্মাবশেষ রক্ষিত হইয়াছিল। প্রায় পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে ফাউচার (fowcher) নামে একজন ফরাসী বৈজ্ঞানিক সীমান্ত প্রদেশে ভ্রমণকালে

মাঠের মধ্যে দুইটি অদ্ভুত মৃত্তিকাস্তূপ লক্ষ্য করেন। খনন করিবার উপযুক্ত যন্ত্রাদির অভাববশতঃ ফাউচার সাহেব আর তাহার বিশেষ অনুসন্ধান করিতে পারেন নাই। কিন্তু প্রত্নতত্ত্ববিভাগের অধ্যক্ষ মার্শাল (marshall) সাহেবের যত্ন ও চেষ্টার ফলে এতদিনে সেই লুপ্ত মন্দির ও মঠ আবিষ্কৃত হইয়াছে।

দুইটি স্তূপের মধ্যে বড়টিই প্রথম খনন করা হয়। কিন্তু তাহার অভ্যন্তরে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ইষ্টকস্তম্ভের ভগ্নাবশেষ ভিন্ন আর কিছুই পাওয়া যায় নাই। এককালে সেই স্থানে এক বিরাট অট্টালিকা ছিল সন্দেহ নাই। ছোট স্তূপটি খনন করিয়া দেখা গেল যে তাহার অভ্যন্তরে একটি বৌদ্ধমন্দিরের ভগ্নাবশেষ প্রোথিত রহিয়াছে। মন্দিরটি প্রস্থে ১৯০ হাতের কম নহে। তাহার স্তম্ভগুলি এত উচ্চ যে দেখিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। আরও নিম্নে খনন করায় শত শত প্রকাণ্ড মৃৎপাত্র বাহির হইল। সেগুলি সব নীল বর্ণে কলাই করা এবং তাহাদের গাত্রে পুরাতন বৌদ্ধকালের প্রচলিত ভাষায় এক একটি অক্ষর খোদিত। আরও নিম্নে খনন করায় একটি বিরাট চতুষ্কোণ প্রস্তর চত্বর বাহির হইল। তাহার নিম্নে একটি প্রস্তরনির্ম্মিত সমাধিগৃহ। গৃহের ছাদটি ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে কিন্তু তাহার এক কোণে দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে রক্ষিত সেই ভস্মাধারটি ঠিক সেইভাবেই প্রস্তরস্তূপের মধ্যে বিরাজিত।

প্রথম একটি মরিচা পড়া সবুজ রঙের ধাতুনির্ম্মিত ভাঙ্গা কৌটা বাহির হইল। পরে সেটিকে পরিষ্কার করিয়া দেখা গেল তাহার গাত্রে নানারূপ মূর্ত্তি খোদিত রহিয়াছে। তাহার উপরিভাগে যোগাসীন বুদ্ধ মূর্ত্তি এবং তাঁহার দুই পার্শ্বে ভগ্নাবস্থায় পূজারত দুইটি বোধিসত্ব মূর্ত্তি রহিয়াছে। বোধ হয় ইহারা ব্রহ্মা ও ইন্দ্র হইবেন। পূর্ণ প্রস্ফুটিত একটি খোদিত পদ্মের মধ্যস্থলে এই তিন মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। ইহা ভিন্ন তাহার ভিতরেও অনেক মূর্ত্তি ও কথা খোদিত রহিয়াছে। এই কৌটাটি গ্রীক শিল্পীর দ্বারা নির্ম্মিত বলিয়াই

আজিসালায়োস্ (Agisalaos) মহাসেনার সুগারমে (Sugarama) কণিষ্ক রাজার বিহারের অর্থাৎ বৌদ্ধমন্দিরের প্রধান এঞ্জিনিয়ার।

এই কৌটাটির মধ্যে স্বচ্ছ মর্ম্মর নির্ম্মিত একটি ক্ষুদ্র কৌটা তাহার উপরিভাগে একটি ছিদ্র। ছিদ্রের মুখটি মৃত্তিকা দ্বারা বন্ধ এবং তাহার উপর একটি হস্তি মূর্ত্তি মুদ্রিত। বোধহয় হস্তীই কণিষ্কের রাজচিহ্ন ছিল। মর্ম্মর পাত্রটির মধ্যেই কণিষ্কের এত সযত্ন রক্ষিত ধনটি নিহিত রহিয়াছে। ইহার অভ্যন্তরে বুদ্ধদেবের চারিখানি দগ্ধ অস্থিখণ্ড পাওয়া গিয়াছে।

গভর্ণমেণ্ট এই ভস্ম ও চারিখানি অস্থিখণ্ড—সিলন্ বর্ম্মা, জাপান ও চীন এই চারিটি বৌদ্ধরাজ্যকে উপহার দিবেন—এইরূপ মানস প্রকাশ করিয়াছেন।

কিন্তু—ডাক্তার সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণের নিকট কলম্বোর প্রধান বৌদ্ধ পুরোহিত এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে, দেশবিদেশে বিতরণের পরিবর্ত্তে সারনাথ বা বুদ্ধগয়ায় একটি স্মৃতিমন্দির স্থাপনা করিয়া তন্মধ্যে এই ভস্মাবশেষ রক্ষিত করাই বিধেয়।

তুর্কে রমণী জীবন!—জনসাধারণের ধারণা যে তুর্ক রমণীগণের জীবন বড়ই দুঃখময়; তাঁহারা অত্যাচার পীড়িত, পদদলিত, সাধারণতঃ নারীজাতি প্রায় সকল দেশেই যে সুখ স্বচ্ছন্দতা সম্ভোগ করেন, তাঁহাদের ভাগ্যে তাহাও দুর্লভ। প্রকৃত পক্ষে এ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। হারেম (অন্তঃপুর) বিষাদের আগার হওয়া দূরের কথা, সেই অংশ টুকুই তুর্ক গৃহের শোভা, তাহা সুসজ্জিত আরামের স্থান। আরব ভাষায় হারেম শব্দের অর্থ পবিত্র স্থান, ধর্ম্মমন্দির, আশ্রম প্রভৃতিও এই নামে অভিহিত হয়। জননী-দেবী এবং গৃহলক্ষ্মীদিগের বাসস্থান, অন্তঃপুর ভবনকে "পুণ্য-স্থান," ধর্ম্মাশ্রয় বলাই যে তাহার যথার্থ নামকরণ সে বিষয় কোন হিন্দুর মনে দ্বিধা থাকিতে পারে না, এবং এই নাম হইতেই বোঝা যায়, তুর্কগণ তাঁহাদের নারীগণকে কি পরিমাণে শ্রদ্ধা করেন। তুর্ক অন্তঃ-পুরের জীবন অনেকাংশে আমাদের হিন্দুস্থানেরি মত,

তুর্ক রমণীগণ আমাদের দেশের মতই সন্তানের প্রতি স্নেহশালিনী এবং বিশেষ করিয়া পুত্র সন্তানের প্রতি অধিক মমতাময়ী। পুত্রগণও বয়োপ্রাপ্ত হইয়া মাতার এই স্নেহঋণ বিস্মৃত হয়েন না, এবং সর্ব্ববিষয়ে অনুগত ভৃত্যের ন্যায় তাঁহার আজ্ঞাকারী হইয়া থাকেন। মহম্মদের একটি প্রবচন আছে; স্বর্গরাজ্য মাতার পদতলে স্থাপিত, তুর্কগণ এই মহৎ বাক্য সর্ব্বদা মনে রাখেন। সামাজিক নিয়ম বশতঃ তাঁহারা পরিবারের বাহিরে কোন স্ত্রীলোকের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিতে পারেন না, তাই তাঁহাদের পারিবারিক বন্ধন সুদৃঢ়, ভ্রাতা ভগিনী, মাতাপুত্রের মধ্যে গভীর বন্ধুতা দেখিতে পাওয়া যায়। স্ত্রীলোক দিগেরও বাহির সংসারের সহিত কোনও সম্বন্ধ না থাকায় গৃহ খানিকে সর্ব্ব সুখের আকর করাই তাঁহাদের জীবনের একমাত্র ব্রত হইয়া উঠে। মুসলমান ধর্ম্মের অনুশাসন অনুসারে বৃদ্ধ পিতামাতাকে, বিশেষ করিয়া, মাতা, মাতামহী এবং পিতামহীকে ভরণপোষণের ভার প্রত্যেক পুত্রকেই গ্রহণ করিতে হয়। নিতান্ত নিকট আত্মীয়দিগের মধ্যেও ভদ্রতার নিয়ম সকল অতি যত্নের সহিত রক্ষিত হয়—বয়োকনিষ্ঠগণ সর্ব্ববিষয়েই বয়োজ্যেষ্ঠদিগের নিকট বিনীত নম্রতার সহিত ব্যবহার করেন—আসন, পান, ভোজনে তাঁহাদিগকে প্রথম সম্মানিত করা হয়—বাড়ীর ছোট ছেলেটি যতই কেন আদরের হন না, বড় ভাই কিম্বা ভগিনীর বিশেষ আজ্ঞাবহ হইয়া থাকিতে হয় এবং তাহারা সর্ব্ববিষয়ে তাহাদের সম্মান রক্ষা করিতে বাধ্য। তুর্ক সম্বন্ধে যে সমুদায় পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিয়া স্বতই ধারণা হয় যে সেখানকার রমণীগণ অতি আলস্যপ্রিয় এবং দিবসের অধিকাংশই তাঁহাদের আয়ত, উজ্জ্বল, কৃষ্ণ-তার চক্ষু কজ্জল লেখায় শোভিত করিতে এবং বেশবিন্যাসে কাটিয়া যায়। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। তুর্করমণীগণ সুগৃহিণী, তাঁহারা অতি সুন্দর সূচীকার্য্য করিতে পারেন। গৃহসজ্জা, আপন আপন পরিধেয় বস্ত্রাদি নিজের হাতে অতি সূক্ষ্ম সূচিকার্য্যে শোভিত করেন। শিশুকাল হইতে তাঁহারা এই কারুকার্য্য শিক্ষা করেন এবং বিবাহ হইলে স্বকৃত চারুশিল্পে আপন আপন গৃহশোভিত করেন। উত্তমরূপে সূচিশিল্প করিতে পারা সৎপাত্রীর একটি বিশেষ লক্ষণ। আমাদের দেশের গৃহলক্ষ্মীদের মতই ওস্‌মানি গৃহিণীগণ অতি প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ করেন, এক পেয়ালা কফি এবং একটি সিগারেটের ধূমপান করিয়া স্বামীর সুখস্বচ্ছন্দের ব্যবস্থা করেন, বিছানার কাছে তাঁহার চটিজুতা এবং প্রাতে পরিধেয় জামাটি সাজাইয়া রাখেন। গৃহস্বামী শয্যাত্যাগের পর মুখ হাত ধুইয়া দিনের প্রথম নমাজ সমাধা করিলে কফি প্রস্তুত করিয়া তাঁহার হাতে দেন—তিনি যদি আধুনিক সিগারেটের পরিবর্ত্তে সেকালের ধরণের লম্বা পাইপ খাইতে ইচ্ছা করেন তাহা হইলে তাহাও স্বহস্তে সাজিয়া দেন—এবং তাঁহার পায়ের কাছে একখানি আসনে বসিয়া থাকেন, তখন দাসীরা আসিয়া বিছানা ইত্যাদি উঠাইয়া ফেলে। শয্যাত্যাগ করিয়া রাত্রিবাস পরিবর্ত্তন করিবার পূর্ব্বেই ছেলেমেয়েরা পিতামাতার কাছে আসে। তাঁহাদিগকে সেলাম করিয়া তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ ও আদরলাভ তাহাদের প্রথম দৈনিক কর্ত্তব্য। ঘরে তাহাদের জন্য সকালের কোন খাবার প্রস্তুত রাখিবার নিয়ম নাই—তাহারা তাই পয়সার আবদার ধরে, পয়সা পাইলেই দাসীদের সঙ্গে যাইয়া দোকান হইতে ইচ্ছামত কিছু কিনিয়া খায়। তাহার পর সাত আট বৎসরের ছেলে মেয়েদের মুখহাত ধোয়াইয়া পরিষ্কার পোষক পরাইয়া একজন পরিচারক সঙ্গে বেড়াইতে পাঠান হয়। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা বাড়ীতেই খেলিয়া বেড়ায়। এইত গেল সকাল বেলার কাজ। এইটি হইয়া গেলে, গৃহস্বামী বাহিরে যাইবার পরিচ্ছদ পরিয়া কাজে চলিয়া যান, তখন গৃহিণী আপন দৈনিক কাজ আরম্ভ করেন। প্রথমে কাফ্রি পাচিকাকে সঙ্গে করিয়া সরকার যে বাজার আনাইয়া বাড়ীর ভিতর পাঠাইয়া দেয়, তাহা দেখিয়া হিসাব বুঝিয়া দাম মিটাইয়া দেন। এই সময় ছোটখাট একটি অভিনয় হইয়া যায়—গৃহিণী পর্দ্দার ভিতর হইতে জিনিশ ভাল নয়, দাম বেশী, চাকর সব অবিশ্বাসী ইত্যাদি বলেন; সরকার বাহির হইতে আল্লার শপথ করে, আর তাহার মত নিমক-সহি গোলাম নাই ইত্যাদি প্রতিপন্ন

করিবার চেষ্টা করে। উভয় পক্ষেরি কণ্ঠস্বর তীব্র, উচ্চ, অজস্র বাক্যস্রোত,—কিছুক্ষণ এমনি চলিয়া হিসাব মিটে। এটুকু না হইলে কাজ বেশ চলিয়া যাইতে পারে কিন্তু গৃহিণীদের চলে না। যদি সেদিন কোন বিশেষ ব্যঞ্জন কিম্বা মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিতে হয় তাহা হইলে হানুম অর্থাৎ গৃহিণী এবং তাঁহার কন্যা ও বধূগণ রন্ধনশালায় উপস্থিত থাকিয়া নিজহাতে সাহায্য এবং তত্বাবধান করেন। রাজধানী এবং প্রধান নগর গুলিতে নারীগণ আর পূর্ব্বের মত গৃহকার্য্যে যোগ দেন না; আজকাল তাঁহারা বিদেশী ভাষা, কারুকার্য্য সঙ্গীতাদি শিক্ষায় অধিক যত্ন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

তুর্করমণীগণ ইচ্ছামত সর্ব্বত্র ও সর্ব্বসময়ে যাইতে পারেন তবে গৃহস্বামীকে একবার জানাইতে হয়—তিনি নিতান্ত বদ্‌মেজাজী কিম্বা সান্দিগ্ধ স্বভাবের না হইলে এ বিষয়ে কোনরূপ বাধা হয় না। গাড়ীতে কিম্বা হাঁটিয়া বেড়াইতে যাইবার প্রস্তাব হইলেই বাড়ীর ছেলে মেয়েরা এমন কি দাসীরা পর্য্যন্ত গৃহিণীর সঙ্গে যাইবার জন্য নাচিয়া উঠে, অনেকক্ষণ ধরিয়া বাকবিতণ্ডা, অশ্রুপাত সাধ্যসাধনা চলে, যাহারা যাইতে পায় তাহাদের তো কথাই নাই যাহারা পড়িয়া থাকে তাহাদের পয়সা খেলনা মিষ্টান্ন ইত্যাদি দিয়া শান্ত করিয়া গৃহিণী সাজসজ্জা করেন। তুর্করমণী চক্ষে, ভ্রূযুগলে শূর্ম্মা, কপোলে এবং ওষ্ঠে রং দিয়া থাকেন, বেশবিন্যাস করিয়া একখানি সূক্ষ্ম ওড়না দিয়া মুখ ও সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া বাহিরে যান। যেখানে যে উদ্দেশ্যেই বাহিরে যাওয়া হউক সন্ধ্যার পূর্ব্বেই বাড়ী ফিরিয়া আসিতে বিশেষ চেষ্টা করেন। কেননা, সেই সময়ে বাড়ীর পুরুষেরা কর্ম্মস্থান হইতে ফিরিয়া আসেন।

দুপর বেলা অনেক সময় বাড়ীর গৃহিণী আত্মীয়া এবং স্ত্রীবন্ধুদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া মধ্যাহ্ন ভোজ দিয়া থাকেন। মহিলাগণ নীচু নরম চৌকোণা বালিশের উপর জোড়াসন হইয়া একখানি অনতিউচ্চ গোল টেবিলের চারিদিকে ঘিরিয়া বসেন, চাটনি, কচি শসা-কাটা, জলপাই, খরমুজার গোল গোল টুকরা, বিলাতি মূলা—ছোট কাচের রেকাবী করিয়া টেবিলের উপর সাজান থাকে এবং প্রত্যেক অতিথির সম্মুখে একখানি করিয়া মাঝারি আকারের কাচের থালা ও একখানি চামচ দেওয়া হয়। পদমর্য্যাদা অনুসারে একজন পরিচারিকা প্রথমে অতিথির সম্মুখে হাত ধুইবার পাত্র ধরে, একজন হাতে সুবাসিত জল ঢালিয়া দেয়, অন্য একজন হাত মুছিবার জন্য অতি সূক্ষ্ম কারুকার্য্যে সুন্দর এক একখানি রুমাল দিয়া যায়। তাহার পর গৃহস্বামিনী সর্ব্বাপেক্ষা মাননীয়া অতিথিকে প্রথম গ্রাস মুখে তুলিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করেন, তখন ভোজ আরম্ভ হয়। অতিথি রমণীগণ গৃহস্বামিনীর অপেক্ষা পদমর্য্যাদায় হীন হইলে তিনিই আহার আরম্ভ করেন। মেদিরঞ্জিত প্রথম তিনটি অঙ্গুলির অগ্রভাগ দিয়া অতি সৌখীন ভাবে মুখে আহার্য্য তুলিয়া দেন। তুর্কদিগের প্রধান জাতীয় খাদ্য পোলাও, খাইবার সময় কখন কখন শুধু জল কখনো বা ফলের সরবৎ পান করেন—বরফে শীতল কোনরূপ সুস্বাদু সিদ্ধ ফল খাইয়া ভোজন সমাধা করেন। তখন আবার মুখ হাত ধুইবার জল দেওয়া হয়, আহারান্তে তাঁহারা দেওয়ানখানায় যাইয়া ফরাসে এবং কৌচে আরাম করিয়া বসেন, এখানেও পদ-গৌরব রক্ষা করিয়া আসন গ্রহণ করিতে হয়। তখন একজন প্রধান পরিচারিকা উজ্জল গোলাপী রেশমী রুমাল দিয়া ঢাকা একখানি থালার উপর করিয়া ছোট ছোট চীন পেয়ালায় কফি লইয়া আসে, আগে হইতে অতিথিদিগের পদমর্য্যাদা জানিয়া লয় এবং সেই অনুসারে তাঁহাদের হাতে পেয়ালা উঠাইয়া দেয়—সর্ব্বশেষ সিগারেট আনিয়া দিয়া দাসীরা ঘরের এক কোণে দেওয়ালের পাশে বুকের উপর হাত রাখিয়া নতচক্ষে নম্রভাবে, গৃহকর্ত্রীর আজ্ঞা প্রতীক্ষা করিয়া সারি বাঁধিয়া দাঁড়াইয়া থাকে।

তুর্কনারীগণ কখনই প্রায় অধিক বয়স অবধি অবিবাহিত থাকেন না—সকলেরই অদৃষ্টে বর লাভ হয়। যিনি সুন্দরী তাঁহার জন্য তো ভাবিতেই হয় না কিন্তু বিধাতা যাহাকে রূপ দেন নাই, সম্ভ্রান্ত বংশে জন্ম হইলে তাঁহারও বর খুঁজিবার জন্য কষ্ট

করিতে হয় না। ভবিষ্যতে সাংসারিক উন্নতির আশায় অনেকেই এরূপ কন্যা বিবাহ করিবার জন্য উৎসুক হন।

অধুনা সেকালের কঠিন সামাজিক নিয়ম সকল অনেক পরিমাণে শিথিল হইয়া গিয়াছে—গৃহের মধ্যে এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বর্ত্তমান যুগের রমণীর আবির্ভাব হইয়াছে এবং চারিদিকের অবস্থা দেখিয়া মনে হইতেছে ইংলণ্ডের মত তুর্কস্থানেও অল্প দিনের মধ্যেই রমণীগণ পুরুষদিগের সহিত সমান অধিকার লাভের জন্য বিপ্লব উপস্থিত করিবেন। আধুনিক রাজনৈতিক পরিবর্ত্তনসকলই নারীগণের এমন দ্রুত স্বাধীনতা লাভ প্রয়াসের প্রধান কারণ। সুলতান যেদিন প্রথম তুর্কপার্লামেণ্ট খুলিতে যান, সেদিন পথে অসংখ্য অবগুণ্ঠিতা রমণী তাঁহার সেই শুভযাত্রা দেখিবার জন্য সমবেত হইয়াছিলেন। যাঁহারা গৃহ বাতায়ন হইতে এই যাত্রা দেখিতেছিলেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই শুধু যে বাতায়নের সম্মুখের পর্দ্দা সরাইয়া ফেলিয়াছিলেন এমন নহে মুখের ঘোমটাও খুলিয়া ফেলিয়াছিলেন।

চিত্র-ব্যাখ্যা।

শ্রীচৈতন্য। শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু কর্ত্তৃক অঙ্কিত। পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের গরুড়স্তম্ভের তলে বসিয়া চৈতন্য জগন্নাথ দর্শন করিতেছেন, ইহাই চিত্রের বিষয়। চৈতন্যের ভাব-গদগদ শিথিল অঙ্গ, ভগবৎপ্রেমে তন্ময়তা, আলুথালু অথচ শান্তভাব শিল্পী অতি পারদর্শিতার সহিত অঙ্কিত করিয়াছেন; মুখখানি দেখিলে মনে হয় চৈতন্য বাহ্যজ্ঞান শূন্য—জগতের কোনো-কিছু তাঁহার চিত্তকে অধিকার করিতে পারিতেছে না, জগৎস্বামীর ধ্যানে তিনি বিভোর হইয়া উঠিয়াছেন; চোখদুটির প্রান্তে যেন তাঁহার সমস্ত প্রাণটা আসিয়া ঠেকিয়াছে, সেই প্রাণ দিয়া তিনি আরাধ্য দেবতাকে একাগ্রভাবে দেখিতেছেন। শিল্পী এই ভাবটি চোখে অতি সুকৌশলে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। মুখখানিও একটি স্বর্গীয় শ্রীতে ভরিয়া উঠিয়াছে।

শঙ্করাচার্য্যের দর্পচূর্ণ। শ্রীযুক্ত ভেঙ্কটাপ্পা কর্ত্তৃক অঙ্কিত চিত্র হইতে। চিত্রকর একজন মাদ্রাজী যুবক, ইনি এখন কলিকাতা গভর্ণমেণ্ট আর্ট স্কুলে ভারতীয় পদ্ধতি অনুসারে চিত্রাঙ্কন শিক্ষা করিতেছেন; ইহাই তাঁহার প্রথম চিত্র।

শঙ্করাচার্য্য সম্বন্ধে একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে। একসময় তাঁহার মনে গর্ব্ব হয় যে সকল বিষয়েই তিনি পাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছেন—কাহারো কাছে তাঁহার কিছু শিখিবার নাই। সেইসময় একদিন পথে যাইতে যাইতে তিনি হঠাৎ দেখিতে পান যে এক পাসি গাছে না চড়িয়াই তাড়ি পাড়িতেছে—একটা প্রকাণ্ড খেজুর গাছ নুইয়া পড়িয়াছে, তাহার মাথাটা সেই পাসির হাতে আসিয়া ঠেকিয়াছে। শঙ্করাচার্য্য এই ব্যাপার দেখিয়া অত্যন্ত বিস্ময়ান্বিত হইয়া পাসিকে প্রশ্ন করেন যে কেমন করিয়া সে এই অঘটন ঘটাইয়াছে। পাসি উত্তর করে মন্ত্রবলে। শঙ্করাচার্য্য তাহার নিকট হইতে মন্ত্রটি শিক্ষা করেন। তখনই তাঁহার মনে হয়, "এখনও আমার অনেকের কাছে অনেক শিখিবার বাকি;—একজন সামান্য, অশিক্ষিত শূদ্রও আমাকে মন্ত্র শিখাইতে পারে দেখিতেছি। আজ আমার দর্প চূর্ণ হইল!" কথিত আছে স্বয়ং শিব পাসি বেশে শঙ্করাচার্য্যের দর্প-চূর্ণ করিয়াছিলেন।

পূর্ব্বোক্ত কাহিনীটাই এই চিত্রের বর্ণনীয় বিষয়।

ব্রহ্মরূপ অগ্নিদেবতা। এই চিত্রখানি উদয়পুর রাজপ্রাসাদে রক্ষিত একখানি প্রাচীন তৈলচিত্র হইতে গৃহিত। ঋক্‌বেদ ৩ অষ্টক, ৮ অধ্যায় ১০ বর্গ, এবং যজুর্ব্বেদ ১৭ অধ্যায় ৯১ মন্ত্রে বর্ণিত শব্দ ব্রহ্মরূপ অগ্নিদেবতার প্রতিমূর্ত্তি।

"ওঁ চত্বারি শৃঙ্গা ত্রয়ো অস্য পাদাদ্বে শীর্ষে
সপ্ত হস্তাসো অস্য। ত্রিধাবদ্ধো-বৃষভো
রোরবীতি মহোদেবো মর্ত্ত্যাংঃ আবিবেশ"

ঋগ্বেদ ৩ অষ্টক ৮ অধ্যায় ১০ বর্গ।

নাম, অখ্যাত, উপসর্গ এবং নিপাত এই চারিটি যাঁহার শৃঙ্গ, ভূত, ভবিষ্যৎ এবং বর্ত্তমান, এই তিনকাল যাঁহার চরণ নিত্যশব্দ, এবং কার্য্য শব্দ, এই দুইটি যাঁহার মস্তক; প্রথমাদি সাত বিভক্ত যাঁহার সপ্ত হস্ত; হৃদয়, কণ্ঠ এবং মস্তক এই তিন স্থানে যিনি বদ্ধ; যিনি সাধকদিগের মনোরথ সম্পূর্ণ করেন সেই শব্দ ব্রহ্মরূপ মহান্দেব স্বরবর্ণাত্মক শব্দাদির আবির্ভাব করিতে করিতে মনুষ্যলোকে ব্যাপ্ত হউন।"

কলিকাতা, ২০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত ও ৪৪,ওল্ড বালিগঞ্জ রোড হইতে
শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।



"নকল গড়"

শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু কর্ত্তৃক অঙ্কিত চিত্র হইতে

ভারতী।

৩২ বর্ষ]　　আশ্বিন ১৩১৬　　[৬ষ্ঠ সংখ্যা

আষাঢ় সন্ধ্যা।

আষাঢ় সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল
গেলরে দিন বয়ে।
বাঁধনহারা বৃষ্টিধারা
ঝরচে রয়ে রয়ে।
একলা বসে ঘরের কোণে
কি ভাবি যে আপন মনে,
সজল হাওয়া বিজন বনে
কি কথা যায় কয়ে!

হৃদয়ে আজ ঢেউ দিয়েছে
খুঁজে না পাই কূল,
সৌরভে প্রাণ কাঁদিয়ে তোলে
ভিজে বনের ফুল।
আঁধার রাতে প্রহরগুলি
কোন্ সুরে আজ ভরিয়ে তুলি,
কোন্ ভুলে আজ সকল ভুলি
আছি আকুল হয়ে॥

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বৈরাগ্য।

(জাপানী গল্প)

(১)

সমস্ত দিন বনে বনে ঘুরিয়া এক ব্যাধ হতাশ মনে বাড়ি ফিরিতেছে—সে দিন সে একটিও শিকার পায় নাই।

শীতকাল—চারিদিকে কন্‌কনে বাতাস। পরিশ্রমে কাতর, ক্ষুধায় পীড়িত, তাহার উপর শীতের বাতাস গায়ে ছুঁচ ফুটাইতেছে! ব্যাধ অবসন্ন শরীরটাকে কোন রকমে বহন করিয়া ঘরে ফিরিতেছিল।

পথে নদী। তাহার ঘোলা জলের স্রোতে সাদা মেঘের মত এক জোড়া হাঁস ভাসিয়া যাইতেছে। তাহাদের কণ্ঠের কল্ কল্ শব্দ নদীস্রোতের ছল ছল শব্দে মিশিতেছিল।

হাঁস বধ করা বড় নিষ্ঠুর কাজ। কিন্তু সে কথা বিবেচনা করা চলিল না—ব্যাধের ক্ষুধা প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল।

বিপদ দেখিয়া দুইটা হাঁসই পালাইতে গেল, কিন্তু একটা হাঁস ব্যাধের শরে মরিল;—সেখানকার জলটা একেবারে লাল হইয়া উঠিল।

স্রোতমুখে টক্‌টকে রক্তের একটা রেখা ব্যাধের পদ স্পর্শ করিল! ব্যাধ শিহরিয়া চোখ বুজিয়া ফেলিল!

(২)

হাঁসের মাংসে কোন রকমে ক্ষুধা মিটাইয়া ব্যাধ সে রাত্রে ঘুমাইতেছে, স্বপ্নে দেখিল এক পরমাসুন্দরী বালিকা তাহার শিয়রে। পদ্মের মত তাহার সুন্দর মুখ খানি ম্লান,—চোখে জল—বুকে দীর্ঘশ্বাস! দেখিয়া ব্যাধের করুণা হইল।

বালিকা উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিতেছিল। তাহার সে কান্নায় ব্যাধেরও চোখে স্বপ্নে জল দেখা দিল।

বালিকা কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতে লাগিল—"নিষ্ঠুর তুমি কি করলে—আমার কি সর্ব্বনাশ করলে! সে তোমার কি করেছিল—তুমি তার প্রাণ নিলে? নদীর বুকে আমরা কি সুখেই ছিলাম—নির্দ্দয়ের মত সে সুখস্বপ্ন তুমি আমাদের কেন ভাঙলে! তোমার তীর আমার বুক থাকতে, আহা! তার কোমল বুকে কেন বাজল!"

ব্যাধের মনে হইল যেন এক একটি কথা এক একটি বিষধর সর্প হইয়া তাহাকে দংশন করিতেছে। সে যাতনায় চীৎকার করিয়া উঠিল—"থামো থামো আর বোলোনা।"

বালিকা তখন গুন্ গুন্ করিয়া বলিতে লাগিল—"আমিই তাকে নদীতে ডেকে এনেছিলুম—হায় হায় কেন আন্‌লুম! কখনো যে তাকে ছেড়ে থাকিনি;—আজ কতক্ষণ সে আমার কাছে নেই;—আমি একলা—নিতান্তই একলা—ওহোঃ একথা মনেও যে আনতে পারি না!"

তাহার পর আবার উচ্চস্বরে বলিল—"নির্দ্দয় ব্যাধ! কিছু বুঝতে পারছ না তুমি কি অবস্থা আমার করেছ—তুমি কল্পনায়ও তা আনতে পার না!—দেখো কাল সকালে দেখো নদীতীরে—আমার কি দশা!"

বালিকা ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।

ব্যাধের স্বপ্নও টুটিয়া গেল। সে জাগিয়া উঠিয়া দেখিল—চোখের জলে বিছানা ভিজিয়া গিয়াছে। তাহার চোখে তো কখন জল আসে না—সে ভাবিল এ সেই বালিকারই চোখের জল। তাহার মন অনুশোচনার আগুনে যেন দগ্ধ হইতে লাগিল। তাহার কানে কেবলই বাজিতে লাগিল—"কাল সকালে দেখো নদীতীরে আমার কি দশা।" ব্যাধ সে কথা ভুলিতে পারিল না।

আজ তাহার অন্তরে এ কিসের প্লাবন! সে কখনো তো কাহারো জন্য দুঃখ বোধ করে নাই—কাহারো দুঃখে সে কখনো তো কাতর হয় নাই!—স্বপ্নে দেখা একটা বালিকার দুঃখে কেন তবে তাহার প্রাণ কাঁদিতেছে?

(৩)

ব্যাধ সকালে নদীতীরে গেল—আজ তাহার হাতে ধনুর্ব্বাণ নাই!

নদীর ঘোলা জলে ধূলাকাদা মাখা একটি মাত্র হাঁস ভাসিয়া আসিতেছে। কাল সন্ধ্যাবেলা সে যে দুটি হাঁস এক সঙ্গে দেখিয়াছিল! সেই কথা, তাহার দেহের রক্তের সহিত হৃৎপিণ্ড হইতে বাহির হইয়া সমস্ত শিরার মধ্যে ছুটাছুটি করিতে লাগিল। তাহারই উত্তেজনায় সে পাগলের মত হইয়া উঠিল।

হাঁসটি ভাসিয়া ভাসিয়া তাহারই দিকে

আসিতে লাগিল। কালকের মত তাহার কণ্ঠে আজ সে কলরব নাই—নদীর জলে সে ছল্‌ছল্‌ শব্দ নাই—ব্যাধেরও সে ক্ষুধা নাই!

ব্যাধ দেখিলেই হাঁস পালায় কিন্তু এখন সে নির্ভয়ে তাহার দিকে সমান অগ্রসর হইতেছে। ব্যাধ অবাক হইয়া গেল!

হাঁসটি ব্যাধের পায়ের কাছে আসিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইল। তাহার পর ব্যাধের চোখের সামনে নিজের চঞ্চু দ্বারা নিজের বক্ষ একেবারে বিদীর্ণ করিয়া ফেলিল! ব্যাধ তাহা দেখিয়া চক্ষু মুদিল!

ধনুর্ব্বাণ সে ঘরে ফেলিয়া আসিয়াছিল—সে ঘরে আর সে ফিরিল না—সেখান হইতেই উদাসী হইয়া চলিয়া গেল!

শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

স্বাভাবিক ও কৃত্রিম এসেন্স।

জগতের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে সুগন্ধ দ্রব্য অতি প্রাচীন কাল হইতেই সমস্ত সভ্য দেশে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছিল। পূর্ব্বকালে সভ্য জাতিগণ গাছগাছড়া হইতে সুগন্ধ দ্রব্য বহিষ্কৃত করিবার নিয়ম অবগত ছিলেন বলিয়া মনে হয় না, কিন্তু তাঁহারা চন্দন, ধূপ, ধূনা, শুষ্ক পুষ্প ও গাছগাছড়া প্রভৃতি সুগন্ধের জন্য ব্যবহার করিতেন। মধ্য যুগে গাছ-গাছড়া হইতে গন্ধ-দ্রব্য বাহির করিবার প্রণালী আবিষ্কৃত হয়; অদ্যাপিও সমস্ত সভ্যদেশে সেই প্রণালীই যৎকিঞ্চিৎ উন্নত হইয়া পুষ্পসার প্রস্তুতের জন্য ব্যবহৃত হইতেছে।

মধ্য যুগে সুগন্ধ ব্যবহার প্রথা অত্যন্ত উচ্ছৃঙ্খল অবস্থায় পরিণত হইয়াছিল; প্রাচ্য দেশই সেই সময়ে পুষ্পসার প্রস্তুতের প্রধান নিকেতন ছিল। মুসলমানদের আমলে ভারতবর্ষেও ইহার প্রসার অত্যন্ত বৃদ্ধি হইয়াছিল। তৎসময়ে গ্রীসে ইহা অধিক মাত্রায় প্রস্তুত হইত; তথা হইতে ইহা ইটালিতে (Italy) গৃহীত হইয়াছিল। এক সময়ে ইটালি সুগন্ধ প্রস্তুতের জন্য জগৎবিখ্যাত হইয়াছিল। এখন যদিও ইহার খ্যাতি অনেক খর্ব্ব হইয়াছে, তত্রাচ কোন কোন বিষয়ে স্বাভাবিক সুগন্ধ প্রস্তুতের জন্য ইটালির এখনো বিশেষ প্রতিপত্তি।

অধুনা ফ্রান্সই স্বাভাবিক পুষ্পসার প্রস্তুতের কেন্দ্রভূমি। সমস্ত পৃথিবীর স্বাভাবিক পুষ্পসার একমাত্র ফ্রান্স হইতে আমদানী হইয়া থাকে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আর রসায়ন-বিজ্ঞানের কেন্দ্রভূমি জর্ম্মনীই একমাত্র কৃত্রিম পুষ্পসার প্রস্তুতের প্রধান স্থল। এখনো অপর কোন দেশে কৃত্রিম গন্ধ প্রস্তুতের বিজ্ঞান সম্পূর্ণরূপে আয়ত্তীকৃত হয় নাই। বারলিন্ (Berlin) বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন-বিজ্ঞানাচার্য্য স্বর্গীয় ফারদিনেন্দ টীমেন (Ferdinand Teimann) অনেক গবেষণা দ্বারা বহু কৃত্রিম সুগন্ধ প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। জর্ম্মণগণ অত্যন্ত কর্ম্মোৎসাহী উদ্যমী লোক, শীঘ্রই ইহারা

তাহা বাণিজ্যাকারে গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়াছে।

জগতের যতপ্রকার পুষ্প লক্ষিত হইয়া থাকে, তাহার অধিকাংশ প্রকারই ভারতবর্ষে জন্মিতে দেখা যায়, এবং ইচ্ছা থাকিলে এবং একটু আলস্য ত্যাগ করিয়া কার্য্যে অগ্রসর হইলে, বোধ হয়, ভারতবর্ষও এই বাণিজ্যের জন্য প্রধান স্থান অধিকার করিবে। এখন যত-প্রকার স্বদেশী এসেন্স আমরা বাজারে দেখিতে পাই, তাহার একটীকেও স্বদেশী আখ্যা প্রদান করা যাইতে পারে না; কারণ তাহার মাল-মসলা কিছুই ভারতের নহে, সমস্তই জর্ম্মণ দেশ অথবা ইউরোপীয় অন্য কোন দেশ হইতে আমদানি হইয়া থাকে। ভারতে উহা কেবল মাত্র মিশ্রিত হইয়া বাজারে বিক্রীত হয়। এসেন্স প্রস্তুত করিতে হইলে ভারতে পুষ্পেরও চাষ করিতে হইবে। পুষ্প সম্বন্ধে বারান্তরে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

যদি আমরা পুষ্পসার প্রস্তুতের মূলপ্রণালী আলোচনা করি তবে ইহা অত্যন্ত সহজ বলিয়া বোধ হইবে। সমস্ত গৃহিনীই বোধ হয় জানেন যে ঘৃত এবং রসুন অথবা পলাণ্ডু একত্রে রাখিলে, উহা রসুন পেঁয়াজের গন্ধ লাভ করে। এই প্রকারে পরিষ্কৃত চর্ব্বি অথবা তৈল দ্বারা পুষ্প এবং অন্যান্য গাছ-গাছড়ার সুগন্ধ শোষিত হইয়া থাকে। যদি কোন পুষ্প, তৈল কিম্বা চর্ব্বিতে ডুবান যায়, এবং প্রতিদিন সেই তৈলে পুরাতন পুষ্পের স্থলে নূতন পুষ্প প্রদান করা যায়, তাহা হইলে ঐ তৈল কিম্বা চর্ব্বি পুষ্পসার যুক্ত হইয়া উহার গন্ধ লাভ করে। প্রতিদিন নূতন পুষ্প দেওয়ার ও পুষ্প রক্ষিত সময়ের ন্যূনাধিক্য অনুযায়ী গন্ধেরও তারতম্য হইয়া থাকে। এই গন্ধ সর্ব্বদাই বিশুদ্ধ ও স্বাভাবিক অবস্থায় পাওয়া যায়।

এই প্রণালীই একটু উন্নত হইয়া আধুনিক সময়ে পৃথিবীর সর্ব্বস্থানে ব্যবহৃত। পশ্চিম ফ্রান্সে এই প্রণালী দ্বারাই পুষ্পসার সংগৃহীত হইতেছে। ভায়লেট, টুবারোজ, জেস্‌মিন্ প্রভৃতির ন্যায় সুকোমল গন্ধ পুষ্পের সার এই প্রণালী ব্যতীত সংগ্রহ করা সুকঠিন!

এইরূপে স্বাভাবিক গন্ধ বিশুদ্ধ অবস্থায় পাওয়া যায়, তত্রাচ ইহা সমস্ত কার্য্যো-পযোগী বলিয়া জন সমাজে বিবেচিত হয় না; কারণ ইহা রুমাল, দস্তানা, ও পোষাক প্রভৃতিতে ব্যবহার করা সুবিধা জনক নহে। ইহা ব্যবহার করিলে পোষাক প্রভৃতি তৈলের দাগে নষ্ট হইয়া যায়, এই জন্য সুরাসারযুক্ত বাষ্পসঙ্কুল এসেন্সই মহিলা সমাজে অত্যন্ত আগ্রহের সহিত ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহাকে প্রস্তুত কারকের ভাষায় extract অথবা spirit বলা যায়। স্বাভাবিক পুষ্পসার-তৈলের সহিত বিশুদ্ধ সুরাসার (alcohol) সংযোগে ইহা প্রস্তুত হইয়া থাকে। সুরাসারে এই তৈল প্রদান করিয়া অত্যন্ত নাড়িতে হয়, ইহার ফলে সুরাসার কর্ত্তৃক গন্ধগুলি শোষিত হইয়া যায়। অবশেষে বল প্রয়োগ দ্বারা সুরাসার হইতে সামান্য গন্ধযুক্ত তৈল অথবা চর্ব্বি পৃথক করা হইয়া থাকে। এই চর্ব্বি পুনরায় পুষ্পসার প্রস্তুতের জন্য ব্যবহৃত হয়।

পূর্ব্ববর্ণিত তৈল কিম্বা চর্ব্বির মধ্যে পুষ্প ডুবাইয়া রাখিয়া পুষ্পসার প্রস্তুত প্রণালীকে পাশ্চাত্য ভাষায় maceration বলা হইয়া

থাকে। এই প্রণালী অত্যন্ত পুরাতন ও অসুবিধাজনক। ইহাতে পুষ্পের সঙ্গে লাগিয়া অনেক তৈল লোকসান হয়। বহুদিন যাবৎই ইহার স্থানে একটি উন্নত প্রণালী আবিষ্কারের চেষ্টা হইতেছিল, তাহার ফলে enfleurage নামীয় একটি প্রণালী আবিষ্কৃত হইয়াছে, ইহা উক্ত প্রণালীরই একটু উন্নত সংস্করণ। এই প্রণালীতে পুষ্পগুলি তৈলের সম্পূর্ণ সংস্পর্শে আসে না। লোহার জালে মোড়া কাঠের ফ্রেম (Frames coverd with gauze) কাপ বোর্ডের (cup boards) ভিতরে একটী আর একটীর উপর সজ্জিত থাকে ; ইহার একটীর উপর পরিষ্কৃত চর্ব্বি ও অপরটীর উপর প্রতিদিন টাট্‌কা পুষ্প সংরক্ষিত করা হয়, এবং ইহার মধ্যে বাতাস প্রবাহিত করিয়া পুষ্পের গন্ধ চর্ব্বিতে স্থানান্তরিত করা হইয়া থাকে, এইরূপ অনেক-বার পুষ্প পরিবর্ত্তন ও বাতাস প্রবাহের পর ঐ চর্ব্বি সুগন্ধযুক্ত হইয়া যায়। ইহাই অবশেষে সুরাসারের সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া extractএ পরিণত হইয়া থাকে।

এই প্রণালী কেবল মাত্র বাণিজ্য কার্য্যের জন্যই সুবিধাজনক নহে ; ইহাতে সম্পূর্ণরূপে উদ্ভিদের গন্ধটুকু পাওয়া যায় ; কারণ পুষ্পসকল তৈলের সম্পূর্ণ সংস্পর্শে না আসাতে, ইহারা ইহাদের জীবনীশক্তির শেষ পর্য্যন্ত গন্ধ উদ্গীরণ করিয়া থাকে। বিশ্লেষণ দ্বারা দেখা গিয়াছে যে meceration প্রণালী অপেক্ষা ইহাতে সাতগুণ অধিক গন্ধ পাওয়া যায় ; কারণ Meceration প্রণালীতে পুষ্পসকল চর্ব্বির সম্পূর্ণ সংস্পর্শে আসিয়া অতি সত্বরই জীবনীশক্তি হারাইয়া ফেলে।

সম্প্রতি গন্ধ নিষ্কাষণের আর একটী প্রণালী আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণ নূতন। উপরোক্ত প্রণালীর সঙ্গে তাহার কোনই সম্পর্ক নাই। ইহা গাছ গাছড়ার শুষ্ক অংশ, শিকড় ও বীজ প্রভৃতি হইতে গন্ধ বাহির করার জন্য বিশেষ উপযোগী। Petroleum ither ও benzin প্রভৃতি অতি সহজে বাষ্পীভূত হয় ও ইহাদের গন্ধ গলাইবার ক্ষমতা আছে, সেইজন্য এই সকলদ্রব্য এই কার্য্যের অত্যন্ত উপযোগী। কোন প্রকার নির্য্যাস প্রস্তুত পাত্রে (extracting apparatus) উপরোক্ত পদার্থ দ্বারা গাছ গাছড়ায় গন্ধ গলাইয়া লইয়া অবশেষে উহাকে উপযুক্ত পাত্রে বাষ্পীভূত করা হইয়া থাকে। ইহা বাষ্পীভূত হইয়া, স্বচ্ছ, বর্ণশূন্য, মোমের ন্যায় পদার্থ রূপে পরিণত হয়। ইহাই ঐ সমস্ত গাছ গাছড়ার সার। কখনও কখনও ইহা ঈষৎ তরল ও সামান্য বর্ণযুক্তও হইয়া থাকে। আমাদের দেশে গোলাপজল ও গোলাপী আতর প্রস্তুতের জন্য যে প্রণালী অবলম্বিত দেখা যায় তাহা অত্যন্ত পুরাতন ও সকল প্রকার গাছ গাছড়ার সার প্রস্তুতের সম্যক উপযোগী নহে। ইহা গোলাপ চম্পক প্রভৃতি প্রবল গন্ধবিশিষ্ট পুষ্পের সার প্রস্তুতের মাত্র উপযোগী ; পারস্য ও বুলগেরিয়া প্রদেশের সমস্ত গোলাপী আতর এই প্রণালীতে প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহাকে ইংরেজিতে distillation ও ভারতীয় ভাষায় চ্যবণ বলে। ইহা বকযন্ত্রের সাহায্যে হইয়া থাকে। এই প্রণালী পৃথিবীর অনেক স্থানেই প্রচলিত। ফ্রান্স প্রভৃতি স্থানে ইহার অত্যন্ত উন্নতি হইয়াছে। কিন্তু কোন কোন স্থানে ইহা অতি পুরাতন ভাবেই ব্যবহৃত হই-

তেছে; Cananga ordorate নামীয় সুগন্ধ লুজন, জাবা, ফিলি ও পাইন দ্বীপপুঞ্জে এই প্রণালীতেই হইতেছে। ফ্রান্সের ওডিকলন নামীয় সুগন্ধের প্রধান মসলা Nerote তৈল কমলা মুকুল হইতে এই প্রণালীতেই প্রস্তুত হয়।

এক প্রণালীতে প্রস্তুত গন্ধের সহিত অপর প্রণালীর একটু ইতর বিশেষ এই যে, কোন কোন প্রণালীতে অধিক মাত্রায় কোনটীতে বা তদপেক্ষা অল্প মাত্রায় গন্ধ শোষণ করে। বহুদর্শী এসেন্স প্রস্তুত কারক কেবল আঘ্রাণ দ্বারাই কোন গন্ধসার কোন প্রণালীতে প্রস্তুত তাহা অনুমান করিতে পারেন।

আধুনিক সময়ে কৃত্রিম এসেন্স প্রস্তুত প্রণালী একটী প্রধান শিল্পের মধ্যে পরিগণিত। এই শিল্পের জন্য জর্ম্মণ দেশই দিন দিন প্রসিদ্ধিলাভ করিতেছে। জর্ম্মন রসায়নাচার্য্যগণ ভিন্ন ভিন্ন গন্ধ দ্রব্যের যৌগিক নিরাকরণের জন্য কঠোর পরিশ্রম করিতেছেন; এবং রসায়ন শাস্ত্র এ বিষয়ে কিরূপ অপূর্ব্ব ফললাভ করিয়াছে লিপজিগের প্রধান এসেন্স প্রস্তুতকারক সিমেল কোম্পানি (Schimmel &Co) তাহার প্রধান দৃষ্টান্ত স্থল। ইহাদের অধিকাংশ উৎপন্ন বস্তুই রসায়নিকের তথ্যানুসন্ধানের ফল। ইহাদের পরীক্ষা মন্দিরে দিন দিন নানা বস্তুর পরীক্ষা হইতেছে, এবং এইরূপে ইহারা অনেক মিশ্র ও অস্পষ্ট যৌগিকের আভাস পাইতেছে। অনেক প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ রসায়নবিদ্‌গণ এই আমোদজনক কার্য্যে জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন ও করিতেছেন। এই বিষয়ের প্রধান পথ-নির্দ্ধারক বারলিন বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়নবিজ্ঞানাচার্য্য স্বর্গীয় ফারদিনেন্দ টীমেন। ইহার অসাধারণ ধীশক্তি ও লিপ্সার ফলে অদ্য আমরা সেই সর্ব্বজন আদৃত বহু মূল্যবান ভায়লেট ও ভেনিলা সুগন্ধ প্রস্তুতের কৃত্রিম উপায় জানিতে পারিয়াছি। ইনি সুগন্ধ রাজ্যে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছেন।

আমরা এখন আলোচনা দ্বারা দেখিব যে, স্বাভাবিক গন্ধের কৃত্রিম প্রস্তুত করা কোন প্রকার অসাধারণ বিষয় নহে; লিবিগ (Libig) এবং ওলার (Wohler) পরিশ্রম ও অনুসন্ধানের দ্বারা তিক্ত বাদাম তৈলকে বেনজোইক্ অম্লের অ্যালডিহাইড্ (aldehyde of benzoic acid) বলিয়া জানিতে পারিয়াছিলেন; তৎপরে রসায়নমন্দিরে মূল পদার্থ সকল যোগে প্রস্তুত হইয়া ইহা বাণিজ্য কার্য্যের জন্যও উপযোগী হইয়া উঠে। সিনামিক অম্লের এ্যালডিহাইড (aldehyde of cinnamic acid) শীঘ্রই লঙ্কার দারুচিনি ও কেসিয়া তৈলের প্রধান উপাদান বলিয়া প্রমাণিত হইয়া গেল, এবং সেলিসিলিক অম্লের মিথিল-ইষ্টার (Methyl-ester of salecylic acid) আমেরিকার উইণ্টার গ্রীন (Winter green) নামীয় সুগন্ধ ঘাস তৈলের প্রধান উপাদান বলিয়া গৃহীত হইল। এবং ইহার ফলে কৃত্রিম উপায়ে উক্ত সকল পদার্থ প্রস্তুত হইতে লাগিল সঙ্গে সঙ্গে উহাদের মূল্যও সুলভ হইয়া পড়িল।

বহুসংখ্যক ফলের গন্ধ বহুকাল হইতেই কৃত্রিম প্রস্তুত হইয়া আসিতেছে, ইহা fruit ether নামে কথিত হইয়া থাকে। এই সমস্ত গন্ধ পানীয় ও মিঠাই প্রস্তুতের জন্য বহু পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বাজারে যত ফলের সিরাপ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার

অধিকাংশই এই সমস্ত কৃত্রিম গন্ধ দ্বারা প্রস্তুত।

আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তীগণ বহুকাল অবধিই এই সমস্ত সরল বস্তুর বিষয় জ্ঞাত ছিলেন। অল্পকাল যাবৎই মিশ্রিত বস্তু সমূহের অনুসন্ধান করিতে সমর্থ হইয়াছেন। পূর্ব্বে হাইড্রো কার্ব্বণকে (Hydro carbon $C_{10} H_{16}$) অধিকাংশ গন্ধের মূল বলিয়া জানা ছিল; কিন্তু পরে প্রমাণিত হইলে যে উক্ত পদার্থ বিগর্হিত অনেক গন্ধসারও ঠিক ঐ প্রকার আকার ও গন্ধবিশিষ্ট; এবং এই দিকে রাসায়ণবিদের লক্ষ আকর্ষণের সঙ্গে সঙ্গে গন্ধ-বিজ্ঞান উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে লাগিল।

অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিগণ সাধারণতঃ গন্ধের সাদৃশ্য অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন তৈলকে একত্র করিয়া তাহাদের সাধারণ উপাদান গুলি জানিতে চেষ্টা করেন। যেমন ভারতীয় একপ্রকার ঘাস (Audropogon Scholnanthus) তৈলের এবং Geranium তৈলের সঙ্গে বহু মূল্যবান গোলাপী আতরের গন্ধের সাদৃশ্য আছে, বহুকালাবধিই প্রাচ্য আতর ব্যবসায়ীগণ এই বিষয় অবগত ছিল, কিন্তু উহারা বৈজ্ঞানিক ভাবে এই তৈলের কার্য্যকারিতা লক্ষ্য না করিয়া, অসৎ অভিপ্রায়ে মহামুল্যবান গোলাপী আতরের সহিত ইহার ভাঁজ দিত।

বস্তুত আধুনিক সময়ে এই সমস্ত তৈল হইতে একপ্রকার কৃত্রিম গোলাপী আতর প্রস্তুত হইতেছে। যদিও ইহা প্রকৃত গোলাপী আতর হইতে গন্ধে সামান্য একটু প্রভেদ তত্রাচ গোলাপী তৈলের পরিবর্ত্তে ইহার ব্যবহার চলিতে পারে। সাধারণ লোকে ইহার প্রভেদ সহজে উপলব্ধি করিতে পারিবে না। ভিন্ন ভিন্ন আবিষ্কারকের দ্বারা ইহার ভিন্ন ভিন্ন নাম প্রদত্ত হইয়াছে। একটু সামান্য মিশ্রন দ্বারা ইহাকে ঠিক গোলাপী আতরে পরিণত করিতে পারিবেন বলিয়া রসায়নবিদেরা আশা করিতেছেন।

জেসমিন পুষ্পের কৃত্রিম গন্ধ প্রস্তুত করায় ইহা অপেক্ষাও উৎকৃষ্টতর আর একটী ফল পাওয়া গিয়াছে। অনেকদিন পূর্ব্বে প্রতিপন্ন হইয়াছিল যে জেসমিন পুষ্প হইতে যে তৈল পাওয়া যায় তাহা অত্যন্ত অল্প এবং তাহার সঙ্গে অধিক মাত্রায় সর্ব্বজন পরিচিত বেঞ্জিল সুরাসার (Benzil alcohol) এবং এ্যাসিটেট্ অব বেঞ্জিল (acetate of benzyl) ভাসমান অবস্থায় সংযুক্ত থাকে এবং ইহাতে অধিক মাত্রায় উক্ত পুষ্পগন্ধ বর্ত্তমান দেখিতে পাওয়া যায়; আরো কোন কোন পদার্থ অতি সামান্য মাত্রায় ইহার সঙ্গে সংযুক্ত দেখা যায়, কিন্তু তাহাতে ইহার গন্ধের কোন সহায়তা করে বলিয়া বিবেচিত হয় না। শেষোক্ত পদার্থ যাহা এন্থ্রানিলিক (anthranilic) অথবা অর্থো-আমিডো-বেঞ্জোইক্ (orthoamido benzoic) অম্লের সহিত মিথিল (methiyl) সুরাসার যোগে সুন্দর সাদা স্ফটিকাকারে (crystals) প্রস্তুত করা যাইতে পারে—ইহার মধ্যে কমলা পুষ্পের গন্ধ এমন স্পষ্ট যে ইহার সাহায্যে বাজারে বহু পরিমাণ নকল কমলা ফুলের গন্ধ প্রস্তুত হইয়া বিক্রয় হইতেছে।

পূর্ব্বের বর্ণনা হইতে আমরা জানিতে পারিয়াছি যে কতকগুলি পদার্থের একত্র মিশ্রনে কমলা পুষ্প, গোলাপ ও জেসমিনের

গন্ধ প্রাপ্ত হওয়া যায়, ইহাকে কৃত্রিম বা নকল গন্ধ বলা যাইতে পারে।

সম্পূর্ণ রসায়নিক সংমিশ্রণের দ্বারা ফারদিনেন্দ টীমেন কৃত্রিম ভেনিলা প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। প্রকৃত ভেনিলা, ভেনিলাসিম্ নামক ফলের খোসা হইতে প্রস্তুত হইয়া থাকে। এখন বহু পরিমাণে ইহার কৃত্রিম প্রস্তুত হইতেছে। প্রথমে ইহা আমেরিকান পাইন নামক বৃক্ষের কতিপয় অংশ হইতে প্রস্তুত হইয়াছিল, এখন ইহা বাজারে বিক্রয়ার্থ লবঙ্গ তৈল স্থিত ইউজিনোল নামীয় পদার্থ হইতে প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত হইতেছে। রসায়ন আরো অনেক প্রকার গন্ধের নকল করিতে সমর্থ হইয়াছে; এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাহার বর্ণনা করা অসম্ভব।

এখন দুই একটী আবশ্যকীয় গন্ধের বিষয় বলিয়াই প্রবন্ধ শেষ করিব। ভায়লেটের কৃত্রিম গন্ধ, গন্ধবাণিজ্যে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে। বিজ্ঞানাচার্য্য টিমেনই এই গন্ধের আবিষ্কারক; অসাধারণ আঘ্রাণ শক্তির গুণেই তিনি ইহা প্রস্তুত করিতে পারিয়াছেন। পণ্ডিতবর বুর (baur) অতি দক্ষতার সহিত মৃগনাভি নকল করিয়াছেন, অনেক মূল্যবান এসেন্সে ইহা এখন ব্যবহার হইতেছে। সময়ান্তরে এই সমস্ত বিষয়ের প্রস্তুত প্রণালীসহ রাসায়নিক বিবরণ প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

শ্রীনিরুপমচন্দ্র গুহ ঠাকুরতা।

জ্যোৎস্না-লক্ষ্মী।

তুমি, লুকিয়ে বেড়াও যে মুখখানি দেখেছি কাল রাতে
আমার, পদ্মাচরের ভাঙা ঘরের শূন্য আঙিনাতে;—
তুমি, কত রাতের বিফল জাগা সফল করে দিয়ে—
শেষে,—কালকে আমার চোখের ফাঁদে পড়লে ধরা প্রিয়ে!

তখন, নিঝুম রাতি—সুপ্ত সবাই রুদ্ধ দুয়ার ঘরে,
ভিজে, শেওলা নীড়ে ঘুমায় মরাল চখা ঘুমায় চরে;
কেবল, বুনো ঝাওয়ের বনে বেড়ায় ব্যস্ত ব্যাকুল বায়,
আর, আমি ছিলাম জেগে আমার ঘরের জানালায়।

তুমি, শিশির ভেজা কাশের বনে এলিয়ে দিয়ে আঁচল,
সিত, জ্যোৎস্নামাখা হাঁসের পাখায় বিছিয়ে দিয়ে কাঁচল,
সাদা, ঝিনুক পাতা বালির তটে ঘুমিয়ে ছিলে রাণী;
আমার, মুগ্ধ নয়ন হেরে ছিল সুপ্ত সে রূপখানি!
তোমার, এতকালের গোপন শোভা পড়ল ধরা যাতে,
কাল, রাত দুপুরে পদ্মাচরে শরৎ পূর্ণিমাতে।

আমি, বল্‌ব আরো চিহ্ন কি কি তোমার গায়ে আছে,
আমি, বল্‌তে পারি—ভাবছি কেবল রাগ কর বা পাছে!
তোমার, গত রাতের যত কথা প্রকাশ করে দিয়ে,
পাছে, বঞ্চিত হই চিরজনম প্রসাদ হ'তে প্রিয়ে।
তবু, এটুক আমি বল্‌ব—তুমি রাগ করোনা তা'তে—
তোমার, লুকিয়ে রাখা মুখখানিকে দেখেছি কাল রাতে।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী।

কোচিন্-চীনে ভ্রমণ।

অ্যানাম-প্রদেশ।

(Felicien Challaye-র ফরাসী হইতে)

৩ ফেব্রুয়ারী ৯০১।

Tourane-এ আমার এক বুদ্ধিমান বন্ধু আমাকে বলিয়াছিলেন :—"যাহা এখনও য়ুরোপীয়দিগের অপরিজ্ঞাত সেই সব উচ্চ পার্ব্বত্য প্রদেশগুলি না দেখিয়া তুমি Annam হইতে প্রস্থান করিও না। সেখানে তুমি ইন্দচিনীয় দেশের বিরাট্ প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখিয়া, সমৃদ্ধ ক্ষেত্রসকল দেখিয়া, পরমাশ্চর্য্য অরণ্য দেখিয়া, নিশ্চয়ই মুগ্ধ হইবে। যাত্রাপথে, তুমি অ্যানামবাসীদিগকে দেখিতে পাইবে; Saigon ও Hueর অ্যানাম্‌বাসীদিগের অপেক্ষা উহারা কম য়ুরোপীয়ভাবাপন্ন এবং Hanoi-র অ্যানাম্‌বাসীদিগের অপেক্ষা বেশী প্রাচীন প্রথার ভক্ত। ভ্রমণ-পথের শেষ-সীমায় পৌঁছিলে কতকগুলা বুনা লোককে দেখিতে পাইবে। তাহাদের নাম মোই (Moys); তাহাদের অপূর্ব্ব আচার ব্যবহার। উপনিবেশ রাজ্যের অভ্যন্তর প্রদেশে তাহারা এখনও স্বাধীনভাবে অবস্থিতি করিতেছে।"

এই কথা শুনিয়া, আমি ও আমার বন্ধু Charles Garnier আমরা অ্যানাম-প্রদেশ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিব বলিয়া সঙ্কল্প করিলাম। অনেক পথের বাধা অতিক্রম করিতে হইবে—সেটাও একটা ভ্রমণের আকর্ষণ; এখানে না আছে রেলপথ, না আছে ঘোড়ার গাড়ীর বন্দোবস্ত। পর্য্যায়ক্রমে 'সাম্পান্'-নৌকায়, ডাণ্ডীতে, পাল্কীতে, অশ্বপৃষ্ঠে ও পদব্রজে যাইতে হইবে। বোধহয় "মোই"-গ্রাম Tou nac পর্য্যন্ত দশজন য়ুরোপীয়ও যায় নাই। এখন আমরা সেই গ্রামাভিমুখে চলিতেছি।

Tourane-র 'বৃহৎ হোটেলের' সম্মুখে, আমরা একটা সাম্পানে উঠিলাম; পূর্ব্ব হইতেই ইহার জন্য আমরা বলিয়া রাখিয়াছিলাম। এই ক্ষুদ্র নৌকার মধ্যে একটি কাম্‌রা, নৌকাটা দীর্ঘ ও নীচু, মাথার উপর একটা মণ্ডলাকার খড়ের ছাউনি; একটা ফাঁদের মত রন্ধ্রপথ দিয়া কষ্টেসৃষ্টে ভিতরে প্রবেশ করিতে হয়; ভিতরে গিয়া উবু হইয়া মাদুরের উপর বসিতে হয়, কিংবা শুইতে হয়। এই সঙ্কীর্ণ স্থানে সাম্পানওয়ালা সপরিবারে বাস করে :—তাহার স্ত্রী, তাহার দুইটি বৃদ্ধ আত্মীয়, ও তিনটী শিশুসন্তান। তাহার মধ্যেই, সজীব মুর্গী, খাদ্যসামগ্রী ও অন্যান্য পণ্যদ্রব্য;—সমস্তই Tourane এ খরিদ করা হইয়াছে। একটা কোণ খালী ছিল, সেই কোণে আমাদের অ্যানাম্‌বাসী ভৃত্য আমাদের জন্য শয্যা বিছাইয়া রাখিয়াছে; সেইখানে আমরা শুইয়া পড়িয়া ঘুমাইবার চেষ্টা করিলাম।

অনুকূল বায়ুর সাহায্যে আমাদের সাম্পান রমণীয় বিলের উপর দিয়া, Fai foo-র অভিমুখে বেগে চলিতে লাগিল।

* * *

৪ ফেব্রুয়ারী।

আজ প্রাতে খুব শীত। বৃষ্টি হইতেছে। সাম্পান্-নৌকার খড়ের ছাউনির উপর মোটা-

মোটা ফোঁটা পড়িয়া ছটাছট্ শব্দ হইতেছে। মাজিমাল্লারা কোণালু ধরণের তালপাতার বড় বড় টোপা মাথায় পরিয়াছে; একপ্রকার অপূর্ব্ব খড়ের আচ্ছাদনবস্ত্রে তাহাদের গাত্র আচ্ছাদিত। সমস্ত অতিপ্রাচ্যদেশে, বর্ষার সময়, মাঠ ময়দানে এই প্রকার আচ্ছাদনবস্ত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বৃষ্টি বাদলে কোথাও আমাদের বাহির হইবার জো নাই। কাজেই জিপ্‌সীদের ন্যায় ঘ্যাসাঘেসি করিয়া এই নৌকার কাম্‌রার মধ্যেই বদ্ধ থাকিতে হইয়াছে। লোকজন, ছেলেপুলে, জীবজন্তু, জিনিসপত্র সব এক সঙ্গে এই সংকীর্ণ স্থানের মধ্যে রহিয়াছে। নানাপ্রকার বিচিত্র ও অপ্রীতিকর গন্ধ পাওয়া যাইতেছে। কেবল একটা অতীব ক্ষুদ্র বেদিকার সম্মুখে একটা ধূপ-কাঠী জ্বলিতেছে,—তাহা হইতে অল্প অল্প ধূম উত্থিত হইতেছে—কিন্তু বায়ু শোধনের জন্য তাহা যথেষ্ট নহে। একটু পরেই, নৌকা-ওয়ালী রন্ধনের জন্য আগুন জ্বালাইল;—একটা উৎকট ধোঁয়ায় ঘর ভরিয়া গেল। নৌকাওয়ালী সাদা চালের ভাত রাঁধিতেছিল, দেখিয়া আমাদের লোভ হইল; আমরা তাহার নিকট হইতে একটু চাহিয়া লইলাম;—রুটির বদলে, চাট্‌নী প্রভৃতি দিয়া ঐ ভাত আমরা খাইলাম। সেই সঙ্গে কয়েক পেয়ালা অ্যানা-মের উৎকৃষ্ট চাও পান করিলাম। আমরা তাহাদের ভাত খাইতেছি, তাহাদের চা পান করিতেছি দেখিয়া—নৌকার বুনো ছেঁলেগুলা আমাদের একটু পোষ মানিল। সার্ডিন মাছের একটা খালী বাক্‌স দেওয়ায় তাহারা আরও আমাদের প্রতি আকৃষ্ট হইল।

মধ্যাহ্নে আমরা Fai-Fooতে গিয়া থামি-লাম। ফাইফু একটা বড় চীনে সহর। ডাল চিনি ব্যবসায়ের কেন্দ্রস্থল। ডাল চিনি—চীনে রান্নার, চীনে পিষ্টকাদির, চীনে ঔষধাদির একটা প্রধান উপকরণ। অ্যানাম্‌বাসীরা মোইদের নিকট হইতে উহা খরিদ করিয়া ফাইফুতে আনয়ন করে। চীনেরা ঐখানে আসিয়া, তাহাদের দেশীয় জাহাজে কিম্বা ষ্টীমারে করিয়া উহা হং কং কিংবা সাজ্‌ঁাইতে চালান দেয়।

এই অপরাহ্নে এখনও বৃষ্টি হইতেছে; পাল তুলিয়া যাইবার জো নাই—আবার দাঁড় টানিয়া টানিয়া দাঁড়ীরাও ক্লান্ত হইয়াছে। সুতরাং আমাদের এই ক্ষুদ্র কাম্‌রাটির ভিতর আরও এক রাত্রি যাপন করিতে হইবে।

* * *

৫ ফেব্রুয়ারী।

পূর্ব্বাহ্ন ১১টার সময় আমরা সাম্পান্ ত্যাগ করিলাম; এখন আমরা Tam-ky নগরে পৌছিয়াছি। ইহা অ্যানামের একটি গণ্ডগ্রাম—Ha-Dong প্রদেশের একটি মুখ্য-স্থান। এখানকার Huyen (সহকারী গ্রামাধ্যক্ষ) আমাদের নিমিত্ত অশ্ব ও ডাণ্ডী প্রস্তুত রাখি-বার জন্য Residentএর নিকট হইতে আদেশ পাইয়াছেন; কিন্তু শুনিলাম, সেই ব্যক্তি অনুপস্থিত, তিনি তাঁহার কোন পীড়িত আত্মীয়কে দেখিতে গিয়াছেন...এই স্বেচ্ছাকৃত অনুপস্থিতির কারণ আমরা সহজেই অনুমান করিলাম। অত্যন্ত দাবীদার ও নিষ্ঠুর য়ুরো-পীয়দিগের নিকটে আসিতে বেচারার ভয় হই-য়াছে; আমরা অনেক সময় দেখিয়াছি, কোচিন চীনের ফরাসীরা দেশীয়দিগের প্রতি বড়ই কঠোর ব্যবহার ও অত্যাচার করিয়া

থাকে। বেশ বুঝা যায়, তাহারা আত্মসম্মান রক্ষার জন্যই য়ুরোপীয়দের নিকটে সহজে আসিতে চাহে না,—তাহাদের এইরূপ ভয় হওয়া স্বাভাবিক।

তাহার অনুপস্থিতিতে, গ্রামের তিন জন প্রধান আমাদের অভ্যর্থনা করিলেন ; ভূতল পর্য্যন্ত মস্তক নত করিয়া তাঁহারা আমাদিগকে নমস্কার করিলেন। তাঁহারা শুধু দুঃখিত হইয়া আমাদিগকে জানাইলেন যে, এই গ্রামে না আছে অশ্ব, না আছে ডাণ্ডী ; আগামী কল্য, আমাদের জন্য ও আমাদের ভৃত্যের জন্য তিন খানা পাল্কী প্রস্তুত থাকিবে ; পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে দুইখানা পাল্কী ভাড়া করিবার জন্য লোক পাঠান হইয়াছে ··· কাজেই এখানে একদিন থাকিতে আমরা বাধ্য হইলাম। আমরা আজ রাত্রে এখানকার পান্থশালায় শয়ন করিব ; ইহা একটা গুদাম-ঘর বলিলেও হয় ;—মাদুর ও মশারি দ্বারা সজ্জিত : এইটি Huyenএর পদোচিত বাস-গৃহ।

যখন আমরা এই ঘরে প্রবেশ করিতেছিলাম, অ্যানামবাসী দুইটি যুবক দূর হইতে আমাদিগকে দেখিতেছিল। তাহারা কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া ধীরপদক্ষেপে ভয়ে ভয়ে আমাদের নিকটবর্ত্তী হইল। আমরা যে এখানকার য়ুরোপীয়দিগের ন্যায় তাহাদিগকে ঘুসি ও লাথি মারিয়া তাড়াইয়া দিলাম না ইহাতেই তাহারা বিস্ময়স্তম্ভিত হইল। পরক্ষণেই তাহারা সাহস পাইয়া সস্মিত মুখে আমাদের সম্মুখে আসিল। আমাদের ভৃত্যটি দোভাষীর কাজ করে ; তাহাকে দিয়া আমরা তাহাদিগকে কতকগুলি প্রশ্ন করিলাম, তাহারাও স্বেচ্ছাক্রমে তাহার উত্তর দিল।

ইহারা Huyen-এর পুত্রদ্বয় ; একজনের নাম Guien, আর একজনের নাম Dan ; একজনের বয়স ১৩, আর একজনের দশ। ইহারা রাজবংশীয়,—সম্রাট্ Gia Long এর অব্যবহিত বংশধর। ইহাদের মেয়েলী ধরণের মুখ, নেবুর মত রং, এবং ইহাদের মুখাবয়ব বেশ সুন্দর ও সূক্ষ্ম ছাঁদের ; সমস্ত অ্যানামবাসীদের ন্যায়—ইহাদেরও কালো চুলের খোঁপা। গোলাপী ক্রেপ্-কাপড় পাগ্ড়ীর মত মাথায় জড়ানো ;—এইরূপ পাগ্ড়ী শিক্ষিত লোকেরাই ব্যবহার করে। অ্যানামবাসীদিগের ন্যায় ইহারাও লম্বা কালো জামা ও রেশ্মী পাজামা পরিয়াছে ; এই পাত্লা কাপড় পরিয়া, মনে হইল যেন উহারা শীতে কাঁপিতেছে। তাহাদের নখ্ ৩,৪ Centimetre (এক ইঞ্চের ১০০ ভাগের এক ভাগ = ১ centimetre) লম্বা ; এই লম্বা নখ্ উচ্চপদের চিহ্ন। উচ্চশ্রেণীর অ্যানামবাসীরা বলে যে, তাহারা অভিজাত বলিয়া তাহাদের হাতের কোন কাজ করিতে হয় না, এবং এই জন্যই তাহাদের নখ্ বাড়িয়া উঠে।

দোভাষীর মধ্যবর্ত্তিতায়, তাহাদের সহিত আমরা কথা চালাইলাম ; আমরা বিভিন্ন পদার্থের নাম করিতে লাগিলাম—তাহারা অ্যানামী ভাষায় ও আমরা ফরাসী ভাষায় বলিতে লাগিলাম ; আমরা অ্যানামী শব্দসমূহের উচ্চারণের অনুকরণ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম, কিন্তু তেমন কৃতকার্য্য হইতে পারিলাম না ; আমাদের নিষ্ফল চেষ্টা দেখিয়া তাহাদের খুব আমোদ হইল। তাহারা বলিল, আমরা যে সকল পদার্থের কথা বলিতেছি, তাহারা চীনে অক্ষরে লিখিয়া আমাদিগকে

দেখাইতে পারে। এখন উহারা আমাদের বেশ পোষ মানিয়াছে, গ্রাম পরিদর্শনে তাহাদের সঙ্গে যাইবার জন্য প্রস্তাব করিল। এমন কি, আমাদিগকে লইয়া যাইবার জন্য আমাদের হস্ত ধারণ করিল।—এই অ্যানামবাসীরা খুব ভদ্র ও ইহাদের ব্যবহার অতীব মধুর; ইন্দ-চিনীয় ফরাসীরা ইহাদের প্রতি দুর্ব্যবহার না করিয়া যদি বুদ্ধিপূর্ব্বক ইহাদের প্রতি একটু সহানুভূতি প্রকাশ করে, তাহা হইলে সহজেই উহাদের প্রীতি আকর্ষণ করিতে পারে।

Huyenর পুত্রদিগের সহিত আমরা গ্রামের দোকানগুলি দেখিতে গেলাম! দোকানদারেরা, এক প্রকার বৃহৎ কোণালু-টুপি মাথায় দিয়া, জিনিসপত্রের সম্মুখে খরিদ্দারদিগের প্রত্যাশায় উবু হইয়া বসিয়া আছে; কখন কখন পরিচিত ভঙ্গীসহকারে, ডান হাত দিয়া বাঁ পা ধরিতেছে; খুব উৎফুল্লভাবে অজস্র বকিয়া যাইতেছে; অথবা নগ্ন শিশুদিগকে আদর করিতেছে;—তাহাদের গালে নাক ঘসিয়া দিতেছে, তাহাদের কপোল-গন্ধ আঘ্রাণ করিতেছে; অ্যানামবাসীরা চুম্বনের পরিবর্ত্তে কপোল আঘ্রাণ করিয়া থাকে। দীর্ঘ সুনম্য বেত্রদণ্ডের দুই প্রান্তে দুইটা ঝুড়ি ঝুলাইয়া এবং ঐ দণ্ডটা কাঁধে করিয়া, রমণী-খরিদ্দারেরা ক্রমে আসিয়া উপস্থিত হইল;—উহা দেখিতে দাঁড়িপাল্লার মত। মাটির উপর কিংবা একটা মঞ্চের উপর পণ্যদ্রব্য সজ্জিত রহিয়াছে। চক্‌চকে চট্‌চটে নানাবিধ মৎস্য, মোটামোটা চিংড়া, কাঁকড়া, পাতিহাঁস কিংবা ছোটছোট শূয়োরের কাবাব, আচার-মোরব্বা, গরম-মস্‌লা, মূলা, পেঁয়াজ, কলা, ম্যাঙ্গোষ্টিন্, বাতাবি-নেবু, পিষ্টক ও মিষ্টান্ন, তামাক, চূন্, পানসুপারি, কাপড়, কৃত্রিম চুলের মাদুর, মোটামোটা অলঙ্কার, চীনে-বাসন, ধূপ কাঠি, দেবালয়ে পোড়াইবার জন্য সোনালী কাগজ।

অপরাহ্নের শেষভাগে, গ্রামের প্রধানেরা আসিয়া আমাদিগকে নমস্কার করিল ও নানাপ্রকার উপহার দিল। একজন,—একটা ছোট গোল খাঁচায় বদ্ধ দুইটা মুর্গি এবং কতকগুল ডিম দিল; একজন—কতকগুলা নারিকেল, আর একজন দেশী চিনি দিল।

Huyen-এর ভ্রাতা ও পুত্রগণ রাত্রে ভোজনের জন্য আমাদিগকে নিমন্ত্রণ করিল। চমৎকার অ্যানামী ভোজ:—রুটির বদলে ভাত, তরকারীর ঝোল, মাছ, চিংড়ী, মুর্গির ছোটছোট টুক্‌রো, এক বাসন পেঁয়াজ। একটা বাটীতে Nioc namও ছিল,—এই পচামাছের আচার এখানকার লোকেরা খুব ভালবাসে। ইহার আস্বাদ একটু অপূর্ব্ব ধরণের—কিন্তু রসনার অপ্রিয় নহে। দেশীয় প্রথার সম্মানরক্ষার্থে আমরা অ্যানামবাসীদিগের ধরণেই আহার করিলাম;—দুইটা কাঠি ডান হাতে ধরিয়া পর্য্যাক্রমে চিংড়ী কিংবা একটুকরা মাছ উঠাইয়া niocnam আচারে একটু ভিজাইয়া লইয়া এক এক গ্রাস ভাতের সহিত গিলিতে লাগিলাম। তারপর কদলী ভক্ষণ করিয়া এবং উৎকৃষ্ট হল্‌দে চা পান করিয়া পরিতৃপ্ত হইলাম। ভোজনের সময় স্বয়ং গৃহকর্ত্রী Huyenএর পত্নী আসিয়া আমাদিগকে নমস্কার করিলেন। এ সম্মান বড় কম নহে।···

ভোজনের পর, আমাদের বিনোদনার্থে, বাড়ীর ছেলেরা উপস্থিতমত একটা নাটকাভিনয়ের বন্দোবস্ত করিল। ঘরের সম্মুখে

একটা মাদুর, তার দুই পাশে দুইটা বাতী। ইহাই রঙ্গপীঠ। ঢাক-ঢোলের বদলে কটাহ; —ইন্দ-চীন রঙ্গালয়ে,—যেখানে নাটকের ভাল ভাল কথা অভিনয়ের সময় উপস্থিত হয়—সেই সেই স্থলে এই কটাহের উপর আঘাত করা হয়। Huyenএর পুত্রদিগের অল্পবয়স্ক ৩জন সহচর ইহার অভিনেতা। ইহারা একটা প্রহসন অভিনয় করিল —কিন্তু ইহার হাস্যরস উপলব্ধি করা সব সময়ে আমাদের পক্ষে সহজ নহে। একবার উহাদের মধ্যে একজন বুনো মোই সাজিয়া আসিল; কপালের সম্মুখে চুল ঝুলিয়া পড়িয়াছে; কৃত্রিম স্ফীত উদর, নগ্নপ্রায় গাত্র; গায়ে শুধু একটা ন্যাকড়া জড়ানো। হাতে একটা ছড়ি,—এক প্রকার ঝাঁটার বাঁট,—মোইদের বল্লম মনে করাইয়া দেয়। মোইদের অনুকরণে উহারা হেলিয়া দুলিয়া চলিতে লাগিল, হাস্যজনক ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দ করিতে লাগিল। এই অনুকরণের অভিনয়ে দর্শক-মণ্ডলীর খুব আমোদ হইল; অ্যানামাবাসী-দিগের প্রাচীন সভ্যতা এবং উহারা অপেক্ষাকৃত মার্জ্জিতরুচি; তাই উহারা মোই-জাতিকে ঘৃণা ও অবজ্ঞা করে; উহাদিগকে স্থূলরুচি ও অদ্ভুত বলিয়া মনে করে। আমার বোধ হয়, তাড়াতাড়ি এরূপ দোষারোপ করিলে উহাদের প্রতি অন্যায় করা হয়। প্রতিবেশী অ্যানামবাসী অপেক্ষা আমরা এই সকল বুনো লোকদিগকে ভাল করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করিব এবং আমরা অবশ্য উহাদের স্বাধীন জীবনের আদিম সৌন্দর্য্যের মর্ম্মগ্রহ করিতে পারিব।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পোষ্যপুত্র। পূর্ব্বের অনুবৃত্তি।

(১০)

অপরাহ্নে যোগেন্দ্রবাবুর ক্ষুদ্র বাগানটিতে শান্তি সুপ্রকাশ ও যোগেন্দ্রর পুত্র অনিল তিন জনে বেড়াইতে ছিল, যোগেন্দ্রবাবু যখন ভ্রমণে বাহির হইলেন সুপ্রকাশকে তিনি ডাকিয়া লইয়া গেলেন। অনিল অনেক কাঁদাকাটা করিলেও তাহাকে সঙ্গে লইলেন না—সে নেহাৎ ছেলে মানুষ বেশিদূর হাঁটিতে পারিবে না; আর শান্তি তো এখন বড় হইয়া গিয়াছে, সে যোগেন্দ্রের সঙ্গিনী হইতে রাজি নয়। সুপ্রকাশ চলিয়া গেলে শান্তি একটু নিরুৎসাহ হইয়া পড়িল—মুকু না থাকিলে তাহার কিছুই ভাল লাগে না। কিন্তু অনিল তাহাকে বিশ্রাম দিতে রাজি নয়, সে ফুলের ভারে ঝুঁকিয়া পড়িয়াও নূতন ফুলের জন্য আব্দার করিতে ছাড়িতেছিল না। একটা কাঞ্চনগাছের চারিদিকে প্রজাপতি উড়িতেছিল দেখিয়া সে আব্দার ধরিল "মাসিমা পেত্তাপতি দাও। হাসিয়া শান্তি ধমক দিল—"প্রজাপতি ধরলে বিয়ে হবে না; এই নে কেমন ফুল!" অনিল সমস্ত ফুল চারি-দিকে ছড়াইয়া ফেলিয়া কাঁদিয়া উঠিল "আমায় পেত্তাপতি দাও।" সহসা উদ্যানপথে গাড়ির শব্দ শুনিয়া শান্তি পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিল—যে টমটমখানা সে কয়দিনই এই সময়ে দেখিতে

পায়, সেইখানাই তাহার একমাত্র আরোহীকে লইয়া অগ্রসর হইতেছে। শান্তি অনিলের হাত ছাড়িয়া দিয়া একটু পাশ কাটাইয়া দাঁড়াইল; অনিল ততোক্ষণে ছুটিল আগন্তুক গাড়ি হইতে নামিবামাত্র তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া কহিল "এতো দেলি কেন কাকাবাবু!"

আগন্তুক তাহাকে কোলে তুলিয়া লইয়া তাহার কোমল গণ্ড চুম্বন করিলেন। প্রকৃতির অঙ্গে বৃষ্টি যেমন বর্ষণ চিহ্ন রাখিয়া যায় সগু ক্রন্দনও তেমনি তাহার গণ্ডে অশ্রুচিহ্ন রাখিয়া গিয়াছিল। আগন্তুক পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া শিশুর মুখ মুছাইয়া দিয়া সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিলেন :কেঁদেছ কেন? অনিলের পূর্ব্বশোক আবার উথলিয়া উঠিল, সে রাঙ্গা ঠোঁট ফুলাইয়া চোখে জল আনিয়া নালিস রুজু করিল "আমায় পেত্তাপতি দিয়ে না!"

"এইজন্য! আচ্ছা আমি তোমায় একটা প্রজাপতির ছবি দেবো এখন।" বলিতে বলিতে যুবক অদূরবর্ত্তিনী শান্তির দিকে চাহিয়া দেখিলেন, অনবগুণ্ঠিতা কিশোরী তাঁহার প্রতি কৌতুকপূর্ণ সহাস্য চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া আছে। দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইলেন। তিনিতো যোগেন্দ্রের বাড়ি সর্ব্বদাই আসিয়া থাকেন; এই অল্পদিনের মধ্যেই দুইবার গৃহকর্ত্রী বদল হইল। অনিলের মার মৃত্যুর পরেই অনিলের পিতা দ্বিতীয়-বার বিবাহ করিয়া আনিয়াছেন, —সেও তো কয় মাসের কথা। কিন্তু এ পর্য্যন্ত নববধূ তাঁহার চোখে পড়ে নাই—ইনিই কি সে নববধূ? খোলামাথায় এমন সপ্রতিভ ভাবে একজন অজানা পুরুষের সাক্ষাতে তাহাকে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্যানুভব করিলেন। কিন্তু খোকা শান্তির কাছে আসিয়া ডাকিল "ও মাছিমা" আগন্তুক তখন বুঝিলেন সে অনিলের বিমাতা নয়। তবুও তাঁহার বিস্ময় ঘুচিল না। তিনি জানেন, সহুরে বাঙ্গালীর মেয়ে এই বয়সে আধহাত ঘোমটা টানিয়া গালের মধ্যে পান দোক্তা ভরিয়া রান্না ভাঁড়ার ঘরের এলাকায় ঘুরিয়া বেড়াইলেই সব চেয়ে বেশি মানায়, বড় বেশি স্বাধীন হইল তো না হয় সখী সঙ্গিনী লইয়া রুদ্ধ দ্বারের মধ্যে বসিয়া তাস খেলুক বা টপ্পা গান করুক অথবা বি, এ ক্লাশের স্বামীকে দীর্ঘ পত্র লিখিতেও পারে। সে যে বাগানে ফুলের রাশি আঁচলে, খোলা-মাথায় একজন অপরিচিতের সম্মুখে লক্ষ্মী প্রতিমার মতন দাঁড়াইতে পারে এমন ধারণাই তাঁহার ছিল না। মনে মনে চমৎকৃত হইলেন।

অনিল মাসিমার নিকট উত্তর না পাইয়া রাগিয়া মাটিতে আছাড় খাইয়া পড়িতেছিল, শান্তি ব্যস্ত হইয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিল, হাসিয়া বলিল—তোমার মার কাছে চলো—বলিয়া অনিলের হাত ধরিয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল। আগন্তুক একটু কুণ্ঠিত ভাবে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিয়া ফেলিলেন "আপনারা কি এখন মাদুরায় থাকবেন?" শান্তি দাঁড়াইয়া বলিল, তাতো বলতে পারি না, বোধ হয় থাকা হবে। কলকেতায় এখন খুব প্লেগ হচ্চে কিনা, বাবা তাই এখন আমাদের নিয়ে যাবেন না, তিনি সেইখানেই আছেন।" মনের দুঃখটা হঠাৎ অনিচ্ছাসত্বেও সে প্রকাশ করিয়া ফেলিল। আগন্তক দেখিলেন বালিকার চোখ দুটি ছল ছল করিতেছে। সান্ত্বনা দিয়া কহিলেন 'ছোট ছেলেদের জন্যই

প্লেগে ভয় বেশি কিনা, তাঁর জন্য কিছু ভয় নাই। আপনাদের বাড়ি বুঝি কলকাতায়? আপনার বাবা বুঝি সেখানে চাকরি করেন তাই আসতে পারেন নি?" "বাবাতো চাকরি করেন না, তিনি তো উকিল ইচ্ছা করিলেই আসতে পারতেন। বাবাকে ছেড়ে আমরা থাকতে পারি না, বড্ড কষ্ট হয়।"

"উকিল! ওঃ, তাঁর নাম কি?" "শ্রীযুক্ত বাবু রজনীনাথ মৈত্র" "কি, কি বল্লেন?" শান্তি তাহার নব পরিচিতের অদ্ভুত আগ্রহের স্বরে বিস্মিত না হইয়া থাকিতে পারিল না। পুনর্ব্বার বলিল "শ্রীযুক্ত রজনীনাথ মৈত্র।" আগন্তুক একটা ক্ষুদ্র নিশ্বাস ফেলিয়া মৃদুস্বরে কহিলেন "আপনি রজনী বাবুর মেয়ে! কোন রজনী বাবু—হাইকোর্টের উকিল তো?"

শান্তির ভারি কৌতূহল জন্মিল, আনন্দও হইল, সে বিস্ময়ে নেত্রদ্বয় বিস্তার করিয়া প্রশ্ন করিল 'আপনি বাবাকে চেনেন না কি? আপনার বাড়িও বুঝি কলকাতায়?' "হাঁ, না তানয় চিনি, নাম শুনেছি মাত্র, তেমন কিছু চিনি না" একটু দমিয়া গিয়া সে সংক্ষেপে শুধু বলিল, "ওঃ।" আগন্তুক আবার একটা চাপা নিশ্বাস ফেলিলেন "রজনী বাবুর বড় মেয়ে বুঝি যোগেনের স্ত্রী?"

শান্তির কর্ণমূল পর্য্যন্ত লাল হইয়া উঠিল, সে আঁচলখানা মুখের কাছ পর্য্যন্ত তুলিয়া কি ভাবিয়া আবার সেই লজ্জিত ভাবটা সামলাইয়া লইল, মৃদুস্বরে উত্তর করিল 'আমিই তাঁর বড় মেয়ে! যোগেন বাবুর স্ত্রী আমার মামাতো বোন! আমার সুধু একটি ভাই আছে বোন নাই' বলিয়া এবার সে অনিলের হাত ধরিয়া বাড়ির দিকে অগ্রসর হইল, আগন্তুক আর কোন প্রশ্ন করিলেন না।

(১১)

বৈশাখী পূর্ণিমায় মাদুরার বসন্তমণ্ডপ-মন্দিরে ভারি উৎসব হয়। সেদিন মাদুরায় বড় ধূম। সুন্দরলিঙ্গ মহাদেবের বসন্তোৎ-সবের আজ শেষ দিন, সেই জন্য ভিড়ও অস্বাভাবিক হইয়াছিল। মণ্ডপমধ্যে পয়ঃ-প্রণালী সকল গন্ধবারিতে পরিপূর্ণ। প্রস্তর-স্তম্ভে তিরুমল ও তৎপূর্ব্ব নয় পুরুষের সস্ত্রীক খোদিত মূর্ত্তির উপরে সুন্দর আকারে গ্রথিত পুষ্পমাল্য দোদুল্যমান, দেবালয়ের প্রসিদ্ধ মহামূল্য আসবাবপত্র সকল সংস্কৃত ও পরিস্কৃত হইয়াছে। সৌন্দর্য্যে ও ঐশ্বর্য্যে বসন্ত মণ্ডপ কয়দিন অমরাবতীর শোভা ধরিয়াছিল। কয়দিন শান্তির মাতা বসুমতীর অম্বলের ব্যথা ধরায় তাঁহারা বসন্তউৎসব দেখিতে আসিতে পারেন নাই, কিন্তু চিরপ্রসিদ্ধ এমন উৎসবটা দেখিবার লোভ ছাড়িতে না পারিয়া একটুখানি সারিতে না সারিতে তিনি কাহারো নিষেধ না মানিয়া বাহির হইয়া পড়িয়াছেন। প্রথমে শিবতীর্থের জল স্পর্শ করিয়া দেবদর্শনে যাইতে হয়, পুষ্করিণীর নিকটে আসিয়া যোগেন্দ্রের স্ত্রী মণিমালা ও শান্তি দুজনে ধরিয়া বসিল তাহারা এইখানে স্নান করিবে। দেখাদেখি অনিলও আব্দার ধরিল। যোগেন্দ্রনাথ সকলকে এক একটা ধমক দিলেন "এমন করে যদি জ্বালাতন করো তাহলে এইখান থেকেই বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে যাবো বলে রাখছি। দেখুন দেখি পিসিমা এদের অন্যায় আব্দার!"

পিসিমা মৃদু হাসিয়া ভ্রাতৃজামাতার অভি-

যোগের বিরুদ্ধে কেবলমাত্র বলিলেন "ওরা পাগল ওদের কথা শোন কেন!"

মীনাক্ষিদেবী দর্শন ও সুন্দরলিঙ্গের উৎসব সমারোহ দর্শনান্তর পূজাদি সারিয়া ললাটে শ্বেত চন্দন ও বিভূতি চিহ্ন ধারণ করিয়া অনেক কষ্টে ভিড় ঠেলিয়া যোগেন্দ্র যখন মেয়েদের ফাঁকা জায়গায় আনিয়া দাঁড় করাইতে পারিল, তখন হঠাৎ মৈত্রগৃহিনীর বুকের বেদনাটা অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিয়াছে। কিন্তু হিন্দুর মেয়েরা এতোটুকু শক্তি থাকিতে পুণ্যের লোভ দমন করিতে পারে না তিনি সে যন্ত্রণাটা চাপিয়া লইয়া সহস্র স্তম্ভ মণ্ডপ দেখিতে চলিলেন।

আর্য্য নায়কের অপূর্ব্ব কীর্ত্তি সহস্র স্তম্ভ মণ্ডপের এখনও ৯৯৭টি স্তম্ভ প্রায় অক্ষত আছে। ইহার নির্ম্মাণকৌশল চিত্রচাতুর্য্য অসাধারণ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ভারতের সর্ব্বত্র প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য মহান কীর্ত্তি এখনও তাহার বিগত গরিমার সাক্ষ্য দিতেছে।

তেপ্পমকুলম্ বা টেপ্পা ট্যাঙ্ক একটি বৃহৎ পুষ্করিণী, ইহার প্রত্যেক দিক ১২০০ গজ লম্বা—চারিদিকে উত্তম গ্রেনাইট প্রস্তরের সোপান এবং সর্ব্বোপরি এক গ্রেনাইট প্রস্তরের কলস। স্থানে স্থানে দেব ঘোটক, ময়ূর এবং অন্যান্য পশুমূর্ত্তি সুশোভিত। কলসের মধ্যদিকে বেড়াইবার একটি প্রশস্ত রাস্তা আছে তথায় সন্ধ্যাকালে অনেক লোক বায়ু সেবনার্থ গমন করে। পুষ্করিণীর মধ্যস্থলে একটি উপদ্বীপ আছে সেই উপদ্বীপের চতুর্দ্দিক প্রস্তর দ্বারা বাঁধানো, ইহার মধ্যস্থলে দ্বিমহল দেবালয় ও চারিদিকে কারুকার্য্য বিশিষ্ট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেবমন্দির। মধ্যস্থলে পথ এবং পথের দুই ধার নানাবর্ণের লতাগুল্ম পত্র পুষ্প দ্বারা সুশোভিত। কয়দিন পূর্ব্বে দেবালয়ের চারিদিক এক লক্ষ বাতি দ্বারা সাজান হইয়াছিল এবং সেদিন মীনাক্ষিদেবীর সহিত সুন্দর লিঙ্গ মহাদেব এখানে আনীত হইয়া সন্ধ্যাকালে মহাসমারোহের সহিত তেপ্পনে চড়িয়া দ্বীপের চারিদিক ভ্রমণ করিয়াছিলেন। যোগেন্দ্রের সহিত ছেলেমেয়েরা সেদিন উৎসব দেখিতে আসিয়াছিল, বসুমতী অসুস্থতার জন্য আসিতে পারেন নাই।

অদ্য মার্ব্বেল ও কষ্টি পাথরে মিলাইয়া গাঁথা প্রাচীরের ধারে বেড়াইতে বেড়াইতে বসুমতী হঠাৎ বসিয়া পড়িলেন। শান্তি তাড়াতাড়ি মার কাছে ছুটিয়া আসিল 'অসুখ করেছে বুঝি মা?' সুকু, সুকু শিগ্‌গির যোগেন বাবুকে ডাক। বলাই শিগ্‌গির গাড়ি আনতে বলো।" যোগেন্দ্রনাথ একটু দূরে দাঁড়াইয়া একটি সহসাদৃষ্ট বন্ধুর সহিত গল্প করিতেছিল। পিস্‌শাশুড়ির অসুখের সংবাদে ভারি ব্যস্ত হইয়া ছুটিবার উপক্রম করিল। বন্ধু তাহার হাত ধরিয়া বাধা দিলেন "শোন, শোন তোমার পিসশাশুড়ির অসুখ তাঁকে এ রোদে আবার এতোটা পথ না নিয়ে গিয়ে এখন কেন আমার বাসাতেই নিয়ে চলো না? তোমার বাড়ি তো আর এ মুল্লুকে নয়! গরমে অসুখ আরো বেড়ে যেতে পারে।"

যোগেন্দ্র কহিল 'তা মন্দ কথা কি, কিন্তু তিনি কি রাজি হবেন? আমার বাসাতেই বেশীদিন থাকতে সম্মত হন না, আচ্ছা বলে দেখি কি বলেন।"

"তবে আমি গাড়িটা এখানে আনাই, তুমি একটু বুঝিয়ে বলোগে।" "বসুমতী প্রথমে

কিছুতেই সম্মত হইলেন না, শান্তি জেদ করিতে লাগিল, "বিপদের সময় কারু কাছে সাহায্য নিতে অপমান নাই মা, বাবা বলেন সকলকেই আপনার মতন করে নিতে হয়। চলো আমরা ঐখানেই একটু জিরিয়ে নিই।"

কিন্তু ধনীর গৃহিণী বসুমতী নিজের মান-মর্য্যাদার প্রতি যথেষ্টই প্রখর দৃষ্টি রাখিয়া চলেন। জামাই বাড়ি উঠিয়াই তিনি কতকটা ছোট হইয়া পড়িয়াছেন ভাবিতেছিলেন, তাহার উপর আমার জামাতা যদি তাঁহাকে এমন করিয়া রামী শ্যামী পাঁচজনের বাড়ি বাড়ি ঘুরাইয়া লইয়া ফিরে তাহা হইলে তো তাঁহার এখানে তিষ্ঠানো দায় হইয়া উঠে। যোগেন্দ্র বন্ধুকে গিয়া বলিল "না ভাই, তিনি সম্মত হলেন না। গাড়িটা এনেছে, ওরে বলাই ওঁদের সঙ্গে করে এনে গাড়িতে তুলে দে।

বলাই ফিরিয়া আসিয়া বলিল "মার ব্যথাটা বড্ড বেড়ে উঠেছে, দিদি বল্লে একটু ঠাণ্ডা জল কোথাও থেকে আনিয়ে দিন, একটু ঠাণ্ডা হয়ে তখন আসবেন।"

"দেখোদেখি অন্যায়! মেয়েরা সব কষ্ট সহ্য করবে তবু নিজেদের জেদ ছাড়তে পারবে না।" যোগেন্দ্র জলের যোগাড়ে চলিয়া গেলে যোগেন্দ্রের বন্ধু বসুমতীর দাসীকে ডাকাইয়া তাহার দ্বারা তাঁহাকে বলাইলেন "আমি সন্তান তুল্য আমার বাড়িতে যদি মা একবার পায়ের ধূলা না দেন তাহা হইলে আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইব।" ইহার পর বসুমতী আর আপত্তি করিতে পারিলেন না; বিশেষ শরীরও আর শ্রান্তি সহ্য করিতে সক্ষম হইতে ছিল না। কন্যা ও ভ্রাতুষ্কন্যাকে বলিলেন—"তবে বলো। বিদেশে যখন বেরিয়েছি তখন মানসম্ভ্রম আর রইলো না!" মোক্ষদা বলিল "অদিদিমনি দাঁড়াও আগে জামাই বাবুকে ডেকে নে আসি। ওমা, ঐগো, ঐবাবুটি, ঐযে নারকেল গাছগুলোর কাছে দাঁড়িয়ে আছে। ঐযে দেখতে পাচ্চো না, ছাতা মাথায় গরদের জামা গায়ে সুন্দর হেন লোকটি। চেহারা খানি যেন রাজার জামায়ের মতন দিব্যি বাবু।"

মোক্ষদার নির্দ্দিষ্ট লোকটিকে দেখিয়া শান্তি ঈষৎ আনন্দধ্বনি করিয়া উঠিল "ওমা ওযে মিঃ রায়! সেদিন যোগেনবাবুকে ওঁরি কথা জিজ্ঞেস করছিলেম, উনি বাবাকে জানেন। বসুমতী বার বার করিয়া অপরিচিতকে দেখিতে লাগিলেন। তাহাকে যেন কোথায় দেখিয়াছেন বলিয়া মনে হইতে লাগিল, কিন্তু স্পষ্ট মনে পড়িল না।

মিঃ রায়ের বাসাটি বেশ একটু উচ্চজমীর উপরে এবং নির্জ্জন স্থানে। একটি সুরম্য ছোট রকম বাগানের মধ্যে বেশ একটি পরিচ্ছন্ন ক্ষুদ্র বাংলো। বাড়িতে তিনি একা —অল্প কয়টি ঘরেই বেশ সঙ্কুলান হইয়া গিয়াছে। মাজের ড্রইং রুমটি বেশ পরিপাটিরূপে সাজান। দুই পাশে দুইটি ঘর, একটি শয়ন গৃহ ও অন্যটি বসিবার ঘর রূপে ব্যবহৃত হইত। সব ঘরগুলিতেই গৃহস্বামীর সৌখিনত্ব ও স্বদেশ অনুরাগের চিহ্ন বিদ্যমান। টেবিলক্লথ, পর্দ্দা, বিছানা হইতে ফটোগ্রাফের ফ্রেমটি ও দোয়াত কলম নিবটি পর্য্যন্ত সমস্ত দেশী। নিতান্ত আবশ্যকীয় ভিন্ন কোন জিনিষ তিনি বিদেশী ব্যবহার করিতেন না।

মিঃ রায়ের গৃহে আসিয়া কোন বিষয়েই তাঁহাদের সম্মান আতিথ্যের ত্রুটি হইল না।

দ্বিপ্রহরে রৌদ্রের সময় বসুমতীর সেই বেদনাটা আরো বাড়িয়া গেল। যোগেন্দ্রনাথ মহা চিন্তাগ্রস্ত হইয়া পড়িলেন। নিকটে ডাক্তার পাওয়া যায় না। মিষ্টার রায় একজন হোমিওপ্যাথ ডাক্তার; অগত্যা তাঁহার চিকিৎসাই আরম্ভ হইল।

শয়ন কক্ষে বসুমতী গায়ে চাদর ঢাকা দিয়া শয়ন করিয়াছিলেন। শান্তি পাখা লইয়া মাথায় আস্তে আস্তে বাতাস দিতেছে, এবং মোক্ষদাদাসী বুকে তেল মালিস করা বন্ধ করিয়া তৈলশিক্ত হাতে বসিয়া আছে। গৃহস্বামী জুতা খুলিয়া ধীরে ধীরে গৃহে প্রবেশ করিয়া ভূমে মাথা ঠেকাইয়া মৈত্র গৃহিণীকে সসম্ভ্রমে প্রণাম করিলেন, বলিলেন "আমি আপনার সন্তান, আমায় দেখে আপনি এমন ব্যস্ত হচ্চেন কেন মা?"

অবগুণ্ঠনের মধ্য হইতে বসুমতী তাঁহার মিষ্টভাষী আতিথ্যকারীর প্রতি চাহিয়া দেখিলেন, কি সুন্দর মুখখানি! কথাগুলিতেও যেন কান জুড়াইয়া যায়! তাঁহার বাড়ি বাধ্য হইয়া আসিয়া পড়ায় যে বিরক্তি জন্মিয়াছিল, তাহা সেই মুহূর্ত্তে অনেক কমিয়া গেল।

ডাক্তার রোগীকে দেখিয়া বলিলেন, "দুটো ওষুধ দিয়ে যাচ্চি এক ঘণ্টা অন্তর বদলে বদলে দিতে হবে। মালিসের ওষুধ একটা আনতে পাঠাই, এলে পরে বুকে মালিস করাবেন।" বসুমতী ব্যস্ত হইয়া শান্তিকে দিয়া বলাইলেন "নানা, ওষুধ আর আনাতে হবে না, সে সব বাড়ি গিয়ে করলেই হবে। বেলা হয়ে গিয়েছে আপনি আমাদের গাড়ির বন্দোবস্ত করে দিন।" মিঃ রায় একটু হাসিয়া কহিলেন, "মা ছেলের কাছ থেকে জামায়ের কাছে যেতে এতো উৎসুক হচ্চেন কেন? দাবিটা তো আমারি বেশি! রৌদ্রটা পড়ে গেলে আমি নিজেই আপনাকে পৌঁছে দিয়া আসব; এখন একটু বিশ্রাম করে নিন। সুপ্রকাশ বাবু! আমার সঙ্গে এসোতো।"

সুপ্রকাশ ঔষধ আনিয়া দিয়া আবার মিঃ রায়ের কাছে ফিরিয়া গেল। তাঁহার বন্দুকের বাক্সটা ও ব্যাটগুলার উপর অনেকক্ষণ ধরিয়াই তাহার লুব্ধদৃষ্টি ঘুরিতেছিল। ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই তাঁহাদের পরস্পরের ভিতরে বেশ পরিচয় হইয়া গেল। এ বিষয়ে কেহই অসমকক্ষ ছিল না, বিশেষতঃ যখন উড্ডীয়মান পাখীটি তাঁহার একটি অব্যর্থ গুলি ভক্ষণ করিয়া নিঃশব্দে মাটিতে শুইয়া পড়িল, তখন খুকুর আর কৌতুকের সীমা রহিল না। সে লুণ্ঠিত মস্তক বিস্তারিতপক্ষ গতপ্রাণ জীবটিকে ছুটি ডানা ধরিয়া উঠাইল, সাগ্রহে তাহাকে দেখিতে দেখিতে তাহার হন্তাকে জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা না মেরে ফেলে কি পাখী বেঁধা যায় না? তাহলে দিদি পুষতো!" তারপর হঠাৎ পাখীটা ফেলিয়া সাগ্রহে তাঁহার বন্দুকটা ধরিয়া টানাটানি আরম্ভ করিয়া দিল "আমায় বন্দুক ছুঁড়তে শিখিয়ে দিন না, আমি একটা পাখী মারবো" মিষ্টার রায় শশব্যস্তে বন্দুকটা তাহার হাত হইতে কাড়িয়া লইলেন "তুমি যে ছেলে মানুষ, তুমি তো এ বন্দুক ধরতে পার্ব্বে না, তোমায় একটা মান্দ্রাজ থেকে এয়ার গান্ আনিয়ে দেওয়া যাবে, কি বলো? সরে এসো, ঠিক আমার পাশে থেকো, ঐ দেখো একটা পাখী উড়ে যাচ্চে, ঐটের উপরে তাক্ করতে হবে, ঐ পড়েছে।" সুপ্রকাশ ছুটিয়া শিকার করা পাখীটি কুড়াইয়া আনিতে গেল। এমন

করিয়া অনেকগুলি নিরীহ প্রাণীর প্রাণ হরণ করিতে করিতে দুইটি অসমবয়স্ক ব্যক্তির মধ্যে বন্ধুত্বের বন্ধন সৃজিত হইল।

ঘণ্টা দুই পরে উভয়ে যখন বাংলা ঘরের মধ্যে ফিরিয়া আসিবেন, তখন যোগেন্দ্রের দিবা নিদ্রা ভাঙ্গিয়াছে, সে গৃহস্বামীর পাঠাগারে ছোট টেবিলের সম্মুখস্থ কেদারাখানা দখল করিয়া বসিয়া অপ্রসন্ন মুখে চা পান করিতে করিতে গত কল্যকার বেঙ্গলী কাগজখানা উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিতেছিল। তাহারা প্রবেশ করিতে মুখ ফিরাইয়া একটু হাসিল "কিহে নূতন বন্ধু পেয়েছ বলে কি পুরাতনের প্রতি এমনই নির্দ্দয় হতে হয়? কৃতজ্ঞ বটে!"

মিষ্টার রায় হাসিতে হাসিতে বলিলেন "নূতন পেলে কে আর পুরাতনের স্মৃতি জাগিয়ে বসে থাকে?

তোমার পিসিমা এখন আছেন কেমন?"

"ভাল। বলছেন তোমার খাঁটি জল নাকি খাঁটি দুধের চেয়েও উপকারী। এ তৃষ্ণার দিনে যে জলটা উপাদেয় তাতে যদিও সন্দেহ নাই, তবে ভোজটা যদি একটু বড় হতো।"

সুপ্রকাশ তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, 'হোমিওপ্যাথি ওষুধ তো আমরা সেখানে খাই। চুণিবাবু বিধু বাবু আমাদের বেশ মিষ্টি মিষ্টি ওষুধ দেন, কবিরাজ মহাশয়ের ওষুধ কিন্তু একটুও ভাল না। মিঃ রায় চা খাইয়া লইয়া উঠিয়া বলিলেন "এসো সুপ্রকাশ মাকে একবার দেখে আসি।" অভ্যাস নাই বলিয়া সুপ্রকাশ চা পান করিল না।

বাহিরে আসিতেই শুনিতে পাওয়া গেল মোক্ষদা দাসী বলিতেছে "ওমা, এ যে তোমার অন্যায় কান্না দিদিমণি! এদের বাড়ীর বাবু পাখী মেরেছেন, তাতে তুমি যে কেঁদে একেবারে হাট বাধালে! ছি চুপ করো, তিনি জানতে পারলে কি মনে করবেন বলো দেখি?"

বসুমতী বলিলেন "তোরই বা বাছা ও মরা পাখীগুলো আমাদের সামনে আনবারই বা কি দরকার ছিল? আহা কি সুন্দর পাখীগুলি, কান্নাই তো পায়।"

সহসা বিজয়ীর বিজয় আনন্দ গভীর অনুতাপের লজ্জায় পর্য্যবসিত হইয়া গেল। একখানা অন্তরালবর্ত্তী বেদনাক্লিষ্ট মুখের ছায়া কল্পনানেত্রে ভাসিয়া উঠিয়া বুকের মধ্যে চলন্ত রক্তস্রোতে ঢুম্ করিয়া একটা ধাক্কা লাগিল। হঠাৎ সুপ্রকাশের সহিত মিঃ রায়কে প্রবেশ করিতে দেখিয়া শান্তি চোখ মুছিতে মুছিতে পলাইয়া গেল।

ভারতে চিত্র-কথা।

অজন্তার গুহাগুলি রাস্তার ধারে সাজানো বাড়ীর মত দেখিতে। ভারতের অন্যান্য গুহাগুলি অনেক স্থলে অসম্পূর্ণ; কিন্তু অজন্তা সেরূপ নয়। অজন্তা বেশ সুসম্পাদিত। ছবিগুলি, অনেক যায়গায় দেওয়ালের উপরে যতদূর হাত যায়, ততদূর পর্য্যন্ত আঁকা হইয়াছে।

এসিয়াটীক সোসাইটীর মাসিক পত্রে (1836. p.p.561) একবার আক্ষেপ করিয়া লিখিত হইয়াছিল,

"ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়, যে, আমাদের উরপীয় ভ্রমণকারীগণ, অজন্তার ছবিগুলি নানাবিধ অত্যাচার ও অযত্নে বিধ্বংস ও বিলুপ্ত হইবার আগে, একবার এখানে আগমন করেন না।"

আজ ষষ্টিবৎসরাধিক কাল গত হইল, এই নিবেদন বা কাতরুক্তি প্রকাশিত হইয়াছিল। লেখকের প্রার্থনা আংশিকভাবে পূর্ণ হইয়াছে। কারণ, মিঃ গ্রীফিথ সদলবলে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিয়োজিত হইয়া, অজন্তায় গমনপূর্ব্বক, অনেক উৎকৃষ্ট চিত্রকে ধ্বংসমুখ হইতে রক্ষা করিয়াছেন।

অজন্তায় অনেক চিত্র আছে। আমরা তাহার মধ্য হইতে কতকগুলির পরিচয় প্রদান করিব।

অজন্তাচিত্রাবলী নানাশ্রেণীর। কোথাও গগনবিহারী বৃহদন্ত রাক্ষস রাক্ষসী, গন্দর্ভ; তাহাদের নিম্নার্দ্ধ পক্ষীবৎ। কোথাও কিন্নর; তাহাদের অধোভাগ মানুষের মত, কিন্তু মুখ অশ্ববৎ। কোথাও চঞ্চলদৃষ্টি মৃগযূথ দ্রুত-ধাবমান, কোথাও আম্র-আনারস প্রভৃতি ফলাদি অঙ্কিত এবং কোথাও বা হস্তী, মহিষ ও পারাবত প্রভৃতি জন্তু ও পাখীর ছবি আঁকা। *

প্রথম গহ্বরে, এক জায়গায় একটী শ্মশ্রু-বহুল পুরুষ একখানি আসনের উপরে বসিয়া, আহার করিতেছেন। তাঁহার মাথায় একটী টুপী। জামার হাতা আজকালকার চুড়ি-দারের মত। ছবির দুই পাশে দুইটী রমণী,—বোধ হয় পরিচারিকা। তাহারা দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। তাহাদের একজনের হাতে পানীয় সলিলপূর্ণ পাত্র এবং অপরের হাতে অনেকটা হুকার মত একটী পাত্র। সম্মুখে, কক্ষতলে, আর দুইজন শ্মশ্রুগুম্ফধারী পুরুষ উপবিষ্ট। তাহাদের একজনের করে আহার্য্যপূর্ণ পাত্র। আসনোপরি উপবিষ্ট, প্রধান মূর্ত্তির দক্ষিণ পাশে আর একজন ক্ষৌরিত লোক বসিয়া রহিয়াছে। তাহার ডান হাতখানি প্রধান মূর্ত্তিটীর কাঁধের উপরে রক্ষিত। লোকটী বামহাতের অঙ্গুলীসংকেতে কি বলিতেছে।

অন্য একখানি ছবিতে দুইটী রমণীর মূর্ত্তি আঁকা। বামদিকের মূর্ত্তিটীর মুখের ভাব,—কি চমৎকার! কত আকুলিবিকুলি মাখা এবং কত ভাববৈচিত্র্যময়! কানে ভারি কুণ্ডল, সুগঠিত ললাটের উপরে একটী চূড়াকৃতি রত্নালঙ্কার। রচিতবেণী কবরীতে পুষ্প বা অলঙ্কার অর্পিত। অলকরাশির কতকাংশ কবরীমুক্ত হইয়া, শ্রবণের দুই পাশ দিয়া গ্রীবার উপরে লুটাইতেছে। উভয়-কর-ধৃত একটী কুসুমনির্ম্মিত দ্রব্য। পার্শ্বে ঈষদানতআননা, শিথিলকেশী, তরলিত-রত্নহারা, নানালঙ্কারখচিতা অপর এক তন্বঙ্গী। রমণীর পয়োধরদ্বয় বড়ই অস্বাভাবিকরূপে আঁকা হইয়াছে। (Vide Journal of Indian Art. No 61,—1900.)

একস্থানে একজন নাগরাজা, ডান-দিকে একটু হেলিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। দক্ষিণ বাহু মনোহর ভঙ্গীতে লম্ববান এবং বামবাহু কোমরের উপরে স্থাপিত। কাপড়খানি

---

* অজন্তাগুহাচিত্রাবলীর ভিতরে অনেকগুলিই বুদ্ধজীবন সংক্রান্ত। এই সমস্ত ছবির তলায় আবার অনেক শ্লোক লিখিত আছে। সপ্তদশ গুহার একটি চিত্রে "MAITRIBAIAJTKA"র—৪৪ শ্লোকটি উদ্ধৃত হইয়াছে।

ডোরাকাটা,—হাঁটুর উপরে উঠিয়াছে ও মালকোঁচা মারিয়া পরা। গলায় মালা। হাতে অনেকগুলি গহনা আছে। তাঁহার রাজমহিমা প্রকাশক মহামূল্য বেশ নাই,—কিন্তু শিরোপরি একটি মুকুট! পিছনে আটটি সাপ ফণা তুলিয়া রহিয়াছে। দীর্ঘ কেশ-পাশ। বামদিকে মুখ ফিরানো,—দৃষ্টি অর্দ্ধনিমীলিত। দৈহিক অন্যান্য স্থান বেশ নিপুণতার সহিত অঙ্কিত। কেবল দক্ষিণ চরণটি ঠিক আঁকা হয় নাই।

সপ্তদশ গুহায় দুইটী গরুড় মূর্ত্তি আছে। একটীর আকৃতি কতক পারাবত ও কতক কুক্কুটের মত। হাত দুটি একেবারে মানুষের মত দেখিতে। এক হাতে করিয়া লতার মত কি একটা জিনিস খাইতেছে। মাথায় একটী ঝুঁটী। ওষ্ঠের স্থানে চঞ্চু। অন্য মূর্ত্তিটির কল্পনা বড়ই অদ্ভুত! বুক, হাত, পা ঠিক মানুষের মত। উদরের স্থানে একটী চাকা মুখ। সূর্য্যের চোখ মুখ নাক করিয়া দিলে, যেমন দেখিতে হয়,—তেমনি! তাহার নীচে বর্ত্তুল উদর। পিছনে লাঙ্গুল। কাঁধের উপরে একটা ঢাকনা-চাপা পাত্র। একহাতে পাত্রটী ধরিয়া আছে। অন্য হাতে লতার মত একটী জিনিষ। (Buddhist Art in India, By James Burgess.) আর এক যায়গায় একটী পুরুষ ও কয়েকটী রমণী গান বাজনা করিতেছেন। পুরুষটী ঢোল এবং সুন্দরীরা চাঁপা-কলির মত ছোট ছোট আঙ্গুলে খঞ্জনী লইয়া বাজাইতেছেন। খঞ্জনীর মৃদু রিঞ্জিনি যেন শ্রবণে আসিয়া পশে! কবরীগুলি এলাইয়া পড়িয়াছে। শিথিলবসনাঞ্চল বসুধাপৃষ্ঠে লুণ্ঠিত।

একস্থানে একদল হাতী ও একদল মানুষ যাইতেছে। একটি হাতীর শুঁড়ে ও পায়ে শক্ত করিয়া দড়ী বাঁধা—সেটি বুঝি কিছু দুরন্ত! একটী লোক হস্তী-শুণ্ডে বল্লমাগ্রভাগ দিয়া আঘাত করিতেছে। তাহার আগে পিছে দুইজন ঘোড়-সওয়ার। পিছনের সওয়ারটীর গাত্রবস্ত্র অনেকটা মেরজাইএর মত ও হাতা অবিকল চুড়িদারের ন্যায়। চিত্রের পশ্চাৎ-দৃশ্যে একটী প্রাচীর অঙ্কিত হইয়াছে। সর্ব্বশেষে একটী অপেক্ষাকৃত সজ্জিত অশ্বের উপরে একজন রাজকুমার উপবিষ্ট। তাঁহার সঙ্গে শস্ত্রধারী সৈনিক। একজন তাঁহার মাথার উপরে একটী লম্বা ছাতা তুলিয়া ধরিয়াছে।

অন্য একখানি ছবিতে, একজন কুঠার বল্লমধারী ঘোড়-সওয়ার। মাড়ওয়াড়ি স্ত্রীলোকেরা যে রকম আঙ্গিয়া এবং মুসলমান রমণীরা, 'নিমা' বলিয়া যেরূপ ছোট জামা পরেন,—তাহার অঙ্গে অনেকটা সেই-রকম একটী অঙ্গচ্ছদ। ঘোড়াটীর সাজ,—জৈনেরা উৎসবের সময়ে অশ্বের যেরূপ সজ্জা দেন,—সেইরূপ। (Dr. J. Muires account of a journey from Agra to Bombay in 1854.)

অপর একস্থানে দুইটি মহিষ ও দুইটি বানর রহিয়াছে। একটি মহিষের সম্মুখে ভূতলে একটা বানর ভয়কাতরভাবে বসিয়া রহিয়াছে। আর একটা বানর অন্য মহিষটীর পিঠের উপরে চড়িয়া, দুই হাতে তাহার দুই চোখ ঢাকিয়া আছে। সেই অবস্থায়, মহিষটীর ক্রোধসূচক অঙ্গভঙ্গী বড় চমৎকার হইয়াছে।

দ্বিতীয় গহ্বরের একটি ছবিতে, একজন লোক, দুই হাতে এক শাঁখ ধরিয়া, গাল ফুলাইয়া বাজাইতেছে। হাত দুটী খুবই উঁচু হইয়াছে;—কিন্তু তাহাতে দুই গাছি শ্লথবলয় রহিয়াছে,—নামিয়া পড়ে নাই। এরূপ অবস্থায়, বলয় দুটী, হস্তের নিম্নাংশে থাকা উচিত,—কিন্তু শিল্পীর সে খেয়াল হয় নাই।

এক যায়গায় দুটী নেকড়ে বাঘ আঁকা। একটি মৃত্তিকা হইতে হেঁটমুণ্ডে আঘ্রাণ লইতেছে এবং আর একটি পিছনদিকে মুখ ফিরাইয়া কি দেখিতেছে!

অন্য একস্থানে, একটি দ্রংষ্টাকরাল ভল্লুক, একটি গুম্ফধারী যুবককে দুই জানু ও উপরের দুই পা দিয়া চাপিয়া বসিয়া আছে!

দক্ষিণ দিকের দেওয়াল হস্তী ও মনুষ্যের চিত্রে পূর্ণ। তাহার ভিতরে একটী হাতির ছয়টি দাঁত আছে! (Speine's life in Ancient India p. p. 266.)

দক্ষিণে একটী দেওয়াল আঁকা। তাহার উপরে ময়ূরের দল। নিম্নে রাজা ও রাণী বসিয়া আছেন।

একস্থানে তিনটি লোক অস্ত্র শস্ত্র লইয়া, নানারূপ ভঙ্গীতে ছুটিতেছে। তাহাদের ভিতরে, দুইজনের দীর্ঘ কেশ আছে। পরিধানে কৌপীনবৎ একখণ্ড কাপড়। তৃতীয় লোকটির মাথায় লম্বা চুল নাই,—গায়ে জামা আছে।

যে সকল চিত্র পরিচয় দিলাম,—যদিও, অজন্তার বহুসংখ্যক চিত্রের মধ্যে সংখ্যায় তাহা সামান্য—তথাপি ইহা হইতেই, সম্ভবতঃ সকলেই অজন্তাচিত্রের দোষ ও গুণের বিষয় বিবেচনা করিতে পারিবেন।

অজন্তাচিত্রের বিশালতা ও সৌন্দর্য্যের সম্যক পরিচয় প্রদান করা, এই সামান্য প্রবন্ধে সম্ভবে না। অজন্তাচিত্র যে সৌন্দর্য্যাভিব্যক্তির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন, তাহা, তত্ত্বজ্ঞমাত্রেই একমতে স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

পণ্ডিত ফারগুসন বলেন :—

"প্রত্যেক বৌদ্ধগুহাই যে এককালে চিত্রবিভূষিত ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই ধ্বংসধর্ম্মী কালকর্তৃক ঐ সকল চিত্র নিঃশেষে বিনষ্ট।"

লাহোরের চিত্রালয়েও অনেকগুলি হিন্দু-লিখিত আলেখ্য রক্ষিত আছে। ঐ সকল চিত্রে,—কোনখানিতে, শ্রীরাধিকা সুন্দরী একান্তে উপবিষ্টা এবং শ্রীকৃষ্ণ গবাক্ষপথ দিয়া, প্রাণতমার পূর্ণযৌবনের শোভনশ্রী অতৃপ্ত নয়নে দর্শন করিতেছেন।

কোনখানিতে ধবলতুষারময় কৈলাস; তথায় বিশ্বমাতা শিবরমা গণপতির সহিত দণ্ডায়মানা; একদিকে পত্রশ্যাম কুসুমিত বনস্পতি-বিরাজিত উপবন এবং অপর দিকে হরজটাচ্যুতা জাহ্নবী প্রবহমানা।

আবার কোনখানিতে, যথাযথ স্বভাবানুকারী পুষ্পিতা বল্লরীর ছবি।

লাহোরের সেনট্রাল মিউজিয়মের একটি কক্ষে মহারাজ রণজিত সিংহের সমকালবর্ত্তী উচ্চপদস্থ মাননীয় ব্যক্তিগণের এবং রাজকুমারীদের প্রতিমূর্ত্তি রক্ষিত আছে। ঐ সকল চিত্র, হিন্দু-শিল্পী কর্ত্তৃক অঙ্কিত। মীউজীয়মের অপর একটি কক্ষে, কাশ্মীরের রঞ্জিত চিত্রাঙ্কিত কলমদান প্রভৃতি নানাবিধ কাষ্ঠ-দ্রব্য রক্ষিত আছে। জলীয় রং দিয়া আঁকা ও সুনির্ম্মিত—ঐ সকল কাষ্ঠদ্রব্যাদি দর্শকগণের সাগ্রহ দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

(Lahore : Its History, Architectural Remains and Antiquities. By Syad Muhammad Latif. p.p. 356 and 358.)

ব্রহ্মদেশে, প্যাগানের (pagan) উত্তর দিকে, ইরাবতী নদীর তটে, কৈকয়োঙ্কুওনমীন (Kyankuionmin) নামধেয় একটী সুপ্রতিষ্ঠ বৌদ্ধগুহা দেখিতে পাওয়া যায়। উচ্চভূমির উপরে একটী তীর্থস্থান আছে। তাহার নাম জাতসোক (Yatsuk) মন্দির। ঐ মন্দিরের বামদিকের দেওয়ালে, একটী ভিত্তিচিত্র অঙ্কিত আছে। ঐ চিত্রে কেবলমাত্র সাদা ও কালো রং ব্যবহার করা হইয়াছে। চিত্রগুলি চতুষ্কোণ রেখা দ্বারা ভাগ করা হইয়াছে।

যতদূর বোঝা যায় তাহাতে বোধ হয়—ছবিগুলি জাতকের গল্প অবলম্বনে অঙ্কিত। চিত্রসমূদয়ের নিম্নে কতকগুলি করিয়া অক্ষর আছে। আলোচনার দ্বারা জানা গিয়াছে, এই ছবিগুলি ১২২০খৃঃ অব্দেরও আগে অঙ্কিত হইয়াছিল।

ছবিগুলি ক্রমে অস্পষ্ট হইয়া আসিতেছে। বিশেষজ্ঞের দৃষ্টি এদিকে পতিত হওয়া আবশ্যক। এই সময়ে, চিত্রগুলির উদ্ধার সাধনে অমনোযোগী হইলে, ইহা চিরকালের জন্য কাল গর্ভে বিসর্জ্জিত হইবে। (Antiquarion Notes in Burma and Ceylon Indian Antiquary—p. 2903.—196.)

পশ্চিম তিব্বতের একস্থানে সাসপোলা (saspola নামক একটী স্থানের পূর্ব্বপশ্চিম দিকে, একটী বৌদ্ধগুহা দেখা যায়। ঐ গুহায় অনেকগুলি ভিত্তিচিত্র অঙ্কিত আছে। সে গুলি দেখিবার জন্য অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিগণের তথায় গমন করা উচিত।

ঐ সকল ভিত্তিচিত্র প্রাচীন Lamaist-আদর্শে অঙ্কিত। গুহার চিত্রকর্ম্মাও জনৈক লামা। তাঁহার সম্বন্ধে একটী কৌতূহলজনক পুরাতন গল্প প্রচলিত আছে। আমরা তাহা নিম্নে প্রকটিত করিয়া দিলাম।

"এক গ্রামে একটি অপূর্ব্ব সুন্দরী কৃষাণ রমণী বাস করিত। উক্ত সন্ন্যাসী (Lama) মহাশয় কালে ভদ্রে যুবতীর বাসগ্রামে গমন করিতেন। আমাদের কাব্য-প্রসিদ্ধ কুসুমায়ুধ ঠাকুরটি ইতিমধ্যে কোন সূত্রে, তাঁহার কুসুমকার্ম্মুকটি উদ্যত করিয়া বসিলেন। চারি চোখে মিলন হইল। ঠাকুরটি বেশ হাসিয়াই তীর ছাড়েন, কিন্তু সামান্য সামান্য মানুষ কাঁদিয়াই সারা হয়। সন্ন্যাসীর কাছে বৈরাগ্য তখন একটা নিষ্ঠুর আবরণ বলিয়া বোধ হইল, শূন্য সন্ন্যাসগর্ব্ব ঘুচিয়া গেল—কেবলই মনে হইতে লাগিল :

"যদি তারে পাই তবে শুধু চাই
একখানি গৃহ কোণ।"

সন্ন্যাসী গুহায় ফিরিলেন। বাহিরে তখন, চন্দ্রালোক-চূর্ণিত গিরিঅঙ্গে শত ঝরণা ঝর্ঝর স্বরে ঝরিয়া পড়িতেছিল ;—আকাশে সনাথ তারকা মধুর হাস্য করিতেছিল। কিন্তু প্রকৃতির জ্যোতি মনের অন্ধকার দূর করিতে পারে না। সন্ন্যাসী সারারাত 'তাহারই' চিন্তায়, 'তাহার'ই ধ্যানে কাটাইলেন।

পরদিন আবার দেখা হইল। খণ্ডশৈলদলোপরি শিথিলকুন্তলা তন্বী মোহনভঙ্গিমায় দাঁড়াইয়াছিল। আগে 'নয়নে নয়নে' হইয়াছিল, আজ 'বচনে বচনে' মিলন হইল। সন্ন্যাসী বলিলেন :

"তবে লুকাবো না আমি আর
এই ব্যথিত হৃদয় ভার।"

কিছুদিন যায়। বিস্মিত গ্রামবাসীরা দেখিল, লামাবর অকারণে এই গ্রামে রোজ রোজ আসিতেছেন। অনুসন্ধানের ফলে, সন্ন্যাসীর প্রেমস্বপ্ন যষ্টির আঘাতে ঘুচিয়া গেল। আপনার গুহাচিত্রালয়ে ফিরিয়া আসিয়া সন্ন্যাসী ভাবিলেন :

"কেন তুমি মূর্ত্তি হয়ে এলে
রহিলে না ধ্যান-ধারণায়।

সন্ন্যাসী যখন বুঝিলেন, তাঁহার "নিশার স্বপন হয়েছে ভোর"—তখন, অপমান ও নিরাশায় জর্জ্জরিত হইয়া, আপনার চিত্রালয়ের মধ্যেই স্বহস্তে আপনাকে মৃত্যু মুখে তুলিয়া দিলেন।

এখনও এই প্রেমকাহিনীপূতঃ গুহাচিত্রের সকল কথা ভালো করিয়া জানা যায় নাই। তবে চিত্রগুলি বুদ্ধদেবের জীবনী সম্বন্ধীয়। একখানি ছবিতে ধ্যানমগ্ন বুদ্ধদেবের একটী সুবৃহৎ প্রতিমূর্ত্তি একটী মণ্ডলাকর বেষ্টনের মধ্যে আছে। (Indian Antiquary)

আমাদের চিত্রপরিচয় সমাপ্ত হইল। কিন্তু কেবলমাত্র চিত্রপরিচয় প্রদানই আমাদের উদ্দেশ্য নয়—আনুসঙ্গিক অন্যান্য বিষয়ও আমরা কিছু কিছু আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব।

হিন্দুরাজাগণের প্রতিমূর্ত্তি সুপ্রাচীনকালে কতকটা কাল্পনিক হইত। কিন্তু ক্রমেই মূর্ত্তি অঙ্কনপ্রণালী সুমার্জ্জিত হইয়া আসিয়াছিল। Antiquities of Alwar নামক পুস্তকে —আলোয়ারের রাজাগণের অনেকগুলি অঙ্কিত মূর্ত্তির রঞ্জিত ও সুন্দর প্রতিলিপি আছে। তাহার অনেকগুলিই প্রাচীন হিন্দুচিত্রকর-কর্ত্তৃক অঙ্কিত। হ্যাভেল সাহেব বলেন—

"কালিদাসের পূর্ব্ব হইতেই ভারতীয়গণ ক্যানভাসের উপরে চিত্রাঙ্কনপ্রথা অবগত ছিলেন।"

আর্য্যগণ যদিও অনেকাংশে অস্বাভাবিক ভাবে চিত্র বা খোদনকার্য্য সমাপন করিয়া ছিলেন, তথাপি, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য, যে তাঁহারা স্বেচ্ছাচারী ছিলেন না। তাঁহাদেরও কাজের ভিতরে একটা বাঁধাবাঁধি নিয়ম ছিল।

এখন যেমন, মাপিবার জন্য, "সেড স্কোয়ার",—"টিস্কোয়ার," "কম্পাস্" প্রভৃতি যন্ত্র প্রচলিত আছে আগে তাহা ছিল না। তখন ভিন্ন উপায়ে মাপিতে হইত। যথা, ৮ পরমাণুতে ১ রথরেণু—৮ রথরেণুতে এক উৎকুন—৮ উৎকুনে এক যব, ইত্যাদি।

শিল্পীগণের গুণনির্দ্দেশও আছে।

"যিনি স্থপতি হইবেন, তিনি একান্ত চিত্ত, সুচরিত্র, অমল হৃদয় এবং বিজ্ঞানাভিজ্ঞ হইবেন।

শিল্পীগণকে উপযুক্ত গুরুর অধীনে থাকিয়া শিক্ষালাভ করিতে হইত। এবং "মান্সার", "সকলধিকার,"—মনুষ্যালয় চন্দ্রিকা," "কাশ্যপ" প্রভৃতি পুস্তক পাঠ করিতে হইত।

মনুষ্যালয় চন্দ্রিকার কতকগুলি উক্তি রামরাজ ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়াছেন। এখানে স্থানাভাবশত দুইটী মাত্র দেওয়া হইবে।

"Of nearly qualifications with him should be the Sistragrahi ; he may be either the son of disciple of the sthapati ; he should be particularly skilled in mathematics, and he strictly obedient to the will of the sthapati."

"A tacshaca who is thus called from part of his avocation being to pare the rough wood, should be of a cheerful temper. and well versed in all mechanical art."

এতদ্ভিন্ন মায়ামাতা (?) বিশ্বকর্ম্মা, সনত-কুমার প্রভৃতি নামধেয় শিল্প-সম্বন্ধীয় পুস্তকেরও অভাব ছিল না।

(Ram-Raj Essay on the Architecture of the Hindus p p. 14.)

শিল্পীগণের মাপ লইবার প্রণালী বিষয়েও

কত শিক্ষাবিধান ছিল! আদৎ কথা, সেকালের শিল্পশাস্ত্র বড় ছেলেখেলা ছিল না। এই কারণেই, ভূতপূর্ব্ব সরকারি চিত্রবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ হ্যাবেল সাহেব এবং ঐ স্কুলের বর্ত্তমান অধ্যক্ষ বরেণ্য অবনীন্দ্র বাবু পাশ্চাত্য পন্থা ছাড়িয়া শিল্প বিষয়ে প্রাচীন পন্থা অবলম্বন করিতে উদ্যত হইয়াছেন।

এখন, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য শিল্পের আকার এবং ভাবগত প্রভেদটা কিরূপ, একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়া দিয়া, অদ্য বিদায় গ্রহণ করিব।

দুইজন শিল্পী, চিত্রাঙ্কন করিবার জন্য, বনভূমে গমন করিল। একজন, দৃশ্যমান প্রকৃতির প্রত্যেক অঙ্গটী 'পারসপেকটিভ' মতে মিলাইয়া, আপনার চিত্র-ফলকে তুলিল। তিনি আঁকিয়াছেন;

উন্নতশির ধূসরকায় গিরিমালা। গিরি-বক্ষচ্যুতা জলবেণীরম্যা একটী নির্ঝরিণী ঝরিয়া পড়িতেছে। তৃণখচিত-শ্যাম-কূলে একখানি ছোট কুটীর। দূরে,—ধরণী অম্বরের মিলনরেখায় শ্যামকায় কানন।

বাঃ! প্রকৃতির যেখানে যাহা দেখিতেছি, ছবিতেও ঠিক সেই গুলি দেখিতে পাইতেছি যে!

তোমার মনে বিস্ময় জন্মিবে, কিন্তু ঠিক আনন্দ হইবে কি? কারণ, যাহা জীবন্ত দেখিতেছ, যাহার বাণী মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতেছ, যাহার ছন্দে হৃদয় তোমার নাচিতেছে, যাহার পূতঃসত্বায় মন তোমার পরিপূর্ণ, যে তরু-মর্ম্মর ও সঙ্গীতশীলা নির্ঝরিণীর মিশ্রিত ভৈরবীতে শ্রবণ তোমার পরিতৃপ্ত, শাখাসীন বিহগের যে বৈতালিক গীতিতে প্রাণ তোমার উদ্‌ভ্রান্ত,—চিত্রে তাহার কিছুই তুমি দেখিতে পাইবে না। তদতিরিক্ত যাহা তুমি পাইবে, লীলারম্যা প্রকৃতির তুলনায় তাহা একান্ত নির্জ্জীব। এমন অবস্থায়, তোমার ঠিক আনন্দ হইবে না,—কিন্তু তুমি বিস্মিত হইবে, সীমাশূন্যা এই শোভনা প্রকৃতিকে চিত্রকারী কি কৌশলে, এই ছোট পট খানির ভিতরে ধরিয়া রাখিল, তাহাই ভাবিয়া তুমি অবাক হইবে। নতুবা, গৃহভিত্তিলম্বিত landscape দেখিয়া কে কবে প্রকৃতি মাতার স্নেহপ্রস্রবণী হৃদয়ে অনুভব করিতে পারিয়াছে? আলেখ্যের সহিত মিলাইয়া কোন কবি স্বভাব বর্ণনার চেষ্টা করেন।

ছবির সাগরে আর জগতের সাগরে অনেক তফাৎ! অনুকারীর তুলিকা রূপার কাটি, প্রকৃতির অঙ্গে স্পর্শ করিলেই প্রকৃতি ঘুমাইয়া পড়িবে। এক্ষেত্রে অনুকরণ ব্যর্থ।

দ্বিতীয় চিত্রকর্ম্মার আলেখ্য দেখ। সেও ঐ এক বিষয় লইয়া, একই সময়ে বসিয়া, ছবি আঁকিয়াছে। দেখ,—ঐ জলদজালজড়িত শৃঙ্গ, উচ্চ পর্ব্বত, ধবলবরণ তুষারাবরণের উপরে বালভানু-ত্যক্ত কর-লেখা জ্বলিতেছে। এক-পার্শ্বে ব্যাঘ্রচর্ম্মাসীন হরপার্ব্বতী বিশ্রাম লাভ করিতেছেন। ঐ দুকূল প্লাবিয়া গঙ্গা তরঙ্গভঙ্গে সুন্দররঙ্গে বহিয়া যাইতেছেন। তটে,—পবিত্র তপোবন। হোমধূম্রে গগন আচ্ছন্ন। পিঙ্গল-জটা, মুদিতাক্ষি ঋত্বিকগণ কুশাসনোপরি উপবিষ্ট। ঐ নিঃশঙ্ক মৃগযূথ ভ্রাম্যমান। কেহ রোমন্থনপরায়ণ, কেহ উৎকর্ণ হইয়া চঞ্চল প্রেক্ষণে কি দেখিতেছে, কেহ শায়িত, কেহ তৃণভক্ষণশীল। গঙ্গাতরঙ্গধৌতমূল এক দেবালয় ঐ স্থানের গভীরতা বৃদ্ধি করিতেছে।

এই দুই চিত্রে কত প্রভেদ! প্রথম য়ুরোপীয়, দ্বিতীয় ভারতীয়। প্রথম, ফটোগ্রাফার, দ্বিতীয় আলেখ্যলেখক। একজন অনুকারী, আর একজন মৌলিক পথচারী। একজন বাস্তবভক্ত এবং আর একজন কল্পনাপ্রিয় একজন, যাহা আছে, তাহাই আংশিকভাবে দেখাইতে চেষ্টা করেন এবং আর একজন যাহা নাই, তাহাই আমাদের হাতে আনিয়া দিতে চাহেন। একজন স্বাভাবিক দৃষ্টিতে যাহা দেখিতে পান, তদতিরিক্ত আর কিছুই দেখেন না, আর একজন অন্তর্দৃষ্টিতে ত্রিজগতের বিচিত্র ও মহান সৌন্দর্য্য দেখিতে পাইয়া, তাহাকে যবনিকার অন্তরাল হইতে টানিয়া আনিয়া, সর্ব্বসাধারণের দৃষ্টির গোচরীভূত করিয়া দেন। কোটীপতি সহস্রখণ্ড রৌপ্যমুদ্রালাভের জন্য ততদূর লালায়িত হন না। কিন্তু জীর্ণকন্থাধারী নিঃসম্বল কুটীরবাসী তাহা লাভের জন্য কত না উৎসুক!

এতক্ষণে, বোধ হয় সকলেই বুঝিতে পারিয়াছেন, আর্য্যচিত্রের আদর্শই হইতেছে, প্রকৃতির উপরে খানিকটা রং চড়াইয়া দিয়া তাহা ফলকে প্রকাশ করা। এই জন্যই তাঁহাদের শিল্পে, আমরা অপ্রাকৃতিকতার কতকটা প্রাধান্য দেখিতে পাই। আর্য্য-শিল্প কখনও সান্তের মধ্যে আবদ্ধ থাকে নাই, তাহা মুক্ত বিহঙ্গপ্রতিম অনিরুদ্ধ পথে স্বাধীনভাবে ছুটিয়াছিল। তাহা সসীমের স্বল্পপরিধি ক্ষেত্র মধ্যে বদ্ধ না থাকিয়া, একেবারে অসীমে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। যেখানে গৌরবর্ণ, সেখানে নীল রং লেপিয়া, যেখানে দুইহাত, সেখানে দশ হাত লাগাইয়া এবং যেখানে একটা মাথা, সেখানে দশটা মাথা বসাইয়া দিয়াছিল। এই অস্বাভাবিকতার উপরেই আর্য্যশিল্প প্রতিষ্ঠিত, এইখানেই তাহার পরিণতি এবং এইখানেই তাহার বিশেষত্ব। তাঁহারা ছবি আঁকিয়াছিলেন—কিন্তু ফ'টো তোলেন নাই। এই বিশেষত্ব ধরিয়াই আর্য্যশিল্পের কনকভাণ্ডারের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইতে হইবে। নতুবা পাশ্চাত্য জগতের ফ'টোক্যামেরা হাতে করিয়া অগ্রসর হইলে, আমরা এই বিপুল ভাণ্ডারের চাবী খুঁজিয়া পাইব না,—অধিকন্তু নিরাশ হৃদয়ে ফিরিয়া আসিতে হইবে। দূরের দৃশ্য দেখিতে হইলে, দূরবীক্ষণ চাই, কারণ তাহা দূরদৃষ্টির পক্ষে উপযোগী; সাদা চোখে অতদূর নজর চলে না। জলপথে যাত্রা করিতে হইলে, নৌকা চাই;—একখণ্ড লোহা ভাসাইয়া যাওয়া যায় না। আর্য্যশিল্প যথার্থরূপে বুঝিতে হইলে, তাহার শাশ্বতপরিকল্পনা হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে, তাহার সৌন্দর্য্যাভিব্যক্তি প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতে হইলে যথার্থ খাঁটি দেশী হৃদয় চাই; অন্যথা পাশ্চাত্য সভ্যতার রঙ্গিল চষমা নাকে লাগাইয়া প্রতীচ্যের তামসিকতার হ্যাট মাথায় চড়াইয়া মুখে বিজ্ঞতার ভাণ করিতে পারি কিন্তু চোখে সব ধোঁয়া দেখিব।

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

সূর্য্যকর-চালিত চালক যন্ত্র।

(Solor Motor.)

আমাদের নানাপ্রকার প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য সাধারণত যে সকল যন্ত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে তাহাদের অধিকাংশই হয় জলীয় বাষ্প না হয় তাড়িতের সাহায্যে চালিত হয়। কোনো কোনো যন্ত্র নদনদীর স্রোতের শক্তি লইয়াই চালানো হইয়া থাকে। কিন্তু তাহাদের সংখ্যা অল্পই। জলীয় বাষ্পের সাহায্যেই আবার চালক যন্ত্রের (motor) জন্ত তাড়িৎ প্রস্তুত হইয়া থাকে। কাযেই জলীয় বাষ্প-চালিত চালক যন্ত্রেরই ব্যবহার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। যেথানে নদনদী হইতে শক্তি সংগ্রহের সুবিধা নাই, সেখানে ত কথাই নাই—সেখানে ত যন্ত্রাদি চালাইতে জলীয় বাষ্পের সাহায্য গ্রহণ করিতেই হইবে। অন্ত স্থানেও, রেলগাড়ীর এঞ্জিন্ প্রভৃতি যন্ত্র পরিচালনে জলীয় বাষ্পের সাহায্য গ্রহণ ভিন্ন অন্ত উপায় নাই।

উক্ত অভিপ্রায়ে পাথুরিয়া কয়লা পোড়াইয়া তাহার উত্তাপে জলকে বাষ্পাকারে পরিণত করিতে হয় তাহা সকলেই জানেন। জলীয় বাষ্প-চালিত যন্ত্র সকলের জন্ত পাথুরিয়া কয়লা আজকাল সকল দেশেই প্রভূত পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে। এখন কয়লা সুপ্রাপ্য; যদি কোনোদিন দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠে তাহা হইলে আমাদিগকে কি বিপদে পড়িতে হইবে তাহা চিন্তার বিষয়। অনেক দিন ধরিয়া এই চিন্তা সমগ্র বৈজ্ঞানিক জগৎকে তোলপাড় করিয়া তুলিয়াছিল। কিন্তু আজকাল সকলে বলিতেছেন যে, যদি কয়লা ফুরাইয়াও যায় তাহা হইলেও রেলগাড়ী জাহাজ প্রভৃতি থামিয়া যাইবার কোনো সম্ভাবনা নাই। বৈজ্ঞানিকেরা এই সকল কার্য্যের জন্ত আরো দুই একটি শক্তির আধার স্থির করিয়া রাখিয়াছেন; তাহাদের মধ্যে কোনোটি অসুবিধাজনক হইলে অপরটি লইয়া কায চালানো যাইবে।

তরল বায়ু বৈজ্ঞানিক জগতে যে নূতন পথের সন্ধান আনিয়াছে তাহাতে আমরা এ বিষয়ে অনেকটা নিশ্চিন্ত হইতে পারিয়াছি। আবদ্ধ বায়ুতে চাপ দিয়া এবং তাহার উষ্ণতা হরণ করিয়া তাহাকে তরলাকার প্রদান করা যায়। এই তরলবায়ু প্রচুর চাপের সহিত আপনার বাষ্পীয় অবস্থা পুনঃপ্রাপ্ত হইতে চেষ্টা করে। জলীয় বাষ্প আকারে বর্দ্ধিত হইবার জন্ত যে চাপ প্রদান করে তাহাতেই এঞ্জিনাদি চলে। তরলবায়ুর চাপ জলীয় চাপ অপেক্ষা বহুগুণ অধিক। তরল বায়ুর চাপ অধিক বলিয়াই এখনো তাহাকে এঞ্জিন্ চালানো প্রভৃতি কার্য্যে আনার সুবিধা হইতেছে না; যন্ত্রের আরো উন্নতি হইলে হইবে—সকলেই এইরূপ মনে করেন। যাহা হৌক, একদিন অত্যন্ত অপরিষ্কার, কয়লার গুঁড়াময় ধূমোদ্গারী এঞ্জিনের পরিবর্ত্তে তরল বায়ু চালিত, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, শব্দবর্জ্জিত এঞ্জিন দেখিতে পাওয়া যাইবে এরূপ আশা করা আর নিতান্ত দুরাশা নহে। পৃথ্বীদেবীর কয়লার ভাণ্ডার শূন্য হইলেও এ বিষয়ে আমাদের বিশেষ কোনো অভাব উপস্থিত হইবে না।

যে বায়ুমণ্ডল সসাগরা পৃথিবী ব্যাপিয়া সদা বর্ত্তমান আছে সেই অক্ষয় ভাণ্ডার আমাদিগকে প্রয়োজনাতিরিক্ত শক্তি দান করিতে পারে।

জলীয় বাষ্প প্রস্তুত করিবার জন্য কয়লার আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া অনেক স্থলেই সূর্য্যকর দ্বারা আমরা সে কাজ চালাইতে পারি। প্রাণদাতা, শক্তিদাতা সবিতা বর্ত্তমান থাকিতে আমাদের চিন্তার কোনোই কারণ নাই, বৈজ্ঞানিকেরা এইরূপ বলিতেছেন, কাযেও তাহাই দেখাইতেছেন। কয়লা পোড়াইয়া আমরা যে শক্তি পাই তাহাও সূর্য্যেরই। বহুশতাব্দী পূর্ব্বে যে সকল উদ্ভিদ্ সূর্য্যকর গ্রহণ করিয়া বর্দ্ধিত হইয়াছে, সেই-গুলিই বহুকাল ধরিয়া মৃত্তিকায় প্রোথিত থাকিয়া পাথুরিয়া কয়লায় পরিণত হইয়াছে; সূর্য্যের তেজ তাহাতে সঞ্চিত হইয়া রহিয়াছে, আমরা কয়লা পোড়াইয়া বহুশতাব্দী পূর্ব্ব হইতে সঞ্চিত সেই সূর্য্যশক্তি কাজে আনিতেছি।

ইহা ত গেল পরোক্ষভাবে সূর্য্যশক্তির ব্যবহার। আমরা প্রত্যক্ষভাবে সূর্য্য হইতে শক্তি সংগ্রহ করিয়া তাহাকে কার্য্যে পরিণত করিতে পারি—একথাটাও নিতান্ত নূতন নহে। কথিত আছে, আর্কিমেডেস্ কতকগুলি দর্পণের সাহায্যে প্রচুর সূর্য্যকর দূরস্থিত শত্রু-জাহাজের একস্থানে প্রতিফলিত করিয়া জাহাজখানি ভস্মীভূত করিয়া আপন মাতৃভূমি সাইরাকিউজ্ রক্ষা করিয়াছিলেন। এই গল্পটিকে এতদিন গল্প বলিয়াই বোধ হইত। কিন্তু ভাসমান বস্তু সম্বন্ধীয় নিয়মের আবিস্কারক আর্কিমেডেসের মস্তিষ্কে সূর্য্যশক্তির উপযোগিতা প্রবেশলাভ করিয়াছিল—এ কথায় এখন আর আশ্চর্য্য হইবার কোনো কারণ নাই। ইহা হইতে অন্তত এটুকু জানা যায় যে আর্কিমেডেসের সমসাময়িক লোকেরা জানিতেন যে দর্পণের সাহায্যে সূর্য্যের কর একত্র করিয়া তাপ সংগ্রহ করা যাইতে পারে।

পরবর্ত্তীকালে এঞ্জিনের আবিষ্কারক জর্জ ষ্টিফেন্‌সন্ এ বিষয়ে ইঙ্গিত প্রদান করিয়া গিয়াছেন। একদিন ষ্টিফেন্‌সন্ তাঁহার এক বন্ধুর সহিত তাঁহারই এঞ্জিন্-চালিত একখানি ট্রেন্ দেখিতেছিলেন। হঠাৎ তিনি তাঁহার বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"ট্রেণ টানিতেছে কে?" "বন্ধু উত্তর দিলেন—এঞ্জিন্।" "এঞ্জিন্ চলিতেছে কিরূপে?"—"জলীয় বাষ্প দ্বারা।" "জলীয় বাষ্প উৎপন্ন হইতেছে কিরূপে?"—"কয়লা হইতে।" "কয়লা কে প্রস্তুত করিল?"—বন্ধু এ প্রশ্নের কোনো উত্তর দিতে পারিলেন না; ষ্টিফেন্‌সন্‌ই উত্তর দিলেন—"সূর্য্য।" ষ্টিফেন্‌সন্ বুঝিয়াছিলেন, কয়লা পোড়াইয়া তাহাতে সঞ্চিত সূর্য্যের শক্তিকে ব্যবহারে আনাও যা আর সোজাসুজি না গিয়া নানা স্থান ঘুরিয়া একস্থান হইতে স্থানান্তরে যাওয়াও তাই। যদি একেবারে সূর্য্য হইতে শক্তি লইয়া তাহাকে কাযে লাগানো যায় তবেই সেটা সোজাসুজি হইবে।

চালক যন্ত্র সকল চালাইতে সূর্য্যকরের ব্যবহার দর্পণের সাহায্যে হইয়া থাকে। কতকগুলি দর্পণ দ্বারা সূর্য্যের কর একটি জলপূর্ণ "বয়লারের"* উপর প্রতিফলিত করা

* Boiler—এঞ্জিনের যে স্থানে জল রাখিয়া তাপ সংযোগে তাহাকে বাষ্পাকারে পরিণত করা হয়

হয়। দর্পণের সংখ্যা অধিক হইলে তাপ এতই অধিক হয় যে বয়লারের জল ফুটিয়া উঠিয়া বাষ্পাকার ধারণ করে। সেই বাষ্প কল চালাইবার জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

দুপুর বেলায় ছাদের উপর উঠিলে দেখা যায় সূর্য্যকরে ছাদ গরম হইয়া উঠিয়াছে। যদি সমস্ত ছাদটার তখনকার তাপ একত্র করা হয় তাহা হইলে কত তাপ পাওয়া যাইবে তাহা সহজেই অনুমেয়। হিসাব করিয়া দেখা যাইতেছে যে একটি জাহাজের ডেকে যে সূর্য্যরশ্মি পতিত হয় তাহাই একত্র করিলে তদ্বারা জাহাজখানিকে চালানো যাইতে পারে। যাঁহারা কাচ ফলক (lens) দ্বারা সূর্য্যের কর একত্র করিয়া শোলা কিম্বা কাগজখণ্ডে অগ্নিসংযোগ করা দেখিয়াছেন তাঁহারা জানেন কয়েক ইঞ্চি মাত্র স্থানে যে সূর্য্যকর পতিত হয় তাহাই একত্র করিলে কত তাপ উৎপন্ন হয়।*

এরিকসন্ সর্ব্বপ্রথমে সূর্য্যকর-চালিত চালক যন্ত্র প্রস্তুত করেন। তিনি বহু দর্পণ দ্বারা একটি বয়লারের উপর সূর্য্যরশ্মি প্রতিফলিত করিয়া যে কল চালাইয়াছিলেন তাহাতে প্রত্যেক একশত বর্গফুট দর্পণে যে শক্তি উৎপন্ন হইয়াছিল তাহাদ্বারা প্রায় সাত মন দ্রব্যকে একফুট উত্তোলন করা যাইতে পারে। অবশ্য ইহা যথেষ্ট হইল না। কিন্তু এ বিষয়ে ইহাই প্রথম দৃষ্টান্ত। প্রথমেই এত আশাজনক ফল অতি অল্প ক্ষেত্রেই পাওয়া গিয়াছে।

আমেরিকার অনেক স্থানেই সূর্য্যকর-চালিত চালক যন্ত্র ব্যবহৃত হইতেছে। ওয়াশিংটনের ডাক্তার ক্যান্ভার এরিজোনা নামক প্রদেশের অনুর্ব্বর ক্ষেত্রে সুবৃহৎ একটি কাষ্ঠের মঞ্চ প্রস্তুত করিয়া তাহাতে ১৬০০ দর্পণ সাজাইয়াছেন। এই দর্পণগুলিকে এরূপে ঘুরানো, ফিরানো ও স্থানান্তরিত করা যায় যে সকল সময়েই সেগুলিকে সূর্য্যের দিকে ফিরাইয়া রাখা যাইতে পারে।

এক প্রকারের দর্পণ আছে তাহাতে সূর্য্যকর পতিত হইলে করগুলি প্রতিবিম্বিত হইয়া দর্পণ হইতে একটা নির্দ্দিষ্ট দূরত্বে আসিয়া একত্র হয়। এই প্রকার দর্পণের নাম burning mirror, অর্থাৎ আতস-দর্পণ। কতকগুলি আতস-দর্পণ এক সময়ে ব্যবহার করিয়া যে তাপ পাওয়া যাইতে পারে তাহা বড়ই ভীষণ। এই তাপে অতি কষ্টে দ্রবণীয় রাসিয়ান্ (Russian) লৌহও মোমের ন্যায় নরম হইয়া যায়। সূর্য্য হইতে তাপ সংগ্রহের জন্য এই প্রকারের দর্পণও ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

উপরে পৃথক পৃথক দর্পণ-বিশিষ্ট যে সূর্য্যকর চালিত চালকযন্ত্রের কথা বলা হইল, কালিফর্ণিয়ায় তাহা হইতে পৃথক আর এক প্রকারের যন্ত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহাতে মাথা কাটা "কোনের"† ন্যায় আকার বিশিষ্ট একটি কাষ্ঠমঞ্চের ভিতর দিকটি ২ ফুট লম্বা ৩ ইঞ্চি চওড়া প্রায় ১৮০০ দর্পণ দ্বারা আবৃত আছে। মঞ্চটি এরূপে স্থাপিত যে একটি ঘড়ির কলের ন্যায় যন্ত্রের সাহায্যে সূর্য্যের গতি

* যে কাচফলক দ্বারা এইরূপে সূর্য্যকর একত্র করা যায় তাহাকে আতস-পাথর কহে। আতস=অগ্নি।

† Cone—একটি মোচা হইতে তাহার মাথার দিকের দুই তিন ইঞ্চি কাটিয়া লইলে একটি "কোন্" পাওয়া যাইবে। তাহার উপর দিকের ইঞ্চিখানেক কাটিয়া বাদ দিলে যাহা থাকিবে তাহাই "মাথাকাটা কোন্"।

অনুযায়ী তাহা ধীরে ধীরে ঘুরিতে থাকে এবং দর্পণগুলি সকল সময়েই সূর্য্যাভিমুখ হইয়া থাকে। এই দর্পণগুলি হইতে প্রতিবিম্বিত হইয়া সূর্য্যকর একটি নির্দ্দিষ্ট স্থানে একত্র হয়। সেই স্থানে একটি ১৩ ফুট ৬ ইঞ্চি লম্বা বয়লার আছে। এই বয়লারে প্রায় ১২ মন জল থাকে। কালো রঙের দ্রব্য অধিক পরিমাণে তাপ গ্রহণ করিতে পারে বলিয়া বয়লারটির চারিদিক কালো পদার্থ দ্বারা আবৃত। এই বয়লার হইতে জলীয় বাষ্প লইয়া যে একটি জলোত্তোলন যন্ত্র চালানো হয় তাহাতে প্রতি মিনিটে প্রায় ১৭০ মন জল উঠে।

অল্পদিন হইল ফিলাডেল্‌ফিয়ার অধ্যাপক ফ্রাঙ্ক শুমান্ একটি নবোদ্ভাবিত উপায়ে সূর্য্যকর হইতে উত্তাপ গ্রহণ করিয়া এঞ্জিন্ চালাইয়াছেন। তাঁহার উদ্ভাবিত যন্ত্রে একটি দুপুরু কাচের আবরণবিশিষ্ট সুবৃহৎ বাক্সে কতকগুলি কালো রঙের নল স্ক্রুর মত ঘুরাইয়া সাজাইয়া রাখিয়া সেই নলের মধ্য দিয়া জল কিম্বা অপর কোনো তরল পদার্থ লইয়া যাওয়া হয়। কাচের আবরণ দুইটির মধ্যে বায়ুর ব্যবধান থাকে। সূর্য্যকরকে দুইভাগে ভাগ করা যাইতে পারে। একভাগ কেবল আলোক ও অপর ভাগ কেবল তাপ দেয়। আলোকদায়ী কর সহজেই তাপদায়ী করে পরিণত হয়। সূর্য্যকরের আলোকদায়ী অংশ সহজেই বাক্সটির কাচ ও বায়ুর আবরণ ভেদ করিয়া নলগুলির উপর গিয়া পড়ে ও সেখানে তাপদায়ী করে পরিণত হইয়া নল ও তন্মধ্যস্থ তরল পদার্থকে উত্তপ্ত করে। নলের ভিতরের তরল পদার্থ উত্তপ্ত হইয়া এঞ্জিন্ চালানো হয়। তাপ কাচের আবরণ দুইটির মধ্যস্থ বায়ু সহজে ভেদ করিতে পারে না সেইজন্য বাক্সটির ভিতর হইতে তাপ বিকিরণ অতি অল্পই ঘটে।

অতি অল্প ব্যয়েই সূর্য্য হইতে শক্তি সংগৃহীত হইতে পারে। যে সকল দেশে নিয়মিত সূর্য্যকর পাওয়া যায়, বৈজ্ঞানিকেরা আশা করেন, সে সকল দেশে শীঘ্রই বহু সূর্য্যকরচালিত চালক যন্ত্রের প্রচলন হইবে। ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে এ সুবিধা নাই, সেখানে কয়লাই সম্বল। এক দিন সে সকল দেশে তরল বায়ুর প্রচলন হইতে পারে। বিশেষজ্ঞেরা বলেন যে পারস্য অন্তর্গত মরুভূমি এবং সাহারা, আরব্য, মঙ্গোলিয়া, মেক্সিকো, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশের প্রখর সূর্য্যকর সূর্য্যকরচালিত চালকযন্ত্রের সাহায্যে কার্য্যে পরিণত হইতে পারে এবং তাহার দ্বারা জল সরবরাহ করিয়া সে দেশগুলিকে কর্ম্মক্ষেত্রে পরিণত করা যাইতে পারে।

সাহারা প্রভৃতি মরুভূমিতে যে সূর্য্যকর পতিত হইয়া নষ্ট হইতেছে তাহার সহস্রাংশও যদি আমাদের কাযে আসে তাহা হইলে কত কয়লা যে বাঁচিয়া যায় তাহা চিন্তা করিলে অবাক হইতে হয়।

বৈজ্ঞানিকের বহু চেষ্টার পর এই সেদিনের নিতান্ত উচ্ছৃঙ্খল, বহু বলশালী তাড়িৎ-শক্তি আয়ত্তীভূত হইয়া অনেকটা আরব্যোপন্যাসের প্রদীপের দৈত্যের ন্যায় প্রায় সকল কার্য্যেই দক্ষ আজ্ঞাধীন ভৃত্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এখন সূর্য্যকরের মুখে কাঁটাওয়ালা লাগাম্ গাছটি একবার ভালো করিয়া পরাইয়া দিতে পারিলেই আমাদের আরো বহু সুবিধার পথ খুলিয়া যায়।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।



কন্যকা কুন্তী



অজন্তা গুহার চিত্র

কন্যকা কুন্তী।

রাজা শূরসেন তখন যদুবংশের অধীশ্বর। ভারত তখন আপন মহিমায় প্রদীপ্ত। ঊর্দ্ধে সাম-গানের উথলিত স্বর, নিম্নে স্বচ্ছন্দ স্বাধীনতার মুক্ত কলরব মধ্যভাগে জ্ঞান, বিদ্যা, বিজ্ঞান এবং বিক্রমের মহাসম্মিলন।

সেই সময় রাজা শূরসেন যদুবংশের মুকুটরত্ন। রাজার প্রতিজ্ঞা অটল, প্রতাপ অসীম। সেই পণবীর্য্য-মহীয়ান্ নৃপতি হইতে যাদব প্রকৃতিমণ্ডলের অতি নগণ্য শিশুটিও যেন পুণ্য এবং তেজের শিখামূর্ত্তিবৎ বিরাজ করিত। যেন সেখানে, সমুন্নত ঘনশ্যাম শালতরু হইতে হরিৎ-রুচি তৃণাঙ্কুরটি, মেঘবিদারী পর্ব্বত হইতে পথ-ধূলির কঙ্করটি, সমস্তই, নির্ম্মল আকাশের নীলিমার তলে আর্য্যাবর্ত্তের বক্ষ-মণিপুঞ্জের ন্যায় চেতনার পুলক-প্রভায় বিকসিত হইয়া থাকিত।

একদিন যদুপুরীর প্রাসাদচূড়া সমূহে পতাকার সারি চঞ্চল হইয়া উঠিল, যাদবরাজ্যে মঙ্গলবাদ্য বাজিয়া উঠিল; যদুবংশের ঘরে ঘরে আনন্দকোলাহলের মধ্যে, যখন, নির্ম্মল উষার প্রথম আলোকের রক্তাম্বর সরাইয়া, পুষ্প কিরণের অর্ঘ্য-ডালায়, প্রাতঃস্নাত নবীন সূর্য্য উজ্জ্বল হস্তে ধরণী জননীর পূজা সাজাইতেছিলেন, সেই সময়ে, রাজা শূরসেনের গৃহে রাজ-কন্যা পৃথা জন্মগ্রহণ করিলেন।

সে দিনের উষা শীঘ্র প্রভাত হইল না। যেন, স্বর্গের যে অমৃত ছবি নৃপতিগৃহে সঞ্জীবনী দিয়াছে, আপনি উষাদেবী বিভোর হইয়া তাহার সৌন্দর্য্যসুধা পান করিতেছিলেন। লোকের সমস্ত দিনের স্নানাহার সেই কন্যার মন্দির-দুয়ারে ভুল হইয়া গেল; সমস্ত রাজ্য এই অলোকসামান্য রূপময়ী কন্যার কল্যাণগীতে ভরিয়া উঠিল।

কিন্তু রাজা শূরসেন এক কঠিন প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ ছিলেন। আপন পিতৃস্বস্পুত্র পরম বন্ধু রাজা-কুন্তীভোজের নিকট তাঁহার এই প্রতিশ্রুতি ছিল, যে, প্রথম তাঁহার যে সন্তান হইবে, তাহা তিনি বন্ধুকে প্রদান করিবেন।

আজ তাঁহার শিশু পৃথার চন্দ্রকিরণের ন্যায় অমৃতমূর্ত্তি—গানের প্রথম সুরের মত, পল্লবতলচারী বাতাসের আনন্দ ক্রন্দনের মত—যেন বেদনায়, আরাধনায়—চিন্তার এক অপূর্ব্ব তরঙ্গ তাঁহার প্রাণময় খেলিয়া যাইতেছিল।

পৃথার জন্ম সংবাদ পাইয়া হাস্য করিয়া ভোজরাজ বন্ধুর পার্শ্বে আসিয়া বলিলেন,—"বন্ধু, তোমার পণ?"

নির্ব্বাত শিখার মত রাজা শূরসেন বন্ধুর দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। নিমেষে, হৃদয়ের অমৃত-উৎস খুলিয়া দিয়া রাজা বন্ধুকে আলিঙ্গন দিলেন, বলিলেন,—"বন্ধু, তাহাই আমার মনে ছিল। এস, দেখ, কি সুন্দর প্রভাতের কলিকা! সত্যই তুমি সুখী হইবে,—বন্ধু। এস, তোমার কন্যা তুমি নিয়া যাও।"

বেদবিহিত যাগ-যজ্ঞ সমাহিত হইল; নানা সমারোহ করিয়া রাজা,স্বীয় নয়ন-প্রাণের আনন্দনির্ঝর, স্বীয় প্রাসাদের স্নিগ্ধ আলোক, রাজ-কুলের প্রথম রত্ন হৃদয়বন্ধু কুন্তীভোজের কোলে তুলিয়া দিলেন।

(১)

আনন্দের গদগদশ্রু বিধৌত সুন্দর সেই নিশা করিয়া যাপন
ফিরিলা অমৃতসিক্ত পথ বাহি নৃপ ভোজ নগরে আপন।
তথা, যেন কোন্ পূত অমিয়-কোমল দেবশিশু-স্পর্শলালসায়
সমগ্র প্রাসাদ পুরী সুপ্রভাত-উজ্জ্বল-শ্রী—ছিল অপেক্ষায়।
অমনি বাজিল বাদ্য, প্রসূনে চন্দনে সারা সমীরণে ভরিল সুবাস,
আন্দোলিত পতাকায় সুচঞ্চল আদর-আহ্বানে বিচিত্র আকাশ।

খেলে গেল ভোজপুরে সুধাস্বরে যেন কোন্ মহাকলরব,—
মধুহাস্যে বিকশিত প্রভাতের শিশিরার্দ্র ফুলের উৎসব!
কোন্ স্বর্গ হ'তে আনি' চাঁদের কলিকা,
স্নেহসরোবর জলে প্রেমানন্দ কুতূহলে
রাখিলা নৃপতি ভোজ আলোকিতে নিজ অট্টালিকা।

(২)

কি সুষমা! কি সুষমা! প্রাসাদের অভ্যন্তরে—খরধারে যেন লুটে' যায়
অমৃত-আনন্দ স্রোত প্রতি স্পন্দে, প্রতি হাস্যে, প্রতি ভঙ্গিমায়!
সমস্ত প্রাসাদময় অমৃতের উৎস-ধারে ঢালিয়া কিরণ
ফুটিল সহস্র হাস্যে জ্যোৎস্নার সহস্রদল জীবন্ত হিরণ!
কনক চরণতল, অলক্তকরেখা আঁকা আদরে নিপুণ,
পড়ে-কিনা-পড়ে প্রায় ধরাগায়, নূপুরশিঞ্জনে রুণু রুণু ঝুন্!
উল্লসিত সেই নৃত্যে পলে পলে রাজগৃহে স্বচ্ছে অকস্মাৎ;
সমস্ত প্রাসাদকক্ষে সহস্র মর্ম্মরগিরি-নির্ঝর প্রপাত!
সমস্ত আঙন-ধূলি হ'য়ে উঠে রাজগৃহে সুবাস-মধুর,
লুটে' পড়ে মত্ত যত বৃক্ষবাটিকায় কলকণ্ঠ বিহঙ্গের সুর।
অকস্মাৎ ভোজরাজ স্থগিত করিয়া দিয়া পূর্ণ রাজসভা,
ছুটি' আসি' লন তুলি' সে পৃথারে কুড়াইয়া, স্বীয় রাজ্যপ্রভা!
এইরূপে কন্যা পৃথা বাড়িলা সুন্দর,
চন্দ্রমার আলো দিয়া ভোজরাজ্য আলোকিয়া
আলোকিয়া নৃপতির আনন্দ সাগর।
সে কি রূপ! অনন্ত উচ্ছ্বাস স্নেহ—অমৃতের ক্ষীর সর ননী!
'কুন্তী' নামে ভোজগৃহে শিশু লক্ষ্মী আইলা আপনি!

(৩)

নবীন প্রভাত শুধু, শুধু হাস্য, শুধু হর্ষ, শুধু আলোময়
যেন সে জীবনখানি—সুন্দর মধুর রূপে হইল উদয়!
উদ্যানে উদ্যানে নিত্য উঠে হাসি' প্রতি ভোরে যত ফুলকুল,
আপনি ভরিয়া উঠে হেম ডালা—করে কার বিহ্বল আকুল?
ধীরে, যত পুণ্যনীতি শাস্ত্রগীতি উচ্চারিত সে কণ্ঠে সুন্দর—
অমৃত বিথারি' দিয়া—বিমোহিয়া গৃহ-প্রাণ-পবন-অম্বর।

দিনে দিনে মুখচ্ছবি প্রশান্ত উজল-মধু,—এ কি পৌর্ণমাসী ?
ভরিয়া কোমল চিত্ত জাগে নিত্য জ্ঞান ভাতি নবাঙ্কুররাশি।
অসামান্য মহিমায় চিত্ত ভরি' কি চেতন-সঞ্জীবন হইল প্রকাশ,—
দর্পণ বদনপটে তাহারি নির্ম্মল পূত অতুলন সুন্দর আভাষ!
সে আভাষ—কোন্ দূর সুভবিষ্য যেন মহা—মহামাতৃত্বের,—
যেন কোন্ মহীয়সী মহানারী—রাজ্ঞী—মাতা—বিশ্ব জগতের!

(৪)

ছড়ায়ে কিরণরাশি পথ ভরি' আজি কন্যা চলে উষাস্নানে,
বিশ্ব সাগরময় শিহরণ দিয়া বালা ফিরে গৃহপানে।
পুষ্প-উদ্যানের মাঝে হের হের উষাভোরে আজি একি সহসা প্রকাশ
আপন জ্যোৎস্নায়-স্নাত স্নিগ্ধ চাঁদ—কন্যাকুন্তী পরি' পট্টবাস।
অর্ঘ্য ডালা করে লয়ে কন্যা কুন্তী, পুণ্যপ্রভা নয়নাভিরাম!
কল্যাণ মুরতি যেন ধীরে উঠে মন্দিরসোপান।
সমাপিয়া দেবপূজা কন্যা আসে গো-গৃহ মাঝার,—
অমৃত দুহিতারূপে দোহি' আনে বিশ্বসুধা ভোজরাজাগার।
স্নেহসুধাস্বরূপিনী, জগন্ময়ী মাতৃত্বের সুপ্রশান্ত ছড়ায়ে কিরণ!
ভোজরাজ্য পাকশালে বিরাট রন্ধন ভার নিজ হস্তে লন।
সহস্র ব্যঞ্জনে, ক্ষীর, অন্নে ভরি উঠে মহাঅন্নশাল—
বিতরেন সেই অন্ন মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মী যেন! ধন্য রাজ্য—ধন্য নরপাল!
অঙ্গন যুড়িয়া উঠে জনসঙ্ঘকোলাহল ছাইয়া গগন;
ভাঙ্গিয়া সমস্ত রাজ্য বায়ু প্রবাহের মত ক্ষুধাতুর আসে অগণন!

(৫)

হের হের ভোজপুরে মিলে গেছে আজি মরি! দেবতা দানব!
দ্বিজ অদ্বিজ দীন এক সাথে সুধা খায় দ্বন্দ্বহীন করি' কলরব!
বর্ণের বিচার নাহি, অবিরাম অন্ন বহি' লক্ষ স্বর্ণথালি—
অক্লান্ত মোহিনী আজি মাতৃরূপে সুধাভাণ্ড বিশ্বে দেন ঢালি'।
মহাব্রতশ্চর্য্যময়ী অতুলনা কন্যকার পূতদীপ্ত এ মূর্ত্তি সুন্দর,—
হেরিলা প্রাসাদচূড়ে ধন্য রাজা কুন্তীভোজ—নেত্র দরদর।
"জয় অন্নপূর্ণা জয়! জয়! জয়!"—উঠে ধ্বনি ভোজরাজপুর,
পবনে অমৃত মাখা সেই ধ্বনি গেল ছুটি' হস্তিনা সুদূর।

শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার।

পাকচক্র। ষষ্ঠ দৃশ্য।

গৃহিণী ও বিনোদ।

গৃ। বাবা আমি বড় খুসী হয়েছি,—আমাকে আগে ত খুলে বল্লেই হোত। তোমার যা ইচ্ছে—আমারও ঠিক তাই ইচ্ছে—

বি। আমি ভেবেছিলুম—বুঝি—

গৃ। বাবা বোঝনাত, ছেলের সুখেই মার সুখ। তাহলে বাবা শুভস্য শীঘ্র—আমি বলি এখুনি নিমন্ত্রণ চিঠিগুলো লিখে বিলি করে ফেল, পরশুই দিন ঠিক করা যাক।

বি। পরশু! এত শীঘ্র কি সব যোগাড় হয়ে উঠবে ?

গৃ। বেশী লোক ত আর বলছিনে,—দু চার জন আত্ম বন্ধু এখানে বরযাত্রী এসে মিষ্টিমুখ করবে—তার পরে কনের বাড়ী যাবে,—এতে আর এমনই কি হেঙ্গাম!

বি। তবে বাবাকে একবার বল—

গৃ। সে আমি ঠিক সময়েই বলব এখন, সে জন্য তোর ভাবনা নেই। তুই এখন চিঠি কখানা লিখে বিলি করে ফ্যাল,—এই তোর কাকার বাড়ী, মামার বাড়ী, রাম বাবুদের—আর—

বি। হরি বাবুদেরও ত বলতে হবে—?

গৃ। তা বল্ না—তাদেরও জানান উচিত বইকি—এতদিন থেকে আশা করে আছে—এখন ঠিকটা বুঝুক।

বি। তা কি রকম চিঠি লিখব ?

গৃ। এই বিয়েতে যেমন লিখে থাকে—তোমার বাবার নামের চিঠি হবে—

বি। আচ্ছা আমি প্রাণধন বাবুর ছেলের বিয়ের নিমন্ত্রণ পত্রখানা দেখে লিখে ফেলছি। কন্যার বাড়ীর নম্বরটা ?

গৃ। অত নম্বর দেবার দরকার কি বাবা! বরযাত্র ত সবাই এখানেই প্রথমে আসবে,—এসে তোর সঙ্গেই ত কনের বাড়ী যাবে—।

বি। তা বটে!—কার মেয়ে সেটা অবশ্য লিখতে হবে ?

গৃ। তাতেই বা দরকার কি ?

বি। তাও দরকার নেই! কিন্তু চিঠিতে ত তা থাকে দেখতে পাই।

গৃ। আমি বলি না থাকাই ভাল। অত আড়ম্বর করে লেখাটা ঠিক হবে না—যত কম কথায় চিঠি সারতে পার—

বি। আমিও দেখছি তাই সুবিধে—কাজটা চটপট হয়ে যাবে। তবে যাই চিঠিগুলো বিলি করে ফেলিগে, তুমি বাবাকে বলে রেখো।

গৃ। দাঁড়া দাঁড়া—আর একটা কথা,—মিষ্টান্ন কিছু ফরমাস দিতে হবে।

বি। কার নামে ?

গৃ। কার আবার নামে ? কর্ত্তার নামে—

বি। একবার তবু জিজ্ঞাসা করে এস,—কি কি চাই—

গৃ। জিজ্ঞাসা আবার করব কি—? কি কি চাই আমি জানিনে নাকি ? তাঁকে বলতে গেলেই বলবেন—এটা—কম কর—সেটা কম কর,—জান ত বাবা তোমার বাবার ধরণ—তার চেয়ে তুই ফরমাস দিয়ে

আয়—তখন আর গোল করার উপায় থাকবে না।

বি। বেশ! তুমি যা বল। আমি এখনি গিয়ে সব ঠিকঠাক করে ফেলছি।

প্রস্থান।

গৃ। বিয়ের খবর পেয়ে হরি বাবু কি রকম বসে পড়বে—আমি তাই ভাবছি! হি হি হি! বাছা আমার পাঁচটি হাজারের জন্য এমন বর হারালে! উঃ আমার এত আহ্লাদ হচ্ছে। হিহিহি। শশী যখন বৌ হয়ে ঘরে উঠবে তখন আর তাকে কেউ পুষ্যি বলে—দাসী বলে নাক তুলতে পারবে না—চন্দ্রকান্ত তার কাছে চাকর হয়ে দাঁড়াবে —হিহিহি!—যাই এখন দাঁড়িয়ে হাসলে চলবে না। শশীকে নিয়ে বোনের বাড়ী যাই—সেখান থেকেই বিয়েটা হোক, সব ঠিকঠাক করে আসি। ও শশি—শশিমুখি—কোথায় আবার গেল!

গৃহিণীর প্রস্থান। শশীর প্রবেশ।

শ। তাইত! একি আশ্চর্য্যি কাণ্ড! (দেয়ালে টাঙ্গান একখানি আয়নায় মুখ দেখিতে দেখিতে) তা এমনি কি আশ্চর্য্যি! আমি যখন নিজের মুখ খানা দেখি তখন নিজেই মোহিত হয়ে যাই। তবে কথা হচ্ছে তাতে ত একটা মীমাংসায় উপস্থিত হতে হয় না। নিজে আমি ত চিরদিন নিজেরই আছি—নিজেরই থাকব;—এখন কথা হচ্ছে এদের দুজনের মধ্যে কাকে রাখি—কাকে ঠেলি! (কপালের অলকদাম কুঞ্চিত করিতে করিতে) তাইত এযে বিষম সমস্যা! একজন হলেন বড়—একজন ছোট! একজন প্রভু একজন অনুগত, একজন পুত্র একজন পুষ্যি। এক-জনের সঙ্গে বিয়ে হলে আমি হব ধনীর ঘরণী ধনীর গৃহিণী, দাস দাসী সেবা করবে, জগতের লোকে আদর করবে; অন্য জনের সঙ্গে বিয়ে হলে আজও যা—কালও তা! এতে আর সমস্যা কি হতে পারে? ওগো চাঁদবদনী তাকেই তুমি বিয়ে কর—যার স্ত্রী হলে জগৎ-সংসার তোমার অনুগ্রহভিখারী হবে। সেই ভাল, সেই ঠিক! উঃ কি সুখ! কি আনন্দ! আমার যেন ধরাখানা সরা জ্ঞান হচ্ছে। কিন্তু তবুও কান্না পাচ্ছে কেন? তাহলে চন্দ্রকান্তের দশা কি হবে! সে কি মরে যাবে না? সে যে আমাকে বড় ভাল বাসে—আর আমিই কি বাঁচব? কার সঙ্গে পরামর্শ করি? চন্দ্রকান্তকেই কি সব বলব? বলি ও চন্দ্রকান্ত কোথায় গেলে তুমি,—আমি আর সহ্য করতে পারছিনে।

(কৌচে অর্দ্ধশায়িত ভাবে উপবিষ্ট হইয়া গান)

মল্লার, রূপক।

আমার,—কেন গো আজি হেন উদাস প্রাণ
কেন—মধুর রাগে হেন বেসুরো তান।
চঞ্চল মন সব হেলা ফেলা—
কিছু না ভাল লাগে হাসি খেলা,
প্রখর তাপ একি! প্রভাত বেলা,
শান্ত মেঘে একি বজ্র গান!
এই কি ভালবাসা! এরে কি প্রেম কহে?
কিলাগি চায় সবে—কিসের মোহে!
মলয় মধু বায়ু ইহাত নহে;
এ যেন ফাগুন আগুন বাণ!

স্বরলিপি।

মা গমা II রা পা মা। মা গা। রগা সা I রা মা গা। মা -া।
"আ মার" কে ন গো আ জি হে॰ ন উ দা স প্রা ণ

। মা গা I রা মা মা। পা পা। না র্সা I না র্রা র্সা। র্সর্রা -র্সা। ধা পা II
কে ন ম ধু র রা গে হে ন বে সু রো তা॰ ন্ "আ মা র"

। া া I { না -া না। না না। নধা না I র্সা -র্রা র্সা। না -া। র্সা -া I
চ • ঞ্চ ল ম ন সব হে ০ লা ফে ০ লা ০

I না র্রা র্সা। ণা ণধা। পা ধা I ণা -র্সা র্সা। ণর্সা -ণধা। পা -া I }
কি ছু না ভা ল• লা গে হা • সি খে॰ ০০ লা ০

I { মা ধা ধা। ণা ণধা। পা ধা I ণা ণা ণধা। পা -ধা। পা -মগা I }
প্র খ র তা প• এ কি প্র ভা ত॰ বে ০ লা ০০

I পা -না না। র্সা র্সা। গা মা I পা -ধা ণা। ধর্সা -ণা। ধা পা II
শা • স্ত মে ঘে এ কি ব ০ জ্র গা॰ ন্ "আমার"

। া া I রা -া রা। রা রা। রা রা I রা মা মা। মা -গা। রগা সা I
এ ই কি ভা ল বা সা এ রে কি প্রে ম ক॰ হে

I রা মা মা। পা -া। ধা ণধা I পা ধা পা। মা -গমা। রা -া I না না না।
কি লা গি চা য় স বে কি সে র মো ০০ হে • ম ল য়

। না না। নধা না I র্সা র্রা র্সর্রা। না -ধনা। র্সা -া I না র্রা র্সর্রা।
ম ধু বা• য়ু ই হা ত॰ ন ০০ হে • এ যে ন॰

। ণা -ধা। পা মগা I মা মণা ধা। পা -মা। গমা রা II
ফা ০ গু ন॰ আ গু • ন বা ণ্ "আমার"

অসমাপ্ত।

১

আজ তিন বৎসর পরে খোস্তালির সত্যেন্দ্রনাথ বি, এ, পাশ করিয়া দেশে ফিরিয়াছে। কলিকাতা হইতে দেশে ফিরিবার পথটা তেমন সুগম ছিল না বলিয়া সত্যেন্দ্রনাথ দেশে বড়-একটা আসিতে চাহিত না। কিন্তু নিন্দুকেরা বলিত, যে সত্যেন্দ্রনাথের বিবাহের পর হইতে অবকাশ-সময়টুকু দেশে নষ্ট করা অপেক্ষা শ্বশুরালয়ে যাপন করাটাই তাহার নিকট বাঞ্ছনীয় সেই কারণেই নাকি সত্যেন্দ্রনাথের দেশে আসিবার পক্ষে বড় একটা সুবিধা ঘটিয়া উঠিত না। কিন্তু এবার বিধবা জননীর সকাতর অনুরোধ কোনরূপ যুক্তি-তর্ক বা চক্ষুলজ্জার খাতিরেও এড়াইতে না পারিয়া ক্ষুব্ধ হৃদয়ে অবশেষে একদিন সে খোস্তালিতে শুভাগমন করিল!

একে বি, এ, পাশ একমাত্র পুত্র, তাহার উপর তিন বৎসর পরে দেশে ফিরিয়াছে, শুধু পাড়া-প্রতিবেশী নহে, পুষ্করিণীর মৎস্যকুলের মধ্যেও একটা প্রবল আন্দোলন উপস্থিত হইল।

মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৌমাকে নিয়ে এলিনে কেন? কতকাল দেখি নি, কেমন-টি হয়েছে এখন?"

পুত্র উত্তর করিল, "তার শরীরটা এখনো তেমন সারেনি—পাড়াগাঁর জলহাওয়াটা, বিশেষ এই গরম" ইত্যাদি।

বিবাহের সময় খোস্তালিতে আসিয়া সত্যেন্দ্রনাথের নববধূর একটু অসুখ করে—সেই সূত্র ধরিয়াই সত্যেন্দ্রনাথের 'ইংরাজী'-মেজাজের শ্বশুর মহাশয় কন্যাকে পাড়াগাঁ পাঠাইতে ততটা সম্মত নহেন এবং স্ত্রী আসিয়া দেশের এই জীর্ণ বাটি, অসভ্য প্রতিবেশিবর্গ বা উঠানের 'ধানের মরাই' প্রভৃতি উদ্ভট জিনিসগুলার সহিত পরিচিতা হয়, সত্যেন্দ্রনাথের তাহাও বড়-একটা অভিপ্রেত নহে।

২

প্রায় আড়াই বৎসর হইতে চলিল, কোথা হইতে এক অনাথ পিতৃমাতৃহীন কায়স্থ বালক আসিয়া খোস্তালির বাবুদের বাড়ী আশ্রয়-গ্রহণ করে। সকলেই বলে, 'ছেলেটি বড় ভালো'। বেশ শান্ত, নম্র, বুদ্ধিমান চাকর! সকল কাজেই সে পটু! গরুর জাব দেওয়া হইতে আরম্ভ করিয়া বাবুদের তৈল মাখানো অবধি কোন কাজেই সে পশ্চাৎপদ নহে! ছেলেটির নাম রাজু! পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে মৃদু হাসিয়া সে শুধু বলে, 'আমরা গরিবের ছেলে, মা, আমাদের আবার পরিচয় কি?'

সত্যেন্দ্রনাথের জননী রাজুর কর্ম্মতৎপরতায় বিস্মিত হইতেন; মধ্যে মধ্যে তিরস্কারও করিতেন, "অন্য চাকর রয়েছে, তুই ছেলেমানুষ এত খাটিস কেন?" সে হাসিয়া উত্তর দিত, "আমাদের ত, মা, চিরদিনই খাটিতে হইবে; শুধু বসিয়া থাকিয়া লাভ কি?"

পুত্রের অনুপস্থিতিতে পুত্রস্নেহাতুরা বিধবা জননী এই আত্মীয়-বান্ধবহীন অনাথ বালকটির প্রতি অনেকখানি স্নেহামৃত দান করিয়া

আপনার অতৃপ্ত ক্ষুব্ধ হৃদয়কে কথঞ্চিৎ শান্ত করিয়াছিলেন।

এইরূপে কাজে-কর্ম্মে সুখে-দুঃখে স্নেহ-মায়ার মধ্য দিয়া বাবুদের বাড়ী রাজুর প্রায় আড়াই বৎসর কাটিতে চলিল। সত্যেন্দ্রনাথের পিতৃব্য-কন্যা পাঁচ বৎসরের 'বুড়ীর' সহিত রাজুর বড় ভাব! দুগ্ধপানের নিমিত্ত মাতার সহিত বুড়ীর যখন দ্বন্দ্বযুদ্ধ বাধিয়া যাইত, মা যখন বহু অযথা বচসা করিয়াও ক্ষুদ্র বর্গীর হাঙ্গামা তুল্য এই দুর্দ্দান্ত কন্যাটিকে কিছুতেই স্ব-মতে আনিতে পারিতেন না এবং দুগ্ধপানের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা ও তদভাবে কন্যারত্নের আশু প্রাণ-বিয়োগের আশঙ্কায় শঙ্কান্বিতা হইয়া বুড়ীর গণ্ডদ্বয় টিপিয়া ধরিয়াও তাহার মুখব্যাদান করাইতে সক্ষম হইতেন না, তখন রাজুদা'র কথায় বিশেষ ফললাভ হইত।

৩

রাজুকে দেখিয়া সত্যেন্দ্রনাথ কহিল, "মা, এ ছেলেটি কে?" মা বলিল, "এটি একজন কায়েতের ছেলে; এখানে এসে রয়েছে। চাকরের কাজ-কর্ম্ম সবই করে। কাপড় কোঁচানো বল, তেল মাখানো বল, সব কাযেই তৎপর! বড় শান্ত ছেলে, মুখে হাসিটুকু লেগেই আছে; আহা, বাপ-মা কেউ নাই, ছেলেমানুষ, আমি ওকে বড় ভালবাসি!" রাজুর প্রতি চাহিয়া কহিলেন, "রাজু এই তোর দাদাবাবু রে! তুই সেদিন বলছিলি দাদাবাবুকে দেখিস নি; দাদাবাবুর কাজকর্ম্ম করতে পারবি ত!"

একমুখ হাসিয়া বিস্তৃতভাবে ঘাড় নাড়িয়া রাজু সহর্ষ সম্মতি জ্ঞাপন করিল। আজকাল রাজুর কাজ-কর্ম্ম অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। সে তাহাতে এতটুকু অসন্তুষ্ট নহে। দাদাবাবুর কাপড় কোঁচানো, স্নান করিবার সময় দাদাবাবুকে তৈল মাখানো, দাদাবাবুর জন্য আহারান্তে পানের ডিপা ও উপযুক্ত অবসরে হুঁকা প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া রাখিতে রাজু বিশেষ পটু! এই পাড়াগেঁয়ে ছেলেটির সমস্ত কাজের মধ্যে এমন একটা সযত্ন-গ্রথিত পারিপাট্য ও শৃঙ্খলা ছিল যে তাহা দেখিয়া সত্যেন্দ্রনাথ প্রায় ভাবিত, 'ছেলেটি খুব চালাক'!

৪

আজ সত্যেন্দ্রনাথের নিমন্ত্রণ আছে। নদীর অপর পারে জনৈক শৈশব-সুহৃদের গৃহে নৃত্য-গীতাদি হইবে। বাড়ী ফিরিতেও রাত্রি হইবে।

সত্যেন্দ্রনাথ রাত্রে বাহিরের ঘরেই শয়ন করে। স্ত্রীর অনুপস্থিতিতে বহির্গৃহে শয়ন করাটাই সঙ্গত বলিয়া অনেকের ধারণা! রাত্রে সত্যেন্দ্রনাথের শয্যা রচনা করা, শয়ন করিলে তাহার পদসেবা ইত্যাদি কাজ রাজুর পক্ষে নৈমিত্তিক ব্যাপার। পরে দাদাবাবুর রীতিমত নিদ্রাকর্ষণ হইলে রাজু পাশের ঘরে শয়ন করিতে যাইত।

সেদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালেই রাজুর শীত করিয়া মাথা টিপ-টিপ করিতে লাগিল। রাজু বুঝিল, জ্বর আসিতে আর বিলম্ব নাই! মধ্যে মধ্যে তাহার জ্বর হইতেছিল; এ সকল লক্ষণ তাহার বিশেষ বিদিত ছিল। রাজু আর বসিতে পারিল না। ঘরে যাইয়া শুইয়া পড়িল। দাদাবাবুর যে বিছানা প্রস্তুত হইল না তাহা আর মনে রহিল না। রাত্রে সকলেই আহারাদি করিল; রাজু আসিল না দেখিয়া গৃহিণী সন্ধানে আসিলেন; দেখিলেন, রাজু একটা

কাপড় মুড়ি দিয়া ঘুমাইতেছে! গায়ে হাত দিয়া দেখিলেন, গা বড় গরম! বুঝিলেন, জ্বর আসিয়াছে; আর বিরক্ত না করিয়া চলিয়া গেলেন।

রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহর হইয়াছে। নিমন্ত্রণ-শেষে জনকোলাহলহীন ঝিল্লি-মুখরিত অন্ধকার গ্রাম্য পথ ধরিয়া সত্যেন্দ্রনাথ বাড়ী ফিরিল। গোবরা মাঝি লণ্ঠন ধরিয়া বাবুকে বাড়ী পৌঁছাইয়া দিল।

সত্যেন্দ্রনাথ বাড়ী আসিয়া কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখে, আলো নাই। পকেট হইতে দিয়াশলাই বাহির করিয়া বাতি জ্বালিয়া দেখে, শয্যা অবধি প্রস্তুত হয় নাই! একে ঘুমের ঘোর, তাহাতে নদীতীর হইতে হাঁটিয়া আসিতে কত কষ্ট হইয়াছে! পথে আসিতে আসিতে তাহার মনে পড়িতেছিল, কলিকাতার কথা। বন্ধুবান্ধবের সহিত বরযাত্রীর নিমন্ত্রণান্তে হাস্য-মুখে কতদিন সে বাড়ী ফিরিয়াছে। পথে কত হাসি, গল্প, গান! বাড়ীতে বাতায়নোপবিষ্টা প্রতীক্ষাকারিণী সুন্দরী পত্নী জাগরণ-ক্ষীণা! কক্ষমধ্যে সপ্রেম আলিঙ্গন! তাহার পর জামা ছড়ি প্রভৃতি যথাস্থানে রাখিয়া প্রেম-সম্ভাষণে জীবনে কি সে এক আনন্দোৎসবের সৃষ্টি করিত! আর এখানে প্রতীক্ষা করিয়া থাকিবে, একটা পাড়াগেঁয়ে অসভ্য ভৃত্য-বালক! কাহার জন্যই বা এ পুষ্পমাল্য? হায়!

গৃহে ফিরিয়া দেখে, সেই পাড়াগেঁয়ে ভৃত্য বালকটীও বাবুর কষ্ট লাঘব করিবার জন্য বসিয়া নাই! এরূপ বেয়াদপি সহ্য না হইবারই কথা! সত্যেন্দ্রনাথ চীৎকার করিয়া ডাকিল, 'রাজু', 'রাজু', 'রেজো'!

কিন্তু, কোথায় রাজু! জ্বরের প্রকোপে সে তখন সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়িয়া আছে। আহা, বেচারা!

সত্যেন্দ্রনাথ ভাবিল, "নিশ্চয় বেটা ঘুমাইয়া আয়েস করিতেছে!" তাহার ঘরে গিয়া দেখিল, রাজু বেশ মুড়ি দিয়া ঘুমাইতেছে!

অসহ্য! পৈশাচিক ক্রোধে সত্যেন্দ্রনাথ তাহার চুল ধরিয়া টানিয়া রাজুকে বসাইবার চেষ্টা করিলে রাজু ঢলিয়া বিছানার উপর আবার শুইয়া পড়িল। তখন বিষম ক্রুদ্ধ সত্যেন্দ্রনাথের হিতাহিত-জ্ঞান লুপ্ত হইল। সে তার পৃষ্ঠে সবলে পদাঘাত করিল। ভীম প্রহারে চৈতন্য লাভ করিয়া রাজু উঠিয়া বসিল। সত্যেন্দ্রনাথ কহিল, "কচি খোকা, ঘুমিয়ে পড়েছ! বিছানাটা কি আমি করব?" কথায় রাগ আরো বাড়িয়া গেল। হস্তের বেত্রযষ্টি রাজুর পৃষ্ঠে বার দুই তিন পড়িল।

বাহিরের ঘরে চীৎকার শব্দ শুনিয়া সত্যেন্দ্রনাথের জননীর নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। পুত্রের প্রতীক্ষায় বসিয়া তিনি অন্দরের দালানেই তন্দ্রামগ্না হইয়া পড়িয়াছিলেন। শশব্যস্তে বহির্বাটিতে আসিয়া বালকের এই শাস্তি দেখিয়া পুত্রকে কহিলেন, "আহা, কেন ওকে বকছিস্? ছেলে মানুষ জ্বরে বেহুঁস হয়ে পড়ে আছে!" সত্যেন্দ্র বিকৃত স্বরে কহিল, "জ্বর! তোমার আদরেই ত ওর আস্পর্দ্ধা আরো বেড়ে গেছে!"

রাজুকে বুকের মধ্যে টানিয়া তার দীর্ঘ কেশগুলির মধ্যে হাত বুলাইতে বুলাইতে জননী বলিলেন, "আহা, বিছানাটা যদি আমি তখন করে রেখে যেতুম!"

সে রাত্রে রাজু যখন পদসেবা করিতেছিল তখন এক ফোঁটা গরম জল বোধ হয় সত্যেন্দ্র নাথের পায়ের উপর পড়িয়াছিল!

* * * *

সমস্ত রাত্রি সত্যেন্দ্রনাথের ভালো নিদ্রা হইল না! এক ফোঁটা জল বড় গরম বোধ হইয়াছিল। রাগটাও সেদিন সহসা বড় অধিক মাত্রায় চড়িয়াছিল। সত্যেন্দ্রনাথ রাজুকে ভালবাসিতেন। স্বাভাবিক মৃদুতার জন্য, শুধু সত্যেন্দ্রনাথের কেন, সকলেরি সে প্রিয় ছিল।

রাত্রে কতবার সত্যেন্দ্রনাথের মনে হইল যে, একবার দেখিয়া আসে রাজুর বেশী লাগিয়াছে কিনা! কিন্তু না, সে যে চাকর—ইহা ত ভাল দেখায় না! কতবার মনে হইল, একবার জিজ্ঞাসা করিয়া আসে, তার অসুখ কমিয়াছে কি না! কিন্তু তাহাতেও লজ্জা বোধ হয়!

সকাল বেলা রাজু মুখ ধুইবার জল আনিয়া দিল, তামাক সাজিয়া দিল। তাহার মুখ-চোখ ফুলিয়া উঠিয়াছিল। সমস্ত রাত্রি সে কাঁদিয়া কাটাইয়াছে। আহা, অসহায় অনাথ! এখনো তার ত্রয়োদশ বর্ষ উত্তীর্ণ হয় নাই। হায়! সত্যেন্দ্রনাথ, তখনো যদি তার মুখের দিকে চাহিয়া একবার বলিতে 'আহা'! একবার যদি নিকটে ডাকিয়া লইয়া দেখিতে, তোমার বেতের ঘা'য় কিরূপ রক্ত জমিয়াছে! অনেকক্ষণ ধরিয়া লজ্জার সহিত সংগ্রাম করিয়া অবশেষে ডাকিল, "রাজু"। ইচ্ছা, সে কেমন আছে জিজ্ঞাসা করিবে। কিন্তু রাজু নিকটে আসিবার পূর্ব্বেই সহসা একখানা টেলিগ্রাম আসিল। তারের সংবাদে সত্যেন্দ্রনাথের মনটা বিচলিত হইয়া উঠিল। খুলিয়া দেখিল, 'স্ত্রীর বড় পীড়া'! ভয়ে তার মাথার রক্ত সোঁ সোঁ করিতে লাগিল, চক্ষে অন্ধকার দেখিল! তৎক্ষণাৎ তাহাকে কলিকাতায় চলিয়া আসিতে হইল। রাজুকে কুশলপ্রশ্ন আর জিজ্ঞাসা করা হইল না! স্নেহের বা সান্ত্বনার একটা কথাও বলা হইল না! গাড়ীতে উঠিয়া ভাবিল, "বুঝি বা প্রায়শ্চিত্ত হয়!"

৫

মাস খানেক প্রায় কাটিয়া গিয়াছে। সত্যেন্দ্রনাথের মুখে হাসি দেখা দিয়াছে! তাহার স্ত্রী এ যাত্রা বাঁচিয়া গিয়াছে! আজ এক সপ্তাহ হইল পথ্য পাইয়াছে! আঃ! আজ সেই উপলক্ষে শ্বশুরের বাগানে বন্ধুবর্গের জন্য সত্যেন্দ্রনাথ ভোজের আয়োজন করিয়াছে!

উপযুক্ত বেশভূষায় সজ্জিত সত্যেন্দ্রনাথ গাড়ীতে উঠিতে যাইতেছে, এমন সময় ভৃত্য একখানি পত্র আনিয়া দিল। পত্রখানি বাড়ী হইতে আসিয়াছে; জননী লিখিয়াছেন। অন্যান্য কথার পর লিখিত আছে,—

"বড়ই দুঃখের বিষয়, কাল শেষ রাত্রে একমাসের জ্বর-বিকারে আমাদের রাজু মারা গিয়াছে! মরিবার আগে অনেকবার সে তোমাকে দেখিতে চাহিয়াছিল!"

পত্রখানির দুই এক স্থলে চোখের জল লাগিয়া অক্ষরগুলা জড়াইয়া গিয়াছে! হা হতভাগ্য পিতৃমাতৃহীন অনাথ! সেদিনকার বেদনার সান্ত্বনা-চ্ছলে, ইচ্ছা থাকিলেও সত্যেন্দ্র-, নাথের একটি কথা বলিবারো অবসর মিলে নাই! আর মিলিবেও না! হায়! আজ স্নেহের সেই একটি কথা চিরদিনেরি মত অসমাপ্ত রহিয়া গেল!

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

কলঙ্কী-শ্রীকৃষ্ণ।

হে মোহন, হে সুন্দর, হে আমার মুরলিবদন,
সৌন্দর্য্যের লীলাভূমি, তুমি নাথ জ্যোতির নির্ঝর ;
অশোভন বলে তবু "তুমি কৃষ্ণ, বড় অশোভন,"
কলঙ্ক হাঁকিয়া কহে "তুমি কৃষ্ণ, কলঙ্ক-আকর।"
অপরূপ বনমালা, অপরূপ তব পীতাম্বর,
জিনি দামিনীর কান্তি, জিনি চারু কষিত কাঞ্চন ;—
মুনির মানস টলে হেরি সেই শোভা-নিকেতন,
হেরে সেই চিত্রপটে মসী-মাত্র জন্মান্ধ বর্ব্বর।
হায় যেই জল্ জল্ রবিকরে ভুবন ভাস্বর,
পেচক কোটরে বসি' তাহারেই পাড়ে শত গালি ;
বুজিয়া অদ্ভুত চক্ষু, বলে পাখী "দেবদিবাকর,
কলঙ্ক-আকর তুমি, বুঝিয়াছি তব নাগরালি।"
ন্যাড়া নেড়ি কি বুঝিবে ভক্ত-ভোগ্য রাসের আস্বাদ ?
ভীরু-চিত্ত কি বুঝিবে পাঞ্চজন্য শঙ্খের-নিনাদ ?

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন।

হালীর ধূমকেতু।

সম্প্রতি একটি বিপুলকায় ইতিহাস প্রসিদ্ধ ধূমকেতু আমাদিগকে দর্শন দিবার জন্য ব্যোম মহার্ণবের মধ্য দিয়া ছুটিয়া সূর্য্য ও পৃথিবীর দিকে প্রবলবেগে আসিতেছেন। ইহার বেগ প্রতি সেকেণ্ডে ২৯ মাইল, সমস্ত বৈজ্ঞানিক জগৎ শশব্যস্ত হইয়া তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন। ইতি মধ্যেই কত শত শত চক্ষু দূরবীক্ষণের সাহায্যে ইহার শুভাগমন (?) দর্শনের জন্য চেষ্টা পাইতেছে। কিন্তু খোলা চক্ষুতে দেখিতে হইলে আমাদিগকে আরও কিছুকাল ধৈর্য্যধারণ করিয়া থাকিতে হইবে। কয়েক মাসের মধ্যেই ইনি আমাদিগকে দর্শন দিয়া কিছুকাল আমাদের নয়ন পথের পথিক থাকিবেন। সুবৃহৎ পুচ্ছসহ ইহার বিশাল দেহখানি নাকি এরূপ যে তাহা অকটরলোনী মনুমেণ্ট হইতে মেডিকেল কলেজের উপরিভাগ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইতে পারে। কোন এক শুভ মুহূর্ত্তে আসিয়া ইনি আমাদিগকে দেখা দিবেন। ইনি প্রায় ৭৬ বৎসর পূর্ব্বে আর একবার দেখা দিয়াছিলেন আর এই বৎসর আসিতেছেন, সুতরাং এমন অতিথির আগমনে জনসমাজ একটু বিচলিত হইবেন, সন্দেহ কি! বিশেষতঃ এই জ্যোতিষ্কটির আবিষ্কারের সহিত জ্যোতির্জগতের একটি মহা তথ্যের আবিষ্কার হইয়াছে। আইজাক নিউটনের, হালী নামক সহযোগী বন্ধু এই ধূমকেতুটির গতি বিধি সম্বন্ধীয় যাবতীয় রহস্যের উদ্ঘাটন করিয়াছেন বলিয়া তাঁহারই নামানুসারে ইহাকে 'হালীর ধূমকেতু' বলা হয়। ইহার ইতিহাস বর্ণনা করিবার পূর্ব্বে ধূমকেতু সম্বন্ধে মোটামুটি কয়েকটি কথা বলা আবশ্যক।

ধূমকেতু সকল অত্যন্ত লঘু উপাদানে নির্ম্মিত এবং স্বচ্ছ। ইহার দেহ বহুলক্ষ মাইল ব্যাপী পরমাণু পুঞ্জে গঠিত হইলেও উহার ভিতর দিয়া নক্ষত্রাদি দৃষ্টি গোচর হয়। ইহার ঘনত্ব নিরূপণ করা বড়ই দুরূহ ব্যাপার। উহা এত কম যে উহা ভেদ

করিয়া যাইবার সময় আলোকরশ্মি আদৌ বক্রগতি প্রাপ্ত হয় না। প্রায় অধিকাংশ ধূমকেতুরই শিরোভাগে নক্ষত্রের মত একটি করিয়া উজ্জ্বল স্থল দৃষ্ট হয়; ইংরেজীতে উহাকে নিউক্লিয়স (নীহারিকা) বলে। সকল ধূমকেতুর আকার আবার একরূপ নহে, কোনটিকে দেখিতে ঝাঁটার মত, কোনটির আকৃতি বা বাঁকা তলোয়ারের মত, কোনটিকে দেখিতে ঠিক ,কমারমত। প্রায় অধিকাংশ ধূমকেতুরই পুচ্ছ দৃষ্ট হয়। কোনোকোনো ধূমকেতুর পুচ্ছ আবার বিচ্ছিন্ন হইয়া দুই বা ততোধিক পুচ্ছে পরিণত হয়। নিউক্লিয়াস্‌টি সকল সময়েই সূর্য্যের অভিমুখে থাকে। গতি বশে ধূমকেতু সকলের আয়তনের হ্রাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে। পূর্ব্ববর্ত্তী জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ মনে করিতেন গ্রহগণের গতি ও ভ্রমণ পথের যেরূপ স্থিরতা আছে ধূমকেতুর সেরূপ নাই। ইহারা একবার দর্শন দিয়া উচ্ছৃঙ্খল গতিবশে অনন্ত ব্যোম সমুদ্রের কোথায় চলিয়া যায়, কেহ জানে না। কিন্তু ইহা এক্ষণে নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হইয়াছে যে কতকগুলি ধূমকেতু নির্দ্দিষ্ট কক্ষায় ভ্রমণ করিতেছে। কেপলারই প্রথমে নির্ণয় করেন যে গ্রহগণ বৃত্তাভাস পথে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে। নিউটন প্রমাণ করেন মহাকর্ষণ শক্তি বশতই গ্রহগণের এরূপ গতি হইয়া থাকে। তিনি ইহাও অনুমান করেন যে ধূমকেতু সকল প্যারাবোলা বা দীর্ঘাকৃতি বৃত্তাভাস পথে ভ্রমণ করে। তাঁহার সহযোগী হ্যালী এ বিষয়ে সত্য নির্ণয় করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। ইহার বহুবৎসর পূর্ব্বে সেনেকা নামক একজন পণ্ডিত বলিয়াছিলেন ধূমকেতুরও নির্দ্দিষ্ট কক্ষ আছে; কিন্তু কোন জ্যোতির্ব্বিদ্‌ই তাঁহার কথা গ্রাহ্য করেন নাই। তবুও সেনেকা দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছিলেন, "এমন দিন আসিবে, যখন লোকে বুঝিতে পারিবে যে, ধূমকেতুগণ নির্দ্দিষ্ট কক্ষায় ভ্রমণ করিয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ে পুনরায় যথাস্থানে উপস্থিত হয়।" যাহা হউক হ্যালী অধ্যবসায়ের সহিত এ বিষয়ের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। বহু পরিশ্রম করিয়া দেশে দেশে যুগে যুগে ধূমকেতু সম্বন্ধে যে সকল বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে সেগুলি সংগ্রহ করিলেন। বিশেষ নিপুণভাবে এই সকল আলোচনা করিয়া তিনি চব্বিশটি ধূমকেতুর ভ্রমণপথ নির্ণয় করিলেন। সৌভাগ্যক্রমে তাঁহার সময়ে ১৬৮২ খৃষ্টাব্দে একটি প্রকাণ্ড ধূমকেতু দৃষ্ট হইল। হ্যালি ইহারও গতি নিরূপণ করিলেন। এই সময় তাঁহার মনে একটি প্রশ্ন উদিত হইল, 'এই ধূমকেতু পূর্ব্বে আর কখনো পৃথিবী হইতে দৃষ্ট হইয়াছে কি না?' তিনি তাঁহার সংগৃহীত বিবরণগুলির সম্যক্ আলোচনা দ্বারা সিদ্ধান্ত করিলেন, ১৫৩১ ও ১৬০৭ খৃষ্টাব্দের ধূমকেতুদ্বয় ও এই ধূমকেতুদ্বয় একই। ইহাদের আকৃতি ও ভ্রমণপথের সাদৃশ্য অনুভব করিয়াই প্রথমে তাঁহার মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছিল। যাহা হউক তিনি স্থির করিলেন, ইহার ভ্রমণ-কক্ষ দীর্ঘায়ত বৃত্তাভাস ক্ষেত্রের ন্যায় এবং সূর্য্য ইহার একতম কেন্দ্রে (focus) অবস্থিত; ৭৫ কি ৭৬ বৎসরে ইহা একবার সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া আসে। এদিকে যতই তিনি এ বিষয়ের আলোচনা করিতে লাগিলেন ততই তাঁহার এই আবিষ্কৃত তথ্যটিকে সত্য বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। তিনি নির্ভীক-

চিত্তে তখন ভবিষ্যদ্বাণী প্রচার করিলেন, এই ধূমকেতুটি ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে পুনরায় দৃষ্টিগোচর হইবে। কিন্তু সৌরগ্রহগণের নিকটবর্ত্তী হইলে তাহাদের আকর্ষণে উহার বেগের হ্রাস হইবার কথা সুতরাং ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দের পরিবর্ত্তে ১৭৫৯ অব্দেই সম্ভবতঃ উহাকে দেখা যাইবে। হালীর এই ভবিষ্যদ্বাণী বৈজ্ঞানিকজগতের একটি স্মরণীয় দিন। ইহাতে একটি রহস্যের দ্বার উন্মুক্ত হইয়া গেল। জ্যোতির্ব্বিদগণ সবিস্ময়ে শুনিলেন, ধূমকেতুর ভ্রমণেরও একটা নির্দ্দিষ্ট নিয়ম আছে, আর উহা জড়পদার্থ মাত্র, অমঙ্গলসূচক কোন দৈত্য বা প্রেতাত্মা নহে। হালী অবশ্য বুঝিয়াছিলেন, ক্ষণভঙ্গুর মানবজীবনে পুনরায় এই ধূমকেতুটির উদয় দেখিবার সৌভাগ্য তাঁহার হইবে না, তাই তিনি বলিয়া গিয়াছেন "যদি আমার ভবিষ্যদ্‌বাণী সফল হয়, তাহা হইলে আশা করি, আমাদের ভবিষ্যদ্‌বংশীয়েরা একথা বলিতে কুণ্ঠিত হইবেন না যে, একজন ইংরেজই এই তথ্যটি নির্ণয় করিয়া গিয়াছেন।"

ক্রমে এই নির্দ্ধারিত সময় নিকটবর্ত্তী হইয়া আসিল; হালীর ভবিষ্যদ্‌বাণী সফল হয় কিনা জানিবার জন্য বৈজ্ঞানিকগণ উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিলেন। ক্লেইরট্ (Clairut) নামক সুবিখ্যাত গণিতজ্ঞ পণ্ডিত উন্নততর প্রণালীতে গণনা আরম্ভ করিলেন, এবং বীজগণিতের সাহায্যে তাহার গণনাফল প্রকটিত করিলেন, কিন্তু তবু কিছু কার্য্য বাকি রহিয়া গেল। লালান্দে ও মাদাম্ লেপুটে ইহার সমাধানে প্রবৃত্ত হইলেন; ৬ মাস ধরিয়া অক্লান্ত পরিশ্রম চলিল! একরূপ আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া দুই জনে গণনায় নিযুক্ত রহিলেন, পরিশেষে লালান্দে স্থির করিলেন, শনিগ্রহের প্রতিকূল আকর্ষণে ১০০ দিন ও বৃহস্পতির আকর্ষণে ৫১৮ দিন মোট এই ৬১৮ দিন বিলম্বে ইহার আগমন হইবে, অর্থাৎ পূর্ব্ববারে ধূমকেতুটি যতদিনে সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিয়াছে, এবার তদপেক্ষা ৬১৮ দিন বেশি লইবে সুতরাং ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসের মধ্যভাগে লোকে ইহাকে দেখিতে পাইবে, কারণ এই সময়ে জ্যোতিষ্কটি, তাহার কক্ষের যে স্থানটি সূর্য্য হইতে সর্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্ত্তী (perihelion) সেই স্থানে আসিবে। কিন্তু এস্থলে ইহাও উল্লিখিত হইল যে সম্ভবতঃ শনিগ্রহের কক্ষের পরেও আরো দুই একটি গ্রহ থাকিতে পারে, সুতরাং সেক্ষেত্রে তাহাদের আকর্ষণফলে ধূমকেতুটির আবির্ভাবকাল, এই নির্ণীত সময়ের একমাস পূর্ব্বে বা পরে হইতে পারে। বলা বাহুল্য, তখনও ইউরেণাস ও নেপচুন গ্রহ আবিষ্কৃত হয় নাই। ধূমকেতু দেখাদিল—মার্চ্চ মাসের ১২ই তারিখে অর্থাৎ নির্ণীত সময়ের একমাস পূর্ব্বে। ভবিষ্যদ্‌বাণী ও অনুমান সফল হইল। ইউরোপের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত আনন্দধ্বনি উত্থিত হইল! হালীর নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হইল! এই আবিষ্ক্রিয়ায় নিউটনের মহাকর্ষণশক্তির (universal gravitation) অস্তিত্ব আরো প্রকৃষ্টভাবে সপ্রমাণ হইল এবং অনাবিষ্কৃত গ্রহদ্বয়ের আবিষ্কারের দিকেও জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণের মনোযোগ আকৃষ্ট হইল! লোকে বুঝিতে পারিল ধূমকেতুগণের মধ্যে অনেকে গ্রহ ভিন্ন আর কিছুই নহে, সূর্য্যকে একতম কেন্দ্রে রাখিয়া ইহারা সুদীর্ঘ বৃত্তাভাস পথে (Eliptical path) ঘুরিয়া আসে।

ইহার পরে পুনরায় ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে ১৫ই নবেম্বর তারিখে হ্যালীর ধূমকেতু আবার দর্শন দিয়াছিল, এবারকার প্রদক্ষিণ সময় পূর্ব্ববার অপেক্ষা মাত্র ৬০ দিন বাড়িয়াছিল, কারণ বৃহস্পতির আকর্ষণে এবার কেবলমাত্র ১৩৫ দিন বিলম্ব হইবার কথা ছিল, কিন্তু ইউরেনাস, শনি ও পৃথিবীর অনুকূল আকর্ষণে উহার ৬৬ দিন কমিয়া যায়। জ্যোতির্ব্বিদ্‌দের গণনানুসারে আগামী ১৯১০ খৃষ্টাব্দের ২৪শে মে তারিখে পুনরায় ইহার পেরিহিলিয়নে অর্থাৎ ইহার কক্ষের যে অংশ সর্ব্বাপেক্ষা সূর্য্যের কাছে—সেই অংশে আসিবার কথা, তাই আজ বৈজ্ঞানিক জগৎ উৎকণ্ঠিত ভাবে ইহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন। ‘পেরিহিলিয়নে’ পৌছিলেই ইহার উজ্জ্বলতা বেশি দেখা যাইবে বটে, কিন্তু তাহার কয়েক মাস পূর্ব্ব হইতেই ইহা পৃথিবী হইতে দৃষ্টিগোচর হইবে। ভারতবর্ষ হইতে ধূমকেতুটিকে দেখা যাইবে কিনা এরূপ বিতর্ক ইতিমধ্যেই অনেকের মনে উপস্থিত হইয়াছে, আশা করা যায় বৈজ্ঞানিকগণ শীঘ্রই এই প্রশ্নের মীমাংসা করিতে পারিবেন। ‘পেরিহিলিয়নে’ পৌছিবার পূর্ব্বে ও পরে অনেকদিন পর্য্যন্ত যখন ইহাকে দেখা যাইবে, তখন মনে হয় এদেশ হইতেও উহার দর্শনের বাধা হইবে না।

যুগে যুগে মানবগণ এই বিশাল ব্যোমচরকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন এবং বিস্ময়াবিষ্টচিত্তে ইহার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু ইহার প্রকৃত স্বরূপ বহুশতাব্দি অজ্ঞাত ছিল। এই বিপুলকায় জীবটির (?) সহিত কত রাষ্ট্রবিপ্লব, কত যুদ্ধবিগ্রহ জড়িত রহিয়াছে, ইনি যখনই উদিত হইয়াছেন তখনই একটা না একটা অনর্থ ঘটিয়াছে তাই অদ্যাপিও ইহার উদয়ে লোকে ভাবী অমঙ্গলের আশঙ্কায় ভীত হইয়া থাকে। ১০৬৬ খৃষ্টাব্দে উইলিয়ম যখন নরম্যান সৈন্য লইয়া ইংলণ্ড জয় করিয়াছিলেন, তখন এই ধূমকেতু আবির্ভূত হইয়াছিল, প্রবল তুর্কী সৈন্য যখন কনষ্টাণ্টিনোপল অধিকার করিয়াছিল, তাহার কিছুকাল পরে ১৪৫৬ খৃষ্টাব্দেও ইহার একবার উদয় হইয়াছিল, তখন মুসলমানের প্রতাপে সমস্ত ইউরোপ খৃষ্টধর্ম্মের বিলোপাশঙ্কায় ভীতিবিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিল। কুসংস্কারাপন্ন লোকের কল্পনা এই ধূমকেতুরপুচ্ছে কতরূপ জ্বলন্ত অস্ত্রের অস্তিত্ব আরোপ করিয়াছিল, শুনিলেও স্তম্ভিত হইতে হয়। এই ধূমকেতুর কল্যাণেই হেষ্টিংশে যুদ্ধজয় হইয়াছিল এই বিশ্বাসে, উক্ত ধূমকেতুর পুচ্ছের অনুরূপ করিয়া মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজমুকুটের একটি মণি গঠিত হয়।

শ্রীকুলদাকুমার সেন রায়।

সমালোচনা।

A Dying Race. By U. N. Mookerji. Published by Mukerjee & Bose, College Square. Calcutta, 1909. Printed by J. N. Bose, Wilkins Press, College Square Calcutta, Price Annas Four.

হিন্দুজাতি যে ক্রমশঃই ধ্বংসের মুখে চলিয়াছে, এই গ্রন্থখানি পাঠ করিলে তাহার বিশদ আভাষ পাওয়া

যায়। ১৮৬২ সালের সেন্সসানুযায়ী বাঙলায় হিন্দুর সংখ্যা ছিল ১৭১ লক্ষ ও মুসলমানের সংখ্যা ১৫৭ লক্ষ। পরে ১৯০১ সালের সেন্সসে হিন্দুর সংখ্যা হয় ১৯৪ লক্ষ ও মুসলমানের সংখ্যা ২২০ লক্ষ। ত্রিশ বৎসরে হিন্দুর সংখ্যা শতকরা ১৭ জন হিসাবে ও মুসলমানের সংখ্যা ৩৩ জন হিসাবে বাড়িয়াছে। ১৮৯১ সালে বঙ্গদেশের সেন্সস-কমিশনার ও'ডনেল সাহেব হিন্দু-মুসলমানের সংখ্যার তারতম্যের উল্লেখ করিয়া সিদ্ধান্ত করেন, যে কালে হিন্দু একেবারেই লোপ পাইবে। আবার হিন্দু যে শুধু সংখ্যাতেই কমিতেছে তাহা নহে; ধনে, মর্য্যাদায়, শিক্ষায় ব্যবসায়াদিতে অবধি মুসলমান হিন্দুকে আপনার পশ্চাতে ফেলিতেছে। এই তুলনা হইতে হিন্দুর বর্ত্তমান দুর্দ্দশা সকলে অনুমান করিতে পারিবেন। গ্রন্থকারের মতে উত্তর ও পূর্ব্ববঙ্গের পল্লিসমূহে হিন্দুগৃহ কচিৎ দৃষ্ট হয়। আশঙ্কার কথা সন্দেহ নাই। তিনি হিন্দুর হ্রসিত সংখ্যা সম্বন্ধে যে কয়েকটি কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা স্পষ্ট চক্ষে সকলেই দেখিতে পাইতেছেন— সেগুলি, জাতীয় অনৈক্য, নীচজাতিগুলির প্রতি অমানুষিক ঘৃণা, সহানুভূতির অভাব, সামাজিক যথেচ্ছাচার, অসংযম, আলস্য ও ধর্ম্মে অনুদারতা, সঙ্কীর্ণ জাতিবন্ধন প্রভৃতি! মুসলমানের উন্নতির প্রধান কারণ, তাঁহারা সমগ্র ভারতে এক-মুসলমানত্বের প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যগ্র, তাঁহাদিগের সামাজিক বন্ধন সুদৃঢ়, জাতীয় সহানুভূতিতে তাঁহাদিগের হৃদয় পূর্ণ। হিন্দুগৃহে ইহার কি বৈপরীত্য লক্ষ্য হয়। গ্রন্থকার বলেন, স্বজাতির মধ্যে শতকরা ৫৭ জন ভ্রাতাকে হিন্দু অস্পৃশ্য এমন কি তাহাদের ছায়াস্পর্শ অবধি নিতান্ত ঘৃণিত মনে করেন। দুর্ভাগ্যের এমন প্রকৃষ্ট উদাহরণ সহজে বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় না। গ্রন্থকার আর একটি শোচনীয় দৃষ্টান্তের দ্বারা হিন্দুর সহানুভূতির অভাব সকলের চক্ষের সম্মুখে ধরিয়াছেন। গত জামালপুর অত্যাচারে অনেকগুলি হিন্দুনারী মুসলমান হস্তে অপমানিত ও নিগৃহীতা হইয়াছিলেন, সেই সকল নিরপরাধিনী হতভাগিনীগণকে তাঁহাদিগের স্বামী, পুত্র, পিতা, ভ্রাতা গৃহে স্থান দান করেন নাই; অগত্যা তাঁহাদিগকে খ্রীষ্টান মিশনের আশ্রয় লইতে হইয়াছে! সমাজের আকাশে এই যে ছোট ছোট মেঘগুলি জড় হইতেছে তাহা মহাপ্রলয়ের সূচনা করিতেছে —সমাজের প্রত্যেক নরনারীর এদিকে মনোযোগ আকৃষ্ট না হইলে আত্মরক্ষা অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইবে। লাট কৌন্সিলের মেম্বারই একমাত্র কাম্য বস্তু নহে— তাহারি উপর জাতির সমগ্র শুভ নির্ভর করিতেছে না। যে ধ্বংসের মুখে নিতান্ত অন্ধভাবে গড়াইয়া চলিয়াছি, সে দিকে দৃষ্টিদান সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। বর্ত্তমান গ্রন্থখানি এই দুর্দ্দিনে 'জ্ঞানাঞ্জনশলাকার' কার্য্য করিবে। ইহারি সাহায্যে সকলে কর্ত্তব্যনির্দ্ধারণ করুন। নহিলে ধ্বংস যে অবশ্যম্ভাবী সে বিষয়ে সংশয়ের কারণ নাই।

ব্রহ্ম প্রবাসীর পত্র। (ব্রহ্মদেশের সামাজিক, পারিবারিক, ধর্ম্মনৈতিক ও ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত-মূলক সন্দর্ভ) শ্রীকালাচাঁদ দালাল প্রণীত। প্রকাশক, শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ইণ্ডিয়ান্ পাবলিশিং হাউস্ কলিকাতা। কান্তিক প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য আট আনা। গ্রন্থখানি বহু জ্ঞাতব্য বিষয়ে পূর্ণ। লেখকের দেখিবার শক্তি আছে, এবং যাহা দেখেন, নিতান্ত পরিচিত বা আত্মীয়-বান্ধবের মতই সরলভাবে সকলকে তাহার বিবরণী দিতে পারেন—তাহাতে আড়ম্বর বা বিজ্ঞতার কোন ভাণ থাকে না। একাদশখানি চিত্রে পরিশোভিত এণ্টিক কাগজে পরিষ্কার ছাপা এই গ্রন্থখানি সাধারণের তৃপ্তিসম্পাদনে সমর্থ হইবে বলিয়া আমাদিগের ধারণা। তবে, দু-একটি ত্রুটি, লেখক সকল কথা আগাগোড়া বেশ গুছাইয়া বলিতে পারেন নাই এবং ভাষার প্রতিও স্থলে স্থলে অবহেলা প্রকাশ পাইয়াছে, লেখকের প্রথম উদ্যম ভাবিয়া ইহা মার্জ্জনা করা যাইতে পারে। ভবিষ্যৎ সংস্করণে ভাষার প্রতি গ্রন্থকারের অধিকতর মনোযোগ প্রদান বাঞ্ছনীয়।

হিন্দু-বিজ্ঞান-সূত্র। 'মনুষ্যের কর্ত্তব্য কি?' পবিত্র হিন্দুত্বসাধন। কেন? তবে শুনুন। মূল্য কত? * * ইত্যাদি। শ্রীবিশ্বনিন্দুক রায় ওরফে বি, এল, রায় প্রণীত। কলিকাতা ভারতমিহির যন্ত্রে মুদ্রিত

১৩১৫। গ্রন্থকার ক্ষমা করিবেন, তাঁহার উদ্দেশ্যের সহিত সহানুভূতি থাকিলেও আমরা তাঁহার বর্ণনা প্রণালীটীকে আদৌ গ্রহণ করিতে পারিলাম না! যৌথ পরিবারে কাহারো মতামত উপেক্ষণীয় নহে—সকলের সমবেত চেষ্টাই যৌথ পরিবারের শ্রীবৃদ্ধির কারণ তদভাবে ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী—স্থূলতঃ ইহাই গ্রন্থকারের বক্তব্য। কিন্তু তাঁহার গ্রন্থ পাঠ করিলে ঠিক বুঝা যায় না ইহা ব্যঙ্গ, কি শ্লেষ, কি উপদেশ, কি আর-কিছু। আত্মকথায় ও বাজে কথায় ক্ষুদ্র-কায়া পুস্তিকাখানি এমনি পূর্ণ যে কাজের কথাটুকু সংগ্রহ করিয়া লওয়া নিতান্ত সহজ ব্যাপার নহে। ইহাতে আছে শুধু বক্ষে করাঘাত, এবং 'পাবাণি', 'দীনতারিণি', 'হর হর শঙ্কর'—প্রভৃতি মর্ম্মোচ্ছ্বাস। কিন্তু শুধু এই অর্থহীন আর্ত্তনাদে ফল কি?

ভারতশিল্প।—শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। প্রকাশক, শ্রীমনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, হিতবাদী লাইব্রেরী, ৭০ কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। কান্তিক প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য আট আনা। 'ভারতী' 'বঙ্গদর্শন' প্রভৃতি, পত্রিকায় প্রাচ্য শিল্প সম্বন্ধে গ্রন্থকার কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, বর্ত্তমান গ্রন্থে সেইগুলি তিনি সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। ভারত চিত্রকলার বিশেষত্ব কি ও কোথায়,—অবনীন্দ্র বাবু ধীরভাবে যুক্তিতর্ক ও অপূর্ব্ব ভাষায় এই গ্রন্থখানিতে তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। গ্রন্থখানি কাব্যের ন্যায় উপভোগ্য অথচ ইহাতে যুক্তি-তর্ক ও প্রমাণের কি নিপুণ সমাবেশ। চিত্রকলায় লব্ধপ্রতিষ্ঠ শ্রীযুক্ত হাভেল-প্রমুখ পাশ্চাত্য মনস্বিবর্গ স্বদেশের চিরপ্রচলিত রীতি ও স্বভাবানুযায়ী পাশ্চাত্য চিত্রের তুলনায় প্রাচ্য চিত্রের বিশেষত্বের প্রশংসায় মুক্তকণ্ঠ হইলেন কেন, তাহার কারণ না বুঝিয়া, সে বিশেষত্বের সন্ধান না করিয়াই আমাদিগের দেশের অসীম প্রতাপশালী সমালোচকবর্গ—বিলাতী এ্যা'লমানাকের কল্যাণেই যাঁহাদিগের চিত্রজ্ঞান লাভ হইয়াছে, তাঁহারা কেবলমাত্র লতানে আঙুলের দোহাই দিয়াই পাশ্চাত্য চিত্রকে আমোল দিয়া সাধারণের নিকট হইতে নয়ন ভঙ্গীর বাহবা লইতে পারেন, কিন্তু তাহাতে সমালোচকের আদর্শ ক্ষুণ্ণ করা হয়। সেই যুক্তিহীন উক্তিগুলা কেবলি যে কৌতুক হাস্যের সৃষ্টি করে তাহা নহে; স্বদেশানুরাগী হৃদয়বান ব্যক্তির হৃদয়ে ইহাতে ক্ষোভেরও সঞ্চার হয়। সমালোচক মহাশয়গণকে এই গ্রন্থখানি বিশেষ করিয়া পাঠ করিতে অনুরোধ করি। অবনীন্দ্রবাবু বলিতেছেন, "Imitation যদি artএর চরম হইত, তবে পৃথিবীতে কবিগণের স্থান হরবোলায় অধিকার করিত,—সঙ্গীতাচার্য্যের স্থান Gramophone ও নর্ত্তকীগণের আসর কলের পুত্তলিকায় অধিকার করিত। কোকিলের কুহুস্বরটী কবিগণ অপেক্ষা হরবোলা তো আমাদের জলজ্যান্তভাবে শুনাইয়া দেয়! যে বসন্তের ভাব আমাদের মনে আনিয়া দিতে কবিগণ ছন্দের পর ছন্দ, কথার পর কথা গাঁথিয়া চলেন, হরবোলা ত গলার জোরে সেটা সারিয়া লয়, তবে কেন না হরবোলাকে কবির আসন দিই, কেন না তাহাকে true poet বলিয়া ভক্তি করি? * * আমাদের শিল্প বলে বিদ্যাসাগরের জরাজীর্ণ ক্ষণভঙ্গুর মাটির দেহের ছাঁচ লইয়া কি লাভ—এই লও * * * সাগরের ন্যায় প্রশান্ত গম্ভীর জ্ঞানজ্যোতিতে সমুজ্জ্বল তাঁহার তেজোময় অমর মূর্ত্তি, যে মূর্ত্তিতে তিনি আমাদের মনে আছেন, সেই মানস মূর্ত্তি।" বুদ্ধমূর্ত্তি সম্বন্ধে হ্যাভেল সাহেবের উক্তি কি হৃদয়গ্রাহী! " * * they (Indian Sculptors) would not take the hideousness of the starvation as the symbol of their worship; they thought not of the feeble wasted human body but only of the spiritual strength and beauty the Master had gained through his enlightment. They gave him a new spiritualised body broad-shouldered deep-chested golden coloured smooth-skinned supple and little as a young lion." এ সকল কথাগুলা বিজ্ঞ সমালোচকের পক্ষে নিতান্ত তুড়ি দিয়া উড়াইবার সামগ্রী নহে, রীতিমত ভাবিবার কথা। গ্রন্থখানি পাঠ করিলে শিল্পের বিভিন্ন আদর্শসমূহও প্রাচ্যশিল্পের বিশেষত্ব সম্বন্ধে মোটামুটি জ্ঞানলাভ হয়, একথা বলিতে পারি।

বিরামকুঞ্জ। শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ। প্রকাশক, শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, ২০১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। কাস্তিক প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য বারো আনা। "বিরামকুঞ্জ", 'কর্ম্মফল', 'নির্ব্বাসিত' প্রভৃতি পাঁচটি গল্পের সমষ্টি। ছোট গল্পের আর্টটুকু সর্ব্বত্র সুরক্ষিত না হইলেও গল্পগুলি সুপাঠ্য। হাস্য ও করুণরসের নিপুণ অবতারণায় এবং ভাষা ও বর্ণনা-ভঙ্গীতে উপভোগ্য। অবসর-যাপনের পক্ষে "বিরামকুঞ্জ" স্নিগ্ধসমীরসেবিত কুঞ্জের মত মনোরম লাগিবে বলিয়াই আমাদিগের ধারণা। গ্রন্থের ছাপা কাগজ ও বাঁধাইও বেশ মনোজ্ঞ হইয়াছে।

আর্য্য-নারী। দ্বিতীয় ভাগ। (ঐতিহাসিক)। শ্রীকালীপ্রসন্ন দাসগুপ্ত এম, এ ও শ্রীদক্ষিণারঞ্জন মিত্র-মজুমদার প্রণীত। কলিকাতা ৬১নং কলেজ ষ্ট্রীট, ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্স্ হইতে শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ১৩১৬। মূল্য এক টাকা। বাঁধাই ১০ মাত্র। গ্রন্থখানিতে 'দাহির-মহিষী' 'সংযুক্তা' 'কর্ম্মদেবী', 'লক্ষ্মীবাই' 'রাণী ভবানী' প্রভৃতি চব্বিশটি ঐতিহাসিক রমণীর পুণ্যকাহিনী সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। আদর্শের জন্য আমাদের বাহিরে যাইবার কোন প্রয়োজনই ছিল না। তবে ঘরের দিকে কখনো চাহিয়া দেখিতাম না, ইহাই দুঃখ। গ্রন্থকারদ্বয় এই সকল আদর্শকাহিনী-সংগ্রহেরভার গ্রহণ করিয়া সমগ্র দেশের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই! কাহিনী-গুলি অসঙ্কোচে অন্তঃপুরিকাবর্গের হস্তে দেওয়া যায়। ভারতের আকাশ-অনিল আজো যাঁহাদিগের অম্লান যশঃসৌরভে পরিপূর্ণ তাহারি সুবাসে বঙ্গরমণীর হৃদয় স্নিগ্ধ হইবে, উৎসাহে আনন্দে পূর্ণ হইবে! তবে দুঃখের সহিত গ্রন্থের দু-একটি ত্রুটিরও উল্লেখ করিতে হইতেছে। অধিকাংশ কাহিনীই স্কুলপাঠ্য ইতিহাসের মত অনাবশ্যক সাল-তারিখে ও দীর্ঘ বক্তৃতায় কণ্টকিত থাকায় গ্রন্থখানিতে সরসতার অভাব হইয়াছে এবং ভাষার প্রতি গ্রন্থকারদ্বয়ের অনেকস্থলেই ঔদাসীন্য প্রকাশ পাইয়াছে। আশা করি দ্বিতীয় সংস্করণে গ্রন্থখানির ভাষা সংস্কৃত হইবে।

মাধুরী।—শ্রীদেবকুমার রায় চৌধুরী প্রণীত। ১৩১৬। কলিকাতা ২৫ নং রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট, ভৈষজ্য-ষ্টিম-মেসিন-যন্ত্রে শ্রীউপেন্দ্রনাথ মণ্ডল দ্বারা মুদ্রিত। মূল্য আট আনা। এই ক্ষুদ্র কাব্যগ্রন্থখানি পাঠ করিয়া আমরা সুখী হইয়াছি। কবিতাগুলির কোনটিতেই কষ্টকল্পনা নাই। কয়েকটি কবিতায় ভাবের কিঞ্চিৎ অস্পষ্টতা দোষ থাকিলেও অধিকাংশ কবিতার ভাবই বেশ স্পষ্ট, সুন্দর। তাহা মুক্তপক্ষ বিহঙ্গের ন্যায় লঘু ও তরল গতিতে কাব্যালোকে উড়িয়া বেড়াইতেছে! ভাষারও কোথাও আড়ষ্ট-ভাব নাই! নবীন কবির সাধনা সফল হউক ইহাই আমাদিগের প্রার্থনা।

জীবন-স্রোত-না আশালতা? উপন্যাস। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রায় এম,এ, বি,এল প্রণীত ও প্রকাশিত। বর্দ্ধমান, রাধানগর। ১৩১৫ সাল। কলিকাতা গুপ্ত-প্রেসে শ্রীপ্রহ্লাদচন্দ্র দাস দ্বারা মুদ্রিত। মূল্য এক টাকা। গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া আমরা স্তম্ভিত হইয়াছি। গ্রন্থকার বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ উপাধিতে ভূষিত, অথচ গ্রন্থের ভাব ভাষা রুচি প্রভৃতি সকলই কদর্য্য! তদ্ভিন্ন কোথাও কার্য্য-কারণের মধ্যে একটা সমন্বয় নাই। উপাখ্যান-ভাগের কল্পনা নিতান্তই সৃষ্টিছাড়া! গ্রন্থখানি ভদ্র-সমাজ হইতে নির্ব্বাসনের যোগ্য! লেখকের 'ভূমিকা'য় বিজ্ঞাপিত 'যমুনা' উপন্যাস যদি প্রকাশিত না হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমাদিগের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ, 'জীবন-স্রোতে'র মতই যদি তাঁহার 'যমুনা'র গতি হয়, তবে যেন লোকালয়ে তাহার প্রকাশ না হয়। প্রকাশ করিলে অপর কোন ক্ষতি না হউক, বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষার প্রতি যে সাধারণের নিতান্ত অবজ্ঞা জন্মাইবে তাহা অভ্রান্ত সত্য!

শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা।

চয়ন।

ভূগর্ভে নগর।—পুরাকালে মহিশূর প্রদেশে চিতলদুর্গ পর্ব্বতের পাদদেশে চন্দ্রবল্লী নামে এক সমৃদ্ধ নগর ছিল। কালের প্রভাবে সে নগর ক্রমে ধ্বংস-প্রাপ্ত হইয়া ভূপৃষ্ঠ হইতে লুপ্ত হইয়াছিল। লোকে তাহার অতীত অস্তিত্বের কথা পর্য্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছিল। বহুদিন হইতে মহিশূর নগরের সন্নিকটস্থ মাঠের কৃষকগণ ভূমি কর্ষণ কালে মধ্যে মধ্যে পুরাতন মুদ্রা, স্বর্ণালঙ্কার বা অস্থি-খণ্ড দেখিতে পাইত। এই সকল সংবাদ পাইয়া ক্রমে মহিশূর রাজ্যের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের কর্ম্মচারীগণ নগর হইতে এক মাইল দূরে যাইয়া খনন আরম্ভ করেন। ছয় হাত খুঁড়িবা মাত্র ইঁট ও সুরকি দ্বারা গঠিত বিস্তৃত কতকগুলি দেয়াল বাহির হইল। ইঁটগুলি বেশ পাকা এবং আধুনিক ইঁটের অপেক্ষা অনেক বড়। কতকগুলি অদ্ভুত মাটির শিলমোহর ও শিশা এবং রৌপ্যের মুদ্রা বাহির হইয়াছে। শিলমোহরটি দেখিয়া মনে হয় ইহা অন্ধ্রগণের রাজত্বকালে গঠিত। মুদ্রাগুলির গাত্রে কতকগুলি বৌদ্ধ চিহ্ন অঙ্কিত আছে। মুদ্রাগুলি হইতে অনুমান করা যায় যে পুলুমায়ির অন্ধ্র রাজার কালে অর্থাৎ প্রায় দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে এগুলি নির্ম্মিত হইয়াছিল। রৌপ্য মুদ্রার মধ্যে কতকগুলি রোমদেশীয় মুদ্রা আছে। সেগুলির গাত্রে এক রোমীয় সম্রাটের মূর্ত্তি অঙ্কিত এবং তাহার নিম্নে জগদ্বিদিত অগষ্টস সিরাজের নাম খোদিত। এই মুদ্রাগুলি খৃষ্টপূর্ব্ব ৬৩ হইতে খৃষ্টাব্দ চতুর্দ্দশ সালের মধ্যে নির্ম্মিত। একটি ক্ষুদ্র হিন্দু মন্দির বাহির হইয়াছে। তাহার মধ্যে একটি ভগ্ন হনুমান মূর্ত্তি অবস্থিত। বর্ত্তমান মন্দিরটি বোধ হয় একটি বৃহত্তর মন্দিরের ভগ্নাংশ মাত্র। অনুমান দশ হাজার বৎসর পূর্ব্বে এই মন্দিরটি নির্ম্মিত হইয়াছিল।

এই ধ্বংসাবশিষ্ট নগরের প্রায় অর্দ্ধ মাইল পশ্চিমে কতকগুলি গিরিমালার মধ্যে বহুসংখ্যক ভূমধ্যস্থিত গুহা বাহির হইয়াছে। এই গুহাগুলি খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে বৌদ্ধ রাজাগণ তাঁহাদের রাজ্যস্থিত সন্ন্যাসী ও পরিব্রাজকগণের বাসের জন্য নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। অন্ধকারের মধ্য দিয়া অসংখ্য সোপানাবলি অবতরণ করিলে তবে এই সকল গুহার মধ্যে উপস্থিত হওয়া যায়। গুহাগুলি নানা আকারের পৃথক পৃথক গৃহের ন্যায় গঠিত। মধ্যে মধ্যে এক একটি বেদী আছে, বোধ হয় সাধুগণ এই সকল বেদীর উপর উপবিষ্ট হইয়া পূজা ও ধ্যানাদি করিতেন। দেয়ালগুলিতে এরূপ কারুকার্য্যবিশিষ্ট মূর্ত্তি সকল খোদিত রহিয়াছে, যে তাহার শিল্পচাতুর্য্য দেখিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। সমগ্র স্থানটির খননকার্য্য এখনও শেষ হয় নাই। ক্রমে আরও কত আশ্চর্য্য বস্তু বাহির হইবে তাহা এখন অনুমান করা কঠিন।

বুদ্ধ স্মৃতি।—পৃথিবীর মধ্যে কেবল একটি মহাত্মার স্মৃতিচিহ্ন পঞ্চবিংশতি শতাব্দীর অধিক পুরাতন। এরূপ পুরাতন সম্পদ আর কোন দেশে কোন জাতির নিকট নাই। এই স্মৃতিচিহ্নটি মহাত্মা বুদ্ধদেবের একটি দন্ত। সিংহলের কান্দি নগরে মালিগব (maligava) মন্দিরে ইহা বর্ত্তমান সময়ে রক্ষিত রহিয়াছে। এই বহুযত্নরক্ষিত দন্তটিকে বিশেষ ব্যক্তি ভিন্ন অপর কাহাকেও দেখিতে দেওয়া হয় না, কারণ সিংহলবাসীর বিশ্বাস যে এই দন্তের অধিকারী এক সময়ে সমগ্র পৃথিবীর অধীশ্বর হইবে। মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ সম্প্রতি সিংহলে আছেন। সিংহলের বৌদ্ধমঠের প্রধান পুরোহিতের অনুমতিক্রমে তাঁহাকে এই পবিত্র চিহ্নটি দেখিবার সুযোগ দান করা হইয়াছিল। চতুর্দ্দিকে শ্যামল পর্ব্বতমালার অত্যুচ্চ শৃঙ্গ, মধ্যে বহুদূর বিস্তৃত স্বচ্ছ, শান্ত, সুনীল সরোবর। তাহার উপকূলে বিরাট বৌদ্ধমঠ। তাহারই অন্তঃপুরে এই মালিগব মন্দির। মন্দির দ্বার মনোহর কারুকার্য্য খচিত গজদন্ত নির্ম্মিত। মন্দির মধ্যে বহুমূল্য কিংখাপ রজ্জুতে এক প্রকাণ্ড রৌপ্যাসন বিলম্বিত। তদুপরি

মেখলাকৃতি এক হিরণ্ময় মণিমুক্তা-খচিত বেদিকা। তাহার উপরে সেইরূপ কারুকার্য্য-খচিত ছয়টি হিরণ্ময় কৌটা, একটির মধ্যে অপরটি প্রবিষ্ট। সর্ব্বাভ্যন্তরের এক ফুট উচ্চ ষষ্ঠ কৌটাটির মধ্যে একটি সুবর্ণ পদ্ম। সেই সুবর্ণ শতদলের উপর বুদ্ধদেবের সমুজ্জ্বল দন্তটি রক্ষিত। তাঁহার দন্তদীপ্তি আধারখচিত বিবিধবর্ণের মণিমালায় প্রতিফলিত হইয়া মনোহর বিভিন্ন বর্ণে বেদিকার চতুর্দ্দিক রঞ্জিত করিতেছে।

এই বহুমূল্য স্মৃতিচিহ্নটির সংক্ষিপ্ত একটু ইতিহাস বোধ হয় সকলেরই মনোরঞ্জন করিবে। খ্রীষ্ট পূর্ব্ব পঞ্চ শতাব্দীতে কুশিনরের (গোরখপুর) বুদ্ধ চিতার ভস্মাবশেষ হইতে তাঁহার একটি দন্ত অবিকৃত অবস্থায় পাওয়া যায়। প্রাপ্তির পর দন্তপুর রাজ্যের (বর্ত্তমান গঞ্জাম প্রদেশে রাজমহেন্দ্রীনগর) নৃপতির নিকট ইহা রক্ষিত হয়। দন্তপুর নৃপতিগণ আট শত বৎসর কাল ইহা রক্ষা করেন। খ্রীষ্টাব্দ চতুর্থ শতাব্দীর প্রারম্ভকালে দাক্ষিণাত্যের পাণ্ডু নামে এক ব্রাহ্মণ রাজা ইহা স্বরাজ্যে লইয়া যান। তথায় তিনি ইহা নষ্ট করিবার জন্য নানাপ্রকার চেষ্টা পান। এই অসৎ চেষ্টায় অকৃত কার্য্য হইয়া তিনি বৌদ্ধ ধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। ইহার পর দন্তটি পুনরায় দন্তপুর রাজ্যে গমন করে। কিছু দিনের মধ্যেই দুর্ভাগ্য বশতঃ পুনরায় নবশত্রু আসিয়া উপস্থিত হইল। শত্রুর সহিত সম্মুখ সমরে প্রবেশের পূর্ব্বে দন্তপুররাজ বুদ্ধদেবের এই পবিত্র স্মৃতিচিহ্নটিকে তাঁহার কন্যার কবরী মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়া অর্ণবপোত দ্বারা কন্যা, জামাতা ও এক পুরোহিতকে সিংহল দ্বীপে প্রেরণ করেন। ৩১০ খ্রীষ্টাব্দে পলাতকগণ সিংহলে উপস্থিত হইলে, সিংহল-রাজ কীর্ত্তিশ্রী মেঘবর্ণ সেই পবিত্র দন্তটি রক্ষা করিবার ভার গ্রহণ করেন ও অনুরাধাপুর নগরে এক বিরাট মন্দির গঠিত করিয়া তন্মধ্যে তাহার প্রতিষ্ঠা করেন। প্রভূত অর্থ ব্যয় করিয়া তিনি বাৎসরিক দাথা-ধ-তু (দন্তোৎসব) উৎসবের আয়োজন করেন। ৪১৩ খ্রীষ্টাব্দে চীন পরিব্রাজক ফাহিয়ান যখন অনুরাধাপুরে গমন করেন, তিনি এই উৎসবের বিরাট মাহাত্ম্য দেখিয়া তাহা লিপিবদ্ধ করেন। ৪৫৯ হইতে ৪৭৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে রাজা ধতুসেন ইহার একটি হীরকখচিত আধার নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। ১১৯০ খ্রীষ্টাব্দে প্রবল-পরাক্রান্ত সিংহলরাজ পরাক্রমবাহু পুলস্তিপুরে রাজধানী পরিবর্ত্তন করিলে পর, এই দন্তটিও তথায় স্থানান্তরিত করা হয়, পরাক্রমবাহু ইহার প্রতিষ্ঠার জন্য এক বিরাট মন্দির নির্ম্মিত করেন। সে মন্দিরের সৌন্দর্য্য দেখিয়া আজিও পরিব্রাজকগণ মুগ্ধ ও চমৎকৃত। প্রায় ১২৪৪ খ্রীষ্টাব্দে রাজা বিজয় বাহু ইহাকে দেম্বদে-নেয় নগরে স্থানান্তরিত করেন। তথা হইতে রাজা ভুবনেকবাহু ইহাকে যপহু নগরে লইয়া যান। ১৩৬৮ খ্রীষ্টাব্দে ইহা শ্রীবর্দ্ধনপুরে (কান্দি) স্থানান্তরিত হয়।

১৩০৩ হইতে ১৩১৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে দক্ষিণ ভারতের পাণ্ড্য দেশের তামিল রাজা সিংহল আক্রমণ করেন ও দন্তটিকে মাদুরানগরে লইয়া আসেন। তৃতীয় পরাক্রমবাহুর কৌশলে ইহা পুনরায় সিংহলে নীত হয়। তাঁহার পুত্র ১৩১৯ খ্রীষ্টাব্দে হস্তিশেলপুরে ইহাকে প্রতিষ্ঠিত করেন। তৎপরে দ্বীপ মধ্যে যখন চতুর্দ্দিকে যুদ্ধ বিগ্রহ উপস্থিত হয়, সেই সময়ে এই দন্তটি দ্বীপ-মধ্যে নানাস্থানে লুক্কায়িত ছিল। অবশেষে ইহা জাফ্‌নার তামিল হিন্দুরাজগণের অধিকারে আইসে। ১৫৬০ খ্রীষ্টাব্দে পর্ত্তুগীজগণ জাফ্‌না অধিকার করিলে ইহা তাহাদিগের হস্তগত হয়। পর্ত্তুগীজ ঐতিহাসিক গণ বলেন তাঁহাদের রাজ প্রতিনিধি ইহাকে ধ্বংস করেন এবং ১৫৬৬ খ্রীষ্টাব্দে বিক্রম বাহু গজদন্ত নির্ম্মিত একটি দন্ত লইয়া বুদ্ধদেবের সেই পুরাতন পবিত্র স্মৃতিচিহ্ন বলিয়া ঘোষণা করিয়া কান্দিনগরে প্রতিষ্ঠিত করেন। সিংহলের ঐতিহাসিকগণ কিন্তু বলেন যে পর্ত্তুগীজগণের আগমনে আসল দন্তটি লুকাইয়া রাখিয়া তাঁহাদিগকে নিবৃত্ত করিবার জন্য একটি নকল দন্ত দেওয়া হইয়াছিল, সেইটিই তাঁহারা ধ্বংস করিয়াছিলেন।

যাহা হউক ১৫৮৬ খ্রীষ্টাব্দে সীতাবক্কের রাজা রাজ-সিংহ যখন কান্দি অধিকার করেন তখন এ দন্তটি যে কোথায় লুক্কায়িত ছিল তাহা তিনি জানিতে পারেন নাই। ১৫৮৯ খ্রীষ্টাব্দে নিষ্ঠাবান বৌদ্ধ রাজা বিমলচন্দ্র যখন কান্দির সিংহাসন অধিকার করেন, তখন পুনরায় এই দন্তটি বাহির হয়। ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে রাজা কীর্ত্তিশ্রী জয় সিংহ মালিগবের মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া তথায় এই দন্তটিকে প্রকাশ্য ভাবে রক্ষা করিয়াছেন।

'টাউয়ার'।

ইহা লণ্ডনের সর্ব্বপুরাতন রাজবাটী ও দুর্গ। লণ্ডনের নিকটবর্ত্তী অন্য রাজপ্রাসাদগুলির মত এটিও পুণ্যতোয়া "টেমস" নদীর ধারেই অবস্থিত। এটি এত পুরাতন যে অনেকের বিশ্বাস রোমানদের আমলেও ইহার কতক অংশ বর্ত্তমান ছিল। পরে নর্ম্মাণরা ইংলণ্ড জয় করিলে তাহাদের রাজা "বিজয়ী উইলিয়ম" এই স্থানে একটি কেল্লা নির্ম্মাণ করিয়া বিজিত দেশ শাসন করিবার ব্যবস্থা করেন। এবং চারিদিকে একটি চওড়া নালা কাটিয়া তাহা আবার একটি বৃহৎ প্রাচীর বেষ্টনে আবদ্ধ করিয়া ও সেই প্রাচীরের মধ্যে মধ্যে উচ্চ চূড়া তুলিয়া দুর্গরক্ষার বন্দোবস্ত আরও সুদৃঢ় করেন।

এখন এই টাউয়ার একটি পুরাতন দেখিবার স্থান মাত্র—রাজা বা রাজপরিবারের অবস্থিতি স্থান নহে। তবে—রাজ সংসারের যত মহামূল্য অলঙ্কার এখন এই স্থানেরই এক অংশে রক্ষিত।

এস্থানের ইতিহাস অতীব বিচিত্র। একটি অতি দুর্দ্দম্য জাতি কিরূপে শত বাধা বিপত্তির মাঝে থাকিয়া ধনে মানে শৌর্য্যেবীর্য্যে ও ক্ষমতায় পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে এই স্থান হইতে তাহার সবিশেষ বিবরণ পাওয়া যায়। কত যুদ্ধ বিগ্রহ কত নরহত্যা ও অমানুষিক অত্যাচার এই ভীষণ স্থানে ঘটিয়াছে তাহার ঠিক নাই।

আমি যে দিন প্রথম এই বড় বড় পাথর নির্ম্মিত কেল্লা বা রাজবাড়িটী প্রথম দেখি সেদিন পুরাতন রাজপুতানার রাজধানী ভীষণ পর্ব্বতের উপরিস্থিত এইরূপই পাথরে গাঁথা "মিবারের" দুর্গটি আমার মনে পড়ে। এ দুটি অনেকটা একরূপই দেখিতে। এই পুরাতন রাজপ্রাসাদ গুলির তুলনায় আজকালকার সমতলভূমিতে গঠিত বিলাস উদ্যানযুক্ত রাজবাটীগুলি নিতান্ত নিস্তেজ ও হীন বলিয়া মনে হয়। প্রাচীন রাজবাটী বা গড়গুলি যুদ্ধ বিগ্রহের রূঢ় ভাবমাখা স্থান আর আধুনিক রাজপ্রসাদগুলি যেন মূর্ত্তিমান নাট্যশালা।

জনতাপূর্ণ পথ ঠেলিয়া প্রথমে টিকিট লইবার স্থানে যাইতে হয়। পরে সেখান হইতে জলযান ও জনতাপূর্ণ টেমসের ধারের সুন্দর বাঁধা পথ দিয়া একটি ছোট খালের সেতু পার হইয়া এই দুর্গে প্রবেশ করিতে হয়। অদূরে টাউয়ারের বিখ্যাত সাঁকো (Tower bridge)। দ্বারদেশে এক ভীমাকৃতি—সশস্ত্র প্রহরী, তাহার মাথার উপর একটি প্রকাণ্ড কাল ঝাঁকড়া লোমের টুপীতে তাহাকে যেন ভীষণ কেশর বিশিষ্ট সিংহের মত দেখাইতেছে। ইহাদের নাম "বিফ ইটার" বা গোখাদক। এমন ভীষণদর্শন পুরুষ আমি অন্য কোথাও কখনও দেখি নাই।

এই স্থলেই Bell Tower "বেল-টাউয়ার" নামক একটি উচ্চ কক্ষে রাণী হইবার পূর্ব্বে এলিজাবেথ অনেক দিন কারারুদ্ধ ছিলেন। এই টাওয়ারটির পরই ভীষণ "Trotorgate" "ট্রটরগেট" বা রাজদণ্ডে দণ্ডিত লোকদের কারাগৃহে বা হত্যা স্থানে যাইবার পথ। এই পথ দিয়া অষ্টম হেনরীর রাজ্ঞী

"অ্যানাবেলিন্" "সার্ টমাস্ মুর্" ও "লেডী জেন্ গ্রেও" হত্যা স্থানে গমন করেন। ইহার পর আর একটি ভীষণ ঘটনা স্থল আছে তাহার নাম "Bloody Tower" "রক্তমঞ্চ-প্রাসাদ"। এই ঘরেই তৃতীয় এডওয়ার্ডের দুইটি শিশুকে তাঁহাদের অভিভাবক ও আপনার কাকা "ডিউক গ্লষ্টর" রাত্রিযোগে লোক লাগাইয়া হত্যা করেন। অনেক দিন পরে তাঁহাদের অস্থি এইখানে পাওয়া যায় এবং তাহা "আবির" চ্যাপেলে সমাধিস্থ হয়।

এই টাওয়ারের নিকটবর্ত্তী আর একটি প্রাসাদের নাম "Wakefield Tower" "ওয়েকফিল্ড টাউয়ার"। ইহা রাজ্যের সকল মণিমাণিক্য প্রভৃতি মুলাবান আসবাব রাখিবার স্থান। দর্শকেরা কাতার দিয়া দাঁড়াইয়া বিস্ফারিত নয়নে সেই জ্যোতির্ম্ময় পুরাতন সম্পদগুলি দেখেন। ঘরের মধ্য স্থলে একটি মণিরত্ন খচিত বেদীর সর্ব্বোচ্চ স্থানে রাজমুকুট খানি রক্ষিত। চারি দিকে অপরাপর সরঞ্জম। সকল জিনিষ গুলিই চারিদিকে আলোক প্রতিফলিত করিতেছে, মুকুটখানি তিন সহস্র খণ্ড চুনি-খচিত। রাজছত্রটিও এইরূপ কারু কার্য্যে রচিত। রাজতরবারি রাজমুকুট ও রাজ্যে অভিষিক্ত হইবার অন্যান্য সমস্ত সরঞ্জম সুন্দর ভাবে রক্ষিত হইয়া যেন কি এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য প্রকটিত করিয়াছে। সকল দর্শকেরই পক্ষে ইহা রমণীয় স্থান—বিশেষ রমণীগণ ইহা দর্শনে নিতান্ত মুগ্ধ হইয়া পড়েন। দর্শকদের মধ্যে বারআনা লোক তাঁহাদেরই জাতিভুক্ত দেখিলাম।

এই স্থান হইতে—White Tower—শ্বেত প্রাসাদের ভিতর প্রবেশ করিতে হয়। এই স্থানটি সর্ব্বাপেক্ষা আভ্যন্তরিক স্থান ও সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন। যাইবার পথেই একটি বৃহদাকার কামান রক্ষিত আছে দেখা যায়। এই কামানটির উপর চড়াইয়াই রাণী ভিক্টোরিয়ার মৃতদেহ সমাধিস্থানে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। এই টাওয়ারে ইংরাজের অস্ত্রাগার। এইটিই আমার মতে সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়জনক ও দর্শনীয় স্থান। ইহার উপরতালায় পুরাকালিক অস্ত্রশস্ত্র, নীচে তালায় আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র ও ভারতীয় ও অন্যান্য দেশের অস্ত্র শস্ত্র রক্ষিত। তাহাছাড়া ব্রীটিশ্ বীরদের স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ তাঁহাদের কতক অস্ত্রাদিও অতি সুব্যবস্থায় এখানে সজ্জিত আছে।

মধ্যযুগের বর্ম্মশিরস্ত্রাণধারী ভীষণদর্শন নাইটদের ভীমমূর্ত্তিগুলি অনেক স্থলেই বায়ুগামী ঘোড়ার উপর রক্ষিত। অতি দীর্ঘাকৃতি বল্লম ও ঢাল হাতে করিয়া তীরবেগে শত্রুর দিকে ধাবিত হইতেছেন এই ভাবে রাখা। তাঁহাদের এই গঠিত মূর্ত্তি দেখিলেও মনে ভয় হয়—জীবদ্দশায় তাহারা কতই না জানি ভীষণ ছিলেন। তাঁহাদের 'চওড়া তরবারি'গুলি (Broad sword) অতিশয় প্রশস্ত অতিশয় ভারি, আর লম্বা তরবারিগুলি নিতান্ত দীর্ঘ। আমাদের আজকালকার দিনে এমন লোক নাই যাঁহারা সেগুলি সহজে তুলিয়া ব্যবহার করিতে পারেন।

সেই স্থানের আর একটি অংশে নানা সময়কার কামান বন্দুক ও অসি ক্রমবিকাশ অনুসারে পরে পরে রক্ষিত। এক অবস্থার পরে আর একটি অবস্থা কেমন করিয়া আসিয়াছে সে সবগুলি অতি সুন্দরভাবে দেখান আছে। সেখানে আর একটি

দেখিবার জিনিষ দেখিলাম, সেটি ফরাসী বিপ্লবের দিনে ফরাসীজাতিদের দ্বারা উদ্ভাবিত অতি শীঘ্র নরমুণ্ডচ্ছেদকারী গিলোটিন নামক যন্ত্র। এই কলে অতি ক্ষীপ্রগতিতে একখানি শাণিত অসি পড়িয়া—নিমেষে অজস্র নরহত্যা করিতে পারে। তাহা ছাড়া যে কোনও বৃটীশ্‌ বীরের যুদ্ধে জাহাজ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে সেই জাহাজের বিশিষ্ট টুকরাগুলিও অতি সযত্নে এখানে রক্ষিত আছে। এমন বীর ভাব এমন বীরপূজা কোথাও দেখি নাই।

এই স্থান হইতে নামিলেই "শ্বেতপ্রাসাদের" বিস্তৃত প্রাঙ্গণে পড়া যায়। এ স্থানের দৃশ্য অতি মহান অতি ভীষণ ও অতিশয় বিস্ময়কর। একদিকে পাহাড়ের স্তূপের মত রাশি রাশি ভাঙ্গা কামান জড় করা আছে—এগুলি সব বৃটিসজাতির যুদ্ধ জয়ের পাওনা,—বিজিত দেশ ও নিপাতিত শত্রু হইতে গৃহীত এবং জয় চিহ্ন স্বরূপ অতি আদরে সংরক্ষিত। অপরদিকে সেই প্রসিদ্ধ কারাগার উচ্চ অন্ধকূপ "বক্যাম্প টাওয়ার।" এই সংকীর্ণ কারাগৃহেই যত গণ্য মান্য কয়েদীরা রুদ্ধ হইয়া থাকিতেন। কত লোক আজীবন এই অন্ধকূপে কাটাইয়াছেন!

ইহারই নিকটে এক প্রকাণ্ড প্রাঙ্গণে বধ্য-ভূমি অবস্থিত। এই স্থানটীতে এখনও একখানি হাড়কাট দেখাযায়। তাহাতে—অষ্টম হেনরীর দ্বিতীয় রাণী "আনাবোলিন্‌" লেডী জেন গ্রে প্রভৃতি কত রমণীই হত হইয়াছিলেন। রাণী ভিক্টোরিয়া তাই এই স্থানটি অতি মূল্যবান পাথর দিয়া সুন্দররূপে এখন বাঁধাইয়া দিয়াছেন।

উপসংহারে এই অন্ধকূপ গারদ-খানার কথা কিছু বিস্তারিত ভাবে বলি। এই মোটামোটা পাথর নির্ম্মিত গবাক্ষহীন কারাগৃহটি সাধারণ কয়েদীদের জন্য নহে—যত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের আবদ্ধ রাখিবার স্থান। কত রাজা কত রাজপুত্র কত রাণী কত রাজপুত্রী, কত যোদ্ধা রাজসচিব, ধর্ম্মবীর ও দেশহিতৈষী লোক এই কারাগৃহে বাস করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের নিদর্শন আর কিছুই নাই কেবল কাহারও কাহারও কারাগৃহের দেওয়ালে নিজ নামাঙ্কন বা মনের ভাব প্রকাশক নানারূপ ছবি আঁকা আছে। সেই বিস্ময়কর লেখাগুলি ভাবুকের মনকে উদাসীন করিয়া দিয়া সুদূর অতীতে লইয়া যায়।

এরূপ ছোট অন্ধকূপে একত্রে অনেকে আবদ্ধ থাকিয়া এইরূপ কাজে তাঁহারা মন ভুলাইয়া সময় কাটাইতেন। এখানকার বেশী ভাগ কয়েদীই ইংলণ্ডের দুর্দ্দিনের কর্ম্মবীর। দুর্দ্দান্তপ্রতাপ রাজা অষ্টম হেনরীর আমলের অনেক নাম দেখা যায়—তাঁর নিজেরই দুই মহিষী এইখানে কারারুদ্ধ ছিলেন। তার পরের নামগুলি চারিটি রাণীর—যথা"লেডি জেনগ্রে" "মেরী" "রাণী এলিজাবেথ" ও স্কটল্যাণ্ডের "মেরী কুইন।" ইহাদের লইয়া নানারূপ প্রলয় ঘটনায় দেশ দগ্ধ বিদগ্ধ হইতে থাকে। পরবর্ত্তী সময়ের ঘরাও বিপ্লবের দিনেরও অনেক কয়েদীর নাম লেখা আছে। আর ধর্ম্ম লইয়া চিরবিগ্রহের তো কথাই নাই। ধর্ম্মের প্রধান উদ্দেশ্য একতা ও শান্তি স্থাপন অথচ ধর্ম্মের নামেই সংসারে কত না অত্যাচারই সংঘটিত হইয়াছে।

কারাঘরগুলি অতিশয় ছোট ইহার খুব উচ্চে ছোট ছোট গবাক্ষ আছে, সেখানে মুখ



ফুলের ভাষায় বংশ-লিপি



বক্যাম্প টাউয়ারের দেওয়াল

বাড়াইয়া একটু আলো ও হাওয়া পাওয়া যায়। ঘরের মাঝে একটি মোটা থাম তাতে অনেকটা জায়গা জুড়িয়াছে, কক্ষ হইতে কক্ষান্তরে যাইবার পথ সরু ও অন্ধকার। কি স্তম্ভ কি দেওয়াল সকল স্থানই ছবি ও লেখা ভরা, অধিকাংশ লেখাতেই নশ্বর জীবনের অস্থায়ী সুখ সম্পদ ও ধর্ম্মের স্থায়ীত্বের কথাই অঙ্কিত। অনেকগুলি লেখাতেই আমাদের দেশের মত উদাসীন ভাব।

যে সকল ছবিগুলি খোদা আছে সেগুলি নানা রকমের রূপক (Alegorical Expression)। এক স্থানে একটি বৃহৎ দেবদারুগাছ বড় বড় ফলে ভরা। আর এক স্থানে একটি ক্রুশ আঁকা। অপর স্থানে একটি রক্ত মাখা হৃদয়ের ছবি। আর এক স্থানে যুদ্ধের অস্ত্র শস্ত্র। একস্থানে একটী লোক হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া কাতরে প্রার্থনা করিতেছে। আর এক স্থানে একটী ঘুঘু আঁকা। তার পাশেই একটি শান্তিসূচক ওলিভ গাছের পাতা। তার নিকটেই এক স্থানে এক ভক্তের হৃদয়ের ভিতর একখানি ক্রস্ আঁকা। কিছু দূরে একটি প্রকাণ্ড চালের ভিতর অনেক আঁটী শস্য আঁকা। পাশে কাঁটা গাছের মুকুট পরা একটি দেহবিচ্ছিন্ন মস্তক। তার দুই পাশে দুইটি মৃত দেহের অস্থিপঞ্জর। কোন ছবিটি যে কি অর্থে লেখা হইয়াছিল তা বুঝিয়া উঠিবার যো নাই।

প্রথম ছবি "রূপক ভাষা"। রাণী "জেন গ্রের" স্বহস্তে লেখা নামাঙ্কও আছে। তাঁর ক্ষীণ শরীরের মত হাতের লেখাও বড় ক্ষীণ। "পুল" নামক এক ব্যক্তির নামের পাশে তাঁহার নাম অঙ্কিত। তার তলায় লেখা—"He who sows in tears reaps in joy." যে কাঁদিতে কাঁদিতে কার্য্যারম্ভ করে, সে পরিশেষে প্রচুর শস্য লাভ করিয়া আনন্দ পায়।

সুধু জেন গ্রে নন—তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ ও শ্বশুর দেবরেরা সকলেই বহুদিন এই স্থানে আবদ্ধ থাকিয়া—দেয়ালে নানারূপ ভাবের কথা লিখিয়াছেন। "ডাড্‌লে" বংশীয় তাঁহার একজন আত্মীয় দেবর দেয়ালের একস্থানে যে একটি সুন্দর ছবি লিখিয়া গেছেন—

তাহা "ফুলের ভাষায় বংশলিপি।" ইহা কারাগৃহের দ্বিতীয় চিত্র। তাহার প্রতিলিপি উদ্ধৃত হইল। লেখাটির চারিদিকে নানারূপ লতাপাতা বেষ্টিত। একদিকে কাঁটাওয়ালা গোলাপ গাছ তার এক ভাই "রবার্টে"র নাম সূচনা করে। অপর দিকে "জীরেনিয়ম" ফুল ও পাতা—এটি লেডী জেনের স্বামী জর্জের নাম সূচক। আর একটি ফুল "হানিসাকল—" সেটি তার আর এক ভাই হেনরীর। চতুর্থটি "একর্ণ" নামক দেবদারু গাছের ফল। এটী আর এক ভায়ের। এইরূপে সমগ্র পরিবারের লোকের নাম একত্র আবদ্ধ করিয়া সেই বন্দী পুরুষ দুঃসহ জীবন কাটাইয়াছে।

রাণী জেনের জীবন কাহিনী অতিশয় পুণ্যময়। তিনি এক নিষ্পাপ বিদুষী রমণী ছিলেন। অতি অল্প বয়সেই তাঁর বিবাহ হয়। ষষ্ঠ এডওয়ার্ডের মৃত্যুর পর তাঁর শ্বশুর তাঁর অমতে জেদ করিয়া তাঁহাকে রাণী করেন। তিনি এগার দিন মাত্র রাণী হইয়াছিলেন। পরে তাঁর মামাতভগিনী "মেরী" আসিয়া তাঁহাদের সমস্ত পরিবারকে বন্দী করিয়া নিজে

রাণী হন। যে দিন তাঁহাদের বধ করা হয় সে দিন তাঁর স্বামীকে প্রথমে বধ্যভূমিতে লইয়া যাওয়া হইল—তিনি উপরকার জানালা হইতে সে দৃশ্য স্বচক্ষে দেখিলেন ও কিছুক্ষণ পরে নিজেও হাড় কাটে হত হইলেন।

এইবার আর কতকগুলি লেখার কথা সংক্ষেপে বলিয়া এ প্রবন্ধশেষ করিব।

এক স্থলে সেণ্টপলের উপদেশগুলি একত্রে লেখা আছে—

"Love the brothers, Fear God, Honor the King."

ভাইদের ভাল বাসো, ঈশ্বরকে ভয় করো, ও রাজাকে মান্য করো,—এই কয়টি সকল নীতির মূলে।

আর একটি স্থানে লেখা আছে—

Grief is overcome by patience."

অর্থাৎ "সহিষ্ণুতায় দুঃখ দূর হয়।

আর একটি স্থানে লেখা—

"Better to be in the house of mourning than in the house of Banqueting."

ভোজোৎসবের মধ্যে থাকা অপেক্ষা শোক তাপের মধ্যে থাকাই শ্রেয়।

"There is time for every thing—a time to be born—a time to die."

জীবনে সকল পরিবর্ত্তনেরই সময় আছে—জন্মিবার ও মরিবার। তার নীচে লেখা

"Use well the time of prosporety and remember well the hour of misfortune.

সৌভাগ্য সময়ের সদ্ব্যবহার করিও, এবং তখনও দুর্দ্দিনের কথা মনে রাখিও।

শ্রীইন্দুমাধব মল্লিক।

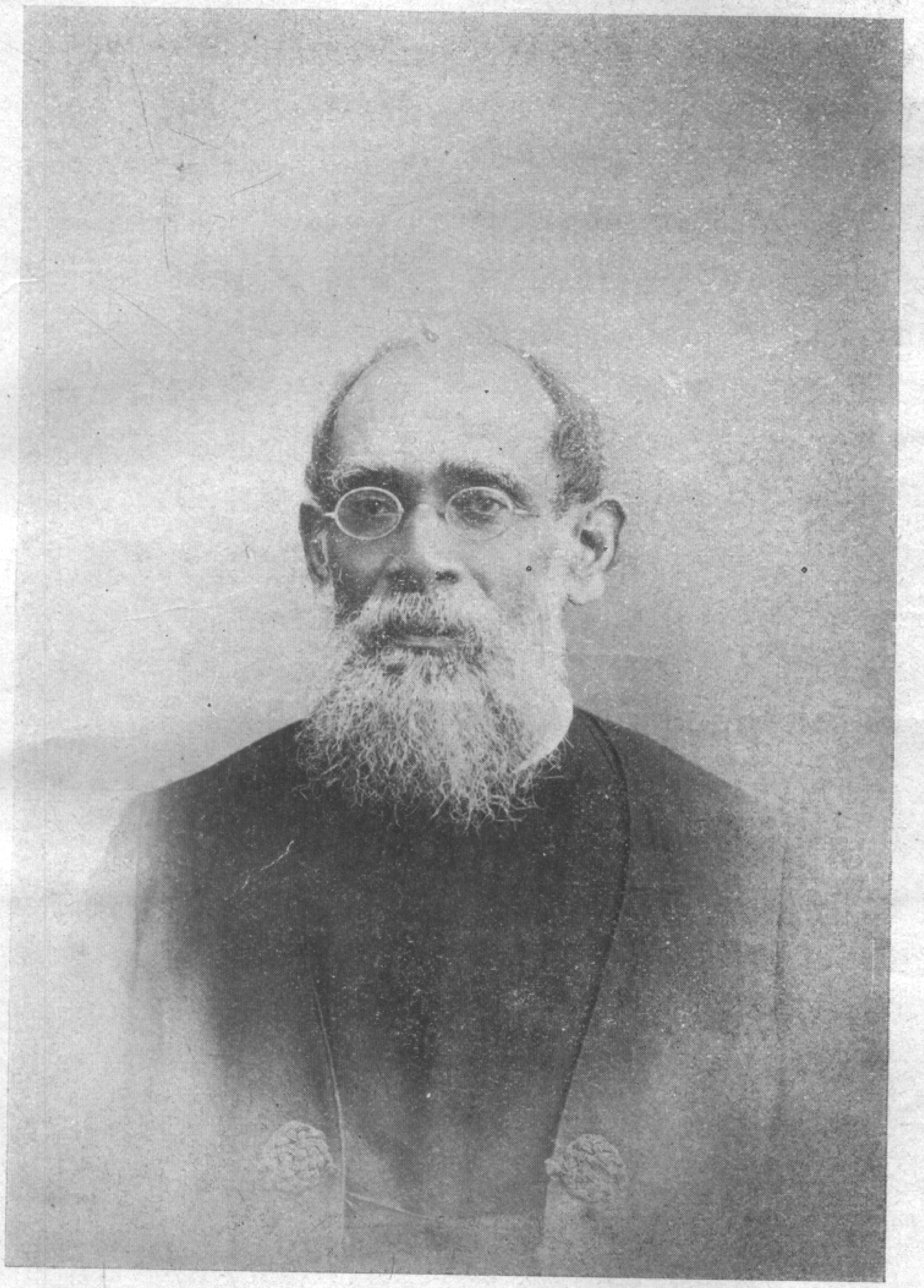
সুরেন্দ্রনাথের একটি কল্পনা।

বর্ত্তমানযুগের ভারতবাসীর নিকট শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথের পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক। যে সকল মহাপুরুষ একটা সম্মিলিত জাতীয় ভাব পুষ্ট করিয়া তুলিবার চেষ্টায় ও আমাদের বর্ত্তমান শাসনপদ্ধতির সংস্কার সাধনের সংগ্রামে কায়মনোবাক্যে নিঃস্বার্থ সেবা ও শ্রম করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই আমাদের পূজ্য। কিন্তু সুরেন্দ্রনাথই এই মহাব্রতসাধকদিগের গুরু—পথপ্রদর্শক। বস্তুতঃ তাঁহাকে ভারতে এই বর্ত্তমান জাতীয়তার স্রষ্টাস্বরূপ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কেবল বঙ্গদেশে নহে, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের বিচ্ছিন্ন শক্তিকে এক করিবার জন্যও ইনি যে কিরূপ অক্লান্ত চেষ্টা ও পরিশ্রম করিয়াছেন এবং এখনো করিতেছেন তাহা সকলেই জানেন। ধনীর ধনগৌরব চিরদিন থাকে না—মানীর মানসম্ভ্রম চিরদিন থাকে না,—কিন্তু ভারতগৌরব সুরেন্দ্রনাথের নামকীর্ত্তি, ভারতবাসীর ইতিহাসে, অক্ষয় অমররূপে চিরবিরাজিত থাকিবে সে বিষয়ে সংশয়মাত্র নাই।

ভারতবাসীকে রাজনৈতিক কর্ম্মে সম্মিলিত করিবার কল্পনা তাঁহার মনে কি করিয়া প্রথম উদিত হইয়াছিল—আমাদের অনুরোধে সে সম্বন্ধে তিনি যাহা লিখিয়া পাঠাইয়াছেন নিম্নে তাহা প্রকাশিত হইল। বলা বাহুল্য এজন্য আমরা তাঁহার নিকট সাতিশয় কৃতজ্ঞ। ভারতী সম্পাদিকা।

১৮৭৭ সালে জানুয়ারি মাসে মোগল

তাহা দেখিয়া সমগ্র ভারতকে সম্মিলিত করিবার



শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

পেট্রিয়ট' পত্রিকার বিশেষ সংবাদদাতারূপে তথায় গিয়াছিলাম। স্বর্গীয় কৃষ্ণদাস পাল তখন উহার সম্পাদক ছিলেন। আমি মনে মনে বলিলাম—"ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের নৃপতিগণের পক্ষে যদি একস্থানে এরূপে সমবেত হওয়া সম্ভব হয়, তাহা হইলে জনসাধারণ ও তাহাদের প্রতিনিধিগণের পক্ষেই বা এরূপ সম্মিলন অসম্ভব কিসে?" তাহার পর হইতেই আমি আমার মনোভাবটি কার্য্যে পরিণত করিতে অগ্রসর হইলাম। অচিরে ভারতগবর্মেণ্টই আমাকে এক অভিনব সুযোগ প্রদান করিলেন। ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই, কারণ রাজশক্তির সঙ্কীর্ণ নীতি চিরদিনই প্রজাশক্তির পুষ্টির পক্ষে সহায় হইয়া দাঁড়ায়। তদানীন্তন ভারতসচিব লর্ড সলিসবরি ভারতের সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার্থীগণের বয়সের সীমা ২১ বৎসরের পরিবর্ত্তে ১৯ বৎসরে পরিণত করিলেন। আমি তৎক্ষণাৎ ২১ বৎসরের সীমা পুনঃস্থাপিত করিবার জন্য এক আন্দোলন উপস্থিত করিলাম এবং কলিকাতা হইতে লাহোর, লাহোর হইতে বোম্বাই ও বোম্বাই হইতে মান্দ্রাজ পর্য্যন্ত নগরে নগরে সাধারণ সভা আহ্বান করিয়া পুরাতন বিধির আবশ্যক বুঝাইতে লাগিলাম। এই আন্দোলন ১৮৭৭ হইতে ১৮৭৯ সাল পর্য্যন্ত প্রায় দুই বৎসর সমভাবে চলিল। এই আন্দোলন প্রমাণিত করিয়া দিল যে, আমরা বিভিন্ন প্রদেশের ভারতবাসী—ধর্ম্ম, ভাষা ও সামাজিক রীতি নীতিতে যতই বিচ্ছিন্ন হই না কেন, কোন রাজনৈতিক অন্যায়ের প্রতিবিধান চেষ্টায়

সক্ষম। এই আন্দোলনের মধ্যে ভারতবাসী প্রথম তাহার ঐক্য ভাব ও অন্তর্শক্তির পরিচয় লাভ করিল,—এবং সেই ভাব ও শক্তির ফলে দশ বৎসরের মধ্যেই দেশে জাতীয় মহাসমিতি জন্মলাভ করিল। ইহা ভারতব্যাপী এক মহান রাজনৈতিক আদর্শ ও আকাঙ্ক্ষার অস্তিত্ব প্রমাণ করিয়া দিল। আমি ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের যাবতীয় সভাস্থলেই বক্তৃতা করিয়াছিলাম এবং বক্তৃতাকালে ভারতবাসীর মধ্যে একতার আবশ্যকতার প্রতি শ্রোতৃবর্গের বিশেষভাবে মনোযোগ আকর্ষণ করিবার চেষ্টারও ত্রুটি করি নাই। আমার তদানীন্তন বক্তৃতাসকল পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়াছে। ভারতের প্রধান প্রধান নগর হইতে লর্ড সলিসবরির নিকট সিভিল-সার্ভিসের বয়ঃসীমা বৃদ্ধি করিবার জন্য আবেদন পত্র প্রেরিত হইল। মুসলমানপ্রধান আলিগড় নগর হইতে পর্য্যন্ত একখানি আবেদনপত্র প্রেরিত হইল। আলিগড় মুসলমান কলেজের প্রতিষ্ঠাতা সার সায়েদ আমেদ এই নিবেদনপত্রের প্রধান উদ্যোগী ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি এই সম্মিলিত চেষ্টার প্রশংসা করিয়া তাঁহার এক বক্তৃতামধ্যে বলেন—

"ভারতে হিন্দু ও মুসলমান সুন্দরী ললনার নয়নযুগলের ন্যায়, একটির ক্ষতি করিলে অপরটি ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।"

এই আদর্শানুসারে কলিকাতার 'ভারত-সভা' য়্যালবার্টহলে ১৮৮৩ সালের ডিসেম্বর মাসে এক জাতীয় সমিতির অধিবেশনের আয়োজন করেন। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে নির্ব্বাচিত সভ্যগণ সমিতিতে সমবেত

আলোচনা করিবার জন্য নিমন্ত্রিত হন। প্রাতঃস্মরণীয় স্বর্গীয় রামতনু লাহিড়ী মহাশয় এই সমিতিতে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। এই সমিতি হইতেই জাতীয় মহাসমিতির সূচনা হয়। ১৮৮৪ সালে আমি পুনরায় ভারত-ভ্রমণে বাহির হই। রাওলপিণ্ডি ও মুলতান পর্য্যন্ত যাইয়া আমি একতার শিক্ষা প্রচার করি। তাহার পর বৎসর অর্থাৎ ১৮৮৫ সালে জাতীয় মহাসমিতির প্রথম অধিবেশন হয়। ভারতের একদিক হইতে অপরদিক পর্য্যন্ত ভ্রমণকালে আমার অনুরাগ ও উৎসাহ দেখিয়া মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর আমার বন্ধু রামকমল ভট্টাচার্য্যের নিকট বলিয়াছিলেন "সুরেন্দ্রনাথের উৎসাহ দেখিয়া আমার শুভ্র-কেশ আবার কৃষ্ণ হইয়া উঠিয়াছে।"

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

চিত্রব্যাখ্যা।

নকল গড়—শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু কর্ত্তৃক অঙ্কিত চিত্রের প্রতিলিপি। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত বিখ্যাত কবিতা "নকল গড়" এই চিত্রের বর্ণনীয় বিষয়। কবিতাটির অংশ বিশেষ উদ্ধৃত হইল ঃ—

জলস্পর্শ করবনা আর
চিতোর রাণার পণ—
বুঁদির কেল্লা মাটির পরে
থাক্‌বে যতক্ষণ।
কি প্রতিজ্ঞা, হায় মহারাজ,
মানুষের যা অসাধ্য কাজ
কেমন করে সাধবে তা আজ—
কহেন মন্ত্রিগণ।
কহেন রাজা, সাধ্য না হয়
সাধব আমার পণ।

*   *   *

মন্ত্রী কহে যুক্তি করি—
আজকে সারারাতি
মাটি দিয়ে বুঁদীর মত
নকল কেল্লা পাতি।

*   *   *

কুম্ভ ছিল রাণার ভৃত্য
হারাবংশীবীর
হরিণ মেরে আসছে ফিরে
স্কন্ধে ধনু তীর।
খবর পেয়ে কহে—কেরে
নকল বুঁদী কেল্লা মেরে
হারা বংশী রাজপুতেরে
করবে নত শির?
নকল বুঁদী রাখবো আমি
হারাবংশী বীর!

*   *   *

কলিকাতা, ২০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত ও ৪৪, ওল্ড বালিগঞ্জ রোড হইতে শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।



যুধিষ্ঠিরের মহাপ্রস্থান

শ্রীযুক্ত যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় কর্ত্তৃক অঙ্কিত মূল চিত্র হইতে

ভারতী।

৩৩শ বর্ষ] কার্ত্তিক ১৩১৬ [৭ম সংখ্যা

সেমিরামিসের ভারত-আক্রমণ।

আসিরীয় সাম্রাজ্যের কথা য়িহুদীদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রে পাওয়া যায়। মিশর, পারস্য ও আরব উক্ত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত ছিল। তাইগ্রীস্ নদের তীরে নিনেভ নগর উক্ত সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল। গ্রীক ঐতিহাসিক দায়োদোরস্ (Diodorus) উক্ত সাম্রাজ্যের প্রবল পরাক্রান্ত রাণী সেমিরামিসের ভারতাক্রমণ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

আসিরিয়া দেশে পুরাকালে নিনাস নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর রাজ্ঞী সেমিরামিস তাঁহার শিশুপুত্র নিনিয়াসের স্থলে সাম্রাজ্য চালনা করিতেন। সেমিরামিস্ ভারতের শৌর্য্য ও সম্পদের কথা শ্রুত হইলেন। তিনি শুনিলেন, পৃথিবীতে ভারতবাসীদিগের মত পরাক্রান্ত জাতি আর নাই, এবং ভারতবর্ষ পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা রমণীয় দেশ। বহুসংখ্যক নদনদী ভারতের বক্ষদেশে প্রবাহিত হইয়া উহার উর্ব্বরতা সম্পাদন করে। ভারতের জমীতে বৎসরে দুইবার ফসল উৎপন্ন হয়। দেশের অধিবাসীগণ প্রভূত ধনশালী এবং জীবিকার উপযোগী দ্রব্য তাহাদের গৃহে এত অধিক পরিমাণে সঞ্চিত যে তথায় কখনও দুর্ভিক্ষ হয় না। দেশের জলবায়ু স্বাস্থ্যকর এবং দেশে এত অধিক সংখ্যক হস্তী যে শুনিয়া অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়। ভারতের হস্তী আফ্রিকাজাত হস্তী অপেক্ষা অধিক সাহসী ও বলবান্। ভারতবর্ষে স্বর্ণ, রৌপ্য, লৌহ, পিত্তল ও মূল্যবান্ প্রস্তরাদি প্রচুরপরিমাণে পাওয়া যায়।

ভারতের প্রতি রাজ্ঞীর বিদ্বেষ বুদ্ধি উদ্বুদ্ধ হইবার কোনও কারণ ঘটে নাই—তথাপি উক্তরূপ ঐশ্বর্য্য সম্পদের কথা শুনিয়া রাজ্ঞীর হৃদয়ে ভারত জয় করিবার একটি প্রবল আকাঙ্ক্ষা উদ্দীপিত হইল। স্তাব্রো-বেতস (Stobro bots) নামধেয় এক রাজা তখন ভারতবর্ষে রাজত্ব করিতেন; তাঁহার অগণিত সৈন্য ও অসংখ্য সুসজ্জিত হস্তী ছিল। এবং শত্রুগণ তাঁহার ভয়ে সর্ব্বদা সন্ত্রস্ত থাকিত। সুতরাং ভারত জয় করিতে হইলে প্রভূত শক্তি সঞ্চয়ের প্রয়োজন ইহা বুঝিয়া সেমিরামিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত বিভিন্ন বিভাগের শাসনকর্ত্তাদিগের প্রতি দেশের সাহসী বীর যুবকগণকে সৈন্যদলভুক্ত করিতে আদেশ করিলেন। প্রত্যেক শাসনকর্ত্তার উপর নির্দ্দিষ্টসংখ্যক সৈন্য সংগ্রহভার

অর্পিত হইল। তিন বৎসরের মধ্যে সাম্রাজ্যের যাবতীয় বিভাগের সৈন্যগণ নূতন অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া বাক্ট্রিয় দেশে (Bactria) এক নির্দ্দিষ্ট স্থানে মিলিত হইবে এই আদেশ প্রচারিত হইল। সাম্রাজ্যের মধ্যে জাহাজ নির্ম্মাণপারদর্শী যত লোক ছিল, সমুদ্রতীরবর্ত্তী ফিনিসিয়া, সিরিয়া, সাইপ্রাস্ প্রভৃতি স্থলে তাহাদিগকে নৌ-বাহিনী নির্ম্মাণের জন্য প্রেরণ করা হইল। নৌকাসকল এরকম ভাবে নির্ম্মাণ করিতে বলা হইল যেন ইচ্ছামত তাহাদিগকে খণ্ড খণ্ড অংশে খুলিয়া লইয়া অনায়াসে যথা ইচ্ছা তথায় বহন করিতে পারা যায়। সিন্ধুনদ ভারতের প্রান্তদেশে অবস্থিত। ভারত জয় করিতে হইলে এই নদ পার হইতে হইবে। উক্ত নদের নিকটবর্ত্তী স্থানে নৌনির্ম্মাণোপযোগী কাষ্ঠের অভাব থাকায় দূর হইতে নৌকা প্রস্তুত করিয়া লওয়া যুক্তিসিদ্ধ বিবেচিত হইয়াছিল।

ভারতবর্ষের সহিত যুদ্ধে হস্তীর নিতান্ত প্রয়োজন, কিন্তু সাম্রাজ্ঞীর অধিক হস্তী ছিল না। হস্তীর অভাব পূরণ করিবার জন্য তিনি এক কৌশল অবলম্বন করিলেন। ভারতবাসীগণের বিশ্বাস ছিল—ভারতের বাহিরে কোথাও হস্তী নাই। রাজ্ঞী তিনলক্ষ ষাঁড় নিহত করিয়া, তাহাদের চর্ম্মে কৃত্রিম হস্তী নির্ম্মাণ করিতে বহুসংখ্যক লোক নিযুক্ত করিলেন। কয়েকখানি চর্ম্ম এক সঙ্গে সেলাই করিয়া তন্মধ্যে খড় পুরিয়া হস্তীর অবয়ব গঠন করা হইল এবং প্রত্যেক কৃত্রিম হস্তীর মধ্যে এক একটী লোক রাখিয়া উষ্ট্রপৃষ্ঠে চাপান হইল। এই সকল নরহস্তনির্ম্মিত হস্তী দূর হইতে দেখিতে বাস্তব হস্তীর মতই হইয়াছিল। যথেষ্ট সতর্কতার সহিত এই হস্তীনির্ম্মাণ কার্য্য সম্পন্ন হইল।

নৌকা ও হস্তী নির্ম্মাণে দুই বৎসর অতিবাহিত হয়। তৃতীয় বৎসরে সংগৃহীত সৈন্যদল বাক্ট্রিয়াভিমুখে অগ্রসর হইল। কেহ কেহ বলেন সেমিরামিসের ত্রিশলক্ষ পদাতিক, দুই লক্ষ অশ্বারোহী, এক লক্ষ রথ এবং এক লক্ষ উষ্ট্রারোহী সৈন্য যুদ্ধার্থে বহির্গত হয়। প্রত্যেক উষ্ট্রারোহীর হস্তে চারি হস্ত দীর্ঘ এক একখানি তরবারি ছিল। দুই সহস্র নৌকাও উষ্ট্র পৃষ্ঠে চালান হইয়াছিল। কৃত্রিম হস্তী সমুহের ভীষণ আকার দেখিয়া যাহাতে অশ্বগণ ভীত হইয়া পলায়ন না করে, তজ্জন্য অশ্বারোহীগণ উহাদের নিকট স্বীয় অশ্বগণকে বারংবার লইয়া গিয়া উক্ত দৃশ্যে অভ্যস্ত করিয়া লইয়াছিলেন।

এই ভীষণ যুদ্ধোদ্যোগবার্ত্তা যখন স্তাব্রোবেতসের কর্ণগোচর হইল তখন তিনিও সৈন্য সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইলেন। ভারতের নদী তীরস্থ স্থান সমূহে এক প্রকার বেত জন্মে এবং ঐ বেত দ্বারা এক রকম নৌকা নির্ম্মিত হয়, উহা কখনও পচিয়া যায় না। এই বেত দ্বারা স্তাব্রোবেতস চারি সহস্র নৌকা নির্ম্মাণ করাইলেন। অস্ত্রশস্ত্রও প্রচুর পরিমাণে নির্ম্মিত হইল। স্তাব্রোবেতস স্বয়ং ভারতের সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়া সেমিরামিসের সৈন্যদল অপেক্ষা বৃহত্তর সৈন্যদল গঠন করিলেন। পূর্ব্বেই তাঁহার প্রভূত হস্তী ছিল আরও বহু-সংখ্যক হস্তী ধৃত করিয়া তিনি তাহাদের সংখ্যা

বৃদ্ধি করিলেন। শত্রুগণের ভীতি উৎপাদক হস্তীগুলিকে রণ-সজ্জায় সজ্জিত করা হইল। তাহাদের সংখ্যাধিক্য ও যুদ্ধ সজ্জা দেখিয়া বোধ হইয়াছিল—সে আক্রমণ প্রতিরোধ করা মানবক্ষমতার অতীত।

সমস্ত উদ্যোগ সমাধা করিয়া স্তাব্রোবেতস্ সেমিরামিসের নিকট দূত প্রেরণ করিলেন—এবং তাহাকে জানাইলেন—তিনি সেমিরামিসের কোনও ক্ষতি করেন নাই তথাপি যখন তিনি তাঁহাকে আক্রমণ করিতে আসিতেছেন, তখন যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারিলে তিনি রাজ্ঞীকে ক্রুশ বিদ্ধ করিবেন।" দূতের মুখে এই কথা শুনিয়া সেমিরামিস হাস্য করিয়াছিলেন, এবং বলিয়াছিলেন "ভারতবর্ষের রাজা আমার কার্য্যের দ্বারাই আমার বীরত্বের পরিচয় পাইবেন।"

সিন্ধুনদের তটে উপস্থিত হইয়া সেমিরামিস্ দেখিলেন শত্রুর নৌবাহিনী যুদ্ধোদ্যমে তাঁহার অপেক্ষা করিতেছে। তিনি বলিষ্ঠ সৈন্য দ্বারা স্বীয় নৌবাহিনী সজ্জিত করিয়া যুদ্ধারম্ভ করিলেন। নিকটেই স্থল সৈন্য সাহায্যের জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিল। উভয় পক্ষ বীরত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিল,—অবশেষে সেমিরামিসেরই জয় হইল। তিনি শত্রুপক্ষের এক সহস্র নৌকা জলমগ্ন করিলেন এবং বহুসংখ্যক সৈন্য বন্দী করিলেন। স্বীয় কৃতকার্য্যতায় উৎফুল্ল হইয়া সেমিরামিস্ সিন্ধু নদের তীরস্থ যাবতীয় দ্বীপ ও নগর অধিকার করিয়া এক লক্ষ ভারতীয় সৈন্য বন্দী করিলেন। এবং প্রভূত ব্যয়ে সিন্ধুনদের উপরে এক নৌ-সেতু নির্ম্মাণ দ্বারা সৈন্য সহ নদী পার হইয়া পলায়মান ভারতসৈন্যদিগের অনুসরণ করিলেন। কেবলমাত্র ষাট্ হাজার সৈন্য সেতু রক্ষার জন্য রাখিয়া গেলেন। সেমিরামিসের সৈন্যের অগ্রভাগে কৃত্রিম হস্তীগুলি স্থাপিত দেখিয়া ভারতবাসীগণ বিস্ময়ে অভিভূত হইল। কিন্তু সত্বরই সেমিরামিসের প্রতারণা ধরা পড়িল। অতঃপর স্তাব্রোবেতস্ সেমিরামিসের বিরুদ্ধে পুনরায় অভিযান করিলেন।

সৈন্যদল পরস্পরের অভিমুখীন হইল। স্তাব্রোবেতস্ অশ্বারোহী ও রথারোহীদিগকে সর্ব্বপ্রথমে এবং তৎপশ্চাতে অনেক দূরে অধিকাংশ পদাতিক সৈন্য স্থাপন করিলেন। শত্রু পক্ষের কৃত্রিম হস্তীদল সর্ব্বাগ্রে এবং তৎপশ্চাতে অনেক দূরে অধিকাংশ সৈন্য স্থাপিত হইল। ভারতীয় অশ্বারোহীদিগের অশ্বগণ হস্তিযুদ্ধে অভ্যস্ত ছিল, সুতরাং কৃত্রিম হস্তী দেখিয়া ভীত হইল না, পরন্তু নির্ভীকভাবে তাহাদের অভিমুখে ধাবিত হইল। কিন্তু নিকটে আসিয়া তাহাদের অস্বাভাবিক মূর্ত্তি দেখিয়া এবং তাহাদের গাত্র নির্গত অনভ্যস্ত গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া ভীত হইয়া পড়িল। তাহারা বিশৃঙ্খল ভাবে ধাবিত হইয়া পরস্পরের উপরে পতিত হইতে লাগিল এবং অনেক আরোহীকে ভূপতিত করিয়া, শত্রুসৈন্যের মধ্যভাগে ধাবিত হইল। অশ্বারোহিদিগের পলায়নে স্তাব্রোবেতস্ বিস্মিত হইলেন। কিন্তু ভীত না হইয়া স্বীয় পদাতিক সৈন্যদল ও হস্তিদল শত্রুর অভিমুখে চালনা করিলেন। এক বিপুলকায় হস্তীর উপরে নিজে উপবিষ্ট হইয়া তিনি রাণী সেমিরামিস্‌কে আক্রমণ করিলেন, সেমিরামিসও স্বীয় কৃত্রিম হস্তিদল সম্মুখে চালান করিলেন। কিন্তু ভারতীয় হস্তির বিরুদ্ধে

তাহারা ক্ষণমাত্রও তিষ্ঠিতে পারিল না। তাহাদের অনেকগুলি আরোহীসহ ভারতীয় হস্তীর পদদলিত হইল, কতকগুলি শুণ্ডাঘাতে আকাশে নিক্ষিপ্ত হইল; কতকগুলির অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইল। মৃতদেহে যুদ্ধস্থল সমাচ্ছন্ন হইল এবং আসিরীয় সৈন্য রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল। সেমিরামিসের সম্মুখস্থ হইয়া স্তাব্রোবেতস্ তাঁহার বাহু ও স্কন্ধদেশ শর-বিদ্ধ করিলেন। শরাঘাতে জর্জ্জরিত হইয়া রাণী যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিয়া অশ্বের ক্ষিপ্রগতিতে রক্ষা পাইলেন। তাঁহার হতাবশিষ্ট সৈন্য সিন্ধুনদের সেতু অভিমুখে ধাবিত হইল। কিন্তু সকলে এক সঙ্গে ধাবিত হওয়ায় বিষম বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল। পরস্পরের উপর পতিত হইয়া অনেকে পথেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। অবশিষ্ট সৈন্য যখন সেতুর সমীপে উপনীত হইল তখন ভারতীয় সৈন্য পশ্চাতে সমাগত। পলায়মান সৈন্যগণের অনেকে ভীতি বশতঃ নদীগর্ভে পতিত হইল। স্বল্পাবশিষ্ট সৈন্য নদীপার হইলে নৌসেতুর বন্ধনরজ্জু সমুদয় কাটিয়া দেওয়া হইল। নদী পার হইয়া সেমিরামিস্ নিরাপদ হইলেন। স্তাব্রোবেতস্ আর তাঁহার অনুসরণ করিলেন না। জ্যোতি-ষীগণ গণনা করিয়া বলেন যে সেমিরামিসের অনুসরণ করিলে তাঁহার মঙ্গল হইবে না। রাজা নিজেও অনেক দুর্নিমিত্ত দর্শন করিয়া-ছিলেন। আসিরীয় সৈন্যের এক তৃতীয়াংশ মাত্র অবশিষ্ট ছিল। তাহা লইয়া সেমিরামিস্ স্বীয় রাজ্যে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

উপরি-বর্ণিত ঘটনা দায়োদোরাসের গ্রন্থে বর্ণিত আছে। সেমিরামিস্ সম্বন্ধীয় অনেক কিংবদন্তী দায়োদোরস্ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ভারতাক্রমণ তন্মধ্যে একটি। কিন্তু আধুনিক পণ্ডিতগণ বলেন সেমিরামিস্ নাম্নী কোনও রাণী আসিরিয়াতে কখনও রাজত্ব করেন নাই। তাঁহাদের মতে এ সমস্তই মিথ্যা। তবে ঘটনাটী সত্য না হইলেও তাৎকালিন জগতে ভারতের শৌর্য্যবীর্য্যের কিরূপ খ্যাতি ছিল বর্ণিত গল্প হইতে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

শ্রীতারকচন্দ্র রায়।

পাকচক্র। সপ্তম দৃশ্য।

চন্দ্রকান্তের প্রবেশ।

চ। প্রাণটা যে ষোলআনাই হুহু করছে! আঃ শশী যে দুদিন থেকে কোথায় গেল—কিছুই বুঝতে পারছিনে;—এমন কি করতে হয়—প্রেয়সি!

(নেপথ্যে—ও চন্দ্রকান্ত বলি ও চন্দ্রকান্ত)

আবার এই সময় কর্ত্তাবাবু ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি করছেন! নিস্তব্ধে যে একটু বিরহ জ্বালা ভোগ করব—তারও যো নেই!

কর্ত্তার প্রবেশ।

ক। চন্দ্রকান্ত এ কি ব্যাপার! এ কি কাণ্ড!

চ। কি হয়েছে?

ক। আমি ত কিছুই তলাতে পার-ছিনে—তুমি ছাড়া কেউ পারবে না।

(ঝুড়ি মাথায় সন্দেশওয়ালীর প্রবেশ)

ক। একি! এ যে এখানে পর্য্যন্ত এসে উপস্থিত! বেরো বলছি বেরো। কি করি বল দেখি চন্দ্রকান্ত—এ বেটি বলছে—আমি সন্দেশ ফরমাস দিয়েছি—কিন্তু দিব্যি করে বলছি—আমি এর বিন্দুবিসর্গ জানিনে।

চ। তাইত!

স-ওয়ালি। আপনকার বড়লোকের কি রকম কথা বাবু!—আপনিই ত চিঠি দিয়েছ! অর্জ্জুন ময়রা কি এমনি—আমাকে চিঠি শুদ্ধ পাঠিয়েছে—এই দেখ—

ক। (চিঠি দেখিয়া) তাই ত আমারি ত নাম সই দেখছি! চন্দ্রকান্ত ভয় পেয়োনা যাদু,—তুমিই কি আমার নামে এ কাজ করেছ? সত্য করে বল—আমি কিচ্ছু বলব না।

চ। আমার ঘাড়ে দোষ নিলে যদি দামটা দিতে না হয়—তাহলে আমি রাজি আছি। কিন্তু তাতেও যখন আপনি রেহাই পাবেন না তখন সত্য কথা বলাই ভাল—আমি এর কিছুই জানিনে।

(খাজাওয়ালীর প্রবেশ)

খা-ওয়ালী। এজ্ঞে কি রকম আপনার বাড়ীর লোক সব—খাজা গজা মতিচুর এনে—এত ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি করছি—কেউ নিতে আসছে না—কাজেই উপরে উঠে আসতে হোল!

ক। খাজা গজা মতিচুর!

খা-ওয়ালি। এজ্ঞে হাঁ?

ক। কেন?

খা-ওয়ালি। তা কি করে জানব—আপনি ফরমাস পাঠিয়েছ আপনিই বলতে পার।

ক। আমি ফরমাস পাঠিয়েছি?

খা-ওয়ালি। ওমা! অস্বীকার যাও নাকি? আজকাল দেখছি ধর্ম্ম নেই। ভাগ্যি ছেলেটা চিঠিখানা সঙ্গে দিয়েছে—এই দেখ!

চিঠি প্রদান।

ক। দেখ চন্দ্র তুমি দেখ—যদি কিছু বুঝতে পার। আমার মনে হচ্ছে আমি স্বপ্ন দেখছি।

চ। ঠিক মনে করুন দেখি—আপনি এ রকম স্বপ্ন আর কোন দিন দেখেছিলেন কিনা?—কোন বিয়ের ইচ্ছা করে—

ক। না বাবা আমি ত মোটেই মনে করতে পারছিনে।

চ। আচ্ছা আমি সন্ধান নিচ্ছি।

চন্দ্রকান্তের প্রস্থান ও রসগোল্লাওয়ালীর প্রবেশ।

র-ওয়ালি। আজ্ঞে কাঙ্গালিচরণ রসগোল্লা পান্তুয়া পাঠিয়ে দিলে এক একটা চেখে দেখতে আজ্ঞে হয়।

ক। চেখে দেখব! নিয়ে যা তোর রসগোল্লা পান্তুয়া; আমি দেখছি পাগল হয়ে যাব! ও চন্দ্রকান্ত তুমি আবার কোথায় গেলে! কিছু কি সন্ধান করতে পারলে?

(কচুরী নিমকি প্রভৃতি লইয়া আর একজনের প্রবেশ)

ক-ওয়ালী। আজ্ঞে খাস্তা কচুরী নিমকি সিঙ্গেড়া পাঁপড় এই সব এনেছি; আঃ একটু বসি।

অন্য সকলে। বেশ বলেছ—আমরাও বসি—সেই অবধি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা ধরে গেল?

ক। কৃতার্থ হলুম! তোমরা সকলে মিলে এখানে বসে বসে খাওয়া দাওয়া কর—আমি চল্লুম—

(সকলে পুনরায় দাঁড়াইয়া উঠিয়া)

১ম। তা যাবে যাও সন্দেশের টাকাটা দিয়ে যাও বাপু, জান ত অর্জ্জুন ময়রা—

২য়। আমার টাকাটা আগে মশায়—

৩য়। এজ্ঞে আমরা বড় গরীব,—দোহাই—

৪র্থ। টাকা না দিলে আমরা কিছুতেই ছাড়ব না।

ক। কি সর্ব্বনাশ! নিজের বাড়ীতে যে আমাকে বন্দী করলে! সর্ বলছি—নইলে—নইলে!

(বাজিওয়ালার প্রবেশ)

ক। এ আবার পুরুষ মানুষ! তুমি কেহে? কি মিষ্টি এনেছ? আর অবিশ্বাস করার যো নেই নিশ্চয়ই আমি সব ফরমাস দিয়েছি।

বা-ওয়ালা। অজ্ঞে না আমি কোন মিষ্টি আনি নি।

ক। মিষ্টি আননি? ভারী যে আশ্চর্য্য মনে হচ্ছে! শ্যামাধন চট্টোপাধ্যায়ের কাছ থেকে কোন মিষ্টান্নের ফরমাস পাওনি?

বা-ওয়ালা। আজ্ঞে না, আমি—বা—

ক। খুব আশ্চর্য্য! খুব আশ্চর্য্য! সবাই ফরমাস পেয়েছে কেবল তুমি পাওনি? এ হতেই পারে না—

বা-ওয়ালা। তা পেয়েছি বই কি—

ক। পেয়েছ—আঃ বাঁচালে—তাই বল—

স-ওয়ালী। দামটা চুকিয়ে দাওনা মশায়—

খা-ওয়ালী। আর কত দেরী করব—

ক। আঃ ভদ্রলোকটার সঙ্গে একটু কথা কইতেও দেবে না?

ক-ওয়ালী। তা কওনা—কথা কইতে কইতে কি আমাদের টাকা দিতে পার না বাবু।

র ওয়ালি। আমাদের কি ঘর কন্না নেই বাবু—২৪ঘণ্টা আমরা এখানেই কাটাব।

ক। চুপ কর—চুপ কর বলছি। তা তোমাকে কি ফরমাস দিয়েছি—বাবা!

বা-ওয়ালা। আমি বাজিকর! বাজি আনতে বলে ভুলে গেছেন দেখছি।

মিষ্টান্ন ওয়ালীগণ। ওঁর ঐ রকম মেজাজ! সব আনতে বলেন—আর টাকা দেবার বেলা ভুলে যান,—বুঝলে কথাখানা?

ক। আমি বাজি আনতে বলেছিলুম!

স-ওয়ালী। ঐ শোন!

(সকলের হাস্য)

বা-ওয়ালা। নইলে আনব কেন বলুন?

ক। তা ত ঠিকই! আমি যখন সন্দেশ আনতে বলেছি, রসগোল্লা আনতে বলেছি—কচুরী নিমকি খাজা গজা সব আনতে বলেছি—তখন নিশ্চয় বাজিও আনতে বলে থাকব।

বা-ওয়ালা। তবে কোথায় পোড়াব মশায়?

ক। কোথায় আর পোড়াবে? আমার মাথায় হলেই ভাল হয়। বলি ও চন্দ্রকান্ত?

(চন্দ্রকান্তের হাঁপাইতে হাঁপাইতে প্রবেশ)

চ। মশায়—বড় বড় গাড়ী জুড়ীতে রাস্তা ভরে গেছে—লোকে লোকে গিস গিস করছে।

ক। কেন কেন? আমি তাদেরও কি ফরমাস দিয়েছি?

চ। সবাই বলছেন—আপনার নিমন্ত্রণ চিঠি পেয়ে তাঁরা বরযাত্রী এসেছেন।

মিষ্টান্নওয়ালীগণ। ঐ শোন্ শুনলি?

চ। আপনি কি কোন চিঠিপত্র—

ক। একটু ভাবতে দাও—চিঠি পত্র ত কই কিছুই মনে করতে পারছিনে বাবু!

চ। কিন্তু শুনছি বিনোদ বাবুর সঙ্গে শশীর বিয়ে দেবার জন্যে—

ক। বিনোদের সঙ্গে শশীর বিয়ে! তাই নাকি গিন্নির মৎলব? কি সর্ব্বনাশ! চন্দ্রকান্ত তুমি এগুলোকে বিদায় কর—আমি আসছি? প্রস্থান।

স-ও। মশাই কে আপুনি—শালাবাবু বুঝি—

চ। দূর হ পাজিনী—

রস-ও। নানা দেখছ না—উনি বোধহয় ভগ্নিপোত হবেন।

চ। মলো মাগী—বেরো—

খা-ও। নাগো না—দেখছ না—জামাই বাবু হবেন—

চ। আমি কে সে খবরে তোদের দরকার?

ক-ও। তা যেই হও আপুনি—আমাদের সে কথায় কাজ কি—টাকাটা আমাদের চুকিয়ে দিলেই যাই।

চ। তা দিচ্ছি—নীচে চল—উঠনে বসগে—

সকলে। তা যাচ্ছি! সেকথা ত এতক্ষণ বল্লেই হোত। এখন দেখছি—ইনি বাবুর ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির।

(মিষ্টান্নওয়ালীগণের প্রস্থান। বাজিওয়ালার সম্মুখে আগমন)

বা। আমিও কি নীচে যাব?

চ। তুমি কে হে?

বা। আমি বাজি এনেছি—

চ। বাজি! তা যাও—যাও—নীচেই যাও—আমি এখনি আসছি!

বাজিওয়ালার প্রস্থান।

চ। শেষকালে আমার বিনোদ বাবুর সঙ্গে দ্বন্দ্ব যুদ্ধ চলবে নাকি? প্রাণ ধরে আমি শশীকে তাকে দিতে পারব না—এতে যে বাঁচে যে মরে! ওঃ বেশ বুদ্ধি যুগিয়েছে! তেমন বেগতিক দেখি—তখন বাজিগুলোকে বোমা বলে ধরিয়ে দেব—দেখি শশীর সঙ্গে বিনোদ ভায়ার বিয়েটা কি করে হয়?

প্রস্থান।

বেহুলা।

শারদ প্রভাত ঝলে গাঙ্গুড়ের জলে—
হাসে সৈকতে শ্যাম গ্রামখানি
তরুবীথিকার তলে;
কোলে লয়ে মৃত পতি,
ভেলায় ভাসিছে সতী,
তীরে পুরবাসী ভাসে নয়নের জলে
শারদ প্রভাতকালে।

ও কে যায় ও কে যায়।
কদলীর ভেলা করে টলমল
উতলা দখিণ বায়,

তরঙ্গের তালে বাজে করতাল
জগৎ দেখিবি আয়,
ও কে যায় ও কে যায়!

হা হা হা রে নববধূ!
বাসর শয়নে প্রেম বন্ধন
কাটি গেছে প্রাণবঁধু!
গেছে আলো হাসি গেছে উৎসব
গেছে জগতের মধু,
হা হা হা রে নববধূ।

ওগো সতি ওগো সতি;
ছাড় ও প্রয়াস পাগলের আশ
ওগো মিথ্যা ব্রতবতী।
মৃত্যু অকরুণ নির্ম্মম দারুণ।
কেমনে জীয়াবে পতি।
ওগো সতি ওগো সতি!

অয়ি সুকুমারী লতা।
হের নদী ঘোর এ কি যাত্রা তোর
অকূলেতে যাবি কোথা?
মকর কুম্ভীরে গরসিবে যে রে
রাখ্ ও দারুণ কথা—
অয়ি সুকুমারী লতা!

শোভন সীমন্ত তলে
গত রজনীর আঁকা সিন্দূর
শুক তারা সম জ্বলে,
কনক প্রভাতে শত আভরণ
ঝলমলে চেলীতলে,
মণিময় অঞ্চলে!

'মরি গো ভগিনী মোর।
কাল যে তুহারে সাজায়ে দিয়েছি
বাঁধি মাণিকের ডোর'
ধেয়ে সপ্ত ভাই আসি নদী তীরে
কাঁদে করি মহা রোর;—
'মরি গো ভগিনী মোর।'

'চল ফিরে যাই ঘরে—
আহা কে পাষাণ কনক পুতলী
ভাসায়ে দিয়াছে নীরে।
কাঁদিছে জননী তিতায়ে ধরণী
চল বোন্ চল ফিরে,
বধিবি কি জননীরে?'

যুড়িয়া যুগল পাণি,—
ভাসি আঁখিনীরে বেহুলা সবারে
কহে বাধা নাহি মানি;
"জীবনে মরণে স্ত্রীর স্বামী গতি
আর কিছু নাহি জানি"
যুড়িয়া যুগল পাণি!

ভেসে যায় ভেলা জলে,
পুরবাসী যত সজল আঁখিতে
দাঁড়ায়ে গাঙ্গুড় তলে,
নমিছে কেহ বা কেহ জল লয়ে
অঙ্গে ও শিরে ঢালে,
"সতী গেছে এই জলে!"

যায় দিন যায় রাত,
বুকে মৃত পতি ধ্যানরতা সতী
দেবে করে প্রণিপাত;
"কায় মনে যদি ভালবেসে থাকি
আবার পাইব নাথ"
ভাবে সতী দিন রাত।

গেল পক্ষ গেল মাস!
অনাবৃত শিরে লয়ে রবিতাপ
সহে বালা উপবাস,
বরষার জল ঝরি অবিরল
বিগলিল পট্টবাস;
চলে যায় বর্ষ মাস।

করাল তামসী নিশি;
গরজে গগনে অশনি সঘনে
চমকিয়া দশদিশি,

করি মহা রোর বহে বায়ু ঘোর
বিশ্ব ভুবন গ্রাসি ;
ভয়াল তামসী নিশি।

তিমিরে ভুবন ভরা ;
নাহি ঊর্দ্ধ অধঃ দিগ্বিদিক-বোধ।
দ্যুলোক ভূলোক ঘেরা—
বজ্রাগ্নির শিখা সর্প জিহ্বা সম
লেহন করিছে ধরা ;
তিমিরে ভুবন ভরা !

কাঁপে সতী থর থর ;
উত্তাল তরঙ্গে খসি পড়ে ভেলা
সহেনাকো আর ভর !
ইষ্ট দেবতারে মনে মনে স্মরে
নেত্রে নীর ঝর ঝর !
কাঁপে সতী থর থর।

সহসা তিমির টুটি
নন্দন বন ফুল্ল কুসুম
নয়নে উঠিল ফুটি !
প্রিয় সম্ভাষে কিন্নর বালা
হাসি হাসি পড়ে লুটি,
সহসা তিমির টুটি !

"হা রে অবোধিনী বালা,
মৃতের কঙ্কালে লয়ে হেন কালে
কোথা যাস্ বেয়ে ভেলা ?
আয় হেথা আয় নন্দনের বায়
করিবি প্রমোদ লীলা ;
হারে অবোধিনি বালা।"

ভ্রুভঙ্গে ফিরায়ে মুখ
সতী ভাবে চিতে "শুধু এ জগতে
ব্যথিতের তরে দুখ,
পতিত লতারে পায়ে দলিবারে
সকলের বাড়ে বুক" !
লাজে অপমানে মূক !

ঘুচিল নন্দন বন ;
সহসা প্রবল হিমানী সম্পাতে
ভরি গেল ত্রিভুবন,
নিদারুণ শীতে অঙ্গে হানে সূচী
দুর্ব্বিসহ সে বেদন,—
ঘুচিল নন্দন বন !

হেরে সতী নদী তীরে
বিচিত্র হর্ম্ম্যে ধনীর কুমার
রতন পালঙ্ক পরে,
হেরি বেহুলারে মোহে অভিভূত
ত্রাসে ধায় ধরিবারে—
নদীর নিকট তীরে।

একা নিরুপায় নারী !
হৃদয়ের তলে আবরি কঙ্কাল
ভয়ে কাঁপে থরথরি !
"রাখ অবলারে বিপদ পাথারে
দীননাথ ভয়হারি।"
ডাকে অসহায়া নারী।

মিলাল সে মায়াপুরী ;
পূর্ব্বদিক-পথে কিরণ বন্যা উথলিল বিশ্ব ভরি।
অপগত ত্রাস সঞ্চারিত আশ
পতিরে হৃদয়ে ধরি,
হেরে সতী চাহি,— দেববালাগণ
দাঁড়ায়ে তাহারে ঘিরি,
অমিয়ে কুম্ভ ভরি।

শ্রীআমোদিনী ঘোষ।

বীজগণিতের প্রাচীন ইতিহাস। *

বর্ত্তমান সময়ে বীজগণিতের ইতিহাস চর্চ্চা করিলে দেখা যায় বীজগণিতকে ভারতের প্রাচীন সম্পদ বলিয়া দাবী করিবার উপযুক্ত প্রমাণের বড়ই অভাব। ইহার একমাত্র কারণ—ভারতে বীজগণিতের চর্চ্চা একবারে লয় পাইয়া গিয়াছে। বেদ, বেদান্ত, জ্যোতিষ, সাহিত্য, দর্শন, কাব্য প্রভৃতির ন্যায় যদি বীজগণিতও অর্থকরী বিদ্যা হইত, তবে অবশ্যই আমরা ভারতীয় চতুষ্পাঠিগুলিতে তাহার আলোচনার আশা করিতে পারিতাম। তাহা হইলে কখনই উহা এত অবহেলিত হইয়া এই দরিদ্র দেশ হইতে নির্ব্বাসিত হইত না।

বর্ত্তমান সময়ে য়ুরোপেই বীজগণিতের (Algebra) প্রভূত আদর ও উন্নতি। সে উন্নতির মূল কোথায়? কোন দেশ বা কোন জাতি ইহার প্রথম আবিষ্কারক ও পথপ্রদর্শক?

মুসলমান, গ্রীক্, ও হিন্দু এই তিন জাতি এই প্রশ্নের সমস্বরে উত্তর করিতেছেন—"বীজগণিত আমাদের উদ্ভাবিত শাস্ত্র।" বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা এই তিন জাতির দাবীর প্রাচীন ইতিহাস আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব।

মুসলমানেরা বলেন—

"খ্রীষ্টীয় ৮ম শতাব্দীর মধ্যভাগে খলিফা অলমামুনের রাজত্ব সময়ে খোরাসন প্রদেশস্থ মহম্মদ বেন্ মুশা সর্ব্বপ্রথম বীজগণিত প্রকাশ করেন। মুশার পর দশম্ শতাব্দীর প্রারম্ভে মহম্মদ আবুল ওয়াফা বীজগণিত প্রচারিত করেন। তখন য়ুরোপের কুত্রাপি গণিতের বীজ অঙ্কুরিত হয় নাই।"

য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ মুসলমান ঐতিহাসিকের উক্তি অস্বীকার করিতেছেন না। পরন্তু মুসলমানগণ বীজগণিত রক্ষা করিয়াছেন বলিয়া য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ মুসলমানদিগের নিকট প্রভূত পরিমাণে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছেন। কিন্তু মুসলমানেরা ইহাকে রক্ষা করিয়াও যে বহুকাল ধরিয়া ইহার কোন উন্নতি করিতে পারেন নাই তাহা মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিতেও তাঁহারা কুণ্ঠিত নহেন।

দ্বিতীয় পক্ষ গ্রীকদিগের মত এইরূপ :—

"খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে গ্রীকদেশে ডায়োফেন্‌টাসের আবির্ভাব। ইনিই (Diophantus) বীজগণিতের আবিষ্কর্ত্তা। তাঁহার রচিত বীজগণিত গ্রন্থ (Arithmaticorum Lebrisex) ৩৬০ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত হয়। পঞ্চম শতাব্দীতে গ্রীকের সুপ্রসিদ্ধা বিদুষী মহিলা Hipatia তাহার টীকা প্রকাশ করেন। তার পর গ্রীকদের ভাগ্যের নানারূপ পরিবর্ত্তন ঘটে। কনষ্টাণ্টিনোপল তুর্কির হস্তগত হয় ও গ্রীক ভূমি রাষ্ট্রবিপ্লবে উৎসন্ন হইয়া যায়। এই বিপ্লব সময়ে মুসলমানেরা গ্রীসের অনেক রত্নের অধিকারী হন। Diophantus, Euclid, Apollonius প্রভৃতি বহু মনীষিগণের অমূল্য পাণ্ডুলিপি সমূহ এই অবসরে মুসলমানদিগের রত্নভাণ্ডারের সম্পদ বৃদ্ধি করে। ক্রমে মুসলমানেরা আরবী ভাষায় তাহাদের অনুবাদ

---

* Colebrook's Essays, Asiatic Researches Vol. XII, Elphenstone's History of India, Amirali's History of Serason, Hotton's Dictionary, Encyclopœdia Britanica,

প্রচার করিয়া নিজের গৌরব ও সম্পদের পরিচয় প্রদান করিতে থাকেন।" ইত্যাদি (১)

অতঃপর তৃতীয় পক্ষ ;—

বর্ত্তমান সময়ে হিন্দুদিগের একমাত্র বীজগণিত গ্রন্থ যাহা পাওয়া যায়, তাহা ভাস্করাচার্য্যের জ্যোতিষ শাস্ত্র সংগ্রহের অংশ। পণ্ডিতচূড়ামণি ভাস্করাচার্য্যের সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ সিদ্ধান্তশিরোমণি। ইহার পূর্ব্বাভাস বীজগণিত নামে পরিচিত। (২) এই বীজগণিতের সংগ্রহ সম্বন্ধে ভাস্করাচার্য্য লিখিয়াছেন :—

"ব্রহ্মাহ্বয় শ্রীধর পদ্মনাভ বীজানি যস্মাদতিবিস্তৃতানি।
আদায় তৎসারমকারি নূনং সদ্যুক্তিযুক্তং
লঘুশিষ্যতুষ্ট্যৈ ॥"

অর্থাৎ ব্রহ্মা, শ্রীধর ও পদ্মনাভ নামক বীজগণিত প্রণেতাদিগের গ্রন্থ বিস্তৃত বিধায় শিষ্যদিগের পরিতুষ্টির জন্য আমি এই সকল গ্রন্থ হইতে সারসংগ্রহ করিয়া যুক্তিযুক্ত ভাবে এই সংক্ষিপ্ত বীজগণিত প্রস্তুত করিলাম।

উপরিউক্ত শ্লোক হইতে অবগত হওয়া যায় যে তৎকালে পণ্ডিতদিগের চতুষ্পাঠিতে ব্যাকরণ ও অলঙ্কার শাস্ত্রাদির ন্যায় বীজগণিত শাস্ত্রেরও অধ্যাপনা হইত। এবং সেই জন্য অধ্যাপকদিগকে টীকা সহ সহজ এবং সংক্ষেপ করিয়া ঐ সকল গ্রন্থাদি সংগ্রহ করিতে হইত। ভাস্করাচার্য্যও স্বীয় শিষ্যদিগের জন্যই এরূপ সংক্ষিপ্ত বীজগণিত রচনা করিয়াছিলেন।

ইহা হইতে আরও অবগত হওয়া যায় যে ব্রহ্মা, শ্রীধর, পদ্মনাভ নামক তিন ব্যক্তিরও তিনখানা বীজগণিত তৎকালে প্রচারিত ছিল।

ভাস্করাচার্য্য মহারাষ্ট্রীয় পণ্ডিত। তিনি ১১১৪ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সুতরাং তাহার সংগ্রহ অবলম্বনে দেখা যাইতেছে যে খ্রীষ্টিয় দ্বাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বেও ভারতে বীজগণিতকারের অভাব ছিল না।

উক্ত শ্রীধর, পদ্মনাভ, ও ব্রহ্মা ব্যতীত শ্রীপতি, লল্ল, ব্রহ্মগুপ্ত ও আর্য্যভট্ট প্রভৃতি পণ্ডিতগণও এক এক খানা বীজগণিত রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া শুনা যায়। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে এই সকল গ্রন্থের একবারেই অভাব।

বহুদিন প্রাচ্যভূমিতে থাকিয়া মিঃ ডেভিস্ (Devis) হিন্দুগণিত ও জ্যোতিষ সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করেন। তিনি ব্রহ্মগুপ্তের বীজগণিত গ্রন্থের আলোচনায় গ্রন্থকারকে সপ্তম শতাব্দীর লোক বলিয়া অনুমান করেন। হাণ্টার সাহেবও ব্রহ্মগুপ্তের আবির্ভাব ৬২৮ খ্রীষ্টাব্দে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পুরাতত্ত্ববেত্তা সুপণ্ডিত কোলব্রুক্ বহু গবেষণার পর সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে আরবীয়েরা বীজগণিত শাস্ত্রের সহিত পরিচিত হইবার পূর্ব্বে ব্রহ্মগুপ্ত আবির্ভূত হইয়াছিলেন। কিন্তু ব্রহ্মগুপ্তই যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন বীজগণিতকার তাহাও বলা যাইতে পারে না। কেন না আর্য্যভট্টের গ্রন্থ আর্য্যভট্টীয় তাহা অপেক্ষাও বহু প্রাচীন। আর্য্যভট্টের আর্য্যভট্টীয়

(১) অবশ্য সকলেই অবগত আছেন যে ইউক্লিডের ও এপলনিয়সের গ্রন্থ সমুহ আরবী ভাষাতেই সর্ব্বপ্রথমে প্রচারিত হইয়াছিল।

(২) পূর্ব্বভাগের প্রথম অংশ "লীলাবতী" ইহা পাটীগণিত বা ব্যক্তগণিত, দ্বিতীয় অংশ বীজগণিত বা

একখানি জ্যোতিষ গ্রন্থ। এই গ্রন্থে বীজগণিত আছে। আর্য্যভট্টের এই বীজগণিতের অধ্যায় ভাস্করাচার্য্যের শিষ্য গণেশ উদ্ধার করিয়াছিলেন। সুপণ্ডিত ভাওদাজী বহু গবেষণার পর দেখাইয়াছেন যে আর্য্যভট্ট ৩৯৮ শকাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই আর্য্যভট্টের পূর্ব্বে কোন হিন্দু বীজগণিতকারের নাম অবগত হওয়া যায় না। লল্ল, পদ্মনাভ, শ্রীপতি, শ্রীধর প্রভৃতি যে সকল বীজগণিতকারের নাম অবগত হওয়া গিয়াছে তাঁহারা সকলে আর্য্যভট্টের পরবর্ত্তী লোক। (১)

আমরা ক্রমে মুসলমান, গ্রীক ও হিন্দুদিগের বীজগণিতের প্রাচীন ইতিহাস স্থূল ভাবে আলোচনা করিলাম। এই স্থূল আলোচনায় যতদূর প্রত্যক্ষ প্রমাণ অবগত হওয়া যায়, তাহাতে গ্রীক গণিতবেত্তা ডায়োফেণ্টাস্‌কেই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। কিন্তু য়ুরোপীয়

---

(১) এই প্রবন্ধ সংকলনে কটক রাভেন্সা কলেজের অধ্যাপক শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় এম, এ মহাশয়ের সহিত আমার যে পত্র ব্যবহার হইয়াছিল তাহা হইতে লল্ল, পদ্মনাভ, শ্রীপতি, শ্রীধর সম্বন্ধীয় অংশ এখানে সযত্নে উদ্ধৃত করিলাম। যোগেশ বাবু লিখিয়াছেন—

"লল্লের তন্ত্রের নাম ধীবৃদ্ধিদ। এই গ্রন্থে বীজগণিত দেখিতে পাই না। তাঁহার একখানা পাটীগণিত ছিল। তাহা ভাস্করের উল্লেখে অনুমান করা যায়। অদ্যাপি তাহা অজ্ঞাত। প্রথমে লল্লকে বৃদ্ধ আর্য্যভট্টের প্রত্যক্ষ শিষ্য মনে করিয়াছিলাম, পরে দীক্ষিতের (যোগেশবাবু ৺ শঙ্করবালকৃষ্ণ দীক্ষিতের কথা লিখিয়'ছেন) হেতু দেখিয়া তাঁহাকে প্রায় ৫৬০ শকে আনিতে হইয়াছে।

পদ্মনাভ ও শ্রীধরের বীজগণিত পাওয়া যায় নাই। ইহাদের বিষয় প্রায় কিছুই জানা নাই। কোলব্রুক সাহেব শ্রীধরের গণিতসার নামক এক অঙ্ক পুস্তক ও ক্ষেত্রগণিত পাইয়াছিলেন। দ্বিবেদী মহাশয় (মহামহোপাধ্যায় সুধাকর দ্বিবেদী) বহুকষ্টে তাঁহার ত্রিশতিকা নামক এক পাটীগণিত পাইয়াছেন। ইহাতে বীজগণিত নাই। এই শ্রীধরের কথাই ভাস্কর উল্লেখ করিয়াছেন কি না তাহাও নিঃসন্দেহে বলা কঠিন। দ্বিবেদী মনে করেন হয়ত এই শ্রীধর নগরকন্দলীর রচয়িতা, তাহা হইলে তিনি ৯১৩ শকে ছিলেন। নগরকন্দলীকর্ত্তা ভট্ট শ্রীধর ও শ্রীশ্রীধর ভট্টাচার্য্য দক্ষিণ রাঢ়ে ভূরিসৃষ্টি (বর্ত্তমান ভুরসুট) গ্রামের বাঙ্গালী। কিন্তু দীক্ষিত, মহাবীর নামক জৈন ধর্ম্মাবলম্বী এক গণিতবেত্তার সারসংগ্রহ নামক ব্যক্তগণিত দেখিয়াছেন। সেই সারসংগ্রহে শ্রীধরাচার্য্য নামক গ্রন্থকারের গ্রন্থের উল্লেখ আছে। মহাবীর সম্ভবতঃ ৭৭৫ শকে ছিলেন। এই হেতু দীক্ষিত শ্রীধরকে ৭৭৫ শকের পূর্ব্বের লোক মনে করেন। বোধ হয় ইহাই ঠিক।

কোলব্রুক সাহেব বলেন—শ্রীধরের পূর্ব্বে পদ্মনাভ ছিলেন। এজন্য দীক্ষিত মনে করেন পদ্মনাভ ৭০০ শকের পূর্ব্বের লোক। দ্বিবেদীজী পদ্মনাভ মিশ্র নামে এক ব্যক্তির ব্যবহারপ্রদীপ নামক সংহিতা মুহূর্ত্তরূপ গ্রন্থ পাইয়াছেন। কিন্তু তাহার অন্তভাগ পান নাই। কাজেই গ্রন্থকারের সময় অজ্ঞাত রহিয়াছে এবং সময় জ্ঞান বিনা ইনি ভাস্করোক্ত পদ্মনাভ কি না তাহাও বলা যাইতে পারে না। কিন্তু পদ্মনাভ জ্যোতিষী ছিলেন বলিয়া তাঁহার ব্যবহার প্রদীপে জানা যায়। ব্যবহার প্রদীপে ভোজরাজকৃত রাজমার্ত্তণ্ডের বচন আছে। অতএব এই পদ্মনাভ ভোজরাজের পূর্ব্বের অর্থাৎ ৯৬৪ শকের পূর্ব্বের লোক বলিয়া বোধ হয়।

"শ্রীপতি কৃত পাটীগণিত, বীজগণিত ও সিদ্ধান্তশেখর নামক জ্যোতিষ সিদ্ধান্ত ছিল। কিন্তু কোনটাই পাওয়া যায় নাই। যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহা অন্য প্রকার গ্রন্থ,—যথা রত্নমালা, জাতকপদ্ধতি, মুহূর্ত্তরত্নাবলী, রত্নসার। এতদ্‌ ভিন্ন দ্বিবেদীজী দৈববলে কাশীতে ধীকোষ্ঠীসংজ্ঞ নামাকরণ পাইয়াছেন তাহাতে রচনাকাল

নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকদের মত অন্যরূপ। তাঁহারা ভারতবর্ষকেই বীজগণিতের আদিভূমি বলিয়া মনে করেন। আমরা বীজগণিতের ক্রম বিকাশের সহিত সে আলোচনায় উপনীত হইতে চেষ্টা করিব।

আমরা ইতিপূর্ব্বে মুসলমান ঐতিহাসিকের মত উদ্ধৃত করিয়াছি। তাঁহাদের মতে বেন মুসাই বীজগণিতের প্রথম প্রবর্ত্তক। এদিকে সুপণ্ডিত Cowell সাহেব লিখিয়াছেন— ৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে খলিফা মামুনের রাজত্বকালে আরবীয়গণকর্ত্তৃক সর্ব্বপ্রথমে ভারতীয় বীজগণিত গ্রন্থ আরবী ভাষায় অনুবাদিত হয়। আরবীয়েরা ভারতীয় কোন্ গ্রন্থকারের কি গ্রন্থ অনুবাদ করিয়াছিলেন, কাউয়েল্ সাহেব তাহা নির্দ্দেশ করেন নাই। যাহাই হউক, সেই সময়ে বা তৎপূর্ব্ব শতাব্দীতে পদ্মনাভ, লল্ল, ব্রহ্মগুপ্ত, আর্য্যভট্ট প্রভৃতি বহু ভারতীয় বীজগণিতকার আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ইহার দুই শতাব্দী পরে নির্ব্বাসিত অল্‌বেরুণীও একখানা সংস্কৃত বীজগণিত আরবী ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। ঠিক এই সময়ে ডায়োফেণ্টাসের বীজগণিতও তাহাদের জ্ঞাননেত্রে সমুদ্ভাসিত হইয়া উঠে। এবং আবুল ওয়াফা তাহার একখানা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর অনুবাদ প্রচার করেন। আবুল ওয়াফার এই গ্রন্থকে মুসলমানগণ অনুবাদ গ্রন্থ বলিয়া অস্বীকার করেন। কিন্তু আর্ম্মানী পণ্ডিত গ্রীগরি (ইনি ইংরেজী গ্রন্থে Abul Pharagius বলিয়া পরিচিত) বহু গবেষণার পর ইহা ডায়োফেণ্টাসের অনুবাদ বলিয়া প্রচার করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং

এই সম্পদ লাভ করিয়াছিলেন ইহা সুনিশ্চিত।

যে সময়ে আরবে হিন্দু ও গ্রীক বীজগণিতের অনুবাদ হইতে ছিল, সেই সময়ে গ্রীক ডায়োফেণ্টাসের নাম গ্রীকদিগের নিকটই সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিল।

খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে ভাস্করাচার্য্যের বীজগণিত প্রচারিত হইলে লিওনার্ড নামক জনৈক বণিক বাণিজ্য ব্যপদেশে ভারতবর্ষে আসিয়া তাহা অবগত হইয়া যান্। এবং ১২০২ খ্রীষ্টাব্দে ইটালিতে যাইয়া তিনি ইহার মর্ম্ম প্রচার করেন। এইরূপে য়ুরোপে বীজগণিতের বীজ রোপিত হয়। হিন্দু বীজগণিত য়ুরোপে প্রবেশ করিয়া স্বীয় জটিলতা দোষে সম্যক আদর অভ্যর্থনা লাভ করিতে পারে নাই। কিছুদিন পরে, ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে আরবীয় বীজগণিতও (অল—জবর) ধীরে ধীরে য়ুরোপে প্রবেশ লাভ করে এবং হিন্দু বীজগণিতের সহিত সমভাবে অনাদরে রক্ষিত হয়। য়ুরোপের ডায়োফেণ্টাস্ য়ুরোপে তখনও অজ্ঞাত।

এইরূপে তিন শতাধিক বর্ষকাল অনাদরের পর য়ুরোপে বীজগণিত আদর লাভ করিবার অবকাশ পায়। ১৫৫৭ খ্রীষ্টাব্দে কেম্ব্রিজের জনৈক শিক্ষক, রবার্ট রেকর্ডি ইংরেজী ভাষায় Weston of wit নামক একখানি বীজগণিত গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। রেকর্ডির এই পুস্তক য়ুরোপে বীজগণিত আলোচনার পথ উন্মুক্ত করিয়া দেয়। ইহার ফলে ডায়োফেণ্টাসের নাম জগতে পুনঃ প্রচারিত হয়।

ডায়োফেণ্টাসের এই গ্রন্থের একখানা পাণ্ডুলিপি রোমনগরের মহামান্য পোপের

পুস্তকালয়ে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ১৪৭৫ খ্রীষ্টাব্দে Hyland লাটীন ভাষায় এই গ্রন্থের অনুবাদ প্রচার করেন। এইরূপে বীজগণিতের ক্রমবিকাশ সূচিত হয়। এবং য়ুরোপীয় পণ্ডিতেরা গ্রীসকে বীজগণিতের আদিস্থান বলিয়া প্রচার করেন। য়ুরোপীয় পণ্ডিতদিগের এই মত কিন্তু ভ্রান্তিসংকুল বলিয়া শীঘ্রই পতিপন্ন হইয়াছিল।

১৫৭৯ খ্রীষ্টাব্দে রোমের একজন অধ্যাপক এবং বোম্বেলী একখানা বীজগণিত প্রস্তুত করিতে অগ্রসর হন। তাঁহারা হিন্দু, আরবী ও গ্রীক বীজগণিতের সমন্বয়ে তাঁহাদের অনুষ্ঠিত কার্য্য সম্পাদন করিতে প্রয়াস পান। বোম্বেলী ডায়োফেণ্টাসের বীজগণিতের অনুবাদ করিতে যাইয়া লিখিয়াছেন "এই গ্রন্থে বহু ভারতীয় গ্রন্থকারের মত সমর্থিত হইয়াছে।"

বোম্বেলীর এই উক্তি হইতে সুস্পষ্টরূপে অবগত হওয়া যায় যে গ্রীকগণিতবেত্তা ডায়োফেণ্টাসের পূর্ব্বেও ভারতে বীজগণিতের প্রচার বিরল ছিল না। যদি তাহাই হয়—যদি ডায়োফেণ্টাস্ ভারতীয় গ্রন্থকারের মত স্বীয় গ্রন্থে উল্লেখ করিয়া থাকেন তাহা হইলে সেই সকল গ্রন্থপ্রণেতা কে? এবং গ্রীকগণিতবেত্তাই বা কি উপায়ে তৎকালীন সংশ্রববিহীন সুদূর ভারতের বৈভবতত্ত্ব অবগত হইলেন?

পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের গবেষণায় এ পর্য্যন্ত ভারতীয় গণিতবেত্তাদিগের সম্বন্ধে যতদূর অবগত হওয়া গিয়াছে তাহার মধ্যে আর্য্যভট্টই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া অবধারিত হইয়াছেন। আর্য্যভট্ট ...

করিয়াছিলেন। কিন্তু ডায়োফেণ্টাস তাহা অপেক্ষাও প্রায় শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে স্বীয় গণিত গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

সুপণ্ডিত কোলব্রুক্ ও কাউএল সাহেব আর্য্যভট্ট ও ডায়োফেণ্টাসের প্রচারিত নিয়ম সমূহের সমালোচনা করিয়া আর্য্যভট্টের সিদ্ধান্ত সমূহকে বহুউর্দ্ধে স্থান প্রদান করিয়াছেন। কোলব্রুক্ লিখিয়াছেন "আর্য্যভট্টের বীজগণিত এত উন্নত, পরিপুষ্ট এবং সম্পদশালী যে বহুকাল-প্রচলিত চর্চ্চা ব্যতীত এরূপ উন্নতি প্রাথমিক চেষ্টায় সম্পূর্ণ অসম্ভব। সুতরাং আর্য্যভট্টের পূর্ব্বেও হিন্দু বীজগণিতের অস্তিত্ব ছিল ইহা অনুমান করা অমূলক নহে। সুপণ্ডিত কোলব্রুক মহামতি পরাশর, গর্গ, ও বশিষ্ঠকেও গণিতবেত্তা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহাদের কোন বীজগণিত গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। ভারতবর্ষের ন্যায় যুগব্যাপী বিপ্লবোৎসন্ন দেশের পক্ষে সহসা তাহা সম্ভবপরও নহে। এ পর্য্যন্ত যাহা কিছু পাওয়া গিয়াছে তাহাও পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণেরই গভীর গবেষণার ফল।

ভারতের বহু সৌভাগ্য যে ভারতীয় বহু গ্রন্থ মুসলমানেরা আরবী ও পারস্য ভাষায় অনুবাদ করিয়া রক্ষা করিয়াছিলেন। নতুবা আর্য্যভট, ব্রহ্মগুপ্ত, ভাস্করাচার্য্য প্রভৃতিরও অস্তিত্ব লক্ষিত হইত কি না সন্দেহ।

১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে রুবিন্ বারো (Rubin Burrow) ভারতীয় গণিতের উদ্ধার কল্পে সচেষ্ট হন। তিনি এই ব্রত গ্রহণ করিয়া বহু সংস্কৃত পাণ্ডুলিপি ও তাহার পারস্য ...

১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে Edward Strachey ভারতবর্ষে থাকিয়া পারস্য ভাষায় লিখিত ভাস্করাচার্য্যের বীজগণিত গ্রন্থের ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করেন। এই অনুবাদ প্রকাশ করিতে যাইয়া তিনি লিখিয়াছেন—

"হিন্দুদিগের বহু বীজগণিত গ্রন্থ পারস্য ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে। এই সকল পারসী গ্রন্থের অনুবাদ করিলে হিন্দুদিগের বীজগণিত সম্বন্ধীয় উচ্চ জ্ঞান গরিমার বহু নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যাইবে।"

১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে কোলব্রুক সাহেব আর্য্য-ভট্ট, ব্রহ্মগুপ্ত ও ভাস্করের গ্রন্থনিচয়ের এক একখানা ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করেন। তিনি পারস্য ও আরবী ভাষার সাহায্যেই তাঁহার অনুষ্ঠিত কার্য্য শেষ করিয়াছিলেন।

সুপ্রসিদ্ধা বিদুষী মহিলা "আনিবেসান্ত" হিন্দু ফিলসফি বিষয়ক বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন...

"আরবী ও পারস্য ভাষায় এত মূল্যবান গ্রন্থ সমূহ স্তূপীকৃত হইয়া রহিয়াছে যে তাহার ইংরেজী অনুবাদ হইলে আর কোন জাতির না হউক হিন্দু জাতির প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইবে। ইহা হইতে তাঁহারা প্রভূত আত্মসম্পদ লাভ করিতে পারিবেন।"

এসিয়াটীক সোসাইটীর কল্যাণে দিন দিন আমরা আমাদের প্রাচীন সম্পদের অধিকার লাভ করিতেছি। এমতাবস্থায় পরাশর, গর্গ, বশিষ্ঠ প্রভৃতিরও গণিত গ্রন্থের অস্তিত্ব থাকিলে তাহা অনাবিষ্কৃত থাকিবে এমন মনে হয় না।

আমরা ভাস্করাচার্য্যের শ্লোকে ব্রহ্মার নাম উল্লেখ করিয়া আসিয়াছি। এই ব্রহ্মা আমাদের স্বর্গীয় পিতামহ ঠাকুর কি না নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। ভারতীয় প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থাদির রচয়িতার স্থলে প্রায়ই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, অথবা মহেশ্বরের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। এই রচকত্রয়ের রচনা সম্বন্ধে প্রত্নতত্ত্ব-বিদগণ আস্থাবান নহেন। তাঁহারা বলেন—

"প্রাচীন ভারতে যশোলিপ্সা বিরাগী এমন অনেক মহাপুরুষ ছিলেন যাঁহারা স্বীয় জীবনান্তক বিপুল পরিশ্রমের ফলও অপরের সামগ্রী বলিয়া প্রকাশ করিতে দ্বিধা বোধ করিতেন না। ইহারই ফলে দেবাদিদেবত্রয়ও লেখকশ্রেণীভুক্ত হইয়া পাঠক সমাজে গ্রন্থাদির মৌলিকতা প্রতিপাদন ও সম্মান বৃদ্ধি করিতেছেন।"

প্রত্নতত্ত্ববিদগণ এই সকল গ্রন্থের কল্পিত লেখকদিগের প্রতি শ্রদ্ধাবান না হইলেও ঐরূপ নাম সংযুক্ত গ্রন্থাদির প্রাচীনত্ব অস্বীকার করিতেছেন না। আমরাও এই যুক্তিবলে পিতামহ ঠাকুরের নাম সংযুক্ত ভাস্কর উল্লিখিত এই বীজগণিত গ্রন্থ খানার প্রাচীনত্বের দোহাই দিতেছি। নানা কারণে আমাদের বিশ্বাস আর্য্যভট্টও এই গ্রন্থেরই অনুসরণ করিয়াছিলেন। ব্রহ্মার প্রণীত গ্রন্থের অনুসরণ করিয়াও যে আর্য্যভট্ট স্বীয় স্বাধীন চিন্তার পরিচয় প্রদান করেন নাই, তাহা বলা যায় না। আর্য্যভট্ট উদ্ভাবিত বীজগণিতের "কুট্টক" নিয়ম তাহার একটী স্বাধীন চিন্তার ফল। সুপণ্ডিত ভাওদাজী বলেন "এই নিয়মে অঙ্ক কষিবার রীতি তাঁহার পূর্ব্বে বোধ হয় প্রচলিত ছিল না।"

য়ুরোপীয়েরা বিগত শতাব্দীতে মাত্র এই নিয়ম অবগত হইয়াছেন।

যদি বোম্বেলীর উক্তিই প্রকৃত হয়, যে—গ্রীক গণিতবেত্তার গ্রন্থেও ভারতীয় গ্রন্থকা-রের মত সমর্থিত হইয়াছে, তবে ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর পূর্ব্বেও ভারতবর্ষে বীজগণিতের চর্চ্চা বিরল ছিল না।

এখন দেখা যাউক সুদূর গ্রীসে বসিয়া

সেই প্রাচীন তমসাচ্ছন্ন যুগে ডায়োফণ্টাস্ কি করিয়া ভারতীয় গ্রন্থের অনুসন্ধান লইয়াছিলেন? এই বিচারে অগ্রসর হইয়া Edward Strachey যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহাই আমাদের নিকট সমধিক যুক্তিপূর্ণ বলিয়া মনে হইল। তিনি লিখিয়াছেন—

"আলেকজেন্দ্রিয়ার কোন নাবিক বাণিজ্য ব্যপদেশে ভারতবর্ষে আসিয়া কোন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের নিকট বীজগণিত শিক্ষা করিয়া আসিয়া তাহা স্বদেশে প্রচার করিয়া থাকিবে; অথবা ডায়োফেণ্টাসই আলেকজেন্দ্রিয়া প্রবাসী কোন ভারতীয় বণিকের নিকট শিক্ষা লাভ করিয়া থাকিবেন।"

লিওনার্ড ভারতবর্ষে আসিয়াই ভারতীয় বীজগণিত য়ুরোপে লইয়া গিয়াছিলেন। ডায়োফেণ্টাসও এই উপায়ে বা অন্য কোন উপায়ে হিন্দু বীজগণিতের সহায়তা লাভ করিয়াছিলেন, বোধ হয় একথা একেবারে অস্বীকার করা যাইতে পারে না।

এতাবৎ প্রমাণ অনুসারে আমরা ভারতবর্ষকেই বীজগণিতের জন্মভূমি মনে করি। বিপুল গবেষণার ফলে কালে এই অনুমানই অবিসংবাদি সত্যে পরিণত হইবে ইহা সুনিশ্চয়।

ভারতবর্ষ বীজগণিতের জন্মভূমি হইলেও বর্ত্তমান সময়ে য়ুরোপই বীজগণিতের লীলাভূমি। সপ্তদশ শতাব্দীতে ফরাসী একাডেমী বীজগণিতের উন্নতি কল্পে বহু চেষ্টা করেন। এই চেষ্টার ফলে উক্ত একাডেমির একজন সভ্য বাচেৎ ১৬২১ খ্রীষ্টাব্দে ও ফরাসী গণিতবেত্তা ফারমেৎ ১৬৭০ খ্রীষ্টাব্দে দুই খানা অতি উচ্চ অঙ্গের বীজগণিত গ্রন্থ রচনা করেন। অতঃপর অষ্টাদশ শতাব্দীতে De La Grange এর সুপ্রসিদ্ধ বীজগণিত গ্রন্থ রচিত হইয়া য়ুরোপীয়দিগের জ্ঞান গরিমা চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত করিয়া দেয়।

য়ুরোপ অষ্টাদশ শতাব্দীতে বীজগণিত সম্বন্ধে যে দিগন্ত বিস্তৃত যশ অর্জ্জন করিয়াছিল প্রাচীন ভারতের বীজগণিত জ্ঞান তাহা অপেক্ষা বোধ হয় কোন অংশে হীন ছিল না। এতৎসম্বন্ধে Edward Stracheyর মত লিপিবদ্ধ করিয়া আমরা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উপসংহার করিলাম।

"The Hindoos had made a wonderful progress in some parts of Algebra; that in the indeterminate analysis they were in possession of a degree of knowledge, which was in Europe first communicated to the world by Bachet and Fermat in the 17th Century and by Euler and De La Grange in the 18th."

শ্রীকেদারনাথ মজুমদার

বিপরীত।

এক কথা নিয়ে বসি, হয়ে যায় আর;
বাজে বীণা ত্যজি গ্রাম অপর ঝঙ্কার।
নিবিড় আনন্দোচ্ছ্বাসে গাহি আনমনে—
নীরব ব্যথার অশ্রু সঞ্চারে নয়নে!

দুঃখ শোকে জর্জ্জরিত ব্যথিত চিত্তেতে
ভ্রমি যবে উদাসীন—শূন্য এ জগতে,
একদিন থামে অশ্রু; স্মৃতি অতীতের
দুঃখেরে সুখের মত করে গৌরবের!

শ্রীসুধীরচন্দ্র মজুমদার।



মহাদেবের তাণ্ডবনৃত্য

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক অঙ্কিত চিত্র হইতে

মিশর-কবিতা।

নিম্ন অনুবাদিত কবিতাগুলি চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে রচিত।

পথিক-বধূ।

দুয়ারের পানে সতত চাহিয়া থাকি,
বঁধূ যে আমার আসিবে দুয়ার দিয়া ;
পথে পাহারায় রেখেছি দুইটি আঁখি,
কর্ণ সজাগ, স্তব্ধ ক'রেছি হিয়া।
স্তব্ধ হৃদয় অসাড় হইয়া আসে,
বন্ধু তোমার সাড়া যে পাইনে তবু ;
তব ভালবাসা নিধি সে আমার পাশে,
তা বিনা পরাণ তৃপ্ত হ'বে না কভু।
প্রবাসে বসিয়া পাঠায়েছ সমাচার
'বিলম্ব হ'বে' জানায়েছ লিপিমুখে,
কেন লিখিলে না 'ভালবাসি না গো আর
মনোমত ধন মিলেছে, রয়েছি সুখে।'
চঞ্চল, তুমি কেন এত নির্দ্দয় ?
এমন ক'রে কি বেদনা সঁপিতে হয়।

মিলনানন্দ।

যখন তাহারে আসিতে দেখিতে পাই
হৃদিপিণ্ড দ্রুত তালে দুলে,
দু'বাহু বাড়ায়ে বাহুতে বাঁধিতে চাই
অসীম পুলক উথলে হৃদয়-কূলে।
ভুজবন্ধনে বন্দী সে যদি করে,
তনু আরবের আতরে তিতিয়া উঠে,
চুমে যদি হাসি-বিকচ-অধরে
বিনা মদিরায় সংজ্ঞা আমার টুটে।

মনোজ্ঞা।

তোমার মনের মতন হইতে
কি যে ছিল প্রয়োজন,
সে কথা আমারে দিয়েছিল ব'লে
গোপনে আমারি মন।
তুমি যাহা চাও চাহিবার আগে
আমি তা' করিয়া রাখি,
যেখানে যখন খুঁজিবে, বন্ধু,
সেখানে তখন থাকি।
পাখী মারিবার তীর ধনু লই
পাখী ধরিবার জাল,
মৃগয়ার মাঠে ছুটে সারা হই
মুখ হ'য়ে ওঠে লাল।
আরবের পাখী মিশরে আসে গো
আতর মাখিয়া পাখে,
টোপের উপর ঠোকর মারিয়া
শূন্যে ঘুরিতে থাকে।
গায়ে আরবের ফুলের গন্ধ,
পায়ে তার খস্ খস্,
তোমারে বন্ধু! মনে পড়ে গেল
আঁখি হ'ল সুখালস।
শুধু কাছাকাছি পেলে তোমা বাঁচি
অধিক কামনা নাই ;
নূতন পাখীর সুতীব্র সুর
বারেক শুনাতে চাই।

মরণ।

মরণ, জ্বরের দাহ অবসানে,
মুক্ত বাতাসে যাওয়া।
নিখিল ব্যাধির ঔষধ সে যে
দৈবে শিয়রে পাওয়া!
মরণ, সুরভি পূজা-ভবনের
ধূপের অন্ধকার ;
বাত্যা-তাড়িত তরীতে নিদ্রা,—
লেশ নাই সংজ্ঞার।
সে যে কমলের গূঢ় পরিমল,
সীমার প্রাপ্তি ভূমা।

মহা নিঝরের বর্ম্ম মরণ,—
অনাদি কালের চুমা!
যুদ্ধের শেষে নৌ-সেনানীর
ফিরে যাওয়া নিজ দেশে,
আকাশ-নীলের বিমল বিকাশ
ঘোর ঝঞ্ঝার শেষে।
বন্দীজনের কামনার নিধি
মরণেরে মনে হয়,
বহু বরষের কারাক্লেশে যায়
জীবন দুঃখময়।
সেই তো দেবতা দেহ-অবসানে
যে গেছে মৃত্যু-লোকে,
মোচন করিয়া দূরে ফেলে দেছে
শোচনার নির্ম্মোকে।
সূর্য্যের কাছে সুখে বসে আছে
সূর্য্যেরি নৌকায়,
তর্পণ-কালে দেবতার সাথে
বলি-উপহার পায়;
মৃত্যুরে পেয়ে পায় গো না চেয়ে
জ্ঞানীর অধিক জ্ঞান,
জীবিতে যা' রবি না দ্যান্ কখনো
মৃত জনে তাহা দ্যান্!

মিশর-মহিমা।

মিশরে পুরুষ রণ-পণ্ডিত,
রমণী ধনুর্দ্ধর!
স্তন্যপায়ী-শিশু তাহারে জননী
ধরান্ ধনুঃশর!
মার কাছে ছেলে সত্য বলিতে
সত্য পালিতে শেখে,
সহজ সাহসে দুঃখ সহিতে
শেখে শৈশব থেকে।
ভয়ে সে কাঁপে না, কষ্টে কাঁদে না,
লোহার বাঁটুল ছেলে;
দুই দণ্ডে বশ করিতে সে পারে
দুরন্ত ঘোড়াও পেলে!
পিতা হাতে তার দেন হাতিয়ার
শেখান অস্ত্র খেলা,
বেড়ে ওঠে বুক—শড়্‌কী ধনুক
লয়ে ফিরে সারাবেলা।
ভীনকুল পারা দুর্ম্মদ তারা,
লড়িতে করেনা ভয়,
বিনা ছলে কভু তাদের হঠানো
নরের সাধ্য নয়।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

পোষ্যপুত্র। পূর্ব্বের অনুবৃত্তি।

বসুমতী সহরের বাহিরে বেশ একটু খোলা ও স্বাস্থ্যকর জায়গায় বাটী লইয়াছেন।

যোগেন্দ্র সপরিবারে সহর ছাড়িয়া 'অসার সংসারের সারাশ্রমে' শাশুড়ির অতিথি হইয়াছে। মিঃ রায় আজকাল আর এ পরিবারের কাছে অপরিচিত বাহিরের লোক নহেন। তিনি এখন ইহাদের মধ্যে এখন এখানকার সকলেই প্রতি সন্ধ্যায় আগ্রহের সহিত তাঁহার আগমন প্রতীক্ষা করে। রাত্রি বাড়িয়া উঠিলেও বিদায়ের ইচ্ছা কাহারো মনে উঠে না। একদিন দৈবক্রমে না আসিতে পারিলে পরদিন ইহাঁর উহাঁর মান ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে বেচারার প্রাণ হাঁফাইয়া উঠে।

বশ হইয়া থাকে ; গৃহকর্ত্রী বসুমতী পর্য্যন্ত তাঁহার এই নূতন ছেলেটীর জন্য বিকাল হইতে ছটফট করেন। যতক্ষণ না মিঃ রায় আসিয়া তাঁহার স্বহস্তপ্রস্তুত মিষ্টান্নগুলি খাইতে বসিয়া সুপ্রকাশের সহিত কাড়াকাড়ি লাগাইয়া দেন, ততক্ষণ যেন তাঁহার আরাম বোধ হয় না। তারপর খাবারের সমালোচনায় ও মায়ের উপর দাবী-দাওয়া লইয়া প্রায়ই ভাই দুটিতে হাতাহাতির উপক্রম ঘটে ; অত্যন্ত স্নেহের চক্ষে তখন তিনি উভয়েরই প্রতি চাহিয়া দেখেন। শান্তি এসব ঝগড়া বিবাদ ও পাখী শিকার ছাড়া বাকি সকল সময়ই তাঁহাদের সহিত সানন্দে যোগ দিত। মধ্যে মধ্যে বাগানের চড়িভাতির ব্যাপারে এবং প্রাত্যহিক বৈকালিক ভ্রমণের সময় কোথায় কোন সত্যকালের ভগ্নস্তূপ পুরাতন দেবালয় অথবা উদ্যান দর্শনে তাহারা যোগেন্দ্র অপেক্ষা মিঃ রায়ের সাহায্য অধিক পসন্দ করিত। যোগেন্দ্র ভারি কড়া সমালোচক তিনি মুগের ডালের আঁকা গন্ধ ও নৌকার ধারে ঝুঁকিয়া পড়া কিছুই সহ্য করিতে পারিতেন না। কিন্তু মিঃ রায় ডাল তো ডাল ভাত পর্য্যন্ত পুড়িয়া অঙ্গার হইয়া গেলেও সুপ্রসন্নভাবে তাহার মধ্য হইতে নীর ছাড়িয়া ক্ষীরটুকু গ্রহণ করিতেন। এক-দিনকার চড়িভাতির খিচুড়ি ধরিয়া গিয়া ভয়ানক ধরা গন্ধ উঠিলে যোগেন্দ্র তীব্র সমালোচনা করিল "সরস্বতি! মিথ্যা কেন এ বিড়ম্বনা ভোগ করছো? সপত্নী বিদ্বেষটা চিরকালের জিনিষ! তার চেয়ে তোমার দিদিকে এই কাজটা ছেড়ে দিয়ে ততোক্ষণে বরঞ্চ একটা টেনিসনের ট্রান্‌শ্লেসন করে ফেল—যে সময়ের সার্থকতা হবে। কি বল হে রায় মহাশয়?" শান্তি কাঁদো কাঁদো মুখে নত চক্ষে বসিয়া রহিল।

মিঃ রায় একবার চকিতনেত্রে তাহার লজ্জা ও বেদনা পরিপূর্ণ করুণ মুখচ্ছবি সাগ্রহে চাহিয়া দেখিলেন। যোগেন্দ্রের উপরে একটুখানি রাগ হইল, তাড়াতাড়ি শান্তির কাছে আসিয়া বলিলেন "এসোতো শান্তি এবার আমরা দুজনে মিলে খিচুড়ি রাঁধি, ও পেটুকটার অল্পে স্বল্পে কুলাবে না তো, সেজন্য তোমার রান্নার দোষ দিয়ে আর এক হাঁড়ির বন্দোবস্ত করে নিচ্চেন।"

চখের জল চাপিতে চাপিতে অপরাধী-ভাবে রন্ধনকারিণী বলিল "না ওটা সত্যিই যে পুড়ে গ্যাছে।" তথাপি মিঃ রায় বলিতে ছাড়িলেন না যে ইহা যোগেনের নিন্দুক স্বভাবের মিথ্যা দোষারোপ ভিন্ন আর কিছুই নয়। নহিলে এখানে এতোগুলা নাসিকার মধ্যে যোগেন্দ্রই বা ধরাগন্ধ পাইল কেন?"

যোগেন্দ্র কিন্তু এ অপবাদ সহ্য করিল না! সে রাগিয়া বলিল "ঐতো তোমাদের কেমন রোগ! তোমরাই তো মিথ্যা তোষামোদ করে এখনকার মেয়েদের দিন দিন বিবি নাচাচ্চো। সরস্বতীরা মালক্ষ্মীর সঙ্গে আড়ি দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছেন, যা করেন তাই মনে হয় খুব করেছি। খালি উল কার্পাটের শ্রাদ্ধ করে বাতে ও অম্বলের ব্যায়রামে অস্থির হচ্চেন। তার কারণ কিন্তু এই তোমরাই! খোসামুদে!"

মিঃ রায় হাসিয়া বলিলেন "তুমি বুঝি খোসামোদ জানোনা? গৃহিনীকে একেবারে লক্ষ্মীর আসনখানাই দিয়ে ফেল্লে?"

এই সব নানা কারণে শান্তি মিঃ রায়কে মনে মনে প্রশংসা করিত। বিশেষ, সম্পর্কের দোষে যোগেন্দ্র তাহাকে যে সকল তামাসা করিত এবং মণিমালা শুদ্ধ তাই লইয়া সময় অসময় তাহাকে যেরকম জ্বালাইতে থাকিত তাহাতে আরো তাহার যোগেন্দ্রনাথের সহিত বনিত না। আর ইঁহার সহিত কোন বিষয়েই তাহার এতোটুকু পর্য্যন্ত মতদ্বৈধ ছিল না। বরং সময় সময় দেখিয়া আশ্চর্য্যানুভব করিত যে তিনি যেন তাহার বাবার মনের লেখাগুলি সমস্ত পাঠ করিয়া আসিয়াছেন—যেন তিনি তাহার পিতার হাতে গড়িয়া তোলা একটি প্রিয় শিষ্য। ইদানীং বসুমতীও এই অপরিচিত যুবাকে স্নেহের সহিত বিশেষ একটু শ্রদ্ধা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। কথাবার্ত্তায় ও চালচলনে তিনিও বুঝিয়াছিলেন যে ছেলেটি তাঁহার স্বামীর একজন বিশেষ প্রীতিপাত্র হইবার উপযুক্ত। তিনি তাঁহাকে নাম ধরিয়াই ডাকিতেন, তাঁহার নাম নীরদকুমার রায়। এখানে তাঁহার বিদেশী সহকর্ম্মীগণের দ্বারা নামটার সংক্ষিপ্ত আধুনিক সংস্করণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল মিঃ রায়। বসুমতী তাঁহার আত্মীয় স্বজনের কথা জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়া লইয়াছিলেন, দেশে অনেকেই আছেন, বিষয় সম্পত্তিও কিছু আছে জ্ঞাতিদের সহিত বনিবনাও হয় নাই, তাই পৈতৃক সম্পত্তি ত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন। একবার জন্মভূমি দর্শনে যাইবার প্রবল ইচ্ছা আছে, বোধহয় শীঘ্রই যাইবেন। অনেকদিন হইতেই যাইতে ইচ্ছা, কেবল কাজকর্ম্মের ঝঞ্ঝাটে পড়িয়া ঘটিয়া উঠিতেছে না। এখানে মিঃ রায়ের চিনির কুঠি ও কাপড়ের তাঁত বেশ ভাল রকমই চলিতেছে। তিনি নিজেই সব ম্যানেজ করেন। অংশীদাররাও ধনী ব্যক্তি; নিত্য নূতন নূতন কাজ আরম্ভ হইতেছিল। কতোকটা বসুমতী ও কতোকটা শান্তির পত্রে এই দূরদেশের অপরিচিত বন্ধু ও অজ্ঞাতভক্তের বিষয় জানিয়া রজনী-নাথেরও তাঁহার প্রতি বিশেষ একটু শ্রদ্ধার উদয় হইতেছিল। একলব্যের মত কে এই পূজক? এ কৌতূহল অনেকবারই মনে জাগিত। শান্তিকে লিখিলেন "বুড়ি তুই বড় দুষ্টু হচ্ছিস। প্রথম প্রথম রায়ের কথা তোরা কতোই না লিখতিস্, কিন্তু আজকাল আর মোটেই লিখিস্ না। কেন বল্ দেখি? তাঁর তাঁত টাঁত সব উঠে গ্যাছে নাকি? না তিনি তোদের বাড়ি আর আসেন না?'

শান্তি উত্তর লিখিল "না বাবা তাঁর কারবার বেশ চলছে। একটা কাপড়ের কল আবার শীঘ্র আরম্ভ হবে। আমরা তাঁর তাঁতের অনেকগুলো কাপড় কিনে নিয়েছি। সেগুলো সব দেশি সুতোর আর খুব মজবুত। চিনিও বেশ ফর্সা হচ্চে, বিক্রিও খুব।"

রজনীনাথ চিঠি পড়িয়া হাসিলেন, লোকটার সম্বন্ধে বুঝি একটা কথাও লিখিবার প্রয়োজন নাই? শুধু তার কাজের সংবাদ!

এমনি করিয়া অপরিচিত স্থানে নূতন লোকের মধ্যে শান্তিদের বেশ সুখে দিন কাটিয়া গেল।

প্রথম আষাঢ়ের আকাশ সেদিন আসন্ন বর্ষণের জন্য মেঘ বিদ্যুৎ লইয়া রমণীয় সজ্জায় সাজিয়া আইসে নাই। যথা পূর্ব্বং

তথা পর,:—সেই একঘেয়ে বিস্তৃত নীলঢালা আকাশখানা সমস্ত দিন রোদে ঝলসাইয়া ঝলসাইয়া এতোক্ষণ পরে অগ্নিময় থালখানাকে নদীর ওপারে নারিকেল গাছগুলার মাঝখানে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়া একটু ঠাণ্ডা নিশ্বাস ফেলিল।

এখানে প্রায়ই অসহ্য গরম পড়ে না, আজ দিনের বেলা একটু গ্রীষ্মবোধ হইলেও এখন গুমোট কাটিয়া বেশ ঠাণ্ডা পড়িয়া আসিল এবং বাগানের ফুলগাছগুলার মাথা নাড়াইয়া একটু ঝিরঝিরে বাতাসও বহিতে আরম্ভ করিল। সন্ধ্যা হইয়া গেলেও সেদিন মিঃ রায় আসিলেন না। যোগেন্দ্র কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহার অপেক্ষা করিয়া করিয়া অবশেষে সুপ্রকাশকে ডাকিয়া লইয়া বেড়াইতে বাহির হইয়া গেল।

শান্তি গাড়ি বারান্দার একটা আইভি জড়িত থামের গায়ে হেলান দিয়া অনিলের হাত ধরিয়া দাঁড়াইয়াছিল। মিঃ রায় না আসাতে সন্ধ্যাটাকে যেন বৃথা বলিয়া মনে হইতেছিল। তাঁহার কথা,তাঁহার হাসি, তাঁহার মধুর স্বভাবটি তাঁহার সকলের নিকট নম্রতা, বিশেষতঃ দেশের প্রতি প্রাণঢালা অনুরাগ আগ্রহ তাহার প্রাণে কি একটি অনুপম আনন্দ ও প্রীতি জাগাইয়া তুলিত। শান্তি কিইবা ছাই গল্প জানে, কিই বা সে দেখিয়াছে সে জানিবে, তবু তাহাই তিনি কতো আগ্রহের সহিত শুনেন। আবার তাহার বুদ্ধিশীলতার এতো বেশি প্রশংসা করেন যে শুনিয়া লজ্জায় সে মুখ তুলিতে পারে না।

আজ সহসা শান্তির হাসিমুখ মলিন হইয়া গিয়াছে, সে গম্ভীর মুখে ভাবিতেছিল, "আর কখনো তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইবে না, কেমন করিয়া হইবে?" ভাবিতে ভাবিতে শান্তির মুখখানা অকস্মাৎ একটুখানি রক্তিম হইয়া উঠিল, মনে মনে সে আপনার নির্ব্বুদ্ধিতায় আপনার কাছেই লজ্জা অনুভব করিল। সে কি অকৃতজ্ঞ! কি বোকা! সেখানে গেলে সে নিজেদের বাড়িঘর, পাখী, পায়রা, হরিণ, বিড়াল কুকুর পাঁচকড়ি, হরে, বিধুর মা, হরিদাসী সর্ব্বোপরি তাহার বাবাকে দেখিতে পাইবে, তা না ভাবিয়া কিনা সে ভাবিতে বসিল বাড়ি গেলে কোথাকার কে মিঃ রায়কে দেখিতে পাইবে না! কি লজ্জা! সহসা শান্তির সম্মুখীন হইয়া নীরদকুমার ডাকিলেন "শান্তি!"

চোর ধরা পড়িলে যেমন চমকায় প্রথমটা শান্তি সেইরূপ চমকিয়া উঠিল কিন্তু শীঘ্রই প্রকৃতিস্থ হইয়া কহিল "আপনার বুঝি আর কাজ শেষ হয় না? এতো দেরি? তার চেয়ে না এলেই তো হতো।"

নীরদকুমারের ললাট কর্ণমূল পর্য্যন্ত আরক্ত ও উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। আনন্দ-উত্তেজনায় সহসা বলিয়া উঠিলেন "আমার আজ আসতে বিলম্ব হয়ে গ্যাছে; শান্তি মাপ করো। তুমি আমার প্রতীক্ষা করছিলে?"

"করিনি? যোগেন্দ্রবাবুও অনেকক্ষণ বসেছিলেন, তারপর রাগ করে একটু আগে বেড়াতে চলে গেলেন। সুকুও তাঁর সঙ্গে গ্যাছে।" নীরদকুমার মনের সে অদম্য হর্ষোচ্ছ্বাস গোপন করিতে না পারিয়া একটু নিকটে আসিয়া পুলক কম্পিত ব্যগ্রস্বরে বলিয়া উঠিলেন "আমি কেমন করে আমার আনন্দ ও কৃতজ্ঞতা তোমায় জানাবো শান্তি?"

শান্তি তাঁহার আগ্রহে লক্ষ্যমাত্র না করিয়া দ্বারের দিকে অগ্রসর হইয়া তাহার স্বাভাবিক মিষ্ট হাসি হাসিয়া কহিল "ঘরে আসুন, কতোক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবেন?" চারিদিকে চাহিয়া দেখিল, অনিল নাই, সে কোন্ সময় পলাইয়া গিয়াছে। ঘরে প্রবেশ করিয়া মিঃ রায় আসন গ্রহণ করিলেন না। দাঁড়াইয়া রহিলেন। বলিলেন, "আজ যোগেন সুকু কেউ নাই, আজ আমি যাই। কাল থেকে খুব সকাল সকাল আসবো। বলো তো দুবেলাই আমি আসতে পারি।"

শান্তি হাসিল, অত্যন্ত মৃদু ভুল সংশোধনের হাসি হাসিয়া কহিল "কালই আসবেন, পরশু বোধহয় আমরা এখান থেকে চলে যাবো। বাবা টেলিগ্রাম করেছেন, আমাদের নিতে আসবেন, বোধহয় কাল সকালে এসে পৌছবেন।"

নীরদকুমার ঈষৎ বিস্মিত ঈষৎ ব্যথিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন "সেকি তিনি এসে দুদিনও থাকবেন না, এতো শীঘ্র চলে যাবেন?"

"সেই রকমই তো লিখেছেন।" বলিয়া শান্তি ঈষৎ নিশ্বাস ফেলিল।

সে নিশ্বাসটুকুও নীরদকুমারের কর্ণ অতিক্রম করে নাই। তিনি ব্যথিত দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া দেখিলেন। তারপর নীরবে অনেকক্ষণ ধরিয়া কি ভাবিতে লাগিলেন। শান্তি বলিল "আপনার সঙ্গে আর হয়তো আমাদের দেখা হবে না!"

বলিতে বলিতে সহসা তাহার সহাস্য চোখের পাতা লজ্জায় যেন মুদিয়া আসিল। কে জানে কোন এক অনির্দ্দেশ্য ভাবের আবেশে তাহার গোলাপি গণ্ডে রক্তিমা সুস্পষ্ট হইয়া উঠিল। মিঃ রায় ঘরের উজ্জ্বল আলোকে লজ্জিতার সেই সুন্দর মুখখানি অতৃপ্ত দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিলেন, একটু হাসিয়া বলিলেন,

"যদি ইচ্ছা করো তাহলে আবার আমাদের দেখা হবে। কি বলো শান্তি হবে কি?" যে স্বর এই কথাগুলা উচ্চারণ করিল, তাহা বালিকা শান্তির কম্পনহীন হৃদয়তন্ত্রিতেও সবলে একটা আঘাত করিল। সে কিছু না বুঝিলেও না ভাবিলেও, তাহার নত দৃষ্টি সহসা আরো নত হইয়া পড়িল। নীরদকুমার আবার একবার সহাস্য সপ্রেম সাগ্রহ দৃষ্টিতে তাহার লজ্জাকুণ্ঠিত মুখের দিকে চাহিয়া গম্ভীরস্বরে বলিয়া ফেলিলেন "আবার দেখা হবে শান্তি! নিশ্চয়-নিশ্চয়ই আমাদের আবার দেখা হবে। না হলে আমি বাঁচবো না! তবে আজ চল্লেম—না একবার মার সঙ্গে দেখা করে আসি—"

সুপ্রকাশ আসিয়া দিদির কাছে শুনিল মিষ্টার রায় আসিয়া চলিয়া গিয়াছেন—সে রাগিয়া গেল, ক্রুদ্ধস্বরে বলিয়া উঠিল "বাঃ যেই আমরা বাড়ি থেকে চলে গিয়েছি, অমনি তিনি এসেছেন, তাও আর একটু দাঁড়াতে পারলেন না! দাঁড়াও তো কাল আমি তাঁর সঙ্গে এমন ঝগড়া করবো। মিঃ রায় কিন্তু দিদি, আমার চেয়ে তোমায় বেশি ভালবাসেন, তা তুমি যাই বলো—"

শান্তি তাড়াতাড়ি ভাইয়ের কাছে আসিয়া তাহার একটি ছোট হাত নিজের দুইহাতের মধ্যে তুলিয়া লইয়া ব্যগ্রকণ্ঠে বলিয়া উঠিল "সুকু সুকু ওকথা না, সুকু ওকথা বলোনা,

বলতে নেই।" সুকু দিদির কাণ্ড দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেল, অত্যন্ত আমোদও অনুভব করিল, সে হাসিয়া বলিল "হ্যাঁ বলতে নেই বই কি? খুব বলতে আছে! সত্যিই তো তিনি আমার চেয়ে তোমায় বেশি ভালবাসেন। আমায় অনেক জিনিষ দেন, কিন্তু তোমার সঙ্গে বেশি গল্প করেন তো? আমি যেন কিছুই বুঝতে পারি না?"

শান্তি বড় বিপদেই পড়িল। মিঃ রায় তাহাকে ভালবাসেন, তা বাসিলেই বা, তাহাতে ক্ষতি কি? এ লইয়া তাহার এতো লজ্জাই বা কিসের জন্য? কিন্তু আজ যেন সবি নূতন ধরণ। সেও নূতন, তিনিও যেন নূতন! আজি সে বুঝিয়াছে—কে জানে ছাই পাঁশ কিই বা বুঝিয়াছে তাহাও সে স্পষ্ট জানে না—শুধু এইটুকু অভিজ্ঞতা সে লাভ করিয়াছে যে তাঁহাকে ছাড়িতে তাহার প্রাণে একটা গভীর আঘাত লাগিবে। আর এইটুকুও সে বুঝে একজন নিঃসম্পর্ক যুবার জন্য এ বেদনা বোধ করা তাহার পক্ষে অন্যায়।

পরদিন রজনীনাথ আগমন করিলেন। রজনীনাথ পুত্রের ফরমায়েস মত এয়ারগান্‌টা তাহাকে বাহির করিয়া দিয়া কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তুই যে কিছু আনতে বল্লি না বুড়ি? কেন? রাগ করেছিস্?"

শান্তি হাসিয়া কহিল "না বাবা! আমরা তো বাড়িই যাচ্চি, তা ছাড়া আমার তো সবই আছে, কি আর আন্‌তে বলবো?"

ইস্ তুই যে মস্তলোক হয়েছিস্ রে! এমন কথাটা তো এপর্য্যন্ত কেউ বলেনি। তবু কিন্তু একটা জিনিষ আমি তোর জন্যে কিনে এনেছি—এই নে। রজনীনাথ তাহাকে ছবি আঁকিবার দ্রব্যাদি সম্বলিত একটি বাক্‌স দিলেন।

রজনীনাথ মিঃ রায়ের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য বিশেষ ব্যগ্র থাকিলেও সেদিন সাক্ষাৎ ঘটিল না। মিঃ রায় আসিলেন না। এ ঘটনা অপ্রত্যাশিত। সকলেই ইহাতে আশ্চর্য্য হইল। বসুমতী তাঁহার বাসায় জিজ্ঞাসা করিতে পাঠাইলেন "বাবুর কি অসুখ করিয়াছে?" বলাই ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিল "তিনি বাড়ি নাই। সকাল বেলাই বাহিরে গেছেন, রাত্রেও হয়তো আসিবেন না।"

বসুমতী দুঃখিত হইয়া বলিলেন "কই কালতো সে কিছুই বলিল না! আমি সারাদিন ধরিয়া তার পসন্দসই খাবারগুলি তৈরি করে রাখলেম।"

যোগেন্দ্র বলিল "নিশ্চয়ই কোন জরুরী কাজে তাহাকে যাইতে হইয়াছে। নাহলে সে কখনো পিসে মহাশয়ের সঙ্গে দেখা না করে চলে যায়?" রজনীনাথ একটু মনঃক্ষুণ্ণ হইলেন। তাঁহার অজ্ঞাত ভক্তটিকে দেখিবার জন্যে একটা আগ্রহ তিনি অনেকদিন হইতে মনে মনে পোষণ করিতেছিলেন। সেদিনকার আনন্দটা মাত্রাহীন হইয়া রহিল।

শান্তির বিবাহ সম্বন্ধে বসুমতীর আবেদন শুনিয়া চিন্তিতভাবে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নীরব থাকিয়া অবশেষে রজনীনাথ কহিলেন "এতো হতে পারে না বসু! আমি অনেকদিন হতেই একরকম কথা দিয়ে ফেলেছি। বলতে গেলে তিনি একরকম শান্তির জন্যই হেমকে পোষ্যপুত্র নিয়েছেন। এখন কি আমি মত বদলাতে পারি?"

বসুমতী বলিলেন "সে কোন কাজের কথা দেওয়া নয়। সেরকম কথা ছেলেমেয়ে থাকলেই অমন হয়ে থাকে, তাতে কি আসে যায়। এ ছেলেটীকে তো দেখোনি, দুদিন যদি কাছে রাখো, তাহলে আর কোন বাধাকেই বাধা মনে করবে না। ঠিক তুমি যেমনটি পছন্দ করো ভগবান যেন তেমনি এনে মিলিয়ে রেখেছেন। রূপই বা কি! দিব্য লম্বা চওড়া সুস্থ সবল দেহ। তা ছাড়া এ বিয়েতে বোধ হয় মেয়েও বেশি সুখী হবে। লক্ষ্মীপুরের ওরা বড়লোক সত্য, কিন্তু সেখানে পড়লে তারা আমার মেয়ে পাঠাবে না। ছেলেও কেমন তাইবা কে জানে? নীরদ শান্তিকে আমার খুব ভালবাসে। আমি বুঝেছি সেও ওকে চায়।"

রজনীনাথ বিদ্রূপের সহিত হাসিয়া বলিলেন—

"ঐ তোমাদের একটা ভুল বিশ্বাস বসু! দুদশখানা নভেল পড়ে তোমরা সংসারটাকেই উপন্যাসের চক্ষে দেখতে থাকো। তোমার সঙ্গে যখন আমার বিয়ে হয়, তখনতো কই আমাদের মধ্যে ভালবাসা হয় নাই, আর তার এমনই কি মন্দ ফল ফলেছে? শান্তির বাপ মা যে পথে চলেছে তারও সে পথই ভাল। ওসব নভেলিয়ানা আমি ভাল বুঝি না। শ্যামাকান্ত চৌধুরীর ভারী সাধ যে শান্তি তাঁর বধূ হয়। তাঁর ছেলে বিনোদ কতোদিন নিরুদ্দেশ এপর্য্যন্ত তাহার এতোটুকু খবর পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। ধরে নেও সে বেঁচে নাই। বিশেষ সেবার সংবাদপত্রে সেই যে রেলওয়েতে কাটাপড়া ছেলেটির কথা সে বিনোদ ছাড়া আর কেউ? চৌধুরীকে লুকলেম সত্য কিন্তু তারিণী বাবু স্বচক্ষে সে ছেলেটীকে দেখে এসে স্পষ্টই বল্লে শুনলে তো যে সে বিনোদ ছাড়া আর কেউ নয়। সেই জন্য চৌধুরী যখন শান্তিকে পাবার জন্য তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র হেমেন্দ্রকে দত্তক নিলেন আমি বাধা দিইনি। পূর্ব্বেও আমি একবার তাঁর কাছে স্বীকার করেছিলেম, যে যদি বিনোদ ফিরে আসে তাহলে আমি শান্তিকে তার হাতে দেবো। এখন শ্যামাকান্ত চৌধুরী সেই দাবী তুলেছেন। সেদিন তিনি নিজে তাঁহার বর্ত্তমান পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন আমিও এক প্রকার কথা দিয়ে ফেলেছি।" বসুমতী নীরবে বসিয়া রহিলেন। তিনি কয়মাস ধরিয়া যে আশা সদৃঢ়ভাবে মনের মধ্যে পোষণ করিতে ছিলেন, বুঝিলেন তাহা পূর্ণ হইবার আর আশা নাই।

রজনীনাথ পুনশ্চ কহিলেন "বসু! তুমি দুঃখ করিও না! ঈশ্বর মঙ্গলময় তিনি যা করেন তা ভালর জন্যই করেন। দেখো শান্তির জন্য শ্যামাকান্ত যেমন ব্যগ্র পৃথিবীতে বৌয়ের জন্য কোন শ্বশুর বোধ হয় তেমন হয় না। আমাদের বুড়িটা যেমন আদরের সেখানেও তেমনি আদর পাবে। ছেলেটীও দেখতে শুনতে নম্রস্বভাবে সবরকমে ভাল; নিশ্চয়ই শান্তি সুখী হবে। এস বসু আমরা তার মঙ্গলকামনায় মঙ্গলময়কে প্রণাম করি।" বসুমতী গলায় অঞ্চল দিয়া স্বামীর পার্শ্বে ভূমিতলে প্রণতা হইলেন। এই দুইটি স্নেহগভীর হৃদয়ের আকুল প্রার্থনা মানবঅদৃষ্টের নিয়ন্তা ভবিষ্যতের একমাত্র দর্শক কিভাবে গ্রহণ করিলেন— তিনিই জানেন।



মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়

বীর পুরুষ।

"ওহোঃ সার্জ্জিয়াস! আর একটি কাজের কথা আছে।"

"কি কথা হুজুর?"

"ভলট্রোমার দরবারে যাইবার বন্দোবস্ত কতদূর হইল?"

"সেস্থানে হুজুরের নিজের উপস্থিত না হওয়াই কর্ত্তব্য।"

"নিরাপদ নহে? হাঃ হাঃ কেন?"

"হুজুর! ভলট্রোমার প্রান্ত হইতে প্রান্তান্তর নিহিলিষ্টে পরিপূর্ণ। বহুসংখ্যক লোকদিগের প্রতি পুলিশের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রহিয়াছে সত্য, কিন্তু সকলপ্রকার বিপদের প্রতি দৃষ্টি রাখা মানুষের সাধ্যাতীত। সেইজন্য আমি পল কার্শনেকের সহিত পরামর্শ করিয়াছি সে হুজুরের স্থলাভিষিক্ত হইয়া ভলট্রোমার দরবারে উপস্থিত হইবে।"

রুষ সম্রাটের ভ্রাতুষ্পুত্র গ্র্যাণ্ড ডিউক ভ্যাশিলিও এবং তাঁহার বিশ্বস্ত পরিচারক সার্জ্জিয়াসের মধ্যে উক্তরূপ আলোচনা হইতেছিল।

"বটে!" প্রিন্স ভ্যাসিলি টেবিলের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া, সার্জ্জিয়াসের প্রতি আপনার আয়ত চক্ষু স্থাপন করিয়া কহিলেন,—

"বটে! তবে শোন সার্জ্জিয়াস! আগামী বৃহস্পতিবার ভলট্রোমার দরবারে আমি স্বয়ং উপস্থিত থাকিব। এবং ইহাও শুনিয়া রাখ ভবিষ্যতে আমি সেখানে বাস করিব স্থির করিয়াছি।"

প্রিন্স ভ্যাসিলির কোন মীমাংসার উপর কোন রকম আপত্তি উত্থাপন করা যে বাতুলতা তাহা সার্জ্জিয়াসের মত আর কেহ জানিত না। তথাপি প্রিয়তম প্রভুর এই বিপজ্জনক প্রস্তাবে তাঁহার হিতাকাঙ্ক্ষী এবং বিশ্বাসী ভৃত্যটি নিতান্ত শঙ্কান্বিত হইয়া উঠিল। সে শত চেষ্টাতেও মুখের ভীতিবিহ্বল ভাব লুকাইতে পারিল না। জিজ্ঞাসা করিল,—

"আর আমার কর্ত্রীঠাকুরাণী? প্রিন্সেস ভ্যাসিলি? তিনিও কি ভলট্রোমায় বাস করিতে যাইবেন?"

প্রিন্স দৃঢ়স্বরে "হ্যাঁ" বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সার্জ্জিয়াস বুঝিল তাহাদের কথাবার্ত্তা এইখানে শেষ করাই প্রভুর অভিপ্রায়।

প্রিন্স ভ্যাসিলি প্রকৃত বীরপুরুষ,—ভয় কাহাকে বলে তাহা তিনি জানিতেন না। জীবনে তিনি কখনও ভীত হইয়াছেন বলিয়া স্মরণ করিতে পারেন না। কাহাকেও ভীত দেখিলে তিনি অধৈর্য্য হইয়া উঠিতেন। সার্জ্জিয়াসের তখন সেই গৃহ পরিত্যাগ ভিন্ন উপায় রহিল না। দ্বারের নিকট গিয়া সে একবার ফিরিয়া দাঁড়াইল; অত্যন্ত বিনীতস্বরে বলিল,—

"হুজুর! আইভ্যান ক্যারেলিন নামে একটি লোক নীচে বসিয়া আছে। ভলট্রোমা সম্বন্ধে নাকি কি প্রয়োজনীয় সংবাদ আছে হুজুরকে ব্যতীত সে অন্য কাহারও নিকট সে কথা বলিবে না।"

এই লোক সম্বন্ধে সে তাহার প্রভুকে কিছু বলিবে না বলিয়াই এক্ষণে স্থির করিয়াছিল। কিন্তু তাহার সংবাদ শুনিয়া প্রিন্স ভলট্রোমায়

বাস করিবার মত পরিবর্ত্তন করিতে পারেন এই আশায় সে এক্ষণে এই কথা বলিল। প্রিন্স বলিলেন,—"তাহাকে আসিতে দাও—আমি যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি তাহাতে তাহার সংবাদে আমার বিশেষ উপকার হইতে পারে।" অবিলম্বে আইভ্যান ক্যারেলিন গৃহে প্রবেশ করিল। প্রিন্স তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"আমার নিকট তোমার কিছু বক্তব্য আছে?" মস্তক অবনত করিয়া একটু কম্পিতস্বরে লোকটি বলিল,—

"হ্যাঁ হুজুর!"

আইভ্যান ক্যারেলিন দেখিতে খর্ব্বাকৃতি তাহার চক্ষুদুটি অতিশয় উজ্জ্বল হইলেও তাহার মুখে দুর্ব্বলতা এবং ধৈর্য্যাভাব স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছিল। এ সংসারে এক প্রকৃতির লোক আছে যাহারা সামান্য দুঃখ কষ্টের সহিত বহুকাল ধরিয়া যুদ্ধ করিতে পারে না—অতি সহজেই ভাঙ্গিয়া পড়ে; এবং কল্পনাচক্ষে চতুষ্পার্শ্বে শুধু বিপদরাশিই দেখিতে পায়। আইভ্যান ক্যারেলিন সেই প্রকৃতির লোক।

প্রিন্স বলিলেন,—

"বেশ—বেশ—তুমি কি বলিতে চাও সব খুলিয়া বল।"

"হুজুর! একটা কথা প্রথমে নিবেদন করি, এখান হইতে আমাদের কথাবার্ত্তা কাহারও শুনিবার সম্ভাবনা নাই তো? আপনার ভৃত্য আমার আপাদমস্তক পরীক্ষা করিয়া আমাকে এই গৃহে প্রবেশ করিতে দিয়াছে—সুতরাং আমা হইতে হুজুরের কোন বিপদের সম্ভাবনা নাই।" প্রিন্স ভ্যাসেলি বিরক্তভাবে ললাট কুঞ্চিত করিলেন। সার্জ্জিয়াসের এই রূপ সাবধানতা তাঁহার বিরক্তি উৎপাদন করিত। তাঁহার বিবেচনায় এসকল নিষ্প্রয়োজন এবং বালকসুলভ।

"তোমার প্রতি এই ব্যবহার আমার আজ্ঞানুসারে হয় নাই ইহা বিশ্বাস করিও। আমার ভৃত্যকে এজন্য যথোচিত শিক্ষা দিব। চল আমরা ভিতরের ঘরে যাই—সেখান হইতে কেহ আমাদের কথা শুনিতে পাইবে না।" প্রিন্স সেই গৃহের দ্বার অর্গলাবদ্ধ করিয়া ক্যারেলিনকে লইয়া পার্শ্বের একটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র গৃহে প্রবেশ করিলেন। গৃহের মধ্যস্থলে একটি লিখিবার টেবিল—তাহার পার্শ্বের চেয়ারে উপবেশন করিয়া ক্যারেলিনের প্রতি চাহিয়া বলিলেন,—

"তোমার যাহা বলিবার আছে এইবার বলিতে পার।"

"হুজুর! আমার কাহিনী ক্ষুদ্র নয়—অধীনের প্রতি দয়া করিয়া একটু ধৈর্য্যধারণ করিতে হইবে। আপনার সমূহ বিপদ উপস্থিত—সে বিপদ হইতে আপনাকে রক্ষা করাই আমার এখানে আসিবার উদ্দেশ্য। সেই জন্যই সকল কথা বুঝাইয়া বলা নিতান্ত প্রয়োজন।"

প্রিন্স ভ্যাসিলি গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন,—"নিজের বিপদাপদের জন্য আমি কিছুমাত্র চিন্তিত নহি—যাহাহউক তোমার কথা বলিয়া যাও।"

"হুজুর! আমি একজন "নজরবন্দী"—আমি সাইবেরিয়ায় প্রেরিত হইয়াছিলাম। আমার পঞ্চবিংশতি বৎসর বয়সের সময় নির্ব্বাসিত হইয়াছিলাম—নয় বৎসর সেখানে ছিলাম। দুই বৎসর হইল সেস্থান হইতে পলায়ন করিয়া আসিয়াছি।"

"প্রিন্স এই সময়ে বলিলেন,—"আমার নিকট সেজন্য তুমি সম্পূর্ণ নিরাপদ—তোমার কথা নির্ভয়ে বলিয়া যাইতে পার!"

"আপনার বিরুদ্ধে একটি ষড়যন্ত্র চলিতেছে—ভলট্রোমার দরবারে উপস্থিত হইলে আপনাকে হত্যা করা হইবে।"

"তুমি কি করিয়া জানিলে?"

প্রিন্সের কণ্ঠস্বর একটু বিদ্রূপাত্মক। "নিহিলিষ্ট সম্প্রদায় কর্ত্তৃক আমি চর নিযুক্ত হইয়াছি। ভলট্রোমায় আমাদের দলের যে সকল লোক আছে তাহারা অত্যন্ত সরল প্রকৃতির—কিন্তু অত্যন্ত কঠোর এবং কার্য্যতৎপর। আমরা বহু বৎসর ধরিয়া তাহাদিগকে শিক্ষা দিতেছি। এখনও তাহারা নজরবন্দী হয় নাই! পুলিশের লোক এখনও তাহাদের নিতান্ত নিরীহ বলিয়াই জানে। তাহারা নিজেদের মতামত প্রতিবাসীর নিকটও প্রকাশ করে না।"

"ওঃ তুমি তাহাদের জান? তাহারা কোথায় থাকে বলিতে পার?"

প্রিন্স টেবিলের উপর একখণ্ড কাগজ লইয়া অন্যমনস্কে কি সব লিখিতেছিলেন। মনে মনে একটি সংকল্প স্থির করিতেছিলেন। ক্যারেলিনকে আর একবার পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত বলিলেন,—

"তুমি কি করিতে যাইতেছ একবার ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখ। নিজের অবশিষ্ট জীবন নিরাপদ করিবার জন্য কয়েকটি সরল নিরীহ লোকের সর্ব্বনাশ করিতেছ। তাহাদের মৃত্যুর পথ কিম্বা তাহা হইতেও ভয়ঙ্কর সাইবেরিয়ায় নির্ব্বাসনের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিতেছ। বিশ্বাসঘাতকতা অপেক্ষা মৃত্যুকে আলিঙ্গন করা কি শ্রেয় নয়?"

অত্যন্ত কাতরস্বরে আইভ্যান ক্যারেলিন উত্তর করিল,—

"হুজুর! অত্যন্ত নির্ভীক হৃদয় হইলেও আপনি শান্তিপ্রিয়। আপনার হৃদয় উদার, মহানুভব, দয়া করুণায় পূর্ণ এবং পরদুঃখে ব্যথিত। ইহা আমার অজ্ঞাত নহে। আপনাকে হত্যা করিয়া আমাদের সম্প্রদায়ের কি অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে জানি না। আমি আপনাকে রক্ষা করিবার জন্যই এখানে আসিয়াছি। নিজেকে রক্ষা করাও আর একটি উদ্দেশ্য। আমি ইহা বিশ্বাস করি না যে আপনার ন্যায় মহৎ ব্যক্তির পক্ষে এই লোক কয়টির সর্ব্বনাশ করা সম্ভবপর। আপনি শুধু ইহাদের অভিসন্ধি ব্যর্থ করিয়া দিয়া"——

বাধা দিয়া প্রিন্স বলিলেন,—আমার কর্ত্তব্য আমি নিজেই নিরূপণ করিতে পারিব।"

তাঁহার মুখ দেখিয়া মনে হইল তিনি কর্ত্তব্য স্থির করিয়াছেন।

"তোমাদের সম্প্রদায়ের এই আজ্ঞাধীন যন্ত্র কয়টি কে?"

"মাইকেল পেট্রোভিচ ও তাহার পুত্র সাইমন! তাহারা ব্যবসায়ে মুচি—মস্কো রোডের উপর একটি ক্ষুদ্র কুটিরে বাস করে। তাহাদের সহিত এই ষড়যন্ত্রে আর একটি লোক আছে—তাহার নাম নিকিটা এণ্টোনিক—সে ডাক্তার। আগামী বুধবার সন্ধ্যা ৭টার সময় তাহারা তিনজনে পেট্রোভিচের কুটিরে আমার জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকিবে। সেই কুটিরে ইহারা ব্যতীত মাত্র সাইমনের

স্ত্রী মেরায়া ও তাহার একটি শিশু পুত্র আছে। তাহাদের বাসস্থান বাহির করিয়া লওয়া অত্যন্ত সহজ হইবে। ঐ রাস্তার উপর সর্ব্বশেষ কুটিরে তাহারা বাস করে। নিকট-বর্ত্তী অন্যান্য কুটির অপেক্ষা ইহা অনেক ক্ষুদ্র ও জঘন্য।"

"এই তিনটি লোকের আকৃতি সম্বন্ধে আমাকে কিছু বলিতে পার?"

"না হুজুর! আমি তাহাদিগকে কখনও চক্ষে দেখি নাই।"

"তাহারা তোমাকে কখনও দেখিয়াছে? তোমার আকৃতি সম্বন্ধে তাহাদের কোন জ্ঞান আছে?"

"না হুজুর! এই আংটি মাত্র আমার সঙ্কেত চিহ্ন। ইহা আমি আপনাকে দিতে পারি।"

ক্যারেলিন তাহার পকেট হইতে একটি স্মবর্ণময় অঙ্গুরী বাহির করিয়া প্রিন্সের সম্মুখে স্থাপন করিল। তিনি অসাবধানে একবার তৎপ্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"অন্য কোন প্রকার সঙ্কেত নাই? কোন প্রকার অভিবাদন বা ফরমাইস?"

"না হুজুর! এই তিনটি ব্যক্তি সম্প্রদায়ের মণ্ডলিভুক্ত নহে। ইহাদের প্রতি ব্যবহারে সরলতাই শ্রেয় এবং নিরাপদ।"

প্রিন্স ভ্যাসিলি উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন,

"আইভ্যান ক্যারেলিন! তোমার কথাই ঠিক। আমি এই সরল নিরীহ লোক তিনটিকে শাস্তি ভোগ করিতে দিব না। কিন্তু তুমি বোধ হয় বুঝিতেছ যে তোমার বিশ্বাসঘাতকতা ইহাদের নিকট প্রকাশ হইবে।"

"আজ্ঞা হাঁ হুজুর! আমি তাহা জানি—কিন্তু আমি একবার ইংলণ্ড বা আমেরিকায় নিরাপদে পৌঁছিতে পারিলে এখানকার বন্ধুবান্ধবদের মতামতে আমার বিশেষ কিছু ক্ষতি হইবে না। আপনার কৃপা হইলে নির্ব্বিঘ্নে এদেশ ছাড়িতে পারিব সেই আশা-তেই এই দুঃসাহসিক কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়াছি।"

"না আইভ্যান ক্যারেলিন! তাহা হইবে না।" বিচারকের দণ্ডাজ্ঞা প্রদানের ন্যায় প্রিন্সের কণ্ঠস্বর ধীর এবং গম্ভীর।

"না আইভ্যান ক্যারেলিন! তাহা হইতে দিব না। তোমার ন্যায় বিশ্বাসঘাতক বাঁচিয়া থাকা নিরাপদ নহে—অন্য দেশে যাইয়া গুরুতর অপরাধ করিবার জন্য তোমাকে বাঁচিয়া থাকিতে দিতে পারিব না। তোমার মত বিশ্বাসঘাতক আর নাই। তুমি রুষরাজের নিকট বিশ্বাসঘাতক এবং তোমার সম্প্রদায়ের নিকট বিশ্বাসঘাতক। তোমার উপযুক্ত একমাত্র দণ্ড—মৃত্যু!"

কিছুক্ষণের জন্য উভয়ে নীরব!

আইভ্যান ক্যারেলিন দেওয়ালের নিকট হঠিয়া গিয়া প্রিন্স ভ্যাসিলির সুদীর্ঘ গম্ভীর মূর্ত্তির প্রতি মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় চাহিয়া রহিল। প্রিন্স টেবিলের দেরাজ হইতে একটি পিস্তল বাহির করিলেন। তাঁহার অভিপ্রায়, তাঁহার ধীর, গম্ভীর, শান্ত এবং সতর্ক ব্যবহারেই প্রতীয়মান হইতেছিল। ক্যারেলিন নিশ্চিত বুঝিল এই নির্ভীক হৃদয় প্রিন্স তাঁহার প্রতিজ্ঞা পালন করিবেন। তখন তাহার স্বাভাবিক বিদ্বেষ আবার ফিরিয়া আসিল। সে অত্যন্ত গর্ব্বিত ভাবে মস্তক উত্তোলন করিয়া দাঁড়াইয়া অবজ্ঞাপূর্ণ স্বরে বলিল,—

"অত্যাচারী পাষণ্ড! মৃত্যুকে আমি তুচ্ছ জ্ঞান করি।" আত্মসংযমের যথেষ্ট চেষ্টা থাকিলেও ভয়ে তাহার কণ্ঠস্বর কম্পিত হইতেছিল।

প্রিন্স বিনাবাক্যে পিস্তল ছুঁড়িলেন! সার্জ্জিয়াস বাহির হইতে পিস্তলের আওয়াজ শুনিয়া অত্যন্ত ভীতস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল; রুদ্ধদ্বারে পুনঃ পুনঃ করাঘাত করিতে লাগিল। প্রিন্স ধীরভাবে আসিয়া দ্বার উন্মোচন করিয়া কহিলেন,—

"ঐ গৃহে একটি মৃতদেহ আছে। এ সম্বন্ধে যেখানে যেখানে সংবাদ দিবার প্রয়োজন অদ্যই দিবে। সাক্ষী দিবার প্রয়োজন হইলে আমি দিব। যাহাতে আজই সব শেষ হইয়া যায় তাহা করিবে। আমি ভলগ্রোমা অভিমুখে মঙ্গলবার যাত্রা করিব। যেমন করিয়া হউক বুধবার সন্ধ্যা ছয় ঘটিকার সময় সেখানে পৌছিতে হইবে।"

২

মাইকেল পেট্রোভিচ তাহার কুটিরের মুক্তদ্বারের নিকট দণ্ডায়মান হইয়া একাগ্রচিত্তে নগরের অপর প্রান্তস্থিত তোপের আওয়াজ শুনিতেছিল। বৈকালে এক পসলা বৃষ্টি হইয়া অল্প অল্প বরফ পড়িতে আরম্ভ হইয়াছে। দীন দরিদ্রের উৎকণ্ঠিত চিত্ত বুঝিল ইহাই শীতের প্রারম্ভ! মাইকেল তাহার দীর্ঘ এবং বিকৃত অঙ্গুলির অগ্রভাগে তোপের সেই ভয়ঙ্কর আওয়াজগুলি গণনা করিতেছিল। কুটিরাভ্যন্তরে তাহার পুত্র সাইমন একটি ক্ষুদ্র টেবিলের নিকট বসিয়া, ঔদাস্যপূর্ণ দৃষ্টি দেওয়ালের প্রতি স্থাপিত করিয়া তাহার নূতন কর্ত্তব্য ভাল করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিবার বৃথা চেষ্টা করিতেছে। তাহার কিশোরী পত্নী ভীত এবং উদ্বিগ্ন ভাবে তাহাকে নানা প্রকার প্রশ্ন করিতেছে।

মাইকেলের গণনা শেষ হইল। সে কুটিরে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া হাসিতে হাসিতে বলিল,—

"প্রিন্স ভ্যাসিলির তোপ! প্রিন্স আসিয়া পৌছিলেন! খুব আমোদ করিতেছেন—না সাইমন? খুব আমোদ? হাঃ হাঃ হাঃ।"

মেরায়া বলিল,—

"নিকিটা এণ্টোনিক কোথায়? সে তো এখনও আসিল না।"

মাইকেল উদ্বিগ্নভাবে বলিল,—হ্যাঁ—হ্যাঁ—তাই তো! তাহার বড়ই দেরী হইতেছে—সাতটা প্রায় বাজে।"

সাইমন বলিল,—

"বাস্তবিকই বড় বিলম্ব করিতেছে। কে এখন—কি তাহার নাম বাবা—তাহার সঙ্গে কথাবার্ত্তা চালাইবে? আমি তো—

মাইকেল তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল,—"আইভ্যান ক্যারেলিন! আইভ্যান ক্যারেলিন! তাহার নাম আইভ্যান ক্যারেলিন—ভুলিও না।"

পকেট হইতে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক বাহির করিয়া মাইকেল ঈষৎ কোমলস্বরে বলিতে লাগিল,—"হাঁ। আইভ্যান ক্যারেলিন—আমাদের গুরু। সাইমন! শোন তিনি তাঁহার পুস্তকে কি লিখিয়াছেন—আমরা যদি সত্যই স্বাধীনতা চাই তবে আমাদের প্রত্যেকেরই মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। আমরা একজন আত্মোৎসর্গ করিলে লক্ষ লক্ষ লোককে

স্বাধীনতা দিতে পারিব একথা যেন এক মুহূর্ত্তের জন্ত বিস্মৃত না হই। শোন সাইমন! আমরা পিতাপুত্রে ইচ্ছা করিলে লক্ষ লক্ষ লোককে রক্ষা করিতে পারি। ইহা কি বিস্ময়কর ব্যাপার নহে? আরও বিস্ময়কর আইভ্যান ক্যারেলিন আজ এই গৃহে পদার্পণ করিবেন। আজ আমাদের উৎসবের রাত্রি সাইমন! উৎসবের রাত্রি!"

মেরায়া করুণস্বরে জিজ্ঞাসা করিল,—"এবার কি গ্র্যাণ্ড ডিউক ভ্যাসিলির পালা পিতা? কালই কি তাঁর শেষ দিন?"

"হ্যাঁ প্রিন্স ভ্যাসিলি কাল। আগামী মাসে আর একজন—তার পরের মাসে আবার একজন। এই রকম চলিবে—যতদিন না আমাদের ভয়ে তাহারা কম্পিত হইবে ততদিন ইহার শেষ নাই। তারপর আমরা বাঁচিয়া থাকিবার অধিকার পাইব। বুঝিলে মেরায়া? আমরা বাঁচিয়া থাকিবার অধিকার পাইব। এখন যে বাঁচিয়া আছি তাহা অপেক্ষা মৃত্যুও শ্রেয়।"

মেরায়া একটু চিন্তাপূর্ণ স্বরে বলিল,—"আমি প্রিন্স ভ্যাসিলিকে একবার পিটার্স-বার্গে দেখিয়াছিলাম।"

সাইমন অমনি ব্যস্তভাবে বলিয়া উঠিল,—"সত্যি? বল বল সে সম্বন্ধে সব কথা বল।"

সাইমন তাহার পত্নীর অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে একটু গর্ব্বিত কেননা তাহারা পিতা পুত্রে কখনও তাহাদের জন্মস্থান পরিত্যাগ করে নাই। তাই এই পৃথিবী সম্বন্ধে তাহারা নিতান্তই অনভিজ্ঞ।

মেরায়া পূর্ব্ববৎ স্বরে বলিতে লাগিল,—"আঃ—তিনি কি আমাদের মত? তাঁহার চেহারা কেমন সুন্দর—কত গম্ভীর, কত মহৎ কত গৌরবান্বিত!" মাইকেল ঘৃণা ভরে বলিয়া উঠিল, "ঈস্!"

মেরায়া বলিয়া যাইতে লাগিল,—"তাঁর জন্য আমার বড় কষ্ট হয় তাঁর কাল মরিতে হইবে ভাবিয়া বড় দুঃখ হয়। তিনি বড় ভাল।" মাইকেল চীৎকার করিয়া উঠিল, "বাস্—বাস্।"

যাহাকে সে অত্যাচারকারী পাষণ্ড বলিয়া ঘৃণা করে তাহার জন্য এই কাতরতা দেখিয়া সে ক্রোধান্বিত হইয়া উঠিল। সে আরও কি বলিতে যাইতেছিল—কিন্তু অকস্মাৎ গবাক্ষ পথে একটি মনুষ্য মুণ্ড দেখিয়া চুপ করিয়া গেল।

"এই যে নিকিটা! তোমার এত দেরী হইল কেন? এস—এস—দরজা খুলিয়া দিতেছি।"

সাইমন উঠিয়া দ্বার উদ্ঘাটন করিল। নিকিটা কুটিরে প্রবেশ করিয়া দ্বার পুনরায় অর্গলাবদ্ধ করিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল,—"সর্ব্বনাশ হইয়াছে! সর্ব্বনাশ হইয়াছে! আইভ্যান ক্যারেলিন ধরা পড়িয়াছে। ঘণ্টা খানেক হইল একটা দোকানে দুজন লোক বলাবলি করিতেছিল। তাহারা অবশ্য কাহারও নাম করে নাই—কিন্তু আমি নিশ্চয় জানি সে আইভ্যান ক্যারেলিন। এমন কি হইবে? সব কথাই তো তাহা হইলে প্রকাশ হইয়াছে। আমি তখনই"—

মাইকেল তাহাকে কথা শেষ করিতে দিল না। চীৎকার করিয়া উঠিল,—

"অসম্ভব! আইভ্যান ক্যারেলিন ধরা পড়িবে? যে একবার বুদ্ধিবলে সাইবেরিয়া

"না হুজুর!"

অপ্রত্যাশিত বিপদ রাশির মধ্যে পতিত হইয়াও প্রিন্স বিচলিত হইলেন না। তাঁহার স্বাভাবিক তীক্ষ্ণ বুদ্ধিবলে অতি শীঘ্রই উপায় স্থির করিলেন। মেরায়াকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—

"ওঠ ওঠ। আমার কথা শোন। আমাকে যে তুমি চিনিয়াছ তাহা অন্য কাহারও কাছে বলিও না। আমার কথা শুনিলে? আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি কাহারও কোন বিপদ হইবে না। কিন্তু যদি আমার কথার অবাধ্য হও তবে,"—

"তবে—?" প্রিন্স হাস্য করিলেন "তবে বিপদ গ্রস্ত হইবে।"

মেরায়া বলিল,—"হুজুর! কিন্তু"—

প্রিন্স বাধা দিয়া বলিলেন,—

"ইহার মধ্যে "কিন্তু" নাই। আজ রাত্রের জন্য আমি আইভ্যান ক্যারেলিন। তুমি সকলকে ডাকিয়া বলিবে আমি আইভ্যান ক্যারেলিন। বুঝিলে? ঐ গৃহের মধ্যে তোমার স্বামী আছে—একটি ছোট শিশু আছে। আমার আজ্ঞা পালন করিয়া তাহাদের প্রাণ রক্ষা কর। যাও—এইবার তাহাদের ডাক,—না থাক্—এইখান হইতেই ডাক।"

মেরায়া ক্ষীণকণ্ঠে নিকিটার নাম ধরিয়া ডাকিল। তিনবার ডাকিবার পর নিকিটা এণ্টৌনিক দ্বার উন্মোচন করিয়া বাহিরে আসিল। তাহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আগন্তুকের প্রতি স্থাপিত করিয়া সন্দেহপূর্ণস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, —"কে আপনি?"

মৃদুহাস্য করিয়া প্রিন্স বলিলেন,—

"আইভ্যান ক্যারেলিন নামেই আমি এক্ষণে পরিচিত।"

"সাঙ্কেতিক অঙ্গুরীয়ক কোথায়?"

মেরায়া তাহার হস্তস্থিত অঙ্গুরীয়ক নিকিটার হস্তে প্রদান করিল। নিকিটা বহুক্ষণ ধরিয়া মনোযোগ সহকারে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। প্রিন্স একটু ব্যস্তভাবে বলিলেন,—

"ভ্রাতঃ আইভ্যান ক্যারেলিনের স্বরূপতা সম্বন্ধে স্থির নিশ্চয় হওয়া কর্ত্তব্য বটে কিন্তু আমাদের অন্যান্য কর্ত্তব্য বিস্মৃত হওয়া কি উচিত? কোথায়? মাইকেল পেট্রোভিচ ও তাহার পুত্র সাইমন কোথায়?"

মাইকেল তাহার দেবতার আজ্ঞা পালনের জন্য অত্যন্ত উৎসুকভাবে অর্দ্ধোন্মুক্ত দ্বারের পার্শ্বে অপেক্ষা করিতেছিল। তাঁহার মুখে আপন নাম উচ্চারিত হইবামাত্র আনন্দোৎফুল্ল নয়নে তাঁহার সম্মুখীন হইয়া সসম্ভ্রমে তাঁহাকে অভিবাদন করিল। প্রিন্স সহাস্যবদনে তাহার স্কন্ধে হস্তার্পণ করিয়া কহিলেন,—

"নিশ্চয়ই তুমিই মাইকেল পেট্রোভিচ। মাইকেল! কাল তুমি রুষরাজ্যের একজন বীরপুরুষের মধ্যে গণ্য হইবে।"

মাইকেলের উজ্জ্বল চক্ষু উজ্জ্বলতর হইল। আনন্দে তাহার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল। সে গদগদ কণ্ঠে বলিতে লাগিল,—

"তা—তা—আপনার আশীর্ব্বাদে"—

মেরায়া নীরবে একপার্শ্বে দণ্ডায়মান—কি এক অমঙ্গল আশঙ্কায় তাহার শরীর মন কম্পিত হইতেছিল। তাহার পতি পুত্র অপেক্ষা এই নির্ভীক হৃদয় প্রিন্সের জন্যই যেন তাহার প্রাণ অধিক কাঁদিতে লাগিল। তাঁহার বাক্যে তাহার সম্পূর্ণ বিশ্বাস জন্মিয়া-

ছিল, তাই তিনি তাহাকে গৃহান্তরে গমন করিতে আদেশ করিলেই সে তাহা প্রতিপালন করিল। প্রিন্স বলিলেন,—

"এইবার কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া যাক্।" গৃহে একখানি চেয়ার ছিল প্রিন্সের জন্য তাহা নির্দ্দিষ্ট হইল। নিকিটা, মাইকেল ও সাইমন কাষ্ঠের বেঞ্চিতে আসন গ্রহণ করিল। নিকিটা প্রথমে কথা কহিল,—

"আমরা মনে করিয়াছিলাম আপনি ধরা পড়িয়াছেন।"

প্রিন্স হাস্য করিয়া উঠিলেন,— "আমি? না—না—যে পাখী একবার জালে পড়িয়া মুক্তি পায়, তাহার পুনর্ব্বার জালে পড়িবার সম্ভাবনা অতি অল্প।"

মাইকেল গর্ব্বভরে নিকিটার প্রতি চাহিয়া মৃদুহাস্য করিল। নিকিটা একটু অপ্রস্তুত হইয়া কহিল,—"এতদূরে আমরা সব সঠিক সংবাদ পাই না।" প্রিন্স জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"তারপর কালকার কার্য্য সম্বন্ধে কি ঠিক করিয়াছ?"

মাইকেল বলিল,—"কালকার কার্য্য সম্বন্ধে আমি একটুও ভীত নই। আপনি উপদেশ দিলে আমার কর্ত্তব্য আমি পালন করিতে পারিব।"

"তোমরা আমাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস কর?"

অন্য কেহ উত্তর দিবার পূর্ব্বে মাইকেল তাড়াতাড়ি কহিল,—"আমরা আপনাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি—সম্পূর্ণ।"

প্রিন্স কিয়ৎকাল নীরব রহিলেন।— তিনি আসিবার সময় তাঁহার কর্ত্তব্য কিছুই স্থির করিয়া আসেন নাই। তাঁহার প্রতি এই তিনটি প্রাণীর কি ভাব তাহাও তিনি অবগত নহেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তোমরা প্রিন্স ভ্যাসিলিকে কখনও দেখিয়াছ? তাহার সম্বন্ধে তোমরা কি জান?"

তিনজনে একবাক্যে বলিয়া উঠিল,—

"না—আমরা তাঁহাকে কখনও দেখি নাই; আমরা তাঁহার সম্বন্ধে আর কিছু জানিতে চাহি না। আমরা শুধু জানি তিনি একজন অত্যাচারী প্রজাউৎপীড়ক জমীদার। এই জ্ঞানই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট।"

তাহাদের কণ্ঠস্বর কঠোর! প্রিন্স তাহাতে কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না করিয়া কহিলেন—

"হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক কথা। কিন্তু তোমরা তাঁহাকে চিনিবে কি করিয়া?

নিকিটা বলিল—"দরবারে প্রধান ব্যক্তিকে চিনিয়া বাহির করা খুব অসাধ্য ব্যাপার নয়।"

মাইকেল উত্তেজিত হইয়া আপন বক্ষে হস্তার্পণ করিয়া কহিতে লাগিল—

"আমার হৃদয় আমাকে বলিয়া দিবে। আমি জানি তাহার সম্মুখীন হইবামাত্র আমার সমস্ত শরীর ঘৃণায় সঙ্কুচিত হইবে। তাহার উপস্থিতি আমি শিরায় শিরায় অনুভব করিব। সহস্র মনুষ্যের মধ্যেও সে আমার দৃষ্টি এড়াইতে পারিবে না।"

প্রিন্স ভ্যাসিলি ধীর শান্তস্বরে বলিলেন—

"দেখিতেছি আমি আসিয়া ভালই করিয়াছি। নিকিটা এণ্টোনিকে তোমার কথার উত্তর এই যে, দরবারের প্রধান ব্যক্তিকে চেনা সহজ বটে কিন্তু প্রিন্স ভ্যাসিলি যে দরবারের প্রধান ব্যক্তির স্থান অধিকার করিবেন তাহা তুমি নিশ্চয় করিয়া

বলিতে পার কি? তোমরা কি জাননা যে এই সব কার্য্যে প্রায়ই পল কার্সনেফ প্রিন্সের স্থান অধিকার করে? আর মাইকেল পেট্রোভিচ! তোমাকে বলিতেছি পাগলের মত কতগুলা বকিলেই এই সব কার্য্য সম্পাদন হয় না।”

প্রিন্সের তিরস্কারে কিঞ্চিৎ লজ্জিত হইয়া মাইকেল বলিল,—“আপনি কি মনে করেন আমি তাহাকে চিনিতে পারিব না?”

“মনে করিব কি? আমার সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই। তোমরা কি প্রিন্স ভ্যাসিলিকে সত্যই ঘৃণা কর?”

মাইকেল পুনরায় উত্তেজিত হইয়া উঠিল,—“সমস্ত হৃদয় মন দিয়া মানুষের মানুষকে যতদূর ঘৃণা করা সম্ভব, আমি”—

বাধা দিয়া দৃঢ়স্বরে প্রিন্স বলিলেন,—

“না—তোমরা ঘৃণা কর তাহার কাল্পনিক দোষগুলিকে। তাহার অত্যাচার তাহার নিষ্ঠুরতা—তাহার স্বেচ্ছাচারিতা, তাহার হৃদয়হীনতা,—তোমরা তাহার কথা মনে করিলেই এই দোষগুলি তাহার প্রতি আরোপ কর। যাহাকে কক্ষনো চক্ষে দেখ নাই তাহাকে ঘৃণা করা কি সম্ভব? তোমরাই একবার ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখ না?”

তাহারা একথার কোন উত্তর দিতে পারিল না। মাইকেল লজ্জিত হইয়া মস্তক অবনত করিয়া আপন পদদ্বয় নিরীক্ষণ করিতে লাগিল, নিকিটা মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে জিজ্ঞাসা করিল—“তা—তা তবে কেমন করিয়া তাহাকে চিনিব?”

“প্রিন্স গৃহ মধ্যে পাদচারণা করিতে করিতে কহিলেন—

“সেটা বোধ হয় খুব কঠিন হইবে না—আমি বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত হইয়াছি প্রিন্স আপনার নির্দ্দিষ্ট আসন গ্রহণ না করিলেও দরবারে উপস্থিত থাকিবেন।”

নিকিটা জিজ্ঞাসা করিল—“কি করিয়া তাহাকে চিনিব?”

ঈষৎ হাস্য করিয়া প্রিন্স কহিলেন,

“আমাকে খুঁজিও, দেখিতে পাইলে কাছে আসিয়া কার্য্য সম্পাদন করিও।”

মাইকেল একটু বিরক্তভাবে বলিল—“আপনার কথা বুঝিলাম না।”

নিকিটা বলিল, “আমিও না!”

প্রিন্স বড়ই বিপদগ্রস্ত হইলেন। কি ভাবে আত্ম পরিচয় দান করিবেন চিন্তা করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল সকলেই নীরব। বাহিরে প্রবল ঝটিকা বহিতেছিল রুদ্ধদ্বারের ক্ষুদ্র ছিদ্র দিয়া অল্প অল্প বায়ু প্রবেশ করিয়া গৃহস্থিত প্রদীপের সহিত ক্রীড়া করিতে লাগিল। কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া প্রিন্স বলিলেন “প্রিন্স ভ্যাসিলি ও আমার মধ্যে এত সাদৃশ্য যে উভয়কে ভিন্ন করিয়া চেনা কষ্টকর।”

মাইকেল আপন মনে মৃদুস্বরে বলিতে লাগিল—“অদ্ভুত— অদ্ভুত।”

“এত সাদৃশ্য, যে কাল যখন তোমরা প্রিন্সকে দেখিবে তখন নিশ্চয়ই একবাক্যে বলিয়া উঠিবে—“একি! ইহাও কি সম্ভব? এ যে আইভ্যান ক্যারেলিন!”

“নিকিটা অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলিল—“এসব ঠাট্টা ভাল লাগে না!” প্রিন্স বলিলেন:—“বড়ই দুঃখের বিষয় যে তোমাদের মধ্যে এমন কেহই নাই যে প্রিন্সকে দেখিয়াছে

তাহা হইলে এখনই সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া দিতাম।"

সাইমন এতক্ষণ নীরবে বসিয়াছিল। প্রিন্সের কথা শুনিয়া সাগ্রহে বলিল—

"মেরায়া প্রিন্স ভ্যাসিলিকে দেখিয়াছে।"

প্রিন্স বিস্মিতের ন্যায় ভান করিয়া কহিলেন :—"মেরায়া? মেরায়া কে? যে মেয়েটী আমাকে দ্বার খুলিয়া দিয়াছিল? বেশ তো তাহাকেই ডাক।"

এই বলিয়া অন্য কাহারও অপেক্ষা না করিয়া নিজেই ডাকিলেন,

"মেরায়া।" কোন উত্তর না পাইয়া পুনরায় উচ্চকণ্ঠে ডাকিলেন—"মেরায়া।"

মেরায়া দ্বার উন্মোচন করিয়া ভীতস্বরে জিজ্ঞাসা করিল—

"আমাকে ডাকিতেছেন?"

প্রিন্স অগ্রসর হইয়া তাহার চক্ষুর প্রতি আপনার তীক্ষ্ণ স্থির দৃষ্টি স্থাপন করিয়া কহিলেন—"মেরায়া! তোমার স্বামী বলিতেছে তুমি প্রিন্স ভ্যাসিলিকে দেখিয়াছ! ইহা কি সত্য?" মেরায়া উত্তর করিল—"হ্যা!"

"তিনি কি ঠিক আমার মত দেখিতে ঠিক বল।" মেরায়া কি উত্তর দিবে বুঝিতে পারিল না। তাহার ভীত নয়ন প্রিন্সের প্রতি স্থাপিত করিয়া নীরব রহিল। প্রিন্স পুনরায় একটু ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"প্রিন্স ভ্যাসিলির সহিত কি আমার কোন সাদৃশ্য আছে?"

মেরায়া এইবার উত্তর করিল "হ্যাঁ।"

"আমাকে প্রিন্স ভ্যাসিলি বলিয়া ভুল করা কি সম্ভব?" "হ্যাঁ।"

বেচারা মেরায়া হৃদয়ের ভার আর সহ্য করিতে পারিল না—কাঁদিয়া ফেলিল।

প্রিন্স বলিলেন; "বেশ এবার তুমি যাইতে পার।"

মেরায়া প্রস্থান করিলে তিনি ফিরিয়া বলিলেন—

"শুনিলে? এখন তোমাদের প্রিন্সকে খুঁজিয়া বাহির করা অত্যন্ত সহজ হইবে।"

নিকিটা ঘৃণাপূর্ণ স্বরে বলিল—"এই সাদৃশ্যতে আপনি খুব গর্ব্বিত দেখিতেছি।"

প্রিন্স হাসিয়া বলিলেন,—

"ইহাতে গর্ব্ব করিবার কি আছে। ভগবান আমাকে যে আকৃতি দিয়াছেন আমি তাহাতেই সন্তুষ্ট আছি।"

মাইকেল কহিল,"তাহা হউক—আকৃতিতে সাদৃশ্য থাকিলে প্রকৃতিতে নাই ইহা নিশ্চিত।"

প্রিন্স ভ্যাসিলি অতি ধীরে ধীরে বলিলেন—"প্রিন্স ভ্যাসিলির অনেক গুণের কথাও শুনিয়াছি।"

তাঁহার শ্রোতৃবর্গ ভ্রূকুঞ্চিত করিল। প্রিন্স পুনরায় কহিলেন,—

"শুনিয়াছি তিনি অতি নির্ভীক হৃদয়।

নিকিটা বিদ্রুপের স্বরে কহিল—"নির্ভীক হৃদয় হওয়া উহাদের পক্ষে বড়ই সহজ।"

প্রিন্স বুঝিলেন ইহাদের ঘৃণা এত গভীর যে তাঁহার স্বপক্ষে একটী কথা শুনিতেও ইহারা প্রস্তুত নহে। তিনি নীরবে বসিয়া তাঁহাদের বক্তব্য শুনিতে লাগিলেন। তাহারা কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনার কথা বলিতে লাগিল। প্রিন্স ভ্যাসিলির ভৃত্যবর্গ দ্বারা যে সব অত্যাচার নিষ্ঠুরতা এবং হত্যাকাণ্ড তাহারা স্বচক্ষে দেখিয়াছে তাহা বলিল। প্রিন্সকে

তাহারা অপব্যয়ী, এবং প্রজার সুখ দুঃখ সম্বন্ধে অত্যন্ত উদাসীন জমীদার বলিয়া চিত্রিত করিল। সর্ব্বশেষে তাহারা দৃঢ়বাক্যে বলিল নিষ্ঠুর শাসন দ্বারা এতকাল যাহারা অজ্ঞান, নিরীহ এবং দুর্ব্বল প্রজার উপর অত্যাচার করিয়াছে তাহাদিগকে ভয়াভিভূত করিবার জন্য তাহাদের ক্ষুদ্র শক্তি তাহারা যথাসাধ্য প্রয়োগ করিবে।

মাইকেল বলিল, "আপনি আমাদের অবিশ্বাস করিবেন না। সময় আসিলে প্রাণের ভয়ে আমরা কর্ত্তব্য অবহেলা করিব না। আপনার পুস্তকে আপনি কি লিখিয়াছেন?" মাইকেল পকেট হইতে পুস্তক বাহির করিয়া পড়িতে লাগিল—

"আমরা যদি সত্যই স্বাধীনতা চাই তবে আমাদের প্রত্যেকেরই মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিবার জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইবে। একজন আত্মোৎসর্গ করিলে লক্ষ লক্ষ লোককে স্বাধীনতা দিতে পারিব। একথা এক মুহূর্ত্তের জন্যও বিস্মৃত হইলে চলিবে না।" আপনি নিজে একথা লিখিয়াছেন—আপনি আমাদের গুরু। আপনার মহৎবাক্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া আমরা মৃত্যুর জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত আছি।"

প্রিন্স মাইকেলের হস্ত হইতে পুস্তক খানা গ্রহণ করিয়া তাহার পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে বলিলেন—"এ সব কথা লেখা বড় সহজ কিন্তু মানুষকে হত্যা করা বড় কঠিন ব্যাপার এবং সম্পূর্ণভাবে নিজের আয়ত্বাধীন উপায় হীনকে হত্যা করা কঠিনতম ব্যাপার।'

মাইকেল পুস্তক খানা প্রতি গ্রহণ করিয়া ... দিয়া কহিল

"সহজ হউক কঠিন হউক—তাহাকে বধ করিতে কুণ্ঠিত হইব না।"

"তোমরা কখনও কাহাকেও হত্যা করিয়াছ কি?

তিন জনেই মস্তক সঞ্চালন করিয়া কহিল "না"। প্রিন্স উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন—

"আমি আজ কয়েকদিন হইল একজনকে হত্যা করিয়াছি। তোমাদের নিকটে সে সব কথা বলিতে আসিয়াছি। তোমাদের এখানে দৃঢ় রজ্জু আছে?"

নিকিটা আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—"রজ্জু কেন?"

"প্রয়োজন আছে"

সাইমন গৃহ কোণ হইতে একটী দীর্ঘ এবং দৃঢ় রজ্জু আনয়ন করিল। প্রিন্স বলিলেন—

"আমার হস্তদ্বয় পশ্চাদ্দিকে দৃঢ়রূপে বন্ধন কর। সাইমন ও নিকিটা আশ্চর্য্য হইয়া পরস্পরের দিকে চাহিল। প্রিন্স বলিলেন—

"আমার আজ্ঞা পালন কর—এখনই সব কথা বুঝিবে"। তাহারা উভয়ে মিলিয়া তাঁহার আজ্ঞা পালন করিল। তিনি কহিলেন "বন্ধন দৃঢ় কর আঘাত দিবার ভয়ে ভীত হইও না।"

তাঁহার আজ্ঞা প্রতিপালিত হইলে তিনি একটু দূরে সরিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার গম্ভীর মূর্ত্তি আরও গম্ভীর দেখাইতে লাগিল। তিনি তাঁহার কাহিনী বলিতে আরম্ভ করিলেন।

"দুই দিন পূর্ব্বে একটী অপরিচিত লোক আমার সাক্ষাৎপ্রার্থী হইয়া আমার গৃহদ্বারে উপস্থিত হইল। অপরিচিত লোককে গৃহ

প্রবেশ করিতে দেওয়া আমাদের নিয়ম বিরুদ্ধ, কিন্তু ভয় জিনিষটার সহিত আমার চিরশত্রুতা তাই আমি কিছুমাত্র ভীত না হইয়া আমার বসিবার গৃহে তাহাকে প্রবেশ করিতে দিতে আমার ভৃত্যকে আদেশ দিলাম।" নিকিটা অস্পষ্টস্বরে আপন মনে কি বকিতে লাগিল। প্রিন্স বলিয়া যাইতে লাগিলেন; "সেই লোকটী আমাকে একটী ষড়যন্ত্রের কথা বলিল। তোমরা যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছ সেই রকমেরই একটা ষড়যন্ত্র। কিন্তু সে কাপুরুষ। পূর্ব্বে একবার ধৃত হইয়াছিল বলিয়া ভীত হইয়া আত্মরক্ষার জন্য আমার নিকট উপস্থিত হইয়া সকল কথা জ্ঞাপন করিল।"

মাইকেল জিজ্ঞাসা করিল "তাহার নিজের কার্য্য সে বুঝি আপনার উপরে ন্যস্ত করিতে চাহিল?"

"না তাহা নয়, সে নিজের অবশিষ্ট জীবন নিরাপদ করিবার জন্য সঙ্গীদিগকে ধরাইয়া দিতে গিয়াছিল। সে এই সম্বন্ধে সকল সংবাদ আমাকে বলিল। এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত অন্যান্য ব্যক্তিগণের নাম ও তাহাদের ঠিকানা আমাকে জানাইল। তাহার সকল কথা ধৈর্য্য সহকারে শ্রবণ করিয়া তাহাকে রুষ রাজ্যের ও তাহার আপন সম্প্রদায়ের নিকট বিশ্বাসঘাতক জানিয়া তাহাকে গুলি করিয়া হত্যা করিলাম।"

মাইকেল নিকিটা ও সাইমন রুদ্ধ নিশ্বাসে মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় সেই তেজোব্যঞ্জক মূর্ত্তির প্রতি চাহিয়া রহিল। তাঁহার কাহিনীর পরিসমাপ্তির জন্য তাহারা উৎসুক হইয়া উঠিল। প্রিন্স বলিলেন,—

ছিল—আইভ্যান ক্যারেলিন।" মাইকেল ভীতি বিহ্বল হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া অবিশ্বাসের স্বরে বলিল—

"আইভ্যান ক্যারেলিন!—অসম্ভব!" নিকিটা তাহার চঞ্চল চক্ষু উৎকণ্ঠিত ভাবে প্রিন্সের মুখের প্রতি স্থাপিত করিয়া উঠিল,—"বিশ্বাসঘাতক!! আমরা শত্রুহস্তে সমর্পিত হইয়াছি!!"

"শত্রু! হাঃ হাঃ হস্তপদ বদ্ধ শত্রু! বাঃ আমি যে সম্পূর্ণ তোমাদের আয়ত্তাধীন। আমি একটি কথা উচ্চারণ করিবার পূর্ব্বেই তো তোমরা আমাকে বধ করিতে পার।"

তিন মুখে এক সঙ্গে উচ্চারিত হইল,—

"তুমি কে? শীঘ্র বল!"

"একটি শান্তি প্রিয় জীব!" প্রিন্স ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন,—

"আমি আইভ্যান ক্যারেলিনকে বধ করিয়াছি সত্য—কিন্তু আমার জীবনে ইহাই প্রথম জীবহত্যা। আমি তাহাকে বিশ্বাস ঘাতক এবং প্রতারক বলিয়া বধ করিয়াছি। আমি তোমাদেরই মত একজন মানুষ। সাইমন পেট্রোভিচ! আমিও একটি ক্ষুদ্র বালকের পিতা! তোমর পুত্র যেমন তোমার প্রিয়, আমার সন্তান আমার তেমনই প্রিয়!" মাইকেল জিজ্ঞাসা করিল,—

"আপনি কে? আপনার নাম কি?"

"সকলে আমাকে গ্র্যাণ্ড ডিউক ভ্যাসিলি বলে!"

তিনটি ভয়াভিভূত প্রাণী নীরব নিশ্চল হইয়া রহিল। প্রিন্সের ধীর শান্ত দৃষ্টির নিকট তাহাদের দৃষ্টি আপনিই নত হইয়া

"গ্র্যাণ্ড ডিউক ভ্যাসিলিকে হত্যা করিবার জন্য কে জানে তোমরা আজ কতকাল ধরিয়া ষড়যন্ত্র করিতেছ। এই-ই উত্তম সুযোগ উপস্থিত! এই তো সেই গ্র্যাণ্ড ডিউক ভ্যাসিলি আজ তোমাদের সম্মুখে। তোমাদের সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীন,—হস্তপদ দৃঢ় আবদ্ধ,—নিকটে পুলিশ প্রহরী দূরের কথা,—জন মানবের সাড়া পর্য্যন্ত নাই। একজনকে হত্যা করিবার জন্য তিন জন উপস্থিত আছে। তোমাদের কার্য্য সুচারুরূপে সমাধা করিতে পারিবে।"

তাঁহার কণ্ঠস্বর বিদ্রূপাত্মক নহে,—একটু লজ্জাদায়ক। থামিয়া থামিয়া ধীরে ধীরে তিনি কথাগুলি উচ্চারণ করিলেন।

কিন্তু কেহ নড়িল না। স্বাভাবিক প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া কখন যে তাহারা মস্তক হইতে টুপী উত্তোলন করিল তাহা তাহারা জানিতেও পারিল না। তাঁহার পদগৌরব তাহারা ভুলিয়া গেল,—তাঁহার নির্ভীকতা, তাঁহার সাহসই এই শ্রমজীবিদিগের চক্ষে তাঁহাকে মহৎ করিয়া তুলিল। তাঁহার ঐন্দ্রজালিক ব্যক্তিত্বের প্রভাবে তিনি তাহাদিগের হৃদয় জয় করিয়া লইলেন।

সহসা মাইকেল দুই হস্তে বদনাবৃত করিয়া ক্রন্দন করিয়া উঠিল। নিকিটা দ্রুত আসিয়া প্রিন্সের বন্ধন মোচন করিয়া দিয়া সসম্ভ্রমে জিজ্ঞাসা করিল, "আমাদিগের প্রতি কি শাস্তি বিধান করিবেন?"

মৃদু হাস্য করিয়া প্রিন্স বলিলেন,—

"তোমরা আমার প্রতি কি শাস্তি বিধান করিবে তাহা জানিতেই তো আমি আজ আসিয়াছিলাম।" নিকিটা যন্ত্রচালিত পুত্তলিকার ন্যায় পুনরায় প্রশ্ন করিল,—

"আমাদিগের প্রতি কি শাস্তি বিধান করিবেন?"

উৎসাহ পূর্ণ মধুর স্বরে প্রিন্স বলিলেন,—

"কি শাস্তি বিধান করিব? তোমাদিগকে বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ করিব। তোমরা ধর্ম্মভীরু মনুষ্যের ন্যায় সৎপথে জীবন যাপন করিলে তোমাদিগকে সর্ব্ব বিষয়ে প্রাণপণে সাহায্য করিব। আমি তোমাদিগকে একটু শিক্ষা দিতে আসিয়াছিলাম। ভাবিয়া দেখ দেখি কোন শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছ কি না? সাইমন! একটা কথা মনে রাখিও,—তোমার শিশুপুত্রকে স্বাধীনতা ভালবাসিতে শিক্ষা দিও; কিন্তু সেই সঙ্গে নির্ভীকতাও শিক্ষা দিও। স্বাধীনতার স্পৃহা উত্তম,—কিন্তু নির্ভীকতা, সাহস আরও উত্তম। রুষরাজ্যের শ্রমজীবিগণ, শিল্পিগণ ও কারিকরগণ যেদিন নির্ভীকতা শিক্ষা করিবে, সেদিন আর অত্যাচারী জমীদারদিগকে হত্যা করিবার প্রয়োজন হইবে না। তাঁহাদিগকে পরিচালনা করিবার শক্তি তাহারা আপনা হইতেই পাইবে!!"

ইহাই প্রিন্স ভ্যাসিলির শেষ আদেশ! তাঁহার শ্রোতাগণ এই মহৎ বাক্যের উত্তর দিবার পূর্ব্বেই তিনি ধীরপদে সেই গৃহ ত্যাগ করিলেন। তাঁহার সুদীর্ঘ প্রশান্ত মূর্ত্তি অন্ধকারে মিলাইয়া গেল।

সাইমন ও নিকিটা নীরব নিস্পন্দ হইয়া বসিয়া রহিল। প্রিন্সের শেষ কথাগুলি তখনও তাহাদের কর্ণে বাজিতেছিল।

মাইকেল পেট্রোভিচ সুদীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া উঠিল। পকেট হইতে আইভ্যান ক্যারেলিনের পুস্তকখানা বাহির করিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়া, ছিন্ন খণ্ডগুলি পদদ্বারা মথিত করিতে লাগিল।

‘বনলতা’ রচয়িত্রী।

বাঙ্গলা দেশে প্রথম যখন স্ত্রীশিক্ষার প্রবর্ত্তন হয় তখন সমাজে রীতিমত একটা আন্দোলন বাধিয়া গিয়াছিল! কিন্তু ক্রমে ক্রমে সেই স্ত্রীশিক্ষার শুভ ফল যখন প্রস্ফুট হইয়া উঠিল, তখন দেশে যেন একটা নব শক্তির আভাস পাওয়া গেল। আজ নারীগণ শিক্ষিত সমাজে আপনাদিগের প্রভূত প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন এবং তাঁহাদের অনেকেরই রচনায় বঙ্গসাহিত্য আজ গৌরবান্বিত।

আমরা ভারতীর পাঠক পাঠিকাগণকে এই নারী লেখিকাগণের গ্রন্থ ও জীবনী সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদানের মানস করিতেছি। ইহা দ্বারা কেবল যে আমাদের বর্ত্তমান কৌতুহল নিবৃত্ত হইবে তাহা নহে, ভবিষ্যতে বাঙ্গলা সাহিত্যেরও অনেক উপাদান প্রস্তুত হইয়া থাকিবে। বঙ্গসাহিত্যে আধুনিক বিদুষী নারীর রচনা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে যাইলে, ভারতীর সম্পাদিকা শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীর নামই সর্ব্বপ্রথম আসিয়া পড়ে, কারণ তাঁহার ‘দীপনির্ব্বাণ’ই আধুনিক সাহিত্যক্ষেত্রে বঙ্গনারীর প্রথম রচনা। তাঁহার উপন্যাস, প্রহসন কবিতা প্রবন্ধাদি বঙ্গের শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই পাঠ করিয়াছেন, বঙ্গসাহিত্যে তাঁহার প্রভাব কাহারও নিকট অজ্ঞাত নহে। কিন্তু ভারতী পত্রিকায় তাঁহার রচনাদি সম্বন্ধে আলোচনা করা ঠিক শোভন ও সঙ্গত নহে। সেইজন্য আমরা সে প্রলোভন হইতে নিবৃত্ত থাকিয়া এই যুগের অন্যান্য লেখিকাগণের আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে ‘বনলতা’ রচয়িত্রীর গ্রন্থাদিই আমাদের আলোচ্য বিষয়।

ইঁহার গ্রন্থাদি সম্বন্ধে আলোচনা করিবার পূর্ব্বে তাঁহার জীবনী সম্বন্ধে সংক্ষেপে দুএকটি কথা বলা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। লেখিকার নাম শ্রীমতী প্রসন্নময়ী দেবী। বর্ত্তমানবর্ষের ‘বৈশাখ’ সংখ্যায় প্রকাশিত ‘নববর্ষে’ শীর্ষক কবিতাটি ইনিই লিখিয়াছিলেন। প্রসন্নময়ী পাবনা জেলাস্থ হরিপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম ৺ দুর্গাদাস চৌধুরী। পদমর্য্যাদা ও বংশগৌরবে চৌধুরী বংশ উক্ত প্রদেশে ও বারেন্দ্র সমাজে সুপ্রসিদ্ধ। সর্ব্বজনপ্রিয় সুপ্রসিদ্ধ স্বদেশপ্রাণ ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী মহাশয় ইঁহার সহোদর। “দ্বাদশ ভূম্যাধিকারী” গ্রন্থে ইঁহাদিগের বংশের সবিস্তার পরিচয় লিপিবদ্ধ আছে।

বাল্যকাল হইতেই প্রসন্নময়ীর পাঠানুরাগ প্রবল। মেয়েদের স্কুলে পাঠানো তখনকার দিনে আচার বিরুদ্ধ থাকায় বাড়ীতেই প্রসন্নময়ীর শিক্ষা হয়। বাঙ্গালা, সংস্কৃত ও ইংরেজী তিনটি ভাষাতেই প্রসন্নময়ী শিক্ষালাভ করেন। অল্পবয়সেই তাঁহার বিবাহ হয়। স্বামীর নাম ৺ কৃষ্ণকুমার বাগচি। “আধ আধভাষিনী” নামক কবিতাগ্রন্থ তাঁহার চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সের রচনা! শ্রদ্ধের বিদ্যাসাগর মহাশয় বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু, হেমচন্দ্র প্রমুখ মনস্বিবর্গ তাহার প্রশংসা করিয়া লেখিকার সাহিত্যানুরাগে উৎসাহ প্রদান করেন। তৎপরে ১২৮৭ সালে প্রসন্নময়ীর ‘বনলতা’ এবং তৎপরে যথাক্রমে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হয়—

নীহারিকা (কাব্যগ্রন্থ) প্রথমভাগ।



শ্রীমতী প্রসন্নময়ী দেবী

আর্য্যাবর্ত্ত (ভারতবর্ষে নানাপ্রদেশে ভ্রমণ কাহিনী)।

অশোকা (উপন্যাস)।

নীহারিকা (কাব্যগ্রন্থ) দ্বিতীয় ভাগ।

এতদ্ভিন্ন নানা ইংরাজী কবিতা ও প্রবন্ধের সরল বঙ্গানুবাদ ইঁহা কর্ত্তৃক নানাসময়ে সাময়িক পত্রাদিতে প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রসন্নময়ী দেবীর প্রথম প্রকাশিত বনলতা ২৫টি খণ্ডকবিতার সমষ্টি। ভাবে ভাষায় তেমন বৈচিত্র্য না থাকিলেও ইহার সুরটি করুণ এবং সহজেই মর্ম্মস্পর্শ করে। ভাবপ্রকাশের কোন আড়ম্বর নাই, শব্দচ্ছটায় পাঠকের মোহ উৎপাদন করে না কিন্তু তাহা একেবারেই পাঠকের সূক্ষ্ম অনুভূতিটুকুর উপর আঘাত করে! তাই কষ্টকল্পনার কণ্টকে বাণীর কমল বন কণ্টকিত হয় নাই!

জীবনের দুঃখ শোকে জর্জ্জরিত হইয়া প্রসন্নময়ী কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাই কবির সান্ত্বনা। মনের দুঃখে পাশ্চাত্য কবি নক্ষত্রকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন, "Ye Stars! which are the poetry of Heaven," 'বনলতার' কবিও 'নক্ষত্রকে বলিতেছেন—

সুদূর গগনে থাকি বরষে কিরণ—
সে আলোকে আলোকিত অভাগ্যজীবন।"

'নীহারিকা' কবির দ্বিতীয় গ্রন্থ। নীহারিকা পাঠ করিয়া শ্রদ্ধেয় ৺ রাজনারায়ণ বসু সুদীর্ঘ পত্রে কাব্যখানির প্রশংসা করেন। "উহাতে স্থানে স্থানে যেরূপ ভাবের গভীরতা ও সৌন্দর্য্য প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে বাঙ্গলা ভাষায় অতি শ্রেষ্ঠ কবিরাও ঈর্ষান্বিত হইতে পারেন। * * স্থানে স্থানে হাফেজের ন্যায় প্রগাঢ়। * * আপনাকে Sappho of Bengal এই উপাধি দিতে ইচ্ছা হইল।" 'সাধারণী' বলিয়াছিলেন, "তাঁহার কবিত্ব সরলতা শক্তি এবং ভক্তি সকলই মনোরম।"

'নীহারিকার' প্রথম কবিতা বসন্ত পঞ্চমীতে কবি সরস্বতীর প্রতি নিবেদন করিতেছেন—

"অরণ্য কুসুম মম, আজিও কলিকাসম
সুবাস নাহিক তাহে, নহে বিকশিত;
আধ ফুট ফুট করে, হয়ত যাইবে ঝরে
অকালে হিমানী পাতে হইয়া ব্যথিত।"

ছত্রগুলি পাঠ করিয়া কীট্‌সের অমর ছত্র মনে পড়ে—

"when I have fears that I may cease to be
Before my pen has gleaned my teeming brain."

কবির দক্ষতা শুধু কাব্য রচনাতেই নিবদ্ধ নহে। তাঁহার ভ্রমণ কাহিনী 'আর্য্যাবর্ত্ত' অনেক তথাকথিত সাড়ম্বর ভ্রমণ বৃত্তান্ত হইতে উৎকৃষ্ট! গ্রন্থখানি কন্যাকে উপহার দিয়াছেন। লেখিকা কন্যাকে বলিতেছেন, * * সীতা সাবিত্রী দময়ন্তী দ্রৌপদী ও লক্ষ্মীরাণী প্রভৃতি পুণ্যবতী প্রাতঃস্মরণীয়া আর্য্যনারীগণ যে দেশের মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন সেই দেশে তুমিও জন্মিয়াছ এইটি সতত স্মরণ রাখিয়া তাঁহাদিগের উচ্চতম আদর্শে এবং তাঁহাদেরি পদানুসরণে অদ্যকার বিজাতি সভ্যতা-বিড়ম্বিত না হইয়া যথার্থ হিন্দুমহিলার উপকরণে নিজের সুকুমার হৃদয় ও কিশোর চরিত্র সুগঠিত কর।" গ্রন্থকর্ত্রী ভারতের নানাস্থানে ভ্রমণ কালে সেই সকল স্থলের পুণ্যোজ্জ্বল কাহিনী

'আর্য্যাবর্ত্তে' লিপিবদ্ধ করেন! প্রত্যেক স্থানের সৌন্দর্য্যের বিশেষত্বটুকু চিত্রিত করিতে লেখিকার প্রয়াস সফল হইয়াছে! লেখিকার চক্ষে 'তাজমহল'—"কঠিন প্রস্তরে ললিত সঙ্গীত, ভাবুকজন হৃদয়ে আশার হাস্য, প্রণয়ের স্বপ্নময় সুখদ-সম্মিলন এবং শিল্পের চরমোৎকর্ষ!" এই অল্পকথায় কি সুন্দর একখানি চিত্রের আভাষ পাওয়া যায়। "অশোকা" সিপাহী বিদ্রোহের ঘটনাসম্বলিত একখানি ক্ষুদ্র উপন্যাস।

প্রসন্নময়ীর জীবনের উপর দিয়া নানা দুঃখশোকের ঝড় বহিয়া গিয়াছে। অল্প বয়সেই তাঁহার দুইটি সন্তান হয়। তন্মধ্যে পুত্রটি শৈশবেই ইহলোক ত্যাগ করে। পরে তাঁহার স্বামীর মৃত্যু হয়। ইহার উপর বিবাহের অল্পদিন পরেই তাঁহার একমাত্র কন্যাটিও একটি শিশুসন্তান কোলে লইয়া বিধবা হন। শোকাতুরা প্রসন্নময়ী শিশু দৌহিত্রটির উপর স্নেহবর্ষণ করিয়া কোন প্রকারে কালাতিপাত করিতেছিলেন। কিন্তু বিধাতা প্রসন্নময়ীকে সে সুখেও বঞ্চিত করিলেন। শিশুটি অকালে সংসার ত্যাগ করিয়া পলাইল। কিন্তু এরূপ বিপদ ও আঘাতের মধ্যেও তিনি যেরূপ ধৈর্য্য, সৌম্য ও শান্তি রক্ষা করিয়া সকলের সহিত যথোপযুক্ত ব্যবহার করেন, তাহা আদর্শ হিন্দু রমণীর পক্ষেই সম্ভব। তাঁহার জীবনের এই শান্ত সংযত ভাবটি যথার্থই আদর্শ যোগ্য।

প্রসন্নময়ী তাঁহার দৌহিত্রের উদ্দেশে সম্প্রতি ছবিশীর্ষক যে কবিতাটি রচনা করিয়াছেন, সেইটি উদ্ধৃত করিয়া আমাদিগের বক্তব্য সমাপ্ত করিলাম।

ছবি।

ছবি তুমি প্রতিবিম্ব, সাকার দর্শন,
মৌন মূর্ত্তি, প্রতিভার প্রদীপ্ত নয়ন—
ভাষাহীন, যেই ভাষা সুধা মন্দাকিনী
অধর, আনন, নেত্রে দিবস যামিনী
ছুটিত আনন্দ উৎসে ভাব সচঞ্চল—
অঙ্গে অঙ্গে সঞ্চারিয়া জীবন কল্লোল
সেই ভাষা স্তব্ধ;—তব মুরতি মোহন
পাষাণ প্রতিমা সম ধ্যানে সমাহিত
বিশ্বরবে সে সমাধি নহে তিরোহিত,
নিদ্রিত ব্রহ্মাণ্ড যেন ছবির আকারে
মূর্ত্তিমান, পরিব্যাপ্ত অন্তরে বাহিরে।
ভাস্কর .খাদিত মূর্ত্তি দেবতা করিয়া,
ভক্ত পুজে অনুদিন মানস ভরিয়া
সচন্দন বিল্বদল, পুষ্প ভারে ভারে
আত্ম সমর্পণ করি নানা উপচারে;
ভকত হৃদয় নাহি চাহে ফিরাইয়া
বিনিময়ে। অনন্তের অন্তহীন দানে
নিষ্ফল জীবন ব্রত সফল কারণে
অচেতনে সচেতনে মধুর মিলন;
জীবনের প্রতিদিন করিতে বহন
প্রতিমূর্ত্তি নিরখিয়া, পরশিয়া তায়।
প্রেমের অপূর্ব্ব দৃশ্য ভালবাসা হায়!

শ্রীপ্রসন্নময়ী দেবী।

চয়ন।

বিভিন্ন দেশের বিবাহপদ্ধতি।—পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন প্রকার বিবাহপদ্ধতি প্রচলিত। এক ভারতবর্ষে এই হিন্দুদিগের মধ্যেই যে কত প্রকার বিবাহপদ্ধতি প্রচলিত আছে তাহা বলা যায় না। কিন্তু আমরা তাহার কোনও সন্ধানই রাখি না।

'কনের বাক্সের' কথা বোধ হয় এ দেশের কেহই জানেন না। কিন্তু মরক্কো দেশে এ নামটি প্রতি গৃহে প্রচলিত। তথায় বর কন্যার বাটীতে যাত্রা করে না, কন্যা বরের বাটীতে যাত্রা করে। যাত্রাকালে কন্যাটিকে নানাবিধ বসনভূষণে সজ্জিত করিয়া একটি কাঠের বাক্সের মধ্যে রাখিয়া লইয়া যাওয়া হয়। বাক্সের গঠনটা কতকটা খাঁচার মত, তবে তাহাতে বায়ু প্রবেশের পথ বড় থাকে না। এইরূপ যাত্রা কন্যার পক্ষে কিরূপ সুখের হয় তাহা সহজেই অনুমেয়। নানারূপ বাদ্যাদি করিয়া কন্যাযাত্রীদল নানা পবিত্র স্থানে ভাবী স্ত্রীপুরুষের জন্য আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিতে করিতে অতি মন্থরগতিতে অগ্রসর হন। কন্যা বেচারীর প্রাণ প্রায় ওষ্ঠাগত হয় বলিলেই হয়। অবশেষে বরের বাটীতে উপস্থিত হইলে কন্যা খাঁচা হইতে বাহির হইয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচে। ইহাদের বাসরব্যাপার দুই দিন ব্যাপী। দুই দিন পরে সেই বাক্সটিকে সর্ব্বসমক্ষে উচ্চে টাঙ্গাইয়া রাখা হয়। তাহার অর্থ এই যে এক্ষণে বিবাহিত দম্পতি অতিথিগণের অভ্যর্থনা করিতে প্রস্তুত।

প্রশান্ত মহাসাগরের অনেক দ্বীপের মধ্যে অনেক আশ্চর্য্য বিবাহপ্রথা প্রচলিত আছে। হেব্রাইডিস্ (New Hebrides) দ্বীপের কতকাংশে বিবাহেচ্ছুক কন্যার একটি অঙ্গহীন হইতে হয়। ত্রয়োদশ বর্ষে উপনীত হইবার পূর্ব্বেই তাহার সম্মুখের দাঁতগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হয়। নচেৎ কোনও যুবা তাহাকে বিবাহ করে না পরন্তু বেচারীকে চির দিন সকলের নিকট ঘৃণাভাজন হইয়া থাকিতে হয়।

আয়র্ল্যাণ্ডের (New Ireland) স্থানে স্থানে কুমারী কন্যাদিগের অবস্থা এইরূপ শোচনীয়। কন্যাটি ৮।১০ বৎসরের হইলেই পিতামাতা তাহাকে একটি ক্ষুদ্র খাঁচার মধ্যে রাখিয়া দেন। এই ভাবে তাহাদিগকে ৪।৫ বৎসর যাপন করিতে হয়। বিবাহ হইয়া গেলে তাহারা মুক্তিলাভ করে। খাঁচাগুলি এত ছোট যে তাহার মধ্যে বসা বা হাত পা গুটাইয়া শোওয়া ভিন্ন আর কিছু করিবার উপায় থাকে না। দিবা রাত্রের মধ্যে স্নানের সময়ে কেবল একবার মাত্র তাহাদিগকে খাঁচা হইতে বাহিরে আসিতে দেওয়া হয়।

অরোরাই (Arorai) দ্বীপে কন্যার স্বয়ম্বর প্রথা বড় চমৎকার। যে কুমারীর পাণিগ্রহণের জন্য অনেক পুরুষ উৎসুক সে কুমারীটি নীচের একটি ঘরে গিয়া বসে। তাহার ঠিক উপরের ঘরেই তাহার প্রণয়াকাঙ্ক্ষিগণ সমবেত হয়। মেজের ফাঁক দিয়া প্রত্যেক পুরুষ একটি করিয়া নারিকেল পাতা নীচের ঘরের দিকে নামাইয়া দেয়। বালিকাটি একটি পাতা টানিয়া তাহার অধিকারীর নাম জিজ্ঞাসা করে। উত্তরে যদি সে তাহার প্রেমাস্পদের কণ্ঠস্বর শুনিতে না পায়, তাহা হইলে আবার আর একটি পাতা ধরিয়া টান দেয়। এইরূপে সে আপনার ইপ্সিত স্বামী বাছিয়া লয়।

মালয় দেশের কোনও রাজপুত্রের বিবাহ এক দিনে সমাপ্ত হয় না। বিবাহ সাঙ্গ হইতে প্রায় তিন সপ্তাহ লাগে। উৎসবের প্রথম ক্রিয়া শেষ হইয়া গেলে রাজকুমার আপনার প্রাসাদে ফিরিয়া আসে। তথায় ষোলজন নারী প্রহরীস্বরূপ তাঁহাকে সর্ব্বদা ঘিরিয়া থাকে। সপ্তাহকাল তাহাকে বহির্গমন করিতে দেওয়া হয় না। পরে বিবাহকর্ম্ম সাঙ্গ হয়। কিন্তু আশ্চর্য্য এই প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত কন্যার সহিত কোনপ্রকারে সাক্ষাৎ হয় না।

জাপানে বিবাহব্যাপার ঘটকের দ্বারা সম্পন্ন হয়। ঘটকের নিকট হইতে মনোমত সম্বন্ধ স্থির হইলে, উভয়পক্ষের পিতামাতা সব কথাবার্ত্তা ঠিক করেন। বিবাহের পূর্ব্বে বরকন্যা উভয়কে একবার পরস্পরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে দেওয়া হয়। ইহাদের মধ্যে বিবাহক্রিয়া অতি সামান্য। ইহাদের দেশে বরের বাটীতে বিবাহ হয়। কন্যাকে শ্বেত রেশমের বস্ত্রাচ্ছাদিত করিয়া বরের বাটীতে লইয়া যাওয়া হয়। শ্বেত বসনটা শোকচিহ্ন। কন্যাকে শ্বেত বসন পরাইবার অর্থ যে, সে সেইদিন হইতে তাহার আত্মীয়গণের পক্ষে মৃতস্বরূপ গণ্য হইল। তাহার পর ঘটক ও দুইটি অল্পবয়স্কা কুমারীর সম্মুখে বরকন্যা দণ্ডায়মান হইয়া তিনটি পেয়ালা হইতে তিনবার সুরাপান করিয়া

বিবাহসম্বন্ধে আবদ্ধ হয়। সুরাপান সাঙ্গ হইলেই বিবাহক্রিয়া সম্পন্ন হইল।

কোরিয়ার বিবাহপ্রথাও অতি সহজ। বিবাহদিনের পূর্ব্বে বরকন্যার সাক্ষাৎ হয় না। বিবাহদিনে বর একটি শ্বেতবর্ণ ঘোড়ার উপর চড়িয়া কন্যার বাটীতে উপস্থিত হয়। তথায় কন্যার সহিত সাক্ষাৎ হইলে, বর তাহাকে একটি রাজহংস উপহার দেয়। রাজহংসকে তাহারা বিশ্বস্ততার চিহ্ন বলিয়া মনে করে। তাহার পর উভয়ে তিন চারি বার মস্তক নত করিয়া পরস্পরকে অভিবাদন করে। বাস্, বিবাহ হইয়া গেল!

তিব্বতে কোন যুবা কোন যুবতীর পাণিগ্রহণেচ্ছু হইলে, সে তাহার পিতামাতা সমভিব্যাহারে যুবতীর আবাসে গিয়া উপস্থিত হয়। প্রথম অভিবাদনাদি সাঙ্গ হইলে যুবকের পিতা পুত্রের হইয়া যুবতীর পাণি ভিক্ষা করেন। যুবতী স্বীকৃত হইলে, যুবক একখণ্ড মাখন লইয়া কন্যার কপোলে রাখিয়া দেন। যুবতীও সেইরূপ করিলেই তাহারা স্বামীস্ত্রী বলিয়া গণ্য হইল।

সার্ভিয়া (Servia) দেশে স্বামীর বাটীতে প্রবেশের পূর্ব্বে কন্যাকে তাহার স্বামীর জননীর চতুর্দ্দিকে তিনবার ঘুরিতে হয়। বাটীর ভিতর প্রবেশ করিয়া উনুনের চতুর্দ্দিকে তিনবার ঘুরিতে হয়। এদিকে একটি ভাঁড় আনিয়া রন্ধনের কাষ্ঠগুলিকে চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া ফেলে। সে এইরূপে চতুর্দ্দিক লণ্ডভণ্ড করিবার পর, কন্যাটি আবার যাবতীয় দ্রব্যগুলিকে যথাস্থানে রাখিয়া দেয়। ইহা তাহার ভাবী গৃহিণীপণার পরীক্ষা। আমাদের দেশে বিবাহের পর যেমন ভাঁড় খেলা!

ল্যাপল্যাণ্ডে পত্নী মনোনীত করিবার পদ্ধতি অতি অদ্ভুত। যুবক ও যুবতীকে একটা নির্দ্দিষ্ট পথ দৌড়াইতে হয়। যুবকের স্কন্ধে এরূপ ভার চাপাইয়া দেওয়া হয় যে তাহার পক্ষে দ্রুতগমন একপ্রকার অসম্ভব। তৎসত্ত্বেও যদি যুবা জয়ী হয়েন, তাহা হইলে পরাজিতা কুমারী তাঁহার পত্নী হন। এরূপস্থলে পরিণয়েচ্ছু কুমারী ইচ্ছা করিয়া পরাজয় স্বীকার করেন। যুবক মনোমত না হইলে তিনি দৌড়াইয়া জয়লাভ করিলেই তাহার হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারেন।

বিজ্ঞান কথা।

উপগ্রহের জন্ম।—উপগ্রহের জন্ম সম্বন্ধে দুইটি মত প্রচলিত আছে। একমতে উপগ্রহ গ্রহেরই অংশমাত্র, গ্রহগঠনের প্রথমাবস্থায় তাহার অবয়ব হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। এই মতাবলম্বীদের মতে পৃথিবী হইতে চন্দ্র বাহির হইয়া গিয়াছিল বলিয়াই প্রশান্ত মহাসাগরের উৎপত্তি হইয়াছে। আর এক মতে উপগ্রহগুলি এককালে ধূমকেতু ছিল, গ্রহের আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া গ্রহের চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে মাত্র। এইরূপ ধূমকেতুগুলি ক্রমশ চন্দ্রে পরিণত হয়। অধ্যাপক সী বলিতেছেন যে তিনি এরূপ প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন যাহা দ্বারা ইহা স্পষ্ট প্রতীত হইবে যে উপগ্রহগুলি ধূমকেতু ভিন্ন আর কিছুই নহে।

জাতি-নির্ণয়ের যন্ত্র।—সম্প্রতি বিলাতের রিভিউ অফ্ রিভিউস্ (Review of Reviews) পত্রিকায় একটি আশ্চর্য্য বৈজ্ঞানিক যন্ত্র আবিষ্কারের কথা প্রকাশ হইয়াছে। উইলিয়ম্‌স্ (Williams) নামে একজন এঞ্জিনিয়ার একটি যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন, যাহা দ্বারা যে কোন প্রাণী পুরুষ কি নারী তাহা সহজেই নির্ণয় করা যায়। যন্ত্রটির মধ্যে একটি সরু ইস্পাতের তার আছে। তাহার নিম্নে একটি গোলাকার ধাতুপিণ্ড ঝুলিয়া থাকে। যন্ত্রটি যে কোন পুরুষজাতীয় জীবের অঙ্গস্পর্শ করিবামাত্র, এই ধাতুপিণ্ডটি ঘুরিতে থাকে। স্ত্রীজাতির অঙ্গে স্পর্শ করিলে ঘড়ির পেণ্ডুলামের (Pendulum) ন্যায় ইহা কেবলই দুলিতে থাকে।

বর্ণচিকিৎসা—আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণের মতে নীল ও ভায়লেট (Violet) বর্ণের আলোকে যাবতীয় রোগের বীজ পাঁচ মিনিটের মধ্যে নষ্ট হইয়া যায়। এইরূপ আলোক প্রয়োগ দ্বারা চিকিৎসার চেষ্টা হইতেছে।

বিভিন্ন জাতির বিশেষত্ব—ডাক্তার ম্যাটিগ্ননন্ (matignon) নামে একজন ফরাসী চিকিৎসক বলেন পৃথিবীর মধ্যে প্রত্যেক বিভিন্ন জাতির অঙ্গ

হইতে এক প্রকার বিভিন্ন গন্ধ বাহির হয়। শ্বেতাঙ্গদিগের কৃষ্ণাঙ্গের প্রতি বিরক্তির কারণ তাহাদের অঙ্গ হইতে একপ্রকার দুর্গন্ধ বাহির হইয়া তাহাদিগকে পীড়িত করে। কৃষ্ণাঙ্গগণও শ্বেতাঙ্গের অঙ্গের গন্ধে বিরক্তি অনুভব করে। চীনবাসীরা বলে শ্বেতাঙ্গের অঙ্গে মৃতদেহের ন্যায় দুর্গন্ধ।

নিঃশব্দ ঘটিকা—ইংলণ্ডে কাটনাউ (Kutnow) নামে একজন শিল্পী তাড়িৎশক্তিতে চালিত একটি ঘড়ি আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহার বিশেষত্ব এই যে ইহা চলিবার সময়ে কোনপ্রকার শব্দ হয় না। যন্ত্রাদিও অতি সহজ ও সামান্য। ঘড়ির ভিতরে পাঁচটি মাত্র চাকা আছে। একটি তাড়িৎযন্ত্রের সাহায্যে সহস্র দিন পর্য্যন্ত ইহা অবিরাম চলিবে। পরে একটি নূতন যন্ত্র বসাইয়া দেওয়া আবশ্যক।

আকের ছোবড়ার কাগজ—ভারতবর্ষে আকের প্রভূত চাষ হইয়া থাকে বটে কিন্তু তৎসত্ত্বেও প্রতিবৎসর আমাদের লক্ষ লক্ষ টাকার বিদেশী চিনি ক্রয় করিতে হয়। সুতরাং আমাদের দেশে আকের চাষ আরও অধিক হওয়া আবশ্যক। কেবলমাত্র আকের চাষ করিলে বিশেষ লাভবান হওয়া কঠিন বলিয়াই বোধ হয় কৃষকগণ এ বিষয়ে তাদৃশী মনোযোগী নহে। কিন্তু ছোবড়াগুলিও যদি কাজে লাগান যায় তাহা হইলে বিস্তর লাভ হইবার কথা।

আমরা আক হইতে তাহার রস বাহির করিয়া লইয়া ছোবড়াগুলি ফেলিয়া দিয়া জ্বালাইয়া ফেলি, সেগুলিকে কোনপ্রকার ব্যবহারে লাগাইতে চেষ্টা করি না। ইয়ুরোপবাসীগণ কোন বস্তু ফেলিয়া দিয়া সন্তুষ্ট হয় না, তাহা একটা না একটা ব্যবহারে লাগাইবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে। সেইজন্য ইহারা বাণিজ্যে এত শীঘ্র উন্নতি করে ও লাভবান হয়। ম্যাঞ্চেষ্টার নগরের টি, জে, হাচিন্‌সন্ (T. J. Hutchinson) নামে একব্যক্তি আকের ছোবড়া হইতে উত্তম কাগজ প্রস্তুত করিবার একটি প্রণালী বাহির করিয়াছেন। কাগজ প্রস্তুত করিবার ব্যয় অতি সামান্য। ছোবড়াগুলি এক্ষণে জ্বালাইবার জন্য লোকে অতি সামান্য মূল্যে ক্রয় করে। কাগজ করিলে উহা হইতে বিশেষ লাভবান হওয়া যাইতে পারে। আমাদের দেশে যাঁহারা চিনির কল করিয়াছেন, তাঁহারা এ বিষয়ে মনোযোগী হইলে নিজেরাও লাভবান হইতে পারিবেন, দেশেরও বিশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে।

গণনা যন্ত্র—কালিঘাটের শ্রীযুক্ত আশুতোষ মল্লিক নামে একটি যুবা এক আশ্চর্য্য গণনা যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহা দ্বারা টাকা, আনা পাইয়ের যোগ বিয়োগ বা ভাগ অতি সহজেই সম্পন্ন করা যায়। জর্ম্মাণির একজন এঞ্জিনিয়ার এইরূপ একটি যন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন বটে, কিন্তু শ্রীযুক্ত মল্লিকের যন্ত্রটি তাহা অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ এবং মূল্যেও সুলভ বলিয়া শোনা যায়। বাঙ্গালীর মস্তিষ্কেও যে সৃষ্টি শক্তি আছে মল্লিক তাহার পরিচয় দিয়া বাঙ্গালীর মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন।

নবাবিষ্কৃত টেলিফোন্—সুইডেনের দুই জন এঞ্জিনিয়ার একটি নূতন মাইক্রফোন (microphon) আবিষ্কার করিয়াছেন। এতদিন টেলিফোনের সাহায্যে দশবিশ ক্রোশের মধ্যে কথোপকথন চলিত। কিন্তু এক্ষণে এই নবাবিষ্কৃত যন্ত্র দ্বারা এক দেশ হইতে অন্য দেশে যথেচ্ছ কথোপকথন চালিত হইতে পারিবে। সুইডেনের রাজধানী ষ্টকহল্‌ম্ নগর হইতে ফ্রান্সের রাজধানী প্যারী নগর পর্য্যন্ত কথোপকথন শুনা গিয়াছে। ক্রমে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বসিয়া বন্ধুগণ কথা কহিতে পারিবেন। ধন্য বিজ্ঞানের মহিমা।

বীজের অমরত্ব।—ডাক্তার ব্ল্যাক্‌ম্যান (Dr. F. F. Blackman) পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন যে বীজের কোন অবস্থাতেই মৃত্যু নাই; অর্থাৎ উৎপাদন শক্তির ধ্বংস নাই। যে প্রকার উত্তাপ বা শৈত্যে জীবমাত্রেরই ধ্বংস পায়, তাহাতে বীজের জীবনীশক্তির কোনই ক্ষতি হয় না। ফুটন্ত জলের উত্তাপ বা যৎপরোনাস্তি শৈত্যের মধ্যে রাখিলেও ইহার উৎপাদন শক্তির হ্রাস হয় না। অ্যামোনিয়া বা অপর কোন ক্ষারের মধ্যে নিমজ্জিত করিয়া রাখিলেও ইহার শক্তি নষ্ট হয় না। একশত

পাঁচ বৎসরের পুরাতন বীজেরও উৎপাদনশক্তি থাকিতে দেখা গিয়াছে। গ্রীস দেশের রৌপ্যখনিতে প্রাপ্ত বীজের গল্প যদি সত্য হয় তাহা হইলে বীজের অমরত্ব বিষয়ে আর সন্দেহ থাকে না। একটি রৌপ্যখনিতে ১৫০০ বৎসরের পর পুনরায় কার্য্যারম্ভ কালে কতকগুলি বীজ পাওয়া যায়। সেগুলি বপন করিলে তাহা অঙ্কুরিত হইয়া উঠিল।

পৃথিবীর অভ্যন্তর।—আজ পর্য্যন্ত এঞ্জিনিয়ারগণ ভূমির উপরিভাগ হইতে ৬৫০০ ফিট পর্য্যন্ত ভূগর্ভে প্রবেশ করিয়া দেখিয়াছেন। ফ্লাম্যারিয়ন (Flammarion) নামে একজন ভূতত্ত্ববিদ্ বলেন যে, ভূগর্ভস্থিত অবস্থা সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞানলাভ করিবার জন্য আমাদের পৃথিবীর মধ্যে প্রবেশ করা কর্ত্তব্য। ছয়শত হস্ত পরিধির একটি গর্ত্ত খনন করিয়া তাহার মধ্যে একটি ঝোলায় বসিয়া প্রবেশ করা যাইতে পারে। পৃথিবীর মধ্যে যেরূপ উত্তাপ তাহাতে প্রায় দুই মাইল নিম্নে যাইলেই ফুটন্ত জলের উত্তাপ পাওয়া যাইবে। সুতরাং অতদূর যাওয়া সম্ভব হইবে না। কিন্তু তাহা না হইলেও এরূপ পরীক্ষা দ্বারা পৃথিবীর মধ্যস্থিত অনেক গুপ্ততত্ত্ব, খনি ও আশ্চর্য্য ব্যাপার বাহির হওয়া সম্ভব। আমেরিকা ও ফরাসীদেশের দুইজন ধনকুবের অর্থসাহায্য দ্বারা তাঁহার কল্পনাকে কার্য্যে পরিণত করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।

তারবিহীন টেলিফোন্।

বৈজ্ঞানিকের নিকট তাড়িৎ বেচারাকে কি নাকালই হইতে হইয়াছে। তাঁহারা তাহাদ্বারা পাখা চালাইয়া, আলো জ্বালাইয়া, গাড়ী টানাইয়া লইতেছেন। কত কল যে সে চালায় তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। এত করিয়াও সে অব্যাহতি পায় নাই; শতসহস্র ক্রোশ দূরবর্ত্তী স্থানে তাহাকেই সম্বাদ বহন করিয়া লইয়া যাইতে হইতেছে।

সম্বাদ-বহন-কার্য্যে এতদিন তাড়িতের একটা বাঁধা পথ ছিল,—সেটি তার। এই পথ বাঁধিতে খরচও যথেষ্ট ছিল। সম্প্রতি বৈজ্ঞানিকেরা এটুকুও এড়াইবার উপায় করিয়া দিয়াছেন।

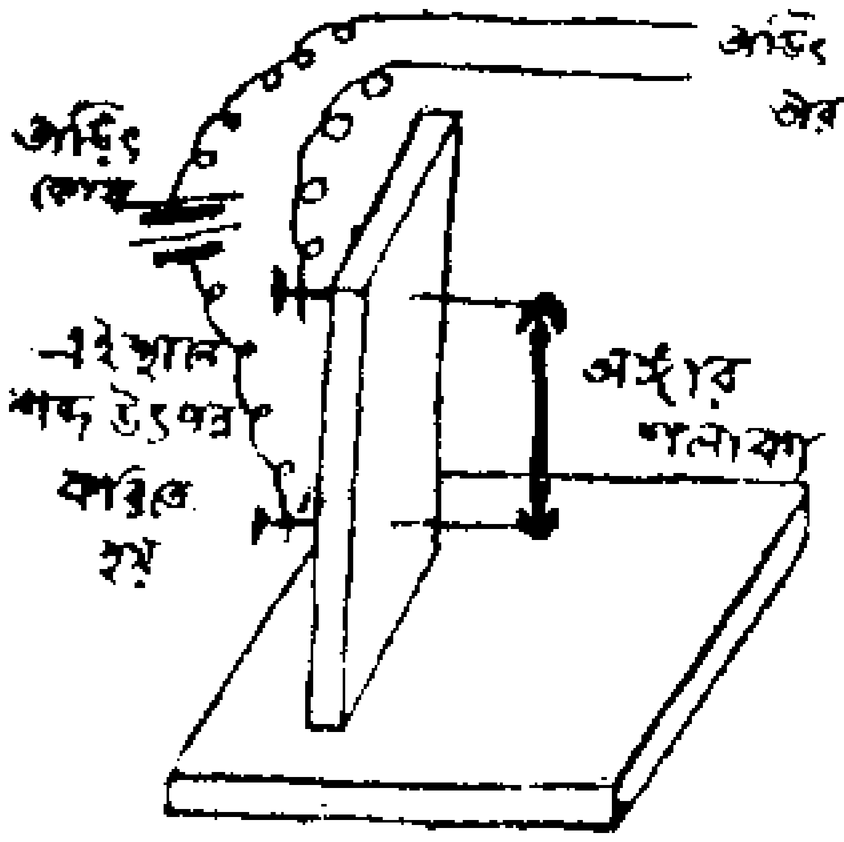
তারওয়ালা টেলিগ্রাফের কথা সকলেই জানেন। তারবিহীন টেলিগ্রাফের কথাও, আশা করি, সকলেই শুনিয়াছেন। এখান হইতে সম্বাদ পাঠাইলাম, এখানের সহিত ওখানের কোনো বাহ্য যোগ নাই, মুহূর্ত্তমধ্যে এখানকার সম্বাদ শতসহস্র ক্রোশ দূরবর্ত্তী স্থানে গিয়া পঁহুছিল—তারবিহীন টেলিগ্রাফের কার্য্য এইরূপ।

টেলিগ্রাফে তাড়িৎ-সাহায্যে সঙ্কেতদ্বারা সম্বাদ প্রেরণকরা হয়। টেলিফোনেও তাড়িতেরই সাহায্যে, সঙ্কেত দ্বারা নহে, একেবারে গলার আওয়াজ পাঠাইয়াই সম্বাদ প্রেরিত হইয়া থাকে। টেলিগ্রাফে কিম্বা টেলিফোনে সম্বাদপ্রেরণ ও তাহা গ্রহণের স্থান দুইটির মধ্যে একটি তাড়িৎবাহী তারের যোগ থাকার প্রয়োজন। এই তারের যোগ উঠাইয়া দিয়াও টেলিফোনের সাহায্যে শব্দ প্রেরিত হইতেছে। কিরূপে তাহা হয়, তাহাই এই প্রবন্ধের বক্তব্য বিষয়।

সাধারণত যে টেলিফোন্ ব্যবহৃত হয় তাহাতে, সম্বাদপ্রেরণের সময় একটি যন্ত্রের নিকট মুখ লইয়া গিয়া কথা কহিলে শব্দায়মান বায়ুতরঙ্গ শ্লথভাবে রক্ষিত অঙ্গার-শলাকায়

আঘাত করিয়া টেলিফোনের তারের সহিত তাড়িৎ-কোষের (যেখানে তাড়িৎ

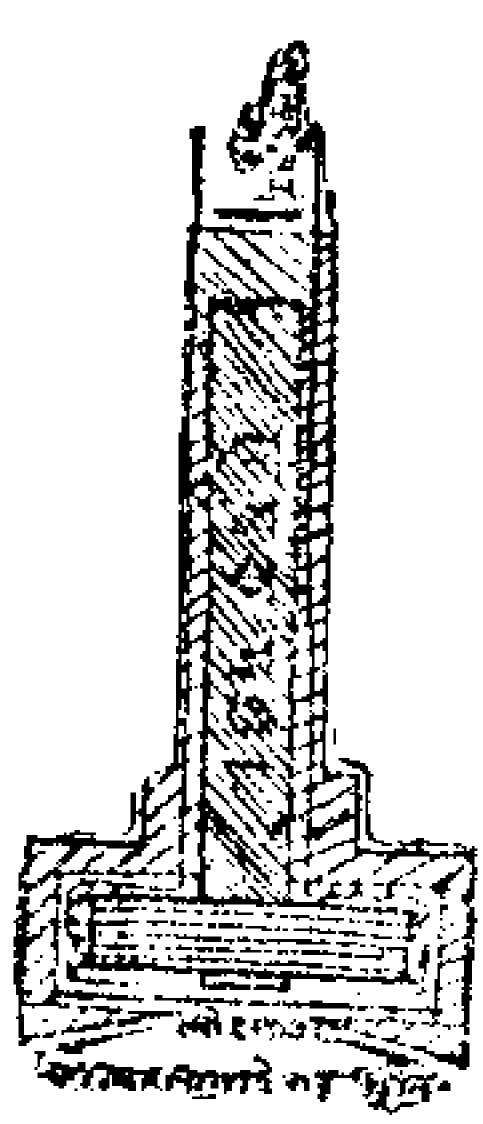
টেলিফোনের প্রেরক যন্ত্র।



টেলিফোনে যে যন্ত্রটির নিকটে মুখ লইয়া গিয়া কথা কহিতে হয় তাহার ভিতরে এইরূপে সজ্জিত অঙ্গার-শলাকা থাকে।

উৎপন্ন হয়) সংযোগ কখনো দৃঢ় কখনো বা আলা করিয়া দেয়। একটি মাত্র শব্দ উচ্চারণ করিলে এই পরিবর্ত্তন বহুবার ঘটে। এই পরিবর্ত্তনে টেলিফোনের তারে তাড়িৎ-প্রবাহেও পরিবর্ত্তন জন্মে, অর্থাৎ প্রবাহের হ্রাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে। এই বৈষম্যময়

টেলিফোনের গ্রাহক যন্ত্র।



তাড়িৎ-প্রবাহ যেখানে সম্বাদ পঁহুছিবে তার বাহিয়া সেখানে গিয়া একটি চুম্বকদণ্ডের চুম্বকশক্তিতে বৈষম্য উৎপাদন করে। চুম্বকদণ্ডটির সম্মুখে একখানি লৌহের পাতলা পাত থাকে তাহা চুম্বককর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়া কম্পন করিতে থাকে। চুম্বকশক্তির বৈষম্যে তাহার আকর্ষণেও বৈষম্য জন্মে, এই কারণেই লৌহপাতটিতে কম্পন উৎপন্ন হয়। লৌহপাতের সম্মুখস্থ বায়ু এই পাত হইতে কম্পন গ্রহণকরিয়া তরঙ্গায়িত হইয়া উঠে। শব্দপ্রেরণের সময় বায়ুতে যে তরঙ্গ উত্থিত হইয়াছিল লৌহপাতটির সম্মুখে তদনুরূপ বায়ুতরঙ্গ উত্থিত হওয়াতে প্রেরিত শব্দটি পুনরুত্থিত হইয়া থাকে। যন্ত্রের নিকট কান লইয়া গেলেই শব্দটি শুনিতে পাওয়া যায়।

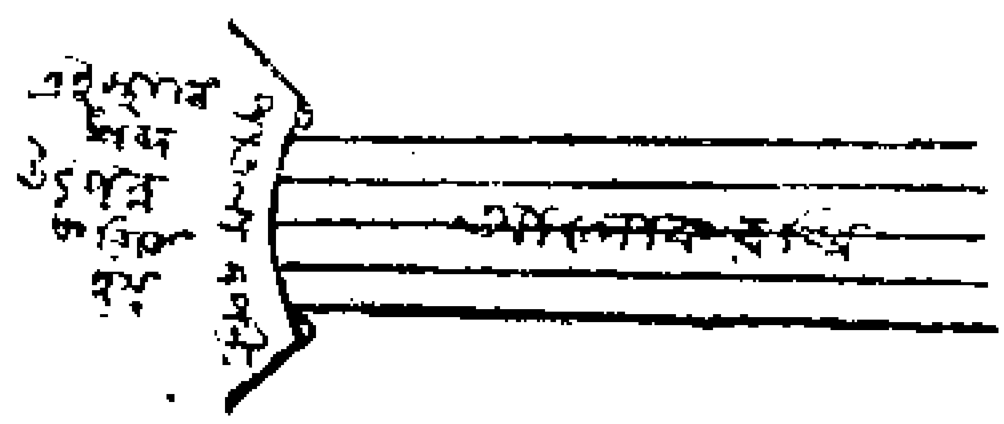
ধাতব তারদ্বারা প্রেরক ও গ্রাহক উভয় যন্ত্রকেই সংযুক্ত করিয়া না দিলে টেলিফোনের কাজ চলে না। শব্দ যেন তার বাহিয়াই যায়। অধুনা বৈজ্ঞানিকেরা শব্দকে এই সুবিধাটুকুও দিতে রাজি হইতেছেন না। এখন তাহাকে বিনা তারেই চলিতে হইবে।

দুই প্রকার তারবিহীন টেলিফোনের কথা আমরা বলিব। প্রথমটিতে আলোকের সাহায্যে শব্দ প্রেরিত হইয়া থাকে। ইহার কার্য্যপ্রণালী আলোচিত হইবার পূর্ব্বে গ্রাহাম বেল্ কর্ত্তৃক উদ্ভাবিত ফোটোফোনের কথা বলা আবশ্যক।

ফোটোফোনেও কথা চলে। সাধারণ টেলিফোনে বক্তা ও শ্রোতার মধ্যে যে ধাতব তারের যোগ থাকে, ফোটোফোনে সে যোগটি আলোকের। এই যন্ত্রে, একটি অতি পাতলা

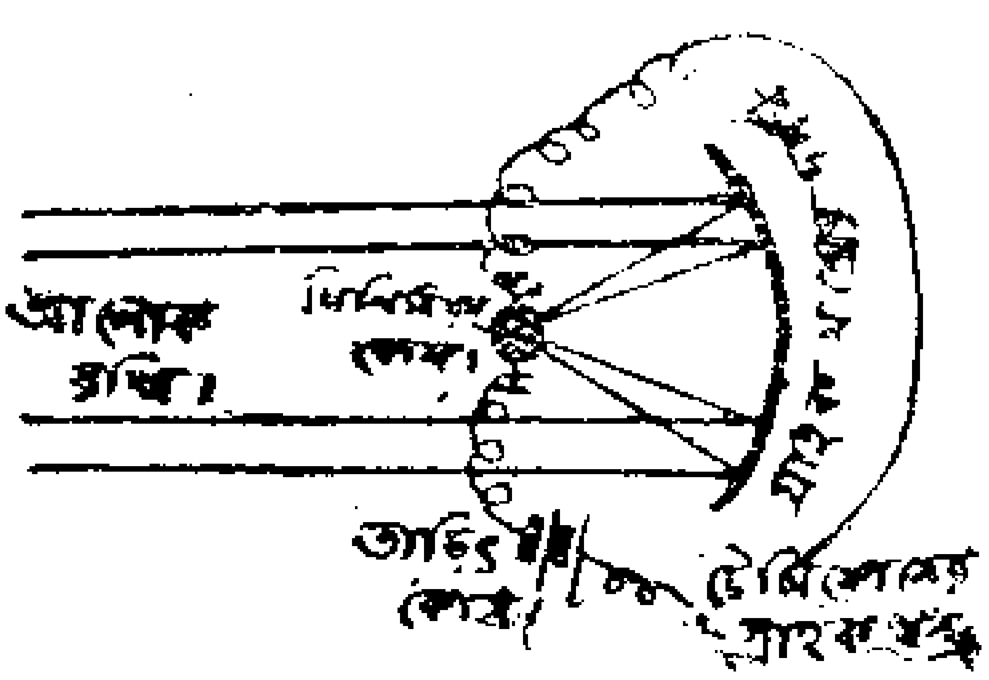
কাচের দর্পণের পিছন দিকে প্রেরিতব্য শব্দটি

ফোটোফোনের প্রেরক যন্ত্র।



উৎপন্ন করা হয়। শব্দায়মান বায়ুতরঙ্গের আঘাতে দর্পণটি, অতি পাতলা বলিয়া, আকারে পরিবর্ত্তন প্রাপ্ত হয় এবং ইহার আলোক-প্রতিবিম্বন-শক্তিতেও বৈষম্য জন্মে। এই দর্পণে কাচফলক দ্বারা (Condensing lens) ঘনীভূত আলোকরশ্মি পাতিত করিয়া ইহাকে এরূপে ফিরানো হয় যে আলোকরশ্মি তাহা হইতে প্রতিফলিত হইয়া শ্রোতার দিকে যায়। শব্দতরঙ্গে দর্পণটির আকারে যে বৈষম্য জন্মে তাহার সঙ্গে সঙ্গে দর্পণ হইতে প্রতিফলিত আলোকে ঠিক তদনুরূপ বৈষম্য জন্মিয়া থাকে, অর্থাৎ দর্পণ হইতে আলোক কথনো অধিক কথনো বা অল্প পরিমাণে প্রতিবিম্বিত হয়। এই বৈষম্যময় আলোকই শব্দ বহন করিয়া লইয়া যায়। এই বৈষম্যকেই শব্দের আর এক আকার বলা যাইতে পারে। এখন

ফোটোফোনের গ্রাহক যন্ত্র।



এই আলোককে ধরিয়া তাহাকে কথা কহাইয়া লইলেই হইল। এ কার্য্যটিও হয় দর্পণের সাহায্যে। বক্তার নিকট হইতে আলোক শ্রোতার নিকটে আর একটি দর্পণে আসিয়া পড়ে। এই দ্বিতীয় দর্পণটি (Parabolic Mirror.) এরূপ যে তাহাতে আলোক পতিত হইলে, প্রতিবিম্বিত হইয়া কোনো এক নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসিয়া একত্র হয়। যে স্থানে আলোকরশ্মি একত্র হয় সেই স্থানে একটি সিলিনিয়ম্ কোষ আছে। এই সিলিনিয়ম্-কোষের সহিত একটি তাড়িৎ-কোষ সংযুক্ত থাকে ; তাহার সহিত একটি টেলিফোনের গ্রাহক যন্ত্রও (টেলিফোনে শ্রোতাকে যাহা কানে লাগাইতে হয়) সংযুক্ত করিয়া রাখা হয়।

সিলিনিয়মের একটী বিশেষ গুণ আছে যে ইহার উপর আলোক পতিত হইলে ইহার তাড়িৎ-পরিচালন-শক্তি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় অর্থাৎ তখন তাড়িৎ সিলিনিয়ম্ অতিক্রম করিয়া সহজেই যাইতে পারে। ফোটোফোনে কাজ করিবার সময় সিলিনিয়মে যে আলোক পড়ে তাহাতে বৈষম্য থাকে বলিয়া ইহার তাড়িৎ-পরিচালনেও বৈষম্য জন্মে এবং ইহাতে সংলগ্ন তাড়িৎ-বহ তারে তাড়িতের পরিমাণে হ্রাসবৃদ্ধি উৎপন্ন হয়। এই বৈষম্য-ময় তাড়িৎ-প্রবাহ একটি সাধারণ টেলিফোনের গ্রাহক যন্ত্রে পূর্ব্ববর্ণিত-রূপে শব্দ উৎপন্ন করে। এ ক্ষেত্রে, লৌহ-পাতটির কম্পন বক্তার বাক্যোত্থিত বায়ু তরঙ্গে পাতলা দর্পণখানি যেরূপে কাঁপিয়াছিল সেইরূপই হয়, সেইজন্য লৌহপাতটির নিকটে যে বায়ুতরঙ্গ উত্থিত হয় তাহাতে প্রেরিত শব্দটিই উৎপন্ন হইয়া থাকে।

গ্রাহাম বেল্ এই যন্ত্রটির সাহায্যে ৮০০ গজ দূরে শব্দ প্রেরণ করিয়াছিলেন। তিনি কেবল মনুষ্যের কণ্ঠস্বর প্রেরণ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, সঙ্গীতও প্রেরণ করিয়া তবে ছাড়িয়াছেন।

এখন বোষ্টন্ নিবাসী হ্যামণ্ড ভি, হেজ্ কর্ত্তৃক উদ্ভাবিত Radiophone বা আলোক-বক্তার কথা বলা যাউক। ফোটোফোনের বিষয় জানা থাকিলে ইহার কার্য্যপ্রণালী বুঝা কঠিন হইবে না। ইহাকেই তারবিহীন টেলিফোন্ নাম দেওয়া হইয়াছে।

যে বস্তু আলোক দেয় তাহা তাপও বিকিরণ করে। আলোক দেখিলেই বুঝিতে হইবে তাহার উৎপত্তিস্থানে তাপ আছে। তাপ ভিন্ন আর কি উপায়ে উজ্জ্বল আলোক উৎপন্ন করা যাইতে পারে আমরা জানি না। জাহাজে ও ষ্টীমারে বহুদূর পর্য্যন্ত আলোক বিকীর্ণ করিবার জন্য এক প্রকার তাড়িতালোক ব্যবহৃত হয় তাহার নাম সার্চলাইট্ (Searchlight); ইহাতে প্রভূত আলোক ও উত্তাপ জন্মে। বহু মাইল দূরেও সার্চলাইটের আলোক দেখা যায়। যতদূর আলোক যায় তাপও তত দূর যায়, কিন্তু দূরে সে তাপ অনুভব করিতে আমাদের শক্তি নাই। হেজ্ এক অভিনব উপায়ে দূরেও যাহাতে আলোকের তাপ গ্রহণ করা যায় তাহার ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং তাহাদ্বারাই শব্দ পরিচালন করিয়াছেন।

আলোক-বক্তার প্রেরক যন্ত্রটি একটি সার্চলাইট্ ভিন্ন আর কিছুই নহে। ইহার পিছন দিকে চারিযোড়া- তার টেলিফোনের একটি প্রেরক যন্ত্রের সহিত সংযুক্ত হইয়া আছে। যে তার বাহিয়া তাড়িৎ আসিয়া সার্চলাইটে আলোক উৎপন্ন করে তাহাও এই তারগুলির সহিত সংযুক্ত। গ্রাহক যন্ত্রটি ফোটোফোনের গ্রাহক যন্ত্রেরই মত—তাহাতেও আলোক ঘনীভূত করিবার জন্য একখানি দর্পণ (Concave or Parabolic Mirror) থাকে। এই দর্পণে আলোক পতিত হইয়া যে স্থানে কেন্দ্রীভূত হয়, সেস্থানে একটি দীর্ঘাকৃতি কাচের ফাঁপা ক্ষুদ্র পাত্র আছে; এই পাত্রটি অতি সহজেই তাপ গ্রহণ করিতে পারে এরূপ ধর্ম্মবিশিষ্ট অঙ্গারকণায় অর্দ্ধপূর্ণ এবং ইহার সূক্ষ্ম সূচ্যগ্র মুখটি ঈষৎ পরিমাণে কানে দিবার একটি চোঙের ভিতরে আসিয়াছে।

এই যন্ত্রদ্বারা কোনো শব্দ প্রেরণ করিতে হইলে প্রেরক তাহার সার্চলাইট্‌টির আলোক যাহাতে শ্রোতার দিকেই চালিত হয় এরূপে ফিরাইয়া লইয়া সার্চলাইট্‌সংলগ্ন টেলিফোনে কথা কহেন। টেলিফোনের সহিত সার্চলাইটের তাড়িৎবাহী তার সংযুক্ত আছে। টেলিফোনে শব্দ হইলে শব্দতরঙ্গ শ্লথভাবে রক্ষিত অঙ্গারশলাকার সাহায্যে সার্চলাইটের আলোক-উৎপাদনকারী তাড়িৎ-প্রবাহকে কখনো কিছু দুর্ব্বল কখনো বা কিছু সবল করিয়া দেয়, কাজেই সার্চলাইটের আলোকে হ্রাসবৃদ্ধি উপস্থিত হয়। সার্কলাইটের আলোক শ্রোতার নিকটস্থ দর্পণ হইতে প্রতিফলিত হইয়া ঘনীভূত অবস্থায় কাচের পাত্রটির উপরে পড়ে এবং অঙ্গারকণাগুলি সেই আলোক হইতে তাপ লইয়া আকারে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় ও কাচ-পাত্রটির সূচ্যগ্র মুখটিকে কানে দিবার চোঙ্‌টির দিকে ঠেলিয়া দেয়; ইহাতে সূচ্যগ্র

মুখটি চোঙ্‌টিতে মৃদু মৃদু আঘাত প্রদান করে। এই আঘাত হইতেই প্রেরিত শব্দটি পুনরুত্থিত হয়। আলোকের বৈষম্য হইতে অঙ্গার কণাগুলির তাপেও বৈষম্য জন্মে; কাচ পাত্রটির সূচ্যগ্র মুখের আঘাতও তদনুরূপ বৈষম্যযুক্ত হয়। আলোকের বৈষম্য তাড়িৎ প্রবাহ হইতে এবং তাড়িৎ প্রবাহের বৈষম্য-টেলিফোন্ হইতে উৎপন্ন হয়; কাজেই গ্রাহক যন্ত্রে প্রেরিত শব্দটিই উৎপন্ন হইয়া থাকে।

সেদিন সম্বাদ আসিয়াছে যে মধ্যসমুদ্রে একখানি জাহাজের সহিত আর একখানি জাহাজের সংঘর্ষণ ঘটিয়াছিল। সেই জাহাজ দুইখানির একখানি হইতে তারবিহীন টেলিগ্রাফের সাহায্যে নিকটবর্ত্তী অন্যান্য জাহাজে এই বিপদের সম্বাদ প্রেরিত হইয়াছিল। সম্বাদ পাইয়া অতি অল্প সময়ের মধ্যে কয়েকখানি জাহাজ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া প্রায় এক সহস্র লোককে আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষা করিয়াছে। জাহাজে জাহাজে সম্বাদ আদান প্রদান করিতে তারবিহীন সম্বাদ-প্রেরক যন্ত্র ভিন্ন অন্য উপায় নাই। তারবিহীন টেলিগ্রাফের মূল্য অধিক বলিয়া সকল জাহাজে তাহা থাকে না। হেজের এই যন্ত্রটি সকল জাহাজেই ব্যবহৃত হইতে পারে। অবশ্য হেজের যন্ত্রের সাহায্যে তারবিহীন টেলিগ্রাফের মত বহুদূরে সম্বাদ প্রেরণ করা যায় না, তবে যতটা যায় সাধারণত তাহাই যথেষ্ট। প্রত্যেক জাহাজেই সার্চলাইট্ থাকে, অবশিষ্ট বন্দোবস্ত করিয়া লওয়া সহজ ও অল্পব্যয়সাধ্য।

এক প্রকার তারবিহীন টেলিফোনের কথা বলা হইল। অপরটির কথা বলিতে হইলে আমাদিগকে বায়ুমণ্ডল ত্যাগ করিয়া ভূগর্ভে প্রবেশ করিতে হইবে।

ফিলাডেল্‌ফিয়ার শ্রীযুক্ত এ, এস্, কলিন্স পৃথিবীর অভ্যন্তর দিয়া তাড়িৎ-প্রবাহ পরিচালন করিয়া এক প্রকার তারবিহীন টেলিফোন্ প্রস্তুত করিয়াছেন। এই যন্ত্রে, মৃত্তিকা মধ্যে একখানি সুবৃহৎ ধাতব জাল প্রোথিত করিয়া তাহার সহিত একটি অত্যন্ত প্রবল তাড়িৎ-কোষ সংযুক্ত করিয়া দেওয়া হয়। এই জাল অতিশয় তাড়িতাবিষ্ট হইয়া ভূমধ্যে আপনার চারিদিকে তাড়িৎ-শক্তি বিকীর্ণ করিতে থাকে। এই স্থানেই প্রেরিতব্য শব্দটি এরূপে উৎপন্ন করা হয় যে তাহাতে জালখানির তাড়িতে বৈষম্য জন্মে। ইহা হইতে চারিদিকে বিকীর্ণ শক্তি-রেখাগুলিতেও বৈষম্য ঘটে। দূরে, যেখানে শব্দ গ্রহণ করিতে হইবে সেখানে, আর একখানি জাল প্রোথিত থাকে; তাহাদ্বারা প্রেরকযন্ত্র-প্রেরিত কতকগুলি শক্তি-রেখা ধৃত হয়, এবং এই জাল সংলগ্ন একটি টেলিফোনের গ্রাহক যন্ত্রের সাহায্যে প্রেরিত শব্দটি পুনরুত্থিত করা হইয়া থাকে।

তারবিহীন টেলিগ্রাফ্ যখন প্রথম প্রস্তুত হয় তখন তাহার একটি বিশেষ অসুবিধা এই ছিল যে তাহাদ্বারা গোপনীয় সম্বাদ প্রেরণ করা যাইত না, কারণ যে স্থানেই তারবিহীন টেলিগ্রাফের গ্রাহক যন্ত্র থাকুক না সেই স্থানেই প্রেরিত সম্বাদটি গ্রহণ করা যাইত। এখন যন্ত্রের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এই অসুবিধা ঘুচাইবার পথ অনেকটা প্রশস্ত হইয়াছে। দুইটি যন্ত্র এরূপে প্রস্তুত করা যাইতে পারে যে একটির দ্বারা প্রেরিত সম্বাদ দ্বিতীয়টি ভিন্ন

আর কোনোটির দ্বারা গৃহীত হইবে না। * কলিন্সের উদ্ভাবিত এই তারাবিহীন টেলিফোনেও সেইরূপ বন্দোবস্ত হইবার আশা আছে।†

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

যোগস্থিতি।

মনুষ্য স্থিতি চায়। স্থিতি বিনা শান্তি নাই। স্থিতি কোথায়? সামঞ্জস্যই স্থিতি। কিসের সামঞ্জস্য? শক্তির। শক্তিবিনা বস্তু বা অস্তি নাই। এই সত্য-বস্তু শক্তির অন্তরে বাহিরে অভেদে মিলন বা যোগযুক্ত হওয়াই সামঞ্জস্য। এই শক্তিগত সামঞ্জস্যের মূলে যে ব্যক্তি প্রকাশমান তিনিই এক-সত্য, আত্মা বা স্থিতি।

শক্তি ও সৃষ্টি দুই নয় এক। শক্তির গতি বা ক্রিয়াকেই-সৃষ্টি বলে। শক্তির গতি বা ক্রিয়ার দ্বারাই প্রতি মুহূর্ত্তে অন্তরে বাহিরে নানা বৈচিত্র্যের উৎপত্তি ও লয় হইতেছে। ইহাদের অন্তরে যে সামঞ্জস্য বা যোগ আছে তাহাই স্থিতি বা আনন্দ। এই যোগ বা আনন্দের প্রকাশ ইহার শেষ কথা বা চরম ফল হইলেও সাধারণতঃ বাহ্য দৃষ্টিতে শক্তির ক্রিয়া বা গতির মধ্যে বৈপরীত্যই দেখা যায়—যোগ বিয়োগের বৈপরীত্য, মঙ্গল অমঙ্গলের বৈপরীত্য, সত্য মিথ্যার বৈপরীত্য, পাপ পুণ্যের বৈপরীত্য, শীত উষ্ণের বৈপরীত্য, আলোক অন্ধকারের বৈপরীত্য ইত্যাদি। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে এই বৈপরীত্য স্বাতন্ত্র্য বা পার্থক্য নয় ইহা নিবিড়তম ঐকান্তিক ঐক্যেরই অভিব্যক্তির প্রণালী বা উপায়।

বৈপরীত্য ব্যতীত শক্তির প্রকাশ সম্ভবে না, শক্তির প্রকাশ ব্যতীত শক্তিগত সামঞ্জস্য ঘটিতে পারে না। যোগ বিয়োগ, মঙ্গল অমঙ্গল, সত্য মিথ্যা, পাপ পুণ্য, শীত উষ্ণ, আলোক অন্ধকার, রূপ বৈষম্যের মধ্যে যে যোগময় অখণ্ডতা বিরাজমান তাহাই স্থিতি বা আনন্দ, তাহাতেই এক-সত্য, আত্মা বা ভগবান প্রত্যক্ষ। প্রসুপ্ত বা প্রচ্ছন্ন যোগকে সজ্ঞান ভাবে অনুভব করিতে হইলে বিয়োগ সম্বন্ধে সজ্ঞান হওয়ার প্রয়োজন। বিয়োগ সম্বন্ধীয় সজ্ঞানতা সজ্ঞান যোগেরই পূর্ব্বাবস্থা বা পূর্ব্বাভাস। এইরূপ সজ্ঞান অমঙ্গল শক্তি সজ্ঞান মঙ্গল শক্তিরই পূর্ব্বাবস্থা বা পূর্ব্বাভাস। অমঙ্গল কাহাকে বলে? সমষ্টির সহিত যোগ-ভ্রষ্ট অবস্থার অহং অনুভূতির নামইত অমঙ্গল? ইহা ব্যতীত অমঙ্গলের আর কোন তাৎপর্য্য নাই? এই সমষ্টি বা সকলের সহিত যোগ-ভ্রষ্ট রূপ অমঙ্গলবোধ মনুষ্য ছাড়া আর কোন জীবের আছে কি? জড় কাষ্ঠ প্রস্তরের আছে কি? ইহার জন্য তাহাদের কোন

---

* তারবিহীন টেলিগ্রাফের কথা বলিবার সময় এ বিষয়টি আলোচিত হইবে।—জ্ঞ।

† আরো একপ্রকার তারবিহীন টেলিফোন্ উদ্ভাবিত হইয়াছে; তাহার কার্য্যপ্রণালী অনেকটা তারবিহীন টেলিগ্রাফেরই মত। পরে সে বিষয়েও বলিবার ইচ্ছা রহিল।—জ্ঞ।

কষ্ট বা যাতনা বোধ হয় কি ? পাপ সম্বন্ধেও এইরূপ। সজ্ঞান পাপবোধ সজ্ঞান পুণ্যানুভূতিরই পূর্ব্বাবস্থা বা পূর্ব্বাভাস। মনুষ্য ছাড়া আর কোন জীবের পাপবোধ নাই। অন্তর্জগতে এই যে রূপ বহির্জগতেও অবিকল তাই। প্রচ্ছন্ন আলোকেরই নাম অন্ধকার। ইহা আলোক অভিব্যক্তিরই পূর্ব্বাবস্থা বা পূর্ব্বাভাস। অন্ধকার সম্বন্ধে স্বতন্ত্র কোন সজ্ঞানতা নাই; আলোকের আবির্ভাবেই অন্ধকার সম্বন্ধে সজ্ঞানতা ঘটে। আলোকই শক্তি বা বস্তু তাহার অভাব বা অপ্রকাশকেই অন্ধকার বলে। এইরূপ উষ্ণতাই শক্তি বা সক্রিয়তা উষ্ণতার অভাবই শীত বা নিষ্ক্রিয়তা। সত্য মিথ্যা সম্বন্ধেও এইরূপ। যাহা আছে যাহা বাস্তব তাহাই সত্য। যাহা নাই তাহার কল্পনা ও যাহা আছে তাহা অস্বীকার করাকেই মিথ্যা বলে।

উষ্ণতার আবির্ভাবে শৈত্য, আলোকের আবির্ভাবে অন্ধকার, বাস্তবের আবির্ভাবে কল্পনা, মঙ্গলের আবির্ভাবে অমঙ্গল, যোগের আবির্ভাবে বিচ্ছেদের লয় ঘটে। এই লয়কেই মনুষ্য মিথ্যা ও অমঙ্গলের বিনাশ বলে। স্থূল বা বাহ্য দৃষ্টিতে ইহা বিনাশ কিন্তু সূক্ষ্ম বা অন্তর্দৃষ্টিতে ইহা বিনাশ নহে; নূতন অবস্থায় নবজীবন লাভ। সমুদায় মিথ্যা ও অমঙ্গল এইরূপে লয় বা বিনাশ প্রাপ্তি দ্বারা সত্য ও মঙ্গলে পরিণত হইয়া আসিতেছে ও আসিবে। ইহাই শক্তি বা বস্তুর সনাতন স্বভাব।

যাঁর অন্তরস্থ চেতনা পবিত্র আচরণ ও সাধনা দ্বারা সূক্ষ্মতা প্রাপ্ত হয় তিনিই শক্তির এই গতি ও স্থিতি অনুভবে সমর্থ হন ও এই শক্তির মূলে বা মর্ম্মে যে একই সত্য অন্তরে বাহিরে অভেদে প্রকাশমান আছেন তাহা তাঁহার লক্ষ্য গোচর হয়।

শ্রীহেমলতা দেবী।

লালমোহন ঘোষ।

গত ১৮ই সেপ্টেম্বর শনিবারে ভারত-গৌরব শ্রীযুক্ত লালমোহন ঘোষ পরলোক গমন করিয়াছেন। তাঁহাকে হারাইয়া সমগ্র দেশ আজ ব্যথিত। তাঁহার ন্যায় বিদ্বান বাগ্মী ও দেশসেবক ক্রমেই আমাদের মধ্যে বিরল হইয়া পড়িতেছেন। আমরা শোক-সন্তপ্ত হৃদয়ে আজ তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনীর মধ্যে তাঁহার নানা সদ্‌গুণের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। তাঁহার জীবনের অনেক কথা আমরা তাঁহার কন্যা শ্রীমতী সুকুমারীর নিকট পাইয়াছি। এজন্য তাঁহাকে আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের ১৭ই ডিসেম্বর নদীয়ার সদর কৃষ্ণনগরে লালমোহন জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা রায় রামলোচন ঘোষ বাহাদুর তথায় সদর আমীন পদে নিযুক্ত ছিলেন। ঘোষ পরিবার পূর্ব্বে পূর্ব্ববঙ্গে বিক্রমপুরে বাস করিতেন এবং ব্রিটিশ শাসন স্থাপিত হইবার পূর্ব্ব হইতেই তাঁহারা জমিদার ছিলেন।

শিশুকাল হইতেই লালমোহনের অসাধারণ প্রতিভা প্রকাশ পাইত। তিনি যখন চারি বৎসরের বালক তখন তাঁহার মাতা তাঁহার জ্যেষ্ঠা ভগিনীকে পড়াইতেন দেখিয়া তিনিও বর্ণপরিচয় লইয়া তাঁহার মাতার নিকট



লালমোহন ঘোষ

বসিতেন, এবং তাঁহাকে পড়াইবার জন্য পীড়ন করিতেন। তখনকার হিন্দুপ্রথানুসারে পঞ্চম বৎসর না হইলে হাতে খড়ি হইত না, এবং হাতে খড়ির পূর্ব্বে বিদ্যারম্ভ করিতে নাই বলিয়া জননী তাঁহাকে পড়াইতেন না,—তিনি নিকটে খেলা করিতেন! জননীর নিকট খেলিতে খেলিতে ভগিনীর পড়া শুনিয়া তিনি পাঠ অভ্যাস করিয়া ফেলিতেন। একদিন হঠাৎ তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠ মনোমোহনকে বলিলেন "দাদা, মা আমাকে পড়ান না, আমি কিন্তু শুনিয়া শুনিয়া শিখিয়াছি, আর দিদির লেখার উপর লিখিয়া লিখিতেও শিখিয়াছি।" মনোমোহন পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন লালমোহন আপন চেষ্টায় বস্তুতই পড়িতে ও লিখিতে শিখিয়াছেন। তিনি তৎক্ষণাৎ লালমোহনকে পিতার নিকট লইয়া গেলেন। পিতা বালকের বিদ্যা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া হাসিয়া বলিলেন—"তুমি হাতে খড়ির আগেই পড়িতে শিখিয়াছ! তুমি এত পণ্ডিত, দেখিও শেষে সরস্বতী যেন তোমার উপর অসন্তুষ্ট না হন।" বিদ্যালয়ে শিক্ষাকালে তাঁহার অসাধারণ ধীশক্তি, স্মৃতিশক্তি ও পাঠানুরাগ দেখিয়া সকলেই মুগ্ধ হইতেন। ১৮৬৬ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় ইংরাজিতে সর্ব্বোচ্চস্থান অধিকার করিয়া প্রথম শ্রেণীর বৃত্তি লাভ করেন। পরে যথাসময়ে এফ, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ব্যারিষ্টার হইবার জন্য ইংলণ্ডে গমন করেন। তথায় লণ্ডননগরে ল্যাকোনিক্‌স্ (Laconics) নামক আলাচনা সমিতিই তাঁহার স্বাভাবিক বাগ্মিতাশক্তির প্রথম বিকাশস্থল। ছাত্রাবস্থাতেই তিনি এরূপ মনোহর বক্তৃতাদানে নিপুণ ছিলেন, যে বিলাতের শ্রেষ্ঠ বক্তা জন্ ব্রাইটের সহিত তিনি প্রায় সমকক্ষ হইয়া উঠিয়াছিলেন। এক সভাতে জন্ ব্রাইট সভাপতি ছিলেন। যুবা লালমোহন সেই মঞ্চে দাঁড়াইয়া বক্তৃতা করিতেছিলেন। মিষ্টার ব্রডহার্ষ্ট (Broadhurst) নামে একজন পার্লামেণ্টের সভ্য বাহিরে দাঁড়াইয়া তাঁহার বক্তৃতা শুনিতেছিলেন। তাঁহার বক্তৃতা শেষ হইবার পর তিনি ভিতরে আসিয়া বলিলেন—"ভদ্রমহোদয়গণ, দুর্ভাগ্যবশতঃ সভাস্থলে উপস্থিত হইতে বিলম্ব হওয়ায়, আমি বাহিরে দাঁড়াইয়া কেবল বক্তৃতা শুনিতেছিলাম মাত্র, বক্তাকে দেখিতে পাই নাই। শুনিতে শুনিতে আমি মনে করিতেছিলাম বক্তা নিশ্চয়ই পার্লামেণ্টের কোন বিখ্যাত বাগ্মী হইবেন। কিন্তু ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম বক্তা আমাদের ভারতবাসী লালমোহন।" এই কথা বলিবামাত্র শ্রোতৃবর্গ উচ্চ করতালি দিয়া উঠিলেন,—সভাপতি স্বয়ং তাহাতে যোগদান করিলেন। ১৮৭৩ সালে তিনি ব্যারিষ্টারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ভারতে প্রত্যাগমন করেন।

১৮৭৯ সালে লর্ড লিটনের দেশীয় সংবাদপত্র আইন, নূতন সিভিল সার্ভিস্ ও অন্যান্য অকল্যাণকর কর্ম্মের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিবার জন্য তিনি ভারতবাসীর প্রতিনিধিরূপে দ্বিতীয়বার ইংলণ্ডে গমন করেন। তাঁহার অসাধারণ বাগ্মিতা ও অক্লান্ত চেষ্টার ফলে দেশীয় সংবাদপত্র আইন লুপ্ত হয় এবং ভারতে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা গ্রহণের বিধি প্রবর্ত্তিত হয়। এই সময়ে ইংলণ্ডে বক্তৃতা-

কালে তিনি ভারতে জাতীয়তার জন্ম ও জাতীয় মহাসমিতির জন্মের আভাস প্রদান করেন। ভারতের প্রতি ইংলণ্ডের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে তিনি এক সভাস্থলে এরূপ মনোহর ভাষায় ও অকাট্য যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা করেন যে জন ব্রাইট বক্তৃতা করিতে উঠিয়া বলেন—"আমার মনে হয় আমি কোন কথা কহিয়া লালমোহনের বক্তৃতার মাধুর্য্য নষ্ট না করিয়া এই স্থলেই সভা ভঙ্গ করা সঙ্গত।" ভারতের ইতিহাসে ভারতবাসীর বক্তৃতার এরূপ প্রবল প্রভাব আর কখনও দেখা যায় নাই। এই বক্তৃতার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই ভারতে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা প্রতিষ্ঠিত করিবার আদেশ ভারত গবর্মেণ্টকে টেলিগ্রামে প্রেরণ করা হয়।

পর বৎসর তিনি পুনরায় লর্ড লিটনের শাসননীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিবার জন্য ইংলণ্ডে গমন করেন। এবার তথায় উপস্থিত হইয়া তিনি ইংলণ্ডের চতুর্দ্দিকে যেরূপ তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করিলেন তাহাতে ইংলণ্ডবাসী তাঁহার অসাধারণ প্রতিভায় বিস্মিত হইয়া পড়িলেন।

পরে 'ইল্‌বার্ট বিলের' সেই লজ্জাকর আন্দোলন সময়ে লালমোহন যেরূপ উদ্যমে কার্য্য করিয়াছিলেন তাহা দেখিয়া তাঁহার একজন বন্ধু বলেন "জাতীয় স্বার্থ রক্ষার জন্য একক প্রাণীর এরূপ উদ্যম চেষ্টা সচরাচর দেখা যায় না।" তাঁহার ঢাকানগরের বিখ্যাত বক্তৃতার ফলে মিষ্টার ব্রান্‌সনকে (Branson) ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া পলায়নে বাধ্য হইতে হয়। ইহার কিছু দিন পরেই তিনি দেশকল্যাণের জন্য চতুর্থবার ইংলণ্ড গমন করেন। দুই বৎসর কাল তিনি ইংলণ্ডে 'ইলবার্ট বিল' ও অন্যান্য দুর্নীতি সম্বন্ধে আন্দোলন করেন। ১৮৮৫ সালে তাঁহার অসাধারণ বাগ্মিতা ও প্রতিভায় মুগ্ধ হইয়া গ্রীন্‌উইচ (Greenwich), ডেপ্টফোর্ড (Deptford) ও উল্‌উইচ (Woolwich) এই তিনটি প্রদেশ তাঁহাকে তাহাদিগের প্রতিনিধিস্বরূপ পার্লামেণ্টের সভ্য হইবার জন্য অনুরোধ করে। ভারতবাসীর পক্ষে এরূপ নিমন্ত্রণলাভ এই প্রথম, এবং তাঁহার প্রতি এই সম্মান প্রদানের জন্য আমরা ভারতবাসী চিরদিনই গৌরবান্বিত। তাঁহাকে পার্লামেণ্টের সভ্য করিবার জন্য গ্রীন্‌উইচবাসীর অনুরোধের ইতিহাসটি বলিলে বোধ হয় পাঠকবর্গের অপ্রীতিকর হইবে না। পূর্ব্বে ব্রাইট সাহেব যখন লালমোহনকে জিজ্ঞাসা করেন "মিষ্টার ঘোষ, আপনার কি মনে হয় যে কোন ভারতবাসীর পক্ষে পার্লামেণ্টের সভ্য হওয়া সম্ভব?" তখন লালমোহন বলেন যে ইংলণ্ডবাসীর পক্ষে ভারতবাসীকে তাহাদের প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত করা অসম্ভব। পরে একদিন গ্রীন্‌উইচের এক প্রকাশ্য বক্তৃতা স্থলে তাঁহার জনৈক বন্ধু তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যান। সেই বন্ধুটি যেখানকার সমিতির সেক্রেটরির নিকট লালমোহনের অসাধারণ বক্তৃতাশক্তির কথা উল্লেখ করেন। এই কথা শুনিয়া তিনি লালমোহনকে ১০ মিনিটকাল বক্তৃতা করিবার জন্য অনুরোধ করেন। সেই দশমিনিট সময়ের মধ্যে লালমোহন এরূপ বাগ্মিতার পরিচয় প্রদান করেন, যে গ্রীন্‌উইচ বাসীগণ মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে তাহাদের প্রতি-

নিধিস্বরূপ পার্লামেণ্টের সভ্য হইবার জন্য অনুরোধ করেন। এই ঘটনার পর ব্রাইট্ সাহেব তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—"মিষ্টার ঘোষ, আমি আজ প্রাতে যখন এ সংবাদ সংবাদপত্রে দেখিলাম তখন যেন নিজের চক্ষুকে বিশ্বাস করিতে পারিলাম না। তোমার বক্তৃতার কি মোহিনী শক্তি, যে অজ্ঞ ব্রিটিশ প্রজাগণ কৃষ্ণাঙ্গ বিদেশীর প্রতি বিদ্বেষ বিস্মৃত হইয়া তোমাকে তাহাদিগের প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত করিবার জন্য ব্যগ্র হইল। ভারতবাসীর নিকট পার্লামেণ্টের দ্বার মুক্ত করিবার জন্য তোমার নাম চিরস্মরণীয় থাকিবে।" দুর্ভাগ্যবশতঃ নানা কারণে তাঁহার পার্লামেণ্টে প্রবেশলাভ ঘটিল না, কারণ হোম্ রুল (Home rule) আন্দোলন লইয়া ইংলণ্ডে উদারনৈতিকগণের প্রভাব সে সময়ে বড়ই ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু তৎসত্ত্বেও তিনি যদি ডেপ্টফোর্ড ত্যাগ করিয়া বারমিংহামে যাইতেন তাহা হইলে তাঁহার পার্লামেণ্টে প্রবেশ করা অসম্ভব হইত না। কিন্তু একবার ডেপ্টফোর্ডের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া নিজ স্বার্থের জন্য বারমিংহামে যাইতে তিনি অস্বীকার করিলেন। উপর্য্যুপরি দুইবার তিনি ডেপ্টফোর্ডে পরাজিত হন। কিন্তু ভোটের সংখ্যার হিসাবে পরাজিত হইলেও, অন্য হিসাবে তিনিই জয়ী হইয়াছিলেন সন্দেহ নাই। গ্ল্যাড্ষ্টোন সাহেব তাঁহাকে লইয়া যাইবার জন্য আপন গাড়ী পাঠাইতেন। এ স্নেহ ও সম্মান ইংলণ্ডে আর কখনও কেহ লাভ করিতে সক্ষম হয় নাই। সহস্র সহস্র ইংরাজ ঘোড়া খুলিয়া আপনারা তাঁহার গাড়ী টানিয়া লইয়া যাইতেন। ইহা কৃষ্ণাঙ্গ ভারতবাসীর পক্ষে অল্প সম্মানের পরিচায়ক নহে। তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী এভেলিন (Evelyn) সাহেব জয়ী হইলেও লালমোহনের জয়বার্ত্তা ঘোষিত করিয়া পার্লামেণ্ট ত্যাগ করেন। পার্লমেণ্ট প্রবেশের কিছু দিন পরে তিনি বলেন—"গত নির্ব্বাচনে একজন আশ্চর্য্য শক্তি ও প্রতিভাশালী পুরুষ আমার প্রতিদ্বন্দ্বীস্বরূপ ছিলেন। তিনি বলিতেন আয়র্লাণ্ডে স্বায়ত্তশাসন প্রদান বা প্রজাপীড়ন করা এই দুইয়ের মধ্যে মধ্যপথ কিছুই নাই। আমি কিন্তু আমার প্রদেশবাসীকে বুঝাইয়াছিলাম যে এরূপ মধ্যপথ যথার্থই আছে। এক্ষণে রাজমন্ত্রীগণের ব্যবহারের দ্বারা আমি বুঝিতেছি যে আমার পরাজিত প্রতিদ্বন্দ্বীর কথাই সত্য—আমার কথাই মিথ্যা! এরূপস্থলে আমি আর বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্টকে সমর্থন করিতে অক্ষম।"

ভারতে প্রত্যাগত হইয়া তিনি কলিকাতা হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারি আরম্ভ করেন। তিনি ফিরিয়া আসিলে একজন বিচারপতি নাকি বলিয়াছিলেন—"পার্লামেণ্ট যাহা হারাইল, বিচারালয় তাহা লাভ করিল। অল্পের মধ্যে মনোগ্রাহী করিয়া অভিযোগ উপস্থিত করিতে, তাঁহার সমকক্ষ খুব অল্প লোকই আছেন। তাঁহার প্রবল ও তীব্র যুক্তি শ্রবণ করিতেও সুখ হয়।" ব্যবসাতে তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠ মনোমোহনের ন্যায় দয়ালু ও পরোপকারী ছিলেন। অনেক সময়ে অনেক দরিদ্র ব্যক্তিকে গৃহে স্থান দিয়া খাওয়াইয়া বিনা মূল্যে তাহার মকদ্দমা করিয়া দিতেন।

বন্ধুদের নিকট লালমোহন অমায়িক ও কৌতুকপ্রিয় ছিলেন। তাঁহার গল্প করিবার একটি বিশেষ শক্তি ছিল।

সাহিত্য চর্চ্চাই তাঁহার—জীবনের একমাত্র সুখ ছিল। কিছু দিন হইতে তিনি মেঘনাদ বধের ইংরাজি অনুবাদ করিতেছিলেন। পূর্ব্বে একবার মেঘনাদ বধের অনুবাদ করেন। কিন্তু তাঁহার এক ভৃত্য তাহা হারাইয়া ফেলায় তিনি পুনরায় তাহার অনুবাদ আরম্ভ করেন। নেপোলিয়নের জীবন চরিত শেষ করিবার পূর্ব্বেই তিনি রোগাক্রান্ত হইলেন। রোগ-শয্যায় শায়িত অবস্থাতেও সাহিত্য চর্চ্চা ত্যাগ করেন নাই। মৃত্যুর দুই সপ্তাহ পূর্ব্বেও তিনি তাঁহার কন্যাদিগকে মিল্টনের Paradise Lost পড়িয়া শুনাইতেন। পাঠের সময় যদি কেহ জিজ্ঞাসা করিতেন তিনি কেমন আছেন, তিনি বলিয়া উঠিতেন "এখন ও সব কথা থাক, পড়ার সময় বাজে কথা কহিও না।" পত্নীর মৃত্যুর পর কন্যাদিগকে এতাদৃশ স্নেহ ও যত্ন করিতেন যে তাঁহারা একদিনের জন্যও স্নেহময়ী মাতার অভাব জানিতে পারেন নাই।

লালমোহনের পুত্র ছিল না। তাঁহার দুইটি কন্যা। জ্যেষ্ঠাটি অবিবাহিতা, কনিষ্ঠটি ডাক্তার শরৎকুমার মল্লিকের পত্নী। ছবিতে তাঁহার নিকট তাঁহার দৌহিত্রীটি রহিয়াছে।

বিদায়-পূর্ব্বে।

"বিদায়!" যখন বল্‌তে হবে
তখন না হয় কেঁদো,
তখন না-হয় বাহুলতায়
কণ্ঠ আমার বেঁধো!
তার আগেতে হেসে হেসে
থেকো আমার কাছটী ঘেঁষে;
এটা-সেটা হাতের কাছে
এগিয়ে দিয়ো, বধু!
"তবে আসি?"— বল্‌ব যখন
তখন কেঁদো শুধু।

২

মনের দুঃখে সারাদিনটা
উস্কু-খুস্কু চুলে
ঘুরোনাক সজল চোখে
সকল যাব ভুলে!
মোট্‌-মাট্‌ সব গুছিয়ে যখন
সাজ-গোজটী করে,—
ঢুকবো তোমার কুঞ্জগৃহে
—তোমার ছোট ঘরে;
দেবতার ফুল, আঁচল থেকে
ছুঁইয়ে যখন দেবে রেখে,
দেবে যখন বিদায়-চুমো
গলা জড়িয়ে ধরে!
কাঁদতে হয়ত কাঁদব তখন
দুজনে প্রাণ ভরে।

শ্রীগোলোকবিহারী মুখোপাধ্যায়।

অতিথি।

শরতে আজ কোন্ অতিথি
এল প্রাণের দ্বারে।
আনন্দগান গা'রে হৃদয়
আনন্দগান গা'রে!
নীলাকাশের নীরব কথা,
শিশির-ভেজা ব্যাকুলতা,
বেজে উঠুক আজি তোমার
বীণার তারে তারে।
শস্যক্ষেতের সোনার গানে
যোগ দে রে আজ সমান তানে,
ভাসিয়ে দে সুর ভরা নদীর
অমল জলধারে।
যে এসেছে তাহার মুখে
দেখ্‌রে চেয়ে গভীর সুখে,
দুয়ার খুলে তাহার সাথে
বাহির হয়ে যা'রে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সমালোচনা।

গুরুগোবিন্দ সিংহ।—শ্রীবসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। ঘোষ প্রেসে মুদ্রিত ও গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ।৵৹ মাত্র। গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া আমরা সুখী হইয়াছি। অল্পের ভিতর, গোবিন্দের জীবনের অনেক জ্ঞাতব্য কথাই গ্রন্থমধ্যে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, অথচ কোথাও সুদীর্ঘ টীকা-টিপ্পনীর বিভীষিকা নাই। বালকগণের উপযোগী সহজ ও সরল ভাষায় লিখিত এই ক্ষুদ্র জীবনীগ্রন্থখানি বিশেষ হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে।

বিদ্যাসাগর।—শ্রীচণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। তৃতীয় সংস্করণ। ইণ্ডিয়ান্ প্রেস, এলাহাবাদ। ১৯০৯। মূল্য ৩৲ টাকা মাত্র। প্রকাশক, ইণ্ডিয়ান্ পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা। বর্ত্তমান গ্রন্থখানির তৃতীয় সংস্করণ দেখিয়া আমরা প্রকৃতই আনন্দিত হইয়াছি। এমন উপাদেয় গ্রন্থ বাঙলা সাহিত্যে বিরল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। চারিদিকে বিপুল স্বার্থের আবর্ত্তে পড়িয়া বাঙালীর হৃদয় পঙ্কিল হইয়া পড়িতেছে, শ্রদ্ধাহীনতার বিষে বাঙালী যুবকের

হৃদয় জর্জ্জরিত হইয়া উঠিতেছে, দেশের এই দুর্দ্দিনে, বিদ্যাসাগরের ন্যায় অদ্বিতীয় কর্ম্মবীরের জীবনী বাঙালীর হৃদয়ে সঞ্জীবনী ঔষধির কার্য্য করিবে। বর্ত্তমান জীবনীগ্রন্থে, গ্রন্থকার যে পদ্ধতি অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাতে পাঠকের সমক্ষে বিদ্যাসাগরকে বিবিধ বিষয়ে দেখাইবার বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। বিদ্যালয়, কর্ম্মক্ষেত্র, বাঙলা সাহিত্য, স্ত্রীশিক্ষা, সমাজসংস্কার, জ্ঞান ও শিক্ষাবিস্তার কার্য্য, পারিবারিক ও সামাজিক জীবন এবং লোকসেবা প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে বিদ্যাসাগরের সার্ব্বজনীন প্রতিভা কিরূপ বিকাশলাভ করিয়াছে, সাধারণের হিতার্থে বিদ্যাসাগরের দুঃখকাতর হৃদয়খানি কিরূপ উন্মুখ ছিল, গ্রন্থখানি পাঠ করিলে তাহার বিশদ আভাষ পাওয়া যায়। গ্রন্থখানি মনোজ্ঞ হইয়াছে। গ্রন্থের ছাপা বাঁধাই প্রভৃতি বিশেষ চিত্তাকর্ষক—যে কোন উৎকৃষ্ট ইংরাজী গ্রন্থের ছাপা-বাঁধাইয়ের অপেক্ষা কোন অংশে হীন নহে, এ কথাটুকু আমরা অকুণ্ঠিত চিত্তে বলিতে পারি।

গাথা।—(কবিতাপুস্তক) শ্রীঅবিনাশচন্দ্র দাস এম, এ, বি, এল প্রণীত। কলিকাতা, সংস্কৃতপ্রেস ডিপজিটারী হইতে প্রকাশিত। ১৯০৯। স্বদেশ প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য বার আনা। দুঃখের সহিত স্বীকার করিতে হইতেছে, কবিতাগুলি পাঠ করিয়া আমরা সন্তোষলাভ করিতে পারিলাম না। কবিতাগুলি নিতান্তই শিক্ষানবিশি রচনা! "কু-তন্ত্রী" ভিন্ন অন্য কোন কবিতাতেই কিছুমাত্র বিশেষত্ব নাই! ভাব ও ভাষা-বৈচিত্র্যেরও একান্ত অভাব!

সরল পূর্ত্তশিক্ষা।—প্রথম ভাগ। মূল্য ১৷৷০ টাকা। দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ ভাগ (একত্রে) মূল্য ১৷৷০ টাকা। শ্রীকুঞ্জবিহারী চৌধুরী, এল, সি, ই প্রণীত। ভবানীপুর পার্থিব যন্ত্রে মুদ্রিত। তৃতীয় সংস্করণ। গ্রন্থকার অবসরপ্রাপ্ত পাবলিক ওয়ার্কস্ বিভাগের ইঞ্জিনিয়ার। তাঁহার চতুর্ব্বিংশতি বৎসরের অভিজ্ঞতার ফলে, এই গ্রন্থখানি বাঙলা সাহিত্যের একটি গুরুতর অভাব মোচন করিয়াছে! গ্রন্থগুলিতে এমন সরলভাবে গৃহনির্ম্মাণ, রাস্তা নির্ম্মাণ, ইষ্টক তৈয়ারী, ও তাহার গুণাগুণ পরীক্ষা, সুরকি, চূণ, বালি, সিমেণ্ট, প্রভৃতি মালমসলা, রং বার্ণিস প্রভৃতি বিশেষ প্রয়োজনীয় কথার অবতারণা করা হইয়াছে যে, গ্রন্থখানি শুধু ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার্থী কেন, সাধারণ গৃহস্থের পক্ষেও বিশেষ উপযোগী ও উপাদেয় হইয়াছে। বিষয়বোধের সুবিধাকল্পে বিবিধ চিত্রেরও সমাবেশ হইয়াছে। গ্রন্থখানি বহু সর্ভে স্কুল ও টেকনিক্যাল স্কুলের পাঠ্যস্বরূপ গৃহীত হইয়াছে। ইহা গৃহে থাকিলে কণ্ট্রাক্টর বা রাজমিস্ত্রীর অনুগ্রহের উপরই, আপনাকে অকারণ অসহায় ভাবে নিক্ষেপ করিতে হইবে না এবং তাহাদিগের কার্য্যাদির গুণাগুণ সহজেই গৃহস্থের চক্ষে ধরা পড়িয়া যাইবে।

বালিকা-নীতি।—শ্রীমতী সৈরিন্ধ্রীবালা ঘোষ প্রণীত। প্রকাশক, আশুতোষ লাইব্রেরী, ঢাকা। ঢাকা, আশুতোষ যন্ত্রে মুদ্রিত। ১৩১৫। মূল্য তিন আনা। অবিবাহিতা বালিকাগণকে নীতিবিষয়ে মোটামুটি শিক্ষা দিবার অভিপ্রায়ে এই পুস্তিকাখানি লিখিত হইয়াছে। লেখিকার ভাষাটুকু মন্দ নহে, তবে বক্তব্যটুকু তেমন পরিস্ফুট হয় নাই। লেখিকা ভালো করিয়া সকল কথা বুঝাইতে পারেন নাই।

ঋদ্ধি।—বা শ্রীবৃদ্ধি ও সমুন্নতি। শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস প্রণীত। প্রকাশক, শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা। কান্তিক প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য ১৷০ মাত্র। গ্রন্থকার বলেন, 'সঞ্চিত ধন বৃদ্ধি করিবার উপায়' ও 'সামান্য আয়ে কিরূপে গুছাইয়া সংসার করা যাইতে পারে', 'ঋদ্ধিতে, তাহার আভাষ' পাওয়া যাইবে। তবে 'ঋদ্ধি কাহাকেও রাতারাতি বড়মানুষ করিতে পারিবে না।' এই শ্রেণীর গ্রন্থ যত অধিক প্রকাশিত হয়, ততই দেশের মঙ্গল। বালকগণের পাঠ্য হিসাবে রচিত হইলেও গ্রন্থখানি সংসারী ব্যক্তি মাত্রেরই পাঠ করা কর্ত্তব্য। গ্রন্থের ভাষা বেশ সহজ, সরল ও অনাড়ম্বর। 'ঋদ্ধি'র কয়েকটি মোটামুটি কথা কার্ড-বোর্ডে লিখিয়া বসিবার ঘরে প্রত্যেকের ঝুলাইয়া রাখা উচিত। "কষ্টসহিষ্ণু না হইলে কেহ মিতব্যয়ী হইতে পারে না।" "মুহূর্ত্তের সদ্ব্যবহার কর!"

"ঋণ করিও না।" "যত্র আয় তত্র ব্যয় করিও না।" "সংসারে বাজে খরচ রহিত করা গৃহিণীর প্রধান কর্ত্তব্য।" এই ঘোর বিলাসিতা ও অলসতার দিনে অনর্থক বাজে খরচে, বাঙালীর কড়াক্রান্তিটি অবধি যে জলে যাইতেছে, তাহা কয়জনে বুঝিয়া চলেন। ছেলেমেয়ের বিবাহে অনর্থক জাঁকজমকের কথা ছাড়িয়া দিলেও, বিলাসী বাবুদের চুরুটের ছাইয়ের সহিত কত পয়সা যে ছাই হইয়া যাইতেছে, সে সকল রোধ করিবার কি উপায় নাই? ঋদ্ধি সকলকে সচেতন করিয়া দিবে। হায়, অন্ধ অজ্ঞানের মত এই বাজে খরচের বন্যায়, কত সংসার আজ উৎসন্ন যাইতেছে, কে তাহার সংখ্যা করিবে। "ঋদ্ধিতে" চিন্তাশীল গ্রন্থকার সমাজের এই দারুণ ক্ষত জাজ্জ্বল্য ভাবে দেখাইয়া দিয়াছেন এবং তাহার আশু প্রতিকারের ঔষধও নির্দ্দেশ করিয়াছেন। গ্রন্থখানির ছাপা কাগজ ও বাঁধাইটিও পরিপাটি হইয়াছে।

চয়নিকা।—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এলাহাবাদ, ইণ্ডিয়ান প্রেসে মুদ্রিত। কলিকাতা, ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস্, প্রকাশক, শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বি, এ। মূল্য চারি টাকা মাত্র। রবিবাবুর কবিতার নূতন করিয়া পরিচয় দিতে যাওয়া বাতুলতা। সহস্র নিন্দুকের নিন্দার কালি তাঁহার কবিতার যশঃ-শুভ্রতা হরণ করিতে পারে না, এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে। রবিবাবুর সমগ্র কবিতার মধ্য হইতে কতকগুলি উৎকৃষ্ট করিয়া চয়ন করিয়া,'চয়নিকা' বাহির হইয়াছে। এই গ্রন্থে প্রথমেই রবিবাবুর আধুনিক সময়ের একখানি ছবি ও পরে কবিতার বিষয় লইয়া সাতখানি আরো সুন্দর ছবি আছে। রবিবাবুর সমস্ত কবিতা পড়িবার সুযোগ, যাঁহাদের হইয়া উঠে না,—তাঁহাদিগের নিকট 'চয়নিকা' বিশিষ্ট আদর পাইবে। গ্রন্থের ছাপা ও বাঁধাই এমন চমৎকার হইয়াছে যে বাঙলা কোন বই ইহার তুল্য নয়। 'চয়নিকা'র সংস্করণটি সাহিত্য-রসজ্ঞের পক্ষে বিশেষ লোভনীয় হইয়াছে।

হোমিও গাথা। শ্রীকুলচন্দ্র দে প্রণীত। কুন্তলীন প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য এক টাকা। সূচনাতে লেখক বলিতেছেন, "চিকিৎসা শাস্ত্র নিতান্ত নীরস ও জটিল বলিয়া আমাদের লক্ষ্মীরা পারত পক্ষে উহা পড়িতে চাহেন না।" 'তাই, কলকণ্ঠের আবৃত্তি-কল্পে' 'কবিতায়, হোমিও পুঁথি' রচিত হইয়াছে। গৃহস্থের উপযোগী অনেক জ্ঞাতব্য কথার সমাবেশে, রোগের লক্ষণ নির্দ্দেশ, পথ্য প্রভৃতির সহজ অবতারণায় হোমিও-গাথা উপাদেয় হইয়াছে। তবে গ্রন্থের মূল্য, আমাদিগের মতে, আর একটু কমাইয়া দিলে, 'হোমিও-গাথা' সাধারণ গৃহস্থের পক্ষে একটু সুপ্রাপ্য হয়।

নারায়ণী। উপন্যাস। শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম, এ, প্রণীত। কলিকাতা, ২০১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য দেড় টাকা। সাহিত্য-যন্ত্রে মুদ্রিত। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে নারায়ণী'র প্রথমাংশ যখন 'ভারতী' পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল, তখন পাঠক-পাঠিকা ইহা পাঠে রীতিমত তৃপ্তিলাভ করিয়াছিলেন। তাহার পর, দ্বিগুণ বর্দ্ধিত, স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে 'নারায়ণী' প্রকাশিত হইয়াছে। 'নারায়ণীর' ভাষাটি এমনি সহজ, অনাড়ম্বর যে, তাহা নিমেষেই হৃদয়গ্রাহী হইয়া উঠে। ব্রাহ্মণ রতনের তেজস্বিতা, সদাশিবের আদর্শ গুরুভক্তি, তুলসীর নিঃস্বার্থ পতিপ্রেম, ব্রাউন সাহেবের সহানুভূতি সকলই বেশ সুন্দর ফুটিয়াছে। অনেকগুলি আদর্শ চরিত্রের আলোক-রেখায় 'নারায়ণী'র পৃষ্ঠা উজ্জ্বল, অথচ সে ঔজ্জ্বল্যে বাড়াবাড়ি নাই, তাহা বেশ স্নিগ্ধ, মনোরম। গ্রন্থকারের আর একটি অসাধারণ ক্ষমতা, প্রথম পৃষ্ঠা হইতেই যে কৌতূহলটি তিনি পাঠকের মনে জাগাইয়া তুলিয়াছেন, সুদীর্ঘ ৩৪৪ পৃষ্ঠা ব্যাপিয়া, সে কৌতূহলের মাত্রাটুকু সমভাবেই তিনি রক্ষা করিয়াছেন। উপন্যাসখানি একবার পাঠ করিতে আরম্ভ করিলে শেষ না করিয়া থাকা যায় না। অধিকাংশ আধুনিক বাঙলা উপন্যাসে এই গুণটির একান্ত অভাব।

পৌরাণিক কথা। শ্রীপূর্ণেন্দুনারায়ণ সিংহ,

এম, এ, বি, এল প্রণীত। থিওসফিক্যাল সোসাইটি হইতে শ্রীঅঘোরনাথ দত্ত কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ১॥০ টাকা। ৪৩ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, লোটাস লাইব্রেরীতে প্রাপ্তব্য। এই গ্রন্থে, ভরত, ধ্রুব, রামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, ও বিবিধ পৌরাণিক কাহিনীর ব্যাখ্যা সহজ ও সরল ভাষায় বিবৃত হইয়াছে। গ্রন্থকার হিন্দুধর্ম্মের বহু জটিল তথ্যের মীমাংসা করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। ভাগবতগ্রন্থ-পাঠকের নিকট ইহা একখানি টীকার কার্য্য করিবে বলিয়া মনে হয়। 'রাসপঞ্চাধ্যায়' অধ্যায়টুকু এখনো কিন্তু জটিল রহিয়া গিয়াছে। আশা করি, দ্বিতীয় সংস্করণে গ্রন্থকার সেগুলির আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা স্ফুটতর করিয়া পাঠকের সম্মুখে ধরিবেন। রূপক ব্যাখ্যার দিক দিয়া না গিয়া, বৈষ্ণব কবির ভাবের অনুসরণ করিয়াই, গ্রন্থকার কাহিনী-গুলির আলোচনা করিয়াছেন। গ্রন্থের ভাষা বেশ মধুর ও চিত্তাকর্ষক হইয়াছে।

রামায়ণ। সচিত্র কৃত্তিবাস রচিত সপ্তকাণ্ড রামায়ণ। শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত ও প্রকাশিত। কুন্তলীন প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য দুই টাকা মাত্র। সম্পাদক বিজ্ঞাপনে বলিয়াছেন,"বটতলার ছাপা কৃত্তি-বাসী যথাসাধ্য সংশোধনপূর্ব্বক ভদ্রপরিবারে পাঠের যোগ্য করিয়া এই সংস্করণ মুদ্রিত করিলাম। ভদ্রগৃহে সম্পূর্ণ অপাঠ্য সামান্য দুই একটি অংশ ব্যতীত আমি এই সংস্করণে বটতলার মুদ্রিত পুঁথি হইতে আর কিছু বাদ দিই নাই।" সম্প্রতি আরো দুই একখানি রামায়ণের ভদ্র সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। তন্মধ্যে রামানন্দ বাবুর সম্পাদিত রামায়ণখানি উৎকৃষ্ট হইয়াছে বলিয়া আমাদিগের ধারণা। রামানন্দ বাবু স্বীয় ক্ষমতা প্রদর্শন মানসে কৃত্তিবাসের সরল রচনার উপর ষ্টীলের কলম চালান নাই, এই টুকুই তাঁহার সংস্করণ খানির আরো বিশেষত্ব সম্পাদন করিয়াছে। গ্রন্থের ছাপা, বাঁধাই, কাগজ প্রভৃতিও প্রথম শ্রেণীর হইয়াছে। লব্ধপ্রতিষ্ঠ চিত্রশিল্পীগণের অঙ্কিত ৪৩ খানি বিবিধ বর্ণে রঞ্জিত চিত্রে গ্রন্থের সৌষ্ঠব সহস্রগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছে। বিভিন্ন চিত্রের সমাবেশে রামানন্দবাবু প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য চিত্র-প্রথার বিশেষত্ব ও পার্থক্য তুলনা করিবার পক্ষে পাঠককে পর্য্যাপ্ত অবসর দান করিয়াছেন। মুক্তকুন্তলধারিণী কেশতৈলের বিজ্ঞাপন শোভাবর্দ্ধিনী উপেন্দ্রকিশোর বাবুর অঙ্কিতা বিলাতী নায়িকা 'সীতা'র পার্শ্বে, অবনীন্দ্রবাবু ও শ্রীমান্ অসিতকুমারের প্রাচ্য সীতা, পাশ্চাত্য কলানুযায়ী অঙ্কিত, যাত্রার 'নারদে'র পার্শ্বে, সুরেন্দ্রনাথের প্রাচ্য কলানুযায়ী অঙ্কিত 'নারদ' মূর্ত্তি কি সজীব, ও স্নিগ্ধকর! 'রামায়ণের' চিত্র হইতেই, পাশ্চাত্য চিত্রমুগ্ধ পাঠকের নয়ন প্রাচ্য চিত্রের স্নিগ্ধ মাধুর্য্যটুকু অনায়াসে ধরিতে পারিবেন, তাহা বুঝিবার জন্ম, বোধ হয়, আর দীর্ঘ পুঁথি ঘাঁটিবার প্রয়োজন হইবে না। চিত্র প্রভৃতির তুলনায় এই গ্রন্থখানির মূল্য একান্ত সুলভ বলিয়াই মনে হয় এবং রামানন্দ বাবু সাধারণ বাঙালীর পক্ষেও রামায়ণ খানি সহজ প্রাপ্য করিয়া দিয়া, সমগ্র দেশের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন, সন্দেহ নাই।

সাবিত্রী। শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দাসগুপ্ত বি, এ, প্রণীত। প্রকাশক কে, ভি, সেন, এণ্ড ব্রাদার্স। লক্ষ্মীবিলাস প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য ছয় আনা। সাবিত্রীর উপাখ্যান সরল রূপকথার ভাষায় বিবৃত হইয়াছে। ইহাতে ছয় খানি রঙিন ছবি আছে। ছোট ছেলে মেয়েদের পক্ষে বইখানি বেশ উপযোগী হইয়াছে। সকল ছবির পরিকল্পনা কিন্তু আমাদের তেমন ভালো লাগিল না।

শ্রীসত্যব্রত শর্ম্মা।

রাখীবন্ধনে।

প্রভাতী—একতালা।

কি আলোক জ্যোতি আঁধার মাঝারে, কি পুলকে প্রাণ ছায়।
ফুটিল এ না কি অন্ধ নয়ন—সমুখে নেহারি কায়।
আপনায় মায়ে পেয়েছি দেখিতে, চিনিয়াছি ভাই বোন,
আর রহিব না দাঁড়াইয়ে দূরে—আজি—মহোৎসব সম্মিলন।
শত হৃদয়ের দলরাশি মিলে একটি পরাণ হোক্
এক হয়ে যাক্ শত হৃদয়ের হরষ বিষাদ শোক!
শত কণ্ঠ তুলে অনন্তের সুরে গাহরে মিলন গান,
অসীম আকাশে উথলি উঠুক বিমল মধুর তান!
স্বরগের শান্তি আনিবে বহিয়ে আকুল সে প্রেম গান,
পবিত্র হইবে মলিন পৃথিবী তৃষিত পাইবে প্রাণ।

শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবী।

॥৬॥ ম১ গ১ গ১ গ১ গর১ স১। গ১ গ১ গ১ র১ স১ ন্১। স১ র১ গ১ গ১
কি আ লো ক জ্যো তি আঁ ধা র মা ঝা রে কি পু ল কে

গ১ মগ১। র১ প১ ম১ গ৩। স১ স১ র১ র প১ প১ প১। প১ মীপধ১ প১ ম১
প্রা ণ ছা — — য় ফু টি ল এ না কি অ — ন্ধ ন

ম১ গমপ১। ম১ গ১ গর১ স১ স১ র১। সর১ গ১ র১ স৩ ॥ ম১ ম১ ম১ ম১
য় ন স মু খে নে হা রি কা — — য়, আ প নার মা

গমপ১। প১ প১ প১ প১ প১ প১। প১ ধো১ ধো১ র্স১ র্স১ নর্সর১। ন১ র্স১ ন১
য়ে পে য়ে ছি দে খি তে চি নি য়া ছি ভা ই বো — —

ধো২ পধোনো১। নোধো১ ধো১ প১ ম১ ম১ গমপ১। প১ প১ প১ প১ প১
— ন আ প না র মা য়ে পে য়ে ছি দে খি

প১। প১ ধো১ ধো১ ধো১ ধো১ নোধো১। প১ ধোপ১ ম১ প৩। ম১ মগ১
তে চি নি য়া ছি ভা ই বো — — ন আ র

ম১ ধো১ ধো১ ধো১। প১ ধো১ প১ মপ১ ম১ মপ১। মপ১ মগ১ গ১ গর১
র হি ব না দাঁ ড়া ই য়ে দূরে (আজি) ম হোৎ স ব

স১ র১। ম২ গমপ১ ম৩ ॥
স ম্মি ল — ন *

শ্রীমতী সরলা দেবী।

---

* অন্য কলিগুলি ধারাবাহিকক্রমে উপরি উক্তরূপ।

ভারতবর্ষের বীর-রমণী।

ভারতবর্ষের ইতিহাসে বীর-রমণীগণের অনেক কার্য্য বিবরণ জানা যায়। মহারাষ্ট্র জাতিই এই গৌরবে বিশেষরূপে গৌরবান্বিত —মহারাষ্ট্র রমণীগণ শারীরিক এবং মানসিক উভয় বলের জন্যই বিখ্যাত। শুধু যে যুদ্ধ-ক্ষেত্রে নেতৃত্বগ্রহণ করিয়া নারীগণ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন এমন নহে, তাঁহারা অনেক স্থলে সাধারণ পদাতিক এবং অশ্বারোহী সৈনিকদল-ভুক্ত হইয়া যুদ্ধ করিয়াছেন। অষ্টাদশ শতাব্দির শেষ এবং উনবিংশ শতাব্দির প্রারম্ভকাল পর্য্যন্ত হাইদ্রাবাদের নিজাম মহোদয়ের দুই সহস্র স্ত্রী-সেনা ছিল। ইহারা আরবব-ংশ-সম্ভূতা, ইহাদিগকে নিয়মিত যুদ্ধ বিদ্যা শিখিতে এবং অভ্যাস করিতে হইত, অন্তঃপুরের চতুষ্পার্শে প্রহরীর কার্য্য করা এবং পুরমহিলারা যখন একস্থান হইতে অন্যত্র যাইতেন, তখন তাঁহাদিগকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষার ভার ইহাদিগকেই গ্রহণ করিতে হইত। ১৭৯৫ শালে মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত যুদ্ধের সময় কার্ডলা যুদ্ধক্ষেত্রে ইহারা অম্বা-বারণ এবং অম্বা চামবিবির অধীনে যুদ্ধ করিয়াছিল এবং পুরুষ সৈনিকদিগের অপেক্ষা কোন রূপেই হীনতার পরিচয় দেয় নাই। সিপাহী-দিগের ন্যায় বেশপরিধান করিয়া স্কন্ধে বন্দুক বহন করিয়াছিল এবং ১৮১৫ সালের রাজকীয়-কার্য্য বিবরণ হইতে জানা যায় যে, ইহারা ফরাসী-যুদ্ধ-কৌশল পরীক্ষায় নিপুণতার পরিচয় দিয়াছিল। হাইদ্রাবাদের এই স্ত্রী-সেনা-সমাজের নাম জাফর পল্টন্ অর্থাৎ 'বিজয়িনী' সেনা।

সমরু বেগম। বিখ্যাত বীর-রমণী-গণের মধ্যে সমরু বেগম বিশেষরূপে প্রতিপত্তি লাভ করিয়া ছিলেন—স্লীমান-সাহেব ইঁহার জীবনের যে সকল ঘটনাবলি বর্ণন করিয়াছেন তাহা উপন্যাসের অপেক্ষাও মনোরম। সিন্ধিয়া রাজের সহিত যুদ্ধে তাঁহার স্বামীর মৃত্যু হয়, তখন তিনি স্বয়ং সৈন্য চালনার ভারগ্রহণ করিয়া, বিপক্ষের অবরুদ্ধ দুর্গ-প্রাচীরের ভগ্ন অংশে প্রথম আরোহণ করিয়া-ছিলেন। তাঁহার এই অসাধারণ সাহস ও বীর্য্য দেখিয়া সিন্ধিয়ারাজ চমৎকৃত ও মুগ্ধ হইয়া-ছিলেন। দ্বিতীয়বার তিনি সমরু নামক এক ব্যক্তিকে বিবাহ করেন, এই নাম হইতেই এই বীর রমণীর নাম সমরু বেগম। এই নির্দ্দয় পাষণ্ড পাটনার সমুদয় ইউরোপীয়দিগকে একত্রে বধ করিয়াছিল। হরিয়ানা রাজ্য সংস্থাপয়িতা প্রসিদ্ধ নাবিক জর্জ্জ টমাস এক সময়ে এই বীর রমণীর অধীনে ভৃত্য ছিলেন। ১৮০৩ সালের যুদ্ধে জেনারেল ওয়েলেস্‌লি বেগম সাহেবের সৈন্যবল ধ্বংস করেন। তখন তিনি নিরুপায় হইয়া জেনেরাল লেকের নিকট আত্মসমর্পণ করিলেন। জেনারেল মহোদয় তাঁহাকে পিতার ন্যায় স্নেহ এবং সমাদরে গ্রহণ করেন। ইহার পর বেগম সাহেব আমৃত্যু অতি বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত তাঁহার জমীদারী সার্দ্ধনায় বাস করিয়াছিলেন।

মহারাষ্ট্র-বীর-রমণী। শুনিতে পাওয়া যায় পিণ্ডারী দল যখন গ্রামে গ্রামে অত্যাচার ও লুণ্ঠন করিয়া ফিরিত তখন তাহাদের স্ত্রীগণও কখনো অশ্বে, কখনো বা

উষ্ট্রে আরোহণ করিয়া তাহাদের সঙ্গী হইত এবং নিষ্ঠুরকার্য্যে শুধু সহায় কেন অনেক সময় প্রধান হইয়া দাঁড়াইত। ১৮১৭ সালে মহারাষ্ট্র যুদ্ধে অনেকগুলি নারী রাজসভা এবং যুদ্ধক্ষেত্র উভয় স্থানটিরই নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়া ছিলেন। ইহার মধ্যে নাবালক মহ্লাররাও হোলকারের অভিভাবিকা এবং রাজ্যশাসনকর্ত্রী তুলসীবাই একজন। ইনি মৃত যশোবন্ত রাও হোলকারের প্রেয়সী ভার্য্যা ছিলেন—ইহার পুরুষোচিত পরুষগুণ অনেক পরিমাণে ছিল। ১৮১৮ সালের ডিসেম্বর মাসে ইনি যখন সমুদায় সৈন্যবল লইয়া মেহিদপুরে যুদ্ধক্ষেত্রে পটবাসে অবস্থিতি করিতেছিলেন তখন জেনারেল টমাস হিস্লপের অধীনে ব্রিটিশ সৈন্য ইঁহার বিরুদ্ধে অগ্রসর হইতেছিল। সারজন ম্যালকম ব্রিটিশ পক্ষ হইতে সন্ধির প্রস্তাব লইয়া ইঁহার নিকট আসেন; তুলসীবাই তাহাতে অসম্মত ছিলেন না। কিন্তু এই সন্ধির প্রস্তাবে মহারাষ্ট্রীয়দিগের মধ্যে বিরোধের সৃষ্টি করিল, একদল সন্ধি এবং অন্যদল যুদ্ধের পক্ষপাতী হইল,—অবশেষে যুদ্ধ পক্ষীয়েরা একদিন রাত্রে তুলসী বাইকে ধরিয়া লইয়া গিয়া শিপ্রা নদী তীরে হত্যা করিল, তখন যুদ্ধ ভিন্ন উপায়ান্তর রহিল না। মেহিদপুরে যে যুদ্ধ হইল তাহাতে মহারাষ্ট্রীয় সৈন্যদল সম্পূর্ণ পরাজিত হইল—এবং যাহারা প্রাণে বাঁচিল তাহারা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল এই বিক্ষিপ্ত দলকে একত্র করিয়া মৃত যশোবন্ত রাওয়ের বিংশতি বর্ষীয়া কন্যা ভীমাবাই তাহাদের নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন। তিনি পুরুষবেশে কটিতে তরবারি বাঁধিয়া মুক্ত খড়্গহস্তে অশ্বপৃষ্ঠে সৈন্য চালনা করিতেন। হোলকার যখন সন্ধি করিলেন তখন তিনি তাহার বিরোধী না হইয়া স্বয়ং স্যার উইলিয়াম গ্রাণ্টের নিকট আত্মসমর্পণ করিলেন।

ঝান্সীর রাণী লক্ষ্মীবাই। সমগ্র বীর-রমণী সমাজের মধ্যে ঝান্সীর রাণী লক্ষ্মীবাই সর্ব্বাগ্রগণ্যা। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে উত্তরাধিকারীর অভাবে ঝান্সী রাজ্য ইংরাজ সরকার ভুক্ত করা হয়। মৃত গঙ্গাধর রাও হোলকারের পত্নী লক্ষ্মীবাই এই অনধিকার চর্চ্চার বিরুদ্ধে অনেক প্রতিবাদ করেন। কিন্তু তাঁহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া তাঁহাকে পোষ্যপুত্র গ্রহণের অনুমতি না দিয়া কেবলমাত্র মাসহারা মঞ্জুর করা হইল। এই অন্যায় বিচারে রাণী সাহেব মনে মনে ব্রিটিশ রাজের দারুণ শত্রু হইয়া রহিলেন এবং ১৮৫৭ সালে যখন সিপাহীগণ বিদ্রোহী হইল তখন তাহাদিগের সহিত যোগ দিতে আর কালবিলম্ব করিলেন না। রাণীজি, রাজ্যভার গ্রহণ করিলে পর স্যার হিউরোজ ১৮৫৮ সালের বসন্তকালে যখন ঝান্সী দুর্গ অবরোধ করিলেন লক্ষ্মীবাই অতি দক্ষতার সহিত আত্মরক্ষা করিয়া ছিলেন। অবরোধকারী সৈন্যগণ সর্ব্বদাই দেখিতে পাইত তিনি রাজপ্রসাদের বাহিরে চন্দ্রাতপের নীচে বসিয়া যুদ্ধ ব্যাপারের সকল কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন। ইংরাজগণ ৩রা এপ্রেল সহসা আক্রমণ করিয়া ঝান্সী হস্তগত করেন এবং রাণিসাহেব রাত্রিযোগে স্বল্প সংখ্যক সৈন্য সঙ্গে লইয়া উত্তরাভিমুখে পলায়ন করিতে বাধ্য হইলেন। লেপটেনাণ্ট ডাওকার অশ্বারোহী সৈন্যদল লইয়া তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া ঝান্সী হইতে

দশক্রোশ দূরে ভাণ্ডার নগরে লক্ষ্মীবাইয়ের অকস্মাৎ পলায়নের চিহ্ন দেখিতে পাইলেন; দেখিলেন তাম্বুর মধ্যে তাঁহার অসমাপ্ত খাদ্য পড়িয়া রহিয়াছে। তিনি নগরের অপর পার্শ্বে অগ্রসর হইয়া যুদ্ধে চল্লিশ জন রোহিলাকে হত করিলেন। এবং দেখিতে পাইলেন চারি জনমাত্র সৈনিক লইয়া রাণীজি একটি ধূসর বর্ণের অশ্বে আরোহণ করিয়া অতি দ্রুত পলায়ন করিতেছেন। আর অল্প দূর যাইতে পারিলেই রাণীজিকে বন্দী করিতে পারিতেন কিন্তু তীক্ষ্ণ তরবারির আঘাতে সাঙ্ঘাতিক আহত হইয়া অশ্ব হইতে পড়িয়া যাওয়াতে তিনি আর অগ্রসর হইতে পারিলেন না। লক্ষ্মীবাই পলাইয়া যমুনা তীরে কল্লিনগরে নানা সাহেবের ভ্রাতুষ্পুত্র রাওসাহেবের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া যুদ্ধের নিমিত্ত সহায় প্রার্থনা করিলেন। তান্তিয়া তোপিকে সঙ্গে লইয়া তাহার অধীনস্থ সৈন্যের সাহায্যে কুঞ্চনগরে স্যার হিউ রোজের সহিত যুদ্ধ করেন। যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া পুনরায় কল্লিনগরে ফিরিয়া আসিলেন—সেখানে আর একবার যুদ্ধ হয় কিন্তু এবারেও তাঁহার অদৃষ্টে জয়-গৌরব-লাভ ঘটে নাই। সেই রাত্রিতে দুর্গাভ্যন্তরীন্ তাঁহার শয়ন গৃহে একটি কামানের গোলা পড়িয়া ফাটিয়া যায় এবং সেই আঘাতে দুই জন ভৃত্যের মৃত্যু হয়, অগত্যা আবার তিনি পলায়নে বাধ্য হন। কল্লি হইতে তাঁহারা গোয়ালিয়র যাত্রা করিয়া এবং সিন্ধিয়ার বিদ্রোহী সৈন্যদলের সহিত মিলিত হইয়া স্বীয় অর্থবল এবং সৈন্যবল বর্দ্ধিত করিয়া লইলেন! এখানেও ইংরাজ সৈন্য তাঁহার অনুসরণ করে। জেনারেল স্মিথ স্যার হিউরোজের সহায়তা করিবার জন্য অগ্রসর হইতেছিলেন সেই দলের সহিত রাণীর যুদ্ধ হয়। রাণী লক্ষ্মীবাই ফুলবাগে কামান পরিচালক সৈন্যদিগের নিকট বসিয়া সরবৎ পান করিতে ছিলেন এমন সময় সংবাদ পাওয়া গেল বিজয়ী ইংরাজ সৈন্য অতি সন্নিকট। রাণীজির পরিধানে চুড়িদার পায়জামা লাল-কুর্ত্তা এবং মাথায় পাগড়ি, গলায় একটি বহুমূল্য মুক্তাহার শোভা পাইতেছিল। এইটি বিদ্রোহী সৈন্যগণ সিন্ধিয়া রাজকোষ হইতে লুণ্ঠন করিয়া আনিয়াছিল। সংবাদ পাইবামাত্র তাঁহার পার্শ্ব-চারিণী এবং নিত্যসঙ্গিনী একটি ব্রাহ্মণ কন্যাকে সঙ্গে লইয়া তৎক্ষণাৎ অশ্বারোহণে তিনি পলায়-নের আয়োজন করিলেন ইংরাজ সৈন্য এড়াইয়া যাইবার চেষ্টায় দুর্গপরিখা একলম্ফে পার হইবার জন্য অশ্বচালনা করিলেন, অশ্ব গভীর খাত পার হইতে সাহস করিল না—ইংরাজ ক্রমশই নিকট-বর্ত্তী হইতে লাগিল রাণীজির পার্শ্বদেশে বন্দুকের গুলি এবং মস্তকে তীক্ষ্ণ তরবারির আঘাত লাগিল তবুও তিনি পশ্চাৎপদ হইলেন না, সমানবেগেই অশ্ব ছুটাইয়া চলিলেন। ইহার কিছুক্ষণ পরে অশ্ব হইতে পড়িয়া গেলেন তখন তাঁহাকে পটবাসের ভিতর লইয়া যাওয়া হইল; অল্পক্ষণের মধ্যেই তাঁহার প্রাণ বিয়োগ হয়। মৃত্যুকালে পার্শ্ববর্ত্তী বন্ধুদিগের নিকট তাঁহার সৈন্যদিগের বিশ্বস্ততা ও প্রভুভক্তির জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানা-ইয়া অনুরোধ করিয়াছিলেন যে, তাঁহার অঙ্গের বহুমূল্য অলঙ্কার যেন তাহাদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। মৃত্যুর পর, নিকটবর্ত্তী কোনও উদ্যানে মহাসমারোহে তাঁহার সৎকার করা হইয়াছিল। স্যার হিউরোজ বলেন বিদ্রোহী দিগের মধ্যে ঝান্সীর রাণী লক্ষ্মীবাই শৌর্য্যে বীর্য্যে এবং বুদ্ধি কৌশলে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন।



পেশোয়ারে প্রাপ্ত বুদ্ধদেবের চিতাভস্মাধার



লীলা কমল

শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক অঙ্কিত মূল চিত্র হইতে

৩৩শ বর্ষ] অগ্রহায়ণ, ১৩১৬ [৮ম সংখ্যা

পোংগল উৎসব।

(অপূর্ব্ব মেলার বিবরণ)

দক্ষিণ দেশের পোংগল উৎসব যেমন পুরাতন, তেমনি কৌতুককর ও আমোদপ্রদ। বঙ্গদেশে ভাদ্র মাসে "গোয়ালাষ্টমী" উপলক্ষে গো-সেবা হইয়া থাকে এবং এই মাসে "অরন্ধন" নামে পর্ব্ব দিনে অনেকে পূর্ব্ব দিবসের পাক করা অন্ন ব্যঞ্জনাদি ভক্ষণ করিয়া থাকেন। পোংগল উৎসবে সর্ব্বপ্রথম পশুসেবা হইয়া থাকে। গবাদি পশুর গলদেশে পুষ্পমালার্পণ, গাত্রে বিবিধ রঙের চিত্রাঙ্কন, মুখে নবীন শষ্প ও নানাপ্রকার খাদ্যদ্রব্য দান, তদনন্তর তাহার পূজা প্রভৃতি ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া গেলে পিষ্টক বিতরিত হইয়া থাকে। দক্ষিণাবর্ত্তের তামীল ভাষায় "পোংগল" অর্থে ভাত এবং তাহার উপকরণ বুঝায়। কেবল ভাতের নাম "চোর" এবং চাউলের নাম "আর্শী"। চোর শব্দ বোধ হয় সংস্কৃত চরু শব্দের অপভ্রংশ। ডালের নাম পপ্প্‌। সমুদয় তেলুগু ও তামিল প্রদেশ এবং তৎসহ মহিশূর, ত্রিবাঙ্কুড়, কোচিন প্রভৃতি, বাঙ্গালীর মত ভাত ভোজী। সিংহল, সিঙ্গাপুর, পিনাং, জাপান, শ্যাম প্রভৃতি দেশও অন্ন ভোজনে প্রাণ ধারণ করে, সুতরাং দক্ষিণ দেশে ভাতের একটা বিরাট উৎসব হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। যে দেশের লোকেরা যে প্রকার শস্য খাইয়া প্রাণ ধারণ করে, সে দেশের লোকেরা সেই প্রকার শস্য লইয়া প্রতিবর্ষে একটা উৎসব করে, ইহা প্রায় পৃথিবীর সর্ব্বস্থানেরই একটা রীতি ও নীতি। ইউরোপ ও আসিয়ার অনেক দেশে এইরূপ উৎসব এখনও প্রচলিত আছে।

মাঘের মকর সংক্রান্তি দিনে পোঙ্গল উৎসবের প্রধান পর্ব্ব আরম্ভ হয়, ঐ দিবস দাক্ষিণাত্যে নববর্ষের সূত্রপাত হইয়া থাকে, এই মাসের নাম "তাই"মাস। ইংরাজী জানুয়ারী মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের যে দিনে সূর্য্যদেব উত্তরায়ণে প্রবেশ করেন সে দিনে এই উৎসব আরম্ভ হয়। নববর্ষের প্রথম দিবসে শত্রু, মিত্র, আত্মীয়, কুটুম্ব, বন্ধু, গ্রামবাসী, স্বজাতি প্রভৃতিকে সঙ্গে লইয়া অন্নাদি ভোজন করা এবং ভোজনের পূর্ব্বে ভগবানকে সভক্তি তাহা অর্পণ করা যেমন সুখকর তেমনি আনন্দজনক।* পরস্পর সম্মিলনের ইহা সুন্দর অবসর, এইজন্য এই

* তামিল ভাষায় পোংগল শব্দের তিন অর্থ;—(১) ভাত ও তাহার উপাদান। (২) চাউল হইতে প্রস্তুত ভোজ্য দ্রব্য। (৩) পারিবারিক সুখ ও পরলোকে শান্তি লাভের জন্য দেবতা ও পিতৃ-

উৎসবকে অনেকে আগ্রহ সহকারে দর্শন করিতে আসিয়া থাকেন। ইউরোপীয়েরা এই উৎসব দেখিয়া এমন বিমুগ্ধ যে গভর্ণমেণ্ট ১৮০৭ অব্দে তিরুভাক্কড়ু মুঠিয়া নামে তদ্দেশীয় এক গুণবান পণ্ডিতকে এই বিষয়ের ইতিহাস লিখিবার জন্য পুরস্কার দান করিয়াছিলেন। মুঠিয়া পণ্ডিতের ঐ বিবরণ ইংরাজিতে অনুবাদিত হইয়া গিয়াছে।*

উৎসবের প্রথম দিনে কৃষ্ণতিল, কুশ, দূর্ব্বা এবং শর্করা সহ জলদান করিয়া পিতৃপুরুষগণের তর্পণ করিতে হয়, তদনন্তর সূর্য্যদেবের পূজা সমাপ্ত হইলে পূজাকারী কহিয়া থাকেন—"হে স্বর্গস্থ পিতা! হে স্বর্গস্থ পিতামহ! হে মৃত সহোদর!† হে মৃত শিক্ষক ও উপদেষ্টাগণ! আপনাদের নিকটে আমি জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞানতঃ যে কোন অপরাধ করিয়াছি তাহা কৃপা করিয়া ক্ষমা করুন। অদ্য ক্ষমাগুণে আপনারা দ্রবীণ চিত্ত হউন। এইরূপ পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করিয়া অধস্তন পুরুষেরা গুরুভক্তি প্রদর্শন করেন এবং কৃতজ্ঞতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া থাকেন। ঐ সকল কথার পরে কহিতে হয় "হে আর্য্যগণ! আমরা যেন ভ্রমেও আপনাদিগের প্রতি অকৃতজ্ঞ না হই, মুহূর্ত্তের জন্যও যেন আপনাদিগের কৃত মহোপকার সমূহ বিস্মৃত না হই।" ইহার পরে সকলে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র স্থানে—এক জাতি বা কুটুম্বাদি হইলে একত্রে ও একই স্থানে চাউল পাক করে এবং ঐ চাউল সিদ্ধ হইবার সময়ে উহাতে শর্করা ও দুগ্ধ নিক্ষেপ করিয়া সকলে "পোংগল" "পোংগল" বলিয়া চীৎকার করিতে থাকে। কেহ কেহ বলে "পোংগলের জয়" "পোংগলের জয়।" এই সময়ে বাদ্য বাজিয়া উঠে এবং নর্ত্তকীরা নৃত্য করিতে থাকে। বালক ও বালিকারা চীৎকার করিয়া কহে "শান্তি হউক, সুখ হউক এবং ভগবানে মতি রহুক!" এই দৃশ্য বড়ই সুরম্য। বালক বালিকাদিগের সুকোমল কণ্ঠ নিঃসৃত এই মধুর রবে মনোমধ্যে পরমানন্দের উদয় করিয়া দেয়। অতঃপর মেলার সর্ব্বস্থানে সকলে দণ্ডায়মান হইয়া সূর্য্য প্রণাম করে এবং পাককরা ভাত, ব্যঞ্জন, ডাউল প্রভৃতি অর্পণ করিয়া "সূর্য্যায় নমঃ" উচ্চারণ করে; অনন্তর পিতৃপুরুষগণকে পোংগল প্রদত্ত হইয়া থাকে।

উৎসবের প্রথম দিবসের অপরাহ্নে "প্রেম সম্মিলন" হয়। ইহার নিয়ম এইরূপ। অল্প বা অধিক দিন পর্য্যন্ত কাহারও সহিত কাহারও মনোমালিন্য থাকিলে অথবা তজ্জন্য কথোপকথন বন্ধ থাকিলে কিম্বা রাজদ্বারে মোকর্দ্দমা প্রভৃতি চলিতে থাকিলে, তাহাদের পরস্পরের মিলন জন্য এই সময়ে চেষ্টা করা হইয়া থাকে। উৎসবের কিয়দ্দিবস

গণকে চাউল বা অন্নাদি উৎসর্গীকরণ। Rottler's Tamil Dictionary. তেলেগু ভাষায় পোঙ্গল অর্থে ভাত, দুগ্ধ ও শর্করা বুঝায়। Campbell's Talegu Dictionary. কানাড়ী ভাষাতেও ঐ অর্থ। See Wilson's Religious Sects of the Hiddoos. Voll. ১, Page 170.

* Asiatic Annual Register for 1807.

পূর্ব্বে গ্রামের প্রধান প্রধান লোকেরা কিম্বা পুরোহিত প্রভৃতির যত্নে ইহাদিগকে একত্র করিয়া মিলনের জন্য পরামর্শ দেওয়া হয়। পরামর্শ মত যে ব্যক্তি কার্য্য করিতে সম্মত হয়, তাহাকে উৎসবক্ষেত্রে তাহার শত্রুর সম্মুখে আনাইয়া মিলাইয়া দেওয়া হয়। যে ব্যক্তি এইরূপ পরামর্শ না মানে তাহাকে কেহ বলপূর্ব্বক মিলাইতে পারে না ইহা সত্য, কিন্তু লোক সমাজে সে ব্যক্তির যথেষ্ট অপযশ ঘোষিত হইয়া থাকে। লোকে কথায় বলে "পোংগলে ইহাদের বিবাদ মিটিল না, অতঃপর আর মিটিবার আশা নাই।" যাহারা বিবাদ মিটাইতে স্বীকৃত হয় তাহারা উৎসবক্ষেত্রে উপস্থিত হইলে, অপরাহ্ণে সূর্য্য পূজার পরে উভয় পক্ষের লোককে সম্মুখে দাঁড় করাইয়া গুরু, পুরোহিত, বন্ধু কিংবা কোন বয়স্ক আত্মীয় বলেন, "তোমরা পরস্পরকে প্রথমে আলিঙ্গন কর; নমস্য হইলে নমস্কার প্রণম্য হইলে প্রণাম কর।" তদনন্তর কহেন, "পরস্পর হাত মিলাইয়া বল, আমরা সরল হৃদয়ে সদ্ভাবে মিলিত হইলাম, আমাদের মনে কোনপ্রকার কপটতা বা শত্রুতা নাই। দেবতাদিগের নামে আমরা ইহা স্বীকার করিতেছি।" অতঃপর পরস্পরের গলদেশে পুষ্পমালা পরাইয়া দিয়া পরস্পরে মিলিয়া গান গায়, একত্র ভোজন করে, নৃত্য করিতে থাকে, হাসে, খেলে এবং ভগবৎ পূজা করে। সায়াহ্নে বালক, বালিকা, সাধু, বৈষ্ণব, ব্রাহ্মণ, পশু, দরিদ্র ব্যক্তি প্রভৃতিকে নানাপ্রকার উৎকৃষ্ট ভোজদ্রব্য খাইতে দেওয়া হয়। রাত্রে বিবিধ প্রকার কৌতুক ও তামাসা হইয়া থাকে এবং প্রীতিভোজনে অনেক টাকা ব্যয় হয়।

দ্বিতীয় দিবসের কথা। রজনী প্রভাত হইলে স্ত্রীলোকেরা কৃষিক্ষেত্রে গমন করিয়া শস্যের উপরে জল সিঞ্চনপূর্ব্বক বলে "জয় পোংগল" "জয় পোংগল"। তদনন্তর বিবিধ প্রকার ফল ও মিষ্টান্ন দ্বারা সূর্য্য পূজা করা হয় এবং আত্মীয় ও বান্ধবগণসহ চর্ব্বচোষ্য লেহ্যপেয় ভোজন ক্রিয়া সমাপ্ত হইয়া থাকে। ভোজনের প্রধান দ্রব্য ভাত। মধ্যাহ্নে দুগ্ধসহ চাউল সিদ্ধ করিয়া তাহাতে শর্করা মিশ্রিত করতঃ ইন্দ্রদেবকে অর্পণ করা হয়। অপরাহ্ণে পশুদিগকে স্নান করাইয়া বিবিধ রঙে সুশোভিত করা হয় এবং নানা প্রকার দ্রব্য তাহাদিগকে খাইতে দেওয়া হয়। এই সময়ে সুমধুর সঙ্গীত হইবার নিয়ম আছে। বালক, বালিকা ও ব্রাহ্মণেরা গো, বলদ প্রভৃতি পশুর চারিদিকে পুষ্প ছড়াইয়া দিয়া নৃত্য ও গান করিতে থাকে। রাত্রিকালে আতসবাজী, নর্ত্তকীদিগের নৃত্য, গায়কদিগের গান, শাস্ত্রপাঠ, শ্রীকৃষ্ণ পূজা, গোসেবা করিবার বিধি।* পশুসেবার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের স্তোত্র উচ্চারণ, ভাগবতশাস্ত্র পাঠ এবং কৃষ্ণ পূজা করা আবশ্যক। (Wil-

---

*উৎসবের প্রথম দিবসের নাম ভোগ পংগল, দ্বিতীয় দিবসের নাম পেরুম্ পোগল এবং তৃতীয় দিনের নাম মথ্যু পোঙ্গল। সূর্য্য, ইন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণ এই তিন দেবতা তিন দিবসের কর্ত্তা। Brown's

son's Glossary of Indian Terms. Page. 421.)

তৃতীয় দিনে আত্মীয় ও বন্ধুগণ পরস্পরের ঘরে গিয়া নানা প্রকার দ্রব্য উপহার দেয় এবং পরস্পরকে আলিঙ্গন করে। এই দিবস দরিদ্রদিগকে নানা প্রকার দ্রব্য বিতরিত হইয়া থাকে। মধ্যাহ্নে গুরু পূজা অপরাহ্নে বয়োজ্যেষ্ঠদিগকে প্রণাম করা হয় এবং সায়াহ্নে স্ত্রীলোকগণ নানাবিধ পিষ্টকাদি প্রস্তুত করিয়া পুরুষাত্মীয়দিগকে খাওয়াইয়া দেয়। এই ভোজের সময় কন্যা মাতাকে এবং কনিষ্ঠা জ্যেষ্ঠা ভগিনীকে প্রণাম করে এবং তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিয়া থাকে। অতঃপর কন্যা পিতাকে এবং ভগিনী জ্যেষ্ঠ সহোদরকে প্রণাম করিয়া তাঁহাদের আনুগত্য স্বীকার করে। স্ত্রী ও স্বামী গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া পরস্পরকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক একত্রে এক পাত্রে সুমিষ্ট দ্রব্য ভক্ষণ করে এবং স্ত্রী স্বামীকে ও স্বামী স্ত্রীকে পিষ্টক খাওয়াইয়া দেয়। অন্ধকার রাত্রি, স্বামী স্ত্রীর আমোদ প্রমোদের রাত্রি। সায়াহ্নে লাঠিখেলা, তরবারী খেলা, বিবিধ প্রকার ব্যায়াম প্রদর্শিত হইয়া থাকে। এই খেলার প্রথা অতি পুরাতন। মাদুরা নগরীতে পাণ্ড্য বংশীয় রাজগণ যখন রাজত্ব করিতেন তখন হইতে একাল পর্য্যন্ত উৎসব ক্ষেত্রে এইরূপ খেলা চলিয়া আসিতেছে। এতদুপলক্ষে স্ত্রীলোকেরাও নানা প্রকার ব্যায়াম প্রদর্শন করিয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন সাপ-খেলা, বানর ও ভালুকের নাচ, মেষ যুদ্ধ, মানুষের মল্লযুদ্ধ, গৃধ্রের লড়াই, গান, প্রভৃতি কত যে কি দেখা যায় ও শুনা যায় তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। দশ বার জন বয়স্কা স্ত্রীলোক এক এক স্থানে একত্র হইয়া যে অদ্ভুত নৃত্য দেখায় তাহা বোধ হয় সমস্ত পৃথিবীতে অতুলনীয়।

পোংগল উৎসবের প্রশংসা করিবার অনেক বিষয় আছে, কিন্তু নিন্দা করিবার কি কিছুই নাই? এ সময় নিম্নশ্রেণীর হিন্দুরা, —কখন কখন মধ্যশ্রেণীর হিন্দুগণও ইংরাজদের অদ্ভুত "বল্" নাচের মত পরস্ত্রীর হস্ত ধারণ করিয়া রাত্রিকালে প্রকাশ্য ভাবে নৃত্য করে; স্ত্রীলোকের স্বামী ঐ নাচে যোগ দেয় অথচ তাহার স্ত্রী তাহার পার্শ্বে থাকে না। পোংগল উৎসবে ব্রাহ্মণগণ নিরক্ষর অব্রাহ্মণ ব্যক্তিবর্গকে ঠকাইয়া বিবিধ প্রকারে অর্থ এবং বিবিধ দ্রব্য সংগ্রহ করে। কেবল তাহাও নহে; ইহা হইতেও জঘন্য কার্য্য করে। ইহা ব্রাহ্মণজাতির ঘোরতর কলঙ্কের কথা। কেবল পোংগলোৎসবে নহে, ভারতবর্ষের অনেক স্থলেই ব্রাহ্মণগণ ধর্ম্মের নামে এইরূপ অধর্ম্ম করিয়া থাকেন। জানি না, বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণসমাজের এ কলঙ্ক কবে অপনোদিত হইবে। উক্ত উৎসবে যুবতী স্ত্রীলোকগণকে সম্মুখে বসাইয়া ব্রাহ্মণগণ যখন ভাগবৎ পাঠ করেন এবং তাহার ব্যাখ্যা করিতে থাকেন তখন ইহা প্রমাণ করিবার চেষ্টা করেন যে ব্রাহ্মণ স্বয়ং ঈশ্বর—বিশেষতঃ মন্ত্রদাতা গুরু স্বয়ং পূর্ণ ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র, অতএব ব্রাহ্মণের দেহ স্পর্শ করিলে এবং ব্রাহ্মণের মনোস্কামনা পূর্ণ করিলে রমণীগণ ত্রিতাপ হইতে মুক্ত হইয়া পরম শান্তিতে

সময়ে দেখিয়াছি, সম্ভ্রান্ত হিন্দুবংশের বয়স্কা ও প্রবৃদ্ধা রমণীগণ পর্য্যন্ত কুসংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া এই সকল ব্যভিচার ও কদাচারের পোষকতা করিয়া থাকেন।

আমরা এক বৎসর পোংগল্ উৎসবে ভাত ভোজন করিয়াছিলাম। ভাতের সঙ্গে কত যে কি খাইয়াছিলাম, এতদিন পরে সে সকলের নাম স্মরণ নাই। বাঙ্গালাদেশের অনেক তরকারি ও খাদ্যদ্রব্য মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীতে পাওয়া যায় এবং মান্দ্রাজীরা তাহা ব্যবহার করে। পুদিনা শাক, সজিনা ডাঁটা, কচু, উচ্ছে, আমড়া, নটে শাক, অম্লমাদার, ডম্বুর, কাঁচাকলা, কুষ্মাণ্ড, পটল, বেগুণ, চাল্‌তা, ইচড় আলু, মুড়ি, মুড়কী, বাতাসা, পাটালি, গুড়, নাড়ু, প্রভৃতি যে সকল দ্রব্য বাঙ্গালীরা ব্যবহার করে তাহার সমুদয়ই প্রায় তথায় পাওয়া যায় —কেবল পাওয়া যায় না, সর্ষপ তৈল; কারণ, সে দেশের লোকেরা গায়ে তিলের তৈল মাথে এবং তরকারীতেও তিলের তৈল ব্যবহার করে। ত্রিবাঙ্কুর ও কোচিন রাজ্যে এবং মালাবার উপকূলে নারিকেল তৈল তরকারীতে ব্যবহৃত হয়। মাদ্রাজ দেশে সর্ষপ তৈল দুর্লভ এবং দুর্ম্মূল্য। সে দেশে সরিষার তৈলের আদৌ প্রচলন নাই। মাদ্রাজীরা বাঙ্গালীর মত তেল মাথে, ভাত থায়, রাঁধে এবং প্রোষ্ঠি ভাত অর্থাৎ পান্তা ভাত বা "বাসি" ভাত থাইয়া থাকে, কিন্তু বঙ্গবাসীর ব্যঞ্জনের সহিত মাদ্রাজীর ব্যঞ্জনের ও রুচির স্বর্গমর্ত্ত প্রভেদ। আমরা একাধিক সব্‌জি মিলাইয়া তরকারী প্রস্তুত করি, মাদ্রাজীরা তাহা করে না, তাহারা একটা জিনিষেরই ব্যঞ্জন প্রস্তুত করে তাহাতে অন্য সব্‌জি মিশায় না। সে ব্যঞ্জনের আস্বাদন আমাদের জিহ্বায় ভাল বোধ হয় না; মশালা অতি সামান্য ব্যবহৃত হয় এবং পাকের প্রণালীও সুন্দর নহে।

সে দেশে "জলখাবার" অর্থে কাফি বুঝায়। কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি খৃষ্টান, প্রতি তিন সহস্র লোক মধ্যে দুই সহস্র নয় শত নিরানব্বই জন লোক প্রাতে উঠিয়াই কাফি থায়, কাফি না থাইয়া কোন স্থানে যায় না বা কোন কার্য্য করে না। পঞ্চশত লোকের মধ্যে এক জনও চা থায় কিনা সন্দেহ। কাফির সঙ্গে, পশ্চিম বঙ্গের লোকদিগের প্রস্তুত পিষ্টকের ন্যায়, "আস্কে" "সরুচাক্‌লী" "ভাজাপিঠে" প্রভৃতি থাইয়া থাকে, তাহা চাউল হইতে তৈয়ার হয়। পিষ্টকের বহুপ্রকার আকার। ত্রিকোণ, চতুষ্কোণ, গোলাকার, দীর্ঘ, চ্যাপ্‌টা প্রভৃতি। পিষ্টকের ভিতর নারিকেল, গুড়, চিনি, চাউল চূর্ণ প্রভৃতি বহুপ্রকার দ্রব্য থাকে। ময়দা বা "আটা" অতি কষ্টে পাওয়া যায়, বড় বড় নগরেও অনেক সময়ে ময়দা বা ঘৃত পাওয়া যায় না। লুচি, কচুরী কি জিনিষ, এখানকার দশ সহস্র লোকের মধ্যে একজনও জানে কিনা সন্দেহ। লুচি কচুরী কোথাও বিক্রীত হয় না। ভাল ভাল মিঠাই, সন্দেশ বা মিষ্টান্ন কেহ চক্ষে দেখে নাই। এদেশের যাহা "মিষ্টান্ন" তাহা আমাদের দেশের ছোট লোকেরাও হয়ত আহার করিতে কুণ্ঠিত হইবে। এদেশের মিষ্টান্ন আমাদের অভোজ্য। যাহা হউক, আমরা পোংগলে ভাত ভোজন করিয়া যে কয়েকটা নূতন জিনিষ আস্বাদন করিয়াছিলাম তাহাদের

মধ্যে দুই চারিটার কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া আবশ্যক বিবেচনা করিতেছি।

প্রকাণ্ড কদলীপত্রের সম্মুখে উপবেশন করিয়া দেখিলাম, সমুদয় ব্যঞ্জনে তিল তৈলের গন্ধ পাওয়া যাইতেছে। তিল তৈল ভিন্ন অন্য তৈল এদেশের পাকশালায় ব্যবহৃত হয় না। আমার বন্ধুগণ তাহাতে অনভ্যস্ত ছিলেন, সুতরাং আহারের সুবিধা হয় নাই, ইহা বলা বাহুল্য মাত্র। আমি অনেক দিবস মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীতে ছিলাম, সুতরাং তিল ও নারিকেল তৈলের প্রস্তুত তরকারী ভক্ষণে আমি একপ্রকার অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিলাম। আমার ভোজনের বিশেষ অসুবিধা হইয়াছিল বলিয়া স্মরণ হয় না। আমাদের দেশের ভাত ও মাদ্রাজ অঞ্চলের ভাত প্রায় এক প্রকার; হিন্দুস্থানীর হাতের তৈয়ারী ভাতের ন্যায় খারাপ নহে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ডালের নাম এখানে পর্পূ, ইহা ঠিক যেন একটা ব্যঞ্জন। অত্যন্ত ঘন এবং তিন্তিড়ি (তেঁতুল) ও লঙ্কাসংযুক্ত। অর্শাদির ইহা আশু জন্মদাতা। যে কোন খাদ্য দ্রব্যে হাত দাও, তেঁতুল ও লঙ্কা প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাইবে। এই জন্য সে দেশে উক্ত প্রকার রোগের যেমন প্রাদুর্ভাব তেমনি এই সকল রোগের চিকিৎসকও গণ্ডা গণ্ডা মিলে। মশুর ডাউল রাঁধিলে তাহা পাৎলা হয় বটে কিন্তু তাহাতেও ঐ অপরূপ লঙ্কা ও তেঁতুল যথেষ্ট থাকে। বড় বড় লঙ্কার ঝোল হয়, তাহাতে লঙ্কা ভিন্ন কেবল তেঁতুল ও গোলমরিচ মাত্র থাকে। কাঁচা কদলী ভাজা প্রধান তরকারী; ডাউল সিদ্ধ যে ব্যঞ্জন হয় তাহা অতি অদ্ভুত!! দধির নাম তায়ার্, ঘোলের নাম মোর এবং দুগ্ধের নাম পাল। ভোজনের সময় এই তিনটা দ্রব্যের খুব প্রচলন আছে।

ডালের সঙ্গে কখন কখন বেগুণ, আলু, সজিনা খাড়া প্রভৃতি মিশাইয়া দেওয়া হয়; ইহাও এক প্রকার তরকারী। আমাদের দেশের মত স্বতন্ত্র "টক্" বা "অম্বল" বলিয়া কোন দ্রব্য নাই। মাছের ঝোল তাহারা জানে না। মাছ ভাজিয়া খায় অথবা "কলম্বু" করে। "কলম্বু" এদেশের সর্ব্বপ্রধান ব্যঞ্জন। ইহা যদি না হয় তাহা হইলে সেদিন আর আহারের সুবিধা হয় না। কলম্বু দুই প্রকার আমিষ ও নিরামিষ। ছাগ, মেষ কিম্বা পক্ষিমাংস অথবা মৎস্য উষ্ণ জলে সিদ্ধ করিয়া তাহাতে বেগুণ কিম্বা আলু অথবা সজিনা ডাঁটা নিক্ষেপ পূর্ব্বক তেঁতুলের রস, লঙ্কা বাঁটা, হরিদ্রা চূর্ণ ও গোলমরিচ চূর্ণ মিশাইয়া দিলে যে অদ্ভুত জিনিষ হয় তাহার নাম আমিষ "কলম্বু"; আমিষ ব্যতিরেকে যাহা হয় তাহা নিরামিষ কলম্বু। ইহা তথাকার সাতরাজার ধন এক মাণিক। ইহা না হইলে কাহারও অন্ন রুচে না। অন্য দেশের লোকেরা এ অঞ্চলে আসিয়া তেঁতুল ও লঙ্কা খাইতে খাইতে জ্বালাতন হইয়া পড়ে। পোঙ্গল উৎসবে অন্ন ভোজন শেষ হইলে, অনেকে "পদ্‌মী" পান করে। পদ্‌মী অর্থে তালরস বুঝায়। ইহা তাড়ি নহে, তালগাছের তাজা রস, সুতরাং অত্যন্ত শীতল, সুস্বাদু ও রোগ নাশক। ইহাতে নেশা হয় না। সকলেই যে ইহা খায়, তাহা নহে,

থাকে। উৎসবের ইহাও একটা প্রধান জিনিস। একটা সুখের বিষয় এই, পোংগল মেলায় মদ, তাড়ি, গাঁজা, চণ্ডু প্রভৃতির ধূম ধাম বা অভদ্রতা দেখি নাই। মদের দোকান খুলিতেও কখন দেখিয়াছি বলিয়া বোধ হয় না।

ভোজন সম্বন্ধে কেবল আর একটা কথা লিখিবার আছে, তাহা এই। এদেশে উচ্চশ্রেণী, মধ্যশ্রেণী এবং নিম্নশ্রেণীর হিন্দু, মুসলমান ও নেটীব খ্রীষ্টান সমাজে "মরিচজল" নামে এক প্রকার তরল পদার্থ ভাত ভোজনের সময়ে প্রচলিত দেখা যায়, তাহা প্রায় নিত্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে, এদেশে ইহা অত্যন্ত প্রিয় ব্যঞ্জন। গোলমরিচ চূর্ণ তিন্তিড়ি রসের সহিত উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া উহা উত্তপ্ত কটাহ বা হাঁড়ি মধ্যে রাখিয়া উষ্ণ করা হইয়া থাকে, কিয়ৎক্ষণ পরে উহাতে লবণ ও থোল মিলাইয়া দিয়া পাত্রান্তরে রাখা হয়। এই "মরিচ জল" ভাতে মাখিয়া খাওয়া হয়। অনেকে চুমুক দিয়াও খাইয়া থাকে। বাস্তবিক ইহার আস্বাদন মন্দ নহে কিন্তু ইহা যেমন উগ্র তেমনি উষ্ণ। ইহাতে লঙ্কা চূর্ণও মিশ্রিত থাকে। এখন ভাবিয়া দেখুন, লঙ্কা আর তেঁতুল মান্দ্রাজ অধিবাসীদিগের পাকশালার কেমন প্রয়োজনীয় উপকরণ!!

শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

যুগল কিশোরের দস্যু-দমন ও বিচার ফল।

শতবর্ষ পূর্ব্বে জমিদারগণ প্রজাগণের উপর এবং দুর্ব্বল জমিদারের উপর কিরূপ ক্ষমতা পরিচালনা করিতেন যুগলকিশোর রায়চৌধুরী মহাশয়ের দস্যুদমন হইতে আমরা সে বিষয়ের সুন্দর দৃষ্টান্ত প্রাপ্ত হই। বোধ হয় বর্ত্তমান সময়ে বঙ্গের প্রায় সকল শিক্ষিত ব্যক্তির নিকটই গৌরীপুরের স্বনামধন্য জমিদার শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী পরিচিত। যুগলকিশোর রায়চৌধুরী ইঁহারই বৃদ্ধ প্রপিতামহ। তিনি অত্যন্ত তেজস্বী ও দৃঢ়চেতা ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার প্রতাপে, বুদ্ধি চাতুর্য্যে ও কার্য্যকৌশলে তিনি ময়মনসিংহ অঞ্চলে আদর্শ জমিদাররূপে লোকের ভয় ও ভক্তির পাত্র ছিলেন। কর্ত্তব্য পরায়ণতা তাঁহার রক্তের সহিত মিশ্রিত ছিল। একবার যাহা তিনি কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করিতেন সহস্র বাধা ঘটিলেও তাহা হইতে বিরত হইতেন না। বাঙ্গালা ১১৯৫ সালে একবার ভীষণ জলপ্লাবন হইয়া লোকের ঘরবাড়ী জলস্রোতে ভাসিয়া যায়। ঐ সময় ময়মনসিংহ অঞ্চলে অনাহারে বহুলোকের জীবনান্ত ঘটিল। ভীষণ আর্ত্তনাদে দেশ ভরিয়া উঠিল এবং বহু গ্রাম জনশূন্য হইল। ভগবানের এই কঠোর নিগ্রহে নিষ্পেষিত হইয়া লোক ধর্ম্মাধর্ম্ম ভুলিল। জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য দস্যুতা করিতেও কুণ্ঠা বা দ্বিধা বোধ করিল না। অরাজকতার তাণ্ডবে ময়মনসিংহ অঞ্চল কম্পিত হইয়া উঠিল।

যুগলকিশোর রায়চৌধুরী বিপন্ন প্রজাগণের দুঃখ দূর করিবার জন্য যত্নের ক্রটি করেন নাই। অর্থ ব্যয় করিয়াও তাহাদের সুখ ও সুবিধার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কঠোর হস্তে অত্যাচার পীড়নের পথরোধ করিয়া দেশে শান্তি স্থাপনের প্রয়াসী হইলেন। তাঁহার প্রতাপে দস্যু তস্কর দণ্ডিত ও দেশ হইতে তাড়িত হইতে লাগিল। অনেক স্থলের প্রজা পুনরায় শান্ত ও নিরুদ্বেগ হইয়া কৃষিকর্ম্মে নিরত হইল। কেবল ময়মনসিং পরগণার পূর্ব্বদিক সিংধা পরগণার প্রজাগণ সে সুখে বঞ্চিত হইল। সিংধা পরগণার গ্রামসমূহে অত্যাচারের পূর্ণস্রোত প্রবাহিত রহিল। এই অত্যাচার বারণের জন্য যুগলকিশোর বদ্ধ পরিকর হইলেন; কিন্তু ইহাতে এক নূতন বিভ্রাট উপস্থিত হইল।

সিংধা পরগণা যুগলকিশোরের সম্পত্তি নহে, মহম্মদ খাঁ নামক মুসলমান ভূম্যধিকারীর অধীন। সুতরাং সিংধার প্রজাগণের উপর তাঁহার কোনও ক্ষমতা ছিল না। সিংধার দুর্বৃত্ত প্রজাগণ প্রশ্রয় পাইয়া দলপুষ্ট হইতে লাগিল, বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া স্থানে স্থানে প্রজাগণের উপর নিত্য নূতন অত্যাচার আরম্ভ করিল। ক্রমশঃ অত্যাচারের বৃদ্ধি দেখিয়া যুগলকিশোর প্রায় পঞ্চ সহস্রাধিক লোক সমভিব্যাহারে ২৪শে পৌষ সোমবার সিংধাভিমুখে ধাবিত হইলেন। সশস্ত্র সৈন্য ও লাঠিয়ালগণ জলোচ্ছাসের ন্যায় সিংধার মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। অচিরেই ভীষণ আর্ত্তনাদে দেশ ভরিয়া গেল। সিংধার প্রজাগণের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠিত হইল। শস্যাদি ও দ্রব্যসামগ্রী সকল প্রদর্শিত হইতে লাগিল। গো ছাগাদি গৃহ-পালিত পশুদল গৃহীত হইল। বালকবালিকা যুবক যুবতী বৃদ্ধ বৃদ্ধা অনেকে আবদ্ধ হইল। পরগণার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রায় সমস্ত গৃহ অগ্নি দ্বারা ভস্মীভূত হইল। সাধু অসাধু দোষী নির্দ্দোষী বিচার রহিল না, সকলের ভাগ্যচক্র একই গতিতে আবর্ত্তিত হইল। নিগৃহীত নিষ্পীড়িত প্রজার আকুল আর্ত্তনাদে সৈন্যগণ কেহ কর্ণপাত করিল না। এই ভীষণ অত্যাচারে ৩৬২ ঘর প্রজা ১২০০ গো বৎসাদি এবং প্রজাগণের সংগৃহীত বহুপরিমাণ ধান্য ও বাসন পত্রাদি লইয়া সৈন্য ও লাঠিয়ালগণ যুগল কিশোরের নিজ পরগণায় আনয়ন করিল। কাণ্ড শূন্য উন্মত্ত পদাতিক লাঠিয়ালগণ শত শত পরিবারকে হস্তীপদের সহিত রজ্জুবদ্ধ করিয়া আনিল।

দস্যু তস্করের শাসনমাত্র উদ্দেশ্যে যুগলকিশোর এই অভিযান করিয়াছিলেন। তাহার পরিণাম যে এত ভীষণ অমানুষিক অত্যাচারে পরিণত হইবে তাহা তিনি পূর্ব্বে মনে করিতে পারেন নাই। পাঁচ সহস্রের অধিক লোক কি ভাবে কোথায় কি কার্য্য করিতেছে তাহা তিনি প্রথমে জানিতে পারেন নাই। নিরক্ষর অসভ্য যুদ্ধব্যবসায়ী লোক স্বাধীনভাবে অত্যাচার করিতে পাইয়া উন্মত্ত হইয়াছিল। তাহাদিগকে সংযত করা সহজ সাধ্য নহে। সুতরাং অল্প দিনের মধ্যেই সিংধার প্রজাগণের সর্ব্বনাশ হইয়া গেল। যুগলকিশোর সমস্ত অবস্থা অবগত হইয়া অনুতপ্ত হইলেন। তিনি উৎপীড়িত প্রজাদিগকে আশ্রয় দিয়া নিজ অধিকার ময়মন-

তাহাদের চাষের জন্য জমী বলদ বীজ প্রভৃতি প্রদান করিলেন। যুগলকিশোরের এই কাণ্ড অদ্যাপি ময়মনসিংহ অঞ্চলে প্রবাদ বাক্যরূপে প্রচলিত রহিয়াছে।

ময়মনসিংহ জেলার তাৎকালীন কালেক্টার রটন সাহেবের নিকট সিংধার জমিদার মহম্মদ খাঁ যুগলকিশোরের অত্যাচার কাহিনী বিবৃত করিয়া অভিযোগ করিলেন। রটন সাহেব স্থানীয় তদন্তের জন্য আমীন কানন ও কাজী প্রভৃতিকে প্রেরণ করিলেন। অনুসন্ধানকারীগণ গ্রামে গ্রামে পরিভ্রমণ পূর্ব্বক সমস্ত বিবরণ সংগ্রহ করিলেন, অত্যাচারে পীড়িত ব্যক্তিগণের নামধামসহ ক্ষতির তালিকা প্রস্তুত করিয়া যথাসময়ে রটন সাহেবের নিকট প্রেরিত হইল।

তখন ইংরেজ রাজত্বের প্রথমাবস্থা। তখন ব্রিটীশ শাসন সর্ব্বত্র সুপ্রতিষ্ঠিত ও ব্রিটীশ শাসননীতি সর্ব্বত্র প্রচলিত হয় নাই। মুসলমানরাজ প্রবর্ত্তিত বিধি নিয়মই অনেকাংশে অক্ষুণ্ণ ছিল। কালেক্টরগণ জেলার প্রধান কর্ম্মচারী হইলেও তাঁহাদের শক্তি অধিক ছিল না। বিভাগীয় শাসনকর্ত্তা বিচার প্রভৃতি বিষয়ে অনেক সময় শক্তি পরিচালনা করিতেন। তাঁহাকেও আবার বহুবিষয়ে বোর্ডের আদেশাপেক্ষী হইয়া কার্য্য করিতে হইত। ময়মনসিংহের কালেক্টার রটন সাহেব আমীনের রিপোর্টসহ ঢাকার শাসনকর্ত্তা ডগলাস সাহেবের নিকট নিজ রিপোর্ট প্রেরণ করিলেন। ডগলাস সাহেব যুগলকিশোরের ন্যায় প্রবল পরাক্রান্তশালী জমিদারকে সাধারণ অপরাধীর ন্যায় দণ্ডিত করিতে সাহসী হইলেন না। কর্ত্তৃপক্ষের আদেশানুসারে কার্য্য করাই সঙ্গত ও নিরাপদ মনে করিলেন। তদনুসারে ডগলাস সাহেব ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে রেভিনিউ বোর্ডের নিকট যুগলকিশোর রায়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ সম্বন্ধে যে রিপোর্ট প্রেরণ করেন তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করা গেল—

The atrocious and violent preccedings of the Zeminder of Mymensing calls aloud for the most examplary and condign punishment; for if the principal land-holders are suffered, in open violation to all laws, to commit such daring outrages and if a total disregard to the repeated and positive orders of government, is allowed to pass over in silence, or with impunity, the most mischievous consequences are to be apprehended both for the peace of the District, the well being of its inhabitants and the safety of its revenues for many Zeminders or Talukders, will in future be liable to the wanton and licentious oppressions and lawless userpation of their more powerful neighbours.

ঢাকার শাসনকর্ত্তার রিপোর্ট প্রাপ্ত হইয়া রেভিনিউ বোর্ডের সদস্যগণ যুগলকিশোরকে দণ্ড বিধান পূর্ব্বক ঐ প্রকার জমিদারগণের অত্যাচার সমূলে ধ্বংস করিতে কৃত নিশ্চয় হইয়া বিহিত আদেশ প্রদান করিলেন। এ দিকে যথা সময়ে যুগলকিশোর রায় ময়মনসিংহ সহরে নীত হইলেন। তাহার জন্য জামিন দিয়া মুক্তি প্রার্থনা করা হইয়াছিল কিন্তু তাহা প্রথমে গ্রাহ্য হয় নাই। তৎপর

অর্থের মোহিনী শক্তিবলে অনেকেরই সহানুভূতি উথলিয়া উঠিল। যুগলকিশোরের ভাণ্ডার হইতে বহু অর্থ বিচার বিভাগসংশ্লিষ্ট ক্ষুদ্র বড় কর্ম্মচারীগণের ভাণ্ডার পূর্ণ করিল। ইহার ফলে যুগল কিশোর তাঁবুতে বাস করিবার অনুমতি পাইলেন। তাঁহার জন্য ভৃত্য পাচক প্রভৃতি নিযুক্ত হইল। প্রহরীবেষ্টিত হইয়াও তিনি স্বাধীনভাবে আমোদ আহ্লাদে সময়পাত করিয়া বিচারকালের জন্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

যথাকালে বিচার আরম্ভ হইল। প্রত্যহ শত শত লোক ময়মনসিংহের বিচারালয়ে উপস্থিত হইয়া বিচার কার্য্য দেখিতে লাগিল। ঐ বিচারের কথাই লোকের একমাত্র আলাপের বিষয় হইল। সিংধার জমিদার সর্ব্বস্ব পণ করিয়া মোকদ্দমার তদ্বির করিতে লাগিলেন। যুগল কিশোরের পক্ষ হইতেও তদ্বিষয়ের ত্রুটি হইল না। এইরূপে উভয় পক্ষের উকীল মোক্তারের উদর পূর্ণ হইতে লাগিল, সাক্ষীগণের মধ্যে অনেকেরই অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিল। অনেকে বিচারালয়ে উপস্থিত হইতে অস্বীকার করিল। যাহারা উপস্থিত হইল তাহাদের মধ্যে কেহ সত্য বলিল কেহ সম্পূর্ণ মিথ্যা বলিল। যুগল কিশোরের ভয়ে অনেকেই তাঁহার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে সাহসী হইল না। সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর কোন লোকই সাক্ষ্য দিলেন না। ফলতঃ লুণ্ঠন গৃহদাহ প্রভৃতি কার্য্য যে হইয়াছে তাহা প্রতিপন্ন হইল কিন্তু ঐ সমস্ত কার্য্য যে যুগলকিশোর রায় কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হইয়াছে তাহা কেহই শপথ করিয়া বলিতে পারিল না। যুগলকিশোর রায়কে কেহ দেখে নাই তিনি যে আদেশ দিয়াছেন তাহাও কেহ শুনে নাই। কেবল অনুমানের উপর নির্ভর করিয়া তাঁহাকে দণ্ডিত করা সঙ্গত কিনা এই সম্বন্ধে উভয় পক্ষে বহু বাক্‌বিতণ্ডা হইয়াছিল। পরিশেষে প্রমাণের অভাবে ও রটন সাহেবের অনুগ্রহে কেবলমাত্র জামিন প্রদান করিয়াই যুগল কিশোর অব্যাহতি লাভ করেন।

যদিও উপরোক্ত কার্য্যে যুগলকিশোর অপযশভাজন হইয়াছিলেন তথাপি তাঁহার ন্যায় সুবিবেচক ও বিষয় কার্য্যে নিপুণ লোক এখনও অতি অল্পই দেখা যায়। কালেক্টার রটন সাহেব বন্দোবস্ত রিপোর্টে লিখিয়াছিলেন—

Jugal Roy manages his business and by his prudent care and abilities is a man of considerable property.

শ্রীশৌরীন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী।

অভাগা।

আমি—তিমির মাঝারে ভাসিয়ে বেড়াই
মম সাথে ওগো সাথী কেহ নাই
আমি যে পথিক একা !
আমি—নাবিক একাকী, জীর্ণ তরীটিরে
ভীতমনে সদা বহিতেছি ধীরে
কাহারো নাহিক দেখা !

আমি—সশঙ্কিত সদা অশ্ব রাশ ধরি,
সারথি হইয়ে মৃত্যু ভয়ে মরি
শান্তি কোথায় মোর !
আমি—আপনারে হায় ! অরি ব'লে বুঝি,
আপনার সাথে অবিরত যুঝি
একিরে অদৃষ্ট মোর !

অমরকণ্টক।

অমরকণ্টক বিন্ধ্য শৈলমালার একটী পর্ব্বত। পর্ব্বতের নাম হইতে দেশের ও জলাশয়ের নামও অমরকণ্টক হইয়াছে। এই জলাশয় একটী কুণ্ড। যে স্থান স্বাভাবিক উৎসদ্বারা পরিপূর্ণ হয় তাহাকে পশ্চিমাঞ্চলে "কুণ্ড"বলে। এই কুণ্ডের চতুর্দ্দিক প্রস্তর সোপানাবলী দ্বারা বাঁধাইয়া দেওয়া হইয়াছে। কুণ্ডের জল হরিদবর্ণ এবং শৈবালে পূর্ণ। এবং ইহার পশ্চিমদিকে একটি সঙ্কীর্ণ পয়ঃপ্রণালী আছে; এই প্রণালীমুখে কুণ্ডধারা ক্ষীণধারায় বহির্গত হইয়া ক্ষীণ হইতে ক্রমশঃ বৃহৎ, এবং বৃহৎ হইতে বৃহত্তর হইয়া দুই ক্রোশ গিয়া প্রপাতরূপে পতিত হইয়াছে। ইহাই নর্ম্মদার প্রপাত। ইহাকে কপিল ধারা বলে। নর্ম্মদার জন্মস্থান বলিয়া এই স্থান তীর্থরূপে পরিণত হইয়াছে।

বিলাসপুর হইতে কট্‌নি যাইবার একটী শাখা রেল আছে। এই পথের "পাণ্ডরারোড" নামক ষ্টেশনকে লোকে "গৌরীলা" বলে। বিলাসপুরে আমি একটী যুবা ছত্রী সাধুসঙ্গী পাইলাম, আমরা দুজনে রাত্রে গৌরীলায় পৌছিলাম,—পান্থশালায় রাত্রিযাপন করিয়া প্রাতে প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া অমরকণ্টক অভিমুখে যাত্রা করিলাম। অমরকণ্টক গৌরীলা হইতে ৭ ক্রোশ পথ। ইংরাজ, নিজের সীমা আমানালার উত্তরাংশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত রাস্তা করিয়া দিয়াছেন;—দুইটী পর্ব্বত উল্লঙ্ঘন করিলে আমানালা পাওয়া যায়। পথের দুই পার্শ্বে বিকট বিজন বন;

অর্জ্জুন তিনিশ হরিতকী আমলকী বয়ড়া ইত্যাদির গাছ রহিয়াছে। শাল ও আমলকী গাছই অধিক দেখিলাম; হরিতকী ফল শূন্য যেহেতু অগ্রহায়ণ মাসে ইহা বিক্রয়ার্থ চয়ন করা হইয়াছে। আমলকী বৃক্ষ ফলে পরিপূর্ণ;—পথে ইহাই আমাদের ক্ষুন্নিবৃত্তির প্রধান সহায় হইয়াছিল। বয়ড়া দুই একটী দৃষ্টি গোচর হইতেছিল। ভেলার গাছও ফলে পূর্ণ; কিন্তু এ গাছ দেখিতে যেন যমদূত! বৃক্ষ যেমন কৃষ্ণবর্ণ পাতাফলগুলিও তদ্রূপ। ইহার অপক্ক ফলগুলি কেহ ভাঙ্গিলে তাহা হইতে ফিনিক দিয়া এক প্রকার উগ্রবীর্য্য রস নির্গত হয় তাহা গায়ে লাগিলে সমস্ত শরীর বিষাক্ত হইয়া উঠে এবং নব মহাব্যাধির মত গায়ে চাকা চাকা চিহ্ন উত্থিত হয়।

এই বনপথে আরণ্য বণিক সম্প্রদায়গণ দলবদ্ধ হইয়া গমনাগমন করিয়া থাকে। ইহাদিগকে এ স্থানে "বনজারা" বলে। বনজারাগণ পুত্র কন্যা পরিজন লইয়া নিজ দেশের শস্য অন্যদেশে বিক্রয়ার্থ লইয়া যায়। বলীবর্দ্দের পৃষ্ঠে শস্যভার চাপাইয়া দেয় এবং ঘোড়ার উপর পুত্র কন্যা স্ত্রীকে আরোহণ করাইয়া এই দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়া থাকে। পাঁচ ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া বিশ্রাম ও রাত্রিবাস করে। বন মধ্যে যে স্থানে রাত্রিবাস করে সে স্থানে এক এক পরিবার পৃথক্ পৃথক্ দুর্গ নির্ম্মাণ করে। আবশ্যক মত শস্যের ছালা একের উপর এক সাজাইয়া দুর্গের প্রাকার নির্ম্মাণ করে; এই প্রাকারের বাহিরে

খোঁটায় বাঁধিয়া দেয়। বনের শত্রু ব্যাঘ্র আসিলে প্রথমেই বলদ ও ঘোটকের ভীতি বিহ্বল চীৎকারে গড়ের যোদ্ধাগণ সজাগ হইয়া ওঠে এবং শত্রুকে বিতাড়িত করিয়া দেয়। আমার সঙ্গী এই প্রকার এক দলের নিকট গমন করিয়া কিছু খাদ্য যাচঞা করিলেন। তাহারা ভিক্ষাদানে তাঁহার সৎকার করিল।

দুই এক ক্রোশ যাইবার পর একটী ক্ষুদ্র নির্ঝরিণী দেখা গেল। তাহার ক্ষীণ জলধারা পথের অল্প নিম্ন দিয়া তির্য্যক ভাবে প্রবাহিত হইতেছে। ঝরণার গর্ভ প্রস্তর খণ্ডময় ;— মধ্যে মধ্যে বড় বড় কৃষ্ণ প্রস্তরের উচ্চ স্তূপ। এই স্থানে আমরা একটু বিশ্রাম করিলাম এবং ভিক্ষালব্ধ আটার রুটী প্রস্তুত করিয়া ক্ষুধা নিবৃত্তি পূর্ব্বক যখন পুনর্যাত্রা করিলাম তখন রৌদ্র ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে, প্রান্তর ধূ ধূ করিতেছে, পথ জলন্ত অঙ্গারবৎ হইয়াছে ; পথিপার্শ্বস্থ বৃক্ষের স্বল্প ছায়াই তখন পথিকের একমাত্র আশ্রয় স্থল। চলিতে চলিতে দেখিলাম পর্ব্বতের পাদদেশে একটী বৃহৎ জলাশয়—সে স্থানে বনজারাগণ দলে দলে বিশ্রাম করিতে পারে এ প্রকার বিস্তৃত ভূমিও রহিয়াছে। আমরা রৌদ্রতাপে তাপিত হইয়া দীর্ঘিকার জলপান করিয়া শীতল হইলাম।

অল্প অগ্রসর হইয়া পর্ব্বতে উঠিবার পথ প্রাপ্ত হইলাম। পর্ব্বতের পার্শ্বদেশ গড়ানো ভাবে কর্ত্তিত ও পরিষ্কৃত করিয়া এই পথ নির্ম্মিত হইয়াছে। উপরে উঠিতে সর্ব্ব সময়েই পাহাড়ের এই খড্ডভাগ পথিকের দক্ষিণদিকে অবস্থিত থাকে। পর্ব্বতের দুর্গম নিম্ন স্থানকে খড্ড কহে। দুই পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী সংকীর্ণ যায় এই খড্ড ততই ভয়ঙ্কর বোধ হইতে থাকে। পথের দক্ষিণ ধারে দাঁড়াইয়া নিম্ন দিকে চাহিতে গেলে হৃদয় শুষ্ক হইয়া যায়। প্রায় এক ঘণ্টা উচ্চপথে উঠিয়া পর্ব্বতের উপরিস্থিত সমতল বা অধিত্যকা ভূমি প্রাপ্ত হওয়া গেল। যে ইংরাজের তত্ত্বাবধানে ১৮৯৮ সালে এই পর্ব্বত গাত্র কর্ত্তিত ও পথ প্রস্তুত হইয়াছে এই স্থানে পর্ব্বতগাত্রে তাঁহার নাম প্রভৃতি লিখিত রহিয়াছে। এই স্থান হইতে নিম্নের দৃশ্য কি মনোরম বোধ হইতে লাগিল! বিশ্বচিত্রকার যেন বিশাল চিত্রপটে বনরাজির ছবি অঙ্কিত করিয়া দর্শকের নয়নানন্দ বিধান করিতেছেন। আসিবার সময় যে শাল বৃক্ষগুলি ৫০।৬০ হাত উচ্চ বোধ হইতেছিল তাহাই যেন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুল্মবৎ প্রতীয়মান হইতে লাগিল। অল্প অধিত্যকা পথ অগ্রসর হইয়া আবার নিম্নে নামিতে হইল। এস্থানে হনুমানগণ দলবদ্ধ হইয়া এক বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে লম্ফ প্রদান করিতেছিল। নিম্ন পথ ৩।৪ পাক গিয়া অন্য পর্ব্বতের গাত্রে মিশিয়াছে। অল্প উঠিয়া একটী সমতল স্থান দৃষ্ট হইল। এই স্থান হইতে অল্পদূরে একটি প্রস্তরময় ক্ষুদ্র নির্ঝরিণী ; ইহার পরিসর ৭।৮ হাত মাত্র হইলেও উচ্চ হইতে নীচে প্রবাহিত বলিয়া ইহার বেগ অত্যন্ত প্রবল, ইহা দুই পর্ব্বতের পাদদেশে অবস্থিত। ইহাকেই লোকে "আমানালা" বলে। আমরা প্রস্তরগুলির উপর পা রাখিয়া পর পারে চলিয়া গেলাম। এই আমানালাই রেঁওয়ারাজ ও ইংরাজ রাজ্যের সীমা নির্দ্দেশ করিতেছে। আমানালা

প্রবাহিত। রেঁওয়ারাজের সীমায় একটী রামানুজী বৈরাগী সন্ন্যাসী কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া অবস্থান করিতেছেন। রেঁওয়ারাজ তাঁহার ভরণপোষণার্থ সাহায্য করিয়া থাকেন। সন্ন্যাসীও অতিথিসৎকার করেন। অতিথিআশ্রমটি পৃথক এবং দোতালা। আমরা সূর্য্যাস্তের অব্যবহিত পূর্ব্বে তথায় পৌঁছিলাম। আমাদের পূর্ব্বে চারি জন রামায়ত সন্ন্যাসী আশ্রমটি অধিকার করিয়াছিলেন সুতরাং আমরা আর একটী ক্ষুদ্র চালায় আশ্রয় লইলাম। রাত্রিযাপন করিয়া আমরা প্রাতঃকালে এস্থান হইতে প্রস্থান করিলাম। আমানালার তটভূমি হইতে অমরকণ্টক পর্ব্বত উঠিয়াছে। রেঁওয়ারাজ পাহাড়ে উঠিবার যে রাস্তা করিয়া দিয়াছেন তাহা প্রায় ৪৫ অংশ খাড়াই সুতরাং উঠিবার সময় সম্মুখের দিকে অল্প অবনত হইয়া পৃষ্ঠ বক্র করিয়া উঠিতে হয়। এই খাড়াই পথে উঠা অত্যন্ত ক্লান্তিজনক। পূর্ব্বে উঠিবার এপথটীও ছিল না। তখন কামাখ্যার পাহাড়ে উঠিবার ন্যায় পর্ব্বতগাত্র অবলম্বন করিয়া উঠিতে হইত। ইংরাজ সীমায় পথ নির্ম্মাণের পরে ইহা প্রস্তুত হইয়াছে। যাহা হউক পাঁচ ছয় বাঁক উঠিবার পর শিখর নিম্নে একটী সমতল স্থান প্রাপ্ত হওয়া গেল। ইহা প্রায় আধ পোয়া বিস্তৃত। ইহার পরে ঢাল নাবিয়াছে। ঢালটীর নিম্নেই অমরকণ্টকের কুণ্ড বা ক্ষুদ্র হ্রদ। পুষ্করিণীর চতুর্দ্দিক বেলে পাথর দিয়া বাঁধান। উত্তর দিকে পুষ্করিণীর গর্ভে মহাদেবের মন্দির,—মন্দির গাত্রে একটী তাম্র ফলক সংযোজিত, তাহাতে সংস্কৃত ও দেবনাগরী ভাষায় লেখা আছে, রেঁওয়ারাজ রঘুনাথ সিংহ ১৯১৮ সম্বতে ইহা নির্ম্মাণ করেন। পুষ্করিণীর উপলগ্ন স্থান সমতল ও জঙ্গলে পূর্ণ: মধ্যে মধ্যে দুই একটি ভগ্ন মন্দির রহিয়াছে এখানে তীর্থযাত্রীগণ আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন। পুষ্করিণীর উত্তরে অল্প দূরে দুইটী ক্ষুদ্র মন্দিরে নর্ম্মদা মাতার স্বর্ণপ্রতিমা প্রতিষ্ঠিত। রেঁওয়ারাজের নিযুক্ত পাণ্ডা তাঁহার সেবা করিয়া থাকেন। পুষ্করিণীর পশ্চিমদিকে পয়ঃপ্রণালী দিয়া একটী ক্ষীণ ধারা প্রবাহিত হইয়াছে। ইহাই বনজঙ্গল ঝোপ ঝাপ প্রস্তর রাশির মধ্য হইতে প্রবাহিত হইয়া দুই ক্রোশ দূরে অনতিপ্রবল স্রোতে পরিণত হইয়া প্রপাত রূপে প্রায় ১০০ হাত উচ্চ হইতে দুই পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী উপত্যকায় পতিত হইতেছে। এই প্রপাতকে লোকে "কপিলধারা" বলে। শুনিলাম পুষ্করিণীর দক্ষিণ পূর্ব্ব অংশ হইতে আর একটী ক্ষীণ ধারা প্রবাহিত হইয়া মহানদীতে পরিণত হইয়াছে; এবং পুষ্করিণীর উত্তর পূর্ব্বাংশে প্রবাহিত ধারাই সুবর্ণভদ্রার মূল।

নর্ম্মদা নদীর ধারা পয়ঃপ্রণালী হইতে নির্গত হইয়া যে ভূভাগে প্রবাহিত হইয়াছে তাহা দুই পর্ব্বতের উপত্যকা ভূমি। উত্তরাংশ বোধ হয় রেঁওয়ারাজের এবং দক্ষিণাংশের পর্ব্বতমালা বোধ করি অন্য কোন রাজার সীমাভুক্ত,—কারণ উহার পাদদেশে অল্প অল্প অন্তরে সীমা নির্দ্দেশক খোঁটা প্রোথিত রহিয়াছে। কপিলধারায় যাইতে হইলে উত্তরাংশ অর্থাৎ অমরকণ্টকের পাদদেশ দিয়া যাইতে হয়। যাত্রীর চলাচল দ্বারা ভূমিতে একটি সংকীর্ণ চিহ্ন পড়িয়া গিয়াছে, ইহাকে এখানে "পাঁউডণ্ডী" বা শুঁড়িপথ বলে।

মনুষ্য প্রমাণ ঘাস ও জঙ্গল মধ্যে উহাই চলিবার একমাত্র পথ। এখানেও দল বাঁধিয়া যাইতে হয়। এপথে একলা দোকলা চলা বিপদ জনক। বনরাজ ব্যাঘ্রের সহিত সাক্ষাৎ হওয়া আশ্চর্য্য নহে। সাক্ষাৎ হইলে আর নিস্তার নাই। প্রায় ক্রোশ দেড়েক যাইবার পর নর্ম্মদার ধারা পর্ব্বতের একস্থানে একটী কুণ্ডরূপ হইয়া আবার বক্র হইয়া একটু দূরে গিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। এই কুণ্ডের নিকট অল্প উচ্চে উঠিয়া আবার আমাদের নীচে নামিতে হইল। ইহার অল্প-দূরেই কপিল ধারা। ইহার প্রায় দুইএক শত হাত পূর্ব্ব হইতে নর্ম্মদার গর্ভ একটী বৃহৎ শিলাপট্টের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। তাহার মধ্যে উচ্চ নীচ শিলাখণ্ড গ্রথিত রহিয়াছে। এই শিলাপট্টের উপর দিয়া নর্ম্মদা তর তর বেগে প্রবাহিত হইতেছে। প্রপাতের নিকট দুইটী ধারা হইয়া গিয়াছে। দক্ষিণের ধারাটী স্থূল উত্তরেরটী ক্ষীণ। এই দ্বিধারপ্রপাত শ্বেত ধূমকণায় নিম্নে শিলারাশির উপর পতিত হইতেছে। প্রপাত-শিখরে দাঁড়াইয়া দেখিলে নীচের দৃশ্য কি মনোরম ও ভয়ঙ্কর বোধ হয়। দুই পর্ব্বতের পাদদেশ উপত্যকা ভূমিতে গিয়া মিশিয়াছে। বিস্তৃত আকাশ যেন নিম্নে গিয়া সংকীর্ণ হইতে সংকীর্ণতর হইয়াছে, ক্ষুদ্র বৃহৎ শিলারাশির উপর দিয়া নর্ম্মদা কুলুকুলু করিয়া প্রবাহিত হইতেছে। এই দৃশ্য দেখিলে মনে নানা প্রকার আধ্যাত্মিক ভাবের উদয় হইয়া মন উদাস হইয়া যায়। ইচ্ছাকরে জগৎপিতার সেবায় নিযুক্ত হইয়া এই নির্জ্জন স্থানে অবস্থান করি। আবার প্রবৃত্তিতে যখন আমি এই স্থানেই

ব্যাঘ্ররাজের ক্রীড়াভূমি তখন এই প্রীতিকর স্থানও ভীতিপ্রদ হইয়া দাঁড়ায়। কপিল ধারার ঠিক উপরে দক্ষিণাংশে একজন উৎকল দেশীয় সন্ন্যাসীর একখানি কুটির। সাধু এখন একাকী আছেন। ইঁহার গুরুকে গতবৎসর বাঘে লইয়া যায়। তিনি আমাদিগের নিকট সরলভাবে নানা গল্প করিলেন। তাঁহার কাছে শুনিলাম, এই পর্ব্বতের একটী জঙ্গলময় হ্রদে "গুলবকাবলী" নামে একরূপ পুষ্প আছে তাহার রসে চক্ষের জ্যোতিঃ বৃদ্ধি ও নিশান্ধতা দূর হয়। তিনি নিজগুরুর কাহিনীও বিবৃত করিলেন।

গুরু এই কুটীরে বাস করিতেন শিষ্য তাঁহার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাকিতেন। এক দিন ধুনী জ্বলিতেছে; দিনের বেলায় ঝাঁপ খোলাই থাকিত, একটী বাঘ আসিয়া থাবা গাড়িয়া ঐ স্থানে বসিল। গুরু তরবারি হাতে লইয়া অগ্রসর হইলেন। বাঘকে আঘাত করিতে গিয়া তরবারি চালে বাধিয়া গেল। ব্যাঘ্র সেই অবসরে পলায়ন করিল কিন্তু গুরুর প্রতি তাহার জাতবৈরিতা রহিয়া গেল। এখানে রেঁওয়ারাজের হুকুমমত কেহ গুলি মারিয়া বাঘ শিকার করিতে পায় না। বনবীরকে সম্মুখযুদ্ধে কেহ তরবারি দ্বারা বধ করিতে পারিলে সে পুরস্কার পাইতে পারে কিন্তু বন্দুক দ্বারা বধ করিলে তাহাকে দণ্ডিত হইতে হয়। যাহা হউক একদিন রাজা কমিশনরের সহিত কপিলধারা দেখিতে আইসেন। গুরু সেদিন তাঁহার গরুগুলি লইয়া কুটিরে ফিরিতেছেন ইত্যবসরে একটী বাঘ আসিয়া সকল লোককে পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাকে লইয়া পলায়ন

করিল। তিনি জটাজুটে বিভূষিত ছিলেন; তাঁহার জটামণ্ডলে ৮০ থান মোহর সঞ্চিত এবং গেঁজে ও থলেতে ২৪০টী টাকা ছিল। বাঘ তাহাকে কোথায় লইয়া গেল কেহ তাহার সন্ধান পাইল না; তবে ২৪০৲ টাকার মধ্যে ৮০৲ টাকা পরে পাওয়া গিয়াছিল; তাহা তাঁহার শিষ্যকে প্রদত্ত হয়।

কপিলধারার নীচে দুই পর্ব্বতের পার্শ্বে নর্ম্মদা পরিভ্রমণকারী যাত্রীর যাইবার ও আসিবার দুইটী শুঁড়িপথ আছে। যাঁহারা নর্ম্মদা পরিভ্রমণ করেন তাঁহাদের জন্য রাজা, মহাজন ও জমিদারগণের প্রদত্ত অন্নসত্র বস্ত্র ও টাকার বন্দোবস্ত আছে। নর্ম্মদার তিনটী প্রধান তীর্থ আছে যথা অমরকণ্টক ভৃগুক্ষেত্র ও ওঙ্কারনাথ। অমরকণ্টকে দুই দিন অবস্থান করিয়া আমরা প্রত্যাবর্ত্তন কালে পুনরায় আমানালা হইতে গৌরীলা গমন করিলাম। বন্ধু কটনী হইতে পদব্রজে প্রয়াগ যাইবেন বলিলেন, আমি জব্বলপুরাভিমুখে যাত্রা করিলাম। মীরগঞ্জ ষ্টেসন হইতে মাইল দেড়েক চলিলেই ভৃগু ক্ষেত্র পাওয়া যায়। ভৃগুক্ষেত্রের চলিত নাম ভেড়াঘাট। এ স্থানে একটি অনতি-উচ্চ প্রপাত আছে। ইহার বহু পূর্ব্ব হইতে বিস্তৃত নর্ম্মদাস্রোত অত্যন্ত বেগে উচ্চনীচ অথচ একাঙ্গীভূত শিলাপট্টের উপর দিয়া হাহা করিয়া প্রবাহিত হইতেছে। এখানকার প্রপাত যদিও অধিক উচ্চ নহে কিন্তু প্রবলবেগে শিলাস্তূপের উপর পড়িয়া ধূমের ন্যায় জলকণারাশি বিকীর্ণ করিতেছে। এই কারণে এই প্রপাতের সাধারণ নাম "ধুঁয়াধার। ইহাই জব্বলপুরের প্রসিদ্ধ প্রপাত। এই স্থানের অনতি দূরে শ্বেতপর্ব্বতশ্রেণী বেষ্টিত একটি ক্ষুদ্র হ্রদ। ইংরাজ এই পাহাড় শ্রেণীকেই marble rocks বলেন। ইহার নিকটেই ডাকবাংলা। ইংরাজগণ জব্বলপুর হইতে ভাল এক্কাগাড়ী করিয়া দলে দলে প্রতি রবিবার প্রাতঃকালে এই মার্ব্বেল পাহাড় ও হ্রদ দেখিতে এখানে আগমন করেন। হ্রদে তাঁহাদের বিচরণের জন্য একখানি নৌকা আছে। তাঁহারা এখানে আমোদ প্রমোদ করিয়া বিকালে বা পরদিন চলিয়া যান। এই হ্রদের জল সুগভীর ও আয়নার ন্যায় নির্ম্মল। তটোপরি বাণকুণ্ড;—এইস্থানে ছোট বড় রাশি রাশি মার্জ্জিত মসৃণ কৃষ্ণ প্রস্তরের নুড়ি বিক্ষিপ্তভাবে পতিত রহিয়াছে ইহাদিগকে বাণলিঙ্গ বলে। বাণকুণ্ডের ভিতরে একটু উচ্চস্থানে শ্বেতপ্রস্তরের একটি স্বাভাবিক গুহা আছে ইহাতে একজন লোক পদ্মাসনে বসিয়া বেশ উপাসনা করিতে পারে। হ্রদের অন্যতটে একটি সন্ন্যাসী কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া বাস করেন। নিকটে দুইধারে উচ্চশ্বেত প্রস্তরের প্রাচীর উঠিয়াছে এবং নিম্নে পাথুরে কয়লার ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ বিস্তৃত শিলা অঙ্গবিস্তার করিয়া রহিয়াছে। শ্বেতপ্রস্তরের শিখর দেশে আবৃত অংশে মধুমক্ষিকাগণ বৃহৎ চাক নির্ম্মাণ করিয়াছে পুরাতন মধুচ্ছিষ্টগুলি নীচে পতিত হইয়াছে। এই মোম দুগ্ধের ন্যায় শুভ্র। মধুমক্ষিকাগণ বিজাতীয় শব্দ শুনিলে বড় বিরক্ত হয় এই কারণে কেহ তাহাদের চাকের নিম্নে কথাবার্ত্তা কহে না। সন্ন্যাসী বলেন রাত্রে সে স্থানে বাঘ আসে তিনি তাহাদিগকে রুটী দিয়া সৎকার করিয়া থাকেন। বাস্তবিকই

সন্ন্যাসীকে দ্বেষহিংসারহিত বলিয়া বোধ হইল। ডাক বাংলার নীচে ভৃগুমুনির তপোভূমি। এখানে একজন অল্প বয়সী সন্ন্যাসী থাকেন তাঁহারও প্রকৃতি মহাজন তুল্য। আমি ইঁহারই আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলাম। হ্রদের জল বর্ষায় যখন পূর্ণ হয় তখন নর্ম্মদা ইহাতে মিলিত হইয়া যায়। শীতকালে ইহাকে বেষ্টন করিয়া নর্ম্মদা প্রবাহিত হয়। ইহার নিকট একটী অল্প উচ্চ পাহাড়ের উপর ৬৪ যোগিনীর ভগ্ন মূর্ত্তি বিরাজ করিতেছে। এই মূর্ত্তিগুলি কালাপাহাড় জাতীয় কোন বিধর্ম্মীর আঘাতচিহ্ন অঙ্গে ধারণ করিয়া হিন্দুধর্ম্মের প্রতি অত্যাচারের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। উত্তরোত্তর অধিক শীত বৃদ্ধি হওয়ায় আমি ওঙ্কারনাথ দর্শন অভিলাষ পরিত্যাগ করিলাম। শুনিলাম উহা ভুসাওলের নিকট অবস্থিত। সেখানেও একটী কুণ্ড আছে। সেখানে যে বাণলিঙ্গ পাওয়া যায় তাহা সুডৌল ও নানাপ্রকার বর্ণ বিশিষ্ট। মীরগঞ্জ ষ্টেসনে দেখিলাম একপ্রকার মস্থণ পাথর স্তূপীকৃত রহিয়াছে; শুনিলাম একজন ইংরাজ বাড়ী নির্ম্মাণের জন্য বিলাত পাঠাইতেছে।

শ্রীকৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী।

পোষ্যপুত্র। পূর্ব্বের অনুবৃত্তি

শান্তি হারমোনিয়ম বাজাইতেছিল,—নীরদকুমার গৃহে প্রবেশ করায় লজ্জিতভাবে বাজনা বন্ধ করিল।

নীরদকুমার অনতিদূরে দাঁড়াইয়া চঞ্চলভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমাদের বাড়ি যাওয়ার দিন স্থির হয়েছে? কবে যেতে হবে?" শান্তি মুখ না তুলিয়াই উত্তর দিল "বোধহয় পরশু" "যোগেনও যাবে?" "তা ঠিক বলতে পারি না, মণিদি ও অনিল যাবে।" মিঃ রায় একটা চেয়ার সরাইয়া বসিলেন। "আমি কাল আসতে পারিনি বলে বুঝি রাগ হয়েছে? তুমিই শুধু রাগ করেছ না সবাই? হাসলে হবে না বল্‌তে হবে কে কে রাগ করেছে। মা সুকু যোগেন অনিল তুমি—আচ্ছা সুকুর কুকুরটাও কি রাগ করেছে না কি? সেটাকেও তো দেখতে পাচ্ছি না!"

করিয়া হাসিয়া ফেলিল "বাঃ কুকুর বুঝি রাগ করতে পারে? ওদের বুঝি ততো বুদ্ধি আছে? কুকুরটা রাগ করেনি"। মিঃ রায়ও হাসিয়া ফেলিলেন "আর তুমিও রাগ করোনি—না?" শান্তির ওষ্ঠপ্রান্তে যে ক্ষীণ সলজ্জ হাসিটুকু ফুটিতে ফুটিতে মিলাইয়া গেল, তাহাই তাঁহার প্রশ্নের উত্তরে যথেষ্ট। মিঃ রায় তাহার মধ্যকার একটুখানি অস্পষ্ট বিষাদের ক্ষীণছায়া লক্ষ্য করিলেন না, তাঁহার সুন্দর মুখ নূতন একটা ভাবের উচ্ছ্বাসে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। এমন সময় বাহিরে একটা দুপদাপ শব্দ ও একটা চীৎকার উঠিল "টেবি টেবি।" সশব্দে সুপ্রকাশ ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। তাহার হস্তে নূতন এয়ার গান্ এবং পশ্চাতে গলায় নীল ফিতা ও পায়ে রূপার ঘুঙুর পরা শ্বেতরোমাবৃত ক্ষুদ্রকায় কুকুর



যশোদা

ঘরে ঢুকিয়াই পুরাতন প্রভুর গলার শব্দ চিনিয়া নাচিয়া লাফাইয়া আনন্দধ্বনি করিয়া উঠিল। কৃতজ্ঞজীব এখনও তাঁহাকে ভুলে নাই। সুপ্রকাশ মিঃ রায়কে দেখিতে পাইয়াই গভীর অভিমানের সহিত ঈষৎ মুখ ফিরাইয়া লইয়া হস্তস্থ দ্রব্যটা পশ্চাৎদিকে লুকাইয়া ফেলিল। তাহার কালোচোখে অভিমানের জল আসিয়া পড়িয়াছিল, সে আজ কোন মতেই তাঁহার সহিত কথা কহিবে না। মিঃ রায় তাহা বুঝিলেন। তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিয়া বালকের বন্দুক শুদ্ধ হাতটা গ্রেপ্তার করিয়া ফেলিলেন "বাঃ সুন্দর বন্দুকটি তো। কিন্তু সুকু এখানে বেশ শিকার করা যেতো ভাই! কলকাতায় তো সে সুবিধা হবে না! আমরা দুজনে শিকার করতে কোনখানে যাবো বল-দেখি?" এ কথা শুনিয়া সুকু ও শান্তি দুজনেই একসঙ্গে প্রশ্ন করিয়া উঠিল "সত্যি! আপনি নাকি কলকাতায় যাবেন?" "যাবো বলেই ত কাল আসতে পারিনি। নানান ঝঞ্চট ঘাড়ে চাপান;—সেগুলো সাফ করে ফেলা চাই তো। সুকু তুমি এটা সহজেই ছুঁড়তে পারবে। কাল সকালেই আমি তোমায় শিখিয়ে দেবো, কি বলো?"

সুপ্রকাশের অভিমান দূর হইয়া গেল, সে আনন্দে বলিয়া উঠিল "হ্যাঁ হ্যাঁ, কালই আমায় শেখাবেন। একটা পাখী কিন্তু আমায় মারতে দিতে হবে।" শান্তি তাহার সব কথা গুলা বলা হইবার পূর্ব্বেই তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া উঠিল "নির্দ্দোষী জীবকে অনর্থক মেরে তোর কি সুখ হয় সুকু? আহা তোর কষ্ট হয় না? আগে তো এমন নিষ্ঠুর ছিলিনে?"

"কেন হবে? নীরদ বাবুর কি হয়? উনিই তো বলেন শিকার না করলে হাতের কৌশল না অভ্যাস করলে এর পরে যদি কখনো রাসিয়ানেরা আসে তা হলে লড়াই করতে পারবো কেমন করে? তখন কি লক্ষণ সেনের মতন খিড়কী দোর দিয়ে পালাবো? বাবাও তো তাই বলেন। তুমি কিন্তু আমার চেয়ে নীরদ বাবুকে বেশি ভালবাসো দিদি! আমারি দোষ ধর! কিন্তু ওঁর বেলাত কিছু বলোনা?"

সুকুর দিদি কাণ্ডজ্ঞান হীন ভাইটার এই বেফাঁস কথায় লজ্জায় যেন মরিয়া গেল। নীরদকুমার প্রীতিপূর্ণ নেত্রে চাহিয়া ঈষৎ স্নিগ্ধভাবে হাসিলেন। সুকু বলিল "সত্যি তুমি যাবে নীরদ বাবু! বেশ হবে কিন্তু তা হলে; আমরা দেশে গেলেই তো দিদির বিয়ে হবে, সে সময় তুমি থাকবে? কতো বাজনা বাজবে, আলো আর বাজি হবে। তুমি এমন করে চেয়ে রইলে যে? তুমি বুঝি শোননি দিদির যে এই মাসেই লক্ষ্মীপুরে বিয়ে হবে?"

মানুষকে সাপে কামড়াইলে সে যেমন আকস্মিক ভয়ে বিস্ময়ে চমকিয়া উঠে নীরদ-কুমারের সেই অবস্থা হইল; তিনি হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন "কোথায়? কোথায়?" সুপ্রকাশ তাঁহার কণ্ঠস্বরে অত্যন্ত বিস্মিত হইল। সে কিছু না বুঝিতে পারিয়া একবার তাহার দিদির দিকে চাহিয়া দেখিল। তাহার দিদি নতমুখে বসিয়া হারমোনিয়মের সুরগুলার উপর অঙ্গুলী দ্বারা মৃদু মৃদু আঘাত করিতেছিল। মিঃ রায়ের দিকে ফিরিয়া ধীরে ধীরে উত্তর করিল "লক্ষ্মীপুরে"। মিঃ রায় পরিত্যক্ত কেদারা খানার উপর বসিয়া পড়িয়া রুদ্ধ

শ্বাসে জিজ্ঞাসা করিলেন "লক্ষ্মীপুরে কাদের বাড়ি? কার সঙ্গে?"

বালক একটু ভাবিয়া বলিল "জ্যেঠামশাই-দের বাড়ি হেম বাবুর সঙ্গে। জ্যেঠামশাইকে চেনো না? তাঁর মস্ত সাদাদাড়ি নেই গল্পও জানেন না, তবুও তিনি আমাদের জ্যেঠামশাই আবার দিদির তিনি ছেলে হন। আমি তাঁর নামও বল্‌তে পারি, বলবো, তাঁর নাম শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামাকান্ত চৌধুরী, জানো নীরদ বাবু! হেম বাবু তাঁর ছেলে নয়,—বাবা মার কাছে বলছিলেন তাঁর ছেলে বিনোদ যদি ফিরে আসতো তাহলে আমি তার সঙ্গে বিয়ে দিতুম না, সে অন্য সব বিষয়েই ভাল ছেলে হলেও বাপের অবাধ্য। এ দত্তক ছেলে। বাবা বল্লেন এ বিনোদের চেয়ে না কি সুন্দর। বিনোদের কিন্তু খুব অন্যায় না নীরদ বাবু! সে কি করে তার বাবার অবাধ্য হলো! দিদি তাকে কক্ষণো বিয়ে করবে না, আমিও বাবার অবাধ্য হই না দিদিও বাবার অবাধ্য হয় না।"

মিঃ রায়ের মুখখানা মর্ম্মাহতের মত নীল হইয়া গিয়াছিল। অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তিনি কোন কথাই বলিতে পারিলেন না; তাঁহার রক্ত শূন্য বিবর্ণ ওষ্ঠ গভীর হতাশায় ঈষৎ কম্পিত হইল, তাহার মধ্য হইতে যেন সকল শক্তি চলিয়া গিয়াছিল একটিও ভাষা বাহির হইল না। সুপ্রকাশ তাঁহার অবস্থা লক্ষ্য করিল না। সে এবার তাহার দিদিকে লক্ষ্য করিয়া শরক্ষেপ করিল "হ্যাঁ দিদি, বাবা বল-ছিলেন তুমি হেমবাবুকে ভালবাসো। আমি কিন্তু তা কক্ষণো বাসতে দেবো না। তা হলে তুমি যদি আমায় আর ভাল না বাসো? তার চেয়ে বরং নীরদ বাবুকে ভাল বাসাও ভাল—ঐ বুঝি বাবা আসছেন।" বলিয়া সে ছুটিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। টেবিও তাহার অনুসরণ করিতে ভুলিল না। এই অপ্রত্যাশিত নিষ্ঠুর আঘাতে নীরদকুমারকে এক মুহূর্ত্ত যেন বজ্র স্তম্ভিত করিয়া ফেলিল। কিন্তু মুহূর্ত্ত মাত্র পরে সেই আকস্মিক বিহ্বলতার স্থানে একটা গভীর উত্তেজনা জাগিয়া উঠিয়া তাঁহার অসাড় মনোবৃত্তি সকল পুনশ্চ সচেতন করিয়া তুলিল। অকস্মাৎ কেদারা ছাড়িয়া উঠিয়া দ্রুতপদে তিনি শান্তির নিকটে গিয়া আর্ত্তকণ্ঠে বলিয়া ফেলিলেন "ওকথা, আমি বিশ্বাস করতে পার্ব্বোনা শান্তি! ওকথা আমি বিশ্বাস করতে পার্ব্বোনা! শোন শান্তি! তুমি আমার অন্ধকার জীবনের ধ্রুবতারা। সেই কথাই আমি আজ তোমার বাবাকে বল্‌তে এসেছি। এমন সময় এমন আঘাত দিও না, বলো শান্তি সুকুর কথা সত্য নয়?"

একটা অস্ফুট ধ্বনি করিয়া শান্তি দুই হাতের মধ্যে মুখ ঢাকিল। সে আগেই তাহার বিবাহের কথা শুনিয়াছিল। "নীরদকুমার উন্মাদের মত তাহার একটা হাত মুখের উপর হইতে সরাইয়া লইতে গেলেন। কিন্তু সহসা ঈষৎ আত্মস্থ ভাবে সেই প্রসারিত কম্পিত হস্ত ততোধিক কম্পিত আর এক খানা হস্ত স্পর্শ না করিয়া নিজের উদ্বেলিত বক্ষে বদ্ধ করিয়া উত্তেজনাপূর্ণ কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন "আমি তোমায় পত্নীরূপে পাবার যোগ্য নই। কিন্তু মানুষ সকল সময় যোগ্যাযোগ্য বিচার করে আশা করে না শান্তি; শুধু তুমি বলো, তোমার কোন আপত্তি নেই তারপর আমি তোমার বাবার কাছে গিয়ে আমার যা

বলবার আছে, সব বলবো। শুনে তিনি আমার ভাগ্য নির্ণয় করবেন।"

শান্তি তথাপি উভয় হস্তে মুখাবৃত করিয়া রহিল। তাহার বুকের রক্তটা যেন বরফ-পিণ্ডের মত জমাট বাধিতে আরম্ভ করিয়াছিল। সে কি বলিবে? প্রথমকার প্রবল আঘাত জনিত অসহ্য বেদনা সহ্যের সীমানায় ফিরিলে ঈষৎ লজ্জিত হইয়া নীরদকুমার একটু সরিয়া দাঁড়াইলেন; শান্তি মুখ তুলিল না। একটা অব্যক্ত ব্যথায় তাহার ক্ষুদ্র দেহ খানি ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল। কেন তিনি তাহাকে এমন ভাবে ভাল বাসিলেন! সেই কি তবে তাঁহার চিরদুঃখের কারণ হইল? সেও তো তাঁহাকে ভালবাসে কিন্তু জানিত না অভিধানে সে ভালবাসার কি অর্থ লেখে,—ভালবাসাকে সে শুধু সেই নামেই জানিত, কিন্তু সেদিন মাত্র সেই অজ্ঞাত মনোবৃত্তি অস্ফুটবাক শিশুর প্রথম আধ আধ বুলির ন্যায় চারিদিকের ইঙ্গিতে যেন নবজীবন লাভ করিয়া কি একটা অপূর্ব্বশ্রুত অস্পষ্ট গুঞ্জন আরম্ভ করিয়াছিল। কিন্তু যে মুহূর্ত্তে সে বুঝিল এ মুকুল সূর্য্যমুখী নহে, ইহা কুমুদকলি, সেই মুহূর্ত্তেই সেই আধ খোলা পাপড়িখানি মুদিত হইয়া আসিয়াছে। যতোটুকু ক্ষুদ্রই হোক কর্ত্তব্যপরায়ণ পিতার কন্যা কর্ত্তব্যের বোঝা বহিতে কোন অবস্থাতেই অপারগ নহে। সে বোঝা যতই ভারি হোক্ শান্তি তাহা বহিবেই।

বহুক্ষণ একদৃষ্টে তাহার আনত মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া আবার ধীরে ধীরে তাহার কাছে একটু অগ্রসর হইয়া আসিয়া অত্যন্ত কোমল অত্যন্ত স্নেহপূর্ণ স্বরে নীরদ-কুমার বলিলেন "শান্তি মুখ তোলো আমার কথার উত্তর দাও। তুমি কি আমার কথা বুঝতে পারছো না? আমি তোমায় চাই। মনে করোনা এ ক্ষণিক মোহ; আমার মনের ভাব আমি ভালরূপেই জানি। যেদিন যোগেনের বাগানে বনদেবীর মতন ফুলরাশির মধ্যে শ্রেষ্ঠ ফুলের মতন তুমি দাঁড়িয়ে ছিলে, সেই মুহূর্ত্তেই আমার বিশ্বাস পরিবর্ত্তিত হয়েছে। তারপর এই কয়মাসে অনেক চেষ্টা করেছি কিন্তু যা কখনো কেউ পারেনি তুমি তাই করেছ! তুমি আমায় পরাজিত করেছো। আমার গর্ব্বিত আত্মাভিমানে পরিপূর্ণ হৃদয় তোমার ওই দুটি স্বচ্ছ কালো চোখের একটু খানি করুণ দৃষ্টির মধ্যে একান্ত ভাবে আত্মসমর্পণ করেছে। আমার বর্ত্তমান আমার ভবিষ্যৎ সব আমি তোমার মধ্যে হারিয়ে ফেলেছি। আমার ভ্রম, আমার অহঙ্কার সব চূর্ণ হয়ে গ্যাছে। এখন আমি তোমার পবিত্রতায় সেসব মলিনতা দূরে ফেলে জটিল জীবনজাল সোজা পথে ফিরিয়ে নিতে চাই, বলো শান্তি তুমি এ ভিখারীর দান দয়া করে গ্রহণ করবে?"

নীরদকুমার উৎকণ্ঠিত নেত্রে তাহার বেদনা চিহ্ন প্রকটিত মুখের দিকে চাহিয়া পুনশ্চ উচ্ছাসভরে বলিতে লাগিলেন "জীবনের কোন রহস্য কোন পাপ আমি তোমার অজ্ঞাত রাখতে চাইনা, সকল কথা স্পষ্ট করে বলতে অনেক বিলম্ব হবে, তবে এখন এই পর্য্যন্ত বলছি আমি নিষ্পাপ নই। মানবের স্বভাবজাত ভ্রম ও দুর্ব্বলতা আমাকে পুনঃপুনঃ পথ ভ্রষ্ট করেছে। আমার জীবনের প্রথম

প্রভাতে আর একদিন আমি এমনি শুভাবসর পেয়েছিলাম, কিন্তু শান্তি, অকপটে আমি স্বীকার করছি, চেষ্টা করেও সেখানে আমি ভালবাসা আনতে পারিনি, সে জন্য আমায় দোষ দিও না ;—সূর্য্যকে লোকে পূজা করতে পারে ভয় ও ভক্তি করতে পারে, কিন্তু সুধাবর্ষী চাঁদকেই ভালবাসে। একি শান্তি তুমি কাঁদচো ?"—দারুণ সন্দেহে বিবর্ণ মুখে অবরুদ্ধ প্রায় স্বরে নীরদকুমার সহসা চমকিয়া বলিয়া উঠিলেন "বুঝেছি শান্তি! এ পৃথিবীতে আমার আর কোন আশাই নাই। নূতন আশায় যে আবার আকাশ কুসুমে মালা গাঁথিতে ছিলাম, তাহা ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। আমার সব ফুরাইল।"

আহত নীরদকুমার মাতালের মতন স্খলিত পদে নিজের পরিত্যক্ত আসনের উপর বসিয়া পড়িলেন। তাঁহার মনে হইতে ছিল চারিদিকের কৌচ কেদারা সাজসরঞ্জাম সমেত সমস্ত ঘরটা তাঁহারি চারিদিকে উন্মাদ তাণ্ডবে নাচিয়া বেড়াইতেছে।

আর শান্তিও কি আঘাত পায় নাই? সে ভাবিল তাহার অপরাধের বুঝি সীমা হয় না! কি বিশ্বস্ত হৃদয়ে সে বজ্র নিক্ষেপ করিতেছে। সে কি নিষ্ঠুর! অথচ দেবতা জানেন সে কত নিরুপায়! সে যে অন্যের বাগ্দত্তা, সে যে উৎসর্গিত ফুল! সে তাঁহাকে ভক্তি শ্রদ্ধা বিশ্বাস সবি দিতে পারে কিন্তু এতোটুকুও তো সান্তনা দিতে পারে না।" ঘড়িতে আটটা বাজিয়া গেল ভিতরের কক্ষ হইতে সুপ্রকাশের কণ্ঠ শুনিতে পাওয়া গেল,—সে বলিতেছে "চলোনা বাবা, [illegible]

চিটি পড়ে শুনিও। জ্যেঠামশাই কেন সকাল বেলা চিঠি লিখতে পারেনি?"

নীরদকুমার স্তব্ধতার মধ্য হইতে জাগিয়া উঠিলেন। চাহিয়া দেখিলেন, শান্তি হারমোনিয়মের ডালাটার উপর মাথা রাখিয়া নীরবে কাঁদিতেছে। আবেগপূর্ণ কণ্ঠে কহিলেন "তোমায় আঘাত দিয়াছি ভাল করি নাই শান্তি! আমার বিশ্বাস হয়েছিল তুমিও আমায় ভালবাসো তাই আমি এতোদূর সাহস করেছিলেম। আমায় ক্ষমা করো।" শান্তি সহসা তাহার অশ্রুপ্লাবিত করুণ দৃষ্টি তুলিয়া কাতর কণ্ঠে বলিল "কেন আপনি এমন কথা বলছেন। আমাদের উপর রাগ কর্ব্বেন না! আপনি বিশ্বাস করুন আমরা চিরদিনই আপনার কথা মনে রাখবো। আমরা কি এতো অকৃতজ্ঞ বলে আপনি মনে করেন? আমরা তো সকলেই আপনাকে ভক্তি করি, সম্মান করি। মা আপনাকে কতো ভালবাসেন! আর বরাবরই বাসবেন—"

"ভালবাসা" কথাটা তাহার মুখ হইতে কোনমতেই বাহির হইল না। ছি ছি সে কি নভেলের স্বেচ্ছাচারিণী নায়িকা? কেমন করিয়া সে বলিবে সেও তাঁহাকে ভালবাসে।

নীরদকুমার কয়েক মুহূর্ত্ত চুপ করিয়া রহিলেন। তাঁহার পাণ্ডু মুখ হইতে অবশিষ্ট শোণিতবিন্দুটুকুও কে যেন শুষিয়া লইল। কিন্তু তখনও বুঝি আশা ছাড়িতে পারিতেছিলেন না। বুঝি শেষ মুহূর্ত্তেও একটা প্রত্যাশিত কথা শুনিবার অপেক্ষা করিতে ছিলেন। তারপর ঈষৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন "তাই

ভালো, তাই ভালো, শান্তি! তুমি যা আমায় ইচ্ছা করে দেবে তাই আমি মাথায় তুলে নেবো। ভক্তি! সম্মান! আমার পক্ষে তাই যথেষ্ট!" তিনি শান্তির কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন, মৃদুস্বরে বলিলেন "তবে বিদায় শান্তি, বোধ হয় জন্মের মত বিদায়। আশীর্ব্বাদ করি উপযুক্ত পাত্রে পড়ে সুখী হয়ো। বাস্তবিকই আমি তোমায় পাবার উপযুক্ত নই।" নীরদকুমার চলিয়া গেলেন। রজনীনাথের সহিত পাছে সাক্ষাৎ হইয়া যায় এই ভয়ে একটু দ্রুত পদেই চলিয়া গেলেন। শান্তি একা সেইখানেই ভারাক্রান্ত বক্ষ লইয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। এ ঘটনাটা কি সত্য কিম্বা এতক্ষণ সে একখানা করুণ কাহিনীর একটা পৃষ্ঠা পড়িতেছিল, তাহাও যেন ভাল করিয়া অনুভব করিতে পারিতে ছিল না। কেবল তাহার মসীরেখাহীন অমল হৃদয়ে একটা কালির রেখা পড়িয়া গেল! হায় এ করুণ অভিনয়টা অনভিনীত থাকিলেই বা ক্ষতি ছিল কি! এ অস্পষ্ট চিত্রখানাকে কেন তিনি অস্পষ্টই থাকিতে দিলেন না!

(১৪)

নীরদ কুমারের নূতন জীবনের নবীন আশা অকস্মাৎ প্রবল ঝঞ্ঝা বাত্যায় ছিন্ন ভিন্ন হইয়া ধূলি লুণ্ঠিত হইল। তিনি সারাদিন তাঁহার অংশীদারদের বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া দিন কতোকের জন্য যে অবসর চাহিয়া লইয়াছিলেন, বাড়ী ফিরিবার পূর্ব্বেই পথের মধ্যেই স্থির হইয়া গেল তাহার আর আবশ্যক নাই। তাঁহার দেশে ফিরিবার প্রয়োজন ফুরাইয়াছে।

ঘরের মধ্যে জিনিষপত্র সব বিশৃঙ্খল, একটা পোর্টমেণ্ট অর্দ্ধসজ্জিত এবং দুইটা ছোট বড় চামড়ার ব্যাগ সাজান পড়িয়া আছে। নীরদকুমার বাড়ী ফিরিয়াই তাঁহার শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

ভৃত্য কাছে আসিতেই বিরক্ত চিত্তে তাহাকে বিদায় করিয়া দিলেন। রান্নাঘরে পাচক তাঁহার আহার্য্য লইয়া প্রতীক্ষা করিতেছে, আহ্বান না পাইয়া আসিতে সাহস করিল না। তা ছাড়া সে জানিত অর্দ্ধেকেরও অধিক দিন ইহার প্রয়োজন হয় না। নীরদ দ্বাররুদ্ধ করিয়া একেবারে বিছানার উপরে শুইয়া পড়িলেন। কাপড় চোপড় গুলা পর্য্যন্ত ছাড়া হইল না। আজ এতোটুকু হস্ত পদ বা মনের শক্তি খরচ করা তাঁহার পক্ষে যেন অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। পৃথিবীর যতোকিছু আবশ্যক অনাবশ্যক খুঁটিনাটি আজ যেন তাঁহার নিকট মস্ত বড় বোঝার মতন ভার ঠেকিতে ছিল। যেন আর কিছুরি প্রয়োজন ছিল না। এখন এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডটা রহিল কি গেল তাহাও খোঁজ করিবার আবশ্যক করে না। সব ফুরাইয়া গিয়াছে!

কি ফুরাইয়াছে? কিবা ছিল, গেলই বা কি? এ কথা মনে অনেকবারই উঠিতে ছিল। কি ছিল? অনেক ছিল, অনন্ত স্নেহ, অতুল সম্মান, অপ্রতিহত অধিকার কি ছিল না? সংসারে লোকে যাহা পাইলে ধন্য মনে করে, যাহা কিছু কামনার তা সবি ছিল। কিন্তু সে সব তো অনেক দিনই গিয়াছে। তবে আবার আজ এতোদিন পরে ইহা নূতন করিয়া অনুভব করা

কেন? 'সব ফুরাইল! ফুরাইয়াছে!' হাঁ ফুরাইয়াছে সত্য কিন্তু সে কাহার জন্য? কাহার দোষে ফুরাইল? নিজেরই দোষে নহে কি? কে স্বেচ্ছায় জেদে পড়িয়া বৃথা অহঙ্কারে অন্ধ হইয়া অভিমানে জ্ঞানশূন্য হইয়া সুখের সংসার সাধের কানন ছাড়িয়া অকৃতজ্ঞের মতন চলিয়া আসিয়াছিল? স্নেহময় জনকের আত্মবিস্মৃত প্রাণ ঢালা ভালবাসা, তাহা কি সেই তুচ্ছ কারণে পরিত্যাগ করিবার? নিষ্ঠুর হৃদয়হীন একবার পশ্চাতে চাহিয়া দেখিলনা, নিজের খেয়ালে নিজের দর্পে অনায়াসে সে স্নেহনীড় ছাড়িয়া আসিল! না হয় অন্যায় করিয়াই ফেলিয়াছিল,—কিন্তু তারও ত পথ ছিল। ভুলতো বুঝিয়াছে কিন্তু তাহার সংশোধন করিল কই? কেন আবার কাঁদিয়া গিয়া তাঁহার বুকে পড়িল না? সে বুক তো তাহারি জন্য পাতা ছিল।

আর তাহাকে বিপদে আশ্রয় দিয়া অক্লান্ত শুশ্রূষায় প্রাণপণে যে বাঁচাইয়া তুলিয়াছে তাহাকেই বা সে কি প্রতিদান দিল? এতদিন নীরদ ভাবিয়াছে "সে যে দয়া করিয়া শিবানীকে গ্রহণ করিয়াছিল, ভালবাসিতে ইচ্ছাও করিয়াছিল সে পুরস্কার সিদ্ধেশ্বরীর মেয়ের পক্ষে যথেষ্ট। তারপর স্বেচ্ছায় সে যখন সে অধিকার ত্যাগ করিল তখন নীরদ করিবে? তাহার ইহাতে অপরাধ কি?" কিন্তু ঠিক কি তাই? কই সে কথা তো আজ সে ভাবিতে পারিল না! কেন মনে হইতে লাগিল 'সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত এই। সে তাহার প্রতিশ্রুতি মন্ত্র, অগ্নি দেবতা, এবং তাহার অপমান করিয়াছে, আজ শাস্তি তাহার শোধ দিল। কেন দিবে না? ঈশ্বরের নিরপেক্ষ ন্যায় বিচারে যথার্থই তো সে এই অপমানদণ্ড ভোগ করিবার যোগ্য। কে বলে কর্ম্মফল নাই? তবে বেশ করিয়াছ শাস্তি ভালই করিয়াছ।' নীরদকুমার বিছানায় উঠিয়া বসিলেন। পড়িয়া পড়িয়া ভাবিতে ভাবিতে নিজের জন্য একটা কিছু সাফাই খুঁজিতেছিলেন। পরাজিত প্রায় উকিল হাল ছাড়িয়া দিবার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে সহসা বিপক্ষ পক্ষের এতোটুকু একটুখানি ছল পাইয়া নূতন উৎসাহে সেইটুকু লইয়াই আবার চাপিয়া ধরে, নীরদকুমারও তেমনি হতাশার শেষ প্রান্তে দাঁড়াইয়া নিজেকে সাফাই করিবার একটা পথ পাইয়া ঈষৎ আশ্বস্তচিত্তে উঠিয়া বসিলেন "শিবানীর প্রতি আমার ব্যবহার খুব বেশি অন্যায় নয়। কেন সেতো স্পষ্টই স্বীকার করিয়াছে সে আমাকে ঘৃণা করে। তবে? যে স্ত্রী স্বামীকে বিশ্বাস করে না যে বিনা প্রমাণে পরের কথায় নির্ভর করিয়া তাহাকে ঘৃণা করে, তাচ্ছিল্য করে, স্বামীই বা কেন তাহাকে পরিত্যাগ করিতে পারিবে না? অবশ্য পারিবে। এতোই কিসের অবিশ্বাস? আমি মাতাল? আমি দুশ্চরিত্র! কিছু কি প্রমাণ পাইয়াছিল? আমি উপার্জ্জনে অক্ষম তা সত্য, কিন্তু যখন তাহার মা আমার সহিত বিবাহ দেয় তখন তো অসহায় পথিক ভিন্ন আমি নিজেকে জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট বা রাজপুত্র বলিয়া জাহির করি নাই, এবং আমি ইচ্ছা করিয়াও তাহাকে বিবাহ করি

জন্যই হইয়াছিল। সে ক্ষতি সত্বেও তাহার জন্য অনর্থক তাহাদের বাড়ীতে আমার অকথ্য লাঞ্ছনা সহিতে হইয়াছে। তাহাও সহিয়াছিলাম, শেষে যাহার জন্য সহিলাম, সেও আমায় ঘৃণা করিল, তাচ্ছিল্য করিল। স্বামীকে অপমান করা স্ত্রীর ধর্ম্ম নহে! আমি সেখানে বেশি অপরাধী নই।"

অপরাধীর পক্ষে অপরাধী নই—একথা ভাবিতে পাওয়া কম আরামের নয়। বুকের ভারটা যেন এ চিন্তায় অনেকখানি কমিয়া যায়। কণ্ঠের কাছ পর্য্যন্ত যে নিশ্বাসটা রুদ্ধ হইয়া কণ্ঠনালিকে চাপিয়া রাখিয়াছে, তাহা যেন কতোকটা হাল্কা হইয়া বাহির হইয়া পড়ে। বৎসর খানেক হইল, কোচিনে যখন কলেরা রোগে সে মরণাপন্ন হইয়াছিল, সেই সময়ে একজন বৃদ্ধ প্রতিবেশী দ্বারা পত্র লিখাইয়া হাজার টাকা রেজিষ্ট্রী করাইয়া বৃন্দাবনে পাঠায়, তখন সেটা সে স্নেহ বা ভালবাসার জন্য করে নাই। সেটা যেন তাহার ঋণ পরিশোধ। তারপর মৃত্যু আসিয়া মাথার শিয়রে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া, কে জানে কি ভাবিয়া ফিরিয়া গেল। যেমন আসিয়াছিল, তেমনি রিক্তহস্তেই ফিরিল, বরং একটুখানি শিক্ষা দিয়া গেল। এইটুকু বুঝাইয়া গেল যে আত্মীয়ের একটু গঞ্জনা সহিতে অভ্যস্থ হইলে নিদারুণ তৃষ্ণায় শীতল জল ও প্রবল যন্ত্রণায় অক্লান্ত শুশ্রূষা অত্যন্ত সহজেই পাওয়া যায়। রোগমুক্তির পরই দ্বিতীয়পত্র লিখিবার একটা আগ্রহ জন্মিল। কিন্তু পরক্ষণেই সে আগ্রহ নিভিয়া গেল। আবার সেই দারিদ্র্য লইয়া তাহার নিকট পরিচিত হইতে ইচ্ছা হইল না। বরং তাহাদের সম্পর্ক মিটিয়া গিয়াছে এক রকম ভাল। যদি কখনো অবস্থা ভাল হয় তখন তাহাকে পত্র লিখিবে ইহাই সঙ্কল্প করিয়া রহিল। কিন্তু যখন তাহার অবস্থা ফিরিল— তখন দৈবগতিকে তাহার ইচ্ছাও ফিরিয়া গেল। শান্তি আসিয়া শিবানীর আকাঙ্খিত সিংহাসনখানা দখল করিয়া লইল। সেখানা শিবানীর জন্য পাতা হইয়াছিল এই মাত্র, কিন্তু তাহাকে তো বসিতে দেওয়া হয় নাই, তাই খালিই পড়িয়াছিল! আর যেটুকু সে দখল করিয়া লইয়াছিল, এতোদিনে বুঝি তাহাও তামাদি হইয়া গিয়াছে।

তারপর বিধাতা সুবর্ণ-সুযোগ মিলাইয়া দিলেন। নীরদকুমার ভাবিল তাহার অদৃষ্টাকাশ হইতে অগ্নিমুখী ধূমকেতুটা বুঝি এতো দিনে নামিয়া গেল। অকস্মাৎ এই ভারতের এক প্রান্তে মাদুরায় শান্তির সহিত অপ্রত্যাশিত সাক্ষাতে তাহার সমুদয় মনঃপ্রাণ যেন সেই মুহূর্ত্তে পূর্ণচন্দ্রের উদয়ে জোয়ারের জলের মত উথলিয়া উঠিল। সে ভাবিল এর চেয়ে উত্তম ঘটনা মানব জীবন ইতিহাসে অল্পই ঘটিয়াছে। শান্তিকে যদি সে পায় তাহা হইলে অনায়াসেই আবার সে নিজের পরিত্যক্ত অধিকারে ফিরিয়া যাইতে পারিবে এবং নিজের অপরাধের কালিমা পুণ্যময়ী বালিকার মধ্যে মুছিয়া ফেলিয়া আবার তেমনি স্নেহের দাবীতে পিতার নিকট গিয়া দাঁড়াইতে পারিবে। তবে শান্তিকে পাইবার পক্ষে তাহার একমাত্র বাধা শিবানী; তা সে এমনিই কি প্রবল বাধা? কোথায় এক দরিদ্র অনাথার অশিক্ষিতা কন্যা শিবানী সেকি শান্তির প্রতিদ্বন্দী হইয়া

দাঁড়াইবার উপযুক্ত! থাক না সে পড়িয়া। তারপর যখন বিবাহের পর একদিন অত্যন্ত সাবধানে শান্তির কোমল হাতখানি হাতে ধরিয়া তাহার কালোচোখের দৃষ্টির সহিত দৃষ্টি মিলাইয়া পুনঃপুনঃ ক্ষমা চাহিয়া সব কথা তাহাকে বলিবে তখন সে করুণা-ময়ী কখনোই তাহাকে ক্ষমা না করিয়া থাকিতে পারিবে না। সে যদি ক্ষমা করে তবে আর কে করিবে না? দুইবার বিবাহে আর কাহার ক্ষতি? রজনী নাথ? কন্যা ক্ষমা করিলে বাপ কি করিবেন না? নীরদ-কুমার নিতান্ত অলীক বিশ্বাস স্থাপন করে নাই। সে ঠিকই বুঝিয়াছিল, একবার সে যদি লালসাড়ি ও সোণার সিঁথিমৌড় পরা কল্যাণময়ী শান্তিকে নববধূবেশে তাহার রেশমী চাদরের গ্রন্থি বন্ধনে পাশে লইয়া দাঁড়াইতে পারে, তাহা হইলে ক্ষমা সেই মুহূর্ত্তে দুইবাহু প্রসারণ করিয়া তাহার জন্য এগাইয়া আসিবে। তাহার কল্যাণবর্ষী স্নিগ্ধ হাসি টুকুতে তাহাদের কঠিন কৈফিয়ৎ মিটাইয়া দিয়া দীর্ঘ তাপদাহ মুহূর্ত্তে জুড়াইয়া দিবে। সে বুঝিয়াছিল শান্তির উপরেই তাহার সমুদয় সুখশান্তি নির্ভর করিতেছে। তাহাকে তাহার পাইতেই হইবে; সেই সঙ্গে রজনী নাথকে দ্বিতীয় পিতাস্বরূপে পাওয়াও তাহার নিকট অল্প প্রার্থনীয় নয়।

কিন্তু এক মুহূর্ত্তেই সকল আশা ভরসা নির্ম্মূল হইয়া গেল; তাই ঘরে ফিরিয়া নীরদ-কুমার ভাবিলেন সব শেষ! শুধু শান্তি নয় শান্তির সঙ্গে সঙ্গে তাহার সুখশান্তি সবি গেল! এখন তাঁহার কর্ত্তব্য কি? এখন কি আর তিনি রজনীনাথকে বলিতে পারেন, আমি শান্তিকে চাহি! তার পর যদি রজনীনাথ পূর্ব্ব কয়বৎসরের ইতিহাস শুনিতে চাহেন? নীরদকুমারতো মিথ্যা-বাদী নন তাহা হইলে সকল কথাই প্রকাশ করিয়া বলিতে হইবে। সে সকল কথা শুনিবার সময় রজনীনাথের ওষ্ঠপ্রান্ত তীব্র উপহাসের হৃদয়ভেদী তীক্ষ্ণ অথচ অস্পষ্ট হাস্যের আভাষে কিপ্রকার গভীর ঘৃণা-কুঞ্চিত হইয়া উঠিবে তাহা কল্পনানেত্রে দর্শন করিয়া সে যেন লজ্জা ও ক্ষোভে মরিয়া গেল। বন্ধুমতার প্রবল স্নেহ কেমন করিয়া গভীর ঘৃণায় পরিবর্ত্তিত হইয়া দাঁড়াইবে, শান্তি তাহাকে কি মনে করিবে এই সকল মনে করিয়া তাহার সমস্ত আশাভরসা চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া গেল। আর নীরদ তখন মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিল আত্মপ্রকাশে সে শান্তিকে পাইবে না—আত্ম প্রকাশে কেবল এখন শান্তিরই সুখ শান্তি নষ্ট হইবে। হউক হেমেন্দ্রের সঙ্গেই শান্তির বিবাহ হউক,—হেমেন্দ্রই তাহার বিষ-য়ের অধিকারী হউক—ইহাই তাহার বিবাহ যৌতুক। বেদনায় বুক ফাটিয়া পড়িতে চাহিল! এর চেয়ে তাহার পাপের সহজ শাস্তি আর কি হইতে পারে? সে দেখিল কর্ম্মফল অকাট্য! উদ্দাম কর্ম্মস্রোতে সে ভাসিয়া চলিয়াছে, ভাসিতেই হইবে। কূলে উঠিবার চেষ্টা এখন বৃথা!

নীরদ ভোরের বেলা ভৃত্যকে গাড়ি তৈয়ার করিতে বলিয়া কাগজপত্র লৌহ সিন্দুকে আবদ্ধ করিল। তার পর ভ্রমণের পোষাকে বাহির হইয়া গেল। ভৃত্যকে বলিয়া গেল "যদি কেহ আমার অনুসন্ধান করে তো বলিস আমি বিশেষ প্রয়োজনে রামনাদে চলিলাম; দিন

পনেরো সেখানে আমার বিলম্ব হইবে, হয় তো বেশিদিনও হইতে পারে।" ভৃত্য বিস্মিত হইয়া বলিল "তবে জিনিষপত্র ?"—মিঃ রায় অধৈর্য্য ভাবে মাথা নাড়িলেন, "কিছু না, কিছুনা কিছুই প্রয়োজন নাই।" মনের বিষম উত্তেজনা আবেগে আবার একবার কাণ্ডজ্ঞান শূন্য হইয়া অকূলে জীবনতরী ভাসাইয়া দিলেন।

কোচিন-চীন।

(ফরাসী হইতে)

৬ ফেব্রুয়ারি।

প্রত্যূষেই পাল্কী করিয়া Tam-ky হইতে প্রস্থান করিলাম। এই পাল্কী একপ্রকার (hamac) ঝোলা-বিশেষ, নীরেট বাঁশে ঝোলানো, ছাদটা খড় দিয়া ছাওয়া। একজন য়ুরোপীয়কে বহন করিতে ৪ জন এবং একজন দেশীয়কে বহন করিতে ২ জন লোক লাগে। আমাদের সঙ্গে একজন অ্যানাম্‌বাসী ভৃত্য, অনেক বোজ্‌কা বুজ্‌কি,—কাজেই ২০ জন লোক লইতে হইল। (গ্রামাধ্যক্ষ) Huyen-এর একজন সেপাই আমাদের আগে আগে চলিয়াছে; এবং একটা ঢাক বাজাইয়া লোক সংগ্রহ করিতেছে। একটা গাছের গুঁড়ি কুড়িয়া এই ঢাক নির্ম্মিত। চাষারা তাহাদের গৃহ কিংবা ক্ষেত ত্যাগ করিয়া, আমাদের পাল্কী ও বোজ্‌কা-বুজ্‌কি নিকটস্থ গ্রাম পর্য্যন্ত বহিয়া লইয়া যাইতেছে।

পাল্কীর মধ্যে সটান শুইয়া পড়িয়া নিদ্রা যাইতেছি; মধ্যে মধ্যে, বাহকদিগের ঈষৎ পদস্খলন হইলেই জাগিয়া উঠিতেছি। সূর্য্যোদয় হইলে, হাঁটিয়া চলিতে আমাদের ভাল লাগে। পাল্কীর মধ্যে হইতে দৃশ্যগুলা কেমন অস্বাভাবিক ও বিকৃতভাবে দেখা যায়।—বাতাস বেশ ঠাণ্ডা ও তীব্র। ফ্রান্‌সে বসন্তের উষা যেরূপ, কতকটা সেইরূপ মনে হয়।

অ্যানামের এই মাঠ-ময়দান অতীব রমণীয়। প্রথমে ধানের ক্ষেত; তাহার পর, নিবিড় অরণ্য; কত কদলী বৃক্ষ, উহার চওড়া পাতাগুলা ঘোর সবুজ; কত বাঁশবন, উহার সরু সরু পাতাগুলা উজ্জ্বল-হরিৎ; কত সুপারি-গাছ, তাহার দীর্ঘ কাণ্ডের শীর্ষদেশ হইতে পাখীর পালকের মত পত্র সকল ঝুলিয়া পড়িয়াছে; দূরে, উচ্চ-উচ্চ গিরিসমূহ লঘু বাষ্পে আচ্ছন্ন হইয়া যেন মনোরাজ্যে পরিণত হইয়াছে।

মধ্যে মধ্যে, যাত্রা-পথে, চাষারা আমাদের সম্মুখে আসিয়া পড়িতেছে; উহারা আমাদের দেখিয়া, ভদ্রভাবে মাথা হইতে টোপা খুলিতেছে; এই বৃহৎ খড়ের টোপাগুল মণ্ডলাকার কিংবা কোণালু...পথের দক্ষিণভাগে একটা উষ্ণ জলের উৎস দেখা গেল; তাহা হইতে ধূমরাশি উত্থিত হইতেছে। এই উৎস নব-জীলণ্ডের উত্তর-প্রদেশ মনে করাইয়া দেয়। এই সকল জলাশয়ের ফুটন্ত জলে Maorigণ উহাদের আলু সিদ্ধ করিয়া লয়।...

প্রায় মধ্যাহ্ন সময়ে, আমরা একটা তরু-

সমাচ্ছন্ন ক্ষুদ্র পর্ব্বতে আসিয়া পৌঁছিলাম; এইখানে বাঁশ, কদলী, বাতাবী-নেবু, এই সকল গাছ রহিয়াছে; বিশেষতঃ বড় বড় পর্ণতরু (Fern) সুনম্য, সুভঙ্গিম,—যেন তাহার ছায়াতলে পথিককে সাদরে আহ্বান করিতেছে।—মনে হয় যেন, সুপরিচিত য়ুরোপের দৃশ্য সমূহ হইতে বহুদূরে আসিয়া পড়িয়াছি—অবারিত প্রকৃতি-রাজ্যের কোন একটা অজ্ঞাত প্রদেশে আসিয়া পড়িয়াছি; এই রমণীয় মোহের আবেশে এইরূপ মনে হয়, পৃথিবীর এমন একটা ভূভাগ আমরা আবিষ্কার করিয়াছি যাহা এখনও পর্য্যন্ত কাহার নয়ন আকর্ষণ করে নাই; কোন মানব-নেত্র এখনও পর্য্যন্ত এই তরু-আকৃতি পর্ণগুল্মের অনুপম সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিতে পারে নাই—তাহার বৃন্তের সেই মনোরম বক্রতা, তাহার পত্রাবলীর সেই সূক্ষ্ম বিচিত্র কারুকার্য্য এখনও কাহারও নয়নগোচর হয় নাই...

পর্ব্বতের শিখর-দেশে উঠিলে, হঠাৎ ছবিটা বদলাইয়া যায়;—একটা প্রশস্ত উপত্যকা নেত্র-সমক্ষে আবির্ভূত হয়। এইখানে য়ুরোপীয়দিগের কলকারখানার অনেকগুলি ইমারৎ আছে। ইহাই Bang Miu স্বর্ণখনির কর্ম্মস্থান।

আমরা খনির পরিচালক মহাশয়ের নিকট, একদিন ও একরাত্রির জন্য, আতিথ্য যাচ্ঞা করিতে যাইতেছি। এই দুরদেশে যে সকল য়ুরোপীয় বসতি করে, কোন পরিচয়-পত্র না লইয়াই ভ্রমণকারীরা তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যায়—ইহাই এখানকার প্রচলিত প্রথা। এই সব বিজন স্থানে যে সকল য়ুরোপীয়ের সহিত সাক্ষাৎ হয়, তাহাদিগের মধ্যে সামাজিক জীবন-সুলভ কোন বৈরিতা নাই; কোন বিদ্বেষপূর্ণ প্রতিযোগিতা নাই। তাহাদের পরস্পরের মধ্যে স্বাভাবিক ভ্রাতৃসম্বন্ধ, মানুষের প্রতি মানুষের সমবেদনা, পরস্পরের প্রতি আনুকূল্য—এই সমস্ত সহজেই প্রতিষ্ঠিত হয়। খনির পরিচালক M. V....একজন সুইস্; ইনি "বিদেশী সৈন্যদলে" ভুক্ত হইয়া ইতিপূর্ব্বে Tonkin-এ আসিয়াছিলেন। ইনি যার পর-নাই আমাদের আতিথ্যসৎকার করিলেন। তা-ছাড়া, যখন আমরা জানিতে পারিলাম, কয়েক মাস পূর্ব্বে আমাদের পরস্পরের মধ্যে দেখা সাক্ষাৎ হইয়াছিল, তখন আমরা উভয়েই বিস্মিত হইলাম। M. V. ক্যাম্বোজিয়ায় ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন, আমি Angkor-এর ধ্বংসাবশেষ দেখিয়া ফিরিয়া আসিতেছিলাম; একটা ফরাসী জাহাজে আমাদের দেখাসাক্ষাৎ হয়। এখানকার জনসমাজ অতীব ক্ষুদ্র।

খনি-পরিচালকের বাড়ীটি একটি সুরম্য স্থানে ছবির মত সমুত্থিত হইয়াছে। গত কল্য M. V. যখন তাঁহার জান্‌লার ধারে দাঁড়াইয়া একটা জোলাপের ঔষধ খাইতেছিলেন,—হঠাৎ দেখিলেন, কতকগুলা বৃক্ষপত্র ইতস্তত বিকীর্ণ হইতেছে,—আর অমনি একটা বৃহৎ কৃষ্ণসার তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইল। কৃষ্ণসার তাঁহাকে শান্তভাবে দেখিতে লাগিল। তিনি তাঁহার সেই ঘরটি হইতেই লক্ষ্য সন্ধান করিয়া, বন্দুকের এক গুলিতেই হরিণটাকে ধরাশায়ী করিলেন। আজিকার প্রাতরাশে আমরা এই হরিণের সুস্বাদু মাংস আহার করিলাম।

অপরাহ্ণে, পরিচালক মহাশয়ের সহিত,

আমরা কারখানা দেখিতে গেলাম। খনিজ ধাতুর মধ্যে যে সোনা ও রূপা থাকে তাহা এই কারখানায় বাহির করা হয়। প্রথমে খনিজ ধাতুকে গুঁড়া করা হয়, তাহার পর তাহাকে ধৌত করা হয়। এই ধৌত ধাতুর একাংশ একেবারেই ফ্রান্সে পাঠান হয়—কেননা ফ্রান্সে, উন্নত পদ্ধতি অনুসারে, ধাতু হইতে বেশী সোণা বাহির করা যায়, এখানে তাহা পারা যায় না। অপরাংশ এখানেই মিশ্র দস্তা-পাতের সংস্পর্শে আনা হয়; এবং এইরূপে সেই ধাতু হইতে সোনা ও রূপা বিচ্ছিন্ন করা হয়। প্রতিদিন ১৫০ মন ধাতু এই কাজে নিয়োজিত হয়। প্রতি ৩০ মন অশোধিত ধাতুতে গড়ে ৫২৫ গ্রেন সোনা থাকে। প্রতি ৩০ মণ স্বর্ণমিশ্র ধাতুতে ১২৭৫ গ্রেন সোনা, ৩০০০ গ্রেন রূপা, ও ১৫০০ গ্রেন সিসা থাকে। সোণা বাদে, শুধু যে রূপা খনি হইতে বাহির হয় তাহাতেই খনির সমস্ত খর্চ্চা উঠিয়া যায়।

কারখানার কাজে অ্যানামবাসী মজুরগণ নিয়োজিত হয়। M. V. বলেন, উহাদের দ্বারা কাজের বেশ সুবিধা হয়। তাহারা প্রতিদিন ছয় আনা হইতে আট আনা মজুরী পায়। যাহারা খনির শিল্পে বিশেষজ্ঞ তাহারা ১৲ টাকা করিয়া পায়। ১৲ টাকা কোচিন-চীনে উচ্চ বেতনের হার।

খনি-পরিচালকের সহিত দুইজন য়ুরোপীয় বাস করেন:—একজন সমাজের গণ্যমান্য লোক, আর একজন তরুণবয়স্ক এঞ্জিনিয়ার—ইহাঁরা প্যারিস হইতে আসিয়াছেন। আজ আমরা খনি-পরিচালকের সহিত সায়াহ্নভোজন করিব। পরিচালক মহাশয় তাঁহার প্রয়োগ-আগার লইয়া ও তাঁহার দেশীয় উপপত্নীকে লইয়া বেশ সুখে আছেন। তিনি সুধু বলিলেন "প্যারিস অপেক্ষা Bong Miu আমার ভাল লাগে।"

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

শ্মশানে সিরাজ।

বিটপি-বেষ্টিত ওই নির্জ্জন গহনে
একেলা রয়েছ দেব অনন্ত ধেয়ানে;
নাহিক হোথায় তব রাজসিংহাসন,
বিষাদে হোথায় কেহ কাঁদেনা এখন!—
উঠিছে করুণ গীতি বিহগ কূজনে,
প্রকৃতি পূজিছে পদ পতিত প্রসূনে।
স্বজাতির অত্যাচারে জর্জ্জরিত প্রাণে
ছেড়ে গেছ জন্মভূমি তরুণ জীবনে;—
অন্তিম দিনের সেই সজল নয়ন
আজিও তুলিছে মনে প্রলয় ভীষণ।
জননী তোমার খেদে মলিন বদন,
সহস্রাংশু-অংশুহারা সুধাংশু যেমন।
স্মরি দেব, তব কথা, ব্যথা বাজে প্রাণে,
যুগ-চিতা ভস্মীভূত তোমারি শ্মশানে।

আবদুলগণি (ছাত্র)।

আমাদের দেশের আহার ও শিক্ষা সম্বন্ধে দুএকটি কথা।

আমাদের দেশের ছেলে মেয়েদের পক্ষে কিরূপ আহার প্রশস্ত—এবং কিরূপ শিক্ষা উপযোগী শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত সে সম্বন্ধে আমার যে পত্র ব্যবহার চলে নিম্নে তাহাই প্রবন্ধাকারে প্রকাশিত হইল।

আজকালকার দিনে দৈনিক কার্য্যের যেরূপ প্রথা হইয়াছে তাহাতে সকলেরই অল্প অল্প করিয়া অনেক বার আহার করা উচিত। যে খাদ্যে শরীরের অনেক শক্তি ক্ষয় হইয়া তবে সে খাদ্য কার্য্যে পরিণত হয়—এরূপ আহার আমাদের এখনকার শক্তিহীন অবস্থার পক্ষে অনুপযোগী। জীবজগতে খাদ্যের অভিব্যক্তি দেখিলে বুঝা যায় মানুষ ক্রমশঃ পরিমাণে অল্প কিন্তু সারবান দ্রব্য খাইবার দিকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইতেছে। গরু মহিষ ঘাস পাতা খায়, বানর জাতির খোরাক ফল ও বীচি। অন্নের মধ্যে শেষোক্তগুলি অধিকতর সারাল। হিংস্রজন্তুও শরীরের আয়তনের তুলনায় অতি অল্প পরিমাণ কিন্তু সারাল দ্রব্য খায়। তাহাদের দেহের সহিত তুলনায় হাত পা গুলি অপেক্ষাকৃত বড়, কর্ম্মঠ ও পাকযন্ত্রের আয়তন অনেক কম। গরু ভেড়ার ঠিক বিপরীত। পাশ্চাত্য জাতিকেও সাধারণতঃ স্বল্প কিন্তু সারাল দ্রব্যভোজী দেখা যায়। ভারতবর্ষের অনেক স্থলে বিশেষতঃ বঙ্গদেশেই ইহার বিপরীত ব্যবস্থা। পরিমাণে অধিক এবং অসার দ্রব্য খাইয়া আমাদের শরীর মন এত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে,—যে মাংসপেশীতে যেন আদৌ বল নাই। হৃদয় মাংসপেশীর সাহায্যে রক্ত ছুটায়, ফুসফুস্‌ও মাংসপেশীর সাহায্যে নিশ্বাস প্রশ্বাস লয়, পাকযন্ত্র মাংসপেশীর শক্তিতেই খাদ্য হজম করে। এইরূপে জীবন ধারণের সকল মূল যন্ত্রগুলিই মাংসপেশী দ্বারা পরিচালিত। প্রথম বয়সে সারাল খাদ্যের অভাবে চিরদিনের জন্য এইগুলি হীন হইয়া পড়ে। প্রধানত ছেলে বয়সের অযত্নই আমাদের দেশের লোকের অস্বাস্থ্য ও দুর্ব্বলতার কারণ।

পড়িবার বয়সে খাদ্য সম্বন্ধে আমি এই কয়টি নিয়ম ভাল মনে করি—

১। দিনে অন্তত চারিবার আহার,—প্রাতে ও বৈকালে লঘু, দুপুরে ও সন্ধ্যায় অপেক্ষাকৃত গুরু। সন্ধ্যাভোজনের পর বিশ্রাম হয় বলিয়া এই সময়কার খাদ্যই সর্ব্বাপেক্ষা সহজে হজম হয়। দিবসের তাড়াতাড়ি আহার ও তৎপরেই দিনে কার্য্যারম্ভ করিতে হয় বলিয়া সে সময়কার খাবারটি গুরুতর হওয়া ঠিক নয়।

২। পাঁউরুটী, ডিম, মুড়ি, নারিকেল বাদাম, পেস্তা, ডাল, ছানা ক্ষীর ইত্যাদি সামগ্রীর নানা প্রকার সুস্বাদু সুপচ্য ও সস্তা খাদ্য সহজে প্রস্তুত করা যায়। সেগুলি তৈরি করিয়া রাখিলেও দুএক দিন থাকে।

আহার্য্য সামগ্রীর চারিটি গুণ দেখিতে হয়—সারাল, সুপচ্য, সুতার ও সস্তা। পূর্ব্বোক্ত উপাদানঃগুলিতে এ সব গুলি গুণই আছে।

আমরা ভাত তরকারী ঝোল ডাল লুন

জল ইত্যাদি যত জিনিষ দৈনিক আহার করিয়া থাকি তাহা ষোল আনা ধরিলে বোধ হয় পরিমাণে তাহার ছয় আনাতেই আমাদের যথেষ্ট হয়। কেবল জিনিসগুলি আরও সারাল হওয়া আবশ্যক। অধিক খাইয়া বল হওয়া দূরে থাকুক অশেষ অপকার হয়। অভ্যস্ত আছি বলিয়া আমরা তা ভাবি না দেখিনা।

৩। আমার মতে দৈনিক আহারের নিম্নরূপ ব্যবস্থাই ভাল।

প্রাতঃকাল ৬॥—পাঁউরুটী, মাখন ও ডিম্; কিম্বা ছানা বিস্কুট মাখন অথবা মোহনভোগ গজা লুচী তরকারী বা ভাজা ইত্যাদিরূপ কিছু লঘু আহার কর্ত্তব্য। দুধ খরচসাধ্য তবে খাইতে পারিলে ভাল কিন্তু খারাপ হইলে হানিকর।

১০টা—মাংস বা মাছ ভাত বা রুটী। কিম্বা খিচুড়ি পোলাও বা ঘি ভাত। ইহার মধ্যে যাহাই খাও অল্প পরিমাণে ও অল্প তরিতরকারী দিয়া আহার করা বিধেয়। তাড়াতাড়ি আহার করিলে ও আহারের পরেই কার্য্যে বাহির হইলে, ও খাদ্যের সঙ্গে বেশী জল পান করিলে হজমের বিশেষ ক্ষতি হয়। আহার আবার মাঝে মাঝে বদল করা চাই ও এক একদিন অর্দ্ধঅনশন বড়ই ভাল। আমাদের নিজের দেহ মন পাকযন্ত্র ও আমাদের বাড়ির মেয়েরা ও চাকরেরাও ইহাতে বিশ্রাম পায়। রবিবারের মত সপ্তাহে এমন একটি দিন রাখা সকল দিক হইতেই হিতকর।

৩টা ৪টার সময় আবার একটু জলযোগ। তাতে কিছু ফল থাকা ভাল। তাছাড়া রুটী মাখন, লুচি ছানা বা অল্প মিষ্টি দেওয়া সন্দেশ, বা ভাল ঘিতে প্রস্তুত ভাল কচুরী সিঙ্গাড়া নিমকী ইত্যাদি সুখাদ্য। নারকেল বাদাম পেস্তা, মুড়ি চিড়া ইত্যাদি দ্রব্য দিয়া এই সময়ের জন্য সারাল ও সুমিষ্ট ও সস্তা অনেক মিষ্টান্ন ও সহজেই প্রস্তুত করিয়া রাখা যায়। আমাদের পূর্ব্বেকার এই সকল আহার আজকালকার বাজারের জলখাবার হইতে অনেক ভাল এবং সস্তা ছিল। বাদাম পেস্তার সহিত সুজি প্রভৃতি মিলাইয়া জলখাবার তৈয়ারী করিলে অতি উপাদেয় হয়। এই শ্রেণীর আহারের উন্নতি করা আমাদের একান্ত আবশ্যক।

আহারের অনেকক্ষণ বাদে তবে মাঝে মাঝে অল্প অল্প জল খাওয়া উচিত। তাহাতে হজমের ও দাস্তের সাহায্য করে। নির্ম্মল জলের মত কিছুই নাই। চা কোকো এমন কি দুধ অবধি সে পক্ষে তত ভাল নয়। তবে অল্প অল্প খাইতে কিছু হানি নাই। কতকটা ক্লান্তি দূর করে।

৭॥০টা—সচরাচর সন্ধ্যা-ভোজনই সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর হওয়া চাই। কারণ সেই সময়েই সকলে দিনের কাজ শেষ করিয়া নিশ্চিন্ত মনে ধীরে সুস্থে আহার করিতে পারেন। পরিবারের মধ্যে এক সঙ্গে বসিয়া গল্প-গুজব করিয়া আহার করিলে যেমন সুন্দর ভাবে আহার উপভোগ করা যায় তেমনি মনেও কত শান্তি আসে। সকল সময়েই কর্ম্মের চিন্তা ও দুশ্চিন্তা শরীর মন উভয়ের পক্ষেই হানিকর। আমাদের দেশে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে অহরহ এরূপ চিন্তার অভ্যাসই সাধারণতঃ দেখা যায়। আমরা যদি সারাদিন

খাটিয়া দিনের শেষ অংশ ও রাত্রের প্রথম অংশ টুকুতে বিশ্রাম ও আনন্দ করিতে পারি আমাদের শরীর মনের অর্দ্ধেক পাপ তাপ সহজেই দূর হয়। নিজ নিজ বাড়িতে রমণী জাতির এমন হীন অবস্থা করিয়া রাখিয়াছি বলিয়াই এই সহজ লভ্য আনন্দ-টুকুও সহজে আমাদের ভাগ্যে ঘটে না। বিলাত প্রভৃতি স্থানে এই সময়টুকু লোকের কি উপভোগ্য। আমি ঠিক সেই স্থানেই পৃথিবীতে স্বর্গের ছবি দেখিয়াছি।

এই সময়ের খাদ্যই সর্ব্বাপেক্ষা সারাল প্রচুর ও তৃপ্তিকর হওয়া চাই। এ সময় নিয়মিত একটু মাংস খাওয়া ভাল। সহ্য হয় না বলিলে চলিবে না—ভবিষ্যতের ভালর জন্য অভ্যাস ছেলেবেলা হইতেই করিয়া লইতে হইবে। ইহার অভাবে অন্য প্রকার এই জাতীয় সারাল জিনিষ চাই। যথা ডাল ছানা বাদাম ইত্যাদি। মাংসের পরিবর্ত্তে মৎস্য ডিম খাওয়া চলে। ডালের অনেক প্রকার সামগ্রীও চলে—যথা বাঁটা ডালের বড়া পাঁপড় ডালপুরী ইত্যাদি।

৪। মোটামুটী আমি খরচেরও একটা হিসাব দিতেছি। প্রাতে ডিম রুটী মাখন বা তদ্‌পরিবর্ত্তে নিরামিষ কোনও খাবার যথা লুচী গজা সন্দেশ ইত্যাদিতে চার পয়সা ;—

দুপুরবেলাকার ভোজনে—কম পরিমাণে পোলাও বা খিচুড়ি—মাছ ভাজা, ডিম ভাজা, রুটী মাংস বা আলু মাংস কিম্বা মাংসের পরিবর্ত্তে মাছ ডিম ইহাতে দুই আনা বা দশ পয়সা ;—

বৈকালে ফল ও মিষ্ট বা রুটী ও মাখন বা চিড়া নারিকেল মুড়ির মোয়া ইত্যাদি চার পয়সা ;—

রাত্রেও দুপুরের মত খাইতে দুই আনা বা তিন আনা।

আহারের পরিমাণ কম হইবে। হাব্‌জা গোব্‌জা বাজে জিনিষ তাহাতে বেশী থাকিবে না। দুপুরবেলা ও সন্ধ্যা বেলা আহারটি প্রধান করিয়া অপর সময় সামান্য জলযোগ করিবে। ইহাতে গড়ে প্রতিদিন একজন বয়স্ক লোকের চারি পাঁচ আনা ঊর্দ্ধ মাত্রায় ছয় আনার বেশি খরচ পড়ে না। অর্থাৎ গড়ে ১০ টাকা মাসে। অনেকে একত্রে থাকিলে ও খাইলে ইহার অপেক্ষাও কিছু কমে হয়।

তার পর ছেলেমেয়েদের শিক্ষা সম্বন্ধে। প্রথমত শরীর গড়িবার জন্য যেমন ভাল পুষ্টিকর খাদ্য দরকার সেইরূপ ব্যায়াম শিক্ষাও আবশ্যক। রক্তস্রোত দেহে তেজে সঞ্চালিত হইলে দেহের অনেক উপকার হয়। শরীরে সকল স্থানে রক্তরস সহজেই নীত হইয়া সে স্থানের ক্ষতিপূরণ করে ও সে স্থানের গঠন ও পুনর্গঠন কার্য্যে সাহায্য করে। আর তথাকার অশেষবিধ ক্লেদ ধুইয়া আনিয়া শরীর হইতে বাহির করিয়া দেয়। ইহা শরীরে বদ্ধ থাকিলেই শরীরের যত ব্যাধি। যে সকল ছেলে বাড়িবার বয়সে দৌড় ঝম্প খেলে ও মুক্ত হাওয়ায় বেড়ায় ও ব্যায়াম করে তাদের গঠন অতিশয় সুন্দর ও বলিষ্ঠ হয়। এ জন্য নিম্নলিখিত ব্যায়ামগুলি প্রশস্ত।

১। সকালে বিকালে স্বাধীন ভাবে মুক্ত স্থানে স্বেচ্ছায় দৌড়াদৌড়ি খেলা। ব্যাট-বল, ফুটবল, লনটেনিস ও আমাদের দেশী খেলা কপাটি খেলা ইত্যাদি।

২। দিনের মধ্যে একবার ড্রীল করা, ও একবার নিয়মিতরূপে মাংসপেশীর কোনরূপ চালনা করা। যথা মুগুর ভাঁজা, বৈঠক, স্যাণ্ডো ইত্যাদি।

৩। ফুসফুসের নিয়মমত চালনা হয় এরূপ ব্যায়ামও আজকাল বিশেষ আবশ্যক বলিয়া বিবেচিত। তাহাতে ফুসফুসের আয়তন বাড়ে এবং সজোরে রক্ত সঞ্চালন হইয়া হৃদয়কে সবল ও দৃঢ় করে। ইহা দ্বারা উদরের পাক যন্ত্র মূত্র যন্ত্র ইত্যাদি যন্ত্র সকলও সতেজ হয়। গান গাহিলে নাচিলে, কোন পাঠ সজোরে আবৃত্তি করিলে— ফুসফুসের ব্যায়াম সাধিত হইতে পারে। তবে তালে তালে নাচায় যে অঙ্গচালনা তাহাতে ব্যায়ামের কাজ বড় একটা হয় না। তার কারণ সে গতিগুলি কলের মত আপনিই আসে—তাহারা ইচ্ছায় আনীত হয় না।

৪। তাছাড়া সাঁতার, দৌড়ান, ঘোড়ায় চড়া, লাফান প্রভৃতি আড়াআড়ি খেলায় মাঝে মাঝে ছেলেদের উৎসাহ দেওয়া আবশ্যক। তাহাতে আনন্দ উৎসাহ ও ইচ্ছাশক্তি আরও দৃঢ় হয়।

৫। সুন্দর সুন্দর কবিতার আবৃত্তি ও গীত বাদ্যাদিও ছেলেদের কিছু কিছু শেখান ভাল। শরীর মন উভয়েরই তাহাতে উৎকর্ষ সাধিত হয়। সর্ব্বোপরি যেরূপ শিক্ষায় ছেলেরা আত্মনির্ভরতা শেখে সে বিষয়ে বিশেষ যত্ন করা চাই। শিক্ষার মূল উদ্দেশ্যই তাই, —শিশু বয়সে শিক্ষা দিয়া জীবনের কার্য্যে সহায়তা করা। অতএব তাহার প্রথম শিক্ষার বিষয় হওয়া চাই স্বাস্থ্য রক্ষা; সঙ্গে সঙ্গে অল্প অল্প রন্ধন, হিসাবকেতাব রক্ষা, আপনার কাপড় চোপড় মেরামত, ঘরঝাড়া জুতা কাপড় ঝাড়া ইত্যাদি যথা সময়ে সকল রকম গৃহস্থালি কার্য্য করিতে শিক্ষা করা উচিত। বালকের ক্ষমতা ও ইচ্ছা বুঝিয়া—কোনও এক বিশেষ অর্থকরী বিষয়েও বাল্যকাল হইতে অল্পে অল্পে তাহার শিক্ষা হওয়া বিশেষ আবশ্যক। অর্থকরী বিদ্যা নহিলে অন্য সকল বিদ্যাই দারুণ অভাবে অনর্থক ও ব্যর্থ হইয়া যায়।

নীতিশিক্ষা সম্বন্ধে আমি এই বলি যে, মহৎ লোকের জীবন কাহিনী শুনাইয়া ও চরিত্র দেখাইয়া নীতিশিক্ষা দেওয়া যেমন ফলপ্রদ মুখের উপদেশে বা পুস্তকের নীতিকথায় তাহা হয় না। অনেক সময় বরঞ্চ শিশু চরিত্র তাহাতে নিস্তেজ হইয়া পড়ে। নিত্যকার ঘটনায় প্রায়ই দেখা যায় যেখানে নীতি শিক্ষায় প্রাচুর্য্য সেই স্থানেই চরিত্রের সমধিক মলিনতা।

আর একটি কথা,—সামাজিক উদারতা শিক্ষা দেওয়াই নীতিশিক্ষার একটি প্রধান অঙ্গ হওয়া আবশ্যক।

ধর্ম্ম সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া আরও কঠিন কথা। আমাদের এত শতাব্দীর অভ্যাস দোষে ধর্ম্ম বলিলেই আমরা বাহ্যাড়ম্বর পূর্ণ সমাজের আচার অনুষ্ঠানগুলিই মনে করি। তাহাতে মানুষের মনে অনুদারতা আরও বাড়ে। ধর্ম্মনীতির কথা ক্লাসে মোটেই না শিখান ভাল। জ্ঞান বুদ্ধির স্বাধীনবিকাশে ধর্ম্মভাব আপনিই সনাতনরূপে মনে জাগ্রত হইয়া উঠে।

শেষ কথা বিদ্যা শিক্ষা সম্বন্ধে।

১। যত মুখে মুখে শিখান যায় ততই ভাল। তাহাই সহজ ও স্বাভাবিক উপায়। ইহাতে অল্পক্ষণে অনেক শিখানর কাজ ভাল করিয়া সম্পাদিত হয়। তবে তেমন শিক্ষক চাই। পুস্তক শিক্ষকের ব্যবহারের জন্য, পাঠার্থী শিশুর জন্য নহে।

২। নিকটে আশে পাশে যে সকল দ্রব্যাদি আছে তাহারই সাহায্যে বিভিন্ন বিষয় শিখান যথা—পদার্থ-বিদ্যা, রসায়ন ,উদ্ভিদ বিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, ভূবিদ্যা, জ্যোতির্ব্বিদ্যা ইত্যাদি। এইরূপ করিলে সর্ব্বদা সেই সব কথাগুলি শিশুর মনে আপনা হইতেই জাগরুক থাকিবে। জ্ঞান অন্তরের ভিতর হইতেই ফুটিয়া উঠিবে। অল্প সময়ের মধ্যে কোনও একটি বিষয়ের পরিচয় করিয়া দিলে শিশু আপনিই সে বিষয়ে মনোযোগ দেয়—ও আপনা আপনিই জ্ঞানার্জ্জন করে। সকল বিষয়েই একটু একটু জ্ঞান লাভ প্রথম বয়সে বড়ই আবশ্যক। তাহাতে—মনের সকল দিকের প্রসার বাড়ে ও জ্ঞানস্পৃহা জন্মে।

৩। এক সঙ্গে অতি অল্পক্ষণমাত্র পড়ান-ভাল। মোটামুটি আধ ঘণ্টা এক এক বিষয়ে পড়িলেই যথেষ্ট হইল। দুইবার পড়ার মাঝে একটু বিশ্রাম বা ড্রীল্ স্ফূর্ত্তিজনক। ইউ-রোপে এইরূপই ব্যবস্থা।

৪। পরীক্ষার উৎপীড়ন অতিশয় হানি-কর। মাঝে মাঝে পরীক্ষা হইবে ও তাহার ফল লইয়া বছরের শেষের পরীক্ষার ফল ঠিক হইবে। ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ক পরীক্ষায় ভিন্ন ভিন্ন সময়ে উত্তীর্ণ হইলেই চলিবে; এক সঙ্গেই সকল বিদ্যার পারদর্শিতা দেখাইবার আবশ্যক নাই। যে যা দেখে শুনে সে তাহা ইহজন্মে ভুলে না। পরীক্ষার দ্বারে তখনি না বলিতে পারুক আবশ্যকের সময় আপনিই সে জ্ঞান মনের দ্বারদেশে আসিয়া তাহার জীবনের কার্য্যে তাহাকে সাহায্য করিবে। শিশুর কাছে কোনও সময়েই যেন রূঢ়মূর্ত্তি না দেখান হয়। "Spare the rod and spoil the child" পুরাকালে এই ব্যবস্থা ঈশ্বরের রাজ্যের গর্হিত নিয়ম। আজকালকার কিণ্ডারগার্টেন নিয়মপ্রণালী শান্ত ভাবের শিক্ষা অনুমোদন করে।

৪। লেখাপড়া শিক্ষা সাঙ্গ হইলে—কিছুদিন শিক্ষানবিশরূপে কাহারও কাছে হাতে কলমে কাজ শিখা উচিত। বিদ্যার সঙ্গে অর্থকরী বিদ্যাও সযত্নে শিক্ষণীয়।

৫। আজকালকার কর্ম্মশীল জগতে বিজ্ঞানের স্থান উচ্চতর। বিজ্ঞান আর কিছুই নয় প্রকৃতির নিয়ম সম্বন্ধীয় সম্যক জ্ঞান। সেই জ্ঞানের দ্বারা প্রাকৃতিক মহাশক্তিগুলিকে নিজ কাজে লাগাইয়াই মনুষ্য বিশ্বরাজ্যে জয়ী হয়। সেই পথে যাহারা অগ্রসর হইতে পারে না তাহারাই পিছাইয়া পড়ে ও অবশেষে বিনষ্ট হয়।

শ্রীইন্দুমাধব মল্লিক।

পাকচক্র। শেষ দৃশ্য।

("চন্দ্রকান্ত ও চন্দ্রকান্ত" বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে কর্ত্তার উৰ্দ্ধশ্বাসে রঙ্গমঞ্চে আগমন পশ্চাৎ পশ্চাৎ হরিবাবুর প্রবেশ।)

হরি। ভণ্ড, পাজি, আহাম্মক, বেয়াদপ! ছেলের বিয়ের সম্বন্ধ ঠিক ঠাক করে,—এখন, "মশায়, আমি ত কিছু জানিনে!"

ক। সত্যি বলছি হরিবাবু, তোমার গায়ে হাত দিয়ে দিব্যি করছি আমি কিচ্ছু জানিনে।

হরি। একেবারে ন্যাকা? কচি খোকা! ভণ্ডতপস্বী! পণ্ড শ্রম! তোর যা ইচ্ছে কর,—আমার দশটি হাজার ফেরত দে, আর নয় ত এই উকীলের চিঠি নে কালই নালিশ চড়িয়ে দেব।

ক। বল কি হরিবাবু! ওঃ এতদিনের বন্ধুতা,—তোমার জন্য গিন্নির সঙ্গে কত ঝগড়া ঝাঁটি মান অভিমান, চোখের জলের নাকের জলের আমদানী,—হায় হায়! সে সমস্তই মিথ্যা!

হরি। আমি কথায় ভুলিনে বাপু! হয় আমার টাকাকড়ি বুঝে দাও নয় ছেলেটিকে দাও।

ক। এই! আর ত কিছু না? হরিবাবু আমি ঠিক বলছি—আমি তোমা বই আর কাউকে জানিনে! তা গিন্নি যদি গলায়—

হরি। তবে চল ছেলে নিয়ে এক্ষণি আমার বাড়ী চল।

ক। এক্ষণি এক্ষণি। তাহলেই হোল ত? আঃ একটু দম নিয়ে বাঁচি! সত্যি বলছি হরিবাবু আমি তোমা বই আর কাউকে জানিনে।

আমি আর কাউকে চিনিনে, জানিনে—ও হরিমোহন বাবু,—চিনিনে,—গো মশায় জানিনে—

(হাতে তাল দিয়া সুর করিয়া গান—গিন্নির দ্রুতপদে প্রবেশ)

গি। আরাম চৌকিতে বসে ভারী যে স্ফূর্ত্তিতে গান করা হচ্ছে! আর এদিকে পুলিসে যে বাড়ী ঘিরে ফেল্লে? এমন পুরুষ নিয়েও মানুষ ঘর করে! হায় রে, আমার কপাল!

ক। (ত্রস্তে উঠিয়া দাঁড়াইয়া) অ্যাঁ পুলিস? কেন? আমি কি তাদেরও ফরমাস দিয়ে আনিয়েছি? ও চন্দ্র—চন্দ্র গো? হায় হায়! চন্দ্রটাও ভেগেছে দেখছি! হরিবাবু—তুমি একবার যদি দেখ,—আমি আর পারিনে! লোকে মেয়ের দায়ে পাগল হয়—আমি ছেলের দায়ে পাগল হয়ে উঠেছি। প্রাণ গেল গো গেল! (পুনরায় উৰ্দ্ধ মুখে চৌকিতে নয়ন মুদ্রিত করিয়া উপবেশন)।

হরি। আচ্ছা আমি দেখে আসছি, অত অস্থির হয়ো না।

হরি বাবুর প্রস্থান,—চন্দ্রকান্তের প্রবেশ।

চ। আজ্ঞে পুলিস বোমা খুঁজতে এসেছে।

ক। (চমকিয়া উঠিয়া) বোমা! এখন থেকে কি বৌ এলেও পুলিসকে দেখাতে

এখনো ত বিয়ে হয় নি, শশীকে তবে বৌমা বলে দেখিয়ে দাও বাবা!

চ। আজ্ঞে তানা, বাজির আওয়াজ শুনেছে কি না তাই বোমা মনে করেছে, এই মানুষ মারা বোমা, যার জন্যে আলিপুরে মেদিনীপুরে—

ক। সর্ব্বনাশ! কি হবে কি হবে! এবার ধনে প্রাণে মারা গেলুম গো—আর উপায় নেই গিন্নি উপায় নেই—

(উঠিয়া গিন্নির অঞ্চল ধারণ)

গি। তাই ত! কোথা যাব! এখনি আমাদের সব ধরে নিয়ে যাবে নাকি! বাবা চন্দ্রকান্ত—উদ্ধার কর তুমি রক্ষা কর।

চ। তা আপনি যদি রাজি হন—আমি সব মিটিয়ে—

গি। এখনি রাজি—যা বলবে তাতেই রাজি—

চ। (মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে) এই—এই—যদি আমার সঙ্গে শশিমুখির ও হরি বাবুর মেয়ের সঙ্গে দাদা বাবুর বিয়ে দিতে রাজি হন—

গি। তাহলেই সব চোকে? এক্ষণি বাবা এক্ষণি—

ক। (অঞ্চল ছাড়িয়া) এক্ষণি চন্দ্রকান্ত এক্ষণি—

(বুকে হাত দিয়া) উঃ উঃ—

চ। তা হলে আর ভাবনা নেই আমি এখনি সব ঠিকঠাক করে আসছি। (স্বগত) কি মজা এক বাণে সব পাখীগুলো মরলো? প্রস্থান।

ক। উঃ বুকে হাত দিয়ে দেখ গিন্নি—

চন্দ্রকান্ত—বেঁচে থাক বাবা—তুমি ব্রহ্মহত্যা নিবারণ করলে?

গি। দেখ—বিপদের সময়ও এ রকম নাকে কাঁদবে?

বিনোদের প্রবেশ।

বি। বাবা, পুলিসের সব লোকগুলো চলে গেল।

ক। এরই মধ্যে? সাবাস চন্দ্রকান্ত—সাবাস—!

বি। বাইরে সব লোক বসে আছে—আপনি শীঘ্র আসুন।

ক। যাচ্ছি বাবা—একটু দম নিয়ে যাচ্ছি—তুমি এগোও।

(বিনোদের প্রস্থান)

দেখলে গিন্নি—ভাগ্যিস চন্দ্রকান্ত ছিল—তাই এ যাত্রা রক্ষা পাওয়া গেল!

গি। এমন বেইমানী যদি কোথাও দেখেছি! আমার শশী না থাকলে কার জন্য চন্দ্রকান্ত একাজ করত!

হরিবাবুর প্রবেশ।

হরি। এখন ঝগড়াঝাঁটি থাক, বাইরে সব বরযাত্রীরা এসেছে—বর নিয়ে চল যাত্রা করা যাক।

ক। বেশ বেশ সে কথা খুব ভাল।

গি। (দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া) তবে বিনোদকে বাড়ি ভিতর পাঠিয়ে দাও বর সাজিয়ে বরণ করে পাঠাই।

ক। চন্দ্রকান্ত কোথা? শশী কোথা? তাদের বিয়েটা কেন এখান থেকে আগে সেরে ফেলে আমরা বিনোদকে নিয়ে বরযাত্রী

চন্দ্রকান্তের প্রবেশ।

চ। আজ্ঞে সেই হলেই ভাল হয়। আমিও পাঁজি দেখে এলুম আজ এখনি একটা লগ্ন আছে আর রাত্রেও আর একটা আছে। বিয়ে-টার পর আমিও বরযাত্রী হয়ে বেরিয়ে পড়ব।

হরি। বেশ বেশ তাই হবে! তোমার বুদ্ধিতেই বাবা বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খেয়েছে—কর্ত্তা গিন্নির মতের মিল হয়েছে—আর আমিও কন্যাদায় থেকে উদ্ধার পাব পাব করছি!—তোমাকে আগে তুষ্ট করতেই হবে—চল বাবা—চল!

গি। কিন্তু দেখ কর্ত্তা—সব যেন হোল—ছুট টোপর ত ফরমাস দেওয়া হয়নি—তার কি উপায়!

চ। তাতে কিছু ক্ষতি নেই, সেজন্য কিছু মনে করবেন না,—একটা ধুচুনি হলেই চলবে এখন, দরকার বুঝে সেটাও আমি ঠিক করে রেখেছি।

হরি। বেশ করেছ বাবা! তোমার উৎসাহ দেখলে—আমারও আর একবার পাক খেতে ইচ্ছা করে।

চ। (মাথা চুলকাইয়া) কি বলেন—আজ্ঞে, আপনাদের অনুগ্রহ—আমি যাই কি হচ্ছে একবার দেখি। প্রস্থান।

ক। (গিন্নির প্রতি বঙ্কিম কটাক্ষ করিয়া) কি বল তুমি হরি বাবু এক পাক!—সাত পাকের একটি পাক কম নয়—এ হচ্ছে বিষম পাক—পাকচক্র! কি বল গো গিন্নি হা হা!

গি। শুনলে কথার ছিরি। পাক খায় কে বর না কনে?

ক। তুমি যদি একটুখানি বিজ্ঞান জানতে গিন্নি তাহলে আর কোন কথা ব্যাখ্যা করে বলতে হোতনা। আসল কথাটা হচ্ছে এই; গতি জিনিসটা বড়ই ভ্রান্তিজনক—দেখনা পৃথিবীখানা ঘোরে মনে হয় সূর্য্যি মামাই পালট খাচ্ছেন। সেই রকম আর কি,—তোমরা খাও পাক,—আমাদের ঘোরে মাথা।

হরি। না গো না,—আমরাই খাই পাক তোমরা ঘোরাও হাতা।

ক। হাতার বদলে যাঁতা কথাটাই এখানে সুপ্রয়োগ হ'ত।

গি। বটে! এবার থেকে তবে হাতার বদলে যাঁতাই ধরব। ঐ রসানচৌকি বেজেছে যাই আর দেরী করা চলে না।

কর্ত্তা ও হরি। চল চল আমরাও যাই,—পাকচক্রটা এবার শেষ করে ফেলা যাক।

(সকলের হাসিতে হাসিতে প্রস্থান)

সন্দেশওয়ালীর গাহিতে গাহিতে প্রবেশ।

এনেছি মনোহরা রস্করা সন্দেশ!
দুনিয়া মাঝে মিলবে না যে এমনটি সরেশ।

(অন্যান্য মিষ্টান্নওয়ালীদিগের প্রবেশ)

দ্বি। আর নাইক ভয় ওগো কর্ত্তা মহাশয়—
আজ বিয়ের রাত্রি, বরযাত্রী—
বাওহা দেবে বেশ!

তৃ। এনেছি রসোগোল্লা মতিচুর খাজা!
চ। কচুরী নিমকি পাঁপড় ভাজা!

(মাথায় দুই চারিটি হাঁড়ি স্তরে স্তরে বহন করিয়া ক্ষীরওয়ালীর প্রবেশ)

এনেছি দধিক্ষীর—মাতাজি কি ফিকির!

সকলে। বাজে বাঁশি হাসি হাসি—
বরণ কর শেষ।

নৃত্যগীতে পটক্ষেপ।

সমাপ্ত।

স্বরলিপি।

দেশ—খেমটা।

‖{ া -া রা। পা মা -া। গা গা -মগা। রা সা -া I রা -া -রা। মা মা -া।
এ নে ছি ০ ম নো ০ হ রা ০ র ০ ঙ্ক রা স ০

। পা -া -া। -া -া -া I } মা মা পা পা পা -া। মা -া পা। র্সা র্সা -া I
দেশ ০ ০ ০ ০ ০ ছু নি য়া মা ঝে ০ মিল ০ বে না যে ০

I র্সা র্সা -র্রা। র্সা ণা -ধা। পা -া -া। -া -া -া ‖ রা -া -া। রা -া রা।
এ মন্ ০ টি স ০ রে শ ০ ০ ০ ০ আর ০ ০ না ই ক

। রা -া -া। -া -া -া I মমা -া মা। মা মা -গা। রা -সা -া। -া -া সা I
ভয় ০ ০ ০ ০ ০ (ওগো) ক ০ র্ত্তা ম হা ০ শয় ০ ০ ০ ০ আজ

I রা রা -া। মা -া মা। পা পা -া। র্সা -া -র্সা I র্সা র্সা র্রা। র্সা ণা -ধা।
বি য়ের ০ রা ০ ত্রি ব র ০ যা ০ ত্রী বা ও বা দে বে ০

। পা -া -া। -া -া -া ‖
বেশ ০ ০ ০ ০ ০

I া -া সা। রা রা -া। রা রা -া। রা রা -া I -া -া মা। মা মা -া।
এ নে ছি ০ র স ০ গো ল্লা ০ ০ ০ ম তি চুর ০

। গা -রা -গা। রসা -া -া I -া -া রা। মা মা -া। পা -া -া। ধা -ণা -ধা I
খা ০ ০ জা ০ ০ ০ ০ ক চু রি ০ নিম ০ ০ কি ০ ০

I -া -া পা। ধা পা -া। মা ধা -া। পা -া -া I { -া -া না। না না -া।
০ ০ পাঁ ০ পড় ০ ভা ০ ০ জা ০ ০ ০ ০ মা তা ভি ০

। র্সা র্সা -া। র্সা -া -া I -া -া র্সা। র্সা র্সা -া। না র্সা -া। র্রা -া -া I }
কি ফি ০ কির ০ ০ ০ ০ এ নে ছি ০ দ ধি ০ ক্ষীর ০ ০

I না না -া। না না -া। র্সা র্সা -া। র্সা র্সা -া I র্সা র্সা -র্রা। র্সা ণা -ধা।
বা জে ০ বাঁ শি ০ হা সি ০ হা সি ০ ব র ণ ক র ০

। পা -া -া। -া -া -া ‖
শেষ ০ ০ ০ ০ ০



প্রিন্স ইটো

প্রিন্স্ ইটো।

সেদিন এক কোরিয়াবাসীর হস্তে জাপানের ভাগ্যবিধাতা প্রিন্স ইটো নিহত হইয়াছেন। রুষিয়ার অর্থসচিবের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য তিনি হার্‌বিন ষ্টেশনে গমন করিয়াছিলেন। তথায় সৈন্যপরিদর্শনকালে তিনি হত্যাকারীর গুলিতে হত হন।

জাপানের এ ক্ষতিতে আজ সমগ্র সভ্যজগত ক্ষুব্ধ। যে সকল মহাপুরুষ যুগযুগান্তর হইতে নিদ্রালসে মৃতপ্রায় জাপানকে জাগ্রত ও জীবিত করিয়া তাহাকে শক্তি ও সভ্যতার উচ্চশিখরে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, প্রিন্স্ ইটো তাঁহাদিগের মধ্যে অগ্রণী। তাঁহার জীবনের কর্ম্মের ও উন্নতির ইতিহাস অর্থে বর্ত্তমান জাপানের ভাবান্তর ও যুগান্তরের ইতিহাস। তাঁহার জীবনের সহিত জাপানের সমগ্র জাতীয় জীবন সম্বদ্ধ ছিল। ইটো একজন অসাধারণ পুরুষ ছিলেন। ভিন্ন ভিন্ন দেশে যুগে যুগে পতিত জাতিকে উদ্ধার করিবার জন্য এইরূপ এক এক জন অসাধারণ পুরুষকেই জন্মগ্রহণ করিতে দেখা যায়। লক্ষ লক্ষ ব্যক্তি যে কর্ম্মভার গ্রহণ করিতে সাহস করে না, তিনি একাকী তাহা সম্পন্ন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, ইঁহার জীবনের ইতিহাস জগতে সকল জাতির মধ্যেই আদর্শ স্থানীয়।

প্রিন্স ইটো ১৮৪১ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা জাপানের একটি পুরাতন জমিদারের অনুচরের কর্ম্ম করিতেন। তিনি জাতিতে সামুরাই। সামুরাইগণ বংশগত যুদ্ধব্যবসায়ী। ইটোর বাল্যকালে জাপান ভীরু, দুর্ব্বল ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন ছিল। এই সময়ে কতকগুলি পাশ্চাত্যবাসী জাপানে একটি দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া তাহার মধ্যে বাস করিত এবং স্বদেশের বাণিজ্যদ্রব্য বিক্রয় করিত। সে কালে জাপানীগণ বিদেশীকে অত্যন্ত ঘৃণার চক্ষে দেখিত। বালক ইটো কিন্তু নানা বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া গোপনে ইংরাজি ভাষা শিক্ষা করিতে লাগিলেন। তাহাতেও তাঁহার প্রাণ তৃপ্ত হইল না। তিনি ইয়ুরোপে যাইয়া এই সকল জাতির শক্তি চিন্তা, জীবন ও চরিত্র অনুশীলন করিবার মানস করিলেন। সেই অল্প বয়সেই তিনি বুঝিয়াছিলেন যে পাশ্চাত্য শক্তির গুপ্ত রহস্য টুকু শিক্ষা না করিলে জাপানের স্বাধীনতা লোপ অনিবার্য্য। সুতরাং যে কোন উপায়ে হোক তিনি ইয়ুরোপ যাইবেন স্থির করিলেন। সে সময়ে জাপানবাসী বিদেশীকে দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিতেছিল। ইটো একজন জাপানীকে জিজ্ঞাসা করিলেন —"বিদেশীগণকে আমাদের দেশে প্রবেশ করিতে বাধা দিবে কি প্রকারে?"

সে ব্যক্তি উত্তর করিল—"কেন, আমাদের দেশের চতুর্দ্দিকে দুর্গ নির্ম্মাণ করাইয়া।"

বালক ইটো জিজ্ঞাসা করিলেন— "কামান প্রস্তুত করিবে কি প্রকারে?" সে উত্তর করিল—"কেন, বৌদ্ধমন্দিরের ঘণ্টা গালাইয়া।"

ইটো তাহার নির্ব্বুদ্ধিতা বুঝিলেন কিন্তু কোন উত্তর করিতে সাহসী হইলেন না। সে সময়ে বিদেশীকে দেশে প্রবেশ করিতে

দেওয়া সঙ্গত বলিলে তাঁহাকে শত্রুজ্ঞানে তৎক্ষণাৎ হত্যা করিত। যাহা হউক তিনি এই সময়ে জাপানের উন্নতি ও রক্ষার জন্য জীবন উৎসর্গ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন।

তাঁহার প্রথম ইয়ুরোপযাত্রার বর্ণনায় তিনি বলিয়াছেন "১৮৬৩ সালে আমি প্রথম ইয়ুরোপ যাত্রা করি। তখন আমার বয়স ২২ বৎসর। আর তিনটি বন্ধুর সহিত পরামর্শ করিয়া আমরা চার জনে টোকিও নগর ত্যাগ করিয়া ইয়োকোহামা নগরে উপস্থিত হইলাম। তথায় মিষ্টার কেস্‌উইক্‌ নামে একজন ইংরাজ ব্যবসায়ীর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলাম। সে সময়ে জাপানে বিদেশ যাত্রা যে কেবল ধর্ম্মনীতি বা সমাজ-রীতি বিরুদ্ধ তাহা নহে—সে সময়ে বিদেশ-যাত্রা আইনবিরুদ্ধ ও দণ্ডার্হ বলিয়া পরিগণিত হইত। অনেক অনুনয় বিনয়ের পর কেস্‌-উইক্‌ সাহেব আমাদের সাহায্য করিতে সম্মত হইলেন।

আমরা একখানি জাহাজের মালপত্রের মধ্যে লুকাইয়া রহিলাম। আমরা মাথার চুল কাটিয়া বিদেশী নাবিকের বেশ পরিধান করিলাম। মধ্যে একবার কেস্‌উইক্‌ সাহেব ভীত হইয়া বলিলেন "তিনি দেশের আইনের বিরুদ্ধে আমাদিগকে জাহাজে স্থান দিতে অক্ষম।" আমরা আত্মহত্যা করিব বলায় অবশেষে তিনি সম্মত হইলেন।

চার মাস পরে আমরা লণ্ডননগরে উপস্থিত হইলাম। সেখানে আমরা প্রাণপণ পরিশ্রম করিয়া ইংরাজি, অঙ্ক, তাড়িত বিদ্যা, শিল্প, অর্থনীতি, বন্দুক ও কামান প্রস্তুত এবং

একদিন শুনিলাম বিদেশীগণ জাপান আক্রমণ করিবার উদ্যোগ করিতেছে। আমরা তৎক্ষণাৎ স্বদেশ সেবার জন্য প্রত্যাবর্ত্তন করাই স্থির করিলাম।"

দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া কিছু কাল তাঁহারা স্বদেশবাসীকে শিক্ষিত ও উন্নত করিবার চেষ্টায় নানা বিষয়ে পুস্তক লিখিতে লাগিলেন। এ কর্ম্মে তিনি কতকগুলি নিঃস্বার্থ সহকারীও লাভ করিয়াছিলেন। প্রথম প্রথম ইঁহাদিগকে সর্ব্বদাই প্রাণভয়ে লুকাইয়া থাকিতে হইত। ইঁহাদিগকে হত্যা করিবার জন্য চতুর্দ্দিকে লোক ঘুরিত। একদিন রাত্রিকালে কতকগুলি সশস্ত্র লোক তাঁহাকে হত্যা করিবার জন্য তাঁহার হোটেলে প্রবেশ করিয়াছিল। একটি চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া বালিকা সে রাত্রে সেই হোটেলে অবস্থান করিতেছিল। সে ইটোকে এত ক্ষিপ্রতার সহিত লুকাইয়া ফেলিল যে সে যাত্রা তাঁহার প্রাণ রক্ষা হইয়া গেল। সেই বালিকাই পরে প্রিন্স ইটোর পত্নী হইয়া স্বামীর মহৎকর্ম্মে সহধর্ম্মিণী হইয়াছিলেন।

পরে ইটো পুনরায় ইয়ুরোপ যাত্রা করিয়া তদ্দেশীয় শাসননীতি শিক্ষা করিয়া আসিয়া স্বদেশের শাসননীতি সংস্কারে প্রবৃত্ত হন। এরূপ চেষ্টায় স্বার্থান্ধ দেশবাসীর নিকট বাধা লাভ অবশ্যম্ভাবী। ফলে দুই পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ উপস্থিত হইল। অবশেষে ইটোর পক্ষই জয়ী হইলেন এবং জাপানে বর্ত্তমান শাসননীতি প্রচলিত হইল এবং প্রিন্স ইটো প্রধান মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত হইলেন।

তিনি আজীবন শিক্ষা লাভের জন্য ব্যগ্র ছিলেন। শিক্ষার জন্য তিনি কোন প্রকার

প্রকার সামান্য বস্তুকেও উপেক্ষা করিতেন না।

ইটো চারিবার প্রধান মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহারই চেষ্টায় ও আত্মোৎসর্গে জাপান শিক্ষা, শাসন, শিল্প ও শক্তিতে-বর্ত্তমানে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে। তাঁহারই বুদ্ধি ও বীর্য্যের বলে রুষ জাপান-যুদ্ধে জাপান আপনার অসাধারণ শ্রেষ্ঠতা দেখাইয়া সভ্য জগৎকে মুগ্ধ ও সন্ত্রস্ত করিতে সমর্থ হইয়াছে। তাঁহারই আদর্শ ও শিক্ষার বলে পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে যে জাপান জগতে নগণ্য ও মৃতপ্রায় ছিল, সে আজ জগতের শ্রেষ্ঠ জাতিগণের মধ্যে উচ্চাসন লাভ করিয়াছে।

মৃত্যুকালে প্রিন্স ইটো সম্রাটের প্রতিনিধি স্বরূপ হইয়া কোরিয়ার শাসনকর্ত্তার পদে নিযুক্ত ছিলেন।

মরণকাল পর্য্যন্ত ইটো দরিদ্র ব্যক্তি ছিলেন। ধনী হইবার জন্য তিনি কখনও কোন চেষ্টাই করেন নাই। তাঁহার সমগ্র জীবন তিনি স্বদেশ সেবায় উৎসর্গ করিয়াছিলেন। তিনি যাহা কিছু উপার্জ্জন করিতেন সমস্তই দরিদ্র স্বদেশবাসীগণের শিক্ষার জন্য ব্যয় করিতেন। বর্ত্তমান একজন প্রধান জাপানী রাজনীতিজ্ঞ বলিয়াছেন—"প্রিন্স ইটো আমাদের দেশের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতের দৈহিক অবতার। তাঁহার প্রতি দেশবাসী যতই বিরূপ হউক না কেন, দেশের বিপদের দিনে আবালবৃদ্ধবনিতা তাঁহারই সাহায্য ভিক্ষায় তাঁহারি মুখের দিকে চাহিয়া থাকিবে। তিনিই জাপানের কর্ম্মকর্ত্তা ও চালক।"

এই মহাপুরুষের জীবন ইতিহাসের উপসংহারে ১৮৯৩ সালে ইয়োকোহামা নগর হইতে স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার স্বদেশবাসীকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, আমরা তাহারই সারাংশ উদ্ধৃত করিয়া আমাদের স্বদেশবাসীকে উপহার দিতেছি।

"তোমরা কি করিতেছ? চিরদিন কেবল বাজে কথা বকিয়া মরিতেছ। এখানে আসিয়া জাপানী জাতিকে দর্শন কর এবং গৃহে গিয়া লজ্জায় মুখ আবৃত করিয়া থাক। হায়, স্বদেশ ত্যাগ করিলে তোমাদের জাত যায়!! সহস্র বৎসর ধরিয়া তোমরা সঞ্চিত জঘন্য রীতির পীড়নে নিষ্পেষিত হইতেছ! খাদ্যের পবিত্রতা ও অপবিত্রতা স্থির করিবার জন্য তোমরা সহস্র বৎসর ধরিয়া তোমাদের শক্তি ক্ষয় করিতেছ! পুরোহিতগণের নির্ব্বোধ পীড়নের ঘূর্ণিতলে তোমরা ডুবিতেছ ও উঠিতেছ! বহুশতাব্দীর সামাজিক পীড়নে তোমরা আপন মনুষ্যত্ব হারাইয়া ফেলিয়াছ!

ভাবিয়া দেখ তোমরা কি এবং তোমরা কি কাজ করিতেছ! হায় নির্ব্বোধগণ, তোমরা পুস্তক হস্তে লইয়া সমুদ্রতীরে বিচরণ করিতেছ—বিজ্ঞানের এক আধ টুকরা শিখিতেছ মাত্র—তাহাও আসল জিনিষ নহে। তোমরা বিজ্ঞানের পুস্তক হস্তে লইয়া ঘুরিতেছ বটে কিন্তু তোমাদের প্রাণ পড়িয়া আছে—ত্রিশ টাকার কেরাণীগিরির উপর—না হয় বড় জোর ধূর্ত্ত উকীল হইবার উচ্চাশায় তোমরা মুগ্ধ। দেশে প্রত্যেক ছাত্রেরই চতুর্দ্দিকে কতকগুলি সন্তান ঘেরিয়া তাহাকে আহারের জন্য পীড়ন করিতেছে! আমি জিজ্ঞাসা করি, তোমাদের সমুদ্রে কি এতই জলের অভাব যে তোমরা তাহাতে তোমাদের বইগুলা, গাউনগুলা, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিগুলা ও এইপ্রকার সবগুলা ডুবাইতে অক্ষম?

এখন শোন, মানুষ হইবার চেষ্টা কর। সর্ব্বপ্রথম পুরোহিতগুলাকে পরিত্যাগ কর, ওগুলা কুরীতি ও স্বার্থান্ধতার মধ্যে প্রতিপালিত—উহারা যুক্তি বুঝিবে না, শুনিবে না। সুতরাং প্রথম উহাদের হাত হইতে

অব্যাহতি লাভ কর। এস মানুষ হও! তোমাদের ওই সংকীর্ণ সীমা হইতে বাহিরে আসিয়া দেখ পৃথিবীর অপর জাতিরা কিরূপ উন্নতি করিতেছে। তোমরা কি সত্যই স্বদেশকে ভালবাস? তোমরা কি যথার্থই তোমাদের দেশকে ভালবাস? তবে অগ্রসর হয়ে এস! এস আমরা প্রাণপণে আমাদের দেশের লোককে সাহায্য করিতে যত্নবান হই। পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিও না—অতি প্রিয় ও আত্মীয়গণকে অশ্রুবর্ষণ করিতে দাও! পিছনদিকে দেখিও না—অসঙ্কোচে অগ্রসর হও।

আমাদের মাতৃভূমির উদ্ধারের জন্য অন্ততঃ এক সহস্র যুবাকে উৎসর্গ দেওয়া আবশ্যক—মানুষ, পশু নহে। আমি জিজ্ঞাসা করি ভারতবর্ষে কয়জন নিঃস্বার্থ যুবা আছে যাহারা সমাজসংস্কারের জন্য, দেশের লোককে জীবনদান করিবার জন্য, দরিদ্রকে সাহায্য ও ক্ষুধিতকে অন্নদান করিবার জন্য, সকল শ্রেণীকে সমভাবে শিক্ষাদান করিবার জন্য অর্থাৎ তাহাদের পূর্ব্বপুরুষের পীড়নে পশুত্বপ্রাপ্ত জাতিকে উদ্ধার করিবার জন্য জীবন উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত? হায়! ভারতবর্ষ কবে এ করুণ প্রশ্নের উত্তর দানে সমর্থ হইবে।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

ছবি ও গান।

কবি :—

তুমি আসিয়াছ রাণি! শ্যামগিরি শিরে,
পুলকে শিহরি তাই নামে সন্ধ্যাসতী,
কুসুমের চারু অর্ঘ্য হাতে ল'য়ে ধীরে,
তারকা-প্রদীপ-হারে করিবে আরতি!
কুন্তল স্তবক ল'য়ে খেলিছে মলয়,
গাহিছে বন্দন-গীতি সুখে নির্ঝরিণী,
পরেছ মুকুট কিবা স্বর্ণজ্যোতির্ম্ময়,
আকাশ দিয়াছে রচি চন্দ্রাতপ খানি!
সন্তোষ-শীতল হাসি খেলিছে অধরে,
বরষে নয়ন দু'টি শান্তি-সুধাধারা,—
দূর হ'তে দীন কবি, ভাবনত স্বরে,
গাহে তব জয় গাথা, মুগ্ধ আত্মহারা।
মাধুর্য্য মহিমাময়ী মূরতি তোমার,—
ছুটাক বীণার তানে নূতন ঝঙ্কার।

চিত্রকর :—

সায়াহ্ন গগনপটে অচল শিখরে
দাঁড়াও আসিয়া সন্ধ্যাপ্রতিমার প্রায়,
নিবিড় অলকদাম পড়ি থরে থরে,
ঢেকে দিক্ স্বর্ণছবি তিমির রেখায়।
অঞ্চলে সাঁঝের ফুল উঠিবে হাসিয়া,
চরণে খেলিবে শুভ্র নির্ঝরের জল,
সাজাইবে রক্ত রবি শেষ কর দিয়া,
কত সুবিচিত্র রঙে সন্ধ্যা নভতল।
নীরবে উঠিবে ফুটি অধর কোণায়
মধুর হাসিটি তব, স্নিগ্ধ সমুজ্জ্বল;—
যতনে আঁকিয়া লব, স্বপ্ন-ছায়া প্রায়,
দিব্য সেই ছবিখানি শান্ত নিরমল।
ফুল, জল, নীলাকাশ, আর তুমি তায়,
কালে উপহাস করি রহিবে অক্ষয়!

নবান্ন।

(পল্লীচিত্র।

রামসদয় বাবু গ্রামের মধ্যে বেশ অবস্থাপন্ন লোক। বাটীতে ৮।১০টী গোলা। প্রত্যেকটীই ধান্যে ও অন্যান্য রবি-শস্যে পরিপূর্ণ। গোয়ালে কুড়ি পঁচিশটীর অধিক গাভী এবং চারিটী বলদ। বাছুরগুলি ইতস্ততঃ ছুটাছুটী করিয়া বেড়াইতেছে। ছোট বড় ছয় সাত খানি কাঁচা ঘর। কোনটী রান্না ঘর, কোনটী ঢেঁকিশালা, কোনটী শয়ন ঘর ইত্যাদি। প্রত্যেক ঘরের দেওয়ালগুলি অত্যন্ত পরিষ্কার এবং নানাবিধ আলিপনায় চিহ্নিত। উঠানটীও তেমনি পরিষ্কার। কেবল মধ্যে মধ্যে শীতকালীন শাকের বীজ বপন করা হইয়াছে। শাকক্ষেত্রের আইলগুলি নিকাইয়া সমান করিয়া রাখা হইয়াছে।

বাহিরে বৈঠকখানা। তাহার সরঞ্জামও বড় বেশী নহে। একখানি বড় ঘরের দুই পার্শ্বে দুইটী কুঠারী। একটী কর্ত্তার কাপড়, উড়ানী প্রভৃতিতে পরিপূর্ণ তোরঙ্গ পেটরায় বোঝাই। অপরটিতে লাঙ্গল, কাস্তে, কোদালি, প্রভৃতি চাষের উপকরণাদি যথাস্থানে সজ্জিত রহিয়াছে। মধ্যেরটী কর্ত্তাবাবুর বসিবার ঘর। একখানি উচ্চ তক্তপোষের উপর একখানি মোটা সতরঞ্চ বিস্তৃত, তাহার উপর একটী শুভ্র তাকিয়া। সম্মুখে দেওয়ালে জগন্নাথদেব, কালীঘাটের কালী, আর্টস্কুলের অন্নপূর্ণা প্রভৃতি কয়খানি ছবি।

বাহিরের রোয়াকে একখানি শ্বেতবর্ণের কম্বল বিছান, তাহার পার্শ্বে দুইটী চর্ম্মাচ্ছাদিত মোড়া শোভা পাইতেছে।

বৈঠকখানার পার্শ্বেই একখানি ইষ্টক নির্ম্মিত ক্ষুদ্র গৃহে একটী শালগ্রামশিলা বিরাজ করিতেছেন। একজন পূজারী ব্রাহ্মণ আসিয়া প্রতিদিন যথা সময়ে চারিটী আতপ চাউলে শালগ্রামদেবের ক্ষুধাশান্তি করিয়া যান। সন্ধ্যার সময় কাঁসর ঘণ্টার রোলে সমস্ত গ্রামখানি মুখরিত হইয়া উঠে। কখনও বা কর্ত্তা নিজে দৌহিত্রকে ক্রোড়ে লইয়া দেবদর্শনের জন্য তথায় আগমন করেন।

বেলা তিনটা বাজিয়া গিয়াছে। সূর্য্যদেব ঢলিয়া পড়িয়াছেন। কাজেই রৌদ্রটুকুও সমস্ত বাড়ী ছাড়িয়া পশ্চিমদ্বারী ঘরের দাওয়ায় পোঁছিয়াছে। রামসদয়ের বর্ষীয়সী গৃহিণী আহার শেষ করিয়া উঠিয়া পান মুখে দিয়া রৌদ্রে আপনার পরিধেয় বস্ত্রের অঞ্চলখানি বিছাইয়া দুয়ারের চৌকাঠের নিম্নকাষ্ঠফলক খানিকে উপাধান রূপে পরিণত করিয়া শয়ন করিলেন। কনিষ্ঠা কন্যা ও পুত্রবধূদ্বয় আসিয়া কেহ তাঁহার হস্তপদ মর্দ্দনে, কেহ বা তাঁহার অর্দ্ধপক্ক আলুলায়িত কুন্তলের মধ্যে অঙ্গুলি সঞ্চালিত করিতে লাগিলেন। কন্যার দুই বৎসরের শিশুপুত্রটী নিকটে বসিয়া অস্পষ্টভাবে দুই একটী ছড়া আবৃত্তি করিয়া হাস্যের ফোয়ারা ছুটাইতে লাগিল।

রামসদয়ের দুইটী পুত্র ও দুইটী কন্যা। প্রথম পুত্রটী ইংরেজী ইস্কুলে দিন কতক পড়িয়াছিল বলিয়া ১৫৲ টাকা বেতনে জেলার জজ আদালতে একটী চাকরীতে নিযুক্ত হইয়াছে। ছুটী কম বলিয়া তাহার বাড়ী

আসা এক প্রকার ঘটিয়া উঠে না। কেবল পূজা ও বড় দিনের অবকাশে দুই চারিদিন পল্লীর শ্রীমুখ দর্শন করিতে পায়। বেতনও অল্প, কাজেই পরিবার লইয়া কর্ম্মস্থলে থাকাও একরূপ অসম্ভব। কনিষ্ঠ পুত্রটী গ্রামস্থ জমীদারের তহশিলদারের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া বৈধ উপায়ে প্রায় ২০৲।২৫৲ টাকা উপার্জ্জন করিয়া থাকে। কিস্তীর সময় ভিন্ন বৎসরের অন্য সময়টা স্বগৃহে যাপন করিবার অবকাশ পায়। গৃহে কোন উৎসবাদি হইলে মহলের রায়তগণ স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া স্ব স্ব ক্ষেত্রোৎপন্ন তরকারী প্রভৃতি দ্বারা তাহার গৃহ পূর্ণ করিয়া ফেলে। রামসদয় জ্যেষ্ঠ পুত্রের নিকট হইতে কোন সাহায্য না পাইলেও পুত্রের সম্মানে আন্তরিক সুখী।

কন্যা দুইটীর মধ্যে একটী বিধবা। সে প্রায় শ্বশুরালয়েই থাকে। বিশেষ কার্য্যে ভিন্ন পিত্রালয়ে আসিবার তাহার অবসর নাই। অপরটি কয়দিন হইল পিত্রালয়ে আসিয়াছে।

সকলকে একত্র পাইয়া সহসা নবান্নের কথাটা গৃহিণীর মনে পড়িয়া গেল। অমনি সেদিন কাহাকে কোন কার্য্যের ভার লইতে হইবে তাহার একটা সংক্ষিপ্ত মৌখিক তালিকা প্রস্তুত করিয়া ফেলিলেন।

ক্রমে অবশিষ্ট রৌদ্রটুকুও গৃহ ছাড়িয়া নিকটস্থ নারিকেল গাছের শীর্ষদেশ আশ্রয় করিল। গৃহিণী ও পুত্রবধূদ্বয় তাড়াতাড়ি উঠিয়া পুনরায় গৃহকর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন। কন্যাটী উঠিয়া শিশুপুত্রকে কোলে লইয়া পিতার নিকট বৈঠকখানার দিকে চলিল। কন্যা পিতৃগৃহে আসিলে সংসারের কাজ হইতে অনেকটা মুক্তি লাভ করে।

রামসদয় তখন সবেমাত্র মধ্যাহ্নের 'আলিস্যি' ত্যাগ করিয়া গাড়ু ও গামছা লইয়া মুখ প্রক্ষালনে ব্যাপৃত ছিলেন।

কন্যার ক্রোড়দেশে শিশু দৌহিত্রকে দেখিয়া বৃদ্ধের আনন্দ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। সুতরাং বিরলদন্ত শুষ্ক মুখখানা কৃত্রিম ক্রোধে একটু বিকৃত করিয়া শিশুকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়া উঠিলেন—"মার্ বজ্জাত্‌কে।" শিশুও অমনি এক গাল হাসিয়া মাতামহের শুভ্র-লোমময় বুকের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল।

বৃদ্ধের কোন ভৃত্য ছিল না। কাজেই দৌহিত্রকে একটী মোড়ার উপর বসাইয়া নিজেই চকমকি ঠুকিয়া অগ্নি উৎপাদন করিয়া ধূমপানের উপায় করিয়া লইলেন এবং সেই শুভ্র কম্বলখানির উপর উপবেশন করিয়া হুকা নিঃসৃত পুঞ্জীকৃত ধূমরাশি ফুৎকার দ্বারা শিশুর উদ্দেশে প্রেরণ করিয়া তাহার আনন্দ বিধান করিতে লাগিলেন। কর্ত্তার ধূমপান শেষ হইলে কন্যা বলিল—"বাবা, নবান্নের দিনটা তবে স্থির ক'রে দিন।"

রামসদয় অমনি হুকাটী নামাইয়া রাখিয়া গৃহাভ্যন্তর হইতে একখানি মোটা কাগজের মলাটে আবৃত "গুপ্তপ্রেশ" পঞ্জিকা ও একখানি বহুদিনের মরিচাধরা সুতাবাঁধা চশমা বাহির করিয়া আনিলেন। অতি সন্তর্পণে চশমাখানি নাকে দিয়া, পঞ্জিকাখানি চক্ষু হইতে অনেকটা দূরে স্থাপন করিয়া প্রায় অর্দ্ধঘণ্টাকাল তাহার পৃষ্ঠা উল্টাইতে লাগিলেন।

পরে কন্যার প্রতি চাহিয়া বলিলেন—"মা, দিন ত তিনটা দেখছি, সত্তেরই, একুশে আর আটাশে; তা আটাশে ত আঁধার পড়ছে, সে দিন ত [illegible]

পারে না; একুশে তারিখ হচ্ছে 'বিস্পতিবার'— 'বানিাদিন' সে দিনটাও বড় সুবিধা নয়। তবে ঐ সতেরই দিনটাই প্রশস্ত। সেদিন হচ্ছে আবার বুধবার 'বুধে বাল তৃতীয়কং' একটু চট্‌পট কাজগুলো সেরে নিতে হবে নইলে বারবেলা পড়বে।"

ইত্যবসরে দৌহিত্রটী সকলিকা হুকাটীকে কম্বলের উপর বিসর্জ্জন দিয়া বসিল। বৃদ্ধ তাড়াতাড়ি উঠিয়া কম্বল ঝাড়িতে ঝাড়িতে তাহার সহিত অনেকগুলি অদ্ভুত সম্বন্ধ পাতাইয়া ফেলিলেন।

কন্যাটী ঈষৎ অপ্রতিভ হইয়া পুত্রকে টানিয়া কোলে লইয়া মিষ্ট ধমকানি দিয়া বলিল—"এমন দুষ্টু ছেলে—"

কর্ত্তা যখন এইরূপে বিব্রত হইয়া পড়িয়াছেন এমনি সময়ে পাড়ার মধুদাদা আসিয়া ডাকিল—"কর্ত্তা বাবু গা' তুলেছেন কি?"

কর্ত্তাবাবু সামলাইয়া লইয়া উত্তর দিলেন "এস, মধু এস।"

সম্ভ্রান্ত পরিবারের মধ্যে অবরোধ প্রথাটা প্রচলিত থাকিলেও পল্লীগ্রামে তাহার তাদৃশ প্রাবল্য দৃষ্ট হয় না। বিশেষতঃ পল্লীগ্রামের কন্যারা এ বিষয়ে অনেকটা নিরঙ্কুশ। মধু রামসদয়ের দুইটী কন্যাকেই ছেলেবেলায় 'কোলে পিঠে' করিয়া 'মানুষ' করিয়াছে। কাজেই মধুর সম্মুখ হইতে পলায়ন কন্যার আবশ্যক হইল না।

মধু বাটী প্রবেশ করিয়াই কন্যাকে দেখিয়া সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিল "এই যে, তুমি কবে এলে?"

মেয়েটীও সবিনয়ে উত্তর দিল "এই চারদিন হ'ল এসেছি।"

পরস্পর কুশল প্রশ্নের পর কন্যা অন্দরে প্রবেশ করিল। মধু কর্ত্তার সহিত বৈষয়িক কথাবার্ত্তায় ব্যাপৃত হইল।

পাড়ায় পাড়ায় টেলিগ্রাফ হইয়া গেল যে রামসদয় বাবু সতেরই তারিখ নবান্নের দিন স্থির করিয়াছেন। কাজেই প্রতিবেশীরাও নিজেদের জন্য সেই দিনটী স্থির করিল।

দেখিতে দেখিতে নবান্নের দিন সমাগত হইল। পূর্ব্বদিবস হাটের জিনিষ দুর্ম্মূল্য হইয়া উঠিল। একটী মূলার দাম দুই পয়সা, পটল, আলু ছয় আনা সের, কদলীর দর উত্তরোত্তর বেলা বৃদ্ধির সহিত বৃদ্ধি হইতে লাগিল। সকালে পয়সায় দুইটী পাওয়া গিয়াছিল, মধ্যাহ্নে হইল দেড়টী, সায়াহ্নে একটীও পাওয়া যায় না।

সকালে নবান্ন হইবে বলিয়া গৃহিণী পূর্ব্বদিনই তরকারী কুটিয়া রাখিবার ব্যবস্থা করিলেন। ছয় সাতখানি বঁটী পড়িয়াছে। কেহ লাউ, কেহ কুমড়া, কেহ বার্ত্তাকুকুলের বিনাশ সাধন করিতে বসিয়াছেন। রামসদয়ের দৌহিত্রটী উঠানে পড়িয়া চীৎকার করিতেছে "মা, দাদা মেয়েছে।" কেহই সেদিকে লক্ষ্য করিতেছে না। শিশুর ক্রন্দন যখন পঞ্চম ছাড়াইয়া সপ্তমে উঠিল তখন তাহার মাতা তন্নিবারণকল্পে যেরূপ ঝঙ্কার দিয়া উঠিলেন তাহাতে শান্তি স্থাপন হওয়া দূরে থাক, গোলমাল আরও বৃদ্ধি পাইল। পাড়ার ছেলেরা দলে দলে খেলার কল্পনা করিতেছে। আজ তাহাদিগকে মাতা পিতার শাসনাধীনে থাকিতে হয় না সুতরাং তাহাদের আনন্দই সর্ব্বাপেক্ষা দর্শনযোগ্য।

রাত্রি পর্য্যন্ত সমস্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি

যথাস্থানে রক্ষা করিয়া গৃহিণী, কন্যা ও পুত্রবধূদ্বয় নিদ্রার্থে গৃহে প্রবেশ করিলেন। সে রাত্রে তাঁহাদের সুনিদ্রা হইয়াছিল কিনা বলা যায় না। প্রভাত না হইতেই গৃহিণী আপনার শয্যা ত্যাগ করিয়া কন্যাকে উঠাইলেন। বধূদিগকে গৃহদ্বার হইতে ডাকিতে লাগিলেন,—

"বৌমা, ওঠ না, বেলা আর কি আছে? কাক, কোকিল যে ডেকে গেল।"

বধূদ্বয়ের নিদ্রা অনেকক্ষণ ভঙ্গ হইয়াছিল, লেপের উষ্ণ কোল ত্যাগ করিয়া কিরূপে বাহির হইবে এক্ষণে তাহাই ভাবিতেছিল। শাশুড়ীর আহ্বানে আর ভাবিবার অবসর পাইল না। তাড়াতাড়ি উঠিয়া আসিয়া শাশুড়ীর সঙ্গে যোগ দিতে হইল।

'অন্নানে' কোন জিনিষ স্পর্শ করিবার উপায় নাই, কাজেই সকলে পুষ্করিণী হইতে স্নান করিয়া আসিলেন। তখন শীতে তাঁহাদের মুখ হইতে প্রায় বাক্যনিঃসরণ হয় না। সিক্ত কুন্তলরাশি পৃষ্ঠের উপর এলাইয়া দিয়া, পরিধেয় বস্ত্রের পাতলা অঞ্চলটুকুতে গাত্র আবৃত করিয়া পূর্ণ উৎসাহে এঘর ওঘর করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। কেহবা কেশের দৈর্ঘ্য দোরাত্ম্যে তাহাকে মস্তকের উপর চূড়াকারে বাঁধিয়া রাখিলেন।

ইতিমধ্যে পাকশালে উনান জ্বলিয়াছে। রন্ধনের ঘ্রাণে এবং ছ্যাঁক্ ছ্যাঁক্ শব্দে পাড়া আমোদিত হইয়া উঠিয়াছে। গৃহিণী স্তূপীকৃত লঘুধান্যের * শ্বেতবর্ণ সিক্ত চাউলের নিকট একখানি প্রকাণ্ড শিল পাতিয়া তাহা পিষিবার উপক্রম করিতেছেন।

গৃহিণীকে এরূপ শ্রমসাধ্য কর্ম্মে নিযুক্ত দেখিয়া গৃহের আরও দুই একজন আসিয়া তাঁহার কাজের সহায়তা করিতে লাগিল। অবিলম্বেই সেই চাউলের রাশি চূর্ণ হইয়া গেল। পরে তদ্দ্বারা 'পঞ্চামৃত' প্রস্তুত হইতে লাগিল। প্রথমে সেই চাউলচূর্ণের সহিত প্রচুরপরিমাণে দুগ্ধ, ক্ষীর ও চিনি মিশ্রিত করা হইল। পরে ইক্ষুর টুকরা, পানিফল, কলা, নারিকেল ও মূলা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র করিয়া কাটিয়া তাহাতে প্রদত্ত হইল। অধুনা অনেক স্থলে বাদাম কিস্‌মিস্‌ও ইহাতে প্রবেশলাভ করিয়াছে।

এই পঞ্চামৃত নবান্নের প্রধান উপকরণ।

গৃহিণীর কাজ শেষ না হইতেই পুরোহিত ঠাকুর আসিয়া উপস্থিত। পুরোহিতের শিখায় একটী হরিদ্রাবর্ণের ফুল বাঁধা, পরিধানে একখানি শুভ্র বস্ত্র, বামহস্তে একটী কদলীপত্রের ঠোঙ্গায় কতকগুলি অনায়াসলব্ধ পুষ্প ও তুলসীপত্র। গাত্রে নামাবলী। প্রাতঃস্নান করিয়া পুরোহিত ঠাকুর শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে উঠানের যে অংশে সকালের রৌদ্রটুকু পড়িয়াছে তথায় আসিয়া দাঁড়াইয়া ডাক দিলেন—"কই গো মা, সব ঠিক্ হয়েছে কি?"

পুরোহিত ঠাকুরের স্বর শুনিয়া গৃহিণী অর্দ্ধঘোমটাবৃত বদনে বাহিরে আসিয়া বলি-

---

* হৈমন্তিক ধান্যের মধ্যে লঘুধান্য কার্ত্তিকমাসের মধ্যেই পাকিয়া উঠে। কাজেই ঐ ধান্যের চাউলই নবান্নে অধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

লেন—"আজ্ঞা হাঁ, সমস্ত ঠিক্, ঐ পা ধুইবার জল রয়েছে।"

নিকটে একটী ঘটীতে তুষারশীতল জল ছিল। পুরোহিতের ইচ্ছা না থাকিলেও গৃহিণীর উপরোধে পদপ্রক্ষালন করিয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন। কর্ত্তাও কালবিলম্ব না করিয়া স্নান করিয়া গামছাখানি স্কন্ধে লইয়া যজ্ঞোপবীতের জল নিষ্কাসন, এবং মুখে নানাবিধ মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে অন্দরে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার শীতের যন্ত্রণাটা মন্ত্রের সঙ্গেই অনেকটা প্রকাশিত হইয়া পড়িতেছিল।

কর্ত্তা গৃহে প্রবেশ করিবামাত্র গৃহিণী তথা হইতে স্থানান্তরে প্রস্থান করিলেন।

সম্মুখেই নূতন চাউল, ডাউল, ঘৃত, তরকারীবিশিষ্ট প্রকাণ্ড 'ভোজ্য' সাজান। কর্ত্তা কুশাসনে বসিয়া গঙ্গামৃত্তিকার ফোঁটা কাটিয়া আচমন করিলেন। পুরোহিত ঠাকুর প্রায় ষোলআনা অশুদ্ধ মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া কর্ত্তার পিতৃপুরুষগণের উদ্দেশে সেই 'ভোজ্য' উৎসর্গ করিয়া দিলেন। তদন্তে উঠানে একটী মৃৎপাত্রে কতকগুলি নূতন বিচালী জালিয়া তদুপরি কয়েকবার 'পঞ্চামৃত' নিক্ষেপ করিয়া ব্রহ্মাদেবকে নবান্ন করাইলেন।

এইবার গাভী, কাক ও বাস্তুদেবের পালা। সকলকেই কদলীপত্রে করিয়া কতকটা 'পঞ্চামৃত' প্রদত্ত হইল। তবে বাস্তুদেবের সম্মানটাই কিঞ্চিৎ অধিক বলিয়া বোধ হয়। কারণ নারিকেল মালার জল হইতে আরম্ভ করিয়া পান পর্য্যন্ত কোনটীই তাঁহার বাদ পড়িল না।

এই সকল নিমন্ত্রিতগণের মধ্যে কাকই নিমন্ত্রকের সম্মান রক্ষা করিতে অধিক তৎপর। কারণ তাহার অভ্যর্থনার জন্য যে সকল দ্রব্য প্রদত্ত হইয়া থাকে তাহার সদ্ব্যবহার ত দূরের কথা নির্জ্জীব বাস্তুদেবের উপরেও বল প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হয় না।

ইহাদের নবান্ন ভোজ শেষ হইলে গৃহের সমস্ত পুরুষগণ একত্র পূর্ব্বাভিমুখী হইয়া উপবেশন করিলেন। ছোট ছোট ছেলেরা নূতন কাপড় পরিয়া একটা মহা হুলস্থূল বাধাইয়া দিল। সকলকেই এক একটী পাথর বাটীতে করিয়া 'পঞ্চামৃত' পরিবেশন করা হইল। বলা বাহুল্য রামসদয়ের গৃহদেবতা শালগ্রাম-শিলার নবান্ন ইতিপূর্ব্বেই সমাধা হইয়াছে। প্রথমে সেই প্রসাদ মুখে দিয়া সকলে 'পঞ্চামৃত' ভোজনে মনঃসংযোগ করিল। পিতা পুত্রে একত্র উপবেশন করিয়া নবান্ন করা নিষিদ্ধ। সুতরাং রামসদয়ের কনিষ্ঠ পুত্র স্থানান্তরে আসন প্রাপ্ত হইল। পুরুষেরা উঠিয়া গেলে স্ত্রীলোকেরাও সেইরূপে নবান্ন শেষ করিল।

দেখিতে দেখিতে গ্রামের ইতরলোকেরা এক একটী পাত্র হস্তে আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল। গৃহিণী লোকবিশেষে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ 'পঞ্চামৃত' দিয়া সকলকে বিদায় করিতে লাগিলেন। অবশ্য ইহাদের জন্য যে 'পঞ্চামৃত' প্রস্তুত করা হইয়াছিল তাহাতে দুগ্ধ, ক্ষীর ও মিষ্টের ভাগ অপেক্ষাকৃত অল্প। তারপর রামী, শ্যামী ও যাহারা বৎসরের মধ্যে দুই একদিন গৃহে বিনা পরিশ্রমে কোন কাজ করিয়া দিয়াছে তাহারা আসিয়া জুটিল। সকলকেই পরিতোষপূর্ব্বক ভোজন করান হইল।

বৈষ্ণব ভিক্ষুকদিগের ভিড় আজ ঠেলা

যায় না। কারণ আজিকার দিন কেহই তাহাদিগকে বিমুখ করে না। সকলে দল বাঁধিয়া, বড় বড় তিলক কাটিয়া, গলায় মালার ঝোলা বাঁধিয়া 'হরিবোল' বলিয়া গৃহ দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইতেছে। গৃহের যে কেহ তাহাদিগকে মুষ্টিভিক্ষা প্রদান করিতেছে।

দেখিতে দেখিতে বেলা অধিক হইয়া উঠিল। গৃহিণী একটা পাত্রে নূতন ও পুরাতন চাউল দিয়া একখানি স্বর্ণ ও একখানি রৌপ্য অলঙ্কার তদুপরি রাখিয়া দিলেন। সকলে আসিয়া তাহাই বামহস্তে এক একবার স্পর্শ করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রটী উচ্চারণ করিতে লাগিল :—

"নূতন বাঁধি পুরাণ খাই জন্ম জন্ম।"

রন্ধনের শেষ হইতে অপরাহ্ণ হইয়া গেল। গাভী, কাক, বাস্তুদেব প্রভৃতিকে পর্য্যায়ক্রমে ভাত ও নবান্ন দানের পর গৃহের সকলের আহারাদি শেষ হইল! কোন কোন গৃহে রাত্রিভোজনেরও নিয়ম দেখা যায়।

ব্যঞ্জনাদি প্রতিবৎসর একই প্রকার। তাহার পরিবর্ত্তনের কোন নিয়ম নাই। যদি দৈবদুর্ব্বিপাকে কোন একটা ব্যঞ্জন বাদ পড়িয়া যায় তাহা হইলে সমস্ত বৎসর তাহা গৃহিণীর পরিতাপের বিষয় হইয়া থাকে। গৃহের সকলের ভোজন হইলে পূর্ব্বোক্তরূপে অন্যান্য লোকদিগকে ভোজন করান হয়।

এই সকল রাজসূয় ব্যাপার শেষ হইতে অগ্রহায়ণ মাসের ক্ষুদ্র দিন অবসান হইয়া আসিল। সূর্য্যদেব অস্তাচল আশ্রয় করিলেন। গৃহের সমস্ত কাজ শেষ হইতে রাত্রি প্রায় নয় ঘটিকা অতীত হইয়া গেল। সমস্ত দিন অসাধারণ পরিশ্রমের পর স্ত্রীলোকেরা এক্ষণে বিশ্রামের অবকাশ পাইলেন। সমস্ত গ্রাম শান্ত হইল। কেবল উচ্ছিষ্টপ্রয়াসী সারমেয়-কুলের বিবাদ ধ্বনি নবান্নের কলরবস্মৃতি রক্ষা করিতে লাগিল।

শ্রীজগদীশ বাজপেয়ী।

মদন ভস্ম।

নিম্নলিখিত ক্ষুদ্র প্রবন্ধটি একজন মুসলমানের লেখা। ইনি সংস্কৃত সাহিত্যের অন্তরে কতদূর প্রবেশলাভ করিয়াছেন এই প্রবন্ধ তাহার পরিচায়ক? আজকাল বাঙলা সাহিত্যকে জাতীয় সাহিত্যরূপে গ্রহণের দিকে আমাদের মুসলমান ভ্রাতাগণের মধ্যেও একটি চেষ্টা দেখা যাইতেছে। ইহা বড়ই সুখের বিষয়। ধর্ম্মসম্বন্ধে আমাদের পরস্পরের যতই মতভেদ থাকুক—আমরা উভয় সম্প্রদায়ই বাঙালী—বিধাতার বিধানে আমাদের উভয়কেই একত্রে বাঁচিতে মরিতে হইবে। এ অবস্থায় আমাদের মধ্যে সাহিত্যের একতা বিশেষভাবে প্রার্থনীয়;—কেন না সাহিত্যই পরস্পরের মিলনের শ্রেষ্ঠ উপায়। বর্ত্তমান লেখকের আমাদের পুরাতন সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ দেখিয়া তাই আমরা অতিশয় আনন্দলাভ করিয়াছি। ভারতী সম্পাদিকা।

গ্রীকপুরাণের রূপকের (allegory) চমৎকারিত্বে আমরা মুগ্ধ হই। কিন্তু হিন্দু-পুরাণেও যে সুন্দর রূপক আছে, তাহা কয়জন অনুসন্ধান করিয়াছেন?

শিবপার্ব্বতীর বিরহাদি বর্ণনচ্ছলে প্রাচীন কবিগণ ছয় ঋতুর কি সুন্দর চিত্র আঁকিয়াছেন!

দক্ষযজ্ঞে সতী দেহত্যাগ করিয়াছেন।

সতীশোকে পশুপতি প্রমথগণের সহিত যজ্ঞভঙ্গ করিতেছেন। চারিদিকে ভূতগণের তাণ্ডব নৃত্য! হেমন্তের কি স্বরূপ বর্ণনা। প্রকৃতিতে আর শরতের সেই সজীবতা নাই। গাছের পাতা পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে এখনও কিন্তু একেবারে মুড়া হয় নাই। সরোবরে এখনও কমল শোভা পাইতেছে। কিন্তু উত্তরের কন্‌কনে বাতাস আর তুষারপাত শীঘ্রই শরতের শেষ চিত্রগুলি লোপ করিতে বসিয়াছে। প্রথমেই হেমন্তের বর্ণনা কেন? অগ্রহায়ণ (হায়ন—বৎসর) শব্দেই তাহা প্রকাশ। পূর্ব্বে হেমন্ত ঋতুতে বৎসর আরম্ভ হইত। তাই কবি বৎসরের আরম্ভ হইতেই ঋতু বর্ণনা করিয়াছেন।

হেমন্ত গেল। শীত আসিল। হেমন্তেই প্রকৃতির শোভার দক্ষযজ্ঞ বিনাশ ব্যাপার আরম্ভ হইয়াছিল। এখন তাহা সম্পূর্ণ হইয়াছে। বৃক্ষগুলি নেড়া মুড়া হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। মাঠের ধান কাটা হইয়া গিয়াছে। চারিদিকে ক্ষেত্র ধূ ধূ করিতেছে। যেন সমস্ত প্রকৃতির উপর কি এক ভীষণ অত্যাচার হইয়া গিয়াছে। এখন যেন জগৎ নয়ন মুদিয়া যোগাসনে বসিয়াছে। কবি রূপকচ্ছলে বলিলেন, সতীর দেহ খণ্ড বিখণ্ড হইল দেখিয়া মহাদেব তপস্যায় বসিলেন।

বসন্ত আসিল। মলয় ও নবমঞ্জরী দেখা দিল। প্রকৃতি পুনর্জ্জীবিতা হইল আর সতীও পুনরায় জন্মগ্রহণ করিলেন। কোকিল পঞ্চমে গাহিতে লাগিল। অলিগণ গুঞ্জন আরম্ভ করিল। চারি দিকে ফুলে ফুলময়। এইবার জগতের জড়ভাব গেল। এখন সকলই আনন্দময়। কবি বলিলেন মহাদেবের তপস্যা ভাঙ্গিয়া পার্ব্বতীর সহিত মিলন সংঘটন করিতে মদন আসিয়া উপস্থিত, হাতে তাঁর ফুলবাণ, বসন্ত আর রতি (প্রীতি) তাঁর সহচর! মধুমাসের কি কবিত্বপূর্ণ বর্ণনা!

তারপর শিবের ক্রোধে মদন ভস্ম হইয়া গেলেন আর পার্ব্বতীও পঞ্চাগ্নি মধ্যস্থা হইয়া তপস্যা আরম্ভ করিলেন। গদ্যের ভাষায় বলিতে গেলে, গ্রীষ্ম আরম্ভ হইল। চারিদিকে যেন আগুনের হল্‌কা বহিতে লাগিল।

পার্ব্বতীর উগ্র তপস্যা শেষ হইল যখন গ্রীষ্ম গেল। শিবপার্ব্বতীর মিলন হইল অর্থাৎ বর্ষা আসিল; মদন পুনর্জ্জীবিত হইলেন। বর্ষায় যে বিরহীদের মদনব্যথা জাগিয়া উঠে তা ত প্রসিদ্ধই আছে যথা,—

মেঘালোকে ভবতি সুখিনোঽপ্যন্যথা বৃত্তিচেতঃ,
কণ্ঠাশ্লেষপ্রণয়িনী জনে কিং পুনর্দূরসংস্থে।

তারপর হরগৌরী মনঃসুখে মিলন উপভোগ করিতে লাগিলেন। হরিৎশস্যতৃণাবৃত, কুমুদকহ্লারবিভূষিত, শুভ্রজ্যোৎস্নাবিধৌত শরতে প্রকৃতি, স্বামি-সোহাগিনী নারীর ন্যায় ধরাতলে প্রকাশিতা হন। তাই শিবদুর্গার মিলন সম্ভোগচ্ছলে কবি ধরাতলে সুষমাময়ী প্রকৃতির প্রকাশ বর্ণনা করিয়াছেন।

মহম্মদ শহীদুল্লাহ।

স্বপ্ন।

একটী দরিদ্র লোক অন্ধকার কুটীরীতে বসিয়া নিজ শোচনীয় অবস্থা এবং ভগবানের রাজ্যে অন্যায় ও অবিচারের কথা ভাবিতেছিল। দরিদ্র অভিমানের বশীভূত হইয়া বলিতে লাগিল, "লোকে" কর্ম্মের দোহাই দিয়া ভগবানের সুনাম বাঁচাইতে চায়। গত জন্মের পাপে যদি আমার এই দুর্দ্দশা হইত, আমি যদি এতই পাপী হইতাম, তাহা হইলে নিশ্চয় এই জন্মে আমার মনে পাপচিন্তার স্রোত এখনও বহিত, এত ঘোর পাতকীর মন কি একদিনে নির্ম্মল হয়? আর ওই পাড়ার তিনকড়ি শীল, তাঁহার যে ধনদৌলত স্বর্ণরৌপ্য দাসদাসী, কর্ম্মফল সত্য হইলে নিশ্চয়ই পূর্ব্ব জন্মে তিনি জগদ্বিখ্যাত সাধু মহাত্মা ছিলেন, কিন্তু কই তাহার চিহ্নমাত্রও এই জন্মে দেখি না। এমন নিষ্ঠুর পাজী বদমায়েশ জগতে নাই। না, কর্ম্মবাদ ভগবানের ফাঁকি, মন ভুলোন কথা মাত্র। শ্যামসুন্দর বড় চতুরচূড়ামণি, আমার কাছে ধরা দেন না, তাই রক্ষা—নচেৎ উত্তম শিক্ষা দিয়া সব চালাকী বাহির করিতাম।" এই কথা বলিবামাত্র দরিদ্র দেখিল হঠাৎ তাহার অন্ধকার ঘর অতিশয় উজ্জ্বল আলোকতরঙ্গে ভাসিয়া গেল, অল্পক্ষণ পরে আলোক তরঙ্গ অন্ধকারে মিলাইয়া গেল, আর সে দেখিল তাহার সম্মুখে একটি সুন্দর কৃষ্ণবর্ণ বালক প্রদীপ হাতে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে—মৃদু হাসিতেছে, কিন্তু কোনও কথা কহিতেছে না। ময়ুরপুচ্ছ ও পায়ে নূপুর দেখিয়া দরিদ্র বুঝিল স্বয়ং শ্যামসুন্দর আসিয়া তাহাকে ধরা দিয়াছেন। দরিদ্র অপ্রতিভ হইল, একবার ভাবিল প্রণাম করি, কিন্তু বালকের হাসিমুখ দেখিয়া কিছুতেই প্রণাম করিবার প্রবৃত্তি হইল না,—শেষে মুখ হইতে এই কথাই বাহির হইয়া গেল "ওরে কেষ্টা, তুই এলি কেন?" বালক হাসিয়া বলিল, "কেন, তুমি ডাকিলে না? এইমাত্র আমাকে চাবুক মারিবার প্রবল বাসনা তোমার মনে ছিল। তা, ধরা দিলাম, উঠিয়া চাবকাও না।" দরিদ্র আরও অপ্রতিভ হইল, ভগবানকে চাবুক মারিবার ইচ্ছার জন্য অনুতাপ নহে, কিন্তু স্নেহের পরিবর্ত্তে এমন সুন্দর বালকের গায়ে হাত লাগানটা ঠিক রুচিসঙ্গত বলিয়া বোধ হইল না। বালক আবার বলিল, "দেখ, হরিমোহন, যাহারা আমাকে ভয় না করিয়া সখার মত দেখে, স্নেহভাবে গাল দেয়, আমার সঙ্গে খেলা করিতে চায়, তাহারা আমার বড় প্রিয়। আমি খেলার জন্যই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছি, সর্ব্বদা খেলার উপযুক্ত সঙ্গী খুঁজিতেছি। কিন্তু, ভাই, পাইতেছি না। সকলে আমার উপর ক্রোধ করে, দাবী করে, দান চায়, মান চায়, মুক্তি চায়, ভক্তি চায়, কই আমাকে ত কেহ চায় না। যাহা চায়, আমি দিই। কি করিব সন্তুষ্টই করিতে হয়, নহিলে আমাকে ছিঁড়িয়া খাইবে। তুমিও, দেখিতেছি, কিছু চাও। বিরক্ত হইয়া চাবকাইবার লোক চাও, আমাকে সেই সাধ মিটাইবার জন্য ডাকিয়াছ। চাবুকের প্রহার খাইতে আসিয়াছি—যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে। তবে যদি প্রহারের আগে আমার মুখে শুনিতে চাও, আমার প্রণালী বুঝাইয়া দিব। কেমন, রাজী আছ?" হরিমোহন বলিল,

"পারিবি ত? দেখিতেছি, বড় বকিতে জানিস, কিন্তু তোর মত কচি ছেলে যে আমাকে কিছু শিখাইতে পারিবে, তাহা বিশ্বাস করিব কেন?" বালক আবার হাসিয়া বলিল, "এস, দেখ, পারি কিনা।"

এই বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ হরিমোহনের মাথায় হাত দিলেন। তখনই দরিদ্রের সর্ব্বশরীরে বিদ্যুতের স্রোত খেলিতে লাগিল, মূলাধারে গুপ্ত কুণ্ডলিনীশক্তি অগ্নিময়ী ভুজঙ্গনীর আকারে গর্জ্জন করিয়া ব্রহ্মরন্ধ্রে ছুটিয়া আসিল, মস্তিষ্ক প্রাণশক্তির তরঙ্গে ভরিয়া গেল। পরমুহূর্ত্তে হরিমোহনের চারিধারে ঘরের দেওয়াল যেন দূরে পলাইতে লাগিল, নামরূপময় জগৎ যেন তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া অনন্তে লুক্কায়িত হইল। হরিমোহন বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইল। যখন আবার চৈতন্য হইল, সে দেখিল কোন অচেনা বাড়ীতে বালকের সঙ্গে দাঁড়াইয়া আছে, সম্মুখে গদীতে বসিয়া গালে হাত দিয়া একজন বৃদ্ধ প্রগাঢ় চিন্তায় নিমগ্ন রহিয়াছেন। সেই ঘোর দুশ্চিন্তাবিকৃত হৃদয়বিদারক নিরাশাবিমর্ষ মুখমণ্ডল দেখিয়া হরিমোহন বিশ্বাস করিতে চায় নাই যে এই বৃদ্ধ গ্রামের হর্ত্তাকর্ত্তা তিনকড়ি শীল। শেষে অতিশয় ভীত হইয়া বালককে বলিল, "কি করিলি কেষ্টা, চোরের মত ঘোর রাত্রিতে পরের বাড়ীতে ঢুকিলি? পুলিস আসিয়া ধরিয়া প্রহারের চোটে দুইজনের প্রাণ বাহির করিবে যে। তিনকড়ি শীলের প্রতাপ জানিস না।" বালক হাসিয়া বলিল, "খুব জানি। কিন্তু চুরি আমার পুরাতন ব্যবসা, পুলিসের সঙ্গে আমার বেশ ঘনিষ্ঠতা আছে, ভয় নাই। এখন তোমাকে সূক্ষ্মদৃষ্টি দিলাম, বৃদ্ধের মনের ভিতর দেখ। তিনকড়ির প্রতাপ জান, আমার প্রতাপও দেখ।" তখন হরিমোহন বৃদ্ধ তিনকড়ির মন দেখিতে পাইল। দেখিল, যেন শত্রু আক্রমণে বিধ্বস্ত ধনাঢ্যা নগরী, সেই তীক্ষ্ণ ওজস্বিনী বুদ্ধিতে কত ভীষণমূর্ত্তি পিশাচ ও রাক্ষস প্রবেশ করিয়া শান্তি বিনাশ করিতেছে, ধ্যান ভঙ্গ করিতেছে, সুখ লুণ্ঠন করিতেছে। বৃদ্ধ প্রিয় কনিষ্ঠ পুত্রের সঙ্গে কলহ করিয়াছেন, তাড়াইয়া দিয়াছেন, বৃদ্ধকালের স্নেহের পুত্রকে হারাইয়া শোকে মৃয়মান, অথচ ক্রোধ, গর্ব্ব, হঠকারিতা হৃদয় দ্বারে অর্গল দিয়া সান্ত্রী হইয়া বসিয়া আছে। ক্ষমার প্রবেশ নিষেধ করিতেছে। কন্যার নামে দুশ্চরিত্রা বলিয়া কলঙ্ক রটিয়াছে, বৃদ্ধ তাঁহাকে বাড়ী হইতে তাড়াইয়া প্রিয় কন্যার জন্য কাঁদিতেছেন, বৃদ্ধ জানেন সে নির্দ্দোষ, কিন্তু সমাজের ভয়, লোকলজ্জা, অহঙ্কার, স্বার্থ স্নেহকে চাপিয়া ধরিয়াছে। সহস্র পাপের স্মৃতিতে বৃদ্ধ ভীত হইয়া বারবার চমকিয়া উঠিতেছে; তথাপি পাপপ্রবৃত্তির সংস্কারে সাহস বা বল নাই। মাঝে মাঝে মৃত্যু ও পরলোকের চিন্তা বৃদ্ধকে অতি নিদারুণ বিভীষিকা দেখাইতেছে। হরিমোহন দেখিল; মরণ চিন্তার পশ্চাৎ হইতে বিকট যমদূত কেবলই উঁকি মারিতেছে ও কপাটে ঠক ঠক করিতেছে। যত বার এই রূপ শব্দ হয় বৃদ্ধের অন্তরাত্মা ভয়ে উন্মত্ত হইয়া চীৎকার করিয়া উঠে। এই ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখিয়া হরিমোহন আতঙ্কে বালকের দিকে চাহিয়া বলিল, "এ কি রে কেষ্টা। আমি ভাবিতাম বৃদ্ধ পরম সুখী।" বালক

বলিল, "ইহাই আমার প্রতাপ। বলদেখি কাহার প্রতাপ বেশী ; ও পাড়ার তিনকড়ি শীলের না বৈকুণ্ঠবাসী শ্রীকৃষ্ণের ? দেখ, হরিমোহন, আমারও পুলিশ আছে, পাহারা আছে, গভর্ণমেণ্ট আছে, আইন আছে, বিচার আছে, আমিও রাজা সাজিয়া খেলা করিতে পারি, এই খেলা কি তোমার ভাল লাগে।" হরিমোহন বলিল; "না বাবা। এ ত বড় বদ খেলা। তোর বুঝি ভাল লাগে ?" বালক হাসিয়া বলিল, "আমার সব খেলা ভাল লাগে। চাবকাইতেও ভালবাসি, চাবুক খাইতেও ভাল বাসি !" তাহার পর বলিল, "দেখ হরিমোহন তোমরা কেবল বাহিরটা দেখ, ভিতরটা দেখিবার সূক্ষ্মদৃষ্টি এখনও বিকাশ কর নাই। সেই জন্যই বল, তুমি দুঃখী, আর তিনকড়ি সুখী। এই লোকটির কোনই পার্থিব অভাব নাই—অথচ তোমার অপেক্ষা এই লক্ষপতি কত অধিক দুঃখ যন্ত্রনা ভোগ করিতেছে। কেন, বলিতে পার ? মনের অবস্থায় সুখ, মনের অবস্থায় দুঃখ। সুখ দুঃখ মনের বিকার মাত্র। যাহার কিছু নাই বিপদই যাহার সম্পত্তি, ইচ্ছা করিলে সে বিপদের মধ্যেও পরম সুখী হইতে পারে। আবার দেখ তুমি যেমন নীরস পুণ্যে দিন কাটাইয়া সুখ পাইতেছ না কেবল দুঃখ চিন্তা করিতেছ ইনিও সেইরূপ নীরস পাপে দিন কাটাইয়া কেবলই দুঃখচিন্তা করেন। তাই পুণ্যের ক্ষণিক সুখ পাপের ক্ষণিক দুঃখ বা পুণ্যের ক্ষণিক দুঃখ পাপের ক্ষণিক সুখ। এই দ্বন্দ্বে আনন্দ নাই। আনন্দ আগারের ছবি আমার কাছে; আমার কাছে যে আসে, আমার প্রেমে পড়ে আমাকে বাধ্য

আমার উপর জোর করে; অত্যাচার করে; সে আমার আনন্দের ছবি আদায় করে।" হরিমোহন আগ্রহ পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের কথা শুনিতে লাগিল। বালক আবার বলিল; "আর দেখ হরিমোহন শুষ্ক পুণ্য তোমার নিকট নীরস হইয়া পড়িয়াছে অথচ সংস্কারের প্রভাব তুমি ছাড়িতে পার না; সেই তুচ্ছ অহঙ্কার জয় করিতে পার না। বৃদ্ধের নিকট পাপ নীরস হইয়া পড়িয়াছে অথচ সংস্কারের প্রভাবে তিনিও তাহা ছাড়িতে না পারিয়া— ইহজীবনে নরক যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন। ইহাকে পুণ্যের বন্ধন পাপের বন্ধন বলে। অজ্ঞানজাত সংস্কার সেই বন্ধনের রজ্জু। কিন্তু বৃদ্ধের এই নরক যন্ত্রণা বড় শুভ অবস্থা ; তাহাতে তাঁহার পরিত্রাণ ও মঙ্গল হইবে।

হরিমোহন এতক্ষণ নীরবে কথা শুনিতেছিল, এখন বলিল, "কেষ্টা, তোর কথা বড় মিঠে, কিন্তু আমার প্রত্যয় হইতেছে না। সুখদুঃখ মনের বিকার হইতে পারে, কিন্তু বাহ্যিক অবস্থা তাহার কারণ। দেখ, ক্ষুধার জ্বালায় যখন মন ছটপট করে, কেহ কি পরম সুখী হইতে পারে ? অথবা যখন রোগে বা যন্ত্রণায় শরীর কাতর হয়, তখন কি কেহ তোর কথা ভাবিতে পারে ?" বালক বলিল, "এস, হরিমোহন, তাহাও তোমাকে দেখাইব। এই বলিয়া বালক আবার হরিমোহনের মাথায় হাত দিল, স্পর্শ অনুভব করিবামাত্র হরিমোহন দেখিল, আর তিনকড়ি শীলের বাড়ী নাই, নির্জ্জন সুরম্য পর্ব্বতের বায়ুসেবিত শিখরে একজন সন্ন্যাসী আসীন, ধ্যানে মগ্ন, চরণ প্রান্তে প্রকাণ্ড ব্যাঘ্র প্রহরীর ন্যায়

শায়িত। ব্যাঘ্র দেখিয়া হরিমোহনের চরণ-দ্বয় অগ্রসর হইতে নারাজ হইল, কিন্তু বালক তাহাকে টানিয়া সন্ন্যাসীর নিকট লইয়া গেল। বালকের সঙ্গে জোরে না পারিয়া হরিমোহন অগত্যা চলিল। বালক বলিল, "দেখ হরি-মোহন!" হরিমোহন চাহিয়া দেখিল, সন্ন্যাসীর মন তাহার চক্ষের সামনে খোলা-খাতার মত রহিয়াছে, তাহার পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় শ্রীকৃষ্ণ নাম সহস্রবার লেখা। সন্ন্যাসী নির্ব্বিকল্প সমাধির সিংহ দ্বার পার হইয়া সূর্য্যালোকে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে ক্রীড়া করিতে-ছেন। আবার দেখিল, সন্ন্যাসী অনেক দিন অনাহারে রহিয়াছে, গত দুই দিন শরীর ক্ষুৎপিপাসায় বিশেষ কষ্ট পাইয়াছে। হরি-মোহন বলিল, "এ কিরে, কেষ্টা? বাবাজী তোকে এত ভালবাসেন, অথচ ক্ষুৎপিপাসা ভোগ করিতেছেন। তোর কি কোনও জ্ঞান কাণ্ড নাই! এই নির্জ্জন ব্যাঘ্রসঙ্কুল অরণ্যে কে তাঁহাকে আহার দিবে!" বালক বলিল, "আমি দিব। কিন্তু আর এক মজা দেখ।" হরিমোহন দেখিল, ব্যাঘ্র উঠিয়া তাহার থাবার এক প্রহারে নিকটবর্ত্তী বল্মীক ভাঙ্গিয়া দিল। ক্ষুদ্র শত শত পিপীলিকা বাহির হইয়া ক্রোধে সন্ন্যাসীর গায়ে উঠিয়া দংশন করিতে লাগিল। সন্ন্যাসী ধ্যানমগ্ন, নিশ্চল, অটল। তখন বালক সন্ন্যাসীর কর্ণকুহরে অতি মধুর স্বরে একবার ডাকিল "সখে!" সন্ন্যাসী চক্ষু উন্মীলন করিলেন। প্রথমে মোহ-জালাময় দংশন অনুভব করেন না, তখনও কর্ণকুহরে সেই বিশ্ববাঞ্ছিত চিত্তহারী বংশীরব বাজিতেছে—যেমন বৃন্দাবনে রাধার কাণে বাজিয়াছিল। তাহার পরে শত শত দংশনে বুদ্ধি শরীরের দিকে আকৃষ্ট হইল। সন্ন্যাসী নড়িলেন না—সবিস্ময়ে মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "এ কি? আমার এমন ত কখন হয় নাই। যাক্, শ্রীকৃষ্ণ আমার সঙ্গে ক্রীড়া করিতেছেন, ক্ষুদ্র পিপীলিকাচয় রূপে আমাকে দংশন করিতেছেন।" হরিমোহন দেখিল; দংশনের জ্বালা বুদ্ধিতে আর পৌঁছে না, প্রত্যেক দংশনে তিনি তীব্র শারীরিক আনন্দ অনুভব করিয়া কৃষ্ণ নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক অধীর আনন্দে হাততালি দিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। পিপীলিকাগুলি মাটীতে পড়িয়া পালাইয়া গেল। হরিমোহন সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল; "কেষ্টা, একি মায়া!" বালক হাততালি দিয়া দুইবার একপায়ের উপর ঘুরিয়া উচ্চ-হাস্য করিল। "আমিই জগতের একমাত্র যাদুকর। এই মায়া বুঝিতে পারিবে না, এই আমার পরম রহস্য। দেখিলে? যন্ত্রণায় মধ্যেও আমাকে ভাবিতে পারিলেন ত! আবার দেখ।" সন্নাসী প্রকৃতিস্থ হইয়া আবার বসিলেন; শরীর ক্ষুৎপিপাসা ভোগ করিতে লাগিল, কিন্তু হরিমোহন দেখিল সন্ন্যাসীর বুদ্ধি সেই শারীরিক বিকার অনুভব করিতেছে মাত্র, কিন্তু তাহাতে বিকৃত বা লিপ্ত হইতেছে না। এই সময়ে পাহাড় হইতে কে মধুর বংশী-বিনিন্দিত স্বরে ডাকিল, "সখে!" হরি-মোহন চমকিল। এ যে শ্যামসুন্দরেরই মধুর বংশীবিনিন্দিত স্বর। তাহার পরে দেখিল, শিলাচয়ের পশ্চাৎ হইতে একটী সুন্দর কৃষ্ণবর্ণ বালক থালায় উত্তম আহার ও ফল লইয়া আসিতেছে। হরিমোহন হতবুদ্ধি হইয়া শ্রীকৃষ্ণের দিকে চাহিল। বালক তাহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছে, অথচ যে বালক

আসিতেছে, সেও অবিকল শ্রীকৃষ্ণ। অপর বালক আসিয়া সন্ন্যাসীকে থালা দেখাইয়া বলিল, "দেখ্, কি এনেছি।" সন্ন্যাসী হাসিয়া বলিলেন,"এলি? এতদিন না খাওয়াইয়া রাখিলি যে? যাক্, এলি ত বস্, আমার সঙ্গে খা।" সন্ন্যাসী ও বালক সেই থালার খাদ্য খাইতে বসিল, পরস্পরকে খাওয়াইতে লাগিল, কাড়াকাড়ি করিতে লাগিল। আহার শেষ হইলে বালক থালা লইয়া অন্ধকারে মিশিয়া গেল।

হরিমোহন কি জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছিল, হঠাৎ দেখিল শ্রীকৃষ্ণ আর নাই, সন্ন্যাসীও নাই, ব্যাঘ্রও নাই, পর্ব্বতও নাই। সে একটী ভদ্রপল্লীতে বাস করিতেছে, বিস্তর ধনদৌলত আছে, স্ত্রীপরিবার আছে, রোজ ব্রাহ্মণকে দান করিতেছে, ভিক্ষুককে দান করিতেছে, ত্রিসন্ধ্যা করিতেছে, শাস্ত্রোক্ত আচার সযত্নে রক্ষা করিয়া রঘুনন্দন প্রদর্শিত পথে চলিতেছে, আদর্শ পিতা, আদর্শ স্বামী, আদর্শ পুত্র হইয়া জীবনযাপন করিতেছে। কিন্তু পরমুহূর্ত্তে ভীত হইয়া দেখিল যে যাহারা সে ভদ্রপল্লীতে বাস করে, তাহাদের মধ্যে লেশমাত্র সদ্ভাব বা আনন্দ নাই, যন্ত্রবৎ বাহিরের আচার রক্ষাকেই তাহারা পুণ্য জ্ঞান করিতেছে। প্রথমটা হরিমোহনের যেমন আনন্দ হইয়াছিল, এখন তেমনি যন্ত্রণা হইতে লাগিল। তাহার বোধ হইল যেন তাহার বিষম তৃষ্ণা লাগিয়াছে, কিন্তু জল পাইতেছে না, ধূলি খাইতেছে, কেবলই ধূলি কেবলি ধূলি অনন্ত ধূলি খাইতেছে। সেই স্থান হইতে পলায়ন করিয়া সে আর এক পল্লীতে গেল, সেইখানে একটী প্রকাণ্ড অট্টালিকার সম্মুখে অপূর্ব্ব জনতা ও আশীর্ব্বাদের রোল উঠিতেছিল। হরিমোহন অগ্রসর হইয়া দেখিল, তিনকড়ি শীল দালানে বসিয়া সেই জনতার মধ্যে অশেষ ধন বিতরণ করিতেছেন, কেহই নিরাশ হইয়া ফিরিতেছে না। হরিমোহন উচ্চহাস্য করিল, সে ভাবিল, "এ কি স্বপ্ন! তিনকড়ি শীল আবার দাতা!" তাহার পরে সে তিনকড়ির মন দেখিল। বুঝিল, সেই মনে লোভ, ঈর্ষা, কাম, স্বার্থ ইত্যাদি সহস্র অতৃপ্তি ও কুপ্রবৃত্তি দেহি দেহি রব করিতেছে। তিনকড়ি পুণ্যের খাতিরে, যশের খাতিরে, গর্ব্বের বশে সেই ভাবগুলি ছাপাইয়া রাখিয়াছেন, অতৃপ্ত রাখিয়াছেন, চিত্ত হইতে তাড়াইয়া দেন নাই। এই সময় আবার কে হরিমোহনকে ধরিয়া তাড়াতাড়ি পরলোক ভ্রমণ করাইয়া আনিল। হরিমোহন হিন্দুর নরক, খৃষ্টানের নরক, মুসলমানের নরক, গ্রীকদের নরক, হিন্দুর স্বর্গ, খৃষ্টানের স্বর্গ, মুসলমানের স্বর্গ, গ্রীকদের স্বর্গ, আর কত নরক, কত স্বর্গ দেখিয়া আসিল। তাহার পরে দেখিল, সে নিজ বাড়ীতে পরিচিত ছেঁড়া মাদুরে ময়লা তোসকে ভর দিয়া বসিয়া আছে, সম্মুখে শ্যামসুন্দর। বালক বলিল, "বড় রাত্রি হইয়াছে, বাড়ীতে না ফিরিলে সকলে আমাকে বকিবে, মারামারি আরম্ভ করিবে। সংক্ষেপে বলি। যে স্বর্গ নরক দেখিলে, সে স্বপ্নজগতের, কল্পনাস্পৃষ্ট। মানুষ মরিলে স্বর্গনরকে যায়, গতজন্মের ভাব অন্যত্র ভোগ করে। তুমি পূর্ব্ব জন্মে পুণ্যবান ছিলে, কিন্তু প্রেম তোমার হৃদয়ে স্থান পাই নাই, না তুমি ঈশ্বরকে ভাল

বাসিয়াছ না মানুষকে। প্রাণত্যাগের পরে স্বপ্নজগতে সেই ভদ্রপল্লীতে বাস করিয়া পূর্ব্ব জীবনের ভাব ভোগ করিতে লাগিলে, ভোগ করিতে করিতে সে ভাব আর ভাল লাগে না, প্রাণ আকুল হইতে লাগিল, সেখান হইতে গিয়া ধূলিময় নরকে বাস করিলে, শেষে জীবনের পুণ্যফল ভোগ করিয়া আবার তোমার জন্ম হইল। সেই জীবনে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৈমিত্তিক দান ভিন্ন, নীরস বাহ্যিক ব্যবহার ভিন্ন কাহারও অভাব দূর করিবার জন্য কিছু কর নাই বলিয়া এই জন্মে তোমার এত অভাব। আর এখনও যে নীরস পুণ্য করিতেছ, তাহার কারণ এই যে, কেবল স্বপ্নজগতের ভোগে পাপপুণ্য সম্পূর্ণ ক্ষয় হয় না, পৃথিবীতে কর্ম্মফল ভোগে ক্ষয় হয়। তিনকড়ি গতজন্মে দাতাকর্ণ ছিলেন, সহস্র ব্যক্তির আশীর্ব্বাদে এই জন্মে লক্ষপতি ও অভাবশূন্য হইয়াছেন, কিন্তু চিত্ত-শুদ্ধি হয় নাই বলিয়া অতৃপ্ত কুপ্রবৃত্তি এখন পাপ দ্বারা তৃপ্ত করিতে হইয়াছে। কর্ম্মবাদ বুঝিলে কি? পুরস্কার বা শাস্তি নহে—কিন্তু অমঙ্গলের দ্বারা অমঙ্গল সৃষ্টি, এবং মঙ্গল দ্বারা মঙ্গল সৃষ্টি। ইহা প্রাকৃতিক নিয়ম। পাপ অশুভ, তাহা দ্বারা দুঃখ সৃষ্ট হয়; পুণ্য শুভ, তাহা দ্বারা সুখ সৃষ্ট হয়। এই ব্যবস্থা চিত্তশুদ্ধির জন্য, অশুভ বিনাশের জন্য। দেখ হরিমোহন, পৃথিবী আমার বৈচিত্র্যময় জগতের অতি ক্ষুদ্র অংশ কিন্তু সেখানে কর্ম্মদ্বারা অশুভ বিনাশ করিবার জন্য তোমরা জন্মগ্রহণ কর। যখন পাপ-পুণ্যের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া প্রেম-রাজ্যে পদার্পণ কর, তখন এই কার্য্য হইতে অব্যাহতি পাও। পরজন্মে তুমিও অব্যাহতি পাইবে। আমি আমার প্রিয় ভগিনী শক্তি ও তাহার সহচরী বিদ্যাকে তোমার কাছে পাঠাইব, কিন্তু দেখ, এক সর্ত্ত আছে, তুমি আমার খেলার সাথী হইবে, মুক্তি চাহিতে পারিবে না। রাজি?" হরিমোহন বলিল, "কেষ্টা, তুই আমাকে গুণ করিলি। তোকে কোলে লইয়া আদর করিতে বড় ইচ্ছা করে, যেন এই জীবনে আর কোন বাসনা নাই।"

বালক হাসিয়া বলিল, "হরিমোহন, কিছু বুঝিলে?" হরিমোহন বলিল "বুঝিলাম বই কি।" তাহার পরে একটু ভাবিয়া বলিল, "ওরে কেষ্টা, আবার ফাঁকি দিলি। অশুভ সৃজন করিলি কেন, তাহার ত কোনও কৈফিয়ত দিস্ নি।" এই বলিয়া সে বালকের হাত ধরিল। বালক হাত কাড়িয়া লইয়া হরিমোহনকে শাসাইয়া বলিল, "দূর হ! এক ঘণ্টার মধ্যে আমার সব গুপ্তকথা বাহির করিয়া লইবি?" বালক হঠাৎ প্রদীপ নিবাইয়া সরিয়া সহাস্যে বলিল, "কই, হরিমোহন, চাবুক মারিতে একেবারে ভুলিয়া গেলে যে! সেই ভয়ে তোমার কোলে বসিলাম না, কখন বাহ্যিক দুঃখে চটিয়া আমাকে উত্তম শিক্ষা দিবে! তোমার উপর আমার লেশমাত্র বিশ্বাস নাই।" হরিমোহন অন্ধকারে হাত বাড়াইল, কিন্তু বালক আরও সরিয়া বলিল, "না, সে সুখ তোমার পর-জন্মের জন্য রাখিলাম। আসি।" এই বলিয়া অন্ধকার রজনীতে বালক কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল। হরিমোহন নূপুরধ্বনি শুনিতে শুনিতে জাগিয়া উঠিল। জাগিয়া ভাবিল, "এ কি রকম স্বপ্ন দেখিলাম! নরক দেখিলাম, স্বর্গ দেখিলাম,

তাহার মধ্যে ভগবানকে তুই বলিলাম, ছোট ছেলে বুঝিয়া কত ধমক দিলাম। কি পাপ! যা হোক,প্রাণে বেশ শান্তি অনুভব করিতেছি।” হরিমোহন তখন কৃষ্ণবর্ণ বালকের মোহনমূর্ত্তি ভাবিতে বসিল এবং মাঝে মাঝে বলিতে লাগিল, “কি সুন্দর! কি সুন্দর!”

শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ।

বৃহত্তম দূরবীক্ষণ যন্ত্র।

চন্দ্র আমাদের নিকট হইতে দুইলক্ষ চল্লিশ হাজার মাইল দূরে আছে। এমন একটি দূরবীক্ষণ যন্ত্র, যাহার সাহায্যে চন্দ্রকে পৃথিবী হইতে মাত্র ৩৫ মাইল দূরে দেখিতে পাওয়া যায়, আজ আমরা তাহারই কথা বলিব। ইহা এত দীর্ঘ যে ইহার এধার হইতে ওধারে ঢিল ছুড়াও কষ্টকর; এত ভারি ও প্রকাণ্ড যে ইহাকে লইয়া যাইতে হইলে একখানি রেলের মালগাড়ীর ট্রেন্ আবশ্যক। মূল্যও কম লম্বা চওড়া নহে; অনেক ক্রোড়পতিকেও এইরূপ একটি যন্ত্র নির্ম্মাণের আদেশ দিবার পূর্ব্বে ইতস্ততঃ করিতে হইবে। এই যন্ত্রটি “প্যারিসের টেলিস্কোপ” নামে প্রসিদ্ধ। ইহা ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিস্ নগরে ১৯০০ খৃঃ অব্দে যে প্রদর্শনী বসিয়াছিল তাহাতেই প্রদর্শন করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল। পৃথিবীতে এইটিই বৃহত্তম দূরবীক্ষণ যন্ত্র।

এম্, ডিলোঙ্‌ক্লের (M. Deloncle) উপদেশমত প্যারিসের জ্যোতিষিগণ দ্বারা এই যন্ত্রটি প্রস্তুত হইয়াছিল। ইহার পূর্ব্বে ইয়ার্কেসের (yerkes) দূরবীক্ষণটিই বৃহত্তম ছিল। ইয়ার্কেসের যন্ত্রটির যে কাচফলকখানি (lens) দ্রষ্টব্য বস্তুর দিকে থাকে তাহার ব্যাস ৪০ ইঞ্চ; প্যারিসের দূরবীক্ষণটির সেই কাচফলকখানির ব্যাস ৪৯ ইঞ্চ। এই কাচফলকখানির উপরেই দূরবীক্ষণের গুণাগুণ অধিক পরিমাণে নির্ভর করে। ইহা যত বড় হইবে দূরবীক্ষণও তত ভাল হইবে।

যে বস্তুটি দূরবীক্ষণের সাহায্যে দেখা হয় তাহা হইতে আলোক আসিয়া সম্মুখের কাচ ফলক খানিতে পড়ে। সেই আলোক যন্ত্রের চোঙের ভিতর দিয়া আসিয়া দর্শকের চোখে পড়ে; দর্শক তখন কাচফলকের গুণে বস্তুটির ছবি বর্দ্ধিত আকারে দেখিতে পায়। বস্তুটি হইতে বেশি পরিমাণে আলোক না আসিলে ছবি বড় হইয়া কোনো লাভ নাই, কারণ ছবি যতই বড় হইবে আলোক ততই ছড়াইয়া পড়িবে এবং ছবি অস্পষ্ট হইয়া যাইবে। দূরবীক্ষণের সম্মুখের কাচফলকখানি বেশ বড় হইলে দ্রষ্টব্য বস্তু হইতে অনেকখানি আলোক আসিয়া যন্ত্রের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে এবং ছবি বড় হইয়াও অস্পষ্ট হয় না।

কোনো বস্তু হইতে আলোক আসিয়া আমাদের চোখে পড়িলে তবে আমরা তাহা দেখিতে পাই। কিন্তু আমাদের চোখের তারার মধ্যস্থিত যে অংশটিতে (যাহার নাম চোখের মণি) আলোক পতিত হইয়া ভিতরে প্রবেশ করে তাহা অতি ক্ষুদ্র। দূরবীক্ষণের সাহায্যে অনেকখানি আলোক সেই ক্ষুদ্র পথে আনিতে পারা যায়। কোনো

বস্তুকে দূরবীক্ষণের সাহায্যে বর্দ্ধিত আকারে দেখিতে হইলে আকারে যতগুণ বর্দ্ধিত করিতে হইবে, শুধু চোখে সেই বস্তুটি হইতে যতটুকু আলোক আসিয়া পড়ে যন্ত্রে তাহার ততগুণ আলোক পড়া চাই। তাহা না হইলেই ছবি অস্পষ্ট হইয়া যাইবে। আমাদের চোখের মণিটির ব্যাস যদি এক ইঞ্চের দশভাগের এক ভাগ হয় এবং দূরবীক্ষণের সাহায্যে যদি কোনো বস্তুর আকার ১০০ গুণ বাড়াইয়া দেখিতে হয় তাহা হইলে যন্ত্রের সম্মুখের কাচ-ফলকখানির ব্যাস চোখের মণির ব্যাসের ১০০ গুণ হওয়া চাই। যদি তাহা ১০ ইঞ্চ না হইয়া ৫ ইঞ্চ মাত্র হয় তাহা হইলে দূরবীক্ষণে যে ছবি পাওয়া যাইবে তাহা স্পষ্ট হইবে না। ডিলোঙ্ক্ল একটি প্রকাণ্ড দূরবীক্ষণ প্রস্তুত করিতে চাহিয়াছিলেন, কাজেই তাঁহাকে ৪৯ ইঞ্চ ব্যাস বিশিষ্ট একখানি কাচফলক সংগ্রহ করিতে হইয়াছিল।

নিখুঁৎ ছোট একখানি কাচফলক পাওয়াই ঘটিয়া উঠে না, এত বড় একখানি ফলক কোথায় পাওয়া যাইবে? দূরবীক্ষণের জন্য ১৮০ ফুট দীর্ঘ চোঙই বা কে প্রস্তুত করিবে? প্রথমে ডিলোঙক্লের প্রস্তাবটি তো সকলে হাসিয়াই উড়াইয়া দিয়াছিল। কিন্তু ডিলোঙক্ল তাহাতে দমিবার লোক ছিলেন না। তিনি কাজ আরম্ভ করিয়া দিলেন। গটিয়ে সাহেব (Gautiea) যন্ত্রটির অন্যান্য অংশ প্রস্তুত করিবার ভার গ্রহণ করিলেন এবং বিখ্যাত কাচ-ফলক নির্ম্মাণকারক মঁাতোয়া (mantois) ফলক প্রস্তুত করিবার ভার লইলেন।

কিন্তু এ যে এক অসাধারণ দূরবীক্ষণ যন্ত্র! একটি প্রকাণ্ড দর্পণ না হইলে ইহা সম্পূর্ণ হইতে পারে না। সাধারণ দূরবীক্ষণ-গুলি যেদিকে ইচ্ছা ঘুরাইয়া যে কোনো বস্তুর প্রতি নির্দ্দেশ করা যায়; ডিলোঙক্লের দূর-বীক্ষণটি এত বড় হইবে যে তাহাকে ঘুরাইবার ফিরাইবার বন্দোবস্ত হওয়া একপ্রকার অসম্ভব বোধ হইল। অনেক চিন্তার পর স্থির হইল যে যন্ত্রটিকে স্থায়িভাবে রাখা হইবে এবং যে বস্তুকে দেখিতে হইবে একখানি প্রকাণ্ড দর্পণের সাহায্যে তাহার ছায়া ঘুরাইয়া আনিয়া যন্ত্রটির সম্মুখের কাচফলকে ফেলা হইবে। ফুঁকো (Foucault) এ বিষয়ে পথ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহার পথই অনুসৃত হইল। কিন্তু এত বড় একখানি দর্পণ কোথায় পাওয়া যাইবে? দর্পণ খানির ব্যাস অন্ততঃ সাড়ে ছয় ফুট্ হওয়া আবশ্যক। ইহাতেও কাজ আটকাইল না। ডেস্‌প্রে (Despret) দর্পণ প্রস্তুত করিবার ভার লইলেন।

প্রকাণ্ড ব্যাপার! যতদূর সম্ভব সাবধান-তার সহিত দূরবীক্ষণটি প্রস্তুত করা হইয়াছিল। দর্পণখানি এরূপে সাজানো হইয়াছিল যে তাহা এক ইঞ্চের ২৫ হাজার ভাগের এক ভাগও এদিক ওদিক হইবার জো ছিল না। ১৮০ ফুট্ দীর্ঘ দূরবীক্ষণ যন্ত্র ওজনে প্রায় ৬০০ মণ; সাতটি মোটা মোটা লোহার নিরেট থামের উপর তাহা সাজানো হইয়াছিল। এ ছাড়া দর্পণখানি আছে। যাহাতে দর্পণখানিকে সহজে ঘুরানো যায় তাহার জন্য ২৭ ফিট উচ্চ ফ্রেম সমেত দর্পণখানিকে পারদ পরিপূর্ণ একটি প্রকাণ্ড পাত্রের উপর ভাসাইয়া রাখা হইয়াছিল। ফ্রেম সমেত দর্পণখানি ওজনে প্রায় ৩৬৪ মণ। পারদের উপর ভাসানো ছিল বলিয়া ইহাকে

সহজেই এদিক ওদিক ঘুরানো ফিরানো যাইত।

আজকাল এঞ্জিনিয়ারিং বিস্তার যেরূপ উন্নতি হইয়াছে তাহাতে দর্পণখানি ও কাচ-ফলক ভিন্ন দূরবীক্ষণটির অপর অপর অংশ নির্ম্মাণ করা তত কঠিন বোধ হয় নাই। দর্পণ ও কাচফলক প্রস্তুত করিতেই যথেষ্ট কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। কাচফলক প্রস্তুত করা বড় সহজ কাজ নহে। কাচের আর দাম কি? ফলক প্রস্তুত করিতে যে সাবধানতা, কৌশল, নৈপুণ্য ও পরিশ্রমের প্রয়োজন হয় তাহাতেই ফলকগুলির মূল্য এত অধিক হইয়া থাকে। প্রথমে কাচ গলাইয়া ছাঁচে ঢালিতে হয়, তারপর ঘষিয়া মাজিয়া তাহার উপরিতল সমান ও মসৃণ করিয়া লইতে হয়। কাচের মধ্যে একটিমাত্র বায়ুর বুদ্বুদ থাকিলে কিম্বা ফলকের উপরিতল সামান্য একটু অসমান হইলেই তাহার মূল্য শত শত গুণ কমিয়া যায়। একখানি ভাল কাচফলকের মূল্য লক্ষ টাকাও হইতে পারে।

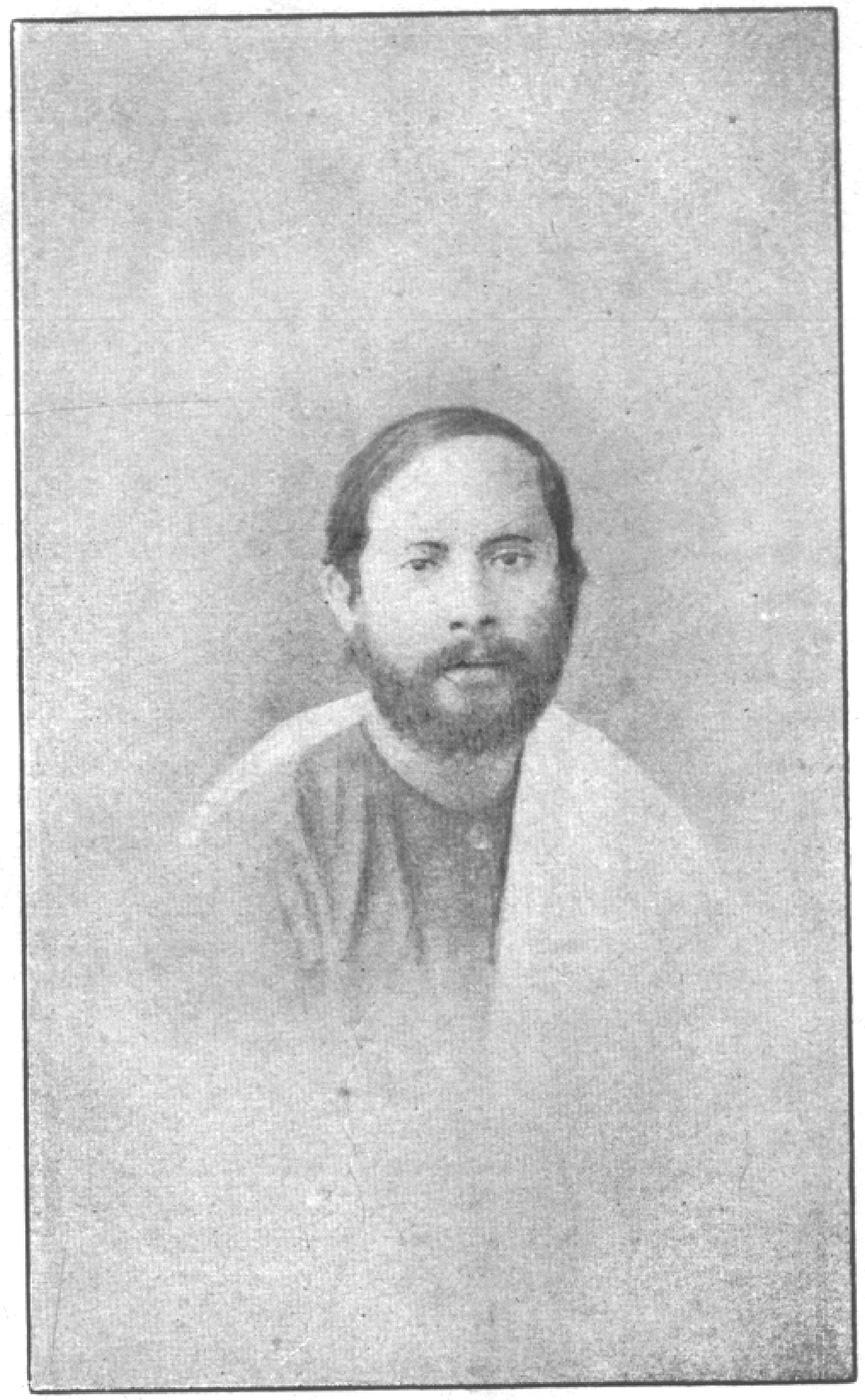
ম্যান্টোয়া একজন বড় কাচফলক ব্যবসায়ী ছিলেন। তিনিই দূরবীক্ষণটির সম্মুখের বড় ফলকখানি প্রস্তুত করিয়াছিলেন। বায়ু বুদ্বুদের হাত হইতে নিস্তার পাইবার জন্য কাচ বারবার গলানো হইত, তারপর তাহা ছাঁচে ঢালা হইত, ছাঁচটিকে অতি সাবধানতার সহিত ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা করা হইত। এক একটি ছাঁচ ঢালার একমাস পরে ভাঙা হইত, কিন্তু প্রায়ই দেখা যাইত যে ফলকের কোথাও না কোথাও একটা ফাট ধরিয়াছে। ঠাণ্ডা হওয়ার দোষেই ইহা হইত। কাচের বাহির দিকটা ভিতর দিক অপেক্ষা শীঘ্র ঠাণ্ডা হইয়া

এই ফাট উৎপন্ন করিত। যাহা হৌক, শেষে একটা ছাঁচ উৎরাইয়া গিয়াছিল।

ফলকের তো উপায় হইল। দর্পণখানি প্রস্তুত করা আরো কঠিন ব্যাপার। ডেস্‌প্রে এমন একটা চুল্লি প্রস্তুত করিলেন যে তাহাতে প্রায় ৪২০ মণ কাচ গালানো যায়। সাড়ে ছয় ফুট্ ব্যাসবিশিষ্ট এবং ১১ ইঞ্চি পুরু দর্পণ চাই। ২০টি ছাঁচে কাচ ঢালা হইয়াছিল, তন্মধ্যে ১৮টিই কোনো কাজে আসে নাই। দর্পণখানিতে প্রায় ১০৫ মণ কাচ লাগিয়াছিল।

ফলক ও দর্পণ ঢালা হইলেই তো হইল না! সেগুলিকে ঘষিয়া মাজিয়া ঠিক করিতে হইবে। এগুলির উপরিতল বেশ সমান ও মসৃণ হওয়া আবশ্যক; কোথাও এক চুল উঁচু নীচু থাকিলে চলিবে না। হাতে এ কাজ হওয়া একেবারেই সম্ভব নহে। গটিয়ে যন্ত্রের সাহায্যে এ কাজটি সম্পাদন করিলেন। নানাপ্রকার সাবধানতা অবলম্বন করিয়া এক বৎসর ধরিয়া অক্লান্ত পরিশ্রমের পর দর্পণফলক প্রস্তুত হইল। প্রস্তুত হইলে দেখা গেল, দর্পণ ও ফলকের কাচে অসমানতা এক প্রকার নাই; যেখানে আছে, তাহা এক ইঞ্চের ২ লক্ষ ২৫ হাজার ভাগের এক ভাগের বেশি নহে।

দূরবীক্ষণের আর আর সমস্ত অংশ প্যারিস্ নগরে কিন্তু দর্পণখানি জিউমণ্টে (Jeumont) প্রস্তুত হইয়াছিল। সেখান হইতে দর্পণখানি স্পেশাল্ ট্রেণের সাহায্যে, যেন কোনো রাজা বাদসাহ যাইতেছেন এইরূপ যত্নের সহিত প্যারিসে লইয়া আসা হইয়াছিল। ট্রেণখানি রাত্রে চলিয়াছিল এবং কোথাও



কবি শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী



ইঁহার পত্নী শুভবিবাহ রচয়িত্রী শ্রীমতী শরৎকুমারী চৌধুরাণী

থামে নাই। ট্রেনের বেগে কোনো পার্থক্য জন্মিতে দেওয়া হয় নাই, পাছে দর্পণখানির কাচে কোনো নড়চড় ঘটে। তার পর অতি সাবধানতার সহিত সেখানিকে ষ্টেশন্ হইতে প্রদর্শনীতে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল।

প্রকাণ্ড কাচফলকখানিও বড় কম সমাদর পায় নাই। তাহাকেও দর্পণখানির মত অতি যত্নে প্রদর্শনীতে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল।

প্রদর্শনীতে দূরবীক্ষণটি যেরূপে প্রদর্শিত হইয়াছিল তাহাও বর্ণনাযোগ্য। একটি অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি মঞ্চ প্রস্তুত করিয়া তাহারই সম্মুখে যন্ত্রটিকে রাখা হইয়াছিল। মঞ্চে দর্শকেরা বসিত, আর দূরবীক্ষণটির সাহায্যে আকাশের চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ প্রভৃতির ছবি একখানি ত্রিশ ফুট উচ্চ পর্দ্দার উপর ফেলা হইত; দর্শকেরা তাহাই দেখিত। যন্ত্রটির ভিতরে চন্দ্র সূর্য্যাদির যে ছবি দেখা যাইত তাহার ব্যাস ২১ হইতে ২২ ইঞ্চ এবং তাহা ৩০ গুণ বর্দ্ধিত হইয়া পর্দ্দার উপর পড়িত।

দূরবীক্ষণে ছবি সুস্পষ্ট দেখিবার জন্য চোখ লাগাইবার স্থানটি এদিক ওদিক সরাইয়া যন্ত্রের চোঙ্টিকে ছোট বড় করিয়া লইতে হয়। ইহাকে "ফোকাস্" করা বলে। এই অতি প্রকাণ্ড যন্ত্রটিতে "ফোকাস্" করিবার ব্যবস্থা এক অভিনব উপায়ে করা হইয়াছিল। দূরবীক্ষণটির যে দিকে চোখ লাগাইতে হয় সেই দিকের খানিকটা চোঙের তলদেশে চাকা লাগাইয়া তাহা রেলের উপর এরূপে রাখিয়া দেওয়া হইয়াছিল যে একটুকু ঠেলিয়া দিলেই চোঙের সেই অংশটিকে ইচ্ছামত এদিক ওদিক সরাইয়া "ফোকাস্" করা যাইতে পারে।

ডিলোঙ্ক্ল্ যখন সর্ব্বপ্রথমে দূরবীক্ষণটিতে চোখ লাগাইলেন তখন তাঁহার যে কি আনন্দ হইয়াছিল তাহা বর্ণনা করা যায় না। এই দূরবীক্ষণ যন্ত্রটি নির্ম্মাণ করিবার প্রস্তাব করিয়া তাঁহাকে অনেকের নিকট হইতেই বিদ্রূপ সহ্য করিতে হইয়াছিল; কিন্তু অধ্যবসায় বলে পূর্ণমনোরথ হইয়া সে বৎসর জগদ্বিখ্যাত প্যারিসের প্রদর্শনীতে সহস্র সহস্র প্রদর্শকের মধ্যে তিনিই সকলের শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিতে পারিয়াছিলেন। প্রদর্শনী তো ক্ষুদ্র স্থান, সমগ্র পৃথিবী তাঁহার শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করিতে বাধ্য—তাঁহার দূরবীক্ষণটি এমনি অতুলনীয়।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

শুভ-বিবাহ-রচয়িত্রী।

বাঙলার সাহিত্যানুরাগীর নিকট শ্রীমতী শরৎ-কুমারীর নাম সুপরিচিত। তাঁহার 'শুভবিবাহ' উপন্যাস পাঠ করিয়া যাঁহারা মুগ্ধ না হইয়াছেন, তাঁহাদিগের সাহিত্যরসগ্রাহিতা সম্বন্ধে আমাদিগের বিলক্ষণ সংশয় আছে।

শুভ-বিবাহ রচয়িত্রীর পিত্রালয় কলিকাতা চোর-বাগানে। ইনি জন্মগ্রহণের কয়েক মাস পরে ইঁহার পিতা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নিকট সুদূর পঞ্জাবে চলিয়া যান এবং এক বৎসরের মধ্যে ভ্রাতৃজায়া ও স্ত্রী কন্যা প্রভৃতিকে লইয়া গিয়া সেখানেই স্থায়ী হন। শ্রীযুক্ত শশীভূষণ

বসু ৺প্যারীচরণ সরকারের ছাত্র। ৺প্যারীচরণের আদর্শে বাল্যকাল হইতেই স্ত্রীশিক্ষার উপর তাঁহার বিশেষ অনুরাগ জন্মিয়াছিল তাই পিতার যত্নে ও আগ্রহে তিন বৎসর বয়স পূর্ণ হইতে না হইতে শরৎ-কুমারীর বিদ্যারম্ভ হয়।

বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত "প্রবাসের পাঠশালাটি" শরৎকুমারীর বাল্যের স্মৃতিচিত্র। এই স্কুলে অনুমান এক বৎসরকাল পাঠের পর শরৎকুমারী একটি ইংরাজি বালিকা বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হন। এখানে তখন ইংরাজ এবং দেশীয় খ্রীষ্টান বালিকা ব্যতীত অন্য কোন জাতীয় বালিকা লওয়া হইত না। শশীবাবু অনেক যত্ন ও চেষ্টা করিয়া শরৎকুমারীকে সেখানে ইংরাজি শিক্ষার জন্য পাঠাইলেন। কিন্তু সে স্কুলে তাঁহাকে বড় বেশি দিন যাইতে হয় নাই। এক বৎসরের মধ্যেই তিনি পীড়িত হইয়া পড়ায় সে স্কুলে যাওয়া বন্ধ হয়।

নয়বৎসর বয়সে আন্দুলের সুবিখ্যাত চৌধুরীবংশে ৺অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী এম্, এ, বি, এল্, ও আটর্ণির সহিত শরৎকুমারীর বিবাহ হয়। বিবাহের এক বৎসর পূর্ব্বেই তাঁহাকে বাঙ্গলা বিদ্যালয় হইতে ছাড়াইয়া লওয়া হইয়াছিল। অক্ষয়চন্দ্র শরৎকুমারীর বুদ্ধি ও স্মরণ শক্তি দেখিয়া বাড়ীতে লেখা পড়ার ব্যবস্থা করেন। একজন মিসনরি মেম আসিয়া পড়াইয়া যাইতেন।

শরৎকুমারীর স্বামী স্বর্গীয় অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী এটর্ণি হইবার পূর্ব্ব হইতেই বঙ্গসাহিত্যে সুকবি বলিয়া পরিচিত ছিলেন। অক্ষয়চন্দ্র, বিহারীলাল, হেমচন্দ্র প্রভৃতি কবিগণের সমসাময়িক। পুরাতন ভারতীতে অক্ষয়চন্দ্রের যে সকল কবিতা প্রকাশিত হইত জনসমাজে তাহা বিশেষ সমাদর লাভ করিত। ব্রাহ্ম না হইয়াও অক্ষয়চন্দ্রের স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতা সম্বন্ধে যথেষ্ট উদারতা ছিল। তাঁহার বন্ধুবান্ধবের নিকট তিনি পত্নীকে পরিচিত করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। পাশ্চাত্য কবি ব্রাউনিং দম্পতির অনুরূপ অক্ষয়চন্দ্র ও শরৎকুমারীর সাহিত্যসেবা বঙ্গসাহিত্যের একটি

হয়। ইঁহারা সাহিত্যসেবায় পরস্পরের অকৃত্রিম বন্ধু ও সমালোচক ছিলেন। এহিসাবে শরৎকুমারী আদর্শ সহধর্ম্মিণী ও আধুনিক বঙ্গনারীর সমধিক শ্রদ্ধার পাত্রী।

'ভারতী'সম্পাদিকা শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীর সহিত শরৎকুমারীর প্রীতিসৌহার্দ্দ্য আজীবন সমভাবেই আছে। সাহিত্য-সেবায় এরূপ অকৃত্রিম সখ্য নিতান্তই আনন্দের বিষয়, সন্দেহ নাই।

শরৎকুমারীর প্রথম রচনা "কলিকাতায় স্ত্রীসমাজ" বহুকাল পূর্ব্বে ভারতীতে প্রকাশিত হইয়া প্রশংসা লাভ করিয়াছিল। ইঁহাদিগের পতি-পত্নীর যে দুখানি ছবি এবারকার ভারতীতে প্রকাশিত হইল তাহা সেই সময়কার তোলা। তখন হইতে ভারতী সাধনা বঙ্গদর্শন প্রভৃতিতে তাঁহার রচনা মধ্যে মধ্যে প্রকাশিত হইয়া আসিতেছে।

সাহিত্য-সাধনায়, শরৎকুমারীর যশ যেমন সুপ্রতিষ্ঠিত, সংসারের কর্ত্তব্য সাধনেও তাঁহার তেমনি সুযশ। সুনিপুণ গৃহিণীপণা যাহা প্রাচ্যনারীর মজ্জাগত ভাব যে ভাব দূর হইলে সহস্রমুখা প্রতিভার বিকাশ সত্ত্বেও প্রাচ্যনারীর নারীত্বে আঘাত লাগে, সেই গৃহিণীপনায় শরৎকুমারীর বিন্দুমাত্রও ঔদাসিন্য নাই। সাহিত্য-সেবারতা, নিষ্ঠাবতী শরৎকুমারীর পতিভক্তি, ও সংসারপালনদক্ষতা প্রভৃতি প্রকৃতই অনুকরণীয়।

শরৎকুমারীর পুত্রসন্তান নাই—একটিমাত্র কন্যা। বর্ত্তমানবর্ষের 'ভারতী'র জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় প্রকাশিত 'দিদিমা' শীর্ষক চিত্রে আমরা শরৎকুমারীর জীবনী সম্বন্ধে দুই চারিটি মনোজ্ঞ ইঙ্গিতের সন্ধান পাইয়াছি। 'দিদিমা'র স্নেহ, ভক্তি প্রভৃতি শরৎকুমারীর হৃদয়ের ছায়ারেখাপাতে কেমন সুন্দর বিকাশলাভ করিয়াছে।

'শুভবিবাহ' উপন্যাসখানি আমাদিগের হিন্দু-সমাজের একখানি নিখুঁত ছবি। উৎসবালোকের বৈচিত্র্যে, সচ্ছল সংসারের আনন্দ কোলাহল মুখরতায়, পারিবারিক প্রীতিবদ্ধ আত্মীয় বান্ধবের কলহাস্যে, কন্যাদায়ের করুণ অশ্রুরেখায়, ও বিধবা নারীর মহিমার

অপূর্ব্ব সামগ্রী! ইহার সহজ, স্বাভাবিক সুরটি নিমেষেই মর্ম্ম স্পর্শ করে। স্নেহসমুজ্জ্বলা দিদি, বৌদি, পিশি, খুড়িমা, আদরের খোকাখুকি হৃদয়টাকে একেবারে অধিকার করিয়া বসে।

শরৎকুমারীর রচনায় যে আড়ম্বরহীনতা ও শুচিতার স্নিগ্ধধারা বহিয়া গিয়াছে তাহা প্রাচ্যের নিজস্ব, এবং তাহাই শরৎকুমারীর রচনাকে একটি বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য দান করিয়াছে।

'শুভবিবাহে' উপাখ্যান-ভাগ অল্প। তিনটি পরিবারের চিত্রের মধ্য দিয়া লেখিকার স্বাধীন সামাজিক মতটুকু সুন্দর ফুটিয়া উঠিয়াছে। প্রবাসিনী বিধবা ভুবনেশ্বরী দীর্ঘ পঁচিশ বৎসর পরে উপযুক্ত পুত্র ললিতকুমার ওরফে গণেশকে লইয়া কলিকাতায় তাঁহার দিদির বাড়ী আসিলেন,—পুত্রের বিবাহ দেওয়াই ইচ্ছা। দিদির ধনী-সংসার—পুত্র পৌত্রের আনন্দ-কোলাহলে হরষিত। সেখান হইতে দিদির 'মেজ যার' কন্যার বিবাহের দিন, শ্বশুর পক্ষের গোলযোগের দরুণ বিবাহভঙ্গ ও ললিতের সহিত কন্যার বিবাহ হইয়া যায় এবং ললিত তাহার বিধবা পুত্রহীনা পিশিমার অগাধ ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হয়! ইহাই সংক্ষেপে গ্রন্থের উপাখ্যান ভাগ। ইহাকে অবলম্বন করিয়াই নানাবিধ শাখাপল্লবে ১২৮ পৃষ্ঠা ব্যাপিয়া বেশ একটি সুখপাঠ্য চিত্রমূলক উপন্যাস বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে।

হিন্দু বিধবা, ধনীর গৃহিণী, সরম সঙ্কুচিতা 'বুকভরা-মধু' বাঙালীর বধূ, আধুনিক আহারাদি বিষয়ে সংযম-হীন যুবক, পিতৃহীন মাতৃনির্ভর পুত্র, প্রভৃতির চিত্রে এতটুকু খুঁত নাই। সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ফুটিয়াছে, বাঙালীর বিবাহ ব্যাপার। লেখিকা তেমন করিয়া এই ব্যাপারটির শোচনীয়তা প্রস্ফুট করেন নাই, তথাপি তাঁহার পাত্রপাত্রীর বক্তব্যের ফাঁক দিয়া সমাজের এই দারুণ ক্ষতটি আমাদিগের দৃষ্টি এড়াইতে পারে নাই। ইহা লেখিকার রীতিমত দক্ষতার পরিচায়ক সন্দেহ নাই।

ভুবনেশ্বরীর দিদি—ধনী সন্তানাদির মাতা সাংসারিক শোকের দুই একটা ক্ষুদ্র আঘাত পাইয়াছেন বটে, কিন্তু তথাপি সাধারণ ধনী গৃহিণীর মতই নিজের স্বার্থটুকু একটু অধিক বুঝেন। তাঁহার কথাবার্ত্তা হইতে আমরা তাঁহার যে একটা কাল্পনিক মূর্ত্তি গড়িয়া লই, সেটি সাধারণের ধারণার সহিতও বেশ খাপ খায়। মোটা সোটা দেহখানি—হাতে অনেক গুলি সোনার চুড়ি, বালা, তাগা, গলায় হার, কোমরে মোটা গোট', বেশ রাশভারি লোকটি। কথাবার্ত্তায় সর্ব্বদাই একটা 'বড়মানুষির বনিয়াদি' আভাষ পাওয়া যায়। মনের মধ্যে একটা তেজ আছে—গর্ব্ব আছে, 'ছেলেগুলিও সুসন্তান' ইহাই গর্ব্বের প্রধান কারণ—কোন্ সুমাতা না এ গর্ব্বের জন্য লালায়িতা হন? থাকুক গর্ব্ব, কিন্তু দিদির হৃদয়ে স্নেহও অপর্য্যাপ্ত! এইটুকুই হিন্দুনারীর বিশেষত্ব!

দিদি বলিতেছেন, দেখিছিস্ তো আমার ছেলে-গুলি? এ কলকেতা সহরে আজকের বাজারে এমন হীরের টুকরো ছেলে কার আছে বল্ দেখি!"

এ গর্ব্ব পুত্রস্নেহান্ধতার খাতিরে সাধারণে ক্ষমা করিবেন বলিয়া আশা করা যায়।

সঙ্কীর্ণতা দোষের হইলেও, সেকেলের গৃহিণীর মধ্যে আমরা একটা প্রচ্ছন্ন অভিমান দেখিতে পাই। দিদির 'মেজযার' কন্যার বিবাহোপলক্ষে তাঁহার বন্ধু আসিয়া নিমন্ত্রণ করিয়া চলিয়া গেলে—দিদি কন্যাকে কহিলেন,—

"রাণি, আমার 'মেজযায়ের আক্কেল দেখছিস্, একটা পুঁটে বৌ দিয়ে কিনা আমাকে নিমন্ত্রণ করা হয়েছে। আমি ত যাব না, তুই কাল মেজবৌকে নিয়ে যাস্। কালই চলে আসিস্।"

রাণী দিদির বিধবা কন্যা—রাণী কহিল, 'মেজ কাকীর জ্বর হয়েছে মা, তাই জন্য আসতে পারেন নাই দেখলে না কত করে বলে দিয়েছেন!"

দিদি কিন্তু সহজে ছাড়িবার পাত্র নহেন। দিদি কহিলেন, "বড় বৌকে তো পাঠাতে পারতো, বেটার বড় চাকরী হয়েছে কিনা তাই বড় গুমর হয়েছে! ইত্যাদি! কিন্তু স্নেহহৃদয়া দিদির অভিমান আর অধিকক্ষণ রহিল না—কন্যাবধূবর্গকে লইয়া সানন্দে নিমন্ত্রণবাড়ী যাইয়া গৃহিণীর স্থান অধিকার করিলেন!

যে কথা বলিতেছিলাম,—উৎসবানন্দের একটি স্নিগ্ধধারা 'শুভবিবাহে'র প্রতি পৃষ্ঠাটির মধ্য দিয়া বহিয়া গিয়াছে। সেই আনন্দকোলাহলের মধ্যেও নেপথ্যে অন্তরাল হইতে সমাজের দুই একটা মর্ম্মদাহী বেদনার কাতর স্বরও আমাদিগেরর শ্রুতিমূলে মাঝে মাঝে আঘাত করিয়াছে।

রাণী ও ভুবনেশ্বরীর চরিত্রে বেশ একটু পবিত্রতা আছে। যখন পলাণ্ডুর বাসে আমাদিগের রন্ধনশালা ও সারা গৃহ একটি বৈদেশিক বিভ্রম আনিয়া দেয়, তখন বিধবানারীর ঠাকুর ঘর হইতে ধূপধুনার যে পবিত্র সুরভি উত্থিত হয় তাহা কি স্নিগ্ধকর! কি চিত্তরঞ্জক। রাণী দিদির জ্যেষ্ঠকন্যা, নিঃসন্তান ও বিধবা, অধিক সময় পিত্রালয়েই বাস করে। ভ্রাতাদের লইয়াই তাহার ঘর সংসার, তাহাদের সুখের সুখী, দুঃখের দুঃখী।' এই অল্প কথায় রাণীর কতখানি পরিচয় পাওয়া যায়। সকলের উপকারের জন্য রাণীর করুণহস্ত সর্ব্বদা প্রসারিত রহিয়াছে ঘরের সামান্য দাসদাসীর সুখ দুঃখটুকু বুঝিতে রাণীর যত্ন কত! হিন্দু বিধবা ভিন্ন এমন সার্ব্বভৌম বিশ্বজনীন প্রেম অপরের হৃদয়ে কতকটা দুর্লভ নহে কি।

রাণী পরের নিন্দা করিতে জানে না—কেহ যদি কাহারো নিন্দা করে রাণী অমনি তাহার মধ্য হইতে ভালোটুকু বাছিয়া দেয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ "দিদি পাকাচুল তুলাইতে তুলাইতে বলিলেন—দেখেছিস রাণি, বৌএর শিকলি চুড়ির গড়ন দেখেছিস, চ্যাপা চ্যাপা—

রাণী। কিন্তু মা বেলওয়ারি কগাছির চমৎকার গড়ন।"

রাণীর মাতা যখন 'মেজযায়ের' নিমন্ত্রণ করার মধ্যে ত্রুটি দেখাইয়া "ছেলের চাকরীর গুমরই তাহার কারণ বলিয়া উল্লেখ করিতেছিলেন, তখন রাণী মাতার ভ্রম বুঝাইয়া বলিল,—

"না মা মেজকাকী তেমন মানুষই নন—বিশেষ আমাদের কত ভালো বাসেন—কি করবেন দায়ে পড়েছেন। তা মা তুমি যাবে না কেন, ও ত তোমার কুটুমবাড়ী নয়। এ বাড়ী ও সেবাড়ী আমাদের তো একই বলতে হবে। আমিই বা কেমন করে কোন নিমন্ত্রিতের মত যাব আর চলে আসবো তাই ভাবছি।

নিমন্ত্রণ বাটী গিয়া রাণী লোকজনের আহারাদি দেখা, পরিবেশন করা প্রভৃতি গৃহিণীপনায় নিযুক্ত হইল। কুটুম্ববাড়ী হইতে গাত্রহরিদ্রার তত্ত্ব আসিয়াছে —চাকর দাসীরা খাইতে বসিবে—কন্যার পিতা—রাণীর পিতৃব্যপুত্রকে রাণী কহিল, "যাই আমি কুটুম বাড়ীর ঝিয়েদের বসাই। তুই ভাই চাকরদের খোঁজ তল্লাস নিস, খাবার যায়গা টায়গা হল কিনা দেখগে, আমি লুচি টুচি পাঠিয়ে দিচ্ছি।"

কন্যার পিতা কহিল, "হ্যাঁ, মহামান্য মহামহিম রাজা পেঁচো, রাজা হরে, রাজা রামা, রাজা শ্যামাদের অভ্যর্থনার ত্রুটি না হয় দেখিগে; আবার নইলে বেহাই ফোঁস করে উঠবেন।"

বাস্তবিক এই সকল রাজা রামা শ্যামা প্রভৃতিকে লইয়া কিরূপ ব্যতিব্যস্ত হইতে হয় তাহা ভুক্তভোগীমাত্রেরই অজ্ঞাত নহে! কন্যাকর্ত্তার মুখ দিয়া লেখিকা অনেক দুঃখেই এই কথাগুলি বলাইয়াছেন।

'শুভবিবাহে'র লেখিকায় সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি ও সহৃদয় সহানুভূতি আমাদিগের সাধারণ গৃহকোণটিকেও একটি বিচিত্র সৌন্দর্য্যে ভূষিত করিয়াছে। 'শুভবিবাহ' সমাপ্তির সহিত একটা উৎসবের আনন্দ কোলাহল, নহবতের মিষ্ট রাগিনী, দাসদাসীর কলহ চীৎকার, শিশুদিগের ক্রন্দন হাস্য, গৃহিণীগণের গল্পগুজব, বধূবর্গের পট্টাম্বরের খসখস্ শব্দ মুখর শিঞ্জিতের মৃদুসঙ্গীত, ছোট মেয়েদের মলের ঝমঝম্ শব্দ প্রভৃতি মিলিয়া পাঠকের চিত্তে একটা বিভ্রমের আবেশ আনিয়া দেয়। সেই 'শাদা ধবধবে প্রকাণ্ড তেতালাবাড়ী—গাড়ীবারান্দায় নহবৎ বাজিতেছে, গোলাপী রঙের কাপড় পরা দুচার জন দাসদাসী বাগানে ঘুরিতেছে। বড় বড় মোটা মোটা সোনার চেনহার গলায়, নীল লাল সবুজ রঙের রেশমের কোট অথবা পাঞ্জাবী গায়ে, ফরসাধুতি পরা ছোট ছোট ছেলেরা ও জরী দিয়া খোঁপা বাঁধা, নোলক-নাকে, কানে এয়ারিং, পায়ে মল, ঘাগরার মত করিয়া নানা রঙের কাপড় পরা, কেশে লাল সবুজ অথবা কালো রঙের এক একটা ফিতাবাঁধা ৫।৭।১০ বছরের

মেয়েরাও ২।৪ জন বাগানে ঘুরিতেছে।" এটুকু হৃদয় হইতে চকিতেই মিলাইয়া যায় না।

আমরা সংক্ষেপে শুভবিবাহের পরিচয় প্রদান করিলাম। পাঠক নিজে ঘনিষ্ঠরূপে পরিচিত হইয়া ইহার প্রকৃত রস গ্রহণ করুন।

শরৎকুমারীর লেখার বিশেষ আকর্ষণই এই ; তিনি প্রত্যেক ছোটখাটো বিষয়গুলি যেন ফোটোগ্রাফের মত করিয়া আঁকেন। ভারতীর মেয়েযজ্ঞিতে শরৎকুমারী যে উৎসব চিত্র দেখাইয়াছেন তাহা কি সুন্দর ! তাঁহার বর্ণিত উৎসবপ্রাঙ্গনের সেই কলকোলাহল এখনো আমাদিগের কর্ণে বাজিতেছে, সেই বাড়ী ফিরিবার সময় একটা বিপর্য্যয় গোলোযোগ" 'গাড়ী কই" "খোকা কোথা" 'খুকির গলার হার কে নিলে ?' কিছুই খুঁজিয়া মিলিতেছে না—বৌমার হীরার ধুকধুকি নাই, টেঁপির মাথার টুপির ল্যাজ ছেঁড়া, গিন্নির নাকের নথের খোলোক পর্য্যন্ত পড়িয়া গিয়াছে,—অমিয় জুতা হারাইয়া শুধু মোজাপায়েই আমার জুতো-ও-ও-ও-ও করিয়া চীৎকার করিতেছে—

এই বিচিত্র কোলাহল শুনিতে শুনিতে আমরা বিদায় গ্রহণ করিলাম।

সমালোচনা।

কল্পকথা।—শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়। ইণ্ডিয়া পাবলিশিং হাউস হইতে প্রকাশিত, কান্তিকপ্রেসে মুদ্রিত। মূল্য আট আনা। সাহিত্য জগতে মণিলাল বাবুর নাম সুপরিচিত। "কল্পকথা" তাঁহারি রচিত একাদশটি ছোট গল্পের সমষ্টি। জাপানী গল্পের ভাব লইয়া রচিত হইলেও, গল্পগুলিকে মণিলাল বাবু যে একটি বিচিত্র সুরের মধুরতা দান করিয়াছেন, তাহা তাঁহার নিজস্ব। গল্পগুলি সমাপ্তির সহিত পাঠকের হৃদয়বেলাটি প্রচুর ভাবতরঙ্গে উদ্বেলিত করিয়া তুলে। গ্রন্থের ভাষাটিও সুন্দর উপভোগ্য। মণিলাল বাবুর পরিপক্ক হস্তের রচনা এই গল্পগুলি কাব্যামোদীমাত্রেরই চিত্তরঞ্জন করিবে। গল্পগুলির মধ্যে বেশ একটু নূতনত্ব আছে। 'বৈরাগ্য', 'দান', 'মণি' 'মিলন' প্রভৃতি গল্পগুলি ভাবসম্পদে অতুলনীয়। গ্রন্থখানির বাঁধাই ও জাপানী চিত্রগুলিও মনোজ্ঞ হইয়াছে।

চাকমাজাতি।—(জাতীয় চিত্র ও ইতিবৃত্ত) শ্রীসতীশচন্দ্র ঘোষ, এম, আই, আর, এস প্রণীত। মূল্য সোণা-রূপায় ছাপা বাঁধাই, তিন টাকা। পেষ্টবোর্ডে বাঁধাই, আড়াই টাকা। 'ভারতী'র পাঠক বর্গের নিকট চাকমাজাতির কথা নিতান্তই নূতন নহে। গ্রন্থোক্ত অনেকগুলি অধ্যায় পূর্ব্বে ভারতীতে ফলে', গ্রন্থখানি বঙ্গ সাহিত্যের সম্পদ্ স্বরূপ হইয়াছে। লেখক চাকমাজাতির ইতিবৃত্ত, সামাজিকতা, সভ্যতা প্রভৃতির সুন্দর একটি চিত্র পাঠকের সমক্ষে ধরিয়াছেন; ভৌগোলিক তত্ত্বটুকুও বাদ পড়ে নাই। গ্রন্থখানিতে লেখকের সূক্ষ্ম পর্য্যালোচনা শক্তি, সুশৃঙ্খল বর্ণনাভঙ্গী, ও উদার সহানুভূতি প্রতি পত্রে জাজ্বল্যমান হইয়া উঠিয়াছে। এই অজ্ঞাত পার্ব্বত্য জাতির ঘরের ছোট কথাটিও লেখকের দৃষ্টি এড়াইতে পারে নাই। লেখকের ভাষাটুকু কেবল সর্ব্বত্র সুচারু সুন্দর নহে। ইহা ভিন্ন গ্রন্থখানির অপর কিছু ত্রুটি নাই।

ভাষাতত্ত্ব।—(ভারতবর্ষীয় আর্য্যভাষার তত্ত্বানুশীলন)। শ্রীশ্রীনাথ সেন প্রণীত। প্রথম খণ্ড দ্বিতীয় সংস্করণ। দ্বিতীয় খণ্ড। ৫০, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, লোটাস লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত। মূল্য প্রতিখণ্ড এক টাকা। ব্যাকরণ ও শব্দ শিক্ষাই ভাষাজ্ঞানের পক্ষে চূড়ান্ত নহে। ভাষার আভ্যন্তরিক বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব সমূহের সহিত পরিচয় না হইলে ভাষাজ্ঞান অসম্পূর্ণ রহিয়া যায়। বক্ষ্যমাণ গ্রন্থখানি গ্রন্থকারের দুঃসহ অধ্যবসায় ও গবেষণার একটি অমৃত ফল। সংস্কৃত ও বাঙলা ভাষার পারস্পরিক সম্পর্ক বিচার, রীতিব্যতিক্রম (Idiom) সন্ধির ব্যবহার প্রভৃতি

হইয়াছে। গ্রন্থকারের মতের সহিত সর্ব্বত্র আমাদিগের মতের মিল না থাকিলেও গ্রন্থখানি প্রত্যেক সাহিত্যসেবীর পক্ষে যে অবশ্য পঠনীয়, তাহা আমরা অসঙ্কোচে বলিতে পারি। ব্যাকরণ লইয়া অতিরিক্ত আলোচনায়, গ্রন্থকারের বক্তব্য সর্ব্বত্র তেমন সরস হয় নাই, তবে বিষয়ের গুরুত্ব বুঝিয়া সে ক্রটি ধর্ত্তব্য নহে।

দুর্গা।—শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ প্রণীত। প্রকাশক, শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, ২০১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। কান্তিক প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য বার আনা। হিন্দু বালকবালিকাগণের জন্য সরল বাঙলায় মার্কণ্ডের পুরাণান্তর্গত চণ্ডীর আখ্যান সঙ্কলিত হইয়াছে। গ্রন্থের সরল অনাড়ম্বর ভাষাটি সহজেই পাঠকের চিত্ত আকৃষ্ট করে। শুধু বালক বালিকা নহে, তাহাদিগের অভিভাবকগণও গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া আনন্দ ও জ্ঞান লাভ করিবেন। গ্রন্থকার সকল কথাই গুছাইয়া বলিয়াছেন। তবে দু এক স্থানে তাঁহার শিশু পাঠকপাঠিকাগণকে নিতান্তই যেন ফাঁকি দিয়াছেন। ক্ষীরোদ বাবুর ন্যায় প্রবীণ গ্রন্থকারের এই শৈথিল্য দেখিয়া আমরা ক্ষুণ্ণ হইয়াছি। পরিশেষে দুঃখের সহিত আরো স্বীকার করিতে হইতেছে; গ্রন্থের প্রারম্ভে দেবী চিত্রের পরিকল্পনারও আমরা সুখ্যাতি করিতে পারিলাম না। রক্তাম্বরা 'বডিশ'-পরিহিতা দুর্গা-চিত্রে,—বরাভয়প্রদা মাতৃমূর্ত্তির পরিবর্ত্তে রঙ্গমঞ্চের 'ব্রিটানিকা' অথবা যাত্রার 'যশোদাঠাকরুণের' ছায়াই পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে!

সতীলক্ষ্মী।—উপন্যাস। শ্রীবিধুভূষণ বসু কর্ত্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত। মজুমদার প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য ॥০ আট আনা। বাঁধাই দশ আনা। দেড় শত টাকা মাহিনার একজন কেরানী,—সাহেব কর্ত্তৃক 'ড্যামফুল' ইত্যাকার গালিলাভে অপমানিত ও লাঞ্ছিত হইয়া পত্নী কমলার অত্যধিক আগ্রহ ও ইচ্ছায় সে চাকরি পরিত্যাগ করে। তাহার পর উপন্যসহলভ ঘটনাপরম্পরায় ব্রহ্মচারী বামাসুন্দরীর সহিত পাঠকের পরিচয়ান্তে গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে। অফিসের সাহেব যদি অপমান করে তবে বাঙালী কেরানী বাবু তখনি চাকুরি ছাড়ুন, তাহাতে আমাদের আপত্তি নাই কিন্তু তাই বলিয়া গ্রন্থকারের মতের অনুসরণ করিয়া যে সকল বাঙালীই এক যোগে অমনি চাকরি পরিত্যাগ করিবেন, এ কথার আমরা অনুমোদন করি না। অফিসের সাহেবের অকস্মাৎ প্রতিশোধবাসনা চরিতার্থ করিবার উদ্দেশে কলিকাতা ত্যাগ করিয়া সুদূর পল্লীগ্রামে আরদালি ও বন্দুক সহ আগমন, স্বামীর চাকরি পরিত্যাগ ব্যাপারে বাঙালী বধূ কমলার একেবারে রাজপুতমহিলার মূর্ত্তি ধারণ বিষয়গুলি আমাদের নিকট হাস্যোদ্দীপক বলিয়া মনে হয়। নীতি শিক্ষার কথা ছাড়িয়া দিয়া উপন্যাসের দিক দিয়া দেখিলে 'সতীলক্ষ্মী' একখানি নিষ্ফল উপন্যাস। এই শ্রেণীর উপন্যাসকারগণ সংযমটুকু দেশছাড়া করিয়া বসেন—পাত্র পাত্রীর মুখে গবেষণাত্মক প্রবন্ধের বাছা বাছা বক্তব্য বন্যার স্রোতের মত বসাইয়া দিতে পারিলেই উপন্যাসের চূড়ান্ত হইয়া গেল বলিয়া ইঁহাদিগের ধারণা! গ্রন্থকারের ভাষাটি মিষ্ট হৃদয়গ্রাহী, লিখিবারো তাঁহার ক্ষমতা আছে সেই জন্যই আমরা ক্ষুদ্র উপন্যাসখানি সম্বন্ধে এত কথা বলিলাম। 'সতীলক্ষ্মীর গ্রন্থকার ভাবের রশ্মি সংযত করিয়া সাহিত্যের পথে চলিলে তাঁহার রচনা ভালো ফুটিবে বলিয়া আশা করা যায়!

বৈদ্যনাথ কথা। ঐতিহাসিক চিত্র। বিবিধ বিষয় এবং সমুদয় দেবদেবীর ধ্যান সম্বলিত। সোনারভারত পুস্তকালয়, ৩৬নং বনমালী সরকার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ১৩১৬। কমলা প্রিন্টিং ওয়ার্কসে মুদ্রিত। মূল্য ৵১০ মাত্র। গ্রন্থের মুখবন্ধে লেখক বলিয়াছেন, "বৈদ্যনাথের বিবিধ তথ্যপূর্ণ একখানি পুস্তকের অভাব * * যথাসম্ভব দূর করিবার জন্য 'বৈদ্যনাথ কথা' বঙ্গীয় পাঠকগণের হস্তে সমর্পিত হইল। প্রধানতঃ ভক্ত বিশ্বাসী বৈদ্যনাথযাত্রীর জন্য রচিত হইলেও পুস্তকখানি যাহাতে সাধারণ পাঠক ও প্রত্নতত্ত্ব জিজ্ঞাসুরও প্রীতিকর হয়, আমি তাহার চেষ্টা করিয়াছি। এজন্য শিবপূজার উৎপত্তি, বৈদ্যনাথে শিবলিঙ্গ স্থাপনার ও মন্দির নির্ম্মাণের কাল নির্ণয় প্রভৃতি জটিল বিষয়ের আলোচনা"ও ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি

বৈদ্যনাথযাত্রীর পক্ষে সুদক্ষ 'গাইডের' কার্য্য করিবে বলিয়া আমাদিগের বিশ্বাস।

ম্যালেরিয়া। শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন গুপ্ত, এল, এম, এস প্রণীত। শ্রীকিরণচন্দ্র রায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মুঙ্গের। কলিকাতা একমি প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য এক টাকা মাত্র। চিকিৎসা ব্যবসায়ী গ্রন্থকার যথার্থই বলিয়াছেন, "এই যে দেশব্যাপী দারিদ্র্য, নিরুদ্যম, পারিবারিক দুঃখশোক, জীবনসংগ্রামে পদে পদে পরাজয়, জাতীয় চরিত্রের অবনতি, ইহার ভিতর ম্যালেরিয়ার প্রভাব বড় সামান্য নহে।" গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া আমরা বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছি। চিকিৎসাবিষয়ক গ্রন্থের এমন হৃদয়গ্রাহী সুদক্ষ আলোচনা বঙ্গসাহিত্যে অধিক আছে বলিয়া মনে হয় না। ম্যালেরিয়ার ইতিবৃত্ত, উৎপত্তি, কারণসন্ধান, ম্যালেরিয়া হইতে আত্মরক্ষার উপায়, পথ্যাপথ্য ও চিকিৎসা সম্বন্ধে গ্রন্থকার এমনি সহজ প্রাঞ্জল ভাষায় বিশদ আলোচনা করিয়াছেন, যে গ্রন্থখানি উপন্যাসেরি মত সুপাঠ্য হইয়াছে। আরো সুখের কথা, গ্রন্থখানি চরকসুশ্রুত ও পাশ্চাত্য গ্রন্থাদির সূক্ষ্ম আলোচনা ও গ্রন্থকারের স্বীয় অভিজ্ঞতার ফল, ইংরাজি 'তর্জ্জমা' নহে। ম্যালেরিয়াজীর্ণ বাঙালীর গৃহে গৃহে গৃহপঞ্জিকার মত এই গ্রন্থ বিরাজ করুক, ইহাই আমাদিগের প্রার্থনা। গ্রন্থখানির মূল্য আরো একটু সুলভ হইলে সাধারণের পক্ষে বিশেষ সুবিধা হয় এবং মোটের উপর গ্রন্থকারেরও তাহাতে বিশেষ অসুবিধা হইবে বলিয়া মনে হয় না। এবিষয়ে গ্রন্থকারের মনোযোগ বাঞ্ছনীয়।

Life of Dr. Mohendra Lal Sircar. By Sarat Chandra Ghose, M. D. Published by Jnanendra Nath Bose. The Oriental Publishing House, 11 Issur Thakur Lane, Calcutta. Printed at the Wilkins Press, College square, Calcutta. গ্রন্থখানির মূল্য দুই টাকা। মহেন্দ্রলাল বাঙলার কৃতি সন্তান, ও আদর্শ কর্ম্মবীর; তাঁহার জীবনী হইতে শিখিবার জিনিষ প্রচুর আছে। মহেন্দ্রলালের জীবনচরিত সঙ্কলন করিয়া শরৎবাবু বাঙালীমাত্রেরই কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। গ্রন্থখানিতে ডাক্তার মহেন্দ্রলাল, স্যালজার, চন্দ্রশেখর কালী প্রভৃতির কয়েকখানি চিত্রও প্রদত্ত হইয়াছে। মহেন্দ্রলালের চিকিৎসাপদ্ধতির বিশেষত্ব, সামাজিকতা, ধর্ম্মজীবন ও রাজনীতিজ্ঞতা প্রভৃতির বিশদ বিবরণী সংগ্রহে গ্রন্থকারের কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। মহেন্দ্রলালের ন্যায় বিশেষজ্ঞ ও সুদক্ষ এলোপেথিক ডাক্তারের হোমিওপ্যাথি পদ্ধতির অনুবর্ত্তিতার বিবরণটুকু বিশেষ কৌতুহলোদ্দীপক, সাধারণ এবং অসাধারণ এলোপেথমাত্রেরই অবশ্য পঠনীয়। এই গ্রন্থখানিতে লেখক নিরপেক্ষ ভাবে হোমিওপ্যাথির বিশেষত্ব সম্বন্ধে স্থানে স্থানে ইঙ্গিত করিয়াছেন। গ্রন্থকারের প্রতিষ্ঠিত ঔষধ প্রচার সমিতির প্রতি স্বদেশানুরাগী ব্যক্তি মাত্রেরই মনোযোগ দেওয়া উচিত। সাধারণের আনুকূল্যে এই সমিতির কার্য্যের প্রসারবৃদ্ধি দেশের পক্ষে রীতিমত গৌরব ও কল্যাণের বিষয়। গ্রন্থকারের ভাষাটিও সুন্দর, সরল, এবং মর্ম্মস্পর্শী। শরৎ বাবু আশাকরি গ্রন্থখানির একখানি বাঙলা অনুবাদ প্রকাশ করিয়া ইংরাজী অনভিজ্ঞ পাঠকের ক্ষোভ দূর করিবেন।

সতী-শতক।—(শাস্ত্রোক্ত সদুপদেশপূর্ণ এক শত সতীরমণীর জীবন-চরিত) শ্রীনির্ম্মলবালা চৌধুরাণী প্রণীত। দ্বিতীয় সংস্করণ—মূল্য আট আনা দ্বিতীয় খণ্ড মূল্য বার আনা। ৫০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, লোটাস লাইব্রেরী। দ্বিতীয় খণ্ডে, 'পদ্মা' 'রেণুকা', 'সুকন্যা', 'সীতা', 'বেহুলা', 'সতী', 'লোপামুদ্রা' 'শুচিস্মিতা', প্রভৃতি প্রাচীনা সতীর কাহিনী লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আরো দুই খণ্ড প্রকাশিত হইলে শতসতীর কাহিনী সম্পূর্ণ হইবে। লেখিকার উদ্যম ও অধ্যবসায় প্রশংসনীয়, অনুকরণের যোগ্য। গ্রন্থের ভাষা 'সেকেলে' হইলেও বিশুদ্ধ, পবিত্র কাহিনী বর্ণনার উপযোগী তবে অধিকমাত্রায় সংস্কৃতবহুল হওয়ায় কাহিনীগুলির মধ্যে সর্ব্বত্র সরসতা রক্ষিত হয় নাই। যাহা হউক, এ ক্ষুদ্র ত্রুটি সত্ত্বেও গ্রন্থখানি নারীপাঠ্য গ্রন্থের মধ্যে যে বিশিষ্ট আসন পাইবার অধিকারী, তাহা কেহই অস্বীকার করিবেন না।

মৃগয়া।

[পাঠক যেন মনে না করেন এই কবিতাটি বিগত আশ্বিন মাসের ভারতীতে প্রকাশিত বৈরাগ্য নামক গল্পের অনুকরণ। আমরা তাহার বহুপূর্ব্বে এই কবিতাটি পাইয়াছি। স্থানাভাবে এতদিন প্রকাশিত হয় নাই।] ভাঃ সঃ

শুষ্ক দ্বিপ্রহর। পথ ধূলিধূসরিত ;
প্রান্তে তার ক্ষুদ্র এক জীর্ণ পর্ণ গেহ।
অদূরে বিশীর্ণা নদী, ক্ষীণ রেখা তার
গ্রাম প্রান্তে বক্রগতি রেখেছে আঁকিয়া।
তীর দেশে বসে আছে চক্রবাক্ একা,
হৃদে লয়ে মৌন সুখ আকুল আকাঙ্ক্ষা
আশাপথ চেয়ে কার ? ক্ষুদ্র আঁখি কোণে
প্রস্ফুরিত জ্যোতি রেখা স্থির অচঞ্চল ;
এখনি আসিবে বুঝি চক্রবাকী তার ?
পরিপূর্ণ আশা, আর আনন্দ হিল্লোল
ক্ষুদ্র বিহঙ্গম হৃদে করিয়া ধারণ
ধ্যানমগ্ন যোগী যেন মহা তপস্যায়!
ডুবে গেল দ্বিপ্রহর সায়াহ্ন ছটায় ;
বাহিরি কুটীর হতে, আগ্নেয়াস্ত্র হাতে
ধীরে ধীরে অতি ধীরে যুবা একজন
দাঁড়াইল বৃক্ষতলে সতৃষ্ণ নয়নে ;
দেখিলনা জানিলনা—বিহগ নির্ভয়।
আকাশে উঠিল শব্দ এহেন সময়ে
শন শন্ শন্ ; উর্দ্ধে চাহে গ্রীবা তুলি।
ওই আসে প্রিয়া বুঝি। ক্ষুদ্র পক্ষ দুটী
বিস্তারিয়া মহাশূন্যে ; পুলক চঞ্চল
নৃত্যপরা অপ্সরার মুখর নূপুর
ধ্বনিয়া মধুরে যেন মিলায় আবার।
পুলকিত চক্রবাক ঈষৎ কাঁপায়ে তার
শুভ্র ছোট ডানাদুটী বায়ু সঞ্চালনে—
পুনঃ স্থির ধীর ভাবে বসিল তখনি।
মিলন আকুল হিয়া তৃষিত অধর
নির্ব্বাক্ নয়নে যেন কহিছে কাতরে
"তৃপ্ত মোর সর্ব্ব সাধ পূর্ণ এতদিনে
আয় তুই হৃদিমাঝে বাঞ্ছিত আমার
স্বল্প স্থায়ী এ জীবন হউক সার্থক।
এখনি আসিবে সন্ধ্যা দৃষ্টিহীন আঁখি
চলে যাব দুইজনে দুই পরপারে
সীমাহীন বিরহের দূর ব্যবধানে ;
গাহিব আকুল কণ্ঠে উন্মত্ত সঙ্গীত
তৃপ্তিহীন শ্রান্তিহীন বসি সারানিশি।"
নামে চক্রবাকী ধীরে, বাড়াইয়ে গ্রীবা
সম্মিলন ব্যগ্র হৃদি, ক্ষুদ্র পদভার
ধরণীতে রাখিবার বিলম্ব না সয়!
কঠোর চঞ্চুর স্পর্শে চকিত চুম্বনে
মিলাল অধর দ্বয় উর্দ্ধে দেহভার।
গুড়ুম গুড়ুম গুম্ গর্জ্জিল অদূরে
অশনির জ্বালাসম ধাঁধিল নয়ন।
বিদ্ধ-কণ্ঠ বিহঙ্গম ধুলায় পড়িল
ঝরিল শোণিত ধারা দুনয়ন বেয়ে।
ভয়ত্রস্তা চক্রবাকী চকিতে উড়িল
ক্ষণপরে সংজ্ঞা পেয়ে আসিল নামিয়া,
সেইমত ঠোঁঠে ঠোঁটে অঙ্গে অঙ্গ রাখি
সৈকত শ্মশানে শুয়ে দৃঢ় আলিঙ্গনে
চাহিল কাতর দৃষ্টি উদার গগনে,
বিন্দুমাত্র তপ্তজল নয়নের কোণে।

শ্রীলীলাবতী দেবী।

কলিকাতা, ২০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত ও ৩৪, ওল্ড বালিগঞ্জ রোড হইতে শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।



বিপন্ন দুর্ব্বাসা

সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় অঙ্কিত চিত্র হইতে

ভারতী।

৩৩শ বর্ষ]   পৌষ, ১৩১৬   [৯ম সংখ্যা।

ভোজরাজ ও ধাররাজ্য।

শিক্ষিত অশিক্ষিত প্রত্যেক ভারতবাসীর নিকটই উজ্জয়িনীরাজ বিক্রমাদিত্যের নাম সমধিক পরিচিত। বালমনোরঞ্জন গল্পাবলী হইতে আরম্ভ করিয়া, বেতালপঞ্চবিংশতি বা দ্বাত্রিংশ সিংহাসনের বিচিত্র উপাখ্যান সমূহ হইতে, এবং বিক্রমাদিত্য সভাস্থিত নবরত্নাদির কাব্যোক্ত প্রসঙ্গে অবন্তীরাজ বিক্রমাদিত্য যে একজন অদ্ভুতকর্ম্মা প্রবল প্রতাপান্বিত নরপতি ছিলেন, তাহা সহজেই হৃদয়ঙ্গম হয়; এবং তাঁহার সম্বন্ধে ক্রমশঃ অধিক তথ্য জানিবার ইচ্ছা বলবতী হইতে থাকে। কিন্তু গবেষণামূলক বৃহৎ ইতিহাস হইতেও বিক্রমাদিত্য বিষয়ক ধারাবাহিক ইতিবৃত্ত অবগত হইতে পারা যায় না। কেবল কিম্বদন্তীর উপর নির্ভর করিয়া, কেহ কেহ লিখিয়া গিয়াছেন, 'তিনি অবন্তী রাজ্যের রাজধানী উজ্জয়িনীতে রাজত্ব করিতেন, শকনামক অনার্য্য জাতিকে বিতাড়িত করিয়া শকারি আখ্যা লাভ করেন। একজন প্রতাপশালী রাজা হইয়াও, তিনি তাঁহার প্রাত্যহিক জীবন একজন সামান্য মিতব্যয়ী গৃহস্থ হইতেও অধিকতর সাধারণ ভাবে পরিচালিত করিতেন।' এই জাতীয় দুই একটি অনৈতিহাসিক উল্লেখ হইতে, রোমসম্রাট মার্কাস অরেলস হইতেও তাঁহার জীবনযাত্রা অধিকতর দীনভাবে নির্ব্বাহিত হইত এই জ্ঞানটুকু লাভে, জাতীয় গৌরবাভিমানে সামান্য একটু আত্মপ্রসাদ লাভ ব্যতীত বিক্রমাদিত্য বিষয়ক ঐতিহাসিক তত্ত্বের কোনই সন্ধান পাওয়া যায় না। কেহ কেহ বিক্রমসংবতের আলোচনাবসরে বলিয়া থাকেন, 'বিক্রম খৃষ্টীয় পঞ্চম বা ষষ্ঠ শতাব্দীর লোক, তিনি পরবর্ত্তীগণের নিকট স্বীয় রাজত্বকাল প্রাচীনতর প্রতিপাদন করিবার অভিপ্রায়ে ৫৭ খৃঃ পূর্ব্ব হইতে গণনা করিয়া গিয়াছেন।' আবার ইংরাজরাজের ভারতীয় শিক্ষাবিভাগের একজন সুযোগ্য কর্ণধার গুপ্তবংশীয় মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের সহিত উজ্জয়িনীরাজ বিক্রমাদিত্যের ঐক্যপ্রতিপাদন প্রয়াসী হইয়াছেন। বিক্রমসম্বন্ধীয় অগণিত অদ্ভুত ঐতিহ্য সমূহের সহিত, ঐতিহাসিকগণও এইরূপে আরও কয়েকটি স্বকপোলকল্পিত বিচিত্র উপাখ্যান সংযোজিত করিতে কৃপণতা করেন নাই। ইহাতে বিক্রমচরিত আরও রহস্যময় হইয়া উঠিয়াছে, এবং সেই সঙ্গে তাঁহার ইতিবৃত্ত অনুসন্ধানের পথও ক্রমশঃ কণ্টকময় হইয়া পড়িয়াছে। আবার আর একদল ঐতিহাসিক আছেন, যাঁহারা বিক্রমাদিত্য নামক কোন বাস্তব

রাজার অস্তিত্বই স্বীকার করেন না। উঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ একটু ঔদার্য্য অবলম্বন করিয়া বলিয়া থাকেন,—বিক্রমাদিত্য উপাধিমাত্র, ভোজ প্রভৃতি বহুসংখ্যক রাজাই ঐ উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন, সুতরাং বিক্রমের একখানি পৃথক্ ইতিবৃত্ত সংকলন আদৌ সম্ভাবিত নহে। আর একপক্ষ বলেন প্রাচীন ব্রিটেনের আর্থারের ন্যায় বিক্রমাদিত্যও কল্পনারাজ্যের রাজামাত্র, সত্যের রাজ্যে তাঁহার কোনই স্থান নির্ণীত হইতে পারে না; এবং আর্থার সম্বন্ধীয় উপাখ্যানাবলীর ন্যায় বিক্রমাখ্যায়িকাও কবিকল্পিত হইয়া জন মধ্যে প্রবেশ লাভ করিয়া কালক্রমে সত্যরূপে পরিগৃহীত হইয়াছে। পক্ষান্তরে প্রাচীন ভারতের আধুনিক ইতিহাস লেখকগণের মধ্যে যাঁহারা স্ব স্ব গবেষণার জন্য সুখ্যাতি লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা বিক্রম সম্বন্ধীয় জটিল সমস্যার কোনই সমাধানে উপনীত হইতে না পারিয়া একেবারে কোন মত প্রকাশ বা কোন প্রসঙ্গই উত্থাপন করেন নাই।

এই ত গেল ইতিহাস ঐতিহ্যের কথা। প্রত্নতত্ত্বজ্ঞ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের গভীর গবেষণা সমূহ হইতেও বিক্রম চরিত সমুদ্ধারের কোন পথই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, কারণ ভারতের প্রসিদ্ধ প্রাচীন রাজা বিক্রমাদিত্যের পুরাতত্ত্ব লইয়া কাহাকেও মস্তিষ্ক পরিচালিত করিতে দেখি না, অথচ আলেকজাণ্ডারের অশ্ব বুসিফেলসের কোন অংশ শ্বেত কোন অংশ কৃষ্ণবর্ণ, তাহার প্রকৃতিই বা কিরূপ, তাহার নামের হেতুবাদই বা কি এই আগ্রহাতিশয্য প্রদর্শিত হয়। অন্য দিকে বিক্রমচরিতোদ্ধারের প্রধান অন্বেষণ স্থল মহাসাগরোপম সংস্কৃত সাহিত্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেও হতাশ হইয়া পড়িতে হয়। বিক্রমাদিত্য ও ভোজের ঐক্য নির্দ্দেশক দুই একটি কিম্বদন্তী সংস্কৃত সাহিত্যে নিতান্ত বিরল না হইলেও, তাহা হইতে উভয়ের ঐক্য প্রতিপাদক কোন প্রমাণই পাওয়া যায় না। বরং উভয়ের রাজধানীর ও সময়ের পার্থক্যপ্রকাশক প্রবাদ হইতে উভয়ের ভিন্নত্বে প্রতীতি জন্মাইয়া দেয়। এরূপ স্থলে কেবলমাত্র ভোজ ও তদ্বংশীয়গণের আলোচনা দ্বারা ভাবী বিক্রমচরিতোদ্ধারের জটিলতা কতকটা অপসারিত হইতে পারে, এই আশায় প্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের প্রকৃষ্ট গবেষণা পদ্ধতির অনুসরণ করিয়া প্রথমে বিক্রমাদিত্য হইতে বিভিন্ন ভোজরাজ ও তদ্বংশের পর্য্যালোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া গেল।

মালব দেশের উচ্চসভ্যতা ও বিদ্যানুরাগিতা অতি প্রাচীনকাল হইতেই ভারতের সর্ব্বত্র সুপ্রথিত। কালিদাস প্রভৃতি কবিবৃন্দের ভাবময়ী বর্ণনায় সংস্কৃত সাহিত্যের স্তরে স্তরে ইহা উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে। মালবের সৌন্দর্য্যগরিমায় হিউয়েন-সাংপ্রমুখ বৈদেশিক ভ্রমণকারীও মুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারেন নাই। আমাদিগের বোধ হয়, অবন্তী ও ধার রাজ্য এক মালবেরই দুইটি উপবিভাগ মাত্র। অতি প্রাচীনকাল হইতেই ইহাদিগের অন্তর্গত উজ্জয়িনী ও ধারা এই দুইটি প্রধান নগরের উল্লেখ দেখিতে পাই; ইহারাই কালক্রমে

পরিকল্পিত হয়। কিন্তু কোনটি কাহাকর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়া সমৃদ্ধিলাভ করে, তাহা জানিবার উপায় নাই। তন্মধ্যে ক্ষিপ্রাতটবর্ত্তিনী উজ্জয়িনী মহারাজ বিক্রমাদিত্যের রাজধানী বলিয়াই সমধিক প্রসিদ্ধ এবং মহাকবি কালিদাসের অমর কবিতায় অবিনশ্বররূপে অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে। কর্ণেল টড তাঁহার রাজস্থানে বলিয়াছেন তম্বনগরী বা আনন্দপুর (বর্ত্তমান আহড়) হইতেই বিক্রমাদিত্য অবন্তী গমন করিয়া তথায় আধিপত্য লাভ করেন। দ্বিতীয় ধারা বা ধার-নগরীই আলোচ্য ভোজরাজের রাজধানী ছিল। শিশুপাঠ্য পুরুষপরীক্ষা প্রমুখ সংস্কৃতগ্রন্থ ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা হইতে বৃহৎ কাব্য নাটকাদিতে পর্য্যন্ত ধারানগরী ও ভোজদেবের উল্লেখ নিতান্ত বিরল নহে। এতদ্ব্যতীত মাণ্ডু, বাঘ, বরবাণী প্রভৃতি স্থানে আর্য্যন্থপতির যে সমস্ত কীর্ত্তিচিহ্ন উৎখাত হইতেছে, তাহাতে সে গুলিও এক সময়ে এক একটি প্রসিদ্ধ নগর ছিল বলিয়া প্রতীতি জন্মে। * প্রচলিত গ্রন্থাদির সাহায্যে এবং মহারাজ ভোজের ন্যায় নানা বিষয়ে প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি বিশিষ্ট শাসনকর্ত্তার রচনাদি হইতে ধাররাজ্য ও ভোজ সম্বন্ধে যে টুকু তথ্য সংগ্রহ করিতে পারা যায়, তাহা ধারাবাহিক সম্পূর্ণ বিবরণের পক্ষে যথেষ্ট না হইলেও নিতান্ত উপেক্ষণীয় নহে। ভোজ একজন প্রজাপালননিরত নরপতিরূপে উল্লিখিত হইলেও বৈয়াকরণ ও দার্শনিক পণ্ডিত বলিয়াও তাঁহার প্রসিদ্ধি কম নহে। রাজকার্য্যের অবসরে তিনি ব্যাকরণ ও দর্শন বিষয়ে বিস্তর গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থ যে কয়েকখানি এখনও পাওয়া যায়, তাহার মধ্যে 'বাক্যপদীয়' বৈয়াকরণ পণ্ডিতগণ এখনও যত্নসহকারে পাঠ করিয়া থাকেন। ভোজ পাতঞ্জল যোগসূত্রের রাজমার্ত্তণ্ড বা রাজ মৃগাঙ্ক নামক যে সরল ব্যাখ্যাগ্রন্থ প্রণয়ন করেন, তিনি তাহাতে রণরঙ্গ মল্লনামে আত্মপরিচয় প্রদান করিয়াছেন; অদ্যাপি তাহা ভোজবৃত্তি নামেই সুপরিচিত থাকিয়া পণ্ডিতসমাজে অতি আদরের সহিত পঠিত হইতেছে। ইহা হইতেই অবগত হওয়া যায়, রণরঙ্গমল্ল ভোজের নামান্তর মাত্র। ভোজপ্রবন্ধ, ভোজচম্পূ, ভোজচরিতাদি ভোজবিষয়ক যে সকল সংস্কৃত গ্রন্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাতে তিনি সিন্ধুলের পুত্র এবং মুঞ্জের অব্যবহিত সিংহাসনাধিকারী বলিয়া কথিত। ভোজপ্রবন্ধকার বল্লাল বা বল্লভ পণ্ডিতের মতে, এই মুঞ্জ সিন্ধুলের কনিষ্ঠ ভ্রাতা সুতরাং ভোজের পিতৃব্য। ভোজ যখন পঞ্চমবর্ষীয় বালক, তখন তাঁহার পিতৃবিয়োগ হওয়ায় পিতৃব্য মুঞ্জই রাজ্যশাসন করিতে থাকেন। ভোজচরিতকার মুঞ্জকে সিন্ধুমহিষী পদ্মাবতীর

---

* মাণ্ডু (বা মাণ্ডব) রাজগণের প্রথম প্রাধান্য সময়েই স্থাপিত হয়। পরে খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে সুলতান হোশাং শাহ গোরী কর্ত্তৃক প্রাচীন হিন্দুনগরীর ভগ্নাবশেষের উপর মাণ্ডু পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয় এবং মালবে মুসলমানাধিপত্য বিলয়ের সঙ্গে সঙ্গেই উহা বিস্মৃতির কুক্ষিগত হইতে থাকে। ধাররাজ্যের স্থাপত্যবিভাগকর্ত্তৃক প্রাচীন স্থানগুলি পুনরায় উৎখাত হইয়া স্ব স্ব ঐতিহাসিকত্ব প্রতিপাদনে অগ্রসর হইতেছে। ধাররাজ্যের শিক্ষাবিভাগের পর্য্যবেক্ষক কাশীনাথ লেলে মহোদয় তাহার ক্রমিক বিবরণী প্রকাশে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। আমরা স্থানান্তরে সেগুলি সংক্ষেপে বিবৃত করিবার চেষ্টা করিব।

পালিত পুত্ররূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাতেও তাঁহার পিতৃব্যত্ব অক্ষুণ্ণই থাকিয়া যাইতেছে। ভোজের ৫৫ বৎসর ৭ মাস ৩ দিন ব্যাপী রাজত্বকাল সম্বন্ধে উভয় গ্রন্থেরই সম্পূর্ণ ঐকমত্য দেখা যায়। প্রবাদ আছে, কোন সন্ন্যাসীর প্ররোচনায় তাঁহার আত্মা এক শুকপক্ষীর মৃতদেহে পরিচালিত করিলে, তাহা সজীব হইয়া উঠে, এবং সেই সুযোগে সন্ন্যাসী স্বীয় আত্মা ভোজদেহে সংক্রমিত করিয়া, তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইয়া কিয়ৎকাল রাজ্যসুখভোগ করে। অতঃপর চন্দ্রাবতীর চন্দ্রসেন সাহায্যে ভোজের আত্মা তাঁহার শরীরে পুনঃ পরিচালিত হইলে, ভোজরাজ পুনরায় হৃতরাজ্যের অধিকারলাভে সমর্থ হন। সুপ্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌ রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহোদয় অনুমান করেন, ভোজ চালুক্যবংশীয় সোমেশ্বর নামক রাজা কর্ত্তৃক পরাজিত ও বিতাড়িত হইলে তাঁহার পরাজয় গ্লানি প্রচ্ছন্ন রাখিবার জন্যই সম্ভবতঃ এই অলৌকিক কাহিনীর উৎপত্তি হইয়া থাকিবে। সোমেশ্বরের রাজ্যকাল গণনায় ১০৪০—১০৪৯ খৃষ্টাব্দের মধ্যবর্ত্তী সময় নির্ণীত হইয়া থাকে, সুতরাং ইহারই মধ্যে কোন সময়ে ভোজ স্বীয় রাজ্য হইতে বহিস্কৃত ও হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া কিয়ৎকাল অতিবাহিত করিতে বাধ্য হইয়া থাকিবেন। ভোজের মৃত্যুর পর তদীয় দত্তকপুত্র গজানন্দ কর্ত্তৃক ধাররাজ্য হইতে প্রমার বংশের বিলোপ সাধিত হয়। কারণ গজানন্দের অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যুর পর তুয়ারবংশীয় চৈতন্যপাল নামক জনৈক ভূম্যধিকারী ও তাঁহার বংশধরগণ ২১৪ বৎসর যাবৎ রাজত্ব করেন,—এক শ্রেণীর পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণ এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। তাঁহারা ভোজরাজের ইতিবৃত্ত অনুসন্ধানে অতঃপর আর অগ্রসর হইতে চাহেন না। কিন্তু অপরাপর মনীষিগণের মত সমালোচনা ও উৎকীর্ণ লিপি প্রভৃতির পাঠোদ্ধার আলোচনা করিলে, উক্ত মত যে ঐতিহাসিক সত্যরূপে পরিগৃহীত হইতে পারে না, অতঃপর আমরা তাহাই দেখাইতে চেষ্টা করিব।

অধ্যাপক লাসেন বলেন, মুঞ্জ সিন্ধুলেরই ভ্রাতা। সিন্ধুল যে সময়ে দক্ষিণাপথ জয় করিতে যান, মুঞ্জ সেই সময়ে ধার রাজ্য অধিকার করেন। কথিত আছে, দাক্ষিণাত্য প্রয়াণের কিছুকাল পূর্ব্বে জ্যোতির্ব্বেত্তাগণ ভবিষ্য গণনা দ্বারা স্থির করেন, মুঞ্জ সিন্ধুলের রাজ্যগ্রহণ করিবেন। রাজগোচরে এ বৃত্তান্ত বিজ্ঞাপিত হইলে, ক্রোধান্ধ হইয়া সিন্ধুল ভ্রাতার শিরচ্ছেদের আজ্ঞা প্রদান করেন, কিন্তু পরক্ষণেই স্বীয় বিবেকহীনতা উপলব্ধি করিয়া ও ভ্রাতৃস্নেহে আর্দ্র হইয়া মুঞ্জের হস্তেই রাজ্যসংক্রান্ত সমস্ত ভার সমর্পণ করিয়া বিজয়াভিযানে প্রস্থান করেন। উল্লিখিত কিম্বদন্তীর সহিত জর্ম্মাণ অধ্যাপকের উক্তির কতকটা সামঞ্জস্য দেখা যায়। মুঞ্জের বংশধরগণের উৎকীর্ণ শিলালেখ্যাদি হইতে, তাঁহার বংশবল্লী যেন বহুপুরুষ পর্য্যন্ত রাজসিংহাসন অধিকার করিয়া ছিল বলিয়াই প্রতীতি জন্মে। সম্ভবতঃ তাঁহারা ধাররাজ্যের অংশবিশেষ প্রাপ্ত হইয়া, তাহাতেই দীর্ঘকাল যাবৎ আধিপত্য করিতে থাকেন। ভারতের লুপ্ত গৌরবোদ্ধারের পথপ্রদর্শক মহাত্মা টড্‌ হর্বৌতিস্থিত মধুকরঘর নামক স্থানে যে প্রস্তরানুশাসন আবিষ্কার করিয়াছেন, তদনুসারে ভোজের পর তদীয়

আত্মীয় ধারসিংহাসনে অধিরূঢ় হন এবং তদ্বংশীয়গণ কয়েক পুরুষ পর্য্যন্ত উক্ত সিংহাসন অলঙ্কৃত করিয়া থাকেন—এইরূপ অবগত হওয়া যায়। কিন্তু নাগপুরের সমীপবর্ত্তী বাণগঙ্গার পশ্চিম উপকূলে যে অনুশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার পাঠোদ্ধার প্রসঙ্গে অবগত হওয়া যায়, ভোজের পূর্ব্বপুরুষ প্রমার বংশীয় বৈরী সিংহের পর তদীয় পুত্র ভীমক এবং তৎপরে তাঁহার পুত্র রাজরাজ বা ভোজ রাজত্ব করেন। অনন্তর ভোজের পুত্র উদয়াদিত্য রাজপদে অভিষিক্ত হন। তদীয় পুত্র নরবর্ম্মদেবের শাসন সময়ে পূর্ব্বকথিত শিলালিপিটি উৎকীর্ণ হয়। অধ্যাপক লাসেনও সাতারার নিকট উক্ত মর্ম্মের আর একখানি তাম্রশাসন প্রাপ্ত হন। ইহাতে পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণ অনুমান করেন, উক্ত প্রস্তর ফলক ও তাম্রপত্র উভয়ই একই মন্দির সন্নিবিষ্ট ছিল, মহারাষ্ট্রীয়দিগের আক্রমণ সময়ে সম্ভবতঃ তাম্রফলক খানি মহারাষ্ট্রসেনাকর্ত্তৃক সাতারায় নীত হইয়া থাকিবে। এই তাম্রলিপির পাঠোদ্ধারে অবগত হওয়া যায়,—বৈরীসিংহের পুত্র সিয়কের দুই পুত্র—মুঞ্জ ও সিংহরাজ, এবং সিংহরাজের পর তদীয় পুত্র ভোজ রাজ্যাধিকারী হন। তাঁহার মৃত্যুর পর দেশে অরাজকতার আবির্ভাব হওয়ায় উদয়াদিত্য নামক তাঁহার একজন আত্মীয় সিংহাসনাধিকার পূর্ব্বক শান্তিসংস্থাপন করেন। কথিত আছে, তাঁহার পুত্র লক্ষ্মদেব বাহ্লিক হইতে গৌড় ও সিংহল হইতে হিমালয় পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তার করেন। কিন্তু কোলব্রুক পঠিত উজ্জয়িনীর ফলকলিপিতে লক্ষ্মদেবের কোনই উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। রাজস্থান পাঠে অবগত হওয়া যায়,—উদয়াদিত্য চৌহান বীর বিশালদেবের সমসাময়িক। ভট্টগ্রন্থের নির্দ্দেশ অনুসারে বিশালদেব ১০৬৬ হইতে ১১২০ সংবৎ পর্য্যন্ত আজমীরের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। মুসলমান দিগের আক্রমণ ও অত্যাচার হইতে ভারতবর্ষকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে তিনি যবনসেনার প্রতিযোগিতায় দণ্ডায়মান হইবার জন্য পার্শ্ববর্ত্তী রাজন্যবর্গকে সম্মিলিত করিয়া তাহাদিগকে বিতাড়িত করিবার চেষ্টা করেন। তাঁহার নেতৃত্বাধীনে সম্মিলিত রাজগণের মধ্যে ধারপতি উদয়াদিত্য প্রমারের নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কর্ণেল টড্‌ নানারূপ খোদিত লিপি হইতে উদয়াদিত্যের শাসনকাল ১১০০ হইতে ১১৫০ সংবৎ নির্ণয় করিয়া বলেন, সম্ভবতঃ উক্ত সময়ের মধ্যভাগেই বিশালদেবের পতাকাধীন হইয়া উদয়াদিত্য যবন বিরুদ্ধে অসি ধারণ করেন।

আমাদিগের বিবেচনায় উহা ১১০০ হইতে ১১২০ সংবতের কোন সময়েই সঙ্গত। কেহ কেহ সময় ও আনুসঙ্গিক অবস্থা পর্য্যালোচনা দ্বারা নির্ণয় করিয়াছেন, বিশালদেবের যুদ্ধায়োজন মহমুদ গজনবীর অধস্তন চতুর্থ পুরুষ মোদাদের বিরুদ্ধেই সজ্জীভূত হইয়াছিল। অনেকেই জানেন,—এবং ইহা একটি দুঃখজনক সত্য, যে ভারতে মুসলমান আক্রমণের ইতিহাস ভারতবাসীগণের অনৈক্য ও পরাজয়ের সুবিস্তৃত কলঙ্ককাহিনী মাত্র। কিন্তু মোদাদের ভারতাভিযানের বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত হইলে, এই যুদ্ধবর্ণনা হয়ত, ভারতবাসীর দুরপনেয় কলঙ্ককালিমা অন্ততঃ অংশতঃ

অপনোদন করিয়া, দিতে পারিবে বলিয়া আশা হয়।

উদয়াদিত্যের পর ক্রমান্বয়ে নরবর্ম্মদেব ও যশোবর্ম্মদেব, এবং দ্বিতীয়ের দুইপুত্র জয়বর্ম্মদেব ও লক্ষ্মীবর্ম্মদেব ধারসিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন,। কিন্তু মহামতি টড্ বলেন, যশোবর্ম্ম উদয়াদিত্যের পৌত্র এবং সমগ্র মালবের অধীশ্বর ছিলেন। ঝালরাপত্তন বা চন্দ্রাবতী প্রভৃতি মধ্য ভারতের অনেক স্থলে তাঁহার অনুশাসন প্রাপ্ত হওয়া যায়। সাতারা-তাম্রশাসনে লক্ষ্মদেব নরবর্ম্মদেবের ভ্রাতারূপে উল্লিখিত হইয়াছেন। ইহাতে ভারতগৌরব মিত্রমহোদয় অনুমান করেন,—উদয়াদিত্যের মালবের রাজ্যাধিকার নরবর্ম্ম প্রাপ্ত হন, এবং তাঁহার ভ্রাতা লক্ষ্মদেব অগ্রজের করদরূপে পৃথক্ স্থানের স্বতন্ত্র রাজ্যে আধিপত্য লাভ করেন। এরূপ স্থলে স্বর্গীয় মিত্রমহাশয়ের প্রদর্শিত পন্থানুসরণে উল্লিখিত আপাত প্রতীয়মান বিসংবাদী লিপিদ্বয়ের নিম্ন লিখিতরূপে সামঞ্জস্য বিধান করিতে পারা যায়।—মালবের প্রমাররাজবংশের পূর্ব্ব পুরুষ কৃষ্ণসিংহ, দ্বিতীয় বৈরীসিংহ, তৃতীয় সিয়ক বা সিন্ধুল এবং চতুর্থ বাকপতিরাজ বা অমোঘবর্ষ বা বলভেন্দ্র। শেষোক্ত নরপতি ১০৩১ সংবৎ (৯৭৪ খৃঃ অঃ) ও ১০৩৬ সংবতে (৯৮০ খৃঃ অঃ) উজ্জয়িনীতে ভূমি দান করেন। মুঞ্জ সম্ভবতঃ ইহাঁরই আদরের নাম এবং উজ্জয়িনী ইহাঁরই অধিকারভুক্ত ছিল। সিন্ধু বৈরীসিংহ বা সিংহরাজের নামান্তর বলা যাইতে পারে। সাতারা তাম্রশাসন পাঠে অবগত হওয়া যায়, লক্ষ্মদেব ১১৬১ সম্বতে (১১০৪ খৃঃ অঃ) জীবিত ছিলেন। তাঁহার ভ্রাতা নরবর্ম্মের পুত্র যশোবর্ম্ম ১১৯১ সংবতে (১১৩৫ খৃঃ অঃ) কার্ত্তিকমাসের শুক্লাষ্টমী তিথিতে পিতার সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধ উপলক্ষে যে গ্রামদ্বয় দান করেন, তাঁহার পুত্র, জয়বর্ম্ম ১২০০ সম্বতের (১১৪৪ খৃঃ অঃ) শ্রাবণমাসের পুর্ণিমা তিথিতে তাহা পুনরঙ্গীকার করেন। এই সাম্বৎরিক শ্রাদ্ধকে অধ্যাপক লাসেন প্রথম প্রেতশ্রাদ্ধ রূপে গ্রহণ করায় কাল নির্ব্বাচনে দশ বৎসরের গোল পড়িয়া গিয়াছে। কুমারপালচরিতে লিখিত আছে,—মুঞ্জ ১০৭৯ সংবতে (১০২২ খৃঃ অঃ) জীবিত ছিলেন। দ্বিতীয় উজ্জয়িনীলিপি পাঠে যশোবর্ম্মের পুত্র লক্ষ্মীবর্ম্ম ১২০০ সংবতে (১১৪৩ ৪ খৃঃ অঃ), এবং তৃতীয় পিপ্লিয়ানগর লিপি হইতে যশোবর্ম্মের প্রপৌত্র অর্জ্জুনবর্ম্ম ১২৭২ সংবতে (১২১৫ খৃঃ অঃ) জীবিত ছিলেন, অবগত হওয়া যায়। সিহোরার তাম্রশাসন পাঠেও অর্জ্জুন বর্ম্মের ঐরূপ সময়ই নির্ণীত হয়। এই অর্জ্জুন বর্ম্মদেবের সহিত গুর্জ্জর রাজ চালুক্য বংশীয় সিদ্ধরাজ জয়সিংহের যুদ্ধ হয় বলিয়া উল্লেখ আছে। ক্যাম্বেল মহোদয় বলেন, এই সিদ্ধরাজ বা সিদ্ধরায় আনহিলওয়ারা পত্তনে ১০৯৭ হইতে ১১৪৩ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। এই যুদ্ধপ্রসঙ্গ ধাররাজ্যে প্রাচীন ভোজশালার একখানি প্রস্তরফলকে খোদিত নাটকাংশ হইতে অবগত হওয়া যায়।*

* এই ফলকখানি ৫ ফুট ৮ ইঞ্চি দীর্ঘ এবং ৫ ফুট প্রশস্ত। তাহার খোদিত অংশ প্রাচীর গাত্রের সহিত গ্রথিত ছিল। ইহাতে রাজগুরু বালসরস্বতী-উপাধিধারী মদনরচিত পারিজাতমঞ্জরী বা জয়শ্রী নামক সংস্কৃত নাটকের প্রথম দুই অঙ্ক উৎকীর্ণ রহিয়াছে। ইহাতে অর্জ্জুন বর্ম্মের প্রশস্তি এইরূপ বর্ণিত আছে

কিন্তু তাহাতে বর্ণিত বিষয়ের কাব্যাংশ বাদ দিলে কতটুকু অংশ ঐতিহাসিক সত্যরূপে অবশিষ্ট থাকে, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। ধার রাজ্যের শিক্ষাবিভাগের পর্য্যবেক্ষক কাশীনাথ কৃষ্ণ লেলে মহোদয় অর্জ্জুন বর্ম্ম দেবের সময় ১২১০ হইতে ১২১৮ খৃষ্টাব্দ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। কিন্তু অনিহল পত্তনের সিদ্ধরাজ জয়সিংহের সময় তিনি ১০৯৭— ১১৪৩ খৃষ্টাব্দই স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। অথচ ইহার কোনরূপ সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করেন নাই। ইহাতে বোধ হয়, প্রস্তর খোদিত নাটকাংশ অর্জ্জুন বর্ম্মের সময়েই লিখিত হয়, অতএব তাঁহার স্তুতি প্রসঙ্গে পূর্ব্ববর্ত্তী কোন রাজার বিজয় মুকুট কবিকল্পনা দ্বারা তাঁহারই মস্তকে আরোপিত হইয়া থাকিবে। সুতরাং সিদ্ধরাজ জয়সিংহ অর্জ্জুন

—'ভোজদেবের বংশধুরন্ধর বীরাগ্রগণ্য মহারাজ অর্জ্জুনবর্ম্মদেবের গুজরাতরাজ জয়সিংহের সহিত যুদ্ধ উপস্থিত হয়। 'পর্ব্ব' পর্ব্বতের নিকট (সম্ভবতঃ পঞ্চমহলের অন্তর্ব্বর্ত্তী আধুনিক পাবাগড়) তাঁহাদিগের মধ্যে একটি ভীষণ খণ্ডযুদ্ধ হয়। প্রতিদ্বন্দ্বী সেনাদ্বয় ঝটিকানিক্ষিপ্ত সমুদ্রতরঙ্গের ন্যায় পরস্পরকে আক্রমণ করিল। শত্রুসেনা রণক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল। বিজয়ী বীররাজ বাণবর্ষণ রহিত করিয়া দিলেন, ইত্যাদি। এই ভোজশালার—আধুনিক কমল-উদ্দীন মসজিদ,—খিলানের অপর পার্শ্বের প্রাচীর-গাত্রে ঐরূপ আর একখানি প্রস্তরফলক আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহাতে প্রাকৃতভাষায় আর্য্যাছন্দে ভোজবিরচিত কূর্ম্মাবতারের স্তুতিমূলক একটি শ্লোক ও তাঁহার আশ্রিত কোন কবিবিরচিত অপর আর একটি শ্লোক খোদিত রহিয়াছে। এতদ্ব্যতীত মধ্যবর্ত্তী গুম্বজের যে দুইটি আশ্রয়স্তম্ভ দৃষ্ট হয়, তাহার একটিতে এক-সর্পবন্ধে সংস্কৃত বর্ণমালা ও 'সুপ্' বিভক্তি এবং দ্বিতীয়টিতে দ্বি-সর্পবন্ধে ধাতুপ্রত্যয়ঘটিত দুইটি শিক্ষাবিষয়ক সাংকেতিক লিপি (Table) উৎকীর্ণ রহিয়াছে। স্থানে স্থানে তাহার পাঠ নষ্ট হইয়া গিয়াছে সত্য, তথাপি লেলে মহোদয়ের যত্নে তাহার উদ্ধার সাধিত হইয়া সাধারণের গোচরীভূত হইয়াছে। ইহাতে স্পষ্ট প্রতীত হয়, এগুলি ভোজ-প্রতিষ্ঠিত পাঠশালার ছাত্রগণের শিক্ষাসৌকর্য্যার্থে খোদিত হইয়া বিদ্যালয়গৃহে রক্ষিত হইয়াছিল। এই ভোজশালা এক্ষণে একটি মুসলমান সমাধি ও প্রার্থনাগারে রূপান্তরিত। প্রাচীন আর্য্যকীর্ত্তির উপর, এই মসজিদটি মাণ্ডুর মহমুদ শাহ খিলজিকর্ত্তৃক ৮৬১ হিজরী অর্থাৎ ১৪৫৭ খ্রীষ্টাব্দের নিকটবর্ত্তী সময়ে মৌলানা কমল-উদ্দীনের সমাধিরক্ষার্থ নির্ম্মিত হইয়াছিল; কিন্তু ইহার প্রাচীন নাম, বিস্মৃতিগর্ভে বিলীন হওয়া দূরে থাকুক, আজও জনসাধারণে 'ভোজরাজা কী নিসাল' অর্থাৎ ভোজরাজের বিদ্যালয় এই অভিধানেই আত্মপরিচয় প্রদান করিতেছে। উল্লিখিত স্তম্ভদ্বয়ের দ্বিতীয়টিতে দুইটি শ্লোক উৎকীর্ণ রহিয়াছে। তাহার একটিতে উদয়াদিত্য নরবর্ম্ম উভয়ের এবং দ্বিতীয়টিতে কেবল উদয়াদিত্যের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে অনুমিত হয়, পূর্ব্ব প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের পুষ্টিসাধনে ইঁহারাও সাতিশয় মনোযোগী ছিলেন। গৌরবাস্পদ পূর্ব্বপুরুষের কীর্ত্তির সহিত স্ব স্ব নাম জড়িত করিয়া রাখিবার জন্য প্রথম শ্লোকটি নরবর্ম্মের সময়ে এবং দ্বিতীয়টি তাহারও অনেক পূর্ব্বে উদয়াদিত্যের সময়ে ভোজনশালার স্তম্ভগাত্রে খোদিত হইয়া থাকিবে। পাঠকগণের কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য যেরূপ অসংস্কৃত পাঠের সহিত শ্লোক দুইটি প্রকাশিত হইয়াছে, অবিকল সেই অবস্থাতেই নিম্নে উদ্ধৃত হইল। অধোরেখাঙ্কিত শব্দগুলির উপস্থিত আকারে কোনই অর্থ নির্দ্ধারণ করা যায় না।

একে যমুদয়াদিত্যনরবর্ম্মমহীভুজোঃ।
মহেশখাম্নিনো বর্ণ স্থিত্যৈ সিদ্ধাসি পুত্রিকা॥ ১

উদয়াদিত্যদেবস্ত বর্ণনাগকৃপাণিকা।
কবীনাঞ্চ নৃপানঞ্চ তোষায়োকসি রোপিতঃ॥ ২

বর্ম্মের সমসাময়িক না হইয়া, টডের নির্ণয় অনুসারে, তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষ উদয়াদিত্যের সময়েই জীবিত ছিলেন। মহামতি টড নানা লিপি হইতে, উদয়াদিত্যের সময় ১১৫০ সংবৎ (১০৯৪—৫ খৃঃ অঃ) পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত ছিল, এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন; কিন্তু এ সম্বন্ধে তাঁহাকে অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করিতে পারা যায় না। মিত্রমহোদয় নানা যুক্তি তর্কের অবতারণা দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন, ভোজরাজ ১০২৬ হইতে ১০৮৩ খ্রীঃ অঃ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। এদিকে বেণ্টলী মহোদয়ও সম্পূর্ণ স্বাধীন গবেষণার দ্বারা ১০৮২ খ্রীঃ অঃ ভোজের রাজ্যশাসন কাল নির্ণয় করিয়াছেন।

ভোজ যে ১০৩৫ খৃষ্টাব্দে রাজপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, একথা কর্ণেল টডও স্বীকার করেন। উদয়াদিত্যের রাজ্য শাসনকাল তাঁহার গণনানুসারে, ১০৯৭ পূর্ব্বে ধরিয়া লইলে, তাঁহার সহিত সিদ্ধরাজ জয়সিংহের সমসাময়িকতার বিষম বাধা উপস্থিত হয়। অথচ তিনি উভয়কে সমসাময়িক বলিয়া অনেকবার স্বীকার করিয়াছেন। এরূপ স্থলে উদয়াদিত্যের রাজ্যারম্ভকাল ১০৪৩ না হইয়া, ১০৮২ বা ১০৮৩ খৃষ্টাব্দ অর্থাৎ ১১৪০ সংবৎ হইলেই কোন অসামঞ্জস্য থাকে না। ক্রমশঃ—

বারাণসী প্রবাসী

শ্রীললিতমোহন মুখোপাধ্যায়।

মেয়েযজ্ঞির বিশৃঙ্খলা।

সে আজ বোধহয় ৩০ বৎসরের কথা যখন ভারতী নব উৎসাহে নূতন প্রকাশিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। আমি তখন ছেলেমানুষ—আমাকে পাঁচজনে বলিলেন প্রবন্ধ লেখ।

সর্ব্বনাশ—"বামন হইয়া চাঁদে হাত" দেওয়া যেমন অসম্ভব কথা, আমার প্রবন্ধ লেখাও ঠিক তেমনি অসম্ভব। আমি বলিলাম পারিব না—তাঁহারা দলে ভারি—বলিলেন, 'হাঁ পারিবে—পারিতেই হইবে, নিমন্ত্রণে যাও, যাহা দেখিয়া আসিয়া গল্প কর—তাহাই লিখিয়া দাও।' আমি বলিলাম 'তাহাতে কি হইবে সে ত প্রবন্ধ নয়। তাঁহারা একবাক্যে বলিলেন' সে সব তোমার ভাবিতে হবে না—আমরা তাই থেকে রচনা করিয় লইব। আমি দশ বৎসরের স্মৃতি একত্র করিয়া যাহা মনে পড়িল লিখিয়া দিলাম। কিছুদিন পরে দেখি আমার সেই কদর্য্য হস্তাক্ষর ভারতীর পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে ফুটিয়া উঠিয়াছে। কি ভয়ানক! ঘরে ঘরে একটা আন্দোলন, একটা আলোচনা পড়িয়া গেল—এ সব ঘরোয়া কথা কে লিখিল? ধরা পড়িলাম—লাঞ্ছনা যথেষ্ট ভোগ করিতে লাগিলাম। শ্বশুর ভাশুর প্রভৃতি গুরুজনেরা বলিলেন "অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্করী, কথামালা পড়ে আর কত বিদ্যা হবে—নইলে ঘরের কথা কাগজে ছাপায়—মনে করেছে বড্ড লেখাপড়া শিখেছে—ছিঃ ছিঃ!" একে ছেলেমানুষ—তাতে বউ—লাঞ্ছনা খাইয়া কাঁদিতে লাগিলাম।

এ লাঞ্ছনা গঞ্জনা আমাকে কিন্তু অনর্থক

বিনা অপরাধে ভোগ করিতে হইয়াছিল। আমি প্রবন্ধও লিখিতে যাইনাই—ইচ্ছা করিয়াও লিখি নাই—কাহারও বা কোন সমাজের দোষ গুণ বিচারের শক্তিও আমার ছিল না—আমি সে বিচার করিতেও বসি নাই। কিন্তু আমার বিচারকেরা আমার বক্তব্য শোনার অপেক্ষা বা আবশ্যক বিবেচনা না করিয়াই একতরফা মকদ্দমা ডিসমিস্ করিয়া দিলেন।

আজ স্বেচ্ছায় প্রবন্ধ লিখিব বলিয়া লিখিতে বসিয়াছি—মনের কথা যে গুছাইয়া লিখিতে পারিব তাহার ভরসা কম—অতএব পাঠক পাঠিকাদের নিকট আমার বিনীত নিবেদন এই যে, আমার কোন কথা অসঙ্গত বা অসংলগ্ন হইলে তাহাতে রুষ্ট না হইয়া যেন সঙ্গত কথাগুলির আলোচনা করেন। আজ আমাদের পিতা, স্বামী, পুত্র সকলেই যাহাতে দেশের উন্নতি হয় সেজন্য সাধ্যমত সচেষ্ট—আমাদেরও কর্ত্তব্য তাঁহাদের সহায়তা করা। কিন্তু কেমন করিয়া কি করিলে আমরা তাঁহাদের যোগ্যা গৃহলক্ষ্মী হইতে পারি তাহা চিন্তার বিষয়। নারীজাতির উন্নতি ব্যতীত সমাজের উন্নতির আশা বৃথা। নারীজাতির উন্নতিতে সমাজের উন্নতি হয়, কেননা সন্তান পালন করা মাতার কর্ত্তব্য কর্ম্ম। মা-ই ছেলেকে "মানুষ" করেন। তাই ছেলেকে মানুষ করিতে হইলে আগে মা'কে মানুষ তৈয়ার করিবার যোগ্যা করা দরকার। সেই জন্যই ত স্ত্রীশিক্ষার এত ব্যবস্থা হইয়াছে, এত বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এখন দেখিতে হইবে আমার জীবনে এই ৪৫ বৎসরে স্ত্রীশিক্ষা কতদূর অগ্রসর হইয়াছে। হাঁ পাড়ায় পাড়ায় পাঠশালা হইয়াছে—বর্ণপরিচয়ের জ্ঞানশূন্যা স্ত্রীলোক হাজারে একটীও মিলিবে না—কিন্তু বাস্তবিক বাঙ্গালী রমণীর উন্নতি কতটুকু হইয়াছে? অথবা উন্নতি হইয়াছে না অবনতি হইয়াছে? এক হিসাবে অবনতি হইয়াছে—সেকালের কিছুই নাই—অতএব মন্দের সহিত ভালটুকুও গিয়াছে। লেখাপড়ার সময় সেই ৫।৬ বৎসর বয়স হইতে ১০।১১ বৎসর পর্য্যন্তই সীমাবদ্ধ আছে—সেই কথামালা, বোধোদয় পড়াই শেষ পড়া। সেই ১৩।১৪ বৎসর বয়সে বালিকা মা হইয়া শিশুপালনের ভার গ্রহণ করে। সে যে তখনও নিজেই মানুষ হয় নাই—সে আবার অন্যকে মানুষ করিবে কি? সেকালে যদিও ৮।৯।১০ বৎসর বয়সেও বালিকারা বিবাহিত হইত কিন্তু ১৫।১৬ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে শ্বশুরালয়ে যাইয়া অধিক দিন বাস করিত না। একালে বিবাহ ১৩।১৪।১৫-তেও হয় কিন্তু ১২ হইতেই "বে হোল না, বে হোল না, কবে হবে, কবে হবে"—এই আলোচনা ছাড়া শিক্ষার কোন ব্যবস্থা দেখা যায় না। বিবাহ হোক্ বা না হোক্ স্কুল ১০।১১ বৎসরেই ছাড়ান হইয়া যায়। আর তাহাও বলি সাধারণ গৃহস্থ ঘরের মেয়েদের এ রকম স্কুলের লেখাপড়ায় অধিক শিক্ষা না হওয়ায় কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নাই—শিক্ষার প্রণালী পরিবর্ত্তিত না হইলে বাস্তবিক উন্নতি হইবে না—অতএব বড় কথা ছাড়িয়া যে কথা নিতান্ত আমাদের ঘরের কথা তাহাই লইয়া আলোচনা করি।

"মেয়েযজ্ঞি" বলিলেই বুঝায় বিশৃঙ্খলতার সমষ্টি—ইহা কি লজ্জার বিষয় নহে—ইহার কি প্রতিবিধান সহজে হইতে পারে না?

মেয়েযজ্ঞিতে আমাদের বাঙ্গালী রমণীর প্রকৃত পরিচয় পাইয়া থাকি। আমাদের সামাজিক ব্যবস্থার ভাল মন্দ বিচার করিয়া চলিতে পারি। অনেক বিশৃঙ্খলা সামাজিক নিয়মের জন্যও হয়—যেমন স্থান সংক্ষেপ হইলেও নিমন্ত্রণ করিতেই হইবে। "কাকে রেখে কাকে বাদ দেব" অতএব কুটুম্বিনী সকলেই আসিলেন—সন্তানদের কোথায় রাখিয়া আসিবেন—তাহারাও আসিল—সঙ্কীর্ণ স্থান—বালকবালিকা যুবতী প্রৌঢ়া বৃদ্ধা সকলে একত্রে নানাপ্রকার বিষয়ে আলোচনা চলিতেছে—বালকবালিকারা যে "মানুষ" তাহাদের অশ্রাব্য যে কিছু থাকিতে পারে সেখানে সে বিচার নাই, তাহাদের যে শরীর নামক পদার্থ আছে, ক্ষুধা আছে—নিদ্রা আছে, স্বাভাবিক নিয়মের ব্যতিক্রমে যে তাহাদের কষ্ট হয় একথা বিচার করা হয় না। শিশু ক্লেশে কাঁদিতেছে বালিকা মাতা নিরুপায়ে তাহাকে যথাসাধ্য পিটনচণ্ডী দিতেছে—এ দৃশ্য মেয়েযজ্ঞিতে প্রচুর। যদি বলি এত ছোট ছেলেপিলে এনেছ কেন—উত্তর—কার কাছে রেখে আস্‌বো। বাস্তবিক কে ভার লইবে? নিমন্ত্রণের একটা নির্দ্দিষ্ট দিন যেমন স্থির করা হয় তেমনি যদি একটা নির্দ্দিষ্ট সময় স্থির করিয়া দেওয়া হয়—যদি পুরুষ রমণীর যেমন পৃথক ব্যবস্থা আছে তেমনি ছেলেপিলের একটা পৃথক নির্দ্দিষ্ট সময় বা দিনের ব্যবস্থা হয় তবে শিশু নিমন্ত্রণ খাওয়ার হাত হতে কতক পরিমাণে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারে। অনেক মাতা শিহরিয়া উঠিবেন—"যে লেখিকা বলে কি—ছেলে ঘরে ফেলে আপনি খেতে যাব—মুখে কি খাবার উঠে"। তাঁহাদের নিকটে আমার নিবেদন যে নিমন্ত্রণ গৃহে শিশুরা যাবার সময় আগ্রহ সহকারে যায় বটে—কিন্তু সেখানে একটা বয়স্ক ব্যক্তির মত পোষাক আঁটিয়া গম্ভীরভাবে আহারের প্রত্যাশায় বসিয়া ধৈর্য্যরক্ষা কতক্ষণ করিতে পারে? তারপর ক্রমশঃ তাহার কর্ত্তব্য জ্ঞান দূরে যায়—জুতা হইতে ক্রমে ক্রমে মাথার টুপি পর্য্যন্ত পুঁটুলি-জাত হয় না কি? মাতা শিখাইয়া আনিয়াছেন "দুষ্টুমি কোরোনা বাবা ক্ষিদে ক্ষিদে কোরোনা"।—আসিয়াছেন বেলা একটা—বাজিল রাত ১২টা তখনও খেতে পায় না—ঘুমুতে পায় না—কর্ত্তব্যজ্ঞান কি থাকে? আমাদের ঘরকন্না এই রকম সকল বিষয়ে ঢিলা ঢালা রকমের, শিশুদের শিশুকাল হতেই কর্ত্তব্যজ্ঞান এজন্য মজ্জার সহিত মিশ্রিত হয় না। চলন বলন নড়নচড়নে যে একটা নিয়ম বা তাহার আবশ্যকতা আমরা আজও হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি নাই। সময়ের মূল্য যে কত তাহা বুঝিতে শিখি নাই। সময়ে নুন ভাত খাওয়াও ভাল অসময়ে পোলাও লুচিরও মর্য্যাদাহানি হয় তা আমরা বুঝি না। স্থানাভাব বিচার নাই—কুটুম্ব পরিচিত সকলেই নিমন্ত্রিত হইয়াছেন, আয়োজন প্রচুর হইয়াছে—কিন্তু দাঁড়াবার স্থান নাই—রান্না শেষ হইতে সন্ধ্যা হইল—কিছুতে দৃক্‌পাত নাই; "ও বৃহৎ ব্যাপারে অমন হয়ে থাকে।" এ ৪৫ বৎসরে এ বিষয়ের কিছুমাত্র বদল হয় নাই। এইখানে স্বীকার করিতেছি একটি কুপ্রথা দূর হইয়াছে—"সরা তোলা"টা একেবারে উঠিয়া গিয়াছে। আহার করিতে আসিয়াই মিষ্টান্নের পাত্রে

লুচিগুলি তুলিয়া পশ্চাতে রাখা—দু তিনখানা পাতা এক একজনে অধিকার করিয়া "ওখানা আমার সরর, ওখানা আমার বরর, এতে তরকারী দিয়ো না" (মনে মনে লুচি যত পার দাও) তা আর নাই। আমাদের কন্যারা এই প্রথা এদেশে ছিল বলিয়া বিশ্বাস করে না। একেত আমাদের জানা থাকে না—যে কত লোক নিমন্ত্রণে আসিবে—অনুমান লোক দুই শতও হইতে পারে তিন শতও হইতে পারে—কেমন হিসাব দেখুন—অতএব প্রচুর খাবার রাখিতে হয়—পাছে কম পড়ে। এর উপর যখন "তোলা" প্রথা ছিল—তখন গৃহস্থের কি কষ্ট ছিল তাহা সকলেই বুঝিতে পারিবেন। কিন্তু তা বলিয়া আজ কাল খরচ গৃহস্থের যে কম হয় তা কেহ যেন মনে না করেন। কারণ ঘরে লইয়া যাওয়া হয় না বটে কিন্তু নষ্ট হয় প্রচুর। সেকালে এত "রকম ফের" ছিল না—লুচির যজ্ঞি—লুচি কচুরি পাঁপর ভাজা আলুনি ছোকা পটল বা বেগুন ভাজা ক্ষীর দই মিষ্টান্ন (তাও মিষ্টান্ন মেয়েরা ঘরে লইয়া যাইতেন স্বামী পুত্র আছেন)—সুতরাং এত "ফেলা ফেলির ঘটা" ছিল না—মিতব্যয়িতা ছিল, লক্ষ্মীশ্রী ছিল। কাঙ্গালী ভোজন ছিল, উদ্বৃত্ত সামগ্রী তাহাতে খরচ হইত। এক শ্রাদ্ধ ব্যতীত আর ত এখন কাঙ্গালী ভোজন বড় একটা হয় না। তার পর বিশৃঙ্খলা ঘটিবার একটা বৃহৎ কারণ গাড়ী পাল্কি। সে কালের মত এখন আর কাহারও বাড়ী পাল্কি আসে না—নিমন্ত্রণ করিয়া গেলাম নিজেরাই যেয়ো। ইহাতে পূর্ব্বাপেক্ষা একটু সুবিধা হইয়াছে—এখন ফিরিয়া যাবার ব্যবস্থা ও সময় মত আহারের ব্যবস্থাটা হইলে অনেক অসুবিধা দূর হয়। নিমন্ত্রণের প্রধান উদ্দেশ্য এই যে মেলা মেশা—আলাপ পরিচয়। কিন্তু আমাদের এই বৃহৎ যজ্ঞিতে সে সুবিধা আদৌ হয় না।

নিমন্ত্রণ বাড়ীতে গিয়াই সকলে চান্, খাওয়াটা হলে হয় চলে যাই—খাওয়াও যে কতক্ষণে হবে তার ঠিক নেই। মুখ চেনাচিনি অথবা আর কে কি বস্ত্রালঙ্কার পরিয়া আসিয়াছে ইহা লক্ষ্য করা ব্যতীত আর কোন রকম আলাপ পরিচয় প্রায়ই হয় না। এখানে সাজসজ্জা সম্বন্ধে এই বলা যায়, মহিলাদের পরিচ্ছদের অনেকটা উন্নতি দেখিতে পাই। একবস্ত্রপরিহিতা বাঙ্গালী রমণী দেখা যায় না—বিধবারা তসর গরদ বা মোটা বস্ত্র ব্যবহার করেন। আর রেশমি বস্ত্র ছাড়িয়া সূতার বস্ত্র পরিধান করিয়া যে আহারে বসা হইত এখন আর সে জ্বালা নাই। ইহা হইতে এই অনুমান করা যায় যে, "সকরীর" বিচার মেয়েদের মধ্যেও ততদূর প্রবল নাই।

শিশু সন্তানকে মানুষের মত মানুষ করিয়া গড়িতে মাতাই পারেন। আমাদের দেশের একরত্তি মেয়েদের কোলে বড় বড় সন্তান দেখিলে ঠিক সেই "১২ হাত কাঁকুড়ের ১৩ হাত বীচি" কথাটি মনে পড়ে। বালক বালিকাকে, 'ছিঃ এটা করিতে নাই' 'ছিঃ ওটা করে না' ইত্যাদি ধীর ভাবে শিক্ষা দিতে বড় একটা দেখা যায় না। ছেলে যতদূর সাধ্য অন্যায় করিয়া যাইতেছে মাতা কিছুই বলে না, সকল রকম আবদার অন্যায় দৌরাত্ম্য সহ্য করিতেছে হঠাৎ এক সময়ে মেজাজ খারাপ আছে—তখন শিশু ন্যায়সঙ্গত কোন কিছু চাহিলেও

প্রহার খায়। ২।৪ ঘা প্রহার খাইয়া হাঁ করিয়া কাঁদিতে বসিল। অনেক পরে আবার মা আসিয়াই কোলে তুলিয়া যাহা চাহিয়া প্রহার খাইয়াছিল তাহা দিলেন। তবে সে শিশুর ভাল মন্দ জ্ঞান হওয়া কি কঠিন নহে? সকল ঘরেই কখনো না কখনো এমন ঘটনা ঘটেই—ইহা কি সাধ্যমত নিবারণের চেষ্টা করিলে কতকটা উন্নতির পথে অগ্রসর হওয়া যায় না? প্রথমে ছোট খাট বিষয়ে কর্ত্তব্যের অধীন হইতে শিখিলে তবে ত বালকেরা বড় হইয়া বৃহৎ কার্য্যে কর্ত্তব্যের মর্য্যাদা বুঝিবে। যত্নে মানুষ হইলে পরে ত সবাইকে প্রাণভরে যত্ন করিবে। পুত্র সন্তান যদি বা কিছু যত্ন পায়—হায় কন্যাদের কি অযত্ন! এক একটি মাতার সহিত ৪।৫টি কন্যা, ১টি হয়ত পুত্র। পুত্রটি আদরের ঢেঁকি—বাহানা লইয়াই আছে। কন্যাগণ তাহার দাসী—ছেলে খাইয়া ফেলে দিলে তারা খাবে। তাহাদের ম্লানমুখে সঙ্কোচের ভাব দেখিলে প্রাণ ফাটিয়া যায়। কন্যার প্রতি এত অনাদর কেন? বিবাহ ব্যয়ভার কি ভয়ানক সকলেই তাহা জানেন। —পুত্রকে পথে বসাইয়া সর্ব্বস্ব খোয়াইয়াও পিতামাতা যে কন্যার বিবাহ দেন—সেই কন্যাকে কি যত্ন পূর্ব্বক পালন করিতে পারেন না? পারেন—কিন্তু "মেয়ের মুখ দেখিলেই যে বুক শুখাইয়া উঠে" কাযেই আদর যত্ন আসে না। এই সকল অযত্নপালিত কন্যা কালে মাতা হইয়া কোন মতে ঘরকন্না চালাইয়া দেয়—অধিক আর কত করিবে।

আমি বলিয়াছি যে মেয়েদের অবনতি হইয়াছে—শুনিয়া অনেকে হাড়ে জ্বলিয়া যাবেন। "এত মেয়ে বছর বছর বিএ, এম এ, পাশ করিতেছে—আর তুমি কিনা বল অবনতি!" পূর্ব্বেই বলিয়াছি মেয়ে যজ্ঞিতে, একত্রে অনেককে দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাতে সমস্ত বাঙ্গালী রমণী সমাজের একটা পরিচয় পাওয়া যায়। পরিচ্ছদের কিছু উন্নতি হইয়াছে বটে কিন্তু জাঁক-জমকের দিকে যতটা দৃষ্টি পরিচ্ছন্নতার দিকে ততদূর নহে—সুরুচি-সঙ্গত বা শোভনীয় বা পরিপাটি নহে। ইহাতেও একটা ঢিলা ঢালা ভাব সর্ব্বত্র লক্ষিত হয়—বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিতা হইলে মহিলারা আর নড়িতে চড়িতে পারেন না—ইহা পূর্ব্বে যেমন ছিল এখনও ঠিক তেমনি আছে। ঘরে যাঁর যত অলঙ্কার আছে সমস্ত একত্রে পরিধান করাই নিয়ম—সে নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই। ইহাতে জড়ভরত ভাবটা পূর্ব্ববৎ।

আলাপ পরিচয় যতটা হয় তাহাও পূর্ব্ববৎ, কিন্তু আমার মনে হয় যে পূর্ব্বে যেমন অপরিচিতাদের মধ্যেও সরলভাবে পরিচয় করিয়া লওয়া হইত এখন তেমনও দেখা যায় না—এটা আমি অবনতি বলিয়াই মনে করি। মেলা মেশার সুবিধা ত আমাদের মধ্যে তেমন নাই—তাও যদি দেখা হইলেও পরিচয় না করি ত আর কেমন করিয়া হইবে। মেয়েরা একত্র হইয়াছেন, এক দল নাচওয়ালী নাচ গান করিতেছে—এ প্রথা পূর্ব্বে মোটে ছিল না—মধ্যে খুব প্রবল হয়—আজ কাল যেন একটু কমিয়াছে। আমার মনে হয় যে এ প্রথা যত শীঘ্র উঠিয়া যায় তত ভাল। সে নাচ গান যে কেহ মুগ্ধ হইয়া শুনিতেছেন বা দেখিতেছেন তাহা ত আমি কখনই দেখি নাই—তাহাতে কেবল নিজেদের মধ্যে আলাপ পরিচয়ের অবসরটুকুও হারাইতে হয়।

রন্ধনাদি ঘরের কাযে পূর্ব্বে যেমন মেয়েদের উৎসাহ ছিল এখন তাহা ততদূর নাই—বিশেষতঃ কলিকাতার মেয়েরা ত শুনিয়া অবাক্ হইবেন যে যজ্ঞিতে এখনও পল্লিগ্রামে স্ত্রীলোকেরা নিজেরাই রাঁধেন। ২০০।৫০০ জনের রান্না একজন বা দুইজনই রাঁধেন। যাঁরা রাঁধেন তাঁরা যতক্ষণ রাঁধেন ততক্ষণ অবশ্য পরিবেশনে যোগদান করেন না—কিন্তু সে বিশাল ডেকৃচি ও কড়া ধরিয়া যখন তাঁহারা ঝাঁকানি দেন তখন তাঁহাদের শারীরিক বল ও কার্য্যকুশলতা দেখিয়া আনন্দিত ও বিস্মিত হইতে হয়। ১০ বৎসরের বালিকা ২৫।৩০ জনের রান্না অনায়াসে রাঁধে—কেবল হয়ত ভাতের হাঁড়ীটা অন্যে নামাইয়া দেয়। কিন্তু রন্ধনাদি কার্য্যে পল্লী-মহিলারাও আর সন্তুষ্ট নহেন—অসন্তোষের গুঞ্জন বাঙ্গলার সর্ব্বত্রই গুন্ গুন্ করিতেছে শুনিতে পাই। এটা ত উন্নতির লক্ষণ নহে। ইহার ফল এই অল্প সময়ের মধ্যেই ফলিতে আরম্ভ করিয়াছে। আমাদের দিদিমা ও মা অনায়াসে অক্লেশে ঘরের সকল কায করিয়াছেন—আমার সময়ে দাস দাসীর চলন আরম্ভ হয়—তবে আমি কতক কতক কায কর্ম্ম করিতে পারি—কিন্তু আমাদের কন্যারা সকল কার্য্যেই অপটু—তাহারা দাস দাসী পরিবেষ্টিত হইয়া মানুষ হইয়াছে ও হইতেছে। কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যেই দাস দাসীর প্রচলন কমিয়া আসিয়াছে—আর সুলভে দাস দাসী পাওয়াও যায় না খরচেও কুলায় না। কাযের অভ্যাস-স্রোতে মাঝে একটা বাঁধ পড়িয়াছে—তাই ঘরের কায যে গৃহিণীদেরই একায়ত্ত সেটা তাঁরা প্রাণে প্রাণে অনুভব করেন না—ঘরের কায যেন কেবল দাস দাসীর কায—দাস দাসী রাখিতে না পারা যেন দুর্ভাগ্যের ফল এমনি ধারণা সকলেরই হইয়াছে।

শিশু চক্ষের সম্মুখে তিল তিল করিয়া পরিবর্ত্তিত হইলে সহসা বোঝা যায় না যে তাহার কতদূর পরিবর্ত্তন হইয়াছে। কিন্তু এক বৎসর পরে হঠাৎ দেখিলে যেমন একেবারেই বোঝা যায় যে তাহার ঘোরতর পরিবর্ত্তন হইয়াছে—আমি তেমনি অনেক দিন পরে মহিলাসমাজ দেখিয়া একেবারেই বুঝিয়াছি যে তাহার অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে—কিন্তু উন্নতি যে বিশেষ কিছু হইয়াছে তাহা মনে হয় না। বায়ু এলোমেলো ভাবে বহিতেছে মধুর দক্ষিণে বাতাসও নহে, হাড়ভাঙ্গা উত্তরে শীতল বাতাসও নহে।

সকল বিষয়েই ভাল মন্দ দুই আছে। ভাল হইতে মন্দটুকু চক্ষে পড়িলেই সকলে সেটা পরিহার করিতে চেষ্টা করেন—তাই আমি আজ মেয়েযজ্ঞির বিশৃঙ্খলার সহিত সকলের সম্মুখে বর্ত্তমান স্ত্রীসমাজের কিছু কিছু চিত্র নিবেদন করিলাম—যদি সুশিক্ষিতা ধনী মহিলারা এদিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করেন তবে তাঁহারা নিজেরাই অনেক অসুবিধা দূর করিতে পারেন—তাঁহাদের দৃষ্টান্তে যেমন ফল হইবে (ও কতক কতক হইতেছে) তেমন আর কিছুতে হইবে না। যেখানে কেবল সুশিক্ষিতা মহিলারা মিলিত হয়েন, সেখানে কোনই বিশৃঙ্খলা দেখা যায় না। কিন্তু সে কয়জন? তাহাতে আমি বঙ্গরমণী সমাজের উন্নতি হইয়াছে একথা বলিতে প্রস্তুত নহি।

বারান্তরে এ বিষয় আরও বিশদরূপে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

গঙ্গা-যমুনা।

সেবারে পশ্চিমে বেড়াইতে গিয়া যেখানে বাসা করিয়াছিলাম ঠিক তার সম্মুখে বাদশাহি আমলের একটা বাগিচা ছিল। প্রকাণ্ড বাগান ;—পাথরের প্রাচীরে চারিদিক ঘেরা, তারি মাঝে পাথরে গাঁথা গোল-গম্বুজ তিনটা কবর। বাগানের স্থানে স্থানে লাল পাথরে বাঁধান হৌজ তার মাঝে জলের ফোয়ারা; বড় বড় নিমগাছের তলায় শ্বেতপাথরের চাতাল। স্থানটা জনশূন্য এবং অযত্নে এখন নষ্টশ্রী। বাগিচার খবরদারি করিতে কোম্পানি বাহাদুরের নিযুক্ত একজনমাত্র বৃদ্ধ মালী ছিল এবং তাহারই যত্নে দুইচারিটা ফুলগাছ ও কতকটা সবুজ ঘাস সেই স্থানটাকে মনোরম এবং সকালে সন্ধ্যায় হাওয়া খাইয়া বেড়াইবার মত করিয়া রাখিয়াছিল।

আমার বাসার ত্রিসীমানায় আর জনমানব ছিল না। খবরের কাগজ এবং দুই একখানা চিঠি লেখা ছাড়া হাতে কাজও বড় একটা ছিল না, সুতরাং সেই বৃদ্ধ মালীর সঙ্গেই বন্ধুতা পাতাইলাম ও সিকি দুয়ানির লোভ দেখাইয়া তাহাকে আমার বাংলা ঘরের এক কোণ দখল করিতে রাজি করিলাম। সন্ধ্যাবেলা ঠিকা চাকর দুইজন কাজ শেষ করিয়া যখন আমায় একলা রাখিয়া চলিয়া যাইত তখন মালী আসিয়া গল্প জুড়িয়া দিত। আমি তাহার মুখে সিপাই বিদ্রোহ, কমিশনার সাহেবের বাঘ শিকার শুনিতে শুনিতে ঘুমাইয়া পড়িতাম। শীতকালের সন্ধ্যাটা তামাকের ধূম আর গল্পের পর গল্পে বেশ গরম থাকিত।

নিষ্কর্ম্মা মানুষের অনেক রকম বাতিক আসিয়া জোটে; আমারও তেমনি অনেক-গুলা ছোট-খাট বাতিক দেখা দিল তার মধ্যে লেখা বাতিকটা সর্ব্বপ্রধান। আমি প্রথম প্রথম ছোট গল্প এবং খণ্ড কবিতা লিখিয়া মাসিকপত্রে পাঠাইতে লাগিলাম। ছোট করিয়া লেখা যে সহজ নয় এ কাণ্ডজ্ঞান তখন আমার জন্মে নাই। যাই হোক নেশা ক্রমে জমিয়া উঠিল। ডিকিন্সনের দোকানে রীতিমত হিসাব খুলিয়া মাসিকপত্রের জন্য আর একটা উপন্যাস আরম্ভ করিয়া দিলাম। উপন্যাসটা যে সেই সাহি-বাগের কবর তিনটার চারিদিক বেড়িয়া বেড়িয়া গজাইয়া উঠিতেছিল তাহা আর বলিতে হইবে না। কলসের মধ্যে আরব্য উপন্যাসের দৈত্যের মত গল্পটা আমার তিনটি মাত্র পরিচ্ছেদের ভিতরে দিবারাত্রি খাটিয়া বেশ ফেনাইয়া তুলিতেছিলাম।

সেই সময় একদিন বাদলার পরে দারুণ শীত পড়িল,—ঘরে আর বসিয়া থাকিবার যো রহিল না। উপন্যাসটার একটা পরিশিষ্ট সেই সাহি বাগিচার কবরের উপরে বসিয়া লিখিব মনস্থ করিয়া খাতা হাতে বাহির হইলাম।

উত্তর পশ্চিম কোণ হইতে বরফের মত তীক্ষ্ণ হাওয়া বহিতেছিল। ঘাসের উপরে মেহদী গাছের বেড়ার গায়ে গায়ে শিশিরের জাল পড়িয়াছে। বেলা আটটা; তখনও সূর্য্যদেবের দর্শন নাই। বাগিচার সান্‌বাঁধা রাস্তায় চলিতে পা যেন হিম হইয়া গেল। আমি নিঃশব্দে গিয়া বাগিচার মধ্যে বড় কবরটায় আশ্রয় লইলাম। কবর-স্থানের দেওয়ালের একদিকে আনার-ফুলের জালি দিয়া বাহিরের আলোক আসিতে-

ছিল, আমি তাহারই কাছে বসিয়া লিখিতে লাগিলাম। দিবসের আহার সঙ্গে লইয়া ঠিকা চাকরদের ছুটি দিয়া আসিয়াছিলাম। সুতরাং বাসায় যে ফিরিতে হইবে তাহা মনেই ছিল না। লেখা শেষ করিয়া যখন উঠিয়া দাঁড়াইলাম তখন সমাধি-গৃহটা অন্ধকারে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে;—চারিদিকের দেওয়ালে নানা-বর্ণের প্রস্তরে লেখা বিচিত্র লতাপাতা, কার্ণিসের কোণে কোণে পাথরে খোদাই করা আল্লার স্তোত্র স্পষ্ট আর দেখা যায় না। জালির ভিতর দিয়া একটুখানি চন্দ্রালোক কবরের উপরে আসিয়া পড়িয়াছে—ঠিক যেন কে সেখানে বড় বড় রূপার ফুল ছড়াইয়া গিয়াছে।

আমি বাহির হইবার জন্য দ্বারের নিকট আসিয়া দেখিলাম দ্বার বন্ধ। মালী ঠিক নিয়মিত সময়ে বাহির হইতে শিকল টানিয়া চলিয়া গিয়াছে। শীতকালে জলে পড়িলে যেমন হয়, হিম অন্ধকারের ভিতরে প্রাণটা আমার তেমনই হাঁফাইয়া উঠিল। পকেট হইতে দেশালাই লইয়া একটা জ্বালাইলাম; এবং তাহারই ক্ষীণ আলোকে পথ চিনিয়া যেখানে বসিয়া লিখিতে ছিলাম সেইখানে আসিয়া বসিলাম। অন্ধকার কবরে চামচিকা বাদুড় এবং কে জানে আরো কাহাদের সহিত একা প্রাণী রাত কাটাইতে হইবে ভাবিয়া মন চঞ্চল হইয়া উঠিল।

আজ রাত্রিটা জাগিয়া কাটাইবার মতলব করিয়া একটার পর একটা সিগারেট ধরাইতে লাগিলাম। এ ভাবে কতক্ষণ কাটিয়াছিল বলিতে পারি না। হঠাৎ এক সময়ে একটা ঝন্‌ঝন্ শব্দে চমকিয়া জাগিয়া উঠিলাম। প্রথমটা কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না; ক্রমে সকল কথা মনে আসিল।

মালী খুব প্রাতে আসিয়া কবরের দরজা খুলিয়া দিত, আমি ভাবিলাম সেই বুঝি শিকল খুলিল। তাড়াতাড়ি উঠিবার চেষ্টা করিলাম কিন্তু পারিলাম না,—হাত পা যেন অবশ হইয়া গিয়াছিল। ঘোর অন্ধকারে কিছুই দেখিতে পাইতেছি না। পকেট হাতড়াইয়া দেশালাই বাহির করিলাম,আন্দাজে আন্দাজে একটা কাঠি ঘসিলাম,—খস্ করিয়া বাক্সের গায়ে শব্দ হইল কিন্তু আলোটা যেরূপ হইল তাহাতে আমি অবাক হইলাম;—দেশলাই কাঠিকে এরূপ ব্যবহার করিতে জন্মে দেখি নাই! কাঠিটার মাথায় অগ্নিশিখা নাই অথচ সমস্ত গৃহটা যেন দিনের মত স্পষ্ট দেখা যাইতে লাগিল।

আমি দেখিলাম চারিদিকে শ্বেত পাথরের দেওয়ালে লেখা বিচিত্র বর্ণের লতা, পাতা, ফুল, ফল, মণিমাণিক্যের মত ঝকমক করিতেছে। দিনের বেলায় কতদিন এই কবরের ভিতর বেড়াইয়া গিয়াছি কিন্তু এত কারুকার্য্য তো কোন দিন চোখে পড়ে নাই! দেওয়ালগুলা যেন আয়নার মত মসৃণ—কোথাও বিন্দুমাত্র মলা ছিল না। বোধ হইল যেন আজ প্রস্তুত করিয়াছে! এক মুহূর্ত্তে আমার চোখের সম্মুখে মোগল শিল্পের সমস্ত গৌরব উদ্‌ঘাটিত হইয়া গেল। সামান্য একটা দেশলাই কাঠি যে এরূপ কাণ্ড ঘটাইবে আমি আশা করি নাই। সোনার কাঠির স্পর্শে যেন একটা মায়া রাজ্যের দ্বার খুলিয়া গেছে মনে হইল। বাহিরে বাগিচায় গোলাপ ফুল ফুটিয়াছিল কিনা কে জানে, কিন্তু একটা মৃদু গোলাপী গন্ধ এবং

জলের ফোয়ারার একটা শীতল ঝর্ঝর সঙ্গীত স্পষ্ট অনুভব করিতে লাগিলাম। কেবলি মনে হইতে লাগিল এখনি আমার চোখের সম্মুখ হইতে অতীতের একখানা পর্দ্দা সরিয়া যাইবে! আমি একটা অনাবিষ্কৃত রহস্যের এক অঙ্ক পাঠ করিবার আশায় লোলুপ চিত্তে অপেক্ষা করিয়া রহিলাম। কতক্ষণ এরূপ অবস্থায় কাটাইয়াছিলাম বলিতে পারি না। হঠাৎ এক সময়ে সমস্ত আলোক নিভিয়া গিয়া চারিদিক অন্ধকার হইয়া একটা দারুণ শীত ও সঙ্গে সঙ্গে কম্প হাড়ে হাড়ে বিঁধিতে লাগিল আমি গায়ের লুইখানা টানিয়া মুড়ি দিলাম এবং যে অভিনয়টি দেখিবার আশা করিতেছিলাম তাহাতে নিরাশ-হইয়া নিদ্রার উদ্যোগ করিতে লাগিলাম। হঠাৎ আমার খাতা খানার কথা মনে পড়িল—সেটাকে উপাধান করিব বলিয়া। কিন্তু খাতা নাই! অন্ধকারে আশপাশ হাতড়াইয়া দেখিলাম খাতার চিহ্নমাত্র নাই! তখনই একটা দেশালাই জ্বালিয়া খাতার সন্ধানে উঠিলাম এবার দেশলাইটা আর পূর্ব্বের মত ব্যবহার করিল না—সহজ ভাবেই জ্বলিতে লাগিল।

আমি যেখানে বসিয়া ছিলাম তাহার এককোণে অনতি গভীর একটা শূন্য কবর ছিল, আমি সেই স্থানটায় ভাল করিয়া খুঁজিবার জন্য আলোক হাতে ঝুঁকিয়া পড়িলাম। সহসা সেই সময়ে কে যেন পশ্চাৎ হইতে আসিয়া আমাকে স্পর্শ করিল এবং চমৎকার উর্দ্দুতে বলিয়া উঠিল—বাবুজী এই যে তোমার কেতাব! আমার শিরায় শিরায় বিদ্যুৎ ছুটিয়া গেল! চীৎকার করিবার শক্তি ছিল না—কণ্ঠরোধ হইয়া গিয়াছিল। মন্ত্রচালিতের মত

আমি ফিরিয়া দাঁড়াইলাম। মাথার ভিতরটা ঝাঁঝাঁ করিতেছিল, চোখে ভাল দেখিতে পাইতেছিলাম না। সম্মুখে দেখিলাম অস্পষ্ট ছায়ার মত মোগলাই পাগড়ি এবং জামাজোড়া পরণে এক পুরুষমূর্ত্তি! সে ধরণের কাপড় এবং শিরস্ত্রাণ এখন চলিত নাই কিন্তু তবু লোকটি যেন চেনাচেনা বোধ হইল। তাহার শ্মশ্রুহীন মুখে এমন একটা কমনীয়তা ও রাজভাব বিদ্যমান ছিল যে, তাহাকে দেখিয়াই আমি বুঝিলাম, ইনি কোন বড় লোক হইবেন।

পশ্চিমে অনেক দিন থাকিয়া আমার মুসলমানি আদব কায়দা ও উর্দ্দুভাষাটায় বিলক্ষণ দখল জন্মিয়াছিল। আমি লোকটিকে রীতিমত সেলাম ও সম্ভাষণ করিয়া খাতাখানির জন্য হাত বাড়াইলাম।

লোকটি একটু হাসিয়া বলিলেন—খাতাতে কি লিখিয়াছেন পড়িয়া শুনাইতে আপত্তি আছে কি?

রাত্রি এখনো অনেক আছে—খাতা শুনাইতে আমার আপত্তি দূরে থাক্ শুনাইবার লোক পাইলে বাঁচি, তবু ভদ্রতার খাতিরে বলিলাম—যদি আপনার বিরক্তি না হয়—।

'তবে আসুন' বলিয়া লোকটি আমাকে লইয়া সেই সমাধি গৃহের পূর্ব্বদিকের এক অংশে প্রকাণ্ড এক খানা শ্বেত পাথরের চৌকির উপরে গিয়া বসিলেন। ধরিয়া ধরিয়া লেখা শুনাইয়া অনেক মানব আত্মাকে আমি নির্ভয়ে যন্ত্রণা দিয়াছি, এবার প্রেতাত্মার সঙ্গে আলাপটা এই সূত্রে কিরূপ জমিবে সেটি একটা ভাবনার বিষয়। যাহা হউক গল্প সুরু করিয়া দিলাম এবং যত শীঘ্র পারা যায় তিনটা পরিচ্ছেদ শেষ

করিলাম। গল্পের পরিশিষ্টটাও শুনাইয়া দিবার ইচ্ছা ছিল কিন্তু শ্রোতার মুখে উৎসাহের লক্ষণ বড় একটা দেখা গেল না, সুতরাং খাতা বন্ধ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—গল্পটা আপনার কেমন লাগিল? উত্তর হইল—মন্দ নয়। কিন্তু সাহিবাগের ইতিহাসটা আপনি যেরূপ দিয়াছেন সত্য ইতিহাসটা তাহা অপেক্ষা আরও হৃদয়-বিদারক এবং আমিই সেই বিয়োগান্ত নাটকের প্রধান অভিনেতা ছিলাম। তবে বলি শুনুন ঃ—

"দিল্লীর রাজ-তক্তের ঠিক নীচেই আমার আসন ছিল। হিন্দুস্থানের বাদশাহি একদিন আমাকেই করিতে হইবে এ কল্পনাও সময়ে সময়ে করিতাম। বাদশাহি প্রথামত এক হিন্দু রাজকুমারীর সহিত আমার প্রথমে বিবাহ হয়। আমি ২১ বৎসরে ছয়-হাজারি শাসন কর্ত্তার পদ ও হিন্দুবেগমকে লইয়া বাঙ্গালা দেশে গেলাম। সেইখানে আমাদের নব অনুরাগের মাঝখানে গোপন বিচ্ছেদের প্রথম সঞ্চার। যে মোগলকুমারী আমাদের দুই হৃদয়ের মাঝে আসিয়া দাঁড়াইল, তাহার রূপের সীমা ছিল না, আর যে রাজসুতাকে আমি আল্লার নাম লইয়া বরণ করিয়াছিলাম, তাঁহার গুণের স্মৃতি প্রেতলোক হইতে আজিও আমায় আকর্ষণ করিয়া আনে। বাঙ্গালাদেশে আসিয়া কেবল যে রাজ্য শাসনে ব্যস্ত নই একথা কে জানে কেমন করিয়া দিল্লীতে পৌঁছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে এই দরিয়া-গঞ্জ ও তৎসন্নিহিত ভূখণ্ডের শাসনভার অনতিবিলম্বে লইবার জন্য জরুরী পরোয়ানা আমার নিকট পৌঁছিল। আমি বাধ্য হইয়া বাঙ্গালা দেশের বসন্তলীলা অসময়ে এবং অতি অশোভনরূপে অসমাপ্ত রাখিয়া সপরিবারে এই নিমগাছের দেশে চলিয়া আসিলাম। মনটা আমার যে নিমের মতনই তিক্ত হইয়া গিয়াছিল সেটা অধীনস্থ সকলে কিছু দিন ধরিয়া বেশ অনুভব করিতে থাকিল। ভাবিয়াছিলাম শাসনকার্য্যে আমার অতি-মনোযোগ, শীঘ্রই দিল্লী দরবারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে এবং অচিরে পুনরায় আমাকে বাঙ্গালাদেশে নির্ব্বাসনে যাইতে হইবে। কিন্তু যেরূপটা চাহিয়াছিলাম সেরূপটা ঘটিল না। স্থান বদলের তাগিদ না আসিয়া উল্টিয়া বরং দরিয়াগঞ্জে নৌ-সেতুটা ভাল করিয়া বাঁধিয়া গঙ্গা যমুনার সঙ্গম স্থলে প্রাচীন কেল্লাটাকে সুদৃঢ় ও নিজের বাসোপযোগী করিয়া লইবার জন্য তিন গাড়ি মোহর আসিয়া হাজির হইল। আমি বেশ বুঝিলাম দিল্লী হইতে আমার জন্য সোনার শৃঙ্খল আসিল এবং আমার নিজের কারাগার নিজেই প্রস্তুত করিয়া লইতে হইবে। বাঙ্গালা-দেশ ছাড়া দুর্দ্দমনীয় সাহাজাদাদিগের জন্য অন্য স্থানও ছিল, সেটা আমি বেশ জানিতাম। সুতরাং সেই তিন গাড়ি মোহরের জন্য দিল্লীতে একটা বিশেষ রকম ধন্যবাদ প্রেরণ করিয়া যতটা সম্ভব প্রফুল্লচিত্তে কাজে লাগিয়া গেলাম। হিন্দুবেগমের অনুরোধে যমুনা তীরে একটা হিন্দুর দেবমন্দির ঘিরিয়া আমি কেল্লা ও আমার মণিমাণিক্যে বিচিত্র অপূর্ব্ব প্রাসাদ গাঁথিয়া তুলিলাম। সেখানে সেই গঙ্গাযমুনার চির মিলনের তীরে আমার বিবাহিত জীবনের দ্বিতীয় অঙ্কটা আরম্ভ করিলাম এবং সেটা যে চোখের জলে চিরবিরহের করুণ ক্রন্দনের মাঝখানে শেষ করিয়া ছিলাম তার সাক্ষী

এই কবর তিনটি। তার পর আমি ওই দক্ষিণ দিকের কবরটায় আমার হিন্দু বেগমকে বামদিকের ছোট গম্বুজটার নীচে আমাদের চারি বৎসরের স্নেহের ধনকে ফেলিয়া রাখিয়া দিল্লীর রাজতক্তে গিয়া বসিলাম। সেখানে ঐশ্বর্য্যের নেশা, রূপের লালসা কোনটাই অতৃপ্ত রহিল না। যাহার জন্য বাঙ্গালা দেশে নির্ব্বাসনকামনা করিয়াছিলাম; সেই মোগল-কন্যাকে একদিন সুতীক্ষ্ণ ছুরির বিদ্যুদ্দাম করাল রুধির বর্ষার অভিসার রজনীতে হিন্দুস্থানের অধিশ্বরীরূপে বাদশাহি তক্তে আমার পাশে আনিয়া বসাইলাম। তার পরে অভাবনীয় ভোগ এবং পিতৃদ্রোহী ভ্রাতৃহন্তা, সন্তানগণের হাতে মর্ম্মান্তিক শোক ও যন্ত্রণার মাঝে জীবনের আমার তৃতীয় অঙ্কটা হঠাৎ একদিন শেষ করিলাম। এই যে মাঝের কবরটা দেখিতেছ এটা আমি নিজের জন্য প্রস্তুত করিয়াছিলাম। কিন্তু কে জানে, কেন তাহারা আমাকে এখানে আনিল না! লাহোরের আনারবাগে আমায় নিয়া সেই রূপবতী মোগলকুমারীর পাশে রাখিয়াছে, আর আমার প্রেতাত্মা এই সাহিবাগের শূন্য কবরটায় স্থানলাভ করিবার জন্য ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। গঙ্গাযমুনার চিরমিলনের মাঝে যেমন রেখা মাত্র ব্যবধান কিছুতে মুছিবার নয়, তেমনি মোগল সম্রাট আমি আর আমার হিন্দুবেগম যমুনার দুই জনের মাঝে শূন্য কবরের বিচ্ছেদ চিরদিন অপূর্ণ রহিয়া গেছে! ওই ঘোড়া আসিয়াছে, আমি তবে চলিলাম আপনি বিশ্রাম করুন।"

আমি কি একটা বলিতে যাইতেছিলাম, হঠাৎ বিজাতীয় ভাষায় Well, good morning শুনিয়া চমকিয়া দেখিলাম ঘোড়ায় চড়িবার সাজ পরিয়া দারাগঞ্জের ডাক্তার সাহেব। ইনি মাঝে মাঝে সকালবেলা অশ্বারোহণে সাহি-বাগিচায় বেড়াইতে আসিতেন।

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

শেষ।

জীবন নাট্যের শেষ ভব রঙ্গভূমে
যবনিকা পড়ে গেল ধীরে;
কি মধুর শান্ত হাসি ফুটে উঠেছিল, দুটি
ম্লান পাণ্ডু অধরের তীরে।
ধীরে ধীরে অতিধীরে স্তব্ধ হোল হৃদি যন্ত্র
স্থির হোল শ্লথ দেহ লতা!
প্রশান্ত শান্তির মাঝে স্থিরভাবে মুদে এলো
মোহাচ্ছন্ন দুটি আঁখিপাতা!

জীবনের সুখ দুঃখ বাসনার বিফলতা—
আকুলতা ভালবাসা বাসি,
স্নেহভক্তি প্রেম স্বার্থ ফুরাইয়া গেল সব
জগতের হাসি কান্না রাশি!
প্রকৃতি ঝটিকা অন্তে স্তব্ধভাবে চেয়ে আছে—
অসংযত ম্লানচ্ছিন্নবেশ!
একি মোহ! এ্কি সুপ্তি! সুখ দুঃখ হরা শান্তি
ইহলোকে এরি নাম শেষ!

শ্রীইন্দিরা দেবী।

আকবর ও আগ্রা।

মিষ্টার এম্, এ, উইলিয়মসন্ নামে একজন ইংরাজ আকবর সম্বন্ধে একটি ইতিহাস প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা তাহারই সারসংগ্রহ করিয়া নিম্নে প্রকাশ করিলাম।

আকবরের রাজত্বের পূর্ব্বে আগ্রা একটি নগণ্য স্থান ছিল মাত্র। তাহার পূর্ব্বে ইহার নাম স্থানীয় অধিবাসীগণ ভিন্ন অপর কেহ জানিত না। পূর্ব্বে ইহা বিয়ানার অধীন একটি গ্রাম ছিল। পরে সিকন্দর লোদী এই স্থানে তাঁহার রাজধানী স্থাপিত করেন। কিন্তু এই পুরাতন আগ্রা নগর যমুনা নদীর বাম তীরে অধিষ্ঠিত ছিল। আধুনিক আগ্রা নগর আকবরের সময়ে যমুনার দক্ষিণ তীরে ইষ্টকনির্ম্মিত গৃহপূর্ণ একটি ক্ষুদ্র নগরী ছিল মাত্র। কিন্তু আকবরের সিংহাসন লাভের কিছুদিন পরেই কাসিম খাঁ নামে একজন বিচক্ষণ রাজকর্ম্মচারী এই স্থানে সুবৃহৎ সৌধমালা গঠিত করিয়া স্থানটিকে সুশোভন করিয়া তুলেন। রাজ্যভার গ্রহণ করার অব্যবহিত পরেই আকবর আগ্রায় এক বিরাট ও অজেয় দুর্গ নির্ম্মাণ করান। সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে বিদ্রোহীগণ যখন চতুর্দ্দিকে রক্ত পিপাসায় উন্মত্ত হইয়া ছুটিতেছিল, তখন বহুসংখ্যক ইংরাজ এই দুর্গ মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন। আকবরের পরবর্ত্তী সম্রাটগণ ভুবনখ্যাত মর্ম্মর স্বপ্ন তাজ মহল ও অন্যান্য সৌধমালা দ্বারা আগ্রার শোভা ও গৌরব বর্দ্ধিত করিয়াছেন। আগ্রার সহিত তাঁহার পিতামহ বাবরের স্মৃতি জড়িত ছিল বলিয়াই বোধ হয় এই স্থানটি আকবরের এত বিশেষ প্রিয় হইয়াছিল। কালে মুসলমান শক্তির হ্রাসের সহিত আগ্রা ও তৎচতুর্দ্দিকস্থ প্রদেশ মহারাষ্ট্রদিগের হস্তগত হয়। পরে ১৮০৩ সালে লর্ড লেক্ ইহা জয় করিয়া ইংরাজ রাজ্যভুক্ত করেন।

আকবর ও আগ্রা সম্বন্ধে যাহা কিছু পুরাতন নিদর্শন বা ইতিহাস ছিল তাহার অধিকাংশই সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ইহাতে যে আমাদের কতদূর ক্ষতি হইয়াছে তাহা বলা যায় না। আকবরই প্রকৃত পক্ষে ভারতে মোগল সম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাপক এবং মহত্বে ও বিজ্ঞতায় ভারতের যাবতীয় সম্রাটদিগের শীর্ষস্থানীয়। আকবর ফরাসীদেশের রাজা চতুর্থ হেনরি ও ইংলণ্ডের রাণী এলিজাবেথের সমসাময়িক। যিনি অপক্ষপাত ভাবে ইতিহাস আলোচনা করিয়া দেখিবেন তিনি ইহাদিগের তিন জনের মধ্যে আকবরকেই সর্ব্বোচ্চ স্থান প্রদান করিবেন। দুর্ভাগ্যের বিষয় আকবর সম্বন্ধে বিশ্বাসযোগ্য ইতিহাস আমরা প্রায় সবই হারাইয়াছি।

১৫৪২ সালে আকবরের জন্ম হয়। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর কাল তিনি রাজত্ব করেন। তাঁহার পিতা হুমায়ুন দশ বৎসর কাল আফগানদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া পরাজিত ও তাড়িত হইয়া সিন্ধুদেশের মরুভূমির মধ্য দিয়া পারস্যদেশে পলায়ন করিতেছিলেন। পথে তাঁহার পতিপ্রাণা মহিষীর প্রসববেদনা উপস্থিত হওয়ায় তিনি অমরকোটের ক্ষুদ্র দুর্গমধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই স্থানে আকবর ভূমিষ্ঠ হন। এই দুঃসময়ে অতি অল্প লোকই তাঁহার সঙ্গী হইতে সাহসী হইয়াছিল। তিনি ও তাঁহার প্রিয়তমা পত্নী অর্থহীন বন্ধুহীন ভাবে সেই ভীষণ মরুভূমির তপ্ত বালুকার মধ্যে ভ্রমণ করিতে ছিলেন। বনের পশুরও একটু আশ্রয় স্থল থাকে, ইঁহাদিগকে বিধাতা সেটুকু হইতেও বঞ্চিত করিয়া ছিলেন। আকবরের জন্মকালে তাঁহার নিকটে যে কয়টি সহচর উপস্থিত ছিল, তাহাদের পুরস্কৃত করিবার সামর্থ্য পর্য্যন্ত তাঁহার ছিল না। সম্পত্তির মধ্যে কেবল একটি মৃগনাভি মাত্র তাঁহার সম্বল,—তিনি তরবারি দ্বারা সেইটি খণ্ড খণ্ড করিয়া অনুচরবর্গের মধ্যে বিতরণ করিয়া বলিলেন—"ঈশ্বর করুন যেন এই মৃগনাভির ন্যায় আকবরের গুণগৌরব চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হয়।"

হতভাগ্য হুমায়ুনের অবশিষ্ট জীবনের আলোচনা

করা এস্থলে অনাবশ্যক। বহু দুর্দ্দশার পর তিনি পুনরায় দিল্লী অধিকার করেন। কিন্তু অচিরেই তাঁহার সংসারের খেলা শেষ হইল। ১৫৫৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার পুত্র আকবর চতুর্দ্দশ বৎসর মাত্র বয়সে পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করেন। সেনাপতি বায়রাম খাঁ তাঁহার বাল্যশিক্ষক ছিলেন। তিনিই এক্ষণে তাঁহার রক্ষক স্বরূপ হইয়া রাজকার্য্য পরিচালিত করেন। আকবরের রাজ্যাভিষেকের পরেই আফগানগণ বিদ্রোহী হইয়া উঠে। আকবর পানিপতের দ্বিতীয় যুদ্ধে বিদ্রোহীগণকে পরাজিত করিয়া তাহাদিগের শক্তি চূর্ণ করিলেন বটে কিন্তু ইহাতেও রাজ্যে শান্তি স্থাপিত হইল না। অব্যবহিত পরেই রাজ্য মধ্যে ভীষণ সমরবহ্নি জ্বলিয়া উঠিয়া দিল্লী ও আগ্রা তাঁহার হস্তচ্যুত হইল এবং তাঁহার সাম্রাজ্য বলিতে পঞ্চনদের কিয়দংশ মাত্র অবশিষ্ট রহিল। এই বিপদের সময়ে একমাত্র বায়রমের বিচক্ষণ বুদ্ধি ও অমিত সাহসের বলেই আকবর তাঁহার রাজ্যোদ্ধারে সমর্থ হন। অষ্টাদশ বর্ষ বয়ক্রমে উপনীত হইলে আকবর স্বয়ং রাজ্যভার গ্রহণ করেন। বায়রম ক্রুদ্ধ হইয়া উঠেন। আকবর তাঁহাকে পরাজিত করিয়া ক্ষমা করেন ও তাঁহার পদোচিত রাজবৃত্তি দান করেন। আকবরের অসাধারণ উন্নতি যে কেবল তাঁহার নিজের গুণে হইয়াছিল, তাহা নহে। তিনি যে মন্ত্রণাদাতা সচিবমণ্ডলি নির্ব্বাচিত করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই তাঁহার এ কঠিন কর্ম্মে প্রধান সহায় ছিলেন। আবুল ফজেল্ তাঁহার অর্থসচিব ও ধর্ম্মোপদেষ্টা ছিলেন, তীক্ষবুদ্ধি টোডর মল্ল তাঁহার রাজস্বসচিব ছিলেন, সংস্কৃত ও আরবী ভাষায় সুপণ্ডিত ফৈজী তাঁহার পরামর্শদাতা ছিলেন। শ্রেষ্ঠ হিন্দু রাজবংশের কন্যাগণের পাণিগ্রহণ, সকল ধর্ম্মের প্রতি সমানুই শ্রদ্ধা প্রদর্শন ও অপক্ষপাত শাসনের দ্বারা তিনি হিন্দুদিগকে করায়ত্ত করেন এবং তাঁহার জীবিত কালের মধ্যেই তাঁহার সাম্রাজ্য আফগানিস্থান হইতে প্রায় সমগ্র ভারতব্যাপী হইয়া উঠে। শুনা যায় পঁচাত্তর ক্রোড় টাকা তাঁহার বাৎসরিক রাজস্ব ছিল।

তাঁহার শেষ বয়সে তিনি মুসলমান ধর্ম্মের বিরুদ্ধে এক বিধি প্রবর্ত্তিত করেন যে পত্নী বন্ধ্যা ব্যতীত কেহ দ্বিতীয় পত্নীগ্রহণ করিতে পারিবে না—এক ঈশ্বর ও এক পত্নীই সাধারণ বিধি। মেরি বা মেরিয়ম নামে এক আরমানী খৃষ্টান ললনা তাঁহার এক প্রিয় বেগম ছিলেন। তাঁহার পুত্র মুরাদ সম্ভবতঃ খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। মেরির ভগিনী জুলিয়ানা সুন্দরী আকবরের অন্তঃপুরে চিকিৎসকের কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন। আকবর ন্যাভারের রাজকুমার জন্ ফিলিপ বৌর্‌বনের সহিত (Prince John Philip Bourbon of Navarre) ইঁহার বিবাহ দেন। রাজকুমার ফিলিপ ফরাসী দেশের রাজা চতুর্থ হেনরির ভ্রাতষ্পুত্র ছিলেন। জনপ্রবাদ হইতে জানা যায় যে রাজকুমার দ্বন্দ্বযুদ্ধে এক উচ্চপদস্থ আত্মীয়কে হত্যা করার অপরাধে ফরাসীদেশ ত্যাগ করিতে বাধ্য হন এবং আকবরের যশের কথা শুনিয়া ভারতে আগমন করেন। আকবর তাঁহার পদমর্য্যাদা ও বীরত্ব কাহিনী শুনিয়া তাঁহাকে নবাব উপাধি দান করিয়া আপন শ্যালিকার সহিত বিবাহ দিয়া রাজপুরীর তত্ত্বাবধারকের পদে নিযুক্ত করেন। ১৭৩৭ খ্রীষ্টাব্দে নাদির শাহ দিল্লী আক্রমণ করা পর্য্যন্ত রাজকুমার বৌর্‌বনের বংশধরগণ এই পদে নিযুক্ত ছিলেন। ভুপাল রাজ্যে এখনও তাঁহার অনেকগুলি বংশধর ভুপাল বেগমের অধীনে নানা প্রকার রাজকর্ম্মে নিযুক্ত আছেন। এই ঘটনা দ্বারা আমরা দেখিতে পাই যে এক সময়ে ইয়ুরোপের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বীর, পরাক্রমশালী ও গর্ব্বিত রাজবংশধর প্রাচ্যদেশের নারীর পাণিগ্রহণ করিতে কুণ্ঠা বা অপমান বোধ করেন নাই। কিন্তু হায়! এক্ষণে আসিয়াবাসিগণের প্রতি তাঁহাদের কি ভাবান্তরই ঘটিয়াছে!

রোমান্‌গণ যখন ব্রিটেন প্রথম অধিকার করেন তখন এক উচ্চপদস্থ রোমক যুবা একটি ব্রিটিশ রাজকুমারীর রূপে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে বিবাহ করেন। এই সংবাদ যখন তাহার পরিবার মধ্যে প্রকাশিত হইল, তাঁহার জননী হাত কচ্‌লাইয়া, চুল ছিঁড়িয়া ক্রোধে ও ঘৃণায় বলিয়া উঠিলেন—"আমার মহিমান্বিত

পুত্র ব্রিটেনের একটা কদর্য্য মেয়েকে বিবাহ করিল।" তাহার পিতা ব্রিটিশ রাজকুমারীকে বিবাহ করার জন্য তাহাকে ত্যাজ্যপুত্র করিলেন। অবস্থাভেদে সংসারে এতই ব্যবহারভেদ। মানুষের মনে এই তত্ত্বটুকু বেশ ভাবিয়া দেখিবার বিষয়।

বোগ্‌দাদের হারুণ-অল্‌-রসিদের ন্যায় আকবর তাঁহার রাজদরবারে ভাঁড় বা চতুর রহস্যপ্রিয় অনুচরে পরিবৃত থাকিতে ভাল বাসিতেন। তাঁহার দরবার মধ্যে মোল্লা দোপিয়াযাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুরসিক ছিলেন। লোকমুখে শুনা যায়—এক সময়ে আকবর তাঁহাকে বহুমূল্য উপঢৌকন সহ পারস্যের শাহের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। রাজধানী পরিত্যাগের পূর্ব্বে মোল্লার কতকগুলি শত্রু উপঢৌকন দ্রব্যাদি বাহির করিয়া লইয়া তাহার পরিবর্ত্তে বাক্সের মধ্যে কতকগুলি মাটি ও পাথর রাখিয়া দেয়। মোল্লা নিরাপদে পারস্যে উপস্থিত হইল এবং নির্দ্দিষ্ট দিনে প্রকাশ্য রাজদরবারের মধ্যে বাক্সটি খোলা হইল। বাক্সের মধ্যে রত্নাদির পরিবর্ত্তে মাটি ও পাথর দেখিয়া মোল্লা ও সাহ যে কি পর্য্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন তাহা আর বিশেষ করিয়া বলিবার আবশ্যক নাই। মোল্লা হতবুদ্ধি হইয়া গেল এবং শাহের ক্রোধে বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। পরে শাহ বজ্রস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—"মোল্লা তোমার কি জীবনে বিরাগ জন্মিয়াছে যে তুমি আমার নিকট এই সকল কদর্য্য বস্তু লইয়া উপস্থিত হইতে সাহসী হইয়াছ?" মোল্লা বুঝিল যে সে কোন প্রকারে প্রতারিত হইয়াছে। কিন্তু তাহার উপস্থিত বুদ্ধি তাহাকে সে যাত্রা জীবনদান করিল। সে তৎক্ষণাৎ উত্তর করিল—"জগদীশ্বর আমাদের সকলকে ক্ষমা করুন, কারণ মহারাজ আপনি যাহাকে ধূলামাটিজ্ঞানে অবজ্ঞা করিতেছেন তাহা ইসলামধর্ম্মে বিশ্বাসীর চক্ষে অমূল্য বস্তু। 'কারবেলা' ক্ষেত্রে যে স্থানে ধর্ম্মবীরগণ জীবন দান করিয়াছিলেন, এ ধূলা-মাটি সেই স্থান হইতেই সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছি। বহু কষ্ট ও ব্যয় স্বীকার করিয়া মহারাজা আকবর এই স্মৃতিচিহ্নগুলি সংগ্রহ করিয়াছেন এবং সেগুলি আপনার নিকট প্রেরণ করিবার অর্থ এই যে, ভারতের সুন্নীসম্প্রদায়ভুক্ত মুসলমানগণের অপেক্ষা ইহা আপনার দেশেই অধিকতর আদৃত হওয়া সম্ভব।" এই কথা শুনিবামাত্র শাহের ক্রোধ দূর হইল। ওমরাহগণ পরিবৃত হইয়া তিনি সসম্মানে সেই বাক্সটির প্রতি দৃষ্টি করিয়া প্রিয় পারিষদগণের মধ্যে সেই ধুলামাটি বিতরণ করিলেন—তখন সেই একটু ধুলা পাইবার জন্য সকলে কাড়াকাড়ি করিতে লাগিলেন।

পারস্যশাহের দরবারেও মোল্লার কতকগুলি শত্রু ছিল। একদিন রাজদরবার মধ্যে তাহারা চক্রান্ত করিয়া মোল্লাকে জিজ্ঞাসা করিল—"কোন্ রাজা বড়,—আকবর না পারস্যের শাহ?" তাহারা মনে করিয়াছিল এবার মোল্লা যে প্রকারেই উত্তর করুক না কেন তাহাদের উদ্দেশ্যসিদ্ধি সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহ নাই। মোল্লা যাহাকেই বড় বলুক না কেন তাহাদের প্রতিহিংসা লইবার সুবিধা হইবে। কিন্তু মোল্লাকে তাহারা ঠিক চিনে নাই। মোল্লা প্রথম উত্তরদানে একটু ইতস্তত করিতেছিল, কিন্তু শাহ স্বয়ং যখন সেই প্রশ্ন করিলেন তখন সে বলিল—"মহারাজ! আপনার ন্যায় পরাক্রান্ত নৃপতির সহিত বাদশাহ আকবরের কি প্রকারে তুলনা হইতে পারে? আপনি পূর্ণচন্দ্রের ন্যায়, আকবর অমাবস্যার ন্যায়।" শাহ সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে বহু পুরস্কার দান করিয়া বিদায় দিলেন। মোল্লা আগ্রায় উপস্থিত হইলে আকবর তাহাকে সাদর সম্ভাষণ না করিয়া একটু বিরক্তি ও ক্রোধ প্রকাশ করিলেন। তিনি পারস্যের শাহের সহিত তাঁহার তুলনার কথা ইতিপূর্ব্বেই শুনিয়াছিলেন। তিনি মোল্লাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"ভাল মোল্লা, তোমার পারস্যদেশে ব্যবহার সম্বন্ধে আমি এ সকল কি শুনিতেছি! যে সকল নির্ব্বোধ যে ডালে বসে সেই ডালই কাটে, তুমিও কি তাহাদের মধ্যে একজন?" মোল্লা বিনীতভাবে উত্তর করিল—"আমি কি অপরাধ করিয়াছি, মহারাজ?" আকবর বলিলেন—"তুমি কি পারস্যের সাহের সম্মুখে তাঁহাকে পূর্ণচন্দ্র ও আমাকে অমাবস্যার সহিত তুলনা কর নাই?" ধূর্ত্ত মোল্লা তৎক্ষণাৎ উত্তর করিল—"মহারাজ, এ উত্তরের দ্বারা আমি আপনার কোন

অবমাননা করি নাই। অমাবস্তার চন্দ্র দিন দিন নবকলায় পূর্ণ হইয়া সৌন্দর্য্যগৌরবে চরাচর আচ্ছন্ন করে, কিন্তু পূর্ণচন্দ্র দিন দিন ক্ষয়প্রাপ্তই হইয়া থাকে। মোল্লার এই সদুত্তরে আকবর সন্তুষ্ট হইলেন।

শুনা যায় মোল্লার পারস্যদেশে অবস্থানকালে পারস্যের সাহ তাঁহাকে একদিন তাঁহার চিত্রালয় দেখিবার জন্ম নিমন্ত্রণ করেন। আকবরের প্রতি ঈর্ষাবশতঃ এবং আকবরের ভৃত্য মোল্লাকে অপমানিত করিবার বাসনায় শাহ আকবরের প্রতিকৃতিখানি তাঁহার পাইখানার মধ্যে টাঙ্গাইয়া রাখিতে আদেশ দেন। মোল্লাকে অন্যান্য যাবতীয় চিত্র দেখাইবার পর শাহ বলিলেন "এইবার দেখিবার উপযুক্ত আর একখানি চিত্র অবশিষ্ট আছে। আমার বিশ্বাস তুমি চিত্র দেখিলেই ব্যক্তিটিকে বুঝিতে পারিবে। কৌতূহলপরবশ মোল্লা দেখিল চিত্র আকবর শাহের। সে তৎক্ষণাৎ এ অপমানের প্রতিশোধ লইবার প্রতিজ্ঞা করিল। সুতরাং যেইমাত্র শাহ জিজ্ঞাসা করিলেন—"চিত্রটি কাহার চিনিতে পারিলে?" অমনি নির্ভীকহৃদয়ে সে উত্তর করিল—'আজ্ঞা হাঁ মহারাজ চিনিয়াছি। চিত্রটি এমন একটি পরাক্রমশালী সম্রাটের প্রতিকৃতি যে তাঁহার মুখ দর্শনই আপনার পক্ষে বিরেচকের কার্য্য করে! সুতরাং আপনি ইহা রক্ষার উত্তম স্থানই নির্ব্বাচন করিয়াছেন। এ স্থানে ইহা থাকিলে আপনার স্বাস্থ্যভঙ্গের আর কোন আশঙ্কা নাই।

এই মোল্লার সম্বন্ধে আর একটি ঘটনার উল্লেখ করিয়া আমরা ইহার নিকট হইতে বিদায় লইব।

একবার আকবর মোল্লার উপর রুষ্ট হইয়া তাহাকে তৎক্ষণাৎ রাজ্যত্যাগ করিয়া যাইতে আদেশ করেন। এই ঘটনার কিছুদিন পরে একদিন এক বনের মধ্যে যাইতে যাইতে আকবর দেখিলেন একটা মানুষ তাঁহাকে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ এক গাছের উপর চড়িয়া বসিল। বৃক্ষের নিকট যাইয়া আকবর দেখিলেন লোকটা সেই মোল্লা, এবং বলিয়া উঠিলেন—"তুমি এখনও এখানে রহিয়াছ? আমি তোমাকে আমার রাজ্যত্যাগ করিয়া যাইতে বলি নাই?" মোল্লা সেই ডালের উপর বসিয়া বিনীতভাবে উত্তর করিল—"ক্ষমা করুন মহারাজ! আমি সমস্ত পৃথিবী ভ্রমণ করিয়া দেখিলাম। যেখানেই যাই শুনি তাহা মহারাজা আকবরের রাজ্য। সুতরাং আমার স্বর্গে যাওয়া ভিন্ন অন্য উপায় নাই। মহারাজ ত দেখিতেছেন আমি আজ কতটা উঠিয়াছি।" এই উত্তর শুনিয়া আকবর হাসিয়া উঠিলেন এবং তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া পুনরায় তাহাকে পারিষদমধ্যে গ্রহণ করিলেন।

আকবর অতি বিচক্ষণ দূরদর্শী রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন। তিনি হিন্দুগণের স্কন্ধ হইতে 'জিজিয়া' কর রহিত করিয়া সকল প্রজাকে সম অধিকার দান করেন। তিনি এতদূর সাহিত্যানুরাগী ছিলেন যে সংস্কৃত শাস্ত্র ও কাব্যাদি পারস্যভাষায় অনুবাদ করাইয়া মুসলমানগণের মধ্যে প্রচলিত করিয়াছিলেন। সকল ধর্ম্মকেই তিনি শ্রদ্ধা ও সম্মান করিতেন। তাঁহার হৃদয়ও অত্যন্ত দয়ালু ছিল। তিনি জীববলি ও বাল্যবিবাহ নিষেধ করিয়াছিলেন। বিধবার পুনর্বিবাহ প্রচলিত করিতে 'সতী' প্রথা লুপ্ত করিতে যত্নবান হইয়াছিলেন। তাঁহার বুদ্ধিবীর্য্যের বলে আফগানিস্থান হইতে উড়িষ্যা ও হিন্দুদেশ পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তার করেন। কেবল চিতোরের রাজপুতগণ আজীবন বিপর্য্যস্ত হইয়াও তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করে নাই। এই একমাত্র হিন্দুজাতিই সগর্ব্বে ও সতেজে তাঁহার সকল চেষ্টাকে ব্যর্থ করিয়া আপন স্বাধীনতা রক্ষায় সমর্থ হইয়াছিল। আমেদনগরের রাণী চাঁদবিবির কৌশলে ও বীরত্বে দক্ষিণ ভারতে মোগলসাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টাও ব্যর্থ হইয়াছিল।

শুনা যায় প্রতি রবিবারে আকবর বিভিন্ন ধর্ম্মের পণ্ডিতগণকে সমবেত করিয়া ধর্ম্মালোচনা শুনিতে ভাল বাসিতেন।

আকবরের শেষ জীবন বড়ই দুঃখের। তাঁহার বন্ধু ও অমাত্য ফজেল্ ও ফেইজীর মৃত্যুতে তিনি বিশেষ কাতর হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাহার উপর তাঁহার দুইটি প্রিয় পুত্র অকালে ইহলোক ত্যাগ করে! কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা তাঁহার স্নেহময়ী মাতার মৃত্যুই তাঁহার পক্ষে বিশেষ পীড়াদায়ক হইয়াছিল।

মাতার মৃত্যুর পর তিনি শোকের চিহ্নস্বরূপ কৃষ্ণবস্ত্র পরিধান করিতেন ও মস্তক ও শ্মশ্রু মুণ্ডন করিতেন। এই শোকের কিছুদিন পরেই তিনি স্বয়ং যখন মৃত্যু-শয্যায় শায়িত হইলেন, তখন ওমরাহগণকে ডাকিয়া অনেক উপদেশ দিয়া বলিলেন "যদি তোমাদের কাহারও কোন ক্ষতি করিয়া থাকি, দয়া করিয়া ক্ষমা করিও। সকলে অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিল। পুত্র জাহাঙ্গীর তাঁহার পদতলে পড়িয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। আকবর তাঁহাকে উঠিয়া তরবারি গ্রহণ করিতে ইঙ্গিত করিলেন। ইহার পরমুহূর্ত্তেই তাঁহার জীবনপ্রদীপ নির্ব্বাপিত হইল।

১৬০৫ খৃষ্টাব্দে আকবরের মৃত্যু হয়। আগ্রার নিকটে সিকান্দ্রা নগরে তিনি সমাধিস্থ হন। তাঁহার পুত্র জাহাঙ্গীর পিতার সমাধির উপর এক বিরাট ও বহুমূল্য সমাধিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত করেন। এই সমাধিরই একটি স্তম্ভের উপর 'কোহিনুর' নামক প্রসিদ্ধ হীরকটি সংলগ্ন ছিল। এক্ষণে সেই কোহিনুর ইংলণ্ডরাজের মাথার মণি হইয়াছে।

মহামতি আকবর মরলোক ত্যাগ করিয়াও আজ জীবিত। ভবিষ্য-বংশের অন্তররাজ্যে যিনি অধিষ্ঠান করেন তিনি মরলোকে জন্মগ্রহণ করিয়াও অমর।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

ব্যবসায়ে সমবায়।

বহুবর্ষের নিদ্রালস নয়ন উন্মীলন করিয়া ভারতবাসী জগতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বুঝিয়াছে, সে সভ্যজগতের কত পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে। বুভুক্ষার প্রপীড়নে, মহামারীর ভীষণ তাড়নে ভারতবাসী বুঝিয়াছে, "বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী * * * * ভিক্ষায়াং নৈব নৈবচ।" তাই আজ ভারতের ইতস্ততঃ যৌথব্যবসায় প্রতিষ্ঠার প্রবল উদ্যোগ চলিতেছে। যাহার মূলধন আছে সে স্বদেশী আন্দোলনের সহায়তায় তাহার একগুণ অর্থ চতুর্গুণ করিতে ব্যস্ত। কিন্তু ধনীর এই অর্থ-বৃদ্ধি-প্রচেষ্টার ফলে তৈলাক্ত শিরেই তৈল মর্দ্দনের ব্যবস্থা হইতেছে—দরিদ্রের ধনাগমের পথ কিন্তু পূর্ব্ববৎ সংকীর্ণই রহিয়াছে। বস্তুতঃ এই মসিজীবী, কৃষি-জীবীর দেশে কয়জন একশত, পঞ্চাশত, এমন কি পঞ্চবিংশতি মুদ্রাই বা অক্লেশে ব্যবসায় স্থাপনের জন্ত প্রদান করিতে সক্ষম? সুতরাং "উথায় হৃদি লিয়ন্তে দরিদ্রাণাং মনোরথাঃ"। যাহা হউক যদিও নিশ্চেষ্টতা অপেক্ষা এই উদ্যম কতক প্রশংসাযোগ্য বটে, তথাপি যে বিষম ভ্রমে আজ বাণিজ্যের আদর্শক্ষেত্র ইয়ুরোপ, আমেরিকা বিপন্ন আমরাও সেই ভ্রমেই পদার্পণ করিতে অগ্রসর হইয়াছি, ইহা বস্তুতঃই চিন্তার বিষয়। সংসারে অপরিণামদর্শী ঠকিয়া শিখে আর দূরদর্শী দেখিয়াই শিখে। পাশ্চাত্য বণিকের ভ্রমপূর্ণ বাণিজ্যনীতির অনুগমন আমাদের অদূর-দর্শিতার ও বাণিজ্যে অনভিজ্ঞতারই পরিচায়ক এবং আমাদের ভবিষ্য বাণিজ্যের বিশেষ বিপদসূচক। আমরা বিষয়টী বিশদ-রূপে আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব।

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, ভারতের বাণিজ্য যে সময়ে সমগ্র জগতের মধ্যে চরম উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল সে সময়ের ইতিহাস কালের কুক্ষিতে বিলীন হইয়া গিয়াছে। আমরা আমাদের দেশের অতীত বাণিজ্যের অভিজ্ঞতার সাহায্যলাভে সম্পূর্ণ বঞ্চিত। সুতরাং

বাধ্য হইয়াই আমাদিগকে বর্ত্তমান যুগের বাণিজ্যকেন্দ্র ইয়ুরোপ ও আমেরিকার ব্যবসায় ও বাণিজ্যের আদর্শ লইয়াই আমাদের লুপ্ত ব্যবসায় ও বাণিজ্য পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে; তজ্জন্য ঐ সকল দেশের ব্যবসায় ও বাণিজ্যের অতীত ও বর্ত্তমান অবস্থাই এক্ষণে আমাদের বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা করা প্রয়োজন।

অতীতকালে ঐ সকল দেশে প্রথমতঃ ব্যক্তিগত ব্যবসায়, বাণিজ্যই বর্ত্তমান ছিল। তৎপর যখন ব্যক্তিগত মূলধন বৃহৎ কোন অনুষ্ঠানের পক্ষে অপ্রচুর বা বিপদসঙ্কুল বলিয়া অনুভূত হইল তখন সাধারণ যৌথকারবারের প্রতি ব্যবসায়ীদিগের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। যৌথমূলধনে ব্যবসায়বাণিজ্যের দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হইতে লাগিল, অজস্র ধনাগমের পথ বিমুক্ত হইল; ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশের ব্যক্তিগত ব্যবসা প্রতীচ্য যৌথব্যবসায়ের সম্মিলিত প্রবল শক্তির সম্মুখে তিষ্ঠিতে অক্ষম হইয়া দ্রুতবেগে অন্তর্হিত হইল। যৌথ-ব্যবসায়িগণ অযত্নে বা স্বল্প যত্নেই ক্রোড়পতি হইলেন; এমন কি ভারতের ন্যায় বিরাট সাম্রাজ্যও অনায়াসেই করতলগত করিতে সক্ষম হইলেন। কিন্তু সংসারে অসত্যে প্রতিষ্ঠিত দৃঢ়ভিত্তিবিহীন কিছুই চিরকাল সমভাবে দণ্ডায়মান থাকিতে পারে না; কালের পরিবর্ত্তনশীল গতির সমক্ষে তাহার একদিন পতন অনিবার্য্য ও অবশ্যম্ভাবী। পাশ্চাত্য সাধারণ যৌথব্যবসায়ও আজ তাই পতনোন্মুখ।

মূলধন, শ্রম ও ক্রয় এই তিনটি মূল শক্তির সম্মিলন দ্বারাই প্রত্যেক ব্যবসায় পরিচালিত হইয়া থাকে। এই তিনটি শক্তির একটিও যদি বিরুদ্ধ হয় তবে কোন ব্যবসায়ই পরিচালিত হইতে পারে না। সাধারণ যৌথ ব্যবসায়িগণ ধনতৃষ্ণায় অন্ধ হইয়া, জন-সাধারণের অজ্ঞানতার সুযোগে একমাত্র মূলধনের গর্ব্বে, অপরিহার্য্য অপর দুইটি শক্তিকে নগণ্য জ্ঞানে অবহেলা করতঃ এত-কাল আয়ত্তাধীনে রাখিয়া লাভের অধিকাংশই অক্লেশে ভোগ করিতেছিলেন; কিন্তু শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে শ্রমজীবী ও ক্রেতারা যখন বুঝিলেন যে, ঐ সকল ব্যবসায়ের স্থিতি ও উন্নতি তাঁহাদের হস্তেও তুল্যপরিমাণে নির্ভর করে এবং এতকাল মূলধনীগণ তাঁহাদের চক্ষে ধূলিকণা নিক্ষেপ করিয়া তাঁহাদের ভাগের কাঁঠাল তাঁহাদের মস্তকেই ভাঙ্গিয়া খাইয়াছেন তখন তাঁহাদের ন্যায্য অধিকার লাভের জন্য তাঁহারা বদ্ধপরিকর হইলেন; তাহার ফলেই আজ সহস্র সহস্র শ্রমজীবী ধর্ম্মঘট করিয়া মূলধনীর সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধার কবল হইতে মুক্তির উপায় নির্দ্ধারণে কৃতসঙ্কল্প; এবং যে ক্রেতৃগণ এতদিন নিজের উপার্জ্জিত অর্থে পরের অন্যায় লোভ চরিতার্থতার সহায়তা করিয়া আসিয়াছেন এখন সেই প্রবঞ্চিত ক্রেতাও কোন দ্রব্যের উপযুক্তাধিক মূল্য দিতে স্বীকৃত নহেন। সাধারণ যৌথব্যবসায়িগণ বিষম বিপদে পড়িলেন— একপক্ষে বহুকাল অযথা অর্থলাভে তাঁহাদের ধনতৃষ্ণা অসাধারণরূপে বৰ্দ্ধিত, নিবৃত্তি অশেষ কষ্টসাধ্য, অপর পক্ষে শ্রমজীবী ও ক্রেতা বিপক্ষ, সুতরাং পাশ্চাত্য সাধারণ যৌথব্যবসায়ক্ষেত্র রণক্ষেত্রে পরিণত হইল; বাণিজ্যনীতির এই বিষম সমস্যা সমাধানের জন্য

পাশ্চাত্য অর্থ নীতিজ্ঞগণ বহু গবেষণা দ্বারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে, সচরাচর শ্রমজীবিরা পরিশ্রম দ্বারা যাহা প্রস্তুত করে তাহা বাজার দরে বিক্রয় করিলে দ্রব্য প্রস্তুত ও বিক্রয় করিবার সমস্ত খরচ বাদে একটা লভ্যাংশ থাকে। চিরন্তন নিয়মানুসারে শ্রমজীবীরা কেবল মাত্র তাহাদের পারিশ্রমিক পায় এবং তাহাও আবার সর্ব্বত্র উপযুক্ত পরিমাণে পায় না; কারণ মূলধনী টানাটানি করিয়া তাহা যথাসাধ্য হ্রাস করিয়া দেন। মূলধনী মনে করেন লভ্যাংশ সমস্তই তাঁহার প্রাপ্য, কারণ তিনি কার্য্যক্ষেত্রে প্রথমতঃ অবতীর্ণ না হইলে শ্রমজীবীরা বাজারে বিক্রয়োপযোগী দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিবার অর্থ সাহায্য পাইত না। ইহার ফলে ক্ষমতাবান মূলধনীর আকর্ষণে শ্রমজীবীদের পারিশ্রমিকের ক্রমশঃ লাঘব হইতে থাকে—ধনীর অবস্থা যেমন উত্তরোত্তর শ্রীসম্পন্ন হয় শ্রমীর অবস্থা ততই হীন হইতে হীনতর হয়। পরে উভয় পক্ষের স্বার্থের সঙ্ঘর্ষে কষ্ট অসহ্য হইলে শ্রমজীবীরা অগ্র পশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া ক্ষেপিয়া দাঁড়ায় ও ধর্ম্মঘট ইত্যাদি দ্বারা ধনীকে পরাস্ত করিতে নিষ্ফল প্রয়াস পায়। ইহাতে ধনীর যথেষ্ট লোকসান দাড়ায় বটে কিন্তু শ্রমজীবীদের বিশেষ কিছু সুবিধা দেখা যায় না বরং তাহাদের দুঃখ দারিদ্র্য আরও বৃদ্ধি পায়। কিন্তু যত্তপি শ্রমজীবীরা স্বীয় পরিশ্রমলব্ধ অর্থ হইতে সামান্য কিছু সংগ্রহ করিতে পারেন, তাহা হইলে "দশের লাঠি একের বোঝা" হইয়া দাঁড়ায় ও ঐ একত্রীকৃত অর্থ মূলধনরূপে ব্যবহৃত হইলে শ্রমের প্রাপ্য পারিশ্রমিক ব্যতীত মূলধনের উপরেও একটি লভ্যাংশ প্রাপ্য হয় এবং তাহা শ্রমজীবীগণ স্ব স্ব প্রদত্ত অর্থের অনুপাতে বণ্টন করিয়া লইতে পারেন। কিন্তু শ্রমজীবীদের এইরূপ চেষ্টা নানাকারণে কার্য্যক্ষেত্রে প্রকৃত ফলবতী হয় না। অন্ততঃ তাহা কষ্টসাধ্য। তাঁহারা এই সকল বিষয় বিশেষরূপে বিবেচনা করিয়া "সমবায় ব্যবসায়" প্রচলন অবশ্য প্রয়োজনীয় বলিয়া স্থির করিলেন। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে মূলধন, শ্রম ও ক্রয় এই তিনটি শক্তির একত্র সমাবেশ ব্যতীত কোন ব্যবসায়ই সুনিয়ন্ত্রিত হইতে পারে না। ক্রেতা না কিনিলে ব্যবসায় চলে না। অথচ সাধারণতঃ কোন দ্রব্য বিক্রয়োপযোগী করিতে যথার্থ যাহা খরচ পড়ে ক্রেতাকে প্রকৃতপক্ষে তদপেক্ষা বহুগুণ অধিক দাম দিয়া তাহা ক্রয় করিতে হয়। প্রত্যেক ব্যবসায়ে প্রস্তুতকর্ত্তা বা উৎপন্নকারী ও ক্রেতার মাঝে নানা শ্রেণীর লোক আসিয়া পড়ে ও তাহাদের উদর পূর্ত্তি করিতে গিয়া বিক্রেয় দ্রব্যের মূল্য অধিক হইয়া পড়ে। মূল্য অধিক হয় বটে কিন্তু ইহাতে উৎপন্নকারী শ্রমজীবীর, এমন কি মূলধনীরও কোন লাভ হয় না পরন্তু ক্রেতাকে প্রকারান্তরে প্রবঞ্চিত হইতে হয়। এক্ষণে যত্তপি ধনী, শ্রমী ও ক্রেতা অথবা শ্রমজীবী ও ক্রেতা ব্যবসায়ের নিমিত্ত সমবেত হইয়া নিজ নিজ অর্থ একত্র করিয়া ঐ ধন দ্বারা নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তু সমূহ উৎপন্ন করেন বা পরিশ্রম প্রয়োগে তদ্রূপ উপাদান দ্বারা দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিয়া বাজারে উপযুক্ত মূল্যে তাহা বিক্রয় করিয়া লভ্যাংশ যথোচিতরূপে তাঁহাদের সকলের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেন, তাহা হইলে এইরূপ ব্যবসায় "সমবায় পদ্ধতি" পরিচালিত

বলা যাইতে পারে। ইহাতে ধনী ও শ্রমীর বিপরীত স্বার্থের সংঘর্ষ নাই। ক্রেতা ক্রয়কালে বাজার দরে ক্রয় করিলেও প্রদত্ত মূল্যের অংশ-বিশেষ লভ্যাংশরূপে পুনঃপ্রাপ্ত হন। উপরি উক্ত পদ্ধতিতে সমবেত চেষ্টা হইলে ধনীর অযথা উৎপীড়ন হইতে শ্রমজীবী ত্রাণ পায়। সকল পক্ষের স্বার্থ সমান হওয়ায় ক্রেতা ক্রয়ে দ্বিধা করেন না। শ্রমী যথাশক্তি পরিশ্রম করিবে ও তাহার দৈন্য ঘুচিয়া যাইবে; উল্লিখিত মধ্যস্থ ব্যক্তিগণের হস্ত হইতে সকলে উদ্ধার পাইবেন; অধিকন্তু ধনী তাঁহার ধন প্রয়োগহেতু পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক লাভও পাইতে পারেন।

অধুনা প্রবঞ্চিত ক্রেতা ও শ্রমজীবিগণ স্ব স্ব সামান্য অর্থ একত্র করিয়া মূলধনী, শ্রমজীবী ও ক্রেতার মধ্যে ব্যবসায়ের লাভ ন্যায্যরূপে বণ্টন করিবার প্রণালীতে দলবদ্ধ হইয়া ব্যবসায়ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন। মূল ধনের অসচ্ছলতা প্রযুক্ত এবং চিরন্তন রীতির পরিবর্ত্তে এক নূতন প্রণালী প্রচলনের সুবিধা, জনসাধারণকে বুঝাইয়া, তাহাদের মনোযোগ আকর্ষণের বিলম্ব বশতঃ যদিও প্রথমতঃ সমবায় প্রথায় আরব্ধ ব্যবসায় সমূহ দ্রুত উন্নতিলাভ করিতে পারে নাই বটে, কিন্তু ব্যবসায়ের মূল শক্তিত্রয়ের একত্র সমন্বয়ে এই প্রণালীতে পরিচালিত ব্যবসায়ের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হইয়া বর্ত্তমানে এক অভাবনীয় উন্নতির সোপানে আবির্ভূত হইয়াছে। এক্ষণে জগতের সর্ব্বত্র সমবায় নীতির মহিমা দ্রুত প্রসারিত হইতেছে। পাশ্চাত্য বহু ধীর, মনস্বিগণ এই প্রথার পৃষ্ট-পোষকরূপে দণ্ডায়মান হইয়া ইহার ক্রমোন্নতির জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞার সহিত অশেষ যত্ন ও চেষ্টা করিতেছেন। আর নাই বা করিবেন কেন? "সঙ্ঘে শক্তিঃ কলৌযুগে" ইহা সার্থক ঋষি বাক্য। বর্ত্তমানকালে মনুষ্য চেষ্টার প্রত্যেক বিভাগে ব্যক্তিগত উদ্যমের সার্থকতা ক্রমশঃই লোপ পাইতেছে। সাধারণ তন্ত্র একাধিপত্যের স্থান অধিকার করিতেছে; মুনির নির্জ্জন ধ্যান অপেক্ষা দলবদ্ধ আলোচনা ও প্রচারই ধর্ম্মের উন্নতি সাধনের প্রকৃষ্ট উপায় বলিয়া গণ্য হইতেছে; এবং গুণী ও জ্ঞানী ব্যক্তিবিশেষের আবির্ভাবের অপেক্ষা না করিয়া মণ্ডলী গঠন ও শিক্ষালয় স্থাপন দ্বারা বিজ্ঞান ও ললিতকলা উৎকর্ষ লাভ করিতেছে। কলি-যুগের বাণিজ্যেই বা উল্লিখিত শাস্ত্রবচন খাটিবে না কেন? বিদেশে ত দেখিতেছি সর্ব্বত্রই সমবায় নীতি অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে এবং ব্যক্তিগত প্রাধান্যের পথ সঙ্কীর্ণ হইয়া আসি-তেছে। আমাদের দেশেও যেখানেই সমবায় নীতি জ্ঞান, বুদ্ধি ও সাধুতার সহিত পরিচালিত হইয়াছে সেইখানেই আশাতীত ফললাভ ঘটি-য়াছে। এই নীতি জনসাধারণের যত শীঘ্র হৃদয়ঙ্গম হইবে ততই তাহাদের উন্নতির পথ উন্মুক্ত হইবে।

পূর্ব্বেও বলিয়াছি, পুনর্ব্বার বলিতেছি আমাদের এমন আশঙ্কা করিবার কোনই কারণ নাই যে সমবায় নীতির বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে মূলধনী সম্প্রদায় বিলুপ্ত হইবে। সমবায় নীতির প্রভাবে বরং ধনের শক্তি সুনিয়ন্ত্রিত ও সুসম্বদ্ধ হইয়া তাহার প্রয়োজনের ক্ষেত্র প্রসারিত করিবে ও অধিক ফলবান হইবে। অনিচ্ছুক শ্রমজীবীকে অন্যায়রূপে আবদ্ধ রাখিতে, আগ্রহশূন্য ক্রেতাকে ভুলাইয়া

আনিতে যে অনর্থক অর্থব্যয় ও ক্ষতি অনিবার্য্য, সমবায় পদ্ধতি অনুসারে শক্তিত্রয় পরস্পরের নিকটবর্ত্তী ও দ্বন্দ্বশূন্য হইলে তাহা লাঘব হওয়ায় শ্রমজীবী ও ক্রেতাকে সম্পূর্ণ তৃপ্ত করিয়াও মূলধনী নিজ অংশে প্রচুর লাভ পাইতে পারেন। তদ্ব্যতীত ধনীর শ্রমী হইতেও বাধা নাই। কিয়ৎ পরিমাণে ক্রেতা শ্রেণীভুক্ত হইতেও তিনি বাধ্য। সুতরাং দ্বিগুণ বা ত্রিগুণ পরিমাণে লাভ হস্তগত করিবার উপায়ও রহিয়া যায়। স্বার্থ ও পরার্থকে এক না করিলে পরমার্থ লাভ হয় না। ইহাই সমবায় নীতির শিক্ষা, এই পরমার্থ ই সমবায় পদ্ধতির সাধনা।

এক্ষণে পাশ্চাত্য দেশ সমূহেও সুদূর আমেরিকায় এই সমবায় নীতি ব্যবসায়ে কিরূপ ফলবতী হইয়াছে ও ভারতবর্ষে কোন কোন স্থানে এই পদ্ধতিতে কার্য্য পরিচালন চেষ্টা হইয়াছে এবং সেই চেষ্টা কতদূর সফলতা লাভ করিয়াছে তাহা সাধারণের অবশ্য জ্ঞাতব্য। আমরা বারান্তরে "সমবায়ের ইতিহাস" প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব। উপসংহারে আমরা আমাদের সুধী ব্যবসায়ী মণ্ডলীকে এই সমবায় নীতির সার্থকতা সম্বন্ধে একটু বিশেষরূপে বিবেচনা করিতে অনুরোধ করি।

শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী।

ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবকালীন দৃশ্য।

প্রথম অঙ্ক।

১৭৯৪ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাস অতীত হইতে চলিল—মাত্র এক দিন অবশিষ্ট আছে। পেরি (প্যারিস) নগরের জনতা ক্ষুব্ধচিত্তে জনশ্রুতি শুনিতে পাইল যে তাহাদের উপাস্য দেবতা—যাহাকে তাহারা এতদিন প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম মনে করিত—সেই দান্তন (Danton) বিশ্বাসঘাতকতার কার্য্য করিয়াছে; অর্থলোভে জন্মভূমিকে প্রুসিয়গণের হস্তে সমর্পণ করিয়াছে। সে সময়ে সাহস করিয়া, বড় করিয়া কেহ কোন কথা বলিতে পারিতনা, কি জানি গিলোটিন রাক্ষসীর করালকবলে কাহাকে কোন সময়ে পতিত হইতে হয়। কিন্তু সকলেই বলাবলি করিতে লাগিল যে দান্তনের সৌভাগ্য-সূর্য্য অস্তমিত হইয়াছে; তাহার সময় ঘনাইয়া আসিয়াছে; যে শোণিতপিপাসু রাক্ষসীর সে প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, সেই রাক্ষসীই বুঝি তাহাকে শীঘ্রই গ্রাস করে। কফির আড্ডায় মৃদুস্বরে মাতব্বরেরা জিজ্ঞাসাবাদ করিতেছিল যে বাস্তবিকই কি দান্তন প্রতারক, প্রকৃতই কি সে অর্থলিপ্সু, যথার্থ ই কি অর্থলোভে শত্রুর হস্তে সে সাধের ফ্রান্সকে সমর্পণ করিয়াছে? যে দান্তন একদিন সমগ্র ফ্রান্সকে এক মোহমন্ত্র বলে জাগরিত করিয়া, বীণার তন্ত্রী সকল একত্র করিয়া এক সুমহান ঝঙ্কারে কম্পিত করিয়া শত্রুর হৃদয়ে ভয় সঞ্চার করিয়াছিল, আবাল বৃদ্ধ বনিতার সেই উপাস্য দান্তনকে তাহার শত্রুপক্ষ কি আজ সত্যই কারাগারে পাঠাইতে সাহস পাইবে?

যখন সমগ্র পেরি নগরীর লোক এইরূপ চিন্তা করিতেছিল, তখন নিজ গৃহে একাকী একটী লোক ক্ষুণ্ণমনে বসিয়াছিলেন। তাঁহার অবয়ব দীর্ঘাকৃতি; মুখে বসন্তের চিহ্ন; ললাট প্রশস্ত। পরিধেয় বসন দেখিলে তাঁহাকে ব্যবহারজীবী বলিয়া বোধ হয় কিন্তু পরিচ্ছদের আড়ম্বর মাত্র ছিল না। বেশ সাদা-সিদে অথচ দেখিলেই ভদ্রলোক বলিয়া সহজেই প্রতীয়মান হয়।

ইনিই সেই দান্তন। দান্তন বসিয়াছিলেন; বসিয়া ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান চিন্তা করিতেছিলেন। সত্যই কি তাঁহার গৌরবরবি অস্তমিত হইয়াছে? সত্যই কি তিনি আর তাঁহার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম জন্মভূমিকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে পারিবেন না? সত্যই কি তিনি আর রক্তস্রোত নিবারণে সক্ষম হইবেন না?

দান্তন সবেমাত্র তাঁহার স্বগ্রাম হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন। গিলোটিন উঠাইয়া দিবেন, রক্তস্রোত আর প্রবাহিত হইতে দিবেন না, পেরি এবং সমগ্র ফ্রান্সকে নূতন পথে আনয়ন করিবেন এই সমস্ত প্রতিজ্ঞায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া স্বগ্রাম হইতে ফিরিয়াছেন। কামিলি দেশমোলিনকে প্ররোচিত করিয়া "Vieux Cordelier" ("বৃদ্ধ সন্ন্যাসী") সংবাদপত্র বাহির করিয়াছেন। সন্ধ্যাসমাগমে সীন নদীস্থ সেতুর উপর দণ্ডায়মান হইয়া অস্তমিত রবির লোহিত কিরণে আলোকিত জলরাশি দেখিয়া তাঁহার বন্ধুকে বলিয়াছিলেন "দেখ; কত রক্ত! সীন আজ মনুষ্যরক্তে রঞ্জিত। কামিলি! আবার তুমি তোমার লেখনী ধারণ কর—আমি প্রাণপণে তোমায় সাহায্য করিব। দেখি আমরা আবার এই রক্তস্রোত প্রতিরোধ করিতে পারি কিনা?"

দান্তনের চিন্তাস্রোতের আজ আর বিরাম ছিল না। তিনি বুঝিতে পারিলেন যে তাঁহার সব ফুরাইয়াছে। বাতায়নপথে দাঁড়াইলে আর নিম্নে তাঁহাকে দেখিবার জন্য জনতা হয় না; বৈকালিন ভ্রমণের সময় আর তাঁহাকে দেখিয়া লোকে বড় একটা টুপি তোলে না; সেতুর উপর গেলে আর মাঝিরা তাঁহার দিকে উদ্‌গ্রীব হইয়া চাহে না। দান্তন সমস্তই বুঝিতেছেন তত্রাপি মনে ভাবিতেছেন যে রোবেশপিয়ার তাঁহাকে আটক করিতে সাহস করিবে না।

হঠাৎ কি একটা শব্দ তাঁহার কাণে গেল। কি ও? রোবেশপিয়ার কি সত্যই তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিতে আসিয়াছে? সিঁড়িতে লোক উঠিবার শব্দ শোনা গেল—পরমুহূর্ত্তেই তাঁহার বন্ধু পানিস দ্রুতবেগে সেখানে উপস্থিত। "দান্তন, এই মুহূর্ত্তেই তোমার আবাসভূমি পরিত্যাগ কর। রোবেশপিয়ারের লোক প্রায় আসিয়া পড়িয়াছে। যাও, যাও—অন্যদেশে যাইয়া নূতন জীবন আরম্ভ কর।" ধীরে ধীরে দান্তন তাঁহাকে বলিলেন "কোথায় যাব? Emportet'on sa patrie sons la semelle de les souliers?" জুতার তলায় করিয়া ত আর আমার জন্মভূমিকে লইয়া যাইতে পারি না! জন্মভূমি ছাড়িয়া আমি কোথায়ও যাইতে প্রস্তুত নহি।" পানিস চলিয়া গেলেন—সেখানে থাকা নিরাপদ নহে। পিশাচ রোবেশপিয়ারের লোকজন আসিয়া পড়িল—

দান্তন ধৃত হইলেন এবং লুক্সেমবর্গে নীত হইলেন।

দান্তন সেখানে যাইয়া দেখেন যে তাঁহার কয়েকজন বন্ধু সেই কারাগারে শৃঙ্খলাবদ্ধ। গম্ভীরভাবে তিনি বলিলেন "বন্ধুগণ, আমি তোমাদের উদ্ধারের কল্পনা করিয়াছিলাম কিন্তু ভগবানের এমনি লীলা যে আমিও আজ তোমাদের সহিত একত্র হইয়াছি। আমি ইহার কোন প্রতিকারই দেখিতেছি না।"

১লা এপ্রিল কনভেনসন বসিল। দান্তনের বন্ধু কসাই নিজেন্দার প্রস্তাব করিলেন যে দান্তনের বিচার সাধারণ প্রথা মতই হউক। রোবেশপিয়ার এই প্রস্তাবের তীব্র প্রতিবাদ করিল। "না আমরা আর কোন কথা শুনিতে চাহি না; আমরা আর কাহাকেও কোন বিশেষ অধিকার দিতে প্রস্তুত নহি; আমরা আর দেবতা চাহি না।" কনভেন্‌সনের সদস্যগণ পিশাচভয়ে ভীত—তাঁহারা কোনরূপ উচ্চবাচ্য করিলেন না। সেণ্ট জাষ্ট তখন দান্তনের বিরুদ্ধে অভিযোগ যথারীতি পাঠ করিলেন। কনভেনসনের সদস্যরা বুঝিলেন দান্তনের সময় হইয়াছে।

পরদিন বিচার আরম্ভ হইল; জুরি নির্ব্বাচনের পর দান্তন ভাবিলেন আর একবার তাঁহার অভ্যস্ত বক্তৃতাশক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিবেন। একদিন এই মহতী শক্তি দ্বারা পরিচালিত হইয়া ফরাসীরা একস্বরে রণশিঙ্গা বাজাইয়াছিল;—এই সুমহান স্বরে ঘরে ঘরে একদিন রণভেরী গুরুগম্ভীর নিনাদে ধ্বনিত হইয়াছিল, এই বক্তৃতাশক্তিই একদিন ফ্রান্সের আবালবৃদ্ধবনিতাকে শত্রুদিগকে পরাজিত করিতে সক্ষম করিয়াছিল! আজ আবার দান্তন সেই শক্তির পরিচালন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। বিচারকের প্রতি নহে, জুরীদিগের প্রতি নহে, সমাগত শ্রোতৃবর্গের প্রতি, পেরির, ফ্রান্সের জনসাধারণের প্রতি তাঁহার মোহিনীশক্তির পরিচালনে দান্তন আজ সচেষ্টিত। তিনি স্থির করিলেন, ইহারই বলে একদিন তিনি ফ্রান্সের উপাস্যদেবতা হইয়াছিলেন, ইহারই কৌশলে আজ তিনি আবার সকলকে মুগ্ধ করিবেন, রোবেশপিয়ারের দন্ত চূর্ণ করিবেন, রক্তস্রোত নিবারণ করিবেন। এই একটী মাত্র তন্ত্রীর উপরই আজ তাঁহার সকল আশা—সকল ভরসা—সকল বল—সকল অবলম্বন।

হইলে কি হয়? দান্তন এবং তাঁহার সহযোগীবর্গ আজ চোর ও গুপ্তচরের সহিত একই কাঠগড়ায়। বিচারক, সহকারীগণ,জুরী—সকলেই রোবেশপিয়ারের নিজের লোক। তারপর, রোবেশপিয়ার যাহাতে দান্তনের পক্ষে কোনপ্রকার সাক্ষ্য উপস্থিত না করা হয় তাহার যথোপযুক্ত ব্যবস্থাও করিয়াছিল। পক্ষান্তরে অভিযোগের অনুষ্ঠানের কোনরূপ ত্রুটিই হয় নাই।

২রা এপ্রিল মোকদ্দমা আরম্ভ হইল। আসামীদিগের নাম জিজ্ঞাসার সময় বৃদ্ধ ওয়েষ্টারমান থিয়েটারের অভিনেতাগণের ন্যায় আবৃত্তির স্বরে বলিলেন যে তিনি যতগুলি অস্ত্রাঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহা ফ্রান্সেরই জন্য এবং সবগুলিই সম্মুখদেশে। পৃষ্ঠে অস্ত্রলেখা কেবল এখনই হইতেছে। দান্তনকে নাম ও নিবাস জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন যে "আমার নাম দান্তন; এ নাম তোমাদের নিকট অপরিচিত নহে; এখন পর্য্যন্ত আমি

পেরিতেই বাস করিতেছি কিন্তু শীঘ্রই ইতিহাসের স্বর্গে আমার নাম খোদিত হইবে।”

৩রা এপ্রিল দান্তন তাঁহার বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন। এ রকম বক্তৃতা তিনি আর কোন দিনও দেন নাই। আদালত গৃহ আজ একেবারে পরিপূর্ণ। গৃহ ছাড়াইয়া আজ তাঁহার কথার শব্দ বাহিরে যাইতে লাগিল। ফ্রান্সের প্রতি তিনি তাঁহার অবিচলিত ভক্তির কথা গদগদ স্বরে বলিতে লাগিলেন। তাঁহার শত্রুদের অভিসন্ধি প্রকাশ করিয়া দিলেন। জনতা বিচলিত হইতে লাগিল, ঘনঘন করতালি পড়িতে লাগিল; যাহারা বহির্দ্দেশে দাঁড়াইয়া তাঁহার কথা অস্পষ্টভাবে শুনিতেছিল তাহারা আবার বক্তৃতার মর্ম্ম আরও দূরের লোককে বুঝাইয়া দিতে লাগিল। আদালত গৃহ হইতে সীন নদী পর্য্যন্ত জনতার মধ্যে বিলক্ষণ ভাবের পরিবর্ত্তন দেখা গেল। আর এক ঘণ্টা সময় দান্তনকে বক্তৃতা করিতে দিলে কি হয় বলা যায় না! বুঝি রোবেশপিয়ারের সব আশা নির্ম্মূল হয়!

হঠাৎ বিচারকের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল; সেদিনকার মত সভা ভঙ্গ হইল। দান্তন আর বলিতে পারিলেন না। সেদিন রাত্রে রোবেশপিয়ার তাহার সহকারী ও বিচারকের সহিত পরামর্শ করিয়া কর্ত্তব্য স্থির করিল। যখন রাত্রি প্রভাতে পুনর্ব্বার বিচারক আসন গ্রহণ করিলেন, তখন দান্তনকে আর বলিতে দেওয়া হইল না। তাঁহাকে সাক্ষী ডাকিবার অনুমতি দেওয়া হইল না; বাজেকাজে সময় কাটাইয়া দেওয়া হইল। আসামী বুঝিলেন তাঁহার সময় হইয়াছে।

৫ই তারিখে বিচারক জুরিদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে তাঁহারা যাহা শুনিয়াছেন তাহাতে কোন মতামত প্রকাশ করিতে তাঁহারা পারগ কি না। অম্লানবদনে জুরিরা বলিলেন যে “তাঁহারা সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন। আর কোন বিষয় তাঁহারা শুনিতে চাহেন না।” দান্তন এবং তাঁহার বন্ধুদিগকে আদালত গৃহ হইতে অপসারিত করা হইল। বৈকালে যখন আদালতের কর্ম্মচারীগণ তাঁহাদের নিকট আসিয়া আদালতের আদেশ পাঠ করিতে উদ্যত হইলেন, তখন তাঁহারা বলিলেন যে তাঁহারা উহা শুনিতে চাহেন না। তাঁহারা উহা অবগত আছেন—মৃত্যুতে তাঁহারা কাতর নহেন। কর্ম্মচারীগণের প্রস্থানের পর দান্তন তাঁহার বন্ধু ও সহযোগীদিগের সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন।

সন্ধ্যার কিছুপূর্ব্বে দুখানি গাড়ী কারাগৃহের দ্বারদেশে উপনীত। প্রথম খানিতে চোর, গোয়েন্দা প্রভৃতি উঠিল। দ্বিতীয় খানিতে দান্তন ও বন্ধুবর্গ উঠিলেন—দান্তন, সেচেলেস, দেশমোলিন, লাক্রয়, ওয়েষ্টারমান, কামিলি যাহারা দেশের জন্য অনেকবার রক্তদান করিয়াছিলেন, ফ্র্যান্সকে যাহারা স্বর্গাদপি গরীয়সী মনে করিতেন তাঁহারা আজ গিলোটিনকে আলিঙ্গন করিতে চলিলেন। একত্র এক ক্ষেত্রে সকলে কার্য্য করিয়াছিলেন; একত্র এক ভাবেই সকলে প্রাণ দিতে চলিলেন।

দান্তন পূর্ব্ববৎ সকলকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। কামিলি তাঁহার প্রিয়তমা স্ত্রীর জন্য কয়েকবার আক্ষেপ করিলেন কিন্তু দলপতির উপদেশ বাক্যে তাঁহাকে সহজেই বিস্মৃত হইলেন। পেবির অব্যবস্থিতচিত্ত

জনতার কেহ হাসিতে লাগিল, কেহ কাঁদিতে লাগিল। দান্তনের কয়েকজন বন্ধু তাহাদিগকে মুখ ভেঙ্গাইতে লাগিলেন—নির্ব্বিকার—সম্মুখে মৃত্যু কিন্তু তত্রাপি প্রশান্ত।

বধ্যভূমির নিকটবর্ত্তী হইলে দান্তনের কয়েকজন বন্ধু সমস্বরে রোবেশপিয়ারের অবশ্যম্ভাবী পতন সম্বন্ধে এক গান গাইতে লাগিলেন। কে জানিত, আর কয়েক সপ্তাহ মাত্র পরেই রোবেশপিয়ারও তাঁহাদের পদানুসরণ করিবে! সম্মুখে গিলোটিন; দান্তনের সহধর্ম্মিণী শেষ বিদায়ের জন্য উপস্থিত। এক মুহূর্ত্তের জন্য দান্তন আত্মবিস্মৃত হইলেন; বলিলেন "প্রিয়তমে আর তোমার সহিত দেখা হইবে না।" পরক্ষণেই আত্মসম্বরণ করিয়া বলিলেন "না; না; দান্তন; এসময়ে কাপুরুষের ন্যায় ব্যবহার করিও না।" হেরল্টকে আলিঙ্গন করিয়া নিকটবর্ত্তী ঝুড়ীর দিকে চাহিয়া বলিলেন "শীঘ্রই আমাদের মাথা একত্র হইবে।" একে একে সকলেই মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন; দান্তন সকলের শেষে চলিলেন। শেষ পর্য্যন্ত প্রশান্ত বদন,—কোনরূপ উদ্বেগের চিহ্ন দেখা যায় নাই—ধীর স্থির, নিশ্চল! হত্যাকারীকে গম্ভীর ভাবে বলিলেন "আমার এই মস্তক যখন দেহচ্যুত হইবে, তখন ইহা জনসাধারণকে দেখাইতে কুণ্ঠিত হইও না। Vive l' Republic."

গিলোটিন আপন কার্য্য সমাধা করিল। সমবেত জনতা কেহ সন্তুষ্টমনে, কেহ সন্দিগ্ধ-চিত্তে, কেহ হতাশহৃদয়ে স্বস্থানে প্রস্থান করিল। "সাধারণ তন্ত্রের জয় হউক" এই শেষ কথা দ্বারা দান্তন তাঁহার বিপক্ষ পক্ষের ভুল দেখাইয়া দিয়া স্বধামে চলিয়া গেলেন।

নাটকের এক অঙ্ক অভিনীত হইল।

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার।

পোষ্যপুত্র। (পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(১৫)

যথাসময়ে আলোকমালায় মণ্ডিত পুর-প্রাঙ্গণে বাজনাবাদ্য, শত কণ্ঠের হুলুধ্বনি ও শঙ্খরোলের মধ্যে শান্তির বিবাহ হইয়া-গেল। বর হেমেন্দ্রনাথকে দেখিতে বড় সুন্দর; তেমন সুন্দর ছেলে সদা সর্ব্বদা চোখে পড়ে না। জামাই দেখিয়া বসুমতীর হৃদয়ের ক্ষোভ অনেকটা নিবিয়া গেল। তথাপি আর একটি উন্নত মহিমাময় মুখ চকিতের মতন যে মনের মধ্যে আসিয়া উঁকি দিতে-ছিল না, তাহা বলিতে পারি না।

শান্তি বিবাহের পূর্ব্বেই অনেকখানি বদলাইয়া গিয়াছিল। সে আর তেমন করিয়া কারণে অকারণে যখন তখন হাসে না। হাসিলেও সে হাসি যেন আর ওষ্ঠাধরের সীমানা ছাড়াইয়া চোখে মুখে উথলিয়া উঠিতে চাহে না। সুকুর সহিত ছুটাছুটি করিয়া খেলিয়া বেড়ায় না, পিতাকে যাহা খুসী প্রশ্ন করিয়া বিব্রত করিয়া তুলে না। শান্তি বিয়ের কনের উপযুক্ত স্থির ও গম্ভীর হইয়া পড়ি-য়াছে। সে যে নীরদের মত একজন লোকের

এতোদূর মনোকষ্টের কারণ হইয়া দাঁড়াইল, ইহাতে নিজের প্রতি তাহার ভারি বিরক্ত ধরিয়াছিল। নিজের কথাটা ভাবিতে শিখে নাই, তাই আজও ভাবিল না।

বুকের মধ্যটা যেন শুধু থাকিয়া থাকিয়া কেবল হুহু করিয়া উঠে আর কেবলি কান্না পায়। মধ্যে মধ্যে চুপ করিয়া বসিয়া বসিয়া ভাবে আর কয়দিন পরেই সে কোন অচেনা ঘরে চলিয়া যাইবে। মা বাবাকে দেখিতে পাইবে না, সুকুকে কেমন করিয়াই সে ছাড়িয়া থাকিবে? সময়ে সময়ে বালিসে মুখ গুঁজিয়া, ঠোঁটে ঠোঁটে চাপিয়া অনেক চেষ্টা দ্বারাও আত্মসম্বরণ করিতে কৃতকার্য্য হইতে পারে না। কোথা হইতে কেজানে হুহু করিয়া চোখে জল আসিয়া পড়ে। ম্লানমুখে বাবার খাবার আনিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। মার গৃহকার্য্যে সাহায্য করিতে করিতে অন্যমনা হইয়া যায়। সব সময় হয়তো সুকুরই সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হইয়া উঠে না। মণিমালা বিদ্রূপ করে 'একদিন সবারি বিয়ে হয় গো, তা বলে আর কেউ এতো করেই বরের ভাবনা ভাবে না।' সুকু রাগিয়া বলে—যাও দিদি তুমি যেন কি হচ্ছো! তাহলে আমি কিন্তু তোমার সঙ্গে যাবো না। শ্বশুরবাড়ি যাবার সময় নিয়ে যেও তুমি ঐ কুনো বেড়ালটাকে।' মাতা সস্নেহে অশ্রু মুছিয়া ভাবেন 'শ্বশুর বাড়ি যাবার ভয়ে মেয়ে আমার আধখানি হয়ে গেলো। মাগো আমি আমার লতিকে ছেড়ে কেমন করেই থাকবো! আমার বাড়ি ঘর সব অন্ধকার হয়ে যাবে। কোথায় যাবে? কে তাহাকে সময়ে আহার দিবে? যত্ন আয়ত্তি করিবে কিনা? জামাই না জানি কেমন চোখে দেখিবে?" সুখের মধ্যে এইরূপ দুঃখের ভয়ের কতো ভাবনা, তাহা সেই মাতৃহৃদয়ই বলিতে পারে।

বিবাহের পর যখন গোলাপি বেনারসী সাড়ি পরা সর্ব্বাঙ্গে স্বর্ণালঙ্কারভূষিতা অশ্রু-মুখী নতাননা শান্তি তাহার সঙ্গিনীদের দ্বারা পরিবেষ্টিতা হইয়া ধীর অনিচ্ছুক গতিতে গাঁঠছড়া বাঁধা বরের সহিত পিতার পায়ের কাছে আসিয়া প্রণাম করিয়া দাঁড়াইল তখন অদম্য অশ্রুজলের প্রবাহে স্থির গম্ভীর প্রকৃতি রজনীনাথের দৃষ্টি রোধ হইয়া গিয়া-ছিল। তিনি তাঁহার কম্পিত দক্ষিণ করে ধীরে ধীরে ধানদূর্ব্বা তুলিয়া সুগভীর স্নেহের ধারায় তাহা সিক্ত করিয়া তাঁহার অন্তরের আশীর্ব্বাদের সহিত তাঁহার স্নেহাধার-দ্বয়ের মস্তকে প্রদান পূর্ব্বক একে একে উভয়ের মস্তকে চুম্বন করিলেন তারপর পুরমহিলাগণের আদেশে কন্যার স্বর্ণমণ্ডিত দক্ষিণ হস্ত এক হস্তে উঠাইয়া লইয়া অপর হস্তে জামাতার হস্ত ধারণ করিয়া উভয়ের হস্ত একত্র করিয়া গদ্ গদ্ কণ্ঠে জামাতাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—

"হেম! আমার শান্তিকে আজ আমি তোমার হাতে দিলেম। এতোদিন সে আমার ছিল, আজ হতে আমার শান্তিলতা তোমার হলো। তুমি তাকে বিপদে সম্পদে রক্ষা করো, পালন করো, বালিকার সমুদয় ত্রুটি অপরাধ মার্জ্জনা করে তাকে নিজের মনের মতন করে গড়ে নিও। মা আমার! নূতন জীবনে সুখী হয়ো।" তাঁহার দুই চক্ষু হইতে ঝর ঝর করিয়া আনন্দ মিশ্রিত বেদনার

অশ্রুজল ঝরিয়া সেই পবিত্র পূত স্নেহাশ্রুবিন্দু নবদম্পতির সম্মিলিত হস্তবন্ধনের উপর পতিত হইল। পিতৃহৃদয়ের সেই অনন্ত আশীর্ব্বাদ অতুল্য স্নেহধারায় সেই মঙ্গল বন্ধন আরো পবিত্র, আরো নিবিড় করিয়া তুলিল। তীর্থসঙ্গমের মত পবিত্র সেই সম্মিলন যেন জাহ্নবীসলিলস্পর্শে পবিত্রতর হইয়া উঠিল। সেই সকরুণ দৃশ্যে দর্শকবৃন্দের নেত্রও সুখময় বিষাদে ছল ছল করিতে লাগিল। তারপর রজনীনাথ কন্যার হস্ত ধরিয়া বৈবাহিকের নিকটে আসিলেন। শ্যামাকান্তের হস্তে তাহাকে সমর্পণ করিয়া অশ্রুরুদ্ধ স্বরে ধীরে ধীরে কহিলেন "আমার লতিকে আমার মাকে আমি আপনার কোলে তুলে দিলেম। আমি জানি সেখানে সে খুবই সুখে খুবই নিরাপদে থাকবে, তবু বাপের প্রাণ কিছুতে প্রবোধ মানে না। বাপের কর্ত্তব্য শেষ হয় না, আপনার নিকট প্রার্থনা—

শ্যামাকান্ত ব্যস্ত হইয়া তাঁহার হাত ধরিয়া বাধা দিলেন, ভাই অমন কথা বলো না, আমি যে তোমার কাছে কতো ঋণী তা সুধু মা জগদম্বাই জানেন। তুমি আমায় যা দিয়েছ, এ পৃথিবীর মধ্যে কেহই আমায় তাহা দেয় নাই। তুমি সন্তানহীনকে সন্তান দিয়েছ। এসো মা আমার লক্ষ্মী! কেন কাঁদছো মা! বাবার কাছথেকে জ্যেঠামশায়ের কাছে যেতে কি কাঁদতে আছে মা! তাহলে যে তোমার ছেলেটি দুঃখ করবে।"

অশ্রুজলে ভাসিয়া নববধূবেশে শান্তি তাহার আজন্মের ঘর বাড়ি চিরদিনের স্নেহের নীড় ছাড়িয়া অপরিচিত সঙ্গীর সহিত কোন্ অজানা গৃহোদ্দেশে চলিয়া গেল! গাড়িতে উঠিবার সময়েও সে তাহার বাবাকে দুই হাত দিয়া এমনি করিয়া জড়াইয়া রহিল, যে সে নির্ভর বাহুপাশ ছিন্ন করা তাঁহার কঠিন হইয়া উঠিয়াছিল। সেই স্নেহপালিতা ক্ষুদ্র লতাটি যে প্রকাণ্ড মহীরুহের আশ্রয়ে এতদিন বর্দ্ধিত হইতেছিল সেই নিরাপদ কক্ষ ছাড়িয়া কোথায় কোন অপরিচিত উদ্যানক্ষেত্রে প্রোথিত হইতে চলিয়াছে। সেখানের ঝঞ্ঝা বৃষ্টি বজ্র হইতে উৎপাটক কি তাহাকে এমনি করিয়া রক্ষা করিতে পারিবেন?

সুপ্রকাশ তাহার নূতন জরীর পোষাক পরিয়া দিদির সঙ্গে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছে। সে দিদির এতদূর কান্নাকাটি মনে মনে একটুও পছন্দ করিতেছিল না। এমন সুন্দর জামা কাপড় এতো গহনা ফুলের মালা পরিয়া এমন উৎসব সমারোহের মধ্যে চতুরশ্ব যানে চড়িয়া দেশান্তর গমন; ইহার মধ্যে যে কান্না আসিবার কি কথা আছে সুকু তো তাহা বুঝিয়াই উঠিতে পারে না। আশ্চর্য্য! মা বাবা পর্য্যন্ত কান্না আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। সে যেদিন বর সাজিয়া অমনি মুক্তার মালা, হীরার আংটি পড়িয়া এমনি ধুমধামে বধূ আনিতে যাইবে সেদিন যদি মা বাবা ও দিদি এমন করিয়া কাঁদিতে বসে তাহা হইলে সে কিন্তু ভারি রাগারাগি করিবে। দিদি যে এখনও অত্যন্ত ছেলে মানুষ ও নির্ব্বোধই রহিয়া গিয়াছে ইহা মনে করিয়া তাহার প্রতি তাহার একটু করুণা হইল। সে তাহাকে একটু আশ্বস্ত করিবার জন্য তাড়াতাড়ি তাহার কাছে আসিয়া কানের কাছে মুখ আনিয়া চুপি চুপি বলিল "দিদি তুমি কেঁদো না ভাই! আমি

কাল ফিরে আসবো না, কিছুতেই আসবো না, আমার ট্রাঙ্কের মধ্যে গোলকধাম ও দশপঁচিশ নিয়ে নিয়েছি সেখানেও খেলা হবে।" তাদের বাগানে লুকোচুরি যদি খেলতে না দেয় তো ছাদে নাহয় খেলবো।"

শুনিয়া দিদির অশ্রুপরিপ্লুত মুখখানি একটা স্নেহ করুণ হাস্যের আভাষে বর্ষাকাশে মৃদু সূর্য্যালোকের ছটার মত একটু খানি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

তারপর সে আবার তেমনি সমারোহের মধ্যে সেই ইন্দ্রপুরীতুল্য প্রাসাদে শত হুলুধ্বনি ও মঙ্গলাচারের মধ্যে সাগ্রহে সাদরে গৃহীত হইল। সেই পুরাতন প্রাসাদ আজ আবার অনেকদিন পরে তাহার শোকমলিন অঙ্গ মার্জ্জিত করিয়া নূতন শোভায় সুসজ্জিত হইয়া উঠিয়াছিল। একটি হৃদয় ভিন্ন আজ সর্ব্বত্রেই নূতন চিন্তা। হায় দুর্ভাগ্য বিনোদ! একি তোর দুর্জ্জয় অভিমানের পরিণাম!

ক্রমে ক্রমে ফুলশয্যা, বৌভাত প্রভৃতি বিবাহের আনুসঙ্গিক অন্যান্য আবশ্যকীয় মঙ্গল অনুষ্ঠান সকল যথারীতি রূপে সম্পন্ন হইয়া গেল। বিবাহের রাত্রি বেদমন্ত্রে এবং গুরুজনের আশীর্ব্বাদে বালিকা শান্তির ক্লান্ত-হৃদয়ে একটি নূতন রেখাপাত করিল। কিন্তু শুভদৃষ্টির সময় সকলকার পুনঃপুনঃ অনুরোধে তাহার লজ্জামুকুলিত চক্ষু তুলিয়া সম্মুখস্থ চক্ষে স্থাপন করিতে গেল, ঠিক সেই সময়ই মণিমালার একটা সমালোচনাসূচক বাক্যে তাহার হৃদয়খানি একটা অজ্ঞাত ব্যথায় ব্যথিত হইয়া চমকাইয়া উঠিল। মুহূর্ত্তে সম্মুখের দৃশ্যপট অপসৃত করিয়া তাহার স্থানে সেই কাতরতাপূর্ণ হতাশদৃষ্টি করুণ মুখখানা ভাসিয়া উঠিল। চমকিয়া সে চক্ষু নত করিয়া ফেলিল। আর চাহিতে পারিল না।

ফুলশয্যার রাত্রে হেমেন্দ্র যখন আদর করিয়া তাহার মুখের দীর্ঘ ঘোমটা খুলিবার চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হইল, এবং মৃদু হাসিয়া স্বহস্তে ফুলের পাখা দ্বারা বাতাস করিয়া বলিল "ভারি গরম, কাপড় মুড়ি দিয়ে ঘেমে উঠ্‌ছো যে, খুলে ফেল" তখন সে চকিতমাত্র নতনেত্র তুলিয়া আধ অপসৃত ঘোমটার মধ্য হইতে স্বামীর দিকে চাহিয়া দেখিয়া ঘোমটার মাত্রাটা আরো একটুখানি বাড়াইয়া দিল। দেখিল, চকিতের মধ্যেই দেখিল সেই মুখখানি অত্যন্ত সুন্দর। হেমেন্দ্রও তখন তাহার দিকে চাহিয়াছিল, সে দৃষ্টি যদিও তেমন করুণ, তেমন উজ্জ্বল, তেমন মর্ম্মস্পর্শী নহে তথাপি শান্তি মনে মনে স্বীকার করিল, খুব সুন্দর পুরুষ। সে কাহারো সহিত এমূর্ত্তির তুলনা করিল না, করিলে কোনখানে গলদ ঘটিত বলা যায় না। সে কিন্তু নত মস্তকে নীরবে এই অপরিচিতকে চিরনির্ভর করিয়া ধরিল মনে পড়িল বাসরে একজন ঠানদি বলিয়াছিলেন 'রতির আমাদের তপস্যা ভাল, যেন মদনরতির মিলন হয়েছে।' হেমেন্দ্রও মুগ্ধ নেত্রে তাহার নব পরিণীতাকে দেখিতেছিল, সেও প্রশংসাসূচক ভাবে স্বীকার করিল 'কুন্দ কিম্বা সূর্য্যমুখী, রেবেকা কিম্বা আয়েসা এমন সুন্দরী ছিল কি?' তাহাদের বর্ত্তমান সংস্করণেরা তো অতো রংচং লাগাইয়াও ইহার কাছে দাঁড়াইতে পারে না। হাঁ স্ত্রী হয়তো এমনি।"

তারপর ধীরে ধীরে একটু একটু করিয়া নবদম্পতির মধ্যে পরিচয় হইতে লাগিল।

ক্রমেই যেন শান্তির মন হইতে পূর্ব্বেকার সেই ভার বোধটা সরিয়া সরিয়া হাল্কা হইয়া আসিতে লাগিল। তারপর পিত্রালয়ে ফিরিবার দিন হেম তাহার কোমল হাত দুখানি দুহাতে ধরিয়া ম্লানভাবে বলিল 'চল্লেম শান্তি, আবার কবে দেখা হবে কে জানে।' হেম চলিয়া গেলে তাহার মনটা একটুও যে কেমন কেমন করে নাই, তাহাও আমরা বলিতে পারি না। পিতৃগৃহে আসিয়া কয়দিনকার বন্দিত্বের শোধ সে কড়ায় গণ্ডায় মিটাইল। প্রতিবেশিনী ও কুটুম্বিনীরা তাহার অপর্য্যাপ্ত হীরা মুক্তার দিকে লুব্ধ ও ঈর্ষান্বিত ভাবে চাহিয়া যথেষ্ট প্রশংসা করিল। মাতা বলিলেন গহনাগুলো ভারি সেকেলে, কিন্তু জিনিষ বটে। পিতা বলিলেন, কি সর্ব্বনাশ! একটা মানুষে এতো সব পরতে পারে? ওরে বুড়ি! এমন কর্ম্ম কখনো করিস্‌নি মাথা ধরে উঠবে। বসুমতী ঈষৎ বিরক্ত ভাবে কহিলেন, "তোমার এককথা, মাথাই বা ধরতে যাবে কেন? পরবে না তো কি গহনাগুলো যকে দেবে?" রজনীনাথ হাসিয়া উত্তর করিলেন "কেমনই বা মাথা তোমাদের কে জানে! আমার তো ওগুলো দেখলেই মাথা ধরে ওঠে। আমার সুন্দর মেয়েকে কুৎসিত করবার এ ফন্দি।"

মণিমালা আসিয়া তাহার গলা ধরিয়া বরের কথা জিজ্ঞাসা করিল, এবং পীড়াপীড়ির চোটে সব কয়টি কথা বাহির করিয়া লইয়া শেষে বিস্ময় প্রকাশ করিল "ওমা! শুধু ঐ রকম ছাড়া ছাড়া কথা? তোর ভগ্নিপতি কিন্তু ভাই ওর চেয়ে অনেক কথাবার্ত্তা বলতেন। রাত্রে ঘুমুতেই পেতাম না! হেম অমন কেন?

শান্তি লজ্জায় রক্তিম হইয়া উঠিয়া সবেগে বলিয়া উঠিল "দূর সে বুঝি ভাল!" মণিমালা তথাপি ছাড়িল না, হাসিয়া বলিল "তখন ভাল লাগতোনা তা সত্যি; যাই বলিস ভাই! তোর বর কিন্তু বেরসিক। এ দিকেতো দিব্যি সৌখিন মানুষ কিন্তু ধরণটা যেন কেমন কাঠ কাঠ, বড্ড গুমুরে বোধ হয়, তা বড় লোকের ছেলে হবে নাই বা কেন? সে যেমন আমাদের নীরদকুমার, তার কি মিষ্টি ধরণটি, অমনটি আর কারও দেখা যায় না। অথচ কেমন তেজী লোক।"

শান্তির আরক্ত মুখখানা মুহূর্ত্তে কাগজের মত সাদা হইয়া গেল।

(১৬)

দ্বিপ্রহরের প্রখর সূর্য্যতাপে চারিদিক ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে। রৌদ্রের বাতাসে অদূরস্থ নারিকেল বাগানের উচ্চশীর্ষবৃক্ষশ্রেণীর কোন অদৃশ্যমান নীড় হইতে চিলের শুষ্ক স্বর ভাসাইয়া আনিতেছিল। একটা আমগাছের শীতল ছায়ায় বসিয়া মালী ও ভৃত্যদের ছেলেরা ঘুঁটিং খেলিতেছিল, ইহারা এখানের তিনপুরুষের বাসিন্দা। মালীর গৃহমধ্যে তালপাতের চেটাই পাড়িয়া মালিপত্নী নিদ্রামগ্না। মালীর ঘরের দক্ষিণেই বৃক্ষচ্ছায়া ঘেরা পুষ্করিণী; তাহার চারিপাড়ের বাঁধা ঘাট এখন জনশূন্য। কেবল একপাশে ঘাটে বসিয়া একটা নিষ্কর্ম্মা বালক জলের মধ্যে বঁড়সি ডুবাইয়া পাষাণমূর্ত্তির মত চুপ

জমিদারদের কোলাহলমুখরিত প্রকাণ্ড বাড়িটা দ্বিপ্রহরের বিশ্রাম অবসরে এখন অনেকখানি :সংযত। যেখানে কোলাহলের প্রধান আড্ডা সেই দাসীমহলেও এখন একজনের ভিন্ন সাড়া পাওয়া যাইতেছে না। উচ্ছিষ্টাভিলাষী কাকের দল সে শোধটা তুলিয়া লইতেছিল। বিধু ঝি জোরে জোরে পিত্তলের উপরে তেঁতুল ঘর্ষণ করিতে করিতে সেই স্বরে স্বর মিলাইয়া আত্মগত বলিল "মর হতভাগা কাকগুলো কি অলুক্ষুণে ডাকই ডাকতে লেগেছে। শুনলে যেন গা শিউরে উঠে।" চন্দর হেঁসেল নিকাইয়া এইমাত্র বাহিরে আসিয়াছে সে সঙ্গিনীর টিপ্পনীতে টীকা কাটিল "অলুক্ষুণে বলে অলুক্ষুণে! বামুনদিদি বলে—যেবারে আমাদের দাদাবাবু নিউদ্দেশ হয়ে যায় সেবারে নাকি এই পোড়ার মুখোরা এমনি ডাক ডেকেছিল, শুনিসনি নাকি বিধি! তুই তো সেই বছরেই এলি।" বিধু পূর্ব্বকথা স্মরণ করিতে গিয়া দেখিল সেই তার শিশুকাল হইতেই কাক দল এমনি উৎসাহে গৃহস্থের ঘর সরগরম রাখিয়া আসিতেছে। কোনদিনই ইহার ব্যত্যয় হইয়াছে বলিয়া তাহার মনে পড়িল না। কিন্তু তাহা মুখে স্বীকার করিলে ব্রাহ্মণ-ঠাকুরাণীর বহুদর্শিতা ও বিশ্বাসের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া তাহাকে অপমানিত করা হয় সেইজন্য সে সাগ্রহে তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিল "ওমা তা আর মনে নাই, সে এক কাণ্ড! তা দেখো ভাই সেদিন আবার ঐ পুরণো পাঁচিলটের পাশে একটা শেবা ডাকছিল, তা যতো বিদঘুটে জানোয়ারগুলো তো মরতে আর জায়গা পায় না।" বিধু ঝাটা আস্ফালন পূর্ব্বক সেই কুদর্শন, কৃষ্ণাঙ্গ জীবদলকে তাড়না করিয়া সমস্বরে সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া বলিল "সত্যি বলেছ দিদি, হতভাগাগুলো তো মরতেও জানে না! এই যে পিরমিমিতে এতো ব্যায়রাম, স্যায়রাম হচ্চে, পটাপট মানুষ মরচে তা কাকগুলোকে তো মরতে দেখিনে! পেলেগ না ফেলেগেতে ইঁদুর মরে তা কাকগুলোকে কি মরণও দেন নি গা! এমন একচোকো ঠাকুরও তো দেখিনি। ছিষ্টিতে এতো মনিষ্যি এতো জন্তু থাকতে অমর হলো কিনা ওরা! তা বোন কলির ধর্ম্মই এমনি! এই দেখো না ছেরকাল ধরে খেটে মনু আমরা আর মাঠকুরুণের সঙ্গে তীথি কর্ত্তে যাবে কিনা তারিণী আর বিমলি, বিচার দেখলে?"

চন্দরা ও বিধুমুখী উভয়েই কাল ধর্ম্মের অবিচারের কথা ভাবিয়া একান্ত দুঃখে গভীর নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া সদুঃখে বলিল "আর বোন ওকথা বলিস নে, আর কি এখন আমাদের কাল আছে না দিন আছে? এখন যতো খোসামুদেরই রাজ্যি! তা দাঁড়া না দু দিন; নতুন মা একটু ভারিক্যিক হোক। এরিমধ্যে দেখছিস না,—ওমেয়ে গুণের আদর করতে জানে। শ্বাশুড়ি ভালবাসতো শুনে অবধি আমার কতো খাতির করে দেখিসনি? ও বিদি! আমার পোড়া দুখানা আজ তুইই না হয় মাজনা ভাই! আমি একবার মিতিনের সঙ্গে দেখা করে চট করে তামাক পোড়াটুকু বানিয়ে নে আসি!"

প্রাত্যহিক কাজ কর্ম্ম সারিয়া আহারান্তে নিজের নির্জ্জন ঘরে বসিয়া শান্তি তাহার

পিতৃদত্ত সেলাইয়ের কলে মণিদিদির নবপ্রসূত সন্তানের জন্য একটা ফ্রক সেলাই করিতেছিল। নিকটস্থ খোলা জানালার মধ্য দিয়া ঈষদুষ্ণ বাতাস আসিতেছিল। সে যেন সুরভিলোভে তাহার খোলা চুলগুলার নিকট হইতে কোনমতেই নড়িতে পারিতেছিল না। তাহাদের উড়াইয়া উড়াইয়া দীর্ঘতা পরীক্ষা করিতেছিল, নাচাইয়া নাচাইয়া খেলা করিতেছিল, আবার ভিজাচুল শুথাইয়াও দিতেছিল। জানালার বাহিরে কার্ণিসের উপর একটা ক্ষুদ্র বিরহী ঘুঘু বসিয়া আকুল বিরহ গানে জগতের কর্ম্মাবসরে ক্লান্ত বিরহীর অর্দ্ধ-নিমীলিত তন্দ্রাজড়িত চক্ষের সম্মুখে করুণ-বিরহচিত্র প্রতিফলিত করিতেছিল। কিন্তু তথাপি তাহার প্রবাসী প্রিয়ের কোন সাড়াই পাওয়া গেল না। জগতের নিয়মই বুঝি এই? একজন অন্যের জন্য কাঁদিয়া ফিরিবে! উদ্যানে বসন্তের পদচিহ্ন অশোকশাখায় লোহিত রাগে ফুটিয়া রহিয়াছে। আম্রমুকুলের মদির সুবাসে ভ্রমরকুল মাতাল হইয়া ঢলিয়া পড়িতেছিল। পাখীগুলার আনন্দ কলরবের শেষ নাই। গন্ধরাজের অতোটা গন্ধ রোদের তেজে শুথাইয়া ফুরাইয়া গিয়াছে।

ফ্রকটা শেষ হইয়া গেল, নিজের হাতে কাটা সুতায় বোনা লেশ দ্বারা তাহার গলায় ফ্রিল ঝুলাইয়া দিয়া কল বন্ধ করিয়া সে একটু কি ভাবিল। তারপর আপনা আপনিই একটু সলজ্জ হাসি হাসিয়া বলিল 'না, তিনি আসবেন না।'

একপাশে একটা কাঠের চৌকির উপরে সেগুন কাঠে পালিস লাগানো একটি চরকা একখানি কাপড় দিয়া ঢাকা ছিল। শান্তি একবার এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিয়া সেটাকে নামাইয়া লইল। চুপড়িতে পাঁজ পাকাইবার সরকাঠি বাগানের কাপাসতুলা এবং একটি ছোট ধনুকের মতন তুলা বুনিবার যন্ত্র আছে। তৈরি সুতাটুকু সুতার নাটাইয়ে জড়াইয়া লইয়া পরীক্ষা করিল, দুটো পৈতে হতে পারে, কিন্তু লেশের জন্য সরু সুতা চাই।

প্রথমটা চরকার ঘরঘর শব্দে শুনিতে পায় নাই, কিন্তু যখন সেই পরিচিত জুতার শব্দটা দ্বারের কাছাকাছি পৌঁছিয়াছে সেই সময়ে তাহার কর্ণে সে শব্দ প্রবেশ করিল, সে পদশব্দ তাহার স্বামীর, হেমেন্দ্রনাথের, তাই সে একটু চঞ্চলভাবে হস্তস্থ সুতাটুকু ছাড়িয়া দিয়া মাথায় কাপড় তুলিয়া দিল, এবং তারপর দ্বারের দিকে একবার চকিত নেত্রপাত করিয়া মুখ নীচু করিয়া টোকা হইতে সুতা খুলিতে মনোযোগ প্রদান করিল। চিত্তবেগজনিত ভাবপরিবর্ত্তনটা প্রকাশ করিয়া ফেলিতে ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু তাহার নত দৃষ্টির মধ্যদিয়া প্রীতির একটি স্নিগ্ধচ্ছটা বিশেষ চেষ্টা স্বত্ত্বেও গোপন রহিল না। একটি মধুর সলজ্জ রাগে মুখখানি নতুন কোটাফুলের মত সুন্দর হইয়া উঠিল।

মধ্যাহ্ন নিদ্রা হইতে জাগিয়া হেমেন্দ্রনাথ আজ হঠাৎ অনেক দিনের পরে এ সময়ে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। বিবাহের পর প্রথম প্রথম সুন্দরী স্ত্রীকে একদণ্ড চোখের অন্তর করিতে ইচ্ছা হইত না। সেই অত্যধিক লাভেচ্ছা পত্নীকে কতকটা কষ্টক্লান্ত করিয়া তুলিয়াছিল। এবং তাহার হাত হইতে মুক্তি

পাইবার জন্ম অনেক সময় লজ্জাসঙ্কোচে সঙ্কুচিতা বধূকে, হরির শরণাপন্ন হইতে হইয়াছে। হেমেন্দ্র বলে সংসার দেখিবার তোমার কি প্রয়োজন? সে সকল যাঁহারা বাড়ি জুড়িয়া বসিয়া বসিয়া অন্নরাশি ধ্বংস করিতেছেন, তাঁহারা দেখুন না! এতো নবাবী কেন? আর তোমার জ্যেঠামশায়ের সেবা! তা সেও তো এতোকাল চাকর দাসীতেই করিয়া আসিতেছে, তোমায় কি কেবল খাটাইতেই আনিয়াছেন নাকি? যাহাদের একশত লোক হুকুম বরদারী করিবার জন্ম মুখ চাহিয়া হাজির আছে, তাহারা কোন দুঃখে কাজ করিবে?

এই সকল সদুপদেশ পালন করা শান্তির পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িত। সে লজ্জায় ঘৃণায় মর্ম্মের মধ্যে মরিয়া যাইত। এবং স্বামী আজ্ঞা লঙ্ঘন করা ভিন্ন তাহার এখানে গতি ছিল না। তারপর আব্দারে বালকের সখের পুতুলের মত বাক্সে না তুলিয়া আলমারির মধ্যে না সাজাইয়া দিনরাত নাড়াচাড়ায় দুদিনে নূতনত্বের সাধ মিটাইয়া ফেলিয়া সে এক অভিজ্ঞতা লাভ করিল। একদিন বন্ধুবর যোগেশের উপদেশে হঠাৎ জ্ঞান হইল, 'সত্যই তো সে এতোবড় একটা লোক, ভাবি জমীদার, সে কিজন্য এমন করিয়া স্ত্রীর আঁচল ধরিয়া থাকে? ইহাতে তো তাকে ভারি প্রশ্রয় দেওয়া হইতেছে! বরং সেই তাহার সাক্ষাৎলাভের জন্য আকুলি বিকুলি করুক।"

বুদ্ধিটা ঠিক মনের মধ্যে থাপ খাইয়া বসিল। যোগেশ যে গ্লাডষ্টোনেরি মত বুদ্ধিমান তাহা সেদিন সপ্রমাণ হইয়া গেল।

হেমেন্দ্র ঘরের মধ্যে পা দিয়াই ঈষৎ বিরক্তির স্বরে বলিয়া উঠিলেন "এই যে আবার আজ চরকা নিয়ে বসে গেছ! আচ্ছা এ পাগলামি কি তুমি ছাড়বে না? ভদ্র ঘরে এসেছ, অমন জোলানীর মতন সখ কেন? শিল্প কাজ করতে হয় একটা মেয়ে রেখে-দিচ্ছি ভালরকম শিল্প শেখো, ছোটলোকের মতন চরকা ঘ্যান ঘ্যান ভাল লাগে না!

শান্তি মাটি হইতে দৃষ্টি না তুলিয়াই একটুখানি সলজ্জ হাসিল, আস্তে আস্তে বলিল "বাবা বলেন, সূক্ষ্ম শিল্পের চেয়ে সূতা কাটা শেখা আমাদের বেশি দরকার। সেলাই, বোনা এসব তো কিছু কিছু জানি, কিন্তু তারচেয়ে আমারো সূতা তৈরি করতে ভাল লাগে। বাবা বলেন পূর্ব্বে আমাদের দেশের মেয়েরা ঘরে ঘরে সূতা কেটে তাঁতিদের কাপড় বুনতে দিত। বাবা—"

বিদ্রূপের সহিত রুষ্ট হাসি হাসিয়া উঠিয়া হেম বলিল "বলতে দাও তোমার বাবাকে, তিনি যা বলেন, তাই যে একেবারে দেববাক্য তা কিছু নয়। তাঁর পরামর্শে চলতে গেলেই আমাদের অধঃপাতে যেতে হবে কোন দিন দেখছি। তিনি উকিল, তাঁর সবই সাজে। আমাদের এতো বাড়াবাড়ি করলে, যোগেশ বলছিল, কোনদিন কালেক্টার সাহেবের নজর পড়বে। একে তাঁরি পরামর্শে সেদিন বাবা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়লের চাঁদায় পঞ্চাশটী টাকা দিয়া মহা অন্যায় কাজ করলেন। তার ফল ভুগতেই হবে, তার উপর তোমরা যদি দেশশুদ্ধ লোককে তুলোর চাষ, তাঁত ও চরকা নিয়ে নাচিয়ে তোল তাহলে পথে গিয়ে দাঁড়াতে হবে দেখছি। ওসব ছাড়ো, কথা

শোন, স্বামীর কথা শুনলে পাপ হবে না। বল তো একটা মেম গবর্ণেস রাখিয়ে দিচ্ছি, সাহেব শুনলে খুসী হবে এখন। যোগেশ বলছিল দুশো টাকা মাইনে দিলে, ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কে আত্মীয়া একটি মিস্ নারায়ণগঞ্জের কুঠিতে থাকেন তাঁকেই ঠিক করে দেয়।"

শান্তি একবার নতমুখ তুলিয়া সবেগে বলিয়া উঠিল 'না, সে জ্যেঠামশাই পছন্দ কর্বেন না', তারপর ঈষৎ অপ্রতিভভাবে, মৃদুস্বরে কহিল "সেলাই তো আমি চলনসই জানি, বেশি করতে তো সময় হবে না, সে কাজ নাই। তাছাড়া—"

বলিতে গিয়া হঠাৎ সে থামিয়া গেল। হেমেন্দ্র বিরক্তভাবে জিজ্ঞাসা করিল "কি তাছাড়া?" "এতো টাকা একজন মেমকে দিয়ে কি হবে? এবৎসর একে বৃষ্টির জন্য ফসল বেশি না হওয়াতে প্রজাদের কিছু ছেড়ে দিতে হবে।"

সরোষে ভাবি জমীদার বসিতে বসিতে বলিয়া উঠিল "মিথ্যাকথা, ফসলের কিছু অভাব হয়নি। ওসব কেবল শালাদের বদমাইসি। বাবা আবার তাই বিশ্বাস করেছেন। ঐতেই সব গোল্লায় যাবে দেখছি। এ বোধহয় শ্বশুরমশাই পরামর্শ দিয়েছেন।

শান্তি সজলনেত্র তুলিয়া করুণদৃষ্টিতে স্বামীর দিকে চাহিল। হেমেন্দ্র ততোক্ষণে সোফার উপর শুইয়া পড়িয়াছে। ভাল করিয়া আলস্য ভাঙ্গিতে ভাঙ্গিতে বলিল "এ আবার কি হুজুক উঠছে শুনছি? তোমরা নাকি তীর্থভ্রমণে চল্লে?" শান্তি ধীরে ধীরে উঠিয়া আসিয়া স্বামীর অনতিদূরে সোফাখানা ঘেঁসিয়া মেজেতে বসিল। স্বামী না ডাকিলে কাছে যেতে এখনও তাহার একটু লজ্জা একটু সঙ্কোচ বোধহয়। ইচ্ছা সত্বেও সেইজন্য সে নিজের পূর্ণ অধিকার গ্রহণ করিতে পারে না। এ গৃহের সে সর্ব্বময়ী গৃহিণী, কারণ গৃহস্বামী তাহাকে সে পদ সম্পূর্ণরূপে প্রদান করিয়াছেন। শ্বশুরের উপর সেই দাবীতেই মাতৃত্বের পরিপূর্ণ গৌরব দখল লইয়াছিল। কিন্তু স্বামীর নিকট নারীহৃদয়ের স্বাভাবিক সরমসঙ্কোচ, মানাভিমান লইয়া সে নববধূ 'কই অযাচিত হইয়া একেবারে পত্নীত্বপদ তো লইতে পারে না।' উত্তর করিল "হাঁ জ্যেঠামশাই যাবেন বলছেন।" "জ্যেঠামশাই তো যাবেন, তুমিও নাকি যাচ্ছো?"

"হাঁ। জ্যেঠামশাইএর ইচ্ছা তুমিও যাও, তোমায় কিছু বলেছেন?"

"আমায়!" হেমেন্দ্র সাশ্চর্য্যে বলিয়া উঠিল "আমার তো সে সাধ নাই। দিব্য বাড়িতে রয়েছি, এসব ছেড়েছুড়ে কোথায় বিদেশে বিভূঁইয়ে অস্থিতপঞ্চকে ঘুরে বেড়াতে যাবো! বানপ্রস্থাবলম্বনের সময় হয়েছে তা আমার তো মনে হচ্ছে না। তা ওঁরা বুড় হয়েছেন, তীর্থ করতে যাচ্চেন, সে বেশ কথা—তোমায় আমায় টানাটানি কেন? তুমি ওঁদের সঙ্গে কোথায় ঘুরতে যাবে? তোমার গিয়ে কাজ নাই।"

শান্তি সাতঙ্কে জিহ্বা দংশন করিল, একবার চকিতনেত্রে দ্বারের দিকে চাহিয়া দেখিয়া শঙ্কিতস্বরে বলিয়া উঠিল "তাকি হয়, জ্যেঠামশাই নিয়ে যেতে চাইছেন কি করে বলবো আমি যাবো না!

হেমেন্দ্র মুখটা একটু ভার ভার করিল "বেশ তবে যেও, আমি যেতে পার্ব্বো না। তুমি গেলে আমার আর ক্ষতিটা কি? তোমারই কষ্ট হবে তাই বলছিলাম।"

স্বামী তাহাদের সঙ্গে যান সে ইচ্ছা শান্তির অত্যন্তই ছিল। কিন্তু সে সম্বন্ধে সে তাহাকে আর কিছুই বলিল না। কাহারো ইচ্ছার বিরুদ্ধে নিজের জেদে কাজ করানো তাহার স্বভাব নয়। বিশেষ হেমেন্দ্রের শেষের কথা কয়টা তাহাকে আঘাত করিয়াছিল। ভালবাসার খাতিরে অনেকখানি অন্যায় সহ্য করা যায়, কিন্তু শান্তি কাছে থাকিবে না বলিয়া হেমেন্দ্রের কিছুমাত্র দুঃখ নাই; এ শুধু তাহার কর্ত্তব্যে বাধা দিবার চেষ্টা?

রাত্রে আহারকালে পাখাহস্তে আসীনা বধূকে সম্বোধন করিয়া শ্যামাকান্ত চৌধুরী বলিলেন "মা আমাদের যাওয়া ঠিক তো?" শান্তি ঈষৎ নতমুখে সলজ্জে উত্তর করিল "হাঁ জ্যেঠামশাই।" "প্রথমে কোথায় গিয়ে উঠা যাবে, তাকি ঠিক করেছ মা?" তাঁহার ক্ষুদ্র জননী, জননীর মতই সস্নেহ হাসি হাসিয়া কহিল "সেটা আপনিই স্থির করুন, জ্যেঠামশাই। আমি মনে করেছিলেম, বৈদ্যনাথে গিয়ে একটু বিশ্রাম করে নেবেন, তারপর গয়া হয়ে পরে কাশী যাবো। আপনার শরীর তো তত ভাল নয়, একেবারে কাশী যেতে টান পড়বে। কিন্তু আপনি—"
বৃদ্ধ জমিদার মুখ তুলিয়া বধূর দিকে সস্নেহে চাহিলেন "আমার মা থাকতে আমি স্থির কর্ব্বো? না মা আমিতো তোমার অবাধ্য ছেলে নই!" বলিতে বলিতে তাঁহার অজ্ঞাতসারে তাঁহার হৃদয় ভেদ করিয়া একটা ক্ষুদ্র নিশ্বাস সহসা বাহির হইয়া আসিল।

মানুষে সংসারপথে চলিতে গিয়া পদে পদে ভ্রম করিয়া বসে। ভ্রান্তিপূর্ণ জগতের এটা অখণ্ডনীয় নিয়ম বলিয়াই যেন মনে হয়। মহা মহা ঋষিরা যখন এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডটাকেই মস্ত বড় একটা ভ্রম ভিন্ন আর কিছুই নহে বলিয়া গিয়াছেন, তখন সামান্য মানুষ সে যাহা কিছু করে যাহা কিছু চাহে যাহা আশা করে সেগুলা কেমন করিয়া অবিচল সত্যস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইবে? তাই অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া অনেক আশা করিয়া যে শ্যামাকান্ত গরীব হেমেন্দ্রকে প্রাণাধিক পুত্রের পরিত্যক্ত শূন্য সিংহাসনে তুলিয়া লইয়া মনে করিয়াছিলেন, সেখানে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সে তাঁহারই হইয়া যাইবে,—বিমানমার্গে সুন্দররূপে নির্ম্মিত অট্টালিকাবৎ সে আশা অচিরেই ভূমিসাৎ হইয়া গেল। এক বৃক্ষ হইতে ছাল কাটিয়া বৃক্ষান্তরে জুড়িয়া দিতে চেষ্টা করিলে যেমন জোড়া লাগে না, বয়স্ক পোষ্যপুত্র লইয়া তাহাকে ঠিক মনের মতন পাইতে আশা করাও তেমনি দুরাশা। গরিবের ছেলে বড়লোক হইয়া হঠাৎ নবাব উপাধিধারী জীবদলের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া বসিল। শ্যামাকান্ত দেখিলেন, তাঁহার নিজ পুত্র বিনোদ বিপন্নের সাহায্য করিতে যে অর্থ ব্যয় করিত, তাহার অষ্টগুণ অধিক হেমেন্দ্র বিলাসিতায় উড়াইয়া দিতেছে। সে দুইখানা পুরাতন গাড়ি কিনিয়া ভর্ৎসিত হইয়াছিল,—হেম এখন নিত্য নূতন গাড়ি ঘোড়ার আস্তাবল ভরাইয়া ফেলিল; বাইসিকল, মোটর সাইকেল,



মহর্ষির বাসভবন—যোড়াসাঁকো

মোটর এসব তো আছেই। হেমেন্দ্র দেখিতে দেখিতে যথেষ্ট বাবু হইয়া উঠিল। তাহার মোসাহেবের সংখ্যা রক্তবীজের ন্যায় দ্রুত গতিই বাড়িয়া চলিল এবং মাতা বীণাপাণির সহিত সম্পর্ক এক রকম রহিত হইল। কালেজে অনুপস্থিতি নিত্য নিত্যই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। কিন্তু সার্কাস বা থিয়েটারের বক্সাসনে উপস্থিতির অভাব ছিল না। এবং নারায়ণগঞ্জের বাগান বাড়ি যাহা বিনোদের পিতামহের মৃত্যুর পর হইতে পরিত্যক্তই পড়িয়াছিল, তাহার নূতন সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গেই আবার পুরাতন স্মৃতির মতন তাহার বৃহৎ উদ্যান ও উচ্চ প্রাচীর ছাড়াইয়া বিস্মিত পথিকবর্গের কর্ণে নারী কণ্ঠের স্বরলহরী ও মধুর নূপুর নিক্কন মধ্যে মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল। দেখিয়া শুনিয়া রজনীনাথ বলিলেন "হেমের স্বতন্ত্র বাড়িতে থাকিবার প্রয়োজন নাই। কাজকর্ম্মের ঝঞ্ঝট লইয়া আমিতো সর্ব্বদা তাহার সংবাদ রাখিতে পারি না। তাহার চেয়ে সে আমার কাছেই থাক আমারও তো স্নকু ভিন্ন বাড়িতে আর কেহ নাই।" শুনিয়া সুখী হইয়া শ্যামাকান্ত হেমেন্দ্রকে ডাকাইয়া তাহার শ্বশুরের আদেশ জানাইলেন, বলিলেন "কাল হইতেই তুমি সেখানে যাও, বিলম্বে প্রয়োজন কি?" হেম সে সংবাদে মহা চটিয়া উঠিল "কি আমি শ্বশুরবাড়ি গিয়ে থাকবো! আপনি এমন কথা আমায় কি করে বল্লেন? তিনি একথা বলে যে আপনাকে শুদ্ধ অপমান করেছেন তা কি আপনি বুঝতে পারেন নি?" শ্যামাকান্ত অনেক প্রকারে তাহাকে বুঝাইতে চাহিলেন যে রজনীনাথের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ ঠিক সে প্রকার নহে। রজনী ঠিক তাঁহার ছোট ভাইয়ের মতন। তিনি যাহা বলিলেন তাহাপেক্ষা সদুপদেশ আর কেহই দিতে পারিবেন না। বিশেষ হেমেন্দ্রনাথের যে অবস্থা, তাহাতে তাহার শ্বশুরালয় বাসে কেহ তাহাকে 'ঘরজামায়ে' ভাবিয়া অবজ্ঞা করিবেন না, সেজন্য ভয় করা অনাবশ্যক। কিন্তু হেমেন্দ্র সে কথা কানেও তুলিল না, সে সাফ বলিয়া দিল "শ্বশুরের কাছে গিয়া সে কিছুতেই থাকিবে না, তাহাতে তাহার পড়াশুনা হোক, আর নাই হোক।"

কিছুদিন পরে সে আরো একটু সাফ্ করিয়া বলিয়া দিল যে 'তাহার চক্ষের দৃষ্টিশক্তি একেবারে হীনতা প্রাপ্ত হইতে বসিয়াছে, আর পড়াশুনা করিতে যাইয়া সে কি অন্ধ হইবে?' তারপর সে একজন ডাক্তারের নিকট হইতে একজোড়া সোনা বাঁধান চশমা পরিবার অনুমতি লইয়া দিনকতোক দার্জ্জিলীং বেড়াইয়া আসিয়া থিয়েটার প্রভৃতি নানারূপ হুজুক লইয়া লক্ষ্মীপুরে অস্থায়ীরূপে বসিল। শ্যামাকান্ত ভয়ে একটি কথাও বলিতে পারেন না, শান্তি একটিও রূঢ়কথা বলিল না। রজনীনাথ তীব্র তিরস্কার করিয়া পাঠাইলেন। কাজেই সে তাঁহার উপর হাড়ে চটিয়া রহিল। শান্তির নিকটে মনের ঝাল মিটাইয়া তাহার পিতৃনিন্দা করিল। শান্তি রাগ বা বিরক্তির চিহ্নমাত্র প্রকাশ না করিয়া বসিয়া শুনিল, এবং সমস্ত টুকু বলা শেষ হইয়া গেলে নীরবে উঠিয়া চলিয়া গেল। পিতার স্বপক্ষে বা স্বামীর বিপক্ষে একটি কথাও বলিল না। যে তাহাদের বুঝে না, বুঝিতে চাহে না কেন সে তাহাকে জোর করিয়া তাহা বুঝাইতে যাইবে?

হেমেন্দ্রের চক্ষে শান্তির সে সহিষ্ণুতাটাকে একটা অপ্রতিহত গর্ব্ব বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। যাহাকে দুকথা শুনাইয়া দিলাম, সে যদি রাগই না করে তাহা হইলে বলার আসল সুখটুকুই নষ্ট হইল। ইহাতে মানুষের রাগ না কমিয়া বরং বাড়িয়াই যায়!

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ।

The Autobiography of Maharshi Devendranath Tagore (with portraits) Translated from the original Bengalee by Satyandranath Tagore and Indira Devi. Calcutta S. K. Lahiri & Co. 1909. Price Rupees 2-8.

মনস্বী বার্ক বলিয়াছেন, "Great men are the guide-posts and Land-marks of our Society." দেবেন্দ্রনাথের জীবনী আলোচনা করিলে আমরা এই সত্য গভীরভাবে উপলব্ধি করি। যিনি সার্দ্ধ শতাব্দীর অধিককাল ব্যাপিয়া বঙ্গীয় ধর্ম্মজীবনের একদিক আপন শক্তির আলোকে উজ্জ্বল রাখিয়াছিলেন, যে আলোকচ্ছটা বঙ্গের অন্তর বাহির এখনও পর্য্যন্ত আলোকিত করিয়া রহিয়াছে এবং ভবিষ্যতেও রাখিবে, আমরা তাঁহার জীবনের কতটুকু সন্ধান রাখি!

যখন পাশ্চাত্যজ্ঞানের,ধর্ম্মের ও সামাজিক আদর্শের প্রবল স্রোত প্রাচ্যসমাজের জীর্ণ প্রাচীরে আঘাত করিতেছিল, তখন দেবেন্দ্রনাথ তৎকালোপযোগী সংস্কার দ্বারা সেই জীর্ণ প্রাচীর সংরক্ষণে সমগ্র শক্তি নিয়োজিত করিয়া সমগ্র বাঙালীজাতির গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন। আমাদের জাতীয় জীবনের এই ধর্ম্ম ও কর্ম্মবীরের জীবনী আলোচনা সমাজের পক্ষে কতদূর শুভকর তাহার ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন।

দেবেন্দ্রনাথের জীবন একটী দীর্ঘ যুদ্ধকাহিনী। ভ্রষ্ট দেশাচার, ভ্রষ্ট ধর্ম্মবিশ্বাস, ইহারাই তাঁহার দুর্দ্দম শত্রু ছিল। তিনি তাহাদিগকে পরাস্ত করিয়া সত্যের সিংহাসন প্রতিষ্ঠা করিতে সমগ্র জীবন অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন। এমন কি যাঁহারা তাঁহার মতের অনুমোদন করেন না—তাঁহারাও তাঁহার মহত্ত্ব, উন্নত চরিত্র, তাঁহার জ্ঞান, তাঁহার সত্যানুরাগ দেখিয়া মুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারেন না।

যিনি কেবলমাত্র একটী মুখের কথায়—আপনার সুবিপুল সম্পত্তি রক্ষা করিয়া সুখে বিলাসসম্ভোগে কালযাপন করিতে পারিতেন, তিনি তাহা না করিয়া ধর্ম্মের জন্য স্বেচ্ছায় সমস্ত ত্যাগে প্রস্তুত হইয়া সামান্যভাবে দিনযাপন করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। তাঁহার সেই সুমহান ত্যাগস্বীকারই তাঁহাকে "মহর্ষি" আখ্যায় উপযুক্ত করিয়াছিল। এমন কি তিনি যদি ধর্ম্মসম্বন্ধে কোনরূপ আলোচনা বা সংস্কার না করিতেন, কেবলমাত্র তাঁহার সেই তরুণ যৌবনের,—যখন ভোগ স্পৃহা মানবের ধর্ম্ম,—সুমহান ত্যাগই তাঁহাকে মহর্ষি নামের যোগ্য করিত।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জীবনের একটী প্রধান ঘটনা—মহাত্মা কেশবচন্দ্রের সহিত, তাঁহার চিরবিচ্ছেদ। তাহার সূক্ষ্ম কারণগুলি বর্ত্তমান গ্রন্থের ভূমিকায় সত্যেন্দ্রবাবু অতি সাবধানে আলোচনা করিয়াছেন। তিনি যে আলোচনা করিয়াছেন তাহা ব্রাহ্মসম্প্রদায়ের ইতিহাসের অন্তর্গত; কিন্তু আমরা যাহারা ব্রাহ্মসম্প্রদায় বহির্ভূত ব্যক্তি আমরা দেবেন্দ্রনাথকে একজন সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মশাখার গুরু না মনে করিয়া, জগতের ইতিহাসে তাঁহাকে একজন মহাত্মা পুরুষ বলিয়াই দেখিতে পাই।

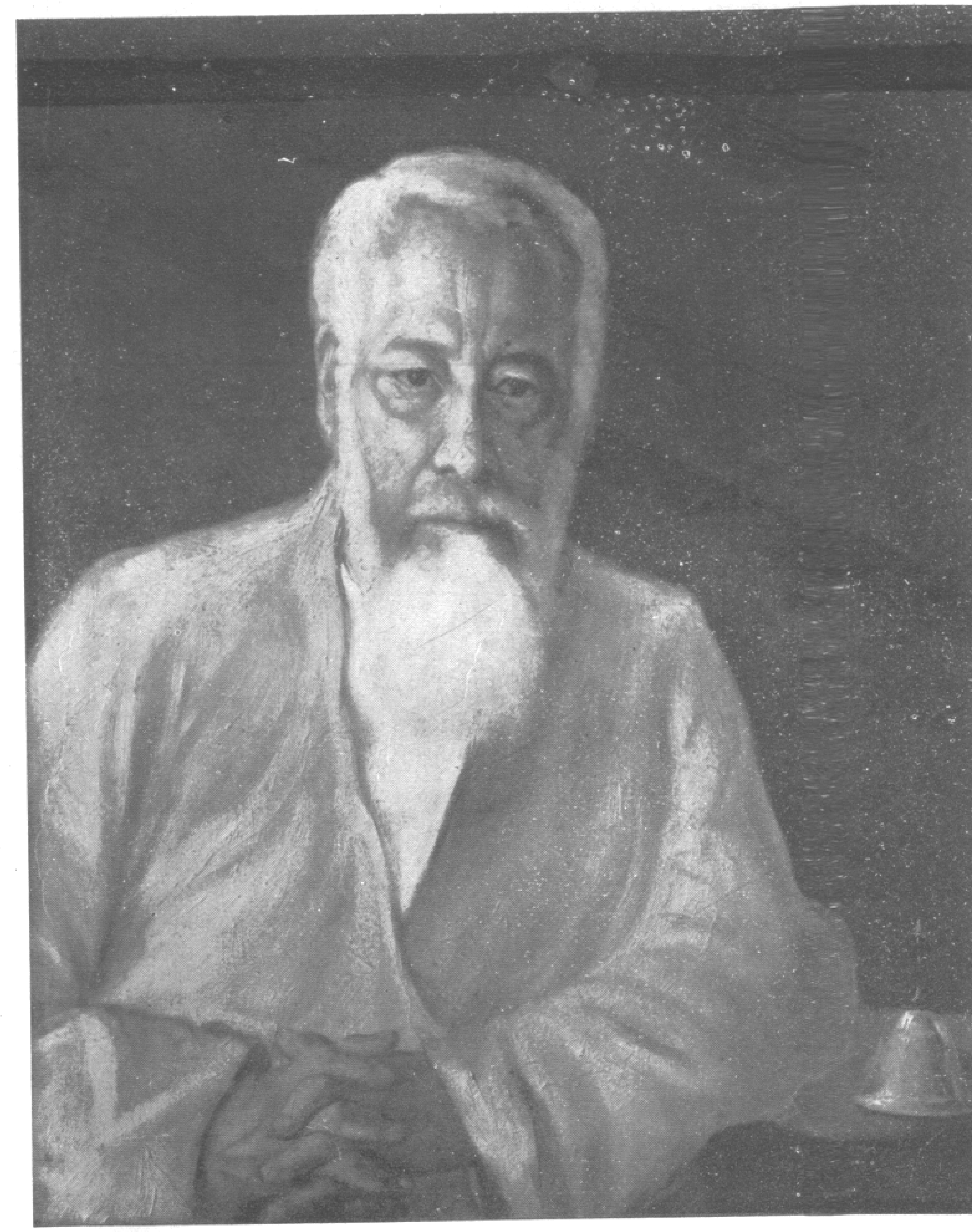
দেবেন্দ্রনাথকে সমাজসংস্কারক মনে করিলে তাঁহার চরিত্র আমরা ঠিক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিব না। তিনি ধর্ম্মসংস্কারক ছিলেন। চিরজীবন ধর্ম্ম ও ব্রহ্মকেই তিনি তাঁহার ধ্রুবতারা করিয়াছিলেন। প্রাচীন ভারতের ঋষিগণ যে ব্রহ্মের স্বরূপ উপনিষদের সূক্তে বর্ণনা



মহর্ষি—(বয়স ৪৫)



মহর্ষি—(বয়স ৩০)



মহর্ষি—(বয়স ৮৫)

করিয়া গিয়াছেন তিনি সেই সনাতন পরব্রহ্মেরি উপাসনার প্রবর্ত্তন করিতে প্রাণপাত করিয়া গিয়াছেন। ভারতের ধর্ম্ম ভারতে প্রচার—ইহাই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল।

তাঁহার ব্রাহ্মধর্ম্ম একটা স্বতন্ত্র ধর্ম্মমত নহে। হিন্দুধর্ম্মের জ্ঞানমূলক ধর্ম্ম—যাহা মহাত্মা রামমোহন রায় প্রবর্ত্তন করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন তিনি সেই মত সমর্থন করিয়া দেশে প্রচার করিতে চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। বেদ না মানিয়াও যদি বৌদ্ধধর্ম্ম সনাতন হিন্দুধর্ম্মের শাখা হয়; জাতিভেদ না মানিলেও শ্রীচৈতন্যদেব যদি হিন্দুধর্ম্মের অবতার মধ্যে গণ্য হন, তবে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ যিনি কেবল সাকার উপাসনা পরিত্যাগ করিয়া হিন্দুধর্ম্মের উচ্চ শাখা নিরাকার উপাসনা পদ্ধতি প্রচার করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তিনি হিন্দুধর্ম্মবিচ্ছিন্ন কোন নূতন মত প্রবর্ত্তন করিতে যান নাই। হিন্দু-ধর্ম্মের অন্যতর সীমা জ্ঞানমার্গ ই যাঁহার অভীষ্ট তিনি কি কম হিন্দু ছিলেন? হইতে পারে আধুনিক "ব্রাহ্মধর্ম্ম" নানা বিষয়ে প্রচলিত হিন্দুধর্ম্ম হইতে স্বতন্ত্রভাব অবলম্বন করিয়াছে, কিন্তু মহর্ষি তাঁহার যে ধর্ম্মমত অতি পরিষ্কার সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন—তাহা আর্য্য হিন্দুরই সনাতন নিরাকারবাদ।

তিনি স্বভাবতঃ রক্ষণশীল ছিলেন—অর্থাৎ হিন্দু-নাম ত্যাগ করিয়া তিনি সমাজ সংস্কারে প্রয়াসী হন নাই। অথচ ধর্ম্মের জন্য যতদূর সংস্কার প্রয়োজন সে বিষয়ে তিনি এতটুকু পরাঙ্মুখ ছিলেন না, এজন্য তিনি তাঁহার পরমাত্মীয়গণকেও ত্যাগ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই।

সমাজ সংস্কারে তিনি যে একেবারেই হস্তক্ষেপ করেন নাই তাহাও আমরা বলিতে পারি না। তাঁহার অনুষ্ঠান পদ্ধতিতে বালিকাদিগের বিবাহের যে বয়স নির্দ্ধারিত করিয়াছেন তাহা হইতে স্পষ্টই দেখা যায়—তিনি প্রচলিত বাল্য বিবাহের পক্ষপাতী ছিলেন না। আর, স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে ত তাঁহার অন্তঃপুর দৃষ্টান্ত স্থল। শুনিতে পাওয়া যায় তাঁহার বিবাহিতা কন্যা ও পুত্রবধূদিগকে সংস্কৃত ও বাঙ্গলা শিক্ষাদানের জন্য তাঁহার অন্তঃপুরে পণ্ডিত নিযুক্ত ছিলেন, এবং মেম আসিয়া ইংরাজি শিখাইয়া যাইতেন। ইহা ছাড়া গৃহে অবস্থান কালে তিনি নিজে প্রত্যহ অন্তঃপুরে ব্রাহ্ম ধর্ম্ম শিক্ষা প্রদান করিতেন। বেথুনস্কুলে শিক্ষার জন্য যাঁহারা সর্ব্ব প্রথম কন্যা প্রেরণ করেন দেবেন্দ্র-নাথ তাঁহাদের মধ্যেও একজন। ভারতী সম্পাদিকা শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীর গ্রন্থ রচনায় তিনি যথেষ্ট উৎসাহ প্রদান করিতেন,—এবং তাঁহার পৌত্রী ইন্দিরা দেবী এবং দৌহিত্রী সরলাদেবী বি-এ পাশ করিলে ইঁহাদের পাণ্ডিত্যে তিনি অতিশয় আনন্দপ্রকাশ করিয়াছিলেন। স্ত্রীলোক মাত্রকেই তিনি লক্ষ্মীস্বরূপা জ্ঞানে সমাদর করিতেন। কি স্ত্রী কি পুরুষ কোন সামান্য দীন ব্যক্তিও মহর্ষির দর্শনে আসিলে তাঁহার ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া গৃহ গমন করিতেন, ইহা একটি প্রবাদ কথা। এইরূপ যেদিক দিয়াই দেখি তাঁহার মহৎভাব উপলব্ধি করি।

এই সর্ব্বগুণসম্পন্ন মহাপুরুষের বাঙলা ১২২৪ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে (ইংরাজী ১৮১৭ মে মাস) জোড়াসাঁকোর সুপ্রসিদ্ধ অট্টালিকায় জন্ম হয়। শৈশবে রাজা রাম-মোহন রায় প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের পর চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সের সময় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ হিন্দু কলেজে প্রবেশলাভ করেন। প্রিন্স্ দ্বারকানাথের পুত্র বিলাস ঐশ্বর্য্যের মধ্যে আজীবন পালিত হইয়া ছিলেন। পিতামহীর তত্ত্বাবধানে দেবেন্দ্রনাথের বাল্যজীবন গঠিত হয়। এই মহীয়সী মহিলার ধর্ম্মভাব দেবেন্দ্রনাথের শৈশব-হৃদয়ে ধর্ম্মের প্রতি একটা আন্তরিক শ্রদ্ধা জাগাইয়া তোলে। কিন্তু শৈবের সে অস্পষ্ট ধর্ম্মের রেখা পরজীবনে সমধিক প্রসারলাভ করিবে বলিয়া কাহারো ধারণা হয় নাই। সাধারণ ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুগৃহের বালকবালিকার মতই দেবেন্দ্র-নাথের শৈশবজীবন গঠিত হইতেছিল। পরমার্থের প্রতি মনের একাগ্র অনুরাগ তখন ব্যক্ত হইবার অবসর পায় নাই বরং ইহলোকের শুভাশুভের বিষয়েই দেবেন্দ্রনাথের কিশোর হৃদয় সমধিক উন্মুখ ছিল। কি করিয়া সহসা একদিন তাঁহার চিত্ত ব্রহ্মের প্রতি সচেতন হইয়া উঠিয়াছিল, তাঁহার 'আত্ম-

জীবনী'তে এ সম্বন্ধে তিনি সুন্দর ইঙ্গিত ব্যক্ত করিয়াছেন। পিতামহীর মৃত্যুর সময় দেবেন্দ্রনাথের হৃদয়ে অবসাদের প্রথম তরঙ্গ উদ্বেলিত হয়। তখন তাঁহার পিতামহীকে গঙ্গাতীরে গঙ্গাযাত্রীদিগের গৃহে আনা হইয়াছে। তিনি 'আত্মজীবনী'তে লিখিয়াছেন, "দিদিমার মৃত্যুর পূর্ব্বদিন রাত্রিতে আমি ঐ চালার নিকটবর্ত্তী নিমতলার ঘাটে একখানা চাঁচের উপরে বসিয়া আছি। ঐ দিন পূর্ণিমার রাত্রি—চন্দ্রোদয় হইয়াছে, নিকটে শ্মশান। তখন দিদিমার নিকট নাম সঙ্কীর্ত্তন হইতেছিল, "এমন দিন কি হবে, হরিনাম বলিয়া প্রাণ যাবে।" বায়ুর সঙ্গে তাহা অল্প অল্প আমার কাণে আসিতেছিল। এই অবসরে হঠাৎ আমার মনে এক আশ্চর্য্য উদাসভাব উপস্থিত হইল। আমি যেন আর পূর্ব্বের মানুষ নই। ঐশ্বর্য্যের উপর একেবারে বিরাগ জন্মিল। যে চাঁচের উপর বসিয়া আছি, তাহাই আমার পক্ষে ঠিক বোধ হইল, গালিচা দুলিচা সকল হেয় বোধ হইল, মনের মধ্যে এক অভুতপূর্ব্ব আনন্দ উপস্থিত হইল। আমার বয়স তখন ১৮ আঠারো বৎসর।"

এই সময় হইতে দেবেন্দ্রনাথের হৃদয়ে ধর্ম্মপিপাসা জাগরূক হইয়া উঠে। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে দেবেন্দ্রনাথ তত্ত্ববোধিনী সভা প্রতিষ্ঠা করেন। সভার অধিবেশনাদি তাঁহার গৃহেই হইত। ধর্ম্মালোচনাই সভার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। প্রতিমাসে উপাসনা, প্রার্থনা, উপনিষদ পাঠও নিয়মিত হইতে লাগিল। এবং ক্রমশঃ এই সভা হইতে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশিত হয়। স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় এই পত্রিকার প্রথম সুদক্ষ সম্পাদক।

১৮৪২ খৃষ্টাব্দে এই সভা রাজা রামমোহন রায় কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্ভুক্ত হয়। এবং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ প্রকাশ্যভাবে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করেন।

১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে দেবেন্দ্রনাথের যত্নে তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা প্রতিষ্ঠিত হয়। বেদান্তের আলোচনা ও ব্রাহ্ম প্রচারকগণকে শিক্ষাদান করাই এই পাঠশালার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। পরবৎসরে এই পাঠশালা হইতে চারিজন ছাত্রকে কাশীতে ধর্ম্মশাস্ত্র—প্রধানত বেদ গ্রন্থ—অধ্যয়নের জন্য প্রেরণ করা হয়। তাঁহারা প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া যথাসময়ে প্রচারকের কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। ইঁহাদিগের মধ্যে পণ্ডিত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশের নামই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি তাঁহার মৃত্যুকাল অবধি সমাজের প্রধান আচার্য্যের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। বেদান্তের অনেকগুলি সংস্করণ ভগবদ্গীতা শ্রৌত ও গৃহ্যসূত্রাদির সম্পাদন করিয়া তিনি বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন।

১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে খৃষ্টান মিশনরীদিগের প্রবল অত্যাচার হইতে স্বধর্ম্ম রক্ষা করিবার বিপুল চেষ্টা ব্রাহ্মধর্ম্মের পক্ষে একটি স্মরণীয় বর্ষ। সে সময় দেবেন্দ্রনাথ অপূর্ব্ব ধীশক্তি দ্বারা আপনাদিগের আসন কি করিয়া সুপ্রতিষ্ঠিত রাখিয়াছিলেন তাহার আমূল বিবরণী প্রদান এই স্বল্প পরিসর স্থানে সম্ভবপর নহে। 'আত্মজীবনী'তে ও সত্যেন্দ্রনাথের ইংরাজী অনুবাদের ভূমিকায় তাহার কৌতূহলোদ্দীপক বিবরণী পাওয়া যায়।

১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে বিলাতে প্রিন্স দ্বারকানাথের মৃত্যু হয়। তাঁহার শ্রাদ্ধাদির সময় আত্মীয়স্বজনের সকাতর অনুরোধ এমন কি আত্মীয়স্বজনের স্নেহ হারাইবার শঙ্কাসত্ত্বেও দেবেন্দ্রনাথ আপনার ধর্ম্মবিশ্বাস অটল রাখিলেন। 'আত্মজীবনী'তে দেবেন্দ্রনাথ বলিয়াছেন,—"ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুরোধে পৌত্তলিকতা পরিত্যাগ করিয়া শ্রাদ্ধানুষ্ঠান এই প্রথম দৃষ্টান্ত। জ্ঞাতিবন্ধুরা আমাকে ত্যাগ করিলেন, কিন্তু ঈশ্বর আমাকে আরো গ্রহণ করিলেন। ধর্ম্মের জয়ে আমি আত্মপ্রসাদ লাভ করিলাম এ ছাড়া আর আমি কিছুই চাহি না।"

মৃত্যুকালে দ্বারকানাথ প্রায় এক ক্রোর টাকা ঋণ রাখিয়া যান, অথচ তাঁহার বিষয়ের মূল্য ৪৩ লক্ষ টাকা মাত্র। দেবেন্দ্রনাথের 'আত্মজীবনী' হইতে এইস্থল উদ্ধৃত করিলাম :—

"আমি কাশী হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেখি * * * আমাদের হাউসের মোট দেনা এককোটি টাকা—পাওনা সোত্তর লক্ষ টাকা—ত্রিশ লক্ষ টাকার অসংস্থান। * * প্রধান কর্ম্মচারী ডি, এন গর্ডন পাওনাদারগণকে বলিলেন, "* এই হাউসের পাওনা ও





মহর্ষি ও তাঁহার পত্নী



মহর্ষি—(বয়স ৮০)

সম্পত্তি এবং ইঁহাদের জমিদারীর স্বত্ব সকলি আপনাদের অধীনে আনিয়া আপন আপন পাওনা পরিশোধ করুন। কিন্তু একটি ট্রষ্ট সম্পত্তি আছে তাহাতে তাঁহারা অধিকারী নহেন কেবল সেই সম্পত্তির উপরে আপনারা হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না।" যদিও দেনার জন্য ট্রষ্ট-সম্পত্তির উপর কাহারো হস্তক্ষেপ করিবার ক্ষমতা নাই, তথাপি দেবেন্দ্রনাথ ট্রষ্ট ভাঙ্গিয়া ঋণ পরিশোধ করিতে প্রস্তুত হইলেন। পাওনাদারগণ এই ব্যাপারে স্তম্ভিত হইয়া গেল। 'অনেক সহৃদয় মহাজনের চক্ষু হইতে অশ্রুপাত হইল।' তাঁহারা এই সাধুতায় চমৎকৃত হইয়া প্রস্তাব করিলেন যে, যখন ইঁহারা সকলি ছাড়িয়া দিলেন, তখন ইঁহাদের সম্পত্তি হইতে ভরণপোষণের জন্য ইঁহারা প্রতি বৎসর ২৫০০০৲ পঁচিশ হাজার টাকা করিয়া পাইবেন। * কেহ টাকার জন্য নালিস করিবেন না।' এই সময় দেবেন্দ্রনাথের সহোদর গিরীন্দ্রনাথ বলিলেন, "* হাঁ এখন লোকে জানুক আমাদের জন্য আমরা কিছুই রাখি নাই—তাহারা বলুক ইঁহারা সকল ধন দিলেন, সর্ব্ববেদসং দদৌ।" তাহাতে দেবেন্দ্রনাথ উত্তর করিলেন, "লোকে বলিলে কি হইবে? আদালত ত শুনিবে না। আদালতে যে কেহ নালিশ করিলেই আমাদের শপথ করিয়া বলিতে হইবে যে আমরা সকলি দিলাম, আমাদের আর কিছুই নাই। নতুবা আদালত আমাদিগকে ছাড়িবে না। কিন্তু যাবৎ অঙ্গে একটি চীর পর্য্যন্ত থাকিবে, তাবৎ রাজদ্বারে দাঁড়াইয়া শপথ করিয়া বলিতে পারিব না যে সব দিলাম। এমনি সকলি দিব, কিন্তু শপথ করিতে পারিব না। ঈশ্বর ও ধর্ম্ম আমাদিগকে রক্ষা করুন। যেন ইনসলবেণ্ট আইনে আমাকে মস্তক দিতে না হয়।"

এই ঘোর স্বার্থসংগ্রামের দিনে, মামলামোকদ্দমার সংঘর্ষে মনুষ্যত্ব যখন চূর্ণ হইয়া যাইতেছে, বিশ্বাসঘাতকতা প্রবঞ্চনা প্রভৃতির দারুণ ক্ষত সমাজকে নিদারুণ যন্ত্রণা দিতেছে তখন মহর্ষির এই অপূর্ব্ব ব্যবহারের আলোচনাটুকুও প্রলেপের ন্যায় স্নিগ্ধ ও মধুর মনে হয়।

মহর্ষির জীবনী আলোচনা করিলে চারিধারের চঞ্চলতার মধ্যে তাঁহার দৃঢ়তা, সহস্র মিথ্যার মধ্যে সত্যের অবিচলিত জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি কিরূপ জাজ্বল্যমান জ্যোতিতে প্রকাশমান হইয়া উঠে।

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে কেশবচন্দ্রের সহিত তাঁহার ধর্ম্মজীবন সম্বন্ধীয় সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়। তাহার সবিস্তার বিবরণী যাঁহারা জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা বর্ত্তমান গ্রন্থখানি পাঠ করুন।

দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনীতে কোন উত্তেজক কাহিনী নাই, কোন রোমাঞ্চকর ঘটনার সমাবেশ নাই—ধর্ম্ম ও সত্যের জন্য আশৈশব সংস্কার ও সামাজিক বন্ধন প্রভৃতির উদ্দেশ্যকল্পে একটি শক্তিমান আত্মার মানসিক সংগ্রামের বিবরণীতেই তাঁহার 'আত্মজীবনী' পূর্ণ। তাঁহার ধর্ম্মবিশ্বাস সম্বন্ধে সাধারণের মতভেদ থাকিতে পারে, কিন্তু দেবেন্দ্রনাথের সুযোগ্য পুত্র, বাঙলার বরেণ্য কবি রবীন্দ্রনাথের সহিত সমস্বরে সকলেই স্বীকার করিবেন যে "তরুণ ব্রাহ্মসমাজ যখন পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে ধর্ম্মের স্বদেশীয় রূপরক্ষা করাকে সঙ্কীর্ণতা বলিয়া জ্ঞান করিত—যখন সে মনে করিয়াছিল বিদেশীয় ইতিহাসের ফল ভারতবর্ষীয় শাখায় ফলাইয়া তোলা সম্ভবপর এবং সেই চেষ্টাতেই যথার্থভাবে ঔদার্য্যরক্ষা হয় তখন দেবেন্দ্রনাথ সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্মের স্বদেশীয় প্রকৃতিকে একটা বিমিশ্রিত একাকারত্বের মধ্যে বিসর্জ্জন দিতে অস্বীকার করিলেন—ইহাতে তাঁহার অনুবর্ত্তী অসামান্য প্রতিভাশালী ধর্ম্মোৎসাহী অনেক তেজস্বী যুবকের সহিত তাঁহার বিচ্ছেদ ঘটিল। এই বিচ্ছেদ স্বীকার করিতে যে দৃঢ়তা, যে সাহস, যে বলের প্রয়োজন হয়, সমস্ত মতামতের কথা বিস্মৃত হইয়া আজ তাহাই যেন আমরা স্মরণ করি। আধুনিক হিন্দুসমাজের প্রচলিত লোকাচারের প্রবল প্রতিকূলতার মুখে আপন অনুবর্ত্তী সমাজের ক্ষমতাশালী সহোদরগণকে পরিত্যাগ করিয়া নিজকে সকল দিক হইতেই রিক্ত করিতে কে পারে—যাঁহার অন্তঃকরণ জগতের আদিশক্তির অক্ষয় নির্ঝর ধারায় অহরহ পূর্ণ হইয়া না উঠিতেছে।"

আমরা বাঙলার আপামর সাধারণকে মহর্ষির আত্মজীবনী পাঠ করিতে অনুরোধ করি। ইহাতে তাঁহাদিগের ধর্ম্মপিপাসা জাগরিত হইবে ও অনিয়ন্ত্রিত জীবনে একটী শৃঙ্খলা আসিবে ইহা আমাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস।

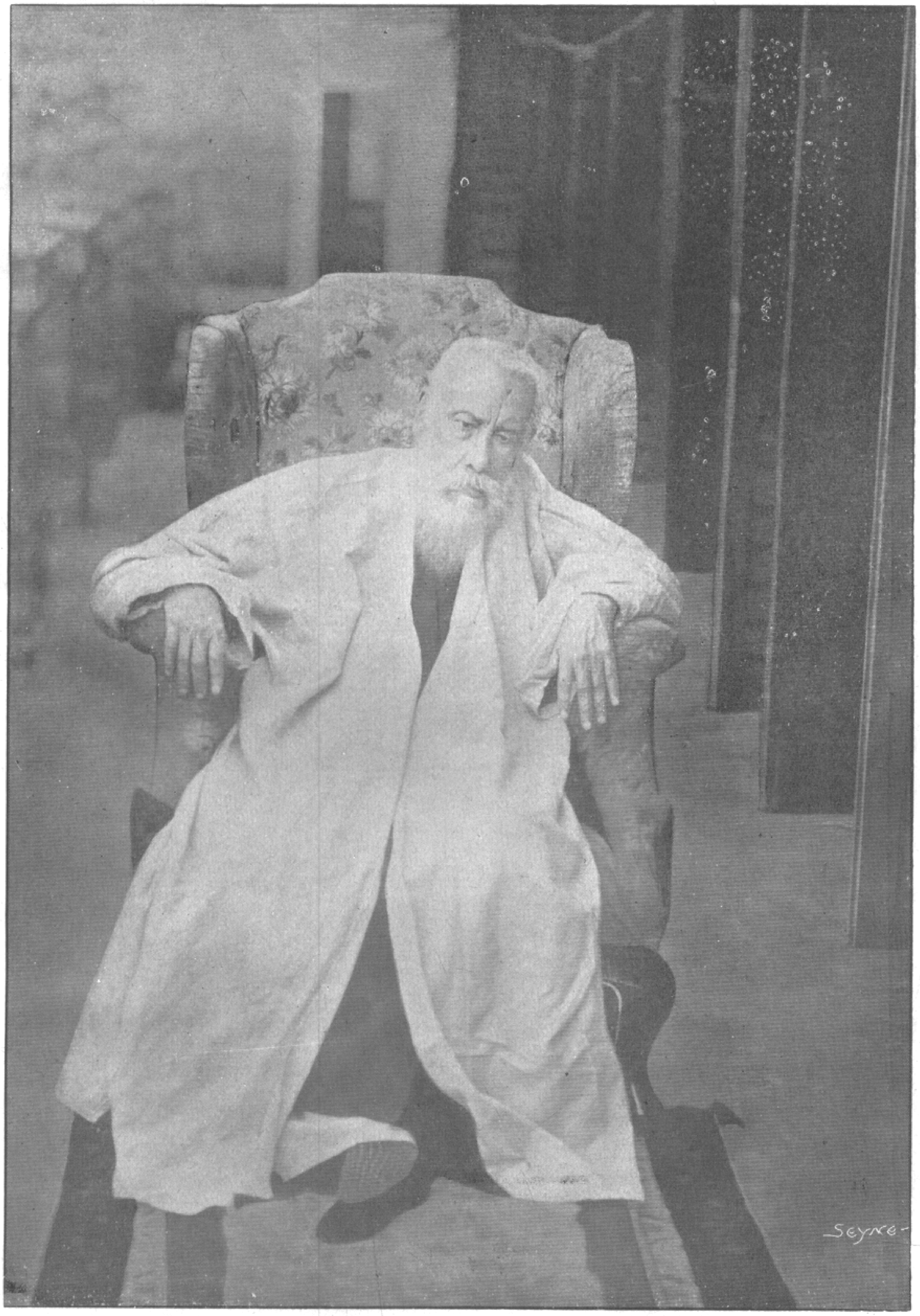
কোচিন-চীন।

৭ ফেব্রুয়ারী

আজ প্রাতে বং-মিউর খনি দেখিতে গেলাম। মানুষেরা আলোক-হীন খনিগর্ভে পশুর ন্যায় খাটিতেছে,—এই নিষ্ঠুর দৃশ্য দেখিতে হইবে বলিয়া প্রস্তুত ছিলাম। যে পর্ব্বতে খনি, সে পর্ব্বতটা ঝোপ্-ঝাড়ে আচ্ছন্ন;—ঝোপ্‌গুলা প্রায়ই সুরম্য। ইহার চারি ধার দিয়া একটা পথ গেছে—এই পথের ভূমি উচ্চ ও ঢালু—মধ্যে মধ্যে সুন্দর কাঠের সেতু আছে। পর্ব্বতের ধারে ধারে খনি—galery-র আকারে থাকে-থাকে সমুত্থিত। খনির ভিতরটা অন্ধকার, কিন্তু বেশ বাতাসের চলাচল আছে। দীপ হস্তে, ধীরে ধীরে আমরা তাহার ভিতর দিয়া চলিতে লাগিলাম। যে সকল অ্যানাম-বাসী খনির কাজে ব্যাপৃত, তাহারা যে খুব বেশী খাটে কিংবা কাজে খুব তৎপর এরূপ বোধ হইল না। এক টন্ পরিমাণ ধাতু উঠাইলে, প্রত্যেক কুলীর দল একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ মজুরী পায়। তাহারা ইচ্ছামত তাহাদের কাজের বন্দোবস্ত করিতে পারে। কেবল, তাহারা প্রতিদিন ১২ cent (দুই আনা) করিয়া নির্দ্দিষ্ট বেতন প্রাপ্ত হয়। এই যৎসামান্য বেতন পাইলেও প্রতি মাসে ১৫ দিন মাত্র তাহারা কাজ করে; জীবিকার জন্য তাহার অধিক কাজ করা তাহারা আবশ্যক মনে করে না। কেন না, তাহাদের প্রধান প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি খুবই সস্তা। দুই সপ্তাহ খাটিয়া, আর দুই সপ্তাহকাল নিজ নিজ গ্রামে গিয়া উহারা বিশ্রাম করে। খনির পরিচালক, উহাদের এই ঔদাসীন্যটা গণনার মধ্যে আনিয়া, দুই দল লোকের যোগাড় রাখেন। প্রত্যেক দল ১৫ দিন করিয়া কাজ করে।

অপরাহ্নের প্রাক্কালেই, ঘোড়ায় চড়িয়া আমরা বং-মিউ হইতে প্রস্থান করিলাম। খনির পরিচালক আমাদিগকে ঘোড়া ধার দিয়াছিলেন। অ্যানামের একটি গণ্ডগ্রাম Tramy-র অভিমুখে আমরা যাত্রা করিলাম। সেখানে দেশীয় সেপাই পাহারার একটা থানা আছে; তাহার নায়ক একজন ফরাসী। এই গ্রামটির ক্ষেত্রভূমি বেশ শস্যশালিনী। যবদ্বীপের ন্যায়, ইহার ভূভাগ তিন ভাগে সুবিভক্ত—ধান্যক্ষেত্র অরণ্য ও পর্ব্বত। ঈষৎ বিষাদময় কি এক অপূর্ব্ব কবিত্ব, এই সকল নিস্পন্দ ও নিস্তব্ধ ক্ষেত্রভূমিকে সজীব রাখিয়াছে। কিন্তু আলোকের আনন্দ, এই নিস্তব্ধতার গাম্ভীর্য্যকে একটু খর্ব্ব করিয়াছে। বাতাবি নেবুর ফুলের সুকুমার সৌরভে মাঠ-ময়দান ভরপুর। সমস্ত পথটায় এই একই ফুলের গন্ধ।

মধ্যে মধ্যে আমরা একএকটা গণ্ডগ্রামে আসিয়া পৌঁছিতেছি; এই সব গ্রামে চুন্-কাম-করা বাঁশের ছোট ছোট গৃহ। কখন কখন, একজন দেশীয় লোক আমাদের আগে-



মহর্ষি—(বয়স ৮৭)

আগে চলিয়াছে; আমাদের অশ্বদিগেরই ন্যায় দৌড়িয়া চলিয়াছে। আমাদের যাত্রার কথা ঘোষণা করিবার জন্য, এবং সম্ভবত আমাদের সম্মানার্থ, উহারা একপ্রকার কাঠের ঢাক্ পিটিতেছে। Tramy-তে আন্দাজ কয়-ঘটিকার সময় আমরা পৌছিব—চাষা-দিগকে আমরা প্রায়ই জিজ্ঞাসা করি। তাহারা সকলেই উত্তর দেয়:—"আজ রাত্রে"। এই সকল প্রাচ্যদিগের নিকট হইতে ঠিক্ খবর বাহির করা অসম্ভব। একদিন, বলি-রেখা-সমাচ্ছন্ন বর্ষীয়ান্ কোন বৃদ্ধকে তাহার বয়সের কথা জিজ্ঞাসা করায় আমার দোভাষী, না হাসিয়া উত্তর করিল;—"৪০ বৎসরের অধিক হবে"...

দিনান্তে, আমরা একটা গিরি-কণ্ঠে উপনীত হইলাম। শুনিলাম, এখানে বাঘ আসে। তাছাড়া, দেখিলাম, কাঠের পায়ার উপর ভর করিয়া কতকগুলি মঞ্চ উঠিয়াছে। ঐখানে বাঘের অপেক্ষায় শিকারীরা বসিয়া থাকে। বাঘদিগকে আকর্ষণ করিবার জন্য ভেড়ার মাংস কিংবা জীবন্ত শূকর রাখা হয়। এখানে যে বাঘের ভয় আছে,—আমাদের বয়্ (boy) সে কথা অবশ্যই জানে। যে ব্যক্তি অন্যদিন ভদ্রতার খাতিরে, ঘোড়ায় চড়িয়া আমাদের পিছনে পিছনে চলিত—আজ কিনা সে আমার বন্ধুর ঘোড়ার ও আমার ঘোড়ার মাঝখানে তাহার ঘোড়াকে রাখিবার জন্য গোঁ ধরিয়াছে। আমার বন্ধু সকলের আগে, ও আমি ২০ ফুট পিছনে রহিয়াছি। শুনিতে পাই, যে সকলের প্রথমে কিংবা সকলের শেষে থাকে, ব্যাঘ্র নাকি প্রায় তাহাকেই আক্রমণ করে।

এখন রাত্রি আরম্ভ হইয়াছে—সূর্য্যাস্তের পর, Tourane ও Hue—এই দুই স্থানের মধ্যে কতবার বাহক সংগ্রহ করিতে আমরা কষ্ট পাইয়াছি। অ্যানামবাসীরা বাঘকে এতটা ভয় করে, যে বাঘকে তুষ্ট করিবার জন্য ব্যাঘ্রকে সসম্ভ্রমে "ব্যাঘ্র মহাশয়" (অংকপ্) বলিয়া অভিহিত করে। এক রাত্রি, আমাদের অগ্রে ও পশ্চাতে কতকগুলা মশালধারীকে স্থাপন করা আবশ্যক হইয়াছিল। বোধ হয় বাঘ আলো দেখিলে ভয় পায়। আর এক রাত্রি,—আমাদের কুলিদিগকে নির্দ্দিষ্ট মজুরীর দ্বিগুণ মজুরী দিতে চাহিলেও তাহারা বাঘের ভয়ে আমাদের সঙ্গে যাইতে স্বীকার করিল না; শেষে গ্রামের প্রধানকে বলিয়া তাহাদিগকে যাইতে আমরা বাধ্য করিলাম।

আমার বন্ধু, আমার 'বয়্' ও আমি—আমরা তিন জনেই মুখে প্রকাশ না করিলেও—মনে মনে বাঘের কথা ভাবিতেছিলাম। পীতাভ গোধূলীর মধ্যে দাঁড়াইয়া, আমি দেখিতেছিলাম—দূরবর্ত্তী পর্ব্বত সকল ক্রমশ কৃষ্ণবর্ণ হইয়া আসিতেছে; আমি একাকী সকলের পশ্চাতে; আমার ঘোড়া ধীরে ধীরে দুল্‌কি চালে চলিতেছে। হঠাৎ ঝোপের মুখ ফাঁক্ হইল; ক্ষুদ্র ব্যাঘ্রের মত একটা পশু বাহির হইল। পশুটা আমার ঘোড়ার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল; আমি ত্রস্ত হইয়া আমার ঘোড়াকে খুব ছুটাইয়া দিলাম। পশুটাও আমার পিছনে পিছনে ছুটিতে লাগিল। আমি আমার রিভল্‌বার খুঁজিয়া বাহির করিলাম; এবং লক্ষ্য সন্ধান করিবার জন্য ফিরিলাম...কিন্তু তখন আমি জন্তুটাকে চিনিতে পারিলাম

ছিলাম এই মনে করিয়া খুব হাসিলাম। জন্তুটা আর কিছুই নয়—বং-মিউ খনির কুকুর! সচরাচর কুকুরটা ঘোড়ার পিছনে পিছনে ছোটে; পাছে আমাদের পিছনে পিছনে আসে এই জন্য বং-মিউ হইতে ছাড়িবার সময় উহাকে বাঁধিয়া রাখা হইয়াছিল; কিন্তু কয়েক ঘণ্টা পরে উহার বন্ধন খুলিয়া দেওয়ায়, কুকুরটা আমাদের পদ-চিহ্ন অনুসরণ করিয়া, আমাদিগকে শীঘ্রই ধরিয়া ফেলিল। রাত্রি ক্রমশই অন্ধকার হইয়া আসিতেছে; আমাদের এই সময়ে পৌঁছান উচিত ছিল। এই চৌমাথা পথে কোন পথ নিদর্শক খোঁটা না থাকায় আমরা কি পথ ভুলিলাম? এই সময়ে আমাদের যেমন ভয় হইতে লাগিল,—সেই সঙ্গে একটা আশ্রয় পাইবারও প্রবল ইচ্ছা হইতে লাগিল,—

অদূরে কতকগুলা আলো দেখা যাইতেছে না? ইহাই কি সেই গ্রাম? না, এই আলোক-বিন্দুগুলা একবার জ্বলিতেছে, আবার নিবিয়া যাইতেছে;—উহারা আমাদের চারিদিকে চলিয়া বেড়াইতেছে—মিট্‌মিট্ করিতেছে। উহা জোনাকির নৃত্য;—অতিপ্রাচ্যখণ্ডে উহাই রাত্রির অপূর্ব্ব শোভা।

হঠাৎ দূর হইতে তুরী নিনাদ শুনা গেল; তবে বুঝি এইবার আমাদের গন্তব্য স্থানে আসিলাম! আমরা অধীরভাবে যার প্রতীক্ষা করিতেছিলাম, এই বুঝি সেই গ্রাম। Tramyতে পৌঁছিয়া প্রথমেই যে গৃহগুলি দেখিলাম, সেইখানেই লোকদিগের নিকট একজন পথপ্রদর্শক চাহিলাম। তাহারা বড় বড় মশাল জ্বালাইয়া মহা-আড়ম্বরে আমাদের সঙ্গে চলিল। আলোকচ্ছটায় আচ্ছন্ন হইয়া, ঘোড়ায় চড়িয়া খুব আড়ম্বর সহকারে আমরা গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। কি হাস্যজনক ব্যাপার!

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

গোপন অশ্রু।

মধুর কুসুম কত
রাতে শুধু ফুটে,
কত মধু আঁখি জল
আঁধারেতে টুটে।
উঁকি দেয় আসি' যবে
দিবসের আলো
পাপ্‌ড়ি হইতে ঝরে
লাজে কণা গুলো;

আলোকের মানবেরা
নাহি দেখা পায়,
আঁধারের সাথে আসে
তারি সাথে যায়।
স্বপ্ন মোহ লেগে' আছে
তাই তা' শোভন,
দেখিতে পাইনা বলে'
মধুর—গোপন!

শ্রীসুখরঞ্জন রায়।

দেশের অবস্থা।

নিঃস্ব, দরিদ্র কৃষকশ্রেণীর চেষ্টায় কিরূপে কোন এক পতিত জাতির উত্থান হইয়া থাকে, গত ভাদ্রের ভারতীতে কোন আমেরিকা প্রবাসী—বিদ্যার্থী "ডেনমার্কের কৃষকদের উচ্চশিক্ষা" প্রবন্ধে তাহা সুন্দরভাবে দেখাইয়াছেন। সত্যই দেশ এবং জাতি শুধু মুষ্টিমেয় ধনাঢ্য এবং শিক্ষিত লোকের দ্বারা গঠিত, পরিপোষিত, সংস্কৃত, এবং পরিচালিত হইতে পারে না, ভারতের ন্যায় যে দেশে শতকরা ৮০ জনের উপর লোক কেবল মাত্র কৃষিলব্ধ আয়ে জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে সে দেশে কৃষক শ্রেণীকে বাদ দিলে কাহাকে লইয়া জাতি? কাহাকে লইয়া দেশ? যাঁহারা আমাদের মস্তক, যাঁহাদের উপদেশ আমাদের শিরোধার্য্য, আজ কাল তাঁহারাই ব্যাধিজরা অনশনক্লিষ্ট দুর্ব্বল কৃষক এবং নীচ জাতীয় লোকের সহিত শিক্ষিত ভদ্র সন্তানদিগকে মিলিতে মিশিতে এবং সমবায় চেষ্টায় দেশের অভাব ও দরিদ্রতা উন্মোচন করিতে কতভাবে উৎসাহিত করিতেছেন। সে দিন বরদারাজ এবং মিঃ এ, চৌধুরীর বক্তৃতাতেও আমরা এবিষয়ে সম্যক উপদেশ পাইয়াছি। যত দিন না কৃষকদের দুঃখ দৈন্য উন্মোচনে আমরা বদ্ধ পরিকর হইব, যতদিন না নীচজাতি এবং কৃষক শ্রেণীকে ভালবাসিতে শিখিব, যত দিন না তাহাদের শিক্ষা দীক্ষার বিধি ব্যবস্থা করিব, যত দিন না তাহাদের প্রতি অবজ্ঞার ভাব ত্যাগ করিয়া ভ্রাতৃভাবে তাহাদিগকে আলিঙ্গন করিব ততদিন আমরা যে তিমিরে আছি সেই তিমিরেই রহিব।

লেখক ডেনমার্কের ন্যায় আমাদের দেশে স্থানে স্থানে কৃষিবিষয়ক পল্লীসমিতি, স্কুল, পরীক্ষাক্ষেত্র, কো-অপারেটিভ সোসাইটী প্রভৃতি স্থাপনের জন্য স্বদেশ বাসীকে অনুরোধ করিয়াছেন, এবং লিখিয়াছেন "জাপানে শিক্ষিত শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার মহাশয় ও আমেরিকা প্রত্যাগত শ্রীযুক্ত দ্বিজদাস দত্ত মহাশয় প্রভৃতি মহোদয়গণ সময় ও সুযোগ মত নিমন্ত্রিত হইলে যে তাঁহারা সানন্দচিত্তে এইরূপ পল্লী সম্মিলনে যোগদান করিয়া ইহার মঙ্গল উদ্যোগের সহায়ক হইবেন তাহাতে সন্দেহ নাই।" এস্থলে আমার নাম উল্লেখ থাকাতেই আমি পাঠকগণের নিকট উপস্থিত হইলাম, আমি লেখক মহাশয়কে সম্পূর্ণ সমর্থন করি। কৃষি এবং কৃষক শ্রেণীর উন্নতির জন্য জাপানে অবস্থান কাল হইতেই অনেক-রূপ কল্পনা জল্পনা করিয়া আসিতেছিলাম। চারি বৎসর কালের পর অনেক আশা পোষণ করিয়া দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলাম। এবং যতদূর জানি শ্রীযুক্ত দ্বিজদাস দত্ত মহাশয় কৃষক শ্রেণীর উন্নতি কল্পে অনেক স্বার্থ ত্যাগ করিয়া দেশের কাজে যোগ দান করিতে প্রস্তুত। কিন্তু আমাদের দুরদৃষ্ট বলিতে হইবে, নতুবা কত পতিত, অপরিজ্ঞাত দেশ জাগিল উঠিল, এমন কি শীর্ষ স্থানে অধি-রোহণ করিল, আর আমরা প্রাচীন সুসভ্য ভারতবাসী নিজ নিজ স্বার্থে অন্ধ হইয়া

হীনাবস্থাতেই পতিত রহিলাম। দরিদ্র কৃষকের দিকে একবার একই ভারত মাতার সন্তান বলিয়া দয়ানেত্রে তাকাইবার অবকাশ পাইলাম না।

আমি দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া প্রায় এক বৎসরকাল যুক্ত বঙ্গের অনেক মহারাজা, রাজা, রায় বাহাদুর, মহামহোপাধ্যায়, জমিদার, তালুকদার, ধনকুবের, সওদাগর, মহাজন, প্রভৃতি সকল শ্রেণীর লোকের দ্বারে দ্বারে অনেক ঘুরিয়াছি অনেক রকম প্রস্তাব করিয়া দেখিয়াছি, কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য বলিতে হইবে যে কেহ কেহ বাহ্যিক আগ্রহ দেখাইলেও আন্তরিক সহানুভূতি একজনের নিকটও পাই নাই। কেহ বলিয়াছেন কি করিব জমি আছে টাকা নাই, আবার কেহ বলিয়াছেন টাকা আছে জমি নাই। যে দেশে দুইটী উচ্চদরের ব্যক্তির একত্র সম্মিলন অসম্ভব সেদেশে ত্রিশ কোটী সাধারণ লোকের সম্মিলন কিরূপে আশা করিতে পারি। কোন কোন জমিদারের নিকট,—জাপান গবর্ণমেণ্ট নিয়োজিত কৃষিপ্রচারকের ন্যায় তাঁহাদের জমিদারীর সর্ব্বত্র প্রজাগণের মধ্যে কৃষিবিষয়ক উপদেশ প্রচার করিবএবং সম্ভবপর এবং সহজ সাধ্য প্রণালীগুলি প্রত্যক্ষভাবে হাতে কলমে বুঝাইয়া দিব বলিয়া অনেক অনুরোধ করিয়াছি। কিন্তু তাহাতেও সফল মনোরথ হই নাই। অনন্যোপায় হইয়া এইরূপে বৃথা সময় নষ্ট না করিয়া অবশেষে প্রিয় বঙ্গভূমি ছাড়িয়া প্রায় ১৬০০।১৭০০ মাইল দূরবর্ত্তী স্থানে আসিতে বাধ্য হইয়াছি। আজ আমি রাজপুতানার অন্তর্গত বিকানীর ষ্টেট্ গার্ডেন কৃষিবিভাগের কার্য্যেই নিয়োজিত আছি। কিন্তু তবু আমার কল্পনা জল্পনা হৃদয়েই নির্ম্মূলিত হইবার উপক্রম প্রায়। জানি না কোন দিন বঙ্গীয় কৃষকের কোন সাহায্য করিতে পারিব কি না।

এস্থলে আমাদের শিক্ষিত সমাজ ধনাঢ্য এবং জমিদারমহাশয়গণের নিকট একটী প্রার্থনা জ্ঞাপন অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। শিক্ষিত সমাজ আজকাল কৃষিতে আস্থা স্থাপন এবং কৃষকের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এমন্ কি অনেক ভদ্র সন্তান অনেক স্থলে স্বহস্তে কর্ষণ করিতে গৌরব বোধ করিতেছেন। ইউরোপ আমেরিকা, জাপান দূরের কথা আমাদের হিন্দুস্থানের অনেক প্রদেশেই আজ পর্য্যন্তও কৃষি পবিত্র কাজ বলিয়া ধর্ত্তব্য। এই রাজপুত ভূমির অধিবাসী, যাহারা বঙ্গের অধিবাসীকে প্রকৃত আর্য্য সন্তান বলিয়া গণ্য করিতে হয়ত অস্বীকার করিবে তাহারাও কৃষি পবিত্র বলিয়া মনে করে এবং অনেক ব্রাহ্মণ সন্তান পর্য্যন্ত আপন ভূমি কর্ষণ করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে। আমার বাগানগুলিতেই কত ব্রাহ্মণ কৃষিকার্য্যে নিয়োজিত আছে।

গতবৎসর হামিণ্টন সাহেব আমাদের শিক্ষিত যুবকগণের নিকট এক বক্তৃতা দ্বারা কৃষির আবশ্যকতা বুঝাইয়া দেন এবং তিনি ২০।২৫ টাকার কেরাণীগিরি কাজ করার পরিবর্ত্তে শিক্ষিত যুবকদিগকে কৃষিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে উপদেশ দেন। বাস্তবিক এখনও আমাদের অঞ্চলের অনেক জমি পতিতাবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে; উহা অল্প খরচে এবং

লইতে পারা যায়। সাঁওতাল পরগণায়, ময়ূরভঞ্জ অঞ্চলে, সুন্দরবনে, ত্রিপুরায়, ভাওয়াল, রংপুর ও আসাম অঞ্চলে অনাবাদী জমি বিস্তর রহিয়াছে। কিন্তু কৃষক হইয়া কৃষকদের সহিত না মিশিলে শুধু আশ্বাস দানে কাজ হইবার নয়।

কৃষির উন্নতি শিক্ষিত সমাজের অপেক্ষা জমিদারদের উপরই অধিক পরিমাণে নির্ভর করিতেছে। আমাদের দেশীয় জমিদারদের আয় শুধু প্রজাদের দেয় রাজস্বের উপর নির্ভর করে। রাজস্ব বৃদ্ধির চেষ্টা কোন্ জমিদার না করিয়া থাকেন? শুধু রাজস্বে পরিতৃপ্ত না হইয়া কোন কোন জমিদার খরচা চাঁদা, মাথট মাঙ্গন প্রভৃতি নামে অতিরিক্ত হারে কর আদায় করিয়া দীন দরিদ্র প্রজার যথাসর্ব্বস্ব আত্মসাৎ করা অন্যায় মনে করেন না। এমন কি প্রতিবৎসর একই জমি একই নলের সার্ভে জরীপে আয়তনে বৃদ্ধি পাইতে থাকে, যাহা পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে এক বিঘা ছিল, এখন হয়ত তাহা দেড় বিঘা পরিণত হইয়াছে। আবার স্থল বিশেষে আমিনের অনুগ্রহে পাঁচ বিঘা জমি হয়ত চারি বিঘায় পরিণত হইয়াছে। জমিদার মহাশয়দিগের এ বিষয়ে দৃষ্টি রাখা উচিত। তাঁহাকে আরও দেখা উচিত যে, যেসকল প্রজার দেয় রাজস্বের উপর তাঁহাদের জীবিকা নির্ভর করে তাহাদের প্রধান এবং একমাত্র অবলম্বন কৃষির কোনরূপ উন্নতি হইতেছে কি না। জমির উৎপন্ন বৃদ্ধি না পাইলে বর্দ্ধিত রাজস্বের সঙ্কুলান দরিদ্র কৃষক কোথা হইতে করিবে? বঙ্গীয় জমিদারগণ নায়েব, নাজীর, জমানবিশ, সুমার নবিশ, মুন্সী [illegible]

পেয়াদা, পাইক প্রভৃতি কত অনাবশ্য লোককে শুধু যেন প্রজা পীড়নের জন্যই রাখিয়াছেন, অথচ জমাজমির উন্নতিকল্পে একটী কৃষিজ্ঞ ব্যক্তিকেও কি কোন জমিদার মহাশয় কখন নিয়োগ করিয়াছেন?

বঙ্গের প্রত্যেক জমিদারই যে এক ছাঁচের তাহা বলিতেছি না। অধিকাংশস্থলে যাহা প্রত্যক্ষ করিতেছি তাহাতেই এতটা লিখিতে হইল। কিঞ্চিৎ ব্যয়সাপেক্ষ হইলেও আমাদের এত বড় বড় জমিদার আছেন যাঁহারা স্বস্ব জমিদারির উন্নতিকল্পে আদর্শ কৃষিক্ষেত্র স্থাপন না করিলেও অন্ততঃ কয়েকজন করিয়া কৃষি-প্রচারক অনায়াসেই নিয়োগ করিতে পারেন। বরদারাজ, মহীশূররাজ, গোয়ালিয়ররাজ, কাশ্মীররাজ প্রভৃতিকে এ বিষয়ে পথপ্রদর্শকরূপে গণ্য করা উচিত। বিকানীররাজও রাজপুতানার মরুভূমি প্রদেশে কি উপায়ে কৃষির উন্নতি হইতে পারে তজ্জন্য বিস্তর প্রয়াস পাইতেছেন। বঙ্গীয় জমিদারদিগকে অন্ততঃ ক্ষুদ্রায়তনে কৃষির উন্নতিবিধানে প্রয়াস পাওয়া উচিত।

মনে করুন কোন জমিদারের বার্ষিক আয় আড়াই লাখ কিম্বা তিন লাখ টাকা। সাধারণতঃ দেখা যায় তিনি প্রতি টাকায় প্রতি বৎসর প্রজাদের নিকট হইতে অন্ততঃ এক আনা হারে খরচা আদায় করিয়া থাকেন। এই এক আনা খরচার একটী পয়সা যদি জমিদার মহাশয় প্রজার মঙ্গলকামনায় ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত না হয়েন তবেই আমরা কৃষির জন্য অনেক করিতে পারি। প্রকৃতপ্রস্তাবে জমিদার মহাশয়ের নিজের পকেট হইতে এক কপর্দ্দকও খরচ হইবে না

অথচ প্রজাদের সমূহ উপকার করা হয়।

স্বীকার করি ইউরোপ, আমেরিকা এবং জাপানে রাজস্বের হার বেশী। তথাচ প্রজাগণ জমিতে পাঁচশত টাকার ফসল জন্মাইলে দেশের কাযে আহ্লাদের সহিত রাজাকে ১০৲ দশ টাকা খাজনা দেয়। কিন্তু আমাদের প্রজাগণ দশ টাকা জন্মাইয়া দশ টাকাই খাজনায় দিলে নিজেরাই বা কিরূপে পরিবার প্রতিপালন করিবে আর কৃষিরইবা কিরূপে উন্নতি করিবে?

আমাদের নিরক্ষর কৃষিগণ নির্ব্বোধ নহে। অন্যান্য দেশের সহিত তুলনায় দেখিয়াছি ভারতের বিশেষতঃ বঙ্গদেশের কৃষকগণ বেশ সুচতুর এবং বুদ্ধিমান, একমাত্র অর্থাভাবে তাহাদিগকে নিস্তেজ করিয়া রাখিয়াছে। শিক্ষিত সমাজ এবং জমিদারগণ সহায় হইলে ধনী, দরিদ্র, ইতর, ভদ্র, জমিদার, কৃষক প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের ভিতর ভেদাভেদ বিলুপ্ত হইবে এবং সকলেই পরস্পরের সাহায্যে আগ্রহ প্রকাশ করিবে।

শ্রীযদুনাথ সরকার।

অরণ্য ষষ্ঠী।

প্রকাণ্ড পাদপ শাখাপত্রে সুশোভিত,
প্রাচীন হয়েছে দেহ জটা প্রলম্বিত।
স্নিগ্ধ ছায়া বিতরণে করে কৃপা দান,
ক্লান্ত পথিক নিত্য জুড়ায় পরাণ।
অশ্বত্থ নামেতে সদা পরিচিত সেথা,
পবিত্র পরশ তার নাহি আবিলতা।
বিটপীর গুহা মূলে ষষ্ঠী দেবী নিজে
বিরাজিত, মূর্ত্তিমতি সদা শুভ কাজে।
রমণী জননী যত পূজে ভক্তি ভরে,
সন্তান কুশল তরে বৎসরে বৎসরে।
অপত্যপালিনী দেবী হিতৈষিণী মতি,
আপদ অশান্তি নাশি রক্ষে সদা সতী।
ফল ফুল বিরচিয়া নব অর্ঘ্য ডালা,
সুকল্যাণী সীমন্তিনী করে সেথা মেলা।
কার্পাস কঙ্কণ গ্রন্থি হরিদ্রা রঞ্জিত,
শ্যামদূর্ব্বাদল গুচ্ছ তাহে বিজড়িত।
ষষ্ঠীর প্রসাদ বর বাঁধে পুত্র করে,
নিদাঘের তাপ পীড়া লয়ে যাবে হ'রে।
নব তালবৃন্ত দিয়া করেন বাতাস,
অমঙ্গল যাবে উড়ে ঘুচাইয়া ত্রাস।
অরণ্য প্রাঙ্গণ মাঝে নিদাঘ প্রভাতে,
সাধেন জননী ব্রত অতি শুদ্ধ চিতে।
মুখরিত তরুলতা উৎসব হরষে,
কুসুম চন্দনগন্ধ বায়ু সনে ভাসে।
জ্যোছনার মাঝে মরি খণ্ড মেঘ সম,
কে রমণী দাঁড়াইয়া মুখ ম্লানতম!
এক পাশে সঙ্কুচিতা ভাবে কার কথা,
দেবি তুমি আশাপূর্ণা মিটাবেনা ব্যথা?
কঙ্কণ লইয়া করে তালবৃন্ত ধরি
অপেখিয়া এতক্ষণে অশ্রু পড়ে ঝরি।
যোড় করে মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসে রমণী,
এখনও এলোনা কেন মোর যাদুমণি।

শ্রীনিস্তারিণী দেবী।

অভয় মন্ত্র।

গত ১৫ই নবেম্বর শ্রীমতী সরলা দেবী কায়স্থ পাঠশালায় সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে যে বক্তৃতা দান করিয়াছিলেন, আমরা তাহার সারাংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

ভোর চারটের সময়ে আমি আম্বালা ষ্টেসনে উপস্থিত হইলাম। শাহারাণপুরের ট্রেণ ধরিবার জন্য প্ল্যাটফর্মে অপেক্ষা করিতেছি—এমন সময়ে একটি যুবা আসিয়া অতিশয় ভদ্রতাসহকারে ও আত্মীয়ভাবে আমার সহিত আলাপ করিয়া আমার স্বামীর কুশল জিজ্ঞাসা করিল। তৎপরেই স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া আমাকে সংবাদ দিল যে একজন ডিটেক্‌টিভ লাহোর হইতে সারাপথ আমার অনুসরণ করিয়া আসিতেছিল। পরে আবার আমাকে নিশ্চিন্ত করিবার জন্য জানাইল যে. আমার ভয়ের কোন কারণ নাই, কিঞ্চিৎ পুর্ব্বেই ডিটেক্‌টিভটি আমাকে ত্যাগ করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে। এই কথা শুনিয়া আমি যথাসম্ভব ভদ্রভাবে তাহাকে জানাইলাম যে ডিটেক্‌টিভকে ভয় করিবার আমার কোন কারণ নাই, যেহেতু আমার গুপ্ত ব্যাপার কিছুই নাই। লোকটি একটু অপ্রস্তুত হইল। পরে যেই আমি তাহাকে তাহার নাম জিজ্ঞাসা করিলাম অমনি সে নাম না বলিয়া মুখস্থ পাঠের ন্যায় উত্তর: করিল সে দয়ানন্দ (আর্য্য) বৈদিক কলেজের ছাত্র। কথাটা শুনিয়া আমার একটু হাসি আসিল এবং মনে একটু চিন্তারও উদ্রেক করিল।

এই একটি অপরিণত বয়স্ক বালক, আমার এক জাতি ও এক রক্তের সন্তান হইয়াও এত মর্ম্মান্তিকরূপে বিকৃতপ্রকৃতি হইয়া গিয়াছে, এত চাতুরী এত বিশ্বাসঘাতকতা তাহার অন্তরে আধিপত্য লাভ করিয়াছে, যে সে আজ গুপ্তচরের কর্ম্মে উন্নতিলাভের জন্ত মাতৃভূমির প্রতি অনুরক্তা বলিয়া বিদিত একটি স্ত্রীলোককে এইরূপ জঘন্যতম কাপুরুষের ন্যায় ভীতিপ্রদর্শন করিতেও কুণ্ঠাবোধ করিতেছে না। এই বালকের এইরূপ দুর্ব্বৃত্ততা ও ভারতবর্ষময় এইরূপ সহস্র সহস্র বালকের এইপ্রকার চরিত্র বিকৃতির জন্ত দায়ী কে এবং ভারতীয় চরিত্রের কোন্ উপাদানটিকে অবলম্বন করিয়া ইহারা এরূপ জঘন্য ব্যবসায় চালাইতেছে? ভারতের জননীগণই তাঁহাদিগের সন্তানগণের এই বিকৃতির জন্ত দায়ী—বা এইরূপ বিকৃতি ভারতীয় জননীগণের 'অবিদ্যা' অর্থাৎ উপযুক্ত শিক্ষাভাবের ফল, এবং ইহাদের কার্য্যসিদ্ধির জন্য ভারতীয় চরিত্রে ভয় বলিয়া যে বৃত্তিটি আছে তাহারই সাহায্যে ইহারা স্বকর্ম্মসাধনে প্রবৃত্ত হইতেছে।

শাস্ত্রে ছয়টি বন্ধনের বিষয় উল্লিখিত আছে। এই ছয়টি বন্ধন আমাদিগকে 'অবিদ্যার' সহিত বাঁধিয়া রাখিয়াছে। ইহাদিগের মধ্যে ভয়টি সর্ব্বপ্রধান বন্ধন। এক্ষণে ভয় জিনিষটি কি তাহাই ভাবিয়া দেখা যাউক।

স্বাভাবিক বা স্বাস্থ্যকর অবস্থায় ভয় জিনিষটা আত্মরক্ষার একটা সহজ বৃত্তি। পশ্চাৎপদ, পলায়ন বা অন্য কোন উপযুক্ত উপায় দ্বারা আত্মরক্ষার চেষ্টা মাত্র। কিন্তু অস্বাভাবিক বা অস্বাস্থ্যকর অবস্থায় ভয় জিনিসটা ইহার ঠিক বিপরীত হইয়া দাঁড়ায়—উপকারী না হইয়া ইহা অনিষ্টকর হইয়া দাঁড়ায়,—রক্ষার উপায় না হইয়া ইহা ধ্বংসের অস্ত্র হইয়া দাঁড়ায়। অর্থাৎ যে মুহূর্ত্তে জীবের কোন কর্ম্মের উপর তাহার জীবন মরণ নির্ভর করে, যে মুহূর্ত্তে আক্রমণ, আত্মরক্ষা বা পলায়ন নিতান্ত আবশ্যক, সেই মুহূর্ত্তে আমরা মানুষ ও পশুকে উদ্বেগপঙ্গু হইতে দেখিতে পাই এবং আক্রান্ত অবস্থায় তাহাদের যেটুকু শক্তি থাকে তাহা ব্যবহার করিতে অক্ষম হইয়া পড়ে। অস্বাভাবিক ভয় তাহার উদ্রেকের কারণ অপেক্ষা অনেক অধিক হইয়া পড়ে। স্বাভাবিক সঙ্গত ভয় অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত, চিন্তাশক্তিই তাহার চালক কিন্তু অস্বাভাবিক ভয় অযুক্তি ও বুদ্ধি বিচারের অভাবের উপরই প্রতিষ্ঠিত। ভাবী অনিষ্ট সম্বন্ধে আমাদের যেরূপ সত্য বা মিথ্যা ধারণা হয়, আমাদের

ভয়ের মাত্রাও সেইরূপ বিভিন্ন হয়। অনেক সময়ে অতিরিক্ত কল্পনাশক্তিই আমাদের স্থায়ী বা অস্বাভাবিক ভয়ের কারণ। যাহা হউক সকল প্রকার ভয়ই জ্ঞান ও যুক্তির দ্বারা দূর হইতে পারে।

বিজ্ঞানবিদেরা বলেন অধোগতির অবস্থাতেই ভয়ের উৎপত্তি ও বৃদ্ধি হয়। সুতরাং আমাদের ভারতের সমাজদেহ হইতে এই রোগের উচ্ছেদের জন্য চিকিৎসার ব্যবস্থা করাই আমাদের সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য। আমাদের জাতির অধঃপতন, সমাজদেহের অর্দ্ধাঙ্গের উপেক্ষিত অবস্থা। নারীগণের অশিক্ষিত অবস্থাই দেশের সকল অনিষ্ট ও দুর্নীতির মূল।

এমন কি সিংহলের গবর্ণর পর্য্যন্ত সেদিন এক সভাস্থলে আমাদিগকে তিরস্কার করিয়া বলিয়াছেন "এ দেশের অধিবাসীগণের সাবধান হওয়া উচিত যেন তাঁহারা অন্যান্য শিক্ষার বন্যার মধ্যে পড়িয়া এই মহাসত্যটি ভুলিয়া না যান যে, তাঁহাদের পক্ষে তাঁহাদের স্বকীয় ইতিহাস ও ভাষা সম্পূর্ণ ভাবে শিক্ষা করা তাঁহাদের সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য। আমি সেণ্ট্‌পলের ভাষায় পুনরায় বলিতেছি যে যদি এ দেশের কোন অধিবাসী দেবদূতের ন্যায় সুকণ্ঠলাভেও সক্ষম হন, কিন্তু তাঁহার স্বদেশপ্রেম না থাকিলে তিনি পিত্তলের করতালের ন্যায় ধ্বনি করিতে থাকেন এবং জাতির উন্নতিকল্পে প্রত্যেক ব্যক্তিমাত্রেরই অবশ্য করণীয় কর্ত্তব্যপালনে অক্ষম হন।" তিনি আরও বলিয়াছেন "এদেশবাসীকে তাহার স্বদেশ ও মাতৃভাষা সম্বন্ধে এবং বিশেষতঃ তাহার স্বজাতিসম্বন্ধে শিক্ষাদান করা তাহার পিতামাতা ভিন্ন অপর কাহারও পক্ষেই সম্ভব নহে।"

এইভাবে তোমাদিগের একজন সদাশয় শাসনকর্ত্তা বলিতেছেন যে তোমাদিগের পিতা মাতাই তোমাদিগকে যথার্থ শিক্ষাদানে মনুষ্যত্ব দান করিতে সক্ষম। কিন্তু এই পিতামাতার মধ্যে মাতা যিনি যথার্থই সমগ্র জাতির শিক্ষয়িত্রী, তিনি নিজেই সম্পূর্ণ অশিক্ষিতা। এরূপ অবস্থায় তিনি তাঁহার সন্তানকে জাতীয় উন্নতি কর্ম্মে সহায়তা করিতে শিক্ষাদান করা কি সম্ভব?

এই ভারতেই একদিন যখন আর্য্যজাতি উন্নতির চরমশিখরে উপনীত ছিলেন, তখন আর্য্যরমণী সমগ্র জাতির শিক্ষা ও সাধনার সম্পূর্ণ অংশলাভে সক্ষম হইয়া পুরুষের শ্রদ্ধা ও সম্মান লাভের অধিকারী হইয়াছিলেন। আজ সে দেশের নারীগণ যেরূপ জঘন্যভাবে রক্ষিত ও পালিত হয় তাহার ফলে তাহারা কেবল ডিটেক্‌টিভ্, বিশ্বাসঘাতক, যথেচ্ছাচারী ও কাপুরুষ সৃজন করিতেছে। তাহাদিগকে সযত্নে প্রতিপালিত কর, জ্ঞানদানে উন্নত কর,—তাহাদিগের আত্মার আলোক উদ্দীপ্ত করিয়া তোল দেখিবে তাহারা আবার রাম ও ভরত, যুধিষ্ঠির ও শ্রীকৃষ্ণ গর্ভে ধারণ করিবে। আজ অস্বাভাবিক ভীতি সমগ্র ভারতবর্ষকে তাহার লৌহকবলে ধরিয়া রাখিয়াছে—অধঃপতিত ভূমি পাইয়া সেই ভীতি আজ বদ্ধমূল হইবার সুযোগ পাইয়াছে। অধঃপতনের কারণ দূর কর, দেখিবে এ ভীতি সমূলে উচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে। তোমরা অমরত্বের সন্তান—তোমরা 'অভয়ের' সন্তান তোমাদিগের নিকট হইতে ভয় চিরদিনই দূরে পলাইবার কথা। হিন্দু ঋষি বলিয়া গিয়াছেন জ্ঞানই ভীতির প্রধান ঔষধ। সুতরাং গৃহের নারীগণকে জ্ঞানদান কর, তাহাদিগকে ভীতি হইতে মুক্ত কর, দেখিবে তাহারাই তোমাদিগকে অভয়দান করিবে। এ প্রস্তাব যেন এই খানেই এক দিনের বক্তৃতার কথাতেই পর্য্যবসিত না হয়—অন্তরের সহিত ইহা কর্ম্মে পরিণত করিতে উদ্যোগী হও। উঠ, জাগ্রত হও—যতক্ষণ না লক্ষ্যস্থলে উপস্থিত হও ততদিন সকল বিরাম ত্যাগ কর। উপস্থিত সকলেই আপন গৃহ হইতে আরম্ভ করিয়া স্বদেশ কল্যাণে প্রবৃত্ত হও।

আমি যে দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি সে দেশ উত্তর ভারতে যাদু ও মন্ত্র তন্ত্রের জন্য প্রসিদ্ধ। উত্তর ভারতের সঙ্গীত ও প্রচলিত উপকথা গুলি এ দেশবাসীর যাদুবিদ্যা শিক্ষার জন্য বঙ্গে গমন ও তথায় নানা দুঃসাহসিক দুর্ঘটনার বর্ণনায় পরিপূর্ণ। আজ আমি তোমাদিগকে একটি অতি ক্ষুদ্র মন্ত্র দান করিব, বঙ্গের অনন্ত যাদু ভাণ্ডার হইতে একটি সামান্য মন্ত্র আজ তোমাদিগকে শিখাইয়া দিব। ইহা হৃদয়

হইতে ভীতি দূর করিবার মন্ত্র—কিন্তু ইহা অতি গোপনে তোমাদিগের কর্ণে দান করা আবশ্যক। অতএব শুন—মন্ত্রটি তিন অক্ষরে গঠিত—অ, ভ, য়। অভয় নাম উচ্চারণ কর,—আপনাকে অভয় কর—অবিরাম এই অভয় মন্ত্র জপ করিতে থাক। তখন যে কেহই তোমাদিগের অন্তরে ভীতি উৎপাদন করিতে চেষ্টা করুক না কেন এ মহামন্ত্র তোমাদিগকে সে আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবে। মুখে ইহার জপ কর এবং অন্তরে ইহার জীবন্ত মূর্ত্তিকে অধিষ্ঠাত্রী করিয়া রাখ—তিনিই আমাদের জাতির সকল ভয় দূর করিবেন। অভয়ের শান্তি ও মহত্ত্ব উপলব্ধি কর তাহা হইলেই তোমরা উন্নতি পথে অগ্রসর হইবে।

সংস্কার বিধান।

বিগত ১৫ই নবেম্বর ইণ্ডিয়া গেজেটের এক অতিরিক্ত পত্রে মিণ্টো মর্লের সংস্কার বিধান প্রকাশিত হইয়াছে। বহুদিন হইতে এই সংস্কার বিধান লইয়া ভারতে স্বয়ং রাজ প্রতিনিধি হইতে রাজপক্ষের চুনো পুঁটিটি পর্য্যন্ত যেরূপ ভেরীনিনাদ করিতেছিলেন, তাহাতে আমরা আশা করিয়াছিলাম এই নববিধানের বলে ভারতে প্রজাশক্তির আংশিক প্রতিষ্ঠা দ্বারা রাজা ও প্রজার মধ্যে আন্তরিক সহযোগ সংস্থাপিত হইবে এবং সাধারণ শাসননীতিতে এক অভিনব যুগান্তর প্রবর্ত্তিত হইবে। ভারতে শাসননীতির এ নববিধান দেশের শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই পাঠ করিয়াছেন সুতরাং তাহার আর এ স্থলে পুনরাবৃত্তি অনাবশ্যক। বিধানটি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া আমরা একটু দুঃখের হাসি না হাসিয়া থাকিতে পারি না। দুঃখ আমাদের নিজেদের জন্যই একান্ত নহে—দুঃখ দেশের রাজা প্রজা উভয়েরই জন্য, তাহাদের মধ্যে ভবিষ্যতে সম্বন্ধের জন্য—রাজপক্ষের দেশে অশান্তি ও অসন্তোষ দূর করিবার উদ্দেশ্যে বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়ার জন্য—মিণ্টো ও মর্লির ন্যায় প্রবীন বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ রাজনীতিজ্ঞের দুর্ব্বলতা ও অদূর দৃষ্টির জন্য,—আর—ইংরাজের এই অসম্ভব অল্প বুদ্ধির জন্য।

ভারতবাসী তুরস্ক, পারস্য বা চীন অপেক্ষা বুদ্ধি বা শিক্ষাতে হীন নহে। উক্ত তিন জাতির মধ্যেই রাজশক্তি প্রজাশক্তিকে স্বীকার করিয়া প্রজার ইচ্ছানুসারে রাজকার্য্য পরিচালনা করিতেছেন বা করিবার উদ্যোগ করিতেছেন। কিন্তু সাম্যতন্ত্রী সভ্যতাভিমানী ইংরাজ এত আড়ম্বরের পর ভারতবাসীকে যে কেবল 'যথাপূর্ব্বং' অবস্থাতেই রাখিলেন তাহা নহে, অধিকন্তু সংস্কারের নামে সংকীর্ণতার প্রতিষ্ঠা ও শক্তিদানের নামে শক্তিহ্রাস করিতেও কুণ্ঠিত হইলেন না।

গবর্মেণ্টের প্রকাশিত বিধানের মন্তব্য পাঠ করিলে মনে হইবে আমরা যথার্থই 'একটা কিছু' পাইলাম? কিন্তু একটু তীক্ষ্ণদৃষ্টি দিয়া পাঠ করিলেই গবর্মেণ্টের আশাতীত মহানুভবতা উপলব্ধি করিতে বিশেষ বিলম্ব হয় না। এরূপ বিধানের বিচার করিতে হইলে তিনটি প্রধান বিষয় বিবেচনা করা আবশ্যক। প্রথম প্রতিনিধিগণের সংখ্যা ও প্রকৃতি, দ্বিতীয় দেশের প্রতিনিধি শক্তি এবং তৃতীয় নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিগণের কর্ম্ম ও ক্ষমতা। পরে পরে এই তিনটি বিষয়ের বিচার করিয়া দেখিলেই আমরা বুঝিতে পারিব দেশে সংস্কারের নামে সংকীর্ণতার প্রতিষ্ঠা ও শক্তি দানের নামে শক্তিহ্রাস হইল কি না।

প্রথম, প্রতিনিধি সংখ্যার দিক দিয়া দেখিলে কাগজে কলমে আমরা সর্ব্বত্রই পূর্ব্বাপেক্ষা সংখ্যাবৃদ্ধি দেখিতে পাই। কিন্তু সংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে যথার্থ শক্তিবৃদ্ধি না হইলে, কেবল সমিতিগুলির কলেবর বৃদ্ধি ভিন্ন দেশের যে আর কি উপকার হইতে পারে তাহা আমরা বুঝিতে অক্ষম। সুতরাং ইহাকে দেশের পক্ষ হইতে লাভ বলিয়া বিবেচনা করা অসম্ভব।

তাহার পর প্রতিনিধিগণের প্রকৃতি সম্বন্ধে বিচার

করিয়া দেখিলে আমরা দেখিতে পাই এতদিন যেখানে জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে ভারতীয় সভ্যগণ সাধারণ প্রজার প্রতিনিধি বলিয়া গণ্য ছিলেন, এক্ষণে তাহার মধ্যে জাতি, ধর্ম্ম, ও অর্থ আসিয়া আপনার আধিপত্য প্রতিষ্ঠা পূর্ব্বক পূর্ব্বের অখণ্ড ভাবটিকে নষ্ট করিয়া নানা খণ্ডতার গণ্ডি অঙ্কনে বিদ্বেষ ও বিরোধের পথ উন্মুক্ত করিয়াছে। এতদিন রাজচক্ষে ইংরাজ বা ভারতবাসী দুই জাতিই ছিল। এক্ষণে তাহার স্থলে ভারতবাসীকে বিভক্ত করিয়া তিনটি জাতি সৃষ্ট হইল—ইংরাজ, মুসলমান ও হিন্দু। হিন্দু সকলের শেষে আসিয়া পড়িল। সংখ্যা ও শিক্ষায় মুসলমান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইলেও সে আজ রাজচক্ষে নিকৃষ্ট ও হীন। ফুলার সাহেব একবার এক বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন "হিন্দু মুসলমান আমার দুই সহধর্ম্মিণী।" এই উপলক্ষে সেই কথাটা মনে পড়িয়া গেল। এতদিনে বুঝিলাম আমরা উভয়েই রাজরাণী—তবে আমরা 'দুয়ো' তাই স্বামী-সোহাগিনী সুয়োরাণী 'দুয়ো'কে গোয়াল ঘরে ঠেলিয়াছে।

কিন্তু তাই বলিয়া মুসলমান মাত্রেরই উপর যে ইংরাজ সমানুরাগ প্রকাশ করিয়াছেন তাহাও নহে। শিক্ষিত ও পদস্থ মুসলমান অপেক্ষা অশিক্ষিত ও হীনপদস্থ মুসলমানগণের প্রতিই তাঁহার অনুরাগের মাত্রাটা কিছু অধিক। শিক্ষাভিমানী ইংরাজ প্রতিপদেই শিক্ষাবিদ্বেষের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

স্বর্গগতা ভিক্টোরিয়া রাজ্যভার গ্রহণ করিয়া ১৮৫৮ সালে তাঁহার চিরস্মরণীয় ঘোষণাপত্র প্রকাশ করার পর হইতে আজ পর্য্যন্ত ইংরাজ আর কখনও ভারতবাসীর মধ্যে এরূপ প্রকাশ্যভাবে ধর্ম্ম ও সম্প্রদায় ভেদনীতি সমর্থন করেন নাই। এরূপ ভেদনীতি প্রজার পক্ষে অহিতকর ত বটেই, রাজার পক্ষেও ইহা কোনমতেই কল্যাণকর নহে। মুসলমানগণের প্রতি এইরূপ পক্ষপাতিতা প্রদর্শনের সমর্থনে তাঁহারা বলিয়াছেন যে ন্যূনসংখ্যক সম্প্রদায়কে রক্ষণ করা রাজার কর্ত্তব্য। কিন্তু তাহা হইলে কেবল মুসলমানকে রক্ষা করিয়াই কি রাজার কর্ত্তব্য শেষ হইয়া গেল? শিখ, পার্শী, দেশীয় খ্রীষ্টান ও অন্যান্য সম্প্রদায় সম্বন্ধে তাঁহারা কি করিলেন? কৈ তাহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য ত কোনপ্রকার ব্যগ্রতা দেখিতে পাই না। আর সকল স্থানেই যে হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের সংখ্যা অল্প তাহাও নহে। পূর্ব্ব বঙ্গে হিন্দু অপেক্ষা মুসলমান অনেক অধিক। তবে সেখানেও আমরা মুসলমানের প্রতি রাজপক্ষের এ পক্ষপাতিতা দেখিতে পাই কেন?

এইবার প্রজাপ্রতিনিধির আধিক্য সম্বন্ধে বিচার করিয়া দেখা যাউক। বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভায় ৩৫টি গবর্ণমেণ্ট পক্ষের সভ্য থাকিবেন—২৮ জন রাজকর্ম্মচারী এবং ৭ জন রাজমনোনীত সভ্য। আর ২৫টি প্রজানির্ব্বাচিত সভ্যের ১১টি ভারতের বিভিন্ন প্রাদেশিক সভা হইতে প্রেরিত হইবে। সুতরাং তাহারা যে গবর্ণমেণ্টের সকল কর্ম্মের সমর্থনকারী হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কারণ আমরা পরে দেখিতে পাইব প্রাদেশিক সভায় কাগজে কলমে নির্ব্বাচিত সভ্যের সংখ্যা অধিক হইলেও বস্তুত পক্ষে সে সকল স্থানে গবর্ণমেণ্ট পক্ষেরই প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ থাকিবে। তাহার পর দুইজন ইয়ুরোপীয় সভ্য হইবেন। তাঁহারা কোন্ পক্ষ আলোকিত করিবেন তাহা বলা অনাবশ্যক। তাহার পর মুসলমানগণের বিশেষাধিকারে নির্ব্বাচিত ৫ জন মুসলমান সভ্য। তাঁহারা রাজপক্ষের এই সবিশেষ অনুগ্রহের যে মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া চলিবেন সে বিষয়ে সন্দেহ না করিলেও চলে। যে কয়টি সংখ্যা অবশিষ্ট রহিল তাহার সকলগুলিই জমিদারশ্রেণীর প্রতিনিধি দ্বারা পূর্ণ হইবে। তাঁহাদের মধ্যে কেহ বড় একটা প্রতিবাদ করিতে সাহসী হওয়া সম্ভব নহে—করিলেও তাহা অরণ্যে রোদন, কারণ সে প্রতিবাদ সমর্থন করিবে কে? সুতরাং কার্য্যতঃ বড়লাটের সভায় যথার্থ প্রজাপক্ষের প্রতিনিধি আর একজনও থাকিবে না, সংস্কারের এই প্রথম লাভ! তাহার পর বঙ্গের ব্যবস্থাপক সভার বিষয় আলোচনা করিয়া দেখা যাক। বিধানে লেখা আছে এখানে ২২ জন রাজমনোনীত ও ২৬ জনপ্রজানির্ব্বাচিত সভ্য থাকিবে। দেখিলে মনে হয় এইখানে বুঝি প্রজাশক্তি প্রাবল্য লাভ করিয়াছে।

কিন্তু একটু বিচার করিয়া দেখিলেই এই 'সংখ্যা-ভেল্কী' ভাঙ্গিয়া যাইবে। গবর্ণমেণ্টের সভ্যের সংখ্যা ছোটলাট ইচ্ছা করিলেই আরও দুইটি বাড়াইতে পারেন; এবং সভাপতি স্বরূপ ছোট-লাটের একটি অতিরিক্ত ভোট আছে। সুতরাং প্রয়োজন মতে গবর্মেণ্ট পক্ষে সব শুদ্ধ ২৬টি ভোটই হইল। প্রজাপক্ষের প্রাধান্যের এইখানেই পঞ্চত্বপ্রাপ্তি। ইহার উপর নির্ব্বাচিত সভ্যগণের মধ্যে সাধারণতঃ ৪জন ইংরাজ নির্ব্বাচিত হইবেন। অবশিষ্ট২২জনের মধ্যে ৪ জন মুসলমান, ও একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি। ইঁহারাও গবর্মেণ্ট পক্ষ সমর্থন করিবেন বলিয়াই আশা করা যায়। অবশিষ্ট রহিল ১৭টি, তাহার মধ্যে ৫টি জমিদার। বাকি রহিল ১২টি। ইহার মধ্যে ৬জন জেলা বোর্ডের ও ৭জন মিউনিসিপালিটির সভ্য। জেলাবোর্ডের সভাপতি জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট। সুতরাং সে ছয় জনকে সরকারী সভ্য বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এইরূপে দেখিলে শেষে প্রজার ভাগ্যে কেবল 'টিকি'টি মাত্র অবশিষ্ট থাকে—আর সবই সরকারীগুলিতে হজম হইয়া যায়।

এইবার দেশের প্রতিনিধি নির্ব্বাচন-শক্তি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া দেখা যাউক আমাদের নূতন শক্তি লাভ হইল, না পুরাতন শক্তি ক্ষয় হইল। এতদিন আমাদের জেলাবোর্ড বা মিউনিসিপালিটি সেই জেলার অধিবাসী যে কোন উপযুক্ত ব্যক্তিকে আপনাদিগের প্রতিনিধিস্বরূপ প্রেরণ করিতে পারিতেন। কিন্তু এই নববিধানের ফলে আর তাহা হইবার উপায় নাই। এখন হইতে বোর্ড বা মিউনিসিপালিটি তাঁহাদিগের সমিতির সভ্য ভিন্ন অপর কাহাকেও নির্ব্বাচিত করিতে পারিবেন না। সুতরাং মিষ্টার এ চৌধুরী বা শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসুর ন্যায় ব্যক্তিগণও আর নির্ব্বাচিত হইতে অক্ষম। তাহা ভিন্ন যে কোন ব্যক্তি গবর্মেণ্টের কর্ম্মচ্যুত হইয়াছেন, কারারুদ্ধ বা দ্বীপান্তরিত হইয়াছেন বা শান্তিরক্ষার জন্য মুচ্‌লেকা দিতে বাধ্য হইয়াছেন, সেরূপ ব্যক্তিও নির্ব্বাচিত হইতে পারিবেন না। ইহার ফলে সুরেন্দ্রনাথ, তিলক, অশ্বিনীকুমার, অনাথবন্ধু গুহ, লজপত রায় ইত্যাদি মহারথিগণ ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশাধিকারে বঞ্চিত। এ সকল গণ্ডি বাঁধিয়াও রাজপক্ষ নিশ্চিন্ত হন নাই। রাজপক্ষ যাঁহাকে অনুপযুক্ত অর্থাৎ অমনোনীত করিবেন তিনি নির্ব্বাচিত হইলেও সভামধ্যে প্রবেশ করিতে পাইবেন না।

নির্ব্বাচন শক্তি লইয়াও গবর্মেণ্ট হিন্দু মুসলমানের মধ্যে প্রভেদ সৃষ্টি করিয়াছেন। বাৎসরিক ৭,৫০০ টাকা রাজকর না দিলে কোন হিন্দু জমিদার সভ্য হইতে পারিবেন না। অথচ উহার অপেক্ষা অনেক অল্প রাজকর দিলেই মুসলমান সভ্য হইতে পারিবেন। হিন্দুর কোনও শিক্ষিত ব্যক্তিই ভোট দানে সক্ষম নহেন,...মুসলমান বি,এ, পাশ করার ১০ বৎসরের মধ্যে ভোট দিতে পারিবেন না; কিন্তু অপর পক্ষে ২৫ টাকা বেতনের একজন সামান্য গ্রাম্য মৌলবী যে সময়ে ইচ্ছা ভোট দিতে পারিবে। সুতরাং মুসলমানগণের মধ্যেও শিক্ষিত সম্প্রদায়কে অশিক্ষিতের অপেক্ষা নিকৃষ্ট স্থান দেওয়া হইয়াছে। হিন্দু যত বড়ই হউন তিনি ভোট দিতে পারিবেন না, কিন্তু মুসলমান সামান্য ব্যবসায়ী হইলেও সে ক্ষমতা হইতে বঞ্চিত হইবে না। এইরূপ পদে পদে বিধানটি শিক্ষিত অশিক্ষিত ধনী দরিদ্র, হিন্দু মুসলমানের মধ্যে ভেদনীতিতে পরিপূর্ণ।

অবশেষে নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিবর্গের কর্ম্ম ও ক্ষমতা। প্রথমতঃ ত প্রতিনিধিবর্গের পরামর্শ দেওয়া ভিন্ন অন্য কোন অধিকারই নাই। কিন্তু সে শক্তি-টুকুকেও নানারূপ নাগপাশে বদ্ধ করিয়া প্রতিনিধি-বর্গের কণ্ঠরোধ করা হইয়াছে। বৈদেশিক শক্তি বা দেশীয় রাজ্যের সহিত সম্বন্ধের বিষয়ে, সৈন্য, নৌবিভাগ ও সামরিক বিভাগের ব্যয় সম্বন্ধে ও অপরাপর বহুবিধ বিষয়ের আয় ব্যয় সম্বন্ধে প্রতিনিধিগণ কোন প্রকার প্রশ্ন করিতে পারিবেন না। যে সকল বিষয়ে তাঁহারা প্রশ্ন করিতে অধিকারী সে সকল বিষয়েও গবর্মেণ্ট ইচ্ছা করিলে কোন প্রকার উত্তরদান না করিতে পারেন। বিলাতের পার্লামেণ্টের সাধারণ সভায় প্রশ্নকারীর শক্তির উপর যদি এতগুলি অনুশাসন

প্রচলিত থাকিত, তাহা হইলে সভার অর্দ্ধেক কর্ম্ম কমিয়া যাইত সন্দেহ নাই। ইণ্ডিয়া গবর্মেণ্ট আত্মরক্ষার জন্য এমন সুবুদ্ধির সহিত প্রতিনিধিবর্গের শক্তির সীমা বদ্ধ করিয়া দিয়াছেন যে, গবর্মেণ্টের পক্ষে অসুবিধাজনক বা ক্ষতিকর মনে করিলেই তাঁহারা তাঁহাদিগের সে শক্তিটুকু হরণ করিতে পারেন। ইহার উপর আবার সভাপতি উত্তরদানের অসুবিধা বোধ করিলে অর্থাৎ আপনাদিগকে অপদস্থ হইবার আশঙ্কা থাকিলে যে কোন প্রশ্ন বা প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন। বাস্, সকল আপদ চুকিয়া গেল।

রিস্‌লি সাহেব রাজতক্ত না পাইলেও ইতিহাসের পত্রে অমরস্থান লাভ করিলেন। তাঁহারই মুন্সিয়ানায় আমরা বঙ্গচ্ছেদ পাইয়াছিলাম আর তাঁহারই অনুগ্রহে আমরা এই নববিধান লাভ করিলাম। এইরূপ নীতিই যদি প্রজার সহিত সহযোগিতা হয়, তবে ইহার একটা মহা সুবিধা এই; কাউন্সিলে প্রবেশ করিতে পারিলে প্রজাভাগ্যের তহবিলে শ্রম-খরচায় শূন্য এবং উপাধিটাই তাহার লাভ জমা! ম্যাক্‌ডোনাল্ড সাহেবের (Mr. Ramsay Macdonald) অভিমত উদ্ধৃত করিয়া আমাদের বক্তব্য শেষ করিলাম। তিনি বলিয়াছেন—

"এই বিধানে ভারত গবর্মেণ্ট এক মহা ভুল করিতেছেন। শিক্ষিত হিন্দুগণের প্রতি অবিশ্বাস তাঁহাদের প্রথম ভ্রম; জেলাবোর্ড ও মিউনিসিপালিটির সভ্য ভিন্ন অপর কেহ প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হইতে পারিবে না, এরূপ নিয়ম করা তাঁহাদের দ্বিতীয় ভ্রম; আর মুসলমানগণের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়া হিন্দুদিগকে অবিশ্বাস করা এক বিষম ভ্রম। ইহা দ্বারা এই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে মিলন হওয়া দূরে থাক, দিন দিন অধিকতর বিচ্ছেদই সংঘটিত হইতে থাকিবে। ইহার ফল অতি শোচনীয় হইবে বলিয়াই আমি মনে করি; কারণ রাজনৈতিক আন্দোলন অপেক্ষা ধর্ম্ম ও সাম্প্রদায়িক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত আন্দোলন গবর্মেণ্টের পক্ষে অধিকতর বিপজ্জনক হইবে সন্দেহ নাই।"

হাইন হইতে।

টগরের ঝাড়ে একটি টগর
বিষণ্ণ আভাহীন;
শিশির অন্তে নববসন্তে
তবু সে তেমনি দীন;—
পাণ্ডুর ছবি—যেন আহা মরি!
রুগ্ন বালিকা ক্ষীণ!

মৌন কুসুম মিনতিয়া কহে
তুলি লও সখা মোরে;
আমি কহিলাম—তুমি ত সে নও;
টগর না চাহি তোরে;
আমি খুঁজি রাঙ্গা সুন্দর কুসুম,—
অশান্ত তিয়াসা ভরে।

ব্যথিত টগর কহে—খোঁজ তবে
দেখ যদি তারে পাও;
মোর মনে হয় পাবে না সে ফুল—
বৃথায় খুঁজিতে যাও।
লহ তুমি মোরে মিনতি রাখগো
ব্যথিতে শরণ দাও।

শুনি টগরের আকুলতা বাণী
তুলিয়া লইনু করে—
অমনি জুড়াল মরমের ব্যথা
আলো ফুটে আঁখি পরে;
দেবদুর্ল্লভ বিমল আনন্দে
হৃদয় উঠিল ভরে।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী, বি, এ।

শোকবার্ত্তা।

৺রমেশচন্দ্র দত্ত। গত ৩০শে নবেম্বর প্রাতঃকালে ভারতবর্ষের উজ্জ্বল রত্ন রমেশচন্দ্র ৬১ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দের ১৩ই আগষ্টে রামবাগানের প্রসিদ্ধ দত্তবংশে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার এই অকাল মৃত্যুতে হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত সমগ্র ভারত আজ শোকাচ্ছন্ন। কালের এই নির্দ্দয় আঘাতে বাঙ্গালীমাত্রেই আজ মর্ম্মাহত। আর আমরা—রমেশচন্দ্রের মৃত্যুতে যে কেবল স্বজাতিগৌরব, স্বদেশ-প্রেমিক কর্ম্মবীরকে হারাইয়াছি তাহা নহে, —তাঁহার মৃত্যুতে আমরা আজ বন্ধুবিয়োগের আঘাতে মর্ম্মাহত। জীবিতকালে রমেশচন্দ্র অনেক সময়ে তাঁহার অক্লান্ত লেখনীর দ্বারা ভারতীর পত্র ভূষিত করিয়াছেন।

বঙ্গদেশ চিরদিনই রত্নপ্রসবা বলিয়া জগতে বিদিত। আজ দেশের এ দুঃখ দারিদ্র্যের দিনেও আমাদের জননী জন্মভূমি কি ধর্ম্মে, কি কর্ম্মে, কি কার্য্যে, কি সাহিত্যে, কি স্বদেশপ্রেমে কি স্বদেশসেবায় যে অমূল্য রত্নগুলি প্রসব করিয়া জগতের সম্মুখে আপনাকে গৌরবান্বিত করিয়া তুলিয়াছিলেন; রমেশচন্দ্র সেই নবরত্নের একটি। তাঁহার জীবন অক্লান্ত কর্ম্ম ও অবিচলিত সাধনার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তাঁহার জীবনে তেজ ও সাহস, শক্তি ও সাধনা, কর্ম্ম ও চিন্তা স্বদেশপ্রেম ও স্বজাতিসেবার যেরূপ একত্র সমাবেশ দেখা যায়, এরূপ দৃষ্টান্ত, কেবল ভারতের ইতিহাসে কেন, সমগ্র জগতের ইতিহাসেও বিরল।

বিংশতিবর্ষ বয়সে ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের ৩রা মার্চ্চে তিনি তাঁহার বাল্যবন্ধু বিহারীলাল গুপ্ত ও সুরেন্দ্রনাথের সহিত গোপনে শিক্ষালাভের জন্য বিলাতে পলাইয়া যান। তথায় সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় তিনশত ইংরাজ পরীক্ষার্থীদিগের মধ্যে তিনি ইংরাজি ভাষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। ইহা তাঁহার ন্যায় অল্পবয়স্ক বিদেশীর পক্ষে কম গৌরবের কথা নহে। সংস্কৃতে তিনি প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছিলেন।

১৮৭১ সাল হইতে ১৮৮২ সাল পর্য্যন্ত রমেশচন্দ্র বঙ্গের বিভিন্ন জেলায় নানাপ্রকার কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন। যেখানে হিন্দু মুসলমানে বিরোধ হইয়া শাসন বিশৃঙ্খলা উপস্থিত করিত, যেখানে দুর্ভিক্ষ বা বন্যায় দেশে হাহাকার উপস্থিত হইত, সেইখানেই যুবক রমেশচন্দ্র নিযুক্ত হইতেন। রমেশচন্দ্র তাঁহার অসাধারণ শ্রমশক্তি, সহানুভূতি ও অধ্যবসায়ের ফলে অচিরে বিরোধ, বিশৃঙ্খলা, দুর্ভিক্ষ ও হাহাকারের স্থানে শান্তি, শৃঙ্খলা, সচ্ছলতা ও সন্তোষ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইতেন। এবং এই সকল দায়িত্ব ও শ্রমের মধ্যেও তাঁহার লেখনী একদিনের জন্যও অলস থাকিত না। তিনি তাঁহার কর্ম্মের প্রথম অবস্থাতেই তাঁহার ইয়ুরোপ ভ্রমণ ও বঙ্গদেশের সাহিত্য ও কৃষকদিগের জীবন সম্বন্ধে পুস্তকাদি প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তাহার পরে তিনি মাতৃভাষায় উপন্যাস লিখিতে অগ্রসর হন। বঙ্কিমচন্দ্র রমেশচন্দ্রের একজন বিশিষ্ট বন্ধু ছিলেন। একদিন কলিকাতায় উভয়ের সাক্ষাৎ হইলে বঙ্কিম রমেশচন্দ্রকে মাতৃ-ভাষায় পুস্তক লিখিবার জন্য অনুরোধ

করেন। রমেশচন্দ্র বলিয়া উঠিলেন—"আমি বাঙ্গালায় লিখিব—আমি যে বাঙ্গলা ভাষাই জানি না।" বঙ্কিম উত্তর করিলেন "কেন, তোমার মত শিক্ষিত ব্যক্তি যাহা লিখিবে, তাহাই ভাষা বলিয়া চলিয়া যাইবে। তোমার যদি ভিতরে শক্তি থাকে ত ভাষা আপনিই আসিয়া যাইবে।" এই উপদেশের ফলে ১৮৭৪ হইতে ১৮৮০ সালের মধ্যে রমেশচন্দ্র তাঁহার ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলি প্রকাশ করেন।

ইতিমধ্যে তাঁহার চাকরির ১১ বৎসর হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে রাজপুরুষগণ চিন্তা করিতে লাগিলেন একজন দেশীয়কে জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট করিয়া দেওয়া সঙ্গত ও নিরাপদ কি না। গবর্মেণ্ট তাঁহাকে পরীক্ষা করিবার জন্য বঙ্গের সর্ব্বাপেক্ষা দুর্দ্দান্ত জেলা বাখরগঞ্জে প্রধান ম্যাজিষ্ট্রেট করিয়া দিলেন। তিনি এরূপ সুচারু দক্ষতার সহিত শাসন করিতে লাগিলেন, সমগ্র জেলায় এরূপ শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হইল যে বহু বৎসরাবধি তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী ইংরাজ ম্যাজিষ্ট্রেটগণের শাসনে সেরূপ হয় নাই। তাঁহার কর্ম্মে বড়লাট রিপন সাহেব এতদুর প্রীত হইয়াছিলেন যে তাঁহাকে আপন প্রাসাদে আহ্বান করিয়া বলেন—"আমি তোমাকে ডাকিয়াছি—ভারতত্যাগের পূর্ব্বে তোমাকে দেখিব ও তোমার পরিচয় গ্রহণ করিব বলিয়া। তোমার কৃতিত্ব ইংলণ্ডবাসীর জানা আবশ্যক, তাহা হইলে ভবিষ্যতে ভারতবাসীকে উচ্চ শাসন কর্ম্মে নিযুক্ত করিতে আর তাহাদের কোন আপত্তি হইবে না।"

তাহার পর ১৮৮৫ সালে দুই বৎসরের

প্রকাশ করেন। তিনি শূদ্র হইয়া বেদের অনুবাদে অগ্রসর হইয়াছেন বলিয়া দেশময় তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইল। কিন্তু রমেশচন্দ্র তাহাতে ভীত না হইয়া অবিচলিত চিত্তে স্বকর্ম্মে অগ্রসর হইতে লাগিলেন এবং ১৮৮৬ সালের প্রথমভাগে তাঁহার ঋগ্বেদ প্রকাশিত করিলেন।

এই সময়েই ভারতবর্ষের ইতিহাস লিখিবার কল্পনা তাঁহার মনে জাগ্রত হইয়া উঠে। পাবনার ম্যাজিষ্ট্রেটি করিতে করিতে তিনি "পুরাতন ভারতে সভ্যতা" নামে তিন খণ্ডে এক বৃহৎ ইতিহাস প্রকাশিত করেন। সমস্ত দিনের শ্রমের পর তিনি প্রায় সমস্ত রাত্রি এই কঠোর কর্ম্মে অতিবাহিত করিতেন। ১৮৯৩ সালে তিনি "বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ" স্থাপিত করেন। সাহিত্য পরিষদ্ যে এই কয় বৎসরের মধ্যে দেশের সাহিত্য জীবন কতপ্রকারে সমুন্নত করিয়া তুলিয়াছে তাহা বঙ্গবাসীমাত্রেই জানেন।

১৮৯৪ সালে রমেশচন্দ্র বর্দ্ধমান বিভাগের কমিশনরের পদে নিযুক্ত হন। ইংরাজ শাসনে ভারতবাসীর এরূপ উচ্চ কর্ম্মপ্রাপ্তি এই প্রথম। এবং এই বৎসর তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় সভ্য নির্ব্বাচিত হন। অবশেষে অর্থচেষ্টা ত্যাগ করিয়া সাহিত্য ও স্বদেশের সেবায় জীবনের অবশিষ্ট ভাগ উৎসর্গ করিবার উদ্দেশ্যে ১৮৯৭ সালে তিনি রাজকর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণান্তে ইংলণ্ডে থাকিয়া স্বর্গগত উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও দেশপূজ্য দাদাভাই নাওরোজীর সহিত ভারতবাসীর দুঃখমোচনের জন্য কায়মনোবাক্যে চেষ্টা করিতে থাকেন।

১৮৯৯ সালে কংগ্রেসের সভাপতি হইয়া তিনি ভারতে প্রত্যাগমন করেন। ১৯০৪ সালে বরোদার মহারাজা কর্ত্তৃক রমেশচন্দ্র তাঁহার রাজস্বসচিবের পদে নিযুক্ত হন। তিন বৎসরের মধ্যে বরোদা রাজ্যে রমেশচন্দ্র শিক্ষা, শিল্প, কৃষি, বাণিজ্য, বিচার ও শাসন সম্বন্ধে এরূপ উদার সংস্কার সকল প্রবর্ত্তিত করেন যে তাহার ফলে বরোদারাজ্য আজ ভারতে শত্রু মিত্রের নিকট আদর্শরাজ্য বলিয়া পরিগণিত। "বরোদাবাসী কর্ত্তৃক রমেশচন্দ্র দরিদ্রবন্ধু" উপাধি লাভ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার অবসরগ্রহণের সময় শিক্ষিত অশিক্ষিত, ইতর ভদ্র সকলেই ক্ষুব্ধ ও শোকসন্তপ্ত হইয়াছিল। পরে দুই বৎসর রমেশচন্দ্র রাজনিযুক্ত Decentrelisation কমিশনে নিযুক্ত ছিলেন। দুই বৎসর পরে তিনি পুনরায় দেওয়ান পদে নিযুক্ত হইয়া বরোদারাজ্যে গমন করেন। একটি জীবনে এরূপ বহুমুখী চেষ্টা ও সফলতা দেখিলে বস্তুতই মুগ্ধ হইতে হয়। তিনি যে কেবল কর্ম্মী ছিলেন তাহা নহে। শাসনদক্ষতার গুণে তিনি বর্ত্তমান যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শাসনকর্ত্তৃগণের সমকক্ষ ছিলেন। স্বদেশপ্রেমে তিনি বর্ত্তমান যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্বদেশসেবকগণের সহিত সমাসনে প্রতিষ্ঠিত হইবার যোগ্য। ইংরাজি লিখিবার ক্ষমতায় তাঁহার সমকক্ষ বড় কেহই নাই। কিন্তু ভারতের ইতিহাসগুলি তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তি,—ইহারাই তাঁহার নামকে ভারতের ভবিষ্যৎ ইতিহাসে অমর করিয়া রাখিবে। এইরূপ ইতিহাসের দ্বারাই জাতির অন্তর গঠিত ও উন্নত হইয়া উঠে। যতদিন ভারবর্ষ থাকিবে ততদিন এই অমর পুরুষের স্বদেশ সেবা তাঁহার ইতিহাসের পত্রে পত্রে জীবিত ও জাগ্রত হইয়া থাকিবে।

পূর্ব্ব হইতেই ইঁহার হৃদ্‌রোগ ছিল। ইংলণ্ডের ডাক্তারেরা আশ্বাস প্রদান করিয়া বলেন, 'ইহা মারাত্মক নহে, সাবধানে থাকিয়া কাজ কর্ম্ম করিতে বাধা নাই।' কিন্তু এবার গভর্ণর জেনেরলের বরদা গমনকালে দাওয়ানের কর্ত্তব্য বোধ তাঁহাকে আর সাবধান হইতে দিল না। সেই সময়কার নিরতিশয় শারীরিক পরিশ্রম ও মানসিক উদ্বেগই প্রকৃতপক্ষে তাঁহার এই আকস্মিক মৃত্যুর কারণ দাঁড়াইল। প্রাসাদে যেদিন লাট সাহেবের ভোজ—একত্র ভোজনে বসিয়া রমেশচন্দ্র বক্ষে দারুণ বেদনা অনুভব করিতে লাগিলেন। কিন্তু টেবিল হইতে উঠিলে উৎসব ভঙ্গ হইয়া যাইবে এই জন্য বেদনায় ঘর্ম্মাক্তকলেবর ও মূর্চ্ছিতপ্রায় হইয়াও প্রাণপণ আয়াসে শেষ পর্য্যন্ত বসিয়া, লাট সাহেবের উঠিবার পর বিদায় গ্রহণ করিলেন। এই ঘটনা তাঁহার মনের বল ও কর্ত্তব্যজ্ঞানের কিরূপ জ্বলন্ত পরিচয় প্রদান করিতেছে!

কেবল রমেশচন্দ্র দত্ত নহেন, সম্প্রতি আমরা আরও কয়েকটি কর্ম্মবীর ও আদর্শ পুরুষ হারাইয়াছি। স্থানাভাবে আমরা শোকসন্তপ্তচিত্তে তাঁহাদের কর্ম্মশীল জীবনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করিয়াই হৃদয়ের ক্ষোভ কথঞ্চিৎ নিবৃত্তি করিলাম।

৺কেদারনাথ রায় সেশন জজ ছিলেন। "বিচারাসনে বসিয়া তিনি এক ধর্ম্মরাজ বিধাতা ব্যতীত কাহাকেও ভয় করিতেন না। তিনি একদিকে যেমন

স্বাধীনচেতা ছিলেন, অপরদিকে তেমনি দয়ালু ও ধর্ম্মভীরু ছিলেন। তাঁহার এই সকল গুণে সকলকেই মুগ্ধ করিত এবং গবর্মেণ্ট অনেক সময়েই তাঁহার উপর দুইটি জেলার কর্ম্মভার ন্যস্ত করিতেন। তাঁহার স্বাধীন-চিত্ততা ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠার জন্য তিনি অনেক সময়ে লোকের ও গবর্মেণ্টের বিরাগ ভাজন হইতেন। কিন্তু তাহার প্রতি তিনি কোন দিনই দৃকপাত করেন নাই। গবর্মেণ্টের কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিবার দিনেও তিনি লিখিয়াছিলেন—স্বাধীনচিত্ততা ও সাহসই বিচারকের শ্রেষ্ঠ গুণ। রোগীর সেবা ও বিপন্নের কার্য্যোদ্ধার করিবার সময় কেদার-নাথের সময়ের জ্ঞান বা আহার নিদ্রাবোধ থাকিত না। কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াও তিনি নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। ব্রাহ্মধর্ম্ম ও সমাজের উন্নতি কল্পে আত্মোৎসর্গ করিয়া-ছিলেন! এ সকল করিয়াও তিনি নিজের প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন না—সর্ব্বদাই বলিতেন—"আমার জীবনটা ব্যর্থ হইল।"

অধ্যবসায়, কার্য্যোৎসাহ, দৃঢ়প্রতিজ্ঞা ও উচ্চাভিলাষ সত্ত্বেও তিনি কোন দিন নিজের জন্য কিছু করিবার চেষ্টা করেন নাই—পরিবার, সমাজ বা দেশই তাঁহার সকল কর্ম্মের লক্ষ্যস্থল ছিল।

৺অনাথবন্ধু প্রাণকৃষ্ণ দত্ত। ইঁহারই উদ্যোগে, সেবায়, স্বার্থত্যাগে ও আত্মোৎসর্গে আমাদের নগরের অনাথ আশ্রমটি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। প্রথম তিনি নিঃসম্বল অবস্থায় যখন অনাথ প্রতিপালন আরম্ভ করেন তখন অনেকেই উপহাস করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রাণকৃষ্ণের দেবচিত্ত সে সকল হীন তিরস্কার উপেক্ষা করিয়া আপন মহৎকর্ম্ম অনুসরণ করিতে বিমুখ হয় নাই। প্রথমে নিজের উপর নির্ভর করিয়া নারিকেলডাঙ্গায় একটি ক্ষুদ্র পর্ণ-কুটীর নির্ম্মাণ করাইয়া অনাথ সেবা আরম্ভ করেন। একটি শিশু হইতে ক্রমে চারিটি শিশু সংগ্রহ করিয়া তিনি আশ্রম স্থাপনা করেন। আশ্রমের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য ভিক্ষার ঝুলি হাতে করিয়া তিনি বাঙ্গালীর দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। কেহ বা যৎকিঞ্চিৎ দান করিতেন, কেহ বা অপমানিত করিয়া তাড়াইয়া দিতেন। প্রাণকৃষ্ণ তাহাতে বিচলিত হইতেন না। তিনি অদম্য উৎসাহে ও অক্লান্ত সেবায় সেই নগণ্য আশ্রমটিকে ক্রমে বঙ্গের একটি বৃহৎ কীর্ত্তিতে পরিণত করিয়া গিয়াছেন। ১৮৯২ সাল হইতে সাধারণে বিধিবদ্ধ ভাবে ইহার সহায়তা করিতে আরম্ভ করেন। ১৯০০ সালে বঙ্গের ভূতপূর্ব্ব অধীশ্বর সহৃদয় উডবর্ণ সাহেব ইহার পৃষ্ঠপোষক হন। পরে প্রাণকৃষ্ণ বাবুর যত্নে কুমার মন্মথনাথ মিত্র শ্যামবাজারে ২৩ কাঠা জমি দান করেন ও অন্যান্য সহৃদয় ব্যক্তির নিকট প্রায় বিশ সহস্র মুদ্রা সংগৃহীত হয়। এইরূপে বহুকষ্টে তিনি অনাথআশ্রমের বর্ত্তমান বৃহৎ অট্টালিকাটি নির্ম্মিত করিয়া তুলেন। প্রাণকৃষ্ণের পত্নী যথার্থই স্বামীর সহধর্ম্মিণী ছিলেন। তাঁহার ভগিনীও এই কার্য্যে তাঁহাদের সহায়তা করিয়া আসিয়াছেন। ইঁহারা সকলেই অনাথসেবায় জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। পালিত অনাথগণ তাঁহাদের সন্তান অপেক্ষা প্রিয় ছিল। অনাথ আশ্রমের ইতিহাস প্রাণকৃষ্ণের কীর্ত্তিকে অমর

করিয়া রাখিবে। আজ প্রাণকৃষ্ণের মৃত্যুতে তাঁহার ভগিনীই অসহায়গণের একমাত্র আশ্রয়স্বরূপ রহিলেন।

৺ডাক্তার দেবেন্দ্রনাথ রায়। ইঁহার জন্ম নদীয়ার রাজবংশে। ইঁহার ন্যায় চিকিৎসানিপুণ কৃতি লোক অল্পই দেখা যায়। ইনি গবর্মেণ্টের অধীনে অনেক প্রকার কর্ম্ম করিয়া অবশেষে কলিকাতা ক্যাম্বেল হাঁসপাতালে অধ্যাপক এবং বড়লাটের অবৈতনিক চিকিৎসক নিযুক্ত হন। ১৮৭৬ সালে মান্দ্রাজের দুর্ভিক্ষে যখন গবর্মেণ্ট বাঙ্গলা হইতে কতকগুলি ডাক্তার প্রেরণ করিবার ব্যবস্থা করেন তখন যুবক দেবেন্দ্রনাথ সর্ব্বপ্রথম সেই কার্য্যে অগ্রসর হন। ১৮৭৭সালে বড়লাট লিটন সাহেব দুর্ভিক্ষস্থল পরিদর্শনে গমন করিয়া দেবেন্দ্রনাথের গুণপণা ও কার্য্যকুশলতা দেখিয়া এতদূর প্রীত হইয়াছিলেন যে তৎক্ষণাৎ আপন অঙ্গুরী খুলিয়া দেবেন্দ্রনাথকে পুরস্কার দান করেন ও পরে স্বহস্তে প্রশংসা পত্র লিখিয়া তাঁহাকে প্রেরণ করেন। কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি কলিকাতার অ্যালবর্টভিক্টর হাঁসপাতাল ও বিদ্যালয়ের উন্নতিকল্পে জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। তাঁহার ন্যায় অমায়িক, পরোপকারী, স্নেহময় অন্তঃকরণ খুব অল্প লোকেরই দেখিতে পাওয়া যায়।

৺সুরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলি। স্বদেশীভাবের প্রসিদ্ধ চিত্রকর শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথের ইনি একজন প্রিয় ছাত্র ছিলেন। ৺রমেশচন্দ্র দত্ত প্রভৃতির ন্যায় কর্ম্মবীর না হইলেও ইঁহার মৃত্যু কম শোকজনক নহে। এই অকাল মৃত্যুতে ভারতমাতার কণ্ঠলগ্ন একটি উজ্জ্বল রত্ন কালগর্ভে বিলীন হইল। ছাত্রজীবনেই সুরেন্দ্রনাথ চিত্রাঙ্কনে যে অসামান্য প্রতিভা দেখাইয়াছেন, বয়োবৃদ্ধি সহকারে তাহা যে পরিস্ফুট মহিমায় ভারতচিত্রজগতের গৌরব শতগুণ বর্দ্ধিত করিত তাহাতে সন্দেহ নাই। এই বৎসরের ভারতীতে সুরেন্দ্রনাথের অঙ্কিত অনেকগুলি চিত্রের প্রতিলিপি প্রকাশিত হইয়াছে;—এই সংখ্যার বিপন্ন দুর্ব্বাসা তাঁহারই চিত্রলিপি।

এই শোক সংবাদে আমরা যেন আত্মীয় বিয়োগের আঘাত প্রাপ্ত হইলাম। ভবিষ্যতে ইঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশে ইচ্ছা রহিল।

৺ব্রজনাথ কাঞ্জিলাল। ইনি বৎসর খানেক পূর্ব্বে মাত্র জষ্টিস আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের বিধবা কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। সংসারে মৃত্যুতাপ, শোকদুঃখ আছেই; সঙ্গে সঙ্গে তাহার পূরণও আছে। কিন্তু ইঁহার অকালমৃত্যুতে, ইনি পরিবারকে যে অসীম শোকে আকুল করিয়া গিয়াছেন—দেশকে যেরূপ ক্ষতিগ্রস্ত করিয়া গিয়াছেন—তাহার বুঝি আর পূরণ নাই! তথাপি আমরা স্বল্পদর্শী মানব সেই সর্ব্বদর্শী নিয়ন্তৃ-পুরুষের মঙ্গল ভাবের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া বলিব —"তোমারই ইচ্ছা হউক পূর্ণ, মঙ্গলময় স্বামী; দাও দুঃখ দাও তাপ—সকলি সহিব আমি।" সেই করুণাময় স্বামীই শোকার্ত্ত পরিবারকে এই অসীম শোকবেদনা সহ্য করিবার বল প্রদান করুন; ইহাই সন্তপ্ত হৃদয়ের আন্তরিক প্রার্থনা।

চিত্রব্যাখ্যা।

গত অগ্রহায়ণ মাসে শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিকল্পিত 'লীলাকমল' ও শ্রীযুক্ত অসিতকুমার হালদারের 'যশোদা' নামক চিত্রের দুইখানি প্রতিলিপি ভারতীতে প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাদের সম্বন্ধে দু-এক কথা ব্যাখ্যা অনেকের নিকট আবশ্যক বোধ হইয়া থাকিতে পারে। এজন্য ঐ চিত্র দুখানিকে আমরা যেরূপ বুঝিয়াছি তাহারই সংক্ষিপ্ত আভাস এখানে লিখিত হইতেছে।

লীলাকমল। শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি আমাদের দেশের ভগবানের চিহ্নস্বরূপ, কেহ বা বৃন্দাবনের কৃষ্ণকে পূজা করেন, কেহ বা গীতার কৃষ্ণকে স্বীকার করেন। মোটের উপর একেশ্বরবাদীও গীতার কৃষ্ণকে ভগবানের নামান্তর বলিয়া গ্রহণ করিতে দ্বিধা বোধ করেন না। শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি আমাদের দেশের মন্দিরে মন্দিরে, গৃহে গৃহে, হৃদয়ে হৃদয়ে বিভিন্নরূপে বিরাজিত। তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া মা যশোদার স্নেহ, গোপবালকের সখ্য, রাধার প্রেম, ধ্রুব প্রহ্লাদ উদ্ধব অক্রূরের ভক্তি, অর্জ্জুনের নির্ভরতা অহরহ আমাদের মনের মধ্যে জাগরূক হইয়া উঠিয়াছে। এ কৃষ্ণ ব্যক্তি-বিশেষ নয়, এ কৃষ্ণ পুরাণ মহাভারতের নয়—এ কৃষ্ণ শাশ্বত পুরুষ, আমাদের নয়নানন্দ, হৃদয়েশ্বর, এক অদ্বিতীয় ভগবান। তাই বুঝিয়াই শিল্পী শ্রীকৃষ্ণের পরিকল্পনা করিয়াছেন। তিনি কাহারো মতানুসরণ করেন নাই। ভক্তের অমল ধবল পবিত্র হৃদয় শতদলের উপর ভাববিহ্বল আনন্দদুলালকে চিত্রিত করিয়াছেন। হৃদয়পদ্ম বিকশিত পত্রের যত সব শিরা উপশিরা সে ত ভক্তেরই শিরাধমনী—ভক্তের হৃদয়রক্তের মধ্যে আনন্দ-তরঙ্গ, ভাবস্পন্দন, বিচিত্র অনুভূতি বিবিধ বর্ণে, অপূর্ব্ব রেখায় প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে কৃষ্ণের সুন্দর শিশুমূর্ত্তি দর্শকের চিত্তকে রসাভিষিক্ত করিয়া দেয়; তাঁহার মুখে তন্ময়তা, অঙ্গে উচ্ছলতা। হস্তে ধৃত মিষ্টান্ন উপভোগের আনন্দ ও চিরপূর্ণতার সূচনা করিতেছে। এই চিত্রখানি ভাবে, মাধুর্য্যে, সৌন্দর্য্যে, অঙ্কনপারিপাট্যে প্রসিদ্ধ শিল্পীর তুলিকার উপযুক্তই হইয়াছে।

যশোদা। লীলাকমল প্রসঙ্গে কৃষ্ণসম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছি। তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। যশোদা আমাদের মাতৃমূর্ত্তির আদর্শ, আমাদের ম্যাডোনা। যশোদার স্নেহবর্ষিণী স্নিগ্ধ দৃষ্টি চিত্রকরের তুলিকায় অতি চমৎকার প্রকাশিত হইয়াছে। 'শুধু বৈকুণ্ঠের তরে বৈষ্ণবের গান' নয়। 'আমাদেরি কুটীর-কাননে ফুটে পুষ্প, কেহ দেয় দেবতা-চরণে, কেহ রাখে প্রিয়জন তরে।' এইরূপ সুন্দর মাতৃমূর্ত্তি আমাদের ঘরে ঘরে, তাই আমাদের এ ছবিখানি বড় ভাল লাগিয়াছে। শিশুটির পরম নির্ভর শান্তগভীর নিদ্রা ও জননীর স্নেহদৃষ্টি অতি মধুরভাবে অঙ্কিত হইয়াছে। যশোদার বস্ত্রের আকুঞ্চন শিল্পীর কলাকুশলতার পরিচয় দিতেছে। ভাবের সহিত সৌন্দর্য্য সমাবেশ করাই প্রাচ্য শিল্পীর কবিত্ব। অসিতকুমার সেই সাধনায় সিদ্ধির পথে অগ্রসর হইয়াছেন, ইহা প্রাচ্য-প্রথাবিরোধীরাও স্বীকার করিবেন।

বিপন্ন দুর্ব্বাসা। সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় কর্ত্তৃক অঙ্কিত।

অম্বরীষ নামে পরম বিষ্ণুভক্ত এক রাজা ছিলেন। ভগবান বিষ্ণু তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে নিজের চক্রটি দান করিয়াছিলেন। সেই চক্র সদাসর্ব্বদা অম্বরীষের পাশে পাশে থাকিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিত। একদিন দুর্ব্বাসা মুনি তাঁহার বাড়ি আসিয়া উপস্থিত;—সে দিন কার্ত্তিক মাসের দ্বাদশী-ব্রতের পারণ। এই পুণ্য দিনে দুর্ব্বাসার মত ঋষিকে বাড়িতে অতিথি পাইয়া অম্বরীষ অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন এবং নিজেকে কৃতার্থ জ্ঞান করিলেন। দুর্ব্বাসাকে যথোচিত সমাদর করিয়া তাঁহাকে সেদিনকার মত সেখানে ভোজন করিতে অনুনয় করিলেন। দুর্ব্বাসা সম্মত হইয়া স্নান করিতে গেলেন।

দুর্ব্বাসা সেই যে গেলেন আর ফেরেন না—অনেক সময় বহিয়া গেল। রাজা ভাবিলেন ঋষি আর আসিবেন না। তখন পুরোহিতের অনুমতি' লইয়া নিজের আহার শেষ করিয়া ফেলিলেন। তার পর দুর্ব্বাসা আসিয়া হাজির। দুর্ব্বাসা একে রাগী মানুষ তাহার উপর উপবাসী, যখন শুনিলেন রাজা আহার করিয়া বসিয়া আছেন তখন তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ভয়ানক ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিল। তখনই তিনি নিজের জটা হইতে উগ্রদেবতার সৃষ্টি করিয়া তাঁহাকে বলিলেন—পাপিষ্ঠ অম্বরীষকে বধ কর। উগ্রদেব আক্রমণ করিতে আসিতেছে, সুদর্শন চক্র ছিল অম্বরীষের পাশে, সে ছুটিয়া আসিয়া উগ্রকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিল—তাহার পর দুর্ব্বাসাকে তাড়া করিল। দুর্ব্বাসা ভয়ে ছুট দিলেন—সুদর্শন পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল;—যেখানে যান নিস্তার নাই, সুদর্শন পশ্চাতে। অনেক ঘুরিয়া শেষে অম্বরীষের শরণাপন্ন হইলেন, তখন রক্ষা!

দুর্ব্বাসা পলাইতেছেন সুদর্শন তাড়া করিয়া চলিয়াছে এই কৌতুকজনক দৃশ্যটি শিল্পী অতি পারদর্শিতার সহিত অঙ্কিত করিয়াছেন। দুর্ব্বাসা কিরূপ প্রাণপণে ছুটিয়াছেন তাহা তাঁহার অঙ্গভঙ্গিতে বেশ বুঝা যায়। পবন-তাড়িত বসনপ্রান্ত হইতেও সেই ভাবের আভাষ পাওয়া যায়। তিনি ছুটিতে পারিতেছেন না তবুও ছুটিয়া চলিয়াছেন এই ভাবটিও বেশ পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহার মুখে একটা অসহায়তা, একটা দারুণ ভয়ের ভাব জাজ্বল্যমান!

দান।

জানিনা দেবতা তুমি থাক কোন্ দেশে
পথও তার নাহি মোর চেনা,—
নাহি জানি কবে তুমি কোন্ দেব বেশে
ধরা মাঝে কর আনা গোনা!

জানি শুধু হে রাজন্, মোরা হেথা যাহা
সুখ আর শুভ রূপে পাই,—
নীরবে গোপনে রহি' অকাতরে আহা,
দাও তুমি, দাও তুমি তাই!!

সমালোচনা।

সরল বিজ্ঞানসোপান। শ্রীকুঞ্জবিহারী, এল, সি, ই প্রণীত। ৯২টি চিত্র শোভিত ভবানীপুর পার্থিব যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য ১॥০ টাকা, বোর্ডে বাঁধাই। এই গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া আমরা বিশেষ প্রীতিলাভ করিয়াছি। ইহাতে জড়জগত, নক্ষত্রমণ্ডল, চন্দ্র ও সূর্য্যগ্রহণ, জোয়ার ভাঁটার বিবরণ, আলোক, তাড়িত, বায়ু, প্রাণিতত্ত্ব, স্বাস্থ্যবিধান প্রভৃতি সম্বন্ধে সুদক্ষ আলোচনা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। অধ্যাপক গিকি রচিত প্রাকৃতিক ভূগোল, হকসলি রচিত প্রাথমিক বিজ্ঞান প্রভৃতির মত ছাত্রছাত্রীগণের পক্ষে এই গ্রন্থখানি সবিশেষ উপযোগী। শিক্ষাদানের জন্য বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় এমন হৃদয়গ্রাহী গ্রন্থ আমাদিগের চক্ষে বড় একটা পড়ে নাই। এই গ্রন্থখানি টেক্সট্‌বুক কমিটির কর্তৃপক্ষকর্ত্তৃক পাঠ্য পুস্তকস্বরূপ নির্ব্বাচিত হইলে, আমাদিগের ছাত্র-ছাত্রীগণ যে উপকার লাভ করিবে তাহা নিঃসন্দেহ।

কাদম্বরী। পণ্ডিত তারাশঙ্কর তর্করত্ন প্রণীত গ্রন্থ অবলম্বনে শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বি, এ ও শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সংস্কৃত মূলানুযায়ী করিয়া সম্পাদিত। প্রকাশক, শ্রীকালাচাঁদ দালাল, ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা। ১৯০৯। মূল্য দশ আনা। কবিবর রবীন্দ্রনাথ রচিত ভূমিকা এই গ্রন্থের উপাদেয়তা বর্দ্ধন করিয়াছে। বাণভট্টের কাদম্বরী ভাষার ঐশ্বর্য্যে, ভাবের বৈচিত্র্যে ও সৌন্দর্য্যের বিকাশে সংস্কৃত সাহিত্যের একখানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। কবির মর্ম্মকথাটি কতকগুলি সুন্দর মধুর চিত্রের পাশ দিয়া এমন সকরুণভাবে ফুটিয়া উঠে, যে বিপুল অলঙ্কার ও দীর্ঘ বচনবিন্যাসের মধ্যেও তাহা সুন্দর, হৃদয়গ্রাহী। রবীন্দ্রবাবু কবির সৌন্দর্য্য-গ্রাহিতার যে সুনিপুণ বিশ্লেষণ করিয়াছেন, তাহার উপর আর অধিক বলিবার কিছু খুঁজিয়া পাই না। যে ভারত চিরদিনের জন্য আমাদিগের দৃষ্টির অন্তরালে অন্তর্হিত যাহা কেবল ধ্যান ও কল্পনার বিষয়ীভূত, যাহা কেবল কাব্যের অমর আলোকে এখনো অম্লান আছে, সেই বিস্মৃত পুরাতন ভারতের নরনারীগণের হৃদয়ব্যথা প্রেমকাহিনী, বিচিত্র প্রণয়রীতি, যে অবরুদ্ধ গণ্ডীর মধ্যে উহাদিগের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহিত হইত, তাহার মনোজ্ঞ সরস ইঙ্গিত, আমাদিগের হৃদয়কে আজ কি এক অনির্ব্বচনীয় বিস্ময়ানন্দে অভিভূত করিয়া ফেলে। গ্রন্থখানির হৃদয়গ্রাহিতার পরিচয় বোধ হয় স্বল্প পরিসর স্থানে আর অধিক করিয়া বলিতে হইবে না। গ্রন্থের পরিশিষ্টভাগে টীকা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। টীকা সংক্ষিপ্ত হইলেও মনোজ্ঞ। গ্রন্থে সুপ্রসিদ্ধ যামিনীবাবুর অঙ্কিত দুইখানি চিত্রের সমাবেশ ইহার কমনীয়তা বৃদ্ধি করিয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রগণের জন্য এইরূপ গ্রন্থ পাঠ্যতালিকাভুক্ত হইলে কোনপক্ষে ক্ষোভ বা অভিযোগের কারণ থাকে না।

সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব। শ্রীবিশ্বেশ্বর দাস, বি, এ সঙ্কলিত। কলিকাতা, উইলকিন্স প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য ছয় আনা। সংস্কৃত সাহিত্য আমাদের দেশে বিশেষ আদর পাইবার যোগ্য কেন, গ্রন্থকার প্রথমে তাহার দুইটি সাধারণ কারণ নির্দ্দেশে অগ্রসর হইয়াছেন এবং পরে সংস্কৃত কাব্য নাটক, যোগ ও ভক্তিশাস্ত্রাদি হইতে সরল অনুবাদের সহিত বিবিধ শ্লোক সঙ্কলন করিয়াছেন। গ্রন্থখানি সংকলনের উদ্দেশ্য,—ছাত্রমণ্ডলীর হৃদয়ে সংস্কৃত ভাষায় অনুরাগ উদ্রিক্ত করিয়া দেওয়া। উদ্দেশ্য সাধু এবং সিদ্ধ হইবে সন্দেহ নাই। কারণ গ্রন্থখানি সরস হইয়াছে। তবে শেষাংশের ব্যক্তিগত উচ্ছ্বাসটুকু, আমাদিগের মতে বর্জ্জনীয়। এরূপ অর্থহীন উচ্ছ্বাসের বাহুল্যে চিন্তার স্বাধীন গতি প্রতিরুদ্ধ হয় বলিয়াই আমাদিগের বিশ্বাস।

A Discourse on The Study of Sanskrit. By Bisvesvar Das, B. A., Printed at the Wilkins Press. Price three Annas এখানি উল্লিখিত গ্রন্থের ইংরাজী সংস্করণ। লেখকের ভাষাটুকু সরল ও প্রাঞ্জল হইয়াছে।

কলিকাতা, ২০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত ও ৪৪, ওল্ড বালিগঞ্জ রোড হইতে শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।



আরব্যোপন্যাস-কথন

শ্রীযুক্ত সমরেন্দ্রনাথ গুপ্ত কর্ত্তৃক অঙ্কিত চিত্র হইতে

ভারতী।

৩৩শ বর্ষ] মাঘ, ১৩১৬ [১০ম সংখ্যা।

পোষ্যপুত্র। (পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(১৭)

বৈদ্যনাথে গিরিগর্ভস্থ মহাদেব দর্শনান্তে ষষ্ঠ দিবস গয়া ও গয়া হইতে কাশীধাম পৌঁছিয়া শ্যামাকান্ত সেখানে বাঙ্গালীটোলার বাহিরে একমাসের ভাড়ায় দিন পনেরোর জন্ম একটা বাসা লইয়া একবার হাঁপ ফেলিয়া লইলেন।

শান্তি পূর্ব্বে একবার কাশী গিয়াছিল, বৈদ্যনাথ মধুপুর তাহার অচেনা স্থান নয়, কিন্তু শ্যামাকান্তের প্রবীণা আত্মীয়ার দল অত্যন্ত মুগ্ধনেত্রে এ সকল স্থানের শুষ্ক বালুকাময় ধূলিকণাটা পর্য্যন্ত পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন। বিশ্বেশ্বরের আনন্দধাম বিশ্ব-মাতার রন্ধনশালা যোগিবাঞ্ছিত পুণ্যক্ষেত্র; এখানকার পবিত্র বাতাসে সংসার-তাপদাহ জুড়াইয়া যায়। কতদিনের কাশী! এই জনাকীর্ণ রাজপথ কত শত শত বৎসর পূর্ব্বে মহামহর্ষিগণের পবিত্র পদাঙ্ক বক্ষে ধরিয়া গর্ব্ব-স্ফীত হইয়াছিল; এই নগর-গগন সামগানের গম্ভীরতানে স্পন্দনাহীন ভাবে প্রণত হইয়াছিল আর আজিও এই অবনতির শেষ যুগে হিন্দুর হিন্দুত্ব, সাধুর সাধুত্ব, অদ্বৈতবাদের অচল মহিমার মধ্যে এইখানেই প্রতিষ্ঠিত আছে। বিন্ধ্যাচল প্রয়াগ হইয়া টুণ্ডুলা দিয়া আগ্রা জয়পুর এবং তথা হইতে পুষ্কর তীর্থ ও সাবিত্রী পাহাড়ে দেবী দর্শন করিয়া শ্যামাকান্ত উজ্জয়িনী গমন করিলেন। উদয়পুর চিতোর গড় দেখিয়া আরাবলি পর্ব্বতপ্রাচীর বেষ্টিত গিরিপথে কত শত ইতিহাস প্রসিদ্ধ প্রাচীন কাহিনীর করুণ ও গৌরবস্মৃতি হৃদয়ে লইয়া শ্বশুর ও বধূ ফিরিয়া আজমীরে আসিলেন। আজমীরও এক বহু পুরাতন ইতিহাস-প্রসিদ্ধ সুসমৃদ্ধ নগর। ইহার প্রাকৃতিক দৃশ্যও অত্যন্ত রমণীয়। আরাবলির সমুন্নত ধূসরবর্ণ শৈলশ্রেণী ইহাকে চারিদিক দিয়া অটল প্রাচীরের মত বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছে। মেঘের কোল হইতে সহরের জনাকীর্ণ রাজপথ পর্য্যন্ত সেই প্রাকৃতিক প্রাচীর বিস্তৃত। একদিকে গিরিপ্রবাহিত সলিলরচিত সুদৃশ্য হ্রদ আনারকাগর! তাহার তিন পার্শ্বে শৈলপ্রাকার; সম্মুখতীরে মর্ম্মরনির্ম্মিত নরহস্তরচিত প্রশস্ত দালান, মর্ম্মর রেইলবেষ্টিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রীষ্মাবাস এবং রত্নরক্ষিত আধুনিক ফ্যাসানে প্রস্তুত রাজকীয় উদ্যান। এই প্রস্তর প্রাসাদাবলী পূর্ব্বে মহানুভব সম্রাট আকবরসাহ এবং সাজাহানের কাছারীবাড়ী ছিল, এখন ইহা চিফ কমিশনরের আবাস। সে উদ্যান বাটিকার আর সে মহিমা, সে গরিমা কিছুই নাই, এখন ইহা সাধারণ ইংরাজ স্ত্রী পুরুষের ক্রীড়াকানন, দর্শকবৃন্দের কৌতূহলবৃত্তি

চরিতার্থ করিবার স্থল। আজমীরে সাধারণত দ্রষ্টব্যস্থল অনেকগুলি। আজমীর রাজবংশীয় কীর্ত্তি অধুনা যাহা আড়াইয়া ঝোবরা নাম প্রাপ্ত তাহার সূক্ষ্মশিল্প ও নির্ম্মাণকৌশল অপূর্ব্ব। ইহার অসমাপ্ত অবস্থাতেই হিন্দু সৌভাগ্যসূর্য্য অস্তমিত হইয়া গিয়াছিল। মুসলমান অধিকারের পরে ইহা পুনঃসংস্কৃত ও সমাপ্ত হয়, এবং ইদানীং ইহার শোচনীয় ধ্বংসের উপরে আমাদের রাজপুরুষগণের করুণ দৃষ্টি নিপতিত হইয়াছে।

তারাগড় দুর্গে এখন বিদেশী বিজেতার বিজয় বৈজয়ন্তি উড়িতেছে। ধূসরগিরি মালার উচ্চতর গিরিচূড়া প্রাচীন ভারত ইতিহাসের একটি গৌরব চিহ্ন। সেই উন্নত দুর্গ শিরে সমগ্র রাজপুত জাতির বিগত পুণ্যগৌরবময় রক্ত পতাকা তাঁহাদের বীরহৃদয়ে এক বিভীষিকাময় বেদনাস্মৃতি জাগাইয়া রাখিয়াছে। তারাগড়ের ঠিক নীচেই পর্ব্বতের গাত্র হইতে আরম্ভ করিয়া সমতলভূমি পর্য্যন্ত বিস্তৃত মুসলমানের পুণ্যতীর্থ আজমীর সরিফ। ইহা ধর্ম্মের সহিত ঐশ্বর্য্যের মিলনে পবিত্রতায় ও সৌন্দর্য্যে ভারতের একটি শ্রেষ্ঠ দর্শনীয় স্থান। ভক্তের ভক্তি আরাধনার নিমিত্ত আন্তরিক প্রয়াস ইহাতে ব্যক্ত হইতেছে। অতি পুরাতনকাল হইতে বর্ত্তমান-কাল পর্য্যন্ত সমস্ত সম্রাট, নবাব, সেনাপতি, ও ওমরাহগণের কিছু না কিছু কীর্ত্তি চিহ্ন ইহার মধ্যে আছেই। বাবর, হুমায়ুন, আকবরসাহ, জাহাঙ্গীর, আরঙ্গজেব, হইতে হায়দার পর্য্যন্ত মহা মহা স্বনামখ্যাত ব্যক্তির এক, একটি গেট, মসজিদ, বা কোন কিছু দান এখনও তাঁহাদের নামকে এখানে সজীব রাখিয়াছে। ইহাদের মধ্যে দিল্লীশ্বরের মসজিদ ভক্তোজনোচিত পবিত্র, এবং সৌখিন সম্রাট সাহজাহানের মর্ম্মরপ্রাসাদ তাঁহারি রুচির অনুরূপ। প্রবেশদ্বারের উপর নহবৎখানায় চিতোরলুণ্ঠিত বিগত গৌরবচিহ্ন প্রকাণ্ড জয়ঢাক, এখনও তেমনি মেঘমন্দ্র স্বরে প্রহরে, প্রহরে বাজিয়া উঠে। কিন্তু সে শব্দ রাজপুত হিন্দুর হৃদয়ে আর তেমন অশনি নির্ঘোষ বলিয়া বাজে কি? সে হিন্দু আর নাই সে বিজেতা মুসলমানও আর নাই।

ইহা ভিন্ন রাজকুমার কলেজ, প্রভৃতি আধুনিক কালেরও কিছু কিছু দ্রষ্টব্য স্থান আছে। বনপর্ব্বতমালাপরিবেষ্টিত নির্জ্জনকানন মধ্যবর্ত্তিনী সাবিত্রী পর্ব্বতের উচ্চচূড় মন্দিরাভ্যন্তরে শ্বেত প্রস্তরময়ী অপূর্ব্ব শিল্পকলার আদর্শমূর্ত্তি সাবিত্রী ও স্বরস্বতী অধিষ্ঠিতা। উচ্চে দাঁড়াইয়া চারিদিকে চাহিয়া দেখিলে মন এক অননুভূতপূর্ব্ব শান্তিরসে পরিপ্লুত হইয়া যায়। বিশ্বশিল্পির অনন্ত শিল্পচাতুর্য্যের মধ্যে ইহাও এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য। নীলাকাশের নীচে যতদূর চাহিয়া দেখো ধূসর শৈলমালা এবং উচ্চ নীচ শ্যাম বৃক্ষশ্রেণীর মধ্যে ক্ষুদ্র বৃহৎ গিরিতরঙ্গিণী সকল এবং একপার্শ্বে মারোয়ার-মরুবালুর অস্পষ্ট শুভ্ররেখা।

শ্যামাকান্ত পর্ব্বতারোহণে অক্ষম এবং সাবিত্রীদেবীকে সিন্দূরদান স্ত্রীলোকের কার্য্য সেই জন্য শ্যামাকান্ত সাবিত্রী না গিয়া পুস্করেই যথাকৃত্য সম্পন্ন করিয়া হ্রদতীরে নির্দ্দিষ্ট বাসাটিতেই মাধ্যাহ্নিক বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। শান্তি যখন ফিরিয়া আসিল তখন পাণ্ডার পাওনা গণ্ডা লইয়া তাহার সহিত

সরকার মহাশয়ের একটুখানি বিবাদের সূত্রপাত হইয়াছে। সেই গোলমালে জমীদার মহাশয় ঘুম ভাঙ্গিয়া উঠিয়া বধূর আগমন বিলম্বে উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিয়াছেন,—এই সময় শান্তি ঘরে ঢুকিয়াই সাগ্রহে বলিয়া উঠিল "কি চমৎকার মূর্ত্তি দুটি জ্যেঠামশাই! আমার ইচ্ছা করছে আমাদের লক্ষ্মীপুরে অমনি মূর্ত্তি দুটি থাকে! আহা আপনি যদি দেখতেন!

শ্যামাকান্ত বধূর পরিশ্রমে ঈষৎ ম্লান ও ও ভক্তি আনন্দে সমুজ্জ্বল মুখখানির দিকে সস্নেহে দৃষ্টি করিয়া ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন "কেন মা! এই যে তাঁরি ছায়া আমার ভক্তিমতী জননীর মধ্যে আমি দেখতে পাচ্ছি! মায়ের অন্নপূর্ণা মূর্ত্তি মায়ের করালিনী মূর্ত্তি ভিন্ন রাজরাজেশ্বরী কমলা প্রভৃতি সকল মূর্ত্তিই তো আমি আমার ক্ষুদ্র মায়েতে অনুভব করি। খুব ভাল লাগলো মা?"

শান্তি এ অযোগ্য প্রশংসাবাদে লজ্জাকুণ্ঠিত ভাবে চোখ নীচু করিয়া উত্তর করিল "খুব ভাল লাগলো।"

উজ্জয়িনী হইতে ফিরিবার মুখে আজমীরে যেদিন বিশ্রাম লওয়া হইল সেইদিন রাত্রে শ্যামাকান্ত একটু জ্বরানুভব করিলেন। শান্তি তাঁহাকে হোমিওপ্যাথি ওষুধ খাওয়াইয়া অনেকরাত্রি পর্য্যন্ত পাখা করিয়া ঘুম পাড়াইল কিন্তু মনে মনে সে বড় উদ্বিগ্ন হইয়া রহিল। যদি জ্যাঠা মহাশয়ের অসুখ বাড়ে! এ বিদেশ বিভূঁয়ে নারীবাহিনী লইয়া কি বিপদ! সেদিন স্বামীর উপর তাহার ভারি রাগ হইল। তিনি যদি নিতান্ত স্বার্থপরের মতন নিজের কথাই শুধু না ভাবিয়া একটু জ্যেঠামহাশয়ের কথা ভাবিতেন!

কিন্তু পরদিন প্রভাতে শ্যামাকান্ত সুস্থ হইয়াই জাগিলেন। সে যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। কোলের ছেলেটিকে সুস্থ হইতে দেখিলে মা যেমন নিরুদ্বেগ হয় সেও সারারাত্রির পর তেমনি শান্তি অনুভব করিল। শান্তির সাগ্রহ প্রশ্নের উত্তরে শ্যামাকান্ত বলিলেন "যার এমন স্নেহময়ি মা সঙ্গে রয়েছেন সে কি বেশিক্ষণ অসুস্থ থাকতে পারে? চলো মা আমরা আজই বেরিয়ে পড়ি।" তাঁহারা কুরুক্ষেত্র, জ্বালামুখী, ও হরিদ্বার ঘুরিয়া মথুরা বৃন্দাবন দর্শনে গমন করিলেন।

কুরুক্ষেত্রের সুবিস্তৃত ময়দান ও ধান্যক্ষেত্র সকল এখনও সেই সব পুরাতন যুগান্তব্যাপী মহাস্মৃতি বক্ষে ধরিয়া পড়িয়া আছে! উদাস আকাশে মহাগাম্ভীর্য্যময় অব্যক্ত সুর এখনও সেই মহাভারতের মহাযজ্ঞের কাহিনী ব্যক্ত করিতেছে! এদেশের মৃত্তিকা এখনও সেই স্রোতোবাহিত শোণিতে রঞ্জিত; বাতাস-শোক গাথায় ম্রিয়মান! অশ্রুপ্লুতনেত্রে সুদূরে চাহিয়া বালিকা এক অজ্ঞাত ব্যথায় স্তম্ভিত হইয়া রহিল। হরিদ্বারে হিমরাজের ভীমকান্ত শোভাও ধবলতরঙ্গার অনির্ব্বচনীয় শোভা দেখিয়া সবচেয়ে শান্তি বিস্ময় জড়িত আনন্দানুভব করিল। বিবিধ বর্ণের প্রস্তর সকল শৈলজা-জাহ্নবীর অমল সলিলের ভিতর হইতে বিচিত্র ভাবে প্রকাশ পাইতেছে। বিল্বকেশ্বর ও নীল পর্ব্বত গগনে মস্তক উত্তোলন পূর্ব্বক জননীর 'ইন্দ্রমুকুট মণি রঞ্জিত চরণের প্রতি চাহিয়া মহাধ্যানে মগ্ন হইয়া গিয়াছে। জলমধ্যে মৎসগণের নির্ভীক আনন্দ ক্রীড়া চক্ষু ভরিয়া দেখিবার সামগ্রী। তীরে ক্ষুদ্র জনপদ বাজার দোকান লইয়া

পর্ব্বত গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ, সংযত। শান্তি মৎসদের আহার দিয়া বানরকুলের হাতে বড়ই নাকাল হইল।

তার পর দৃশ্যপট পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। মথুরায় দুই সপ্তাহ কাটাইয়া তাঁহারা বৃন্দাবন যাত্রা করিলেন,যাইবার পূর্ব্বদিনে শান্তি বিশ্রান্ত ঘাটে ও সতীঘাটে আরতি দর্শন করিয়া আসিল। সতীস্তম্ভ দেখিতে দেখিতে তাহার মন একটা অপূর্ব্ব শ্রদ্ধার ভারে নত হইয়া পড়িল। সেই অতুল্য আত্মত্যাগী প্রেম ও সতীত্বের পুণ্যপ্রভাব অনুভবে সে আনন্দে নিস্পন্দ হইয়া চাহিল। এ কীর্ত্তি আর কাহারো নহে, শুধু ভারতরমণীর! সাগ্রহে নিজের অন্তর মধ্যে চাহিয়া দেখিল! দেখিয়া নিজেই ঈষৎ বিস্ময় ও বেদনা অনুভব করিল। কই পুরাকালীন আত্মদানকারিণী পুণ্যবতী সতীর ন্যায় কি সে তাহার স্বামীকে ভাল বাসে? কিছুই সে ভাবিয়া স্থির করিয়া উঠিতে পারিল না, বাসে-বুঝি? কিন্তু কই যদি তাহাই হইত তবে এতোদিন কেমন করিয়া সে স্বামীকে ছাড়িয়া নূতনত্বের আনন্দে বিভোর হইয়া আছে! মণিদিদি হইলে পারিত না, সেজবউ, মেজ ঠাকুরঝি নির্ম্মলা, মালতি, কেহই পারে না। কই যেমন শুনা যায় দেবতার চেয়েও স্বামীকে ভক্তি করা উচিত সেকি তাই করে? না ততদুর কৈ? তবে কি সে স্বামীকে ভালবাসে না? শান্তি সারাপথ গাড়ির মধ্যে চুপ করিয়া বসিয়া ভাবিল, হাঁ বাসে বই কি! তাঁহার একটু মাথা ধরিলেও তো সে বেদনা বোধ করে! তবে? বাড়ি ফিরিয়া কাজ কর্ম্ম সারিয়া শ্বশুরকে ঘুমপাড়াইয়া আহারান্তে নিজের ঘরে প্রবেশ করিয়া নদীর দিকের জানালা খুলিয়া জোৎস্নার আলোকে বসিয়া একটা নূতন কথা যেন তাহার বেদনার মধ্যে ব্যক্ত হইয়া পড়িতে চাহিল। তাহা বুঝি আর চাপা দেওয়া চলে না! বুঝি হেমেন্দ্রই তাহাকে ভালবাসে না! বংশমর্য্যাদায় হেমেন্দ্র যে শান্তির পিতা অপেক্ষা অনেক বড়,—ধনে মানে তিনি যে তাহাপেক্ষা অনেক নীচু এসব কথা সর্ব্বদাই তাহাকে স্মরণ করাইতে হেমেন্দ্র ভুল করিত না। কই একটি দিনও তো শান্তির একটা কাজকেও তিনি সহানুভূতির চক্ষে দেখেন নাই! তাহার সকল কার্য্যেই একটু শ্লেষপূর্ণ বিদ্রূপের সহিত কখনও অল্প কখন তীব্র সমালোচনা করা ছাড়া আর কি বলিয়াছেন? বিদুষী, পণ্ডিত মশাই, এজিটেটার প্রভৃতি শব্দগুলাই ত তাঁহার সাদর সম্ভাষণ! সনিশ্বাসে শান্তি ভাবিল "কেমন করিয়া আমি তাঁহার মনের মতন হইব? আজীবনের সমুদয় সংস্কার শিক্ষা না ভুলিতে পারিলে বুঝি ভাগ্যে সে সুখ নাই? কিন্তু তাই কি? কেন পারিব না? চেষ্টা করিলে, প্রাণের সহিত যত্ন করিলে পারিব বইকি। সত্য কি তিনি নিষ্ঠুর! জগতে সকলেই ত দেবতা নয়; মানুষ কিন্তু অনেকেই; তিনিও তাহার মধ্যে একজন। তাঁহার মন বুঝিয়া আমায় চলিতে হইবে।"

দেবতার কথায় আর একজনের কথা মনে পড়িল, তাঁহাকে সে দেবতা বলিয়াই মনে করে। সে শুনিয়াছে মিঃ রায় এখন তাঁহার কর্ম্মকেন্দ্র কতখানি উন্নত করিয়া তুলিয়াছেন। তিনি তাঁহার সম্পূর্ণ হৃদয় সেবাব্রতে নিয়োজিত করিয়া যথাশক্তি স্বদেশ

হিতব্রত অন্তরের সহিত পালন করিতেছেন। শান্তি যাহা ভয় করিয়াছিল তাহা ফলে নাই, সে অংশত তাঁহার এই উন্নতির মূল ইহা বুঝিয়া তাহার গোপন বেদনা অনেকাংশে প্রশমিত হইয়া গিয়াছে। সে শুনিয়াছে তিনি বিশেষ যত্ন ও চেষ্টায় একটি অনাথ আশ্রম ও সংস্কৃত বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। নিজের ব্যবসায়ের সমুদয় আয় তাহারি জন্য ব্যয় করেন। নিজেও কঠোর ব্রহ্মচর্য্যে সংসারের সমুদয় ভোগসুখ ডুবাইয়া দিয়া অক্লান্ত যত্নে অধ্যাপনা করেন। যোগেন্দ্র বলে, তাঁহার গুরুদেব একজন অসাধারণ ব্যক্তি। মুগ্ধা শান্তি তাঁহার উদ্দেশ্যে বার বার করিয়া প্রণাম করিল। তার পর সে সাশ্রু-নেত্রে ভক্তি গদগদ কণ্ঠে কহিল "তোমায় শ্রদ্ধা করিতাম ভক্তি করিতাম এখন পূজা করি; তুমি এতো মহৎ! এতো উচ্চ!"

পরদিন যাইবার গোলমালের মধ্যেও শান্তির মনটা কেমন যেন পূর্ব্বরাত্রের গোল-যোগে বিমর্ষ বিমর্ষ হইয়া রহিল। শ্যামাকান্ত সেটুকুও লক্ষ্য করিয়াছিলেন, জিজ্ঞাসা করি-লেন "শরীরটা কি ভাল নাই মা?" শান্তি চোখ তুলিয়া বিষণ্ণ ভাবে হাসিল; মৃদুস্বরে উত্তর করিল "আমিতো ভালই আছি জ্যেঠামশাই।"

বৃদ্ধ চিন্তিত মুখে ভাবিতে ভাবিতে প্রশ্ন করিলেন "রজনীর চিঠিতো কাল এসেছে! সুপ্রকাশও তো লিখেছে মা?" শান্তি ধীরে ধীরে উত্তর দিল "হাঁ জ্যেঠামশাই তাঁরা সবাই ভাল আছেন।" শ্যামাকান্ত ঈষৎ ব্যথিত নিশ্বাস ফেলিলেন "মা হেমতো আর আমাদের চিঠিপত্র লেখে না!" সে কথায় শান্তির বুকের মধ্যে খানিকটা রক্ত আসিয়া হৃদ্‌পিণ্ডের উপরে ছলাৎ করিয়া পড়িল। একটু খানি মুখ নীচু করিয়া সে অঞ্চলের সূত্র টানিতে লাগিল তাহার গালদুটো ও কপালটা একটুখানি যে লাল হইয়া উঠিয়াছিল—পাছে জ্যেঠামশাই তাহা ধরিয়া ফেলেন, তাই ভাবিয়া সে সেই রক্তিমাকে আরো বর্দ্ধিত করিয়া তুলিল।

শ্যামাকান্ত তাঁহার বড় আদরের বধূর প্রতি হেমেন্দ্রের এমন উদাসীন, অনাগ্রহ ব্যবহারে মনে মনে বড়ই ব্যথানুভব করিতেন। হেম যে তাঁহার সহিতও বেশ সদ্ব্যবহার করিত তা নয়; কিন্তু নিজের প্রতি অসম্মান সহ্য করা যায় কিন্তু শান্তির অপমান অসহ্য! তবুও মুখ বুজিয়া সব সহ্য করিতে হইত। কারণ সে শান্তির স্বামী,—সে যদি তাহারই শাসন না মানে তবে কেমন করিয়া তিনি তাহাকে সংশোধন করিবেন! বিশেষ এখন আর সে মনের বলও নাই সে চেষ্টা বা উদ্যম কিছুই নাই। সে সবি সেই একজন সঙ্গে লইয়া চলিয়া গিয়াছে। এমনি করিয়া তিনি তাহার সকল অন্যায় সকল আব্দার সহিয়া তাহার অন্যায়ের মাত্রা বর্দ্ধিত করিয়া তুলিতেছিলেন। ইহা যে শান্তির পক্ষেই অধিক ক্ষতিজনক হইতেছে ইহা জানিয়া বুঝিয়াও দৌর্ব্বল্যের বশে পড়িয়া কিছুমাত্র প্রতিকারের চেষ্টা করিতেও পারিতেন না। সত্য কথা বলিতে গেলে বলিতে হয় শ্যামাকান্তের প্রয়োজন ছিল শান্তিকে; হেমেন্দ্র তাঁহার তেমন বেশি লোভ-নীয় নহে। কিন্তু এখন আর তাহা বলা চলে না; সে যে শান্তির স্বামী, শান্তির চিরজীবনের সুখ দুঃখ যে একান্ত ভাবে তাহারি উপর নির্ভর

করিতেছে একথা তো অগ্রাহ্য করিবার নয়। তাই যখন মনে হয় লোভপরবশ হইয়া শান্তিকে তিনি অযোগ্য হস্তে প্রদান করিয়াছেন, তখনি আত্মগ্লানিতে হৃদয় ভরিয়া উঠে। কেমন করিয়া হেমেন্দ্রকে শুধরাইয়া তুলিবেন কি করিলে শান্তির সুখ অবিচ্ছিন্ন হইতে পারে এই কঠিন সমস্যা যতই জটিল হইয়া উঠে, ব্যাকুলতা ততোই যেন বাড়িতে থাকে। এই সময় নিজের ছেলের প্রতি অত্যন্ত ক্রোধ জন্মে। সে যদি ফিরিয়া আসিত! সেই তো তাঁহাদের সব দুঃখের মুল! সেইদিনই দেওয়ানকে পত্র লিখিলেন—

"হেমকে বলিও সে যেন দুই একদিন অন্তর পত্র লিখে। তাহার হস্তলিখিত পত্র না পাইলে আমাদের তৃপ্তি হয় না। সে যেন ইহার অন্যথা না করে। সে এখন কোথায় আছে তাহা জানিনা বলিয়া তাহাকে পত্র লিখিলাম না; তুমি এ পত্র তাহাকে দেখাইও।"

কয়দিন পরে উত্তর আসিল "ছোটবাবু কলিকাতা হইতে আসিলে তাঁহাকে আপনার পত্র দিলাম। তিনি পাঠ করিয়া বলিলেন তাঁহার আজকাল সেরূপ অবসর নাই, সেজন্য আপনাদের ব্যস্ত হইবার প্রয়োজন কি? সংবাদ তো পাইতেছেন। নারায়ণগঞ্জের বাগানে সাহেব ভোজের জন্য আমরা সকলেই অত্যন্ত ব্যস্ত আছি, বোধহয় ইহাতে পাঁচহাজার টাকা খরচ পড়িবে। রাজরাজেশ্বরী দেবী-প্রতিমা গঠন প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, বোধহয় ভাদ্র পূর্ণিমার সময়ে দেবী প্রতিষ্ঠা করান হইয়া উঠিবে। মন্দিরেরও আর অধিক বিলম্ব নাই। কিন্তু অতিথিশালা বাড়ান এবং ডাক্তারখানা ও কবিরাজি চিকিৎসালয় শেষ হইতে কিছু বিলম্ব হইতে পারে। যাহা হউক সমস্তই ভাদ্র পূর্ণিমায় একপ্রকার দাঁড়াইয়া যাইবে। সেই সময় মাতাঠাকুরাণীকে লইয়া আপনি আসিলেই সমস্ত প্রস্তুত দেখিবেন এবং নিঃসন্দেহ সন্তুষ্ট হইতে পারিবেন। ছোটবাবু স্বয়ং ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট গিয়া পঞ্চাশ হাজার টাকার সহি দিয়া আসিয়াছেন শুনিলাম। সাহেবের প্রশ্নে বলিয়াছেন 'আপনার ইচ্ছাতেই তিনি ইহা দিতে স্বীকার করিতেছেন। শুনা যায় সাহেব আপনার জন্য 'রাজা' খেতাবের চেষ্টা করিবেন।'

শ্যামাকান্ত এ পত্র শান্তিকে দেখাইতে পারিলেন না। সরোষে পত্রখানি ছিঁড়িয়া ফেলিয়া বক্তব্যকথাটা এক সময়ে বধূকে বলিলেন। শান্তি খুসী হইয়া বলিয়া উঠিল "আমার ঠাকুর কি তেমনি সুন্দর হবেন! আমি কিন্তু কাশী থেকে জরি চুমকি এনেছি তারি কাজ দিয়ে বেনারসী সাড়ি তৈরি করে পরাবো। আর অনেকগুলি গহনা করাতে হবে, না জ্যেঠামশাই! না হলে মানাবে কেন? ঠাকুরের মাপ নিয়ে কাকা যেন চুড়ি বাউটি আর সোনার মল গড়িয়ে রাখেন। বাকি আমি নিজে পছন্দ করে গড়াবো। খুব ভাল করে সাজাতে হবে জ্যেঠামশাই! না হলে রাজরাজেশ্বরী মূর্ত্তি মানাবে কেন? আমাদের মা তো সত্যি কাঙ্গালিনী নহেন। বাবা বলেন, তিনি সর্ব্বৈশ্বর্য্যময়ী জগদ্ধাত্রী; তাঁর তেমনি মূর্ত্তি হওয়া চাই।"

মুগ্ধ শ্যামাকান্ত কহিলেন "তুই যা করবি তার কি কিছু খুঁৎ থাকতে পারে মা! এতোদিন যক্ষের ধন কেবল সঞ্চয়ই করেছি। তার যে এমন সদ্ব্যয় হবে, তা

স্বপ্নেও ভাবিনি। তোমার আতুরালয় ও অতিথিশালার বন্দোবস্তও নূতন করাচ্ছি। এবার দুজন ভাল ডাক্তার ও একজন কবিরাজের জন্য রজনীকে লিখবো।"

আনন্দে বালিকার উজ্জ্বল চক্ষু বিস্ফারিত হইয়া উঠিল "এবার অনেক লোক থাকতে পাবে তো? সে বেশ হবে। ওটার নাম কি থাকবে জ্যেঠামশাই! ওর নাম থাক না কেন "রাজরাজেশ্বরীর ভাণ্ডার।"

১৮

বৃন্দাবনে যমুনাতীরে তেমন সুবিধা মতন ভাল বাড়ি পাওয়া গেলনা সেই জন্য একটু দূরে রাস্তার উপরেই এক প্রকাণ্ড পাথরের বাড়ির একটা অংশ ভাড়া লওয়া হইয়াছে। সেদিন বাদলে ঘাটে বেশি লোকজন নাই। একটু বেলা করিয়া সকলকার কাছে সানুনয়ে সম্মতি সংগ্রহ করিয়া শান্তি যখন প্রাচীনা, অর্দ্ধ প্রাচীনা, এবং অল্প সংখ্যক যুবতী বালিকাদলের সহিত যমুনায় স্নান করিতে আসিল তখন বৃষ্টি থামিয়া গিয়াছে। ঘাটে জনতা করিয়া ব্রজবাসী স্ত্রীপুরুষ স্নান করিতেছিল এবং পৃথক এক পাশে একটি বাঙ্গালির মেয়ে কাপড় কাচিতেছিল। শান্তি তাহাকে দেখিয়া সানন্দে তাহার মাসতুত ধাকে বলিল 'সেজদি দেখো মেয়েটি কেমন সুন্দর?" সেজদিদি যুবতীর দিকে অপাঙ্গে চাহিয়া তাচ্ছিল্য ভাবে উত্তর করিলেন "সুন্দর তো কতো! নাও স্নান করে নাও, পৃথিবীর লোকের সঙ্গে আমাদের খোঁজ কি?

কাপড় কাচিয়া একটা ডুব দিয়া উঠিয়া যুবতি সিঁড়ির উপর হইতে পিত্তলের কলসী তুলিতে গিয়া দেখিল, এক যোড়া উজ্জল কালোচোখ সিঁড়ির উপর হইতে বিস্ময়ের সহিত তাহাকে লক্ষ্য করিতেছে।

শান্তির একেই মিশুনে স্বভাব। তাহার উপর এই খোট্টার মুলুকে 'অল্পবয়স্কা সুন্দরী বাঙ্গালিনী দেখিয়া সে মনে মনে ভারি লুব্ধ হইয়া উঠিল। লোভ সম্বরণে অক্ষম হইয়া ধীরে ধীরে তাহার কাছে আসিয়া একটুখানি মাত্র ইতস্তত করিয়াই মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল "তোমার বাড়ি কোথা ভাই! "যুবতী ঈষৎ বিস্মিত ভাবে শান্তির আপাদ মস্তক পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিতে দেখিতে উত্তর করিল "আমাদের এই ঘাটের উপরেই বাড়ি। আপনারা কোথা থেকে এসেছেন?" শান্তি মাথায় নদীরজল একটু ছিটাইয়া দিয়া আলতাপরা পাদুটি জলে ডুবাইতে ডুবাইতে কহিল "আমাদের বাড়ি লক্ষ্মীপুরে। আচ্ছাভাই এখানে তোমরাও তো তীর্থ করতে এসেছ?"

"না, এইখানেই আমাদের বাড়ি।"

"বাপের বাড়ি না শ্বশুর বাড়ি?"

"বাপের বাড়ি!"

"আচ্ছা তোমার শ্বশুর বাড়ি কোথায় ভাই?"

এ প্রশ্নের উত্তরে রমণী ধীরে ধীরে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া অনুচ্চ স্বরে উত্তর দিল 'জানি না।' বলিয়াই ঈষৎ মুখ ফিরাইয়া মাথা মুছিতে লাগিল। উত্তর শুনিয়া শান্তি আশ্চর্য্য হইয়া গেলেও সে বিষয়ে তখন সে কৌতূহল দমন করিয়া রাখিল। কিন্তু অর্দ্ধঘণ্টার মধ্যেই সে জানিয়া লইল যে তাহার নব পরিচিতার নাম

শিবানী, তাহার একটি শিশুসন্তান ও মা ভিন্ন আর কেহ নাই।

শুনিয়া শান্তির বড় কষ্ট বোধ হইল। শান্তির সঙ্গিনীরা তাহাকে 'গুঁড়ি গুঁড়ি' 'বৃষ্টিতেও দাঁড়াইয়া যাহার তাহার সহিত বহুক্ষণ গল্প করিতে দেখিয়া মৃদু মৃদু অনুযোগ করিতে লাগিলেন। মাসিমা বলিলেন, একি মা তোমার লীলাখেলা! নিজের সোনার শরীরে একটুও কি মায়া নেই গা!

কাকিমা কহিলেন'পাগলীর বেটির আমার সকল তাতেই পাগলামী। এখন কি তোমার মাঠে ঘাটে দাঁড়িয়ে থাকা উচিত বাছা! নাও চান করে ঘরে চলো অসুখ বিসুখ হয় তো আমরা মাথা চাপড়ে মরবো তখন। "ঠানদি কহিলেন" নাত বৌ তোর ভাই সকলি বাড়াবাড়ি। যদি ব্যারাম হয় শ্যামাকান্ত আমাদেরই বকবেন, ওঠ।" অপরা আর একটু মাত্রা চড়াইলেন; আঁচল দিয়া বধূর অঙ্গের বৃষ্টির জলকণা মুছাইয়া কহিলেন "আহা মা যেন আমার এ পিরথিবির নন! অনাথ আতুর দেখলে, মায়ের আমার কচি প্রাণটি গলে পড়ে। তা যেও গো বাছা! একদিন আমাদের বাসায় যেও। মায়ের আমাদের দয়ার শরীর।" শান্তি লজ্জায় যেন মাটি হইয়া গেল। শিবানীর স্থির চক্ষে ঈষৎ কৌতুকের হাসি অত্যন্ত সন্তর্পণে ফুটিয়া উঠিল। সে কলসীটা লইয়া আবার জলে নামিয়া গামছা কাচিতে লাগিল। কাছে আসিয়া সলজ্জে চুপি চুপি শান্তি তাহাকে বলিল "ওঁদের কথায় তুমি কিছু মনে করো না ভাই, মাপ করো।" শিবানীর দৃঢ়বদ্ধ ওষ্ঠে একটুখানি অবজ্ঞার হাসি ফুটিতে ফুটিতে আবার মিলাইয়া গেল, সে তেমনি প্রশান্তভাবে উত্তর করিল 'কিছু না।" "তারপর ভিজা গামছা কাঁধে ফেলিয়া মাজা কলসীতে জল ভরিতে লাগিল। সঙ্কুচিতভাবে শান্তি কহিল "আচ্ছা ভাই কাল আবার আমি এই সময় স্নান করতে আসবো তুমিও তখন এসোনা? তোমাদের বাড়িতো খুবই কাছে।" শিবানীর পক্ষে এ নিমন্ত্রণে আগ্রহ বা অনাগ্রহ কিছুই ছিল না। সে শান্তির গহনা বস্ত্র ও সঙ্গের লোকজন দেখিয়া তাহাকে 'বড়লোকের বধূ' বলিয়া বুঝিয়াছিল। গরীব শিবানীর প্রতি তাহার এই সহৃদয় ব্যবহার, যাহা দেখিয়া পাঁচজনের দয়া বলিয়া মনে হয়, তাহা পাইবার জন্য শিবাণী কিছুমাত্র উৎসুক ছিলনা। পৃথিবীর মধ্যে এইটিকেই সে সবচেয়ে বেশি ঘৃণা করে। শান্তির আগ্রহে সেইজন্য সে টলিল না। নিজের অক্ষুণ্ণ গর্ব্বের মধ্য হইতে সবল পাষাণ প্রতিমার মতন ঈষৎ মস্তক সঞ্চালন দ্বারা সম্মতি প্রকাশ করিয়া কোনদিকে আর লক্ষ্যমাত্রও না করিয়া পূর্ণকুম্ভকক্ষে ধীরে ধীরে উঠিয়া চলিয়া গেল। পশ্চাতে আর বারেকও ফিরিয়া দেখিল না। তাহার আর্দ্র বস্ত্র হইতে জল ঝরিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। তাহার পদ চিহ্নগুলি সিঁড়ির ধাপের উপর কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত লিখিত হইয়া রহিল। ভিজা কাপড় তাহার ক্ষীণদেহে সংযুক্ত থাকিয়া তাহার ম্লান সৌন্দর্য্য বিকাশ করিয়া তুলিতেছিল। সে সকলি শান্তির চোখে যেন 'নূতন নূতন ঠেকিতেছিল! সে আকৃষ্টভাবে সেইদিকে বহুক্ষণ চাহিয়া রহিল।

সেদিন বাড়ি ফিরিয়া তাড়াতাড়ি পট্টবস্ত্র ছাড়িয়া শ্বশুরকে প্রতিদিনকার মতই

খাওয়াইতে বসিলে, শ্যামাকান্ত সহসা আজ আবার প্রশ্ন করিলেন "হেম কি চিঠি লিখেছে ?" শান্তি নীরবে ঘাড় নাড়িল, তাহার নিজের দুঃখে সে তাঁহাকে দুঃখিত করিতে নিতান্ত অনিচ্ছুক থাকিলেও মিথ্যা কেমন করিয়া বলিবে! শ্যামাকান্ত আর একটি কথাও না বলিয়া, নীরবে আহার করিতে লাগিলেন। আজকাল এই ছোটখাট ব্যাপারটি লইয়া তাঁহার মন অত্যন্ত উত্যক্ত হইয়া উঠিতেছিল। নিজের দিনতো ক্রমেই শেষ হইয়া আসিতেছে, কিন্তু তাঁহার এই জীর্ণ তরীতে যে ক্ষুদ্র আরোহীটিকে তিনি কূলের আশ্রয় জনপদ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া তুলিয়া লইয়াছেন, মাঝনদীতে তাহাকে তিনি কোন আনাড়ি মাঝির হাতে ফেলিয়া যাইবেন! একি করিলেন ? নিজের স্বার্থ খুঁজিতে গিয়া শান্তিকে তিনি কি জন্মদুঃখিনী করিয়া ফেলিলেন নাকি ? হেম একি হইয়া উঠিতেছে! মনের দুঃখে তাঁহার সেদিন আহার্য্য যেন মুখে উঠিতে চাহিতে ছিল না।

শান্তি তাহা বুঝিতে পারিল, সে তাঁহাকে ভুলাইবার চেষ্টায় অন্যকথা পাড়িতে গেল ; "আজ ঘাটে একটি বাঙ্গালীর মেয়ে দেখে এলাম জ্যেঠামশাই, আহা তার একটি ছেলে ভিন্ন আর কেউ নাই। তার বড় কষ্ট না জ্যেঠামশাই ?" শ্যামাকান্ত এ সংবাদে একটু সহানুভূতি দেখান উচিত ভাবিয়া বলিলেন "সত্যি! বড্ড কষ্ট তো।"

"হ্যাঁ, জ্যেঠামশাই! তার বড্ড কষ্ট বই কি! সে সধবা কিনা জানি না, সে কথা কিছু বল্লে না, কিন্তু হাতে দুগাছা লোহা আছে। তাতেই তাকে কতো সুন্দর দেখাচ্চে। তার ধরণও খুব উঁচু। আর তার মুখখানি কি সুন্দর! চোখদুটি ঠিক যেন স্কুকুর মতন।" শ্যামাকান্ত ঈষৎ স্নেহের হাসি হাসিলেন "তাকে কিছু কি দিতে হবে ? সে তোমার সঙ্গে এসেছে বুঝি?" শান্তি অপ্রতিভভাবে বাধা দিল "নানা, সে খুব গরীব নয়। সে কিছু চায় না। আচ্ছা জ্যেঠামশাই! আমি যদি স্নান করতে গিয়ে তার বাড়ি যাই তাহলে কিছু দোষ আছে ? ঠিক ঘাটের উপরেই তাদের বাড়ি। আমার তাকে খুব ভাল লেগেছে।" "কেন মা! তুমি যা ইচ্ছা করো কখনোতো অন্যায় ইচ্ছা করোনা! তাতে দোষ কিসের ? তোমার মাসিমাকে নিয়ে যাও।"

(১৯)

প্রথম প্রথম স্নানের ঘাটে ও তারপর দুপুরবেলা শিবানীর জীর্ণ গৃহেও শান্তি আসিতে আরম্ভ করিল। শিবানী প্রথম প্রথম ইহাতে ভারি অশান্তি অনুভব করিত। কারণ মানুষ বাড়ি আসিলেই ভদ্রতার খাতিরে তাহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে হয় তাহাকে একটু যত্ন আতিথ্য দেখাইতে হয়। কিন্তু শিবানী তাহার নিজের অভেদ্য গাম্ভীর্য্য বর্ম্ম পরিয়া চারিপাশের পৃথিবীটাকে নিজের নিকট হইতে বহুদূরে ঠেলিয়া সরাইয়া দিয়া নিজের অচল ধ্যানাসনে স্তব্ধ হইয়া থাকিতেই ভালবাসে। সেইজন্য শান্তির অতিরিক্ত আদর তাহার পক্ষে প্রথমটা ক্লেশদায়ক হইয়া পড়িয়াছিল। সাধক তাহার সাধনার ব্যাঘাতে যেমন কষ্ট অনুভব করে, সে তেমনিতর একটা অস্বচ্ছন্দ বোধ করিত। কিন্তু সৌন্দর্য্যের কি একটা অপ্রতিহত ক্ষমতা আছে সে সৌন্দর্য্য বাহিরের বা ভিতরের হোক না কেন,

তাহার সংস্পর্শে আসিলেই চুম্বকাকৃষ্ট লৌহের ন্যায় আকৃষ্ট হইতেই হইবে। শান্তির এই উভয় সৌন্দর্য্যই শিবানীর কঠিন লৌহবর্ম্ম ভেদ করিয়া ভিতরে গিয়া প্রবেশ করিল। লোহা কাটিয়া যে অস্ত্র বক্ষে বিঁধে তাহার বড় সামান্য শক্তি নহে। নেহাৎ অনিচ্ছা-সত্ত্বেও গরীব শিবানী রাজবধূ শান্তিকে অত্যন্ত ভালবাসিয়া ফেলিল।

শান্তি অল্পদিনের মধ্যেই তাহাকে চিনিয়া লইয়াছিল। সেই জন্য সে এপর্য্যন্ত একদিনও তাহাকে তাহাদের বাসায় নিমন্ত্রণ করে নাই, তাহাদের সাংসারিক আয় ব্যয় সম্বন্ধে একটিও প্রশ্ন করে নাই সাহায্য করিবার চেষ্টাও করে নাই। আজ যখন তাহারা পরস্পরের অনেকখানি কাছাকাছি আসিয়া পৌঁছিয়াছে তখন শান্তি ছলছুতায় কথাটা পাড়িয়া ফেলিল, সে তাহার শ্বশুরের সহিত পরামর্শ করিয়াছে যে তাহারা একবার শিবানীর নিরুদ্দিষ্ট স্বামীর অনুসন্ধান করিয়া দেখিবে! শান্তি বলিল "আচ্ছা ভাই তাঁর নিজের কোন ফ'টো কি হাতের লেখা কিছুই নাই? শুধুই ওই হীরার আংটি?" সেই ক্ষুদ্র ঘরের জানালার নিকটে বসিয়া দুইজনে কথা কহিতেছিল; অদূরে শিবানীর পুত্র সদ্যোপ্রাপ্ত উপহারের চুপড়িটি লইয়া ব্যাপৃত রহিয়াছে, মধ্যে মধ্যে চুপড়ি হইতে রঙ্গিন কাঠের খেলনা গুলা নামাইতে নামাইতে 'এতা থোয়া, এতা গয়ু, এতা হুম্মান।' ইত্যাদি যথেচ্ছ বিশেষ্যের দ্বারা যাহাকে খুসী বিশেষিত করিতেছিল, নিজের বুদ্ধির উপরে যে তাহার কিছুমাত্র অবিশ্বাস আছে তাহার কিছুমাত্র লক্ষণই দেখা যাইতেছিল না।

কথাটা শুনিয়াই শিবানী প্রথম চমকিয়া উঠিল। তার পর ধীরে ধীরে নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল "আর কেন? যে স্বপ্ন শুধু স্বপ্নই থাকিয়া যাইবে, সে স্বপ্ন আর জাগান কেন? "তুমি আমায় ভালবাসো আমার উপকার করতে চাইছো করো; কিন্তু আমি জানি না ইহা আমার ঠিক উপকার কিম্বা অপকার যদি এ বিশ্বাস আমার ভেঙ্গে যায়, যদি সত্য সত্যই জানতে পারি আমি বিধবা!"

শান্তি বিদায় কালে ক্রীড়ারত অমূল্যকে কোলে তুলিয়া চুম্বন করিতে করিতে বলিল 'কই' সে আংটিটা দিলে না? শিবানী কাঠের সিন্দুকটি খুলিয়া একখানি কাগজে মোড়া ফ'টোগ্রাফ ও আংটিটি বাহির করিয়া দিয়া বলিল "এই দুটি তাঁর মার জিনিষ আমায় রাখতে দিয়েছিলেন, তাঁর আর কোন চিহ্নই আমার কাছে নাই।" শান্তি অমূল্যকে কোলে লইয়া আদর করিতে করিতে দ্বারের দিকে অগ্রসর হইল শিবানীও তাহার অনুসরণ করিল, গাড়িতে উঠিতে উঠিতে মুখ ফিরাইয়া শান্তি শিবানীর দিকে চাহিল, মৃদু হাসিয়া অমূল্যকুমারকে দেখাইয়া বলিল "কেমন তোমার ছেলে নিয়ে যাই?" শিবানী সম্মতি সূচক ঘাড় নাড়িয়া ঈষৎ হাসিল, শান্তি আবার ফিরিয়া আসিয়া ছেলেকে তাহার মায়ের কাছে দিতে দিতে বিনীত ভাবে বলিল; "একদিন আমাদের ওখানে পায়ের ধুলো পড়বে না?" "যাবো বৈকি" বলিয়া শিবানী চুপ করিল। কোথাও যাওয়া তাহার যেন মস্ত দায়। "তবে কালই যেও ভাই। সকালেই আমি তবে গাড়ি পাঠাবো। মাসিমাকেও নিয়ে যেও, তাঁকে আজ বলে যাওয়া হলো না।"

"কালই ? আচ্ছা" বলিয়া শিবানী ছেলেকে কোল হইতে নামাইয়া দিলেন, সে ছুটিয়া তাহার পরিত্যক্ত খেলনা লইতে চলিয়া গেল। শান্তি গাড়িতে উঠিতে গিয়া আবার ফিরিয়া আসিল "একটা কথা, তোমার স্বামীর নামটা তো জানা চাই।" শিবানী উত্তর করিল "কাল লিখে দিলে হবে না ? কেমন করে বলবো!"

সে রাত্রে শ্যামাকান্তের শরীর ও মন তেমন সুস্থ ছিল না বলিয়া তিনি কিছুই আহার করিলেন না। বধূর সঙ্গেও বেশি কথা-বার্ত্তা হইল না কাজে কাজেই সে দিন আংটি ও ছবি বাক্সের মধ্যেই পড়িয়া রহিল।

পর দিন মাতঙ্গিনীকে সঙ্গে লইয়া শিবানী সখীর বাড়ী নিমন্ত্রণ রাখিতে আসিল। শান্তি অমূল্যকে ও নিমন্ত্রিতাদ্বয়কে আদর করিয়া গ্রহণ করিল। শ্যামাকান্ত আহার করিতে বসিলে শান্তি অমূল্যকুমারকে কোলে করিয়া সেঘরে প্রবেশ করিল, এমন চাঁদের মতন ছেলেটি জ্যেঠামশাইকে না দেখাইয়া তাহার আরাম হইতে ছিল না। শ্যামাকান্ত তাহার চুড়ির শব্দে চাহিয়া দেখিলেন, ছেলেটিকে দেখিয়া বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "এছেলেটি কাদের মা ?"

শান্তি শিশুকে কোল হইতে নামাইয়া পাখা হাতে লইয়া শ্বশুরের কাছে বসিল। অমূল্য সবিস্ময়ে তাহার বড় বড় চোক দুইটা বিস্ফারিত করিয়া শান্তির গায়ে হেলান দিয়া বৃদ্ধকে দেখিতে লাগিল। শান্তি পরিচয় দিল "সেই যে মেয়েটির নাম শিবানী যার কথা আপনাকে বলেছিলেম ছেলেটি তারি। বেশ সুন্দর নয় ?"

শ্যামাকান্ত একটা গভীর দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বহুক্ষণ নীরবে চসমা যোড়াটার মধ্য হইতে শিশুকে দেখিতে লাগিলেন। সে অপরিচিত দৃষ্টিতে বালক যেন কেমন একটু বিব্রত হইয়া পড়িয়া শান্তির কাছে আরো ঘেঁসিয়া আসিল, তার পর সেও মুখের মধ্যে একটা অঙ্গুলি প্রবেশ করাইয়া দিয়া গম্ভীর ভাবে তাঁহার দৃষ্টি পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিল। শ্যামাকান্ত হঠাৎ দৃষ্টি ফিরাইয়া লইয়া আবার একটা যন্ত্রণাব্যঞ্জক নিশ্বাস ফেলিলেন, চক্ষের দৃষ্টি বিপর্য্যস্ত এবং বুকখানা উদ্বেলিত হইয়া উঠিল, দৃষ্টি যেন সেখান হইতে আর ফিরিতে চাহিতেছিল না। সহসা একান্ত কাতর স্বরে বলিয়া উঠিলেন "মা, মা, একে কোথা থেকে নিয়ে এলি মা ? আমার সেই ছোট্ট মুখখানি, ওরে সে যে এখনও অমনি স্পষ্টভাবে এই বুকের ভিতরে আঁকা রয়েছে। এযে তারি জীবন্ত ছায়া, এযে সেই—আমার বিনো! আমার বিনো আবার কি তুই তেমনি ছোট্টটি হয়ে আমায় দেখা দিতে এলিরে?" বলিতে বলিতে হঠাৎ আত্মবিস্মৃত বৃদ্ধ আত্ম সম্বরণ করিয়া লইলেন, অত্যন্ত বিষাদের ক্ষীণ হাসি হাসিয়া কহিলেন "পাগলের কাণ্ড দেখে অবাক হয়ে গেছ মা! কিন্তু সবটাই পাগলামী নয়। একে দেখে আমার একটি ছোট্ট মুখ মনে আসছে, সুন্দর ছেলেরা বুঝি ছোট বেলায় এক রকমই থাকে ? বেশ ছেলেটি, এসোতো দাদা, আমার কাছে এসো তো ভাই! বলিতে বলিতে সাগ্রহে তিনি শিশুর দিকে উভয় বাহু প্রসারিত করিয়া দিলেন। শান্তির মৃদু মৃদু অনুরোধে বালক ঈষৎ ভয়ে ভয়ে শ্যামাকান্তের নিকট এক পা এক পা করিয়া অগ্রসর হইয়া গেল। শ্যামাকান্ত

তাহাকে দুই হাতে টানিয়া লইয়া কোলে বসাইয়া অতৃপ্ত নেত্রে দেখিতে লাগিলেন। দেখো মা খোকার হাতখানি ঠিক তার মতন, কপাল চুল চোখ কি আশ্চর্য্য সাদৃশ্য! তোমার নামটি বলতো দাদা?"

বালক একবার অদূরবর্ত্তিনী শান্তিকে দেখিয়া ভয়ে ভয়ে আস্তে আস্তে বলিল "অমূয়কুমার চৌধুরী" সে শান্তির নিকটেই নিজের নাম বলিতে শিখিয়াছিল। "অমূল্যকুমার চৌধুরী! চৌধুরী? তোমার বাবার নাম কি জানো খোকা?" বাবা শব্দটা বালকের তেমন পরিচিত নয়, সে ইহার ভাল অর্থবোধ করিতে পারিল না, একবার ইহার একবার উহার মুখপানে চাহিয়া দেখিল! শান্তি বলিল "আমি জেনেছি তাঁর নাম ছিল নীরদকুমার চৌধুরী, তাঁরাও বারেন্দ্র শ্রেণী।" শ্যামাকান্তের মুখে ঘোর হতাশার চিহ্ন প্রকাশ পাইল, কিন্তু শান্তি তাহা লক্ষ্য করিল না; সে অঞ্চলপ্রান্ত হইতে অঙ্গুরীটি ও ছবিখানা বাহির করিতে করিতে বলিতে লাগিল "তাঁর দেশ কোনখানে সে কথা পর্য্যন্ত তিনি শিবানীকে জানান নাই, জিজ্ঞাসা করলে বলতেন 'যখন সময় আসবে তখন নিজেই বলব, এখন মনে করো আমার অজ্ঞাতবাস।' এই একটি হীরার আংটি ও একখানি ছবিমাত্র তিনি রেখে গেছেন, এ থেকে যদি কিছু সন্ধান করা যায়।" বলিতে বলিতে সে মোড়ক খুলিয়া ছবিখানার উপর নেত্রপাত করিল। সে চিত্র একটি মধ্যবয়স্কা সুন্দরী রমণীর। অস্পষ্ট হইয়া আসিলেও চেহারা চিনিবার পক্ষে কিছুমাত্র ব্যাঘাত জন্মায় না। চাহিয়াই শান্তি চমকিয়া উঠিল "একি এ কার ফ'টো! এ শিবানীর শাশুড়ির কেন হবে? এ যে জেঠাইমার!"

"কি? বল্লে মা?" উচ্চকণ্ঠে এই কথা বলিয়া তাড়াতাড়ি শ্যামাকান্ত বধূর হাত হইতে ফ'টোগ্রাফখানা তুলিয়া লইলেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহার হাত দুইটা থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল, তারপর শিথিল অঙ্গুলিচ্যুত হইয়া চিত্রখানা ভূমে পড়িয়া গেল।

কতোক্ষণ পর্য্যন্ত কেহ কোন কথা কহিতে পারিল না; মহাবিস্ময়ে অভিভূত হইয়া জড়ের মত হইয়া রহিল। তারপর প্রথমে শান্তির অবসন্ন শরীরে সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিলে সে সেই হীরকাঙ্গুরীয়টা তাড়াতাড়ি তাঁহার সম্মুখে ধরিল "তবে দেখুন দেখি এটাও চেনেন কিনা। তিনি ইহা শিবানীকে যত্নপূর্ব্বক রাখিতে বলিয়াছিলেন।"

শ্যামাকান্ত বিদ্যুৎ তাড়িতবৎ চমকিয়া উঠিলেন "আংটি? ঠিক কথা! তার মায়ের নাম লেখা হীরার আংটি একটা তার হাতে থাকতো, সেটার দাম বোধ হচ্ছে পাঁচ হাজার টাকার কাছাকাছি, কিন্তু দামকে সে গ্রাহ্য করতো না, মার শেষকালের দেওয়া জিনিষ বলে সেটা তার কাছে বহুমূল্য ছিল। ভিতর দিকে কিছু লেখা আছে কিনা দেখোতো মা!" শান্তি শ্বশুরের নির্দ্দেশানুসারে দেখিল অঙ্গুরীর ভিতর দিকে বাঙ্গলা অক্ষরে ভুবনমোহিনী এই নাম খোদা আছে। আংটিটা শ্বশুরকে দিয়া পুলক কম্পিতস্বরে কহিল "আছে"।

শ্যামাকান্ত নামটা পড়িয়া আর কোন কথাই বলিতে পারিলেন না, শিশুকে উভয় বাহুর মধ্যে টানিয়া সবলে বুকে চাপিয়া ধরিলেন। তাঁহার চোখের অবিশ্রান্ত ধারায়

হতবুদ্ধি বালকের অনাবৃত অঙ্গ ভিজিয়া যাইতে লাগিল। সে কিন্তু এই অঘটিতপূর্ব্ব কাণ্ডে এতোই বিস্মিত হইয়াছিল যে তাঁহার হাত ছাড়াইয়া পলাইতেও ভুলিয়া গিয়া তাঁহার ক্রন্দন দেখিতে লাগিল। এ জিনিষটা দেখা তাহার বড় অনভ্যস্ত ছিল না।

শান্তি চোখের আনন্দাশ্রু মুছিতে মুছিতে শিবানীর নিকট ছুটিল। তাহার কাছে এই মুহূর্ত্তেই যেন সে নিজেকে অপরাধিনী বলিয়া অনুভব করিতে লাগিল। 'ছি ছি এ সমস্ত রাজঐশ্বর্য্যের প্রকৃত অধিকারিণী যে সে কিনা আজ দীনা অনাথিনীভাবে কোথায় পড়িয়া আছে, আর তাহাদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার কাড়িয়া লইয়াছে কে? না সে নিজে!

শান্তির সহিত অৰ্দ্ধ মূর্চ্ছিতাপ্রায় শিবানী আসিয়া যখন শ্বশুরের পায়ের কাছে প্রণাম করিয়া নতমুখে বসিয়া পড়িল তখন শ্যামাকান্ত বক্ষবদ্ধ নাতিকে নামাইয়া দিয়া অবগুণ্ঠনবতী বধূর হাতদুখানা নিজের কম্পিত শীর্ণ হস্তের মধ্যে লইয়া তাহাকে নিকটে টানিয়া লইলেন, তাহার মাথাটা বুকের উপর রাখিয়া রুদ্ধকণ্ঠে বালকের ন্যায় কাঁদিয়া বলিলেন "মা মা, আমার হারানিধি আবার কেন হারালি মা! আমার অমূল্যধনকে কেন আমায় এতোদিন দিসনি মা? আমার নয়নতারা হারিয়ে যে আমি অন্ধ হয়ে গেছলুম!" স্বামীহীনা ও পুত্রহারার বিরহসন্তপ্তচিত্তের অজস্র অশ্রুজলের মধ্যে উভয়ের একমাত্র ধ্রুবতারার ক্ষুদ্র প্রতিকৃতি অমূল্যের আজ অভিষেক হইয়া গেল। সেও কান্না দেখিয়া দেখিয়া বেশিক্ষণ আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না সহসা ঠোঁট ফুলাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। শান্তিও সে দৃশ্য আর বেশিক্ষণ সহ্য করিতে পারিল না, সুখেরি হোক আর দুঃখেরই হোক কাহারও অশ্রুজল তাহার বুকে বড়ই বাজিত। সেই দিনই সে পিতাকে যখন পত্র লিখিতে বসিল প্রথমেই এই শুভসংবাদ দিতে ভুলিল না। অতীত ও বর্ত্তমানের সকল সংবাদ জানাইয়া লিখিল 'বাবা, আপনি কি মনে করিতেছেন? আমার ভাসুর কি বাঁচিয়া নাই? আমার কিন্তু আজ আবার অত্যন্ত আশা হইতেছে। নিশ্চয়ই তিনি বাঁচিয়া আছেন, আবার আসিবেন।" একটা কথা লিখিতে গিয়াও সে পারিয়া উঠিল না, পূর্ব্বস্মৃতির উদয়ে মুখখানা ঈষৎ লাল করিয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিল। "নীরদকুমার রায় ও নীরদকুমার চৌধুরী, একই লোক নহেন তাহার প্রমাণ কি?"

সেদিন আনন্দের প্রথম উচ্ছ্বাসে বিষাদের সুরটাই ক্রমাগত বাজিতে লাগিল। অশ্রুজলের উৎস একবার বহিতে আরম্ভ করিলে আর তাহাকে থামানো যায় না। শিবানীর স্থির গাম্ভীর্য্য ঘোর বিষাদের বাষ্প-রূপে ঝরিয়া পড়িতেছে। এতোদিন সে যেন কোনখানেই একটুখানি আলোক দেখিতে পাইতেছিল না! সমস্ত জীবনটাই যেন তাহার পক্ষে একখানা অভেদ্য রহস্যময় জটিল উপন্যাস হইয়া উঠিয়াছিল। একটা বৈচিত্র্যপূর্ণ স্বপ্নের স্মৃতি ও বাকী সবটা অন্ধকার লইয়া তাহার শূন্য হৃদয়খানা হাহা করিয়া ফিরিতেছিল। মৃত্যুর যুগান্তরব্যাপী অন্ধকারের মতন তাহা যেন তাহাকে একটা অচ্ছেদ্য নাগপাশে আঁটিয়া আঁটিয়া বাঁধিয়া রাখিয়াছিল, কোথাও সে এমন একটু ফাঁক

পাইত না যে সেখান দিয়া তাহার বন্ধনমুক্ত প্রাণটা মুক্তপক্ষ বিহঙ্গিনীর মত হাল্কা হইয়া বাহিরের বাতাসে উড়িয়া বেড়ায়। আজ সহসা সেই জীবনরহস্যের শেষ অঙ্ক অভিনীত হইয়া গেল, আজ সকল প্রহেলিকা তাহার নিকটে সত্যের আলোকে পরিষ্কার হইয়া গেল! সেই দুর্জ্জের অভিমানও আজ সে মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়া বাণবিদ্ধের ন্যায় অন্তরে অন্তরে লুটাইয়া পড়িল! হায় যেজন রাজ্যেশ্বর রাজা দরিদ্রা নিগুর্ণা শিবানী তাহাকে কেমন করিয়া ধরিয়া রাখিবে? পিতৃস্নেহও যে অভিমানকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারে নাই সে কি শিবানীর প্রেমে প্রতিহত হইবার? সেদিন মাতঙ্গিনীর বড় আনন্দের দিন। তিনি সত্য সত্যই নিরাশ্রয়া বালিকার জন্য মনে মনে বড়ই উৎকণ্ঠিতা ছিলেন। আজ অকস্মাৎ সেই শিবানী এই রাজ্যেশ্বর তুল্য ধনপতির একমাত্র পুত্রের বধূ জানিয়া, তিনি আনন্দে ও বিস্ময়ে অনেকক্ষণ স্তব্ধ হইয়া থাকিলেন। তারপর সহসা উচ্ছ্বাস দমন করিতে না পারিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। কাঁদিয়া বলিলেন "মাগো তোর যে একটা হিল্লে হলো, এ আনন্দ রাখবার ঠাঁই নেই। আমার বিশ্বাস নীরদ আমার বেঁচে আছেন, আবার তাঁকে তুমি ফিরে পাবে মা, রাজরাণী হয়ে স্বামী পুত্তুর নিয়ে সুখে ঘর করবে। আহা দিদি যদি এখন এখানে থাকতো, কেজানে ঠাকুরবাড়ী থেকে কতোদিনেই ফিরবে, ইচ্ছে করছে যে ছুটে গিয়ে খপরটা দিয়ে আসি।" শিবানীও তখন মার জন্য উৎকণ্ঠিতা হইতেছিল

সিপাহীর বিশ্রাম।

("Soldier's Song" হইতে)

চির সহিষ্ণু সাহসী সিপাহী
ক্লান্ত-চরণ আজ,
বিশ্রাম তরে আশ্রয় নেছে
নিভৃত সমাধি মাঝ।
মিথ্যা আজিকে তূর্য্য-নিনাদ,
আর সে দেবে না কাণ;
ছাউনি ফেলেছে মরণের ছায়ে
যাত্রার অবসান।

বালক বয়সে ছেড়ে এসেছিল
গরীব বাপের ঘর,
ভাগ্য ফিরাতে সৈনিক হ'য়ে
ঘুরেছে নিরন্তর।
দুর্গম দেশে দুঃসাহসী বেশে
ফিরেছে সর্ব্বদাই,
সম্পদ কোন ছিল না সহায়
ছিল না বন্ধু, ভাই।
দুঃখ বিপদ : গ্রাহ্য করেনি,
চলেছে গাহিয়া গান;
আজি বিশ্রাম; পেয়েছে আরাম
ঘূর্ণার অবসান।

ফাল্গুনী মিঠা পুষ্প ছিটায়ে
আবরিয়া শবাধার,—
দুঃখ সুখের দোসরেরা তার
মুছে আঁখি শতবার।
কাঁদিয়া বেচারী সিপাহীর নারী
চলিয়াছে ম্রিয়মান!
সিপাহীর তার হ'য়েছে যাত্রার
চিরতরে অবসান!

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

কোচিন-চীন।

৮ ফেব্রুয়ারী।

আজ Tramyতে আমাদের বিশ্রাম। এই আড্ডাটির মধ্যে দেশ-রক্ষী সৈন্যদলের একটি গৃহ, (এই সৈন্যদলের নায়ক একজন Alsace-বাসী ফরাসী) পান্থদিগের জন্য একটি কাম্‌রা, অ্যানামবাসী সৈনিকদিগের কতকগুলা আবাস-গৃহ এবং অশ্বশালা-সমূহ সন্নিবিষ্ট। মধ্যস্থলে একটি সুন্দর উদ্যান। আত্মরক্ষণের উদ্দেশে এই আড্ডাটি একটি ঢালু ভূমির দ্বারা বেষ্টিত। সিংহদ্বারের উপর নহবৎ-খানার মত একটা ঘর; সেইখানে সান্ত্রী পাহারা দেয়। এই ঘরের উপর ফরাসী রেপব্লিকের তে-রঙ্গা নিশান উল্লাস-ভরে উড়িতেছে।

অপরাহ্ণে Tramyর যিনি একমাত্র উপনিবেশী তাঁহার সহিত আমরা সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। প্রেমে হতাশ হইয়া এই অল্পবয়স্ক যুবক ফ্রান্স ত্যাগ করিয়া এইখানে আসিয়াছেন। ইনি এখানে ডালচিনির ব্যবসায়ে ব্যাপৃত। ইনি "মোই"দিগের নিকট হইতে সমস্ত ডালচিনির গাছ ক্রয় করেন—তাহার পরিবর্ত্তে উহাদিগকে কম্বল, মুক্তার হার, মহিষের চাম্‌ড়া, "সুম্‌সুমে"র (অ্যানামের সুরা) বোতল দেন; এই সকল গাছ কাটিয়া Fai-Fooতে চালান দেন; এবং ইহার ছাল চীনেদের নিকট বিক্রয় করেন। মোইদিগের সহিত পরিচয় করিবার জন্য, কত বৎসর ধরিয়া তিনি একাকী পর্ব্বতে পর্ব্বতে ঘুরিয়াছেন, কখন ক্ষুধার যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছেন, কখন বা দারুণ জ্বরে কম্পমান হইয়াছেন; মোইদের সহিত একত্র মুর্গির রক্ত পান করিয়া, তাহাদের কতকগুলি পবিত্র মন্ত্র আবৃত্তি করিয়া, তাহাদের সহিত মৈত্রী-বন্ধন করিয়াছেন।

আজ অপরাহ্ণে তাঁহার গৃহে কতকগুলি মোইকে দেখিলাম। এরা প্রকৃত 'বুনো' লোক; ইহাদের গাত্রচর্ম্ম লাল্‌চে শ্যামল, মুখাবয়বগুলি মানান্‌-সই, চোখ্ সোজা, নাক্ চ্যাপ্‌টা, মুখ বিশাল; কপালের সম্মুখভাগের চুল ছাঁটা; মাথার পিছন্‌-দিকে একটা খোঁপা। শরীর দীর্ঘ ও সুগঠিত; বক্ষদেশ সুবক্র ও ফুলানো। পরিধানে একটা ধুতি, কখন বা স্কন্ধদেশে একটা উত্তরীয়, পরিচ্ছদের দিকে উহাদের ততটা দৃষ্টি নাই, অলঙ্কারের প্রতিই উহাদের বেশী অনুরাগ। চুলের ভিতর ছোট ছোট কাঠের গোঁজ, কানে কান-বালা, বুকে মুক্তার মালা, এবং হাতে প্রচুর বলয়। উহাদের মধ্যে একজনের পিঠের উপর একটা চুব্‌ড়ী; সকলেরই হাতে একএকটা কাঠের বল্লম; বল্লমের আগায় একএকটা লোহার ফলা।

এই ফরাসী উপনিবেশী উহাদিগকে কতকগুলা ঢাক্‌-ঢোল দেখাইলেন; ক্রয় করিবার পূর্ব্বে, উহারা বাজাইয়া তন্নতন্নরূপে পরোখ করিয়া লইল। পরে তিনি কতকগুলি মুক্তার মালা উহাদিগকে নির্ব্বাচনের জন্য দিলেন। তন্মধ্যে কতকগুলা উহারা অগ্রাহ্য করিল, কতকগুলা খুব উৎসাহের সহিত গ্রহণ করিল; উহাদের পছন্দ অপছন্দের কারণ অনুমান করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব; যাই

হৌক্, উহাদের সওদা-করা দেখিয়া আমাদের খুব আমোদ হইল। ডাল্‌চিনী-সওদাগরের কুঠীর সম্মুখে, এই সূর্য্যাস্তের সময়ে, আমাদের যে মণ্ডলীটি একত্র হইয়াছিল তাহা অতি অদ্ভুত :—তিনজন ফরাসী, উপনিবেশ-বাসীর সুন্দরী দেশীয় উপপত্নী,তাঁহার চীনে কর্ম্মচারী। কর্ম্মচারীর দুইটী ছেলে, ও ৪।৫ জন বুনো "মোই"!

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পঞ্চম শতাব্দীর ভারত।

পুরাকালে চীনদেশীয় ভ্রমণকারিগণ আমাদের দেশের যে সমস্ত বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন তাহা হইতে আমরা ভারত-বর্ষের তৎকালীন অবস্থার বিষয় অনেক পরিমাণে অবগত হইতে পারি। "বিভিন্ন দেশের ইতিহাসে ভারতের কথা" প্রবন্ধে আমরা যে সমস্ত ঐতিহাসিক বা পর্য্যটন-কারিগণের উল্লেখ করিয়াছি, তাঁহাদের মধ্যে প্রায় সকলেই বাণিজ্যব্যপদেশে ভারতবর্ষে আগমন করিয়াছিলেন। কিন্তু চীনদেশীয় ফাহিয়ান বা হিউয়েনসাং প্রভৃতি মনস্বীগণ জ্ঞান এবং ধর্ম্মলিপ্সু হইয়াই এ দেশ ভ্রমণ করিয়াছিলেন।

যতদূর জানা যায় তাহাতে চি-টাও-আন নামক ভ্রমণকারীই ঐ দেশ হইতে আমাদের দেশে প্রথম আইসেন। তিনি খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর প্রথমভাগে আগমন করেন কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহার লিপিবৃত্তান্তের কোন অনুসন্ধান পাওয়া যায় না *। ফা-হিয়ান নামক সুপ্রসিদ্ধ ভ্রমণকারীও খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে এই দেশে আসিয়া দেশের বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। পঞ্চম শতাব্দীতে হৈসেঙ্গ এবং সঙ্গ-ইয়ান নামকও দুই ব্যক্তি উত্তর-ভারতে পর্য্যটন করেন কিন্তু তাঁহাদের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। মনস্বী হিউয়েনসাং খৃষ্টীয় ৬২৯ খৃষ্টাব্দে এই দেশে আসিয়া অধ্যয়নাদি ও ধর্ম্মালোচনা করিতে থাকেন এবং ৬৪৫ খৃষ্টাব্দে স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। হিউয়েনসাংয়ের বৃত্তান্ত "Records of the western world" অত্যন্ত মূল্যবান। হিউয়েনসাং কেবলমাত্র রাজনৈতিক এবং সামাজিক বিধি লিপিবদ্ধ করেন নাই; তিনি অনেক জনশ্রুতির কথাও তাঁহার পুস্তকে লিখিয়া গিয়াছেন। এই সমস্ত প্রাচীন জন-শ্রুতি পাঠে আমরা অতি পুরাকালের অনেক বৃত্তান্ত অবগত হইতে পারি। হিউয়েনসাংয়ের জীবনী প্রণেতা তাঁহার বন্ধুবর উইলির (Hwui-li) বৃত্তান্ত পাঠেও আমরা তৎকালীন ভারতসম্বন্ধে অনেক বিষয় জানিতে পারি।

ইৎসিং নামক অন্য একজন সুপ্রসিদ্ধ ভ্রমণ-কারী, খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে যে ষাট ৬০ জন চীন দেশীয় বৌদ্ধ যাজক এদেশে আগমন

* খৃষ্টের জন্মের এক শতাব্দী পূর্ব্বে সুমাচীন নামক চীনদেশীয় প্রথম ঐতিহাসিক ভারতবর্ষের এক সুন্দর ইতিহাস লিখিয়াছিলেন।

করেন তাহাদের উল্লেখ করিয়াছেন। ইৎসিং নিজে সপ্তম শতাব্দীর শেষ ভাগে ভারতবর্ষ এবং মালয় দ্বীপপুঞ্জ দেখিয়া তাঁহার পুস্তকে "ভারতবর্ষে এবং মালয় দ্বীপপুঞ্জে বৌদ্ধ ধর্ম্মের অবস্থা" প্রকাশ করেন। তৎকালীন ভারতের বৌদ্ধ ধর্ম্মের এবং সংস্কৃত ভাষার আমূল বৃত্তান্ত এই পুস্তক পাঠে জানা যায়। দুঃখের বিষয় ইৎসিং তাঁহার পুস্তকে দেশের অন্যান্য অবস্থার বিষয় কিছুই লিপিবদ্ধ করেন নাই। খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে ক্ষিণি নামক বৌদ্ধগুরু প্রায় তিনশত শিষ্য সহ এই দেশ পরিভ্রমণ করিয়া যান কিন্তু তাঁহার বৃত্তান্ত পাঠে বিশেষ কিছুই অবগত হওয়া যায় না।

এই সমস্ত পর্য্যটকদিগের মধ্যে ফাহিয়ান এবং হিউয়েনসাংয়ের বৃত্তান্ত দুইটীই বিশেষ আদরণীয়। ফাহিয়ান পঞ্চম শতাব্দীতে এবং হিউয়েনসাং সপ্তম শতাব্দীতে ভ্রমণ করেন। দুঃখের বিষয় শেষোক্ত পর্য্যটনকারী ভারতবর্ষের তদানীন্তন সকল বিষয়েরই যেরূপ আমূল বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, প্রথমোক্ত ব্যক্তি সেরূপ করেন নাই। ফাহিয়ান সাধারণতঃ বৌদ্ধ ধর্ম্ম এবং তৎপ্রাসঙ্গিক বিষয়েরই অবতারণা করিয়াছেন। তত্রাপি তিনি যে বৃত্তান্ত লিখিয়া গিয়াছেন তাহা হইতে আমরা তৎকালীন ভারতের বেশ একটী চিত্র দেখিতে পাই। ফাহিয়ানের পুস্তকের নাম ফু-কো-কি—(Fou-ko-ki) ইহা চল্লিশটী অধ্যায়ে সমাপ্ত। তিনি তক্ষশীলা, মথুরা, কনোজ, কোশল, সরস্বতী, কপিলবস্তু, বৈশালী, মগধ ও তাহার রাজধানী পাটলিপুত্র, নালন্দ, রাজগৃহ, গয়া, কাশী প্রভৃতি স্থান পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। দাক্ষিণাত্যের কতকাংশেরও বৃত্তান্ত তিনি রাখিয়া গিয়াছেন। তাম্রলিপ্তি (বর্ত্তমান তমলুক) সহরে তিনি দুই বৎসর থাকিয়া অনেক প্রাচীন পুঁথি নকল ও অনেক প্রতিমূর্ত্তির নক্সা লইয়া ছিলেন। তৎপর তিনি লঙ্কাদ্বীপ ও জাবা হইয়া দেশে প্রত্যাগমন করেন। ফাহিয়ানের বৃত্তান্ত পাঠে সহজেই বোঝা যায় যে দেশের অবস্থা তখন অনেক ভাল ছিল এবং তৎকালীন রাজা বিক্রমাদিত্যের সুশাসনে প্রজাপুঞ্জ নির্ব্বিঘ্নে কালাতিপাত এবং দিন দিন সমৃদ্ধিশালী হইতে ছিল।

ফাহিয়ান যখন এ দেশে আগমন করেন তখন গুপ্তবংশীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য দেশের রাজা ছিলেন। বিক্রমাদিত্য শৌর্য্যে সিংহকে পরাস্ত করিতে পারিতেন এবং তিনি ৪১৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজা ছিলেন।

ফাহিয়ান যখন প্রথম পাটলিপুত্রে গমন করেন, তখন তিনি অশোকের রাজপ্রাসাদ দেখিয়া অতিশয় মুগ্ধ হন। দেড়শত বৎসরেও ঐ রাজপ্রাসাদের বিশেষ কোন ক্ষতি লক্ষিত হয় নাই। প্রাসাদ প্রস্তরে নির্ম্মিত এবং এমন সুন্দর প্রণালীতে গঠিত হইয়াছিল যে দেখিলে সাধারণ মনুষ্যের রচিত বলিয়া বোধ হইত না। ফাহিয়ান বলিয়াছেন,—তিনি লোক মুখে অবগত হইয়াছিলেন যে ইহা সম্রাটের নিয়োজিত অশরীরী ভূত প্রেতদ্বারা গঠিত হইয়াছিল এবং সেই জন্যই এত দিনেও তাহার কোন ক্ষতি হয় নাই। পাটলিপুত্র সহরের সন্নিকটেই দুটী মঠ ছিল; একটীতে "মহাযান" মতাবলম্বিগণ বাস করিতেন এবং অপরটীতে "হীনযানাবলম্বী" সন্ন্যাসীগণ থাকিতেন। দুই মঠে প্রায় ছয় শত কি সাত শত যাজক

থাকিতেন এবং তাঁহারা অধ্যাপনায় এরূপ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন যে দূর দেশ হইতেও ছাত্রগণ আসিয়া তাঁহাদের নিকট শিক্ষা গ্রহণ করিতেন। ফাহিয়ান এই সহরে ৩ বৎসর বাস করিয়া সংস্কৃত শিক্ষা করেন। তিনি এই স্থানের প্রচলিত উৎসব, যাত্রা, মিছিল প্রভৃতির বিশেষ প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। এই সমস্ত মিছিল বিশেষ জাঁকজমকের সহিত সম্পাদিত হইত। বৎসরের প্রত্যেক দ্বিতীয় মাসের অষ্টম দিনে বিশখানি প্রকাণ্ড সুসজ্জিত রথে করিয়া দেবমূর্ত্তিগুলি নগরের প্রত্যেক রাস্তায় প্রদর্শন করান হইত। সঙ্গে সঙ্গে অনেক বাদ্যকর এবং গায়ক ঘুরিত। অন্যান্যস্থলেও তিনি এইরূপ দেখেন।

ফাহিয়ান মগধের নগরী সমূহ এবং জনসমূহের সমৃদ্ধির কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। জনসাধারণ বিশেষ সুখী এবং সকলেই ধার্ম্মিক ছিল। বদান্যতা এবং দয়ার কার্য্যে সকলেই তৎপর ছিল এবং দেশে দানশীললোকের অভাব ছিল না। রাস্তায় রাস্তায় ভ্রমণকারীদিগের থাকিবার জন্য গৃহাদি ছিল এবং রাজধানীতে এক প্রকাণ্ড দাতব্য চিকিৎসালয় সকলের অভাব মোচন করিত। এই চিকিৎসালয়ে ব্যাধিগ্রস্ত সকল ব্যক্তিই আশ্রয় পাইত। তাহাদের রীতিমত তত্ত্বাবধান হইত এবং ঔষধ ও পথ্য বিনা মূল্যে প্রদত্ত হইত। সম্পূর্ণরূপে সুস্থ না হইলে তাহাদের যাইতে দেওয়া হইত না।

ফাহিয়ান সিন্ধু নদ হইতে যমুনা তীরবর্ত্তী মথুরা নগরে যাইবার পথে বহুসংখ্যক বৌদ্ধ মঠ দেখিয়াছিলেন; এই সমস্ত মঠেই সহস্র সহস্র বৌদ্ধ ভিক্ষু বাস করিত। মথুরার প্রান্তে তিনি এই প্রকার কুড়িটি মঠ দেখিতে পান, সেখানে তিন সহস্র বৌদ্ধ ছিলেন। এই প্রদেশে বৌদ্ধ ধর্ম্মেরই প্রাধান্য ছিল।

মথুরার দক্ষিণে মালব প্রদেশে যাইয়া ফাহিয়ান বিস্ময়ে আপ্লুত হন। স্বভাবের শোভা, প্রকৃতিপুঞ্জের প্রকৃতি এবং আইনের সুব্যবস্থা ও রাজার ন্যায়শীলতা দেখিয়া তিনি আশ্চর্য্যান্বিত হয়েন। একদিকে দেশের জল বায়ুর প্রশংসা, এবং অন্যদিকে নিজের দেশের কঠোর শাসনপ্রণালীর সহিত এতদ্দেশের শাসন প্রণালীর তুলনা করিয়া রাজার গুণানুবাদ করেন। রাজা আদৌ প্রজাপীড়ন করিতেন না। প্রজাপুঞ্জ ইচ্ছামত যাতায়াত করিতে পারিত এবং সে জন্য কোন প্রকার ছাড়পত্রের আবশ্যক হইত না।

ফাহিয়ান ফৌজদারী কার্য্যবিধির বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। সাধারণতঃ অপরাধ করিলে জরিমানা হইত এবং প্রাণদণ্ড আদৌ প্রচলিত ছিল না। বার বার রাজদ্রোহ অপরাধে অপরাধী হইলে দক্ষিণ হস্ত ছেদন করা হইত কিন্তু এই প্রথা কদাচিৎ অবলম্বন করা হইত। ধর্ম্মাধিকরণে কোন রূপ যন্ত্রণা দেওয়া হইত না এবং সাক্ষী ও অভিযুক্ত পক্ষকে কোনরূপ নির্য্যাতন করা হইত না। রাজকর রাজার স্বকীয় ভূমি হইতেই উঠিত এবং রাজকর্ম্মচারী দিগের নির্দ্দিষ্ট বেতন থাকাতে তাহারা প্রজাপুঞ্জকে উৎকোচ দানে বাধ্য করিয়া কষ্ট দিত না।

সাধারণতঃ বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচলিত নিয়মাবলী সর্ব্বত্রই অবলম্বন করা হইত। কেহ কোন জীব হত্যা করিত না, মদ্যপান করিত না, এবং পেঁয়াজ রসুনও খাদ্যাদির মধ্যে পরি-

গণিত হইত না। * নগরের মধ্যে কসাইয়ের দোকান বা ভাটিখানা থাকিতে দেওয়া হইত না।

ফাহিয়ানের বৃত্তান্ত পাঠে অবগত হওয়া যায় যে অনার্য্যজাতিদিগের নগরের মধ্যে বাসাধিকার ছিল না। চণ্ডাল বা অন্যান্য অনার্য্যজাতির কোন ব্যক্তি নগরের মধ্যে প্রবেশাকাঙ্ক্ষী হইলে তাহাকে দুইখণ্ড কাষ্ঠে আঘাত করিয়া অর্থাৎ ঐ শব্দে অন্যান্য উচ্চজাতীয় ব্যক্তিকে সাবধান করিয়া নগরে বা বাজারে প্রবেশ করিতে হইত। কেবল-মাত্র অনার্য্যজাতিগণই কসাইয়ের কার্য্য, মৎস্যজীবির ব্যবসায় এবং শিকারে লিপ্ত থাকিত।

বৌদ্ধ সন্ন্যাসিগণকে এবং মঠে রাজারা প্রচুর দান করিতেন এবং যতিগণ যে কোন স্থানেই যাতায়াত করুন না কেন তাঁহাদের থাকিবার স্থান, আহার্য্য এবং বস্ত্রাদির অভাব হইত না।

ফাহিয়ান তিন বৎসর পাটলিপুত্রে অধ্যয়ন করিয়া পরে তাম্রলিপ্ত † (বর্ত্তমান তমলুক) গমন করেন। তমলুক তখন একটী প্রসিদ্ধ বন্দর ছিল এবং পাটলিপুত্র হইতে তমলুক গমন করিতে তাঁহাকে কোনরূপ কষ্ট বা কোনরূপ দস্যুতস্করের হস্তে পতিত হইতে হয় নাই।

ফাহিয়ান যে ভ্রমণ বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন তাহা পর্য্যালোচনা করিলে আমরা কয়েকটী বিষয়ে প্রাচীন ভারতের আভ্যন্তরিক অবস্থার বিষয় অবগত হই। প্রজাপুঞ্জ সুশাসনে বিশেষ সুখী এবং সমৃদ্ধিশালী ছিল এবং দেশে চৌর ভয় মাত্র ছিল না। সর্ব্বত্রই বিদ্বান ব্যক্তি এবং বৈদেশিকগণ সম্মানিত হইতেন এবং দেশে বিদ্যাশিক্ষার যথেষ্ট প্রচলন ছিল। দয়া-দাক্ষিণ্যাদি গুণে ভারতবাসীরা প্রসিদ্ধ ছিলেন এবং যে দাতব্য চিকিৎসালয়ের কথা ফাহিয়ান উল্লেখ করিয়াছেন তাহা হইতে আমাদের দেশ সেই সময়ে সভ্যতার যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহই থাকে না। ঐ সময়ে পৃথিবীর কুত্রাপি আর দাতব্য চিকিৎসালয়াদি বর্ত্তমান ছিল না। সপ্তমশতাব্দীতে ইউরোপে প্রথম দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল কিন্তু আমাদের দেশে তৃতীয় শতাব্দী হইতেই চিকিৎসার ব্যবস্থা দেখা যায়। রাজা অশোকের দ্বিতীয় প্রস্তর লিপিপাঠে জানা যায় যে অশোক নিজরাজ্যে এবং নিকটবর্ত্তী চোলদেশে, পাণ্ড্যরাজ্যে, এমন কি সুদুর লঙ্কা, এবং গ্রীস দেশে পর্য্যন্ত পশু এবং মনুষ্যের চিকিৎসার সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এবং রাজা অশোক যে মহৎ পথ প্রদর্শন করিয়া-ছিলেন শতাব্দীর পর শতাব্দী চলিয়া গেলেও সে বদান্যতা ও দয়ার হ্রাস হয় নাই। আমাদের বিশ্বাস মিতাচারের জন্য ভারতবর্ষ চিরকালই প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে এবং

---

* "রাজতরঙ্গিণী" পাঠে অবগত হওয়া যায় যে পেঁয়াজ ও রশুন নিষিদ্ধ খাদ্যমধ্যে পরিগণিত হইবার কারণ এই যে, উহা দ্বিখণ্ড করিলে উহার মধ্যস্থিত অংশবিশেষ মাংসের ন্যায় বোধ হয়। গোপাদিত্য নামক কাশ্মীরের জনৈক রাজা পেঁয়াজভোজী ব্রাহ্মণদিগকে বিশেষ শাস্তি দিতেন।

† বর্ত্তমান তমলুক সমুদ্র হইতে এইক্ষণ প্রায় ৬০ মাইল দূরে অবস্থিত।

এই বৈদেশিকের ভ্রমণবৃত্তান্তে আমাদের সে বিশ্বাস আরও বদ্ধমূল হয়। পশুহত্যা ইত্যাদি আমাদের দেশে অশোকের সময় হইতে নিষিদ্ধ হইয়াছিল এবং কলিঙ্গ বিজয়ের পর ত্রয়োদশ প্রস্তরলিপিতে অশোক যে আদেশ গ্রথিত করিয়াছিলেন সেই বৃক্ষ ফাহিয়ানের সময়ও ফল প্রসব করিতেছিল।

ফাহিয়ানে আমরা আর একটী বিষয়ের আভাস পাই। অতি প্রাচীনকাল হইতেই দেখা যায় যে ভারতবর্ষে সাক্ষী বা অপরাধী-গণকে নির্য্যাতন করার প্রথা কোনকালেই ছিল না। মনস্বী এলফিনষ্টোন সাহেব হিন্দুদিগের দণ্ডবিধি আইন সমালোচনা করিতে গিয়া যদিও তাহার অনেক ত্রুটি ধরিয়াছেন তত্রাপি বলিতে বাধ্য হইয়াছেন যে "It is an honorable distinction from most ancient codes, that torture is never employed either against witnesses or Criminals." অন্যান্য দেশের আইনের সহিত তুলনা করিলে ভারতবর্ষের পক্ষে ইহা কম গৌরবের বিষয় নহে। ফাহিয়ানেও আমরা ইহার উল্লেখ দেখিতে পাই।

ফাহিয়ান ইহাও লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন যে, "ব্রাহ্মণধর্ম্মাবলম্বী" নাবিকগণ গঙ্গাতীরবর্ত্তী বন্দরাদি হইতে লঙ্কা দ্বীপে, লঙ্কা হইতে জাবা এবং তথা হইতে চীন পর্য্যন্ত বাণিজ্যার্থ গমনাগমন করিতেন। জাবাদ্বীপে হিন্দুধর্ম্ম প্রচলিত ছিল। তৎকালীন হিন্দুগণ যে সমুদ্রযাত্রার বিরোধী ছিলেন না ফাহিয়ান পাঠে তাহা বেশ হৃদয়ঙ্গম হয়।

সুতরাং মোটামোটী হিসাবে ফাহিয়ান পাঠে আমরা খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর যে বৃত্তান্ত পাইতেছি তাহাতে দেখিতেছি যে কি অর্থে, কি সুশাসনে, কি বিদ্যায়, কি দয়াদাক্ষিণ্যে কি আইনকানুনে আমরা তৎকালীন অন্য কোন দেশ অপেক্ষা কোন অংশে হীন ছিলাম না। আগামীবারে আমরা ফাহিয়ানের ভ্রমণের বিস্তারিত বৃত্তান্ত দিব।

উৎসব।

(শান্তি নিকেতনের বাৎসরিক উৎসব উপলক্ষ্যে)

প্রভাতের সূর্য্য যে উৎসব দিনটির পদ্মদলগুলিকে দিকে দিকে উদ্ঘাটিত করে দিলেন তারই মর্ম্মকোষের মধ্যে প্রবেশ করবার জন্যে আজ আমাদের আহ্বান আছে। তার স্বর্ণরেণুর অন্তরালে যে মধু সঞ্চিত আছে সেখান থেকে কি কোনো সুগন্ধ আজ আমাদের হৃদয়ের মাঝখানে এসে পৌঁছয় নি? এই বিশ্ব উপবনের রহস্য-নিলয়ের ভিতরটিতে প্রবেশের সহজ অধিকার আছে যার, সেই চিত্তমধুকর কি আজও এখনো জাগ্‌ল না? কোনো বাতাসে এখনো সে কি খবর পায় নি? আজকের দিন যে একটি অনেক দিনের খবর নিয়ে বেরিয়েছে এবং সে যে সম্মুখের অনেক দিনের দিকেই চলেছে। সে যে দূর ভবিষ্যতের পথিক। আজ তাকে ধরে, দাঁড় করিয়ে আমাদের প্রশ্ন করতে হবে,



মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর—(বয়স ১৮)

তার যা কিছু কথা আছে সমস্ত আদায় করে নেওয়া চাই। সমস্ত মন দিয়ে না জিজ্ঞাসা করলে সে কাউকে কিছুই বলে না, তখন আমরা মনে করি, এই গান, এই বাদ্যধ্বনি, এই জনতার কোলাহল, এই বুঝি তার যা ছিল সমস্ত, আর বুঝি তার কোনো বাণী নেই! কিন্তু এমন করে তাকে যেতে দেওয়া হবে না—আজ এই সমস্ত কোলাহলের মধ্যে যে নিস্তব্ধ হয়ে আছে সেই পথিকটিকে জিজ্ঞাসা কর, আজ এ কিসের উৎসব?

প্রতি বৎসর বসন্তে আমের বনে ফলভরা শাখার মধ্যে দক্ষিণের বাতাস বইতে থাকে—সেই সময়ে আমের বনে তার বার্ষিক উৎসবের ঘটা। কিন্তু এই উৎসবের উৎসবত্ব কি নিয়ে, কিসের জন্যে? না, যে বীজ থেকে আমের গাছ জন্মেছে সেই বীজ অমর হয়ে গেছে এই শুভ খবরটি দেবার জন্যে। বৎসরে বৎসরে ফল ধরচে—সে ফলের মধ্যে সেই একই বীজ—সেই পুরাতন বীজ। সে আর কিছুতেই ফুরচ্চে না—সে নিত্যকালের পথে নিজেকে দ্বিগুণিত চতুর্গুণিত সহস্রগুণিত করে চলেছে।

শান্তিনিকেতনের সাম্বৎসরিক উৎসবের সফলতার মর্ম্মস্থান যদি উদ্ঘাটন করে দেখি তবে দেখ্‌তে পাব এর মধ্যে সেই বীজ অমর হয়ে আছে যে বীজ থেকে এই আশ্রম-বনস্পতি জন্মলাভ করেছে।

সে হচ্চে সেই দীক্ষাগ্রহণের বীজ। মহর্ষির সেই জীবনের দীক্ষা এই আশ্রম-বনস্পতিতে আজ আমাদের জন্যে ফল্‌চে; এবং আমাদের আগামীকালের উত্তরবংশীয়দের জন্যে ফল্‌তেই চল্‌বে।

বহুকাল পূর্ব্বে কোন্ একদিনে মহর্ষি দীক্ষাগ্রহণ করেছিলেন, সে খবর ক'জন লোকই বা জান্‌ত? যারা জেনেছিল যারা দেখেছিল তারা মনে মনে ঠিক করেছিল এই একটি ঘটনা আজকে ঘট্‌ল এবং আজ্‌কেই এটা শেষ হয়ে গেল।

কিন্তু এই দীক্ষাগ্রহণ ব্যাপারটিকে সেই সুদূর কালের ৭ই পৌষ নিজের কয়েক ঘণ্টার মধ্যে নিঃশেষ করে ফেল্‌তে পারেনি। সেই একটি দিনের মধ্যেই এ'কে কুলিয়ে উঠ্‌ল না। সেদিন যার খবর কেউ পায়নি এবং তারপরে বহুকাল পর্য্যন্ত যার পরিচয় পৃথিবীর কাছে অজ্ঞাত ছিল সেই ৭ই পৌষের দীক্ষার দিন আজ অমর হয়ে বৎসরে বৎসরে উৎসব ফল প্রসব করচে।

আমাদের জীবনে কত শত ঘটনা ঘটে যাচ্চে কিন্তু চিরপ্রাণ ত তাদের স্পর্শ করে না—তারা ঘট্‌চে এবং মিলিয়ে যাচ্চে তার হিসেব কোথাও থাক্‌চে না।

কিন্তু মহাপ্রাণ এসে কার জীবনের কোন্ মুহূর্ত্তটিকে কখন্ লুকিয়ে স্পর্শ করে দেন, তার উপরে নিজের অদৃশ্য চিহ্নটি লিখে দিয়ে চলে যান—তারপরে তাকে কেউ না দেখুক না জানুক, সে হেলায় ফেলায় পড়ে থাক্, তাকে আবর্জ্জনা বলে লোকে ঝেঁটিয়ে ফেলুক—সেদিনকার এবং তারপরে বহুদিন-কার ইতিহাসের পাতে তার কোনো উল্লেখ না থাকুক্—কিন্তু সে রয়ে গেল। জগতের রাশি রাশি মৃত্যু ও বিস্মৃতির মাঝখান থেকে সে আপনার অঙ্কুরটি নিয়ে অতি অনায়াসে মাথা তুলে ওঠে—নিত্যকালের সূর্য্যালোক এবং নিত্যকালের সমীরণ তাকে পালন করবার

ভার গ্রহণ করে—সদাচঞ্চল সংসারের ভয়ঙ্কর ঠেলাঠেলিতেও তাকে আর সরিয়ে ফেলতে পারে না।

মহর্ষির জীবনের একটি ৭ই পৌষকে সেই প্রাণস্বরূপ অমৃতপুরুষ একদিন নিঃশব্দে স্পর্শ করে গিয়েছেন—তার উপরে আর মৃত্যুর অধিকার রইল না। সেই দিনটি তাঁর জীবনের সমস্ত দিনকে ব্যাপ্ত করে কি রকম করে প্রকাশ পেয়েছে তা কারও অগোচর নেই। তারপরে তাঁর দীর্ঘ জীবনের মধ্যেও সেই দিনটির শেষ হয়নি। আজও সে বেঁচে আছে—শুধু বেঁচে নেই, তার প্রাণশক্তির বিকাশ ক্রমশই প্রবলতর হয়ে উঠ্‌চে।

পৃথিবীতে আমরা অধিকাংশ লোকই প্রচ্ছন্ন হয়ে আছি আমাদের মধ্যে সেই প্রকাশ নেই যে প্রকাশকে ঋষি আহ্বান করে বলেছেন, আবিরাবীর্ম্ম এধি—হে প্রকাশ, তুমি আমাতে প্রকাশিত হও! তাঁর সেই প্রকাশ যাঁর জীবনে আবির্ভূত তিনি ত আর নিজের ঘরের প্রাচীরের দ্বারা নিজেকে আড়াল করে রাখ্‌তে পারেন না এবং তিনি নিজের আয়ুটুকুর মধ্যেই নিজে সমাপ্ত হয়ে থাকেন না। নিজের মধ্যে থেকে তাঁকে সর্ব্বদেশে এবং নিত্যকালে বাহির হতেই হবে। সেই জন্যেই উপনিষৎ বলেছেন

যদৈতম্ অনুপশ্যতি আত্মানং দেবম্ অঞ্জসা
ঈশানং ভূতভব্যস্য ন ততো বিজুগুপ্সতে।

যখন এই দেবতাকে এই পরমাত্মাকে, এই ভূতভবিষ্যতের ঈশ্বরকে কোনো ব্যক্তি সাক্ষাৎ দেখ্‌তে পান তখন তিনি আর গোপনে থাকতে পারেন না।

তাঁকে যিনি সাক্ষাৎ দেখেছেন অর্থাৎ একেবারে নিজের অন্তরাত্মার মাঝখানেই দেখেছেন তাঁর আর পর্দ্দা নেই, দেয়াল নেই, প্রাচীর নেই—তিনি সমস্ত দেশের, সমস্ত কালের। তাঁর কথার মধ্যে, আচরণের মধ্যে, নিত্যতার লক্ষণ আপনিই প্রকাশ পেতে থাকে।

এর কারণ কি? এর কারণ হচ্চে এই যে, তিনি যে আত্মানং, সকল আত্মার আত্মাকে দেখেছেন। যারা সেই আত্মাকে দেখেনি তারা অহংকেই বড় করে দেখে। তারা বাহিরের দরজার কাছেই ঠেকে গিয়েছে। তারা কেবল আমার খাওয়া আমার পরা, আমার বুদ্ধি আমার মত, আমার খ্যাতি আমার বিত্ত—একেই প্রধান করে দেখে। এই যে অহঙ্কার এতে সত্য নেই, নিত্য নেই; এ আলোকের দ্বারা নিজেকে প্রকাশ করতে পারে না, আঘাতের দ্বারা প্রকাশ করতে চেষ্টা করে।

কিন্তু যে লোক আত্মাকে দেখেছে সে আর অহংয়ের দিকে দৃক্‌পাত করতে চায় না। তার সমস্ত অহংয়ের আয়োজন পুড়ে ছাই হয়ে যায়। যে প্রদীপে আলোকের শিখা ধরে নি সেই ত নিজের প্রচুর তেল ও পল্‌তের সঞ্চয় নিয়ে গর্ব্ব করে—আর যাতে আলো একবার ধরে গিয়েছে সে কি আর নিজের তেল পল্‌তের দিকে ফিরে তাকায়? সে ঐ আলোটির পিছনে তার সমস্ত তেল সমস্ত পল্‌তে উৎসর্গ করে দেয়। কিন্তু সে একেবারে প্রকাশ হয়ে পড়ে, সে আর নিজের আড়ালে গোপনে থাকতে পারে না।

ন ততো বিজুগুপ্সতে। কেন? কেননা তিনি অনুপশ্যতি আত্মানং দেবং। তিনি



ছাতিমতলা—শান্তিনিকেতন

আত্মাকে দেখেছেন, দেবকে দেখেছেন। দেব শব্দের অর্থ দীপ্তিমান। আত্মা যে দেব, আত্মা যে জ্যোতির্ম্ময়। আত্মা যে স্বতঃপ্রকাশিত। অহং প্রদীপ মাত্র, আর আত্মা যে আলোক। অহং দীপ যখন এই দীপ্তিকে এই আত্মাকে উপলব্ধি করে তখন সে কি আর অহঙ্কারের সঞ্চয় নিয়ে থাকে? তখন সে আপনার সব দিয়েই সেই আলোককেই প্রকাশ করে।

সে যে তাঁকে দেখেছে যিনি ঈশানো ভূতভব্যস্য, যিনি অতীত ও ভবিষ্যতের অধিপতি। সেই জন্যেই সে যে সেই বৃহৎ কালের ক্ষেত্রেই আপনাকে এবং সব কিছুকেই দেখতে পায়। সে ত কোনো সাময়িক আসক্তির দ্বারা বদ্ধ হয় না কোনো সাময়িক ক্ষোভের দ্বারা বিচলিত হতে পারে না। এই জন্যই তার বাক্য ও কর্ম্ম নিত্য হয়ে ওঠে— তা কালে কালে ক্রমশই প্রবলতর হয়ে ব্যক্ত হতে থাকে, যদি বা কোনো এক সময়ে কোনো কারণে তা আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে তবে নিজের আচ্ছাদনকে দগ্ধ করে' আবার নবীনতর উজ্জ্বলতায় সে দীপ্যমান হয়ে ওঠে।

মহর্ষির ৭ই পৌষের দীক্ষার উপরে আত্মার দীপ্তি পড়েছিল—তার উপরে ভূত ভবিষ্যতের যিনি ঈশান তাঁর আবির্ভাব হয়েছিল—এই জন্যে সেই দীক্ষা ভিতরে থেকে তাঁর জীবনকে ধনী গৃহের প্রস্তরকঠিন আচ্ছাদন থেকে সর্ব্বদেশ সর্ব্বকালের দিকে উদ্ঘাটিত করে দিয়েছে—এবং সেই ৭ই পৌষ এই শান্তিনিকেতন আশ্রমকে সৃষ্টি করেছে এবং এখনও প্রতিদিন এ'কে সৃষ্টি করে তুলচে।

তিনি আজ প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী হল যেদিন এর সপ্তপর্ণের ছায়ায় এসে বসলেন সেদিন তিনি জানতেন না যে, তাঁর জীবনের সাধনা এইখানে নিত্য হয়ে বিরাজ করবে। তিনি ভেবেছিলেন নির্জ্জন উপাসনার জন্যে এখানে তিনি একটি বাগান তৈরি করেছেন। কিন্তু ন ততো বিজুগুপ্সতে। যে জায়গায় বড় এসে দাঁড়ান সে জায়গাকে ছোট বেড়া দিয়ে আর ঘেরা যায় না। ধনীর সন্তান নিজেকে যেমন পারিবারিক ধনমানসম্ভ্রমের মধ্যে ধরে রাখতে পারেন নি সকলের কাছে তাঁকে বেরিয়ে পড়তে হয়েছে—তেমনি এই শান্তিনিকেতনকেও তিনি আর বাগান করে রাখতে পারলেন না— এ তাঁর বিষয়সম্পত্তির আবরণকে বিদীর্ণ করে ফেলে বেরিয়ে পড়েছে,—এ আপনিই আজ আশ্রম হয়ে দাঁড়িয়েছে। যিনি ঈশানো ভূতভব্যস্য, তাঁর স্পর্শে বোলপুরের মাঠের এই ভূখণ্ডটুকু ভূত এবং ভবিষ্যতের মধ্যে ব্যাপ্ত হয়ে দেখা দিয়েছে।

এই আশ্রমটির মধ্যে ভারতবর্ষের একটি ভূতকালের আবির্ভাব আছে। সে হচ্চে সেই তপোবনের কাল। যে কালে ভারতবর্ষ তপোবনে শিক্ষালাভ করেছে, তপোবনে সাধনা করেছে এবং সংসারের কর্ম্ম সমাধা করে তপোবনে জীবিতেশ্বরের কাছে জীবনের শেষ নিশ্বাস নিবেদন করে দিয়েছে। যে কালে ভারতবর্ষ জল স্থল আকাশের সঙ্গে আপনার যোগ স্থাপন করেছে এবং তরুলতা পশুপক্ষীর সঙ্গে আপনার বিচ্ছেদ দূর করে দিয়ে "সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং" আত্মাকে সর্ব্বভূতের মধ্যে দর্শন করেছে।

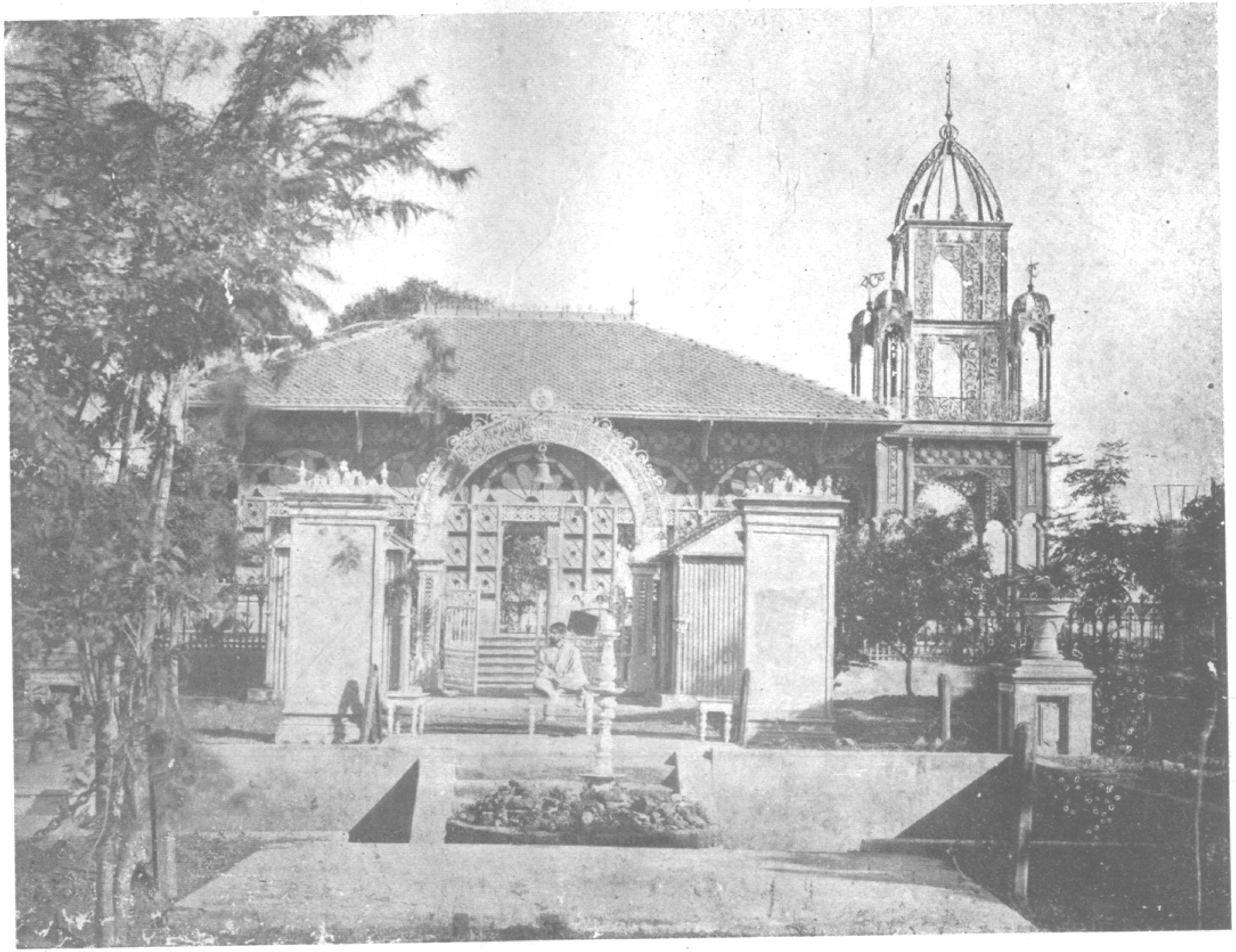
শুধু ভূতকাল নয়, এই আশ্রমটির মধ্যে একটি ভবিষ্যৎকালের আবির্ভাব আছে। কারণ, সত্য কোন অতীতকালের জিনিষ

হতেই পারে না। যা একেবারেই হয়ে চুকে গেছে, যার মধ্যে ভবিষ্যতে আর হবার কিছুই নেই তা মিথ্যা, তা মায়া। বিশ্বপ্রকৃতির মাঝখানে দাঁড়িয়ে আত্মার সঙ্গে ভূমার যোগ-সাধনা এই যদি সত্য সাধনা হয় তবে এই সাধনার মধ্যে এসে উপস্থিত না হলে কোনো কালের কোনো সমস্যার মীমাংসা হতে পারবে না। এই সাধনা না থাকলে সত্যের সঙ্গে মঙ্গলকে আমরা এক করে দেখতে পাব না—মঙ্গলের সঙ্গে সুন্দরের আমরা বিচ্ছেদ ঘটিয়ে বসব—এই সাধনা না থাকলে আমরা জগতে অনৈক্যকেই বড় করে জানব এবং স্বাতন্ত্র্যকেই পরম পদার্থ বলে জ্ঞান করব—পরস্পরকে খর্ব্ব করে প্রবল হয়ে ওঠবার জন্য কেবলই ঠেলা-ঠেলি করতে থাকব—সমস্তকে এক করে নিয়ে যিনি শান্তং শিবং অদ্বৈতংরূপে বিরাজ করচেন তাঁকে সর্ব্বত্র উপলব্ধি করবার জন্যে না পাব অবকাশ, না পাব মনের শান্তি।

অতএব সংসারের সমস্ত ঘাত প্রতিঘাত কাড়াকাড়ি মারামারি যাতে একান্ত হয়ে উত্তপ্ত হয়ে না ওঠে সে জন্যে এক জায়গায় শান্তং শিবং অদ্বৈতং-এর সুরটিকে বিশুদ্ধভাবে জাগিয়ে রাখবার জন্যে তপোবনের প্রয়োজন। সেখানে ক্ষণিকের আবর্ত্ত নয়, সেখানে নিত্যের আবির্ভাব, সেখানে পরস্পরের বিচ্ছেদ নয় সেখানে সকলের সঙ্গে যোগের উপলব্ধি। সেখানকারই প্রার্থনামন্ত্র হচ্চে অসতোমা সদ্‌গময়, তমসোমা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মা-মৃতংগময়।

সেই তপোবনটি মহর্ষির জীবনের প্রভাবে এখানে আপনি হয়ে উঠেছে। এখানকার বিরাট প্রান্তরের মধ্যে তপস্যার দীপ্তি আপনিই বিস্তীর্ণ হয়েছে; এখানকার তরুলতার মধ্যে সাধনার নিবিড়তা আপনিই সঞ্চিত হয়ে উঠেছে; ঈশানো ভূতভব্যস্য এখানকার আকাশের মধ্যে তাঁর একটি বড় আসন পেতে-ছেন। সেই মহৎ আবির্ভাবটি আশ্রমবাসী প্রত্যেকের মধ্যে প্রতিদিন কাজ করচে। প্রত্যেক দিনটি প্রান্তরের প্রান্ত হতে নিঃশব্দে উঠে এসে তাদের দুই চক্ষুকে আলোকের অভিষেকে নির্ম্মল করে দিচ্চে—সমস্ত দিনই আকাশ অলক্ষ্যে তাদের অন্তরের মধ্যে প্রবেশ করে জীবনের সমস্ত সঙ্কোচগুলিকে দুই হাত দিয়ে ধীরে ধীরে প্রসারিত করে দিচ্চে—তাদের হৃদয়ের গ্রন্থি অল্পে অল্পে মোচন হচ্চে, তাদের সংস্কারের আবরণ ধীরে ধীরে ক্ষয় হয়ে যাচ্চে, তাদের ধৈর্য্য দৃঢ়তর ক্ষমা গভীর-তর হয়ে উঠচে—এবং আনন্দময় পরমাত্মার সঙ্গে তাদের অব্যবহিত চেতনাময় যোগের ব্যবধান একদিন ক্ষীণ হয়ে দূর হয়ে যাবে সেই শুভক্ষণের জন্যে তারা প্রতিদিন পূর্ণতর আশার সঙ্গে প্রতীক্ষা করে আছে। তারা দুঃখকে অপমানকে আঘাতকে উদার শক্তির সঙ্গে বহন করবার জন্য দিনে দিনে প্রস্তুত হচ্চে—এবং যে জ্যোতির্ম্ময় পরমানন্দ ধারা বিশ্বের দুই কূলকে উদ্বেল করে দিয়ে নিরন্তর-ধারায় দিক্‌দিগন্তরে ঝরে পড়ে যাচ্চে জীবনকে তারই কাছে নত করে ধরবার জন্যে তারা একটি আহ্বান শুনতে পাচ্চে।

এই তপোবনটির মধ্যে একটি নিগূঢ় রহস্য-ময় সৃষ্টির কাজ চলচে সেই রহস্যটি আমাদের মধ্যে কে দেখতে পাচ্চে! যে একটি জীবন দেহের আবরণ আজ ঘুচিয়ে দিয়ে পরমপ্রাণের পদপ্রান্তে আপনাকে সম্পূর্ণ সমর্পণ করে



মন্দির—শান্তিনিকেতন

(বোলপুর)

দিয়েছে সেই জীবনের ভাষামুক্ত স্বরমুক্ত অতি বিশুদ্ধ আনন্দ এখানকার নিস্তব্ধ আকাশের মধ্যে নির্ম্মল ভক্তিরসে সরস একটি পবিত্র বাণীকে কেবলি বিকীর্ণ করচে—কেবলি বলচে তিনি আমার প্রাণের আরাম আত্মার শান্তি, মনের আনন্দ, সে বলা আর শেষ হচ্চে না—সেই আনন্দের কাজ আর ফুরালো না।

জগতে একমাত্র আনন্দই যে সৃষ্টি করে, সৃষ্টির শক্তি ত আর কিছুরই নেই। এখানকার আকাশপ্লাবী অবারিত আলোকের মাঝখানে বসে আনন্দের সঙ্গে তাঁর যে আনন্দ মিলেছিল, সেই আনন্দ, সেই আনন্দ সম্মিলন ত শূন্যতার মধ্যে বিলীন হতে পারে না। সেই আনন্দই আজও সৃষ্টি করচে, এই আশ্রমকে সৃষ্টি করে তুলেছে—এখানকার গাছপালার শ্যামলতার উপরে একটি প্রগাঢ় শান্তির সুস্নিগ্ধ অঞ্জন প্রতিদিন যেন নিবিড় করে মাখিয়ে দিচ্চে। অনেকদিনের অনেক সুগভীর আনন্দ-মুহূর্ত্ত এখানকার সূর্য্যোদয়কে, সূর্য্যাস্তকে এবং নিশীথ রাত্রের নীরব নক্ষত্রলোককে দেবর্ষি নারদের বীণার তারগুলির মত অনির্ব্বচনীয় ভক্তির সুরে আজও কম্পিত করে তুলচে। সেই আনন্দসৃষ্টির অমৃতময় রহস্য আমরা আশ্রমবাসীরা কি প্রতিদিন উপলব্ধি করতে পারব না? একদিন একজন সাধক অকস্মাৎ কোথা থেকে কোথায় যেতে যেতে এই ছায়াশূন্য বিপুল প্রান্তরের মধ্যে যুগল সপ্তপর্ণ গাছের তলায় বসলেন—সেই দিনটি আর মরলনা—সেই দিনটি বিশ্বকর্ম্মার সৃষ্টিশক্তির মধ্যে চিরদিনের মত আটকা পড়ে গেল, শূন্য প্রান্তরের পটের উপরে রঙের পর রং, প্রাণের পর প্রাণ ফলিয়ে তুলতে লাগল—যেখানে কিছুই ছিল না, যেখানে ছিল বিভীষিকা সেখানে একটি পূর্ণতার মূর্ত্তি প্রথমে আভাসে দেখা দিল তার পরে ক্রমে ক্রমে দিনে দিনে বর্ষে বর্ষে স্পষ্টতর হয়ে উঠতে লাগল, এই যে আশ্চর্য্য রহস্য, জীবনের নিগূঢ় ক্রিয়া, আনন্দের নিত্যলীলা, সে কি আমরা এখানকার শালবনের মর্ম্মরে, এখানকার আম্রবনের ছায়াতলে উপলব্ধি করতে পারব না? শরতের অপরিমেয় শুভ্রতা যখন এখানে শিউলি ফুলের অজস্র বিকাশের মধ্যে আপনাকে প্রভাতের পর প্রভাতে ব্যক্ত করে করে কিছুতে আর ক্লান্তি মানতে চায় না তখন সেই অপর্য্যাপ্ত পুষ্পবৃষ্টির মধ্যে আরও একটি অপরূপ শুভ্রতার অমৃত বর্ষণ কি নিঃশব্দে আমাদের জীবনের মধ্যে অবতীর্ণ হতে থাকে না? এই পৌষের শীতের প্রভাতে দিক্‌প্রান্তের উপর থেকে একটি সূক্ষ্ম শুভ্র কুহেলিকার আচ্ছাদন যখন উঠে যায়, আমলকীকুঞ্জের ফলভারপূর্ণ কম্পিত শাখাগুলির মধ্যে উত্তর বায়ু সূর্য্যকিরণকে পাতায় পাতায় নৃত্য করাতে থাকে এবং সমস্ত দিন শীতের রৌদ্র এখানকার অবাধ-প্রসারিত মাঠের উপরকার সুদূরতাকে একটি অনির্ব্বচনীয় বাণীর দ্বারা ব্যাকুল করে তোলে, তখন এর ভিতর থেকে আর একটি গভীরতর আনন্দ-সাধনার স্মৃতি কি আমাদের হৃদয়ের মধ্যে ব্যাপ্ত হয়ে পড়ে না? একটি পবিত্র প্রভাব, একটি অপরূপ সৌন্দর্য্য, একটী পরম প্রেম কি ঋতুতে ঋতুতে ফল পুষ্প পল্লবের নব নব বিকাশে আমাদের সমস্ত অন্তঃকরণে তার অধিকার বিস্তার করচে না? নিশ্চয়ই করচে। কেননা এই খানেই যে একদিন সকলের চেয়ে বড় রহস্য নিকেতনের

একটি দ্বার খুলে গিয়েছে—এখানে গাছের তলায় প্রেমের সঙ্গে প্রেম মিলেছে, দুই আনন্দ এক হয়েছে—যেই এষঃ অস্য পরম আনন্দঃ যে ইনি ইহার পরমানন্দ সেই ইনি এবং এ কতদিন এইখানে মিলেছে—হঠাৎ কত উষার আলোয়, কত দিনের অবসানবেলায়, কত নিশীথ রাত্রের নিস্তব্ধ প্রহরে—প্রেমের সঙ্গে প্রেম, আনন্দের সঙ্গে আনন্দ! সেদিন যে দ্বার খোলা হয়েছে সেই দ্বারের সমুখে এসে আমরা দাঁড়িয়েছি, কিছুই কি শুন্‌তে পাব না? কাউকেই কি দেখা যাবে না? সেই মুক্ত দ্বারের সাম্‌নে আজ আমাদের উৎসবের মেলা বসেছে, ভিতর থেকে কি একটি আনন্দ গান বাহির হয়ে এসে আমাদের এই সমস্ত দিনের কলরবকে সুধাসিক্ত করে তুল্‌বে না? না, তা কখনই হতে পারে না। বিমুখ চিত্তও ফিরবে, পাষাণ হৃদয়ও গল্‌বে, শুষ্ক শাখাতেও ফুল ফুটে উঠবে। হে শান্তিনিকেতনের অধিদেবতা, পৃথিবীতে যেখানেই মানুষের চিত্ত বাধামুক্ত পরিপূর্ণ প্রেমের দ্বারা তোমাকে স্পর্শ করেছে সেখানেই অমৃতবর্ষণে একটি আশ্চর্য্য শক্তি সঞ্জাত হয়েছে—সে শক্তি কিছুতেই নষ্ট হয় না, সে শক্তি চারিদিকের গাছপালাকেও জড়িয়ে ওঠে, চারিদিকের বাতাসকে পূর্ণ করে। কিন্তু তোমার এই একটি আশ্চর্য্য লীলা, শক্তিকে তুমি আমাদের কাছে প্রত্যক্ষ করে রেখে দিতে চাও না। তোমার পৃথিবী আমাদের একটি প্রচণ্ড টানে টেনে রেখেছে, কিন্তু তার দড়িদড়া তার টানাটানি কিছুই চোখে পড়ে না—তোমার বাতাস আমাদের উপর যে ভার চাপিয়ে রেখেছে সেটি কম ভার নয়, কিন্তু বাতাসকে আমরা ভারী বলেই জানিনে; তোমার সূর্য্যালোক নানাপ্রকারে আমাদের উপর যে শক্তিপ্রয়োগ করচে যদি গণনা করতে যাই তার পরিমাণ দেখে আমরা স্তম্ভিত হয়ে যাই কিন্তু তাকে আমরা আলো বলেই জানি শক্তি বলে জানিনে। তোমার শক্তির উপরে তুমি এই একটি হুকুম জারি করেছ সে লুকিয়ে লুকিয়ে আমাদের কাজ করবে এবং দেখাবে যেন সে খেলা করচে।

কিন্তু তোমার এই আধিভৌতিক শক্তি যা আলো হয়ে আমাদের সাম্‌নে নানা রঙের ছবি আঁকচে, যা বাতাস হয়ে আমাদের কানে নানা সুরে গান করচে, যা বল্‌চে "আমি জল," বলে, আমাদের স্নান করাচ্চে, যা বল্‌চে আমি স্থল বলে আমাদের কোলে করে রেখেছে—যখন শক্তির সঙ্গে আমাদের জ্ঞানের যোগ হয়, যখন তাকে আমরা শক্তি বলেই জান্‌তে পারি—তখন তা'র ক্রিয়াকে আমরা অনেক বেশি করে অনেক বিচিত্র করে লাভ করি; তখন তোমার যে শক্তি আমাদের কাছে সম্পূর্ণ আত্মগোপন করে কাজ করছিল সে আর ন ততো বিজুগুপ্সতে—তখন বাষ্পের শক্তি আমাদের দূরে বহন করে বিদ্যুতের শক্তি আমাদের দুঃসাধ্য প্রয়োজন সকল সাধন করতে থাকে। তেমনি তোমার অধ্যাত্ম শক্তি আনন্দের প্রস্রবণ থেকে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠে এই আশ্রমটির মধ্যে আপনিই নিঃশব্দে কাজ করে যাচ্চে, দিনে দিনে ধীরে ধীরে, গভীরে গোপনে—কিন্তু সচেতন সাধনার দ্বারা যে মুহূর্ত্তে আমাদের বোধের সঙ্গে তার যোগ ঘটে যায় সেই মুহূর্ত্ত হতেই সেই শক্তির ক্রিয়া দেখতে দেখতে আমাদের জীবনের মধ্যে পরিব্যাপ্ত ও বিচিত্র হয়ে ওঠে। তখন সেই যে কেবল একলা কাজ করে তা

নয়, আমরাও তখন তাকে কাজে লাগাতে পারি। তখন তাতে আমাতে মিলে সে এক আশ্চর্য্য ব্যাপার হয়ে উঠ্‌তে থাকে। তখন যাকে কেবলমাত্র চোখে দেখ্‌তুম, কানে শুনতুম, অন্তর বাহিরের যোগে তার অনন্ত আনন্দরূপটি একেবারে প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে—সে আর ন ততো বিজুগুপ্‌সতে। সে ত কেবল বস্তু নয়, কেবল ধ্বনি নয়, সেই আনন্দ, সেই আনন্দ।

জ্ঞানের যোগে আমরা জগতে তোমার শক্তিরূপ দেখি, অধ্যাত্মযোগে জগতে তোমার আনন্দরূপ দেখ্‌তে পাই। তোমার সাধকের এই আশ্রমটির যে একটি আনন্দরূপ আছে সেইটি দেখতে পেলেই আমাদের আশ্রমবাসের সার্থকতা হবে। কিন্তু সেটি ত অচেতনভাবে হবে না, সেটি ত মুখ ফিরিয়ে থাক্‌লে পাব না। হে যোগী, তুমি যে আমাদের দিক থেকেও যোগ চাও—জ্ঞানের যোগ, প্রেমের যোগ, কর্ম্মের যোগ। আমরা শক্তির দ্বারাই তোমার শক্তিকে পাব ভিক্ষার দ্বারা নয় এই তোমার অভিপ্রায়। তোমার জগতে যে ভিক্ষুকতা করে সেই সব চেয়ে বঞ্চিত হয়। যে সাধক আত্মার শক্তিকে জাগ্রত করে' আত্মানং পরিপশ্যতি, ন ততো বিজুগুপ্সতে; সে এমনি পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে যে আপনাকে আর গোপন করতে পারে না। আজ উৎসবের দিনে তোমার কাছে সেই শক্তির দীক্ষা আমরা গ্রহণ করব। আমরা আজ জাগ্রত হব, চিত্তকে সচেতন করব, হৃদয়কে নির্ম্মল করব, আমরা আজ যথার্থ ভাবে এই আশ্রমের মধ্যে প্রবেশ করব। আমরা এই আশ্রমকে গভীর করে, বৃহৎ করে, সত্য করে, ভূত ও ভবিষ্যতের সঙ্গে একে সংযুক্ত করে দেখব, যে সাধক এখানে তপস্যা করেছেন তাঁর আনন্দময় বাণী এর সর্ব্বত্র বিকীর্ণ হয়ে রয়েছে সেটি আমরা অন্তরের মধ্যে অনুভব করব—এবং তাঁর সেই জীবনপূর্ণ বাণীর দ্বারা বাহিত হয়ে এখানকার ছায়ায় এবং আলোকে, আকাশে এবং প্রান্তরে, কর্ম্মে এবং বিশ্রামে, আমাদের জীবন তোমার অচল আশ্রয়ে, নিবিড় প্রেমে, নিরতিশয় আনন্দে গিয়ে উত্তীর্ণ হবে এবং চন্দ্র সূর্য্য অগ্নি বায়ু তরুলতা পশুপক্ষী কীট পতঙ্গ সকলের মধ্যে তোমার গভীর শান্তি, উদার মঙ্গল ও প্রগাঢ় অদ্বৈতরস অনুভব করে শক্তিতে এবং ভক্তিতে সকল দিকেই পরিপূর্ণ হয়ে উঠ্‌তে থাকবে।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

স্বপ্ন-ভঙ্গ।

তখন গ্রামের পাঠশালায় পড়িতাম। পড়াশুনায় মোটেই ভাল ছিলাম না। গুরু-মহাশয়ের তর্জ্জন গর্জ্জনে সর্ব্বদাই অস্থির থাকিতে হইত। তবু শত তাড়নায় না কাঁদিয়া এবং লজ্জা না পাইয়া গুরুকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতাম। কিন্তু এমনটী বরাবর চলিল না, এমনও দিন আসিল যখন আমি বেত্রতাড়নে পূর্ব্বানমুভূত বেদনা পাইতে লাগিলাম এবং আমার বুদ্ধিহীনতায় আমার মর্ম্মদেশ নীরবে লজ্জাহত হইতে লাগিল। এই পরিবর্ত্তনের কারণও ছিল।

আমি বড় মাতৃভক্ত। মায়ের কাছে শত আব্দার করিয়া, নিত্য নূতন জিনিষের বায়না ধরিয়া তাঁহাকে স্নেহের অত্যাচারে বিব্রত রাখিতাম। খেলিতে খেলিতে হঠাৎ মায়ের কথা মনে পড়িলে আমার আর খেলা হইত না, চঞ্চল হাস্যদীপ্তি এক নিমেষের দম্‌কা বাতাসে একেবারে নিঃশেষে নিবিয়া যাইত, ধীরে ধীরে গৃহে ফিরিয়া আসিয়া মাকে সমস্ত গৃহকর্ম্ম হইতে ছিনাইয়া লইয়া তাঁহার বুকে মুখ লুকাইয়া যখন তখন রূপকথার জন্য আব্দার করিয়া বসিতাম। মা আমাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন কাজেই এ সবে তিনিও অত্যন্ত সুখী হইতেন।

কিন্তু চিরদিন কাহারো সমান যায় না, আমারও গেল না। একদিন সকালে ঘুম হইতে উঠিয়া দূর হইতে দেখিলাম মায়ের কোলে একটি কচি শিশু রহিয়াছে, বাড়ীর লোকে সে ঘরে আমাকে প্রবেশ করিতে দিল না। এক মাস দীর্ঘ দিনগুলি আমার বড় কষ্টে কাটিতে লাগিল, কিন্তু তবু তখনো দ্বারে দাঁড়াইয়া যখন তখন মায়ের স্নিগ্ধ দৃষ্টি-টুকু হৃদয়ে সঞ্চয় করিয়া যেখানে সেখানে হাস্যমুখে ছুটিয়া বেড়াইতে পারিতাম। যাহা হউক মাসটি দীর্ঘ হইলেও অন্যান্য মাসের ন্যায় সেটিও চলিয়া গেল। মাকে আবার কাছে পাইলাম। সে কি আনন্দ! সারারাত্রির বিনিদ্র ব্যাকুলতার পর পূজার প্রভাতের প্রথম অরুণরশ্মি দেখিয়া নববস্ত্র পরিধান সুখলোভী আমার বালচিত্তে যে আনন্দ বর্ষে বর্ষে পাইতাম, সুদীর্ঘ এক মাসের নির্ব্বাসন দুঃখের পর আমার মাকে পাওয়ার আনন্দের কাছে তাহাও অকিঞ্চিৎকর!

প্রথম আনন্দ-উচ্ছ্বাসের মুখে বুঝিতে পারি নাই, কিন্তু শীঘ্রই বুঝিতে লাগিলাম যে পুরাতন আর অক্ষুণ্ণ নাই, একটি নবীন অতিথি আসিয়া আমার ও মায়ের মধ্যে ব্যবধান রচনা করিয়া বসিয়াছে। আমার সকল আনন্দের উৎস এবং সকল দুঃখের যেখানে অবসান সেই বুকটি ত খোকাই একচেটিয়া করিয়া লইয়াছে, এমন কি মায়ের অঞ্চলের আড়ালটুকু হইতেও আমি ধীরে ধীরে বঞ্চিত হইতে লাগিলাম। কাছে আসিলে মা বলি-তেন "পড়াশুনা নেই? সারাদিন পাছে পাছে ঘুরঘুর! যা পড়্‌গে"; রূপকথার জন্য আব্দার করিলে বলিতেন—"না, এখন খোকাকে দুধ খাওয়াতে হ'বে।" তিনি তখন আর আমাকে নিজহাতে খাওয়াইয়া দেন না, নিজহাতে সাজাইয়া স্কুলে পাঠান না, নিত্য নূতন জিনিষ দিয়া আমাকে ভুলাইতে চেষ্টা করেন না। রুদ্ধ অভিমানে আমার বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল, মার কাছ হইতে দূরে দূরে সরিয়া থাকিতে লাগিলাম, দেখি কভু আদর করিয়া আমাকে ডাকিয়া পাঠান কি না,—কিন্তু নিত্য নূতন আশা নিত্য নূতন নিরাশা ব্যথায় পীড়িত হইতে লাগিল।

মাতার স্নেহ হইতে বঞ্চিত হইয়াছি মনে করার যে দুঃখ তাহা আমার চিত্তকে সকল দুঃখের প্রতিই সচেতন করিয়া তুলিল। আমার হৃদয়ের বিরাট দুঃখপাথারের শীতস্পর্শে সামান্য আঘাতের আবছায়াটুকু পর্য্যন্ত অশ্রুজলে গলিয়া আসিয়া আমার অন্তরদেশ মথিত করিয়া তুলিতে লাগিল। দুঃখই দুঃখকে টানিয়া আনে, জলই বাষ্পকে জলে পরিণত করিয়া দেয়,—আঘাত

যতই সামান্য হউক না তাহাকে আমার হৃদয়-সঞ্চিত দুঃখরসে সিঞ্চিত করিয়া আমি প্রতিমুহূর্ত্তেই নূতন করিয়া পুরাতন দুঃখকে অনুভব করিতে লাগিলাম। এই সময়ই গুরু-মহাশয়ের বেত্রতাড়ন এবং আমার বুদ্ধিহীনতা আমাকে সুগভীর সান্ত্বনাহীন অব্যক্ত বেদনায় ব্যথিত করিয়া তুলিতে লাগিল।

(২)

পাঠে অমনোযোগ বাড়িতে লাগিল, সারাদিন একটা অস্তিত্বহীন মলিন ছায়ার মত বাড়ীর এখানে সেখানে ঘুরিয়া ফিরিতে লাগিলাম। সেদিন স্কুলে গুরুমহাশয় অনেক-গুলি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন, তার মধ্যে কয়েকটা অতি সাধারণ কথা ছিল, কিন্তু আমি একটিরও উত্তর দিতে পারিলাম না। একটি নীচের শ্রেণীর ছাত্রকে ডাকিয়া আনিয়া জিজ্ঞাসা করায় সে সব গুলিরই উত্তর অনর্গল বলিয়া গেল। সমস্ত ছাত্রের সামনে আমি লজ্জায় এতটুকু হইয়া গেলাম,—তাতেও নিস্তার নাই, গুরুমহাশয়ের লাঞ্ছনদণ্ড সেইদিন আমার পিঠে একটি চিরস্থায়ী লাঞ্ছন আঁকিয়া দিল। সেদিন আমার চোখে একফোঁটা জল না দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইল। আমি গৃহে ফিরিয়া আসিয়া রক্তাক্ত জামাটি কোনো প্রকারে চাদরটি দিয়া ঢাকিয়া সকলের দৃষ্টি এড়াইয়া রাখিলাম। মনে করিলাম সকলের নিকট হইতে গোপন রাখিয়া এই দারুণ কথাটি আজ মায়ের নিকটই প্রথম ফাঁশ করিব। বাড়ী আসিতেই বাবা বলিলেন "কি রে বিনু! তোর মুখ আজ এত শুক্‌নো দেখাচ্ছে কেন?" আমি যথাসম্ভব দৃঢ়তার সহিত বলিলাম "না কিছু নয়।" বাবা বলিলেন "কাপড় ছেড়ে কাজ নেই, ওপাড়ার মাখনকে বলে আয় ত সে রাত্রে এখানে খাবে, সে আবার বেরিয়ে যাবে, যা শীগ্‌গীর্ যা।" আমি যন্ত্রচালিতের মত মাখনদাকে রাত্রে আমাদের বাড়ীতে খাইতে বলিয়া আসিলাম। কিন্তু সব সময় সেই একই কথা আমার অন্তরে জাগিতেছিল। পিঠের অসহ্য যন্ত্রণা আজ আমাকে বিন্দু-মাত্রও কষ্ট দিতে পারিতেছিল না, বরং তাহা যেন হৃদয়ের দুঃখের সহিত সমান তাল রাখিয়া আমাকে একটি অপূর্ব্ব তৃপ্তি দিতে লাগিল। আমার কেবলি মনে হইতে-ছিল—আজ মা আমাকে কখনো উপেক্ষা করিবেন না, আমার এই আঘাতের জন্য আজ মা চোখের জল না ফেলিয়া নিশ্চয়ই থাকিতে পারিবেন না, হয় ত খোকাকে নামাইয়া তাঁহার বিনুকে আজ উচ্ছ্বসিত স্নেহে বুকে চাপিয়া ধরিবেন। পিঠে হাত দিয়া দেখিলাম যে তখনো অল্প অল্প রক্ত ঝরি-তেছে এবং ক্ষতস্থান গভীরও বটে। মা আপন মনে খোকার জন্য একটি জামা তৈয়ার করিতে নিযুক্ত আছেন দেখিতে পাইলাম। আমি কিছুক্ষণ তাঁহার কাছে কাছে ঘুরিলাম ফিরিলাম, কিন্তু তাঁহার দৃষ্টি আমার উপর পতিত হইল না, তিনি আমাকে ডাকিলেন না। অন্যদিন হইলে তখনই চলিয়া যাইতাম, কিন্তু সেদিন আমার হৃদয় যেভাবে পূর্ণ ছিল, মার পায়ে তাকে নিঃশেষে শূন্য করিয়া না দিয়া ফিরিয়া যাইতে পারিলাম না। কিছুক্ষণ ব্যর্থ চেষ্টার পর মার সম্মুখে আসিয়া নীরবে দাঁড়াইলাম, কিন্তু তবুও তিনি মুখ তুলিয়া চাহিলেন না। আমার চক্ষু ছল ছল করিয়া

উঠিল, কাঁদ কাঁদ স্বরে বলিয়া ফেলিলাম "মা আমাকে মাষ্টারে আজ বড় মেরেছে।" মা মুখ না তুলিয়াই বলিলেন "বেশ করেছে, মারবে না! পড়া শুনা নেই সারাদিন ঘুরে ঘুরে বেড়ান'! যা' রাত্রে খাবার জন্ত বাগান থেকে দুটো বেগুন নিয়ে আয় ত, মাখন খাবে, সকাল সকাল রাঁধতে হবে।" সেখানে আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলাম না, পুত্তলিকার মত বাগানের দিকে চলিলাম, কিসের জন্ত যাইতেছি কিছুই বুঝিলাম না। বাগানে একটা বড় কাঁঠাল গাছের নীচে ছায়ায় গিয়া বসিয়া পড়িলাম। বুক ফুলিয়া উঠিল, চোখে দরদর ধারে অশ্রু বহিতে লাগিল, মাটির উপর মুখ রাখিয়া অনেকক্ষণ গুমিয়া গুমিয়া কাঁদিলাম। কাঁদিয়া কাঁদিয়া কতকটা শান্ত হইলে পিঠে ভয়ানক যন্ত্রণা অনুভব করিতে লাগিলাম। মনে হইতে লাগিল—এখন যদি মরি তবে বেশ হয়, আচ্ছা এমন যদি হয় যে এই গাছ হইতে একটা সাপ আসিয়া আমাকে কাম্‌ড়ায় তবু কি মা আসিয়া আমাকে কোলে নেবেন না! ভাবিতে ভাবিতে আমার ঘুম আসিল। কতক্ষণ অর্দ্ধনিদ্রিত অবস্থায় ছিলাম জানি না।

হঠাৎ পায়ের দিকে যেন কি একটা যন্ত্রণা অনুভব করিয়া জাগিয়া উঠিলাম। যা ভাবিয়াছি তাই! একটা সাপ আমার পায়ের উপর দিয়া হিড়্ হিড়্ করিয়া চলিয়া গেল। কি হইয়াছে কোথায় কামড়াইয়াছে আমার আর দেখিবার শক্তি ছিল না। 'মাগো' বলিয়া চীৎকার করিয়া প্রাঙ্গণের দিকে দৌড়িয়া আসিয়া ঢলিয়া পড়িলাম। সন্ধ্যাকাশের রক্তিম আলো দেখিতে দেখিতে ম্লান হইয়া আসিল, বাড়ীর সকলে 'কি হইয়াছে' বলিয়া বাহিরে ছুটিয়া আসিলেন, মা আসিয়া আকুলকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি হইয়াছে?" "সাপে কাম্‌ড়াইয়াছে" অস্ফুট স্বরে এই কথাটুকু বলিয়াছিলাম মনে আছে। দেখিতে দেখিতে সর্ব্বশরীর বিষে দগ্ধ হইয়া যাইতে লাগিল, মুখে কথা রুদ্ধ হইয়া গেল, ধ্বনি ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া কখন কোথায় থামিয়া গেল, বিশ্বরঙ্গভূমির উপর কে একটি তিমির যবনিকা টানিয়া দিল,—তার পর কোথায় কি হইল আমি কিছুই জানিতে পারিলাম না।

(৩)

কতক্ষণ অথবা কয়দিন এইরূপ অবস্থায় ছিলাম জানি না। তার পর মনে হইতে লাগিল আমি যেন স্বপ্ন দেখিতেছি। যেন চারিদিকে বড় বড় ঢেউ খেলিতেছে; হাঙ্গর কুম্ভীর গুলা এখানে সেখানে ভাসিয়া উঠিতেছে, কোনোটা বা আমার কাছে আসিয়া আবার দূরে চলিয়া যাইতেছে; যেন চারিদিকে শ্যামল হিল্লোলিত শষ্যক্ষেত্র, মধ্য দিয়া একটা প্রকাণ্ড নদী আমাকে বহন করিয়া কোথায় ছুটিয়া চলিয়াছে; কখনো কখনো পারে কত ঘর দেখা যাইতেছে, কখনো বা মানুষ,—তাদের মধ্যে সকলেই যেন মার মত, বাবার মত, গুরুমহাশয়ের মত; আবার কখনও পার একেবারে মুছিয়া যাইতেছে, সেখানে নদী কত প্রশস্ত; কখনো যেন শান্ত নদী সূর্য্যালোকে ঝক্ ঝক্ করিয়া উঠিতেছে, কখনো বা উন্মাদ বাতাসের সঙ্গে খেলা করিয়া করিয়া ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিতেছে,

চারিদিক হইতে মনুষ্যের ক্ষীণ চীৎকার শুনা যাইতেছে; কখনও যেন স্বপ্ন চিত্রগুলি হঠাৎ বাতাসে মিলাইয়া গেল,—আবার সেই অন্ধকার!

একদিন যখন হঠাৎ চোখ মেলিলাম দেখি—আমাকে বাহিরে চাটাইয়ের উপর শোয়াইয়া এক ব্যক্তি আমার সর্ব্ব শরীরে হাত বুলাইতে বুলাইতে কি মন্ত্র আওড়াইতেছে। আমার চোখ মেলার সঙ্গে সঙ্গে চারিদিক হইতে অনেক লোকে সমস্বরে বলিয়া উঠিল "বাঁচিয়াছে, বাঁচিয়াছে!" আমি চারিদিকে ভয় চকিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখিলাম সকলের মুখই আমার নিকট অপরিচিত এবং ঘরদ্বার কেমন নূতন ধরণের, তখন এক ব্যক্তি একবাটি গরম দুধ আনিয়া আমাকে খাওয়াইয়া দিল। আমি যেন একটু বল পাইয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিতে চেষ্টা করিলাম। কিন্তু পারিলাম না। যে ব্যক্তি আমাকে দুধ দিয়াছিল সে আমাকে অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিল—তোমার বাড়ী কোথা, তোমার নাম কি, তোমার বাবার নাম কি ইত্যাদি। আমি তাহার দিকে ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিলাম, সে কি জিজ্ঞাসা করিতেছে আমি যেন ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। আমি যেন কি মনে আনিতে চেষ্টা করিলাম, মনে আসিল না, কাজেই সে ব্যক্তি কোনো প্রশ্নেরই আমার নিকট হইতে সদুত্তর পাইল না। সেই বাড়ীতে তিন চার দিন ছিলাম। তাঁহাদের নিকট হইতে শুনিলাম যে তারা নদীতীর হইতে তুলিয়া আনিয়া ওঝা ডাকাইয়া আমাকে বাঁচাইয়াছে। তার পর আরেকটি লোক আসিয়া আমাকে অন্য বাড়ীতে লইয়া গেল। সেখানে একটি ঘরে একা থাকিতাম, একা খাইতাম, তারা যা বলিত তাই করিতাম, এমন করিয়া কতদিন গেল জানি না।

সেখানে কত জায়গা হইতে কত লোক আসিয়া আমাকে কত কথা জিজ্ঞাসা করিত—আমি কিছুই উত্তর দিতে পারিতাম না। একদিন একজন একখানি বই আনিয়া আমাকে পড়িবার জন্য দিয়াছিল। বইটা খুলিয়া পড়িবার চেষ্টা করিতেই আমার বুকের ভিতরটা কাঁপিয়া উঠিল, কবেকার যেন কোন অতীতের একটা ভয-বিজড়িত স্মৃতির আভাস ছায়ার মত আমার মনে আসিল, কিন্তু অক্ষর গুলার সঙ্গে পরিচয় করিয়া উঠিতে পারিলাম না। আমার কাছে অনেক লোক দাঁড়াইয়াছিল,—তার মধ্যে একজন বলিল "শশি, আমি বলি নাই ও ভদ্র লোকের ছেলে; লেখাপড়া নিশ্চয়ই জানে কিন্তু কিছুই মনে আনতে পারছে না।" তারপর অনেকে অনেক কথা বলিল, আমার আর কিছুই মনে নাই।

এমনি করিয়া যে কত দিন, কত মাস, কত বৎসর গেল কিছুই বলিতে পারি না। চারিদিকে দেখিতাম কত মানুষ হাসিতেছে, খেলিতেছে, আমোদ করিতেছে, আমি সকলের মধ্যে নিঃসঙ্গ নিরাশ্রয়! চারিদিকে সুখে দুঃখে গ্রামের পরিবারগুলির একটির পর একটি করিয়া দিন চলিয়া যাইতেছে তাদের সহিত আমার কিছুরই যোগ নাই! বন্ধু বন্ধুকে আলিঙ্গন করিতেছে, পিতামাতা সন্তানকে আদর করিতেছে, পল্লীঘাটে শত নরনারী আসিয়া জমা হইতেছে, গ্রাম্য পথ দিয়া কত লোক হাটে যাইতেছে, রাখাল

গরুগুলিকে লইয়া মাঠের দিকে চলিয়াছে; এগুলি আমার চোখে স্বপ্নচিত্রের মত খেলিতে থাকে। চারিদিকের ছন্দোপ্রবাহের মধ্যে আমি যেন একটি শুব্ধ যতি, চারিদিকের মিলন-মূঢ় শরীরীগুলার মধ্যে আমি যেন একটি অস্তিত্ব হীন ছায়া? হায়! হায়! চারিদিকের পুলক-নিগূঢ় তাড়িত-বহনের মাঝে আমিই শুধু যেন একটা প্রকাণ্ড পাথর!

এমন করিয়া আর কতদিন থাকা যায়! একদিন কি যেন একটা অজানা কিছুর অস্ফুট আকাঙ্ক্ষা আমাকে বিশ্বজগতের মধ্যে বাহির করিয়া দিল; সে বাড়ী হইতে একদিন কাহাকে কিছু না বলিয়া পলাইয়া গেলাম। তার পর এখানে সেখানে ঘুরিয়া কতদিন কত বৎসর কাটাইয়াছি,—কত রোদে অনাবৃত মাঠে হাঁটিয়া চলিয়াছি, কত শীতে গাছতলায় সারারাত কাঁপিয়াছি, সারাদিন উপবাসের পর কত গৃহস্থের পাতের অন্নরাশির দিকে সতৃষ্ণ নয়নে তাকাইয়াছি। কেহ দয়া করিয়া কোনোদিন কিছু খাইতে দিয়াছে, কোনো দিন বা একেবারে না খাইয়া কাটিয়াছে, কোনদিন গাছ হইতে ফল পাড়িয়া খাইয়াছি। একদিন এক আখের ক্ষেত চড়াও করিয়া বসিয়াছিলাম, কিন্তু খাইবার আগেই একব্যক্তি আসিয়া আমাকে ধরিয়া ফেলিল, বলিল "ব্যাটা বরাবর আখ খেয়ে ক্ষেতের একটা কোণকে একেবারে খালি করে দিয়েছে, আজ ব্যাটাকে ধরেছি!" তারপর থানাওয়ালা আসিয়া আমাকে থানায় নিয়া আটক্ করিয়া রাখে, সেখানে পেট ভরিয়া খাইতে পাইতাম। কিছুদিন পরে সেখান হইতে ছাড়িয়া দিল, আবার ঘুরিয়া ফিরিতে লাগিলাম! পথে ঘাটে যেখানেই আমি কোনো স্ত্রীলোককে দেখিতাম আমার একটা অভ্যাস ছিল তার দিকে অনেকক্ষণ ধরিয়া না চাহিয়া কেমন থাকিতে পারিতাম না। কতদিন কতজনে কত কি বলিয়াছে কিন্তু আমার ইচ্ছাকে বাধা দিতে পারিতাম না।

(৪)

সেদিন দুইদিন ধরিয়া না খাইয়া অনবরত হাঁটিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম। সামনে একটা পুকুর ছিল। তার পারে একটা গাছতলায় গিয়া বসিলাম। তখন বেলা পড়িয়া আসিয়াছে, সূর্য্য পশ্চিমদিগন্তের গাছগুলার উপর নামিয়া আসিয়াছে, আলোছায়া দুটি বোনের মত হাত ধরাধরি করিয়া আমার চারিপাশে যেন আমাকে উপেক্ষা করিয়াই নীরব কল গীতিকে খেলিয়া ফিরিতেছে। তখন গ্রামের বধূগণ একটি একটি করিয়া ঘাটে আসিতেছে, আমি অভ্যাস মত সেদিনও সকলকে আগ্রহ সহকারে লক্ষ্য করিয়া দেখিতেছিলাম। হঠাৎ একটি স্ত্রীলোকের মুখ দেখিয়া আমি চমকিয়া উঠিলাম, সে যেন কোন জন্মান্তরের ক্ষীণ স্মৃতির মত আমার বক্ষ কাঁপাইয়া তুলিল, যে যেন কোন সুদূরের একটি প্রিয় আলয়ের ছায়াময় স্বপ্ন-আভাস আমার প্রাণে জাগাইয়া তুলিল। আমি আমার অজ্ঞাতসারে সেই স্ত্রীলোকটির অনুসরণ করিতে লাগিলাম। একটা বাড়ীর কাছে আসিতেই আমার মন হইতে যেন একটা বহুদিনের আবরণ খসিয়া পড়িল, এক নিমেষেই বাড়ীটিকে আমার চিরপরিচিত মনে হইতে লাগিল। যদিও এখানে সেখানে অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে,

তথাপি ষষ্ঠীতলার বেলগাছটি, বাড়ীর বাগানের পুরানো কাঁঠাল গাছটি এবং চণ্ডীমণ্ডপ না থাকিলেও তাহার পাশের সেই বহুদিনের জীর্ণ মন্দিরটিকে এক মুহূর্ত্তেই আমি চিনিয়া লইলাম। আমি আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলাম না, দৌড়িয়া গিয়া সেই বেলগাছটিকে বুকে চাপিয়া ধরিলাম, সেখান হইতে বেগে কাঁঠাল গাছটির দিকে ছুটিলাম; তাহার নীচে গিয়া যেমন একদিন শুইয়াছিলাম তেমনি শুইলাম; আমার বুকের রক্ত দ্রুত তালে নৃত্য করিতে লাগিল, আমার মনে যে তখন কি হইতেছিল তা কি করিয়া বুঝাইব! তাহার পর বাগান হইতে বাহির হইয়া বাড়ীর ভিতরের দিকে ছুটিলাম—কে একজন আমাকে মানা করিতে লাগিল আমি শুনিলাম না। ভিতরে ঢুকিয়া প্রাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়াইতেই দেখি একটি স্ত্রীলোক হাতে কি নিয়া একঘর হইতে অন্যঘরে যাইতেছেন, তাঁহার পশ্চাতে একটি দশ বার বৎসরের বালক। আমি দেখিবামাত্রই স্ত্রীলোকটিকে চিনিতে পারিলাম, বাহ্যজ্ঞান শূন্য হইয়া তাঁহার দিকে ছুটিয়া চলিলাম, তিনি সচকিত হইয়া সরিয়া গেলেন, আমি তাঁর পদতলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলাম!

মূর্চ্ছা ভাঙ্গিলে দেখি কয়েক জন লোক আমার কাছে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। তাহারা আমার বাড়ী কোথা, এখানে আসিয়াছি কেন, বাড়ীর ভিতরে ঢুকিয়াছি কেন ইত্যাদি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। আমি চারিদিকে চাহিয়া লইয়া বলিলাম "এই আমার বাড়ী"। বারান্দায় দণ্ডায়মানা রমণীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলাম,—"আর এই আমার মা।" সকলে তখন উচ্চস্বরে হাসিয়া উঠিল, বলিল "পাগল দেখ্‌ছি।" আমি তখন আমাকে সাপে কাম্‌ড়ানর কথা হইতে অন্য সমস্ত বৃত্তান্তই বলিলাম। তাহারা এ ওর দিকে চাহিয়া আমার এবং আমার পিতার নাম জিজ্ঞাসা করিল। পিতার নাম বলিতে পারিলাম না, আমার নাম বলিলাম 'হারাণ'। তাহারা আবার হাসিল, বলিল "মরিয়াও কি কেহ কখন বাঁচে!"

দেখিতে দেখিতে গ্রামের লোক আসিয়া আমার চারিদিকে ভাঙ্গিয়া পড়িল। তার মধ্যে জত জনে কত কি যে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। একজন বলিয়া উঠিল "দু'দিনের সাপে-কাটা মরা ত কখনো ভাল হ'তে দেখিনি।" সেই সময়ে একজন আসিয়া আমার কাছে দাঁড়াইলে, তাঁহাকে আমার পিতা বলিয়া চিনিতে পারিলাম। আর একজন বৃদ্ধ আমার কাছে আসিয়া বলিলেন "বিনয় ফর্শা ছিল, এ ত কালো; তবে একটা কথা আমার কেমন কেমন ঠেক্‌ছে। বিনয়কে আমি যেন পিঠে একদিন খুব শক্ত মেরে-ছিলাম, এর পিঠেও একটা দাগ দেখা যাচ্ছে।" এমন সময় মা আসিতেছেন, শুনিয়া সকলে দূরে সরিয়া গেল। মা আসিলেন, আমি সকল ভুলিয়া তাঁর দিকে ব্যাকুলভাবে চাহিয়া রহিলাম। তিনি আমার পিঠ এবং চিবুকের নীচে কি লক্ষ্য করিয়া দেখিয়া চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন "এ যে আমারি বিনয় গো! গ্রামের লোকের মধ্যে তখন একটা কানাঘুষা শুনিতে পাইলাম। বাবা কি ভাবিয়া আসিয়া আমাকে

বাহিরে লইয়া চলিলেন, আমি যাইতে চাহিলাম না, কিন্তু তবু যাইতে হইল। তখন সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিয়াছে, অনেক রাত পর্য্যন্ত নানা রকম পরামর্শ আঁটিলেন।

পরদিন হইতে বাড়ীর লোকেরা বাহির ঘরে আনিয়া আমাকে তিন বেলা ভাত দিয়া যাইত, ভিতরে ঢুকা আমার পক্ষে নিষিদ্ধ হইল। সেই ঘরে আমি একা বসিয়া বসিয়া কত কি ভাবিতাম, কোনোদিন কান্না চাপিয়া রাখা আমার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিত। মাকে সব সময় দেখিতে চেষ্টা করিতাম, কিন্তু বড় একটা পাইতাম না, দেখিলেও তাহার কাছে ভিড়িতে আমার সাহস হইত না। তিনি চেষ্টা করিয়াই যেন আমার নিকট হইতে দূরে দূরে থাকিতেন। এক দিন আর সহ্য হইল না, বাড়ীর ভিতরে ছুটিয়া আসিয়া উঠানে পড়িয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিলাম। মা আসিয়া সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন "কেঁদনা বিনয়, সমাজের মধ্যে থেকে তোমাকে কি করে ঘরে আন্‌ব বল, তুমি কত লোকের ছোঁয়া খেয়েছ! বাহির ঘরে থাক, সেখানে বরাবর নিয়ম মত ভাত দিয়ে আস্‌ব।" হায়! আমি ত ভাতের কাঙ্গাল নাই, আমার ক্ষুধিত হৃদয়টিকে মা যদি একটিবার সেই আগেকার মত বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিতেন তবে যে তাহা অমৃত রসে পূরিয়া উঠিত, বিনয়ের সকল ক্ষুধা যে এক নিমেষে মিটিয়া যাইত!

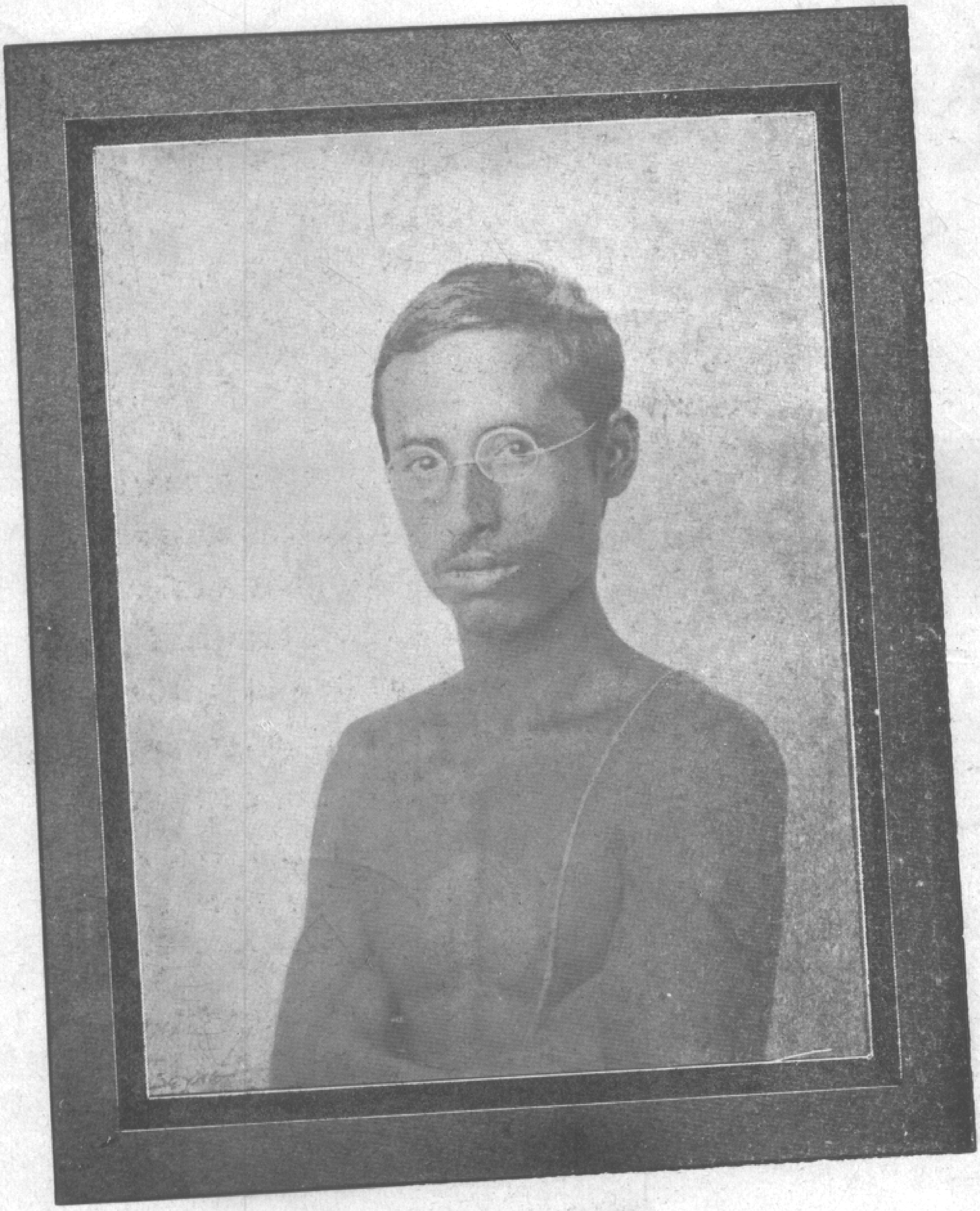
আর কিসের জন্য থাকিব বল! একদিন বাড়ী হইতে পলাইয়া গেলাম। আবার সেই উদ্‌ভ্রান্ত ভ্রমণ!

তার অনেক দিন পরে মা, বাবা একদিন খুঁজিয়া খুঁজিয়া গিয়া আমার কাছে উপস্থিত হইলেন। তাঁদের নিকট শুনিলাম যে আমার ছোট ভাইটি মারা গিয়াছে, তাঁহারা আমাকে লইয়া বিদেশে গিয়া বসবাস করিতে চাহেন। আমি তখন এক ভণ্ড সন্ন্যাসীর সঙ্গ লইয়াছিলাম, এবং তাহার দৃষ্টান্তে কুক্রিয়ারত হইয়া পড়িয়াছিলাম। সন্ন্যাসীর বেশ দিয়া ভুলাইয়া লোকের সর্ব্বনাশ করিতাম। পিতা মাতার সহিত যাইতে আমার তখন একটুও ইচ্ছা হইল না! তাঁহারা অনেক কান্নাকাটা করিলেন, শেষে আমাকে না পাইয়া ফিরিয়া গেলেন।

অনেক দিন পরে সন্ন্যাসী আমাকে ছাড়িয়া গেল। মার জন্য মন তখন আবার কাঁদিয়া উঠিল। খুঁজিয়া খুঁজিয়া আমাদের সেই গ্রামে আসিলাম, দেখিলাম ঘর দ্বার শূন্য পড়িয়া আছে, বাড়ীতে কেহ নাই। একটি লোকের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে তাঁহারা বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন, আর ফিরিবেন না,—কোথায় গিয়াছেন সে বলিতে পারিল না। আবার এই বিশাল বিশ্বজগতে একাকী নিরাশ্রয় অসহায় প্রাণী অন্তহীন উদ্দেশ্যহীন উদ্‌ভ্রান্ত ভ্রমণে বাহির হইয়া পড়িলাম। ইহার কভু শেষ হইবে কিনা কে জানে!

* * *

এই পর্য্যন্ত যাহা বলিতেছিলাম পাঠক সব ঠিকই মনে করিয়া আসিতেছেন দেখিতেছি। অবশ্য স্বপ্ন দেখিবার সময় আমিও তাহাই মনে করিতেছিলাম এবং চোখ মেলিয়াও এই ভুল শীঘ্র ভাঙ্গে নাই। কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই বুঝিলাম যে



সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

সবই মিথ্যা। কেবল সাপে কামড়াইয়াছিল ইহাই সত্য। দেখিলাম আমার পা দড়ি দিয়া শক্ত করিয়া বাঁধা রহিয়াছে, কাচের টুক্‌রা দিয়া দংশন স্থান কাটিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং সেখান হইতে কালো রক্ত ঝরিতেছে, ওঝা মন্ত্র আওড়াইতেছে, আমি উঠানে মায়ের কাছে শুইয়া রহিয়াছি। আমাকে সজ্ঞান দেখিয়া সকলে আনন্দে অধীর হইয়া উঠিলেন, মার চোখ দিয়া আনন্দাশ্রু বহিতে লাগিল। আমি স্বপ্নের কথা স্মরণ করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। আমাদের ও পাড়ার মধু ঘোষের ছেলে সর্পাঘাতে মারা গিয়াছিল, তাহাকে কোনো ওঝা ভাল করিতে না পারায় নদীতে ভাসাইয়া দেওয়া হয়, সে বাঁচিয়া অনেক দিন পর বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়াছিল, দেখিলাম তাহারই জীবনের অনেক ঘটনা আমার স্বপ্নের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে!

আমি সম্পূর্ণ ভাল হইয়া উঠিলাম। আমার স্বপ্নের কথা মাকে বলিলাম, মা খুব কাঁদিলেন। কাঁদিয়া আমাকে বক্ষে টানিয়া লইলেন, আমি সুখে অভিভূত হইয়া পড়িলাম। সেই হইতে আর কোন দিনই মাতার স্নেহের অভাব অনুভব করি নাই।

লেখকের বিড়ম্বনা।

১

এই, যখনি ঠিক খেতে বসি, একলা কিম্বা দলে,
ভাতে ডালে মাখি মুখে তুলি পূর্ণগ্রাস,—
ভাবের মাত্রা মগজটারে নাড়ে বিষম বলে,
—কত রঙ্গ-কথা, কাব্য গল্প যে ছাই পাঁশ!—
আহারটিকে রীতিমত শান্তভাবে সারি'
কাগজ হাতে লয়ে তাকাই হায় রে চারিদিশে,
কোথায় বা ভাব, কোথা কাব্য? ব্যর্থ ছলনারি
আক্রোশেতে চিত্ত আমার যায় যে ভেঙ্গে পিষে।

২

এই, ছুটির দিনে দুপুরবেলায়, খেলছি দাবাপাশা,
খেলার সনে, চলছে হুঁকা—সমাজতত্ত্ব কথা
মাথার মধ্যে তোলাপাড়া,—পরিপাটি খাসা—
সমাজেরি শুভ কিসে, কিসে বা তার ব্যথা!
খেলাভঙ্গে, ভাবের রঙ্গে কাগজ জোগাড় করি,
দোয়াতটাতে ভরি কালি, ধরি কমলটারে,
মাথায় রাখি উভয় হস্ত, এত ভেবে মরি!
অত যে ভাব,—কিছুই কি তার মনে পড়েনারে!

৩

এই আফিসেতে গলদ্‌ঘর্ম্ম কাগজপত্র ঘেঁটে,
সাহেব হাঁকে, বন্ধু ডাকে, বিষম হট্টগোলেই
ভাবের আঠা ভাবনাটাকে যেন ধরে এঁটে,
লিখবো ভাবি, ছুটি হয়ে একটু বসতে পেলেই!
বাড়ী ফিরে—কথাবার্ত্তা নয়কো—জ্বালি আলো,
কাগজপত্র সামনে নিয়ে, ভাবি দস্তুর মত।
এত চিন্তা-ভাবতরঙ্গ!—কোথায় হা সব গেলো!
ওমা, গাঢ়তর নিদ্রা কিনা করে অভিভূত!

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

পূর্ব্ববঙ্গের ষষ্ঠীব্রত।

পূর্ব্ব ময়মনসিংহে ষষ্ঠীব্রত হিন্দুনারীর একটি প্রধান ব্রত। ষষ্ঠীদেবী শিশুসন্তানের রক্ষাকর্ত্রী, সুতরাং ষষ্ঠীপূজা নারীর নিকট শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়াছে। জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লপক্ষের ষষ্ঠী তিথিতে পুরনারীগণ এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। ব্রতের পূর্ব্বদিন নারীগণ ৬০ গাছি দূর্ব্বা ৬০টী চাউল কলাগাছের সূতায় বাঁধিয়া প্রত্যেকে পৃথক পৃথক এক এক গুচ্ছ গ্রহণ করেন। একটা ডোঙ্গায় আম কাঁঠালের পাতার উপর কলা, দূর্ব্বা ফল ও জল রাখিয়া দিতে হয় এবং স্নানান্তে পূর্ব্বমুখে দণ্ডায়মানা ব্রতধারিণীর নাভিতে সেই দূর্ব্বা দ্বারা পাত্রস্থ জল দিতে হয়। পরে ঐ ডোঙ্গা আর নানাবিধ ফল ও কাপড় ইত্যাদি সমেত আর একখানা ডালা পূজার স্থলে রাখা হয়। ইহাকে পুত্র-ডালা বলে। ব্রতশেষে ঐ পাত্রের ফল ও ডালার বস্ত্র ইত্যাদি, পুত্র কন্যা এবং জামাতাকে দিতে হয়। ইহা ছাড়া চাউলের গুঁড়ায় প্রস্তুত সূতাবেষ্টিত একটী পুতুল পূজাস্থানে থাকে ইহাকে "আরিপুংটী" বলে। ব্রাহ্মণ পূজা করিলে পর ব্রতের কথা শুনিতে হয়। ব্রতকথা শেষ হইলে ব্রতধারিণী দূর্ব্বাগুচ্ছ হইতে এক এক গাছি দূর্ব্বা ও চাউল পুত্র কন্যা ও জামাতার মাথায় আশীর্ব্বাদ স্বরূপ প্রদান করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে "ষাট" "ষাট" শব্দ উচ্চারণ করিয়া থাকেন। ষাট দেওয়া শেষ হইলে (বায়না) বদল হয়। ব্রতের দিন অন্ন ভক্ষণ নিষিদ্ধ।

ব্রত কথা। এক ছিল গৃহস্থ। তার একমাত্র পুত্র। পুত্রের বিবাহ দিল। বিবাহের পর থেকে তার সংসারের আর উন্নতি নাই—গোয়ালে গরু মরে, 'বাতানে' মহিষ মরে, এইরূপে নানা অমঙ্গল ঘটতে লাগলো। কত দিন পরে পুত্রবধূ গর্ভবতী হলো—কিন্তু সন্তান জন্মাবার আগেই গর্ভ নষ্ট হলো। একবার দুইবার না ক্রমে ক্রমে ছয় বার গর্ভ নষ্ট হলো। গৃহস্থের মনে শান্তি নাই।

গৃহস্থের স্ত্রীর এক সই ছিল—গোয়ালিনী। গোয়ালিনী বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে আছে। একদিন কথায় কথায় গৃহস্থের স্ত্রী গোয়ালিনীকে বল্লে "সই তোদের দিন দিনই উন্নতি হচ্ছে আর আমাদের দুঃখের কথা কব কি? যে দিন থেকে ঐ বউটা ঘরে পা দিয়েছে সেদিন থেকে আমাদের ঘরে অলক্ষ্মী এসেছে। আজ এটা কাল ওটা একটা না একটা অমঙ্গল লেগেই আছে। তুমি কি কর সই যে তোমার এমন শ্রী"! গোয়ালিনী উত্তর করিল "বোন্ বছর বছর আমি ষষ্ঠীব্রত করি আর কিছু জানি না। তুমিও তোমার বউকে নিয়ে এব্রত কর সংসারের উন্নতি হবে।" গৃহস্থের স্ত্রী জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্ল ষষ্ঠীতে ব্রত আয়োজন করলেন।

তার পুত্রবধূ সব জিনিষ আগে চুরি করে খায় তাই তাকে সকলে "আরিপুংটী" বলে। সে বছরও ব্রতের আগে চুরি ক'রে খাওয়ায় তার ব্রত করা হলো না। এক বছর গেল, আবার বছর ফিরে এলো, গৃহস্থের স্ত্রী এবার পুত্রবধূর অজ্ঞাতে গোয়ালিনীর বাড়ীতে ব্রতের আয়োজন করলেন। ব্রতের দিন প্রাতে, ব্রতের সবই আয়োজন বাড়ীতে আনলেন এবং পুত্রবধূকে বেঁধে কাজকর্ম্ম করতে লাগলেন। পুত্রবধূর বাধ্য হয়ে ব্রতের জন্য উপবাসী থাকতে হোল। ব্রত শেষ ক'রে গৃহস্থের স্ত্রী গৃহে এসে দেখেন বধূর—"আলজিহ্বা" ঘরের পালা-খুঁটি বেড়ে ফেলেছে। তখন শাশুড়ী ২॥০ আঙ্গুল জিব রেখে আর সব কেটে দিলেন। ব্রত শেষ হল; দিন যায়, বৌ আছে থকে খায়, ক্রমে গর্ভবতী হলো—এবার—দশমাস দশ দিন পূর্ণ হলো,—তারপর একদিন বসে চরকা কাটতে কাটতে প্রসব বেদনা উঠল। শাশুড়ী এক গুটি সূতা ফেলে দিয়ে বল্লেন, যেখানে গিয়ে এই সূতো শেষ হবে সেই খানেই তোর সন্তান ভুমিষ্ঠ হবে। "আরিপুংটী" চলতে লাগলো,—যেতে—যেতে এক চণ্ডালের

শ্মশানে গিয়ে গুটি শেষ হল এবং তার একপুত্র জন্মাল। তখন শ্মশানের সমস্ত মরার বিছানা সংগ্রহ করেসে ছেলে কোলে করে বসে রইল। এমন সময় দেখে তাহার ছেলেকে নেওয়ার জন্য যমদূত সব ঘুরছে। কিন্তু মায়ের কোল থেকে যমদূত ত ছেলে নিতে পারে না তাই সহসা এক ঝাপটা বাতাস এসে ছেলেকে মায়ের কোল থেকে সরিয়ে ফেল্লে,—এই অবসরে যমদূতগণ ছেলে নিয়ে নিলে,—আরিপুংটি তাদের সঙ্গে সঙ্গে চল্লো। (মেয়েলি প্রবাদ এই যে মাতা বাম হস্তপদ দ্বারা সন্তানকে আগুলিয়া রাখিলে যমদূত তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। এই জন্য সন্তানের ব্যারাম হইলে জননী উক্তরূপে তাহাকে আগুলিয়া রাখেন।) যেতে যেতে পথে আরিপুংটীর সহিত এক গাভীর দেখা। গাভী বল্লে 'আরিপুংটী কই যাচ্ছ?' আরিপুংটী বল্লে 'আমার দুঃখের কথা বলতে ষষ্ঠীঠাকরুণের কাছে যাচ্ছি।' তাই শুনে গাই বল্লে "আমারও দুটা দুঃখের কথা আছে। দেখ আমার এত দুধ, তা মানুষ নেয় না, বাছুরে খায় না। বাঁটের বেদনায় আমি দিনরাত অস্থির। তোমার পায় ধরি আমার কথাটা ষষ্ঠীঠাকরুণকে বলো।" আরিপুংটী স্বীকার করে চল্লো। যেতে যেতে আরিপুংটী রৌদ্রে ক্লান্ত হয়ে এক আম গাছের নীচে বিশ্রাম করতে গেল। সেখানে আমগাছ জিজ্ঞাসা কল্লে "আরিপুংটী কই যাচ্ছ?" "ষষ্ঠী ঠাকরুণের কাছে দুঃখের কথা বলতে যাচ্ছি।" "আমারও দুটী কথা তাঁকে জিজ্ঞাসা করো। দেখ আমার কত ফল; কেউ খায় না, ঝড়ে পড়ে না, পক্ষীতে ধরে না; কি হলে আমার ফল লোকে খায় তাঁকে বলো।" আরিপুংটী স্বীকার করে চলতে লাগলো। যেতে যেতে এক ব্রাহ্মণের বাড়ীতে উপস্থিত। বাড়ীতে ব্রাহ্মণের যুবতী সাত কন্যার বিবাহ হয় না। ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করলে "আরিপুংটী কই যাস্?" আরিপুংটী বল্লে "আমি ষষ্ঠী ঠাকরুণের কাছে যাচ্ছি।" "তবে আমার দুইটী কথা বলিস—আমার সাত কন্যার বিবাহ হয় না, কি উপায়ে তাদের বিবাহ হবে ষষ্ঠীমাকে জিজ্ঞাসা করে বলে যাস। আরিপুংটী স্বীকার হয়ে চল্লো।

তার পর পথে এক বৃদ্ধার সঙ্গে দেখা। সে বল্লে "আরিপুংটী কই যাও।" "আমার দুঃখের কথা বলতে ষষ্ঠীমার কাছে যাই।" তবে আমার একটা কথা ব'লো। আমার চক্ষে জল নাই,—কি হ'লে আমার কান্না আসে—ষষ্ঠী ঠাকরুণকে জিজ্ঞাসা করে আমায় বলে যেও।

পরে এক কাঠুরের ও এক চূণওয়ালীর সঙ্গে দেখা। কাঠুরের মাথায় এক বোঝা কাঠ, কেউ কেনে না, মাথার বোঝাও নামে না; আর চূণ-ওয়ালীরও চূণও কেউ কেনে না মালসাও নামে না। আরিপুংটী তাদের দুঃখের কথাও শুনতে শুনতে চলিল। যেতে যেতে ক্রমে যমের বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত। তখন যমের মা একটা ফোড়ার বেদনায় অস্থির হয়ে অচেতন অবস্থায় বিছানায় পড়ে আছেন। আরিপুংটী ফোড়াটা গেলে দিয়ে পালঙ্কের নীচে লুকিয়ে রইল। যমের মা আরাম বোধ ক'রে বল্‌তে লাগলেন আমাকে যে এযন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিয়েছে সে পুত্রবতী হ'ক। তখন আরিপুংটী প্রণাম ক'রে বল্লে, "মা, আপনি আশীর্ব্বাদ করেছেন আমি পুত্রবতী হব কিন্তু ছয় পুত্রকে পূর্ব্বেই নিয়েছেন আর শেষের পুত্রটিকে আপনার দূতগণ নিয়েছে। এখন যদি আপনি আমার পুত্রদের ফিরিয়ে না দেন তা হলে আপনার বাক্য নিষ্ফল হবে।" যমের মা অগত্যা বাধ্য হয়ে তার পুত্র সাতটীকে ফিরিয়ে দিতে সম্মত হলেন আর কতকগুলি নিয়ম ব'লে দিয়ে বল্লেন যে 'এগুলি যদি পালন কর তবে তোমার পুত্র তোমার নিকট থাকবে নতুবা পুনরায় এখানে আসবে। বছর বছর জৈষ্ঠ মাসের শুক্ল ষষ্ঠীতে ব্রত করতে হবে, ব্রতের দিন মা ছেলেকে তৈল মাখাবে না, ধোপার কাপড় পড়তে দেবে না, জল ভাত খেতে দেবে না।' এই বলে ছেলেদের তার মায়ের সঙ্গে যেতে বল্লেন। বিদায় হবার সময় আরিপুংটী পথের লোকদের কথাগুলি তাঁকে বলায় ষষ্ঠীঠাকরুণ বল্লেন "আরিপুংটী যাবার বেলায় ব্রাহ্মণকে বলো "শীঘ্রই তার মেয়েদের বিবাহ হবে। তা মেয়েরা পুরুষকে দেখে

হেসেছিল এজন্য তাদের এই দশা। গাভীকে বলো এক বামুন দেবসেবার জন্য দুধ নিতে এসেছিল তখন দুধ দেয়নি দুধ চুরি করে রেখেছিল এ জন্য তার এই দশা। এখন একজন ব্রাহ্মণকে ডেকে দুধ দিলেই তার এ দুঃখ দুর হবে। আম গাছকে বলো;—এক বামুন দেবসেবার জন্য একটী পাকা আম নিতে চেয়েছিল,—গাছ বোঁটা শক্ত করে ধরেছিল বলে বামুন আম নিতে পারে নাই তাই তার এদশা। এখন ব্রাহ্মণ ডেকে আম তাঁকে দিলেই দুঃখ যাবে। বৃদ্ধাকে বলো তার কাঁদবার দিন অতি নিকট, তখন কাঁদতে কাঁদতে তার চক্ষে ঘা হবে। কাঠুরিয়া ও চুণওয়ালিকে বলো ব্রাহ্মণ দেখে দান করলেই তাদের কষ্ট দূর হবে, লোকে চুণ ও কাঠ কিনবে।” তখন আরিপুংটী পুত্রদের নিয়ে ষষ্ঠীমাকে প্রণাম করে বিদায় নিলেন। ফেরবার সময় পথে পথে সকলকে খবর দিয়ে গিলেন। আরিপুংটী একেবারে সাত ছেলে নিয়ে শ্বশুর শাশুড়ীর ঘরে এলেন; নাতি দেখে তাঁদের আনন্দ ধরল না। এইরূপ কতদিন যায়, আবার ষষ্ঠীব্রত এল। এবার "আরিপুংটী" নিজেই ব্রতের আয়োজন করলেন। ব্রতের দিন তার ছেলেরা তেল চাইলে, মা দিলেন না, ছোট ছেলেটী অন্য স্থান থেকে তেল নিলে, ধোপার কাপড় মার নিকট না পেয়ে অন্য স্থান থেকে পরলে। এইরূপ নিয়ম ভঙ্গ করে যমের বাড়ী চল্লো। মাও সঙ্গে সঙ্গে গেলেন। পুত্র ষষ্ঠীঠাকরুণকে প্রণাম করে দাঁড়ালো আরিপুংটীও প্রণাম করেন দাঁড়ালো।

ষষ্ঠীঠাকরুণ সব কথা শুনে বল্লেন "যখন তুমি নিজে ব্রতনিয়ম পালন করেছ তখন তোমার পুত্র তুমি পাবে। তবে আরো কয়টী নিয়ম পালন করতে হবে। তোমার এই ছেলের নাম রাখ গোবিন্দ; এবং একটা রূপার বালা দিয়ে বল্লেন; যে মেয়ের হাতে এই বালা লাগবে তার সঙ্গে এই ছেলের বিবাহ দিও। ছয় দফা বাজনা, ছয় ঝাঁক হুলু ইত্যাদি ছয় ছয় ক'রে সব ক'রো। আর বিবাহের দিন যখন ছেলেকে নাপিত কামাবে তখন ছেলে নাপিতের কাণ কেটে দিলে, নাপিত যেন বলে—

'যাইট যাইট কাণ গেলে পাইবাম
যাইটীর পুত গোবিন্দ গেলে কই পাইবাম।'

পরে শ্বশুর বাড়ী যাওয়ার সময় গৃহস্থের পাকা ধান-ক্ষেত ভেঙ্গে যাবে, তখন গৃহস্থ যেন বলে—

'যাইট যাইট এক ক্ষেত গেলে আর ক্ষেত পাইবাম
যাইটীর পুত গোবিন্দ গেলে কই পাইবাম।'

এই সব নিয়ম রক্ষা ক'রে তোমার ছেলের বিবাহ দিলে তার উপর আমার আর কোন অধিকার থাকবে না তোমার পুত্র নিয়ে তুমি চির-কাল সুখে থাকবে।" আরিপুংটী বাড়ী গিয়ে খুঁজতে খুঁজতে ঐ ব্রাহ্মণের ছোট কন্যার হাতে বালা লাগল। তখন তার সাত কন্যার সহিত তার সাত পুত্রের বিবাহ হয়ে গেল। সুখে দিন যেতে লাগল। আর সেই হতে ষষ্ঠীঠাকরুণের মাহাত্ম্য-প্রচার হোল। স্ত্রীলোকেরা পুত্র কামনায় ষষ্ঠীব্রত করতে লাগল।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ মজুমদার।

স্মরণে।

সে ত আজ কত দিন,—তুমি এসেছিলে
চির-পরিচিত সম মোর গৃহতলে,—
নিতান্ত সহজ ভাবে শুধু একদিনে
কেমন আপন করি নিলে সর্ব্ব জনে!
শ্যাম সূত্র-রেখা-সম এক মালিকায়
আমার সংসারখানি বাঁধিলে ধরায়;
উদার গভীর প্রেমে—স্বামী এক-সুরে—
বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন রাগ রাখিলে যে ধরে!
টুটালে স্বার্থের গণ্ডি, দেখালে জগৎ
কি সুখ পুলকে ভরা—বিচিত্র—মহৎ!
তুমি আজ গেছ, তবু তব পুণ্যবলে
তোমার সংসারখানি আজো স্থির চলে!—
—হে মোর গৃহের লক্ষ্মি, সন্তান-জননি,
জীবনের ধ্রুবতারা হে চির-কল্যাণি!

শ্রীসুধীরচন্দ্র মজুমদার।

ভোজরাজ ও ধাররাজ্য।

(পূর্ব্বসংখ্যার অনুবৃত্তি)

লেলে মহোদয় বলেন, অর্জ্জুন বর্ম্মদেব ধাররাজবংশের কুলপ্রতিষ্ঠাতা উপেন্দ্র হইতে ঊনবিংশতি এবং সুবিখ্যাত ভোজদেব হইতে দশম স্থানীয়। কিন্তু আমাদিগের সংগৃহীত ধারবংশের রাজাবলী হইতে লেলে মহাশয়ের উক্ত উক্তি সপ্রমাণ করিবার পক্ষে যথেষ্ট উপাদান সঞ্চিত হয় নাই। কর্ণেল টড্ বলেন, প্রমারবংশীয় ভোজনামক তিন জন নরপতি ধারসিংহাসনে ক্রমশঃ অধিষ্ঠিত ছিলেন। প্রথম দুই জন সম্বন্ধে আমরা বিশেষ কিছুই অবগত হইতে পারি নাই। টডের তৃতীয় ভোজই এখানকার আলোচনার বিষয়। তিনি বলেন, 'হিন্দু সাহিত্যে ভোজ প্রমার ও তাঁহার নবরত্নের নাম অবিনশ্বর হইয়া রহিয়াছে।' কোন ভোজ যে নবরত্নের আশ্রয়দাতা, তাহা তিনি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারেন নাই। কিন্তু তাঁহার সময় নির্দ্ধারণ হইতে বিচার করিতে গেলে অনুমান হয়, তদুল্লিখিত প্রথম ভোজই হয়ত আমাদিগের অনুসন্ধেয় বিক্রমাদিত্য, নবরত্নের প্রবাদমূলক আরোপ তাঁহাতেই সম্ভাবিত। পূর্ব্বে দেখা গিয়াছে কর্ণেল টডের সময়নির্ব্বাচন সর্ব্বত্র ভ্রান্তিশূন্য নহে এবং তাঁহার প্রথম ভোজের সময় যে আরও প্রাচীন হইতে পারে না, তাহার অকাট্য প্রমাণ নাই। যে বিক্রমাদিত্য শকগণকে বিতাড়িত করিয়া 'শকারি' আখ্যা লাভ করেন, তাঁহার সময় পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক টড্‌নির্দ্দিষ্ট প্রথম ভোজের সময়েই নির্ণীত হয়, কারণ শকাধিপত্য নিবারক কোহরুর যুদ্ধ ঐ সময়ে হওয়াই সম্ভাবিত। টড্ অপর ভোজ দ্বয়ের সম্বন্ধে অধিক কিছু না বলিয়া 'মুঞ্জপুত্র (? ভ্রাতুষ্পুত্র) ভোজের সময় সুন্দররূপে নির্দ্ধারিত হইয়াছে,' রাজস্থানে জোরের সহিত এই কথাই বলিয়াছেন। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে বিক্রমাদিত্যও ভোজের ন্যায় প্রমারবংশ সমুদ্ভূত *। টড্ বিক্রমাদিত্যকে তুয়ার-বংশীয় বলিয়াই স্বীকার করেন, এবং তাঁহার ভোজত্রয় সকলেই প্রমার বংশোদ্ভূত। † কিন্তু স্থানান্তরে তিনি উজ্জয়িনী ও ধারের নরপতি-

* 'Vikramajeet, the champion of Brahmanism was a Powar according to the common accounts.'—Captain Cunningham's History of the Sikhs, ch. II, p. 26. Footnote. পোয়ার বা পুয়ার প্রমারেরই অপভ্রষ্ট প্রচলিত রূপান্তর মাত্র।

† 'Indraprastha was conquered by Vicramaditya Tuar of Oojein......(Vicramaditya) who transferred the seat of imperial power from Indraprastha to Avante or Oojein from which time it became the first meridian of the Hindu astronomy'—Rajasthan Vol. I., Intro., ch. III., pp. 46, 48.

'Salivahana the conqueror of Vicramaditya was a Takshak, and his era set aside that of the Tuar in the Dekhan.' [Ib. Intro. ch. VII, p. 87. টডের উক্ত তিনটি মন্তব্যের ঐতিহাসিক উপযোগিতা নিশ্চয় করা কঠিন। তাঁহার মীমাংসা অনুসারে শালিবাহন কর্ত্তৃক বিক্রমাদিত্য-বিজয় সত্য হইলে, ঐতিহাসিক গবেষণায় যুগান্তরের আবির্ভাব হইবে সন্দেহ নাই। ইহাতেও তাঁহার সময় খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে গিয়া পড়ায়, তাঁহার প্রাচীনত্ব অক্ষুণ্ণই থাকিয়া যাইতেছে। নচেৎ বিক্রমসংবৎকে অত্যন্ত পিছাইয়া দেওয়ায় শকাব্দ সম্বন্ধেও সেইরূপ একটা কিছু বোঝা পড়া করিয়া লইতে হয়; নতুবা কর্ণেলের উক্তি ভ্রান্ত প্রতিপন্ন হয়।

গণকে অনেক সময়ে এক বংশীভূত স্বীকার করিয়া, আরও কতকগুলি নূতন প্রতিজ্ঞার অবতারণা করিয়াছেন। চিতোর সন্নিহিত মানসরোবরতীরে মৌর্য্যরাজগণের যে খোদিত লিপি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহাতে তিনি রাজা ভীমকে মালবের অধীশ্বর এবং অবন্তী বা উজ্জয়িনীর নরপতি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাতে রাজা ভোজ তাঁহারই বংশধর বলিয়া কীৰ্ত্তিত হইয়াছেন। ইনি আমাদিগের প্রস্তাবিত ভোজ নহেন,—বাপ্পা রাওয়ের সমসাময়িক রাজা মানের পিতা। ইনিই সম্ভবতঃ টডের দ্বিতীয় ভোজ, কারণ তাঁহার গণনা অনুসারে, দ্বিতীয় ভোজ ৭৩১ সংবতে বৰ্ত্তমান ছিলেন। এদিকে বাপ্পারাও ৭৮০ সংবতে মোরিবংশীয় মানরাজকে নিহত করিয়া, চিতোরের সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই মানের পিতার সময়, সুতরাং, ৭২১ সংবৎ হওয়াই সঙ্গত। এই মোরি বা মৌর্য্যবংশ যে প্রমারবংশের একটি শাখা মাত্র, তাহা টড্ মহোদয় পুনঃ পুনঃ স্বীকার করিয়াছেন।* তাহাতে বোধ হয়, টড্ মহোদয় ধার বা উজ্জয়িনীর ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে তাদৃশ সাবধানতা ও পূর্ব্বাপর সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে সমর্থ হন নাই। সুতরাং প্রমারবংশের উল্লেখ সত্ত্বেও প্রথম ভোজকে বিক্রমাদিত্যরূপে গ্রহণ করিলে নিতান্ত অসঙ্গত হয় না, কারণ তাঁহার কুলনির্ব্বাচন খ্যাতনামা ঐতিহাসিকগণের পক্ষেও বিতর্ক শূন্য নহে। কানিংহাম তাঁহাকে বিশ্বামিত্রের ন্যায় ব্রাহ্মণ পদলিপ্সু বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আমাদিগের প্রস্তাবিত টডের তৃতীয় ভোজ স্বয়ং বিদ্বান্ এবং একজন বিদ্যোৎসাহী নরপতি ছিলেন; তাঁহার বাক্যপদীয়, ভোজবৃত্তি প্রভৃতি গ্রন্থ, ভোজশালা ('ভোজরাজা-কী নিসাল') অর্থাৎ ভোজরাজের বিদ্যালয় ও তৎ-সন্নিহিত সরস্বতীকূপ ('অকিল কুই') অদ্যাপি বৰ্ত্তমান। সম্ভবতঃ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে সমস্ত স্বনামধন্য পণ্ডিতমণ্ডলি আবির্ভূত হইয়া খ্যাতনামা বিক্রমাদিত্যের বা ভোজের সভা-পণ্ডিতগণ স্ব স্ব আশ্রয়দাতার আশ্রয়াধীন বলিয়া প্রচার করিয়া তাঁহার গৌরববর্দ্ধন করিয়া-গিয়াছেন। নচেৎ বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের অন্ত-র্নিবিষ্ট বলিয়া যে ধন্বন্তরি, ক্ষপণক, অমরসিংহ, শঙ্কু, বেতালভট্ট, ঘটকর্পর, কালিদাস, বরাহমিহির, বররুচি প্রভৃতি পণ্ডিতগণের নামোল্লেখ করা হয়, বিক্রমাদিত্যের সময়ে দূরে থাক, কোন এক শতাব্দী মধ্যে তাঁহারা সকলে বৰ্ত্তমান ছিলেন বলিয়াও

---

* 'Chitore at this period was held by a Mori prince of the Pramar race, the ancient lords of Malwa, then paramount sovereigns of Hindusthan.'—Rajasthan I., Mewar, ch II., p. 211.

'From the inscription it is evident that Chitore was an appanage of Oojein, the seat of the Pramar empire. Its monarch Chandragupta (Mori) degraded into the barbar (Marya) tribe was the descendent of Srenica, prince of Rajgriha, who according to Jain work *Calpoodrum Calka*, flourished in the year 477 before Vicramaditya and from whom Chandragupta was the thirteenth in descent.'—Ib, p. 230.

টডের এই শেষ উক্তিটি ঐতিহাসিক তথ্যরূপে প্রমাণিত হইলে, পাটলিপুত্রের মৌর্য্যবংশের ইতিহাস-সংকলনেও যথেষ্ট সহায়তা করিবে। আমরা চন্দ্রগুপ্তবিষয়ক আলোচনায় এ তত্ত্ব নির্ণয়ে সমর্থ হই নাই।

প্রমাণ করা যায় না। বিক্রমাদিত্যের সময় নির্দ্ধারণে গোল উপস্থিত হওয়ার ইহাও একটা সামান্য কারণ নহে। কি বিক্রম কি ভোজ— কাহারও সময়েই সমগ্র নবরত্নের অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায় না। সুতরাং 'বিক্রমের নবরত্ন' যে ভিত্তিহীন স্তুতি গানমাত্র, ইহাই অনুমিত হয় এমন কি কালিদাসও ভোজের সভাপণ্ডিত ছিলেন কি না তাহাও সংশয়ের মধ্যে আসিয়া পড়ে।* কারণ কালিদাস খৃষ্টাবির্ভাবের বহু পূর্ব্বের না হইলেও, পরের লোক নহেন, ইহা একরূপ স্থির হইয়াছে, সুতরাং তাঁহার পক্ষে একাদশ শতাব্দীর ভোজের সভায় কেন, টডের ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভোজের সভাপ্পতি হওয়াও সম্ভবপর নহে। ইহাতে বোধ হয়, বিক্রমাদিত্য সম্বন্ধীয় কিম্বদন্তীগুলি, ভোজের বিদ্যানুরাগিতা প্রভৃতি কারণেই, তাঁহাতে আরোপিত হইয়া থাকিবে। এতদ্ব্যতীত অপর কোন মূলভিত্তি অবলম্বন করিয়া এরূপ করা হইয়াছে কিনা, তাহা নিশ্চয় করা আদৌ সহজ নহে। কিন্তু আমাদিগের চির পরিচিত পরম্পরাগত বিক্রমাদিত্য সম্বন্ধীয় ঐতিহ্য ভোজে আরোপিত হইলেও, বিক্রমাদিত্য ও ধারপতি ভোজ যে অভিন্ন ব্যক্তি তাহা কোন মতেই প্রতিপাদিত হয় না। কর্ণেল টড্ বিক্রমাদিত্যকে ইন্দ্রপ্রস্থবিজয়ী

---

* প্রবাদ আছে, ভোজ নূতন শ্লোক শ্রবণ করাইতে পারিলে লক্ষমুদ্রা পারিতোষিক দিবেন, এই ঘোষণা-বাক্য প্রচার করিলে, কবিগণ দলে দলে উপস্থিত হইয়া সভাস্থিত শ্রুতিধরগণের দৌরাত্ম্যে স্বরচিত শ্লোকগুলির পুরাতনত্ব প্রতিপাদন হইতে দেখিয়া ভগ্নমনোরথ হইতে লাগিলেন। মহাকবি কালিদাস ইহা অবগত হইয়া, অতি সামান্য একটি কবিতা আবৃত্তি করিয়া, রাজসভায় প্রবেশাধিকার লাভ করার পর, নিম্নলিখিত শ্লোক পাঠ করিয়া রাজাকে ও চতুর সভাপণ্ডিতগণকে অতি সঙ্কট অবস্থায় পাতিত করেন।

স্বস্তি শ্রীভোজরাজ ত্রিভুবন বিজয়ী ধার্ম্মিকঃ সত্যবাদী
পিত্রা তে মে গৃহীতা নবনবতিযুতা রত্নকোটির্ম্মদীয়া।
তাং ত্বং মে দেহি শীঘ্রং সকল বুধজনৈর্জ্ঞায়তে সত্যমেতৎ
নো বা জানন্তি কেচিন্নবকৃতমিতি চেদ্ দেহি লক্ষং ততো মে।

এই ভোজ পরিবর্ত্তী শ্লোকে শ্রীকর্ণাট বসুন্ধরাধিপ' রূপে বর্ণিত। সুতরাং আমাদিগের আলোচ্য ভোজের সহিত ইঁহার কোন সম্বন্ধ স্বীকার করা যায় না।

কথিত আছে, ভোজ মহিষীও পরম বিদুষী ছিলেন এবং পাণ্ডিত্যাভিমান বশতঃ প্রকাশ্য সভায় পণ্ডিত-দিগের উপর অবমাননাসূচক উদ্ধত বাক্য প্রয়োগেও লজ্জাবোধ করিতেন না। কালিদাসের কবিত্ব পরিচয় পাইয়া তিনি নিম্নলিখিত শ্লোক রচনা করেন।

একোঽভূন্নলিনাৎ ততশ্চ পুলিনাৎ বল্মিকতশ্চাপরঃ
তে সর্ব্বে কবয়স্ত্রিলোকগুরব স্তেভ্যোনমস্কুর্ম্মহে॥
অর্ব্বাঞ্চো যদি গদ্যপদ্য রচনৈশ্চেতশ্চমৎ কুর্ব্বতে
তেষাম্মূর্দ্ধ্নি দধামি বামচরণং কর্ণাটরাজপ্রিয়া॥

ইহাতে তিনি আপনাকে 'কর্ণাটরাজপ্রিয়া' বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। ইনি উপরিলিখিত প্রবাদ কথিত কালিদাসের অধমর্ণ ভোজেরই পত্নী হইবেন, সুতরাং আমাদিগের প্রস্তাবিত ভোজের সহিত ইঁহার কোন সম্বন্ধ নাই।

এবং পক্ষান্তরে শালিবাহনকে বিক্রমাদিত্য বিজয়ী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু ভিন্সেণ্ট স্মিথ প্রমুখ প্রাচীন হিন্দুরাজত্বের আধুনিক ঐতিহাসিকগণ, বিক্রমাদিত্যের ন্যায়, শালিবাহনের অস্তিত্বেও সম্পূর্ণ সন্দিহান। এরূপ অবস্থায় উপকথার আবরণ উন্মোচন করিয়া যতদিনে যথার্থ বিক্রমচরিতের উদ্ধার সাধিত না হইতেছে, ততদিনে ভারতের প্রাচীন ইতিবৃত্ত সংকলনপ্রয়াস তাদৃশ ফলোপদায়ক হইবে বলিয়া আশা করা যায় না। কারণ বিক্রমাদিত্য বিষয়ক ঐতিহ্যের সত্যাসত্যের উপরই প্রাচীন ভারতেতিহাসের উপাদান, গবেষণা ও তত্ত্ব সমূহ অত্যধিক পরিমাণে নির্ভর করিতেছে। ভারতবর্ষে সময় নির্দ্দেশ প্রধানতঃ বিক্রমসংবৎ সাহায্যেই সমাহিত হইয়া থাকে, সুতরাং বিক্রম সময়কে কেন্দ্ররূপে অবলম্বন না করিলে, প্রাচীন কালের ঘটনাবলীর পৌর্ব্বাপর্য্য নির্দ্ধারণও একরূপ দুঃসাধ্য। এরূপ স্থলে প্রত্যেক লেখক এবং প্রত্যেক ঐতিহাসিকের সংবৎপ্রতিষ্ঠাতা বিক্রমাদিত্যের কাল নির্ব্বাচন ও ইতিবৃত্ত সংকলনে যত্নবান হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

মহমুদ গজনবীর ভারত আক্রমণের অব্যবহিত পরেই ভোজ ধারসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী নরপতি নেহরওয়ালা বা অনিহলওয়ারা পত্তন প্রভৃতি অবরোধের সময় মুসলমানদিগের অভিযান প্রতিরোধ করিবার জন্য অভ্যুত্থিত হইয়াছিলেন, কি সম্পূর্ণ ঔদাসীন্য অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। ভোজের মৃত্যুর পর তাঁহার স্ববংশীয় ও নিকট আত্মীয় উদয়াদিত্য ধারসিংহাসনে অধিরোহণ করেন, এবং স্বদেশের অরাজকতা নিবারণ করিয়া, ভারতের বহিঃশত্রু দমনার্থ অন্যান্য রাজন্যবর্গের সহিত আজমীরের বিশালদেবের পতাকামূলে একত্রিত হন। উদয়াদিত্যের বংশধর যশোবর্ম্মের পৌত্রের ধার শাসন সময়েই সম্ভবতঃ ভারতে মুসলমানরাজত্বের প্রতিষ্ঠাতা শাহাবুদ্দীন মহম্মদ গোরী ভারত আক্রমণ করেন। কনোজাধিপতি ভারতকলঙ্ক জয়চন্দ্রের বিদ্বেষপ্রসূত সাহায্যে চৌহানবীর পৃথ্বীরাজ এই ভারতবিধ্বংসী অগ্নিকুণ্ডে প্রথম আহুতিরূপে প্রদত্ত হন এবং সেই মহাপাপ ক্ষালণার্থ রাঠোররাজ পবিত্রসলিলা নদী গর্ভে নিমজ্জিত হইয়া দেশদ্রোহীর শেষ পুরস্কারের হস্ত হইতে স্বয়ং রক্ষা পাইলেও, জয়চন্দ্রের পাপে গোরীর হস্তেই তাঁহার স্ত্রী পুত্রের অশেষ দুর্দ্দশা ঘটে। কারণ তিরৌরীক্ষেত্রে পৃথ্বীরাজ পরাজিত হইলে, গোরী তদীয় নিমন্ত্রণকারী কনোজরাজের সম্মানবর্দ্ধনার্থ প্রস্থিত হইলে, হতভাগ্য জয়চন্দ্র রাজ্য, ঐশ্বর্য্য, দাসদাসী, মহিষী, রাজবধূ সমস্তই অতিথি সৎকারের জন্য উৎসর্গ করিয়া, অবশেষে যমুনাগর্ভেই আত্মবিসর্জ্জন করিতে বাধ্য হন। এই শাহাবুদ্দীনের অভিযান কালে ধাররাজ্যও পরস্পর বিদ্বেষ ও প্রতিহিংসানলে জ্বলিতেছিল, সুতরাং যে ধাররাজ্য বিক্রমসংবতের প্রথম হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত ভোজের পূর্ব্বপুরুষ ও প্রথমপুরুষগণের শাসনগৌরবে উন্নতমস্তক ছিল, কেবল আত্মকলহেই তাহা খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে সমগ্র মালবের সহিত মুসলমানদিগের করকবলে পতিত হয়। ১৩৮৭ খৃষ্টাব্দে

সুলতান দিলাওয়ার গোরী মালবদেশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন তিনি ১৪০১ খৃষ্টাব্দে স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়া শাহ উপাধি গ্রহণ করেন। ১৪০৫ খৃষ্টাব্দে হোশাং শাহ গোরী ধার হইতে দশ ক্রোশ উত্তরে মাণ্ডুর প্রাচীন দুর্গে তাঁহার রাজধানী স্থানান্তরিত করেন, এবং এই সময় হইতেই পুনরায় মাণ্ডুর গৌরব বৃদ্ধি পাইতে থাকে। হোশাংশাহ যে জুম্মামসজিদ নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করেন তাহাই মাণ্ডুর সর্ব্বাপেক্ষা রমণীয় স্থপতিকার্য্য,—ফর্গুসন প্রমুখ মনীষীগণ এইরূপ নির্ণয় করিয়াছেন। ১৫৩৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মালব স্বাধীন মুসলমান-রাজ্য ছিল। পরে ১৫৭০ খৃষ্টাব্দ মোগল কেশরী আকবর কর্ত্তৃক রাজবাহাদুরের পরাজয়ের পর, মালব দিল্লীর অধীনস্থ একটি পৃথক শাসন বিভাগ (সুবা) রূপে নির্ণীত হয়। * মাণ্ডু পাঠান শাসনাধীন থাকিয়া যে গৌরবলাভে সমর্থ হইয়াছিল, তাহা এই সময় হইতে নষ্ট হইতে আরম্ভ হয়।

কিন্তু ১৬১৭ খৃষ্টাব্দে জাহাঙ্গীর সাময়িক অবস্থানের জন্য কতকগুলি সৌধের জীর্ণ সংস্কার করেন। অতঃপর আওরঙ্গজেবও ১৬৬৮ খৃঃ অব্দে একটি প্রাচীন তোরণ পুনর্নির্ম্মাণ করিয়া তাহাকে 'আলমগীর দরওয়াজা' নামে অভিহিত করেন। তদবধি ইহার ধ্বংসসাধনের প্রতিরোধ করিতে কেহই চেষ্টা না করায়, মাণ্ডু ক্রমশঃ অসভ্য ভীল ও বন্যপশুগণের আশ্রয় স্থল হইয়া উঠে। অবশেষে খৃষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মহারাষ্ট্রকুলতিলক মহারাজ শিবাজীর পৌত্র সাহু মহারাজের শাসন সময়ে পবার অর্থাৎ প্রমার বংশীয় উদাজী রাও মুসলমান কবল হইতে মালবের উদ্ধার সাধন করেন। অতঃপর ধার ও দেওয়াস্ দুইটি পৃথক্ মহারাষ্ট্র রাজ্যে পরিণত হইয়া, অদ্যাপি প্রাচীন প্রমার বংশের পারম্পর্য্য ও গৌরব রক্ষা করিয়া আসিতেছে। ইহারা এক্ষণেও ইংরাজ সাম্রাজ্যের করদ মিত্র রাজ্যরূপে স্ব স্ব স্বাতন্ত্র্য

---

* জেমস্ ফর্গুসনের মতে মালবজয় ১৫৬৮ খৃঃ অব্দে সমাহিত হয়। তাঁহার গণনা অনুসারে সুলতানগণ নিম্নলিখিত ক্রমে রাজত্ব করেন :—

সুলতান দিলাওয়ার গোরী	১৪০১—১৪০৫ খৃঃ অঃ
সুলতান হোশাংশাহ গোরী	১৪০৫—১৪৩২ „
সুলতান গজনী খাঁ	১৪৩২—১৪৩৫ „
মহমুদ খাঁ (চিতোরের রাণাকুম্ভের সমসাময়িক)	১৪৩৫—১৪৬৯ „
সুলতান গিয়াসউদ্দীন	১৪৬৯—১৫১২ „
সুলতান মহমুদ (দ্বিতীয়)	১৫১২—১৫৩৪ „

ইহার পর হইতে মালব আকবর কর্ত্তৃক পরাজিত হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত গুজরাতের সহিত সন্নিবিষ্ট হইয়া থাকে। মাণ্ডুর নিকটে নর্ম্মদা উপত্যকার সমীপবর্ত্তী পর্ব্বতগাত্রে আকবর কর্ত্তৃক পরাজিত রাজবাহাদুরের ভগ্নাবশিষ্ট প্রাসাদ বিদ্যমান রহিয়াছে।

ফর্গুসন মহোদয়ের ন্যায় একজন অক্লান্ত পরিশ্রমী স্থপত্যবিজ্ঞানবিশারদও ধারের প্রত্নতত্ত্ববিষয়ক কোন নূতন তথ্য আবিষ্কারে সমর্থ হ'ন নাই।

আংশিকরূপে অব্যাহত রাখিতে পারিয়াছে। ভারতের এই অধঃপতনের যুগেও ধাররাজ্যের প্রাচীন সিংহাসনে প্রমার বংশীয় রাজাই অধিষ্ঠিত থাকিয়া ভোজ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ প্রাচীন প্রমারগণের কীর্ত্তি কলাপ লোক সমূহের গোচরীভূত করিতে যত্নবান হইয়াছেন; এবং রামমন্দির ও কৃষকগণের পল্লী স্থাপনাদির দ্বারা মাণ্ডুর দুর্গমতা অপনোদন করিয়া অনুসন্ধিৎসুগণের আশীর্ব্বাদ ভাজন হইয়াছেন। মহারাষ্ট্রীয়দিগের অধিকারের পর হইতে, ইহার স্থাপত্য ও পুরাতত্ত্বের দিকে ইংরাজদিগেরও দৃষ্টি আকৃষ্ট হইতে আরম্ভ হইয়াছে। তাহার ফলে ১৮৪৪, ১৮৫৩, ও অবশেষে ১৮৯৫-৬ খৃঃ অব্দে বহুবিধ পুস্তক প্রবন্ধাদি প্রকাশের পর মাণ্ডুর ঐতিহাসিকত্ব সমুদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়েছে। * এবং এই আন্দোলন ও আলোচনার ফলে, ইংরাজরাজ ইহার গৃহাদির জীর্ণ সংস্কারের ভার গ্রহণ করিয়াছেন। মাণ্ডুর হিন্দোলামহল, জাহাজমহল, সিতারেপাক প্রভৃতি স্থানগুলি বিশেষ উল্লেখ যোগ্য।

ধারের ভোজশালা মহম্মদ শাহ খিলজি কর্ত্তৃক ১৪৫৭ খৃঃ অব্দে বা তাহার ৫০ বৎসর পূর্ব্বে মস্‌জিদ্‌রূপে পরিণত হয়। মৌলানা কমল-উদ্দীন নামক জনৈক মুসলমান ইহাতে সমাহিত হওয়ায়, ইহা পরবর্ত্তী কালে কমল মৌলা-মস্‌জিদ আখ্যা লাভ করিলেও, স্থানীয় হিন্দুগণের মধ্যে এখনও ভোজরাজের বিদ্যালয় (ভোজ রাজা কি নিসাল) নামেই সমধিক পরিচিত রহিয়াছে। এতদ্ব্যতীত ধারনগরে লাট মস্‌জিদ নামে আর একটি সুগঠিত ভজনালয় আছে। ধারের রাজপ্রাসাদের সমীপবর্ত্তী 'হাতীখান' নামক স্থানে কূপ খনন সময়ে বহু সংখ্যক প্রস্তরমূর্ত্তি ও প্রাচীন দ্রব্য সমূহ আবিষ্কৃত হইয়াছে। মূর্ত্তিগুলির অধিকাংশই জৈন প্রতিমা, তাহার কতকগুলি এখনও ধারের এজেন্সী ভবনে সংরক্ষিত রহিয়াছে। ইহাতে দেখা যাইতেছে, ধারে একাধারে হিন্দু, জৈন, মুসলমান সকলেরই প্রাচীন গৌরব চিহ্ন বিদ্যমান। এই হেতু বর্ত্তমান ধাররাজের পূর্ব্ববর্ত্তী মহারাজের সময় হইতে, প্রাচীন স্মরণীয় পদার্থগুলির সংরক্ষণ বিষয়ে ধাররাজ্যেরও দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়া, অনুসন্ধান ও সংগ্রহ চলিতেছে, এবং হিন্দুমুসলমানগণের খোদিতলিপি ও হিন্দু জৈনদিগের দেবমূর্ত্তি সংগৃহীত হইয়া একটি সাধারণ প্রদর্শিনীতে স্থাপিত হইতেছে। জৈন মূর্ত্তিগুলির বাহুল্য হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মালবে জৈন ধর্ম্মের প্রাধান্য সূচিত হয়। এতদ্ব্যতীত উন, মান্ধাতা এবং উজ্জয়িনীতে প্রমার শাসন সময়ের কতকগুলি সংস্কৃতানুশাসন কাশীনাথ কৃষ্ণ লেলে মহোদয় কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত হইয়াছে। ধারের ভোজ-

* The palaces of Mandu are, however, perhaps even more remarkable than its mosques. Of these the principal is called the Jehaj Mahal, from its being situated between two great tanks almost literally in the water, like a "ship." It is so covered with vegetation that it is almost impossible to sketch or photograph it, but its mass and picturesque outline makes it one of the most remarkable edifices of its date; very unlike the refined elegance afterwards introduced by the Moguls but well worthy of being the residence of an independent Pathan chief of a warrior state.—James Fergusson's Indian & Eastern Architecture Bk VII, ch. VI, p. 543.

শালার ন্যায় উন ও উজ্জয়িনীতেও বর্ণমালা-বিষয়ক সংকেত প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, এবং মান্ধাতায় কতকগুলি তাম্রশাসনে পরবর্ত্তী প্রমারগণের বংশানুক্রমণী লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। এগুলির পাঠোদ্ধার হইলে ধাররাজ্যের প্রাচীন ইতিহাস সংকলনের বিশেষ সুযোগ উপস্থিত হইবে বলিয়া আশা করা যায়। এই তাম্র-লিপিগুলির সময় ১২৬১ খৃঃ অঃ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ধাররাজ্যের শিক্ষাবিভাগের পর্য্যবেক্ষক লেলেমহোদয়ের যত্নে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আবিষ্কৃত ও সংগৃহীত হইয়াছে। (ক) ধারের লৌহস্তম্ভত্রয় সম্বন্ধে সমালোচনার পর স্থির হইয়াছে, ইহারা সম্ভবতঃ ভোজ বা অপর কোন প্রমার কর্ত্তৃক জয়স্তম্ভরূপে উত্তোলিত একটি সমগ্র সুদীর্ঘ স্তম্ভের ভগ্ন অংশ মাত্র। দিল্লীর লৌহস্তম্ভ * ব্যতীত লৌহ শিল্পের এরূপ বিস্ময় কর ব্যাপার অন্যত্র দৃষ্টি-গোচর হয় না। (খ) ভোজশালায় খোদিত দুইটি সর্পবন্ধ ও (গ) পারিজাত মঞ্জরী বা জয়শ্রী নামক সংস্কৃত নাটকাংশ। লেলেমহোদয় সর্পবন্ধ দ্বয়ের বর্ণমালা, বিভক্তি, ও ধাতু প্রত্যয় ঘটিত ব্যাখ্যা এবং নাটকাংশের একটি সংক্ষিপ্তসার প্রকাশ করিয়া সাধারণের গোচরীভূত করিয়াছেন। (ঘ) ধারের বিস্তৃত ইতিহাস সংকলিত হইয়া তিন খণ্ডে প্রকাশিত হইতেছে। তাহার প্রথম ভাগে ৩০০ খৃঃ পূঃ হইতে চতুর্দ্দশ খৃষ্ট শতাব্দ পর্য্যন্ত মালবের প্রাচীন ইতিবৃত্ত গ্রথিত থাকিবে। বিক্রমাদিত্যের পুরাবৃত্ত সংগ্রহে হয়ত ইহা হইতে মহান্ সুযোগ উপস্থিত হইবে, এই আশায় আমরা ইহার আশু প্রচার প্রতীক্ষা করিতেছি। মুসলমানশাসিত মালবের

---

* দিল্লীর কুতবমিনারের লৌহস্তম্ভ ফর্গুসনের ন্যায় সমগ্র জগতের স্থপত্যবিজ্ঞানবিশারদেরও কিরূপ বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছে, নিম্নের বর্ণনায় তাহা বুঝা যায় :—

"It stands 22 ft. above the ground, aud as the depth under the pavement is now ascertained to be only 20 in., the total height is 23 ft. 8 in. Its diameter at the base is 16·4 in., at the capital 12·05 in. The capital is 3½ ft. high, and is sharply and clearly wrought into the Persian form that makes it look as if it belonged to an earlier period than it does; and it has the *amalaka* moulding which is indicative of considerable antiquity....My own impression is that it belongs to one of the Chandra Rajas of the Gupta dynasty either consequently to A. D. 363 or A. D. 400. Taking A. D. 400 as the mean date—and it certainly is not far from truth—it opens our eyes to an unsuspected state of affairs to find the Hindus at that age capable of forging a bar of iron larger than any that have been found even in Europe upto a very late date and not frequently even now.......It is almost equally startling to find that after an exposure to wind and rain for fourteen centuries, it is unrusted and the capital and inscription are as clear and as sharp now as when put up fourteen centuries ago."

"There is no mistake about the pillar being pure iron. Gen. Cunningham had a bit of it analysed in India by Dr. Murray, and another portion analysed in the School of Mines here by Dr. Percy. Both found pure malleable iron without any alloy." [Footnote on the above]—History of Indian aud Eastern Architecture, Bk. VII, ch. III. pp.507-8.

ইতিবৃত্ত দ্বিতীয় ভাগের, এবং মহারাষ্ট্রীয়গণের রাজ্যারম্ভ হইতে ধারের আধুনিক ইতিহাস তৃতীয় ভাগের বিষয়রূপে নির্ণীত হইয়াছে। ইহাতে আশা করা যায়, এই বিপুল গ্রন্থ সম্পূর্ণাকারে প্রকাশিত হইলে, ধার ও উজ্জয়িনী বিষয়ক অজ্ঞাত পূর্ব্ব অনেক পুরাতন তত্ত্ব নূতন অবগত হওয়া যাইবে। ভারতের অন্যান্য রাজন্যবর্গ যদি ধারের মহারাষ্ট্রীয়রাজের সদ্দৃষ্টান্তের অনুসরণ করেন, তাহা হইলে 'ভারতবাসীর ইতিহাস নাই' এই অমূলক অভিযোগে আমাদিগকে অযথা আত্মগ্লানি ভোগ করিতে হয় না। বস্তুতঃ ভারতেতিহাস সংকলনোপযোগী উপাদানের আদৌ অভাব নাই, কেবল আমাদিগের প্রকৃতিগত জড়তা এবং দেশমুখগণের উৎসাহাভাবই জাতীয় গৌরবোদ্দীপক ও স্বদেশানুরাগ বর্দ্ধক ইতিবৃত্ত সংগ্রহের পথ রোধ করিয়া আছে, এবং শুদ্ধ এই জন্যই আমাদিগকে জগতের সমক্ষে নতশির ও হেয় বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়া দিতেছে।

বারাণসী প্রবাসী
শ্রীললিতমোহন মুখোপাধ্যায়।

সমালোচনা।

বিক্রমপুরের ইতিহাস। শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রণীত। কলিকাতা ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্স হইতে শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত। কলিকাতা ভারতমিহির যন্ত্রে মুদ্রিত ডবল ক্রাউন ষোড়শাংশ ৪১২ পৃষ্ঠা, মূল্য ২॥০ টাকা। দেশের কথা ভাবিতে, দেশের কথা জানিতে, দেশের কথা লিখিতে যখন লোকের ইচ্ছা ও আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়, তখন তাহা দেশের উন্নতির লক্ষণ। যোগেন্দ্রবাবু এই বিপুলকায় গ্রন্থের উপাদান সংগ্রহ করিতে, সংগ্রহগুলি সুবিন্যস্ত করিতে, আখ্যানভাগ সুখপাঠ্য করিতে যে বিপুল পরিশ্রম ও আয়াস স্বীকার করিয়াছেন, এই গ্রন্থপাঠে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। যে দেশে পদ্মার মত নদী, যে দেশে ধর্ম্মবিপ্লব, যে দেশে বৈদেশিক রাজা, সে দেশের অধিবাসী ইতিহাস অপেক্ষা ইতিকথার অধিক পক্ষপাতী, সে দেশের ইতিহাস-সঙ্কলন কিরূপ শ্রমসাধ্য, তাহা সহজেই অনুমেয়। বিক্রমপুর সম্বন্ধে যাহা-কিছু বক্তব্য যোগেন্দ্রবাবু তাহার প্রায় সমস্তই এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

বিক্রমপুরের ইতিহাস বর্ত্তমান বাঙালীজাতির প্রথম ইতিহাস। বিক্রমপুরই বাঙ্‌লার প্রাচীন রাজধানী। বাঙালীর উপর বিক্রমপুরের প্রভাব কতদূর তাহা এই গ্রন্থ পাঠেই জানা যায়। প্রাচীন বাঙল দেশের জ্ঞানচর্চ্চা, শাস্ত্রালোচনা, ধর্ম্মানুষ্ঠান, চিকিৎসাবিদ্যা, স্থাপত্য বিদ্যা—"সভ্যতার" অঙ্গীভূত কলাগুলি কি ভাবে পরিণত হইয়াছিল, তাহাই বিক্রমপুরের ইতিহাস। বাঙালী রাজাদিগের কাহিনী বাঙালীর যুদ্ধকাহিনী, জাতীয়-সমাজের ইতিহাস কাহিনী পাঠ করিতে করিতে সত্য সত্যই মনে একটা আত্মপ্রসাদ অনুভব করা যায়!

চাঁদ ও কেদার রায়ের রণলীলা ও আত্মত্যাগের লীলাভূমি, সেন ও পাল রাজগণের কীর্ত্তিকাহিনীপূত রাজবাড়ীর মঠ, রাজ আদমের মসজিদ্‌শোভিত হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টীয় ও মুসলমান ধর্ম্মের সম্মিলনক্ষেত্র বিক্রমপুরের ঐতিহাসিক প্রসঙ্গ আমরা কয়জন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অবগত আছি! অথচ ইহাই বাঙালীর ইতিহাসের যথার্থ অস্থি-মজ্জা।

এই গ্রন্থে, গ্রন্থকার বিক্রমপুরের মুখোজ্জ্বলকারী সন্তানগণের—যাহার মধ্যে জগদ্বিখ্যাত জগদীশচন্দ্র অন্যতম,—পরিচয় সঙ্কলন, তৎপ্রদেশ প্রচলিত বার, ব্রত, আচার ব্যবহার, পোষাক পরিচ্ছদ, কৃষি শিল্প প্রভৃতির

প্রাচীন ও আধুনিক ইতিহাস সঙ্কলন করিয়া গ্রন্থখানি চিত্তাকর্ষক করিয়াছেন। তবে অনেক village Hampden বা inglorious Miltonএর নাম গ্রন্থের কলেবর অনাবশ্যক বৃদ্ধি করিয়াছে। দুইখানি সুরঞ্জিত মানচিত্র প্রায় ৪৫ খানি চিত্র, সুন্দর বাঁধাই গ্রন্থখানির মূল্য ও শোভা বৃদ্ধি করিয়াছে। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় এই গ্রন্থের সুন্দর, গবেষণাত্মক ভূমিকায় অনেক নূতন তথ্যের সমাবেশ করিয়া গ্রন্থখানির উপাদেয়তা বৃদ্ধি করিয়াছেন। যোগেন্দ্রবাবু এই গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া বাঙালীমাত্রেরই ধন্যবাদার্হ। এই গ্রন্থে একটি ক্ষুদ্র ত্রুটি, মানচিত্রগুলিতে "স্কেল" দেওয়া হয় নাই,—আর একটি প্রধান ত্রুটি অসঙ্গত ও অসংযত উচ্ছ্বাসগুলি বহু স্থানে রসভঙ্গ করিয়াছে।

শিবাজী ও মারাঠাজাতি। শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় প্রণীত। হিতবাদী লাইব্রেরী, শ্রীমনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত। হিতবাদী প্রেসে মুদ্রিত। ৮৫ পৃষ্ঠা, মূল্য আট ৷৷০ আনা। সুখের বিষয়, বঙ্গীয় সাহিত্যসেবীগণের দৃষ্টি ইতিহাসের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে। কিন্তু অধিকাংশ লেখক প্রায়ই ইতিহাসের বাহ্যবস্তু, রক্ত, মাংস লইয়াই ব্যস্ত;—অধিকাংশ গ্রন্থ, তাই, খৃষ্টাব্দ, যুদ্ধ বিগ্রহের বর্ণনায় পরিপূর্ণ। অবশ্য এ কথা বলিতেছি না যে ঐতিহাসিক ঘটনা বা তারিখের কোন মূল্য নাই। ঐতিহাসিক তথ্যের মূল্য যথেষ্ট, কারণ ঐ সকল ঘটনার অন্তরালে যে শক্তি কাজ করিতেছে তাহার রহস্য ভেদ না হইলে আমরা ইতিহাসের আভ্যন্তরীন্ প্রাণটুকুর সন্ধান পাই না। বর্ত্তমান গ্রন্থখানি রাণাডে লিখিত Rise of the Mahratta Power ও কাপ্তেন গ্রাণ্টডফের ইতিহাস অবলম্বনে লিখিত।

কিরূপে একটি জাতি গঠিত হয়, কোন্ কোন্ শক্তি ও ঘটনা দ্বারা তাহার অভ্যুত্থান ও পতন হয়, কিরূপে একটি জাতির ব্যবস্থাবিধি, আচার ব্যবহারের মধ্য দিয়া জাতীয় জীবন প্রবাহিত হয়, রাষ্ট্রীয় শাসনপ্রণালী, অধিকার বিধি প্রবর্ত্তিত, পরিবর্ত্তিত ও পরিণত হয়;—ইহাই ইতিহাসের কঙ্কাল; (Constituional history)। মারাঠাগণ কিরূপে সহসা মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল,—কিরূপে বিভিন্ন দলগুলি সম্মিলিত হইল, কিরূপে শিবাজী মারাঠাদিগের এই অভ্যুদয়ে আপনার ঐশী শক্তি নিয়োজিত করিয়া রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা করিলেন; নিরক্ষর শিবাজীর প্রতিভা কোন্ কোন্ উপায়ে প্রকৃষ্ট প্রকাশপথ পাইল;—বিচ্ছিন্নতার মধ্যে ঐক্য আবিষ্কার করিয়া, খণ্ডিত অংশগুলিকে সংযোজিত করিয়া, কিরূপে একটি সমগ্র জাতি গঠন করিল, এই গ্রন্থে তাহাই বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে।

কেবল রাষ্ট্রীয় ইতিহাস লইয়া শরৎবাবু গ্রন্থখানি নীরস করিয়া তোলেন নাই। ঐতিহাসিক তথ্যেরও যথোচিত আলোচনা করিয়াছেন। আফজল খাঁর হত্যাবর্ণন প্রসঙ্গে, তিনি শিবাজী চরিত্রের দুরপনেয় কলঙ্ক মোচনে সফল হইয়াছেন। গ্রন্থের ভাষাটী কেবল স্থলবিশেষে দুর্ব্বল এবং ইংরাজি ভাবের অনুকরণে স্থলে স্থলে শ্রুতিকঠোর হইলেও আখ্যায়িকাটুকু সুখপাঠ্য।

এই গ্রন্থে কবিবর রবীন্দ্রনাথ একটি উপাদেয় ভূমিকা লিখিয়া দিয়া মারাঠা ইতিহাসের বিশেষত্ব, ও বৈচিত্র্য অতি প্রাঞ্জলভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন।

ঐতিহাসিক সাহিত্যবিভাগে ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি যথেষ্ট আদরের সামগ্রী। ভরসা করি, সাধারণ্যে ইহার বিশেষ সমাদর হইবে।

মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়। (এবং ধর্ম্ম, সমাজ রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে তাঁহার উপদেশ ও মতামত) শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। কলিকাতা ইণ্ডিয়ান্ পাব্লিশিং হাউস হইতে শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত। কান্তিক প্রেসে মুদ্রিত, চতুর্থ সংস্করণ কাপড়ে বাঁধাই, মূল্য তিন টাকা। গ্রন্থখানি যে আদরের সহিত সাধারণ্যে গৃহীত হইয়াছে তাহা ইহার চতুর্থ সংস্করণ হইতে বুঝা যায়। আমাদের দেশে উপাদেয় গ্রন্থের তেমন আদর নাই নতুবা এই গ্রন্থের চৌদ্দটি সংস্করণ দেখিতাম। লোমহর্ষণ উপন্যাস, কুরুচিপূর্ণ নাটক ও অর্থহীন, চটুল ডিটেকটিভের

গণই বাজারে একাধিপত্য করিতেছে। অনেকে মনে করিতে পারেন, আমরা অকারণ আক্ষেপ করিতেছি; কিন্তু ইহা কঠিন সত্য; অপলাপের উপায় নাই।

এই গ্রন্থে, নগেন্দ্র বাবু মহাত্মা রামমোহন রায়ের সম্বন্ধে যে সমস্ত কথা ইতিকথাদির সঙ্কলন করিয়াছেন তাহা অতি প্রামাণিক। যাঁহারা স্বর্গীয় মহাত্মাকে স্বচক্ষে দেখিয়াছেন বা যাঁহারা তাঁহার সহিত পরিচিত ছিলেন এমন অনেক বিশ্বস্ত লোকমুখ হইতেই অধিকাংশ বিবরণী সংগ্রহ করিয়াছেন। এই রচিত আখ্যানে রাজার জীবনী ক্রমানুক্রমে সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ হইয়া বেশ হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে—তাহা যেন উপন্যাসের মত কৌতূহলোদ্দীপক।

এই সংস্করণে পূর্ব্ব সংস্করণগুলি অপেক্ষা গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি পাইয়াছে। অনেক নূতন ও অজ্ঞাত-পূর্ব্ব কথারও সমাবেশ আছে। গ্রন্থের ভাষা সরল সংযত। কেবল স্থলবিশেষে গ্রন্থকার অন্যান্য মহাত্মা-গণের সহিত, রামমোহনের তুলনা করিতে গিয়া সংযম হানি করিয়াছেন। (দ্বিতীয় পৃষ্ঠার, দ্বিতীয় পারাগ্রাফের শেষাংশ)। আর একটি কথা, নগেন্দ্রবাবু গ্রন্থসন্নিবিষ্ট তৃতীয়বারের "বিজ্ঞাপনে" লিখিয়াছেন, "রাজার বাঙ্গলা গ্রন্থ সকলের ভাষা, বর্ত্তমান সময়ের লোকের বোধসুলভ ও রুচি সঙ্গত নহে বলিয়া এখনকার লোক তাহা পাঠ করিতে ইচ্ছা করেন না। সেইজন্য অনেক স্থলে আমরা রাজার রচনা, আধুনিক বাঙ্গালায় পরিবর্ত্তিত করিয়া দিয়াছি।" নগেন্দ্রবাবুর এই কার্য্যের আমরা আদৌ অনুমোদন করি না। এবং সাহিত্য সমাজনীতি মতেও তিনি অনধিকার হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। এরূপ স্বাধীন-তার দোহাই দিয়া, তখনকার পরিচ্ছদে ভূষিত, রাজার চিত্র বর্ত্তমান রুচির উপযোগী করিতে হয়। এবং সংস্কৃত সাহিত্য, বাঙ্গলা প্রাচীন সাহিত্যেরও নূতন সংস্করণ করিতে হয়। রাজার রচনা যদি রুচি-সঙ্গত না হয়, হয় তাহা বর্জ্জন করুন, নয় তাহার মর্ম্ম-সঙ্কলন করিয়া দিউন। ভাষার উপর কলম চালাইলে ইতিহাসের মর্য্যাদা হানি করা হয়।

গ্রন্থখানি একভাবে রাজার জীবনের কাহিনী অন্তভাগে তাহারি আলোচনার সমাবেশে সুন্দর হইয়াছে ইহাতে যেমন রাজার কার্য্য কলাপের সহিত পরিচয় স্থাপন হয় তেমনি রাজার অন্তরের ছবিও দেখিতে পাওয়া যায়। এ গ্রন্থখানি যে বঙ্গসাহিত্যে গৌরবের বস্তু, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

বেতাল পঞ্চবিংশতি। স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় কর্ত্তৃক প্রণীত। ইণ্ডিয়ান্ পাব্লিশিং হাউস হইতে, শ্রীযুক্ত মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত, সচিত্র সংস্করণ কান্তিক প্রেসে মুদ্রিত। সুদৃশ্য কাপড়ে বাঁধাই ১৪২ পৃষ্ঠা মূল্য ৷৷৶৹ আনা মাত্র। মণিবাবু কিছুদিন পূর্ব্বে সংস্কৃত রত্নাকরের উজ্জ্বল রত্ন 'কাদম্বরী'র সচিত্র সংস্করণ প্রকাশিত করিয়াছেন। সম্প্রতি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বেতাল পঞ্চবিংশতির সুলভ ও সচিত্র সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া মণিবাবু গ্রন্থখানির বহুল প্রচার-পথ সুগম করিয়া দিয়াছেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের গ্রন্থের সমালোচনা নিষ্প্রয়োজন। সাহিত্যের হিসাবে গ্রন্থখানির একটি বিশেষ মূল্য এই যে ইহা অর্দ্ধাধিকশতাব্দী পূর্ব্বে বর্ত্তমান বঙ্গভাষার আদি গুরু কর্ত্তৃক লিখিত। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের রচনা মনোযোগের সহিত পাঠ করিলে প্রকৃতই ভাষা শিক্ষা হয়। 'পঞ্চবিংশতি' কথাগ্রন্থ এবং খাঁটি ভারতীয় ভাবে ও রসে পরিপুষ্ট, নানা বিচিত্র রসের সংমিশ্রণে কৌতূহলোদ্দীপক। মণিবাবু গ্রন্থের নাতিক্ষুদ্র ভূমিকায়, স্বল্প কথায়, গ্রন্থের মূল সূত্রটী ধরাইয়া দিয়াছেন। তাহার সাহায্যে পাঠকের অনেকটা সুবিধা হইবে।

পরিপাটি মুদ্রণ, ও সুন্দর কাগজ, মনোরম বাহারবর, চিত্র ও সুলভ মূল্য—গ্রন্থখানির একটি প্রধান আকর্ষণ। পারিতোষিক বা উপহার দিবার উপলক্ষে এইরূপ গ্রন্থের ব্যবহার প্রশস্ত এবং বাঞ্ছনীয়।

সূচনা। শ্রীগিরিজাপ্রসন্ন রায়। কলিকাতা গুপ্ত প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য চারি আনা মাত্র। এখানি ক্ষুদ্র কবিতাগ্রন্থ। কবি জাতীয় জীবনযজ্ঞে সকলকে আবাহন করিয়াছেন। সমাজতত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক উদার মতের অবতারণায় গ্রন্থের বক্তব্য কিছু জটিল হইয়া উঠিয়াছে।

সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

১২৯২ সালের ১৬ই কার্ত্তিক বরিশাল জেলার অন্তর্গত শুক্তাগড় গ্রামে সুরেন্দ্রনাথ ভূমিষ্ঠ হন।

গ্রামটী ক্ষুদ্র হইলেও নিতান্ত অপ্রসিদ্ধ নহে। এখানকার কামার কুমার যুগী প্রভৃতিরা নিজেদের হস্তশিল্পে চতুর্দ্দিকের অর্দ্ধশত গ্রামের লোকের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র জোগাইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন শুক্তাগড়ের শাণ্ডিল্য গোত্রীয় ব্রাহ্মণেরা সংস্কৃতে সুপণ্ডিত বলিয়া সর্ব্বত্র বিখ্যাত।

৺সুরেন্দ্রনাথের পিতা ৺ভগবতীচরণ গঙ্গোপাধ্যায় উক্ত শাণ্ডিল্য-গোত্রীয় ৺ধনকুমার চক্রবর্ত্তীর ভাগিনেয়। ভগবতীচরণের পৈতৃক বাড়ী চেচড়ী; কিন্তু কুলীন ভগবতীচরণ মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করিয়া, মাতুলালয়ে জীবন কাটাইয়া মাতুলালয়েই দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। ভগবতীচরণ ও তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর শ্রীকালীচরণ মাতুলকে পিতার মত ভক্তি করিতেন এবং মাতুলানীর সহিত মায়ের কোনো তফাৎ আছে বলিয়া জানিতেন না। ইঁহারা এবং ইঁহাদের সন্তানগণ সকলে অদ্যাবধি মাতুলগৃহে অবস্থান করিতেছেন।

ধনকুমার সত্যনিষ্ঠ, জিতেন্দ্রিয়, তপস্বী, ধর্ম্মপ্রাণ মহাপুরুষ ছিলেন। চতুর্দ্দিকের মুসলমানেরা তাঁহাকে "ধার্ম্মিক ঠাকুর" এই আখ্যা প্রদান করিয়াছিল। গ্রামের মধ্যে সর্ব্বদা মামলা মোকদ্দমা ছিল, কিন্তু কোন পক্ষই তাঁহাকে শক্র বলিয়া মনে করিত না। পুলিশ আসিয়া সাক্ষ্যপ্রদানের জন্য সব বাড়ীর সবলোক জড় করিত, কেবলমাত্র "ধার্ম্মিকঠাকুর" তাহাদের কাছে রেহাই পাইতেন। ইঁহার ধর্ম্মভাব, ইঁহার ভাগিনেয় ভগবতীচরণে এবং ভগবতীচরণ হইতে সুরেন্দ্রনাথে কথঞ্চিৎ সংক্রমিত হইয়াছিল।

ভগবতীচরণ কিঞ্চিৎ সংস্কৃত ব্যাকরণ পড়িয়াই অধ্যয়ন বিরত হন। তিনি পৌরহিত্যকার্য্যে অত্যন্ত পটু ছিলেন। একালে তেমন বিশুদ্ধ-যাজনিক ক্রিয়াবিৎ ব্রাহ্মণ বিরল। হিন্দুধর্ম্মের ক্রিয়াকলাপে তাঁহার বিশেষ আস্থা ছিল, এবং তিনি স্নান আহ্নিক জপ তর্পণ প্রভৃতি নিরতিশয় যত্নসহকারে সম্পন্ন করিতেন। পুত্রের বিদ্যালাভ কামনায় ভগবতীচরণ অনেক তপস্যা ও দেবারাধনা করিয়াছিলেন। ইহারই ফলে সুরেন্দ্রনাথের প্রতি শিল্প সরস্বতী সুপ্রসন্ন হইয়াছিলেন। ভগবতীচরণ নিপুণ শিল্পী ছিলেন। তিনি বহুবার নিজের দুর্গাপ্রতিমা স্বহস্তে গড়িয়াছিলেন। তিনি ছুতোরের এবং ঘরামির কাজেও সিদ্ধহস্ত ছিলেন। ভগবতীচরণের শিল্পনৈপুণ্য সুরেন্দ্রনাথে চরম উন্নতি লাভ করিয়াছিল। পিতার এই সকল গুণের সঙ্গে সঙ্গে পুত্র সুরেন্দ্রনাথ তাঁহার ক্ষয়-রোগেরও অধিকারী হইয়াছিলেন, এবং ইহাই তাঁহার অকাল মৃত্যুর কারণ।

সুরেন্দ্রনাথের জননী শ্রীযুক্তা অটলমণি দেবী সাতিশয় বুদ্ধিমতী রমণী। সুরেন্দ্রনাথকে গর্ভে ধারণ করিয়া ও তাঁহাকে সুশিক্ষা প্রদান করিয়া তিনি বঙ্গদেশে চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। তিনি গ্রাম্য-চিত্রাঙ্কন, কাঁথা শেলাই, আলেপনা প্রভৃতি তৎকালীন মহিলা-শিল্পগুলি সুন্দররূপে জানিতেন।

সুরেন্দ্রনাথ অতি আহ্লাদের ছেলে ছিলেন। তাঁহার পিতার মাতুলানী তাঁহাকে আদর করিয়া "ঠাকুরচাঁদ" নাম দিয়াছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ তাঁহার গ্রামে স্কুলে এবং কুটুম্ব ও বন্ধুবর্গের নিকটে ঐ নামেই পরিচিত ছিলেন। ঠাকুরচাঁদ যে পরিবারে জন্মিয়াছিলেন, সেটী একটী বৃহৎ একান্নভুক্ত পরিবার। বিশেষত তখনও ঠাকুরচাঁদের কাকাদের (একজন পিতার সহোদর এবং দুইজন পিতার মামাত ভাই) কাহারও সন্তান হয় নাই। সকলেই ঠাকুরচাঁদকে নিজ সন্তানের মত স্নেহ করিতেন।

ঠাকুরচাঁদ ছোটকালে কখনো মারামারি ধরাধরি করে নাই। এবং কি বাল্যে কি যৌবনে, কখনো কটুকথা বা কর্কশ ব্যবহারে কাহারও মনে ক্লেশ দেয় নাই। ঠাকুরচাঁদ বাল্যকালে অশ্লীল কথা জানিত না। একদা তাহার কোনো বয়স্ক তাহাকে অত্যন্ত অশ্লীল ভাষায় গালি দেয়। অর্থ না জানায় বালক সুরেন্দ্র দৌড়াইয়া গিয়া পূর্ণ সভায় ঐ কথার অর্থ জিজ্ঞাসা করিয়াছিল।

চারি বৎসর চারিমাস বয়সের সময় ঠাকুরচাঁদের হাতে খড়ি হয়। এই সময় হইতেই লেখাপড়া অপেক্ষা

শিল্পকার্য্যের দিকে তাহার বেশী মনোযোগ দেখা যাইতে লাগিল। আজকাল কিণ্ডারগার্ডেনের দিন; কিন্তু চিরকালই দেশে কিণ্ডারগার্ডেনের অল্পবিস্তর চলন ছিল। ঠাকুরচাঁদ বাল্যকালে মাটির দুর্গাপ্রতিমা গঠন করিত, এবং নানারূপ কলকব্জা নির্ম্মাণ করিয়া স্বকীয় ভাবী প্রতিভার পরিচয় প্রদান করিত।

এই সময়ে ঠাকুরচাঁদের পিতা ও খুল্লতাত নলছিটী রেজিষ্টরী আফিসে কেরাণিগিরি করিলেন। খুব অল্প বয়সে ঠাকুরচাঁদ মাতৃক্রোড় ছাড়িয়া লেখাপড়ার জন্ম নলছিটী গমন করে, এবং নলছিটী স্কুলে কিছুদিন পড়িয়া তথা হইতে নিম্নপ্রাথমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। এইখানে বাঙ্গলার সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুরচাঁদ একটু ইংরাজি শিখিতে আরম্ভ করে। দৈবদুর্বিপাকে এই সময়ে তাঁহার পিতা ও খুল্লতাত চাকুরি এস্তাফা দিতে বাধ্য হন। বরিশালের তদানীন্তন মাজিষ্ট্রেট্ বিটসন্ বেল্ সাহেবের ভ্রমে এইরূপে দুঃস্থ পরিবারের অন্নসংস্থানের পথ বন্ধ হইল। তখন ঠাকুরচাঁদের অন্যতম কাকা শ্রীযুক্ত বনমালী চক্রবর্ত্তী সবে মাত্র বি, এ, পাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার এবং ঠাকুরচাঁদের অধ্যয়ন ব্যয় কুলাইয়া উঠা কঠিন হইয়া দাঁড়াইল। ঠাকুরচাঁদ গ্রামে ফিরিয়া আসিল এবং গ্রামের একজন গুরু মহাশয়ের নিকট বাঙ্গালা ও ইংরাজি পড়িতে লাগিল। এইরূপে এক বৎসর কাটিয়া গেল।

১৩০৪ সালের অগ্রহায়ণ মাসে বনমালী বাবু বরিশালের রাজচন্দ্র কলেজে ইংরাজি দর্শনের অধ্যাপক নিযুক্ত হইলেন। শুক্তাগড়ের চক্রবর্ত্তী-গঙ্গোপাধ্যায় পরিবারের দুরবস্থার একটু হ্রাস হইল। ঠাকুরচাঁদ অধ্যয়নমানসে বনমালীবাবুর সহিত বরিশাল গমন করিল, এবং তথায় রাজচন্দ্র কলেজের সংসৃষ্ট স্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইল। ঐ স্কুলে সুরেন্দ্রনাথের বাল্যজীবনের সাড়ে তিন বছর অতিবাহিত হইয়াছিল।

এই সময়ে সুরেন্দ্রনাথ তাঁহার চিত্র-কৌশলের প্রথম পরিচয় প্রদান করেন। সুরেন্দ্রনাথ ক্লাসের পাঠে তত মনোযোগী ছিলেন না, কিন্তু ড্রয়িং শ্রেণীতে বিশেষ নৈপুণ্য প্রদর্শন করিতেন। ইহা দেখিয়া নোয়াখালীয় শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার চক্রবর্ত্তী (এখন এম্ এ; বি, এল্, মুনসিফ্) মহাশয় উঁহাকে অবিলম্বে আর্টস্কুলে পাঠাইতে পরামর্শ দেন। অক্ষয়বাবু নিজে সুনিপুণ কলাবিৎ—তাঁহারই নিকট সুরেন্দ্রনাথের স্বাভাবিক প্রতিভা সর্ব্বপ্রথমে ধরা পড়িয়াছিল।

১৩০৮ সালে আষাঢ় মাসে বনবালী বাবু বরিশাল ত্যাগ করিয়া বঙ্গবাসী কলেজের প্রধান সংস্কৃতাধ্যাপক হইয়া কলিকাতা গমন করেন। সুরেন্দ্রনাথও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে গিয়া বঙ্গবাসী কলেজিয়েট স্কুলে ভর্ত্তি হন। এই সুরেন্দ্রনাথের প্রথম কলিকাতায় আগমন। ভবিষ্যতে এইখানেই তাঁহার প্রতিভার বিকাশলাভ হইয়াছিল।

১৩১০ সালে সুরেন্দ্রনাথ বনমালীবাবুর সঙ্গে কাশীতে গিয়া সেণ্ট্রাল হিন্দু কলেজের স্কুলে ভর্ত্তি হন। কাশীধামের প্রাচীন কীর্ত্তির চিহ্নগুলি দেখিয়া সুরেন্দ্রনাথের চিত্ত প্রাচীন ভারতের দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে, এবং সেণ্ট্রাল হিন্দুকালেজের হৃদয়গ্রাহী শিক্ষা তাঁহার নয়নের কাছে নূতন আদর্শ আনিয়া উপস্থাপিত করে। কাশীতে সুরেন্দ্রনাথের স্বাস্থ্যেরও ভূয়সী উন্নতি হইয়াছিল। ইহার পূর্ব্বে প্রায় মাঝে মাঝে সুরেন্দ্রনাথের জ্বর হইত। কিন্তু কাশীতে প্রায় পাঁচমাস নিয়মিত ব্যায়ামের পর উহাঁর শরীর বেশ হৃষ্টপুষ্ট হইয়া উঠে এবং জ্বর প্রভৃতি ব্যাধি একেবারে অন্তর্হিত হয়।

কিছুদিন পরে বনমালী বাবু কলিকাতা সংস্কৃত কালেজের বেদান্তাধ্যাপক হইয়া আইসেন। সুরেন্দ্রনাথও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া কলিকাতা সংস্কৃত কালেজের স্কুলে ভর্ত্তি হন। এইখানে ব্যায়ামের বেশ সুবন্দোবস্ত ছিল। সুরেন্দ্রনাথ নিজে নিয়মিত ব্যায়াম করিতেন এবং অপেক্ষাকৃত অল্প বয়স্ক বালকদিগকে সযত্নে ব্যায়াম শিখাইতেন। এখানেও ড্রয়িংক্লাসে তাহার বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল।

১৩১১ সালে সুরেন্দ্রনাথ সংস্কৃতকলেজিয়েট স্কুল হইতে এন্ট্রান্স্ পরীক্ষা দেন, এবং সৌভাগ্যের বিষয় ফেল হন। যদি ফেল না হইতেন, তবে চিত্রকর সুরেন্দ্রের পরিবর্ত্তে আমরা কেরাণি বা হাকিম সুরেন্দ্র-নাথ পাইতে পারিতাম সত্য, কিন্তু উহা দ্বারা

আমাদের দেশের কোনও স্থায়ী কল্যাণ সাধিত হইত না। তাই সুরেন্দ্রনাথের 'ফেলে' আমরা ভগবানের কল্যাণময় হস্ত দেখিতে পাইয়াছি।

সুরেন্দ্রনাথের পিতা ভগবতী চরণ সেকেলে লোক; তাঁহার একান্ত ইচ্ছা ছিল যে সুরেন্দ্রনাথ আবার এন্‌ট্রান্‌স্ পড়ে, এবং বি, এ, এম্, এ পাশ করিয়া উকিল বা হাকিম হয়। কিন্তু সুরেন্দ্রনাথের শিক্ষা-বিষয়ক নিয়ন্তা বনমালী বাবু; তিনি জ্যেষ্ঠ ভগবতী চরণের কথা উপেক্ষা করিয়া সুরেন্দ্রনাথকে আর্ট-স্কুলে দিতে চাহিলেন। আজকালকার শিক্ষাবিভ্রাটে যে অনেক প্রতিভাবান্ যুবকও সমাজে মূর্খ বলিয়া পরিচিত হন, এবং অনেক অন্তঃসারশূন্য জড়বুদ্ধিও যে মুখস্থের জোড়ে লম্বা লম্বা উপাধিতে ভূষিত হন, ইহা বনমালী বাবু বিলক্ষণ অবগত ছিলেন। নিজে অনেক পরীক্ষায় পাস করিয়া এবং প্রায় আটবৎসর ধরিয়া বি, এ, এম্, এ, ক্লাসে অধ্যাপনা করিয়া তিনি পরীক্ষার মর্য্যাদা সম্যক হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। তাই তিনি কিছুতেই সুরেন্দ্রনাথকে পুনরায় এন্‌ট্রান্‌স্ পড়িতে দিতে চাহিলেন না। সুরেন্দ্রও আর্টস্কুলে যাইবার জন্য সমুৎসুক ছিলেন। তিনি পিতাকে বলিলেন "বাবা, আমি ষষ্ঠ শ্রেণী হইতে আজ পর্য্যন্ত কখনও স্কুলপাঠ্য বিষয়গুলি মনোযোগ দিয়া পড়ি নাই, যদি আবার এন্‌ট্রান্‌স্ পড়িতে পাঠান তবে অবশ্যই পড়িব, কিন্তু পাস হইব না ইহা ঠিক।" ইহার পর আর দ্বিধা করণের অবকাশ রহিল না। সুরেন্দ্রনাথ শুভক্ষণে আর্টস্কুলে প্রেরিত হইলেন।

এই সময়ে বিখ্যাত হাবেল সহেব কলিকাতা আর্টস্কুলের অধ্যক্ষছিলেন। তিনি অজন্তাগুহার চিত্র, বিভিন্নস্থান হইতে আনীত হিন্দু ও বৌদ্ধ মূর্ত্তি, এবং মোগল বাদসাহদিগের আমলের চিত্রাদিকে ভারতীয় চিত্রকলার মূল আদর্শ বলিয়া ধরিলেন। তিনি কলা-বিদ্যায় "স্বদেশী" চালাইলেন। দেশের লোকে প্রথমে উল্টা বুঝিলেন। সংবাদপত্রে এবং অন্যান্য স্থানে হাবেল সাহেবের প্রতি ঠাট্টাবিদ্রূপ চলিতে লাগিল, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট মহামতি হাবেলের পক্ষ অবলম্বন করিলেন। তাঁহারই যত্নে বিখ্যাত চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর আর্টস্কুলের সহকারী অধ্যক্ষ হইলেন। অবনীন্দ্রবাবু যে দিন আর্টস্কুলে পদার্পণ করিয়াছেন, সেদিন অতি শুভদিন। সেইদিন হইতে গবর্ণমেণ্টের যত্নে ভারতীয় আর্টে "স্বদেশী"র দৃঢ়তর প্রতিষ্ঠা হইয়াছে।

সুরেন্দ্রনাথ অল্পদিনের মধ্যেই হাবেল সাহেব এবং অবনীন্দ্র বাবুর প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন। সুরেন্দ্রনাথের উদ্ভাবনী শক্তি দেখিয়া ইঁহারা মুগ্ধ হইলেন। সুরেন্দ্রনাথ মাসিক আট টাকা হিসাবে বৃত্তি পাইলেন।

১৩১৩ সালে সুরেন্দ্রনাথ পিতৃহারা হন। ১৩১৪ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে সুরেন্দ্রনাথের বিবাহ হয়। সুরেন্দ্রনাথ কুলীন, বিশেষত নিপুণ চিত্রকর বলিয়া তখন সুরেন্দ্রনাথের বিলক্ষণ নামও হইয়াছিল। তিনি ইচ্ছা করিলে বিবাহের সময় যথেষ্ট অর্থ গ্রহণ করিতে পারিতেন। কিন্তু সংসারের কর্ত্তা বনমালী বাবু সমাজ সংস্কারে ব্রতী ছিলেন। তিনি সুরেন্দ্রের বিবাহে টাকা লইতে চাহিলেন না। সুরেন্দ্রনাথ ইহাতে খুব সুখী হইলেন, এবং নিজে জেদ্ করিয়া বলিলেন যে, গরীবের গৃহে সুপাত্রী পাইলে বিনা-পণে বিনা-অলঙ্কারে বিবাহ করিবেন। সঙ্গতি সম্পন্ন ভাল ভাল বংশজেরা তাঁহাকে কন্যাদান করিতে আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। বংশজের কন্যা বিবাহ করিলে নগদ অর্থভিন্ন বৎসর বৎসর কিছু বার্ষিকও পাওয়া যায়। অজ্ঞ কুলীনেরা উহাকে একপ্রকার "তালুক" বলিয়া মনে করে। কিন্তু বনমালী বাবুর শিক্ষার ফলে সুরেন্দ্রনাথ ভাবিলেন "কুলীন কন্যার বিবাহে যেরূপ কষ্ট, তাহাতে অর্থলোভে কুলীনকন্যা পরিহার করিয়া বংশজকন্যার পাণিপীড়ন করা অকর্ত্তব্য।" সুরেন্দ্র-নাথের মন বাক্য ও কার্য্য সর্ব্বদা একরূপ ছিল। তিনি নিঃশব্দ সংস্কারক ছিলেন। তিনি উক্তকারণে, কুলীন সমাজের কল্যাণের জন্য, বংশজের মেয়ে বিবাহ করিতে নারাজ হইলেন। এবং বহু সম্বন্ধের পর প্রিয়বালা নাম্নী একটী লক্ষ্মীশ্রী সম্পন্না দরিদ্র কুলীন কন্যার পাণিগ্রহণ করিলেন।

বিবাহের পরে লক্ষ্মী প্রিয়বালার ভাগ্যবলে

সুরেন্দ্রনাথ প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। সুরেন্দ্র নাথের শ্বশুর বিবাহে কিছু যৌতুক দিতে পারেন নাই, এবং বছর বছর উপযুক্ত তত্ত্বাদি পাঠাইতে পারিতেন না বলিয়া, বাড়ীর কেহ কেহ তদুপরি একটু বিরক্ত ছিলেন। কিন্তু সুরেন্দ্র ইহাতে বিচলিত হইতেন না। "শ্বশুরের কাছে অর্থপ্রত্যাশা দীন ভিক্ষুকের কাজ" বনমালী বাবুর এই অমূল্য উপদেশ সুরেন্দ্রনাথ সর্ব্বান্তঃকরণে গ্রহণ করিয়াছিলেন। শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ এবং আধ্যাত্মিক গুরু বনমালীর প্রত্যেক উপদেশ সুরেন্দ্রনাথ কার্য্যে পরিণত করিয়াছিলেন।

সকল সৎকাজেই সুরেন্দ্রনাথের অসাধারণ উৎসাহ ছিল। যখন "স্বদেশীর" প্রথম তরঙ্গে দেশ নাচিয়া উঠে তখন সুরেন্দ্রনাথও স্বদেশীর উন্নতির জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি কখনও পিকেট করিয়া বা মিছিলে গান গাহিয়া সময় কাটান নাই। তিনি ৺ দুর্গাপূজার বন্ধে বাড়ী না গিয়া কলিকাতায় থাকিয়া হাটার্সলি তাঁতের (hatersley loom) ব্যবহার অভ্যাস করিয়াছিলেন। তাঁহার আশা ছিল যে গ্রামে গ্রামে বিনা পারিশ্রমিকে হাটার্সলি তাঁতের ব্যবহার শিখাইয়া স্বদেশী শিল্পের প্রকৃত উন্নতির পথ সাধ্যানুসারে সুগম করিয়া দিবেন।

প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতায় যে প্রাচ্যকলা-প্রদর্শনী (Oriental Art Exhibition) বসিয়াছিল, তাহাতে সুরেন্দ্রনাথের ছবিগুলি সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করে। সুরেন্দ্রনাথ ঐ সময়ে ছবির দাম ও পুরস্কার বাবদে প্রায় আটশত টাকা প্রাপ্ত হন। গরীবের ঘরে প্রতিপালিত বিংশতিবর্ষীয় যুবকের হস্তে হঠাৎ এত টাকা পড়িল, কিন্তু ব্রহ্মচারী সুরেন্দ্রনাথ ঐ টাকার একপয়সাও বাবুয়ানিতে ব্যয় করেন নাই। শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রবাবু সুরেন্দ্রনাথকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন। তাঁহারই পরামর্শ মত ঐ টাকা দিয়া পরিবারের বৎসরের খাদ্য সংস্থানের জন্য কিছু জমী রাখা হইয়াছিল। সুরেন্দ্রনাথ সর্ব্বদা বলিতেন যে "ডাল ভাতের যোগাড় হইলে, আমি নিশ্চিন্ত মনে ছবি আঁকিব। বড়লোক হওয়া, বা সুন্দর বহুমূল্য পরিচ্ছদ ধারণ করা নিষ্প্রয়োজন"। সুরেন্দ্রনাথ একালের "বুনো রমানাথ"।

খাদ্য সম্বন্ধে সুরেন্দ্রনাথের এক মহা গুণ ছিল। যাহা দেও না কেন, তাহাতে তাঁহার পর্য্যাপ্ত হইত। ইহা ভাল হয় নাই, ইহা কম হইয়াছে বলিয়া সুরেন্দ্র কখনও দৌরাত্ম্য করিত না। সামান্য বিষয়েও অপরকে কষ্ট দেওয়া তাঁহার স্বভাববিরুদ্ধ ছিল।

সুরেন্দ্রনাথের কোনও প্রিয় সুহৃৎ তাঁহাকে বলেন "তোমাদের চিত্রগুলি সাধারণের কাছে তত ভাল লাগে না। বাজারে চলিতে পারে, এমত ছবি তৈয়ার কর, তাহা হইলে বড়মানুষ হইতে পারিবে। শ্রীযুক্ত রাজা রবিবর্ম্মার পদাঙ্কানুসরণই ভারতীয় চিত্রকরদের কর্ত্তব্য।" সুরেন্দ্র এতদুত্তরে ভারতীয় প্রাচীন চিত্রের শ্রেষ্ঠত্ব বুঝাইতে চেষ্টা করেন। বন্ধু তাহাতে বলিলেন "তোমার ছবি যেন ভালই হইল, কিন্তু সাধারণে না বুঝিলে উহা বিক্রয় হইবে কেন? তুমি কি খাইয়া ছবি আঁকিবে?" সুরেন্দ্রনাথ বলিলেন "বরং না খাইয়া মরিব, কিন্তু যাহাকে চিত্রবিদ্যার আদর্শ বলিয়া বুঝিয়াছি, কখনও অর্থলোভে, তাহা হইতে বিচ্যুত হইব না"। এইরূপ আদর্শপরতা ও একাগ্রতা ছিল বলিয়াই গুণজ্ঞ হাবেল ও অবনীন্দ্রনাথ সুরেন্দ্রনাথের আদর করিতেন। এই একাগ্রতার ফলে, গত গ্রীষ্মাবকাশের সময় সুরেন্দ্রনাথ মাসিক একশত টাকা বেতনের চাকুরী পাইয়াও তাহা গ্রহণ করেন নাই। গরীব সুরেন্দ্রনাথের পক্ষে ইহা অপেক্ষা আদর্শপরতা ও লোভহীনতার প্রমাণ কি হইতে পারে।

১৩১৫ সালের অগ্রহায়ণ মাসে সুরেন্দ্রনাথের অভিভাবক বনমালী বাবু কার্য্যগতিকে কলিকাতা পরিত্যাগ করেন। এই সময় কলিকাতার বিখ্যাত শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায় (এম্, এ, বি,এল্,) মহাশয় সুরেন্দ্রনাথের নিকট চিত্রবিদ্যা অভ্যাস করিবার নিমিত্ত উহাকে স্বগৃহে আশ্রয় দান করিলেন। গাঙ্গুলী পরিবারের যত্নে ও স্নেহে, সুরেন্দ্রনাথ নিজ পরিবার হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াও, কোনও অসুবিধা

বোধ করেন নাই। সুরেন্দ্র সর্ব্বদাই ঐ পরিবারস্থ স্ত্রীপুরুষ সকলের বিশেষ সুখ্যাতি করিতেন।

১৩১৫ সালের শেষভাগে, কলিকাতায় অবস্থান কালে সুরেন্দ্রনাথের মধ্যে মধ্যে জ্বর হইতে আরম্ভ হয়। ১৩১৬ সালের আষাঢ় মাসে সুরেন্দ্রনাথ পীড়িত হইয়া বাড়ী যান। তথায় সুবিজ্ঞ কবিরাজেরা উহার প্রকৃত রোগ কি তাহা নির্ণয় করিতে সমর্থ হন নাই। পরে বরিশালের প্রবীণ ডাক্তার শ্রীযুক্ত তারিণীকুমার সেন মহাশয় পরীক্ষা দ্বারা বুঝিতে পারেন ইহা ক্ষয় রোগ। বনমালী বাবু ইহা শুনিয়া পূজার বন্ধের সময় তাহাকে লইয়া কলিকাতায় আগমন করেন। সেইখানে ডাক্তার আর্ এল্ দত্ত এবং ডাক্তার ইন্দুমাধব মল্লিক মহাশয়ের চিকিৎসাধীনে কিছুদিন অতিবাহিত করিয়া গত ৪ঠা অগ্রহায়ণ সুরেন্দ্রনাথ ভাগীরথীবক্ষে দেহ ত্যাগ করিয়াছেন।

সুরেন্দ্রনাথ চিরজীবন কর্ত্তব্যপরায়ণ ছিলেন। কর্ত্তব্য যে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া উপনীত হউক না কেন, সুরেন্দ্রনাথ সর্ব্বদা তাহাকে সাদরে মাথা পাতিয়া গ্রহণ করিতেন।

চব্বিশ বছরের বালক সুরেন্দ্রনাথ ছাত্রাবস্থায় স্বর্গে গিয়াছেন। তাঁহার জীবনী লিখিব কি? ইহাতে ঘটনার বৈচিত্র্য কি থাকিবে? কিন্তু সুরেন্দ্রনাথের জীবনে শিক্ষিতব্য বিষয়ের অভাব নাই। সুরেন্দ্রনাথ প্রকৃতই আদর্শ চরিত্রের লোক। সত্যনিষ্ঠা, সংযম, সরলতা, পরোপকার প্রভৃতি তাঁহার স্বাভাবিকগুণ বলিয়া প্রতীয়মান হইত। সুরেন্দ্রনাথের অসাধারণ সত্যনিষ্ঠা দেখিয়া তাঁহার মৃত্যুর পর একজন লিখিয়াছেন "ঠাকুরচাঁদের মতন সত্যবাদী লোক আর সংসারে কখনও দেখি নাই।" তাঁহার মধুর জীবন, তাঁহার ঐকান্তিক সত্যনিষ্ঠা, তাঁহার অকপট সরলতা, তাঁহার স্বাভাবিক সংযম, তাঁহার প্রগাঢ় মাতৃভক্তি, তাঁহার গুরুজনানুবর্ত্তিতা তাঁহার জন্য অমর ধামে রত্নসিংহাসন নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছে; তাঁহার অনাড়ম্বর সমাজ-সংস্কার, তাঁহার অক্লান্ত আদর্শ সেবা, তাঁহার দেশানুরাগ, তাঁহার মনেমুখে স্বাধীন জীবিকা প্রীতি তাঁহাকে চিরকাল বিদ্যার্থী সমাজের অনুকরণীয় করিয়া রাখিবে; কলাবিৎ সুরেন্দ্রনাথের চিত্রগুলি তাঁহাকে [মর জগতে] অমর করিয়া রাখিবে" (প্রবাসী পৌষ)। সত্য শিবসুন্দর এই তিন সনাতন আদর্শের মধ্যে সুরেন্দ্রনাথ সুন্দরকে সত্য ও শিবের অঙ্গভাবে উপাসনা করিতেন। তাই তাঁহার জীবন মধুর ছিল। তাই আজ তাঁহার শ্রাদ্ধবাসরে আমরা বলিতে পারি—

মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্ত সিন্ধবঃ
মাধ্বীর্নঃ সন্ত্বোষধীঃ।
মধু নক্তমুতোষসোঃ মধু দ্যৌরস্তু বঃ পিতা
মধুমান্ বো বনস্পতিঃ।
মধুমানস্তু সূর্য্যো মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু বঃ।
ওঁ মধু ওঁ মধু ওঁ মধু।

সুরেন্দ্রনাথ,

তোমার জীবন মধুময় ছিল। তোমার আচার ব্যবহার বাক্য কার্য্য সমস্তই ইহ জগতে মধু বর্ষণ করিত। তুমি আজ স্বর্গে চলিয়া গিয়াছ। সেখানে

বায়ু তব মধু হোক্ সূর্য্য তব হোক্ মধুমান্।
মধু তব আনুক নদীরা। মধুক্ষরা হোক্ গাভী
ওষধিরা মধু হোক্ বৃক্ষ তব হোক্ মধুভরা।
দিন রাতি হোক্ মধুময়। বিশ্বপ্রাণ মধুপারাবার
আকাশ বর্ষুক মধু গর্ভে তার থাক লুকাইয়া॥

শ্রীউমাচরণ শাস্ত্রী।

স্বরলিপি।

ললিত—ঢিমা তেতালা।

(বিলাত যাত্রার সময় ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে রচিত)

কেমনে বিদায় লব থাকিতে জীবন
কোন্ প্রাণে চলে যাব বিজন গহন।
কেমনে ছাড়িব তারে, সদা প্রাণ চাহে যারে,
কেমনে সহিব বল বিচ্ছেদ দহন।

শরীর যদিও যাবে, মন সদা হেথা রবে,
যার ধন তারি কাছে রবে অনুক্ষণ।
দিবস ফুরায় যত, ছায়া যায় দূরে তত,
কভু না ছাড়য়ে তবু পাদপ বন্ধন।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

॥

॥ { সা ঋা মা -া। মা মা -া -গমা। -গমা -পদা -পণা দা। পা -া -া -দপা I
কে ম নে • বিদায় ◦ • ◦ ◦ • ল ব • ◦ ◦

I মা মা -মগা মা। -া ণদা -া পা। -া -দপা -মা -গমপা। -মা -গা -ঋা -সা I }
থা কি • তে • জী • ব ◦ ◦ • ◦ ◦ ◦ • ন্

I পা দা র্সা -া। া -া র্সা র্ঋা। র্সনা -দা -না দা। পা -া -া -দপা I মা মগা মা ণদা।
কোন্ প্রা • ◦ • ণে চ লে ◦ ◦ যা ব • ◦ ◦ বি জ ন গ

। -া -া পা -া। -া -দপা -মা -পমা। -গমা -গা ঋা -সা ॥ { পা পা -া -া।
• • হ • ◦ ◦ • ◦ • • ◦ ন্ কে ম • •

। -দপা -মা পা দা। র্সা -নর্সা -র্ঋা র্সা। র্সা -া -া -া I র্সা র্সা র্সনা -র্সা।
• নে ছা ড়ি ব • ◦ তা রে ◦ ◦ • স দা প্রা •

। র্সা র্সা র্ঋা -র্সঋা। -র্গা র্গা র্গঋা -র্সা। -নর্সা -না -দা -পা I } I পা দা র্সা -া।
ণ চা হে • • যা রে • ◦ • • ◦ কে ম নে

। -া -া র্সা র্ঋা। র্সনা -দা -না দা। পা -া -া -দপা I মা মাঃ -গঃ মা। ণদা -া পা -া।
• • স হি ব • • ব ল • ◦ ◦ বি চ্ছে ◦ দ দ ◦ হ •

। -া -দপা -মা -গমপা। -মপমা -গা ঋা -সা ॥ I সা সা সা -া। -াঃ -নৃঃ সা সা।
• ◦ • • • ◦ • ন্ শ রী র • ◦ • য দি

। { ঋা -া ঋা ঋা। -া -া -া -জ্ঞঋা I সা ঋা মা -া। -া -া মা মা। মগা -পা মা মা।
ও • যা বে ◦ ◦ • ◦ ম ন স • ◦ ◦ দা হে থা ◦ র বে

। -া -পমা -গা -পা I (গা ঋা গঋা -া। -া -সা সন্া সা)। } I -পা দা র্সা -া।
• • • • শ রী র ◦ • • য দি যা র ধ •

। -া -া র্সা র্ঋা । র্সনা -দা -না দা । পা -া -া -দপা I মা মা -া -গা । মা -ণা -দা দা ।

০ • ন তা রি ০ • কা ছে ০ ০ • র বে • ০ অ • • মু

। পা -দপা -মা -পমা । -গমা -গা -ঋা সা I { পা পা পদা -মা । -া -া পা দা ।

ক্ষ ০ • • • • ০ ণ্ দি ব স ০ • ০ ফু রায়

। -র্সা -নর্সা -র্ঋা র্সা । র্সা -া -া -া I র্সা র্সা র্সনা -র্সা । র্সা র্সা র্ঋা -র্সর্ঋা ।

• • • য ত • ০ ০ ছা য়া যা • য় দূ রে ০

। -র্গা র্গা র্গর্ঋা -র্সা । -নর্সা -না -দা -পা I } I পা দা র্সা -া । র্সা র্ঋা র্সনা -দা ।

• ত ত • ০ • ০ • ক ভু না ০ ছা ড় য়ে ০

। -না দা পা -া । -া -া -া -দপা I মা মগা মা ণদা । -া -া পা -দপা ।

• ত বু • • • • • পা দ প ব ০ ০ দ্ধ ০

। মা -পমা -গা -মপা । -মা -গা ঋা -সা ॥

• ০ ০ • • • • ন্ ॥

শ্রীইন্দিরা দেবী।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

লাহোরের জাতীয় মহাসমিতি।—এবারকার সমিতিকে জাতীয় বলা যে কতদূর সঙ্গত, তাহা স্থির করা কঠিন। কলিকাতার শেষ সমিতি ও আজ লাহোরের এ সমিতিতে কি প্রভেদ! সেবারের তুলনায় এবার প্রতিনিধিসংখ্যা মুষ্টিমেয় এবং লোকের উৎসাহ, উদ্যম ও সহানুভূতিও নাই বলিলেই হয়। তাহার উপর কন্‌ভেন্‌সনের বিধি-স্বীকারে অসম্মত ব্যক্তিগণ এবারও এ সমিতি হইতে দূরে। আর মুসলমানগণ ত শাসন সংস্কার বিধিতে হিন্দুর উপর প্রাধান্যলাভ করিয়া জয়োল্লাসে মত্ত। ভারতের জাতীয় ব্যাপার তাঁহাদের পক্ষে ক্ষতিকর বলিয়াই তাঁহাদের অধিকাংশের ধারণা। তাঁহারা তাঁহাদের মস্‌লিম্ লিগ্ লইয়াই ব্যস্ত। সুতরাং কনগ্রেসে মুসলমানগণের প্রতিনিধিসংখ্যাও খুব অল্পই উপস্থিত ছিলেন। তাই বলিতেছিলাম সমিতিকে জাতীয় বলা যে কতদূর সঙ্গত, তাহা স্থির করা কঠিন।

মুসলমান সংখ্যা অল্প বলিয়া আমরা সমিতিকে দোষ দিতে পারি না। মুসলমানগণের মধ্যে শিক্ষা ও জ্ঞানের বলে সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা যতদিন না সাধারণের অন্তর হইতে দূর হইতেছে, ততদিন দুই চারিজন উদারচেতা তেজস্বী পুরুষ ভিন্ন আর কেহ সমিতির সহিত যোগ দেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু হিন্দুদের মধ্যেও আজ এ দুর্ব্বলতা কেন? আজ এ শোচনীয় দলাদলি কেন? ইহাতে যে সমিতির উদ্দেশ্যের মূলেই কুঠারাঘাত করা হইতেছে তাহা কি ইঁহারা বুঝিতেছেন না? একতা ভিন্ন জাতীয়তা দাঁড়াইবে কোথা? হিন্দুদিগের মধ্যেই যদি দুই দলের সৃষ্টি হইয়া হিন্দুসম্প্রদায়কে বিচ্ছিন্ন ও বলহীন করে, ত' ভারতের এত বিভিন্ন সম্প্রদায় ও স্বার্থ লইয়া এক করিবার যোগ্যতা আমাদের কোথা? এলাহাবাদ কন্‌ভেন্‌সনের নিয়মাবলীই হিন্দুদের মধ্যে এই দলভেদের কারণ। এস্থলে আমরা একটা কথা

বলিতে চাই। যাহা দেশের ও জাতির কর্ম্ম তাহা তোমার বা আমার ইচ্ছানুসারে চালাইলেই হইবে না, তাহা দেশের ও জাতির অনুমোদিত হওয়া আবশ্যক। এলাহাবাদ কনভেন্‌সন আপন ইচ্ছামত বিধি লিপিবদ্ধ করিয়া জাতীয় কর্ম্মকে পণ্ড করিবার উদ্যোগ করিয়াছেন। কনভেন্‌সনের নেতাগণের সহিত যাঁহাদের মতের বিরোধ, তাঁহারা যে সকলেই দেশের অকল্যাণ ব্রতে ব্রতী তাহা আমরা মনে করি না। তবে সকলকে এক করিয়া সমবেত জাতির সম্মুখে কনভেন্‌সনের বিধিগুলি অনুমোদিত করিয়া লওয়া হইল না কেন? দেশের এই দুর্দ্দিনে আমাদের মধ্যে এ দুর্ব্বলতা ভারত-বাসীর দুর্ভাগ্য ভিন্ন আর কিছুই নহে।

অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি লালা হরকিষণ্ লালের বক্তৃতার একটি স্থল আমরা উদ্ধৃত করিলাম। ভারতের ইংরাজগণ এ সত্যটী মনে রাখিয়া চলিলে দেশের অনেক অমঙ্গল এতদিনে দূর হইত। তিনি বলিয়াছেন—

মুসলমান দিগ্‌কে কৃপাদান করিলেই হিন্দু সম্প্রদায় একত্রিত হইয়া কৃপা ভিক্ষা করিতে থাকিবে; অভিজাত-তন্ত্রীদিগের পিঠে হাত চাপাড়াইতে আরম্ভ করিলেই, দেশে প্রজাতন্ত্রের বেগ প্রবল হইয়া উঠিবে; জমিদারগণ অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিলেই ব্যবসাদারগণ অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিবে এবং গবর্মেণ্টের মন্ত্রণা সভাগুলি নগণ্যের দ্বারা পূর্ণ করিলেই, বাহিরের রাজনৈতিক আন্দোলন বৰ্দ্ধিত হওয়া অবশ্যম্ভাবী। সকলেই যেন স্মরণ রাখেন যে এ সংসারে ঘাতপ্রতিঘাত সর্ব্বদাই তুল্য বলশালী ও বিপরীতগামী। ইহা জড় জগতে যেমন সত্য, রাজনৈতিক জগতেও তদ্রূপ। আমাদের ইহা মনে রাখা আবশ্যক যে, যে দেশে শাসন কর্তৃগণ বিদেশী, সে দেশে সকল সময়ে শাসক ও শাসিতের স্বার্থ একই প্রকারের হওয়া অসম্ভব। সুতরাং এরূপ স্থলে ঘাতপ্রতিঘাতের নীতিটা আরও প্রবল হইয়াই দাঁড়ায়। সাম্প্রদায়িক চেষ্টার বিভিন্ন গতির সময়েও এই নীতির প্রভাবই আমরা দেখিতে পাই। কোনও সম্প্রদায় যে ইহার আঘাত হইতে রক্ষা পাইবেন, তাহার উপায় নাই।"

আশা করি হিন্দু মুসলমান উভয়েই এ কথাটি স্মরণ রাখিবেন। মহাসমিতির সভাপতি পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য তাঁহার বক্তৃতার প্রারম্ভেই তাঁহার ত্রুটির জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করিয়াছেন। তিনি বক্তৃতার পূর্ব্বে কেবলমাত্র ছয়দিন সময় পাইয়াছিলেন। সে কয়দিনও আবার তিনি মফস্বলে ওকালতিতে ব্যস্ত ছিলেন এবং তাঁহার শরীরও অসুস্থ ছিল। কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাঁহার বক্তৃতার কতকগুলি ত্রুটি অমার্জ্জনীয়। কলিকাতা-কংগ্রেস আমাদের রাজনৈতিক আন্দোলনকে যে নবজীবন দান করিয়াছিল, তাহার কোন লক্ষণইই তাঁহার দীর্ঘ বক্তৃতায় নাই। সেই পুরাতন 'ভিক্ষা দেও গো ব্রজবাসী'র সুর। তদ্ভিন্ন বর্ত্তমান যুগের কতকগুলি প্রধান বিষয়েরও কোন উল্লেখই আমরা দেখিলাম না। বঙ্গচ্ছেদ, স্বদেশী পণ্য গ্রহণ, জাতীয় শিক্ষা, ট্রান্সভালে ভারতবাসীর প্রতি নির্য্যাতন ইত্যাদি বিষয়ে তিনি একেবারেই মৌন। মর্লি সাহেবের শাসন সংস্কার বিধির খুব তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহার মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিশেষ কিছুই নাই। সে সমালোচনা সংবাদপত্র পাঠক মাত্রেরই নিকট পরিচিত। আর সব সেই চর্ব্বিত চর্ব্বণ।

দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতবাসী।—দক্ষিণ আফ্রিকার ইংরাজ উপনিবেশে ভারতবাসীদের উপর অত্যাচার, অবিচার ও পীড়নের কথা আমরা বহুদিন হইতেই শুনিয়া আসিতেছিলাম। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য মধ্যে ভারতবাসী ব্রিটিশ প্রজা হইয়াও যেরূপ নিপীড়িত হইতেছে, তাহা আমাদের কল্পনা করাও কঠিন। সম্প্রতি তথাকার ভারতবাসীগণ তাহাদের এই লাঞ্ছনা ও নির্য্যাতনের কাহিনী ত্রিশকোটি ভারত বাসীকে জানাইবার জন্য শ্রদ্ধেয় সার হেন্‌রি পোলক (H. S. L. Pollock) সাহেবকে তাঁহাদের প্রতিনিধি-স্বরূপ করিয়া প্রেরণ করিয়াছেন। ভারতবাসীর প্রতি ইঁহার সমবেদনা অসাধারণ ও তাহাদের দুঃখ মোচনের জন্য ইনি যেরূপ স্বার্থত্যাগ ও আত্মোৎসর্গ করিতেছেন, তাহা পাঠ করিলে বিস্মিত ও মুগ্ধ হইতে হয়। কলিকাতায় আসিয়া ইনি আফ্রিকা প্রবাসী ভারত-

বাসীর প্রতি আমাদের দেশের নরনারী সকলেই সহানুভূতি জাগ্রত করিয়া তুলিয়াছেন। আমাদের নেতৃবৃন্দ এই সকল প্রবাসীকে যথাসাধ্য সাহায্য করিবার জন্য একটি সমিতি গঠন করিয়াছেন। দেশের শিক্ষিতা মহিলাগণও তাঁহাদের প্রবাসের অসহায়া ভগিনীগণকে সাহায্য করিবার জন্য একটি সমিতি গঠন করিয়াছেন।

তথায় কর্তৃপক্ষের অত্যাচারের প্রকৃতি যে কি ভয়ঙ্কর তাহা নিম্নলিখিত ঘটনা হইতে সকলে উপলব্ধি করিবেন। ভারতকে তাহাদের দুঃখ জানাইবার জন্য তাহারা পোলক সাহেব, এবং একজন মুসলমান, একজন হিন্দু ও একজন পার্সীকে প্রতিনিধিস্বরূপ মনোনীত করিয়াছিল। তাহাদের নাম প্রকাশিত হইবামাত্র কর্তৃপক্ষ পোলক সাহেব ভিন্ন অপর তিনজন ভারতবাসীকে একটা ছুতা করিয়া গ্রেপ্তার করিলেন ও পরে কারারুদ্ধ করিলেন। এই প্রকার লাঞ্ছনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিতে গিয়া তিন সহস্র ভারতবাসী সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছে। পীড়নের তাড়নে তিন বৎসরের মধ্যে ট্রান্সভালে ভারতবাসীর সংখ্যা দ্বাদশ সহস্র হইতে আজ ছয় সহস্রে দাঁড়াইয়াছে। ইহা অপেক্ষা শোচনীয় ব্যাপার আর কি হইতে পারে। আমাদের সুখের ও গৌরবের বিষয় এই যে, এইরূপ অত্যাচার ও যথেচ্ছ শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদের জন্য দুর্ব্বল, অধীন, অসহায় ভারতবাসী, কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি শিখ, কি পার্সী, সকলেই সমবেত হইয়া অদম্য উদ্যমে, অসাধারণ দৃঢ়তার সহিত, সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া একপ্রাণে এই অসাধ্য সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

ভারতের সম্মান রক্ষার জন্য, ভারতবাসীর অধিকার ও মনুষ্যত্ব রক্ষার জন্য তিন সহস্র ভারতবাসী যে দুর্জ্জয় সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, অনাথা মহিলাগণ পর্য্যন্ত অসহায় শিশুসন্তানকে লইয়া নিরাশ্রয়ে, অনশনে যে দুঃখ ভোগ করিতেছেন, আমরা ত্রিশকোটি ভারতবাসী কি কেবল নীরবে চাহিয়া চাহিয়া তাঁহাদের এই আত্মবল ও অপমৃত্যু দেখিতে থাকিব। তাঁহাদের প্রতি এ অত্যাচারের প্রতিবিধানে আমরা অক্ষম সত্য, কিন্তু ত্রিশকোটি নরনারীর আন্তরিক সহানুভূতি এবং নৈতিক সহায়তা পাইলে এ জগতে কোন্ অবিচারের না উচ্ছেদ করা সম্ভব, এ পৃথিবীর কোন্ গর্ব্বিত শক্তিকে খর্ব্ব করা অসম্ভব। তথাকার মুষ্টিমেয় ভারতবাসী নরনারী যে নৈতিক সংগ্রাম ও আত্মত্যাগের মহৎ দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন, তাহা আজ শক্তিদর্পে উপেক্ষিত হইলেও, জগতের ভাবী ইতিহাসে অমর অক্ষরে লিখিত থাকিবে। বাহুশক্তির দ্বারা ক্ষণিকের জন্য প্রতিহত হইলেও, অন্তর্শক্তির পরিণামজয় অবশ্যম্ভাবী। "যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ!"

ট্রান্সভালের ভারতবাসী সম্বন্ধে শ্রদ্ধেয় পোলক সাহেব কংগ্রেসে যে বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহার সারাংশ আমরা প্রকাশ করিলাম।

আফ্রিকার শ্বেত ঔপনিবেশিকের ভারতবাসীর প্রতি মনোভাবটি কি তাহা বুঝাইবার জন্য তিনি একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করেন। একটি স্ত্রীলোক অরেঞ্জ উপনিবেশে বাস করিত। পরে বিবাহ করিবার জন্য সে পার্শ্ববর্ত্তী নেটাল প্রদেশে গমন করে। অবশেষে যখন সে জন্মভূমিতে প্রবেশ করিতে আসিল, তখন কর্তৃপক্ষ তাহাকে নিষেধ করিলেন। কর্তৃপক্ষ বলিলেন যে, তাহাকে প্রবেশ করিতে দেওয়া সঙ্গত নয়, কারণ পরে তাহার কতকগুলি কন্যা হওয়া সম্ভব এবং সেই সকল কন্যার আবার কতকগুলি করিয়া সন্তান হওয়া সম্ভব, এই প্রকারে দেশে অনেকগুলি কৃষ্ণাঙ্গের বৃদ্ধি হইবে। এইরূপ অন্যায়ের বিরুদ্ধে ভারতবাসীগণ নিজের সম্মান, ধর্ম্ম ও অধিকার রক্ষার জন্য প্রাণপণে সংগ্রাম করিতেছে। ফলে তিন সহস্র ব্যক্তির কারাবাস হইয়াছে। তাহার ফলে শত শত পরিবার আজ পথের ভিখারী হইয়াছে, নাগাপান (Nagappan) নামে একটি যুবা প্রাণ পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিয়াছেন। আফ্রিকার ভারতবাসীর ইতিহাস অর্থে কেবল মিথ্যা আশ্বাস, সর্ব্বস্বান্ত ও বিচ্ছিন্ন পরিবারের ভগ্ন হৃদয় এবং ভগ্ন আশার এক দীর্ঘ ইতিহাস। এই সংগ্রামের জন্য, তথাকার ভারতবাসীগণ অশিক্ষিত ও দুর্ব্বল হইলেও, আপন স্ত্রীপুত্র,

বাণিজ্য উপজীবিকা স্বাধীনতা ও আবশ্যক মতে প্রাণ পর্য্যন্ত ত্যাগ করিতে বদ্ধ পরিকর। তাঁহাদের এরূপ অবস্থা যে, প্রাতে যে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল, সন্ধ্যায় সে আর গৃহে ফিরিয়া আসিবে কি না, পথে তাহারা কারারুদ্ধ হইবে কি না, কারাবাসের পর তাহারা জীবিত অবস্থায় স্ত্রী পুত্রের নিকট আসিয়া উপস্থিত হইবে কি না, বা বন্ধুহীন গৃহহীন ও অর্থহীন ভাবে উপনিবেশ হইতে তাড়িত হইবে কি না, তাহার কিছুরই স্থিরতা নাই। আর ওদিকে তাহাদের স্ত্রী পুত্রগণ অনশনে পথে পথে ঘুরিতেছে। ট্রান্সভালে অনেক পুরস্ত্রী পেটের দায়ে ভিক্ষা করিয়া বা পথে পথে সামান্য কিছু দ্রব্য বিক্রয় করিয়া বেড়াইতেছেন। ভারতগবর্মেণ্ট ভবিষ্যতে যাহাতে আর কুলি প্রেরণ না করেন এরূপ ব্যবস্থা করিবার জন্য তিনি ভারতবাসীকে সচেষ্ট হইতে অনুরোধ করেন। দুঃখের পেষণে অনেক ভারতবাসী শ্রমজীবী আত্মহত্যা দ্বারা নিষ্কৃতি লাভ করে। নির্দ্দিষ্ট সময়ের পর শ্রমজীবিগণ তথায় বাস করিতে ইচ্ছা করিলে প্রত্যেক ষোল বৎসরের পুরুষকে ও ১৩ বৎসরের স্ত্রীলোককে বাৎসরিক ৫৫ টাকা করিয়া কর দিতে হয়। ১৩ বৎসরের বালিকার পক্ষে সুভাবে জীবন ধারণ করিয়া বৎসরে ৫৫ টাকা করিয়া গবর্মেণ্টকে দেওয়া অসম্ভব। ইহার ফলে পুরুষগণ সংসার ত্যাগ করিয়া অন্যত্র পলায়ন করিতে ও নানা অকর্ম্ম করিতে বাধ্য হয় এবং স্ত্রীলোকগণ অনেকে সতীত্ব পর্য্যন্ত বিক্রয় করিতে বাধ্য হয় বলিয়া গবর্মেণ্টের নিকট এই কর তুলিয়া দিবার জন্য দুইবার আবেদন করা হইয়াছিল। কিন্তু তাহাতে কোনো ফলোদয়ই হয় নাই। এই সকল হতভাগ্যকে সাহায্য করিবার জন্য এবং অনাথ পরিবারগুলিকে অন্নদান করিবার জন্য ভারতবাসীর অর্থ দ্বারা যথাসাধ্য সাহায্য করা কর্ত্তব্য।

বক্তৃতা স্থলে শ্রীমতী সরলা দেবী তৎক্ষণাৎ তাঁহার হাতের বালা খুলিয়া প্রদান করেন এবং ৫০ টাকা অর্থ সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হন। আরও চারিজন মহিলা চারিটি অঙ্গুরীয়ক প্রদান করিয়াছেন। সেখানে ১০।১২ হাজার টাকা চাঁদা উঠিয়াছে। আশা করি ভারতবর্ষের অন্যান্য বিভাগের ধনী দরিদ্র সকলেই যথাসাধ্য এই পুণ্যকর্ম্মে সাহায্য করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না। এইরূপ বিপদে ভারতবাসী ভারতবাসীকে সাহায্য না করিলে সে কলঙ্ক অনন্তকালেও মুছিবার নহে।

লাহোরে মহিলা সম্মিলন।—গত ৩০শে ডিসেম্বর লাহোরে একটি মহিলা সম্মিলন হইয়াছিল। আজ কয় বৎসর হইতেই কংগ্রেসের পর এইরূপ মহিলা সম্মিলন হইতেছে। দেশের দুরবস্থায় ক্ষুব্ধ হইয়া বহুদিন পূর্ব্বে বঙ্গের স্বর্গীয় কবি হেমচন্দ্র গাহিয়াছিলেন—

"না জাগিলে সব ভারত ললনা,
এ ভারত আর জাগেনা জাগেনা।"

কবির সে কাতরবাণী আজ সফল হইয়াছে। নবযুগের নব জাগরণের সঙ্গে হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত সকল প্রদেশ, সকল সমাজেরই মহিলাগণ আজ জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছেন। ভারতের পুনরুত্থানের ইহাই পূর্ব্বলক্ষণ।

এবার লাহোরের সম্মিলনে পঞ্জাবের পদস্থা ও শিক্ষিতা সকল মহিলাই সমবেত হইয়াছিলেন। প্রায় চারি শত মহিলা এই সম্মিলনে যোগদান করিয়াছিলেন। আক্ষেপের বিষয় মুসলমান মহিলাগণ কেহই যোগদান করেন নাই। লাটপত্নী লেডি ডেন্ পর্য্যন্ত এই সম্মিলনে উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার সহানুভূতি প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। প্রতাপগড়ের মহারাণী সভাপতির আসনে আসীনা ছিলেন। শ্রীমতী সরলা দেবী ট্রান্সভালের ভারত-মহিলাগণের প্রতি আন্তরিক সহানুভূতি প্রকাশ করিবার জন্য একটি প্রস্তাবের সূচনা করেন। তাঁহার বক্তৃতাটি এত শিক্ষাপ্রদ ও সময়োপযোগী হইয়াছে, যে আমরা তাহার সারাংশ উদ্ধৃত করিয়া দিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না।

নারীগণই সমাজের, সংসারের, জাতির ও জগতের কল্যাণ সাধনে সক্ষম। আমাদিগের শাস্ত্র নারীকে 'অবলা' না বলিয়া শক্তি নামেই অভিহিত করিয়াছেন। পুরুষ চালক শক্তি কিন্তু নারীই তাহার শক্তিকে জাগ্রত করিয়া তুলেন। তিনিই গৃহের

লক্ষ্মী বা অধীশ্বরী দেবী। তিনিই গৃহের শারীরিক ও নৈতিক কল্যাণ-বিধায়িনী। সমাজের মধ্যে নারী-শক্তিই সর্ব্বপ্রধান। স্বামী হয় ত একজন বিখ্যাত বাগ্মী বা সমাজ সংস্কারের পক্ষপাতী, হয় ত তিনি বক্তৃতামঞ্চে দাঁড়াইয়া ওজস্বিনী ভাষায় স্ত্রীশিক্ষা ও বিধবা-বিবাহ সমর্থন করিয়া আসেন এবং বাল্যবিবাহ প্রথাকে ধিক্কার দিয়া থাকেন, কিন্তু মুগ্ধ শ্রোতৃবৃন্দের প্রশংসাধ্বনি লাভ করিয়া বাড়ী ফিরিবামাত্র তাঁহার দশ বৎসরের বালিকা কন্যাটিকে অবিবাহিত রাখার অপরাধে পত্নীকর্ত্তৃক তিনি তিরস্কৃত ও ধিক্কৃত হইতে থাকেন। একশতের মধ্যে নিরেনব্বই স্থলেই অগত্যা তিনি পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হন। তথাপি নারীকে বলে 'অবলা'। নারীই সমাজসংস্কারকে প্রতিপদে বিপর্য্যস্ত করে। প্রকৃত পক্ষে নারীই সমাজের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের কর্ত্রী। নারীই মানবজাতির জননী, সুতরাং নারীই মানবজাতির শিক্ষয়িত্রী, নারীর হস্তে সত্যের আলোক দিতে পারিলে সে তাহার সন্তানগণকে যথার্থ উন্নতির পথে চালিত করিতে পারে। কিন্তু তাহার হস্তে সে জ্ঞানবর্ত্তিকা না থাকিলে তাহার পুত্রকন্যাগণের জীবন-পথ অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। সাধারণ মানবসমাজে নারীর প্রভাব অনন্ত।

তাঁহার বক্তৃতার উপসংহারে তিনি 'ভারত স্ত্রী-মহামণ্ডল' নামে একটি ভারতীয় মহিলাসমিতি গঠন করিবার প্রস্তাব করেন। একস্থানে একটি প্রধান সমিতি থাকিবে ও ভারতের চতুর্দ্দিকে তাহার শাখা-সমিতি প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। মণ্ডলের প্রধান উদ্দেশ্য হইবে নারীগণের মঙ্গল ও উন্নতিকল্পে তাহাদের মধ্যে নানা বিষয়ক শিক্ষা বিস্তার।

আমরা বিধাতার নিকট প্রার্থনা করি শ্রীমতী সরলা দেবীর এ প্রস্তাব যেন অচিরে দেশের মধ্যে একটি জীবন্ত শক্তিতে পরিণত হয়।

শ্রীসুঃ

শিল্পোন্নতি সমিতির বৈঠক।—মহাসমিতির অধিবেশনের অব্যবহিত পরেই দ্বারবঙ্গেশ্বরের অধিপতিত্বে শিল্প সমিতির বৈঠক বসিয়াছিল। লালা হরকিষণ অভ্যর্থনা বিভাগের কর্ত্তা ছিলেন। দ্বারবঙ্গেশ্বর তাঁহার বক্তৃতায় যে সকল বিষয়ের সমাবেশ করিয়াছেন তন্মধ্যে অনেকগুলি সমীচীন মন্তব্য আছে। মহারাজা সত্যই বলিয়াছেন যে একদিনে রোমনগরী নির্ম্মিত হয় নাই এবং আমরা যদি আমাদের পূর্ব্ব গৌরব লাভ করিতে চাই তবে 'রাতারাতি বড়লোক' না হইয়া ধীর পদবিক্ষেপে কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে হইবে। "First thing first" প্রথম আমাদের কৃষির উন্নতি করিতে হইবে,—আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকই কৃষিনির্ভর। দুঃখের বিষয় আবহমানকাল হইতে কৃষকেরা তাহাদের চিরন্তন সাদাসিদে উপায় অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে। বিজ্ঞান তাহারা জানেনা; —যাহাতে বৈজ্ঞানিক উপায় শিক্ষার তাহাদের কিছু ব্যবস্থা হয় তাহার চেষ্টা একান্ত কর্ত্তব্য।

মহারাজ তৎপর, তন্তুনির্ম্মিত শিল্পের কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে ১৮৮০ সনে মাত্র ৪৮০০ তাঁত ছিল। ২৮ বৎসরে কি প্রকার উন্নতি হইয়াছে তাহা নিম্নলিখিত তালিকায় দেখাইয়াছেন। ১৮৯০ সনে ৭৯৬৪, ১৯০১ সনে ১৫৩৩৬, ১৯০৫ সনে ২১৩১৮ এবং ১৯০৮ সনে ৩০৮২৪টী গুলি তাঁত বৃদ্ধি হইয়াছে। শিল্পপ্রদর্শনীদ্বারা আমাদের কি উপকার হয়, চিনির কারখানা হওয়া কতদূর বাঞ্ছনীয়, যৌথ ও সমবায় শক্তিতে দেশের শক্তি কিরূপ নিয়োজিত হওয়া উচিত ইত্যাদি বিষয় উল্লেখ করিয়া মহারাজা বলিতেছেন, 'প্রকৃষ্ট উপায়ে দেশের ধনবৃদ্ধি করাই "স্বদেশীর" উদ্দেশ্য।' মহারাজের এ উক্তি স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়া রাখিবার যোগ্য।

পরিশেষে মাননীয় সভাপতি মহাশয় ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের সুশাসনের জন্য যে দেশে শান্তি রহিয়াছে, এবং ঐ সুশাসনের জন্যই যে কৃষি ও শিল্প উন্নতি শীর্ষে আরোহণ করিয়াছে এইরূপ বলিয়াছেন। "We want India to be country of happy home and of a loyal contented people." আমরাও সকলকেই রাজভক্ত হইতে উপদেশ দিই, ইংরাজ বিদ্বেষ আমরা মোটেই ভাল মনে করি না। তবে আইনসঙ্গত উপায়ে এবং অবস্থা সঙ্গত

আন্দোলনে যতদিন নিজস্ব অধিকার না পাইব ততদিন বোধ হয় আমরা সন্তুষ্ট হইতে পারিব না। ন্যায্য দাবী করিতে বোধ হয় গভর্ণমেণ্টও আমাদের নিষেধ করেন না—দিন আর নাই দিন।

শিল্প সমিতি সভার সুযোগ্য সেক্রেটারী রাওবাহাদুর মাধোলকর কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া ভারতবর্ষের অনেক সহর হইতে অনেকে প্রবন্ধ পাঠ করেন। প্রবন্ধগুলি বিশেষজ্ঞদ্বারাই সাধারণতঃ লিখিত সুতরাং ইহাদের মূল্যও অধিক। তন্মধ্যে নিম্নলিখিতগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

১। কলিকাতার পাটন সাহেবের 'সহযোগিতা'।

২। মাদ্রাজের সার নিকলসনের—'মৎস্য ধরিবার ব্যবসায়'।

৩। কলিকাতার লা টুস সাহেবের 'ভারতবর্ষের খণিজ বিদ্যার ভুত ও ভবিষ্যৎ।

৪। পুনার খেল মহাশয়ের 'ভারতবর্ষের বর্ত্তমান আর্থিক অবস্থা।

৫। মাদ্রাজের হাডাওয়ে সাহেবের "ভারতবর্ষীয় চিত্রবিদ্যালয়ে শিক্ষা"।

৬। কলিকাতার মিঃ দাসের "বঙ্গে মৎস্য-ব্যবসায়।"

৭। কেনি সাহেবের "প্রকৃত দেশহিতৈষিতা ও স্বদেশী"।

৮। অমরাবতীর সান্ত মহাশয়ের "ভারতবর্ষে নর্ম্মাল স্কুল স্থাপনের আবশ্যকতা।

৯। পুনা কলেজের শ্রীযুক্ত জগন্নাথ রায় মহাশয়ের "উদ্যানরক্ষণ"।

১০। পুনার এলেন সাহেবের "বৈজ্ঞানিক এবং শিল্প শিক্ষা"।

১১। বাঙ্গালোরের হে সাহেবের "শিল্পোন্নতি"।

১২। হাজারীবাগের প্রোফেসর সমাদ্দারের "যৌথ মহাজনী"।

১৩। ওকনর সাহেবের "ভারতীয় শিল্পোন্নতি"।

১৪। দেরাদুনের ট্র্যা সাহেবের "দেশালাই নির্ম্মাণ উপযোগী ভারতীয় কাষ্ঠ"।

১৫। নাগপুরের সাকরওয়ালার "তন্তুশিল্প"।

১৬। কানপুরের সেক্সপিয়ার সাহেবের "চিনির ব্যবসায়"।

বারান্তরে এতন্মধ্যের কয়েকটি প্রবন্ধ সম্বন্ধে বিশদ আলোচনার ইচ্ছা রহিল।

ভারতের নীচজাতি। মান্দ্রাজ হইতে প্রকাশিত Indian Review নামক সুপ্রতিষ্ঠিত মাসিকপত্রে বরোদার মহারাজ গুইকোয়ার "The Depressed classes" বলিয়া একটী সারগর্ভ প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। এই প্রবন্ধের সকল স্বত্ব সংরক্ষিত সুতরাং আমরা ইহার সমস্ত উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না। তবে পাঠকের কৌতুহল নিবারণার্থে কয়েকটী বিষয়ের উল্লেখ করিতেছি। প্রথম আমাদের দেশের অনাচরণীয় ও অস্পৃশ্য জাতির সংখ্যা ছয়কোটী। আমাদের দেশের মোট লোকসংখ্যা ত্রিশকোটি সুতরাং এক পঞ্চমাংশ দিয়া আমাদের কোন কাজই হয় না. ফাহিয়ানের ভারত ভ্রমণ পাঠ করিলে জানা যায় যে, অস্পৃশ্য জাতিগণ সহর প্রবেশের পূর্ব্বে কাঠে কাঠে আঘাত করিয়া আগমনবার্ত্তা জ্ঞাপন করিত। দাক্ষিণাত্যে এখনও এই-রূপ প্রথা বর্ত্তমান আছে। একই ঈশ্বরের সৃষ্টজীব অথচ তাহাদিগকে স্পর্শকরা দূরে থাকুক, তাহারা আমাদের নিকটে আসিতেও পারিবে না ইহা কি ভীষণ অবিচার! আমরা তবে কোন যুক্তিতে রাজনীতি ক্ষেত্রে শাসনকর্ত্তাদের সহিত এক শ্রেণীতে দাঁড়াইতে চাই!

মহারাজ বাহাদুর ভগবদ্গীতা হইতে "গুণকর্ম্ম বিভাগশঃ" উদ্ধৃত করিয়া চ'খে আঙ্গুল দিয়া দেখাই-য়াছেন যে বৈদিককালে এরূপ কোন নিয়ম ছিল না। তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন যে আমরা বাহ্যিক তিল তুলসী গঙ্গামৃত্তিকা আবৃত হইয়া অন্তরে কত না মলিনতা লইয়া বাস করিতেছি। স্পেনের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া বলিয়াছেন যে পুরোহিত শ্রেণীর অসামান্য প্রাধান্য স্বীকার করিয়া পড়িয়া থাকিলে চলিবে না। যদি আমরা আমাদের এই ছয়কোটী ভ্রাতার মায়া পরিত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র নিজ স্বার্থে কূপ মণ্ডূকের ন্যায় আবদ্ধ থাকি তাহা হইলে আমাদের

উন্নতির আশা অতল সমুদ্র গর্ভে চিরদিনের জন্য নিহিত থাকিবে।

দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে। রয়াল ষ্ট্যাটিসটিকাল সোসাইটীর পত্রিকায় মধ্যপ্রদেশের অ্যাকাউন্টেণ্ট জেনারেল মিঃ এটকিনসন সাহেব ভারতবর্ষে দিন দিন সকল দ্রব্যের মূল্য চড়িতেছে কেন ইহার সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। এটকিনসন সাহেবের মতে নিম্নলিখিত কারণে মূল্য দিন দিন চড়িয়া যাইতেছে :—

(১) বৃষ্টির আধিক্য বা অল্পতা।

(২) চলিত মুদ্রার আধিক্য বা অল্পতা।

(৩) খাদ্যদ্রব্যের রপ্তানি এবং তৎসহ সরবরাহ (sapply) অপেক্ষা গ্রাহকসংখ্যার আধিক্য।

(৪) বেতনের হার বৃদ্ধি এবং তৎসহ খাদ্যদ্রব্য উৎপাদনের ব্যয়বৃদ্ধি।

(৫) অনাবশ্যক দ্রব্যাদির আমদানী। (Import)

(৬) দেশে মূলধনের আধিক্য।

(৭) ব্যবসায়ীদের কৃত্রিম উপায়ে খাদ্যদ্রব্যের দর বৃদ্ধি করন।

এটকিন্সন সাহেব এই সমস্ত বিষয় বিশেষরূপ পর্য্যালোচনা করিয়া নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন।

(১) বিভিন্ন সময়ে মূল্যাদির তারতম্য হইয়াছে।

(২) অনাবৃষ্টির জন্য মূল্যবৃদ্ধি অনেক সময় হইয়াছে এবং দুষ্প্রাপ্যতা উত্তীর্ণ হইয়া গেলেও মূল্যাধিক্য কমে নাই।

(৩) দুষ্প্রাপ্যতার শেষ সময়ে অনেক স্থলে অর্থাভাব পরিলক্ষিত হইয়াছে।

(৪) যাহাদের ব্যবসায়ে একচেটীয়া আছে তাহারা এই সময় নিজেদের আরও সুবিধা করিয়া লইয়াছে এবং দ্রব্যাদির দর আরও অধিক করিয়াছে।

(৫) অনেক সময় অনাবশ্যক মুদ্রা প্রস্তুত করা হইয়াছে।

(৬) বেতনের হার বৃদ্ধির সহিত মূল্য বৃদ্ধির কোন সম্পর্কই নাই।

ইংরাজের বিদ্রূপ। আমাদের দেশে যে কাগজের কল নাই এমন কি খাঁটী স্বদেশী কাগজও যে স্বদেশী কাগজে মুদ্রিত হয় না Advocate of India এইরূপ বিদ্রূপ করিয়াছেন। আমরা এ বিদ্রূপ নত মস্তকে সহ্য করিতেছি কেন না এ কথা সম্পূর্ণ সত্য। আমাদের দেশে ত ধনকুবেরের অভাব নাই। গত ১৯০৭ সালে গবর্ণমেণ্ট কাগজাদিতে আমরা ৬১২৫৮১৪৭৩ টাকা ব্যাঙ্কে মজুত করিয়াছি। ইহার কিছু অংশ দিয়া কি আমাদের কুবেরগণ একটী কাগজের কল করিতে পারেন না।

শাসননীতি সংস্কার।—মর্লি মিণ্টো আমাদের যে "দিল্লীর লাডডু" খাওয়াইয়াছেন, সে সম্বন্ধে ভারতীয় শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের মত 'ভারতীর' অনেক পাঠক পাঠিকাই অবগত আছেন। সম্প্রতি ইংরাজ পরিচালিত কলিকাতা হইতে প্রকাশিত দৈনিক সংবাদপত্র 'এম্পায়ার' যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহা গবর্ণমেণ্টের পক্ষে ভাল না লাগিলেও তাহাতে যে কেবল মাত্র সত্য কথাই বলা হইয়াছে ইহা অনেক বিরুদ্ধবাদীও স্বীকার করিবেন। এম্পায়ার লিখিয়াছেন—

"Moslems to right of them, Moslems to left of them, Moslems behind them, Volleyed and thundered."

অর্থাৎ নূতন মতে কাউন্সিলের সদস্য নির্ব্বাচন ব্যাপার শেষ হইলে গবর্ণমেণ্ট দেখিবেন যে দক্ষিণে বামে, পশ্চাতে মুসলমান ব্যতীত অন্য কেহই নাই। 'এম্পায়ার' সত্যই লিখিয়াছেন যে মুসলমান আধিক্য যে এত হইবে তাহা গবর্ণমেণ্ট নিজেও ভাবেন নাই। আমরা আমাদের মুসলমান ভ্রাতৃদিগের উপর কটাক্ষপাত করিয়া এম্পায়ারের এ মন্তব্য উদ্ধৃত করিতেছি না, হিন্দু এবং মুসলমান এক মায়ের সন্তান উভয়েই তুল্যাধিকার পাউন এই আমাদের প্রার্থনা। ভেদমন্ত্র প্রয়োগে গবর্ণমেণ্টের কার্য্যসিদ্ধির কিছুই সম্ভাবনা দেখা যায় না।

প্রকৃত পক্ষে, এযাবৎ নির্ব্বাচনে যাহা দেখা যাইতেছে তাহাতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে কয়েকটী "brilliant exception" ব্যতীত অন্যান্য মনোনীত ব্যক্তিকে প্রথম শ্রেণীর ব্যক্তি বলা যায় না এবং গবর্ণমেণ্ট এই ব্যক্তিদিগের নিকট যে শাসন কার্য্যে বিশেষ সাহায্য পাইবেন ইহা ভরসা করা যায় না।

দার্শনিক ডাইয়োজিনিষ যেরূপ দিনের বেলায় বর্ত্তিকা হস্তে উপযুক্ত ব্যক্তি খুঁজিতেন, গবর্ণমেণ্টও সেই প্রথা অবলম্বন না করিলে উপযুক্ত লোক পাইবেন না।

নাসিকে হত্যা।—গত ২১শে ডিসেম্বর তারিখে বোম্বাই হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে নাসিক সহরে তত্রস্থ কালেক্টর মিঃ জ্যাকসন সাহেবকে একটি ব্রাহ্মণ যুবক পিস্তলের গুলিতে নিহত করিয়াছে। মিঃ জ্যাকসন বিশেষ শিক্ষিত ও যতদূর জানা যায় তাহাতে জনপ্রিয় ছিলেন। তিনি বিলাতের এম্, এ, ও ব্যারিষ্টার; এখানে আসিয়া সংস্কৃত ও মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। গত ২১শে ডিসেম্বর মঙ্গলবার তাঁহার সম্মানার্থ বিজয়ানন্দ নাট্যমঞ্চে হিন্দু মুসলমান একত্র হইয়া একটি "পান গুপারী" সভা ও রঙ্গমঞ্চে 'সর্দ্দা' নামক নাটক অভিনয়ের আয়োজন করেন। মিঃ জ্যাকসন বোম্বাইর কলেক্টর নিযুক্ত হইয়া শীঘ্রই নাসিক পরিত্যাগ করিবেন এই জন্য এই সভা আহূত হইয়াছিল। হত্যাকারী জ্যাকসান সাহেবকে নিহত করিয়াই নিজে ধরা দেয় এবং গম্ভীর ভাবে বলে যে "আমাকে আটক করিবার আবশ্যক নাই। আমি পলাইব না। আমার কর্ত্তব্যমাত্র করিয়াছি।" কারণ জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর দেয় যে মিঃ "জ্যাকসন সবরকার মহাশয়কে সিডিসনের জন্য যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দিয়াছেন কিন্তু তত্রত্য ইঞ্জিনিয়ার উইলিয়ম্‌স্ একজন হিন্দু গাড়ীচালককে হত্যা করিলেও জ্যাকসন সাহেব তাঁহাকে কোনরূপ শাস্তি দেন নাই।" আমরা এপ্রকার হত্যার সম্পূর্ণ বিরোধী; এরূপ কার্য্যে কখনই মঙ্গল হইতে পারে না। জ্যাকসন সাহেব আইনের দাস ব্যতীত কিছুই নহেন, সুতরাং আমরা আইন সঙ্গত উপায়ে যতদিন আমাদের রাজপুরুষদিগকে তাঁহাদের শাসননীতি পরিবর্ত্তিত না করাইতে পারিব ততদিন এইপ্রকার অমানুষিক হিংসা প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিয়া কোন লাভেই লাভবান হইতে পারিব না। এক জ্যাকসন গেলে শত জ্যাকসন আসিবে; ইংরাজ ভয় পাইবার জাতি নহে সুতরাং রাজনৈতিক হিসাবেও এপ্রকার হত্যা অত্যন্ত দুষনীয়।

মহাসমিতির অধিবেশন শেষ হইয়া গেলে সকলে যখন ব্র্যাড্‌লো হল পরিত্যাগ করিতেছিলেন তখন দেখিতে পাইলেন যে প্রায় একহস্ত পরিমিত এক বিজ্ঞাপনে বোমা এবং রিভলভর দ্বারা ইউরোপীয়ান-দিগকে বধ করিবার অনুরোধ করা হইয়াছে। আমরা পূর্ব্বেও বলিয়াছি এবং এখনও বলিতেছি যে রাজপুরুষদিগের অন্তঃকরণে ভয় সঞ্চারই যদি এপ্রকার বিজ্ঞাপনাদির উদ্দেশ্য হয় তবে আমরা নিঃসন্দেহচিত্তে বলিতে পারি যে ইহাতে হিতে বিপরীত হইবে। খুব সম্ভব ইহাতে কতকগুলি নিরপরাধ ব্যক্তিরই নির্য্যাতন হইবে। এ নির্য্যাতনের জন্য সকল সময়ে আমরা গবর্ণমেণ্টেরও দোষ দিতে পারিনা। কিন্তু যাহারা এরূপ কার্য্যে ব্রতী তাহাদিগকে ইহা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে, যে সার্ব্বজনীন উন্নতির জন্য দেশবাসী বদ্ধপরিকর সে উন্নতি বোমায় নহে, রিভলভারে নহে, সে উন্নতি দেশের কৃষিশিল্পে, সে উন্নতি আত্ম-নির্ভরতায়; অর্থাৎ দেশের আর্থিক (Economic) উন্নতির উপরই সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে।—

বিলাতের ভোট অধিকারপ্রার্থী মহিলা। ইঁহাদের নাম এখন সকলেই বিশেষরূপে অবগত আছেন। এই সমস্ত মহিলাগণ পুরুষদিগের সহিত সমান অধিকার প্রত্যাশী। সম্প্রতি কোন সভাস্থলে গোলমাল করায় মিসেস লি নাম্নী একটী সম্ভ্রান্ত মহিলা জেলে যাইতে বাধ্য হন। তথায় জেলখানার জানালা ভাঙ্গার অপরাধে তাঁহাকে আরও নয় দিন জেলে আবদ্ধ থাকিতে হয়। মিসেস লি জেলে কোন প্রকার খাদ্যদ্রব্য গ্রহণে অসম্মতিপ্রকাশ করাতে জেলকর্ত্তা ও ডাক্তারগণ তাঁহাকে জোর করিয়া খাওয়াইয়াছিলেন বলিয়া মিসেস লি মুক্ত হইয়া ইঁহাদের বিরুদ্ধে মোকর্দ্দমা করিয়াছিলেন। বিচারস্থল লোকে লোকারণ্য হইয়াছিল। উভয় পক্ষেই অনেক বড় বড় চিকিৎসক সাক্ষ্য দেন। বিচারে স্থিরীকৃত হইয়াছে যে জেলের ডাক্তার কোন অপরাধ করেন নাই। বাদিনীকে মোকর্দ্দমার সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিতে হইবে।

যোঃ

ইউরোপে নারী পরিচ্ছদে ব্যয়বাহুল্য। ইউরোপে সম্ভ্রান্ত মহিলাগণ বিশেষতঃ সামাজিকতাই যাঁহাদের জীবনের একমাত্র ব্রত, তাঁহারা পরিচ্ছদের জন্য কি পরিমাণ অর্থ হেলায় ব্যয় করেন শুনিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। সম্প্রতি শ্রীমতী গুল্ড বলিয়াছেন তিনি কোন পরিচ্ছদ কখনো একেবারের অধিক ব্যবহার করেন না—সান্ধ্যভোজন কালে তাঁহার এক একটি পরিধেয় গাউনের দাম ১০০ পাউণ্ড অর্থাৎ ১৫০০ টাকা। নৌকায় বায়ুসেবনের জন্য তাঁহার এক শতটি পরিচ্ছদ আছে তাহার প্রত্যেকটির মূল্য ৫০ পাউণ্ড—৭৫০ টাকা। দিনের মধ্যে তিনবার কখনো দুইবার তিনি পরিচ্ছদ পরিবর্তন করেন, প্রত্যেক বারই সমুদায় নূতই জিনিষ ব্যবহার করিয়া থাকেন, এমন কি মোজা, জুতা, রুমাল, ছাতা, টুপি সবই নূতন আবশ্যক হয়। এক বৎসরে তিনি কেবল মাত্র পোষাকের জন্য একলক্ষ বিশহাজার টাকা খরচ করেন। তবে ইহাই যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ব্যয়ের পরিমাণ তাহা নহে—কুমারী সিসিল সরেল, যাঁহার পরিচ্ছদের আদর্শে প্যারিস ফ্যাশান পরিচালিত হয়, তিনি বলেন ৯০,০০০ নব্বুই হাজারের কমে কোনও ভদ্র মহিলার শোভনরূপে সজ্জিত হওয়া অসম্ভব—তিনি স্বয়ং পরিচ্ছদের জন্য বৎসর দেড়লক্ষ টাকা ব্যয় করেন; নিউইয়র্ক নিবাসী অর্থবণিক জিওভানা মরোসিনির কুমারী কন্যাই এই বিষয়ে কিন্তু সকলকে হারাইয়াছেন—ছয়লক্ষ মুদ্রার কমে তাঁহার সম্ভ্রম রক্ষা হয় না।

প্রিঃ

ভুনাগ রাজার মেয়ে।

(From Campbell.)

ডাকিয়া কহে মেবার দেশের ভু'ঞা,
"পাট্‌নি দেরি করিস্‌নেরে আর।
মুদ্রা আমি প্রচুর দিব তোরে,
মোদেরে দিয়ে আয়্‌রে পরপার।"

"আঁধার রাতি, ঝঞ্ঝা-চপল জল,
এখন পারে কে চাও তুমি যেতে?"
"মাঝিরে, আমি মেবার দেশের ভু'ঞা,
ভুনাগ রাজার মেয়ে আমার সাথে।

"রাজার লোক ছুটিছে পিছে দ্রুত,
তিনটী দিন এসেছি ছুটে মোরা;
রক্তে মোর ধৌত হবে ভূমি,
মোদেরে যদি ধরিতে পারে ওরা।

"এখনি আমি—এখনি যাব সাথে,"
সাহসী মাঝি কহিল দৃঢ়স্বরে,
"মুদ্রা লোভে যাব না,—যাব প্রভু,
কাতরা তব তরুণী বধূ তরে।

"শপথ মোর, বিপদে হেথা তব
দুখিনী প্রিয়া রুদ্ধ রহিবে না,
খেয়াটী আমি করিয়া দিব পার,
যদিও ঢেউয়ে ঢেউয়ে প্রবল উঠে ফেণা।"

ক্ষুদ্র তরী ত্যজিল ঝড়ো ভূমি,
সমুখে তার ক্ষুব্ধ পারাবার,
ঝঞ্ঝা তখন জেগেছে চারিদিকে,
তুচ্ছ সেথা নরের অধিকার।

ভীষণ বায়ু হইল ভীমতর,
ভয়ালতর রাত্রি ভয়াল হ'তে,
নিকট হ'তে নিকটে শুনা যায়,
অশ্বখুর-শব্দ শিলা-পথে।

"শীঘ্র ওগো, শীঘ্র," কহে বালা,
যদিও ঝড় ঘিরেছে শত ফেরে,
বজ্র লব মাথায় তুলে, তবু—
দিব না ধরা ক্রুদ্ধ জনকেরে।"

কল্লোলিত জলের উপর দিয়া
দুজনে তারা চলেছে বাহি তরী।—
মৃত্যু তীরে দাঁড়াল আসি পিতা,
ক্রুদ্ধ হিয়া ব্যথায় গেছে ভরি'।

ক্ষুব্ধ তীর,—ঝটিকা-প্রবল বুকে
দেখিল রাজা আপন মেয়েটীরে,
একটী কর মাগিছে অনুগ্রহ,
অন্য কর স্বামীরে আছে ঘিরে।

"ফিরে আয় মা,—আয়," সে কহে ডাকি,
"স্বামীরে তোর করিব আমি ক্ষমা,
ঝঞ্ঝা মুখর সাগর হিয়া ত্যজি,
আয়রে কন্যা—আয়রে প্রিয়তমা।"

বৃথায় ডাকা,—বন্ধ যাওয়া আসা,
উচ্চ ঊর্ম্মি প্রহারি' যায় তীরে ;—
ক্ষিপ্ত সলিল গ্রাসিল রাজবালা,
শোকের তরে রাখিয়া নৃপতিরে।

শ্রীহেমেন্দ্রলাল রায়।

চিত্র-ব্যাখ্যা।

আরব্যোপন্যাস কথন।—শ্রীযুক্ত সমরেন্দ্রনাথ গুপ্ত কর্ত্তৃক অঙ্কিত চিত্রের প্রতিলিপি।

যাঁহারা আরব্যোপন্যাস পাঠ করিয়াছেন তাঁহারাই জানেন,—পারস্য-সুলতান শাহরিয়া নিজ পত্নীর বিশ্বাসঘাতকতায় উন্মত্ত হইয়া সমস্ত স্ত্রীজাতির উপর বিতৃষ্ণ হইয়া উঠেন। তখন তিনি রাজ্যমধ্যে এই নিয়ম প্রচার করিলেন যে প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে এক একটি রমণী বিবাহ করিয়া পরদিন প্রাতঃকালে তাহার প্রাণ সংহার করিবেন। এইরূপে প্রতিদিন স্ত্রীহত্যা হইতে লাগিল—রাজ্যময় হাহাকার উঠিল! এই হাহাকার দূর করিবার জন্য সুলতানের প্রধান মন্ত্রীর জ্যেষ্ঠ কন্যা শাহারজাদি বদ্ধপরিকর হইলেন। তিনি স্বয়ং সুলতানকে বিবাহ করিতে চাহিলেন। বিবাহের রাত্রে তিনি সুলতানের নিকট এই প্রার্থনা জানাইলেন যে, তাঁহার জীবনের শেষ রাত্রে তিনি একবার কনিষ্ঠা ভগিনীকে জন্মের শোধ দেখিয়া লইবেন। সুলতান তাঁহার মনোরথ পূর্ণ করিলেন—দিনারজাদি সুলতানের শয়নকক্ষে আসিয়া রাত্রি যাপন করিতে লাগিলেন। জ্যেষ্ঠা ভগিনীর শিক্ষামত তিনি ভোর রাত্রে উঠিয়া দিদিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—দিদি! প্রতিদিন তোমাঁর নিকট যেমন গল্প শুনি আজও তেমনি একটি শুনাইবে না? সুলতানের আজ্ঞা লইয়া সাহারজাদি গল্প আরম্ভ করিলেন। শাহরিয়া শীঘ্রই চিত্তহারী গল্পমাধুর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন। সাহারজাদি কৌশল করিয়া এক গল্পের সহিত আর এক গল্প যুক্ত করিতে লাগিলেন—শেষ করিয়া ফেলিলেন না। সুলতান গল্পমোহে সব ভুলিয়া গেলেন। এইরূপে একাধিক সহস্র রজনী কাটিয়া গেলে সুলতানের প্রকৃতির পরিবর্ত্তন হইল—স্ত্রীজাতির উপর বিদ্বেষ চলিয়া গিয়া শ্রদ্ধা ফিরিয়া আসিল।

মন্ত্রীকন্যা শাহারজাদি কনিষ্ঠা ভগিনী দিনারজাদি ও সুলতান শাহরিয়াকে গল্প বলিতেছেন ইহাই এবারকার চিত্রের বর্ণনীয় বিষয়।

কলিকাতা, ২০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত ও ৪৪, ওল্ড বালিগঞ্জ রোড হইতে



সাবিত্রী ও যম

শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু কর্তৃক অঙ্কিত চিত্র হইতে

ভারতী।

৩৩শ বর্ষ] ফাল্গুন, ১৩১৬ [১১শ সংখ্যা।

চিরনবীনতা

প্রভাত এসে প্রতিদিনই একটি রহস্যকে উদ্‌ঘাটিত করে দেয়—প্রতিদিনই সে একটি চিরন্তন কথা বলে অথচ প্রতিদিন মনে হয় সে কথাটি নূতন। আমরা চিন্তা করতে করতে, কাজ করতে করতে, লড়াই করতে করতে প্রতিদিনই মনে করি, বহুকালের এই জগৎটা ক্লান্তিতে অবসন্ন, ভাবনায় ভারাক্রান্ত এবং ধূলায় মলিন হয়ে পড়েছে—এমন সময় প্রত্যূষে প্রভাত এসে পূর্ব্ব আকাশের প্রান্তে দাঁড়িয়ে স্মিতহাস্যে যাদুকরের মত জগতের উপর থেকে অন্ধকারের ঢাকাটি আস্তে আস্তে খুলে দেয়—দেখি সমস্তই নবীন, যেন সৃজনকর্ত্তা এই মুহূর্ত্তেই জগৎকে প্রথম সৃষ্টি করলেন। এই যে প্রথমকালের এবং চিরকালের নবীনতা এ আর কিছুতেই শেষ হচ্চে না প্রভাত এই কথাই বল্‌চে।

আজ এই যে দিনটি দেখা দিল এ কি আজকের? এ যে কোন্ যুগারম্ভে জ্যোতির্বাষ্পের আবরণ ছিন্ন করে যাত্রা আরম্ভ করেছিল সে কি কেউ গণনায় আন্‌তে পারে? এই দিনের নিমেষহীন দৃষ্টির সামনে তরল পৃথিবী কঠিন হয়ে উঠেছে, কঠিন পৃথিবীতে জীবনের নাট্য আরম্ভ হয়েছে এবং সেই নাট্যে অঙ্কের পর অঙ্কে কত নূতন নূতন প্রাণী তাদের জীবলীলা আরম্ভ করে সমাধা করে দিয়েছে; এই দিন মানুষের ইতিহাসের কত বিস্মৃত শতাব্দীকে আলোক দান করেছে, এবং কোথাও বা সিন্ধুতীরে, কোথাও মরুপ্রান্তরে, কোথাও অরণ্যচ্ছায়ায় কত বড় বড় সভ্যতার জন্ম এবং অভ্যুদয় এবং বিনাশ দেখে এসেছে,—এ সেই অতি পুরাতন দিন যে এই পৃথিবীর প্রথম জন্মমুহূর্ত্তেই তাকে নিজের শুভ্র আঁচল পেতে কোলে তুলে নিয়েছিল,—সৌরজগতের সকল গণনাকেই যে একেবারে প্রথম সংখ্যা থেকেই আরম্ভ করে দিয়েছিল। সেই অতি প্রাচীন দিনই হাস্যমুখে আজ প্রভাতে আমাদের চোখের সাম্‌নে বীণাবাদক প্রিয়দর্শন বালকটির মত এসে দাঁড়িয়েছে। এ একেবারে নবীনতার মূর্ত্তি—সদ্যোজাত শিশুর মতই নবীন। এ যাকে স্পর্শ করে সেই তখনি নবীন হয়ে ওঠে—এ আপনার গলার হারটিতে চিরযৌবনের স্পর্শমণি ঝুলিয়ে এসেছে।

এর মানে কি? এর মানে হচ্চে এই, চিরনবীনতাই জগতের অন্তরের ধন, জগতের নিত্য সামগ্রী—পুরাতনতা, জীর্ণতা তার উপর দিয়ে ছায়ার মত আস্‌চে যাচ্চে, দেখা দিতে না দিতেই মিলিয়ে যাচ্চে—এ'কে কোনোমতেই আচ্ছন্ন করতে পারচে না। জরা মিথ্যা, মৃত্যু মিথ্যা, ক্ষয় মিথ্যা, তারা মরীচিকার মত—জ্যোতির্ম্ময় আকাশের উপরে তারা ছায়ার নৃত্য নাচে এবং নাচতে নাচতে

তারা দিক্‌প্রান্তের অন্তরালে বিলীন হয়ে যায়। সত্য কেবল নিঃশেষহীন নবীনতা—কোনো ক্ষতি তাকে স্পর্শ করে না, কোনো আঘাত তাতে চিহ্ন আঁকে না—প্রতিদিন প্রভাতে এই কথাটি প্রকাশ পায়।

এই যে পৃথিবীর অতি পুরাতন দিন, এ'কে প্রত্যহ প্রভাতে নূতন করে জন্মলাভ করতে হয়। প্রত্যহই একবার করে তাকে আদিতে ফিরে আস্‌তে হয়, নইলে তার মূল সুরটি হারিয়ে যায়। প্রভাত তাকে তার চিরকালের ধুয়োটি বারবার করে ধরিয়ে দেয়, কিছুতেই ভুল্‌তে দেয় না। দিন ক্রমাগতই যদি একটানা চলে যেত, কোথাও যদি তার চোখে নিমেষ না পড়ত, ঘোরতর কর্ম্মের ব্যস্ততা এবং শক্তির ঔদ্ধত্যের মাঝখানে একবার করে যদি অতলস্পর্শ অন্ধকারের মধ্যে সে নিজেকে ভুলে না যেত এবং তারপরে আবার সেই আদিম নবীনতার মধ্যে যদি তার নবজন্মলাভ না হত তাহলে ধূলার পর ধূলা আবর্জ্জনার পর আবর্জ্জনা কেবলি জমে উঠ্‌ত—চেষ্টার ক্ষোভে, অহঙ্কারের তাপে, কর্ম্মের ভারে তার চিরন্তন সত্যটি আচ্ছন্ন হয়ে থাকত। তাহলে কেবলি মধ্যাহ্নের প্রখরতা, প্রয়াসের প্রবলতা, কেবলি কাড়তে যাওয়া, কেবলি ধাক্কা খাওয়া, কেবলি অন্তহীন পথ, কেবলি লক্ষ্যহীন যাত্রা—এরই উন্মাদনার তপ্ত বাষ্প জম্‌তে জম্‌তে পৃথিবীকে যেন একদিন বুদ্‌বুদের মত বিদীর্ণ করে ফেল্‌ত।

এখনো দিনের বিচিত্র সঙ্গীত তার সমস্ত মূর্চ্ছনার সঙ্গে বেজে ওঠেনি। কিন্তু এই দিন যতই অগ্রসর হবে, কর্ম্মসংঘাত ততই বেড়ে উঠ্‌তে থাক্‌বে, অনৈক্য এবং বিরোধের সুরগুলি ক্রমেই উগ্র হয়ে উঠ্‌তে চাইবে,—দেখ্‌তে দেখ্‌তে পৃথিবী জুড়ে উদ্বেগ তীব্র, ক্ষুধাতৃষ্ণার ক্রন্দনস্বর প্রবল এবং প্রতিযোগিতার ক্ষুব্ধ গর্জ্জন উন্মত্ত হয়ে উঠ্‌বে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও স্নিগ্ধ প্রভাত প্রতিদিনই দেবদূতের মত এসে ছিন্ন তারগুলিকে সেরে-সুরে নিয়ে যে মূল সুরটিকে বাজিয়ে তোলে সেটি যেমন সরল তেম্‌নি উদার, যেমন শান্ত তেমনি গম্ভীর, তার মধ্যে দাহ নেই, সংঘর্ষ নেই, তার মধ্যে খণ্ডতা নেই, সংশয় নেই,—সে একটি বৃহৎ সমগ্রতার সম্পূর্ণতার সুর—নিত্যরাগিণীর মূর্ত্তিটি অতি সৌম্যভাবে তার মধ্যে থেকে প্রকাশ পেয়ে ওঠে।

এম্‌নি করে প্রতিদিনই প্রভাতের মুখ থেকে আমরা ফিরে ফিরে এই একটি কথা শুন্‌তে পাই যে, কোলাহল যতই বিষম হোক্‌না কেন তবু সে চরম নয়, আসল জিনিষটি হচ্চে শান্তম্‌। সেইটিই ভিতরে আছে, সেইটিই আদিতে আছে, সেইটিই শেষে আছে। সেই জন্যই দিনের সমস্ত উন্মত্ততার পরও প্রভাতে আবার যখন সেই শান্তকে দেখি তখন দেখি তাঁর মূর্ত্তিতে একটু আঘাতের চিহ্ন নেই একটু ধূলির রেখা নেই। সে মূর্ত্তি চিরস্নিগ্ধ, চিরশুভ্র, চিরপ্রশান্ত।

সমস্ত দিন সংসারের ক্ষেত্রে দুঃখ দৈন্য মৃত্যুর আলোড়ন চলেইচে কিন্তু রোজ সকাল বেলায় একটি বাণী আমাদের এই কথাটিই বলে যায় যে, এই সমস্ত অকল্যাণই চরম নয়, চরম হচ্চেন শিবম্‌। প্রভাতে তাঁর একটি নির্ম্মল মূর্ত্তিকে দেখ্‌তে পাই—চেয়ে দেখি সেখানে ক্ষতির বলি রেখা কোথায়? সমস্তই পূরণ হয়ে আছে। দেখি যে বুদ্‌বুদ যখন

কেটে যায় সমুদ্রের তখনো কণামাত্র ক্ষয় হয় না। আমাদের চোখের উপরে যতই উলট্‌ পালট্‌ হয়ে যাক্‌ না তবু দেখি যে সমস্তই ধ্রুব হয়ে আছে—কিছুই নড়ে নি। আদিতে শিবম্‌, অন্তে শিবম্‌ এবং অন্তরে শিবম্‌।

সমুদ্রে ঢেউ যখন চঞ্চল হয়ে ওঠে তখন সেই ঢেউদের কাণ্ড দেখে সমুদ্রকে আর মনে থাকে না—তারাই অসংখ্য, তারাই প্রকাণ্ড, তারাই প্রচণ্ড এই কথাই কেবল মনে হতে থাকে। তেমনি সংসারে অনৈক্যকে বিরোধকেই সব চেয়ে প্রবল বলে মনে হয়—তা ছাড়া আর যে কিছু আছে তা কল্পনাতেও আসেনা। কিন্তু প্রভাতের মুখে একটি মিলনের বার্ত্তা আছে যদি তা কান পেতে শুনি তবে শুন্‌তে পাব এই বিরোধ এই অনৈক্যই চরম নয়—চরম হচ্চেন অদ্বৈতম্‌। আমরা চোখের সাম্‌নে দেখ্‌তে পাই হানাহানির সীমা নেই, কিন্তু তার পরে দেখি ছিন্ন বিচ্ছিন্নতার চিহ্ন কোথায়? বিশ্বের মহাসেতু লেশমাত্রও টলেনি। গণনাহীন অনৈক্যকে একই বিপুল ব্রহ্মাণ্ডে বেঁধে চিরদিন বসে আছেন, সেই অদ্বৈতম্‌, সেই একমাত্র এক। আদিতে অদ্বৈতম্‌, অন্তে অদ্বৈতম্‌, অন্তরে অদ্বৈতম্‌।

মানুষ যুগে যুগে প্রতিদিন প্রাতঃকালে দিনের আরম্ভে প্রভাতের প্রথম জাগ্রত আকাশ থেকে এই মন্ত্রটি অন্তরে বাহিরে শুন্‌তে পেয়েছে শান্তম্‌ শিবম্‌ অদ্বৈতম্‌। একবার তার সমস্ত কর্ম্মকে থামিয়ে দিয়ে তার সমস্ত প্রবৃত্তিকে শান্ত করে নবীন আলোকের এই আকাশব্যাপী বাণীটি তাকে গ্রহণ করতে হয়েছে শান্তম্‌ শিবম্‌ অদ্বৈতম্‌—এমন হাজার হাজার বৎসর ধরে প্রতিদিনই এই একই বাণী, তার কর্ম্মারম্ভের এই একই দীক্ষামন্ত্র।

আসল সত্য কথাটা হচ্চে এই যে, যিনি প্রথম তিনি আজও প্রথম হয়েই আছেন। মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তেই তিনি সৃষ্টি করচেন, নিখিল জগৎ এইমাত্র প্রথম সৃষ্টি হল এ কথা বল্লে মিথ্যা বলা হয় না। জগৎ একদিন আরম্ভ হয়েছে তার পরে তার প্রকাণ্ড ভার বহন করে তাকে কেবলি একটা সোজা পথে টেনে আনা হচ্চে এ কথা ঠিক নয়;—জগৎকে কেউ বহন করচে না, জগৎকে কেবলি সৃষ্টি করা হচ্চে—যিনি প্রথম, জগৎ তাঁর কাছ থেকে নিমেষে নিমেষেই আরম্ভ হচ্চে—সেই প্রথমের সংস্রব কোনো মতেই ঘুচ্‌চে না—এই জন্যেই গোড়াতেও প্রথম, এখনো প্রথম, গোড়াতেও নবীন, এখনো নবীন। বিচৈতি চান্তে বিশ্বমাদৌ—বিশ্বের আরম্ভেও তিনি, অন্তেও তিনি, সেই প্রথম, সেই নবীন, সেই নির্ব্বিকার।

এই সত্যটিকে আমাদের উপলব্ধি করতে হবে—আমাদের মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে নবীন হতে হবে—আমাদের ফিরে ফিরে নিমেষে নিমেষে তাঁর মধ্যে জন্মলাভ করতে হবে। কবিতা যেমন প্রত্যেক মাত্রায় মাত্রায় আপনার ছন্দটিতে গিয়ে পৌঁছয়—প্রত্যেক মাত্রায় মাত্রায় মূল ছন্দটিকে নূতন করে স্বীকার করে এবং সেই জন্যেই সমগ্রের সঙ্গে তার প্রত্যেক অংশের যোগ সুন্দর হয়ে ওঠে, আমাদেরও তাই করা চাই। আমরা প্রবৃত্তির পথে স্বাতন্ত্র্যের পথে একেবারে একটানা চলে যাব তা হবে না—আমাদের চিত্ত বারম্বার সেই মূলে ফিরে আসবে—সেই মূলে ফিরে এসে তাঁর মধ্যে সমস্ত চরাচরের সঙ্গে আপনার যে অখণ্ড যোগ

সেইটিকে বারবার অনুভব করে নেবে তবেই সে মঙ্গল হবে, তবেই সে সুন্দর হবে।

এ যদি না হয়, আমরা যদি মনে করি সকলের সঙ্গে যে যোগে আমাদের মঙ্গল, আমাদের স্থিতি, আমাদের সামঞ্জস্য, যে যোগ আমাদের অস্তিত্বের মূলে তাকে ছাড়িয়ে নিজে অত্যন্ত উন্নত হয়ে ওঠবার আয়োজন করব, নিজের স্বাতন্ত্র্যকেই একেবারে নিত্য এবং উৎকট করে তোলবার চেষ্টা করব, তবে তা কোনো মতেই সফল এবং স্থায়ী হতে পারবেই না। একটা মস্ত ভাঙাচোরার মধ্যে তার অবসান হতেই হবে।

জগতে যত কিছু বিপ্লব, সে এমনি করেই হয়েছে। যখনি প্রতাপ এক জায়গায় পুঞ্জিত হয়েছে, যখনই বর্ণের, কুলের, ধনের, ক্ষমতার ভাগ বিভাগ ভেদ বিভেদ পরস্পরের মধ্যে ব্যবধানকে একেবারে দুর্লঙ্ঘ্য করে তুলেছে তখনই সমাজে ঝড় উঠেছে। যিনি অদ্বৈতম্, যিনি নিখিল জগতের সমস্ত বৈচিত্র্যকে একের সীমা লঙ্ঘন করতে দেন না তাঁকে একাকী ছাড়িয়ে যাবার চেষ্টা করে জয়ী হতে পার্ব্বে এত বড় শক্তি কোন্ রাজার বা রাজ্যের আছে! কেননা সেই অদ্বৈতের সঙ্গে যোগেই শক্তি—সেই যোগের উপলব্ধিকে শীর্ণ করলেই দুর্ব্বলতা। এই জন্যেই অহঙ্কারকে বলে বিনাশের মূল, এই জন্যেই ঐক্যহীনতাকেই বলে শক্তিহীনতার কারণ।

অদ্বৈতই যদি জগতের অন্তরতররূপে বিরাজ করেন এবং সকলের সঙ্গে যোগ সাধনই যদি জগতের মূলতত্ত্ব হয় তবে স্বাতন্ত্র্য জিনিষটা আসে কোথা থেকে এই প্রশ্ন মনে আসতে পারে। স্বাতন্ত্র্যও সেই অদ্বৈত থেকেই আসে, স্বাতন্ত্র্যও সেই অদ্বৈতেরই প্রকাশ।

জগতে এই সব স্বাতন্ত্র্যগুলি কেমন? না গানের যেমন তান। তান যতদূর পর্য্যন্ত যাক্ না, গানটিকে অস্বীকার করতে পারে না, সেই গানের সঙ্গে তার মূলে যোগ থাকে। সেই যোগটিকে সে ফিরে ফিরে দেখিয়ে দেয়। গান থেকে তানটি যখন হঠাৎ ছুটে বেরিয়ে চলে তখন মনে হয় সে বুঝি বিক্ষিপ্ত হয়ে উধাও হয়ে চলে গেল বা—কিন্তু তার সেই ছুটে যাওয়া কেবল মূল গানটিতে আবার ফিরে আসবার জন্যেই, এবং সেই ফিরে আসার রসটিকেই নিবিড় করার জন্যে। বাপ যখন লীলাচ্ছলে দুই হাতে করে শিশুকে আকাশের দিকে তোলেন, তখন মনে হয় যেন তিনি তাকে দূরেই নিক্ষেপ করতে যাচ্চেন,—শিশুর মনের ভিতরে ভিতরে তখন একটু ভয় ভয় করতে থাকে—কিন্তু একবার তাকে উৎক্ষিপ্ত করেই আবার পরমুহূর্ত্তেই তিনি তাকে বুকের কাছে টেনে ধরেন। বাপের এই লীলার মধ্যে সত্য জিনিষ কোন্‌টা? বুকের কাছে টেনে ধরাটাই;—তাঁর কাছ থেকে ছুঁড়ে ফেলাটাই নয়। বিচ্ছেদের ভাবটি এবং ভয়টুকুকে সৃষ্টি করা এই জন্যে যে সত্যকার বিচ্ছেদ নেই সেই আনন্দকেই বারম্বার পরিস্ফুট করে তুল্‌তে হবে বলে।

অতএব গানের তানের মত আমাদের স্বাতন্ত্র্যের সার্থকতা হচ্চে সেই পর্য্যন্ত যে পর্য্যন্ত মূল ঐক্যকে সে লঙ্ঘন করে না, তাকেই আরো অধিক করে প্রকাশ করে; সমস্তের মূলে যে শান্তম শিবমদ্বৈতম্ আছে যতক্ষণ পর্য্যন্ত তার সঙ্গে সে নিজের যোগ স্বীকার

করে—অর্থাৎ যে স্বাতন্ত্র্য লীলারূপেই সুন্দর, তাকে বিদ্রোহরূপে বিকৃত না করে। বিদ্রোহ করে মানুষের পরিত্রাণই বা কোথায়? যত-দূরই যাক্ না সে যাবে কোথায়? তাঁর মধ্যে ফেরবার সহজ পথটি যদি সে না রাখে, যদি সে প্রবৃত্তির বেগে একেবারে হাউয়ের মতই উধাও হয়ে চলে যেতে চায়, কোনোমতেই নিখিলের সেই মূলকে মানতে না চায় তবে তবু তাকে ফিরতেই হবে—কিন্তু সেই ফেরা প্রলয়ের দ্বারা পতনের দ্বারা ঘটবে—তাকে বিদীর্ণ হয়ে দগ্ধ হয়ে নিজের সমস্ত শক্তির অভিমানকে ভস্মসাৎ করেই ফিরতে হবে। এই কথাটিকেই খুব জোর করে সমস্ত প্রতিকূল সাক্ষ্যের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষ প্রচার করেছে :—

অধর্ম্মেনৈধতে তাবৎ ততো ভদ্রানি পশ্যতি,
ততঃ সপত্নান্ জয়তি সমূলস্তু বিনশ্যতি।

অধর্ম্মের দ্বারা লোকে বৃদ্ধি প্রাপ্তও হয়, তাতেই সে ইষ্টলাভ করে, তার দ্বারা সে শত্রুদের জয়ও করে থাকে কিন্তু একেবারে মূলের থেকে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। কেন না সমস্তের মূলে যিনি আছেন, তিনি শান্ত, তিনি মঙ্গল, তিনি এক—তাঁকে সম্পূর্ণ ছাড়িয়ে যাবার জো নেই। কেবল তাঁকে ততটুকুই ছাড়িয়ে যাওয়া চলে যাতে ফিরে আবার তাঁকেই নিবিড় করে পাওয়া যায়, যাতে বিচ্ছেদের দ্বারা তাঁর প্রকাশ প্রদীপ্ত হয়ে ওঠে।

এই জন্যে ভারতবর্ষে জীবনের আরম্ভেই সেই মূল সুরে জীবনটিকে বেশ ভাল করে বেঁধে নেবার আয়োজন ছিল। আমাদের শিক্ষার উদ্দেশ্যই ছিল তাই। এই অনন্তের সুরে সুর মিলিয়ে নেওয়াই ছিল ব্রহ্মচর্য্য—খুব বিশুদ্ধ করে, নিখুঁৎ করে, সমস্ত তার গুলিকেই সেই আসল গানটির অনুগত করে বেশ টেনে বেঁধে দেওয়া এই ছিল জীবনের গোড়াকার সাধনা।

এমনি করে বাঁধা হলে, মূল গানটি উপযুক্ত-মত সাধা হলে, তার পরে গৃহস্থাশ্রমে ইচ্ছামত তান খেলানো চলে, তাতে আর সুর-লয়ের স্খলন হয় না; সমাজের নানা সম্বন্ধের মধ্যে সেই একের সম্বন্ধকেই বিচিত্রভাবে প্রকাশ করা হয়।

সুরকে রক্ষা করে গান শিখ্‌তে মানুষকে কতদিন ধরে কত সাধনাই করতে হয়। তেমনি যারা সমস্ত মানবজীবনটিকেই অনন্তের রাগিণীতে বাঁধা একটি সঙ্গীত বলে জেনেছিল তারাও সাধনায় শৈথিল্য করতে পারে নি। সুরটিকে চিন্‌তে এবং কণ্ঠটিকে সত্য করে তুল্‌তে তারা উপযুক্ত গুরুর কাছে বহুদিন সংযম সাধন করতে প্রস্তুত হয়েছিল।

এই ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমটি প্রভাতের মত সরল, নির্ম্মল, স্নিগ্ধ। মুক্ত আকাশের তলে, বনের ছায়ায় নির্ম্মল স্রোতস্বিনীর তীরে তার আশ্রয়। জননীর কোল এবং জননীর দুই বাহু বক্ষই যেমন নগ্ন শিশুর আবরণ, এই আশ্রমে তেমনি নগ্নভাবে অবারিত ভাবে সাধক বিরাটের দ্বারা বেষ্টিত হয়ে থাকেন,—ভোগবিলাস ঐশ্বর্য্য উপকরণ খ্যাতি প্রতিপত্তির কোনো ব্যবধান থাকে না। এ একেবারে সেই গোড়ায় গিয়ে শান্তের সঙ্গে মঙ্গলের সঙ্গে একের সঙ্গে গায়ে গায়ে সংলগ্ন হয়ে বসা—কোনো প্রমত্ততা, কোনো বিকৃতি সেখান থেকে তাকে বিক্ষিপ্ত করতে না পারে এই হচ্চে সাধনা।

তার পরে গৃহস্থাশ্রমে কত কাজকর্ম্ম, অর্জ্জন ব্যয়, লাভ ক্ষতি, কত বিচ্ছেদ ও মিলন।

কিন্তু এই বিক্ষিপ্ততাই চরম নয়—এরই মধ্যে দিয়ে যতদূর যাবার গিয়ে আবার ফিরতে হবে। ঘর যখন ভরে গেছে, ভাণ্ডার যখন পূর্ণ, তখন তারই মধ্যে আবদ্ধ হয়ে বসলে চল্‌বে না—আবার প্রশস্ত পথে বেরিয়ে পড়তে হবে—আবার সেই মুক্ত আকাশ, সেই বনের ছায়া, সেই ধনহীন উপকরণহীন জীবনযাত্রা। নাই আভরণ, নাই আবরণ, নাই কোনো বাহ্য আয়োজন। আবার সেই বিশুদ্ধ সুরটিতে পৌঁছন, সেই সমে এসে শান্ত হওয়া। যেখান থেকে আরম্ভ সেইখানেই প্রত্যাবর্ত্তন—কিন্তু এই ফিরে আসাটি মাঝখানের কর্ম্মের ভিতর দিয়ে বৈচিত্র্যের ভিতর দিয়ে গভীরতা লাভ করে। যাত্রা করার সময়ে গ্রহণ করার সাধনা আর ফেরবার সময়ে আপনাকে দান করার সাধনা।

উপনিষৎ বল্‌চেন আনন্দ হতেই সমস্ত জীবের জন্ম, আনন্দের মধ্যেই সকলের জীবন যাত্রা এবং সেই আনন্দের মধ্যেই আবার সকলের প্রত্যাবর্ত্তন। বিশ্বজগতে এই যে আনন্দসমুদ্রে কেবলি তরঙ্গলীলা চলচে প্রত্যেক মানুষের জীবনটিকে এরই ছন্দে মিলিয়ে নেওয়া হচ্ছে জীবনের সার্থকতা। প্রথমেই এই উপলব্ধি তাকে পেতে হবে যে সেই অনন্ত আনন্দ হতেই সে জেগে উঠছে, আনন্দ হতেই তার যাত্রারম্ভ, তার পরে কর্ম্মের বেগে সে যতদূর পর্য্যন্তই উচ্ছ্রিত হয়ে উঠুক না এই অনুভূতিটাই যেন সে রক্ষা করে যে সেই অনন্ত আনন্দ সমুদ্রেই তার লীলা চল্‌চে—তার পরে কর্ম্ম সমাধা করে আবার যেন সে অতি সহজেই নত হয়ে সেই আনন্দ সমুদ্রের মধ্যেই আপনার সমস্ত বিক্ষেপকে প্রশান্ত করে দেয়। এই হচ্চে যথার্থ জীবন—এই জীবনের সঙ্গেই সমস্ত জগতের মিল—সেই মিলেই শান্তি এবং মঙ্গল এবং সৌন্দর্য্য প্রকাশ পায়।

হে চিত্ত, এই মিলটিকেই চাও! প্রবৃত্তির বেগে সমস্তকে ছাড়িয়ে যাবার চেষ্টা কোরো না। সকলের চেয়ে বড় হব, সকলের চেয়ে কৃতকার্য্য হয়ে উঠ্‌ব এইটেকেই তোমার জীবনের মূল তত্ত্ব বলে জেনো না। এ পথে অনেকে অনেক পেয়েছে, অনেক সঞ্চয় করেছে, প্রতাপশালী হয়ে উঠেছে তা আমি জানি তবু বলছি এ পথ তোমার না হোক্! তুমি প্রেমে নত হতে চাও, নত হয়ে একেবারে সেইখানে গিয়ে তোমার মাথা ঠেকুক্ যেখানে জগতের ছোট বড় সকলেই এসে মিলেছে; তুমি তোমার স্বাতন্ত্র্যকে প্রত্যহই তাঁর মধ্যে বিসর্জ্জন করে তাকে সার্থক কর—যতই উঁচু হয়ে উঠবে ততই নত হয়ে তাঁর মধ্যে আত্মসমর্পণ করতে থাক্‌বে, যতই বাড়বে ততই ত্যাগ করবে এই তোমার সাধনা হোক্! ফিরে এস, ফিরে এস, বারবার তাঁর মধ্যে ফিরে ফিরে এস—দিনের মধ্যে মাঝে মাঝে ফিরে এস সেই অনন্তে। তুমি ফিরে আস্‌বে বলেই এমন করে সমস্ত সাজানো রয়েছে। কত কথা, কত গোলমাল, বাইরের দিকে কত টানাটানি, সব ভুল হয়ে যায়, কোনো কিছুর পরিমাণ ঠিক থাকে না, এবং সেই অসত্যের ক্ষেত্রে প্রবৃত্তির মধ্যে বিকৃতি এসে পড়ে। প্রতিদিন মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে এই রকম ঘট্‌চে, তারই মাঝখানে সতর্ক হও, টেনে আন আপনাকে, ফিরে এস, আবার ফিরে এস, সেই গোড়ায়, সেই শান্তের মধ্যে, মঙ্গলের মধ্যে, সেই একের মধ্যে। কাজ করতে করতে কাজের মধ্যে

একেবারে হারিয়ে যেয়ো না, তারি মাঝে মাঝে ফিরে ফিরে এসো তাঁর কাছে, আমোদ করতে করতে আমোদের মধ্যে একেবারে নিরুদ্দেশ হয়ে যেয়ো না—তারি মাঝে মাঝে ফিরে ফিরে এসো যেখানে সেই তাঁর কিনারা। শিশু খেল্‌তে খেল্‌তে মার কাছে বারবার ফিরে আসে; সেই ফিরে আসার যোগ যদি একেবারেই বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তাহলে তার আনন্দের খেলা কি ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে! তোমার সংসারের কর্ম্ম সংসারের খেলা ভয়ঙ্কর হয়ে উঠ্‌বে যদি তাঁর মধ্যে ফেরবার পথ বন্ধ হয়ে যায়;—সে পথ যদি অপরিচিত হয়ে ওঠে। বারবার যাতায়াতের দ্বারা সেই পথটি এমনি সহজ করে রাখ যে অমাবস্যার রাতেও সেখানে তুমি অনায়াসে যেতে পার,দুর্য্যোগের দিনেও সেখানে তোমার পা পিছলে না পড়ে;—দিনে দুপুরে বেলায় অবেলায় যখন তখন সেই পথ দিয়ে যাও আর আস—তাতে যেন কাঁটাগাছ জন্মাবার অবকাশ না ঘটে।

সংসারে দুঃখ আছে শোক আছে, আঘাত আছে, অপমান আছে, হার মেনে তাদের হাতে আপনাকে একেবারে সমর্পণ করে দিয়ো না, মনে কোরো না তারা তোমাকে ভেঙে ফেলেছে, গ্রাস করেছে, জীর্ণ করেছে—আবার ফিরে এস তাঁর মধ্যে—একেবারে নবীন হয়ে নাও। দেখ্‌তে দেখ্‌তে তুমি সংস্কারে জড়িত হয়ে পড়, লোকাচার তোমার ধর্ম্মের স্থান অধিকার করে, যা তোমার আন্তরিক ছিল তাই বাহ্যিক হয়ে দাঁড়ায়, যা চিন্তার দ্বারা বিচারের দ্বারা সচেতন ছিল তাই অভ্যাসের দ্বারা অন্ধ হ'য়ে ওঠে, যেখানে তোমার দেবতা ছিলেন সেখানেই অলক্ষ্যে সাম্প্রদায়িকতা এসে তোমাকে বেষ্টন করে ধরে—বাঁধা পোড়ো না এর মধ্যে—ফিরে এস তাঁর কাছে, বার বার ফিরে এস—জ্ঞান আবার উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌বে, বুদ্ধি আবার নূতন হবে। জগতে যা কিছু তোমার জানবার বিষয় আছে, বিজ্ঞান বল, দর্শন বল,ইতিহাস বল,সমাজতত্ত্ব বল সমস্তকেই থেকে থেকে তাঁর মধ্যে নিয়ে যাও, তাঁর মধ্যে রেখে দেখ—তাহলেই তাদের উপরকার আবরণ খুলে যাবে—সমস্তই প্রশস্ত হয়ে সত্য হয়ে অর্থপূর্ণ হয়ে উঠ্‌বে। জগতের সমস্ত সঙ্কোচ, সমস্ত আচ্ছাদন, সমস্ত পাপ এমনি করে বারবার তাঁর মধ্যে গিয়ে লুপ্ত হয়ে যাচ্চে—এমনি করে জগৎ যুগের পর যুগ সুস্থ হয়ে সহজ হয়ে আছে। তুমিও তাঁর মধ্যে তেমনি সুস্থ হও, সহজ হও—বারবার করে তাঁর মধ্যে দিয়ে পূর্ণ হয়ে এস, তোমার দৃষ্টিকে, তোমার চিত্তকে, তোমার হৃদয়কে, তোমার কর্ম্মকে নির্ম্মলরূপে সত্য করে তোলো!

একদিন এই পৃথিবীতে নগ্ন শিশু হয়ে প্রবেশ করেছিলুম—হে চিত্ত তুমি তখন সেই অনন্ত নবীনতার একেবারে কোলের উপরে খেলা করতে। এইজন্যে সেদিন তোমার কাছে সমস্তই অপরূপ ছিল, ধূলাবালিতেও তখন তোমার আনন্দ ছিল; পৃথিবীর সমস্ত বর্ণগন্ধরস যা কিছু তোমার হাতের কাছে এসে পড়ত তাকেই তুমি লাভ বলে জান্‌তে, দান বলে গ্রহণ করতে; এখন তুমি বল্‌তে শিখেছ, এটা পুরাণো, ওটা সাধারণ, এর কোনো দাম নেই। এমনি করে জগতে তোমার অধিকার সঙ্কীর্ণ হয়ে আস্‌চে। জগৎ তেমনিই নবীন আছে, কেন না, এযে অনন্ত রসসমুদ্রে পদ্মের মত ভাস্‌চে; নীলাকাশের

নির্ম্মল ললাটে বার্দ্ধক্যের চিহ্ন পড়ে নি; আমাদের শিশুকালের সেই চিরসুহৃদ্ চাঁদ আজও পূর্ণিমার পর পূর্ণিমায় জ্যোৎস্নার দানসাগর ব্রত পালন করচে; ছয় ঋতুর ফুলের সাজি আজও ঠিক তেমনি করে আপনা আপনি ভরে উঠ্‌ছে; রজনীর নীলাম্বরের আঁচলা থেকে আজও একটি চুম্‌কিও খসে নি; আজও প্রতিরাত্রির অবসানে প্রভাত তার সোনার ঝুলিটিতে আশাময় রহস্য বহন করে জগতের প্রত্যেক প্রাণীর মুখের দিকে চেয়ে হেসে বল্‌চে, বল দেখি আমি তোমার জন্যে কি এনেছি! তবে জগতে জরা কোথায়? জরা কেবল কুঁড়ির উপরকার পত্রপুটের মত নিজেকে বিদীর্ণ করে খসিয়ে খসিয়ে ফেলচে, চিরনবীনতার পুষ্পই ভিতর থেকে কেবলি ফুটে ফুটে উঠ্‌চে। মৃত্যু কেবলি আপনাকেই আপনি ধ্বংস করচে—সে যা-কিছুকে সরাচ্চে তাতে কেবল আপনাকেই সরিয়ে ফেল্‌চে, লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি বৎসর ধরে তার আক্রমণে এই জগৎপাত্রের অমৃতে একটি কণারও ক্ষয় হয় নি।

হে আমার চিত্ত, আজ এই উৎসবের দিনে তুমি একেবারে নবীন হও, এখনি তুমি নবীনতার মধ্যে জন্মগ্রহণ কর, জরাজীর্ণতার বাহ্য আবরণ তোমার চারদিক থেকে কুয়াশার মত মিলিয়ে যাক্; চিরনবীন চিরসুন্দরকে আজ ঠিক একেবারে তোমার সম্মুখেই চেয়ে দেখ—শৈশবের সত্য দৃষ্টি ফিরে আসুক, জলস্থল আকাশ রহস্যে পূর্ণ হয়ে উঠুক, মৃত্যুর আচ্ছাদন থেকে বেরিয়ে এসে নিজেকে চিরযৌবন দেবতার মত করে একবার দেখ, সকলকে অমৃতের পুত্র বলে একবার বোধ কর। সংসারের সমস্ত আবরণকে ভেদ করে আজ একবার আত্মাকে দেখ—কত বড় একটি মিলনের মধ্যে সে নিমগ্ন হয়ে নিস্তব্ধ হয়ে রয়েছে, সে কি নিবিড়, কি নিগূঢ়, কি আনন্দময়! কোনো ক্লান্তি নেই, জরা নেই, ম্লানতা নেই। সেই মিলনেরই বাঁশি জগতের সমস্ত সঙ্গীতে বেজে উঠ্‌চে, সেই মিলনেরই উৎসবসজ্জা সমস্ত আকাশে ব্যাপ্ত হয়েছে! এই জগৎজোড়া সৌন্দর্য্যের কেবল একটিমাত্র অর্থ আছে, তোমার সঙ্গে তাঁর মিলন হয়েছে সেই জন্যেই এত শোভা, এত আয়োজন! এই সৌন্দর্য্যের সীমা নেই, এই আয়োজনের ক্ষয় নেই—চিরযৌবন তুমি চিরযৌবন—চির-সুন্দরের বাহুপাশে তুমি চিরদিন বাঁধা—সংসারের সমস্ত পর্দ্দা সরিয়ে ফেলে সমস্ত লোভ মোহ অহঙ্কারের জঞ্জাল কাটিয়ে আজ একবার সেই চিরদিনের আনন্দের মধ্যে পরিপূর্ণ ভাবে প্রবেশ কর—সত্য হোক্ তোমার জীবন, তোমার জগৎ, জ্যোতির্ম্ময় হোক্, অমৃতময় হোক্!

দেখ, আজ দেখ, তোমার গলায় কে পারিজাতের মালা নিজের হাতে পরিয়েছেন—কার প্রেমে তুমি সুন্দর, কার প্রেমে তোমার মৃত্যু নেই—কার প্রেমের গৌরবে তোমার চারদিক থেকে তুচ্ছতার আবরণ কেবলি কেটে কেটে যাচ্চে—কিছুতেই তোমাকে চিরদিনের মত আবৃত আবদ্ধ করতে পারচে না। বিশ্বে তোমার বরণ হয়ে গেছে—প্রিয়তমের অনন্ত মহল বাড়ির মধ্যে তুমি প্রবেশ করেছ, চারিদিকে দিকেদিগন্তে দীপ জ্বল্‌চে, সুরলোকের সপ্তঋষি এসেছেন তোমাকে আশীর্ব্বাদ করতে—আজ তোমার কিসের সঙ্কোচ—আজ তুমি নিজেকে জান—

সেই জানার মধ্যে প্রফুল্ল হয়ে ওঠ, পুলকিত হয়ে ওঠ—তোমারি আত্মার এই মহোৎসব সভায় স্বপ্নাবিষ্টের মত এক ধারে পড়ে থেকোনা;—যেখানে তোমার অধিকারের সীমা নেই সেখানে ভিক্ষুকের মত উঞ্ছবৃত্তি কোরো না!

হে অন্তরতর, আমাকে বড় করে জানবার ইচ্ছা তুমি একেবারেই সব দিক থেকে ঘুচিয়ে দাও—তোমার সঙ্গে মিলিত করে আমার যে জানা সেই আমাকে জানাও! আমার মধ্যে তোমার যা প্রকাশ তাই কেবল সুন্দর, তাই কেবল মঙ্গল, তাই কেবল নিত্য; আর সমস্তের কেবল এইমাত্র মূল্য যে তারা সেই প্রকাশের উপকরণ। কিন্তু তা না হয়ে যদি তারা বাধা হয় তবে নির্ম্মমভাবে তাদের চূর্ণ করে দাও! আমার ধন যদি তোমার ধন না হয় তবে দারিদ্র্যের দ্বারা আমাকে তোমার বুকের কাছে টেনে নাও, আমার বুদ্ধি যদি তোমার শুভবুদ্ধি না হয় তবে অপমানে তার গর্ব্ব চূর্ণ করে তাকে সেই ধূলায় নত করে দাও যে ধূলার কোলে তোমার বিশ্বের সকল জীব বিশ্রাম লাভ করে। আমার মনে যেন এই আশা সর্ব্বদাই জেগে থাকে যে, একেবারে দূরে তুমি আমাকে কখনই যেতে দেবেনা—ফিরে ফিরে তোমার মধ্যে আসতেই হবে, বারম্বার তোমার মধ্যে নিজেকে নবীন করে নিতেই হবে! দাহ বেড়ে চলে, বোঝা ভারি হয়, ধূলা জমে ওঠে, কিন্তু এমন করে বরাবর চলে না, দিনের শেষে জননীর হাতে পড়তেই হয়—অনন্ত সুধাসমুদ্রে অবগাহন করতেই হয়, সমস্ত জুড়িয়ে যায়, সমস্ত হাল্কা হয়, ধূলার চিহ্ন থাকে না,—একেবারে তোমারই যা সেই গোড়াটুকুতে গিয়ে পৌঁছতে হয়, যা কিছু আমার সে সমস্ত জঞ্জাল ঘুচে যায়। মৃত্যুর আঁচলের মধ্যে ঢেকে তুমি একেবারে তোমার অবারিত হৃদয়ের উপরে আমাদের টেনে নাও—তখন কোনো ব্যবধান রাখনা,—তার পরে বিরাম-রাত্রির শেষে হাতে পাথেয় দিয়ে মুখচুম্বন করে হাসিমুখে জীবনের স্বাতন্ত্র্যের পথে আবার পাঠিয়ে দাও—নির্ম্মল প্রভাতে প্রাণের আনন্দ উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে, গান করতে করতে বেরিয়ে পড়ি,—মনে গর্ব্ব হয়, বুঝি নিজের শক্তিতে নিজের সাহসে, নিজের পথেই দূরে চলে যাচ্চি; কিন্তু প্রেমের টান ত ছিন্ন হয় না, শুষ্ক গর্ব্ব নিয়ে ত আত্মার ক্ষুধা মেটে না—শেষকালে নিজের শক্তির গৌরবে ধিক্কার জন্মে, সম্পূর্ণ বুঝতে পারি এই শক্তিকে যতক্ষণ তোমার মধ্যে না নিয়ে যাই ততক্ষণ এ কেবল দুর্ব্বলতা—তখন গর্ব্বকে বিসর্জ্জন দিয়ে নিখিলের সমান ক্ষেত্রে এসে দাঁড়াতে চাই—তখনি তোমাকে সকলের মাঝখানে পাই কোথাও আর কোনো বাধা থাকে না—সেইখানে এসে সকলের সঙ্গে একত্রে বসে যাই যেখানে "মধ্যে বামনমাসীনং বিশ্বে দেবা উপাসতে।" শান্তম্ শিবমদ্বৈতম্ এই মন্ত্র গভীর সুরে বাজুক্, সমস্ত মনের তারে, সমস্ত কর্ম্মের ঝঙ্কারে,—বাজতে বাজতে একেবারে নীরব হয়ে যাক্, শান্তের মধ্যে, শিবের মধ্যে, একের মধ্যে, তোমার মধ্যে নীরব হয়ে যাক্—পবিত্র হয়ে পরিপূর্ণ হয়ে সুধাময় হয়ে নীরব হয়ে যাক্—সুখদুঃখ পূর্ণ হয়ে উঠুক্, জীবন মৃত্যু পূর্ণ হয়ে উঠুক্, অন্তর বাহির পূর্ণ হয়ে উঠুক্, ভূর্ভুবস্বঃ পূর্ণ হয়ে উঠুক্, বিরাজ করুন অনন্ত দয়া, অনন্ত প্রেম, অনন্ত আনন্দ, বিরাজ করুন শান্তম্ শিবমদ্বৈতম্।

র‍্যালের পরিণয় কাহিনী।

(অগষ্টা ডেবিস্মিথের ইংরাজি গল্প হইতে লিখিত)

[সার ওয়াল্‌টার র‍্যালে একজন সামান্য ব্যক্তি ছিলেন। যৌবনে একদিন লণ্ডনের এক পথ দিয়া যাইবার সময় দেখিলেন সম্মুখে জনতা, রাণী এলিজাবেথ এক অট্টালিকা হইতে নামিয়া গাড়িতে উঠিতেছেন। র‍্যালেও দাঁড়াইলেন। এলিজাবেথ সম্মুখে একটু কর্দ্দমাক্ত স্থান দেখিয়া তাহার উপর চরণ রাখিতে একটু ইতস্ততঃ করিতেছেন দেখিবামাত্র র‍্যালে তাঁহার গাত্রবস্ত্র সেই কর্দ্দমের উপর পাতিয়া দিলেন। রাজ্ঞী ঈষৎ হাস্য দ্বারা তাঁহার সন্তোষ জ্ঞাপন করিয়া গাড়ীতে উঠিয়া চলিয়া গেলেন। সেই অবধি র‍্যালের ভাগ্য পরিবর্ত্তিত হইল। রাজ্ঞীর কৃপাপাত্র হইয়া তিনি দেশের একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি হইয়া উঠিলেন। নবাবিষ্কৃত আমেরিকায় গমন করিয়া প্রভূত ধনরত্ন লইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন। পরে তাঁহার সৌভাগ্যলক্ষ্মী বিমুখ হইলেন। রাজ্ঞীর রোষনয়নে পতিত হইয়া তিনি দীর্ঘকাল বন্দী অবস্থায় অতিবাহিত করিয়া অবশেষে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন। এই ঘটনাটিকে অবলম্বন করিয়াই বর্ত্তমান আখ্যায়িকাটি রচিত হইয়াছে।]

রাজ প্রাসাদের আম দরবারের বাতায়ন পথ দিয়া শীতের ক্ষীণ সূর্য্যকিরণ আসিয়া প্রশস্ত গৃহটিকে আলোকিত করিয়াছে। এই মাত্র রাজ্ঞী এলিজাবেথ তাঁহার অনুচর, সহচর ও পারিষদগণের সহিত সশস্ত্র প্রহরী পরিবৃতা হইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিয়াছেন। রাজ্ঞীর সঙ্গীদলের শেষ ব্যক্তিটি গৃহ হইতে নিক্রান্ত হইতেছিলেন, এমন সময়ে তাঁহার একজন সহচরী ফিরিয়া আসিয়া দ্বাররক্ষককে ইঙ্গিত দ্বারা জানাইল যে, তাহার আর পরদা তুলিয়া ধরিয়া থাকিবার আবশ্যক নাই, তিনি অন্য দ্বার দিয়া গৃহত্যাগ করিবেন।

স্ত্রীলোকটি দেখিতে সুন্দরী, সুবর্ণরঞ্জিত কেশদাম, নীলাভ নয়ন দুটি ঈষৎ বিমর্ষ ও চিন্তান্বিত। কিন্তু তাহার গতি ও দেহভঙ্গী দেখিলে তাহার অন্তর চিন্তা ভারাক্রান্ত বলিয়া বোধ হয় না। বসনভূষণ আড়ম্বর বিহীন। ইঁহারই নাম এলিজাবেথ থ্রগ্‌মরটন্‌, রাণী এলিজাবেথের সহচরীগণের মধ্যে ইনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠা সুন্দরী।

গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া যখন সে বুঝিল যে দ্বারের প্রহরীদ্বয় অন্যান্য পারিষদগণের সহিত সে স্থান ত্যাগ করিয়া গিয়াছে, তখন বালিকা টেমস্‌ নদীতীরবর্ত্তী একটি বাতায়নের দিকে অগ্রসর হইল। বাতায়ন সম্মুখে দাঁড়াইয়া একবার পদাঙ্গুলির উপর ভর করিয়া মাথা তুলিয়া দেখিল। পরে, বাহির হইতে পাছে কেহ তাহাকে দেখিতে পায়, সেই ভয়ে মাথাটি কিঞ্চিৎ বামে হেলাইয়া রাণীর দলবলকে অন্তরাল হইতে লক্ষ্য করিতে লাগিল—রাণী তখন সদলবলে প্রাসাদের একটি প্রকাণ্ড প্রকোষ্ঠের মধ্যে প্রবেশ করিতেছেন। হঠাৎ সে দেখিল মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে নিজেকে সে যেমন করিয়া দলবিচ্ছিন্ন করিয়াছিল, ঠিক সেই ভাবে একজন দীর্ঘায়তন ব্যক্তি একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করিল ও পরে দ্রুতপদক্ষেপে ফিরিয়া আসিয়া আম দরবারের দ্বার মধ্যে প্রবেশ করিল।

বালিকা তাড়াতাড়ি স্বাভাবিক ভাবে ঋজু হইয়া দাঁড়াইয়া টেম্‌সের পরপারবর্ত্তী উদ্যান ও ক্ষেত্রের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া রহিল। তাহার গণ্ডদ্বয়ের রক্তবর্ণ কিন্তু বালি-

কার অন্তরের আন্দোলনটি গুপ্ত রাখিবার চেষ্টাকে ব্যর্থ করিয়া দিল।

পশ্চাতে কে ডাকিল—"এলিজাবেথ থ্‌গ্‌মর্টন্।"

বালিকা পশ্চাৎ ফিরিয়া নবাগতের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিল। পরক্ষণেই তাহার নয়নদুটি আনত হইয়া পড়িল এবং ওষ্ঠাধর ঈষৎ হাস্যরেখায় কম্পিত হইতে লাগিল, তাহারা আর কোন মতেই শাসন মানিল না।

নবাগত ব্যক্তিটি মৃদুস্বরে উচ্ছসিত আবেগ ভরে বলিয়া উঠিলেন—"আমি এমন কি অপরাধ করিয়াছি যে রাণী যতক্ষণ দরবারে উপস্থিত ছিলেন, তাহার মধ্যে তুমি ভুলেও একবার আমার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে না?"

"তাহার কারণ তুমি রাজ্ঞীর দিকেই চাহিয়া থাক, ইহাই আমার ইচ্ছা ছিল।"

"চোখ দুটো ত আমার নিজের!"

বালিকা একটু রহস্যের সহিত উত্তর করিল—"কিন্তু মাথাটা ত তোমার নিজের নয়।"

"কোন্ জিনিষটি আমার নিজের, কোন্ জিনিষটি আমার চুরি গিয়াছে, আর কোন্ জিনিষটি বা আমি প্রফুল্লচিত্তে অপরকে দান করিতে পারি, তা আমি বেশ জানি।"

বক্তার কণ্ঠস্বর বেশ প্রফুল্ল এবং দৃষ্টিটি তাঁহার সঙ্গিনীর রূপগৌরবে মুগ্ধ। এক মুহূর্ত্ত পরেই তিনি আবার বলিলেন—"এলিজাবেথ তোমায় আমি যা দিতে চাই, সেটা কেবল আমাদের দুজনের মধ্যে একটা আদানপ্রদান মাত্র—একটা বিনিময় মাত্র। এক দ্রব্যের বদলে অপর দ্রব্য দেওয়ার নীতি আমরা সকলেই জানি, তবে প্রাণের বদলে প্রাণ দিতে বাধা কি?" কথাগুলি বলিতে বলিতে র‍্যালের রক্তিমমুখ অধিকতর আরক্তিম হইয়া উঠিল।

"সে কেবল আমার প্রাণটা কোমল ও অকপট বলে।"

"ঈশ্বর জানেন, আমারও প্রাণ কি কোমল অকপট নয়? সুন্দরি, আমি তোমার কাছে শপথ করিতেছি যে তুমি আমার এই প্রাণটিকে গ্রহণ করিয়া প্রেমের বিনিময় নীতি ক্রমে তোমার আপনার প্রাণটিকে আমায় সমর্পণ করিলে, তোমাকে কদাচ তাহার জন্য অনুতাপ করিতে হইবে না। এতকাল আমার জীবন মানুষ ও অদৃষ্টের সঙ্গে কঠোর সংগ্রামে অতিবাহিত হয়েছে। আমার এ জীবনের একটা লক্ষ্য, একটা উচ্চাকাঙ্ক্ষা আছে সত্য, কিন্তু আমার অন্তরের গূঢ়তম প্রদেশে যে একটি গুপ্ত মন্দির আছে তথাকার অধিষ্ঠাত্রী দেবী যে এলিজাবেথ, সে সেই সিংহাসনাসীনা, আত্মাভিমানিনী, সর্ব্বনাশিনী এলিজাবেথ্ নয়, সে অপর এক এলিজাবেথ। আমি তাহাকেই যথার্থ ভালবাসি ও তাহারই ভালবাসার ভিখারী। তবে রাণী এলিজাবেথের কাছে যে প্রেমের খেলা খেলি, সে কেবল আপনার প্রাণ রক্ষার জন্য।"

এই কথা বলিয়া তিনি তাঁহার দীর্ঘ হস্ত প্রসারিত করিয়া ধরিলেন, যেন এলিজাবেথ তাঁহার সেই বিস্তীর্ণ অঞ্জলি মধ্যে কিছু রাখিয়া দিবে বলিয়া তিনি আশা করেন। বালিকার স্ফীত বক্ষ ও আরক্তিম কপোল তাহার অন্তরের উদ্বেগকে প্রকাশ করিলেও, সে নিজে নিরুত্তর দেখিয়া র‍্যালে বলিয়া উঠিলেন—

"তোমারও ভালবাসা পাইতে হইলে কি মণি-মাণিক্যের আবশ্যক হয় ?" এই বলিয়া তিনি তাড়াতাড়ি তাঁহার বস্ত্র মধ্যে কি একটা খুঁজিতে লাগিলেন।

তাঁহার কথাগুলি কশাঘাতের ন্যায় বালিকাকে আঘাত করিল। সে কাতর স্বরে বলিয়া উঠিল—"না, না ওয়াল্টার! তুমি আমাকে পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে বড়, সব চেয়ে ভাল, সব চেয়ে মহৎ ধন দান করেছ।" কথা শেষ হইতে না হইতে একটি মুক্তার মালা বাহির হইয়া পড়িল।

"ও সকল মণিমাণিক্য আমাকে দিও না! আমায় কেবল তোমার ভালবাসাটুকু দেও, সেইটেই আমার কাছে সব চেয়ে মূল্যবান।"

র‍্যালে বালিকার একটি হাত ধরিয়া রুদ্ধকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন—"তুমি যা বল্‌ছ, তা কি সত্য? আমার ভালবাসার কি তোমার কাছে সত্যই কোন মূল্য আছে ?"

বালিকা ভয়ে একবার চারিদিকে চাহিয়া বলিল—"আস্তে কথা কও। মনে থাকে যেন আকাশের পাখীটা পর্য্যন্ত আমাদের এ সংবাদ রাণীর কাছে উপস্থিত করতে পারে।"

"কিন্তু তুমি কি আমায় ভালবাস ?"

"হাঁ বাসি।"

তখন সেই দীর্ঘ সুপুরুষ নত হইয়া বালিকার ধৃত হস্তাঞ্জলির উপর একটি সতৃষ্ণ চুম্বন রাখিয়া দিলেন।

"কিন্তু, ওয়াল্টার, রাণীর কাছ থেকে রক্ষা পাবার কি হবে ?"

"সে ভার আমার। মানুষের চিরদিনই এ ভাবে শৃঙ্খল ভোগ করা সম্ভব নয়।"

এই কথা বলিয়া র‍্যালে সেই মুক্তার মালাটি বালিকার কণ্ঠে পরাইয়া দিলেন। বালিকা মালাটিকে চুম্বন করিয়া তাহা গ্রহণে সম্মতি জানাইল।

(২)

কয়েক মাস পরে একদিন আমদরবারের বাহিরের আকাশ বজ্রভরা মেঘে পরিপূর্ণ। সে দিন সে গৃহ রাণী এলিজাবেথের এক পারিষদের নিকট অসহ্য হইয়া উঠিল। লোকটি সৈনিক ও নাবিক, সুতরাং বাহিরের মুক্ত আকাশ ও বাতাসের জন্য তাহার প্রাণটা স্বভাবতঃই আকুল হইয়া উঠিতেছিল। তাহার তৃষিত দৃষ্টি বার বার পার্শ্বস্থ বাতায়নের দিকে ছুটিতেছিল।

একজন ওমরাহ তাঁহার ঠিক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ছিলেন। তিনি তাহাকে চুপি চুপি বলিয়া উঠিলেন—"ব্যাপার কি র‍্যালে? তোমার সেই সাধের পাখীটির কাছে যাবার জন্য বেশী ব্যস্ত হয়ে পড়েছ নাকি ?"

র‍্যালে প্রশ্নকর্ত্তার প্রতি একবার অর্থভরা দৃষ্টি দিয়া বলিলেন—"আমার বোধ হয় রাণী আমাকে সন্দেহ করেছেন।"

এমন সময়ে সঙ্গীত মধুরকণ্ঠে রাণী এলিজাবেথ আদেশ করিলেন—"এক্ষণে আমাদের ইচ্ছা আপনারা সকলে প্রস্থান করুন। কেবল সার ওয়াল্টার র‍্যালে এখানে উপস্থিত থাকুন, তাঁহার সহিত আমাদের কিঞ্চিৎ পরামর্শ করিবার আছে।"

বাহিরে ভেরীর নিনাদ উঠিল। পারিষদগণ একে একে সকলেই দরবার ত্যাগ করিলেন।

গৃহ জনশূন্য হইল, দ্বারের পরদা পড়িয়া গেল। এলিজাবেথ এতক্ষণ তাঁহার বাম

হস্তের দুইটি অঙ্গুলির উপর চিবুক রাখিয়া হেলিয়া ছিলেন। এইবার ধীরে ধীরে ঋজু হইয়া বসিয়া মস্তকের ঈষৎ ভঙ্গী দ্বারা র‍্যালেকে নিকটে আসিতে ইঙ্গিত করিলেন। র‍্যালে আজ্ঞাপালন করিবামাত্র মৃদুস্বরে বলিলেন—"আমাদের একজন সহচরীকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। আমি তাহার অনুপস্থিতি অনেকবার লক্ষ্য করিয়াছি। শুনিলাম তুমি নাকি তাহার সন্ধান বলিতে পার?"

এই বলিয়া রাজ্ঞী নীরব হইলেন। তাঁহার কৃষ্ণচক্ষুর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি র‍্যালের অন্তরস্থল ভেদ করিতে লাগিল।

তখন তিনি নতজানু হইয়া উত্তর করিলেন —"মহারাণি, আপনি বলশালিনী, আপনার পক্ষে অপরের দুর্ব্বলতাকে ক্ষমা করা অধিক সম্ভব। এলিজাবেথ থ্রগ্‌মর্‌টন্‌কে আমি বিবাহ করিয়াছি সত্য; কিন্তু তৎসত্ত্বেও আমি যে এখনও আমার রাজ্ঞীকে ভালবাসি এবং তাঁহার জন্য প্রাণপাত পর্য্যন্ত করিতে প্রস্তুত, এ বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই।"

"মানুষের কথা, র‍্যালে, কেবল শূন্যে ধ্বনি মাত্র।"

"মহারাণি, এতকাল যে আপনাকে প্রাণ দিয়া ভাল বাসিল, সেবা করিল, আজ এরূপ নির্দ্দয়ভাবে তাহার প্রাণের সকল আশা চূর্ণ করিবেন না। অধমের অনুরোধ আপনি যেন ক্রোধ বশে বিস্মৃত না হন যে জগতে দয়া না থাকিলে দেবত্ব থাকিত না, প্রতিহিংসা পশুর ও মানবের ধর্ম্ম। পৃথিবীর সকলেই আপনার ন্যায় সৌভাগ্যবতী ও শক্তিশালিনী হয় না। আপনার প্রজাগণ নিম্নের অধিত্যকা ও সমভূমিতে পর্য্যটন করিয়া বেড়ায়, কিন্তু পর্ব্বতশৃঙ্গই আপনার বিহার স্থল। বিধাতার গৌরব রশ্মি আপনার শিরোদেশকে সমুজ্জ্বল করিয়াছে। সেইজন্য আজ নতজানু হইয়া আমার এই কর্ম্মের জন্য আপনার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি।"

"তুমি উঠিয়া আরও একটু নিকটে এস। হাঁ, এই সিংহাসনের সোপানের উপর অতীত সুখসময়ের ন্যায় নতজানু হইয়া আমার পার্শ্বে অবস্থান কর।"

রাজ্ঞী তাঁহার বহুমূল্য হীরকখচিত দস্তানাটি খুলিয়া মৃণালকরের কমনীয় সুন্দর অঙ্গুলিগুলি নতজানু র‍্যালের ভ্রমরকৃষ্ণ কেশদামের উপর অতি ধীরে রক্ষা করিলেন।

"ওয়াল্‌টার, আমার কৃপা কি এতই মূল্যহীন?" রাজ্ঞীর কণ্ঠস্বর অতি মৃদু সঙ্গীতমধুর ও নতমুখ র‍্যালের অতি নিকটবর্ত্তী। "মধ্যাহ্ন সূর্য্যের পূর্ণগরিমা ভোগ করিয়াও নামগোত্রহীন একটা ক্ষুদ্র তারকার ক্ষীণ আলোকলাভ করিতে তোমার আকাঙ্ক্ষা? তোমার রাজ্ঞীর চুম্বন লাভ করিয়া আবার অপর চুম্বন লাভ করিতেও তোমার সাধ? ওয়াল্‌টার, মুখ তোল। তোমার চক্ষের দৃষ্টিতে আমি তোমার অন্তর-কথা পাঠ করিব। এ কি, তোমার মুখে কোন বেদনার চিহ্ন নাই, আপন দোষ খণ্ডনের লেশমাত্র প্রয়াস নাই! তুমি আমারই ন্যায় সমভাবে আমার দিকে চাহিয়া আছ! তোমার কপোলের রক্তিমবর্ণ কিছুমাত্র বিবর্ণ হইল না!"

মুহূর্ত্তকাল নীরব থাকিয়া এলিজাবেথ আরও মধুরস্বরে বলিলেন—"তুমি নিরুত্তর

রহিলে যে! লজ্জা আসিয়া কি তোমার বাক্‌রোধ করিল? আচ্ছা, একটা কথা শোন। আমি তোমাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করিব, তুমি ঈশ্বরকে সাক্ষী করিয়া সত্যকথা বলিও, নচেৎ ধর্ম্মে পতিত হবে। তুমি কি এই বালিকাকে যথার্থ ভালবাসিতে ব'লেই তাকে বিবাহ করেছ?"

র‍্যালে কিয়ৎক্ষণ নীরব রহিলেন। পরে নির্ভীক চিত্তে রাজ্ঞীর মুখের দিকে চাহিয়া সসম্মানে অথচ সত্যবাদীর ন্যায় অকুণ্ঠিত ভাবে বলিয়া উঠিলেন—"মহারাণি, ভাবী পত্নীকে পুরুষের যেরূপ ভালবাসা সম্ভব, আমি এই রমণীকে সেই রূপই ভাল বাসিতাম।"

তৎক্ষণাৎ, কৌশলী যোদ্ধা যেমন চকিতে তাহার কোষ হইতে তীক্ষ্ণ তরবারি নিষ্কাসিত করে, সেইরূপ নিমেষের মধ্যে এলিজাবেথ তাঁহার ক্রোড়স্থিত রত্নখচিত দস্তানাটি তুলিয়া লইয়া সার ওয়ালটারের মুখের উপর সবলে নিক্ষেপ করিলেন। তাহার রত্নরশ্মি চারিদিকে ঝলসিয়া উঠিল।

র‍্যালে দাঁড়াইয়া উঠিলেন। এ অপমানে ক্রোধবহ্নি তাঁহার বীরমুখে জ্বলিয়া উঠিল। সেই দীর্ঘ সুঠাম দেহ, শুভ্র সুন্দর পরিচ্ছদ-মণ্ডিত, কটিদেশে নানা রত্নখচিত তরবারি-কোষ এবং দক্ষিণে মণিমুক্তাখোদিত ছুরিকা কোষ, ঝুলিতেছে ও ঝলসিতেছে, সে রূপ মনোহর বটে!

রাজ্ঞীও আসন ত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহার সেই প্রায় ষাট্ বৎসরের বার্দ্ধক্য সত্ত্বেও সে দেহখানি নানা বসনভূষণ মণিমুক্তায় বেশ সুন্দর দেখাইতেছিল। সেই নাতি-দীর্ঘ বার্দ্ধক্যের রেখাঙ্কিত বদন, সেই স্ফুরোজ্জ্বল কৃষ্ণপক্ষ্ম নয়ন, সেই বক্র নাসিকা এবং নিখুঁৎ কপাল ও চিবুক যেন তাঁহাকে লালসা ও ক্রোধের জীবন্ত প্রতিমা করিয়া চিত্রিত করিয়াছিল।

রাজ্ঞী তীব্র স্বরে চীৎকার করিয়া উঠিলেন—"কে আছ ওখানে? আমার প্রহরী-গণ কোথা?"

মুহূর্ত্তের মধ্যে পরদা সরিয়া গেল, দ্বাদশ জন সশস্ত্র প্রহরী সশব্দে গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিল।

কয়েক মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে যে ব্যক্তি রাজ্ঞীর প্রিয় পাত্রের মধ্যে গণ্য ছিল, এক্ষণে সেই হত-ভাগ্যের প্রতি একটি ক্ষীণ অঙ্গুলি নির্দ্দিষ্ট করিয়া এলিজাবেথ আদেশ করিলেন—"সার ওয়াল্‌টারকে অন্ধকূপে লইয়া যাও।"

ভবিষ্যৎ অদৃষ্ট বুঝিয়া সার ওয়াল্‌টার তীব্র স্বরে বলিয়া উঠিলেন—"অন্ধকূপে!"

"হাঁ, সেই খানেই তোমার সুনিদ্রা হইবার সম্ভাবনা।"

"দোহাই আপনার, আমাকে অন্ধকূপে পাঠাইবেন না। আমি বন্দী থাকিলে বা জীবন পর্য্যন্ত দান করিলে যদি মহারাণীর লেশমাত্র উপকার হয়, তাহা হইলে আমি ঈশ্বর শপথ করিয়া বলিতেছি আমি স্বাধীনতা বা আত্মজীবন চাহি না। কিন্তু দোহাই আপনার আমাকে অন্ধকূপে প্রেরণ করিবেন না।"

"ইহাকে এস্থান হইতে লইয়া যাও ও আমার সহচরীগণকে ডাকিয়া দেও। কি পাপ! আমার স্বর্গগত পিতার দরবারে দাঁড়াইয়া কি আমাকে তোমার সহিত কথা কাটাকাটি করিতে হইবে? না, সার ওয়াল্-

টার, তোমার সহিত আমার আর কোনও কথা নাই। আমি অনেক কথা ক'য়ে নিজের পদমর্য্যাদা নষ্ট করেছি বলেই বোধ হয়।"

সহচর সহচরীগণ পারিষদবর্গের সহিত আসিয়া গৃহমধ্যে উপস্থিত হইলে রাজ্ঞী উচ্চকণ্ঠে বলিলেন—"লিস্টার, সিংহাসনের সোপানের উপর আমার হাতের দস্তানাটা যে পড়িয়া রহিয়াছে তাহা কি তোমরা কেহই দেখিতে পাও নাই? ইংলণ্ডের রাজ্ঞীকে কি তাঁহার দস্তানা কুড়াইবার জন্য নত হইতে হইবে?"

লিস্টার তৎক্ষণাৎ র‍্যালের মুখোপরি প্রক্ষিপ্ত সেই দস্তানাটি কুড়াইয়া নতজানু হইয়া এলিজাবেথের সম্মুখে ধরিলেন। তখন তিনি তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন "তোমার প্রতি সন্তোষের চিহ্ন স্বরূপ আমি তোমাকে আমার অঙ্গুলি স্পর্শ করিতে অনুমতি দিলাম। বাদকগণ, ভেরীনিনাদ করিয়া এ স্থান হইতে অগ্রসর হও।"

সার ওয়ালটার র‍্যালের পার্শ্ব দিয়া একে একে সকলেই গৃহত্যাগ করিল। হতাশা-পীড়িত হৃদয়ে সার ওয়ালটার একাকী সৈন্য-পরিবৃত হইয়া তথায় অবস্থান করিলেন।

(৩)

ছয় মাস অন্ধকূপে অতিবাহিত করার পর পাঁচ বৎসরের জন্য র‍্যালে রাজদরবার হইতে নির্ব্বাসিত হন। এই কয় বৎসর তাঁহারা স্বামী স্ত্রী উভয়ে তাঁহাদের গ্রাম্য ভবনে বাস করেন। তথায় মনোহর পুষ্পোদ্যানে কুসুমিত বীথিকার মধ্যে, মুক্ত আকাশের তলে, স্নিগ্ধ সুগন্ধি সমীরণের কোলে পদচারণা করিয়া তাঁহারা তাঁহাদের রুদ্ধ প্রেমের মুক্ত বিনিময়ে কালাতিপাত করিতেন।

মাঝে মাঝে তাঁহার পত্নী জিজ্ঞাসা করিতেন—"তুমি কি এখন সুখী?" র‍্যালে উত্তর করিতেন—"হাঁ, সুখী বটে, কিন্তু মনে থাকে যেন আমার অনেক সাধ এখনও অপূর্ণ রয়েছে। ঐ অনন্ত সমুদ্রের পরপারে ধনধান্যে পরিপূর্ণ বসুন্ধরা পড়িয়া আছে, সেই ধন কিছু সংগ্রহ করবার সাধ আছে। তা ছাড়া ইংলণ্ডের মত এই ক্ষুদ্র দেশ এককালে দেশের লোক সংখ্যার পক্ষে অনুপযুক্ত হ'য়ে উঠবে। একটা কোথাও দাঁড়াবার স্থান না করলে, গর্ত্তের ইঁদুরের মত সকলকে এই খানে ব'সে মরতে হবে।"

"কিন্তু তাই ব'লে আমাদের সে দেশে যাওয়া হ'তে পারে না।"

"থাক্ থাক্! তুমি আমার কাছে তোমার বুদ্ধি প্রকাশ না ক'রে তোমার প্রাণটিই প্রকাশ করো। অমন মধুর প্রাণ এ জগতে আর নাই।"

এই ভাবে কথা কহিতে কহিতে দুই জনে উদ্যানপথে ভ্রমণ করিতেন।

পাঁচ বৎসরের পর রাজ্ঞীর সহিত মনোমালিন্য ঘুচিয়া গেল। র‍্যালে অকূল সমুদ্র পারে যাত্রা করিয়া আমেরিকা হইতে প্রভূত ধনরত্ন লইয়া আসিলেন; কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া পুনরায় অন্ধকূপে আবদ্ধ হইলেন।

সেই অন্ধকূপের মধ্যে র‍্যালে মৃত্যুর অপেক্ষা করিয়া দ্বাদশ বর্ষ অতিবাহিত করিলেন।

প্রাণদণ্ডের পূর্ব্বরাত্রি আসিয়া উপস্থিত। তাঁহার পত্নী ও সন্তান তাঁহার নিকটে। অন্ধকূপের অস্বাস্থ্যকর বায়ু আজ তাঁহার সেই সবল দেহকে ক্ষয় করিয়া ফেলিয়াছে। সে ঋজু

দেহ আজ নত হইয়া পড়িয়াছে, এক হস্তের অঙ্গুলিগুলি কুঞ্চিত হইয়া গিয়াছে, শরীরের এক দিক মৃত দেহের ন্যায় অসাড় হিম হইয়া পড়িয়াছে, সে ভ্রমরকৃষ্ণ কেশগুলি আজ সব পাকিয়া উঠিয়াছে।

সেই অন্ধকার নিশীথে মৃত্যুর দ্বারে দাঁড়াইয়া র‍্যালে তাঁহার পত্নীকে সম্ভাষণ করিয়া বলিলেন—

"প্রিয়ে, আজ তোমার সঙ্গে এই শেষ কথা। না, না, ও স্থান থেকে ন'ড়ো না। আজ আবার সাধ হচ্চে তোমার হাতটি ধ'রে এই দুর্ব্বল কোলের উপর তোমায় বসাইয়া রাখি। কিন্তু আর তোমাকে দুঃখ দিতে আমার প্রবৃত্তি নাই। আমাদের এ জীবনের সকল দুঃখ যেন আমারই সঙ্গে সমাধিস্থ হ'য়ে ধূলিতে পরিণত হয়। আমার এই হত্যায় বিচলিত হ'য়ো না। তোমার ন্যায় রমণীর শোককে সংযত করা কর্ত্তব্য। তুমি আমার জন্য যে সকল দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করেছ, তাতে আমার মুক্তি বা প্রাণরক্ষা না হ'লেও আমি তোমার সে ঋণ এ জীবনে শোধ করিতে পারিলাম না।"

শোকবিহ্বলা এলিজাবেথ তাঁহার পতির চরণে লুণ্ঠিতা হইয়া পড়িলেন। প্রফুল্লচিত্ত বালক খেলিতে খেলিতে একবার নিস্তব্ধ হইয়া বিস্মিত ভাবে তাহাদের মুখের দিকে চাহিল।

পত্নীকে সান্ত্বনা দিয়া র‍্যালে বলিয়া উঠিলেন,—

"তুমি আমার শোকে অধিকদিন বিহ্বল হইও না। বালক পুত্রটির কথা মনে রেখো। মনে রেখো তাহার পিতা কপট কাপুরুষ ছিল না, সে মৃত্যুকে অবজ্ঞা করিতে জানিত। আমি আর বেশী কথা কইতে পারচি না। পৃথিবীর কাছ থেকে বিদায় নেবার সময় নিকট হ'য়ে এল। এখন পার্থিব চিন্তা ত্যাগ করাই শ্রেয়। জীবনে যে দেহ হ'তে তুমি বঞ্চিত হ'লে, মৃত্যুর পর আমার সেই শবদেহ নিয়ে আমাদের সেই উদ্যানমধ্যে সমাধি দিও।"

কিছুক্ষণ উভয়েই নীরব রহিলেন। অন্তিমের উচ্ছ্বসিত আবেগ গোপন রাখিবার জন্য র‍্যালে সহসা আসন ত্যাগ করিয়া উঠিলেন। এলিজাবেথ আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিয়া পতির শীর্ণ বাহুর উপর ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। র‍্যালে কষ্টে তাঁহাকে আলিঙ্গন মধ্যে ধরিয়া বলিলেন—

"প্রিয়ে, বিদায়! যতদিন জীবিত ছিলাম তুমিই আমার হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ছিলে!

—এলিজাবেথ স্বামীর বাহুর পরে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। দুর্ব্বল দেহে পত্নীর দেহভার বহনে অক্ষম হইয়া র‍্যালে রুদ্ধবক্ষে উপস্থিত প্রহরীহস্তে মূর্চ্ছিতা পত্নীকে চিরদিনের জন্য বিদায় দিলেন। প্রহরীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"ইহাকে গ্রহণ কর। ঈশ্বর ইহাদিগকে রক্ষা করুন।"

পরক্ষণেই ঝন্ ঝন্ শব্দে লৌহকবাট বন্ধ হইয়া গেল। সেই অন্ধকারমধ্যে র‍্যালে একা!

চব্বিশ ঘণ্টা পরে একটি শোকসন্তপ্তা রমণী পতির মৃতদেহ ভিক্ষা করিয়া কম্পিত হস্তে এই পত্রখানি লিখিল—"আমি আমার স্বর্গগত স্বামী সার ওয়াল্টার র‍্যালের মৃতদেহ সমাধিস্থ করিবার জন্য আজ আপনাদিগের নিকট তাঁহার শবপ্রার্থিনী—ঈশ্বর আমার এ প্রার্থনা পূরণ করুন।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

পৃথিবীর মানব-সমাজে ভারতের স্থান। *

মনুষ্য জাতির মধ্যে সাম্য ও ভ্রাতৃভাব অপেক্ষা আদর্শ আর নাই এবং এই আদর্শকে কর্ম্মে পরিণত করার চেষ্টা অপেক্ষা উচ্চতর মহত্তর কর্ম্মও আর নাই। কিন্তু এস্থলে আমাদিগের ইহা মনে রাখা আবশ্যক যে এই আদর্শটির ভিত্তিস্থল আমাদের অন্তরাত্মার মধ্যে। যেখানে এক জাতি অপর জাতিকে ঘৃণা করে, বা যেখানে সংকীর্ণ সংস্কার বা গর্ব্বের বশবর্ত্তী হইয়া এক সম্প্রদায় অপর সম্প্রদায়কে হীনজ্ঞান করে, সেখানে এই ভ্রাতৃভাব প্রতিষ্ঠিত হওয়া অসম্ভব। যেখানে আমাদের পরস্পরের মধ্যে সুবুদ্ধি ও সহানুভূতি থাকে, সেইখানেই এই ভাবটির উপলব্ধি সম্ভব।

এই ভ্রাতৃভাবের আদর্শটি অন্তরে লইয়া পৃথিবীর বিভিন্ন জাতিগণের মধ্যে আমরা যখন ভারতের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করি, তখন আমাদের সম্মুখে কতকগুলি বিকট বাধা আসিয়া উপস্থিত হয়। সর্ব্বপ্রধান বাধা এই যে ভারতবর্ষ আসিয়ার অন্তর্গত ও ভারতবাসী আসিয়াবাসীর মধ্যে গণ্য। বহুশতাব্দী হইতে ইয়ুরোপ ও আমেরিকা আসিয়া ও প্রাচ্য বস্তু মাত্রকেই ঘৃণা করিয়া আসিতেছে। ইহা এক আশ্চর্য্য ব্যাপার, কারণ ভাবিয়া দেখিলে আসিয়া আমাদের কে? আসিয়াই আমাদের আদি মহাদেশ। আসিয়াই পৃথিবীর বিভিন্ন বর্ণ, জাতি, ভাষা, শিল্প এবং সর্ব্বোপরি পৃথিবীর উচ্চজীবনের আদি জননী। ইয়ুরোপ ও আমেরিকার সভ্যতার প্রত্যেক মূলটিই আসিয়ার রসে সঞ্জীবিত ও পুষ্ট। তবে আমরা আসিয়ার প্রতি ঘৃণাদৃষ্টি করি কেন? পৃথিবীর যাবতীয় প্রসিদ্ধ ও সুমহৎ ধর্ম্মগুলির উৎপত্তি ঐ আসিয়ার ভূমিতে। যে দেশ হইতে আমরা আমাদের বাইবেল্ ও ধর্ম্মবিশ্বাস পাইয়াছি, সে দেশের প্রতি আমাদের এ হীনভাব কেন? অথচ আমাদের সকলেরই মধ্যে এই ভাবটি বর্ত্তমান। আজ বহুশতাব্দী হইতে ইয়ুরোপ তাহার ঘৃণা ও নির্দ্দয়তার দ্বারা আসিয়ার প্রতি যে অশেষ প্রকার নির্য্যাতন করিয়া আসিতেছে, তাহার বিশদ বর্ণনা করিবার অবসর আমার নাই। যাহা হউক, ভারতবর্ষ যে আসিয়ার মধ্যে অবস্থিত, এই ঘটনাটিই আমাদিগের ভারতবাসীকে বুঝিবার পক্ষে এবং আমাদিগের মধ্যে ভ্রাতৃভাব প্রতিষ্ঠিত হইবার পক্ষে একটি বিরাট বাধা।

আর একটি বাধা এই যে আমাদিগের ধারণা ভারতবর্ষ "পৌত্তলিক" দেশ। বহুদিন হইতে আমরা হিন্দুদিগকে খৃষ্টান করিবার জন্য তথায় ধর্ম্মপ্রচারক পাঠাইয়া আসিতেছি। আমরা এই "পৌত্তলিক" কথাটি যেভাবে ব্যবহার করি, তাহাতে তাহার মধ্যে কি একটা ঘৃণার ভাব লুক্কায়িত থাকে না? ইহা কি কতক অংশে বর্ব্বর বা অসভ্যের অর্থবোধক নহে? খৃষ্টান হইয়া আমরা কি আপনাদিগকে ধর্ম্মে ও সভ্যতায় "পৌত্তলিক" অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করি না? বস্তুতপক্ষে ভারতে ধর্ম্মপ্রচারক প্রেরণ করার অর্থই কি আমাদিগের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করার চেষ্টা নহে এবং ইহাই কি আমাদিগের উভয়ের মধ্যে ভ্রাতৃভাবের পক্ষে একটি বাধাস্বরূপ নহে? যদি আমাদিগের ধর্ম্মপ্রচারকগণ সকলেই উদারচেতা হইতেন, তাহা হইলে হয়ত এই বাধার সৃষ্টি হইত না। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ ধর্ম্মপ্রচারকগণ সকল সময়েই যে সর্ব্বাপেক্ষা উদারচেতা তাহা নহে। প্রকৃতপক্ষে আমাদের দেশের ধর্ম্মপ্রচার-সমিতিগুলি মনে করেন যে ধর্ম্মশাস্ত্রে অনভিজ্ঞ ব্যক্তি প্রেরণ করাই সর্ব্বপ্রথম আবশ্যক। অর্থাৎ, তাঁহারা যাঁহাদিগকে প্রেরণ করেন তাঁহারা শিক্ষাগত সংকীর্ণমনা এবং যে জাতির মধ্যে ধর্ম্মপ্রচারে তাঁহারা নিযুক্ত হন, তাহাদিগের ধর্ম্ম বা সভ্যতার ভালটুকু উপলব্ধি করিতে তাঁহারা অক্ষম। ধর্ম্মপ্রচারকগণের নিকট হইতে ভারতের বিবরণ শুনিবার বা পাঠ করিবার সময়ে আমাদের সর্ব্বদা এই কথাটি মনে রাখা কর্ত্তব্য।

---

* আমেরিকার বোষ্টন্ নগরে জে, টি, সাণ্ডারল্যাণ্ড সাহেব এই বক্তৃতাটি পাঠ করিয়াছিলেন।

যদি আমাদের ধর্ম্মপ্রচারকগণ এদেশে ফিরিয়া আসিয়া বলিতেন যে ভারতের অধিবাসিগণ আমাদিগেরই মত বুদ্ধিমান, ধর্ম্মভাবাপন্ন, আমাদিগেরই মত তাহাদিগের পারিবারিক জীবন পবিত্র ও চরিত্র নির্দ্দোষ, তাহা হইলে আমাদিগের ধর্ম্মমণ্ডলীর মধ্যে তাহার ফল কি প্রকার হইত? তৎক্ষণাৎ চতুর্দ্দিকে প্রশ্ন উঠিত—তবে ধর্ম্মপ্রচারক প্রেরণ করা কেন? ধর্ম্মপ্রচার-সমিতির আবশ্যকতা কি? সুতরাং আমরা দেখিতে পাইতেছি যে ধর্ম্মপ্রচারকগণ ভারতের চিন্তা ও জীবনের ভাল দিকটি বর্ণনা হইতে বিরত হইতে বাধ্য—তাঁহারা কেবল তথাকার হীনতম ও নিকৃষ্টতম দিকটাই আমাদের নিকট প্রকাশ করেন। তাহার ফলে আমরা যথার্থ ভারতের পরিচয় হইতে বঞ্চিত থাকিতে বাধ্য হই।

তদ্ভিন্ন আমাদিগের ইহাও মনে রাখা উচিত যে যথার্থপক্ষে এই সকল ধর্ম্মপ্রচারকের মধ্যে অতি অল্প লোকই ভারতের শ্রেষ্ঠ ভাবটির সংস্পর্শে আসিবার ও তাহা উপলব্ধি করিবার অবসর লাভ করেন। তাঁহাদের ধর্ম্মপুস্তক লইয়া তাঁহারা যে সকল লোকের নিকট অগ্রসর হন, তাহারা প্রধানতঃ তথাকার নিম্নতম শ্রেণীর নিরক্ষর অশিক্ষিত ও চরিত্রহীন ব্যক্তি। ভারতের বুদ্ধি, সাহিত্য, শিল্প ও উচ্চতর ধর্ম্মভাব সম্বন্ধে তাঁহারা অপেক্ষাকৃত অল্পই জানেন। তদ্ভিন্ন ইঁহারা যতই ভাল লোক হউন না কেন, বর্ত্তমান ব্যবস্থায় তাঁহারা ভারতের অসম্পূর্ণ ও পক্ষপাতী বিবরণ দিতে বাধ্য। সুতরাং পাশ্চাত্য দেশের পক্ষে প্রধানতঃ এই সকল ধর্ম্মপ্রচারকের নিকট হইতেই ভারতবর্ষ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করা ভিন্ন উপায়াভাব যে কতদূর শোচনীয় ব্যাপার তাহা আমরা সকলেই বুঝিতে পারিতেছি। যখন ভারতবাসীর চরিত্র আমাদিগের সম্মুখে এরূপ চিত্রে বর্ণিত হয় যে আমরা তাহাদিগকে উদ্ধত গর্ব্বের সহিত ঘৃণার চক্ষে না দেখিলেও, অন্ততঃ আক্ষেপ মিশ্রিত একটু কৃপাচক্ষে না দেখিয়া থাকিতে পারি না, তখনই আমাদিগের উভয়ের মধ্যে যথার্থ জাতীয়ভাবের মুল উপাদানগুলি নষ্ট হইয়া যায়। ভ্রাতৃভাব সম্বন্ধে চিন্তার সময়ে ভারতের কথা মনে হইলে আমাদের সম্মুখে আর একটি বাধা আসিয়া উপস্থিত হয়—ভারতবর্ষ বিজিত দেশ, ইংলণ্ডের অধীন; ভারতবাসী স্বাধীন জাতি নহে। বিদেশী শক্তির তরবারিবলে ইহাদের অধিবাসীগণ বশীভূত; রাজনীতিক্ষেত্রে তাহারা তাহাদিগের আপন ভাগ্যগঠনের অধিকার হইতে বঞ্চিত,—বিদেশী প্রভু তাহাদিগকে সর্ব্বতোভাবে শাসিত করিয়া রাখিয়াছে। অধীনতার এই অবস্থা যে কেবল যৎপরোনাস্তি অপমানকর তাহা নহে—ইহা অধঃপতন আনিয়াও উপস্থিত করে। ইহা ভ্রাতৃভাবটিকে নষ্ট করে। বস্তুতঃপক্ষে একটি স্বাধীন ও একটি পরাধীন জাতির মধ্যে রাজনৈতিক ভ্রাতৃভাব প্রতিষ্ঠিত হওয়া অসম্ভব।

ভারতবাসী স্বাধীন জাতির শক্তি ও অধিকার হইতে বহুভাবে বঞ্চিত। আমি এস্থলে দুই একটির উল্লেখ করিব মাত্র।

পৃথিবীর রাজনীতি সম্বন্ধীয় জীবন ও কর্ম্মে তাহার প্রতিনিধি প্রেরণের অধিকার নাই। ওয়াশিংটনে যাইলে আমরা কি দেখিতে পাই? পৃথিবীর ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল স্বাধীন জাতিরই কোন না কোন প্রতিনিধি তথায় রহিয়াছে। কিন্তু ভারতের কোন প্রতিনিধি তথায় আছে কি? কেহই না; অথচ ভারতে ত্রিশ কোটি লোকের বাস—লোকসংখ্যায় রুষিয়া অপেক্ষা দ্বিগুণ। ইয়ুরোপের কোনও রাজদরবারে কি কোনও ভারত-প্রতিনিধি নিযুক্ত আছে? একটিও নহে। ইহা অপেক্ষা হীনতম অবস্থায় কি কোনও জাতিকে স্থাপিত করা সম্ভব? জগতের সাম্যনীতির বিরুদ্ধে ইহা অপেক্ষা জঘন্যতম অত্যাচার আর কি কিছু সম্ভব?

একটি বিষয় লইয়া ভারতবর্ষকে চীন ও জাপানের সহিত তুলনা করিয়া দেখ। জাপান তাহার শ্রেষ্ঠ যুবকগণকে ইয়ুরোপ ও আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয় ও শিল্প বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিতেছে, যাহাতে আমাদিগের দেশ হইতে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান ও শিক্ষা লাভ করিয়া, তাহারা স্বদেশে যাইয়া স্বজাতির মধ্যে অকাতরে সেই জ্ঞান ও শিক্ষা প্রচার করিতে সক্ষম

হয়। গত চল্লিশ বৎসরের মধ্যে জাপান যে অসাধারণ উন্নতি লাভে সমর্থ হইয়াছে, ইহাই তাহার এক প্রধান কারণ। চীনও জাপানের আদর্শ অনুকরণ করিতেছে। বর্ত্তমান সময়ে আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়ে চারি শত হইতে পাঁচ শত চীন ছাত্র অধ্যয়ন করিতেছে, এবং প্রতি বৎসরই তাহাদিগের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছে। এই সকল যুবকগণের নিকট হইতে চীন পাশ্চাত্য-দেশের দেয় যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ শিক্ষা ও জ্ঞান, যাহা কিছু মানসিক ও নৈতিক জ্ঞান সকলই নিজস্ব করিতে সমর্থ হইবে। এই সকল যুবক দেশে ফিরিলে চীন গবমেণ্ট তাহার সাম্রাজ্যের চতুর্দ্দিকে ইহাদিগকে নেতৃত্বের পদে নিযুক্ত করিবেন।

ভারতবর্ষও জাপান ও চীনের ন্যায় স্বদেশের কল্যাণ কল্পে আমাদিগের শিল্প বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য তাহার যুবকগণকে এ সকল দেশে প্রেরণ করিতে ইচ্ছুক। ভারতের লক্ষ লক্ষ লোক জ্ঞান ও উন্নতি লাভের জন্য ব্যগ্র হইয়া রহিয়াছে। কতিপয় ভারতবাসী এদেশে আসিয়াছে বটে,—কিন্তু বর্ত্তমান ভারত গবমেণ্ট স্বাধীন স্বায়ত্তাধীন ভারতগবমেণ্টের ন্যায় কি তাহাদিগকে প্রেরণ ও সাহায্য করিতেছেন? না, তাহা নহে। ইঁহারা তাহাদিগের পথে বাধাই প্রদান করিতেছেন। তাহারা এখানে আসিয়া কি করিতেছে দেখিবার নিমিত্ত ইঁহারা তাহাদিগের পশ্চাতে গুপ্তচর নিযুক্ত করিতেছেন। তাহাদিগকে সদাই সন্দেহের চক্ষে দেখিতেছেন তাহাদিগের গতিবিধি লক্ষ্য করিতেছেন। ভারতগবমেণ্টের ইচ্ছা নহে যে তথাকার যুবকগণ স্বদেশ ত্যাগ করিয়া পাশ্চাত্য জগতের জ্ঞান লাভ করে। বিশেষতঃ আমেরিকার ন্যায় স্বাধীনতার বায়ুপূর্ণ দেশে আসার সম্বন্ধে তাঁহারা নিতান্তই বিরূপ। সকল বাধা অতিক্রম করিয়া যে সকল যুবক আমেরিকায় আসিয়া অধ্যয়ন করিতেছে, তাহারা যখন ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবে, তখন কি ভারত গবমেণ্ট তাহাদিগকে এরূপ পদে নিযুক্ত করিবেন যাহাতে তাহারা তাহাদের জ্ঞান ও শিক্ষার সদ্ব্যবহার দ্বারা স্বদেশের কল্যাণ সাধনে সমর্থ হইবে? তাহা না করিয়া গবমেণ্ট তাহাদিগকে উপেক্ষা করিবেন, বাধা প্রদান করিবেন, ভেদনীতি অবলম্বন করিবেন, এবং দেশের প্রধান প্রধান পদগুলি তাহাদিগকে না দিয়া, অল্পবয়স্ক ইংরাজগণকেই দিবেন। ইহাই ভারতের পরাধীনতার ফল। এই প্রকারেই সাম্রাজ্যনীতি, অর্থাৎ একজাতি অপর জাতির সম্মতি ব্যতিরেকে তাহাকে শাসন করিবার প্রথমেই মানব সমাজের মধ্যে ভ্রাতৃভাবটিকে নষ্ট করিয়া দিতেছে।

প্রাচ্য দেশ হইতে এ দেশে যে সকল ছাত্র আসে তাহাদের সম্বন্ধে আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় আছে। যে সকল জাপানী বা চীন ছাত্র এ দেশে অধ্যয়ন করিতে আসে, তাহারা আমাদিগকে জাপান ও চীনকে বুঝিবার পক্ষে সাহায্য করিয়া আমাদিগের বিশেষ উপকার করিয়া থাকে। তাহারা আমাদিগকে তাহাদিগের দেশের শ্রেষ্ঠ দিকটি দেখাইয়া দেয়। যখন তাহারা আমাদিগের শ্রেষ্ঠ যুবকগণের সহিত এক শ্রেণীতে অধ্যয়ন করিয়া তাহাদিগেরই তুল্য শ্রম করে ও তাহাদিগেরই ন্যায় উচ্চ সম্মান লাভ করে, তখন তাহারা প্রাচ্য জাতি সম্বন্ধে আমাদিগের ভ্রান্ত ধারণা দূর করিবার পক্ষে বিশেষ সহায়তা করে; তাহারা দেখাইয়া দেয় যে চীন ও জাপান ঘৃণার পাত্র নহে, তথাকার অধিবাসিগণ আমাদিগেরই তুল্য গুণসম্পন্ন। এই প্রকারে তাহারা প্রাচ্য ও প্রতীচ্য জাতির মধ্যে ভ্রাতৃভাব প্রতিষ্ঠার পক্ষে বিশেষ সহায়তা করিতে সমর্থ হয়। ভারত হইতে যদি অধিক সংখ্যায় ছাত্র আসা সম্ভব হইত, তাহা হইলে তাহারাও আমাদিগকে বুঝাইতে পারিত যে ভারতের অনেক উচ্চগুণ বর্ত্তমান আছে এবং ভারতবাসী পাশ্চাত্য জাতির সহিত সমাসনে বসিবার উপযুক্ত। এই প্রকারে পৃথিবীর মধ্যে জাতীয় সাম্য ও ভ্রাতৃভাব পুষ্ট হইয়া উঠিত।

ধর্ম্ম প্রচারকগণের নিকট হইতে বিবরণ লাভ করা ভারত ও পাশ্চাত্য প্রদেশ উভয়েরই পক্ষে কিরূপ ক্ষতিকর তাহা পূর্ব্বে বুঝাইয়াছি। তদ্দেশের ইংরাজ শাসনকর্ত্তৃগণের নিকট হইতে তথাকার বিবরণ লাভ

আমাদিগের ভারত সম্বন্ধে জ্ঞান লাভের আর একটি উপায়। ইহাও অল্প শোচনীয় ব্যাপার নহে। বিদেশী জেতা ও শাসনকর্ত্তা হওয়াতে ইঁহারাও ধর্ম্ম-প্রচারকগণের ন্যায় অপক্ষপাত বিবরণ দানে অসমর্থ। ভারতের অনেক ইংরাজ অবশ্য আমাদিগেরই ন্যায় ন্যায়পরায়ণ ও অকপটচিত্ত, এবং সত্য দর্শনে ও বর্ণনে ইচ্ছুক। কিন্তু তাঁহাদিগের অবস্থাটা বিচার করিয়া দেখ। তাঁহারা বিদেশী এবং ভারতবাসীর অসম্মতিক্রমে তাহাদিগকে শাসন করিতেছেন। তাঁহারা তাঁহাদিগের ভারতে অবস্থান সমর্থন করিবার জন্য ব্যগ্র। সুতরাং সকল বিষয় তাঁহাদিগের আপন পক্ষের বিরুদ্ধে দর্শন বা বর্ণনা করা তাঁহাদিগের পক্ষে অসম্ভব।

আমেরিকায় ক্রীতদাস ব্যবসায় যখন প্রচলিত ছিল, তখন ক্রীতদাস অধিকারিগণের নিকট হইতে ক্রীতদাস ও ক্রীতদাস-প্রথা সম্বন্ধে অপক্ষপাত বিবরণ পাওয়া কি সম্ভব হইত? তাহারা কি পক্ষপাতী সম্প্রদায় ছিল না? তাহাদের মধ্যে অনেকে ভাল লোক ছিলেন, অনেকে বুদ্ধিমান ছিলেন, অনেকে ন্যায়পরায়ণ হইতে ইচ্ছুক ছিলেন সত্য, কিন্তু অবস্থার প্রভাবে তাঁহারা পক্ষপাতী ছিলেন এবং ক্রীতদাসপ্রথা সম্বন্ধে তাঁহাদিগের বিবরণও তদ্রূপ হইয়া পড়িত। ভারতের ইংরাজ-গণেরও সেই অবস্থা। যে সকল ইংরাজ ভারতে গমন করিয়া তথায় বহুবৎসর গবর্মেণ্টের কর্ম্মে অতিবাহিত করিয়া দেশে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া ভারতের অবস্থা বর্ণনায় প্রবৃত্ত হন, ভারত সম্বন্ধে পুস্তক প্রণয়ন করিয়া বা সংবাদপত্রে ও মাসিকপত্রিকায় প্রবন্ধাদি লিখিয়া পাশ্চাত্য জগতকে ভারতবাসী সম্বন্ধে জ্ঞান দান করেন—তাঁহারা আমাদিগের দেশের ক্রীতদাস ব্যবসায়ীগণের মত ভারতবাসী ও ভারতীয় ব্যাপার সম্বন্ধে তুল্যভাবেই পক্ষপাতী। ইঁহাদিগের বিবরণ পাঠের সময়ে আমাদিগকে এই কথাটি সর্ব্বদাই মনে রাখিতে হইবে।

পৃথিবীর সম্মুখে ভারতকে বশীভূত রাখার ঔচিত্য সমর্থনের জন্য ইংলণ্ডের পক্ষে ভারতবাসীকে নিকৃষ্ট জাতিরূপে বর্ণনা করা অবশ্য স্বাভাবিক। কিন্তু বস্তুতপক্ষে ভারতবাসীরা কোন্ জাতির অন্তর্গত? ভারতের উচ্চবর্ণের অধিবাসিগণ তোমার আমার সহিত একই জাতির অন্তর্গত। তাহারা আর্য্য; গ্রীক, রোমান্, জর্ম্মাণ ও ইংরাজের জ্ঞাতি। অতএব তাহারা বিশেষ নিকৃষ্ট জাতি নহে।

তদ্ভিন্ন, ইংরাজগণ ভারতের সভ্যতাকে অবস্থাগত হীনভাবে চিত্রিত করিতে প্রলুব্ধ হইয়া পড়েন। কিন্তু প্রকৃত অবস্থাটা কি? ইংলণ্ড অসভ্যতার অন্ধকার হইতে উত্তীর্ণ হইবার বহুপূর্ব্ব হইতেই ভারত সভ্যতার উচ্চশিখরে আরোহণ করিয়াছিল। পুরাতন পৃথিবীর মধ্যে তাহার সভ্যতাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ও শ্রেষ্ঠ ছিল। পুরাতন পৃথিবীর যে তিনটি মহান সাহিত্য আমাদের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে—তাহা গ্রীস, ইতালি ও ভারতের সাহিত্য। পৃথিবীর মধ্যে যে পাঁচ ছয়টি প্রধান মহাকাব্য আছে তাহা দেখিতে চাহিলে ভারত হইতে দুইটিকে গ্রহণ করিতে হইবে। পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ও সুন্দর ভাষার সন্ধান করিলে, আমার মনে হয় সংস্কৃত ভাষাকেই সে সম্মান দান করিতে আমরা বাধ্য। ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে সংস্কৃত ভাষাই পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা নির্দ্দোষ ও সুসঙ্গত ভাষা। ভারতবাসী পৃথিবীকে তাহার যে কতকগুলি শ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক নীতি দান করিয়াছে,—সে নীতিগুলি গ্রীস বা জর্ম্মাণির শ্রেষ্ঠ নীতির পার্শ্বে আসন পাইবার উপযুক্ত। তাহারা পৃথিবীকে যে শিল্পকলা দান করিয়াছে, তাহা সকল জাতির শ্রেষ্ঠ শিল্পমধ্যে গৌরবাসন পাইবার উপযুক্ত। এই জাতিকেই ইংরাজগণ তাহাদের যথার্থ গৌরবচ্যুত করিয়া হীনভাবে চিত্রিত করেন।

ইংরাজের ভারতে অবস্থানের সমর্থনে আর এক যুক্তি তাঁহারা প্রয়োগ করিয়া থাকেন যে, তথায় শান্তিরক্ষার জন্য, পরস্পরের মধ্যে হানাহানি নিবারণ করিবার জন্য তাঁহাদের তথায় অবস্থিতি আবশ্যক। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা আমরা কি দেখিতে পাই? ভারতের ইতিহাসে আমরা দেখি যে ভারতবর্ষ য়ুরোপ অপেক্ষা চিরদিনই শান্তিপূর্ণ। জর্ম্মাণির ত্রিশ বৎসরের যুদ্ধের ন্যায় তথায় কোন যুদ্ধব্যাপার আমা-

দের নয়নগোচর হয় না। নেপোলিয়নের জীবনকালে রক্তপাতের স্থায় বা আমেরিকার গৃহযুদ্ধের ন্যায় কোনও সর্ব্বনাশকর ব্যাপার আমরা তথায় দেখিতে পাই না। কিন্তু সেই কারণে কি কোন বিদেশী শক্তি, যেমন চীন, অস্ত্রশস্ত্রে শক্তিশালী বলিয়া, রক্তপাত নিবারণের জন্য ইয়ুরোপকে জয় করিয়া আপন অধীনে রাখিলে ব্যাপারটা সমর্থন করা সঙ্গত হইত? না সেই শক্তি আমেরিকার গৃহযুদ্ধের জন্য আমাদিগকে পদানত রাখিলে তাহা সঙ্গত হইত?

পাশ্চাত্যগণ বলেন ভারতবর্ষ স্বায়ত্ত-শাসনে অক্ষম। যদি তাহা সত্য হয় তাহা হইলে ইহা ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে কি দারুণ অভিযোগ আনিয়া উপস্থিত করে? ইংলণ্ড আসিবার পূর্ব্বে ত ভারত স্বায়ত্তশাসনে অক্ষম ছিল না। আজ দেড়শত বৎসর ব্যাপী ইংলণ্ডের শিক্ষকতার ফলে কি তাহার এ অধঃপতন আনিয়া উপস্থিত করিয়াছে? আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ইংলণ্ড বা ইয়ুরোপের অপর কোনও দেশ অসভ্যতার অন্ধকার হইতে উত্তীর্ণ হইবার বহুপূর্ব্ব হইতেই ভারত উচ্চ সভ্যতা ও উন্নত শাসননীতির অধিকারী ছিল। ইংলণ্ড আসিবার পূর্ব্বে তিন সহস্র বৎসর ধরিয়া ভারতের রাজ্য ও সাম্রাজ্যগুলি আসিয়ামধ্যে সর্ব্বপ্রধান স্থানে প্রতিষ্ঠিত ছিল। এ পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ লোক-শাসক, রাজনীতিজ্ঞ ও অর্থনীতিজ্ঞের মধ্যে কতকগুলিকে ভারতভূমিই প্রসব করিয়াছে। তবে ইংলণ্ড উপস্থিত হইবামাত্র সে স্বায়ত্তশাসনের শক্তি হারাইয়া ফেলিল, ইহার অর্থ কি? এ কথা সত্য যে ইংলণ্ডের আগমনের কালে ভারতবর্ষ অশান্তি ও বিশৃঙ্খলার মধ্যে নিমজ্জিত হইয়া পড়িয়াছিল; কারণ আমাদের এস্থলে স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে মোগল সাম্রাজ্য সেই সবেমাত্র ভাঙ্গিয়া পড়িতে আরম্ভ করিয়াছিল এবং দেশের চতুর্দ্দিকে নূতন রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করিবার একটা চেষ্টা চলিতেছিল,—এই বিশেষ অবস্থার ফলেই ইংলণ্ড ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে পদার্পণ করিবার সুযোগ লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু ভারতের প্রকৃতি হইতে আমাদের মনে হয় যে ইয়ুরোপীয় শক্তিগুলি আসিয়া হস্তক্ষেপ না করিলে, ভারত অনতিবিলম্বেই কর্ম্মক্ষম শাসনশক্তি প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হইত।

ভারতের শাসনশক্তির অভাবের অভিযোগ সম্বন্ধে আর একটি অকাট্য উত্তর এই যে, এখনও পর্য্যন্ত ভারতের অনেকাংশে ভারতবাসী স্বায়ত্তশাসন করিতেছে—এবং তাহা বেশ পারদর্শিতার সহিতই চালাইতেছে। ইহা কাহারও অবিদিত নাই যে ভারতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শাসনবিধি ইংরাজের রাজ্যে নহে, ভারতবাসীর স্বাধীন রাজ্যমধ্যেই প্রচলিত; বরোদা ও মহিশূর রাজ্যই এ বিষয়ে অগ্রণী। ভারতে আজিও কতকগুলি দেশীয় রাজ্য রহিয়াছে যাহারা সাধারণ ভাবে ইংরাজের অধীন হইলেও, আভ্যন্তরীণ বিষয়ে কতকাংশে স্বায়ত্তশাসনে অধিকারী। এই সকল রাজ্যমধ্যে, বিশেষতঃ বরোদারাজ্যে, প্রজাগণ ভারতের অপর যে কোন রাজ্যের অধিবাসী অপেক্ষা অধিক স্বাধীন, সমৃদ্ধিশালী, তৃপ্ত এবং অধিকতর উন্নতিশীল। উপরিউক্ত দুইটি দেশীয় রাজ্যের সাধারণ শিক্ষা সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠতাটি লক্ষ্য করিবার বিষয়। সাধারণ শিক্ষার জন্য প্রত্যেক প্রজার উপর মহিশূর রাজ্য ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট অপেক্ষা তিন গুণের অধিক ব্যয় করিয়া থাকেন। আর বরোদা রাজ্যে সাধারণ শিক্ষা বিনামূল্যেই বিতরিত হইয়া থাকে। সেখানে সকল প্রজাই, কি স্ত্রী কি পুরুষ শিক্ষালাভে বাধ্য। এ অবস্থা ব্রিটিশ ভারতের প্রজাগণের পক্ষে স্বপ্নাতীত ব্যাপার। শিক্ষা বিষয়ে বরোদা রাজ্য ইয়ুরোপ বা আমেরিকার প্রধান জাতিগণের সমতুল্য। এই দুই রাজ্যের সহিত ব্রিটিশ ভারতের তুলনা করিলে দেখিতে পাইবে যে তথায় যে সামান্য শিক্ষাটুকু দেওয়া হয় সেটুকু হইতেও দেশের দশজন বালকের মধ্যে নয়জন বঞ্চিত এবং ১৪৪ জন বালিকার মধ্যে ১৪৩ জন বঞ্চিত।

যথার্থ কথা এই যে এমন একটিও প্রকৃত প্রমাণের উল্লেখ করা অসম্ভব, যাহা দ্বারা প্রমাণ হইতে পারে যে সুযোগ পাইলে ভারত স্বায়ত্তশাসনে অক্ষম। আজ ভারতে এমন এক পার্লামেণ্ট গঠন করা দুঃসাধ্য ব্যাপার নয়, যাহার সভ্যগণ দক্ষতা ও উচ্চ চরিত্রের

গুণে জাপানের সুন্দর পার্লামেণ্টের বা চীনের ভাবী পার্লামেণ্টের সভ্যগণের অপেক্ষা কোন অংশে হীন হইবার সম্ভাবনা। অর্থাৎ বর্ত্তমান ভারতের দেশীয় রাজ্যের ও ব্রিটিশ প্রদেশসমূহের নেতৃগণের মধ্যে এমন সকল ব্যক্তি রহিয়াছেন যাঁহাদিগকে লইয়া ভারতের একটি জাতীয় পার্লামেণ্ট গঠিত করিলে, তাহা পারদর্শিতা ও নৈতিক চরিত্রের বলে পাশ্চাত্য জগতের যে কোন পার্লামেণ্ট অপেক্ষা হীন হইবে বলিয়া আশঙ্কা করার কোনও কারণ নাই।

আজ ভারতে এক নবভাব জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে। ভারতবাসীর অন্তরে একটা নূতন আশা ও প্রতিজ্ঞা উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিতেছে এবং তাহা দেশের নূতন জাতীয় দলের মধ্যে বিকাশ লাভ করিতেছে। ভারতের এই ভাবটি পরাধীন জাতির জাগরণ ও প্রতিবাদ ভিন্ন আর কিছুই নহে। একদিন যে জাতি ভুবনখ্যাত ছিল এবং আজিও যে তাহার স্বাভাবিক শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে সচেতন, ইহা তাহার ধূলি হইতে উঠিবার, পুনরায় আপন পদে নির্ভর করিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা মাত্র।

আজ দেড়শত বৎসর ভারতবাসীর জন্মভূমি বিদেশীর লীলাস্থল, বা জন্ ষ্টুয়ার্ট মিলের ভাষায় 'ইংলণ্ডের গোচারণ ভূমি' হইয়া রহিয়াছে। আজ তাহাদের এই ভাবটি তাহাদের স্বদেশকে পুনরায় আপনার ধন বলিয়া ফিরিয়া পাইবার একটা চেষ্টা মাত্র। ভারতবাসী যে স্বাধীনতা লাভের জন্য উদ্‌গ্রীব সে স্বাধীনতার উপর তাহার জন্মগত অধিকার। সে স্বাধীনতা অর্থে তাহাদের আপন বিধি আপন শিল্প ও আপন জাতীয় জীবন গঠিত করিবার শক্তিলাভ ভিন্ন আর কিছুই নহে। তাহারা এ পৃথিবীর মানব সমাজ ও জাতীয় সমাজের মধ্যে একটা নির্দ্দিষ্ট সম্মানসূচক আসন পাইবার জন্য উৎসুক। এ আসন তাহাদের লাভ করাও উচিত।

আমি যাহা বলিলাম তাহার যেন কেহ ভ্রান্ত অর্থ না বুঝেন। তাহাদের এই ভাবটির এমন অর্থ নয় যে তাহারা ইংলণ্ড হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার জন্য ব্যগ্র। ভারতবাসীর নেতৃগণ ইহা বার বার স্পষ্টাক্ষরে প্রকাশও করিয়াছেন। তবে এই ভাবটির অর্থে ইহা নিঃসন্দেহ বুঝা যায় যে যতদিন তাহারা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সহিত সংযুক্ত থাকিবে, ততদিন তাহারা নিঃসহায় অধীন প্রজা বা দায়িত্বহীন প্রভুগণের হস্তে শক্তিহীন ক্রীতদাসের ন্যায় না থাকিয়া ব্রিটিশ প্রজার প্রচলিত অধিকারে অধিকারী হইয়া থাকিতে চায়। ইহার অর্থ এই যে ভারতবর্ষকেও ক্যানাডা বা অষ্ট্রেলিয়ার মত সাম্রাজ্য মধ্যে একটা স্বতন্ত্র স্থান দেওয়া আবশ্যক এবং এই সকল স্বাধীন, স্বায়ত্তশাসনাধিকারী উপনিবেশের ন্যায় ভারতকেও স্বদেশী শাসন দান করা আবশ্যক। ভারতবাসীর এ দাবী কি ন্যায্য নহে? এ প্রশ্নের উত্তরে কেবল ভারতবাসী নহে, অনেক শ্রেষ্ঠ চরিত্র ইংরাজও অকপট চিত্তে এ ন্যায্যতা স্বীকার করিয়া থাকেন। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য ভারত যে দুঃসাধ্য উদ্যমে প্রবৃত্ত হইয়াছে,—দুঃসাধ্য, কারণ এ পৃথিবীতে স্বেচ্ছাচারী দায়িত্বহীন শক্তিকে, অবস্থার তাড়নে ভিন্ন তাহার আপন ক্ষমতাকে পরের হস্তে তুলিয়া দিতে আমরা বড় একটা দেখিতে পাই না,—তাহাতে সে সকল জাতিরই উদারচেতা ও স্বাধীনতাপ্রিয় স্ত্রীপুরুষের নিকট আন্তরিক সহানুভূতি লাভ করিবে সন্দেহ নাই।

কোচিন-চীন।

৯ই ফেব্রুয়ারী

রক্ষী সৈন্যদল আপনাদিগকে জাগ্রত রাখিবার জন্য, ১৫ মিনিট অন্তর, দুইটা ছোট বাঁশের চাকতি লইয়া বাজাইতেছে। সমস্ত রাত্রিই এই শব্দ শোনা যাইতেছে। এই সান্ত্রি বেচারিদিগের কাসির শব্দও ক্রমাগত আমাদের কানে আসিতেছে। অ্যানাম-বাসীদিগের পক্ষে এই পার্ব্বত্য আবহাওয়া

অত্যন্ত ঠাণ্ডা। তারা ইচ্ছাসুখে এখানে আসে নাই। সৈনিক কাজের অনুরোধে বাধ্য হইয়া আসিয়াছে।

খুব প্রাক্কালেই আমরা ঘোড়ায় চড়িয়া (Travan) ত্রাভানের অভিমুখে যাত্রা করিলাম। আমাদের বোজ্‌কাবুজ্‌কি বহিবার জন্য পাহারার লোকেরা যে সকল কুলি যোগাড় করিয়াছিল, তাহাদের আসিতে একটু বিলম্ব হইল। রক্ষীদলের ফরাসী-সর্দ্দার বলিলেন ;—"গত রাত্রে যদি তাদের কয়েদ করিয়া রাখিতাম, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহারা আমাদের হাতের মধ্যে থাকিত···"

পোয়া ঘণ্টা ধরিয়া, কত সুরম্য অরণ্যের মধ্য দিয়া আমরা চলিতে লাগিলাম। এই অরণ্যগুলা,—সিংহল ও যবদ্বীপের অরণ্যের ন্যায় বৃহৎ। নিবিড় জঙ্গলের মধ্য হইতে লতা ও পত্রগাছায় আচ্ছন্ন কত বর্ষীয়ান বৃক্ষ মাথা তুলিয়া রহিয়াছে ; তাহাদের শাখা প্রশাখায় বানর ও টিয়াপাখীরা বাস করে ; মাঝে মাঝে, দলিত বৃক্ষাদির মধ্যে, মাটির উপর বড় বড় পায়ের দাগ দেখা যাইতেছে। এই সমস্ত, বুনো হাতীর পদচিহ্ন।

মাঠ ময়দান কুয়াসায় আচ্ছন্ন। এমন কি পর্ব্বত-চূড়ার উপর হইতেও,—বৃক্ষাদির মধ্যে, একটা কুয়াসার সমুদ্র বই আর কিছুই দেখা যায় না। পর্ব্বতের গায়ে-গায়ে ছোট-ছোট মেঘ চলিয়া বেড়াইতেছে। হ্যুয়ে (Hue) নামক গণ্ডগ্রামে, অ্যানাম্‌-সম্রাটের প্রাসাদে, আমরা এই প্রকার দৃশ্যের ছবি দেখিয়াছিলাম। এই সকল চিত্র তখন অদ্ভুত-কল্পনাপ্রসূত বলিয়া মনে হইয়াছিল, কিন্তু এখন যতই দেশের সহিত পরিচয় হইতেছে, ততই এই সব চিত্রগতদৃশ্য বাস্তবের অনুরূপ বলিয়া মনে হইতেছে।

এই রহস্যময় অরণ্যের মধ্য দিয়া, রহস্যময় বড় বড় গাছের নীচে দিয়া আমরা অশ্বারোহণে, ত্রাভানে আসিয়া পৌঁছিলাম।

এখানকার রক্ষীসৈন্যদলের নেতা—ফরাসী-জাতিভুক্ত একজন সুইস্‌। ছেলেটি বেশ সৌম্যদর্শন, কর্ম্মিষ্ঠ ও আমুদে। পূর্ব্বে যেমন তিনি ট্র্যামির (Tramy) আড্ডাটি গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, সেইরূপ এখন তিনি ট্র্যাভানের (Travan) আড্ডাটি গড়িয়া তুলিবার উদ্যোগে আছেন ; তিনি তাঁহার লোকজনের দ্বারা কতকগুলা কাঠের ঘর ও কতকগুলা চুন-কাম-করা ঘর তৈরী করাইয়াছেন। তাঁহার হুকুমে, অ্যানামবাসী সৈনিকেরা ইঁট তৈয়ারী করিতেছে, তক্তা প্রস্তুত করিতেছে, শাক-সব্জির চাষ করিতেছে, ছাগ ও খর্গোস পালিতেছে।

অপরাহ্নে, রক্ষীদলের সর্দ্দার, একজন বৃদ্ধ প্রধান মোইকে লইয়া আসিল। তাহার নাম "নোয়া" (Noah)। আমরা তাহাকে জানাইলাম যে, আমরা পার্ব্বত্য প্রদেশ দিয়া তু-নাক্‌ (Tou-Nac) পর্য্যন্ত যাইতে ইচ্ছা করি। আমাদের এই অসমসাহসিক সংকল্পের কথা শুনিয়া বৃদ্ধ সর্দ্দার ভীত হইল ; যদি তাহার দলের লোক ছাড়া অন্য দলের লোক আমাদিগকে আক্রমণ করে তাহা হইলে কি হইবে?—তখন আমরা তাহাকে এক পাত্র সুম্‌-সুম্‌ (সুরা) দিলাম। নোয়া ঐ সুরা-পাত্রটি আমাদের সকলের সম্মুখে এক একবার ধরিল ; আমরা একে-একে সবাই সেই সুরায় আমাদের আঙ্গুল ডুবাইলাম, এবং

তাহাদের রীতি অনুসারে সেই আঙ্গুল চুষিলাম; সে, কতকগুলা মন্ত্র আওড়াইয়া তাহার পর সেই সুরা পান করিতে প্রবৃত্ত হইল। সুরার প্রভাবে তখনি তাহার সমস্ত ভয়-ভাবনা কোথায় উড়িয়া গেল। আমাদের যাত্রা যাহাতে সফল হয়—আমাদের সাহায্যার্থে তাহার কতকগুলি লোককে সে আমাদের সঙ্গে পাঠাইতে স্বীকৃত হইল। ত্রাভান্-আড্ডার প্রধান, এক দল রক্ষী-সেনা লইয়া তু-নাক্ (Tou-Nac) পর্য্যন্ত আমাদের সঙ্গে যাইবেন বলিয়া স্থির করিলেন।

গত বৎসর, মোইদিগের কতকগুলা শাখা-জাতি ট্র্যামি-স্থিত য়ুরোপীয় উপনিবেশের কুঠী লুট করে ও জ্বালাইয়া দেয়। সেই সময়ে, তাহাদের বিরুদ্ধে এক দল রক্ষী-সৈন্য প্রেরিত হয়, এবং সেই যুদ্ধে উভয় পক্ষেরই কতকগুলা লোক নিহত হয়। হইতে পারে, এই সকল শত্রুজাতিরা অন্য য়ুরোপীয়দিগকে আক্রমণ করিয়া, প্রতিশোধ লইবার চেষ্টায় আছে; আবশ্যক হইলে, তাহাদের আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার জন্য আমাদের প্রস্তুত হইতে হইবে!

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

চীনের কবিতা।

বসন্তের প্রত্যাবর্ত্তন।

(সুকুন্ত হইতে)

কিরণে ঝলমল অগাধ নীলজল,
নীল কমল তায় ফুটেছে;
বনের পথ ধরি' চলেছে সুন্দরী
নীল কমল হেরি' ছুটেছে।
ঝাপ্‌সা ঝোপে ঝাপে ব্যথিত বায়ু কাঁপে,
পিচের শাখে শাখে পাতার সূচী;
ঝাউয়ের মৃদু ছায়া রচিছে কি যে মায়া
ছড়ায়ে বন পথে সোনার কুচি।
নীল কমল লখি' চলে কমল-সখী,
বন বিজন, ভিজা ভেষজ ঘ্রাণ;
আবেশে একাকার চলিতে পিছে তার
শুনি গো বারবার পুরাণ তান;—
'নিখিলে আছে মিশে কাহিনী অনাদি সে
যা' ছিল পুরাতন হ'ল সে নব;
কালের বিষে জরা তরুণ হল ধরা,
পুরাণ প্রাণে নব প্রেমোৎসব।'

অশ্রু।

(ওয়াং-সেং-জু হইতে)

চাঁদের নৌকা ভাসিয়া চলেছে শৈল-শিখর'পরে,
প্রদীপের আলো মরে;
অতীত অযুত বসন্ত আজি বুকে মোর হাহা করে,
আর আঁখি জলে ভরে,
মরমী নারিল মরম বুঝিতে, এ দুখ রাখিতে ঠাঁই
নাই গো কোথাও নাই।

বাসন্তী স্বপ্ন।

(ৎসেন্-ৎসান্ হইতে)

আমার আঁধার ঘরে,
রাতে এসেছিল হাল্কা বাতাস
ফাল্গুনী লীলাভরে।
আমারে ঘিরিয়া ঘুরে ফিরে শেষে
চুপে চুপে বলে "ওরে!
উড়্ উড়্ মন উড়াব আজিকে
সাথে নিয়ে যাব তোরে।"

সাগরে চলিল ধারা,
জ্যোৎস্না-প্লাবিত শতেক যোজন
মিলায় স্বপন পারা।
মন-রাখা ও গো মনের রাখাল!
এনু কি তোমারি দেশে?
চান্দা নদীর কিনারে কিনারে
ফাগুনী হাওয়ায় ভেসে?

ক্ষণিক স্বপ্নাবেশ
আঁখির পলক পড়িতে টুটিল,—
হ'য়ে গেল নিঃশেষ!
ব্যথিত নয়ন লুকানু যেমন
বিতথ শয্যা মাঝে,
পরাণ আমার হ'ল উপনীত
অমনি তোমার কাছে!

কোথায় চম্পাপুর!
কোথা আমি, হায়, তুমি বা কোথায়,
শতেক যোজন দূর!
মাঝে ব্যবধান গিরি, নদী, গ্রাম,
পথে বাধা শত শত,
সুপ্ত মু'খানি ছুঁয়ে এনু তবু,—
চকিতে,—হাওয়ার মত!

মণিহারা।

(মেং-হৌ-জান্ হইতে)

রক্ত আলো মিলিয়ে গেল
ইতস্ততঃ করে,
মৌন চাঁদের সুষমাতে
রাত্রি ওঠে ভরে'।
জান্‌লা খুলে-বাদ্‌লা হাওয়া
নিই গো মাথা পেতে,
কালো চুলের লহর দোলে
জ্যোৎস্না তরঙ্গেতে।
নিশার বায়ু নীলপদ্মের
গোপন কথা বলে,
টুপ টুপিয়ে শিশির পড়ে
শুভ্র ঝাউয়ের তলে।
ইচ্ছা করে—বাজাই বীণা;
শুন্‌বে কে তা' আর?
মৃতের জগৎ জাগায় এমন
শক্তি আছে কার?
এম্‌নি করে' স্বপ্ন মিলায়
উড়ো পাখীর সাথে!
মনের মাঝে হারা মণি
পাই গো গভীর রাতে।

সে।

(সুকুন্ত হইতে)

বনে, প্রান্তরে, শৈল শিখরে সে আছে সীমার পারে,
সে রয়েছে লোক-লোচনের অগোচরে;
লুপ্ত-আলাপ বিশ্ব রাগিণী লিপ্ত করিছে তারে,
পান্থ পাখীর সাথী হয়ে সে বিহরে।
নিভাঁজ নিবিড় পর্দ্দা দোলায়ে বাতাস যেমন ক'রে
যায় গো জানায়ে আপন আবির্ভাব,—
বাঁশের বাঁশিতে পশিয়া যেমন নিশ্বাস ধরা পড়ে'
ফুকারি, প্রকাশে গোপন গভীর ভাব,—
তেমনি করিয়া মাঝে মাঝে সে যে ধরা দিতে কাছে আসে,
ধরিতে গেলেই পলায়ে পলায়ে ফিরে,
নব বেশ বাস, নব বিন্যাস নিতি নব হাসি হাসে
বিহরে লীলায় অকূলের তীরে তীরে!

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

ঝিঁঝিট্ খাম্বাজ—একতালা।

কে সে পরম সুন্দর—
বিচিত্র রূপেতে যিনি অতি মনোহর।
আনন্দ মুরতি যাঁরি মনেরে বিচিত্র করি
গড়িতেছে মনোমাঝে থেকে নিরন্তর।
যেরূপ হইলে লীন্ মনোভাব গতিহীন্
তিলেক বিচ্ছেদে যাঁর ব্যাকুল অন্তর॥

শ্রীমতী হেমলতা দেবী।

{ মা-ধা পা II মা গা রা। রগা-সা রা। (পা - া - মগা)। } পা - া - া।
কে • সে প র ম সু ০ ন্দ র ০ ০ র ০ ০

। া - া - মপগা I গা গা - মা। পা-না না। র্সা - নর্রা র্সা। ণর্সা-ণধা পা I
• • • বি চি • ত্র ০ রূ পে ০ তে যি ০ নি

I মা গা রা। রগা-সা রা। পা - া - মগা। মা-ধা পা II গা। মা গমা রা I
অ তি ম নো • হ র • ০ "কে ০ সে আ ন ন্দ মু

I { গা পা-ধমা। মা পা - া। - া - া মা I পা ধা না I না র্সা-না।
র তি • যাঁ রি ০ ০ ০ ম নে রে বি চি ত্র •

। ণনা ধা-নধা। (পধা-ণর্সা র্সা। ণধা পমা গরা) }I -পা-া মা। {মা ণধা না I
ক রি • • • আ ন ন্দ মু ০ ০ গ ড়ি তে ছে

I র্সা র্সগা-র্রা। র্সা র্সা র্রর্সা। - না - র্সা না। ধা - নধা পা I পা - ধপা ধা।
ম নো • মা ঝে ০ • ০ থে কে • নি র ০ ন্ত

। না - া - সর্না। (-ধা - না র্সা) ।} -ধা-না-পা। মা-ধা পা II না। {না না না I
র • • • • গ • • ০ "কে ০ সে" যে রূ প হ

I না নর্সা-র্রর্সা। (নধা - পা -া। - া - া না) ।} নধা-পা-ধপা। - মা-পা গা।
ই লে • লী • ন্ • ০ যে লী • • • ন্ ম

। মা পা ণর্সা I র্সরা ণাঃ-ধঃ। পধা-ণধা-পমা। - মপা-ধপা-মগা। -গমা-পমা-গরা I
নো ভা ব গ তি • হী • • ০ ০ ০ • • ০

I -সা - া সা। { গা গা গা। গপা মা - া। গা রসা - া I (- া - া সা)। }
ন্ • তি লে ক বি চ্ছে দে • যাঁ র ০ • • তি

I সা-র্সা ণধা। পধা-ণা ধা। পা-া-মগা। মা-ধা পা IIII
ব্যা • কু ল ০ অ ন্তর • ০ "কে ০ সে"

শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী।

পোষ্যপুত্র। (পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(২০)

সে দিন লক্ষ্মীপুরের চৌধুরীবাড়ী ভারি ধুম।

ঠাকুরদালানের মোটা মোটা থামের মাথায় দেবদারু পত্রের বিচিত্র ফটক; দ্বারে দ্বারে আমপাতার মালা ঝুলান, রাঙ্গা নিশানে লাগান সরু মোটা নানান্ আকারের জরিগুলা রৌদ্র পড়িয়া ঝক মক করিয়া জ্বলিতেছিল। পুরাতন মন্দিরের মধ্যে রূপার দোলনায় রাধাশ্যামের যুগলমূর্ত্তি স্থাপিত; ধূপের পবিত্র গন্ধে চতুর্দ্দিক আমোদিত হইয়া উঠিতেছিল। মন্দিরের অপর পার্শ্বে ঠিক রাধাশ্যামের সম্মুখদিকেই এক মর্ম্মরবেদীর উপর রজতকান্তি মহাদেবের বক্ষোপরি বিরাজিতা অসুরনাশিনী মহাশক্তি। কোটি ব্রহ্মাণ্ড তাঁহার কণ্ঠের মুণ্ডমালা, হস্তে জ্ঞান অসি ধারণ করিয়া তিনি অজ্ঞানরূপী দানব সকলকে নিহত করিতেছেন, মায়ের যোগেন্দ্র বাঞ্ছিত পদস্পর্শে শিবেও শিবত্ব লাভ করে। পরমা প্রকৃতি এক্ষণে স্থিতি সংহারকারিণী। শ্যামামন্দিরের বামভাগে নূতন মন্দির উঠিয়াছে, সুন্দর কারুকার্য্যযুক্ত দুগ্ধফেণশুভ্র দেবালয় নির্ম্মল সূর্য্যালোকে সবুজ গাছগুলার মাঝখানে নীল আকাশের প্রান্তে পুঞ্জীকৃত শুভ্র মেঘখণ্ডের মতন দেখাইতেছে। পত্রে পুষ্পে মঙ্গলঘট ও কদলী বৃক্ষে সুশোভিত এই মন্দির শান্তির সাধের রাজরাজেশ্বরীর মন্দির। এই মন্দির প্রতিষ্ঠা আজ মহাসমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়া গেল। মন্দিরের হোমাদি বহুক্ষণ হইয়া গিয়াছে কিন্তু এখনও চণ্ডিপাঠ শেষ হয় নাই। দ্বাদশ জন ব্রাহ্মণের মধ্যে পণ্ডিত হরিনারায়ণ ভক্তি গদ্‌গদ কণ্ঠে সুললিত ভাষায় পাঠ করিতেছিলেন

"দেবী প্রপন্নার্তি হরে প্রসীদ,
প্রসীদ মাতর্জগতোখিলস্য,
প্রসীদবিশ্বেশ্বরী পাহি বিশ্বম্
ত্বমীশ্বরী দেবী চরাচরস্য"

ফোঁটা তিলক কণ্ঠিধারী ভক্তগণ এবং ছাইমাখা গেরুয়াপরা সন্ন্যাসী অবধূত অনেকগুলি একত্র হইয়া কেহ রাধাশ্যামমন্দিরের দালানে কেহ কেহ শ্যামা বা রাজরাজেশ্বরী মন্দিরের সম্মুখে তর্ক বিতর্ক কলহ কোলাহলের দ্বারা পূজা রাত্রি সরগরম রাখিয়াছিল। ঠাকুরবাড়ি ও অতিথিশালায় আজ মস্ত বড় একটা যজ্ঞের ব্যাপার চলিতেছিল। শান্তি সর্ব্বাগ্রে দেবীদর্শন করিতে আসিয়াছিল। জয়পুরী শিল্পীর ভাস্কর্য্যনৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠাস্বরূপ সেই মর্ম্মর প্রতিমাকে স্বহস্তে অলঙ্কার বস্ত্রে সাজাইয়া সে ভক্তি ও আনন্দের আবেগে বাক্‌শূন্য হইয়া অপলকে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল। তখন চারিদিক হইতে দেবীর অভিষেক দ্রব্য সম্ভার আনীত হইতেছে; লোকে লোকারণ্য। শ্যামাকান্ত ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া উঠিয়া বধূকে জিজ্ঞাসা করিলেন "কেমন মা, যেমন চেয়েছিলে তেমনি পেয়েছ তো?" বধূ সাগ্রহে সম্মতি জানাইয়া পরে বলিল "কিন্তু শুনেছি তপস্যা দ্বারা প্রথমে মহারুদ্ররূপিণীকে প্রসন্না করতে পারলে তারপর সাধক তাহার রাজরাজেশ্বরী মূর্ত্তি দেখতে পায়। ঘোর ঝঞ্ঝা অমাবস্যা ও শ্মশান তাঁহার সাধনার স্থল, ইন্দ্রিয়জয় ও

হৃদয়শোনিত দান তাঁহার সাধনা। সেই মহা কঠোর তপদ্বারা অজ্ঞান অসুর নাশ হইলে তবে তাঁহাকে রাজরাজেশ্বরী মূর্ত্তিতে পাইবে। কিন্তু তা না করেই যে একেবারে মার রাজরাজেশ্বরী মূর্ত্তি স্থাপনা করতে বসেছি যদি তিনি অপ্রসন্না হন?" বৃদ্ধ জমীদার বিস্ময়োৎফুল্ল-নেত্রে ক্ষুদ্র বালিকার দিকে চাহিয়া মুগ্ধস্বরে কহিয়া উঠিলেন "হিন্দুর সাধনা তো এক জন্মের জন্য নয় মা? মা আমাদের মতন বৃদ্ধদের সারাজন্মের সাধনার ফলে মা বিশ্বময়ী যদি প্রসন্না হয়ে তাঁর পবিত্র নির্ম্মাল্য হতে একটি মাত্র ফুল প্রদান করেন তাতেই আমরা ধন্য হইতে পারি। শান্তি মা! তোমার রাজরাজেশ্বরী তোমাকে তাঁহার সহিত এখানে চিরপ্রতিষ্ঠিতা রাখুন।" বৃদ্ধের স্নেহপরিপূর্ণ হৃদয় বিষাদের ছায়া দূরে সরাইয়া ফেলিতে পারিতেছিল না। সর্ব্বদাই তাঁহার প্রাণের মধ্যে যেন কি একটা অপ্রকাশ্য অন্ধকার ঘুরিয়া বেড়াইত।

শান্তি মুহূর্ত্তের ভাবনা ভুলিয়া হাসিমুখে বলিল "জ্যেঠামশাই! আনন্দমঠের মতন আমাদেরো তিনটি মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করলে বেশ হয়। মা যা ছিলেন, যা আছেন, যা হবেন।" শ্যামাকান্ত হাসিলেন "মা এইজন্যেই শাস্ত্রে বলে লোভ বাড়াতে নাই।"

ব্রাহ্মণভোজন কাঙ্গালিভোজন ইত্যাদির সঙ্গে থিয়েটারের জন্য বেশ ঘটা লাগিয়াছিল। বড় বড় পাল খাটাইয়া বাঁশ বাঁধিয়া, বেঞ্চ, কেদারা নাড়ানাড়ি করিয়া চিক খাটাইয়া সতরঞ্চ বিছাইয়া বাড়ির ভৃত্য গণ, ভাড়াকরা ফরাশেরা ও গাঁয়ের প্রজাগণ শুদ্ধ যেন হিমসিম খাইয়া যাইতেছিল!

বিপুল উদরের ভারে হেলিয়া পড়িয়া মৃদু-মন্দ গমনে এখানে ওখানে দাঁড়াইতে দাঁড়াইতে পান চিবাইতে চিবাইতে প্রৌঢ় দেওয়ানজী বিরলকেশ মস্তকে ভিজা গামছা ঢাকা দিয়া সকলকার প্রতি হুকুম জারি করিয়া বেড়াইতেছিলেন।

কলিকাতা হইতে মিনার্ভা থিয়েটার আনা হইয়াছে আজ রাত্রে তাহারা কপালকুণ্ডলার অভিনয় দেখাইবে। দূর পল্লীগ্রামের অনভিজ্ঞ জনগণ কৌতূহলে অধৈর্য্য হইয়া উঠিয়াছিল। হেমেন্দ্রনাথ এই সব ব্যাপার লইয়া আজ ভারি ব্যতিব্যস্ত হইয়া আছেন। উপেন ও যোগেশের সঙ্গে ঘুরিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে মধ্যে মধ্যে বলিতেছেন "দেখলে হে সরকারটার আক্কেল কোন যুগে হুকুম করেছি গোটাকতক ভাল ভাল গোলাপের তোড়া বানিয়ে যেন 'লেডিদের' পাঠিয়ে দেওয়া হয়, এতক্ষণে খবর দিচ্চেন মালি বেটারা সব ভাল ফুল পূজার জন্য তুলে দিয়েছে।

উপেন জিজ্ঞাসা করিল "কর্ত্তার ফিরতে যে এতো দেরি হলো?" ঔদাস্যের সহিত ভাবী জমীদার উত্তর করিলেন "কে জানে রাত্রে তখন আমি ঘুমুচ্ছিলাম সকালবেলা গিয়ে দেখি কর্ত্তার মেজাজটা যেন চটা চটা। গতিক বড় সুবিধে মতন নয় বুঝে বুদ্ধিমানের মতন চটপট সরে পড়া গেল।" যোগেশ খুব সমজ-দারের মতন মাথা নাড়িয়া সায় দিয়া গেল "তাই তো চাই। তাই ত শাস্ত্রে বলেছে 'স্থান ত্যাগেন দুর্জ্জনা।'" উপেন হাসিয়া বলিল "দুর্জ্জনই বটে। তার পর অন্দর মহলে? সেখানেও বোধ হয় সুরটা ঠিক কোমল নিখাদে আরম্ভ হয়নি?"

হেমেন্দ্র জয়ের হাসি হাসিল "আহাঃ আমায় তেমনি আহাম্মক বুঝি ঠাউরেছ? আজকের এমন আমোদের দিনটা আমি সকল কর্ম্ম ফেলে সেই পাদরী সাহেবের ধর্ম্মোপদেশ শুনতে ছুটলাম আর কি! একে চিঠিপত্র লেখা নিয়ে দুজনকারই মেজাজ গরম হয়ে আছে জানি,—তারপর এই থিয়েটারও একটা ছুতা হবে। আবদার দেখো না! ওঁরা এদিক সেদিক টং টং করে ঘুরে বেড়াবেন, আর আমি শালা নিত্য নূতন ঠিকানা খুঁজে চিঠি লিখে মরি! আর ওঁরা রাজ্যের ঠাকুর আর মন্দির তৈরি করে পয়সাগুলো জলে ফেলে দেবেন, পৃথিবীজুড়ে একটা কুড়ের রাজ্যত্ব স্থাপন করে অপূর্ব্ব কীর্ত্তি স্থাপন কর্বেন তাতে কিছু ক্ষতি নাই, যতো লোকসান বোধ হয় আমাকে একটু আমোদ করতে দেখলে! আশ্চর্য্য কথা! বলেন কি না ও টাকাগুলো তার চেয়ে অনাথ আতুরকে দিলে তারা বেঁচে যেতো! আরে বাপু অনাথ আতুরকে বাঁচিয়ে তোর কি উপকার! শুদ্ধ পৃথিবীর দারিদ্র্য ও ভার বৃদ্ধি বৈতো নয়! ওসব মেয়ে শঙ্করাচার্য্যদের কাছে যাওয়াও আতঙ্ক জনক!" উপেন বলিল "আচ্ছা উপদেশ জিনিষটা এমন মন্দ কি? বিশেষ অমন উপদেষ্টার মুখে?" "নাঃ কিছু না তুমি যাই বলে তার গুণগান করতে চাও করো ভাই! আমি কিন্তু গার্গী লীলাবতীকে ভয় ভিন্ন কখনো ভক্তি করতে পার্ব্বোনা। ইহাদের সংস্রব হতে যতোই দূরে থাকিতে পাওয়া যায় আমাদের পক্ষে ততোই মঙ্গল! বরং ভট্টাচার্য্য মহাশয় যখন টিকি নাড়িয়া ধর্ম্ম কথা কহেন তখন দায়ে পড়িলে দুদণ্ড সেখানে তিষ্ঠিতেও পারি তবুও স্ত্রীর পণ্ডিতি কোন রকমেই বরদাস্ত করিতে পারি না।"

উপেন্দ্র ঈষৎ ক্রুদ্ধস্বরে কহিল "হেমবাবু এ তোমার বড় অন্যায় অমন গুণবতী স্ত্রীরও যদি তুমি নিন্দা করো তোমার নরকেও স্থান হবে না।"

যোগেশ উত্তেজিত উপেনের পিট চাপড়াইয়া তাহাকে থামাইয়া দিয়া বলিল "নরকে স্থান না হলে এমনি বেশি ক্ষতি কি? বি কাম, বি কাম।" হেম বলিল আমার উপর অতোটা চটোনা। আমি কি বলছি আমার স্ত্রী বড় মন্দ? তাহলে আর সে আমার স্ত্রী হলো কেন? তবে কি জানো. স্ত্রীর মতোন আবদার করবে, মান অভিমান করবে, চাই কি তাই নিয়ে মধ্যে মধ্যে সোনালী রকম এক আধ পশলা রৌদ্রবৃষ্টি হয়েও গেল—তবে না সে স্ত্রী! স্ত্রী ধরবে বাড়িতে যাত্রা থিয়েটার দাও, প্রতি শনিবারে গড়ের মাঠের সার্কাস থিয়েটার বা চিড়িয়াখানা দেখিয়ে আনো; সন্ধ্যাবেলা বাসন্তী রংয়ের সাড়িখানি পরে ফুলের মালাগাছি হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাক যে, যাবামাত্র মালাগাছি গলায় পরিয়ে দিয়ে হাত ধরে ভালবাসার কথা বার্ত্তা কইতে থাকবে, তা নয় গিয়ে দাঁড়াবামাত্র —বাবা লিখেছেন তোমার এখন হতে পড়াশুনা ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়; কিছু দিন বরং মেডিকেল কলেজে পড়লে হয় না কতো গরীব দুঃখীর উপকার হবে ইত্যাদি ইত্যাদি! গরীব দুঃখীদের জন্য তো ভেবে ভেবে আমি মারা গেলাম! এদিকে লজ্জাবতী লতাটি কিন্তু দরকার হলে এনিবেশাণ্টের মতন বক্তৃতা দিতেও পিছপাও হন না! তার

উপর আবার শ্বশুর যখন আরম্ভ করেন তখন কোথায় বা লাগেন সুরেন্দ্রবাবু কোথায় বা থাকেন রবীন্দ্র বাবু ত্রাহি মধুসূদন ডাক ছেড়ে উঠতে হয়!"

এমন সময়ে সাধুচরণ ভৃত্য আসিয়া জানাইল "যে তাঁহার শ্বশুর আসিয়াছেন এবং তিনি তাঁহাকে ডাকিতেছেন।" বিপন্ন হেমেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিয়া আরো জানিল যে তিনি এখন অন্তঃপুরে তাঁহার কন্যার নিকটেই আছেন। হেমেন্দ্রনাথ বিরক্তচিত্তে বলিয়া উঠিল "তবেই আজ দেখছি আমার দফা নিকেশ! মণি-কাঞ্চনে সংযোগ!" যাইবার সময় বন্ধুদের বলিয়া গেল "দেখোহে বন্দোবস্ত যেন সব ঠিক হয়; শালারাতো ফাঁকি দিতে পেলে কিছুই আর চায় না। লেডিদের যেন কোন প্রকার অসুবিধা ভোগ না করিতে হয়। যোগেশ তুমি সেখানে যাও আমি শীঘ্রই ফিরে আসছি।"

রজনীনাথ জামাতাকে সম্মুখে পাইয়া প্রথমতঃ তাহাকে পড়াশুনা ত্যাগ করার জন্য খুব একচোট তিরস্কার করিয়া লইলেন। তার পর বলিলেন এই বয়সে পড়াশুনা ছেড়ে থিয়েটার ও আমোদ নিয়ে ঘুরে বেড়ালে তোমার চলবে না। আমি তোমাকে উৎসন্নের পথে ছেড়ে দিতে পারব না তো; আমার কাছে থেকে আবার তোমাকে পড়াশুনা করতে হবে। কালই আমি তোমাকে নিয়ে যাব। অনেক বার তোমায় একথা বলেছি তুমি গ্রাহ্য করো নাই।"

হেমেন্দ্র মনে মনে ভারি চটিল, কিন্তু তথাপি ক্রোধ দমন করিয়া বেশ শান্ত ও বিনীত ভাবে কহিল "আমার চোখের অসুখ, পড়াশুনা করতে গেলেই আমি অন্ধ হয়ে যাব। তাতে যদি আপনার আপত্তি না থাকে বেশ বলুন আমি যাচ্ছি?"

রজনীনাথ মৃদু হাসিলেন বলিলেন "তোমার চক্ষুরোগের কথা আমার মনে আছে যদিই বা ভুলতাম কিন্তু চক্ষের সামনেই ওই নীল চশমাটা দেখে সেটা ভোলা অসম্ভব। চশমাটা কি সর্ব্বদাই ব্যবহার কর? না আমার সামনে এখন পরে এলে? সে যা হোক আমার জামাই অন্ধ হয় অবশ্য সে ইচ্ছা আমার নেই সে ভাবনাটা তুমি আমার উপরেই ফেলে দিয়ে রাত্রের মধ্যে প্রস্তুত হয়ে থাকো, ৬টার ট্রেনেই আমাদের যেতে হবে বিলম্ব করতে পারবনা।"

রজনীনাথের স্বরের দৃঢ়তা দেখিয়া হেমেন্দ্রের মনে মুক্তির আশা ক্ষীণ হইয়া আসিল ভারি রাগ হইল, সে ঈষৎ ক্রুদ্ধ কণ্ঠেই বলিয়া ফেলিল "কাল সকালেই আমি কেমন করে যাব? বাবাকে বলতে হবে তা ভিন্ন আজ বাড়িতে কাজ; আজ রাত্রের মধ্যেই তো সব উদ্যোগ হয়ে উঠবে না, সে একেবারে অসম্ভব! আমি দু একদিন পরে যাবো।"

রজনীনাথ ভ্রুকুটি করিলেন, বলিলেন "অসম্ভব! অসম্ভব কিসে? তোমার বাবাকে আমি সব বলে রেখেছি। থিয়েটার তুমি যথেষ্ট দেখেছ; গোছানর জন্য তোমার ভাবনা নেই শান্তি সে সব বন্দোবস্ত করবে। বুড়ি! কেমন তুই পারবিনা?

পার্শ্বের ঘরে দ্বারের নিকটেই অবগুণ্ঠনবতী শান্তি দাঁড়াইয়া ছিল। পিতার আহ্বানে সে ধীর পদে কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিয়া জানাইল,—পারিবে।

রজনীনাথ উঠিয়া দাঁড়াইলেন "আমি তোমার বাপের কাছে যাচ্ছি, একটু পরে তুমিও সেখানে যেও, কিছু কথা আছে। বুড়ি এখন আমি চল্লাম"। বলিয়া রজনীনাথ সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। হেমেন্দ্র পরুষ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল "তুমি বুঝি আমার নামে শ্বশুর মশায়ের কাছে কতকগুলো লাগিয়েছ ?

শান্তি অকস্মাৎ চমকিয়া উঠিল, বিস্ময়ে নেত্র বিস্ফারিত করিয়া কহিল "আমি! সে কি কথা!"

"তুমি নয়তো আর কে? তোমায় চিঠি পত্র লিখতে ফুরসৎ পাইনি, কাজের ভিড়ে তুমি এসে পর্য্যন্ত দেখা করতে সময় করতে পারিনি বলে বুঝি তোমার রাগ হয়েছে? তারি শোধ নেবার জন্য বাপের কাছে কতকগুলো আমার মিথ্যা নিন্দা করে আমার বাড়ি থেকে বিদায় করবার চেষ্টা হচ্চে? তা বেশ বেশ! তুমি খুব ভাল স্ত্রী! তুমি দুচক্ষে আমায় দেখতে পারোনা।"

শান্তি শিহরিয়া বলিয়া উঠিল, "তুমি আমায় এমন নীচ মনে কর ছিঃ!

সে ধিক্কারে হেমেন্দ্র যেন স্তম্ভিত হইয়া গেল। শান্তির কণ্ঠে ইহার পূর্ব্বে সেরূপ স্বর শুনে নাই তাই প্রথমটা ঈষৎ লজ্জা বোধ করিয়া মুখ নত করিল। কিন্তু পরক্ষণেই সে নিজের আগতপ্রায় বিপদের কথা স্মরণ করিয়া যেন শান্তির উপরে মমতাহীন হইয়া উঠিল বলিল "নিশ্চয়ই এ তোমার কাজ নইলে তিনি আজ রাত্রেই এ যন্ত্রণা ভোগ করাইতেন না। কি গ্রহেই পড়লাম, এমন জানলে আমি তোমার সামনে আসতাম না।

শান্তির বিবর্ণ অধর ঈষৎ কম্পিত হইল, সে তীব্রভাবে কি একটা কথা বলিতে গিয়া হঠাৎ দ্রুতপদে কক্ষের অপর প্রান্তে একটা জানলার ধারে গিয়া মুখ ফিরাইয়া রহিল।

তখন শরতের অপরাহ্ণ ছায়াচ্ছন্ন সন্ধ্যার মধ্যে মিলাইয়া যাইতেছিল। জানালার নীচে উদ্যানস্থ কামিনী বৃক্ষের শ্রেণী হইতে একটা মদিরময় সুবাস সন্ধ্যার বাতাসে মিশ্রিত হইয়া উঠিতেছিল। পাখীটার গান গাহিবার সাধ তখনো যেন মিটে নাই, তাই থাকিয়া থাকিয়া জামরুল গাছের মধ্যে লুকাইয়া ঝঙ্কার দিয়া উঠিতেছিল। শান্তি তাহার অনাদৃত, অভিমানাহত হৃদয় লইয়া চুপ করিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার কালো চোখে একটা কম্পিত জলের রেখা দেখা দিল, সেটাকে সে তাহার অঞ্চলপ্রান্তে ধীরে ধীরে মুছিয়া ফেলিল। এমন হৃদয়হীনের কাছে হৃদয়ের দৌর্ব্বল্য প্রকাশ করাও অপমান! যাহার নিকটে তাহার কথার একটা সামান্যও মূল্য নাই!

শান্তির ব্যবহারে একমুহূর্ত্ত হেমেন্দ্রের মুখখানা ক্রোধে আরক্ত হইয়া উঠিয়া দ্বিতীয় মুহূর্ত্তে আবার তাহা স্বাভাবিক ভাব ধারণ করিল। সে স্থির দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ শান্তির দিকে চাহিয়া রহিল। গোধুলীর সেই আধ আলো আধ আন্ধারে, ঈষদ্রক্তিম ক্ষীণালোকে সেই অদূরবর্ত্তিনী নারীমূর্ত্তি যেন কোন নিপুণ চিত্রকরের তুলিতে চিত্রিত করা ছবির মতন দেখাইতেছিল। তাঁহার সুরচিত কবরী তাহার পীতবর্ণের সাড়িখানি সেই পরিপুষ্ট অঙ্গবেষ্টন করিয়া তাহার শুভ্রবর্ণের সৌন্দর্য্য আরো বাড়াইয়া তুলিতেছিল, তাহা হেমেন্দ্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া লইল।

মনে মনে সে যেন ঈষৎ লজ্জা ও পরাভব বোধ করিতে লাগিল, শাস্তি কি তাহার সমালোচনা এইমাত্র শুনিয়া আসিয়াছে? এই কথাই না সে বন্ধুদের কাছে এইমাত্র বলিতেছিল? সত্যসত্যই কি তবে সে এতোদিন তাহার মনোমত সাজে সাজিয়া তাহার জন্ম উৎকণ্ঠিত হৃদয়ে পথ চাহিয়া ছিল? দুর্ভাগ্যের বিষয় যে উপস্থিত সেখানে একগাছা জুঁই ফুলের গোড়ে ছিল না, আর এই যে দীর্ঘ বিরহের পর দম্পতির প্রথম আলাপ ইহাকেও ঠিক প্রেমালাপ বলিতে পারা যায় না। হেমেন্দ্র ডাকিল "শান্তি!"

অনিচ্ছাসত্বেও অভ্যাসের বশে সে ফিরিয়া দাঁড়াইল। তাহার বিষাদপূর্ণ ম্লানমুখে বেদনা ও অভিমানের রেখাগুলি পরিষ্কার অক্ষরে ফুটিয়া উঠিল। "শান্তি কাছে এসো, এতোদিন পরে দেখা রাগ করোনা।"

সত্য, এতোদিন পরে সাক্ষাৎ শান্তির আজ অভিমান প্রকাশ করা উচিত হয় নাই। সে ধীরে ধীরে ফিরিয়া আসিল। হেমেন্দ্র কোমল মিনতিপূর্ণস্বরে কহিল, "শান্তি, কাল সকালেই আমি যেতে পারবো না, সে একেবারেই অসম্ভব, তোমায় এর কিছু উপায় করে দিতে হবে, লক্ষ্মীটি আমার এই উপকারটা করো।" "আমি!" সবিস্ময়ে শান্তি জিজ্ঞাসা করিল "আমি কি উপায় কর্ব্বো?" হেমেন্দ্র পরামর্শ দিল "তোমার বাবাকে বলে' আজ তোমার শরীর ভাল নাই সেইজন্য কিছুই উদ্যোগ করে তুলতে পারলে না, তাহলেই তিনি বিশ্বাস করবেন! তুমি ইচ্ছা করলে কি না হয়! দেখো দেখি কাল তোমাদের আবুহোসেন আর বিবাহ-বিভ্রাট প্লে হ'বে কাল আমি কেমন করে যাবো, তুমিই বল দেখি? শান্তি সভয়ে জিহ্বা দংশন করিল "না না আমি বাবার কাছে মিথ্যা বলতে পারবো না, আর কিছু বলো।"

হেমেন্দ্রনাথের মুখে গভীর বিরক্তির চিহ্ন প্রকাশ পাইল, সবেগে সে ভূমে পদাঘাত করিয়া বলিয়া উঠিল "ঐতো তোমার দোষ, ঐ জন্যই তো তোমার সঙ্গে আমার বনে না। মিথ্যা কিসে হোল? আমার উপকারের এটুকুও তুমি করতে পারোনা? সাধ করে কি বলতে হয় যে আমি তোমার আপদ আমায় বিদায় করতে পারলে তুমি বাঁচো।"

শান্তি ক্রুদ্ধ হেমের হাতখানা দুই হস্তে চাপিয়া ধরিয়া ব্যাকুলকণ্ঠে তাহাকে বাধা দিয়া উঠিল "তুমি আমাকে এমন করে আঘাত করোনা, বলো আমায় কি করতে হবে? তাই আমি করছি।"

"আঃ তাই বলো, এইতো বেশ ভাল-মানুষের মতন কথা; বেশি আর কি এমন করতে হ'বে, শুদ্ধ কাল আমায় যাতে চলে যেতে না হয় তারি কিছু উপায় করো! আমি কাল যাবোনা সেটা নিশ্চিত তবে তা নিয়ে একটা ঝগড়া বাধান আমার ইচ্ছা নয়?"

ঈষৎ বিবর্ণমুখ নত করিয়া সে উত্তর করিল "চেষ্টা করিব।" হেমেন্দ্র খুসী হইয়া পত্নীকে একটু কাছে টানিয়া লইল, তাহার শুভ্র ললাটে মৃদু মৃদু অঙ্গুলির আঘাতে পরিস্ফুট কৃতজ্ঞতার চিহ্ন প্রকাশ করিয়া বলিল "আমায় বাঁচালে, দেখো দেখি শ্বশুর মশায়ের অন্যায়, এতো পয়সা খরচ করে আমি

থিয়েটারটা দেশে আনাইলাম, আর আজই আমায় যতো দরকার পড়ে গেল এ শুধু আমার উপর আক্রোশ প্রকাশ করা। তবে আমি এখন চল্লাম, দেখিগে ওদিকে কতোদূর কি হলো, আবার "নবকুমারের" শরীরটা ভাল নাই, ম্যানেজার ধরেছে আমায় 'নবকুমারের পাঠ নিতে হবে'। যদিও কলকেতায় বারকয়েক অ্যাক্টি করা গেছে, তবু এখানে একটু যেন বাধ বাধ ঠেকে। ওটা আর কিছু নয় অনভ্যাসের জন্য। না হলে সকলেই বলে 'নবকুমারের অ্যাকটিং 'আমি যেমন করেছিলুম তেমন অন্য কেহ পারে না। হাঁ আর একটা কথা, ম্যানেজার বলছিল যে 'মেহেরুন্নিসার' জন্য ভুল করে লাল রংয়ের সাড়ি আনা হয়েছে, তাতে তাকে মানাবে না। দাও দেখি তোমার একখানা নীল বা গোলাপি রংয়ের ভাল সাড়ি।

একমুহূর্ত্ত শান্তির শান্তমুখ ঘৃণা মিশ্রিত বিরক্তিতে আরক্ত হইয়া উঠিল, কিন্তু মুহূর্ত্ত মধ্যে সে আত্মসংবৃত্ত হইয়া এতো শীঘ্র পার্শ্বের ঘরে চলিয়া গেল যে তাহার এই সহসা অন্তর্ধানে হেমেন্দ্র বুঝিয়া উঠিতে পারিল না, যে, সে রাগ করিয়া গেল বা ভাল মনে গেল। কিন্তু বেশিক্ষণ তাহাকে সমস্যায় থাকিতে হইল না, অল্পক্ষণ পরেই একখানা ফিকে নীলবর্ণের রেশমী সাড়ি হাতে শান্তি সেই ঘরে প্রবেশ করিল। হেমেন্দ্র আবার বিস্মিত হইয়া গেল, "যে শান্তি উপদেশ দিতে পারিলে আর কিছুই চাহে না—" সে আজ স্বামীর মুখের কথা খসিতে খসিতে তাহার আজ্ঞা পালনে ছুটিল, এমন বাধ্য স্ত্রী সে কবে হইতে হইল! পরীক্ষা করিয়া দেখিল সাড়িখানি বহুমূল্য। প্রকাশ্যে বলিল 'হাঁ এখানা মেহের উন্নিসার যোগ্য হইবে।" বলিয়া পত্নীর গম্ভীর মুখের দিকে চাহিয়া দেখিয়া ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল। যাইবার সময় বলিল "ভেরীমাচ্ থ্যাঙ্ক ইউ, কিন্তু দেখো যেন সে কথাটা ভুলে যেও না।" শান্তির ললাট হইতে কর্ণমূল কে যেন লোহিত রাগে রাঙ্গাইয়া দিল।

রজনীনাথ আসনে বসিয়া কিছুক্ষণ অন্যমনস্ক ভাবে আহার করিতে লাগিলেন। শান্তি নিকটে বসিয়া পিতাকে পাখার বাতাস দিতে লাগিল, সেও সহসা কোন কথা বলিতে পারিল না। পিতার অদ্ভুত গাম্ভীর্য্য তাহার স্নেহকোমল বক্ষে কেমন যেন ব্যথার মত বাজিতে লাগিল! ধীরে ধীরে ডাকিল "বাবা!" রজনীনাথ মুখ তুলিয়া কন্যার দিকে ফিরিয়া চাহিলেন, বিষণ্ণভাবে একটুখানি ম্লানহাসি হাসিয়া কহিলেন "কিরে লতি! তুই যে বড় থিয়েটার দেখতে যাসনি?

সেও একটু ক্ষীণভাবে হাসিল, কথা ঘুরাইয়া লইবার চেষ্টায় বলিল "বাবা, সুকু কেন এলোনা, তাকে অনেকদিন দেখিনি বড় দেখতে ইচ্ছা করে।"

"তার শরীরটা ভাল ছিল না, সেইজন্য আনতে পারিনি মা, সেতো আসবার জন্য মহা হাঙ্গামা সুরু করেছিল। বুড়ি তোর মাও তোকে দেখবার জন্য ভারী ব্যস্ত হয়েছেন।"

শান্তির বিষন্ন চোখে আনন্দের জ্যোতি নবোৎসাহে ফুটিয়া উঠিল "আমিও অনেকদিন মাকে দেখিনি, বাবা, আমায় কেন নিয়ে চলুন না?"

রজনীনাথ সস্নেহে কন্যার দিকে চাহিলেন; "তোকে নিয়ে যেতে পারলেতো বাঁচতাম বুড়ি, কিন্তু, কিন্তু তাতো এখন পারব না।" বলিয়া তিনি একবার চারিদিকে চাহিয়া দেখিয়া ঈষৎ নিম্নস্বরে পুনশ্চ কহিলেন "এখন যদি তোকে নিয়ে যাই তাহলে চৌধুরী মশায় হয়তো অন্য রকমও মনে করতে পারেন; সেটা আমি উচিত মনে করি না, কি বলিস লতি তোকে পূজার পরই একেবারে কিছুদিনের মত নিয়ে যাবো, সেই ভাল না?"

একটা ক্ষুদ্র নিশ্বাস ফেলিয়া সে উত্তর করিল "হাঁ"।

নিশ্বাসটা ক্ষুদ্র হইলেও সেটা রজনীনাথের কান এড়াইতে পারে নাই। তিনি অমনি চকিতনেত্রে তাহার মুখের দিকে একবার চাহিয়াই একমুহূর্ত্তে তাহার মনের লেখা যেন কতোকটা পাঠ করিয়া ফেলিলেন, কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া পরে বলিলেন "হেমকে কাল আর নিয়ে যাবোনা, আজ তোর পক্ষে যথেষ্ট পরিশ্রম হয়েছে লতু, আজ আর তার যাবার বন্তোবস্ত করে উঠতে পারবিনে, হেম না হয় দুদিন পরেই যাবে এখন। কিন্তু তার যাওয়া চাইই সে ভার তোমার উপর রৈল, এখন থেকে পড়া ছেড়ে থিয়েটারের দলে মিশলে চলবে কেন?"

আচমনান্তে ঘরে ফিরিয়া আসিয়া রজনীনাথ কন্যার হাত হইতে পানের ডিবাটা লইতে লইতে জিজ্ঞাসা করিলেন "তোর খাওয়া হ'য়ে গিয়েছে? আচ্ছা তবে তুই যা, আমি একটু বসি।

অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত পিতা পুত্রীতে কথাবার্ত্তা হইল। রজনীনাথ বলিলেন "আমি তোর সম্বন্ধে সমস্ত স্থির করেই এসেছি। তোর অধিকার কেহ কেড়ে নিতে পারবে না; তুই চৌধুরী মশায়ের কাছে থাকবি। কিন্তু হেম এখন হতে আমার কাছে থেকে পড়াশুনা করবে। সে বেশ বুদ্ধিমান ছেলেই তো ছিল দায়িত্ব বুঝলে এখনও যত্ন করতে পারে! আমার বিশ্বাস এই ব্যাপারটা ভগবান তারি মঙ্গলের জন্য ঘটিয়েছেন, তার জন্য আমার বড্ডই ভাবনা হয়েছিল, এমন সময় তোর চিঠি পড়ে আমার ভয়ানক একটা দুশ্চিন্তা দূর হয়ে গেল। এবার সে আবার পড়ুক, মানুষ হবে, কেন হতে পার্ব্বে না!" তারপর একটু চুপ করিয়া থাকিয়া আবার বলিলেন "লতি তোর মা ভাবছিলেন যে শিবানীর সঙ্গে তোর বনিবনাও হবে কি না! তাঁর ইচ্ছা তুইও আমাদের কাছে থাকিস, আমি কিন্তু বলেছি লতু আমাদের এমন মেয়ে নয় যে তার সঙ্গে কারও বনবে না। সেজন্য বৃথা ভাবনা। কি বলিস্ বুড়ি! আমি তোকে তোর মার চেয়েও বেশি চিনি কিনা?" সে মৃদুস্বরে কহিল "হ্যাঁ বাবা, তিনি আমায় কি না, খুব ভালবাসেন।" পিতা সস্নেহে কন্যার হাতটা হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া অপরহস্তে তাহার মাথাটা বুকের উপর চাপিয়া স্নেহ কণ্টকিত হইয়া হাসিয়া কহিলেন "কেন, আমার মেয়েটিকে আমি কি ভাল বাসিনা? আচ্ছা বুড়ি বিনোদের শাশুড়ি লোক ভাল তো? আর যদি তা নাই হয়, ত তেই বা তোর ক্ষতি কি? তুই তাঁকে নিজের মায়ের মতন শ্রদ্ধা ভক্তি করবি, সকল কাজেই তাঁর পরামর্শ চাইবি, অবশ্যই তিনি তোকে ভাল-



শ্রীযুক্ত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

বাসবেন। নিজে ভাল থাকলে কেউ মন্দ হতে পারে না। বিনোদের স্ত্রীর সঙ্গে ঠিক বোনের মতন ব্যবহার করবি, কর্ত্তৃত্বের অধিকার তার হাতে দিবি, অথচ নিজে সব কাজেতেই তার সাহায্য করবি! আমি জানি আমার মাকে আমার বুড়িকে আমার কিছুই বলবার প্রয়োজন নাই, তবুও বাপের একটা কর্ত্তব্য তো আছে, তাই বলছি লতি এইবার তোর পরীক্ষার দিন এসেছে সংসারের এই সব ছোট বড় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হতে তবেই প্রশস্ত কর্ম্মক্ষেত্রে অচল প্রতিষ্ঠালাভ ঘটে। বিনোদকুমারের বিধবা যেন—"

"বাবা! সত্যি কি দিদি তা'ই? সত্য সত্যই তাঁকে আর পাওয়া যাবে না বাবা কন্যার স্বরে রজনীনাথ বেদনা বোধ করিলেন, সামলাইয়া লইলেন।

"ওটা আমার বলা ভুল হয়েছে বুড়ি! ঈশ্বর জানেন বিনোদ জীবিত কি না কিন্তু আশা তো কিছু দেখি না। হ্যাঁরে হেম তো শিবানীকে বেশ শ্রদ্ধাভক্তি করে? তাকে এ সম্বন্ধে কিছু বলবো মনে করেছিলাম কিন্তু সেতো আমার সঙ্গে আর দেখাই করলে না। শিবানী বা তার ছেলের উপর তার তো কোন বিরুদ্ধভাব জন্মে নাই?"

শান্তি দেখিল কথাগুলার শেষে তাহার পিতা ঈষৎ গম্ভীর হইয়া পড়িলেন। সে চকিতদৃষ্টি ভূমিসংলগ্ন করিয়া ফেলিয়া অস্ফুটস্বরে উত্তর দিল "দিদির সঙ্গে দেখা হয়নি তো?"

"মোটে দেখাই করেনি, ভাল করেনি, তাকে বলতে হবে যেন সে তার উপর বেশ সদ্ব্যবহার করে। অমূল্যকুমারের ভার এখন তারি উপর তো! ওরা আসাতে সন্তুষ্ট হয়েছে তো?"

শান্তির নত দৃষ্টি আরো নত হইয়া আসিল, ম্লান মুখ অধিক ম্লান করিয়া মৃদুস্বরে লজ্জার মধ্য হইতে সে উত্তর করিল "তাতো জানি না।"

রজনীনাথ ঈষৎ বিস্ময়পূর্ণ ক্রোধে নীরব হইয়া রহিলেন।

তখন অনেক রাত হইয়া গিয়াছে। পূর্ণিমার চাঁদ বিমল জ্যোৎস্না তরঙ্গে ভাসিয়া যাইতেছিল। ঘুমন্ত জগতের উপর অমৃত বর্ষণ করিয়া প্রকাণ্ড পুরীর এক অংশ হইতে মধুর যন্ত্রস্বরের সহিত সম্মিলিত সকরুণ সুমধুর সঙ্গীতলহরী ভাসিয়া আসিতেছিল

"কোলে তুলে নে'মা কালী! কালের
কোলে দিসনে ফেলে,
বড় জ্বালায় জ্বলছি যে মা, আমায়
যেতে দে' জয় কালী বলে।"

উদীয়মান লেখক।

(১)

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

শেফালি। শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় প্রণীত। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ চৌধুরী কর্ত্তৃক প্রকাশিত। অ্যান্টিক কাগজে কান্তিক প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য ৸৹ আনা।

অল্প বয়সেই, সৌরীন্দ্রমোহন সাহিত্য-সাধনায় যশের পথে অগ্রসর হইয়াছেন। এরূপ স্বল্প সময়ে, সাহিত্য সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারা অল্প লোকের ভাগ্যেই ঘটে। সৌরীন্দ্রমোহনের বয়স এখনও ২৫ বৎসরের অধিক হয় নাই।

গত বৎসর তাঁহার "যৎকিঞ্চিৎ" ষ্টার রঙ্গালয়ে সুখ্যাতির সহিত অভিনীত হইয়া গিয়াছে। তাঁহার এই গ্রন্থের বিবৃত বিষয় সম্বন্ধে অনেকের মতভেদ থাকিতে পারে,—আর এমন কোন্ লেখক আছেন যাঁর রচনা সম্বন্ধে মতভেদ নাই?—তথাপি একথা অনেকেই স্বীকার করিবেন যে, তাহাতে সৌরীন্দ্রমোহন একটি মনোরম বৈচিত্র্য, সুমধুর নূতনত্ব এবং ব্যঙ্গ নাট্যের অন্তর্ভুক্ত নাটকীয় শিল্পচাতুর্য্যের পরিচয় দিয়াছেন।

কিন্তু 'যৎকিঞ্চিতের' লেখক অপেক্ষা, সৌরীন্দ্রমোহন, সুন্দর গল্প লেখক বলিয়া অধিকতর সুপরিচিত। বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ মাসিক পত্রিকায় তাঁহার যে সকল গল্প প্রকাশিত হইয়াছে—সম্প্রতি তাঁহার কতকগুলি গুচ্ছাকারে শেফালি নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। অনাড়ম্বর শেফালিকার শুভ্রশোভা যেমন জগদ্বাসীর মনোমোহক, সৌরীন্দ্রমোহনের শেফালিও সাহিত্যসেবীর পক্ষে তেমনি প্রীতিপ্রদ হইবে আশা করা যায়।

শেফালি একখানি ছোট গল্পের বহি। দুচারিটি পাতার আড়ালে একটি ফুলের ন্যায়, ছোট একটি গল্প আপনাতে পরিপূর্ণ একটি খণ্ড সৌন্দর্য্য। পাশ্চাত্য সাহিত্যের সহিত নিত্য সম্পর্কে বাঙ্গালা সাহিত্যে ছোট গল্পের সৃষ্টি হইয়াছে। বঙ্গসাহিত্যে ছোট গল্পের প্রবর্ত্তক কে সে সম্বন্ধে আপাতত আলোচনা করিতে প্রস্তুত নহি। তবে মোটামুটী বলা যাইতে পারে—বঙ্কিমবাবুর 'ইন্দিরার' পর শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীর "মালতী" প্রভৃতি এবং তাহার পর রবীন্দ্রবাবুর নাম আসিয়া পড়ে। বস্তুতঃ ইঁহারা ভ্রাতা ভগিনীতেই বঙ্গসাহিত্যে ছোট গল্পের বহুলপ্রচার করেন।

ইঁহাদিগের দৃষ্টান্তে এখন ক্ষুদ্র গল্পের রচনায় অনেক লেখকই হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। সুখের বিষয়, এই ব্রতে ব্রতী সৌরীন্দ্রমোহন আপনার স্বাধীন পথটুকু আবিষ্কার করিয়া লইয়াছেন। তাঁহার বর্ণনা-কৌশল, চিত্রাঙ্কন পদ্ধতি,—এমন কি বাক্‌ভঙ্গি পর্য্যন্ত তাঁহার নিজস্ব। শত রচনার মধ্য হইতেও তাঁহার রচনা সূক্ষ্ম সমালোচকের চক্ষে ধরা পড়ে।

সৌরীন্দ্রমোহনের রচনাভঙ্গীতে তাঁহার বলময়ী প্রকৃতির একটা ছাপ থাকিয়া যায়;—তাহা সঙ্কোচহীন, পরিষ্কার ও মনোজ্ঞ! রচনার স্বচ্ছ আবরণের মধ্য হইতে গ্রন্থকার ফুটিয়া বাহির হন। অনেক সময় দেখা যায়, অনেক মনস্বী লেখকও আপন বক্তব্য ভাবটীকে সংযত করিতে না পারিয়া উচ্ছৃঙ্খল ভাবে লেখনী চালন করিতেছেন। সৌরীন্দ্রমোহনের রচনায় সেরূপ ত্রুটি, সেরূপ দুর্ব্বলতা বা অক্ষমতার চিহ্ন বিরল। অনাবশ্যক ভাবের বা বর্ণনার আতিশয্যে তিনি আপন বক্তব্যের প্রকাশটুকু কুয়াসাচ্ছন্ন করিয়া তোলেন না। তেজস্বিতার সহিত মুক্তপ্রাণতা, ভাবের সহিত ভাষার স্বাভাবিক মিলনই তাঁহার রচনাকে এমন হৃদয়গ্রাহী করিয়া তোলে।

সৌরীন্দ্রমোহনের কোনো কোনো গল্প নাটকীয় ভাবের সংমিশ্রণে সমুজ্জ্বল! "শেফালির" সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র গল্প "নির্ব্বন্ধ" তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ! সামান্য একটী দিনের ঘটনা—সামান্য তার সূচনা; কোন আয়োজন নাই, কোন পূর্ব্বাভাব নাই; অথচ তাহার পশ্চাতে আসন্ন ট্র্যাজেডির করাল ছায়া! প্রতিদিনের যাওয়া-আসার, উৎসব আমোদের মধ্য দিয়া, মৃত্যুর শোকনাট্য—অভিনয় ও সমাপ্ত হইয়া গেল! উৎসব-ভবনে তাহার সাড়াটী পর্য্যন্ত পৌঁছিল কিনা তাহার কোন সংবাদ নাই; অথচ কেমন একটীর পর একটী, দৃশ্যের পর দৃশ্য, ত্বরিত গতিতে মহা অবসানের আয়োজন আরম্ভ ও শেষ হইয়া গেল! বিকালে মাছ ধরিতে যাওয়ায় এমন কিছু বিশেষত্ব নাই। এই নাট্যের দৃশ্যপটের আয়োজন অনেকদিনের পুরাতন একখানি মেঘাচ্ছন্ন আকাশেই সমাপ্ত! তারপর, মেঘগর্জ্জনসহ ঝড়, পিতা পুত্রের মরণ-কঠিন-শেষ আলিঙ্গন তার পর ছাড়াছাড়ি; পুত্রহীন পিতার প্রত্যাবর্ত্তন, পুত্রব্যাকুলা মাতার সকাতরব্যাকুলতা, স্বামীপুত্রহীনা নারীর সকরুণ-চিত্র, শুধু এক রাত্রের ঝড়ের পাশ দিয়া ত্বরিত পর্য্যায়ক্রমে উষার অশ্রুমাখা আলোকচ্ছটায় ফুটিয়া উঠিয়াছে;—স্বল্পতার মধ্যে চিত্রখানি একেবারে সম্পূর্ণ সৌন্দর্য্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে!

এরূপ ভাব সৌরীন্দ্রবাবুর অনেক গল্পেই পাওয়া

যায়। তাঁহার "নীরা" গল্পটী নাটকীয় বর্ণে কেমন সুন্দর হইয়াছে। বংশহীন পিতামহের একমাত্র অবলম্বন স্নেহপাত্রীর জন্ম গভীর স্নেহধারা, প্রচ্ছন্ন ফল্গুর মত, হৃদয়ের ভিতর দিয়া বহিয়া গিয়াছে। যে চুরির জন্ম এত ব্যগ্রতা, কোলাহল, সৌজন্য-হীনতা, নির্দ্দয়তা, তবু তাহার কোন সন্ধান মিলিল না। লাঞ্ছিত, অপবাদ-কলঙ্কিত পিতামহের হৃদয়ে মর্য্যাদা, অভিমান স্নেহ তিনটীতে বিরোধ বাধাইয়া তাঁহার গোপন কথাটী রহস্যগর্ভে চিরগোপন রাখিয়া দিয়াছে; মৃত্যুর দিব্য আলোকে সহসা তাহা বাহিরের আলোকে আসিয়া পড়িয়াছে।

দু একটী কথায় অনেকখানি প্রকাশ করা, কিম্বা একটু ইঙ্গিতে পাঠকের হৃদয়ে সহানুভূতিদ্বারা অসমাপ্ত চিত্রটুকু সম্পূর্ণ করিয়া তোলা সাহিত্যিকের শিল্প চাতুর্য্য। সেরূপ উদাহরণ উদ্ধৃত করা অনাবশ্যক। পাঠক পাঠিকাগণ সহজেই তাহা লক্ষ্য করিবেন।

চিত্রাঙ্কনে সৌরীন্দ্রবাবুর কৃতিত্ব যথেষ্ট। গার্হস্থ্য জীবনের যে যে চিত্র তিনি অঙ্কিত করিয়াছেন তাহাতে সর্ব্বত্র স্বাভাবিকতা পরিস্ফুট। জমীদার, দরিদ্র প্রজা, তেজস্বীপুরুষ, পতিব্রতা নারী, কিশোরী, বালিকাবধূ, বিপত্তিক্, বিপথগামী, শিক্ষিতা স্ত্রী সকলগুলি কেমন স্বাভাবিক, সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী।

করুণরসে সিদ্ধহস্ত হইলেও, ব্যঙ্গেও তিনি যথেষ্ট শক্তির পরিচয় দিয়াছেন। ব্যঙ্গ অর্থে কেবলি হাসি নয়;—ব্যঙ্গে একটা উচ্চ অঙ্গের আনন্দ আছে। শেফালির "ময়ূরপুচ্ছ" নামক ব্যঙ্গ গল্প তাঁহার অসামান্য নৈপুণ্য প্রকাশ পাইয়াছে।

অবশেষে সৌরীন্দ্রবাবুর 'শেফালি' সম্বন্ধে আমাদের কেবল দুইটী ক্ষুদ্র বক্তব্য আছে। প্রথম, কোন কোন গল্পে তাঁহার রচনার শেষভাগগুলি অনাবশ্যক উজ্জ্বল ভাষা ও ভাবের আতিশয্যে ভারী হইয়া পড়িয়াছে;—দ্বিতীয়, "হারানো চিঠি" বোধ হয় তাঁহার বহুপূর্ব্বের রচনা,—ওটি এ সংগ্রহে স্থান না পাইলেই ভাল হইত।

কৃষাণীর গান।

ননদিনি, কদ্দিন থাকে বা মানুষ সহরে?
ও সে গিয়েছে সেই ভাদর মাসে
এ যে আবার ভাদর ফিরে আসে
দিদি যারাই ছিল পরবাসে সবাই ত এল ঘরে;
ও তার হাতের ছাওয়া নতুন ঘরে
এখন দেবতা লাগলেই পানি পড়ে,
ওসে গোঁজা দেওয়া টিক্‌ছে না আর
এ কাল বছরের বাদরে—
তবু কেমন বেহুঁস্ মানুষ সেকি ফিরে আমার নাম করে!
কদ্দিন থাকে বা মানুষ সহরে?

আমি বিকাল বেলা যাইনা ঘাটে
আমার খোঁপা বাঁধতে পরাণ ফাটে
ও সে কি দুখে যে দিবস কাটে কেম্‌নে জানবে অপরে।
যখন সাঁজের বেলা গোলার পাশে
কাল ছায়া পড়ে দুব্বো ঘাসে
তখন ডুক্‌রে আমার কাঁদন আসে
শুধু কাঁদি না তোদের তরে;
যদি দেখার হ'ত দেখ্‌তে পেতিস্
কি আগুন জ্বলে অন্তরে—
কদ্দিন্ থাকে বা মানুষ সহরে?

ননদি সে কেমন তোর ভাই
আমি ভেবে কিছু ঠিক্‌না না পাই
আমি আন্‌চান্ করে' মরি সদাই
সে থাকে কেমন করে'?
কত লোকে কাঁদে হাসে
আমার কাঁদা বার মাসে
ও যার আপন মানুষ নাইক পাশে
সে কি আশে পরাণ ধরে?
ও সে কি দিয়ে যে মন তার গড়া
জানিনা কোন্ পাথরে!
কদ্দিন থাকে বা মানুষ সহরে?

খণ্ডগিরি।

খণ্ডগিরি গৌরবের অশ্রুবিন্দু। অশ্রু দেখিতে চাও ত' দেখ, কিন্তু যাহার এই অশ্রু, তাহার হাসি ভুলিও না। ইতিহাসের কথা পরে বলিব; আগে যাহা দেখিয়াছি, তাহাই বলি।

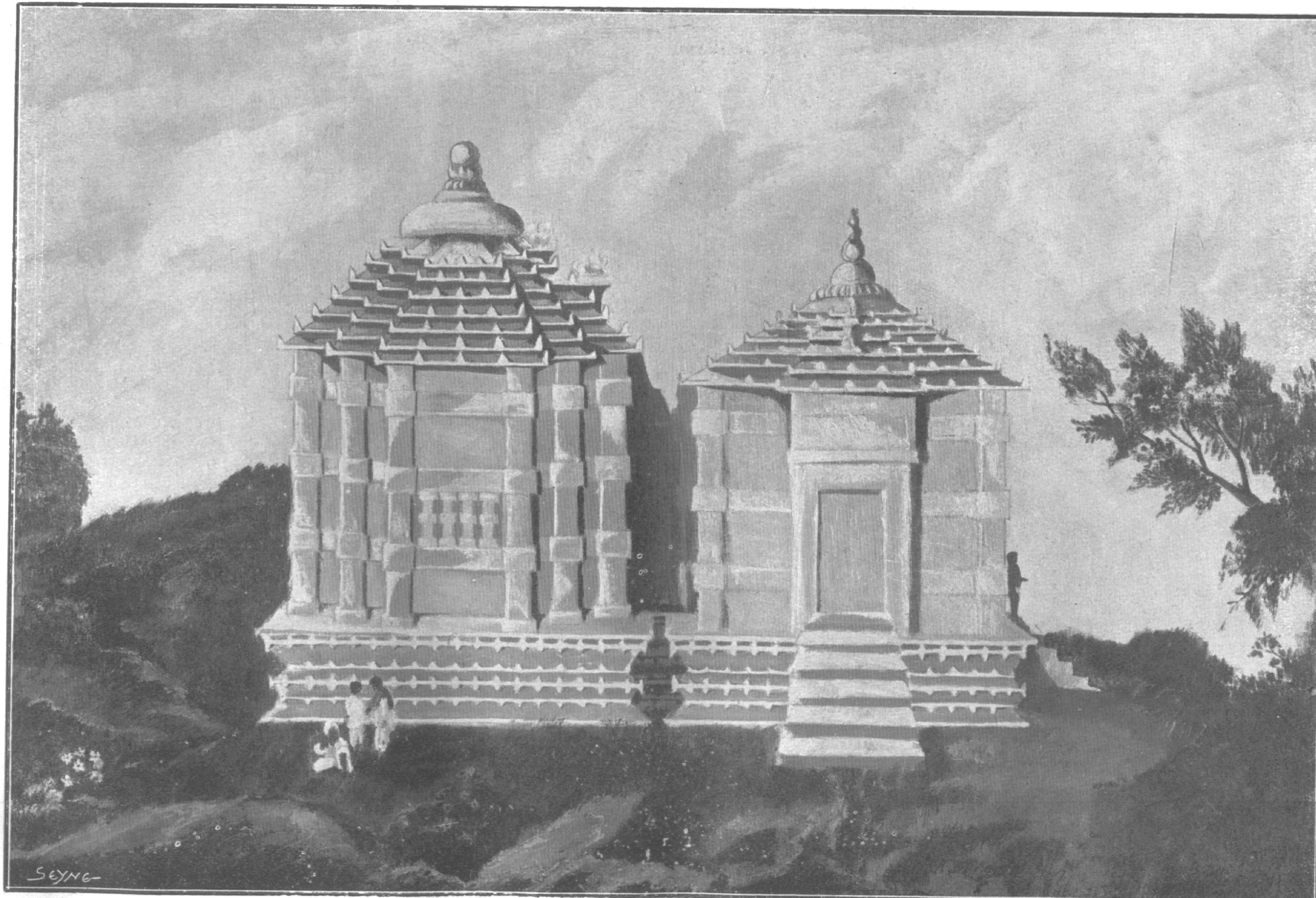
ভুবনেশ্বর হইতে, তিন মাইল দূরে, খণ্ডগিরির বৌদ্ধকীর্ত্তি। চারিদিকে হরিৎ-ধান্যতুকুলাভূমি, মর্ম্মরিত নিবিড় অরণ্য,—মধ্যে অসমোচ্চ পথ। সেই পথে, গোশকট যায়। সন্ধ্যার পর, পথে বাঘের ভয় আছে।

উৎকলের প্রায় সমস্ত শৈলই বালুকা-প্রস্তরগঠিত। খণ্ডগিরিও তাই। বালুকা-প্রস্তরগঠিত পর্ব্বতমালা অপেক্ষাকৃত কোমল হয়। সেই জন্য এখানে গুহাক্ষোদনের সুবিধা হইয়াছে। কোমলতার জন্য, শিল্পি-গণের কার্য্য, যেমন অনায়াসসাধ্য হইয়াছে,—ধ্বংসধর্ম্মী কালের দ্রংষ্টাচাপও তেমনি ইহার উপরে শীঘ্র বসিয়াছে। নতুবা, খণ্ডগিরির বৌদ্ধকীর্ত্তি দুই হাজার বৎসরের ভিতরেই বিধ্বংসস্তূপে পরিণত হইত না।

উদয়গিরির শিখর হইতে খণ্ডগিরির শীর্ষ অপেক্ষাকৃত উচ্চ। কিন্তু ইহা পাহাড়মাত্র,—ইহাকে গিরি বলা চলে না। নীচের সমতল ভূমি হইতে, খণ্ডগিরির উচ্চতা ৯০ হস্তের অধিক নয়। বিস্তারও সামান্য।—নয়শত হাতেরও কম। উদয়গিরির অংশ পূর্ব্বদিকে এবং খণ্ডগিরি পশ্চিমদিকে। মধ্যে একটি অপরিসর পন্থা শৈলাঙ্গকে দ্বিধা-বিভক্ত করি-য়াছে। প্রকৃতপক্ষে, এখানে একটিই পাহাড়।

উদয়গিরিতে অসংখ্য গুহা আছে। খণ্ডগিরির গুহাসংখ্যা কম। গুহা-গুলির কোনোটি খুব বড়, কোনোটি মধ্যমাকার এবং কোনোটি বা নিতান্ত ছোট। এখানকার গুহার মধ্যে, যেটি খুবই বড়,—কারলী বা ইলোরার একটি ছোট গুহার কাছেও সেটি সামান্য মাত্র।

রাণীগুম্ফাই সর্ব্বাপেক্ষা বড়। সেটি লম্বে প্রায় ৪০ হাত ও উচ্চে ১১ হাত। দেখিতে ঠিক যেন চকমিলানো ঘর। বারা-ন্দাটি পাঁচ হাত চওড়া ও প্রায় ২৪ হাত লম্বা। ৯টি স্তম্ভের উপরে, ছাদের গুরুভার অর্পিত। গুহাগুলি দ্বিতল। বারান্দার সম্মুখে, দুপাশে দুটি ঘর বাহির হইয়া আসি-আছে। বারান্দার তলায়, পাশাপশি আটটি ঘর আছে। প্রত্যেক ঘরই প্রায় দশহাত দীর্ঘ ও তিনহাত উচ্চ। দ্বারশীর্ষে কোথাও বিচিত্রভঙ্গিমধুর তন্বীললনা, কোথাও অদ্ভুত-গঠন অলঙ্কার, সঙ্গীতযন্ত্রাদি এবং কোথাও বা বিভিন্ন আদর্শের অঙ্গচ্ছদ প্রভৃতি। উপরের তলাটি একান্ত সংকীর্ণ। দক্ষিণদিকটা মুক্ত—গুহাদি শূন্য। মধ্যে একটি প্রাঙ্গণ আছে—সেটি দীর্ঘে প্রায় একত্রিশ হাত এবং প্রস্থে ১৭৷৷০ হাত। দুপাশের প্রথম ঘর দুটিতে ভিত্তিসংলগ্ন বর্ম্মপরিধৃত দ্বারপালের মূর্ত্তি। ডাঃ হাণ্টার বলেন, দু'পাশের ঘর দু'টির একটীতে রন্ধন ও অপরটীতে আহারাদি হইত। বারান্দাও মূর্ত্তিশূন্য নয়। সেই সকল মূর্ত্তিই গিরির পাষাণদেহ মাথায় ধরিয়া আছে। কিন্তু হায়! এক সময় এই গুহা, নিখিলের আসিস্ গ্রহণ করিত,—এই মূর্ত্তি,—এই ক্ষীণ-



খণ্ডগিরির জৈন মন্দির

মধ্যা, উচ্চউরসা, রচিতবেণী-কবরীরমা, কোমলমৃগপ্রেক্ষণা, এই হাস্তে বিকশিতা, লাস্তে চঞ্চলা, দাস্তে নম্রা, ব্রীড়ায় নিমীলিতা, ভঙ্গিমায় বঙ্কিমা, প্রেমে বিলসিতা, কামিনীমূর্ত্তিগুলি, এই বিশালবপু, সিংহস্কন্ধ, কবাটবক্ষ আজানুলম্বিতবাহু বর্ম্মধৃততনু, এই ভক্তিতে গদ্‌গদ্, সাধনায় সমাহিত, বীর্য্যে স্ফুরিত, শৌর্য্যে দৃপ্ত, ক্রোধে দীপ্ত পুরুষ-মূর্ত্তিগুলি, মুগ্ধ দর্শকের বিস্ময়ের কারণ ছিল, সেই সর্ব্বরসাধার মূর্ত্তিগুলির সুমার্জ্জিত অঙ্গের উপরে ভাস্থর প্রদ্যোত ঝল্‌মল্ করিত! হায়রে, আজ তাহারা ভগ্নচূর্ণে পরিণত; কোনোটি কবন্ধ, কোনোটি অন্ধ, কোনোটি নাসাচ্যুত, কোনোটি হস্তহীন, কোনোটি ভগ্নকটি বা খঞ্জ। গুহাও ভাঙ্গিয়াছে, তাহার ছাদ হেলিয়াছে, তাহার দেওয়ালে ফাটল ধরিয়াছে, তাহার প্রবেশপথের দ্বার ভাঙ্গিয়াছে, তাহার ভিত্তির কারুকার্য্য খসিয়াছে, তাহার গৃহতলের আয়তনে আরণ্যলতা জন্মিয়াছে, কিন্তু চিরকাল এমন ছিল না। সে যদু-পতিও নাই আর সে মথুরাপুরীও নাই। সে শ্রীরামচন্দ্রও নাই আর সে অযোধ্যাও নাই। কঙ্কালের ভস্মস্তূপ দেখিয়া দেহের লাবণ্য বুঝিতে পারিবে না।

রাণীগুম্ফার উপরে, গণেশগুম্ফা। ইহা একতলা। দুখানি ঘর আছে। প্রত্যেকেরই পরিমাণ এক। লম্বায় নয় হাত ও চওড়ায় পাঁচ হাত। ঘর দুখানির বাহিরের দেওয়াল মাপিলে কুড়ি হাত হয়। ঘরের সমুখেই বারান্দা। দুপাশে দুটি পাথরের হাতী আছে। তাহার পর, একটি উঁচু যায়গা, নাম বড় ছাতা।

কত শত বৎসর আগে, এইখানে দাঁড়াইয়া, বৌদ্ধযতিগণ, আবক্ষ-ধৃত-গৈরিক-বাসে ভক্তি তরলনেত্রে উদয় দিগ্‌বলয়ে ভোরের রক্তরাঙা রবির রশ্মিচ্ছটা দর্শন করিতেন। গণেশ গুম্ফার পাশে, মর্ত্ত্যপুর, পাতালপুর ও বৈকুণ্ঠপুর নামে কয়েকটি স্থান। তাহাদের বিশেষ পরিচয়ের আবশ্যক নাই। তাহার পর হস্তী গুম্ফা। পথ প্রদর্শক বলিল, এখানে রাজার হাতী থাকিত। হস্তী গুম্ফার ছাদে একটি শিলালিপি আছে। লিপির অক্ষরগুলি অনেক স্থানেই অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। বিশেষ চেষ্টা করিলেও পড়া যায় না। ছাদটি পতনোন্মুখ হইয়াছিল, পাছে শিলালিপিটি নষ্ট হইয়া যায়, সেই ভয়ে বঙ্গের ভূতপূর্ব্ব মৃত ছোটলাট উডবরন্ সাহেব, ছাদের তলায়, তিনটি প্রস্তর স্তম্ভ করিয়া দিয়াছেন। স্তম্ভগুলি সাদাসিদা,—তাহাতে কোনো রূপ কারুকার্য্য নাই,—শুনিলাম তাহাই নির্ম্মাণ করিতে দুহাজার টাকা খরচ হইয়াছে।

তাহার পর, খুব উচ্চে আরো অনেকগুলি ছোটখাটো গুহা আছে। তাহাদের কোনো-টির নাম পবনাহারী গুম্ফা, কোনোটির নাম ব্যাঘ্র গুম্ফা, কোন গুম্ফাটির নাম সর্প গুম্ফা ইত্যাদি। ব্যাঘ্র গোফাটি অবিকল বাঘের মুখের মত। চোখ, নাক, মুখ সবই ক্ষোদিত হইয়াছে। দেখিলে মনে হয়, যেন একটি বাঘ, মুখব্যাদান করিয়া রহিয়াছে। স্বর্গপুরী-গুম্ফা দ্বিতল। তাহার অবস্থান রাণী-গুম্ফার পশ্চাতে। এ গুহাটিতেও দুটি ঘর। নীচের বারান্দায় তিনটি দ্বারপাল মূর্ত্তি, স্তম্ভের উপরে, দুইটি অশ্বারোহী মূর্ত্তি, তাহারা ছাদের ভার বহন করিতেছে। ঘরের ভিতরে, পালি

ভাষায় লিখিত, একটি শিলালিপি আছে। হরিদাস গুহা লম্বে সাড়ে পাঁচ হাত ও প্রস্থে, চার হাত। উচ্চতাও পাঁচ হাত। জগন্নাথ গুম্ফা লম্বে চৌদ্দ হাত, চওড়ায় সাড়ে তিন হাত ও উচ্চতায় সাড়ে চারি হাত। তিনটি থামের উপরে ছাদ। দু'পাশে দুখানি ঘর। জয়া-বিজয়া প্রভৃতি নামে আরো কতগুলি ছোট গুহা দেখিয়া, আমরা উদয় গিরি হইতে ধীরে ধীরে নামিয়া আসিলাম।

শুনিলাম, এই সকল গুহার ভিতরে অনেক সময়ে চোর ডাকাত আসিয়া লুকাইয়া থাকে। পুলিশ, আসিয়া, অনেকবার অনেক লোককে এখান হইতে ধরিয়া লইয়া গিয়াছে।

তাহার পর, আমরা খণ্ডগিরিতে উঠিতে লাগিলাম। উদয়গিরি অপেক্ষা, খণ্ডগিরিতে উঠিতে, বেশী কষ্ট। পাথর কাটিয়া সিঁড়ি করিয়া দেওয়া হইয়াছে। দেখিলাম, সোপান গুলির কোনোটি এক ফুট ও কোনোটি বা আদফুট চওড়া।

সোপানের পঁয়ত্রিশটি ধাপ উঠিয়া আমরা একটি গুহা দেখিতে পাইলাম। সেটি লম্বায় বারো হাত ও চওড়ায় প্রায় নয় হাত। এখন ফাটিয়া গিয়াছে। তিনটী সিঁড়ির ধাপ দিয়া, ভিতরে যাইতে হয়। দ্বিতীয় গুহাটির নাম, ধানঘর। এস্থানে আগে ধানের ভাণ্ডার ছিল। গুহাটি উচ্চে প্রায় পাঁচ হাত, লম্বায় বারো হাত ও চওড়ায় দশ হাত, তৃতীয় গুহাটির নাম নবমুনি। উচ্চে সাড়ে পাঁচ হাত, লম্বায় সাড়ে নয় হাত ও চওড়ায় চার হাত। ভিতরে অনেক ভিত্তি খোদিত প্রস্তর মূর্ত্তি আছে। মূর্ত্তিগুলি সারিবিভক্ত। প্রথম সারিতে সপ্ত ঋষির মূর্ত্তি, দ্বিতীয় সারিতে আটটি স্ত্রীমূর্ত্তি। বাঁদিকে, একটি ছোট মূর্ত্তি, ডানদিকে বিষ্ণুমূর্ত্তি, শিরোপরি সফণা সর্প। তাহার পর একটি ধ্যানমগ্ন বুদ্ধমূর্ত্তি। চতুর্থ গুহাটির নাম,—দুর্গা গুম্ফা। নাম শুনিয়া বিস্মিত হইলাম। বৌদ্ধগণ এরূপ নাম কখনো দেন নাই। পরে বুঝিলাম, বৌদ্ধ প্রাধান্য অতীত হইলে, যখন লুপ্ত ব্রাহ্মণ-শক্তির পুনরুদ্বোধন হইয়াছিল,—সেই সময়ে গুহার প্রাচীরে হিন্দু শিল্পীর হাত পড়িয়াছিল এবং তাহারই ফলে ভিত্তিতে সিন্দূরাক্ত সর্ব্বমঙ্গলামূর্ত্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে। গুহাটি দুভাগে বিভক্ত। ভিতর ভাগ উচ্চে সাড়ে চার হাত, লম্বায় চৌদ্দ হাত ও চওড়ায় পাঁচ হাত। বাহির ভাগের উচ্চতা একরূপ, কেবল লম্বে বারো হাত ও চওড়ায় সাড়ে তিন হাত। গৃহভিত্তিতে উপবিষ্ট ও দণ্ডায়মান কতকগুলি বুদ্ধ ও স্ত্রীমূর্ত্তি আছে। তাহার পর, পঞ্চমগুহা;—খণ্ডগিরি ও উদয় গিরির ভিতরে আমার বোধ হয়, এই গুহাটিই সকলের চাইতে সুন্দর। ইহার নাম, সাতবখরা গুম্ফা। এ গুহাটিরও দুই ভাগ। উচ্চতা, প্রায় পাঁচ হাত। চওড়ায় চার হাত। লম্বে বারো হাত। ভিতরে তিনখানি সিংহাসন আছে। তাহার উপরে তিনটি বুদ্ধমূর্ত্তি। মূর্ত্তিগুলি বড়ই সুন্দর এবং চমৎকার পালিস করা। গৃহভিত্তিতেও বহু বুদ্ধমূর্ত্তি খোদিত আছে। মণ্ডলাকার স্তম্ভের উপরে ছাদভার অর্পিত। গুহাটির কক্ষতল, ও ভিত্তি,—সকল যায়গাই সুমার্জ্জিত—ঝক্ ঝক্ করিতেছে। ইহার উপরে, দ্বিতলে আর একটি গৃহ আছে। কিন্তু সেখানে উঠা যায় না। নীচে হইতে, উপরের ঘরের জানালামাত্র দেখা যায়। আরো

একুশটি ধাপ উঠিয়া দেখিলাম, সোপানশ্রেণী দুইদিকে চলিয়া গিয়াছে। আমরা বাঁদিক দিয়া চৌদ্দটি সিঁড়ি উঠিয়া, একটি ঈষৎ সমতল যায়গা পাইলাম। সেখান হইতে অনেকটা আসিয়া একটি স্থানে থামিলাম। তথায় একটি ছোট বাপী আছে। তাহার নাম, কেহ বলেন, আকাশগঙ্গা,—কেহ বলেন গুপ্তগঙ্গা। বাপীতে সর্ব্বদাই জল থাকে। চল্লিশ হাত গভীর করিয়া, শৈলাঙ্গ খোদিত হইয়া, এই বাপী সম্পূর্ণ হইয়াছে! আর্য্যশিল্পীর আসুরিক শক্তি স্মরণ করিয়া, আমরা অবাক হইলাম। এই গিরিপৃষ্ঠে, যে শক্তি, এমন অদ্ভুত কাজ করিয়াছে, সে শক্তি ধন্য! বাস্তবিক, সেই প্রাচীন যুগে, যখন বর্ত্তমান কালের মত বিবিধ প্রকার যন্ত্রাদির চলন ছিল না, তখন কঠিন পর্ব্বতাঙ্গ কাটিয়া, এরূপ গভীর জলাশয় নির্ম্মাণ করা, কিরূপ কষ্টকর ও ব্যয়সাধ্য ছিল—তাহা এখন কেবল অনুমান যোগ্য। খণ্ডগিরিবাসী সাধুগণ, আগে আকাশগঙ্গারই অমলজলে তৃষ্ণা নিবারণ করিতেন। অনাদরে, জলে এখন পানা জন্মিয়াছে। একটু জল তুলিয়া দেখিলাম, তাহা এখনো দিব্য স্বচ্ছ। পান করিবার ইচ্ছা হইল, কিন্তু পীড়ার ভয়ে পারিলাম না। তবে ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র, আকাশগঙ্গার জল পান করিয়া লিখিয়াছেন, সে জল ভারি মিষ্ট। "List of ancient Monuments of Bengal" নামক পুস্তকে পড়িয়াছিলাম, উদয়গিরির উচ্চ শিখরেও ললিতকুণ্ড নামক আর একটি বাপী আছে। কিন্তু আমরা তাহা দেখি নাই। আকাশগঙ্গার পাশে, খুব নীচে, একটি অগম্যস্থানে ললাটকেশরী রাজার সিংহদ্বার দেখিতে পাইলাম। এই স্থানে যাইবার পথ নাই। রাজা ললাটকেশরীর দেহাবশেষ এই স্থানে রক্ষিত আছে। স্থানটি বড়ই অন্ধকার। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র বলেন, ইহাও একটি গুহা। কিন্তু আমাদের পথপ্রদর্শক বৃদ্ধ বলিল 'এটি সিংহদ্বার।' কাহার কথা ঠিক?

তাহার পর ডান দিক ধরিয়া, আরো উচ্চে উঠিয়া, খণ্ডগিরির শীর্ষদেশে গিয়া উপস্থিত হইলাম। সেই স্থানেই, পূর্ব্বোক্ত জৈন মন্দিরটি স্থাপিত। শুনিলাম, ইহা পরেশনাথের মন্দির। মন্দিরটি, দেখিতে অতি চমৎকার। প্রস্তরনির্ম্মিত ভিত্তি চারহাত চওড়া। দুইটি ঘর আছে। দশটি সোপান-শ্রেণীর সাহায্যে ভিতরে যাইতে হয়। ভিতরের ঘরটি চতুষ্কোণ। চারিদিকেই প্রায় চৌদ্দহাত লম্বা। গৃহমধ্যে একটি বৃহৎ প্রস্তরের সিংহাসন আছে। সিংহাসন বা বেদীটি দু'থাকে বিভক্ত। তাহার উপরে ছোট বড়, সুন্দর পালিস করা পরেশনাথের মূর্ত্তি। দুই দিকের জানালায়, পাঁচটি ছিদ্র। বাহিরের ঘর বা দালানটি লম্বে প্রায় চৌদ্দ হাত এবং চওড়া সাত হাত। সমগ্র মন্দিরটির উচ্চতা মাপিতে পারি নাই,—তবে কুড়ি বাইশ হাতের কম হইবে না। ষোলটি মণ্ডলাকার থাক পরে পরে উঠিয়া,—সূচাগ্রভাবে গম্বুজটি সমাপ্ত হইয়াছে। মন্দিরের পিছনে দেবসভা নামে একটি বৌদ্ধচৈত্য আছে। হিন্দুর মহিমায়, এখন উহার নাম "ব্রহ্মার গাদি" হইয়াছে। প্রধান মন্দিরের দক্ষিণ পাশে একটি ছোটখাট জৈন মন্দির। ভিতরে কৃষ্ণপ্রস্তররচিত সুমার্জ্জিত উলঙ্গ জিনের

মূর্ত্তি। তাহার পর, অনন্ত ও তিন্তুড়ি প্রভৃতি বিভিন্ন নমের বিভিন্ন গুহা। অনন্ত গুম্ফায় একখানি মাত্র দীর্ঘ ঘর। ঘরের সম্মুখে একটি বারান্দা আছে। ঘরের দ্বারের উপরে কারুকার্য্য আছে। ভিতরে, বুদ্ধদেবের ভগ্নচূর্ণ মূর্ত্তি।

গুহা-দর্শন সমাপ্ত হইল। খণ্ডগিরি-শিখরস্থ জৈন দেবায়তনের চত্বরে গিয়া বসিয়া পড়িলাম। এই আকাশ-অলকা, তরু-নিচোলা, নদীকঙ্কনা লীলারম্যা প্রকৃতির যৌবন-লীলা দেখিয়া, মুগ্ধ হইলাম। দূরে ভুবনেশ্বরের বিরাট শিখর-চক্র ভানু-প্রস্তোতে জ্বলিতেছিল। নীল-কমলনিলীম আকাশের জলদাচলে রবি রক্তআঁখি মুদিয়া ডুবিয়া গেলেন। দূর নিম্নে, দৃষ্টিসীমা ভরিয়া শ্যামলিতা সীতামাতা,—বক্ষে তটিনী-রজত-রেখা-রম্যা হরিৎশ্যাম ধান্যভুমি লইয়া, স্তব্ধভাবে অম্বরের অনাহত নিলীমার প্রতি নির্ণিমেষ-নেত্রে চাহিয়াছিলেন। চারিদিক স্তব্ধ। মুক্তজনতার উচ্চরোল, এখানে ধ্যানমগ্ন অনন্ত ধারণার কাছে, নীরবে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। কেবল, মাঝে মাঝে, কোন তৃণ-তরলিতা ভূমি হইতে রাখালের বেণু-বাজনার তান, অলস-বায়ুতালে ভাসিয়া আসিতেছে। এবং অতনু-দ্রুম-মালগুপ্ত ঘুঘুর বিষাদ-বেহাগ তাহার সহিত করুণ-সুর বাঁধিয়া দিতেছে। বিশ্বকবির স্বপ্ন ইহা,—অসীমে তাহার ছন্দ, অনন্তে তাহার প্রেরণা, ধ্যানে তাহার পরিণতি। জগতে, নন্দনের কোন বীণা আছে, যাহাতে তাহার রাগিনীর ঝঙ্কৃতি রনন-ঝনন বাজিয়া না উঠে? মনের ভিতর হইতে, কে যেন শঙ্খগম্ভীরস্বরে গাহিয়া উঠিল :—

"সুন্দর হৃদিরঞ্জন তুমি, নন্দন ফুলহার।
তুমি অনন্ত, নব বসন্ত অন্তরে আমার ;"

খণ্ডগিরির ঐতিহাসিক তথ্য বড় বেশী পাওয়া যায় না। ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র, মহাত্মা প্রিন্সেপ্, ডাঃ হাণ্টার, ষ্টার্লিং, ফারগুসান ও কনিংহাম প্রভৃতি সুবিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদগণ, খণ্ডগিরির ইতিহাস সংকলনের জন্য প্রাণপাত পরিশ্রম ও যত্ন করিয়াছেন। ফলে, যাহা সংগৃহীত হইয়াছে, এতগুলি পণ্ডিতের মিলিত চেষ্টার নিকটে, তাহা সামান্য মাত্র। পরন্তু, তাহাও মতদ্বৈধের অতীত নয়। ভারতীয় পৌরাণিক গ্রন্থগুলি, হিন্দু-কীর্ত্তির বিজয়-ঘোষণায় শতমুখ। কিন্তু বৌদ্ধকীর্ত্তি-বর্ণনাকালে তাহারা মূক। অতএব এস্থলে প্রাচীন পুস্তক হইতে, কোনোরূপ সাহায্য পাওয়া যায় না।

তবে দু' একখানি প্রাচীন পুস্তকে খণ্ডগিরি বা স্বর্ণকূটাদ্রির নামমাত্র পাওয়া যায়। যথা একাম্র-চন্দ্রিকায়,—

"খণ্ডাচলং সমাসাদ্য যত্তাস্তে কুণ্ডলেশ্বরঃ।
আসাদ্য বারাহী দেবী বহিরঙ্গেশ্বরাবধি ॥"

অন্যত্র :

"অন্য ক্ষেত্রস্থ যৎপাপং ক্রিয়তে মানবৈন হি।
তৎসর্ব্বং নাসয়তি স্বর্ণকূটাদ্রি মূর্দ্ধনি ॥
স্বর্ণকূটেঽপি যৎপাপঃ কর্ম্মণা মনসা গিরা।
তৎক্ষালয়েন্মহাপাপং ক্ষেত্রস্যৈব প্রদক্ষিণম্।

খণ্ডগিরির গুহাস্থাপত্যের আদর্শ ও নির্ম্মাণ-প্রণালী দেখিয়াও, কালনির্ণয়ের অনেকটা সুবিধা হয়। এবং গুহাভিত্তির বহুস্থলে শিলালিপিও ক্ষোদিত আছে। তাহাই কাল-নির্ণয়ের প্রধান সহায়। কিন্তু, ঐ সকল শিলালিপিও, কালপ্রভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া, ভিত্তিগাত্রে অদৃশ্য হইয়া যাইতেছে। স্থানে

স্থানে, তাহা এত অস্পষ্ট, যে প্রিন্‌সেপের মত বহুদর্শী প্রত্নতত্ত্ববিদও তাহা হইতে কোনো জ্ঞাতব্য তথ্য আবিষ্কার করিতে সক্ষম হন নাই।

সিংহলের Dathadhatawanso নামক পবিত্র পুস্তকে উল্লিখিত হইয়াছে:—৫৪৩ খৃঃ পূর্ব্বে, বুদ্ধের নির্ব্বাণের পর, তাঁহার জনৈক শিষ্য, পবিত্র দন্ত লইয়া, পুরীতে আগমন করেন। তাহার পর,—উড়িষ্যাপ্রদেশে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারিত হয়। এবং পরবর্ত্তী দশ শতাব্দকাল, উৎকলপ্রদেশে, বৌদ্ধধর্ম্মের অসামান্য প্রাধান্য স্থাপিত হয়।

বৌদ্ধপ্রাধান্যকালে নানাদেশীয় রাজন্যবর্গ, বুদ্ধমত প্রচারের জন্য চারিদিকে ধর্ম্মপ্রচারক প্রেরণ করিতেন। তাঁহারা নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, ভিক্ষুব্রত অবলম্বনপূর্ব্বক ধর্ম্ম-প্রচার করিয়া বেড়াইতেন। সেই বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের প্রধান উপনিবেশ ছিল,—খণ্ডগিরি।

প্রকৃতির শিক্ষা, বড় শিক্ষা। যে মানুষ হইতে চায়, প্রকৃতির শিক্ষাকে, সে অবহেলা করিতে পারে না। তাই প্রকৃতির প্রসারিত ক্রোড়েই পরমনির্ব্বাণশয্যা বিসর্পিত। সেই জন্যই বৌদ্ধযতিবৃন্দ, খণ্ডগিরিকেই আপনাদের যোগনিবাসে পরিণত করিবার জন্য আগ্রহান্বিত হইলেন।

কিন্তু, পাহাড়ের উপরে বাস করিবার উপযুক্ত স্থান কোথায়? স্বভাবনির্ম্মিত গুহা থাকিতে পারে, কিন্তু জল পাওয়া যায় কিরূপে? জল হয়ত' পাওয়া গেল,—কিন্তু মাথা রাখিবার ঠাঁই পাওয়া দায় হইয়া উঠিল। তখন মানবশিল্পীর অস্ত্রমুখে গুহা-ক্ষোদনের পরামর্শ উঠিল। কিন্তু তাহা ব্যয়সাধ্য। ভিখারি মানুষের অত টাকা নাই। তখন, ধর্ম্মপ্রাণ রাজা আসিয়া সাহায্য স্বীকার করিলেন। এইরূপে, খণ্ডগিরির বৌদ্ধ-কীর্ত্তির প্রতিষ্ঠা।

প্রাচীন ভারতীয়ের বাসস্থান দেখিবার সুযোগ, কালের মহিমায় দুর্লভ হইয়া উঠিয়াছে। তাহার শেষচিহ্ন পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। কেবল, খণ্ডগিরি প্রভৃতি, দু'একটি স্থানে, তাহার, নিদর্শন পাওয়া যায়। এই যে নিদর্শন,—ইহাও লুপ্ত হইত, যদি ভারতের শিল্পিগণ সংসারমোহে অভিভূত হইতেন,—যদি সে ক্ষেত্রে তাঁহারা অচিরকাল-স্থায়ী ইষ্টক বা প্রস্তরস্তূপ গঠন করিয়া আপনাদের সাময়িক সুবিধা করিয়া লইতেন। ফলে, দু'দিনে তাহা ধ্বংসকবলগত হইত। কিন্তু তাঁহারা ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করিয়া-ছিলেন। এই ভিন্ন পন্থানুসরণের কারণ,—ধর্ম্মের অনন্তানুগামিতা। ভারতীয় স্থপতিগণ, বহু স্থলেই, সুচির-অটুট গিরি-বর্ম্মের আশ্রয়ে আপনাদের কারুকলাপকে ধ্বংসের কঙ্কাল হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। নতুবা, গ্রীসের প্রাচীন দেবদেবীর মন্দিরের মত, ভারতীয় স্থাপত্য আজ ইতিহাসের পত্রই অলঙ্কৃত করিত। ইহার মূলে, কেবল সংসারীর সৌন্দর্য্যলালসা থাকিলে, আজ আমরা খণ্ডগিরি দেখিবার সৌভাগ্য লাভ করিতে পারিতাম না। কিন্তু যোগীর প্রাণের স্পন্দন প্রকৃতির বক্ষে। খণ্ডগিরি যোগীর জন্যই নির্ব্বাচিত।

খণ্ডগিরির গুহা-শিল্প, আমাদের চক্ষুর সম্মুখে, বৌদ্ধধর্ম্মের ত্রিবিধ চিত্র প্রসারিত করিয়া দিয়াছে। প্রথম, যোগী-যুগ

(Ascetic age) তাহার পরিচয়, ক্ষুদ্রতম গুহাগুলিতে। সেগুলি দেখিলে, তাহা মানব হস্তে উৎকীর্ণ গুহার পরিবর্ত্তে, বনচারী জন্তুর গর্ত্ত বলিয়া মনে হয়। বাস্তবিক, খণ্ডগিরির এক একটি গুহা এমনি স্বল্প-পরিসর,—যে তাহা একজন মানুষের উপবেশন স্থান-কল্পেও একান্ত অপ্রচুর। ইহার কারণ কি? যিনি বৈরাগ্য-মন্ত্রের প্রচারক,—তাঁহার আবাস বকপক্ষশুভ্র কোমল শয্যায় নয়। তাঁহার মাথা রাখিবার একটু ঠাঁই হইলেই যথেষ্ট। তাই, সর্ব্বপ্রথমে যে সকল গুহা নির্ম্মিত হইয়াছিল,—তাহা যোগসাধনের জন্যই কল্পিত। সেই কারণে, ক্ষুদ্রগুহাগুলিতে সৌন্দর্য্যজ্ঞানসূচক কোনোরূপ কারুকার্য্য নাই। এই নির্ম্মাণপদ্ধতি হইতে আরো জানা যায়, উক্ত সময়ে, উৎকলপ্রদেশে, বৌদ্ধধর্ম্মের প্রসার বড় অধিক হয় নাই। ধর্ম্মের প্রসার যদি অধিক হইত,—তাহা হইলে, প্রচারকের সংখ্যাও সামান্য থাকিত না, স্বল্পসংখ্যক প্রচারকো-পযোগী ক্ষুদ্রায়তনের গুহা ক্ষোদিত হইত না। পরন্তু, গুহাগুলির পরিসর বহুসংখ্যক ব্যক্তির জন্য বর্দ্ধিত হইত।

দ্বিতীয়, প্রচারপ্রধান যুগ। (ceremonial age) ঐ যুগে, বৌদ্ধধর্ম্ম ক্রমশ দেশ বিদেশে প্রচারিত হইয়াছিল। প্রচারকের সংখ্যাও বাড়িয়া গিয়াছিল। তাহার পরিচয়, স্তম্ভ-শোভিত অপেক্ষাকৃত সুন্দর গুহাগুলিতে। প্রচারকগণ, এই সুপরিসর গুহা সমুদায়ের মধ্যে একত্রে সমবেত হইতেন। এবং পর-স্পরের সহিত ধর্ম্মবিষয়ক আলোচনা ও কথোপকথন ও পরামর্শ ও আলোচনাদিতে অবসরাতিবাহন করিতেন। ঐ যুগে, গুহাবাসী বৌদ্ধযতিগণ কেবল নিভৃত-সাধনায় কাল যাপন করিতেন না। বিবিধ বিষয়ক আলোচনার দরকার, সুতরাং যোগসাধনার নিমিত্ত যে স্থান প্রচুর,—বিশ্রম্ভালাপের পক্ষে তাহা সামান্য। অতএব গুহার পরিসর বাড়িল। লোকজন আসিবেন, শিল্পকর্ম্মশূন্য সামান্য স্থান আর যথেষ্ট নয়,—স্তম্ভ হইল। তাহাতে কারুকার্য্য খোদিত হইল।

তৃতীয়, ধর্ম্মবিলাস যুগ। (Fashionable age) ঐ যুগে ধর্ম্মের অঙ্গে বাদসাহী খেয়ালের ললিতলাস্যলীলার চটুলতাই অধিক দেখা যায়। ধর্ম্ম, তখন আর পুরোহিতের মন্ত্র-বচনের অধীন নয়,—সে তখন আর তুষার-শীতল পাথরের উপরে, আপনার বিশ্রামশয্যা রচনা করিতে চায় না, তখন সে রাজশ্রীপুষ্ট হইয়া, পালকের উপাধানে মাথা রাখিয়া আরামে শুইয়া থাকিতে চায়! যে সংসার-বিমুখ অন্তরতম ভাব, এতদিন ভোরের আকাশে উষার সিন্দূরলাবণ্যরাঙিমায় এবং স্তব্ধ নিশায় নীলাঞ্জনরম্য অনন্তনভে শশিতারকাদীপালী দর্শনে, গম্ভীরউদাত্ত ভজনগানে বক্ষপুট ভেদপূর্ব্বক উচ্ছ্বসিত হইয়া ভূমানন্দে বিলীন হইয়া যাইত, আজ তাহা রাজ-মহিমার বিচিত্রকললীলাকম হইয়া নর্ত্তকীর নূপুরশিঞ্জিতের কল-তালে মন্দিরার বোলে আত্মপ্রকাশ করিল! তাহার পরিচয়, রাণীগুম্ফা, রাণীর প্রাসাদ প্রভৃতি গুহা-শিল্পে। কত বিবিধরূপের কারুকার্য্য,—কত দ্বারপালের মূর্ত্তি, কত শীকার দৃশ্য কত দ্বৈরথ যুদ্ধ, কত তন্বঙ্গীর স্ফুট কাম বিলাস, কত অঙ্গোপকরণ, কেশ বিন্যাস, রত্নালঙ্কার,

মূল্যবান বসন, পাদুকা, বাস্তবস্ত্র! কোথাও প্রেমের ছবি, কোথাও কামের ছবি, কোথাও রণের ছবি, কোথাও উলঙ্গা কামিনী, কামোন্মত্ত পুরুষ, অপাঙ্গ-বিক্ষেপ, চটুল হাস্য, রঙ্গ, পরিহাস, খেলাধূলা, স্মরলীলা! ধর্ম্ম যখন আচার ও বিলাসের গড্ডালিকাপ্রবাহে গা ঢালিয়া দিল, ধ্রুবের আশীষ যখন সে অবহেলা করিল, ঐহিকতার নাগপাশে, যখন সে অশিব পিনাক নিনাদ করিল, তখন আর তাহার সে শাশ্বত নির্ম্মাল্য কোথায়? দেখিতে দেখিতে, সূর্য্যোদয়ে কুহেলিকা-প্রতিম,—উৎকল হইতে বৌদ্ধ ধর্ম্ম বিদায় গ্রহণ করিল,—নববলে বলীয়ান ব্রহ্মণ্যশক্তি আবার হুঙ্কার প্রদান করিয়া জাগিয়া উঠিল, বুদ্ধের গৈরিক পতাকা কোথায় উড়িয়া গেল,—কোথায় রহিল অবেদ-গীতিকা, কোথায় রহিল অহিংসা ধর্ম্ম, কোথায় রহিল ভিক্ষুব্রত, সন্ন্যাসগর্ব্ব! গিরি-গর্ভে থাকিয়া গেল কেবল বৌদ্ধযতির উত্থান, প্রসার এবং পতনের স্থায়ী ইতিহাস।

ইহাই খণ্ডগিরির প্রকৃত ইতিহাস। সাল বা তারিখের তালিকা, ইতিহাস নয়, তাহা মুগ্ধ পাঠককে ঘুম পাড়াইবার রূপার কাটি! কিন্তু তাহা নহিলে আজকাল চলে না, অতএব নীচে প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের সযত্ন সংগৃহীত কতিপয় তথ্য প্রদান করিয়া, আজ বিদায় গ্রহণ করিব। ডাঃ হাণ্টারের মতে, খণ্ডগিরির বৌদ্ধ কীর্ত্তি, খৃঃ পূর্ব্ব ২০৯ শত অব্দে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। (Statistical Account of Bengal : Vol XIX, P, 73.)

ফার্গুসনও ঐ মতাবলম্বী। কিন্তু ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র ভিন্ন মতানুসারী। তিনি বিবিধ প্রমাণপ্রয়োগে দেখাইয়াছেন, যে খণ্ডগিরির গুহা-শিল্প আরো অধিককালের প্রাচীন। তিনি বলেন,

"খৃঃ পূর্ব্ব চারি শত বৎসরের মধ্যকালে হস্তিগুম্ফা ক্ষোদিত হইয়াছিল।"

(Antiquities of Orissa. Vol II. p. p. 40) তিনি আরো বলেন :—

"গুহার ভিতরে, গিরি-গাত্রে পালিভাষায় লিখিত যে শিলালিপি পাওয়া যায়, কালনির্ণয়সম্বন্ধে সকল সন্দেহ, তাহারাই নিরাকরণ করিয়া দেয়। তাহা হইতেই আমরা জানিতে পারি, যে গুহাগুলি, খৃঃ পূর্ব্ব দুই শত বৎসরেরও আগে ক্ষোদিত হইয়াছিল।"

বৈকুণ্ঠপুরের দক্ষিণদিকে, পালিভাষার যে শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে, সুপ্রসিদ্ধ প্রিন্‌সেপ সাহেব তাহার অনুবাদ করিয়াছেন :—

"Excavation of the ragas of Kalinga, enjoying the favour of the Archantas, Buddhist saints......"(তাহার পরের ভাষা একান্ত অবোধ্য)

জানা গিয়াছে, আইর নামক কলিঙ্গাধিপতি খণ্ডগিরির অনেক গুহা ক্ষোদন করিয়া দিয়াছিলেন। সম্ভবত, উক্ত শিলালিপির কলিঙ্গরাজগণের মধ্যে, তিনিও অন্যতম।

আগেই বলিয়াছি, খণ্ডগিরির শিখরে, যে জৈন-মন্দিরটি বহুদূরে হইতে দেখা যায়, তাহা আধুনিক-যুগের। ডাঃ রাজেন্দ্রলালের কাল-নিরূপণ ধরিয়া হিসাব করিলে, বলিতে হয়, উক্ত মন্দিরটি ১১০ বৎসরের কিছু অধিক বা অল্প সময়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল। উহার নির্ম্মাণ কর্ত্তা, দুইজন জৈন ব্যবসায়ী। তাঁহারা পুরীতেই বাস করিতেন। কিন্তু, এই অল্পকালের ভিতরেই মন্দিরে 'ফাট' ধরিয়াছে। আর এক শতাব্দীর মধ্যেই, সম্ভবত, উহা ভূমিসাৎ হইবে।

ফারগুসন বলেন,

"খণ্ডগিরির কারুকার্য্য বৌদ্ধকীর্ত্তি নয়। এই গুহা ও ইহার স্থাপত্য দেখিয়া, মনে একটি প্রশ্ন উদিত হয়, যে এই গুহাগুলিকে বৌদ্ধকীর্ত্তি বলা হয় কেন? এখানে বৌদ্ধস্থাপত্যসুলভ কোন Dagaba বা চক্র নাই প্রভৃতি।"

(Trees & serpent worship)

কিন্তু ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র, সুদৃঢ় প্রমাণ সহযোগে, এই আপত্তি খণ্ডন করিয়াছেন।

জৈনমন্দির হইতে সামান্য দূরে, পাহাড়ের সমতল অংশে, আকাশগঙ্গা হইতে জৈনমন্দিরে যাইবার পথে আমরা একটী সুবৃহৎ চক্র দেখিতে পাইয়াছিলাম। চক্রটি প্রস্তর রচিত। গিরিপৃষ্টসঞ্চিত মৃত্তিকা-স্তরে তাহার অর্দ্ধাংশ আবৃত। ফারগুসান সাহেব, কেন সেটি দেখিতে পান নাই, তাহা বলিতে পারি না। কারণ, একটু মনোযোগ দিয়া দেখিলেই চক্রটি বেশ দেখা যায়। তবে, ফারগুসান সাহেব যখন খণ্ডগিরি দর্শনে গিয়াছিলেন, সম্ভবতঃ, চক্রটি তখন মৃত্তিকাগুপ্ত ছিল। ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র, বা হাণ্টারের পুস্তকেও ইহার কোন উল্লেখ দেখিলাম না।

গণেশগুম্ফার উপরকার বারান্দায় কতকগুলি গল্পচিত্র ছিল। হাণ্টারের 'উড়িষ্যায়' উক্ত ক্ষোদিত চিত্রগুলিকে জীবনবৃত্তমূলক বলা হইয়াছে। আমরা সেই চিত্রসমষ্টির বিবরণের মর্ম্মোদ্ধার করিয়া দিলাম।

প্রথম দৃশ্যে, একটী তরুতলে এক ব্যক্তি শায়িত। পদতলে, তাঁহার সহধর্ম্মিণী উপবিষ্টা। পতির জানুর উপরে, তাঁহার দক্ষিণ হাতখানি স্থাপিত। দ্বিতীয় দৃশ্যে, উক্ত রমণীর প্রেমযাচক আসিতেছেন। সম্ভবতঃ তিনি একজন রাজপুত্র। তৃতীয় দৃশ্যে, যুদ্ধ। পূর্ব্বোক্ত রমণীর পতি এবং তাঁহার প্রেমযাচক অথবা প্রণয় পাত্র, পরস্পরের সহিত অসিযুদ্ধ করিতেছেন। চতুর্থ দৃশ্যে, পরাজিত রাজপুত্রকে বন্দী করিয়া, জেতা সৈন্যগণ অগ্রসর হইয়াছে। পঞ্চম দৃশ্যে, মুক্ত রাজপুত্র, একটি সাদা হাতির উপরে চাপিয়া পলায়ন করিতেছেন। হাতির উপরে, তিন ব্যক্তি বসিয়া আছেন। পিছনে অনুসরণকারী শত্রুসৈন্যগণ অস্ত্রশস্ত্র লইয়া ছুটিতেছে। রাজপুত্র, ধনুর্ব্বাণ লইয়া মহাবিক্রমে যুদ্ধ করিতেছেন। একজন অনুসরণকারী হাতির খুব কাছে আসিয়া পড়িয়াছে। হাতির পিছনদিকে যে লোকটি বসিয়া ছিলেন, তিনি কাস্তের মত একখানি ছোট তরবার লইয়া নিকটস্থ বিপক্ষের শির, দেহ হইতে একেবারে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়াছেন। ষষ্ঠ দৃশ্যে, আবাসে প্রত্যাগমন। হাতিটি যুক্তজানু হইয়া, বিসর্পিতশুণ্ডে বসিয়া পড়িতেছে। আরোহীরা সকলেই অবতরণ করিয়া, একপাশে দাঁড়াইয়া আছেন। আর একদিকে সেই কুলত্যাগিনী মহিলাটি দাঁড়াইয়া। তাঁহার আলুলায়িত কেশদামের উপরে চূড়াকৃতি কি একটা জিনিষ আছে। কিন্তু তাঁহার এক বক্ষ মুক্ত,—দেহ বসনশূন্য। তাঁহার মুখে বিষাদ-জলদ ঘনাইয়া আসিয়াছে। যেন তিনি স্বকৃত পাপানুষ্ঠানের জন্য হৃদয়ে কষ্টের আঘাত পাইয়াছেন। সপ্তম দৃশ্যে, পারিবারিক জীবন-চিত্র। মহিলাটি, তাঁহার বামহাত রাজপুত্রের দক্ষিণস্কন্ধে রক্ষা করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। ডানহাতে, একটি লতার মত জিনিষ। তাঁহার শিরে মুকুট, উন্মুক্ত বক্ষে প্রকটস্তন, কটি বেষ্টনে কৌপিনাকৃতির একখণ্ড বস্ত্র। পূর্ব্ববর্ত্তী চিত্রমালায়, মহিলাটির অঙ্গ একেবারে বিরলবাস ছিল, এবারে কৌপিনমাত্র দেখা দিয়াছে। পাশে রাজপুত্র। তাঁহার বামহাতে ধনুক ;—এবং ডানহাতে, তিনি মহিলার কটিধারণ করিয়া আছেন। বহুকষ্ট, বহু বিপদের পর আকাঙ্ক্ষিত-ধন লাভে রাজপুত্রের মুখে আজ পুলক-প্রসাদ দেখা দিয়াছে। ক্ষোদনচিত্রেও, সেই আনন্দদীপ্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে। অষ্টম উপসংহার দৃশ্যে নায়ক নায়িকার শেষ সুখের কথা জানাইয়া, চিত্র শ্রেণী সমাপ্ত হইয়াছে।

ডাঃ হাণ্টার বলেন,

"এই ছবিগুলি শিল্পীর কল্পনাপ্রসূত নয়। গুহা-গৃহের অধিকারীর জীবনবৃত্তই, চিত্রগুলির ভিতর দিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। গল্পটি অনেকটা রামায়ণের মত এবং অনেকটা হোমারের ইলিয়াদের মত।" (Dr. W. W. Hunter's Orissa—Vol I)

ভারতের সর্ব্বস্থলে, নিবিড় কাননে, মেঘ-মন্দ্রী সাগর-বক্ষে এবং দুরারোহ গিরিগর্ভে, বহুশত গুহা ক্ষোদিত আছে। তাহার কতক আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং কতক এখনো তিমির তলে গুপ্ত। আবিষ্কৃত গুহাগুলি, খণ্ডগিরির গুহাশিল্প অপেক্ষা অনেকাংশে উৎকৃষ্ট। বোধ হয়, খণ্ডগিরির প্রাচীনতাই তাহার অপকৃষ্টতার কারণ। খণ্ডগিরিতেও, অপেক্ষাকৃত পরবর্ত্তী যুগে যে সকল গুহা ক্ষোদিত হইয়াছে, তাহা প্রথম যুগের অপেক্ষা শিল্পোৎকর্ষরম্য। কোন দেশেই আদিম যুগের শিল্প, পরবর্ত্তী যুগাপেক্ষা ভালো হয় নাই। তাহার কারণ, আদিম যুগের শিল্পজ্ঞান বহুদর্শনসঞ্চিত অভিজ্ঞতায় উন্নত হয় না। পর যুগের শিল্পিগণ, অতীত যুগের জ্ঞানের অধিকারী ত হন-ই পরন্তু চিরাচরিত জাগতিক ক্রমোন্নতি-কল্পে তাহাদের সৌন্দর্য্যাভিব্যক্তি অধিকতর স্ফুট হইয়া উঠে। খণ্ডগিরিতে শিল্পের সেইরূপ ক্রমবিকাশ স্পষ্ট দেখা যায়। এই জন্যই, খণ্ডগিরির গৌরব। প্রাচীনতাই তাহাকে মহিমায় গরীয়ান করিয়াছে। ধর্ম্মের ধারাবাহিক ইতিহাসই তাহাকে প্রত্নতত্ত্ববিদের নিকটে মূল্যবান করিয়া তুলিয়াছে। সূক্ষ্মশিল্প দেখিতে চাও ত, ইলোরা দেখ, কারলী দেখ। আর শিল্পের ক্রমিক স্তর দেখিতে চাও ত, খণ্ডগিরিতে যাও।

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।

অগ্নিপরীক্ষা।

অগ্নি পরীক্ষা সংক্রান্ত অলৌকিক বৃত্তান্ত জগতের প্রাচীন ইতিহাসের সর্ব্বত্রই বহুল পরিমাণে পরিদৃষ্ট হয়। আমাদের ভারতীয় পৌরাণিক গ্রন্থপত্রে জানকীর অগ্নিপরীক্ষা, বেহুলার অগ্নিপরীক্ষা প্রভৃতির যেরূপ বর্ণনা আছে, প্রাচীন গ্রীস্, রোম, বেবিলন প্রভৃতির পুরাতন ইতিবৃত্তেও এ সম্বন্ধে তদ্রূপ বহু আশ্চর্য্য বিবরণ দেখা যায়।

ইদানীংও কোন কোন মহাত্মা এই অলৌকিক ব্যাপার প্রদর্শন করিয়া সেই পৌরাণিক বৃত্তান্তের সত্যতা সম্বন্ধে সাক্ষ্য প্রদান করেন। সম্প্রতি ঢাকাতে শ্রীযুক্ত তরণী কান্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয় ইহা প্রদর্শন করিয়াছেন।

গত ১০ই চৈত্র উকিল ইন্‌ষ্টিটিউশন্ প্রাঙ্গণে ইহার এক প্রদর্শনী হয়। জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট প্রমুখ বহু ইউরোপীয়ান্ এবং এতদ্দেশীয় বহুতর শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত লোক প্রদর্শনীতে উপস্থিত ছিলেন। এই অদ্ভুত ব্যাপারে ইংরাজমণ্ডলীর মনেও কিরূপ বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিল, তাহা নিম্নলিখিত মন্তব্য দু'টী পাঠ করিলে, বুঝিতে পারা যায়।

I went to see Srijukta Tarani Kanta Chakravarty giving an exhibition of Jogi. He walked over burning wood and through flames in a marvellous manner.
17. 4. 09. (Sd). J. W. Nelson (I. C. S.)
Dacca.

I went to see Srijukta Tarini Kanta Chakravarty in Dacca and can certify that he walked

way that is likely to astonish any and all spectators. 17. 4. 09. (Sd). S. K. Sawday. (I. C. S..) Chittagong.

ইহার পর গত আষাঢ় মাসেও এই ব্যাপারের পুনরাভিনয় হয়। তাহাও ঢাকাতেই হইয়াছিল। উকিল ইনষ্টিটিউশনের প্রদর্শনী আমি স্বয়ং প্রত্যক্ষ করি নাই। কিন্তু আষাঢ় মাসের ঘটনা, আগা গোড়া সমস্তই আমার স্বচক্ষে দেখা। সকলের অবগতির জন্ম এখানে সে অলৌকিক বৃত্তান্তের সার সঙ্কলন করিয়া দিলাম।

১৯শে আষাঢ় প্রাতে শুনিতে পাইলাম—"দক্ষিণ-মৈশণ্ডিতে ঠাকুর তরণীকান্তের আশ্রমে আজ অগ্নিপরীক্ষা হইবে। ঠাকুর মহাশয় জলন্ত অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করিবেন।" সংবাদটী শুনিয়া বড় কৌতুহল হইল। ঠাকুর তরণীকান্তের নানাপ্রকার অলৌকিক শক্তির কথা, বহু লোকের মুখেই শুনিয়াছি। চক্ষে কখনও দেখি নাই। আজ স্বয়ং এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া, অন্ততঃ এ বিষয়টীর সম্বন্ধে চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভঞ্জনের সংকল্প করিয়া অপরাহ্নে কয়েকজন বন্ধু সঙ্গে করিয়া মৈশণ্ডি অভিমুখে রওনা হইলাম। আশ্রমের সন্নিকটে গিয়া দেখি,—চারিদিক লোকাকীর্ণ। পথের মধ্যে এত লোকের সমাবেশ হইয়াছে যে ঐ ক্ষুদ্র পথ দিয়া চলাচল করা দুষ্কর। অনেক চেষ্টার পর আশ্রমের দরজা পর্য্যন্ত উপস্থিত হইলে, সৌভাগ্যক্রমে আমাদের পরিচিত ঠাকুর মহাশয়ের একজন শিষ্যের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনি অতি কষ্টে আমাদিগকে লইয়া আশ্রমপ্রাঙ্গণে প্রবেশ করিলেন।

তখনও কার্য্য আরম্ভ হয় নাই। ঠাকুর মহাশয় আশ্রমের অভ্যন্তরে আছেন। শিষ্যেরা উদ্যোগ করিতেছেন। প্রথমতঃ প্রাঙ্গণ মধ্যে আট হাত দীর্ঘে ও আট হাত প্রস্থে, অর্দ্ধ হাত পরিমিত গভীর একটী কুণ্ড খনন করা হইল। তাহার উপরে ২০ মণ কাষ্ঠ সাজাইয়া, চতুর্দ্দিকে অগ্নি সংযোগ করিলেন। আগুণ জ্বলিয়া উঠিলে, যাহাতে কুণ্ডের সকল দিকে সমানাংশে অগ্নি প্রজ্বলিত হইতে পারে, তজ্জন্ম তাঁহারা পুনঃ পুনঃ কাষ্ঠ নাড়িয়া চাড়িয়া দিতে লাগিলেন। প্রায় এক ঘণ্টা পরে কাষ্ঠগুলি অর্দ্ধেক পরিমাণ দগ্ধ হইয়া, কুণ্ডের সকলাংশে সমভাবে দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতে লাগিল। আগুণের তেজে তখন ঐ স্থানে তিষ্ঠান দায় হইয়া উঠিল! নয়, দশ হাত দূরে যে আমরা দাঁড়াইয়াছিলাম, গরমে আমাদিগকেও অস্থির করিয়া তুলিল।

এই সময় ঠাকুর মহাশয় সেখানে আগমন করিলেন। তাঁহার নগ্ন পদ, পরিধানে গরদের বস্ত্র, গাত্রে গরদের উত্তরীয়। তিনি কুণ্ডতীরে অগ্নি-অভিমুখে কিয়ৎক্ষণ দণ্ডায়মান থাকিয়া, কি এক মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে জ্বলন্ত কুণ্ডমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। অগ্নিশিখাতে তাঁহার কটিদেশ পর্য্যন্ত ডুবিয়া গেল। এই অলৌকিক দৃশ্যে দর্শক মাত্রেই বিস্ময়ে আত্মহারা হইয়া সকলে হরিধ্বনি করিতে লাগিলেন।

ঠাকুর মহাশয় দক্ষিণ হইতে উত্তরে, উত্তর হইতে দক্ষিণে, আর পশ্চিম হইতে পূর্ব্বে, পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে, চারিবার কুণ্ডমধ্যে পরিভ্রমণ করিয়া তীরে অবতরণ করিলেন। তার পর শিষ্যেরাও তাঁহার পদধূলি গ্রহণান্তর, একে একে অগ্নিকুণ্ড পার হইয়া গেলেন!

ঘটনা খুবই আশ্চর্য্যজনক, কিন্তু মনে মনে একটুকু সন্দেহ হইল—"ইহারা বোধহয় শরীরে ও বস্ত্রে অগ্নিপ্রতিশেধক কোন বস্তু মাখিয়া লইয়াছেন।" কিপ্রকারে ইহা নিশ্চিত জানিতে পারিব,—এই চিন্তা করিতেছি, এমন সময় ঠাকুর মহাশয় দর্শক-মণ্ডলীর দিকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"আপনাদের মধ্যে কাহারও যদি এই পবিত্র অগ্নিতে অবগাহন করিতে ইচ্ছা থাকে, তবে পাদুকা পরিত্যাগ করিয়া আগমন করুন।" আমি, আমার এক বন্ধু ও আরও দুইজন দর্শক কিয়ৎদূর অগ্রসর হইলে, তিনি সম্মুখে আসিয়া হস্তদ্বারা আমাদের প্রত্যেকের মস্তক স্পর্শ করিলেন। তাঁহার স্পর্শে আমাদের আপাদমস্তক যেন একেবারে শীতল হইয়া গেল। মনোমধ্যে এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দের উদয় হইল। আমরাও অগ্নি

মধ্যে অবতরণ করিয়া ধীরে ধীরে ২।৩ বার কুণ্ড পরিভ্রমণ করিলাম। আশ্চর্য্য ব্যাপার! অগ্নির যেন অগ্নিত্বই নাই। দূর হইতে যে আগুণের তেজ অসহ্য বোধ হইতেছিল, সেই কুণ্ডমধ্যে এখন অগ্নিশিখা গায় লাগিতেছে অথচ তাপ অনুভব হয় না। তবে কি অগ্নির দাহিকাশক্তি একেবারেই নষ্ট হইয়া গিয়াছে? আমার বন্ধু এ বিষয়েও একটুকু পরীক্ষা করিলেন। তাঁহার পকেটে কয়েকখণ্ড কাগজ ছিল। একখণ্ড কাগজ অগ্নিকুণ্ড মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র, দেখিতে দেখিতে তাহা মুহূর্ত্তমধ্যে ভস্মসাৎ হইয়া গেল। তখন সকল বিষয়েই আমরা মনে প্রাণে একেবারে নিঃসন্দেহ হইয়া কুণ্ড হইতে অবতরণ করিলাম।

এখানে হয়ত অনেকের মনেই এই প্রশ্ন উদয় হইতে পারে যে "এই অসম্ভব ব্যাপার কি প্রকারে সম্পাদন হয়? প্রজ্বলিত অগ্নি, কোন বস্তু তাহাতে দেওয়া মাত্র ভস্মীভূত হয়। অথচ মনুষ্য তাহাতে প্রবেশ করিয়া কি প্রকারেই বা সুখশীতল স্পর্শ অনুভব করে?"

ইহার উত্তর বড় কঠিন। কারণ,—জড় বিজ্ঞান দ্বারা এই ব্যাপার বুঝিবার কোন উপায় নাই। এই পার্থিব জগতে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায়,—অগ্নি, বিদ্যুৎ, প্রভৃতি দ্বারা যে বহু অসাধারণ কার্য্য সম্পাদন হইতেছে, তাহার কারণ ও কৌশল যেমন স্থূলদর্শী অশিক্ষিতগণের বুদ্ধি বিচারের অতীত, অধ্যাত্মবল সম্পন্ন মহাপুরুষেরা ইচ্ছা শক্তি প্রভাবে জড় ও অজড় উভয় জগতের উপর অলৌকিক প্রভুত্ব করিয়া যে নানাপ্রকার অঘটন সংঘটন করেন, তাহাও তেমনই জড়বিজ্ঞানোপাসকগণের মনোবুদ্ধির সম্পূর্ণ অগম্য।

বড় বেশী দিনের কথা নয়, লণ্ডন ও চিকাগো নগরীতে ডি, ডি, হোম নামক এক মহাত্মা কয়েকবার যে অগ্নি পরীক্ষা প্রদর্শন করেন, তাহাতে রসায়নবিদ্ বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতগণের মধ্যে অনেকেই দর্শকরূপে উপস্থিত ছিলেন। বিস্তর গবেষণা করিয়াও এ পর্য্যন্ত তাঁহারা ইহার কোন সন্তোষজনক কারণ নির্ণয় করিতে সমর্থ হ'ন নাই।

প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানবিদ্ ডক্টর ওয়ালেস্ এ সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, আমরা এস্থলে তাহা উদ্ধৃত করিলাম,—These phenomena have now happened scores of times in the presence of scores of witnesses. They are facts of the reality of which there can be no doubt, and they are altogether inexplicable by the known laws of Physiology and heat.

ঠাকুর তরণীকান্ত সাহিত্য সমাজেও সুপরিচিত; প্রবাসী, নব্যভারত প্রভৃতির লব্ধপ্রতিষ্ঠ সুলেখক। আশা করি,—তিনি এসম্বন্ধে ভারতীতে স্বীয় অভিপ্রায় সবিস্তার ব্যক্ত করিয়া সকলের কৌতূহল পরিতৃপ্ত করিবেন।

শ্রীপ্রাণকুমার ঘোষ, এম্, এ।

১৩১৬, কার্ত্তিক।

পাণিনি-প্রচার।

(ভারতী, ১৩১৩ অগ্রহায়ণ-সংখ্যায় প্রকাশিতের পর)

আয়ুর্ব্বেদ যেমন হিন্দুদের একটী পদার্থ বিজ্ঞান, দর্শনশাস্ত্রও তেমনি একটী মনো-বিজ্ঞান। ইহারা উভয়েই যে গভীর গবে-ষণার ক্ষেত্র, তাহাতে এখন আর কাহারো মনে সন্দেহ নাই। এই উভয় বিজ্ঞানই হিন্দুর স্বতঃপরিচিত। উহাদের তত্ত্ব, অন্বেষণ করিয়া হিন্দুরা যত সহজে বাহির করিতে পারিবে এমন আর কেহ পারিবে না। শ্রদ্ধেয় ডাক্তার জে, সি, বসু এবং পি, সি রায় উহাদের রহস্য স্বতঃ জানেন বলিয়াই, তাঁহারা উহাদের তত্ত্ব

অনায়াসে বাহির করিতেছেন। আমাদের আয়ুর্ব্বেদিক এবং দার্শনিক আলোচনা করা যেন, আমাদের মায়ের কোলে বসিয়া উপকথা শ্রবণ করা মাত্র। এদেশীয় গবেষণাকারী কর্ত্তৃক হিন্দু রসায়ন শাস্ত্র এবং হিন্দু-দর্শনশাস্ত্র মথিত হইলে, তথায় সহজেই রত্ন মিলিবে। কারণ এই ডুবুরি এই সমুদ্রে ডুব দিতেই স্বভাব-সমর্থ। সংস্কৃত দর্শন শাস্ত্রাম্বুধি মন্থন করিয়া, জর্ম্মান্ পণ্ডিত মণ্ডলীই বহু রত্নলাভ করিয়াছেন সংস্কৃতমাতৃক বাঙ্গালীর পক্ষে আরো অধিক রত্নলাভ করাই স্বাভাবিক।

শাস্ত্র দ্বারে জুজুর ভয়

কিন্তু শাস্ত্রদ্বারে একটী জুজুর ভয় রহিয়াছে! যাত্রা করিয়া বাহির হইবামাত্রই এই জুজুর সঙ্গে দেখা হয়। এবং বিনা বল প্রয়োগেই পাঠকের হাত পা যেন পেটের মধ্যে প্রবেশ করে। এই জুজুটী আমাদের সংস্কৃত ব্যাকরণ। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে আমরা এই অ-বিদ্যারই তত্ত্ব-আলোচনা করিব। এই অ-বিদ্যা বড়ই বিষম। যাদুকরের হস্তে পড়িয়া সে নানা আকার ধারণ করিয়াছে,—এবং কখনো মুগ্ধবোধ, কখনো সারস্বত, কখনো সুপদ্ম, কখনো চন্দ্রিকা, কখনো সিদ্ধান্ত কৌমুদী, কখনো বা রত্নমালা-রূপ ধারণ করিয়া পথিককে ভূতের ভয় দেখাইতেছে। যে পথিক নিতান্ত সৎসাহসী, তিনি বিলক্ষণ দেখিতে পান যে, ইহারা আসল-জিনিস নহে, নকল বা ছায়া মাত্র। বৈয়াকরণ যাদুকারগণ নিজ নিজ কৌশলে পাণিনি ব্যাকরণকেই এরূপ ছায়াময় করিয়া তুলিয়াছেন; আর পাণিনি ব্যাকরণ একেবারে ঢাকা পড়িয়াছে এবং বঙ্গদেশীয় পণ্ডিতদের মনে এক সংস্কার দাঁড়াইয়াছে যে, পাণিনি ব্যাকরণ বড়ই কঠিন। ঘুমান মানুষকে সজাগ করা যায়, সজাগ মানুষ ঘুমের ভাণ করিলে, তাহাকে সজাগ করা কিন্তু সুকঠিন ব্যাপার। যে শিক্ষিত ব্যক্তি পরের কথায় কর্ণপাত করিবে না বলিয়া সঙ্কল্প করিয়া রহিয়াছে, তাহার মনের মধ্যে একটী অভিনব ভাব প্রবেশ করান দুঃসাধ্য। তথাপি, আমরা পাণিনির সহজ সূত্ররচনা প্রণালী আলোচনা করিয়া এতদূর বিমুগ্ধ হইয়াছি যে উহার প্রচার না করিয়া থাকা আমাদের পক্ষে একরূপ অসম্ভব।

কোন কোন লোকের ব্যাকরণ পড়িতে প্রধান আপত্তি এই যে,ব্যাকরণে রসিকতা নাই। কিন্তু আদি-রস, হাস্য-রস, করুণ-রস প্রভৃতি সুলভ সামান্য রসই যদি, একমাত্র রস হয়, এবং বিজ্ঞানে যে অদ্ভুত রস আছে, তাহা যদি কোন রসিক স্বীকার করিতে না চাহেন তবে বলিতে হইবে যে, তিনি পূর্ণমাত্রায় রসিক হইতে পারেন নাই। ব্যাকরণ কেবল সাহিত্য শিক্ষার সাহায্যকারী এমন নহে, উহার নিজস্ব একটী স্পৃহনীয়-রসও রহিয়াছে। অন্যান্য বিজ্ঞান পাঠে যে আমোদ উপভোগ করা যায়, শব্দ-শাস্ত্র পাঠেও সেই আমোদ লাভ করা যায়। এক সংস্কৃত ভাষা হইতে কিরূপে ভারতীয় নানা ভাষার উৎপত্তি ও শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে চিন্তা করিলে হৃদয় আনন্দে আপ্লুত হয়। আর যদি শব্দ-বিজ্ঞান-অনুশীলনে, কদাপি এমন কোন উপায় আবিষ্কৃত হয় যে, সংস্কৃত-ব্যাকরণ পড়িলে সংস্কৃত-মূলক সকল-ভাষাই ন্যূনাধিক বুঝিতে পারা যাইবে তবে সেটা কম আনন্দের বিষয় হইবে না। নরকঙ্কাল ও পূজরক্তাদির কারখানায় ডাক্তারগণ অত্যন্ত অদ্ভুতরস পাইয়া থাকেন।

ব্যাকরণ পাঠের আরো একটী উপাদেয়তা রহিয়াছে। রসই কাব্যের আত্মা বটে, তাহাতে কারো সন্দেহ নাই। কিন্তু, কাব্য-দেহে কোন্ দ্ব্যক্ষর, কোন্ ত্র্যক্ষর, বা কোন্ চতুরক্ষর শব্দটী খাটিবে, কেবল ব্যাকরণ শাস্ত্রই তাহা অবাধে বলিয়া দিতে পারে। যদি মনুষ্য-দেহের কোন হাড় ভাঙ্গিয়া যায়, তবে কোন্ আগন্তুক হাড় খানি আনিয়া জোড়া দিলে, দেহের পূর্ণতা রক্ষা পাইবে, তাহা যেমন শরীর বিজ্ঞান-পাঠেই জানা যায়; কোন বাক্যকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিবার জন্য, পরিবর্ত্তিত পরিবর্দ্ধিত করিতে হইলে, কোন্ শব্দটী দ্বারা বাক্যের ঐ পূর্ণতা রক্ষিত হইবে, তাহাও তেমন ব্যাকরণ-শাস্ত্র দ্বারাই অনায়াসে বলিতে পারা যায়।—কারণ, সকল শব্দই শব্দ-শাস্ত্রের অধীন, এবং ব্যাকরণ ও শব্দ-শাস্ত্র এই দু'য়ের মধ্যে কোনও প্রভেদ নাই। আবার, ইহাও অবশ্য-স্বীকার্য্য যে, বাক্যের রস বিরস বিচারে অলঙ্কার-শাস্ত্রেরই অধিকার—তাহাতে ব্যাকরণের কোনও অধিকার নাই। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, শব্দ-বিজ্ঞানেও মূল-তত্ত্ব ছয়টী, শরীর বিজ্ঞানেও মূল তত্ত্ব ছয়টি মাত্র। যেমন, প্রাণিদেহে চর্ম্মমাংস রুধির অস্থি মেদ ও মজ্জা রূপ ছয়টী পদার্থ আছে, তদ্রূপ ব্যাকরণ শাস্ত্রেও নাম, ধাতু, প্রত্যয়, নিপাত, আগম ও আদেশ-রূপ ছয়টী মাত্র পদার্থ রহিয়াছে। আবার, চর্ম্ম মাংস রক্ত প্রভৃতি মিলিত করিয়া কোনও শরীরতত্ত্ববিৎ প্রাণি-নির্ম্মাণ করিতে প্রয়াসী হইলে, যেমন তিনি পণ্ড-শ্রম ও হাস্যাস্পদ হয়েন, তদ্রূপ কোন ব্যাকরণ অধীতী ব্যাকরণ-মাত্র বলে কাব্য-নির্ম্মাণ করিতে প্রবৃত্ত হইলে, তিনিও একটী নীরস শব্দাবলী রচনা করিবেন মাত্র,—তাহাতে তাঁহার প্রাণ প্রতিষ্ঠার কোন অধিকার থাকিবে না।

দেখা যাউক, এইরূপ অত্যাবশ্যকীয় ও প্রাণায়াম শব্দ-শাস্ত্রের অনুশীলন-নিমিত্ত আমাদের দেশে কিরূপ ব্যবস্থা রহিয়াছে। আমাদের দেশীয় টোলে, শিশু-দিগকে সূত্র ও বৃত্তির সংক্ষিপ্ত প্রাচীন- ভাষা অভ্যাস করিতে দেওয়া হয়। যাহাদের প্রচলিত-ভাষায় জ্ঞান নাই, তাহাদিগকে অ-প্রচলিত-ভাষা শেখান হয়, যাহাদের শব্দার্থের জ্ঞান নাই, তাহাদিগকে সর্ব্বাগ্রে ব্যাকরণের সন্ধি বা বর্ণ-বিচারে প্রবিষ্ট করান হয়। ছাত্র জীবনের প্রথম ছয় সাত বৎসর এইরূপ মুখস্থ বিদ্যায় (Gramming) চলিয়া যায়। অপ্রযুক্ত বিট্-কাল সন্ধির ও সনন্ত-যঙন্ত-নিজন্ত-প্রভৃতি দোতালা তেতালা চৌতালা ধাতুর লুডের কারখানাতেই ছাত্রের এই জ্ঞান-পিপাসার সময়টা কাটিয়া যায়। আর, গর্ব্বিত ব্যাকরণ অধীতিগণ সূত্রদ্বারা পদ নির্ম্মাণ করিতে গিয়া, কিম্ভূত কিমাকার পদ-সকল সৃষ্টি করিয়া থাকেন। কার্য্য কালে দেখা যায় যে, তাঁহারা কেহ কেহ একখানি পত্র লিখিতেই বর্ণাশুদ্ধি করিয়া ফেলেন; আর, ধরা পড়িয়া মনে করেন "সারারাত্ সাপ্ পিটালেম্, দুর ষা, ভোরে দেখি, ওটা একটা দড়ি।" বস্তুতঃ, ভূতলে

সর্প না রজ্জু?

প্রচলিত যাবতীয় ভাষার মধ্যে সংস্কৃত-ভাষা একটী অ-সামান্য পূর্ণতা-প্রাপ্ত ভাষা। দেশে সংস্কৃত ব্যাকরণেরও অন্ত নাই, তথাপি সংস্কৃত-শিখিবার কথায় সর্ব্ব-সাধারণের শরীর শিহরিয়া উঠে কেন? আমরা অত্যন্ত পরিতপ্ত হৃদয়ে, প্রত্যেক

শিক্ষিত ব্যক্তির নিকটেই এই প্রশ্ন উত্থাপিত করিলাম। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, এই প্রশ্নোত্তরে তাঁহারা দেখিতে পাইবেন যে, আমাদের দেশে বর্ত্তমান সময়ে, ব্যাকরণ শিক্ষার যে পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত রহিয়াছে তাহা শ্রদ্ধেয় নহে। পূর্ব্বে ব্যাকরণ শিখিয়া পরে ভাষা-শিখিতে আরম্ভ করা এই প্রণালীটী নিতান্ত অসঙ্গত। এই প্রণালীর পরিবর্ত্তন হওয়া, এক্ষণে একান্ত আবশ্যক বলিয়া বোধ হইতেছে। সাহিত্য পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই ব্যাকরণ পড়া উচিত। বঙ্গ-ভাষা কর্ত্তৃক বহু সংস্কৃত শব্দ অবিকল পরিগৃহীত হইয়াছে। তজ্জন্যই অন্যান্য প্রাকৃত ভাষা হইতে বঙ্গ-ভাষা একটী অপূর্ব্ব পদার্থ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সুতরাং বঙ্গীয় যুবকের কাছে, সরল সংস্কৃত ভাষা একেবারে গ্রীক্ বলিয়া কিছুতেই প্রতীয়মান হইতে পারে না। এবং আমরা অকুণ্ঠহৃদয়ে বলিতে পারি যে, যাঁহারা সাহিত্য-প্রসঙ্গে ব্যাকরণের সাহায্য চাহেন তাঁহাদের সাহিত্য সন্দীপনের (elucidation) জন্যে অষ্টাধ্যায়ীই একমাত্র মহৌষধি, (reference book)। অষ্টাধ্যায়ীতে প্রকৃতি প্রত্যয়ের বিশাল বিশাল প্রকরণ রহিয়াছে, এবং বর্ণবিচারের প্রকরণ সর্ব্ব-শেষে সন্নিবেশিত হইয়াছে। যেন প্রকৃতি প্রত্যয় বিভাগ করিয়া লইলে, বর্ণাগম ও বর্ণ-বিকার আপনা আপনিই ধরা পড়িবে। দুঃখের বিষয় এই যে, পাণিনির এইরূপ স্বচ্ছ সূত্র সলিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান শব্দ-তত্ত্ব-গুলিকেও টীকার টীকা তস্য টীকাকারগণ আবিল করিয়া রাখিয়াছেন—যেন, পাণিনির সূত্রগুলি এতই কৃত্রিম যে, টীকার সাহায্য ভিন্ন তাহাদিগের অর্থগ্রহই হইতে পারে না।

আমাদের দেশে প্রচলিত প্রথা অনুসারে ব্যাকরণ প্রারম্ভেই সন্ধি শিখিতে হয়। সন্ধির হাজার উপাদেয়তা থাকিলেও, অবোধ শিশু-দিগকে এরূপ অর্থহীন বর্ণজালে নিক্ষেপ করা উচিত নহে। যে বালক 'সন্' অর্থ জানে না, 'শম্ভু' অর্থও জানে না, তাহাকে শেখান হয় যে, 'সন্-শম্ভুর' সন্ধিতে তিনটী রূপ হয়; সঞ্-ছম্ভুঃ, সঞ্শম্ভুঃ সঞ্-শম্ভুঃ। পুং-কোকিল, শব্দের সন্ধিতে দুইটী রূপ হয়; পুং-স্কোকিল পুঁস্কোকিল 'নৃনং পাহি'র পাঁচটী রূপ হয়; 'সংস্কর্ত্তার' একশত আটটি রূপ হয় ইত্যাদি। কিন্তু, জিজ্ঞাসা করি, কোন্ অধ্যাপক মহাশয় সংস্কর্ত্তার এই অষ্টোত্তর শত নাম একএকটি করিয়া ছাত্রদিগকে সম্পূর্ণরূপে শিক্ষা দিয়া থাকেন? আর শিক্ষা দিলেই বা তাহাতে ঐহিক পারত্রিক কি ফলের আশা করা যায়? অষ্টাধ্যায়ী কিন্তু কোন স্থানেই বলেন নাই যে, এই অষ্টোত্তর শত নাম পাঠ না করিলেই ব্যাকরণ পাঠকের এই চণ্ডী পাঠ অশুদ্ধ হইবে। এদিকে, এইরূপ সন্ধির চেহারা দেখিয়াই শিশুরা ব্যাকরণ ক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিতে ইচ্ছা করে।

পাণিনি-ব্যাকরণ বলিতেই, বঙ্গদেশে অনেকে সিদ্ধান্ত-কৌমুদী বুঝিয়া থাকেন। আচ্ছা, দেখা যাউক, উহাদের কে কিরূপ। অষ্টাধ্যায়ীর সমগ্র প্রথম অধ্যায় ব্যাপিয়া উহার সংজ্ঞা-পরিভাষাগুলি (Definitions, axioms and postulates) রহিয়াছে,—সিদ্ধান্ত-কৌমুদীর সংজ্ঞা-পরিভাষা প্রকরণ ৪০।৫০টি মাত্র সূত্রে সাঙ্গ করিয়া অন্যান্য সংজ্ঞা-পরিভাষা-সূত্র-গুলিকে, ভট্টোজি স্থানে স্থানে (কিয়ৎপ্রসঙ্গে) নিক্ষিপ্ত করিয়াছেন। তাহাতে ফল এই হইয়াছে যে, ভট্টোজিকে

কেবল-মাত্র 'ইকোযণ্‌ অচি' সূত্র-দ্বারা 'সুধ্যুপাস্য' শব্দের সন্ধি না বুঝাইয়া আটটি সূত্রদ্বারা উহা সাধিতে হইয়াছে। আর অবোধ-ছেলের এইরূপ বর্ণ বিচারের আঁটা-আঁটি দেখিয়া ঠাকুরমা নিশ্চয়ই মনে মনে বলিতেছেন; অরে অরে বর্ব্বর চটমটি সার, অর্থের জ্ঞান নাই বর্ণের বিচার; ইত্যাদি। ভট্টোজিদীক্ষিত যে প্রণালীতে তাঁহার সিদ্ধান্ত কৌমুদীখানি লিখিয়াছেন, তাহাতে তিনি ব্যাপক-সূত্রগুলির মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারেন নাই, এবং গুর্ব্বর্থসম্পন্ন অধিকার সূত্রগুলিকেও বিশদরূপে ব্যাখ্যা না করিয়া, প্রসঙ্গানুরোধে অন্য-সূত্রের সঙ্গেই তাহাদের ব্যাখ্যা করিয়াছেন; আর বহুসূত্রের উত্থাপন কেবল আপত্তিচ্ছলে করিয়া আপত্তি খণ্ডন করিয়াছেন মাত্র; সে সমুদায় সূত্রেও দৃষ্টান্ত দেন নাই। ইহাতে বুঝা যায় যে, জিগীষু পণ্ডিতের মত, ব্যাকরণ-শাস্ত্রীয় আপত্তি-ভঞ্জন করা ভট্টোজির একটি প্রধান লক্ষ্য ছিল। নতুবা কোন কোন সূত্রের প্রকৃত ব্যাখ্যা না করিয়া কোন্ আপত্তিতে তাহাদের উত্থাপন হইতে পারে তাহাই মাত্র তিনি দেখাইবেন কেন? বহু কঠিন সূত্রের ব্যাখ্যা-স্থলেও তিনি "স্পষ্টম্" এইকথাটীমাত্র বলিয়া গিয়াছেন; এবং অনেকস্থলে একএকটী সূত্রের দৃষ্টান্ত এক-একটী-মাত্র পদ-দ্বারা নির্ব্বাহ করিয়াছেন; যেমন "পরোক্ষে লিট্" সূত্রের উদাহরণ "বভূব"—কিন্তু বাক্য-সুলভ সংযোগ বিপ্রয়োগ সাহচর্য্যাদি-দ্বারা সূত্রার্থ বুঝাইবার কোন ব্যবস্থাই করেন নাই। আর সে সময়ে ভারতে মুদ্রাযন্ত্রের প্রাদুর্ভাব ছিল না, এবং মুখে মুখেই সমগ্র বিশাল সংস্কৃত শাস্ত্রগুলি অধীত হইত, সেই সময়ে সংক্ষিপ্ত সূত্র সংক্ষিপ্ত বৃত্তি ও সংক্ষিপ্ত উদাহরণ নিতান্তই উপযোগী এবং প্রয়োজনীয় ছিল বটে; কিন্তু আজকাল ততদূর সংক্ষেপের কোনও আবশ্যকতা দৃষ্ট হয় না।

আমাদের দেশে, অষ্টাধ্যায়ী ও সিদ্ধান্ত কৌমুদী অভিন্ন ব্যাকরণ বলিয়া সাধারণের নিকট পরিচিত। বাস্তবিক, সিদ্ধান্ত কৌমুদী অষ্টাধ্যায়ীর একটী টীকামাত্র। অষ্টাধ্যায়ী ও সিদ্ধান্ত কৌমুদী তুলনা করিলে, ইহা স্পষ্টই লক্ষিত হইবে যে, সিদ্ধান্ত-কৌমুদীকে পাণিনি-ব্যাকরণ না বলাই উচিত। সিদ্ধান্ত-কৌমুদী-দ্বারা ভট্টোজির নৈপুণ্য যতদূর প্রমাণিত হইয়াছে, পাণিনির রচনা-কৌশল ততদূর সপ্রমাণ হয় নাই। কারণ উহাতে পাণিনির শব্দ-বিশ্লেষণ প্রণালী অনুসৃত হয় নাই, উহা শব্দ-নির্ম্মাণ-প্রণালীতে লিখিত হইয়াছে। পাণিনির সূত্রগুলিকে, কোন্ সঙ্কেতে সাজাইলে, উহারা কলাপ-মুগ্ধবোধাদির সূত্রের মত বসিতে পারে, সিদ্ধান্ত-কৌমুদী তাহারই একটী অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত স্থল। সুতরাং সিদ্ধান্ত-কৌমুদী ভট্টোজিরই কীর্ত্তিস্তম্ভ, পাণিনির নহে।

সিদ্ধান্ত-কৌমুদী পাণিনি-ব্যাকরণ নহে।

পাণিনীর অষ্টাধ্যায়ীতে সর্ব্বসমেত ৩৯৮৩ অথবা প্রায় চারি হাজার সূত্র আছে। এই পুস্তকখানি আটটী অধ্যায়ে বিভক্ত বলিয়া, ইহাকে অষ্টাধ্যায়ী কহে। ইহার প্রত্যেক অধ্যায় আবার চারি অংশে বিভক্ত। প্রত্যেক অংশকে এক একটি পাদ কহে। অষ্টাধ্যায়ীর প্রথম অধ্যায়ে সংজ্ঞা-পরিভাষা, দ্বিতীয় অধ্যায়ে কারক-সমাস, তৃতীয় অধ্যায়ে ধাতু-প্রত্যয় (তিঙ্‌ ও কৃৎ), চতুর্থ-পঞ্চমে তদ্ধিত, এবং

অষ্টাধ্যায়ী।

ষষ্ঠ সপ্তম অষ্টমে বর্ণনবিচার বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং দেখা যায় যে, অষ্টাধ্যায়ী আট অধ্যায়ে বিভক্ত হইলেও, তাহা পাঁচটিমাত্র ব্যাপক বিষয়ে বিভক্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে, আবার, বিশাল ধাতু-প্রকরণ, প্রত্যয়-প্রকরণ, (প্রাতিপদিক বা) নাম-প্রকরণ, নিপাত-প্রকরণ ও আগম-আদেশ প্রকরণ প্রভৃতি বিরাজ করিতেছে। পাঁচ-ছয়টী-মাত্র-প্রকরণ চারি হাজার সূত্র ব্যাপিয়া রহিয়াছে, ইহা হইতেই পাঠক অনুমান করিবেন—এক একটী প্রকরণ কতদূর বিস্তৃত। এই স্থলে, ইহাও মনে রাখা উচিত যে, এক বিষয়ে অন্যূন দুইটী সূত্র হইলেই তাহাকে একটী প্রকরণ বলে। এক স্থান হইতে অন্যস্থানে পোর্টম্যাণ্ট্ (বা কৌটা) চালান দিতে হইলে, কৌশলী ব্যবসায়িগণ, যেমন বড় পোর্টম্যাণ্টের ভিতরে মধ্যমটাকে ও মধ্যমটার ভিতরে ছোটটাকে পূরিয়া দেন, এবং এমতাবস্থায় বড় পোর্টম্যাণ্ট্টাকে ও ছোট পোর্টম্যাণ্ট্টাকে দেখিলেই যেমন মধ্যম পোর্টম্যাণ্ট্টার সাইজ্ (পরিমাণ) ধারণা করা যায়, তেমনি পাণিনির সূত্রগুলি এমনি ভাবে রচিত যে, কোন সূত্রের পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী সূত্রটাকে দেখিলেই সেই সূত্রের ব্যাপ্তি গ্রহণ করা যায়। কারণ, অষ্টাধ্যায়ীতে বৃহৎপ্রকরণের ক্রোড়ে তদপেক্ষা ক্ষুদ্র-প্রকরণ, তাহার মধ্যে তদপেক্ষা ক্ষুদ্র-প্রকরণ, তাহার মধ্যে তদপেক্ষা ক্ষুদ্র প্রকরণ ইত্যাদির ক্রমে, এক একটি বিস্তৃত-প্রকরণে ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্রতর-ক্ষুদ্রতম ভেদে বহু প্রকরণ সন্নিবেশিত রহিয়াছে। এই প্রণালীই পাণিনির সূত্রের সংক্ষিপ্ততার প্রকৃত রহস্য। এই জন্যই প্রাচীনেরা বলিয়াছেন, "সূত্রেষু অদৃষ্টং পদং সূত্রান্তরাদ্ অনুবর্ত্তনীয়ং সর্ব্বত্র" অর্থাৎ কোনও সূত্রবাক্য কোন অংশে উহ্য থাকিলে, বুঝিতে হইবে যে, ঐ উহ্য-পদটী একটী প্রকরণ-ঘটক পদ, উহা বর্ত্তমান প্রকরণে একবার উল্লিখিত হইয়াছে, এবং বর্ত্তমান-সূত্রের সঙ্গে যে উহার অন্বয় রহিয়াছে তাহা সূত্র-শক্তি-মহিমাদ্বারা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, সুতরাং বর্ত্তমান সূত্রে উহার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। এইরূপ, পেটক পূরণ ন্যায়ে সজ্জিত সূত্র-প্রবাহ হইতে সূত্র-গুলিকে তুলিয়া লইয়া, ভট্টোজি তাহাদিগকে মুগ্ধবোধের ছাঁচে ঢালিয়া, সিদ্ধান্ত-কৌমুদী রচনা করিয়াছেন, এবং এভাবে ছিন্নমূল সূত্র-গুলির মূলবৃত্তান্ত অগত্যা তিনি তাঁহার বৃত্তিতে স্থাপিত করিয়াছেন। কাজেই, বৃত্তির সাহায্য ভিন্ন সিদ্ধান্ত-কৌমুদীর সূত্রগুলিকে প্রায় বুঝা যায় না। এই জন্যই বোধ হয়, বিদ্যাসাগর মহাশয় কলিকাতা-সংস্কৃত কলেজের ব্যাকরণ-পাঠ্যাবলীর মধ্যে সিদ্ধান্ত-কৌমুদীকে মুখ্য-স্থান দেন নাই। যাঁহাদের মনে বিশ্বাস যে, বৃত্তির সাহায্য ভিন্ন অষ্টাধ্যায়ী সূত্রেরও কোন অর্থগ্রহ হয় না, তাঁহারা সর্ব্বাগ্রে পাণিনির প্রথম অধ্যায় এবং পরে অন্যান্য অধ্যায় পড়িয়া দেখিবেন, ইহাই আমাদিগের বিনীত অনুরোধ! অবশ্য কাশিকাতে সূত্র-গুলির অষ্টাধ্যায়ী-ক্রমই অক্ষুণ্ণ রাখা হইয়াছে। কিন্তু, উহাতে প্রত্যেকসূত্রের অব্যবহিত পরেই তাহার ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে বলিয়া উহাতেও সূত্রগুলির পরস্পর সম্বন্ধ বিশদরূপে লক্ষিত হইতেছে না। এমন কি, পাণিনীয় অষ্টাধ্যায়ী যে, অনির্ব্বচনীয় একটী কবিতা-রসে আপ্লুত রহিয়াছে, কাশিকাপাঠকের মতে তাহাও আকাশ-কুসুম-চিন্তা! (ক্রমশঃ)



সীতাগড়ে বনভোজন

বনভোজন। (চিত্র ব্যাখ্যা)

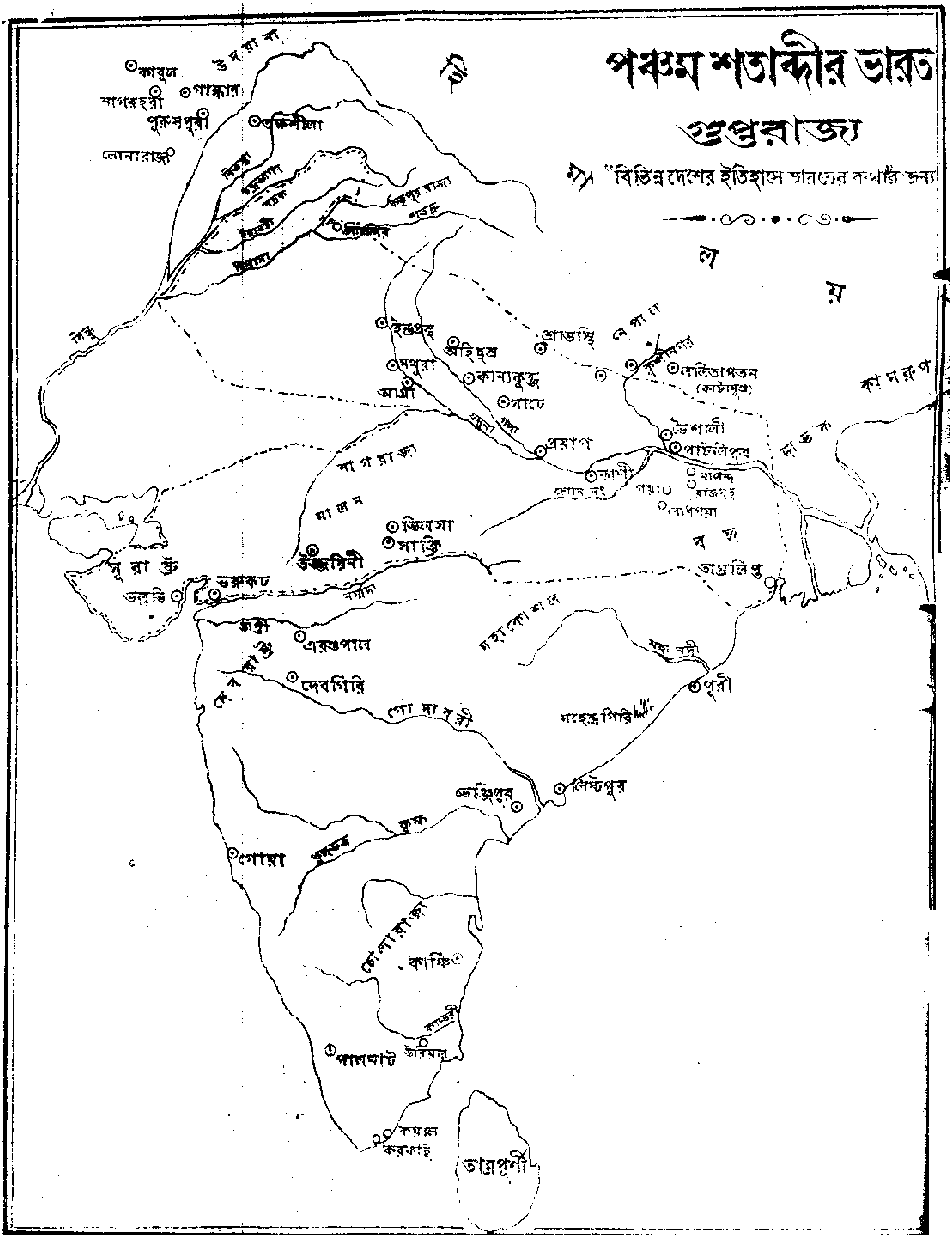
নূতন রেগুলেশন অনুসারে আজকাল যতগুলি ছাত্রনিবাস-কলেজ (Residential College) স্থাপিত হইয়াছে তন্মধ্যে হাজারীবাগের সেণ্ট কলম্বসকে, (St Columba's College) বোধ হয় সর্ব্বাগ্রে স্থান দেওয়া যাইতে পারে। কলেজটী ডবলিন ইউনিভারসিটি মিশন পরিচালকগণকর্ত্তৃক চালিত এবং মার্সম্যান, কেরির সময় হইতে খৃষ্টীয়ধর্ম্মযাজকগণ যতগুলি সুকার্য্য করিয়াছেন তন্মধ্যে ইহা একটি। বস্তুতঃ, এই প্রদেশে এই অগম্য কোল, মুণ্ডা, প্রভৃতি জাতিসেবিত স্থলে, উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা করিয়া ধর্ম্মযাজকগণ প্রভূত উপকার সাধিত করিতেছেন। ছাত্রনিবাস কলেজের নিয়মানুসারে কলেজের দুইজন অধ্যক্ষ রেভারেণ্ড টমসন ও রেভারেণ্ড মরে কলেজে ছাত্রদিগের সহিত থাকেন। কলেজ এবং ছাত্রনিবাস একই বাড়ীতে! অন্যান্য অধ্যাপকগণ কলেজের নিকটবর্ত্তী কলেজের বাড়ীতে থাকেন। অনেক অর্থব্যয়ে গথিক শিল্পানুযায়ী এই মনোরম সৌধ নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। চতুর্দ্দিকে পর্ব্বতমালা— ছাতের উপর হইতে দৃশ্যাবলী প্রকৃতই মনোহর। অতি পুরাকালে আমাদের দেশে যেমন শিক্ষক ও ছাত্রের মধুময় সম্মিলন দেখা যাইত—একত্র বাস, একত্র পাঠ, একত্র আহার—এখানে সেই দৃশ্য দেখা যাইতেছে। অধ্যাপকদের শিষ্যবাৎসল্য ও ছাত্রদের গুরুভক্তির অভাব এখানে আদৌ নাই। আর হিন্দু, মুসলমান, বিহারী ও খৃষ্টান ইহাদেরও এমন একত্র সমাবেশ বোধ হয় আর কুত্রাপি নাই।

গত বড় দিনের বন্ধে কলেজের অনূন ৬০টী ছাত্র লইয়া আমরা বন ভোজনের জন্য প্রায় ৭ মাইল দূরবর্ত্তী সীতাগড় পর্ব্বতে যাত্রা করি। আমরা অর্থে রসায়নের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য, উদ্ভিদ বিদ্যার অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র সিংহ ও আমি। এ বৃহৎ ব্যাপারের সম্পূর্ণ ব্যয়ভার বন্ধুবর শ্রীশচন্দ্রই বহন করিয়াছিলেন। অতি প্রত্যূষে একখানি পুসপুসে করিয়া ভৃত্য ও পাচকবর্গ, ৩।৪টী দুর্ব্বলদেহ ছাত্রের সহিত অভিযানোপযোগী রসদ লইয়া রওনা হইল। পরে বেলা ৮৷৷০ টার সময় সৈন্যদলসহ আমরা যাত্রা করিলাম। কিছুক্ষণ পরে অন্য একটী পুসপুসে করিয়া আরও কয়েকটী ছাত্র, এবং তৃতীয় পুসপুসে রসায়নাধ্যাপক শরৎবাবু তাঁহার পুত্র ও কন্যা সমভিব্যাহারে যাত্রা করিলেন। পুসপুস মনুষ্যচালিত ঠেলা গাড়ী। হাজারীবাগ রোড ষ্টেসন হইতে সহর ৪১ মাইল—এই ৪১ মাইল পুসপুসেই আসিতে হয়। পুসপুস্ অথবা পুষ্পরথ অতি উপাদেয় দ্রব্য। যিনি পুসপুসে চড়িয়াছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে কুলিদিগের রণনিনাদ শ্রবণ করিয়াছেন তিনিই জানেন যে গাত্রবেদনা কিছু অধিক দিন স্থায়ী এবং কাণে তালী লাগার সম্ভাবনাও বেশী। সীতাগড় যখন পৌঁছিলাম তখন বেলা প্রায় বারোটা। পৌঁছিবামাত্রই রসদী সৈন্যগণ আমাদের লুচি ও তরকারী সহ জলযোগের ব্যবস্থা করিল এবং জলযোগ সমাপনান্তেই সীতাগড় অধিকারে তৎপর হইল।

শ্রীশবাবু বটানীর প্রফেসার। তাঁহার সৌন্দর্য্যপিপাসু প্রাণ তরুলতাদির অকৃত্রিম প্রেমতত্ত্ব গবেষণামত্ত। তিনি তাই লোকালয়-হীন বিজন তরুগুল্ম বিরাজিত অভ্রলেহী পর্ব্বতে অকৃত্রিম ছাত্রপ্রেম প্রকাশের স্থান মনোনীত করিয়াছিলেন। বনগমনের সময় সীতাদেবী যে সকল তরুগুল্ম কিংবা পুষ্পশালিনীলতা পূর্ব্বে দেখেন নাই তাহাদের কথা যেমন শ্রীরামচন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, শ্রীশবাবুর ছাত্রবৃন্দও সেইরূপ "পুষ্পমঞ্জরীতে ভরা রমণীয়ান্ বহুবিধান পাদপান্ আনিয়া বিশ্লেষণ করিয়া লইতে লাগিলেন। একাধারে শিক্ষা ও আনন্দ চলিতে লাগিল। দুঃখ কেবল পর্ব্বতে বা তাহার সান্নদেশে "বিচিত্র বালুকাজলা হংস সারস-মুখরিতা নদী" ছিল না; তবে কলেজ হইতে সীতাগড় যাইবার পথে ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য নদী একটী আছে। যেখানে রসদের গাড়ী আটকিয়া পড়ায় সেই বালুকর্দ্দমপ্রোথিত মনুষ্যগাড়ীর চক্র উদ্ধারকল্পে হরিপদ নামক তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রটির বোধ হয় কর্ণের ভূগর্ভগ্রাসিত রথচক্র উদ্ধারের ন্যায় কষ্ট পাইতে হইয়াছিল এবং অর্জ্জুনরূপ পুসপুসারোহী কয়েকটী ছাত্রবৃন্দের বিদ্রূপ বাণাহত হইয়া হরিপদ তাহাদিগকে পুসপুস—অথবা পুষ্পরথ পরিত্যাগ করাইয়া পদব্রজে যাইতে বাধ্য করিয়াছিল। ঐ নিশানের বামদিকে অর্দ্ধশায়িত ব্যক্তিটিই সেই হরিপদ। সে দিন ইনিই উৎসবের কর্ত্তা পদে (Master of the ceremonies) বরিত হইয়া '৪৯' সমিতির Royal Physician গণ্য হইয়াছিলেন। ৪৯ ক্লবের বিবরণ ভারতীর পাঠকগণকে অন্য সময়ে জানাইব। তবে বলিয়া রাখি যে শ্রদ্ধাস্পদ ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি সারদাবাবু ও আমাদের বহুমান্য ইনস্পেক্টার ডাঃ রায় উক্ত সমিতির সদস্য; কলেজের প্রিন্সিপাল ঐ সমিতির মন্ত্রী। পুসপুসারোহী মাত্রেই এই সমিতির সদস্য পদে বৃত হইতে পারেন। সমিতির প্রধান এবং প্রথম নিয়ম এই যে ইহার কোন নিয়ম নাই।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ছাত্রবৃন্দ সীতাগড় অধিকারে তৎপর হইয়া সেনাপতিদের কর্ত্তৃত্ব পরিত্যাগ করিয়াছিল। কিছুক্ষণ পরেই বিজয়োল্লাসে রণজয়ী সৈন্যগণের জয়োৎফুল্ল ধ্বনিতে বনভূমি ও পর্ব্বতকন্দর মুখরিত হইয়া উঠিল।

সীতাগড় পর্ব্বত নেহাৎ ছোট নয়। ক্ষুদ্র হইলেও,তাহার জাতিগত উচ্চতা কে অস্বীকার করিবে? এই পর্ব্বত হিমালয়ের স্বজাতীয়। সহৃদয় ব্যক্তির হৃদয়ের মত, দরিদ্রের আশার মত ইহার উচ্চতা অপরিমেয়। তবে কুমার-সম্ভবের প্রথম সর্গে কালিদাস হিমালয়ের যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, হিমালয়েব জ্ঞাতি হইলেও ইহার গৌরবের তেমন কিছু নাই। ইহাতে করিকুম্ভবিদারক কেশরী নাই, বিলাসবিভ্রমবিবশা কিন্নরী নাই ইহার দরিগৃহদ্বারে জলদ বিলম্বিত হয় কিনা জানি না—তবে ইহার উচ্চশিখর ধাতুরূপরঞ্জিত হইয়া অকালসন্ধ্যা ভ্রম আনয়ন করে বটে আর ধেনু সমূহ লাঙ্গুল বিক্ষেপচ্ছলে চামর ব্যজনও করিয়া থাকে। আর আছে যাহা তাহা কালিদাসের বর্ণনায় নাই। তাহা ইংরাজের ডিনামাইট দ্বারা প্রস্তুত পথ, ভল্লুকের আশ্রম স্থল এবং নিকটবর্ত্তী পিঁজরাপোলের প্রতি সতৃষ্ণ দৃষ্টি বুভুক্ষিত নেকড়ে।



(-.-.-.-.- এইরূপ ডট চিহ্নিত স্থানগুলি গুপ্ত রাজগণের অধিকৃত)

Lithographed at the New School Book Press, Dixon's ... Calcutta

অতি মহান আদর্শের সম্মুখে অহঙ্কার আত্মাভিমান বিদূরিত হয়, নিজের ক্ষুদ্রত্ব অনুভূত হয় তাই আমাদের সীতাগড়ের সানু-দেশে মনে হইল, যে আমরা অতিক্ষুদ্র হইয়াও মহত্বের শ্লাঘা করি। তৎকালোদিত এই ভাব সকলের মধ্যে গুরুশিষ্য সম্বন্ধের অন্তর্নিহিত সঙ্কোচ ভাবকে কিয়ৎকালের জন্য বিলুপ্ত করিয়াছিল। যাহা হউক ভোজনের প্রাক্কাল পর্য্যন্ত যথেষ্ট পরিভ্রমণে বিপুল ক্ষুধার্জ্জন করিয়া শিষ্যগণ চর্ব্বচোষ্য লেহ্যপেয় ভোজ্য দ্রব্য সকল এমন প্রচুর পরিমাণে আহার করিয়াছিল যে মিষ্টান্ন লোলুপ পর্ব্বতবিহারী বন্যজীবগণ গন্ধাকৃষ্ট হইয়া ভোজনস্থলে বৃথা পরিভ্রমণান্তর অবশেষে চিরাভ্যস্ত বনজাত খাদ্যে উদর পূরণ করিতেই বাধ্য হইল। চিত্রে ঐ যে লৌহ কটাহ দেখিতেছেন উহা দৌর্ব্বল্যহারী, পাঁটার উপাদেয় অস্থি ও কলিজা, মৃত্তিকাপাত্রে আমির আবদর রহমানের দেশান্তর্গত আলুবোখারা ও কিসমিসের চাটনী, সুবৃহৎ-ডেকচিগুলিতে রণজিৎ সিংহের লীলাস্থল পঞ্চ-নদের চাউলের পোলাও, এবং অমাংসভোজী ব্যক্তিগণের জন্য ঝুড়ীতে "লুচী কচুরি মতিচুর শোভিতং জিলেপী সন্দেশ গজা প্রভৃতি নানারূপ সোপকরণীয় দ্রব্যাদি বিরাজিতং! ভোজন ব্যাপারকালীন "অধ্যাপক শ্রীশচন্দ্রের জয়ে" বনভূমি ও পর্ব্বতকন্দর মুখরিত হইতে লাগিল। এই বিরাট ভোজনান্তে ছাত্রপরিবৃত শ্রীশবাবুর ফ'টোগ্রাফ লওয়া হইল। ছাত্র ও অধ্যাপকে এমন প্রেমময় সম্মিলন প্রকৃতই স্মৃতিপট ব্যতিরিক্ত পটান্তরে আলিখিত হইবার বিষয়।

তারপর ধীরে ধীরে প্রত্যাগমন। সেই সুরম্য নামাখ্য "চিত্রকুট", ও নন্দন হৃষ্টো মৃগপক্ষিজুষ্টাং বনভূমি পরিত্যাগ করিয়া গৃহে ফিরিতে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইল।

হাজারিবাগ কলেজ ২৪ জানুয়ারী।

পঞ্চম শতাব্দীর ভারত ও ফাহিয়ান।

আমরা পূর্ব্বপ্রবন্ধে ফাহিয়ানের পুস্তক ফু-কো-কি হইতে ভারতের তৎকালীন চিত্র দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছি। বক্ষ্যমান প্রবন্ধে আমরা ফাহিয়ানের ভ্রমণের আরও কিছু বৃত্তান্ত পাঠকবর্গের সমীপে উপস্থিত করিব।

ফাহিয়ান তাঁহার পুস্তকে বরাবর তৃতীয় পুরুষই ব্যবহার করিয়াছেন। তিনি লিখিয়া-ছেন যে, তদীয় দেশে ধর্ম্মগ্রন্থ এবং ধর্ম্মোপ-দেশের স্বল্পতা দেখিয়া কয়েকজন সহযোগীর সহিত তিনি ধর্ম্মশাস্ত্রের আদিস্থান ভারতবর্ষাভি-মুখে রওয়ানা হন। তখন তিব্বত বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রধান ছিল না। সেইজন্য, তিনি আরও পশ্চিমাঞ্চল হইয়া খোটানে পৌছেন। এইস্থানে তাঁহারা এক অভিনব উৎসবে যোগ দেন। তখন রাজপথ সকল পরিষ্কৃত করিয়া ধূলি নিবারণ কল্পে জল দেওয়া হইয়াছিল। পল্লবাদি ও নিশানসহ রাজপথ সুসজ্জিত এবং প্রত্যেক দ্বারের সম্মুখে মূল্যবান যবনিকা রক্ষিত হইয়াছিল। সিংহদ্বারের উপরে এক ক্ষুদ্র মন্দিরে রাজা, রাণী এবং কতকগুলি সুন্দর

স্ত্রীলোক উপবিষ্ট হইয়াছিলেন। সুসজ্জিত রথে করিয়া যখন প্রতিমাগুলি সিংহদ্বার হইতে একশত হস্ত দূরে আসিয়া পৌঁছিল তখন রাজা প্রতিমাগুলির অভ্যর্থনার জন্য গাত্রোত্থান করিলেন। তিনি তাঁহার শিরস্ত্রাণ অপসারিত করিয়া নূতন বস্ত্র পরিধান করিয়া নগ্নপদে প্রধান প্রতিমূর্ত্তির সম্মুখে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া পুষ্প ও গন্ধদ্রব্যদ্বারা বিশেষরূপে অর্চ্চনা করিলেন। সিংহদ্বারাভ্যন্তর দিয়া যখন মূর্ত্তিগুলি যাইতে লাগিল তখন নারীগণ এত পুষ্পবৃষ্টি করিলেন যে প্রতিমা পরিপূর্ণ-রথগুলি ফুলময় হইয়া গেল। ফাহিয়ান এবং তাঁহার বন্ধুগণকে একটী বিহারে (বৌদ্ধ-মঠ) বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া হইল। উক্ত মঠাধিবাসী সকল যতিই একত্র আহার করিতেন। আহারাদির সময় ভোজন পাত্রাদি হইতে যাহাতে কোনরূপ শব্দ না হয় তাহার বিশেষ ব্যবস্থা ছিল এবং আহারের সময় কেহই কোনরূপ বাক্যালাপ করিতেন না। এই নগরের মন্দিরাদি অত্যন্ত ঐশ্বর্য্যশালী। একটি মন্দির নির্ম্মাণ করিতে ৮৪ বৎসর লাগিয়াছিল। যে রাজা মন্দির নির্ম্মাণ আরম্ভ করেন তাঁহার পৌত্র ইহা শেষ করেন। এই মন্দিরের প্রতিমূর্ত্তি সকল সুবর্ণ ও রৌপ্য-নির্ম্মিত এবং বহু মূল্যবান প্রস্তর-সমন্বিত গবাক্ষগুলি স্বর্ণমণ্ডিত এবং চৌকাটগুলি সুবর্ণে নির্ম্মিত।

ফাহিয়ান যখন লাডকে ছিলেন তখন বৌদ্ধদিগের পঞ্চম বাৎসরিক সভার অধিবেশন হয় এবং সকল দেশ হইতেই বৌদ্ধ যতিগণ সমবেত হইয়া এই সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। বসিবার স্থানটী অতি সুন্দররূপে সজ্জিত করা হইয়াছিল এবং সেস্থানে বহুমূল্য রেশম দ্বারা সুশোভিত ও স্বর্ণরৌপ্যের বহুসংখ্যক পদ্মাসনযুক্ত এক তক্ত এবং তন্নিম্নে প্রতিনিধিগণের বসিবার আসন স্থাপিত ছিল। এই সব কার্য্য সাধারণতঃ বসন্ত ঋতুতেই সম্পন্ন হইত এবং একমাস বা দুইমাস কি তিনমাস পর্য্যন্তই এই সভাধিবেশন হইত। উৎসবাদি শেষ হইয়া গেলে, রাজা, মন্ত্রী এবং অন্যান্য প্রধান ব্যক্তিগণ তাঁহাদের অশ্ব, শাল এবং অন্যান্য মূল্যবান যে কিছু দ্রব্যই থাকুক না কেন, সমস্তই শ্রমণদিগকে বিতরণ করিতেন। পরে যথোপযুক্ত মূল্য দিয়া পুনরায় তাঁহাদের নিকট হইতে সেগুলি ক্রয় করিয়া লইতেন। ফাহিয়ান লিখিয়াছেন, স্থানটী এত শীতল যে শস্যাদি অতি কষ্টে পরিপক্ক হয়। কিন্তু শ্রমণগণ রীতিমত বিদায় না পাইলে ঋতু পরিবর্ত্তন হয় না—এই বিশ্বাসে যতদিন শস্য সংগ্রহ না হইত ততদিন রাজা ইঁহাদের বিদায় দিতেন না। এই স্থানের বৌদ্ধ সন্ন্যাসিগণ উপাসনার সময় প্রার্থনাচক্র (Praying wheels) ব্যবহার করিতেন।

প্রত্যেক প্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন ভাষা প্রচলিত কিন্তু ধর্ম্মগ্রন্থ মাত্রই সংস্কৃতে লিখিত হইত। এই ভাষা প্রত্যেক মঠে পঠিত ও অধীত হইত। বৈদেশিকগণ বিশেষ সমাদরের সহিত এই সকল মঠে গৃহীত হইতেন এবং তিন দিন পর্য্যন্ত মঠাধ্যক্ষগণ বিশেষ সমাদরে অতিথির পরিচর্য্যা করিয়া পরে বিদায় দিতেন। বুদ্ধের স্মৃতিসংক্রান্ত সমস্ত স্থলে ফাহিয়ান ভ্রমণ করেন। পূর্ব্বাঞ্চলে (মগধে) আসিয়া তিনি শাক্যসিংহের ভিক্ষাপাত্র দেখিতে পান।

যুথির রাজা এই ভিক্ষাপাত্র চুরী করিতে অভিলাষী হইয়া ইহাকে স্থানচ্যুত করিতে পারেন নাই। পরে একটী হস্তীর উপর ইহা উঠাইয়া দেন, কিন্তু মাহুতের সহস্র চেষ্টাতেও হস্তী স্থান ত্যাগ করিল না। রাজা তখন ভিক্ষাপাত্রটি রথে করিয়া নিজ রাজধানীতে লইবার আদেশ দিলেন কিন্তু রাজার দুর্ভাগ্য কি সৌভাগ্যবশতঃ রথও স্বস্থান পরিত্যাগ করিল না। রাজা এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া সেই স্থানে এক মঠ নির্ম্মাণ করিয়া নিজে সন্ন্যাসী হইলেন। এই স্থানে সাতশত সাধুপুরুষ বাস করিতেন। প্রত্যহ দ্বিপ্রহরের কিছু পূর্ব্বে ইঁহারা শ্বেতবস্ত্র পরিধান করিয়া ভিক্ষাপাত্রকে পূজা করিতেন, এবং ইহার সম্মুখে গন্ধদ্রব্যাদি রাখিতেন। পরে সন্ধ্যাসমাগমে ইহাকে স্বস্থানে রাখিয়া দিতেন।

অন্য একটি নগরে ফাহিয়ান বুদ্ধের করোটীর কথা উল্লেখ করিয়াছেন। যে মন্দিরে এই মূল্যবান স্মরণচিহ্ন থাকিত, তথায় রাজার আট জন মন্ত্রী প্রহরীরূপে মন্দির রক্ষা করিতেন এবং প্রত্যহ প্রত্যেকেই ইহার দ্বারদেশে নিজ নিজ সই মোহর করিতেন। প্রত্যহ প্রাতে এই করোটী সিংহাসনের উপর স্থাপিত হইত এবং সপারিষদ রাজা এখানে আসিয়া পুষ্প ও গন্ধদ্রব্যদ্বারা পূজা করিতেন। পুরোহিতেরা পূজার সময় শঙ্খ ও দামামা ধ্বনি করিতেন। বিহারে হস্তীরা শুণ্ডে করিয়া জল লইয়া মন্দিরের কার্য্যে সাহায্য করিত।

নাগরাজ্যে একটী ক্ষুদ্র সর্পছিল—তাহার কর্ণমূল শ্বেত। ইহাকে প্রত্যহ আহারাদি দানে রীতিমত পূজা করা হইত। ইহারই সন্নিকটে একটি অদ্ভুত কুঞ্জ ছিল। প্রবাদ এই যে পাঁচ শত অন্ধ মনুষ্য পূর্ব্বে এই স্থানে বাস করিত। বুদ্ধদেবের প্রার্থনায় একদিন ইহারা দৃষ্টিশক্তি লাভ করে। প্রত্যেকে প্রত্যেকের যষ্টি মৃত্তিকায় প্রোথিত করিয়া নিকটবর্ত্তী মন্দিরের দিকে চাহিয়া প্রণত মস্তক হইবার পর ফিরিয়া দেখে যে যষ্টিগুলি বৃক্ষে পরিণত হইয়াছে। মধ্যাহ্ন ভোজনের পর ভক্তগণ এই বনে সমবেত হইয়া উপাসনাদি করিতেন।

মগধে পৌঁছিয়া ফাহিয়ান দেখিতে পান যে বৌদ্ধধর্ম্মকে সকলেই অত্যন্ত ভক্তির চক্ষে দেখেন। রাজা এবং জমিদারবর্গ যতিগণকে ভূমি, বাটী, উদ্যান, পশু প্রভৃতি যথেষ্ট দান করেন। যতিগণ তাঁহাদের নিজ নিজ ধর্ম্ম-কর্ম্মে এবং অধ্যয়নেই ব্যাপৃত থাকিতেন। বিদ্যালয়গুলি দেখিতে অত্যন্ত সুন্দর এবং পৃথিবীর সর্ব্বস্থান হইতে এখানে সকলে অধ্যয়নার্থ আগমন করে। পুরোহিতদিগকে দেখিলে অন্য লোক দূরে থাকুক, রাজা পর্য্যন্ত নিজ শিরস্ত্রাণ উন্মোচন করিয়া সম্মান প্রদর্শন করেন এবং নিজ হস্তে শ্রমণদিগকে ভোজন করান। দেশের লোক চিত্র ও ভাস্কর বিদ্যায় অত্যন্ত পারদর্শী। উৎসবকালে ব্যায়াম ও নাট্যাভিনয় হইত। ফাহিয়ান একটী স্তম্ভে নিম্নলিখিত খোদিত লিপি দেখিতে পান "রাজা অশোক পৃথিবীর সকল সাধু ব্যক্তিকেই প্রচুর অর্থ দেন। তিন বার তিনি পৃথিবীর মূল্য দান করেন *।"

* এ প্রকার দানের কথা আমাদের দেশে অনেক পাওয়া যায়। দ্বাত্রিংশৎপুত্তলিকাতে দেখা যায় যে বিক্রমাদিত্য এক লক্ষ মুদ্রা দান করিয়াছিলেন।

ফাহিয়ান মগধে থাকিয়া গঙ্গাগর্ভে নৌকা চড়িয়া তমলুক হইয়া লঙ্কায় যান। লঙ্কায় তখন বৌদ্ধ ধর্ম্মের যথেষ্ট আদর সত্ত্বেও সে স্থানে প্রতিমূর্ত্তিপূজাও প্রচলিত ছিল। লঙ্কায় বুদ্ধদেবের দন্তোৎসব হইত †। উৎসবের দশ দিন পূর্ব্বে তত্রত্য রাজা একটী সুন্দর হস্তী মনোনীত করিলে, পুরোহিত রাজবেশ পরিধান করিয়া দুন্দুভি ধ্বনি সহকারে বুদ্ধদেবের এইরূপ প্রশংসা কীর্ত্তন করিতেন—"তিনি তাঁহার পত্নীকে ত্যাগ করিয়া ছিলেন; তিনি অপরকে দান করিবার জন্য নিজের চক্ষু উৎপাটিত করিয়া ছিলেন; কপোতকে রক্ষা করিবার জন্য নিজ শরীর হইতে মাংস দান করিয়া ছিলেন; ক্ষুধার্ত্ত ব্যাঘ্রকে নিজ শরীর দান এবং নিজের শরীরের অস্থি পর্য্যন্ত পশুপক্ষীর হিতার্থ ব্যয় করিয়া ছিলেন। এমনি করিয়া তিনি বুদ্ধ হইয়াছিলেন।" দশ দিন পরে দন্তটীকে মেহেনটলীতে বহন করিয়া লওয়া হয় এবং ঐ সময়ে পথের চতুর্দ্দিকে বুদ্ধের নানা প্রকার অবতারের মূর্ত্তি স্থাপিত হয়। এই সমস্ত অবতারের মধ্যে "বিদ্যুৎ", "হস্তীরাজ", "অত্যাশ্চর্য্য ঘোটক" প্রভৃতিই দেখিতে সুন্দর। মেহেনটলী পৌঁছিলে নানারূপ অনুষ্ঠানে নব্বই দিন দন্ত পূজা হয়।

পঞ্চম শতাব্দীর প্রথমভাগে যখন ফাহিয়ান এ দেশে আইসেন তখন গুপ্ত বংশীয়েরা উত্তর ভারতের রাজা ছিলেন। মানচিত্রে...... এইরূপ চিহ্নিত স্থান গুপ্ত রাজগণের অধিকারে ছিল। তাঁহাদের রাজত্বের সীমা সাধারণতঃ পশ্চিমে চম্বল এবং যমুনা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ‡ উত্তরে হিমাচল এবং দক্ষিণে নর্ম্মদা সীমান্ত প্রদেশ রক্ষা করিত। এতদ্ব্যতীত আসাম, রাজপুতানা, মালবদেশ তাঁহাদের অধীনতা স্বীকার করিত। গান্ধার ও কাবুলের নরপতিগণের সহিত ইঁহাদের সখ্যতাবন্ধন ছিল। এমন কি অক্সাস্ তীরবর্ত্তী রাজগণও তাঁহাদের বন্ধু বলিয়া স্বীকার করিয়া গৌরবান্বিত বোধ করিতেন।

অধ্যাপক শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার।

সাময়িক সংগ্রহ।

হাইকোর্টে হত্যা।—আমরা আশা করিতেছিলাম—বঙ্গদেশে হত্যা বুঝি বন্ধ হইল। কিন্তু গভীর পরিতাপের বিষয় যে আবার গত ২৪শে জানুয়ারী তারিখে ডেপুটী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট খাঁ বাহাদুর সামসুল আলমকে একটী বিংশবর্ষীয় যুবক পিস্তলদ্বারা নিশৃংস ভাবে হত্যা করিয়াছে। মৃত সামসুল আলম ১৯০৮ সনের মে মাস হইতে স্বনামখ্যাত আলিপুরের বোমার মামলার তদ্বির করিয়া আসিতেছিলেন। মোকর্দ্দমা শুনানী হইবার পর খাঁ বাহাদুর যখন হাইকোর্টের সিঁড়ি দিয়া নামিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন তখনই এই হত্যাকাণ্ড হইয়াছে। হত্যাকারী কয়েক মিনিট পরেই ধরা পড়িয়াছে।

---

† বর্ত্তমানেও সিংহলে এই উৎসব সম্পাদিত হয়।

‡ এই ম্যাপ প্রণয়নে হাজারীবাগ কলেজের প্রথম বার্ষিক শ্রেণীস্থ আমার ছাত্র শ্রীমান বিনয়ভূষণ মজুমদারের নিকট আমি বিশেষ কৃতজ্ঞ।

হত্যাকারীর নাম বীরেন্দ্রনাথ দত্তগুপ্ত, ইহার বাড়ী বিক্রমপুরে। বীরেন্দ্র জলপাইগুড়ির স্কুলে কিছুদিন অধ্যয়ন করিয়া, তাহার জেষ্ঠভ্রাতা ধীরেন্দ্রনাথের নিকট কলিকাতায় বাস করিতেছিল। আর্ত্তের প্রতি যত্ন বীরেন্দ্রের একটী মহৎ গুণ ছিল। জানিনা কোন প্রতিহিংসা সাধনে সামসুল আলমকে হত্যা করিয়াছে। সামসুল তাহার কর্ত্তব্য কার্য্য সাধন করিতেছিলেন মাত্র।

গত সংখ্যার ভারতীতে বলিয়াছি, আমরা যে সার্ব্বজনীন উন্নতির জন্ম বদ্ধপরিকর তাহা বোমায় বা পিস্তলে সাধিত হইবার নহে, তাহা কৃষিশিল্পের উন্নতির উপরেই নির্ভর করে। স্বাবলম্বন শিক্ষা করা সকলেরই উচিত কিন্তু এরূপ কার্য্য স্বাবলম্বন নহে, ইহা নৃশংস অত্যাচার; কাপুরুষতা। ইহাতে কখনই কল্যাণসাধন হইতে পারে না—ইহাতে আমাদের অধোগতিই অবশ্যম্ভাবী। কি করিয়া এ কথা তাহাদিগকে বুঝাইব জানি না। এ সম্বন্ধে বেঙ্গলি ও অমৃতবাজার পত্রিকা যাহা বলিয়াছেন—নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

বেঙ্গলি—"যে সকল অপরিপক্কচরিত্র ব্যক্তি এই সকল অত্যাচার ও হত্যা করিতেছে, তাহাদের কর্ম্মের ফলে দেশের যে কতদূর অকল্যাণ সাধিত হইতেছে, তাহা তাহারা কিছুই বুঝে না।"

পত্রিকা—"এই ভীষণ হত্যা হইতে আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে পৈশাচিক ষড়যন্ত্রীগণ দেশের শান্তিভঙ্গ করিতে বদ্ধপরিকর। হায়! কি প্রকারে তাহাদিগকে বুঝাইব যে তাহাদিগের এ পৈশাচিক কর্ম্মের ফলে দেশে যে দুঃখস্রোত বহিতেছে, তাহার আঘাত সহ্য করা দেশবাসীর সাধ্যাতীত।" ভগবান তাহাদিগকে শুভবুদ্ধি প্রদান করুন ইহাই আমাদিগের একান্ত প্রার্থনা।

ফাঁসির দণ্ডাজ্ঞার পর বীরেন্দ্র কচুরী রসগোল্লা সন্দেশ প্রভৃতি খাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করে।

শিল্পবৃত্তি—আমরা শুনিয়া বিশেষ সন্তুষ্ট হইলাম যে গবর্ণমেণ্ট প্রত্যেক বিভাগ হইতে শিল্প শিক্ষার জন্ম বৃত্তি দিয়া ভারতবর্ষীয় ছাত্রদিগকে ইউরোপে প্রেরণ করিবেন। বৃত্তিভুক্ত ছাত্রের নির্ব্বাচন গবর্ণমেণ্টই করিবেন এবং নিম্নলিখিত বিষয়গুলি পরীক্ষার উপর নির্ব্বাচন নির্ভর করিবে। ১। ইংলণ্ড অথবা ইউরোপের যে দেশে ছাত্রটী প্রেরিত হইবে সেই দেশের ভাষা ছাত্রটী জানে কিনা? ২। গবর্ণমেণ্ট-নির্দ্দিষ্ট শিক্ষায় এবং শিল্পকার্য্যে প্রার্থিগণের সহানুভূতি আছে কিনা এবং দেশে ফিরিয়া তাঁহারা ঐ সমস্ত কার্য্যে লিপ্ত থাকিবেন কিনা। ৩। নির্ব্বাচিত হইবার পূর্ব্বে তাঁহারা ভারতবর্ষে যতটুকু শিল্প শিক্ষা সম্ভব তাহাতে শিক্ষিত হইয়াছেন কিনা ইত্যাদি।

এই কার্য্যের জন্ম গবর্ণমেণ্ট আমাদের ধন্যবাদ ভাজন সন্দেহ নাই। যখন ডিউক অব আরগাইল (Duke of Argyll) সেক্রেটারী অব ষ্টেট ছিলেন তখন এই প্রকার বৃত্তিপ্রথা প্রচলন করা হয়; কিন্তু দুঃখের বিষয় কিছুদিন পরেই এ বৃত্তি আবার বন্ধ হইয়া যায়। আশা করি এবার বৃত্তিগুলি চিরস্থায়ী হইবে। বঙ্গদেশ হইতে যে ছাত্রটী বৃত্তি পাইবেন তাঁহাকে তন্তুশিল্প শিক্ষা করিতে হইবে। আমরা আরও সুখী হইলাম যে গবর্ণমেণ্টের মতে সাধারণতঃ বৃত্তিভুক্ ছাত্রের প্রথমে তাঁহার স্বদেশের শ্রেষ্ঠ শিল্পবিদ্যা শিক্ষা করা আবশ্যক। অতএব আশাকরি বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষাপরিষৎ সংক্রান্ত এবং বেঙ্গল টেকনিকাল ইনষ্টিটিউটের শিল্প বিভাগে শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের দাবীই গভর্ণমেণ্ট সর্ব্বাগ্রে গ্রাহ্য করিবেন।

হিন্দুবিবাহ সংস্কারসমিতি। শ্রীযুক্ত রায় নরেন্দ্রনাথ সেন বাহাদুর মহাশয়ের সভাপতিত্বে এবং অনেকগুলি শিক্ষিত ও গণ্যমান্য ব্যক্তির উপস্থিতিতে গত ২৯শে ডিসেম্বর উক্ত সভা স্থাপিত হইয়াছে। বালক বালিকাদিগের বিবাহের বয়স বাড়ান এবং বালিকাগণের শিক্ষা পরিসর বৃদ্ধি ব্যবস্থাই এই সভার উদ্দেশ্য। এই সভা আহূত হইবার পূর্ব্বে মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ও শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয় প্রায় দুই শত শিক্ষিত ব্যক্তির নিকট তাঁহাদের অভিমত প্রকাশের জন্ম অনুরোধ পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন। সুখের বিষয় অনেকেই এই সমীচীন প্রস্তাব অনুমোদিত করিয়া পাঠাইয়াছিলেন।

বাল্যবিবাহ যে আমাদের দেশের পক্ষে কতদূর ক্ষতিকারক নিম্নলিখিত তালিকা তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ।

সমগ্র ভারতবর্ষের কথা ছাড়িয়া কেবল বঙ্গদেশের কথাই ধরুন।

০-১	৪৩৩
১-২	৫৭৬
২-৩	৬৫২
৩-৪	১৭৫৬
৪-৫	৩৮৬১
৫-১০	৩৪৭০৪
১০-১৫	৭৫,৫৯০
১৫-২০	১৪২,৮৭১

অর্থাৎ এক বঙ্গদেশেই আড়াই লক্ষেরও ঊর্দ্ধ সংখ্যক বালিকাগণ এক বৎসরহইতে বিশ বৎসর বয়সে নিজ পিতামাতা ও সমাজের অবিমৃষ্যকারিতার ফলস্বরূপ অকালে বৈধব্যদশা প্রাপ্ত হইয়াছে। অথচ আমরা বদ্ধপরিকর হইলেই এই দুষনীয় প্রথা সমূলে উৎপাটিত করা যায়। আমরা দেখিয়া অত্যন্ত পরিতুষ্ট হইলাম যে শ্রদ্ধাস্পদ বিচারপতি মহাশয় এ কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছেন। সমাজ সংস্কার বিষয়ে তিনি অনেক ক্ষেত্রেই অগ্রণী। বিশেষতঃ তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের Vice-chancellor —আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস তাঁহার সুদৃষ্টান্ত অবলম্বন করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রবৃন্দ নিজ নিজ পরিবারে এই বাল্যবিবাহস্রোতের গতিরোধ করিবেন। উদারচেতা ডাক্তার ইন্দুমাধব মল্লিক মহাশয় এই সভার সেক্রেটারী।

ইংলণ্ডের মন্ত্রীসভার সভ্য নির্ব্বাচন ব্যয়। বিলাতের পার্লামেণ্টে উন্নতিশীল এবং রক্ষণশীল-দলের পুনঃ পুনঃ সভ্য নির্ব্বাচন চলিতেছে। এই প্রকার নির্ব্বাচনে কি প্রকার ব্যয় হয় আমরা তাহার একটি তালিকা নিম্নে প্রদান করিলাম।

সাধারণ নির্ব্বাচনে অনেক সময় ৯০০০,০০০ পর্য্যন্ত অর্থাৎ এককোটী ত্রিশ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। ইহা ছাড়া ভোটদাতাগণ এবং নির্ব্বাচনপ্রার্থীগণের নিজ নিজ ব্যয় স্বতন্ত্র। কোন এক অভিজ্ঞ লেখক বলিয়াছেন যে মোটের উপর পনর কোটী টাকা ব্যয়ে এই সুমহান যজ্ঞের আহুতি সম্পূর্ণ হয়। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে নূতন নির্ব্বাচন যাহাতে না হয় সেই জন্য প্ল্যানটার (Planter) দিগকে ত্রিশ কোটী টাকা দেওয়া হইয়াছিল। তাহা নহিলে তাঁহারা দেশটাকে উলট পালট না করিয়া ছাড়িতেন না। একবার মাত্র কেবল এক গিনি খরচে নূতন নির্ব্বাচন বন্ধ হয়। ১৮০০ সালে গমের মূল্য এত চড়িয়া যায় যে কেবলমাত্র উৎকৃষ্ট ময়দা দিয়াই রুটী প্রস্তুত হইবে না এইরূপ এক আইন বিধিবদ্ধ হয়। এই আইনের নাম হয় (ব্রাউন্ ব্রেড্ আইন)। কিন্তু ইহাতে মন্ত্রীদিগের বিরুদ্ধে দেশের লোক এত উত্তেজিত হইয়া উঠিল যে ঐ আইন বাতিল করা ভিন্ন তাঁহাদের উপায়ান্তর রহিল না। তখন কমন্স ও লর্ড সভা উভয়েই এই আইন রহিত করিয়া দস্তখতের জন্য রাজ-চিকিৎসক উইলস্ সাহেব মারফৎ এই আইনপত্র রাজার নিকট প্রেরণ করেন। যাতায়াতের গাড়ীভাড়া বাবত ডাক্তার মাত্র এক গিনি দাবী করায় সেবারকার মত এক গিনি ব্যয়েই নির্ব্বাচন স্থগিত থাকে।

লিড্স বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় শিল্পবিজ্ঞান সমিতি। গত ১৮ই ডিসেম্বর লিডস বিশ্ববিদ্যালয়ের গৃহে The Indian guild of science and Technology প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। যাহাতে শিল্পশিক্ষার সহিত বিজ্ঞানের সংযোগ আমাদের দেশে দিন দিন আরও অধিক হয় সেই উদ্দেশ্য সাধন মানসে ইংলণ্ড, স্কটলণ্ড, ও আমেরিকাবাসী ভারতীয় ছাত্রগণ কর্তৃক এই সমিতির প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। ইংলণ্ড এবং স্কটলণ্ড উভয় স্থলের বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতীয় ছাত্রগণ এবং অনেক বড় বড় বিলাতী অধ্যাপকবর্গও এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মিঃ আর এন, সেন, এম, এ সমাগত প্রতিনিধি-বর্গকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া আমাদের দেশে এই প্রকার সমিতির আবশ্যকতা বিশদরূপে বুঝাইয়া দেন এবং অবৈতনিক সম্পাদক মিঃ ভাই

কাজী এই আন্দোলনের উৎপত্তি ও উন্নতির বিষয়ে বক্তৃতা করেন। লীড্স্ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিল্প বিভাগের সভাপতি অধ্যাপক স্মিথেল সাহেব এই সভায় সভাপতির আসনে বরিত হইয়া আমাদের দেশের শিল্পের উন্নতি যে একান্ত প্রয়োজনীয় তাহা বিশদরূপে বুঝাইয়া দেন। তিনি বলেন "স্বদেশের শিল্পোন্নতির জন্য আজকাল দলে দলে যে সকল ভারতীয় যুবক পাশ্চাত্য দেশের বিভিন্ন শিক্ষাস্থলে বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য সমবেত হইতেছেন, তাঁহাদিগের বিচ্ছিন্ন চেষ্টাকে সম্বদ্ধ করিবার জন্যই এই সমিতির উৎপত্তি।" আমরা ভগবানের নিকট কায়মনোবাক্যে এই সমিতির শুভ উদ্দেশ্যের সাফল্য প্রার্থনা করি।

মোগল চিত্রনীতি।—"সম্প্রতি Nineteenth Century" নামক সংবাদ-পত্রে কলিকাতা চিত্র বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ সুচিত্রকর মিঃ পার্সি ব্রাউন মোগল চিত্রনীতি (Moghul School of painting) সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। এই প্রবন্ধে তিনি এই চিত্রশিল্পের আরম্ভ ও শেষের একটী ইতিহাস লিখিয়াছেন। ব্রাউন সাহেব বলিয়াছেন "অনেকেরই মতে, হয় পারস্য, নয় চীন হইতে ভারতবর্ষের শিল্পবিদ্যা সমূহের উৎপত্তি। অথবা মুসলমান বা আরবদেশীয় চিত্রকরের নিকট ভারতীয়েরা শিল্পশিক্ষা করিয়াছে। অনেকে বলেন, চিত্রশিল্প পারস্যে উদ্ভূত এবং মুসলমান অভিযানের সময় ভারতে আনীত। কতক পরিমাণে এই উক্তি সত্য। কিন্তু এ প্রকার উক্তিতে বোধ হয় যে পূর্ব্বে ভারতে চিত্রশিল্প ছিল না। প্রকৃত পক্ষে মুসলমান অভিযানের বহু পূর্ব্বে ভারতীয় চিত্র শিল্পের নমুনা পাওয়া যায়। বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাবের সময় ইহার যথেষ্ট বিস্তার দেখা যায় এবং তৎকালীন চিত্রশিল্পকে বৌদ্ধ শিল্প (Buddhist School) বলা হয়। অজন্তা চিত্র দেখিলে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে তখনও চিত্রশিল্পে ভারতবর্ষীয়েরা অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছিলেন।"

প্রমাণস্বরূপ ইহাও বলা যাইতে পারে যে তখন আসিয়ার বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী সকল দেশই ভারতবর্ষীয় কর্তৃক চিত্রিত বুদ্ধের জীবনী-ঘটনাবলীর চিত্র সমূহের জন্য আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করিত। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে চীন ভারতবর্ষে চিত্রশিল্পের উৎকর্ষ দেখিয়া ভারতীয় চিত্রশিল্প তথায় লইয়া যাইবার চেষ্টা করিয়াছিল। অজন্তা চিত্রাবলীর সহিত চীনের অনেক চিত্রের গভীর সাদৃশ্য দেখা যায়। তারপরও আমরা দেখিতে পাই যে বৈদেশিক মুসলমান চিত্রকরগণ ও হিন্দুচিত্রকরগণ এক সঙ্গে চিত্রশিল্পে নিযুক্ত। এই বৈদেশিকগণ সিরাজ তাব্রিজ প্রভৃতি নগরী হইতে মুসলমান আক্রমণকারিগণের সহিত এই দেশে আসেন। হিন্দুগণ মুসলমান প্রচলিত চিত্রশিল্প শিক্ষা করেন। আকবরের রাজত্বের সময় মুসলমান রাজত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হয় এবং আকবর দেশীয় শিল্পের উন্নতির জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন। তন্মধ্যে চিত্রশিল্পের প্রতিই তিনি অধিকতর মনোযোগী ছিলেন এবং তাঁহারই উদ্যমে মোগল চিত্রনীতির প্রতিষ্ঠা হয়। সাহাজাহানের সময়ই ইহা উন্নতিমার্গে আরোহণ করিয়াছিল এবং মুসলমান রাজত্বের অপমানের সহিত ইহারও দীপ্তি নির্ব্বাপিত হইয়া গিয়াছিল। দিল্লিতে যেমন এখনও সেই পুরাকালের বাদশাহদিগের বংশধর আছেন, হস্তীদন্তোপরি চিত্রেও সেইরূপ সেই চিত্রশিল্পের অবশেষ আছে। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই আমাদের সেই পূর্ব্ব গৌরব ও তৎসহ শেষ অবনতি মাত্রই দেখাইয়া দেয়।

শ্রীযোঃ

জীবনের চতুর্দ্দশটি ভুল।—লণ্ডন বিচারালয়ের বিচারপতি রেণ্টুল (Rentoul) সাহেব এক বক্তৃতা উপলক্ষে নিম্নলিখিত জীবনের চতুর্দ্দশটি মহাভ্রমের উল্লেখ করেন।

(১) নিজের ধারণানুযায়ী ন্যায় অন্যায়ের আদর্শ স্থির করিয়া, সকলেই সেই আদর্শের সমর্থন করিবে এইরূপ আশা করা।

(২) নিজের আনন্দের মাত্রায় হিসাবে অন্যের আনন্দ মাত্রার হিসাব করা।

(৩) জগতে সকলেই একমত হইবে এরূপ আশা করা।

(৪) বালক ও যুবার মধ্যে বিচার শক্তি এবং অভিজ্ঞতার আশা করা।

(৫) সকলের স্বভাবকে এক রকম করিয়া গঠিত করিবার চেষ্টা করা।

(৬) সামান্য বিষয়ে আপনার পরাজয় স্বীকার না করা।

(৭) নিজেদের কর্ম্ম পরিপূর্ণ নির্দ্দোষ দেখিবার ইচ্ছা।

(৮) যাহা সংশোধিত করিবার উপায় নাই সেই বিষয় লইয়া আপনাকে ও অপরকে বিরক্ত করা।

(৯) সক্ষম স্থলে দুঃখ বা অধঃপতন দেখিলে দূর করিবার চেষ্টা না করা।

(১০) অপরের দুর্ব্বলতাকে ক্ষমা করিবার অশক্তি।

(১১) নিজে যাহা করিতে পারি না তাহাই অসম্ভব বলিয়া মনে করা।

(১২) আমাদের সীমাবদ্ধ মন যাহা ধারণা করিতে সক্ষম কেবল তাহাই সত্য বলিয়া বিশ্বাস করা।

(১৩) এরূপভাবে জীবন অতিবাহিত করা যেন জীবনের প্রতি মুহূর্ত্ত, কাল ও দিন অনন্তকাল স্থায়ী হইবে।

(১৪) গুপ্ত গুণগুলিকে উপেক্ষা করিয়া বাহিরের গুণের হিসাবে লোকের মূল্য নিরূপণ করা।

তাঁহার বক্তৃতার উপমা স্বরূপ তিনি নিম্নলিখিত ঘটনাগুলির উল্লেখ করেন। এক সময়ে এক ধর্ম্ম যাজক একটী বিবাহোদ্যতা কুমারীকে বলিয়াছিলেন—"বিবাহ করাটা বড়ই দুরূহ ব্যাপার।" কুমারী উত্তর করিল "হাঁ সত্য, কিন্তু বিবাহ না করাটা আরও অধিক দুরূহ ব্যাপার।"

একজন ভোটপ্রার্থী ভোটদাতার নিকট উপস্থিত হইলে, ভোটদাতা বলিয়া উঠিলেন "আমি স্বয়ং সয়তানকে ভোট দিব, কিন্তু আপনাকে দিব না।" ভোট প্রার্থী উত্তরে বলিলেন—"তা আপনার তিনি যদি ভোট লইবার জন্য উপস্থিত না হন, তাহা হইলে আমাকে দিবেন ত?"

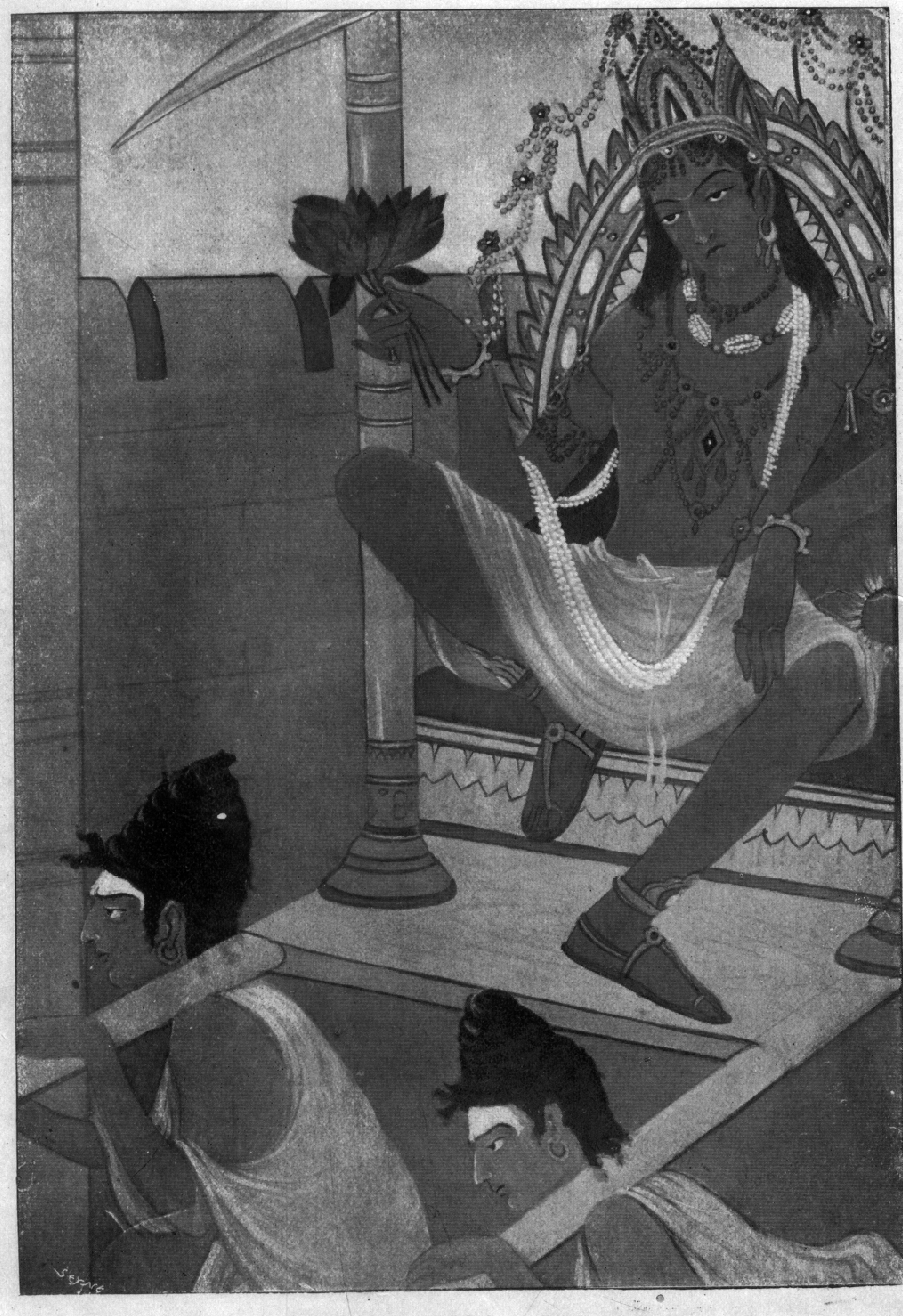
এক ক্লাবে কয়েকটি বন্ধু অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত আনন্দ করিতেছিলেন, এমন সময়ে দ্বাররক্ষক আসিয়া সম্বাদ দিল "বাহিরে একটি মহিলা আসিয়া তাঁহার স্বামীর সন্ধান লইতেছে, তাঁহার নাকি শীঘ্রই বাটী ফিরিবার কথা ছিল।" এই কথা শুনিবামাত্র সকলেই আসন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া বলিলেন "সভাপতি মহাশয় যদি অনুমতি করেন ত এক মিনিটের জন্য আমি একবার বাহিরে যাই।"

এক গৃহস্থের পত্নী দোকানের হিসাবের মধ্যে 'ঐ' অক্ষরটির কোন অর্থ আবিষ্কার করিতে না পারায় তাঁহার স্বামী তৎক্ষণাৎ সেই দোকানে যাইয়া তাহার অর্থ জিজ্ঞাসা করেন। গৃহে ফিরিয়া তিনি পত্নীকে বলিলেন ও অক্ষরটির অর্থ আমি একটি আস্ত নির্ব্বোধ এবং তুমিও 'ঐ'।

মনুষ্য দেহের আভা।—আধুনিক অনেক বৈজ্ঞানিকের মতে মনুষ্য দেহ হইতে নানাপ্রকার আলোকরশ্মি নির্গত হয়। আধ্যাত্মিক অবস্থা অনুসারে সেই আলোকরশ্মির বর্ণ ও উজ্জ্বলতার বিভিন্নতা দেখা যায়। আজকাল পাশ্চাত্যদেশে অনেকে এই আভার ফটোগ্রাফ পর্য্যন্ত তুলিতেছেন। তাঁহারা ইহাও আবিষ্কার করিতেছেন যে একজনের দেহ হইতে নিঃসৃত এই আলোকরশ্মি অপর দেহের নানাবিধ রোগ অপনোদনে সক্ষম, রোগীর অঙ্গে হস্ত বুলাইলেই সেই আলোক রশ্মি তাহার দেহে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাকে সুস্থ করে। এ আবিষ্ক্রিয়া ভারতের পক্ষে নূতন নহে। ভারতের ঋষি তপস্বীগণ এই অজ্ঞাত শক্তির পরিচয় দিতেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ তপঃভ্রষ্ট ভারতবাসী আজ সে শক্তি হইতে বঞ্চিত হইয়াছে।

শ্রীসুঃ

কলিকাতা, ২০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত ও ৪৪, ওল্ড বালিগঞ্জ রোড হইতে শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।



রাজা নহুষের পতন

সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় অঙ্কিত চিত্র হইতে

ভারতী।

৩৩শ বর্ষ]　　　　চৈত্র, ১৩১৬　　　　[১২শ সংখ্যা।

ঊষা।

প্রকৃতির কাব্যকুঞ্জে কুসুমচারিণী—
অনবদ্য লক্ষ্মীরূপে অয়ি ঊষারাণি—
তুমি দেখা দিয়াছিলে প্রথম প্রভাতে
সন্তস্নাতঃ দিব্য বেশে; স্বর্ণপাত্র হাতে
সাজায়ে পূজার অর্ঘ্য। শিশিরাক্ত জলে
ধরণীর তপ্ত বক্ষ সিক্ত করি দিয়া—
মাতৃস্তন্য সুধা সম। পাখী জাগি উঠি
গাহিল বিভুর নাম। পরিমল মাখি
স্নিগ্ধ বায়ু বিশ্বজনে দিল নব প্রাণ।
তপোবনে ঝঙ্কারিল পুণ্য বেদ গান
ঋষিবালকের কণ্ঠে। অয়ি আদি মাতা—
বিশ্বজগতের তুমি প্রথম বন্দিতা!
যুগযুগান্তর হতে চির-মৌন-মুখে—
সম-অচঞ্চলা রহ শোক দুঃখ সুখে।
তবু তব দরশনে—পরশনে তব
মানবের মনে জাগে শান্তি অভিনব!

শ্রীইন্দিরা দেবী।

পোষ্যপুত্র। (পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(২১)

"নূতন গিন্নি? তিনি আবার কে? আমি তো নিজেকেই বাড়ির একমেবাদ্বিতীয়ং বলেই জানি'।

"নূতন গিন্নি—অর্থাৎ কিনা কর্ত্তার বড় বধূ, বিনোদবাবুর স্ত্রী। তাঁকে কেমন দেখলে? নেহাৎই নাকি হাবাতে ঘরের মেয়ে? আবার তার মা নাকি খুব জাহাঁবাজ মেয়ে মানুষ? বৌ বলছিল এরি মধ্যে যেন সব তারি চিরকালের অধিকার করা ঘর বাড়ি এমনি করে চারিদিকে বেড়াচ্ছে। কে জানে তোমাদের সঙ্গে কেমন বনিবনাও হবে, টবে? ছেলেটি কিন্তু দিব্যি চাঁদের মতন, দেখলে মায়া হয়। বড় গিন্নি লোক কেমন?"

"বিনো-দার স্ত্রী!" শয্যাশায়িত হেমেন্দ্র চমকিয়া উঠিয়া বসিল, বিস্ময়ে দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিল "এ আবার কি অ্যাক্ট করা হচ্চে? এসব তামাসা যে শুনলেও আতঙ্ক হয়!"

উপেনও বিস্মিত হইল "তামাসা! তুমি কি নিজের বাড়ির কিছুই খপর রাখো না নাকি? এতো বড় কাণ্ডটার কোন সংবাদই পাও নাই? অথচ পাড়ায় পাড়ায় আজকাল তো এই কথা নিয়েই তুমুল আন্দোলন চলছে, এর মাঝখানে তোমার এত সাধের থিয়েটার কোথায় চাপা পড়ে গিয়েছে। কিন্তু হেম!

মতি বিবির গলাটি কি মিষ্টি! মন যেন কেড়ে নেয়।” আহা প্রাণ দিয়ে সই প্রাণের ছবি যত্নে এঁকেছ”কি সুন্দর গাইলে।”

হেমের মাথার ভিতরে তখন অভিনয়ের দৃশ্যপটটার উপর একখানা তীব্র ঈর্ষার ড্রপসীন্ পড়িয়া গিয়াছে, সে উপেনের শেষ কথাগুলায় পূর্ব্বের মত তদ্গদ হইয়া উঠিল না। অধৈর্য্য স্বরে বলিল “বিনো-দার আবার স্ত্রী পুত্র কোথা থেকে এসে উপস্থিত হলো! তোমার এসব হেঁয়ালীর ছন্দ আমি কিছুই বুঝতে পারছি না একটু স্পষ্ট করে বলো দেখি যাতে বোধগম্য হয়।”

“এর চেয়ে আবার স্পষ্টাস্পষ্টি কি আছে? বিনোদবাবু বৃন্দাবনে এক অনাথা বালিকাকে বিয়ে করেছিলেন, সে এতো কাল পরে তার শ্বশুরের সন্ধান পেয়ে ছেলে ও মা সঙ্গে করে এসে উপস্থিত হয়েছে এতে অস্পষ্ট কোন-খানটায় বোধ করচো?”

হেমেন্দ্রের নিদ্রাটা তাহার মুদিতপ্রায় চোখ দুইটাকে ছাড়িয়া কোথায় চলিয়া গেল তাহা সে জানিতেও পারিল না; আজিকার মতই গেল কি কতদিনের জন্য গেল, তাহাই বা কে বলিতে পারে! এমন সময় বাহিরে চটি জুতার শব্দ শুনিতে পাওয়া গেল, দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া যোগেশ ডাকিয়া বলিল “কি হে ভিতরে যেতে পারি? জেগে না ঘুমিয়ে?”

হেমেন্দ্র উত্তর দিবার পূর্ব্বেই উপেন তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল “বন্ধুদের জন্য দ্বার অবারিত। তুমি স্বচ্ছন্দে আসতে পারো।”

যোগেশ প্রবেশ করিয়া হেমেন্দ্রের হঠাৎ গাম্ভীর্য্যের কোন কারণ না পাইয়া প্রশ্নপূর্ণ দৃষ্টিতে উপেনের দিকে চাহিল।

“যোগেশ! তুমি বিনোদবাবুর ছেলেটিকে দেখলে? হেমবাবু এখনও দেখেননি—তিনি—

একটা কেদারা হেমেন্দ্রের সোফাটার নিকট টানিয়া আনিতে আনিতে মৃদু হাসিয়া যোগেশ বলিল “বিনোদবাবুর ছেলে কি কার ছেলে তা জানে কে? কর্ত্তা যেমন ক্ষেপে উঠেছেন তাতে তুমি আমিও যদি বিনোদ নাম নিয়ে দাঁড়াই তাহলেও হয়তো তিনি তা বিশ্বাস করে কাছে টেনে নেন।”

উপেন ও হেমেন্দ্র উভয়েই যোগেশের কথায় সহসা চমকিয়া উঠিল। উপেন বলিল “কি বলো যোগেশ! কর্ত্তা মশাই নাকি বিশেষ প্রমাণ প্রয়োগ না নিয়ে বউ ঘরে এনে-ছেন? হেমের জ্যেঠাইমার আংটি ও ফ’টো ওঁদের কাছে পাওয়া গিয়েছে।

যোগেশ অবিশ্বাসের মৃদু হাসি হাসিল, “মস্ত প্রমাণ! ও বিনোদের স্ত্রী কি না তা আমি বলতে পারি না সেটা বরং হলেও হতে পারে; কিন্তু ও ছেলে যে বিনোদবাবুর নয় তা আমি হলফ করে বলতে রাজি আছি। ও ছেলে সে চলে যাবার পরে হয়! ছেলের মা ভাল মেয়ে হলে বিনোদবাবু কখনো শুধু শুধু স্ত্রী ত্যাগ করে চলে যায়? সে তেমনি পাষণ্ড ছিল কিনা!

“আহা যোগেশ! তুমি ভুলে যাচ্চো নাকি যে, সে তার বাপকে ছেড়ে চলে গ্যাছে। বাপের চেয়ে স্ত্রী কি বড় হলো? যে পিতৃ স্নেহ ত্যাগ করতে পারে সে এটা পারবে না?”

“ভুলিনি হে ভুলিনি। কিন্তু তোমার এ আরগু-

মেণ্টটা যে ঠিক পুলিশের মতন দেখছি, পুলিশ যেখানেই কেন চুরি হোকটা সে তার কয়েদ-খালাসী দাগী চোরকে ধরবেই। বিনোদবাবু বাপের উপর রাগ করে গিয়েছেন তবে আর কি তিনি স্ত্রীও ত্যাগ করেছেন। হা হা হা!”

হেমেন্দ্রের মুখটা অসাধারণ বিবর্ণ হইয়া আসিয়াছিল, সে তাহার কম্পিত বক্ষে হস্ত বদ্ধ করিয়া স্থির কর্ণে যোগেশের কথার প্রত্যেক বর্ণ টি পর্য্যন্ত যেন পেটুকের মতন গিলিতেছিল। মানুষ কুপরামর্শ টি যেমন মনঃসংযোগপূর্ব্বক শুনিতে পারে সুপরামর্শ টি তেমন পারে না।

অতুল ঐশ্বর্য্য অপর্য্যাপ্ত সম্মান, স্নেহ যত্ন সেবা কিছুরি হেমেন্দ্রের অভাব ছিল না। সংসার এখন তাহার নেত্রে অপূর্ব্ব সুখজাল রচনা করিতেছিল; সহসা বিনা মেঘে একি বজ্রপাত! ভোজবিদ্যাবলে যেমন রাজ-প্রাসাদ অরণ্যে আবার অরণ্য রাজপ্রাসাদে পরিণত হয় হেমেন্দ্রের ভাগ্যে যেন তাহাই ঘটিল। গরীব হেম তাহার দরিদ্র গৃহে তাহার ক্ষুদ্র পাঠাগারে মলিন জীর্ণ পুস্তক রাশি বেষ্টিত হইয়া কঠোর অধ্যয়নে জীবনের উচ্চাকাঙ্ক্ষা ডুবাইয়া দিয়া নিজেকে ঐশ্বর্য্যময়ী জগৎ হইতে পৃথক করিয়া রাখিয়াছিল। সেত স্বপ্নেও এই ইন্দ্রপুরীর ইন্দ্রত্ব পদ কখনো কামনাও করে নাই। সে তো অতি শৈশবে ব্যতীত আর কখনো এই লক্ষ্মীপুর প্রাসাদে পদার্পণও করে নাই। তবে কেন তাহাকে তাহার অভ্যস্থ পথ হইতে টানিয়া আনিয়া দুদিনের জন্য ঐশ্বর্য্যের সর্ব্বোচ্চ পদে আরোহণ করাইয়া দিয়া আবার মুহূর্ত্তে এই গভীর অন্ধকার দারিদ্র্যে নিক্ষেপ! এ যে আরব্য রজনীর অলৌকিক ভাগ্য বিপর্য্যয় কাহিনী!

তখন সন্ধ্যা অতিবাহিত হইয়াছে, বাড়ী ভিতর যাইবে বলিয়া সে বন্ধুবান্ধবকে বিদায় দিল। ঘরে আলোকাধারে উজ্জ্বল আলো জ্বলিতেছিল, টানাপাখা চলিতেছিল, ক্ষুদ্র ত্রিপদীর উপরস্থ রৌপ্য আধার হইতে তাজা ফুলের গন্ধ আসিতেছিল। মর্ম্মর টেবিলের পাশে সবুজ ভেলভেট মণ্ডিত মেহাগ্নিচেয়ারে বসিয়া চিন্তাহীন হেমেন্দ্র আজ আকাশ পাতাল ভাবিয়া পাইতেছিল না। দেওয়ালগিরির আলো দর্পণে দর্পণে নিপতিত হইয়া ঘর আলোকময় করিয়া তুলিয়াছে, গালিচাবৃত কক্ষভূমে বহুমূল্য বিলাতি ফ্যাসানের কৌচ কেদারা, বহুমূল্য রেশমঝালর-যুক্ত সুদৃশ্য আবরণে আবৃত হইয়া গৃহের শোভা বর্দ্ধন করিতেছিল। বাতাসে দ্বারের মূল্যবান সুচিত্রিত পর্দ্দা কাঁপিতেছে দুলিতেছে; সমস্তই যেন আনন্দময়।

হেমেন্দ্র একবার সেই সব চাহিয়া দেখিল। এই সুখের মাঝখান হইতে নামিয়া তাহাকে আবার কোথায় দাঁড়াইতে হইবে। কল্পনা-নেত্রে একবার সেই গোময় মৃত্তিকা লিপ্ত ক্ষুদ্র অঙ্গন, চুনবালি খসিয়া পড়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বার জানালা বিশিষ্ট সেই অর্দ্ধ অন্ধকার গৃহ-খানি উদিত হইল। পুরাকালীন তক্তপোষের উপরে সেই যুগেরই একখানি মাদুর পাতা, এবং তাহারি উপর চারিদিকে পুস্তকরাশি ছড়াইয়া বসিয়া কঠোর অধ্যয়ন তখন অসুখ জনক ছিল না। কিন্তু এখন? হেমেন্দ্র অনেক খানি ভাবিল। শ্যামকান্ত পৌত্রকে পাইয়াছেন বলিয়া তাহাকে একেবারে বঞ্চিত করিবেন না, যথাসর্ব্বস্বের ‘মালিক’ হইয়া যেখানে সে চারিবৎসর কাটাইল সেখানকার

দাবীদাওয়া শেষ হইলেও দয়াদাক্ষিণ্যের এখনও কিছুমাত্র অভাব ঘটিবে না ইহা সে বুঝিল। বিশেষতঃ যতোটা হেমেন্দ্রের জন্য না হউক, শান্তির জন্য অবশ্যই তিনি একটা কিছু উপায় করিবেনই। হেমের ললাট কুঞ্চিত হইয়া আসিল, দয়া! যে বাড়িতে সে প্রভু ছিল সেখানেই কিনা সে একজন প্রতিপাল্য হইয়া থাকিবে?

হেমেন্দ্র গভীর একটা নিশ্বাস সহকারে ভাবিল "আচ্ছা যোগেশ তো মড় মন্দ কথাও বলে নাই? শ্যামাকান্ত নিরুদ্দিষ্ট পুত্রের নামে জ্ঞানশূন্য হইয়া যান, তাঁহাকে প্রতারণা করা কিছুই কঠিন কার্য্য নহে। কিন্তু তাই বলিয়া কোথা হইতে কে আসিয়া বলিল আমি বিনোদের স্ত্রী অমনি তাহাকে অতুল ঐশ্বর্য্য ধরিয়া দিয়া নিজে পথে গিয়া দাঁড়াইব! তাহা হইতেই পারে না! হেমেন্দ্র আর ভাবিতে না পারিয়া শান্তির উদ্দেশ্যে গমন করিল।

সুখের সময় যাহাকে ভুলিয়াছিল—দুঃখের সময় তাহাকে মনে পড়িয়া গেল। শান্তি স্বামীর এই অস্বাভাবিক গম্ভীর বিষণ্ণভাব দেখিয়া আকুল আগ্রহে জিজ্ঞাসা করিল—"কি হয়েছে? রাত জেগে অসুখ করেনি ত?" শান্তির এই ঔৎসুক্যপূর্ণ প্রশ্ন সহসা অপ্রয়োজনেও হেমেন্দ্রনাথের বক্ষে আঘাত করিল। হেমেন্দ্র আজ নূতন করিয়া অনুভব করিল এই উদ্বিগ্ন হৃদয়খানিই এখন কেবল তাহার নিজের! এখানে ইহা ভিন্ন আর কোন কিছুতেই তাহার আপনার বলিবার অধিকার নাই। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সে শয্যায় বসিল "অসুখ হয়নি শান্তি, ঈশ্বর আমাদের উপর নির্দ্দয় হয়েছেন তাই ভাবছি।"

"ঈশ্বর, আমাদের উপর যতো সদয় এমন দয়া তাঁর অল্প লোকেই পেয়েছে। তোমার কপালটা গরম হয়ে উঠেছে! কাল রাত্রে ঘুম না হওয়াতে বোধহয় শরীরটা ভাল নাই। আজ আর বাইরে যেওনা, আজ রাতটা ভাল ঘুম হলেই সব সেরে যাবে এখন।"

হেমেন্দ্র ঈষৎ বিস্মিত হইয়া শান্তির প্রশান্ত মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল। সে কি বুঝিতে পারে নাই? এ ঘটনায় তাহার মনে কি একটা আঁচড়ও লাগে নাই অথবা সে তাহার সহিত ছলনা করিতেছে? আবার একটা নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিল, "আর ঘুমিয়েছি শান্তি, ঘুমের দফা আজ থেকে শেষ। শুনছি কে একটা মাগি নাকি বিনুদার স্ত্রী সেজে—"

শান্তির সমস্ত মুখখানা ঘোর রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, সে চমকিয়া উঠিয়া লজ্জায় ক্ষোভে মর্ম্মের ভিতর মরিয়া গিয়া ধিক্কারের সহিত বলিয়া উঠিল "কি বলছো? তিনি যে অমূ'র মা, তিনি যে আমাদের দিদি, তোমার বড় ভাইয়ের স্ত্রী।"

"তিনি যে কে তার এখন ঠিকানা কি? বিনুদা এমন লোকই ছিল না—যে যেখান সেখান থেকে একটা কুড়ুনে মেয়ে বিয়ে কর্ব্বে! তার তেজ গর্ব্ব, মর্য্যাদাভিমান যে জানে সে একথা কখনই বিশ্বাস করবে না। বাবা এখন তার নামে পাগল, সেইজন্য তার নাম করে যে যা বলে তাতেই বিশ্বাস করে বসেন। তা বলে আমি কিন্তু সহজে ছাড়বো না, আমি এর বিশেষরূপে তদন্ত করবো। নিশ্চয়ই বিনুদা কোনপ্রকারে ঐ হীন স্ত্রীলোকটার কাছে পড়ে মৃত্যুকালে

ওদের আশ্রয় নিয়েছিলেন, সে তাঁর সেই আংটির জোরে জাল ওয়ারিষ সেজে এসেছে। আমি আমার অবশ্য প্রাপ্য সম্পত্তি অমনি ছাড়ছি না—"

শান্তির কম্পিত অধর ভেদ করিয়া একটা অস্ফুটধ্বনি বাহির হইয়া পড়িল। "কি সর্ব্বনাশ!" ফুটন্ত গোলাপ যেন মুহূর্ত্তে শ্বেতপদ্মে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। ভীতা শান্তি একখানা কেদারার উপর বসিয়া পড়িয়া আর্ত্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিল "এমন কথা তুলে দিদিকে তুমি অপমান করোনা, না, না এমন কাজ করোনা, তাঁর কাছে তাহলে আমি আর মুখ দেখাতে পারবো না।"

"শান্তি তুমি ভারী নির্ব্বোধ! এই রাজ-ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ করে তুমি কি আমায় সেই বাসড়ার জঙ্গলে আবার ফিরে যেতে বলো? তুমি কি চাও আমি সব ছেড়ে দিয়ে 'ভাস্করানন্দ' স্বামীর মতন সংসার ত্যাগ করে যাই বা দোরে দোরে ভিক্ষা করে বেড়াই? তোমার কি, তোমার বাপ আছে সেখানে গিয়ে দিব্য আরামে বসে থাকবে তুমি বলবে না কেন?"

শান্তির রক্তহীন মুখ বিবর্ণতর হইয়া গেল, "আমি কি তাই বল্লুম? কেন আমরা এখানে যেমন আছি তেমনি থাকবো, তাতে কেউ তো আমাদের বাধা দিতে চায় না? অমূল্য ছেলেমানুষ তুমি তার কাকা, তাকে তুমি যত্ন করে পালন করো। এ বাড়িতে আমাদের সেই পূর্ব্বের মতন সবই আছে, কেবল বেশির মধ্যে আর একটা কর্ত্তব্য।"—

"কর্ত্তব্য নিয়ে তুমি বসে থাকো, আমায় আর কর্ত্তব্যের লেক্‌চার শুনিয়ে কাজ নাই, আমার কর্ত্তব্য আমায় কর্ত্তে দাও! আমিতো তোমার মতন ক্ষেপিনি, তাই ওই জালিয়াৎ স্ত্রীলোকের তাঁবেদার হয়ে থাকবো। তা আমি কিছুতেই থাকছি না, আমি হয় এস্পার, নয় ওস্পার একটা কিছু চাই তা তুমি জেনে রাখো। দয়ার প্রত্যাশী এ চৌধুরী বংশের রক্ত নিয়ে এপর্য্যন্ত কেউ হয়নি।"

শান্তির সমস্ত শরীরের রক্ত যেন গরম জলের মতন টগবগ্ করিয়া তাহার বুকের মধ্যে একমুহূর্ত্তে ফুটিয়া উথলাইয়া উঠিতে গেল, সে দুইহাত দিয়া স্বামীর কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া ধরিয়া তাহার বক্ষের উপর লুটাইয়া পড়িয়া রুদ্ধশ্বাসে সকাতরে কহিল "আমি কখনো তোমায় কোন অনুরোধ করিনি আজ একান্ত অনুনয় করছি আমার কথা রাখো। সতীসাধ্বীকে অপমান করোনা, করলে ভগবান কখনই আমাদের ক্ষমা করবেন না। আমাদের প্রতি তিনি অনেক দয়া দেখিয়েছেন, আমাদেরও তাঁর সেই অসীম দয়ার জন্য তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ থাকা উচিত, আমরা যদি সে অমূল্য দান বৃথা দর্পে নষ্ট করে ফেলি, তাহলে আর এর পরে সে দয়া পাবো কেন? আমার মিনতি রাখো, দিদির সঙ্গে বিরোধ করোনা, অমূল্যটাকে স্নেহ করো, তিনিও আমাদের প্রতি যেমন দয়া করছেন, তেমনিই কর্ব্বেন।"

(২২)

সকালবেলা পুকুর ঘাটে বাসন মাজিতে মাজিতে হরিদাসী বিমলিকে সম্বোধন করিয়া চুপিচুপি জিজ্ঞাসা করিল "কিলো নূতন মনীব কেমন মানুষ? তুই তো দশ দিন নিয়ে ঘর করে এলি।"

বিমলাদাসী কর্ত্রীর কাপড়খানা জলে প্রসারিত করিয়া দিয়া একটু চাপা সুরে এদিক ওদিক চাহিয়া উত্তর করিল "মন্দ কি, আমাদের এখানেও ঘাস জল, সেখানেও ঘাসজল, গতর খাটাবো খাবো তার আবার ভালমন্দ, এই যে বলে, অন্ধ জাগোরে, না কিবে রাত্তির কিবে দিন"!

"তবে যে তারিণী বলে, মাঠাকুরুণের মতন নাকি মিলুনে মিশুনে নন ? বাবাঃ মা-টি যে সরদারনি। উনি যদি এ ভিটের ঢুকে বসেন তাহলেই লক্ষীপুরের হাড়ের লক্ষী ছাড়াবেন! কি গিন্নেপনা বাবা পেরথম থেকেই!"

বিমলা একটু বেশি সাবধানী! সে আবার একবার সেই আম্রবৃক্ষের ছায়াঢাকা সরল রেখান্বিত সুদূর পথপ্রান্ত পর্য্যন্ত চাহিয়া দেখিল। চারিপাড়ের তাল আম, ও বাতাবী লেবুর ছায়ায় স্নিগ্ধ ঘাটের দিকে চকিতদৃষ্টি ফিরাইল, দেখিল উত্তর পাড়ে কেবল কলমী দলের নিকটে জলের ধারে একটা বিরাগী বক ছাড়া আর কেহ নাই, বকটি চোখ বুজিয়া পরমার্থ চিন্তা করিতেছে কি মৎস্য চিন্তা করিতেছে, তাহা বুঝিবার 'যো' নাই। তখন আশ্বস্ত হইয়া গলার কাংস্য বিনিন্দিত স্বর মৃদুতর করিয়া বলিল "তা কিছু মিথ্যে বলেনি বোন, নূতন গিন্নির ভারি দেমাক। দুনিয়ার মনিষ্যির সঙ্গে কথাবার্ত্তাই কন না! আহা মা আমাদের যেমন মাটির মানুষ তেমন কি সবাই হতে পারে—না অমন আর আছে! তা দেখ আমাদের পোড়া অদেষ্টে আবার কি ঘটে। তখুনি বুঝেছি—বলি নিত্যি নিত্যি কালপেঁচাই বা ডাকে কেন।" বিমলার স্বরে কোন জটিল রহস্যের আভাষ পাওয়া গেল! হরিদাসী বগ্‌নো ঘর্ষণে বিরত হইয়া বিস্ময় পূর্ণ চোখ তুলিয়া সঙ্গিনীর দিকে তাকাইল "কিলা বিম্‌লি! ব্যাপার খানা কি? তারিণী বলছিল বড় গিন্নির মা নাকি মাঠাকুরুণকে দুটি চক্ষে দেখতে পারে না, হাঁালা সত্যি? এসেই নাকি বলেছিল বাড়ি ঘর সব তো আমার মেয়ের, ওরা এখন থেকে কোথায় থাকবে?"

বিমলাসুন্দরী কাচা কাপড় খানা নিঙ্গড়াইতে নিঙ্গড়াইতে পূর্ব্ববৎ সাবধানতা অবলম্বন পূর্ব্বক কহিলেন "আর ব্যাপার! ব্যাপার অনেক দূরই গড়িয়েছে। এঁদের তো এই কাণ্ড ওদিকের খপর শোননি কিছু? কাল রাত্তিরে থিয়াটার মিয়াটার ফেলে ছোট বাবু নাকি কর্ত্তা বাবুর সঙ্গে মহা ঝগড়া করেছেন। নবনে বলছিল বাবু নাকি বেশি কিছুই বলেননি, ছোট বাবুই মুখ চোখ রাঙ্গিয়ে তাঁকে খুব কড়া কড়া কথা বলেছেন; বুড়মানুষ নাকি মনের দুঃখে কাঁদতে লেগেছিল।

শ্রোত্রী উথলিত আগ্রহে নিরুদ্ধ শ্বাসে প্রশ্ন করিয়া উঠিল "বলিস কিলো! এমন আশ্চয্যি কথা তো কখনো শুনিনি! তা পরে হলো কি? ওমা যার শিল তারি নোড়া তারি ভাঙ্গি দাঁতের গোড়া এযে তাই!"

"কেজানে বোন আর তো কিছু শুনিনি। তা আমরা আদার ব্যাপারী আমাদের জাহাজের খপরে কাজ কি বোন, চুপ কে যেন আসছে; কে গো দিদি ঠাকরুণ! আজ যে আপনার এসতে এতো বেলা হলো?" সিদ্ধেশ্বরী ঠাকুরাণী দোক্তা পোড়া টেপা অধরে সৌজন্যের মৃদু হাসি হাসিয়া গাত্র মার্জ্জনী হস্তে ঘাটের পৈঠায় দাঁড়াইয়া আলস্য ভাঙ্গিতে

ভাঙ্গিতে বলিলেন, "কাল 'নাটক' দেখে ঘুমতে তো পাইনি আলিস্যিতে শরীর যেন মাটি মাটি করতে লেগেছে। শিবি কোথা গেল গা? উঠেছে?"

"কোনযুগে। নূতন মা মাঠাকৃরুণের সঙ্গে বুঝি পূজো করতে গ্যাছে তা দিদি ঠাক্‌রুণ! দুটি মা'য়েতে খুব মিল হয়েচে বাবু,—আজ কালকের যেমন সব হয়েছে তেমন নয়।"

কথাটা সিদ্ধেশ্বরী ঠাকুরাণীর খুবই মনঃপূত হইল না, তিনি ঈষৎ মুখ বাঁকাইয়া শ্লেষের স্বরে কহিলেন অমন বোকা 'মা' পেলে সবারি মিল থাকে; পোড়া মেয়ে চারকালই নিজের ভাল বুঝলেনা।"

ক্রমে ক্রমে মাসিমা পিসিমা মামিমা খুড়িমাতে পুখুরঘাট পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল, থিয়েটার হেমেন্দ্র ও শিবানীর আলোচনায় তাঁহাদের প্রাভাতিক মিটিংটি মন্দ চলিল না।

সিদ্ধেশ্বরী নিজের ভবিষ্য-দর্শন জ্ঞানের অদ্ভুত শক্তির সম্বন্ধে বিস্ময়কর গল্প হইতে আরম্ভ করিয়া নিরুদ্দিষ্ট জামাতার জন্য মধ্যে মধ্যে শোক প্রকাশ এবং তাহার মূর্খতার জন্য আক্ষেপ করিতে লাগিলেন। বিনোদের আত্মীয়াগণ অল্পবিস্তর পরিমাণে তাঁহার কথায় সায় দিয়া যাইতে লাগিলেন। কেবল শান্তির বিরুদ্ধে কোন কথা আসিলে কেহ বা নীরবে কেহ বা স্পষ্টাক্ষরে তাহার পক্ষ অবলম্বন করিলেন।

সেদিনকার সকাল বেলাটা শান্তির পক্ষে বড় মধুর হইয়া আইসে নাই, গতরাত্রে হেমেন্দ্র তাহার সহস্র অনুনয় ঠেলিয়া তাহার অজস্র অশ্রুজল উপেক্ষা করিয়া শ্যামাকান্তের সহিত অনর্থক বিবাদ করিয়াছে। সে তাঁহার সব-চেয়ে আপনার ধন অমূল্যকে জাল বলিয়া তাঁহাকে ভয়ানক আহত করিয়াছে, সে লজ্জায় যেন মরিয়া গিয়াছিল। সারারাত সে তাহার নির্জ্জন শয়ন গৃহে নিরালোক কক্ষে একা বিছানায় পড়িয়া ক্রমাগত এ পাশ ওপাশ করিয়াছে একবারটিও বিছানা ছাড়িয়া উঠে নাই অথবা ঘুমাইতে পারে নাই। সে সংসারের কর্ত্রী, আজ তাহার বাড়ি নিমন্ত্রিতে পূর্ণ, আজ তাহার কতো কাজ কতো দায়িত্ব কিন্তু কিছুতেই সে তাহার সংযত হৃদয় খানিকে কোন প্রকার সান্ত্বনা দিয়া অপরাধের গণ্ডী হইতে চরণ ছড়াইয়া লইতে পারিতেছিল না, স্বামীর অপরাধের সেওতো অংশভাগিনী! থিয়েটারের কনসার্টে তাললয়সমন্বিত মধুর স্বরলহরী কক্ষ মধ্যে ধ্বনিত হইতেছিল, বৃষ্টিহীনা জ্যোৎস্নারাত্রির নির্ম্মল শোভাটুকু মুক্তজানালার মধ্য দিয়া প্রকৃতি তাহার চোখের সম্মুখে ধরিয়া রাখিয়াছিলেন, কিন্তু শান্তির মনে প্রাণে যেন সে সব কিছুই পৌছিতেছিল না। সকালে উঠিয়া সে কেমন করিয়া জ্যেঠা মশায়ের কাছে মুখ দেখাইবে? শিবানীর চোখের উপর চোখ রাখিবে কেমন করিয়া? এমন কি অমুকে আদর করিবার অধিকার শুদ্ধ যেন তাহার ফুরাইয়া গিয়াছে। ভোরের বেলা স্বপ্নময় তন্দ্রার মধ্য হইতে জাগিয়া উঠিয়া শুনিতে পাইল তাহার ঘরের রুদ্ধদ্বারে আঘাত করিয়া অমূল্য ডাকিতেছে "কাকিমা?" "কি মাণিক!" বলিয়া তাড়াতাড়ি সে উঠিয়া পড়িল, দ্বার খুলিতেই নগ্নকায় সুন্দরকান্তি শিশু তাহার জানু জড়াইয়া ধরিল, সদ্যজাগ্রত পাখীটির কলকাকলীর স্বরে কহিল আমি "পাইয়ে এসেছি।"

শান্তির প্রথম সঙ্কোচ এমনি করিয়া কাটিয়া গেল, সে সানন্দে শিশুকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া কৃতজ্ঞ চিত্তে তাহার ললাটে গণ্ডে পুনঃপুনঃ চুম্বন করিতে করিতে ঘরে প্রবেশ করিয়া যেন শান্তি অনুভব করিতে লাগিল। ক্ষণপরে জিজ্ঞাসা করিল "অমূ তুই যে এতো ভোরে উঠেছিস? তোর মা কোথায়?"

অমূল্য তাহার কচি কচি হাত দুখানিতে কাকিমার কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া ধরিয়া সশব্দে তাহার চুম্বন প্রতিদান করিয়া কহিল "মা থলে আছে আমি বাজনা দেকবো, রাত্তিরে বাজনা বাজছিল।"

"সে বাজনা যে চলে গেছে ধন! আচ্ছা আমি তোমাকে একটা ভাল বাজনা দিই আয়, এই নে একটা বাঁশী! অমু চল তোর মার কাছে যাই।" শান্তি যাই বলিয়াও সহজে যাইতে পারিল না। এতক্ষণে হয় তো শিবানী সব কথা শুনিয়াছে। সংসারে শুভার্থী লোক দিগের কল্যাণে এসকল সংবাদ প্রচার হইতে বড় অধিক সময় লাগে না। এমন সময় শিবানী আসিয়া ডাকিল "শান্তি এখনও উঠিস্ নি নাকি?

শান্তি ঠিকই আঁচিয়াছিল, হেমেন্দ্রের কীর্ত্তি শিবানীর কাণে রাত্রেই উঠিয়াছিল। শ্বশুরের সহিত হেমেন্দ্রর বচসা শুনিয়া শিবানী বিমলাকে জিজ্ঞাসা করিল—"কি হয়েছে?" "হবে আবার কি, আমাদের খোকাবাবুকে দেখে হিংসেয়' জ্বলে উঠেছেন, এই কথা নিয়ে কর্ত্তাবাবুর সঙ্গে নাকি কুরুক্ষেত্তর হয়ে গেল, নবুনে বলছিল তিনি নাকি বলেছেন তুমি আমাদের দাদাবাবুর ইস্ত্রি নও—"শিবানী সহসা আর্ত্তভাবে বাধা দিল "বিমলা থামো শান্তি কোথায়?"

বিম্‌লি আশ্চর্য্য হইয়া গেল, বলিল "কি জানি বড়মা, মাঠাকৃরুণ বোধহয় কর্ত্তা-বাবুর ঘরে কি ছোটবাবুর ঘরে কোথায় আছেন। তা হ্যাঁগা তুমি যে বড় থিয়েটার দেখতে গেলে না? পাড়ার মেয়েরা তোমায় সবাই খুঁজতে লেগেচেন যে।" শিবানী বলিল, "বলো আমার অসুখ করেছে।"

"ওমা সেকি গো! মাঠাকৃরুণ গেলেন না তুমিও যাবে না, লোকে বলবে কি? তা তুমিই এখন হলে বাড়ির গিন্নি তুমি 'লোক-লৌকতা না রাখলে, চলবে কেন?"

শিবানী ত্বরিৎপদে উঠিয়া তাড়াতাড়ি বলিল "আচ্ছা আমি যাচ্চি তুমি যাও। তাহার চোখ দুইটা ঈষৎ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।" সে এবাড়ির গৃহিণী! কেমন করিয়া? কেহ কি তাহাকে সে অধিকার দিতে ডাকিয়া আনিয়াছিল? এ অধিকার তাহাকে যে দিতে পারিত সে ত তাহাকে দূরেই ফেলিয়া রাখিয়াছিল! সে এবাড়ির কে?

ভোর হইতে না হইতে শিবানী আর থাকিতে না পারিয়া শান্তির গৃহদ্বারে আসিয়া দাঁড়াইল, শিবানীকে দেখিয়া শান্তি তাহার গভীর শঙ্কটাবস্থা হইতে মুক্তি পাইয়া যেন বাঁচিল, তাড়াতাড়ি কাছে আসিয়া সাহ্লাদে বলিয়া উঠিল "কে দিদি? এসো ভাই আমরা এই তোমার কাছেই যাচ্ছিলুম।"

আসনগ্রহণ করিয়া শিবানী বলিল "অমুটা ঘুমভাঙ্গতেই পালিয়ে এসেছে, কিছুতেই ওকে আট্‌কে রাখতে পারা গেল না।

স্নানান্তে পট্টবসনা বধূদ্বয় দেবালয়ের ঘেরা দালানে বসিয়া মালা গাঁথিতেছিল। শান্তির নিপুণ হস্তে ইহারি মধ্যে দুইগাছা গোড়ে তৈয়ারি হইয়া গিয়াছে, কিন্তু শিবানী এপর্য্যন্ত একগাছি ভিন্ন গাঁথিয়া উঠিতে পারে নাই।

তখনো দেবালয়ে লোক সমাগম হয় নাই। দেবসেবক ব্রাহ্মণদ্বয় পূজার আয়োজন করিয়া দিতেছিল, আর একজন বিধবা আত্মীয়া অদূরে বসিয়া নৈবেদ্য প্রস্তুত করিতেছিলেন।

মনের উপরকার বেদনার ভারটা অল্পে অল্পে কোন সময়ে যে নামিয়া গিয়াছে তাহা সে জানিতেও পারে নাই। কিছুক্ষণ পরে কার্য্য হইতে চোখ তুলিয়া সে শিবানীর দিকে চাহিল, "ও দিদি! তোমার এখনও সেই মালাটা শেষ হয়নি?

শিবানী অপ্রতিভভাবে ঈষৎ হাসিল "আমি ভাই বড্ড কুঁড়ে, তোর তিন গাছা হয়ে গেল?

শান্তি সমাপ্ত মালাগাছার মুখে গ্রন্থি দিয়া অবশিষ্ট সুতাটুকু কাঁচির সাহায্যে কাটিয়া ফেলিয়া তাহা অন্য মালাগুলির পার্শ্বে তাম্র-পাত্রে সাজাইয়া রাখিতে রাখিতে কহিল, "কিন্তু দেরি হইলে কি হয়, আমার মালার চেয়ে তোমার গাঁথনি অনেক পরিষ্কার হয়েছে। তুমি 'বিনা সুতা'র মালা গাঁথতে জানো?"

সুঁচের মুখে পুষ্প প্রবেশ করাইয়া সেইদিকে চোখ রাখিয়া শিবানী উত্তর করিল "কিন্তু বড্ড দেরি হয়।"

"তা হইলই বা, এসো রাধাকৃষ্ণের জন্য দুজনে দুগাছি কৃষ্ণকলির মালা গাঁথি, আহা সেদিন যদি গেঁথে দিতুম, কেমন সুন্দর দেখাতো। আমার রাজরাজেশ্বরীর জন্য পদ্মপাপড়ি দিয়ে একগাছি নূতন রকম করে মালা গাঁথতে হবে, এই বড় লাল গোলাপটি তার মধ্যে দিবার জন্য থাক।"

শিবানী কহিল "পদ্মফুল কোথায় পাবি?"

শান্তি খিল খিল করিয়া হাসিয়া উঠিল "তুমি বুঝি কিছুই দেখোনা! খিড়কির পুখুরে উত্তর দিকটায় অনেক পদ্ম ফুটে আছে দাঁড়াও মালাগাছটা শেষ করে তুলে আনা যাবে।"

"ওমা এরি মধ্যে তোর প্রায় অর্দ্ধেকটা হয়ে এলো যে! শান্তি আমি ভাই বড় অকর্ম্মা! আমায় তুই একটু কাজের লোক করে নে না ভাই।"

"তাই তো! আমি যেন বড্ডই কর্ম্মা? মা বলতেন আমার কাজ তাড়াতাড়ির জন্য বেশ পরিষ্কার হয় না, কিন্তু তোমার সকল কাজই আমার চেয়ে কেমন পরিষ্কার।"

"ভারী পরিষ্কার, আমি জানিই বা কি? কাল রাত্রে আমার সে বইখানা শেষ হয়ে গেছে, আর একখানা কিছু দিস্, রাত্রেতো সব দিন ঘুম হয় না।" শান্তি বলিয়া উঠিল "এর মধ্যে শেষ হয়ে গ্যাছে? তবে নাকি তুমি ভাল পড়তে জান না? আচ্ছা 'অনাথবন্ধু' তোমার কেমন লাগলো বলো?

শিবানী ঈষৎ ব্যথিত নিশ্বাস ফেলিল "বেশ লাগলো শান্তি। কিরণশশি, বড় দুঃখী, দুঃখীর মনে দুঃখের কথাই বেশি লাগে। কিন্তু শেষটা যেন কি রকম হয়ে গিয়েছে, ভাল বোঝা যায় না।

"শেষটাতে হিন্দু গৃহস্থের জানিবার উপযোগী অনেক ভাল কথা আছে। কর্ত্তব্য-নিষ্ঠা ও স্বদেশহিতৈষিতার মধ্যে আমাদের

সংসার কেমন করে গঠিত হতে পারে এ বইখানি তারি একখানি সুন্দর চিত্র।"

এমনি করিয়া দুঃখের যে ভারি মেঘখানা শান্তির অম্লান পুষ্পকোরকের মত ক্ষুদ্র বুক খানাকে ঢাকিয়া রাখিয়াছিল, সেখানাকে দূরে সরাইয়া দিয়া আনন্দের স্নিগ্ধ আলোটুকু তাহার তরুণ হৃদয়প্রান্তে ছড়াইয়া পড়িল।

মালা গাঁথা হইলে শান্তি পদ্ম ও শিবানী টগর ফুল তুলিতে গেল। কিন্তু টগরগুলা লইয়াই শিবানী ফিরিয়া আসিতে পারিল না। কারণ পঞ্চমুখী জবাগুলা বিবাহের কনের মতন যে লাল চেলিতে মুখ ঢাকিয়া বসিয়া আছে, ওগুলি তুলিয়া যদি শ্যামা মায়ের কালো পা দুটিতে অঞ্জলি প্রদান করা যায়, তাহা হইলেই তাহাদের পুষ্প জীবনটা সফল হইয়া যায়!

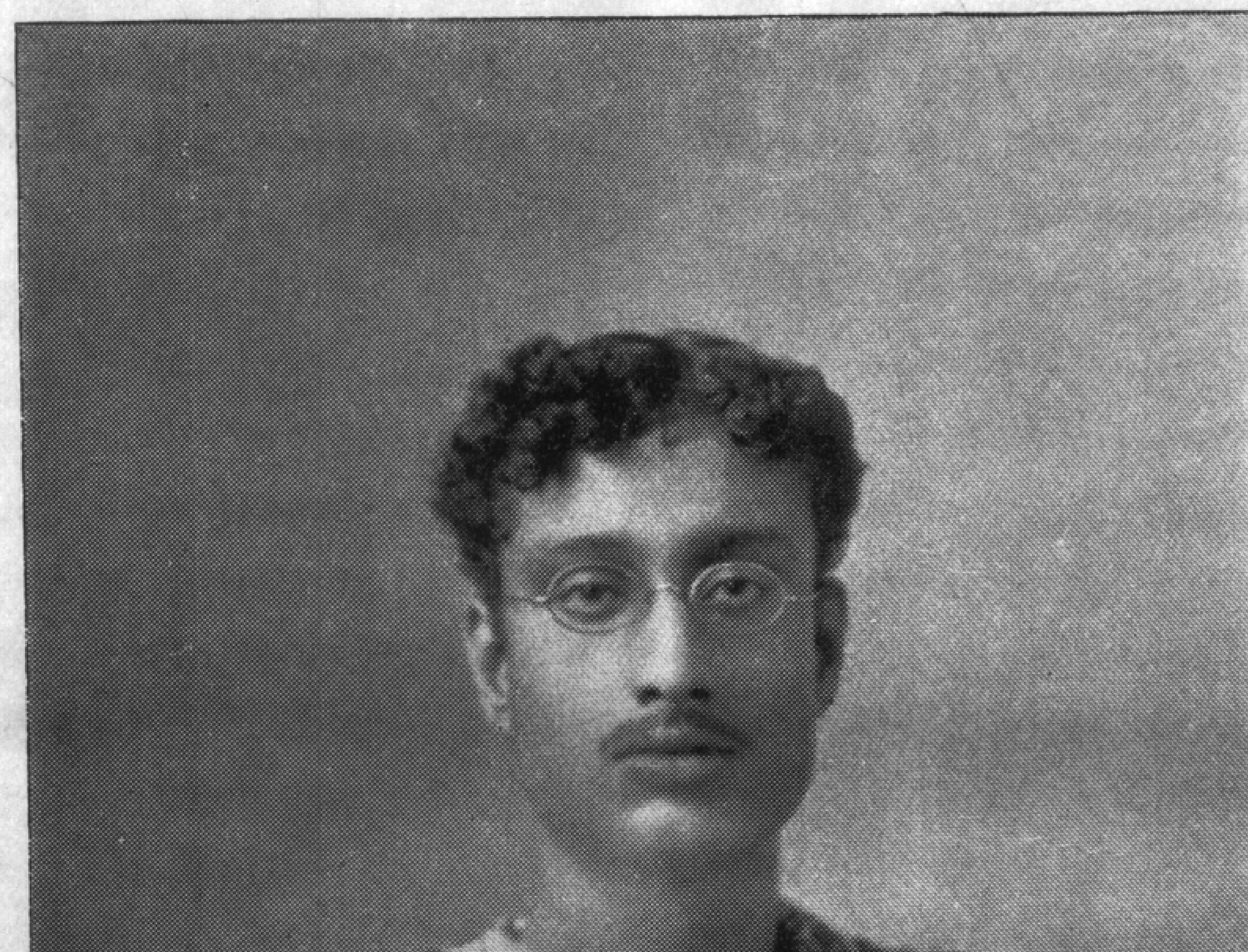
শান্তি পুষ্করিণীতে পদ্ম তুলিতে গিয়া সর্প দংশিতের ন্যায় সহসা বিবর্ণমুখে বসিয়া পড়িল, সেই মুহূর্ত্তে সমস্ত পৃথিবীটা যেন তাহার চক্ষের সম্মুখে অপূর্ব্ব তালে নৃত্য করিয়া উঠিল।

শিবানী ফিরিয়া আসিয়া দেখিল একটা বাতাবীলেবুর গাছে পৃষ্ঠ রক্ষা করিয়া চুপ করিয়া শান্তি দাঁড়াইয়া আছে ফুল তুলিবার কোন চেষ্টা বা উৎসাহই নাই। সে ঈষৎ বিস্মিত ভাবে অগ্রসর হইয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল ফুল তুল্‌তে গেলিনা যে? তার পর তাহার বিবর্ণ মুখের দিকে তাকাইয়াই সভয়ে বলিয়া উঠিল "কি হয়েছে শান্তি" শিবানী ফুলগুলা ফেলিয়া দিয়া সস্নেহে তাহাকে দুই হাত দিয়া বুকে টানিয়া লইল "শান্তি শান্তি কি হলো?" "দিদি" বলিয়া ক্ষুদ্র শিশুর মত ব্যাকুলভাবে শান্তি তাহার বুকের মধ্যে মুখ লুকাইল, তাহার চোখের জল আর লুকানো রহিল না। শিবানী কিছু না বুঝিলেও ইহা সে বুঝিল যেমন করিয়াই হোক, বালিকা শান্তি মনে কোন গুরুতর আঘাত পাইয়াছে, আর সে আঘাতের কারণ হয়তো সে নিজেই। কাতর হইয়া দুই হস্তে তাহার মুখখানা তুলিয়া ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিল "কেন কাঁদছিস বোন!" অশ্রুসিক্ত মুখখানা লুকাইয়া ফেলিবার চেষ্টা করিয়া সে হাসিয়া বলিল "কাঁদিনি দিদি, এসো বাড়ি যাই"। "মালা গাঁথবিনি শান্তি তোর রাজরাজেশ্বরীকে মালা পরাবিনা?" বৃষ্টির পরেই গাছপালার উপরে রবিরশ্মি যেমন ঝিকমিক করিয়া জ্বলিয়া উঠে অমনিতর একটা করুণ হাস্যের আভাষে শান্তির অশ্রুচিহ্নিত গণ্ডদ্বয় ঈষৎ রঞ্জিত হইয়া উঠিল, সে কহিল "না দিদি।"

পরিচয়।

যে মুহূর্ত্তে তোমা সাথে হ'ল পরিচয়
চিরপরিচিতরূপে ছাইলে হৃদয়;
যখনি নূতনবেশে দাঁড়াইলে আসি
চিরপুরাতন মূর্ত্তি উঠিল বিভাসি।

শ্রীসুখরঞ্জন রায়, বি,এ



শ্রীযুক্ত মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়

উদীয়মান লেখক।

(২)

শ্রীযুক্ত মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

অল্পকালের মধ্যেই উপর্য্যুপরি অনেকগুলি গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া মণিবাবু সাহিত্যিকগণের বিস্ময় উদ্রেক করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, সেগুলি 'ভেজাল' নয়। প্রথমেই তাঁহার "ভুতুড়ে কাণ্ড" বঙ্গসাহিত্যে একটা চাঞ্চল্য উপস্থিত করিয়াছিল। তাহাতে আর-কিছু থাকুক্ আর নাই থাকুক, একটা নূতন তত্ত্বের আলোচনায় গ্রন্থখানি বেশ মুখরোচক হইয়াছিল।

তারপর, তাঁহার "জাপানী ফানুস"। বালকবালিকাগণের জন্য উদ্দিষ্ট হইলেও, এই গ্রন্থ রচনায় তিনি যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। সাহিত্যে হিসাবে 'জাপানী ফানুসের' একটা মূল্য আছে। জাপানের বিষয় আমরা অনেকেই কিছু-না-কিছু জানিলেও, জাপানী সাহিত্যের বিষয় আমরা অল্পই জানি। জাপানী সাহিত্যে তাহাদের জাতীয় বিশেষত্বের চিহ্নগুলি লক্ষিত হয়। জাপান দেশের নৈসর্গিক প্রভাব, বৌদ্ধ ধর্ম্ম জাপানী-চরিত্রে একটা অতি সূক্ষ্ম, অস্পষ্ট ছায়াপাত করিয়াছে। সে ছায়াটী "জগৎ নশ্বর" ও পরলোকে বিশ্বাস।

জাপানী সাহিত্যে, জাপানী শিল্পে একটা অস্পষ্টতা আছে, অথচ তাহার অর্থ, তাহার মোহ সহজে হৃদয় অধিকার করিয়া ফেলে ;—আর এমনি একটা ভাবই তাহার বৈচিত্র্য সম্পাদন করিয়াছে। নরওয়ের জনবিরল, শৈলবন্ধুর সমুদ্রতীরবাসীগণের পৌরাণিক গল্পগুলি (saga) যেমন একটা রহস্য ছায়াচ্ছন্ন তেমনি অগ্ন্যুৎপাত ভূমিকম্প সংযুক্ত জাপানী গল্পগুলিতেও একটী অস্পষ্ট অব্যক্তভাব পরিস্ফুট।

মণিবাবু সেই সুকুমার ভাবটিকে ধরিয়া বাংলা ভাষায় তাহার আভাষ দিয়াছেন। তাঁহার জাপানী ফানুস শব্দচিত্রে সৌন্দর্য্যশালী ; সরস বাক্‌ভঙ্গিতে মনোরম এবং সহজ ভাষায় পাঠকপাঠিকাগণের হৃদয়গ্রাহী।

তারপর, তাঁহার "ভারতীয় বিদুষী" বাংলা সাহিত্যে এক নূতন জিনিস। এই হিসাবে নূতন যে এরূপ সঙ্কলন চেষ্টা ইহাই প্রথম। এ বিষয়ে, তিনি যথেষ্ট পটুতা, অনুসন্ধিৎসা, এবং গবেষণার পরিচয় দিয়াছেন। বৈদিককাল হইতে গতশতাব্দী পর্য্যন্ত ইতিহাস আলোচনা করিয়া তাহা হইতে ভারতমহিলার জ্ঞানগরিমার ইতিহাস সঙ্কলন করা বড় কম কৃতিত্বের পরিচায়ক নহে। 'স্ত্রীশিক্ষা' যে নূতন ব্যাপার নহে, তাহা এ গ্রন্থে সহজেই প্রতিপাদন হয়।

তারপর, তাঁহার প্রকাশিত রচনাবলীর মধ্যে সর্ব্বোত্তম পুস্তক তাঁহার "কল্পকথা"। বঙ্গসাহিত্যে ইহা সম্পূর্ণ নূতন। কল্পকথার গল্পগুলি জাপানীদের অতি সূক্ষ্ম ও কবিত্বময় ভাবের সহিত বাঙালীকে ঘনিষ্ঠভাবে এই প্রথম পরিচিত করিয়া দিল। ইহার সুকুমার সৌন্দর্য্যটুকু এত মধুর তাহাতে এমন একটী কোমলতা আছে যে তাহাকে কেবলি হৃদয় দিয়া উপভোগ করিতে হয়। তাঁহার "কল্পকথা" বঙ্গসাহিত্যে চিরকাল আদৃত হইবে, একথা অসঙ্কোচে বলিতে পারি। তাঁহার 'বৈরাগ্য' 'প্রাণের রঙ্' প্রভৃতি গল্পগুলি অস্পষ্টতার ছায়াপাতে কত করুণ।

সম্প্রতি মণিবাবু 'কাদম্বরী' ও 'বেতাল পঞ্চবিংশতির' সচিত্র সংস্করণ প্রকাশ করিয়া অকৃত্রিম সাহিত্যানুরাগের পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার প্রকাশিত গ্রন্থগুলির একটা বিশেষত্ব এই যে, গ্রন্থগুলির মুদ্রন-পরিপাটি, নয়নাভিরাম কাগজ বাঁধাই বিচিত্র। এ হিসাবেও তিনি একটা অভাব মোচন করিয়াছেন।

আশাকরি মণিবাবু চিরদিন অক্লান্ত সাহিত্যসেবা দ্বারা মাতৃভাষাকে শ্রীসম্পন্না করিবেন। তাঁহার লেখনী অমর হউক।

পাণিনি-প্রচার। (ফাল্গুনের অনুবৃত্তি)

একমাত্র বিষ্ণু যেমন একাকী সমগ্র বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া রহিয়াছেন, বর্ণমালার দ্বি-চত্বারিংশটি বর্ণও তেমনি সমগ্র বাঙ্ময় শব্দ শাস্ত্র ব্যাপিয়া আছে। এই বর্ণগুলিই যাবতীয় শব্দের ব্যঞ্জক। সুতরাং শব্দ-শাস্ত্রের হেয়তা-উপাদেয়তা এই বর্ণ-মালা সাজানোর উপর একান্ত নির্ভর করিতেছে। তাই, সর্ব্বাগ্রে পাণিনি বর্ণমালা সাজাইয়াছেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধিধারী জনৈক আধুনিক সূত্রকার পাণিনির এই বর্ণ-মালা সাজানকে কৃত্রিমতা দোষপূর্ণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া, তিনি নিজেই সহজসূত্র প্রণয়নে প্রবৃত্ত হইয়াছেন! উচ্চ-শিক্ষিত লোকেরই যদি এরূপ বদ্ধমূল কু-ধারণা থাকে, তবে অশিক্ষিতেরা দূরেই থাকুক! পক্ষান্তরে প্রবাদ আছে যে, বর্ণমালার এই ক্রমটী পাণিনি সাক্ষাৎ মহাদেবের নিকট হইতে লাভ করিয়াছিলেন, তজ্জন্যই উহাদিগকে মাহেশ্বর সূত্র বলে। আমাদের বিবেচনায়, মাহেশব্যাকরণ নামে কোনও ব্যাকরণের বিদ্যমানতা স্বীকার করিতে হইলে, উক্ত মাহেশ্বর-সূত্রগুলিকেই আপাততঃ মাহেশ-ব্যাকরণ বলা উচিত। বর্ণমালার ক্রম যথা, অই উ(ণ্)। ঋ ৯ (ক্) এ ও (ঙ)। ঐ ঔ (চ্)। হয় বর (ট্)। ল (ণ্)। ঞ ম ঙ ন ণ (ম্)। ঝ ভ (ঞ্)। ঘ ঢ ধ (ষ)। জ ব গ ড দ (শ্)। খ ফ ছ ঠ থ, চ ট ত (ব্)। ক প (য়্)। শ ষ স (র্)। হ (ল্)। ক্রমটী আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, প্রথমে মূল অ-মিশ্র স্বর, পরে মিশ্র-স্বর, পরে সন্ধিজ গুণ-স্বর, পরে সন্ধিজ বৃদ্ধি-স্বর, পরে অর্দ্ধ-স্বর, পরে বর্গীয় পঞ্চম বর্ণ, পরে চতুর্থ বর্ণ, পরে তৃতীয়, পরে দ্বিতীয়, পরে প্রথম, ও পরে উষ্মবর্ণ সাজান রহিয়াছে, শুদ্ধ তাহাও নহে; পূর্ব্বাপর বর্ণগুলি এমন কৌশলে সন্নিবেশিত হইয়াছে, যে, স্বরই হউক আর ব্যঞ্জনই হউক,—বর্ণ-নথী ছোটই হউক, আর বড়ই হউক, এক-জাতীয় বর্ণই এক স্থানে সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। রাম-ধনুর বর্ণ-মালাতে প্রকৃতি-দেবী যেমন সজাতীয় সমস্ত বর্ণগুলিকে একই স্থানে রাখিয়াছেন, এই অক্ষর-মালাতেও তদ্রূপ সজাতীয়-বর্ণ একই স্থানে সুসজ্জিত রহিয়াছে। উপর্য্যুক্ত চতুর্দ্দশটী সূত্রের হলন্ত-চিহ্নযুক্ত-অন্ত্য ব্যঞ্জন-বর্ণগুলি অনুবন্ধ-মাত্র,—উহারা মৌলিক বর্ণ নহে,—সজাতীয়-বর্ণগুলির নামকরণের সৌকর্য্যার্থ উহাদিগকে সূত্রে স্থান দেওয়া হইয়াছে মাত্র। নামকরণেরও সুন্দর সঙ্কেত রহিয়াছে,—যথা, অ হইতে আরম্ভ করিয়া, ণ্ পর্য্যন্ত যে কয়েকটী বর্ণ আছে,, তাহাদিগের সাধারণ নাম অণ্। ('আদিরন্ত্যেন সহেতা')। এইরূপ, অচ্ বলিলে সকল স্বরকে বুঝাইবে, ঞম্ বলিলে বর্গের পঞ্চম-বর্ণগুলিকে, ঝষ বলিলে চতুর্থ-বর্ণগুলিকে, জশ্ বলিলে তৃতীয় বর্ণগুলিকে, খয়্ বলিলে দ্বিতীয় ও প্রথমবর্ণগুলিকে, শর্ বলিলে শষসকে এবং হল্ বলিলে সমস্ত ব্যঞ্জন বর্ণকে, এবং অল্ বলিলে সমুদয় বর্ণমালাকে বুঝাইবে। অট-জাতীয় বলিয়া, হকার একবার পূর্ব্বে,

এবং শল্‌-জাতীয় বলিয়া, একবার পয়ে গৃহীত হইয়াছে *। প্রয়োজনবশতঃ, অনুবন্ধ ণ-কারকেও দুইবার গ্রহণ করা হইয়াছে। স্থূল কথা, কোনও প্রকৃত বর্ণের সঙ্গে তৎপরবর্ত্তী যে কোন অকারাদি অনুবন্ধ-বর্ণকে যোগ করিয়া, এক এক জাতীয় বর্ণের এক একটী নথী গাথা হইয়াছে। যেমন এচ্‌ নামক নথীতে এ ও ঐ ঔ বর্ণগুলি আছে, এঙ্‌ নামক নথীতে একার-ওকার আছে। এইরূপে সকল মূলবর্ণের সহিতই তৎতৎপরবর্ত্তী এক একটী অনুবন্ধ যোগ করিয়া, অসংখ্য বর্ণ-নথীর আবিষ্কার করা যায় বটে কিন্তু শব্দ-শাস্ত্রে এতগুলো নথীর কোনও প্রয়োজন নাই। শব্দ-শাস্ত্রে ৪৪টী নথীই প্রয়োজনীয়, তাই আর সকলগুলিকে ত্যাগ করা হইয়াছে। এইরূপ নথী-নির্ম্মাণ-প্রণালীর অপর নাম সন্দংশ ন্যায়। উপর্য্যুপরি সজ্জী-কৃত কতকগুলি পদ্মপত্রের দুই-প্রান্তের দুইটী পদ্মপত্রের মধ্য-স্থল সাঁড়াশীদ্বারা ধৃত হইলে, যেমন সব পত্রগুলিই ধরা হয় বর্ণনথী-নির্ম্মাণ-প্রণালীও তদ্রূপ বটে। কোথায়, উক্ত প্রণালীকে অ-পৌরুষেয়ই বলিতে প্রবৃত্তি হয়, আর কোথায় আমাদের নূতন-সূত্রকার উহাকে "কৃত্রিম" বলিতেও কুণ্ঠিত হয়েন নাই। পাণিনি ব্যাকরণ বহুক্ষেত্রের অনেকেরই এইরূপ ভ্রমবিলাস! তবে এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে পাণিনি-ব্যাকরণখানা তিন হাজার বৎসর † পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল বলিয়া, উহাতে বর্ত্তমানে অপ্রচলিত অনেক শব্দ পাওয়া যায় ‡ আর উহাতে বৈদিক ও স্বর-সূত্র শ্রুত রহিয়াছে। এজন্যই বঙ্গদেশে পাণিনির চল নাই। যে 'কলাপ' ও 'মুগ্ধবোধে'র গুণে, বঙ্গদেশীয় বার আনা পণ্ডিত মুগ্ধ হইয়া রহিয়াছে, তৎ-সম্বন্ধেও এস্থলে ২।১টী কথা বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। অষ্টাধ্যায়ীতে 'কলাপিন্‌'-শব্দের(১) প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায় বটে, তাহা বলিয়া কলাপ-ব্যাকরণ অষ্টাধ্যায়ীর পূর্ব্ববর্ত্তী এরূপ সিদ্ধান্ত করা যায় না। প্রথমতঃ কলাপ ব্যাকরণের প্রথমাবস্থাতে বৈদিক ও স্বর প্রক্রিয়া ছিলনা। শুনিয়াছি, মহামহোপাধ্যায় পূজ্যপাদ ৺ চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয়, কলাপের এই অভাব মোচন করিয়াছেন। যে ব্যাকরণে বেদ ও স্বরপ্রক্রিয়া নাই, সেই ব্যাকরণ বেদ-বিদ্যানুশীলন-কাল হইতে সুদূরবর্ত্তী, ইহাই অনুমান হয়। দ্বিতীয়তঃ, কলাপ-ব্যাকরণে পঞ্চাঙ্গন্যায়ের যেরূপ প্রভাব তাহাতে বোধ হয় নব্য-ন্যায়ের রাজত্বের পূর্ব্বে উহার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হয় নাই। যাহা হউক, কলাপের অল্প কয়েকটী নিজস্ব সংজ্ঞা * আছে। তদ্ভিন্ন, কলাপের অনেক সংজ্ঞাই

---

* হকারো দ্বিরুপাত্তোঽয়ম্‌, অটি হল্যপি বাঞ্ছতা। অর্হেণাঽধুক্ষদ্‌ ইত্যত্র, দ্বয়ং সিদ্ধং ভবিষ্যতি।

† Goldstuiker.

‡ যেমন ভোজনার্থে 'প্রত্যবসান' ১।৪।৫২, উৎসাহার্থে 'ক্রমণ' ৩।১।১৪, নিন্দার্থে 'ক্ষেপ' ২।১।২৬, বাহনার্থে 'পত্র' ৪।।৩।১২২, পৌনঃপুন্যার্থে (ও অতিশয়ার্থে) সমভিহার, দ্রব্য অর্থে 'অধিকরণ' দেশার্থে 'বিষয়' প্রশংসার্থে 'পূজা' ভক্ষ্যার্থে ভক্ষাঃ ইত্যাদি।

(১) 'কলাপি-বৈশম্পায়না হন্তে বাসিভ্যশ্চ' ।৪।৩।১০৫ 'কলাপিনোঽণ্‌'। ৩।৪।১০৮।

*(১) স্বরোঽবর্ণবর্জং 'নামী' (২) ধাতু-বিভক্তি-বর্জম্‌ অর্থব'ল্লিঙ্গম্‌' (৩) পঞ্চাদৌ'ঘুট' (৪) 'ধুট' ব্যঞ্জনম্‌ অনন্তঃস্থোঽনুনাসিকম্‌ (বর্গীয় বর্ণ)

পাণিনি-সম্মত ও অন্বর্থ বটে। মনীষিগণ 'মুগ্ধবোধ' ব্যাকরণ শব্দের দুই রকম অর্থ করিয়া থাকেন। প্রথম যে ব্যাকরণদ্বারা মুগ্ধেরও বোধ জন্মে তাহাকে মুগ্ধবোধ কহে। দ্বিতীয়, যে ব্যাকরণের 'বোধ' (অর্থাৎ জ্ঞান) বড়ই মুগ্ধ অর্থাৎ মনোহর তাহাকেও মুগ্ধ বোধ কহে। দেখা যাউক, এ নাম কতদূর সার্থক। এই ব্যাকরণের বিশেষত্ব এই যে, বহুস্থলেই ইহার সংজ্ঞাগুলি একাক্ষর ও পাণিনীয় সংজ্ঞার অংশ নির্ম্মিত। যেমন ইহাতে সবর্ণকে র্ণ, গুণকে ণ্, বৃদ্ধিকে ব্রি, উপসর্গকে গি, ধাতুকে ধু, বিভক্তিকে ক্তি, এককে ক, দ্বিকে দ্ব, বহুকে বব, পদকে দ, নিপাতকে নি, প্রত্যয়কে ত্য, অনুস্বারকে স্থ, বিসর্গকে বি, প্রথমাকে প্রী, দ্বিতীয়াকে দ্বী, তৃতীয়াকে ত্রী, চতুর্থীকে চী, পঞ্চমীকে পী, ষষ্ঠীকে ষী, সপ্তমীকে প্তী, সমৃদ্ধিকে দ্ধি, রেফকে র, সর্ব্বনামকে স্রি, অব্যয়কে ব্য, সংযুক্ত বর্ণকে স্তু, নদীকে দী, তদ্ধিতকে ত, আত্মনেপদকে ম, পরস্মৈপদকে প, লিঙ্গকে (নাম) লি, নাম-ধাতুকে লি-ধু, দ্বন্দ্বকে চ, বহুব্রীহিকে ক, কর্ম্মধারয়কে য, তৎপুরুষকে ষ, দ্বিগুকে গ, এবং অব্যয়ীভাবকে ব বলা হইয়াছে। এই-রূপে পাণিনীয়-শব্দ-শাস্ত্রে ব্যবহৃত স্বতঃসংক্ষিপ্ত নাম-গুলিকে আরও সংক্ষিপ্ত করিয়া, মুগ্ধবোধ স্বকীয় সূত্রগুলিকে মুখস্থ করিবার বিলক্ষণ সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু, সাধারণের নিকটে এই সূত্রগুলির রব টরে টঙ্কার মত নির-র্থক জ্ঞান হইয়া থাকে। এবং এইরূপ সংজ্ঞার ছড়া-ছড়িতে, পণ্ডিত শ্রেষ্ঠ বোপদেব মুগ্ধবোধ ব্যাকরণকে মুগ্ধবোধ করিতে পারিয়াছেন কিনা, তাহা সন্দেহ। বরং মুগ্ধবোধ অপেক্ষাও পাণিনি-ব্যাকরণই মনোহর এবং মুগ্ধদেরও বোধজনক। এবং ইহা বলা যাইতে পারে যে বর্ত্তমান ব্যাকরণ রাশির মধ্যে পাণিনিই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন, বিজ্ঞানপূর্ণ ও সহজ। কিন্তু পরবর্ত্তী ব্যাকরণ-কার-গণ ব্যাকরণ-শাস্ত্রকে আরও সরল করিতে গিয়া, অকুটিল-পাণিনীয় শাস্ত্রের মধ্যে আপন আপন নৈপুণ্য ঢুকাইয়া, বৈজ্ঞানিক পাণিনীয় শাস্ত্রকেই ঢাকিয়া ফেলিয়াছেন। টীকার টীকা, তস্য টীকা লেখকগণের ত কথাই নাই। তাহাতে, সাধারণের মনে একটা অন্ধ বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, অন্যান্য ব্যাকরণই যখন এত কঠিন, তখন অপরিচিত পাণিনি-ব্যাকরণ নিশ্চয়ই ততোধিক কঠিন।

কলাপ ও মুগ্ধবোধ

আধুনিক ব্যাকরণ গুলিতে বৈদিক ও স্বরপ্রক্রিয়া প্রায়ই দৃষ্ট হয় না। সুতরাং উহাদের পাঠ-দ্বারা বাঙ্গালীদিগকে একদিকে বেদ-বহির্ভূত অন্যদিকে সংস্কৃতের যে স্বতন্ত্র প্রগাঢ় উচ্চারণ তাহা হইতে সংস্কৃত ভাষাকে সুদূরে নিক্ষিপ্ত করিয়াছে, এবং পশ্চিমাঞ্চলের সংস্কৃতভাষা ও বঙ্গাঞ্চলের সংস্কৃত-ভাষীদের ভাষায় বৈরূপ্য জন্মাইয়াছে। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, "এখন বৃদ্ধ বয়সে উদাত্ত, অনুদাত্ত স্বরিত স্বরের উচ্চারণ অগ্রে নিজে শিখিয়া, পরে ছাত্রদিগকে শিক্ষা দিব, তাহা অসম্ভব! আর, যাহা বলিব, তাহাই ত ভাষা।" কিন্তু যদি কেহ সেক্ষপিয়রের নাটকগুলিকে বাঙ্গালী-টোনে উচ্চারণ করেন, তবে কি উহা আদৌ ইংরাজী নাটক পড়া হইবে? ভাষা প্রচলিতই হউক, আর

আধুনিক ব্যাকরণগুলি অসহায়হীন ও বেদ বহির্ভূত।

অপ্রচলিতই হউক যে ভাষার যে-উচ্চারণ, তাহা ঠিক রাখিতেই হইবে।

পাণিনি-প্রচার আবশ্যক।

এমতাবস্থায়, কদাপি সমগ্র-ভারত ব্যাপিয়া একই ভাষা প্রচলিত হইবার বিন্দুমাত্রও আশা থাকিলে যেমন এক মাত্র সংস্কৃতভাষা, বা সংস্কৃত মূলক হিন্দি বা বঙ্গভাষা প্রচলন দ্বারাই সে আশা সফল হইতে পারে; তেমন, কেবল পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী দ্বারাই সমগ্র ভারতের একই ব্যাকরণ প্রচলিত হইবার আশা ফলবতী হইবার সম্ভব। এবং যাঁহারা প্রবাহে গা ঢালিয়া না দিয়া, সিদ্ধান্তকৌমুদী ও অষ্টাধ্যায়ীর ক্রম নিরপেক্ষভাবে পর্য্যালোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা মুক্তকণ্ঠেই স্বীকার করিবেন যে, অধ্যাপক ও ছাত্রে যতদূর তফাৎ অষ্টাধ্যায়ী ও সিদ্ধান্ত-কৌমুদীতেও ততদূর তফাৎ। অষ্টাধ্যায়ী বরঞ্চ শিক্ষকের সাহায্য ব্যতিরেকে পড়িতে পারা যায়, কিন্তু, সিদ্ধান্তকৌমুদী পড়িতে শিক্ষকের সাহায্য অত্যাবশ্যক। সুতরাং বঙ্গদেশে রাশীকৃত ব্যাকরণ-গ্রন্থের মূলীভূত, এই পাণিনি-ব্যাকরণের বহুল-প্রচার হওয়া অত্যন্ত বাঞ্ছনীয় বলিয়া বোধ হয়। যাঁহাদের মনে অন্ধ-বিশ্বাস এই যে, পাণিনি-ব্যাকরণ অন্যান্য ব্যাকরণ অপেক্ষা কঠিন, তাঁহারা একবার স্থূল স্থূল ব্যাপক-সূত্রগুলি পড়িলেই তাঁহাদের চক্ষু-কর্ণের বিবাদ ঘুচিবে, আর, যখন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উৰ্দ্ধতন পরীক্ষাতেই সিদ্ধান্তকৌমুদী পাঠ্যস্বরূপ নির্ব্বাচিত হইয়াছে, তখন ছাত্রদিগকে স্কুল-কলেজের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে বৎসর বৎসর ভিন্ন ভিন্ন ব্যাকরণ পড়িতে ও মুখস্থ করিতে না দিয়া, সর্ব্বত্র একই পাণিনি-ব্যাকরণ পাঠ্য করা উচিত।

পাণিনি ব্যাকরণের উদ্দেশ্য।

একটী একটী করিয়া, প্রত্যেকটী প্রচলিত শব্দকে ব্যাকরণ সূত্রদ্বারা সাধিয়া দেওয়া কাত্যায়ন-প্রমুখ পরবর্ত্তী ব্যাকরণ কর্ত্তাদের উদ্দেশ্য থাকিতে পারে; প্রসিদ্ধি আছে, তজ্জন্যই কাত্যায়ন পাণিনির ১৫০০ সূত্রের আলম্বনে আরো ৪০০০ বার্ত্তিক সূত্র রচনা করিয়াছেন। কিন্তু, মহর্ষি পাণিনির সে উদ্দেশ্য আদৌ ছিল না। কয়েকটীমাত্র ব্যাপক-সূত্রদ্বারা ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান সমস্ত বাঙ্ময় শাস্ত্রের আবির্ভাব বিবৃত করাই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। পাঠক! ওই দেখ, অনন্ত শব্দ-শাস্ত্র-বারিধি-বক্ষে একখানি অত্যুচ্চ গিরিশৃঙ্গে, অষ্টাধ্যায়ীরূপ একথাকি ঝাঁকি-জাল হস্তে করিয়া, পাণিনিমুনি সমগ্র সমুদ্র আচ্ছাদন করিয়া সেই জাল নিক্ষিপ্ত করিয়াছেন। তাহাতে সমগ্র-সাগর একজালে আচ্ছাদিত হইল বটে। কিন্তু, বড় বড় জাল-ছিদ্র-দ্বারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, অথচ প্রয়োজনীয়, ভাল ভাল, পদমীনগুলি বাহির হইয়া যাইতে উদ্যত হইল! আর, কৌশলী তৎক্ষণাৎ এক একটী করিয়া নিয়ম অতিদেশ নিষেধাদি সূত্রদ্বারা সেই ফাঁক বন্ধ করিলেন! সুতরাং বলা যাইতে পারে যে, পাণিনীয় শব্দ-শাস্ত্রের এইরূপ বিজ্ঞান-প্রাণতার প্রতি লক্ষ্য না করিয়া, এবং অলীক-ভয়ে-ভীত হইয়াই কাত্যায়ন-প্রমুখ বৈয়াকরণ-গণ নিষ্প্রয়োজনে কতকগুলি বার্ত্তিকাদিসূত্রের অবতারণা করিয়াছেন। যে-সমুদয়-শব্দ রক্ষা করিবার মানসে, ইঁহারা এসকল সূত্র

করিয়াছেন, এতটুকু অনুধাবনা করিলে দেখা যাইবে যে, সে সমুদয় স্বয়ং পাণিনি সূত্রদ্বারাই রক্ষিত হইয়া রহিয়াছে। সন্দেহ নিবারণের জন্য, পাণিনি নিজেই 'বহুল'-শব্দের পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ করিয়াছেন। প্রাচীনেরাও বলিয়াছেন,—

স্থূত্র এবহি তৎসর্ব্বং যদ্‌বৃত্তৌ যচ্চবার্ত্তিকে।
সূত্রং যোনি বিহার্থানাং, সর্ব্বং সূত্রে প্রতিষ্ঠিতম্॥

অর্থাৎ, বৃত্তিই বল, আর বার্ত্তিকই বল, সূত্রেই উহাদের অর্থ নিহিত রহিয়াছে; সূত্রই সকল অর্থের মূল, সকলই সূত্রে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অধিকন্তু, অন্যান্য ব্যাকরণে যে সমুদয় কথা টীকাতে উল্লিখিত হইয়াছে, পাণিনি সে সমুদয়কে মূলেই স্থান দিয়াছেন; তজ্জন্যই পাণিনীয় সূত্র-সংখ্যা এত অধিক। যে পাণিনি ব্যাকরণ একটী মহা-প্রাণ কামধেনু, যে পাণিনি ব্যাকরণের সূত্র-ভঙ্গিদ্বারা ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান সমস্ত শব্দ অনায়াসে দোহন করা যাইতে পারে, সেই জলন্ত জীবন্ত ত্রিকাল-সত্য বিজ্ঞান-সম্মত অষ্টাধ্যায়ী হইতে চ্যুত হইয়া আজকাল বঙ্গদেশ কেবল স্কুল-কলেজ ও টোল-পাঠ্য ব্যাকরণ-রাশিতে প্লাবিত! যে-ভাষা ও যে-ব্যাকরণ এতদূর সহজ এবং যাহা সরল-তর-রূপে বুঝাইয়া দিবার জন্যেও, মুগ্ধবোধ-কলাপ-সারস্বত-সুপদ্ম-প্রভৃতি দশ-বিশ ব্যাকরণ আবিষ্কৃত হইল! টীকার টীকা তস্য টীকার অবতারণা হইল! সেই ভাষার ও সেই ব্যাকরণের দুরূহত্ব অদ্যাপি ঘুচিল না কেন? আমাদের মতে, নূতন নূতন ব্যাকরণ কর্ত্তারাই ইহার জন্যেও দায়ী; টীকার টীকা তস্য টীকা লেখকগণকেই ইহার কৈফিয়ৎ দিতে হইবে। তাঁহারাই এমন কিছু করিয়াছেন যাহাতে সরল-পাণিনিও গরল-রূপে প্রতীয়মান হইতেছে। নতুবা সেই অযোধ্যা, তবে সংসার এত হাহাকারময় কেন? নিশ্চয়ই পণ্ডিতমান্য ব্যাকরণ কর্ত্তারা আপন-আপন ব্যাকরণে আপন-আপন মতলব সিদ্ধ করিতে গিয়া, ক্লাস্‌-বুক্ স্কুল-বুক্ নোট্‌-বুক্ বা টোল-পাঠ্য-ও নীচ-দরের পুস্তক লিখিয়া, এই সর্ব্বনাশটী ঘটাইয়াছেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উপক্রমণিকা ও ব্যাকরণ-কৌমুদীর নমুনায় স্কুল-পাঠ্য ব্যাকরণ লিখিয়াও, বর্ত্তমান যুগের ব্যাকরণকারগণ এইরূপই অনিষ্ট-সাধন করিতেছেন ও করিবেন সন্দেহ নাই।

সেই রাম, সেই অযোধ্যা তথাপি সংসার হাহাকারময় কেন?

নতুবা বোম্বাই ও বারাণসী অঞ্চলে ব্যাকরণের নামে এত ভয় হয় না, আর বঙ্গদেশে এত ভয় হইতেছে কেন? কারণ সেই-সেই অঞ্চলে, একমেবাদ্বিতীয়ং পাণিনি-ব্যাকরণই একচ্ছত্র রাজত্ব করিতেছে, তাহা হইলে, বঙ্গদেশেও তাঁহারই শাসন প্রবর্ত্তিত হওয়া উচিত। আর, রাজা থাকিতে কোতোয়ালের দোহাই বা, কেন? সহস্র-রশ্মি ছাড়িয়া, আমরা অন্ধকার-প্রকোষ্ঠে গিয়া, দীপ-শিখার শরণাপন্ন হইব কেন?

রাজা থাকিতে কোতোয়ালের দোহাই কেন?

কাগজপত্রের অল্পতা নিবন্ধনই হউক, আর পাণ্ডিত্যপ্রকাশের জন্যেই হউক, বিশাল-সংস্কৃত-জগতে সন্ধির বড়ই বাড়াবাড়ি ছিল। সৌভাগ্যক্রমে, আজকাল লোকের সেই নেশাটা ছুটিয়া যাইতেছে। বাক্যে যে স্থানটির দ্রুত-উচ্চারণ করিতে হয়,

ব্যাকরণের মধ্যে সন্ধির স্থান কোথায়? আদিতে কি অন্তে?

সেই স্থানেই আপনা- আপনি দুই বর্ণের সন্ধি হইয়া পড়ে। ('ভাষায় বর্ণবিপ্লব' শীর্ষক প্রবন্ধ দেখ।) অনেকে সন্ধির এই আদি কারণটীর কথা ভুলিয়া গিয়া, যে-স্থানে সন্ধি না করিলেও চলিতে পারে, সে-স্থানেও সন্ধি করিয়া, বিষম বিভ্রাট্ ঘটাইয়া থাকেন। আর কেহ কেহ, বাক্যে অভূতপূর্ব্বচ্ছেদের আবিষ্কার করিয়া থাকেন; যথা—

সর্ব্বদ্রব্যেষু বিদ্যৈব, দ্রব্যম্ আহুর অন্-উত্তমম্।
অ-হার্য্যত্বাদ্ অন্-অর্ঘত্বাদ্, অক্ষয়ত্বাচ্ চ সর্ব্বদা॥

এই শ্লোকটীকে পড়িয়া থাকেন যে,—

সর্ব্বদ্রব্যেষু বিদ্যৈব, দ্রব্য মাহু রনুত্তমম্।
অহার্য্যত্বা দনর্ঘত্বা, দক্ষয়ত্বা চ্চ সর্ব্বদা॥?

সন্ধি ও ডডনংএর গল্প।

এস্থানে, আমরা ডডনংএর গল্পটী না বলিয়া পারিলাম না। কোনও ছেলে প্রথম কলিকাতায় গিয়া, রাস্তার পার্শ্ববর্ত্তী কোন দেয়ালে একটী সাইন্‌বোর্ড দেখিয়া, পড়িতে লাগিল "হরেক রকম্বা জিওবা রুদেরকা রখানা ডডনং।" ("হরেক রকম বাজি ও বারুদের কারখানা ৬৬নং")। এইরূপ 'সিদ্ধিঃ সাধ্যে সতাম্ অস্তকে' 'সিদ্ধি সাধ্যে সতামস্ত' করিয়া অনেকেই পাঠ করিয়া থাকেন। কলাপ-ব্যাকরণের 'ব্যঞ্জনম্ অ-স্বরং পরং বর্ণং নয়েৎ' এই সূত্রটীর অকাণ্ডে প্রচণ্ডতা এতই অধিক। কিন্তু উহা সম্পূর্ণ অ-পাণিনীয়। এরূপ-পাঠে বোধ-সৌকর্য্যও নাই, আবৃত্তি সৌকর্য্যও নাই, তথাপি গতানুগতিক ন্যায়ে অনেকেই ওরূপ পাঠে অভ্যস্ত। আপোমার্জনেও অনেকে, 'আপো জনয়থা চনঃ'কে 'আপোজন যথাচনঃ' করিয়া পড়িয়া থাকেন। এরূপ, 'সত্যঞ্চাভীদ্ধাৎ তপসো'কে 'সত্যঞ্চাভী দ্ধাত্তপসে' পড়িয়া থাকেন।

মূর্খে না বুঝিতে পরে, পণ্ডিতের লাগে ধন্দ।

একদিকে লম্বা-লম্বা সমাস-বিন্যাসে, অপরদিকে এরূপ সন্ধিতে, সংস্কৃতভাষা এমন হইয়া দাঁড়াইতেছে যে, "মূর্খে না বুঝিতে পারে, পণ্ডিতের লাগে ধন্দ।"

শব্দ-শাস্ত্রে কোন্ অধ্যায় প্রথম-স্থান পাইবার উপযুক্ত।

এইরূপ অস্বাভাবিক শব্দ-যোজনা ভেদ করাইবার জন্যেই আধুনিক ব্যাকরণ লেখকগণ স্ব-স্ব-রচিত ব্যাকরণের সর্ব্বাগ্রে সন্ধির অধ্যায় সন্নিবেশিত করিয়াছেন। সেই স্রোতের বশবর্ত্তী হইয়া ভট্টোজিও সিদ্ধান্তকৌমুদীতে সন্ধির সূত্রগুলিকে পূর্ব্বেই স্থান দিয়াছেন। পাণিনি এই প্রণালীর শিরে পদাঘাত করিয়া স্বকীয় শব্দ-বিজ্ঞান-অষ্টাধ্যায়ীতে, সন্ধিকে আগম-আদেশের মধ্যে স্থান দিয়াছেন। বস্তুতঃ, ব্যাকরণের বিষয়গুলি এক মণ্ডলাকারে বসিলেই ঠিক্ হয়। তন্মধ্যে, কোন্ বিষয়টী অগ্রে, এবং কোন্ বিষয়টী পশ্চাৎ পড়িতে হইবে, তাহা পাঠকদের ভিন্ন ভিন্ন রুচির উপরে নির্ভর করিবে। উত্তরবঙ্গে, যে সমুদয় টোলের ছাত্র অষ্টাধ্যায়ী পড়িতে আরম্ভ করেন তাঁহারা সর্ব্বাগ্রে সপ্তম-অধ্যায়ের প্রথম-সূত্র 'যুবোরণাকৌ' হইতে আরম্ভ করিয়া থাকেন। আবার, বাক্যে বিভক্তি-হীন পদ-প্রয়োগ এক-দম নিষিদ্ধ। সুতরাং সুবন্ত ও তিঙন্ত প্রকরণই সর্ব্বাগ্রে পঠিত হওয়া উচিত। এমতাবস্থায়, ব্যাকরণে শিশুর অবশ্য-জ্ঞাতব্য

এতগুলি মনোহর বস্তু থাকিতে, কেবল সন্ধির সূত্র লইয়া মাথা ঢুশা-ঢুশি করা আদৌ যুক্তিযুক্ত নহে। যে ছেলে সুধী-শব্দ কি তাহা জানে না; উপান্ত-শব্দ কি, তাহাও জনেনা; তাহাকে সন্ধিজ সুদ্ধ্যুপাস্য শব্দটী গেলান কতদূর শ্রেয়ঃ তাহা চিন্তনীয় বিষয় বটে। তার উপরে আবার অজস্র আপত্তি সূত্র চাপাইয়া দিলে আরও সুন্দর?

কি কৌশলে, পাণিনি-মুনি হাজার চারি সূত্রদ্বারা লৌকিক ও বৈদিক সমগ্র সংস্কৃত-সাহিত্য-জগৎকে সাধিয়া ছেন, তাঁহার কোন্ গুণে মুগ্ধ হইয়াই বা প্রাচীনগণ বার্ত্তিক সূত্রগুলিকেও পাণিনি-সূত্রের ডালপালা রূপে গণ্য করিয়াছেন, কোন্ গুণেই বা পাণিনির এক একটী ব্যাপক সূত্রকে পাণিনিসেবীরা একএকটী চিন্তা-মণি বলিতেও কুণ্ঠিত হয়েন না—সে বিষয় আলোচনা করিতে হইলে আমাদিগকে সংস্কৃত-সাহিত্যের সূত্রযুগে উপস্থিত হইতে হয়।

সংস্কৃত-সাহিত্য ইতিহাসে সূত্র-যুগ।

সংস্কৃত-সাহিত্যের ইতিহাসে সূত্রযুগ নামে একটী যুগ ছিল। সেই সময়ে, সংস্কৃত-পঠন-পাঠন-কারি-গণ আজকালকার মত ছাপান পুস্তক পাইতেন না। মুদ্রাযন্ত্রের প্রচলন দূরের কথা; ছাত্রগণকে মুখে মুখেই সমস্ত শাস্ত্র অভ্যাস করিতে হইত; কখনো কখনো বা ছাত্রগণ অধ্যেতব্য শাস্ত্র লিখিয়া লিখিয়া লইতেন। অধ্যাপক ম্যাক্‌ডনেল্ড্ বলেন "গ্রীস্ ও রোমদেশীয় সাহিত্য একত্রিত করিলে, তাহার সমষ্টি সংস্কৃত শাস্ত্র রাশির সমান হইবে"। এমতাবস্থায়, বিশাল বিশাল এক এক শাস্ত্র শিক্ষা করিতে ছাত্রদিগকে স্মৃতি-শক্তির উপরে অত্যন্ত নির্ভর করিতে হইত। ব্যাপারটী সহজ নহে। তাই, অধ্যাপকগণ অধ্যেতৃগণের স্মৃতি-সুবিধার জন্যে স্ব স্ব অধিকৃত শাস্ত্রের তত্ত্বগুলিকে সংক্ষিপ্ত-সূত্রদ্বারা বাঁধিয়া, শিষ্যগণ-কর্তৃক ধারণ করাইতেন। সুতরাং সূত্রগুলির আর্থিক উৎকর্ষ ব্যতিরেকে বিলক্ষণ মৌখিক উৎকর্ষও ছিল। সূত্রগুলিকে যে ভাবে রচনা করিলে উহারা সুবচ হইবে, এবং ছাত্রেরা অনায়াসে মুখস্থ করিতে পারিবে, সূত্রকারগণের তৎপ্রতি বিলক্ষণ দৃষ্টি ছিল।

সূত্র।

কথিত আছে, কোনও সূত্রকে একটি অর্দ্ধমাত্রা পরিমাণে সংক্ষিপ্ত করিতে পারিলে, বৈয়াকরণগণ পুত্রোৎসব জ্ঞান করিতেন। (অর্দ্ধমাত্রা-লাঘবেন পুত্রোৎসবংমন্যন্তে বৈয়াকরণাঃ।) কারণ, সূত্রের খর্ব্বতা-দীর্ঘতাদ্বারা উহার দোষ-গুণের বিচার হইত। সূত্রকারগণ সূত্রগুলিকে ব্যাকরণ-দুষ্ট করিয়াও সুবাচ্য ও সুশ্রাব্য করিতে ত্রুটি করেন নাই। পাণিনি স্বয়ম্ই ব্যাকরণের মেরুদণ্ডস্থানীয় লিঙ্গ-বচনের প্রতি অবাধে অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া, সূত্র রচনা করিয়াছেন। যথা (১) 'যুবোরণাকৌ'-সূত্রে সমাহারে পুংলিঙ্গতা। (২) গাণ্ড্যজগাৎসূত্রে দ্বিবচনে একবচন প্রয়োগ। (৩) অস্মায়া-মেধাস্রজোবিন্‌সূত্রে বহুবচন স্থলে একবচন প্রয়োগ ইত্যাদি। ("সূত্রে লিঙ্গ-বচনম্ অতন্ত্রম্")। সংস্কৃতভাষায় বিভক্তি-হীন শব্দ প্রয়োগ করা নিষিদ্ধ ইহা একটি স্থূল কথা। কিন্তু অসংখ্য-স্থলে পাণিনী-সূত্রে বিভক্তিহীন শব্দ দেখিতে পাওয়া যায়। 'হনস্ত চ' যুস্ম্যাখ্যোনদী' 'বাজ্ঞঃ ক চ' 'জ্য চ' ইত্যাদি। যে সকল

দোষ ছাত্রদের রচনাতে লক্ষিত হইলে তৎক্ষণাৎ চপেটাঘাত পড়িয়া থাকে, পাণিনীয় ব্যাকরণের ভাষাতেই সে সমুদয় দোষের অন্ত পাওয়া দুর্ঘট ইহাতে পাঠক দুঃখিত হইবেন না। সৌত্রজগতে এ সকল দোষ দোষই নহে। আর "নিরঙ্কুশাঃ কবয়ঃ"—অর্থাৎ পণ্ডিত-মাতঙ্গ ব্যাকরণ-অঙ্কুশের ভয়ে ভীত হয়েন না। তাঁহাদের ভাষা ভীষণ দুর্নিবার বেগে দৌড়িয়া চলিবেই চলিবে। ব্যাকরণ তাহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া এবং তাঁহার গতিবিধি নিরীক্ষণ করিয়া, ভাষা কোন্ দিক্ হইতে আসিতেছে, কোথায় চলিয়া যাইবে, তাহাই মাত্র বলিয়া দিতেছে। আর, যে সংস্কৃত-জগতে ইতিহাস গ্রন্থগুলিও পদ্যে রচিত হইয়াছে, সেই সাহিত্য-জগতে ব্যাকরণের সূত্রগুলিও অন্ততঃ সুশ্রাব্য হইবে ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। পাশ্চাত্য-বৈজ্ঞানিকেরাও এই মাননিক (Mnemonic) সূত্রের উপাদেয়তা অঙ্গীকার করিয়া, রামধনুকের সাতটি রঙ্‌কে ভিব্‌জিয়র্ (Vibgyr) বলিয়া থাকেন, যেন ঐ রঙ্-মালার রঙ্‌গুলির পৌর্ব্বাপর্য্যেরও অক্ষুণ্ণ-স্মৃতি থাকে। রসিক পড়ুয়াগণ পাণিনী সূত্রের মধ্য হইতে আশ্চর্য্য-রসও বাহির করিয়া থাকেন। যথা, মাঝে মাঝে যুবক-বৃন্দের মধ্যে প্রশ্ন হইল যে, 'একোগোত্রে' 'স্ত্রী পুং বচ্চ' 'বৃদ্ধো যুনা' 'সর্ব্বস্থ দ্বে' পাণিনীর এই চারিটি সূত্রকে একই শ্লোকের চারি-পাদের প্রথমে বসাইয়া, একটী কবিতা রচনা করিতে হইবে। আর, অমনি শ্লোক রচিত হইল যে,

'একো গোত্রে' স ভবতি পুমান্,
যঃ কুটুম্বান্ বিভর্ত্তি,
'স্ত্রী পুংবচ্চ' প্রচরতি যদা,
তদ্ধি গেহং প্রণষ্টম্।
'বৃদ্ধো যুনা' সহ পরিচয়াৎ,
ত্যজ্যতে কামিনীভিঃ
'সর্ব্বস্থ দ্বে' সুমতি-কুমতী,
সম্পদ্-আপত্তি-হেতূ।

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি কুটুম্ব-বর্গকে ভরণ-পোষণ করিয়া থাকেন, বংশের মধ্যে কেবল তিনিই পুরুষ-পদ বাচ্য; যে ঘরে স্ত্রীলোক পুরুষের আচরণ করিতেছে, সেই ঘরকে বিনষ্টপ্রায় জানিবে; যুবকের সঙ্গে পরিচয় হইলে, কামিনীগণ বৃদ্ধকে পরিত্যাগ করিয়া থাকে; আর প্রত্যেক ব্যক্তিরই সম্পদ্ বিপদের মূলে দুইটি ভার্য্যা আছে—সুমতি ও কুমতি। আবার, আমার জনৈক বন্ধু, তাঁহার ব্যাকরণ-সূত্র-শিক্ষণ-প্রণালীর কথা এইরূপ বলিয়াছেন —ক্লাসে তাঁহার অধ্যাপক পড়াইয়াছেন 'চিণ্ তে পদঃ' 'চিণ্ ভাব-কর্ম্মণোঃ' তিনি মনে করিয়াছেন "পদ চিন্‌তে, ভাব-কর্ম্ম-(অশ্রৌ) চিন"। আর মাহেশ্বরের বর্ণমালাকে একদমে উচ্চারণ করিলে, ঠিক্ যেন ঢাকের ধ্বনিই হইয়া থাকে। যথা 'অই উণ্, ঋ ৯ ক্, এওঙ্, ঐ ঔচ্, হয়বরট্, লণ্, ঞমঙণ নম্, ঝভঞ্, ঘঢধষ্, জব গড দশ্, খফছঠথ চটতব্, কপয়্, শষসর্, হল্।

গৃহ্য-সূত্র শ্রৌত-সূত্রাদির সম-সাময়িক সূত্রে যে অপূর্ব্ব রস নিহিত রহিয়াছে, আধুনিক ব্যাকরণের সূত্রে সেই রস না পাইয়াই যেন শিক্ষিত সমাজ আজ কাল বিশুদ্ধ পাণিনীর দিকেই অগ্রসর হইতেছে। সুতরাং পাণিনীয়-সূত্রের বোধ-সৌকর্য্যার্থ, সৌত্র-সাহিত্য-

সূত্রের লক্ষণ।

সংক্রান্ত একটু আলোচনা করা এস্থলে সমীচীন বলিয়া বোধ হইতেছে। সূত্রগুলির সাধারণ ও বিশেষ লক্ষণ আছে। সাধারণ যথা—স্বল্পাক্ষরম্ অসন্দিগ্ধং, সারবদ্ বিশ্বতোমুখম্। অস্তোভম্ অনবদ্যঞ্চ সূত্রং সূত্রবিদো বিদুঃ। (১) সূত্রগুলি স্বল্পাকার হইবে, অর্থাৎ প্রত্যেক সূত্রকেই যথাসম্ভব কম-অক্ষরে গাঁথিতে হইবে। যেমন পাণিনীসূত্রে ক্বিপ্-কিন্-কে ক্বি, লিট্-লিঙ্কে লি, দশ-লকারকে ল, স্বরবর্ণকে অচ্ ই-উ বর্ণকে (সন্ধি করিয়া) যূ, এবং আত্মনেপদকে তঙ্ বলা হইয়াছে। ফলতঃ সূত্রগুলি নিরর্থক-বর্ণ-শূন্য হইয়াছে। (২) সূত্রগুলি অসন্দিগ্ধার্থ হইবে, অর্থাৎ কোনও সূত্রে কোন দ্ব্যর্থবাচক-পদ থাকিতে পারিবে না যেমন, অইউণ্। ঋ৯ক্। এও ঙ্। ঐঔচ্ ইত্যাদি-সূত্রে অবশ্য-কর্ত্তব্য সন্ধিও করা হয় নাই;—এস্থলে সন্ধি করিলে, সূত্রগুলি সুখবোধ্য হওয়া দূরে থাকুক, স্বরবর্ণগুলির রূপ চিনিয়া উঠাই কষ্টকর হইত। এইরূপ, নকারান্ত আত্মন্-শব্দকে চিনাইবার জন্যে, 'আত্মন্-বিশ্বজন'-সূত্রে অবশ্য-কর্ত্তব্য নকার-লোপও করা হয় নাই। কোন কোন স্থলে, পূর্ব্ব-পর স্বরবর্ণ দ্বয়কে পৃথক্ দেখাইবার জন্যে, উভয়ের মধ্যে একটা 'দকার' আনা হইয়াছে যেমন 'ঋদোরপ্'। (৩) সূত্র-গুলি সারবান্ অর্থাৎ ন্যায়ানুমোদিত হওয়া চাই। যথা, (যথানির্দ্দিষ্টং সূত্রং ও স্থানেঽন্তর তমঃ সূত্র। 'সারোবলে স্থিরাংশেচ, ন্যায্যে ক্লীবংবরে ত্রিষু'। ইত্যাভিধানিকাঃ।) সূত্র-রচনা প্রণালী প্রসিদ্ধ ন্যায়ের অনুকূল না হইলে, সূত্রার্থের সহজে উপলব্ধি হয় না। কেহ কেহ বলেন যে, 'সূত্রগুলি স-প্রয়োজন হওয়া চাই,' ইহাই সারবত্তা শব্দের অর্থ। (৪) সূত্র-গুলি বিশ্বতো-মুখ হওয়া উচিত। অধিকার সূত্র, বিধি-সূত্র নিয়ম-সূত্র প্রভৃতি নানা জাতীয় সূত্রের মধ্যে, যখন যে জাতীয় সূত্র দ্বারা, বর্ণনীয় অর্থ স্পষ্ট বুঝান যায়, তখন সে জাতীয় সূত্র করাই উচিত। (সামবেদে গীতালাপ পূরণাক্ষরের নাম স্তোভ।) (৫) যে, অর্থ যুক্তি বলে অনায়াসেই লাভ করা যায়, সেই অর্থ প্রকাশ করিবার জন্যে কোনও শব্দ-প্রয়োগ করিবার প্রয়োজন নাই। যেমন বহুস্থলে, যোগ-বিভাগ ও জ্ঞাপক দ্বারাই অর্থ-বোধ হইয়া থাকে। (৬) সূত্রগুলি অনবদ্য বা নির্দ্দোষ হওয়া চাই। যথা, বিশ্লিষ্ট সন্ধি র্ভিন্নার্থো, গুরুর্ব্যাহত এব চ, পুনরুক্ত পদার্থশ্চ পঞ্চদোষাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ। অকারণে সূত্রের মধ্যে বিসন্ধি-পদ রাখা, পরস্পর অসম্বদ্ধ অর্থের প্রয়োগ করা, বিনা-প্রয়োজনে অল্পাক্ষর শব্দ ছাড়িয়া বহু-স্বর শব্দ-প্রয়োগ করা, যুক্তি-লভ্য অর্থ-প্রকাশের জন্যে অধিক শব্দ প্রয়োগ করা, পুনরুক্তি-পরিহার না করা—এই পাঁচ রকমের দোষ সর্ব্বথা পরিহার্য্য। বলা বাহুল্য যে, যে স্থলে কেবল দ্বিবচন-দ্বারাই দ্বিত্ব উক্ত হইতে পারে, সে স্থলে অকারণ দ্বি-শব্দ প্রয়োগ করাও দোষাবহ।

সূত্রগুলির বিশেষ লক্ষণ এই

সংজ্ঞা চ পরিভাষা চ বিধির্নিয়ম এব চ।
প্রতিষেধোঽধিকারশ্চ ষড়বিধং সূত্রলক্ষণম্॥

সংজ্ঞা পরিভাষাদি ভেদে, সূত্র ছয় প্রকার। (১) যে সূত্রে কোনও শাস্ত্রীয় নামের অর্থ বলিয়া দেয় তাহাকে সংজ্ঞা-সূত্র বলে। যেমন কর্ত্তা, কর্ম্ম প্রভৃতি নামের সংজ্ঞা-সূত্র স্বতন্ত্রঃ

কর্ত্তা ইত্যাদি। (২) কোন কোন স্থলে সূত্র-কার, এক বিশেষ প্রণালীতে সূত্রের ব্যাখ্যা করিতে ইচ্ছা করেন, বিমতি বারণের জন্মে যে সকল সূত্রে সূত্রকার সেই বিশেষ প্রমাণ, বলিয়া দেন, সে সমুদয় সূত্রকে পরিভাষা-সূত্র কহে। যেমন, পাণিনি সূত্রের পঞ্চমী-ষষ্ঠী ও সপ্তমী বিভক্তির অর্থ ও ককার-টকার-মকার লোপী আগমের অর্থ, তিনি স্বয়ংই বলিয়া দিয়াছেন।* কেহ কেহ এই পরিভাষা সঙ্কেতকে অনিয়মে নিয়মকারিণী বলিয়া থাকেন। (৩) যে সমুদয় সূত্রে কোন না-জানা বিষয় জানাইয়া দেয়, সেই সকল অজ্ঞাত-জ্ঞাপক-সূত্রকে বিধি-সূত্র বলে। যেমন, 'এরচ্' 'কর্ম্মণ্যণ্'। ইকারান্ত ধাতুর পরে কর্তৃবাচ্যে অচ্-প্রত্যয় হয়, কর্ম্ম কারকপূর্ব্বকধাতুর পর অণ্ প্রত্যয় হয় ইত্যাদি। (৪) যে সূত্রদ্বারা সাধারণ অর্থে ব্যবহার্য্য কোনও বিধিকে কেবল বিশেষ অর্থেই সংযত করা হয়, সেই সূত্রকে নিয়ম সূত্র কহে। 'হস্তিন' শব্দে হাতীকে বুঝায় বলিয়া, স্বতন্ত্র সূত্রদ্বারা হস্তিন্ শব্দে (অস্ত্যর্থীয়) ইন প্রত্যয়েরও বিশেষ অর্থ দেওয়া হইল। এইরূপ 'সাক্ষিন্' শব্দে সাক্ষাদ্‌দ্রষ্টাকে বুঝায় বলিয়া, তজ্জন্যও পৃথক্-সূত্র করিতে হইল। 'হস্তাজ্জাতৌ' 'সাক্ষাদ্রষ্টরি চ সংজ্ঞায়াম্'। (৫) কোনও বিধানের নিষেধ-জ্ঞাপক সূত্রকে প্রতিষেধ-সূত্র (৬) কোনও প্রকরণ আরম্ভক সূত্রকে অধিকার সূত্র কহে। এবং অধিকারের অন্য নাম প্রবর্ত্তন, অনুবৃত্তি, অন্বয় বা প্রকরণ। অধিকার সূত্রও চারিপ্রকার। (১) এক সূত্রস্থ শব্দের ক্রমা-গত বহুসূত্রের সহিত অন্বয়ের নাম গঙ্গা-স্রোতঃ অনুবৃত্তি, বা অনুবৃত্তি ধারা। (২) গোরুর পালস্থ গোরু-গুলি যেমন পরস্পরকে বাধাদিয়া ঠেলিয়া চলে, তদ্রূপ যে স্থলে দ্বিতীয় সূত্রটা প্রথমটাকে, তৃতীয় সূত্রটা দ্বিতীয় টাকে, চতুর্থ সূত্রটা তৃতীয়টাকে ইত্যাদি ক্রমে পর-সূত্র পূর্ব্ব সূত্রকে বাধা দিয়া থাকে, সেই অনুবৃত্তির নাম গবাং-যূথ অনুবৃত্তি (৩) যে স্থলে প্রথম-সূত্রস্থ কোনও পদ দ্বিতীয়-সূত্রের সহিত সম্বন্ধ না হইয়া, মণ্ডূক-প্লুতি বা ব্যাঙের লাফের মত তৃতীয়, চতুর্থ বা পঞ্চমাদি সূত্রের সহিত সম্বন্ধ হয়, সেই অনুবৃত্তির নাম মণ্ডূক প্লুতি অনুবৃত্তি আর (৪) সিংহ যেমন হাঁটিয়া হাঁটিয়া সম্মুখেরদিকে চাহে, এবং মধ্যে মধ্যে পশ্চাদ্-দিকেও তাকায় তদ্রূপ একসূত্রস্থ পদ তৎ-পূর্ব্ববর্ত্তী ও তৎ পরবর্ত্তী এই উভয়দিকের সূত্রের সহিত সম্বন্ধ হইলে তাহাকে সিংহাব-লোকিত অনুবৃত্তি কহে।

(গঙ্গাস্রোতো গবাং যূথো, মণ্ডূক প্লুতিরেব চ।
সিংহাবলোকিতশ্চৈব অধিকারশ্চতুর্বিধঃ।)

কেহ কেহ সূত্রগুলিকে, ষড়্-বিধ না বলিয়া, অষ্টবিধ বলিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে, অতিদেশ ও জ্ঞাপক নামে আরও দুই প্রকার সূত্র আছে। যে সূত্রে কোনও বিষয়ের † বিবরণ স্পষ্ট না বলিয়া, এই বিষয় ‡ অমুক-রূপ এইপ্রকার বলা হয়, সেই

* তস্মাদ্ ইত্যুত্তরস্য' 'অলোঽন্ত্যস্য' 'তস্মিন্নিতি নির্দ্দিষ্টে পূর্ব্বস্য'
'আদ্যন্তৌ ট-কিতৌ' 'মিদ্ অচোঽন্ত্যাৎপরঃ।

† (কোনও কার্য্যের, কোনও শাস্ত্রের, কোনও নিমিত্তের, কোনও নামের, বা কোনও রূপের)

‡ কার্য্য শাস্ত্র, কারণ, নাম বা রূপ)

সূত্রকে অতিদেশ-সূত্র কহে। একের ধর্ম্মকে অন্যের ধর্ম্মে আরোপ করার নাম অতিদেশ; * (analogy) যেমন, লোট্ বিভক্তির কার্য্য লঙের মত হইবে, 'লোটো লঙ্‌বৎ'। আর যে স্থলে, কোনও সূত্রের অর্থ হইতেই কোনও অন্তরং নিহিত-তত্ত্ব লাভ করা যায়, সেই স্থলে সেই সূত্রকে সেই অবান্তর তত্ত্বের জ্ঞাপক-সূত্র (corollary) কহে। বলা বাহুল্য যে, এরূপস্থলে সেই অবান্তর তত্ত্ব বিবৃত করিবার জন্যে আর স্বতন্ত্র সূত্র করা হয় না। কিন্তু অতিদেশ-সূত্রগুলি বিধি-সূত্রের, এবং জ্ঞাপক সূত্রগুলি পরিভাষা-সূত্রের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া, উহাদিগকে পৃথক্ শ্রেণীভুক্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করা অনাবশ্যক।

শ্রীদেবেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন, এম্-এ,
ঢাকা কলেজের সংস্কৃতাধ্যাপক।

স্বর্গীয়া প্রিয়তমা দেবী।

(১)

গম্ভীর ভেরী শব্দে সহসা খুলিল স্বর্গ-স্বর্ণ-দ্বার,
ভরিল শুভ্র পুণ্য আলোকে স্নিগ্ধবিমল সুষমাধার।
ঝলকিল যত চন্দ্রতারকা গ্রহ উপগ্রহ ভ্রাম্যমান,
হাস্য পূরিত আস্যে প্রকৃতি ত্যজিল পূর্ব্ব-সজ্জা ম্লান।
মন্দপবন, নন্দন বন-গন্ধ ছড়ায়ে গগনময়,
বহিল কাঁপায়ে উচ্চ-ত্রিদিব-হর্ম্ম্য-শিখরে পতাকাচয়।
গাহিল ত্রিদশললনাবৃন্দ,—বিপুল-পুলক-পূরিত-প্রাণ—
আবাহন-গীতি প্রীতি-বিজড়িতা সপ্তমে তুলি ললিত তান।
বাহিরিল সবে, করেতে অর্ঘ্য, অঙ্গে পূত মোহন সাজ,
তুষিতে তাদের প্রিয়তমা দেবী শাপমুক্তা স্বর্গে আজ।
অতুলিত-বিভা-মণ্ডিত-মুখী, মহতী-মাধুরী-মহিমা-যুতা,
দেখা দিল এক দিব্য মূর্ত্তি, সৌম্যা, যেমতি জলধি-সুতা।
সম্ভাষি তারে লয়ে গেল সবে, পারিজাত মালা পরা'য়ে গলে,
ত্রিদিবের জ্যোতি মিশিল ত্রিদিবে, স্মৃতি রাখি তার পৃথিবীতলে।

(২)

স্বচ্ছ-সলিল-শীকর-সিক্ত সমীরণ-সম শান্তিকরী
নির্ম্মল-নভো-নীলিমার ন্যায় আবিলতা-হীনা প্রকৃতি ধরি,

---

* প্রকৃতাৎ কর্ম্মণো যত্র তৎসমানেষু কর্ম্মসু। ধর্ম্মোঽতিদিশ্যতে যেন, অতিদেশঃ স উচ্যতে।



প্রিয়তমা দেবী

স্নেহ-প্রীতি-প্রেম-ভক্তি-করুণা-অমিয় উৎস হৃদয় ল'য়ে,
শূন্য-পথহারা তারকার পারা, এসেছিল দীন মরতালয়ে
একটী স্বরগ জ্যোতির কণিকা ; ধরার কলুষ-কালিমা-ছায়া,
নিভাইল তারে, না লভিতে তার শান্ত-উজল পূর্ণ কায়া।
কাল-পারাবারে বিশ্ব-নিচয় ফুটি অগণিত রাত্রি দিন।
নিমেষ মাঝারে কত শত হায় হইতেছে পুনঃ অসীম-লীন!
কিন্তু তার মাঝে দেখেছিনু যারে, প্রভাতকিরণে কনকময়,—
চিত্ত-নয়ন-নন্দন ; দেখি সর্ব্বপ্রথম তাহারই লয়!
ভ্রান্ত আমরা, মঙ্গলময় ধাতার নিগূঢ় বিধান সূক্ষ্ম
না বুঝি তাঁহারে নিন্দি নিয়ত, বলি "অকরুণ, কঠিন, রুক্ষ"!
গচ্ছিত ধন নিয়েছেন তিনি, সে ত নহে হায় মোদের বিত্ত,
চির-সুখ-ধামে গিয়েছে সে, তবে তার তরে কেন কাতর চিত্ত?

শ্রীঅনুকুলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

গত ১০ই ডিসেম্বর রাত্রি আড়াই ঘটিকার সময় একটি প্রফুল্ল কুসুম সহসা বৃন্তচ্যুত হইয়াছে। প্রিয়তমা দেবী উনবিংশ বর্ষ মাত্র জীবিত ছিলেন। এই স্বল্পকালের মধ্যে যিনি তাঁহার সহিত আলাপ করিয়াছেন, একবার তাঁহার সহিত যাঁহার পরিচয় হইয়াছে, তিনিই প্রিয়তমার সরল হৃদয় এবং স্নেহপূর্ণ ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়াছেন।

বালিকার জীবনে বৈচিত্র্যময়ী ঘটনাবলী থাকে না, কিন্তু প্রিয়তমার জীবনীতে এমন অনেক জিনিস শিখিবার আছে যাহা সচরাচর দৃষ্ট হয় না। সুপ্রসিদ্ধ কৃষ্ণনগরের লাহিড়ীবংশে প্রখ্যাতযশা, সেই ঋষিকল্প স্বর্গীয় রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত শরৎকুমার লাহিড়ী মহাশয়ের দ্বিতীয়া কন্যা প্রিয়তমা ১২৯১ সালের ৯ই আশ্বিন জন্মগ্রহণ করেন। জ্যেষ্ঠা ভগিনী মনোরমা অপেক্ষা প্রিয়তমাকে ছেলেবেলা হইতেই বড় দেখাইত। রুগ্ন অশীতিপর বৃদ্ধ রামতনু বাবুর শয্যাপার্শ্বে বালিকাদ্বয় যখন উপবেশন করিত, তখন বড় চমৎকার দৃশ্য হইত—একদিকে জীবনের অবসান, অন্যদিকে স্বাস্থ্যপূর্ণ নবীন জীবনের উদয়, একদিকে সমাপন, অন্যদিকে প্রারম্ভ। একদিকে পূর্ণবিকশিত শিথিল-বৃন্ত পুষ্প, আর একদিকে কি সুন্দর দুটি কুসুম-কোরক। বালিকাদুটিকে যে দেখিত, সেই ভাল বাসিত, সেই কোলে করিত।

শৈশবে গল্প ভালবাসে না, এমন বালক বা বালিকার কথা প্রায় শুনা যায় না। প্রিয়তমাও গল্প শুনিতে বড় ভালবাসিত। পিতার নিকট, মাতার নিকট, মাতামহীর নিকট বসিয়া গল্প শুনিত। যখন দুঃখের কাহিনী বলা হইত, অমনি বালিকার চক্ষের জল ঝর্ ঝর্ করিয়া পড়িত। সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী প্রভৃতি রাজমহিষীগণের দুঃখদুর্দ্দশার কথা শুনিতে শুনিতে কাঁদিয়া আকুল হইত। আবার যখন তাঁহাদের সৌভাগ্যের প্রসঙ্গ আসিত, তখন কি প্রফুল্লমুখে, কি আগ্রহে সমগ্র হৃদয় দিয়া বসিয়া শ্রবণ করিত—যেন সীতা, দময়ন্তী প্রভৃতি তাহার নিতান্ত আপনার জন।

দীনদুঃখী দেখিলে প্রিয়তমা তাহাদের দুঃখমোচনে ব্যাকুল হইত। নিজের সামান্য শক্তিতে যতটুকু পারিত তাহাদের উপকার করিত। বালিকার স্নেহ-

পূর্ণ কণ্ঠস্বরে পরিতৃপ্ত হইয়া ভিখারিগণ হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে চলিয়া যাইত।

কলিকাতা হেরিসন রোড নামক প্রশস্ত রাজপথের পার্শ্বেই প্রিয়তমার পিত্রালয়। রাজপথ বাহিয়া কত লোক দিবারাত্রি গমনাগমন করিত—পথিক পথ দিয়া আপন মনে গান করিতে করিতে চলিয়া যাইত—প্রিয়তমা অতি নিবিষ্টচিত্তে সেই সঙ্গীত শ্রবণ করিত। কখনও আপনার মধুর কণ্ঠে ঐ সুরের আবৃত্তি করিত। পিতা বুঝিতে পারিয়া হারমোনিয়াম্ পিয়ানো প্রভৃতি কিনিয়া দিলেন, আর সঙ্গীত-পারদর্শী এক ব্যক্তির হস্তে উভয়কন্যার সঙ্গীতশিক্ষার ভার অর্পণ করিলেন। প্রকৃতি একএক জনকে একএক বিষয়ে স্বভাবতঃই পারদর্শী করিয়া দেন। প্রিয়তমা আশৈশব সঙ্গীতানুরাগিণী, এক্ষণে সুবিধা পাইয়া সঙ্গীতবিদ্যার অনুশীলন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ইহার মধ্যে একটু চমৎকারিত্ব এই ছিল যে, ব্রহ্মসঙ্গীত এবং কীর্ত্তন ব্যতীত প্রিয়তমার আর কিছুই ভাল লাগিত না। উপাসনার প্রারম্ভে যখন প্রিয়তমা ভগবানকে আবাহন করিয়া তাঁহার সহায়তা ভিক্ষা করিয়া সঙ্গীত করিতেন, মনে হইত এ আবাহন তাঁহার চরণতলে পৌঁছিয়াছে। কতদিন উপাসনা-সময়ে তাঁহার মধুর সঙ্গীত শ্রবণ করিবার সৌভাগ্য আমার হইয়াছে—সে ঝঙ্কার যেন কর্ণে এখনও বাজিতেছে। সঙ্গীত শ্রেষ্ঠ সাধনা—, এই সাধনায় বোধহয় প্রিয়তমা সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, তাই তাঁহার প্রিয় সঙ্গীত

"তোমার এই ভবে মম কর্ম্ম যবে
সমাপন হবে হে;
ওহে রাজরাজ একাকী নীরবে
দাঁড়াব তোমার সম্মুখে।"

শ্রবণ করিয়া ভগবান তাঁহাকে আপনার শ্রীচরণচ্ছায়াতলে লইয়া গেলেন।

লোকের সহিত ব্যবহারে প্রিয়তমা অনুকরণীয়। কাহারও প্রাণে ব্যথা লাগিতে পারে, এমন কথা তিনি যেন জানিতেন না। এমন স্নেহপূর্ণ ব্যবহার এখনকার দিনে বিরল। শুনিলে বিস্ময়ে মন পূর্ণ হয়—প্রিয়তমা উপহাস করিতে জানিতেন না। সহজ কথা এতটুকু বাঁকাইয়া বলিলে সরল-হৃদয়া বালিকা আর বুঝিতে পারিতেন না, সত্যই এযুগে এমন সরলতা বিরল।

মিথ্যাকথাকে প্রিয়তমা বড় ভয় করিতেন। কেহ মিথ্যাকথা বলিলে যেন তাঁহার জ্বালা উপস্থিত হইত। মিথ্যাভাষীকে 'মিথ্যাকথা আর বলিব না' স্বীকার করাইয়া তবে তিনি নিরস্ত হইতেন।

এইরূপে জীবনের ভিত্তি গঠিত হইয়াছিল। কিছুদিন বেথুন স্কুলে পাঠ করিয়া প্রিয়তমা স্কুল পরিত্যাগ করিলেন। ১৯০৩ সনের অক্টোবর মাসে বরাহনগর নিবাসী ডাক্তার শ্রীযুক্ত মতিলাল মুখোপাধ্যায় রায় বাহাদুর মহাশয়ের দ্বিতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়ের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। প্রিয়তমার ব্যবহারে শ্বশুরালয়ের সকলেই প্রীত হইলেন। তাঁহার শ্বশুর শাশুড়ী তাহাকে আপনাদের কন্যা অপেক্ষাও অধিক আদর ও স্নেহ করিতেন। লোককে শ্রদ্ধাভক্তি আদর-যত্ন করাই প্রিয়তমার নৈসর্গিক গুণ ছিল।

অল্পদিন হইল প্রিয়তমা স্বামীর সহিত "ক্রীকুরো" নামক স্থানে অবস্থান করিতেছিলেন। আলো ও ছায়া রচয়িত্রী শ্রীযুক্তা কামিনী রায় লিখিয়াছেন "তাঁহাকে দেখিলে স্বাস্থ্যের প্রতিমূর্ত্তি বলিয়া মনে হইত।" বাস্তবিক স্বাস্থ্যপূর্ণ দেহের যে সৌন্দর্য্য তাহা প্রিয়তমাতে যথেষ্ট ছিল। এই দেহে গত ১০ই ডিসেম্বর প্রত্যূষে কি কালব্যাধি প্রবেশ করিল, ২০ ঘণ্টা না যাইতেই রাত্রি আড়াই ঘটিকার সময় প্রাণপাখী প্রিয়তমার দেহপঞ্জর ভগ্ন করিয়া কোন্ অজ্ঞাত দেশে উড়িয়া গেল! আনন্দপ্রভা স্বর্ণলতিকা ভূতলে পড়িয়া রহিল!

পঞ্চদশ মাস বয়স্ক একটি দুগ্ধপোষ্য শিশুকে অকূল দুঃখসাগরে ভাসাইয়া প্রিয়তমা চলিয়া গেলেন। যাহার গেল তাহারই কেবল গেল। তাহাতে পৃথিবীর কিছু হইল না। আবার তেমনি উষালোকের সহিত বিহগকণ্ঠে জাগরিত হইয়া প্রভাত দেখা দিল,

আবার প্রাত্যহিক নিয়মে ফুল ফুটিল, বায়ু বহিল, বেলা বাড়িল; লোকজন কর্ম্মক্ষেত্রাভিমুখে ধাবিত হইল। যাহার গেল সে ভগ্নপ্রাণে স্বুবর্ণপ্রতিমা চিতাভস্মে পরিণত করিয়া আসিল। শ্মশানে যখন সেই দেবি-প্রতিমার মুখাবরণ উন্মোচিত হইল বিকট দাহস্থল যেন আলোকময় হইয়া গেল। দর্শকগণ অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে কহিল "আহা, কার এমন সর্ব্বনাশ হইয়া গেল। কার ঘর অন্ধকার করিয়া আসিলি মা?" ক্রমে সব ফুরাইয়া গেল।

যেন হঠাৎ একটা ঝড় উঠিয়া প্রিয়তমাকে উড়াইয়া লইয়া গেল। যাহার কর্ম্ম সমাপন হইয়া গিয়াছে, তাহাকে যাইতে হইবে। প্রিয়তমা কর্ম্ম সমাপন করিয়া, রাজরাজের চরণতলে দাঁড়াইব বলিয়া যে আকাঙ্ক্ষা পোষণ করিয়া আসিতেছিলেন, সে আকাঙ্ক্ষা তাঁহার পূর্ণ হইয়াছে। ভগবান তাঁহার আত্মাকে আপনার অমৃতময় ক্রোড়ে স্থান প্রদান করুন, তাঁহার শোকসন্তপ্ত আত্মীয়-স্বজনবর্গের প্রাণে শান্তিবর্ষণ করুন, আর তাঁহার প্রাণের পুত্তলিটিকে বহুসুখের অধিকারী করিয়া দীর্ঘজীবন দান করুন এই প্রার্থনা।

শ্রীঅতুলচন্দ্র ঘটক বি, এ।

বিশ্বময়ী।

তব ছবিখানি রেখেছে আজিকে
নিখিল বিশ্ব ঢাকি;
যত দেখি তত তোমারেই দেখি—
কিছুই রহেনা বাকী।
যত না গন্ধগীতি
উঠিতেছে নিতি নিতি,
যত তারা হাসে সন্ধ্যা আকাশে,
প্রাণে ভাসে যত স্মৃতি,
সব সার্থক সব সুন্দর
তোমারে হৃদয়ে রাখি'।
মধুর মলয় বায়
পরাণ পরশি আধ আধ ভাবে
ভেসে ভেসে চলে যায়,
আনে সে বহিয়া তোমারি সুরভি,
গাহে সে তোমারি গীতি,
ওগো প্রাণময়ী প্রীতি!
তব সুর সনে সুর মিলাইয়া—
দূরে ফুকারিছে পাখী।
দূর নীল নভ চুমি'
সুষমা কুটায়ে আঁচল লুটায়ে
রয়েছ দাঁড়ায়ে তুমি!
পুলকের মেলা আঁখিজল খেলা
জীবনে মরণে যত অবহেলা,
সবারে নিয়াছ আপন করিয়া
সবার মরমে থাকি।
যেদিকেই চাহি তোমার বিকাশে
মুগ্ধ হৃদয়, আঁখি!

শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ সিংহ।

কোচিন-চীন।

১০ই ফেব্রুয়ারী।

প্রাতঃকাল ৬৷৷০টার সময়, আমরা ট্রাভান ছাড়িয়া তু-নাকের (Tou-Nac) অভিমুখে যাত্রা করিলাম। "নোয়া"র প্রজাবৃন্দ, কতকগুলি "মোই", আমাদের আগে-আগে চলিয়াছে; তাহাদের মধ্যে কেহ বা কাটারী দিয়া আমাদের পথ-রোধী কাঁটা গাছ, ও ডালপালা কাটিয়া ফেলিতেছে; কেহ বা তাহাদের পৃষ্ঠস্থ ঝুরীর মধ্যে আমাদের খাদ্য-সামগ্রী লইয়া যাইতেছে; কতকগুলি

অ্যানামবাসী কুলি আমাদের বোজ্‌কাবুজ্‌কি বহন করিতেছে; উহাদের মধ্যে দুইজন পথের মাঝে পীড়িত হইয়া পড়িল; মাটিতে পড়িয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল; রক্ষী-সৈনিকেরা দুইচার ঘা বেত লাগাইল; পরে ঐখানেই উহাদিগকে ফেলিয়া চলিয়া গেল। এই সময়ে ১২ জন বন্দুকধারী অ্যানামবাসী সৈনিক, এবং তাহার পর পাঁচজন য়ুরোপীয় আসিয়া উপস্থিত হইল:—ট্রামি ও ট্রাভানের দুইজন সৈন্যের উপনায়ক, একজন ডালচিনি ব্যবসায়ী, আমার বন্ধু ও আমি—এই পাঁচজন। সব শেষে আমাদের অ্যানামবাসী ভৃত্যবর্গ এবং তিনটা ঘোড়া। যেখানে সমভূমি সেই সব স্থান ছাড়া আমরা আর ঘোড়ায় চড়িয়া যাইতে পারিলাম না।

ট্রাভান পর্য্যন্ত প্রশস্ত রাস্তা; ট্রাভান ও তু-নাক্‌ এই দুই স্থানের মধ্য দিয়া একটা সরু সুঁড়ি পথ পাহাড়ের উপর দিয়া চলিয়াছে—একবার উঠিতেছে, একবার নামিতেছে; পাহাড়গুলা হঠাৎ একএক জায়গায় খাড়া হইয়া উঠিয়াছে। কতকগুলা পাথর, কতকগুলা শৈলখণ্ড, বড় বড় গাছের শিকড়—এই সমস্ত সিঁড়ির ধাপের কাজ করিতেছে। কোথাও বা পথের উপর প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গাছের গুঁড়ি পড়িয়া আছে—তাহার উপর দিয়া আমাদের যাইতে হইতেছে। ঘোড়ায় চড়িয়া হাঁটু-জলে তিন চারিটা নদী পার হইতে হইল।

৬॥৹টা হইতে ১১টা পর্য্যন্ত আমরা চলিলাম; চাটুনি দিয়া ভাত খাইলাম, তাহার পর ১টা হইতে ৩॥৹টা পর্য্যন্ত আবার চলিলাম। ত্রাভান ও তু-নাক্‌—এই দুই স্থানের মধ্যে, পর-পর চারিটা গিরিমালার উপর আরোহণ করিতে হইল। পরে, প্রায় ১২০০ metre পরিমাণ গিরি কন্দর অতিক্রম করিবার জন্য অতি কষ্টে উপরে উঠিতে হইল; অবশেষে, সেই গ্রাম Tou-Nac এ আবার অবতরণ করিলাম। তু-নাক ১০০০ metre (metre = এক গজের কিছু বেশী) উচ্চে অবস্থিত।

ঐ গিরি-কন্দর হইতে চমৎকার দৃশ্য দেখা গেল—যেন একটা গিরিমালার চক্র; একটার পর একটা এইরূপ ৫,৬টা গিরিমালার চূড়া উপর্য্যুপরি সমুত্থিত—এবং পরস্পরের সহিত জড়াজড়ি করিয়া রহিয়াছে। ১৮০০ metre পরিমাণ একটা গিরি-কন্দর দেখা গেল—সেই গিরি-কন্দর বরাবর লায়োস (Laos) পর্য্যন্ত গিয়াছে। দুর্ভাগ্যক্রমে কোয়াসা হওয়ায়, এই বিস্তীর্ণ পথের খুঁটিনাটিগুলা, আমাদের দৃষ্টিগোচর হইল না।

চারিটার সময় আমরা তু-নাকে আসিয়া পৌঁছিলাম। আমাদের অধিকাংশ লোকের পা ছোট ছোট জোঁকের কামড়ে রক্তারক্তি হইয়াছে; সমস্ত পথটায় জোঁক্‌ কিল্‌বিল্‌ করিতেছে; জোঁকের কামড়ে আমার ভৃত্যের পা একেবারে ক্ষতবিক্ষত; সে বলিল ১০০ টাকা দিলেও সে আর আমাদের সঙ্গে কোথাও যাত্রা করিবে না।

মোইরা আমাদের প্রতি সদয় হইয়া, তাহাদের গ্রাম হইতে কিয়দ্দূরে, বাঁশ ও তালপাতা দিয়া আমাদের জন্য একটা কুটীর নির্ম্মাণ করিয়াছে। মাটি হইতে এক metre উচ্চে, বাঁশের একটা মাচা উঠাইয়াছে; কম্বলে গা ঢাকিয়া, দুই রাত্রি আমরা সেই

মাচার উপর নিদ্রা গেলাম। এই উচ্চ স্থানে দিনের বেলা একটু ঠাণ্ডা এবং রাত্রে খুব শীত।

এইখানে পৌঁছিয়াই, রক্ষি-সৈনিকেরা কাজ আরম্ভ করিয়া দিল। বাঁশ কাটিয়া আমাদের জন্য একটা খাবার ঘর প্রস্তুত করিল—তাহাতে কাঠের টেবিল ও কাঠের বেঞ্চি আছে; তার পর, তাড়াতাড়ি তাদের নিজের জন্য, আমাদের ভৃত্য ও কুলিদের জন্য, রন্ধনের জন্য, ঘোড়াদের জন্য, কতকগুল ঘর উঠাইল। মুহূর্ত্তের মধ্যে, যেন একটা গ্রাম বসাইয়া দিল। এই বিস্তীর্ণ পার্ব্বতীয় ভূভাগে, এই দৃশ্যটি অতীব রমণীয়।

আমরা সেখানে পৌঁছিয়াই বাহির-হইতে সেই গ্রামটি দেখিতে গেলাম। গ্রামের চারিদিকে একটা পরিখা, তাহাতে বিষ-মাখানো ছুঁচাল কাষ্ঠখণ্ড সকল বসান আছে; আর একটা মাটির দেয়াল, তাহার উপর কতকগুলা গোঁজ পোঁতা; পরিখার উপর একটা গাছের গুঁড়ি ফেলিয়া রাখা হইয়াছে; সেই গুঁড়িটা সেতুর কাজ করে, তাহার উপর দিয়া প্রবেশ-দ্বারে যাওয়া যায়। এই গ্রামে প্রায় শ খানেক পূর্ণবয়স্ক পুরুষের বাস। এখানে অত্যন্ত আদিম ধরণের, চুনকাম-করা ৩০টা আবাস-গৃহ আছে—এই গৃহগুলা, কতকগুলি খোঁটার উপর স্থাপিত। নীচে,—মহিষ, শূকর, মুর্গী এবং উপরে মানুষ থাকে। গৃহের ছাদে, প্রথমে কতকগুলি পুরুষ, পরে কতকগুলি রমণী ও শিশু ভয়ে ভয়ে আসিল। অতীব কৌতূহলসহকারে তাহারা দূর হইতে আমাদিগকে দেখিতে লাগিল। রমণীরা, ক্ষুদ্র শিশুদিগকে তাহাদের কাপড়ে জড়াইয়া পৃষ্ঠের উপর লইয়া, গ্রামের ভিতর দিয়া গমনাগমন করে।

শাখা-জাতির সর্দ্দার এখানে আসিয়া রক্ষিত-সৈনিকদিগের নিকট প্রকাশ করিল,—এই সময়ে বিদেশীদের এই গ্রামে আসা নিষেধ; কেননা এখন একটা উৎসবের আয়োজন হইতেছে। আমরা যাহাতে গ্রামে প্রবেশ করিতে না পারি এই জন্য বোধ হয় একটা কাল্পনিক হেতু নির্দ্দেশ করিল। কিন্তু আমাদের ঘোড়াদের জন্য কিছু ধান্য পাঠাইতে সম্মত হইল।

মোইদের মধ্যে যাহারা বেশী সাহসী, তাহারা কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া ক্রমশ আমাদের ছাউনীর দিকে অগ্রসর হইল। তাহারা প্রায় নগ্নকায়; তাহাদের দেহের সুন্দর গঠন দেখিয়া আমরা তারিফ্ করিতে লাগিলাম। তাহাদের দেহ, স্থূলধরণের বিবিধ অলঙ্কারে আচ্ছন্ন;—কণ্ঠমালা, কাণবালা, চুলে কাঁটা। অধিকাংশ লোকের হাতে বল্লম—কাহারও হাতে বক্র ধনু। আমরা তাহাদিগকে শিষ্টতার সহিত অভ্যর্থনা করিলাম। এইরূপে শীঘ্রই আমাদের প্রতি তাহাদের সহানুভূতি আকৃষ্ট হইল। আমাদের সাজসজ্জা ও পরিচ্ছদ দেখিয়া তাহাদের খুব আমোদ হইল। বিশেষতঃ আমাদের জেব-ঘড়ি দেখিয়া তাহাদের খুব বিস্ময় জন্মিল; এই পদার্থের অংশগুলা আপনি-আপনি চলিতেছে—না জানি ইহার মধ্যে কি একটা রহস্যময় জীব আছে !!…

এই বুনোদিগের জন্য কোন উপঢৌকন আনি নাই বলিয়া আমাদের বড় আপশোস্ হইল। কিন্তু আমাদের

মাথায় বেশ একটা উপায় আসিয়া জুটিল। তাহার মনে পড়িল, এখনও আমাদের কতকগুলা খালি চাট্নির বোতল আছে। মোইদিগকে সেই সব বোতল আমরা দিলাম। তাহারা পাইয়া ভারী খুসী হইল। এই সকল বোতল তাহাদের নিকট বহুমূল্য দুর্লভ জিনিস। কোন কোন সার্ডিন-মাছের টিন-বাক্সের মধ্যে মৎস্যাকৃতি এক প্রকার ছোট ছোট ধাতব চামচ ছিল; সেই চামচ্গুলা উহাদিগকে দেওয়ায় উহাদের বড়ই আনন্দ হইল। উহারা তাহাদের চুলে গুঁজিয়া রাখিল। তাহাদের নিকট ইহা একটা অপূর্ব্ব অলঙ্কার,—আধুনিক ধরণের, নব্যতম ফ্যাসানের নূতন শিল্প-সামগ্রী!...

সায়াহ্নে, ভোজনের সময়ে ও ভোজনের পরে, আমাদের সেই সদ্যোগঠিত ভোজন-কক্ষে অনেকক্ষণ ধরিয়া মোইদের সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা চলিল। এই বন্যজাতি এতটা আদিম ধরণের যে উহাদের মধ্যে এখনও দ্রব্য বিনিময় প্রচলিত।—উহারা কাষ্ঠের বদলে অ্যানাম-বাসীদিগকে ডালচিনি দেয়। সমস্ত কাজ-কর্ম্ম মেয়েরাই করে; পুরুষেরা, শীকার করিয়া, বল্লম-হস্তে ইতস্তত বিচরণ করিয়া কালক্ষেপ করে। লাল চাউলই উহাদের প্রধান আহার। কোন বিশেষ দিনে, সমস্ত গ্রামের লোকে মিলিয়া বনে আগুন ধরাইয়া দেয়। এইরূপে ভূমি পরিষ্কৃত হইলে পর, উহারা তাহাতে লাল চাউলের বীজ বপন করে। এই ধানের ক্ষেত, সমস্ত গ্রামের সাধারণ সম্পত্তি বলিয়া গণ্য হয়। কিন্তু বোধ হয়, ডালচিনির গাছগুলা কতকগুলি বিশেষ ব্যক্তির কিংবা কতকগুলি বিশেষ পরিবারের নিজস্ব সম্পত্তি। মোইদিগের দুই প্রকার দেবতা;—এক, গৃহ-দেবতা—আর এক, ক্ষেত্র-দেবতা। কোন কোন উৎসবে, এই সকল দেবতার উদ্দেশে, উহারা মহিষ বলি দেয়।

১১ ফেব্রুয়ারী।

আজ প্রাতে কোয়াসা ও বৃষ্টি। বংশ-মঞ্চের উপর, পাশাপাশি আমরা সকলে কম্বল মুড়ি দিয়া শুইয়া আছি। তাল-পাতায়-ছাওয়া ঘরের চাল হইতে ফোঁটা ফোঁটা জল আমাদের কম্বলের উপর পড়িতেছে।

চাট্নীর বোতল-রূপ দুর্লভ উপহার পাইয়া মোইরা আমাদের খুব বশীভূত হইয়াছে। প্রথমে উহারা একটা ছোট শুয়োর আমাদের নিকট পাঠাইল; আমাদের পাচকেরা উহাকে মারিয়া, ও রন্ধন করিয়া, দিনের ও রাত্রির ভোজনের সময়, নানা-আকারে আমাদের সম্মুখে আনিয়া ধরিল:—"ফিলে," কট্লেট্, যকৃৎ,-সসেজ্ ও পুডিং। পাঁউরুটির অভাবে উহারা চাউলের এক প্রকার পিঠা বানাইয়া দিল।

আজ মোইরা আমাদিগকে তাহাদের গ্রামে লইয়া যাইবে। যাহাদিগকে আমরা মৎস্যাকৃতি চামচ দিয়াছিলাম তাহারা কর্ত্তব্যবোধে আমাদের শরীর-রক্ষী হইয়া আমাদের সঙ্গে যাইবে। বিশেষত একটি খ্যাঁদা-নাক্ ছোট ছেলে আমাদিগকে কিছুতেই ছাড়িবে না। আমি ও আমার বন্ধু, একজন জাপানী রমণীকে পূর্ব্বে জানিতাম—এ কতকটা তাহারই মত দেখিতে। সেই জাপানিনীর নাম—সাকু-সান্। আমরা এই নামে বালক-

টিকে ডাকিতে লাগিলাম। সেও আমাদের ডাকে উত্তর দিতে লাগিল।

গ্রামের চত্বরে, পূর্ণবয়স্ক লোক ও বালকেরা আমাদিগকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। আমাদের মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। আমাদের পরিচ্ছদ টিপিয়া-টিপিয়া দেখিতে লাগিল। রমণীরা গৃহের উপর হইতে আমাদিগকে অবলোকন করিতে লাগিল। এমন-কি উহাদের মধ্যে কেহ কেহ ফাঁপা বংশখণ্ডের ভিতর জল ভরিবার ছলে, চত্বরের উপর দিয়া আমাদের কাছে সাহস করিয়া আসিল। একটি নগ্নপ্রায় সুন্দরী বালিকা—চমৎকার গঠন—কাঁধের উপর দিয়া চুল এলাইয়া পড়িয়াছে—পীনোন্নত কঠিন বক্ষদেশ—বাহুদ্বয় বলয়-ভারাক্রান্ত—উৎস হইতে জল আনিবার ছলে, দুই তিনবার আমাদের নিকট দিয়া যাতায়াত করিল। আমাদিগকে দেখা ও নিজের রূপ দেখান—হয়ত ইহাই তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। একজন মোই, তাহার কুটীর-গৃহে যাইবার জন্য আমাদিগকে নিমন্ত্রণ করিল। একটা বৃহৎ আগুন জ্বালাইয়া তাহার চারি ধারে,তাহার স্ত্রী ও তাহার তিনটি শিশু সন্তান উভু হইয়া বসিয়া আছে। আমরাও তাহাদের মত উভু হইয়া বসিলাম। আমাদের অনুরোধক্রমে, গৃহস্বামী ও আর একজন মোই—ঢোলক ও "বোড়ং" নামক এক প্রকার তুরী বাজাইতে লাগিল। সেই বাদ্য-যন্ত্র হইতে উহারা এক ঘেয়ে ও অতিমধুর সুর সকল বাহির করিতে লাগিল।

যে সময়ে আমরা এই মনোহর দৃশ্যটি উপভোগ করিতে ছিলাম—সেই সময়, ডালচিনি ব্যবসায়ী, একটা গাছের সওদা করিতে ছিলেন ; মোইরা দুইটা মহিষ ও দশটা ঢাকের বদলে গাছটা দিতে চাহিতেছে। ডালচিনি ব্যবসায়ী ইহাতে ইতস্তত করিতেছেন।

আবার এদিকে, গ্রামের প্রধানের সহিত, ত্রাভানের রক্ষি-সৈন্যদলের, একটা কাজের বন্দোবস্ত সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা চলিতেছে—ত্রাভান হইতে তু-নাক্ পর্য্যন্ত এখন যে পথটা আছে তাহা অত্যন্ত খারাপ ; তাহার স্থানে একটা ভাল রাস্তা তাহার লোকজনের দ্বারা করাইয়া দিলে, তাহাকে মহিষ, ঢাক, মুক্তার হার প্রভৃতি উপহার দেওয়া হইবে। সেই রাস্তাটা, পরবর্ত্তী গ্রাম মাং-তা পর্য্যন্ত লইয়া যাইতে হইবে। তখন সেখানে সৈনিকদিগের একটা নূতন আড্ডা স্থাপিত হইবে। গ্রামের প্রধান, এই সকল উপহারের লোভ সম্বরণ করিতে পারিল না। "যে মহিষটা আমাকে দিবে সেটা কত উচু?—এতটা উচু? এই বলিয়া মহিষের পরিমাণটা হস্তের দ্বারা ইঙ্গিত করিল।...আহা বেচারা মোই! এখন উহারা পূর্ণ স্বাধীনতা সম্ভোগ করিতেছে। তাহাদের দ্বারা রাস্তা যখনই প্রস্তুত হইবে, তখনি সেখানে কতকগুলা সৈনিক স্থাপিত হইবে, তাহাদের নিকট হইতে করও আদায় করা হইবে ; বিনা ক্ষতিপূরণে, ডালচিনির গাছগুলার স্বত্বাধিকার উহাদিগকে ছাড়িয়া দিতে হইবে ; হয়ত উহাদিগকে জোর করিয়া কাজে খাটান হইবে ; এইরূপে যাহার নাম সভ্যতা সেই সভ্যতা উহাদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইবে। উহাদের সরলতা, উহাদের স্বাধীনতা, উহাদের সুখস্বচ্ছন্দতা চিরকালের জন্য অন্তর্হিত হইবে।

কাল প্রত্যূষে ৬টার সময় এখান হইতে

আমরা ছাড়িব—তাই আজ সকাল-সকাল শয়ন করিতে হইবে। রাত্রি ৮॥০ টার সময় আমরা সকলে শুইয়া নিদ্রার উদ্যোগ করিতেছি—এমন সময়ে হঠাৎ মশাল হাতে কতকগুলা মোই আমাদের তালপাতার কুটীরে প্রবেশ করিল। পাহারার সৈনিক একেবারে লাফাইয়া উঠিল; বিশ্বাসঘাতকতা হইল না কি?...একটা নৈশ আক্রমণ না কি?...না, তাহার ঠিক্ বিপরীত। সদাশয় মোইরা আমাদের বিদায় উপলক্ষে একটা ভোজ দিবে—তাই নিমন্ত্রণ করিতে আসিয়াছে। তখন আমরা শয্যা হইতে উঠিয়া, আমাদের কম্বলাদি সেইখানে রাখিয়া, মশালের আলোকে তাহাদের সঙ্গে চলিলাম। তাহারা গ্রামের সাধারণ অভ্যর্থনা-শালায় আমাদিগকে লইয়া গেল।

অপূর্ব্ব দৃশ্য:—একটা কাঠের ঘর,—ধূমাচ্ছন্ন, সেই ঘরের মধ্যে তিনটা আগুন জ্বলিতেছে; সেই অগ্নিশিখায় মহিষের কতকগুলা পাঁজরা পোড়ান হইতেছে। একটা অদ্ভুত পাত্রে আমাদিগকে এক প্রকার চাউলের সুরা পান করিতে দিল—শিষ্টতার নিয়মানুসারে এই সুরা উহারা অগ্রেই পান করিয়াছে। তাহার পর উহারা ঢোল বাজাইতে লাগিল। আমরা এই সুরামত্ত বুনোদিগের নোংরা হস্ত মর্দ্দন করিয়া উহাদের নিকট হইতে বিদায় লইলাম। এই অপূর্ব্ব দৃশ্য দর্শনে আমাদের নেত্রমুগ্ধ হইল এবং এই সকল বুনোদিগের সরল ও অকপট বন্ধুত্ব লাভ করিয়া আমাদের হৃদয় আর্দ্র হইল।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

দশপদী কবিতা।

কেন?

কেন নাচে ভাল্লুক? কেন লাফায় ব্যাং?
আর্শুলায়া ওড়ে?
রাজা কেন বলে লোকে ক্ষমতাহীন
খেতাব-ওয়ালাকে?
কেন বুড়া শুভ্র সত্য কলপ দিয়ে চুল
কালো করে রাখে?
মিউনিসিপাল—উড়ে কেন নিত্য নিত্য
রাস্তাগুলো খোঁড়ে?
পৌষের শীতে ভোর না হ'তে কেন ঠাণ্ডা
খেজুর রস চাখে?

কেন টাঙায় মশারি লোক? ঢুক্‌তে যখন
মশাই আগে ঢোকে?
ভূত পালায় যে তাঁতির তানে তারো
কেন তারিফ্ করে লোকে?
চাঁদের সাথে র'তে কেন বাদুড় পেঁচা
চাম্‌চিকেরা থাকে?
প্রাণের গভীর পাগলামি সে; কিম্বা
একটা মৌলিকতায় বেগে
এ সব কর্ম্ম করে; এবং তাহা ছ'ড়া
দশ পদী(ও) লেখে!

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

কবিতাগুচ্ছ।

কে বেশী সুন্দর ?

আগে পিছে দুটি মেয়ে কে বেশী সুন্দর।
কার প্রেম বল রবি বিশ্বে মনোহর।
আগে উষা নিজ মনে হেসে চলে যায়,
ভুলেও তোমার পানে ফিরিয়া না চায়।
চলে সে চপলাবালা চকিতে চাহিয়া—
জাগায়ে বিহঙ্গ কুল, বায়ু ছুটাইয়া।
ফোটা ফুল হেলে পড়ে মুখে খায় চুম্,
মাতায় মধুপগণে ভাঙ্গি দিয়ে ঘুম।

পতিব্রতা সন্ধ্যা সতী মলিন বদনা,
মুখে স্নিগ্ধ হাসি লয়ে চাপিয়া বেদনা—
সীমন্তে সিন্দুর ঢালি অনুরাগ ভরে
আজীবন তব পাছে ঘুরে ঘুরে মরে।
তুলি ফোটা যুঁই বেল গাঁথি লয়ে হার,
তোমার চরণ তলে ধরে উপহার।
একবার চাহ ফিরে—হের প্রভাকর।
উষারাণী সন্ধ্যাসতী কে বেশী সুন্দর ?

শ্রীযতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

বাট্‌নাবাঁটা।

আলতাটানা, পদ্মসত পা দুখানি রাখি;
বাট্‌নাবাঁটে পল্লিবালা—ডাগর দুটি আঁখি।
চাঁপারকলি আঙুলগুলি নোড়ার পরে থুয়ে,
শিলের বুকে পড়্‌ছে ঝুঁকে মাথা নুয়ে নুয়ে।
ধোঁয়ায় ভরা রান্নাঘর, নিবে গেছে আখা;
চোক ছল্ ছল্, গণ্ডদুটি রক্ত যেন মাখা।
আঙ্‌টী খোলা আসনপরে, 'ইউদি' দুলে কানে;
বাট্‌না বেঁটে বঙ্গবালা, আঙুল দিয়ে টানে।
চাওনা রেখে বাট্‌নাবাঁটা—বড় ঘরের মেয়ে,
উনুন্ যে অই নিবে গেল দেখ্‌লে না ক চেয়ে?

তেল হলুদে মিশিয়ে রাখি খোকা তোমার পিছু,
শিষ্ট হয়ে বস্‌লো এসে, বুঝ্‌লে না ত কিছু।
কণ্ঠ হ'তে রক্ষা কবচ টেনে টেনে খুলে,
কড়া ভরা দুধের উপর দিচ্ছে দেখ তুলে।
কোমল করে বেড়ি ধরা,—ভুবনমোহন সাজ।
কে অতিথি, লো রমণি কেগো খাবে আজ?

*　　*　　*　　*

বর্ষপরে স্বামী এসে অন্ন দিবেন মুখে,
রান্না তোমার সুধা হ'ক আশীষ করি সুখে।

শ্রীজগৎপ্রসন্ন রায়।

কারা-মুক্তি।

কেমনে রাখিবে মোরে
বদ্ধ তব ক্ষুদ্র ঘরে ?—
এযে তব বৃথা আকিঞ্চন।
ক্ষীণ-কায়া স্রোতস্বতী পারে কি হে, স্থান দিতে
সমুদ্রের অগাধ সলিলে ?
দুরাশায় দাও বিসর্জ্জন।

জাগে মনে,—ছিল দিন,
রহিতাম নিশিদিন
মগ্ন তব প্রেম-মদিরায়;
ক্ষুদ্র তব কারা-মাঝে রাখিতে আমায় বন্দী;
রাখিতে, গো, নয়নে নয়নে।
হয়েছিনু নিমগ্ন তোমায়।

একদিন, অবশেষে,
কে যেন দাঁড়াল এসে
কারা-দ্বার করিয়া মোচন।—
ইঙ্গিতিল বারবার বাহিরে আসিতে ত্বরা ;
আসিলাম বাহিরে চলিয়া।
তুমি ছিলে সুষুপ্তি-মগন।

কারার বাহিরে এসে,
হেরিনু যা', মোহিল সে।
হেরিলাম বিরাট ভুবন !—
অসীম সৌন্দর্য্যরাশি ছড়ায়ে রয়েছে, মরি,
জলে, স্থলে, গগনের পটে।
হেরিলাম আলোক নূতন।

নেহারিনু সে আলোক,—
অসীম ব্রহ্মাণ্ড-বুকে
মৃদু মৃদু লহর তুলিয়া,
বহিতেছে সুধা-নদী ! নব নব কত দৃশ্য
বিমোহিল হৃদয়-নয়ন।
দিনু প্রাণ অসীমে ঢালিয়া

সসীম 'ও' টুকু ঘরে
কেমনে বাঁধিবে মোরে
অসম্ভব। নাহি সম্ভাবনা।
তবে কেন মিছে মোরে ডাকিতেছ বারে বারে
কটাক্ষেতে বিজলি হানিয়া ?
ছাড়, ছাড় বাতুল কল্পনা।

ত্যজি' তব রুদ্ধ কারা
(হয়েছিনু পথহারা,)
আসিয়াছি মুক্ত সমীরণে ;
পেয়েছি অমৃত-স্বাদ ! আর কি এ হিয়া ফেরে;
প্রলোভনে তোমার বিপাকে।
বৃথা আশা ! ছাড় গো, ললনে !

কত আশা সমুজ্জ্বল
উজলিয়া হৃদিস্থল,
নাচিতেছে সারি-সারি-সারি।
হেরিতেছি, নভোগায় জ্বলন্ত অক্ষরে লেখা,—
"দীপ্তিময়, শুভ ভবিষ্যৎ।"
আজ আমি জগতে সবারি।

শ্রীবিভূতিভূষণ মজুমদার।

পূজনীয়া।

হে দেবি ! বরাঙ্গি ! তব পবিত্রমূরতি
নেহারিয়ে আমি, সব হই বিস্মরণ ;
যেন গো ভারতী রাণী দেখা দিলা মোরে
স্বপন মাঝারে হাতে বীণা সুশোভন।
তোমার মধুর কণ্ঠ গীতধ্বনি সম
পশে গো শ্রবণে যবে, আমার তখন—
মনে হয়, তব সম বৈজয়ন্তধামে
আছে কিনা আছে হেন রমণিরতন।
ওগো দেবি !—পড়ি যবে রচনা তোমার—
কল্পনা-কুসুমরাজি করি গো চয়ন
বিচিত্র ত্রিদিব-দিব্য উদ্যানে তোমার,
মনে হয় দেখিতেছি জাগিয়া স্বপন।
কবিতা,—লেখনী—তব জীবন সম্বল।
বিদুষী রমণীমাঝে রমণীর মণি,
উদার হৃদয় তব, অতীব কোমল—
পর দুঃখ হেরি যায় গলিয়ে আপনি।
তুমি গো সাহিত্য-রথে হইয়ে সারথি—
যশোলিপ্সু সুনবীন সাহিত্যিকগণে,
সুভদ্রার মত দাও পথ দেখাইয়া,
প্রণমি আনত শিরে তোমার চরণে।

শ্রীঅসিতকুমার হালদার।

মুক্তির সংবাদ।

সুদূর সিন্ধুর বার্ত্তা করিয়া বহন
অধীর আনন্দ ভরে' দক্ষিণ পবন
প্রবেশ লভিল কক্ষে উল্লাস চঞ্চল ;
পুঁথি, পত্র, বেশবাস কুন্তল, অঞ্চল,
আন্দোলিত, উচ্ছসিত, বিক্ষিপ্ত ব্যাকুল
চারিদিকে স্পর্শে তার ; অপার অকূল
ভাস্বর-উজ্জ্বল-জল স্ফুরিত অধীর
তরঙ্গ বিক্ষোভ মত্ত, মুক্ত তরণীর
পূর্ণ পালে, লীলানৃত্যে গমন সত্বর
দেখা দিল নেত্র পরে। পাষাণের স্তর
সঙ্কীর্ণ আবদ্ধ গৃহ, রুদ্ধ অন্ধতম
মুহূর্ত্তে মিলাল মায়া মরীচিকাসম।

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

বসন্তে।

দক্ষিণের দ্বার খুলি' বসন্তের বায়
বহিল ভুবনে,
মুঞ্জরিল গাছে গাছে পুষ্প শত শত
মদির চুম্বনে।
আম্র-মুকুলের গন্ধে পূরিল অবনী,
মদালস রসাবেশে কাঁপিল ধমনী ;
নীরব নির্লিপ্ত শান্ত সুপ্রসন্ন নীল
আকাশের কোলে,
আবেগ-বিহ্বল হর্ষে তরঙ্গিত ধরা
শিশু সম দোলে।
চারিদিকে প্রবাহিত মদ-মত্ত ধারা
তারি মাঝে আমি ওগো হয়ে গেনু হারা ;
গূঢ় আকর্ষণে এক অজ্ঞাত বেদনা
সুবিপুল বলে—
বাহির করিয়া দিল একাকী আমারে
এ মহীমণ্ডলে।

কণ্টক কর্দ্দম পূর্ণ চঞ্চল সরসে
স্ফুট পদ্মসম
কাহার মানসী মূর্ত্তি ফুটিয়া উঠিল
হৃদয়েতে মম।
তাহারি গুঞ্জন তান দূরেতে সহসা
পেয়েছি শুনিতে,
কাছে গিয়ে শুনি শুধু নদী কলস্বর
ব্যথাভরা চিতে।
মলয় অনিলে তার অঞ্চল পরশ
অঙ্গে যেন লাগে ; জাগে পুলক সরস।
বায়ু-বহা পুষ্পগন্ধে দেহের সৌরভ
শিহরে পরাণে,
আকাঙ্ক্ষিত মুঞ্জরিত সে দেহেরে কোথা
রাখিয়া গোপনে।
জ্যোৎস্নামাঝে ঢল ঢল ফুল্ল তনুখানি
কোথায় মিলায়ে গেছে মোহিয়া পরাণি।
গগনের নীলে আর কনক সন্ধ্যায়,
অরুণ কিরণে,
খুঁজিয়া আকুল তারে সমগ্র ভুবনে।

সহসা বসন্ত মাঝে আসিল নামিয়া
বাদল ঝর্ঝর,
ডুবিল নিমেষে হায়! অন্ধ অন্ধকারে
বিশ্ব চরাচর।
প্রবাসী পাখীরা যত আকুল পরাণে
প্রবাসের মোহ ত্যজি' ধায় নীড় পানে ;
মাঠ হতে গাভী নিয়ে রাখালের শিশু
গোঠে যায় ফিরে ;
ভয় ভীত সচকিত শ্রান্ত পথিকেরা
আর্দ্র নভোনীরে।
পরিত্যক্ত গৃহপানে ছুটিনু তখন
যেন চমকিয়া,
বাহিরে খুঁজিনু যারে দেখি আছে মোর
ঘরেতে ফুটিয়া।

শ্রীসুখরঞ্জন রায়।

ষষ্ঠ শতাব্দীর ভারত।

আমরা গত মাঘের "ভারতী"তে চীন-পর্য্যটক দিগের মধ্যে হৈসঙ্গ এবং সঙ্গ-ইয়ান নামক দুই জনের * নামোল্লেখ করিয়াছি। সঙ্গইয়ান (বা সাংইয়ান) ওয়েনইপ্রদেশের লোইয়াং নগরীর উত্তর-পূর্ব্ব কোণে বাস করিতেন। ইনি ভিক্ষু হৈসঙ্গর (বা হৈসাংর সহিত প্রসিদ্ধ উই বংশের বিধবা সাম্রাজ্ঞী (Dowager Empress) দ্বারা বৌদ্ধ পুস্তকাদি সংগ্রহের জন্য ৫১৮ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে প্রেরিত হন। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ইঁহাদের বৃত্তান্ত সংক্ষিপ্ত এবং ফাহিয়ান বা হুইয়েনসাংয়ের ন্যায় ইহারা বেশী দূর পর্য্যটনও করেন নাই বা ইঁহাদের ভ্রমণ বৃত্তান্ত সেরূপ সারগর্ভও নহে। তত্রাপি গ্রন্থসংগ্রহ ব্যাপারে ইহারাও অনেক পরিমাণে সফলকাম হইয়াছিলেন এবং ইহারা দুই জনে মহাযান সংক্রান্ত একশত সত্তর খানি পুস্তক সংগ্রহ করিয়া ছিলেন।

চীনের রাজধানী হইতে বহির্গত হইয়া পারস্য এবং অন্যান্য দেশ ভ্রমণ করিয়া ইঁহারা উচাং (উদয়ানা) দেশে আগমন করেন। "এই দেশের উত্তরে সাংলিং পর্ব্বত এবং দক্ষিণেই ভারতবর্ষ। লোক সংখ্যা ও উৎপন্ন দ্রব্য যথেষ্ট। এই প্রদেশের ভূমির উর্ব্বরতা-শক্তি অত্যধিক এবং জলবায়ু অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর। এই স্থলেই বোধিসত্ত্ব ব্যাঘ্রীর ক্ষুন্নিবারণের জন্য নিজ দেহ তাহাকে সমর্পণ করিয়াছিলেন, এখনও এইরূপ জনশ্রুতি শোনা যায়। রাজা নিরামিষাশী। প্রধান প্রধান উপবাসের দিন তিনি ঢক্কা, শঙ্খ, বংশী ও অন্যান্য নানা প্রকার বাদ্যাদিসহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় বুদ্ধদেবকে উপাসনা করেন। দ্বিপ্রহর অতীত হইলে তিনি রাজকীয় কার্য্যে মনোনিবেশ করেন। হত্যাপরাধে ধৃত অপরাধীকে নিহত করা হয় না কিন্তু সামান্য আহার্য্যসহ তাহাকে পর্ব্বতে নির্ব্বাসিত করা হয়। মনুষ্যোপযোগী খাদ্যদ্রব্য শস্যাদি এবং নানা প্রকার সুমিষ্ট ফল এখানে যথেষ্ট। সন্ধ্যাকালীন পূজা ও আরতির ঘণ্টা-নিনাদ অনেক দূর হইতে শোনা যায়। নানা প্রকার পুষ্পে পৃথিবী সমাচ্ছন্ন এবং বুদ্ধদেবকে পূজা করিবার জন্য পুরোহিত এবং সাধারণ লোকেও তাহা আহরণ করেন।"

সাংইয়ান তাঁহার সুপারিশ পত্রাদি এতদ্দেশীয় রাজাকে প্রদান করিলে, রাজা পরম সমাদরে উঁহাদের অভ্যর্থনা করেন। চীনের রাণী বুদ্ধদেবের পুজা করেন জানিতে পারিয়াই, রাজা পূর্ব্বাস্য এবং যুক্তকরে, ভক্তির সহিত মস্তক অবনত করিলেন। তৎপর, পরিভাষী দ্বারা রাজা পর্য্যটকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে "সম্মানীয় অতিথিগণ কি সূর্য্যদেবের উত্থানের দেশ হইতে আসিতেছেন?" সাং-ইয়ান উত্তর করিলেন যে তাঁহাদের দেশের পূর্ব্ব দিকে মহাসাগর। এই মহাসাগর হইতে ভগবানের ইচ্ছানুসারে সূর্য্যদেব উদয়াচল ও অস্তাচল গমনাগমন করেন। রাজা পরে জিজ্ঞাসা করিলেন যে তাঁহাদের দেশে সাধু ব্যক্তি আছেন কি না? তদুত্তরে সাংইয়ান

* লিপিকরপ্রমাদ বশতঃ মাঘ-প্রবন্ধে উক্ত ভ্রমণকারীদিগের সময় পঞ্চমশতাব্দী লিখিত হইয়াছিল।

অনেক সাধু ব্যক্তির কথা উল্লেখ করিয়া পরে পরীর দেশের রৌপ্য-প্রাচীর, স্বর্ণ-প্রাসাদ এবং তথায় যে সকল ঋষি বাস করেন তাঁহাদের কথা এবং প্রসঙ্গক্রমে ভবিষ্যৎ-বক্তা কোয়ানলো, চিকিৎসক হোয়াটো এবং যাদুকর ছোজের কথা রাজাকে নিবেদন করিলেন। রাজা এই সমস্ত অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার শুনিয়া বিশেষ আহ্লাদিত হইয়া বলিলেন যে "বাস্তবিকই যদি ঐ দেশে এই সমস্ত ঘটনা ঘটে, তাহা হইলে উহাই প্রকৃত বুদ্ধের দেশ এবং যাহাতে জীবনান্তে পরজন্মে ঐ দেশে আমার জন্ম হয় এজন্য প্রার্থনা করিব।"

পর্য্যটকগণ তৎপর বুদ্ধদেব ও দৈত্যের সংগ্রামস্থলে উপনীত হইলেন। প্রবাদ এই যখন বুদ্ধদেব এই উচাং প্রদেশে প্রচারকার্য্যে আইসেন তখন ঐ দেশীয় এক দৈত্যরাজকে তিনি তদীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে চাহিলে দৈত্যরাজ এক প্রচণ্ড ঝটিকা ও বৃষ্টি দ্বারা বুদ্ধদেবকে আক্রমণ করেন। বৃষ্টি থামিয়া গেলে বুদ্ধদেব এক প্রস্তর খণ্ডের উপর পূর্ব্বাস্য হইয়া উপবেশনপূর্ব্বক আর্দ্র বসন শুষ্ক করিয়াছিলেন। সাংইয়ান তাঁহার পুস্তকে লিখিয়াছেন যে "যদিও বহুবৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে তথাপি তাঁহার বস্ত্রের রেখা এখনও পরিষ্কাররূপে দেখা যায়। এমন কি সেই বস্ত্রের সূত্র পর্য্যন্ত পরিলক্ষিত হয়। ইহার পশ্চিমে এক বৃহৎ পুষ্করিণীতে নাগ-রাজ বাস করেন। নাগরাজ ইচ্ছামত যখন তখন অলৌকিক আকার ধারণ করেন। ঐ দেশের রাজা নাগরাজকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য স্বর্ণ এবং মণিমুক্তাদি ঐ পুষ্করিণীতে নিক্ষেপ করেন।"

তিনি আরও বলেন, "এই দেশের ৮০ লি উত্তরে পর্ব্বতোপরি বুদ্ধদেবের পাদুকা-চিহ্ন এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। এই পাদুকা-চিহ্নের আবরণের জন্য এখানে একটী মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। এই পাদুকার দৈর্ঘ্য বিস্তার পরিমাণ করা দুরূহ কেননা কোন সময় ইহার দৈর্ঘ্য, কোন সময় ইহার বিস্তৃতি অধিক হয়। ইহার অতি নিকটেই একটী ঝরণা। এই ঝরণায় বুদ্ধ একদিন তাঁহার দন্তকাষ্ঠ নিক্ষেপ করেন। নিক্ষিপ্ত হইবামাত্রই ইহা বৃক্ষে পরিণত হয়। নিকটেই একটী মন্দির। তথায় স্বর্ণ নির্ম্মিত মনুষ্যাকার ৬০টী মূর্ত্তি আছে। দেশবাসী কঠোর নিয়মাবলী পালন করেন এবং ভিক্ষুগণ বিশেষ ভক্তিমান।" "এই মন্দিরের ১০০ শত লি দক্ষিণে, বুদ্ধদেব যেখানে নিজ দেহের চর্ম্ম এবং অস্থি লইয়া লিখনপত্র এবং লেখনী প্রস্তুত করেন সেইখানে রাজা অশোক একটী মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছেন। অস্থি ভঙ্গকালে তৎসহ নির্গত মজ্জার চিহ্ন বর্ত্তমানেও পর্ব্বতোপরি স্পষ্টরূপে দেখিতে পাওয়া যায়।

"পাঁচশত লি দক্ষিণপশ্চিমে সেন-সি পর্ব্বত। এই স্থানের জল অত্যন্ত সুস্বাদু এবং ফলাদি অত্যন্ত সুমিষ্ট। পর্ব্বত উপত্যকা উষ্ণ এবং বৃক্ষ ও লতাগুল্মাদি হরিৎ বর্ণে সদাসর্ব্বদাই সুশোভিত থাকে। নিকটেই এক পর্ব্বত-কন্দরে বুদ্ধদেব বাস করিয়াছিলেন। অশোক এই স্থানে এক মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এক লি দক্ষিণে বুদ্ধের পণ্যশালা এখনও বর্ত্তমান আছে। এই পর্ব্বতে এক প্রকাণ্ড মন্দিরে দুইশত যতি বাস করেন।"

পর্য্যটকগণ পরে গান্ধারে আইসেন।

সাংইয়ান বলিয়াছেন "এই স্থানের লোকেরা সকলেই ব্রাহ্মণ কিন্তু সকলেই বুদ্ধকে অত্যন্ত সম্মানের চক্ষে দেখেন। রাজা অত্যন্ত নিষ্ঠুর-প্রকৃতি এবং প্রতিহিংসাপরায়ণ এবং যুদ্ধপ্রিয় সাতশত যুদ্ধ-হস্তী তাঁহার অধীনে। প্রত্যেক হস্তী দশজন সুসজ্জিত সৈন্য বহন করে। এই সমস্ত সৈন্যগণ তরবারি ও বল্লম লইয়া যুদ্ধ করে। হস্তীদের শুণ্ডেও তরবারি থাকে, আবশ্যক হইলে ইহারাও তরবারি ব্যবহার করিতে পারে। রাজা নিজ সৈন্যসহ সকল সময়েই সীমান্তপ্রদেশে অতিবাহিত করেন সেই জন্য প্রজাপুঞ্জ সুখে নাই।"

পশ্চিমাভিমুখে পাঁচদিন যাইয়া যে স্থলে সামান্য এক মনুষ্যের জন্য বুদ্ধদেব নিজ মস্তক অর্পণ করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন ভ্রমণ-কারিগণ সেই স্থলে উপনীত হইলেন। তথা হইতে তাঁহারা সিণ্টু (সিন্ধু) নদ অতিক্রম করিলেন। "এই নদীতে বুদ্ধ মকর মৎস্যের রূপ ধারণ করেন এবং পরে নিজ মাংস (মৎস্য-মাংস) দ্বারা দ্বাদশ বৎসর পৃথিবীর লোকের উদর পূরণ করান। এখনও পর্ব্বতোপরি মৎস্যের আঁইস দেখিতে পাওয়া যায়।"

তৎপর তাঁহারা টোমাকু নগরী পৌঁছেন। "নগর সুরক্ষিত এবং জলের ফোয়ারা অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। সর্ব্বত্রই মূল্যবান প্রস্তরাদি দৃষ্ট হয়। অধিবাসীরা সৎ এবং সাধু। নিকটে এক মন্দিরে স্বর্ণ ও মূল্যবান প্রস্তরাদি খচিত অনেকগুলি প্রস্তর দেবমূর্ত্তি পূজিত।"

পশ্চিমাভিমুখী হইয়া একদিনের পথ অতিক্রম করিলে বুদ্ধ যে স্থলে নিজ চক্ষু উৎপাটিত করিয়া দানশীলতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছিলেন তথায় তাঁহারা উপনীত হন। পরে, সিন্ধুনদ অতিক্রম করিয়া গান্ধার রাজ-ধানীতে পৌঁছিয়া তত্রত্য মন্দির দর্শন, করেন। তিনি বলেন বুদ্ধদেব শিষ্যসহ এই দেশে শুভাগমন করিয়া এইরূপ ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া-ছিলেন যে তাঁহার নির্ব্বাণের তিনশত বৎসর পরে তথায় কনিষ্ক নামে কোন নরপতি এক মন্দির প্রস্তুত করিবেন। কনিষ্ক যখন রাজা ছিলেন, তখন একদিন বহির্গমনের সময় দেখিলেন যে চারিটী বালক গোময় দ্বারা এক বুদ্ধ মন্দির নির্ম্মাণ করিতেছেন। দুই হস্ত পরিমিত এই মন্দির-নির্ম্মাণকার্য্যে ব্যাপৃত বালকগণ কনিষ্ককে দর্শনমাত্র অদৃশ্য হইলেন। অদৃশ্য হইবার পূর্ব্বে একজন দেববালক কনিষ্কের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া এক গাথা পাঠ করিয়া গেলেন। তাহা শুনিয়া কনিষ্ক এই স্থলে এক সুন্দর মন্দির নির্ম্মাণ করেন। এই মন্দির কাষ্ঠনির্ম্মিত এবং ত্রয়োদশ তালা। সর্ব্বোপরি একটী লৌহ-স্তম্ভ। গোময় মন্দিরটি এখনও বর্ত্তমান আছে। কনিষ্কের মন্দিরে অনেক মণিমাণিক্য আছে এবং চারি জন দৈত্য দিবারাত্র এই মণিমাণিক্য রক্ষা করে।" *

"নিকটেই একটী প্রস্তর-মন্দির আছে। ইহা স্পর্শ করিলে কে সৌভাগ্যশালী তাহা পরীক্ষা করা যায়। কেননা সৌভাগ্যবান ব্যক্তি এই মন্দির স্পর্শ করিলেই ইহার

* সাংইয়ানের লিখিত মতে, যদি বুদ্ধদেবের মৃত্যুর তারিখ আমরা ৪৮৭ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দ ধরি তাহা হইলে কনিষ্কের রাজত্বের সময় (৪৮৭-৩০০) ১৮৭ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দ বা নিকটবর্ত্তী সময়ই পড়ে। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক মিঃ ভিনসেণ্ট স্মিথ কনিষ্ককে ১২০ খৃষ্টাব্দে রাজা করিয়াছেন এবং তিনি দ্বিতীয় ক্যাডফাইসেসের পরেই

স্বর্ণ-ঘণ্টাগুলি আপনিই নিনাদিত হইতে থাকে।" বলা বাহুল্য ভ্রমণকারী সাংইয়ান ইহা সামান্য মাত্র স্পর্শ করাতেই ঘণ্টাগুলি অত্যন্ত ধ্বনিত হইতে লাগিল।

পরে বুদ্ধ যেস্থানে শিবিরাজরূপে একটী পারাবত উদ্ধার করিয়াছিলেন তাঁহারা তথায় গমন করেন। এই স্থানে পুরাকালে রাজা শিবির একটী প্রস্তরনির্ম্মিত শস্যগৃহ ছিল। "দৈবদুর্ব্বিপাকে ইহা ভস্মীভূত হইয়া যায়। কিন্তু দগ্ধাবশিষ্ট শস্যকণা এখনও বিদ্যমান। এবং ইহার একটী মাত্র গ্রহণ করিলেও আর জ্বরের সম্ভাবনা থাকে না।"

ইহার পরে, ইঁহারা কিকলেম মন্দিরে যান। "তথায় বুদ্ধের পরিধান বস্ত্র ত্রয়োদশ ভাগে ছিন্নাবস্থায় আছে। বুদ্ধদেবের পাদুকার ন্যায় ইহারও পরিমাণ করা যায় না কেননা কোন সময় বা ইহা দৈর্ঘ্যে বেশি হয় কোন সময় আবার বিস্তৃতিতে বাড়িয়া যায়। এইখানে বুদ্ধের দন্ত আছে এবং ইহার নিকটে বুদ্ধের ছায়া দেখা যায়।"—

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে সাংইয়ান ও হৈসাঙ্গের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত এবং তদ্বারা আমরা ভারতের তদানীন্তন অবস্থার প্রকৃত তথ্য সম্যক অবগত হইতে পারি না। কিন্তু তত্রাপি এই দুই ভ্রমণকারীর ভ্রমণ-বৃত্তান্ত হইতে ইহা সুস্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হয় যে, প্রত্যেক স্থলেই খাদ্যাদির কোনই অভাব ছিল না, বৌদ্ধধর্ম্ম তখনও প্রাধান্য বিস্তার করিতে-ছিল এবং সর্ব্বত্রই বৌদ্ধ মন্দির বিরাজিত ছিল।

সাংইয়ান যখন এদেশে আইসেন তখন গুপ্তবংশীয় কোন্ নরপতি সিংহাসনে ছিলেন তাহা জানা দুষ্কর। ৪৮৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ৫৩৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে নরসিংহগুপ্ত বলাদিত্য, এবং কুমারগুপ্ত রাজা ছিলেন। ইহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ যে সমুদায় উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন, সেগুলি ইঁহারাও ব্যবহার করিতেন কিন্তু বস্তুতঃ ইহাদের রাজত্ব ফাহিয়ানের ভ্রমণকালীন গুপ্তরাজত্বের পূর্ব্ব-সীমাবদ্ধমাত্রই ছিল।

শ্রীযোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার।

জিজ্ঞাসা।

চাঁদের সুষমা রাশি,
বসন্তের ফুল বাস,
অলির পঞ্চম তান;
শিশুর অধর হাস।

প্রেমের অতুল রূপ,
সবাতেই সেই জন;
তবুও শুধায় লোকে
সে কোথায়—সে কেমন!

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মাইতী।

সিংহাসনাধিরোহণ করেন—এই মত প্রকাশ করিয়াছেন। তদুত্তরে প্রখ্যাতনামা ভাণ্ডারকার মহোদয় লিখিয়াছেন "The great difference in the legends and emblems on the coins of Kanishka and Kadphises prevents the supposition that the former was the immediate successor of the latter. Kanishka and his successors appear to me to have formed a distinct family from that of the two Kadphises." যাহা হউক, এপ্রবন্ধে ইহা বিচার করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়।

সহযাত্রিণী।

(ফরাসী গল্প অবলম্বনে)

সংবাদপত্রে যেদিন সিরির সহিত আমার বিবাহ-বার্ত্তা ঘোষিত হইল, সেদিন আমার বন্ধুবান্ধবের মধ্যে একটা হুলস্থূল বাধিয়া গেল। আমার বিবাহ! যে চিরকাল বিবাহিত জীবনকে একটা দুর্ব্বিষহ ভার বলিয়া তর্ক করিয়া আসিয়াছে, তাহার বিবাহ? আবার, বিবাহ কাহার সহিত? না, নিতান্ত আত্মপরায়ণা এক নারী, যাহার সহিত কাহারো কখনো বনিবনাও নাই, তাহার সহিত হুলস্থূল বাধিবার কথাই বটে!

বন্ধু সিসিল আসিয়া কহিল, "ব্যাপারটা কি, বল দেখি? প্রেমের ফাঁদে দুজন ধরা পড়লে কেমন করে?" আমি কহিলাম, "ট্রেণে!"

সিসিল কহিল, "ট্রেণে? অমন বিশ্রী জায়গা—নাকে-চোখে কয়লার গুঁড়া অনর্গল প্রবেশ করছে—একটা কর্কশ ঘটঘট ট্রেণের শব্দ—না আছে পাখীর গান, না আছে গাছের ছায়া—প্রাণটা পরিত্রাহি ডাক ছাড়ে! সে স্থানটা প্রেমের পক্ষে উপযুক্ত হয়ে উঠল?"

সিসিল হাসিতে লাগিল।

আমি কহিলাম, "প্রেমের পক্ষে সব চেয়ে সুন্দর স্থান যদি কোথাও থাকে, তবে ঐ ট্রেণে! কেহ কোথাও নাই—বাহিরে কর্ম্মস্রোতের বিপুল গর্জ্জন, ভিতরে দুটী প্রাণী —এমন সুযোগ, এমন অবসর, কি নিতান্ত লোভনীয় নয়!" কবিত্বটা আমাকে মোটেই স্পর্শ করিত না—কিন্তু ইদানীং কথাগুলা কেমন সাদাসিধাগোছের হইত না!

সিসিল কহিল, "ব্যাপারখানা খুলেই বল না!"

একটা সিগার ধরাইয়া, সিসিল চেয়ারখানি টানিয়া আমার পাশে ঘেঁসিয়া বসিল!

আমি কহিলাম, "এমন বিশেষ কিছু বলিবার নাই! তবু শোন," আমি বলিতে আরম্ভ করিলাম,—"এই সেদিনের ঘটনা! ফেব্রুয়ারি মাসের কথা! 'নাইসে' মেলা দেখিবার জন্য বেলা ৮-৫৫ মিনিটের ট্রেণে উঠিলাম—রাত্রের ট্রেণ আমি মোটে পছন্দ করি না। স্থির করিলাম, প্রথম রাত্রেই ট্রেণ মার্সেল পৌঁছিলে নামিয়া রাত্রিটার মত সেখানে ওয়েটিং রুমে বিশ্রাম করিব—পরদিন, সকালের ট্রেণ ধরিয়া, বেলা দুইটা নাগাদ নাইসে পৌঁছাইব।

ষ্টেশনে সে কি ভিড়! ষ্টেশনমাষ্টারের অনুগ্রহে একখানি কামরা বেশ দখল করিয়াছিলাম। সে কামরায় সঙ্গীর মধ্যে কেবল লম্বা কোট-পরা, আর একটি ভদ্রলোক! তিন চারিটা ষ্টেশনের পরই তিনি নামিবেন, তখন সম্পূর্ণ কামরাখানি একলা আমারি অধিকারে আসিবে! একলা! আঃ, কেবল ট্রেণে চড়িবার সময়ই এই স্বার্থপর নিঃসঙ্গ ভাবটা, এত আরামের, এত আকাঙ্ক্ষার!

দুইটা ঘণ্টা পড়িয়াছে—ট্রেণ এখনি ছাড়িবে—এমন সময় আমাদের কামরায় সম্মুখে রীতিমত গোলমাল বাধিয়া গেল!

একটি স্ত্রীলোক—পরিষ্কার কণ্ঠে তীব্রস্বরে কহিতেছে—"না, মশায়, না—আমার

ঘুমোবার জন্য স্বতন্ত্র কামরা চাইই'—ষ্টেশন-মাষ্টার তাঁহাকে বুঝাইতেছে—"এখানে সে কামরা দেওয়া যাইতে পারে না—এখন সকাল ৮৷৷০টা! সন্ধ্যার সময় সে কামরা মিলিবে!"

"কোথায় মিলিবে? আমাকে কতদূর যেতে হবে" ইত্যাদি মৃদুভৎর্সনায় স্ত্রীলোকটি ষ্টেশনমাষ্টারকে বিব্রত করিয়া তুলিল।

এমন সময় তৃতীয় ঘণ্টা পড়িল। স্ত্রীলোকটি প্রচুর লগেজ লইয়া কামরায় প্রবেশ করিল। প্রবেশ করিয়াই কহিল, "এ কি, কামরায় দুজন লোক!"

ষ্টেশনমাষ্টার বিরক্তির সহিত কহিল, "তা বলে, আপনার জন্য একখানা গাড়ী ত ছাড়িয়া দিতে পারি না।"

"বেশ—টেলিগ্রাম করো—যেন ঘুমোবার গাড়ী পরের ষ্টেশনে পাই!"

ট্রেণ ছাড়িয়া দিল।

স্ত্রীলোকটির সহিত পাঁচ ছয়টা ব্যাগ এবং শীতের কাপড়চোপড় প্রভৃতি অসংখ্য!

তখন শীত প্রচণ্ড! কুয়াসায় সারাদিন সূর্য্যকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে! কামরার সাশি বন্ধ—তাহারি ভিতর দিয়া যতদূর দেখা যায়, কেবল কুয়াসা—কুয়াসা! যেন বাহিরটা আগাগোড়া জমাট বরফে ঢাকা!

স্ত্রীলোকটি দেখিতে বেশ! এই রাগ-রাগ ভাবে মুখখানিকে যেন আরো সুন্দর করিয়া তুলিয়াছে!

সঙ্গীটি খুবই গম্ভীর প্রকৃতির লোক—খবরের কাগজের মধ্যে এমনি নিবিষ্টচিত্ত যে, জগতের আর কোনদিকে দেখিবার তাঁহার অবসর ছিল না।

তখন বেলা সাড়ে এগারটা! 'লারোচি'! 'লারোচি!' ষ্টেশনের পোর্টার হাঁকিয়া গেল! আমাদের গম্ভীর সঙ্গীটি কাগজের তাড়া প্রভৃতি লইয়া নামিয়া গেলেন! 'ষ্টেশন মাষ্টার' 'ইনস্পেক্টর' প্রভৃতি শব্দে স্থানটা কিয়ৎক্ষণ মুখরিত করিয়া স্ত্রীলোকটি আবার স্থির হইয়া বসিল; গাড়ীও ছাড়িয়া দিল।

রাগে, দুঃখে, অপমানে স্ত্রীলোকটি কামরার এক কোণে বসিয়া রহিল! আমি নিতান্ত নির্লজ্জের মত কাগজ রাখিয়া দিয়া তাহার প্রতি কৌতূহল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিলাম। কি সূত্রে আলাপ করা যায়, ইহাই আমার একমাত্র ভাবনা। "জানলাটা খুলিয়া দিব?" "শীতটা প্রচণ্ড"এ সব মামুলি ভূমিকাও নিতান্ত অসঙ্গত! জানলা ত বন্ধ আছেই, এই শীতে খুলিবার কথা তোলাই নির্ব্বুদ্ধিতার চিহ্ন! নিস্তব্ধতা অসহ্য হইয়া উঠিল! একটা নূতন রকমে আলাপের সূত্রপাত করিতে হইবে! কিন্তু কি কথা কহিব? কি কথা?

ভাবিয়া উপায় স্থির করিতে পারিতেছি না, এমন সময় ট্রেণ টোনারে আসিয়া পৌঁছিল। পোর্টার হাঁকিল, "টোনার, এখানে পঁচিশ মিনিট ট্রেণ থামিবে!"

আমার সহযাত্রিণী ধীরে ধীরে ব্যাগ নামাইয়া, লগেজ প্রভৃতি গণিয়া লইয়া প্লাটফর্ম্মে নামিল। তখন বেলা প্রায় তিনটা! ক্ষুধায় আমি অস্থির হইয়া পড়িয়াছিলাম। আমার সহযাত্রিণী খানিক দূর অগ্রসর হইতেই, আমিও ভোজনালয় উদ্দেশ্যে তাহার অনুসরণ করিলাম।

টেবিলে রীতিমত ভিড়! নানারঙের পোষাকে, নানারূপ মূর্ত্তি হাসি-গল্প-গুজবের

সহিত ভোজনে ব্যস্ত! এ সকলের প্রতি আমার লক্ষ্য ছিল না—পাশের ঘরে ভোজন-রতা সহযাত্রিণীর প্রতিই আমার আগাগোড়া লক্ষ্য ছিল!

ভোজনাদি শেষ করিয়া আমি প্ল্যাটফর্ম্মে আমার কামরার সম্মুখে আসিয়া সিগারেট ধরাইলাম। পঁচিশ মিনিটও শেষ হইয়া আসিয়াছে! যাত্রীরা দলে দলে আসিয়া আপন-আপন কামরা অধিকার করিতেছে! আমিও আসিয়া বসিলাম! সহসা দেখিলাম, আমার সহযাত্রিণীটি ওধারের প্ল্যাটফর্ম্মে বুকষ্টলে বহি কিনিতে ব্যস্ত!

আমি শঙ্কিত হইলাম! ট্রেণ ত এখনি ছাড়িবে! প্ল্যাটফর্ম্ম হইতে এ সময়টুকুর মধ্যে আসিয়া পড়া অসম্ভব! সর্ব্বনাশ! বেচারীর ব্যাগ, গরম কাপড় প্রভৃতি এখানে পড়িয়া, টেণ ছাড়িয়া দিলে, সারারাত্রি এই শীতে কি অসহ্য কষ্ট হইবে! গার্ডের বাঁশী বাজিল—আর উপায় নাই ত! আমি তাড়াতাড়ি, ব্যাগ, গরম কাপড় প্রভৃতি প্ল্যাটফর্ম্মের দিকে ছুড়িয়া দিলাম। নিকটে একটা কুলি দাঁড়াইয়াছিল, তাহাকে কহিলাম, "মেমসাহেবের জিনিস"। গাড়ী চলিতে লাগিল—আমি প্রাণপণ বলে তাহার লগেজ প্ল্যাটফর্ম্মে ছুড়িতে লাগিলাম।

"একি, একি, মশায়!" পশ্চাতে ফিরিয়া দেখি, আমার সহযাত্রিণী!

উঃ, আমি কি ভুল করিয়াছি! বুকষ্টলের স্ত্রীলোকটিকে আমার সহযাত্রিণী বলিয়া মনে করিয়াছিলাম! কি বিপদ!

স্ত্রীলোকটি কহিল, "আমার ব্যাগ? লগেজ? কে চুরি করিল?" স্ত্রীলোকটি আমার প্রতি চাহিল। কি সে তীব্র, উগ্র দৃষ্টি! জীবনে আমি তাহা ভুলিব না।

আমি কহিলাম,—আমার স্বর বাধিয়া যাইতেছিল—"ভুল করিয়া আমি প্ল্যাটফর্ম্মে ফেলিয়া দিয়াছি!"

"ভুল! আমার লগেজ?"

"হাঁ, ভয়ঙ্কর ভুল করিয়াছি! কিন্তু আমার উদ্দেশ্য মন্দ ছিল না। আমি ভাবিয়াছিলাম—আপনি বুঝি ট্রেণ ধরিতে পারিলেন না—এই প্রচণ্ড শীতে আপনার কষ্ট হইবে ভাবিয়া আমি আপনার জিনিসপত্র প্ল্যাটফর্ম্মে একটা কুলির জিম্মায় সব ছুড়িয়া দিয়াছি! পরের ষ্টেশনে টেলিগ্রাম করিয়া দিব। কোন ভাবনা নাই, আমি নিজে টোনারে ফিরিয়া আপনার লগেজ লইয়া আসিব! আপনার পোষাকের মত পোষাক পরা, এমনি সুন্দরী আর একটি স্ত্রীলোককে দেখিয়া, আমি ভুল করিয়া ফেলিয়াছি। ক্ষমা করিবেন!" এক নিশ্বাসে কথাগুলি বলিয়া গেলাম।

স্ত্রীলোকটি কহিল, "বেশ করিয়াছেন, মশায়,—এখন আমার উপায়? এই প্রচণ্ড শীতে আমার একখানাও গরম কাপড় নাই!"

কথাটা ভাবিবার বিষয়! আমি কহিলাম, "আমার আলষ্টার—যদি কিছু মনে না করেন —আমি খুলিয়া দিতেছি, আর আমার এই রগখানা বেশ গরম; বোধ হয়, কোন কষ্ট হইবে না!"

"ধন্যবাদ! কোন দরকার নাই, মশায়।" স্ত্রীলোকটি এক কোণে বসিয়া রহিল!

উঃ, আমার মনের অবস্থা, তখন! আমার মনে হইতেছিল, ট্রেণ হইতে লাফাইয়া পড়ি! এমন বিপদেও মানুষ পড়ে!

আমি কহিলাম, "যদি কিছু মনে না করেন, ত' আমার রগখানা"। "কোন দরকার নাই ; আমি ত আপনাকে কিছু বলি নাই মশায়"। আঃ, কি জ্বালা সে স্বরে! আমি দাঁড়াইয়া উঠিলাম! কহিলাম, "আপনি যদি এই রগ ও আলষ্টার না লন্ ত' আমি এখনি ট্রেণ হইতে লাফাইয়া পড়িব।" "আমি কামরার দরজা খুলিয়া দাঁড়াইলাম।

সত্যই হয়ত পড়িতাম আমার মাথার মধ্যে তখন আগুণ জ্বলিতেছিল। আমার জ্ঞান ছিল না—স্ত্রীলোকটি আমার হাত ধরিল; রগ ও অলেষ্টার গ্রহণ করিল। আঃ, আমি যেন কতকটা আশ্বস্ত হইলাম!

স্ত্রীলোকটি কহিল, "আপনার যে শীত লাগছে"।

আমি কহিলাম, "কিছু না!" শীত খুবই প্রচণ্ড বটে! কিন্তু আমার পাপের ইহাই উপযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত!

তার পর নানা কথাবার্ত্তা! ভালো মনে নাই, কারণ তখন আমার অসহ্য শীত লাগিতেছিল! কিন্তু আমি প্রাণ দিতে উদ্যত ছিলাম, এ শীতও আজ আমার পক্ষে কত তুচ্ছ!

রাত্রি সাড়ে সাতটা—ডিজনে পৌঁছাইলাম। টোনারে টেলিগ্রাম করিয়া দিলাম! শীতে জমিয়া যাইবার উপক্রম!

রাত্রি সাড়ে আটটায় মেকান! স্ত্রীলোকটি শয়ন-কামরার কথা ভুলিয়া গিয়াছে!

রাত্রি সাড়ে ন'টায় 'ভালে' ; স্ত্রীলোকটির কথা অস্পষ্ট শুনিতে পাইতেছিলাম। আমার হাতে পায়ে কোন সাড় ছিল না! নাক জ্বালা করিতেছিল মাথা ঘুরিতেছিল! তারপর কিছু মনে পড়েনা।

যখন চোখ চাহিলাম, তখন দেখি সজ্জিত কক্ষে শুইয়া আছি! পাশে, আমার সহযাত্রিণী। আমি কহিলাম, "আপনি? আপনার লগেজ? সে কহিল, "আমার জিনিষপত্র পাইয়াছি—আপনি নিশ্চিন্ত হোন্—এমনি করিয়া কি আত্মহত্যা করিতে হয়?"

সে স্বরে কি আশ্বাস! কি করুণা! স্বর্গের বীণা যেন আমার কর্ণে ধ্বনিত হইয়া উঠিল!

আমার অজ্ঞান অবস্থায় স্ত্রীলোকটি আমাকে মার্শেলে তাহার আত্মীয়ের বাটি লইয়া আসিয়াছে! পরদিন আমি নাইসে গেলাম। আমার সহযাত্রিণী সিরি এবারও আমার সঙ্গিনী। আর বেশী কি বলিব? এক সপ্তাহ পরেই আমাদিগের বিবাহ!"

সিসিল আমার পিঠ চাপড়াইয়া কহিল, "সাবাস!"

শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

কাশীতে এক সপ্তাহ।

বত্রিশ বৎসর পরে গত শ্রাবণ মাসে কাশীতে গিয়া এক সপ্তাহ ছিলাম।

বাঙ্গালী টোলার বাহিরে এখন এত পরিবর্ত্তন ও উন্নতি হইয়াছে যে মনে হয় যে এ কাশী আর যেন সে কাশী নয়। পূর্ব্বে দশাশ্বমেধ ঘাটের অর্দ্ধমাইল দূরবর্ত্তী এক মাঠের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষেত্রাধিকারীগণ প্রাতঃকালে বড় রাস্তার পথিকদিগকে নিজের ক্ষেত্রে গিয়া প্রথম প্রাতঃকৃত্য সম্পন্ন করিবার জন্য

বহু বিনয় সহকারে আমন্ত্রণ করিত। এখন সেই মাঠ সুরম্য অট্টালিকাময় হইয়াছে। গঙ্গার উপরে সেতু নির্ম্মিত হইয়াছে, সর্ব্বত্র জলের কল হইয়াছে, পথ সকল প্রসারিত হইয়াছে, নানাস্থানে ডাকঘর হইয়াছে, বাজারগুলি পাকা হইয়াছে। বাঙ্গালীটোলা বিস্তার লাভ করিয়া কেদার ঘাটেরও বাহিরে গিয়াছে। অনেক বাঙ্গালী বড় বড় বাড়ী করিয়াছেন। বাঙ্গালীর সংখ্যা শুনিলাম দুই লক্ষেরও অধিক। বঙ্গদেশ ভিন্ন ভারতবর্ষের অন্য কোন প্রদেশের লোকই এত অধিক সংখ্যায় কাশীতে বাস করেন না। মরাঠীর সংখ্যা প্রায় পাঁচ সহস্র, পঞ্জাবীর সংখ্যাও তাহাই। বাঙ্গালীর অধিকাংশই এখানে মরিয়া সদ্গতি লাভ করিবেন এই আশায় আসিয়াছেন।

আমি অপরাহ্নে কাশীতে পৌঁছিলাম। তখন খুব বৃষ্টি হইতেছিল; পৌঁছিয়াই ভাবিলাম যে আমার পূর্ব্ব পরিচিত লোকদের মধ্যে কে কে এখনও কাশীতে আছেন তাহার অনুসন্ধান করিব। অনেক অনুসন্ধানের পর কবিরাজ শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের সাক্ষাৎ পাইয়া তাঁহার কাছে জানিলাম যে আমার পূর্ব্বপরিচিত লোকেরা প্রায় সকলেই কাশীলাভ করিয়াছেন। তথাপি আর একবার কাঁকিনার বাড়ীতে গেলাম; এই খানেই আমি পূর্ব্বে পণ্ডিত যাদবেশ্বর তর্করত্নের সহিত একত্র বাস করিতাম। তিনি এখন রঙ্গপুরে,—তাঁহার সহিত দেখা হইল না; তাঁহার পিতৃস্বসাকে দেখিতে পাইলাম; তাঁহার বয়স এখন ৮৫ হইবে। তিনি আমাকে চিনিতে পারিলেন না কিন্তু আমি তাঁহাকে চিনিলাম। তাঁহার তপঃক্লিষ্ট শরীর এখন একেবারেই বলহীন হইয়াছে। আমরা যখন কাশীতে অধ্যয়ন করিতাম তখন তিনি যেরূপে চাতুর্ম্মাস্য ব্রত করিতেন সেরূপ কঠোরব্রত আর কেহ করিয়াছেন বলিয়া শুনি নাই। সেই চারিমাস প্রত্যহ তিনি কাশীর সর্ব্বত্র পদব্রজে ভ্রমণ করিতেন। সন্ধ্যার পূর্ব্বে ফিরিয়া আসিয়া একটী বিল্বপত্র এবং এক সিকি পরিমিত ঘৃত আহার করিতেন। একাদশীর দিন তাহাও খাইতেন না। এই আহারে এবং সেই পরিশ্রমে তিনি যে কিরূপে চারিমাসের পরেও বাঁচিয়া রহিলেন ইহাই আশ্চর্য্য। তিনি যে বৎসরের কেবল চারি মাসই এইরূপ তপঃপরায়ণা থাকিতেন তাহা নহে। প্রতি সপ্তাহেরই অন্তত তিনদিন নিরম্বু উপবাস করিতেন।

তখনকার আর একটী সাধুর কথা এই স্থানে বলিতেছি। তাঁহার নাম হরিনারায়ণ ঘোষ। তিনি পণ্ডিত বা শাস্ত্রজ্ঞ ছিলেন না অতি সামান্য লেখাপড়া জানিতেন। তাঁহার মাসিক আয় ছিল পাঁচ টাকা মাত্র। কাঁকিনার রাজার কাশীতে যে দুইটী বাড়ী আছে তাহার ছোট বাড়ীর তত্ত্বাবধান করিতেন বলিয়া রাজ সরকার হইতে তিনি এই বৃত্তি পাইতেন। তাঁহার কার্য্যক্ষেত্র অতি সংকীর্ণ ছিল। গঙ্গায় প্রত্যহ স্নান করিতে যাইতেন সুতরাং ঘাট হইতে কাঁকিনার বাড়ী পর্য্যন্তই তাঁহার কার্য্যক্ষেত্র ছিল। কেন না বার্দ্ধক্য ও হাঁপানির জন্য এবং অর্থাভাব বশত তিনি অন্য কোন স্থানে যাইতে পারিতেন না। কিন্তু এই ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যেই তাঁহার লোকহিতৈষণা প্রকাশ পাইত। তিনি অধিক জপতপ করিতেন না। স্নানের পর ও সন্ধ্যার সময়ে কয়েক মিনিট মাত্র জপ ও ধ্যান করিতেন এবং যখন একাকী থাকিতেন তখনও নানা জপ করিতেন। যখন নিকটে লোক থাকিত তখন তাহাদেরই সহিত আলাপ করিতেন এবং যাহাতে লোকের উপকার হয় কেবল সেই উপদেশই দিতেন। স্নান করিতে যাইবার সময়ে কিছু কড়ি ও দুই চারিটা আধ পয়সা সঙ্গে লইয়া যাইতেন ও তাহা রুগ্ন অক্ষম ব্যক্তিদিগকে দান করিতেন। বাড়ীতে প্রত্যহ বৈকালে মহাভারত পাঠের বন্দোবস্ত ছিল। তাহা শুনিতে প্রত্যহ প্রায় একশত নরনারী আসিতেন। বাড়ী ঘর, শয্যা, আহার্য্য এমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিতেন যে তেমন আমি অত্যল্প বাঙ্গালীরই দেখিয়াছি। বাঙ্গালীদের যেখানে সেখানে থুথু ফেলা চিরকালের অভ্যাস। যদি কেহ বাড়ীর প্রাঙ্গণে থুথু ফেলিত তাহা হইলে ঘোষ মহাশয় "একি করিলেন?" এই বলিয়া তখনই তিনটা পয়সা খরচ করিয়া দুই তিন ভিস্তি জল আনাইয়া সমস্ত প্রাঙ্গণ পরিষ্কার করাইতেন। দরিদ্র বিধবা এবং বৃদ্ধেরা তাঁহার নিকটে তাহাদের সঞ্চিত অর্থ রাখিয়া দিত। যখনই তাঁহার পীড়াবৃদ্ধি হইত

তাহাদের টাকা তাহাদিগকে প্রত্যর্পণ করিতেন। কাহাকেও সমাজচ্যুত করার প্রস্তাব হইলে তিনি সর্ব্বদাই সেই প্রস্তাবের বিরোধী হইতেন—বলিতেন "তুমি আমি কি কখনও কোন দোষ করি নাই?" একবার একটি লোক তাঁহাকে সামান্য একটি মিথ্যা কথা বলিতে অনুরোধ করিয়াছিল। তিনি বিরক্ত হইয়া উত্তর দিয়াছিলেন, "কাশীতে আসিয়াছি মরিতে, এখানেও মিথ্যা বলিব? তাহা পারিব না।" একদিন শ্রীহট্ট দেশীয় একটী বৈদ্যের মৃত্যু হয়। তাঁহার তিনটী স্বজাতীয় ছিলেন। কিন্তু তিনজনে শব বহন করিয়া মণিকর্ণিকায় লইয়া যাওয়া বিশেষ কষ্টকর বলিয়া তাঁহারা আর একটী বৈদ্যের সন্ধান করিতে করিতে আমার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমি তাঁহাদের সহিত যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলাম। এমন সময়ে আমার অভিভাবক স্থানীয় একজন ব্রাহ্মণ ও একজন বৈদ্য আসিয়া বলিলেন যে শ্রীহট্টের বৈদ্যেরা আমাদের সমাজের নহেন সুতরাং আমার কোন মতেই এ কার্য্যে যোগ দেওয়া উচিত নহে। ঘোষ মহাশয় বলিলেন "ছেলে মানুষ ইচ্ছা করিয়া বিপদাপন্ন লোকের উপকার করিতে চাহিতেছে তাহাতে দোষ কি? যদি কোন দোষ হয় তাহা গঙ্গাস্নান করিলেই যাইবে। যাদবেশ্বর পণ্ডিত মহাশয়ের পিতৃস্বসার কঠোর ব্রতের প্রতিবাদ ঘোষ মহাশয় সর্ব্বদাই করিতেন, বলিতেন, "মা আপনি এইরূপে উপবাস করিতে করিতে যদি মরিয়া যান তাহা হইলে ত আপনার আত্মহত্যা করা হইবে, তাহা হইতে ত কাশীতে মরিলেও উদ্ধার হইবে না।"

এবার যেদিন কাশীতে পৌঁছিলাম তাহার পরদিন অন্নপূর্ণার বাড়ীর একটা ষাঁড়ের মৃত্যু হইল। বহুবাদ্য বাজাইয়া, নিশান উড়াইয়া মহাসমারোহে বহুলোকে সেই ষাঁড়ের শব গঙ্গায় বিসর্জ্জন করিল। আর্য্য সমাজের একটি যুবক পূর্ব্বে এইরূপ ব্যাপার দেখেন নাই। তিনি বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে, একটা ষাঁড়ের জন্য এত ঘটা কেন? উপস্থিত একজন গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "অন্নপূর্ণার ষাঁড় হিন্দুর মহাপূজ্য বলিয়াই তাহার জন্য এইরূপ মহাসমারোহ হইতেছে।" আর একজন গম্ভীরতর ভাবে বলিলেন "আপনি জানেন না যে হিন্দুরা বড় ভক্তিমান জাতি। বৃক্ষ তাঁহাদের পূজ্য, প্রস্তর তাঁহাদের পূজ্য, মনুষ্যকৃত মূর্ত্তি তাঁহাদের পূজ্য। কেবল ঈশ্বরকে পূজা করিতে হয় ইহাই তাঁহারা জানেন না।"

ষণ্ডদেবের মৃত্যুর পরদিন বৈকালে শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের সহিত বাঙ্গালীটোলার মধ্য দিয়া যাইতে যাইতে তিনি একটী দশ এগার বৎসর বয়স্ক বাঙ্গালী বালককে দেখাইয়া বলিলেন যে, সেই বালকটী সমস্ত বেদ অধ্যয়ন করিয়াছে। বলিতে বলিতে বালকটী আমার অতি নিকটবর্ত্তী হইল আমি তাহার হাত ধরিয়া ফেলিলাম। কয়েকজন লোক হাঁ হাঁ করিয়া বলিল "ও ব্রহ্মচারী উহাকে ছুইবেন না।" আমি বালকটীকে ছাড়িয়া দিয়া দুই একটী প্রশ্ন করিলাম। দেখিলাম সে সংস্কৃত কহিতে পারে না কিন্তু বুঝিতে পারে। পরে পুনরায় তাহাকে ধরিয়া সস্নেহে তাহার তাহার মুখে হাত বুলাইয়া দিলাম। বালকটী সন্তুষ্ট হইয়া চলিয়া গেল।

বালকটী এত সংস্কৃত পড়িয়াও সংস্কৃতে কথা কহিতে পারে না ইহা দুঃখের বিষয় বটে কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। কেননা বাঙ্গালীরা প্রায়ই সংস্কৃতে কথা কহিতে শিক্ষা করেন না। যে বঙ্গদেশে এত বড় বড় সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত আছেন এবং লব্ধপ্রতিষ্ঠ সংস্কৃত গ্রন্থকার আছেন, যে দেশের লোক ইংরেজী ভাষায় বক্তৃতা করিয়া সম্পূর্ণরূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে বিদেশীভাষার উপর আধিপত্যবিস্তার করিবার ক্ষমতা তাঁহাদের আছে,—সেই দেশের লোক তাচ্ছল্য করিয়া কেন যে সংস্কৃতে কথা কহিতে শেখেন না এবং শুদ্ধ করিয়া সংস্কৃতের উচ্চারণ করেন না তাহা বুঝিতে পারি না।

একদিন রামকৃষ্ণমিশন আশ্রমে গিয়াছিলাম। ইঁহারাই বাস্তবিক প্রেমের কার্য্য সুতরাং ধর্ম্মচর্য্যা করিতেছেন। যেখানে রুগ্ন বন্ধুহীন অসমর্থ ব্যক্তিকে দেখিতে পান তাহাকে আশ্রমে লইয়া আসেন এবং ঔষধ পথ্য দেন। যদি কেহ কুসংস্কার বশত আশ্রমে যাইতে না চাহে তাহা হইলে তাঁহারা সেই রোগী

যেখানে আছে সেখানে গিয়াই তাহার চিকিৎসা করিয়া থাকেন। অনেক রুগ্ন স্ত্রীপুরুষ আশ্রমে আছেন। তন্মধ্যে দুইটী হিন্দুস্থানী সন্ন্যাসীকে দেখিলাম। মুমূর্ষু অবস্থায় রাস্তায় পড়িয়া ছিলেন মিশনের লোকেরা সংবাদ পাইয়া তাঁহাদিগকে আশ্রমে লইয়া গিয়া শুশ্রূষা করিয়া বাঁচাইয়াছেন। সাধারণের সাহায্যই এই মিশনের একমাত্র নির্ভর। মিশনের লোকেরা অপূর্ব্ব ত্যাগ স্বীকার করিয়া এই জনসেবাব্রত গ্রহণ করিয়াছেন। সহস্র সহস্র হিন্দু প্রতি নিয়ত পুণ্য সঞ্চয় করিবার জন্য কাশীতে গিয়া থাকেন। তাঁহারা যদি প্রত্যেকেই এই মিশনে কিঞ্চিৎ দান করেন তাহা হইলে তাঁহাদের পুণ্য যে বর্দ্ধিত হইবে এ কথা কি এখনকার প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিরাও বুঝিতে অসমর্থ? অনতিদীর্ঘকাল পূর্ব্বে প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মের অবস্থা এরূপ ছিল যে যাঁহারা নিরবচ্ছিন্ন ধর্ম্মকর্ম্মের জন্য তীর্থে যাইতেন তাঁহারাও কোন সহযাত্রীর পীড়া হইলে তাহার মৃত্যু পর্য্যন্তও অপেক্ষা না করিয়া তাহাকে জীবিত অবস্থাতেই রাস্তায় ফেলিয়া চলিয়া যাইতেন। বর্ত্তমান হিন্দুধর্ম্মের অবস্থা কি তদপেক্ষা উন্নত হয় নাই? এখনকার হিন্দুরাও যদি ভাবেন যে রামকৃষ্ণ মিশন কেবল সকল বর্ণের লোককে একত্রিত করিয়া ও একত্র খাওয়াইয়া জাতি মারিয়া ধর্ম্মনষ্ট করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টের নিয়োজিত গুপ্তচর তাহা হইলে হিন্দুজাতির শুভ-পরিণামের কি আশা আছে?

আর এক সম্প্রদায় অন্য দিক দিয়া হিন্দু-সমাজের কল্যাণ কার্য্যে ব্যাপৃত আছেন। ইঁহারা দয়ানন্দ স্বামী প্রতিষ্ঠাপিত আর্য্যসমাজের লোক। এই সমাজের অনেকেই নিজের সর্ব্বস্ব সমাজে দান করিয়াছেন। ইঁহারা সকলেই পঞ্জাবের অধিবাসী। এবার আমি কাশীতে গিয়া ইঁহাদেরই এক জনের বাসায় অতিথি হইয়াছিলাম। তিনি কেশবদেব শাস্ত্রী কবিরাজ। ইঁহার বয়স ত্রিশ বত্রিশ বৎসর। ইনি গুরুমুখী, সংস্কৃত, ইংরেজী, পারসী, গুজরাটী, মরাঠি, উর্দ্দু, বাঙ্গালা প্রভৃতি ভাষা জানেন। ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়াছেন। কলিকাতার বিখ্যাত কবিরাজ ৺ দ্বারকানাথ সেন মহামহোপাধ্যায়ের নিকটে বঙ্গদেশ প্রচলিত চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষা করিয়া এখন কাশীর দশাশ্বমেধ ঘাটে চিকিৎসা ব্যবসায় করিয়া থাকেন। একখানি উর্দ্দু ও নবজীবন নামে একখানি হিন্দী পত্রিকার সম্পাদকতা করেন। এখনও অবিবাহিত। শরীরে ও মনে অদম্য বল, স্ফূর্ত্তি ও উৎসাহ। ইঁহার মুখে শুনিলাম যে কাশীতে আর্য্য সমাজের যে শাখা আছে তাহার সহিত রাজনৈতিক কোন সংশ্রব নাই—তাঁহারা রাজনীতিক কোন চর্চ্চাই করেন না। ভারতবর্ষের অভিসম্পাত স্বরূপ জাতি-ভেদ ও উপধর্ম্মের উচ্ছেদই তাঁহাদের একমাত্র লক্ষ্য। বর্ত্তমান রাজনৈতিক আন্দোলনকে তাঁহারা যে কেবল সময়োচিত নহে বলিয়া মনে করেন তাহা নহে গর্হিত কার্য্য বলিয়াই বিবেচনা করেন। তাঁহারা ব্রহ্ম-চর্য্যের পক্ষপাতী হইলেও অনেকে বিবাহ দিতে না পারিয়া যেরূপ বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া থাকেন তাহা জানিয়া একটী দল সংগঠন করিয়াছেন, এই দলের প্রত্যেকেই যে কোন প্রদেশের যে কোন জাতির শিক্ষিত কন্যাকে বিবাহ করিতে প্রস্তুত আছেন। এই দলের প্রত্যে-কেই উচ্চ বংশীয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষিত। আমার এক বন্ধুর কন্যার সহিত আমি এই দলের কোন ব্যক্তির বিবাহের প্রস্তাব করিয়াছি। এখনও তৎ-সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা চলিতেছে।

শাস্ত্রীজি দুই দিন আমাকে দশাশ্বমেধ ঘাট হইতে তিন মাইল দূরে নিজ বাটীতে আহারের নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। প্রথম দিন গিয়া দেখিলাম নিমন্ত্রিত-দের মধ্যে হিন্দুস্থানী, মরাঠি ও পঞ্জাবী কয়েকজন আছেন। সকলেরই মস্তকে শিখা। পঞ্জাবীদের এক-জন বি এ উপাধিকারী নাম সিদ্ধেশ্বর। মহারাষ্ট্রীয়টী বেনারস হিন্দু কলেজের একটী ব্রাহ্মণ ছাত্র। আহার্য্য সমস্ত বস্তুই নিরামিষ এবং সাদাসিধে রকমের। তাঁহারা জীবিত থাকিয়া কার্য্য করিবার জন্যই আহার করেন কিন্তু কেবল আহার করিবার জন্যই জীবন ধারণ করেন না ইহা স্পষ্ট দেখা গেল। ভোজন হইল টেবিলে। আহারে বসিবার পূর্ব্বেই ব্রাহ্মণ ছাত্রটি

বলিলেন "আমি নিবেদন করিব কোথায়?" তখন একজন উঠিয়া গিয়া কয়েকটা লেবুর পাতা আনিয়া দিলেন। তাহার একটা পাতা টেবিলের উপরে রাখিয়া সেই পাতার উপরে ব্রাহ্মণ যুবকটী নিবেদিত অন্ন রাখিলেন। আহারের পূর্ব্বে অগ্নিপাত্রে প্রজ্বলিত অগ্নিতে সংস্কৃত মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে ঘৃতাহুতি দিয়া হোম করা হয়। তাহার পর প্রার্থনা,—অবশেষে আহার। দ্বিতীয় দিন নিমন্ত্রণে হোমের পর একটী মহিলা হিন্দী ভাষায় প্রার্থনা করিলেন।

দয়ানন্দ স্বামীর উপ্ত বীজোৎপন্ন বৃক্ষ যে এত শীঘ্র বর্ত্তমান সমৃদ্ধ আকার ধারণ করিবে তাহা তিনিও ভাবিয়া ছিলেন কি না সন্দেহ। আমি পূর্ব্বে কাশীতে অবস্থানকালে প্রথম বৎসর প্রায় প্রত্যহই বৈকালে তাঁহার নিকটে যাইয়া দুই তিন ঘণ্টা থাকিয়া তাঁহার সহিত অন্যান্য পণ্ডিতদিগের কথোপকথন শুনিতাম। তাঁহার মুখোচ্চারিত সরল সুন্দর সংস্কৃত ভাষা শুনিয়া পরমানন্দ অনুভব করিতাম। সমাজের অধিকাংশ লোকই তাঁহাকে দেখেন নাই, আমি তাঁহাকে দেখিয়াছি ও তাঁহার সহিত বহুদিন আলাপ করিয়াছি বলিয়া আর্য্য সমাজের অনেকের কাছে আমি আদর ও সম্মান পাইয়াছি। তিনি জাতিভেদ, পুনর্জ্জন্ম, শ্রাদ্ধ, তর্পণ, হোম, বেদের অপৌরুষেয়তা, রামায়ণ মহাভারত ও মনুসংহিতার প্রামাণ্য মানিতেন। কিন্তু তাঁহার জাতিভেদ বর্ত্তমান হিন্দুসমাজের জাতিভেদের ন্যায় ছিল না। তিনি শূদ্রের অন্ন গ্রহণ করিতেন না এবং শূদ্রের বাড়িতে ভিক্ষা করিতেও যাইতেন না—কিন্তু বলিতেন যে শূদ্র যদি নখকেশ কর্ত্তন করিয়া ভাল করিয়া স্নান করিয়া শুদ্ধ শরীর ও শুদ্ধ বেশ হয় তাহা হইলে সে পাক করিয়া দিলে আহারের কোন বাধা হইতে পারে না। রাজেন্দ্রলাল মিত্র শূদ্র হইয়াও বেদাধ্যয়ন করিয়াছেন শুনিয়া বলিলেন, তবে তিনি ব্রাহ্মণ হইয়াছেন। ব্রাহ্মণ কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়া যাহারা লেখাপড়া শেখে নাই বিশেষতঃ বেদাধ্যয়ন করে নাই তাঁহারাই তাঁহার মতে শূদ্র। ইঁহার মতে ঈশ্বর না মানিলেও চলে কিন্তু যাহারা পুনর্জ্জন্ম মানে না তাহারাই প্রকৃত নাস্তিক। শ্রাদ্ধ ও তর্পণ বিষয়ে দয়ানন্দ স্বামী বলিতেন যে, মৃতজনদিগকে প্রত্যহ একবার স্মরণ করিলে আমিও যে একদিন মরিব তাহা মনে পড়িয়া মনে বৈরাগ্যের উদয় হয়। হোম সম্বন্ধে স্বামী বলিতেন যে, হোমের ধূম মেঘে লাগিয়া মেঘের জল বিশোধিত হয়—সুতরাং সেই জল বৃষ্টি ধারায় পতিত হইয়া প্রজার হিতসাধন করে।

একদিন একটী সৌখিন বিদ্যার্থী স্বামীর সহিত তর্ক করিতে গিয়াছিল। তাহার একটা কথা শুনিয়া স্বামী বলিলেন 'একথা কোনো বেদে নাই।' বিদ্যার্থী বলিল "আপনি কি সমস্ত বেদ পড়িয়াছেন যে এমন কথা বলিতেছেন?" স্বামী বলিলেন যে "চারি বেদ ও চারি উপবেদ সমস্তই পড়িয়াছি।" বিদ্যার্থী বলিল "এমন কখনই হইতে পারে না। বেদ অনন্ত একথা বেদেই আছে। যদি বেদ অনন্ত হয় তাহা হইলে আপনি সমস্ত বেদ পড়িলেন কিরূপে?" স্বামী বলিলেন "বিবক্তি যে তে বেদাঃ জ্ঞানবন্তঃ পুরুষাঃ ত এব অনন্তাঃ। যে বেদকে অনন্ত বলা হইয়াছে তাহা পুস্তক বেদ নহে। পুস্তক বেদ যদি অনন্ত হইত তাহা হইলে মনু তিন তিন বৎসরে এক এক বেদ পড়িতে হইবে এরূপ নির্দ্দেশ করিতেন না।" মনুসংহিতা সম্বন্ধে স্বামী বলিতেন যে তাহাতে পঁচিশটী শ্লোক প্রক্ষিপ্ত আছে। মহাভারত সম্বন্ধে স্বামী একদিন এক আশ্চর্য্য কথা বলিলেন। কালিদাস নাকি একস্থানে লিখিয়াছেন যে তিনি যখন বালক ছিলেন তখন মহাভারতে চতুর্বিংশতি সহস্র মাত্র শ্লোক ছিল—তিনি বৃদ্ধ হইয়া দেখিতেছেন যে এখন তাহতে ত্রিশ সহস্র শ্লোক আছে—মহাভারত যদি এইরূপে বর্দ্ধিত কলেবর হয় তাহা হইলে কালে তাহা এক উটের বোঝা হইবে।

স্বামী হাস্য পরিহাসে নিপুণ ছিলেন। একদিন তাঁহাকে একজন জিজ্ঞাসা করিলেন "ব্যাসকাশীতে মরিলে কি বাস্তবিক গর্দ্দভ হয়?" স্বামী উত্তর করিলেন "গর্দ্দভা বদন্তি।" আর একজন বলিলেন কাশীতে মরিলে শিবত্ব লাভ হয়। স্বামী বলিলেন শবত্ব যে লাভ হয় সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

বাঙ্গালীরা স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া স্বদেশ প্রচলিত অভিবাদন করিতেন। কিন্তু হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত যাঁহারা যাইতেন তাঁহারা সকলেই স্বামীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিতেন। তাঁহারা অনেকেই স্বামীর মস্তকে পুষ্পাঞ্জলি দিতেন। আমি একদিন স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলাম "আপনি ঈশ্বর পূজা প্রচার করিতে আসিয়া নরপূজার অনুমোদন করেন কেন?" স্বামী হাসিয়া বলিলেন "পাষাণ পূজা করিয়াই ভরতখণ্ডের এত দুর্দ্দশা হইয়াছে—পাষাণ পূজা করিয়া লোকের বুদ্ধি পাষাণের মত হইয়া গিয়াছে। তাহারা যদি আমার মত একজন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির পূজা করে তাহা হইলে তাহাদের বুদ্ধিও মনুষ্যের মত হইবে।"(দয়ানন্দ স্বামী ভারতবর্ষকে ভরতখণ্ড বলিতেন।)

বাঙ্গালীদিগকে স্বামী বুদ্ধিমান বলিয়া প্রশংসা করিতেন। একদিন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সহিত এক তপোবনে তাঁহার সাক্ষাৎমাত্র হইয়াছিল কিন্তু আলাপ হয় নাই। কলিকাতায় আসিয়া কেশবচন্দ্র প্রভৃতির সহিত আলাপ হইয়াছিল। কেশবচন্দ্র সেনকে তিনি কেশবসেন চন্দ্র বলিতেন। কেশবচন্দ্র কেমন লোক? এই প্রশ্নের উত্তরে স্বামী বলিসেন "শূর বীরোঽস্তি।" বিদ্যাসাগর মহাশয়ও তাঁহার মতে মহাপুরুষ ছিলেন। একজন বিখ্যাত বাঙ্গালী পণ্ডিতকে তিনি "মহাধুর্ত্তোঽস্তি" বলিতেন। আর একজন বাঙ্গালী পণ্ডিত সম্বন্ধে বলিতেন "কিঞ্চিদপি ন জানাতি।" বঙ্গদেশের পণ্ডিতেরা সংস্কৃতে কথা কহিতে পারেন না ইহাতে স্বামীর বিশ্বাস হইয়াছিল যে "বঙ্গদেশে সংস্কৃত বিদ্যায়াঃ প্রচার এব নাস্তি।" বাঙ্গালীরা বক্তৃতা শুনিতে শুনিতে হাততালি দিয়া থাকেন তাহা দেখিয়া কাশীতে গিয়া স্বামীজি একদিন বলিয়াছিলেন "বঙ্গীয়া যদা প্রসন্না ভবন্তি তদা হস্তৈঃ পট্ পট্ ইত্যাকারং ধ্বনিং কুর্ব্বন্তি।" একদিন একজন বলিলেন যে বাঙ্গালীরা পদ্মকে পদ্দ বলেন। স্বামী বলিলেন "বঙ্গীয়া মকারস্য ভক্ষণং কুর্ব্বন্তি।"

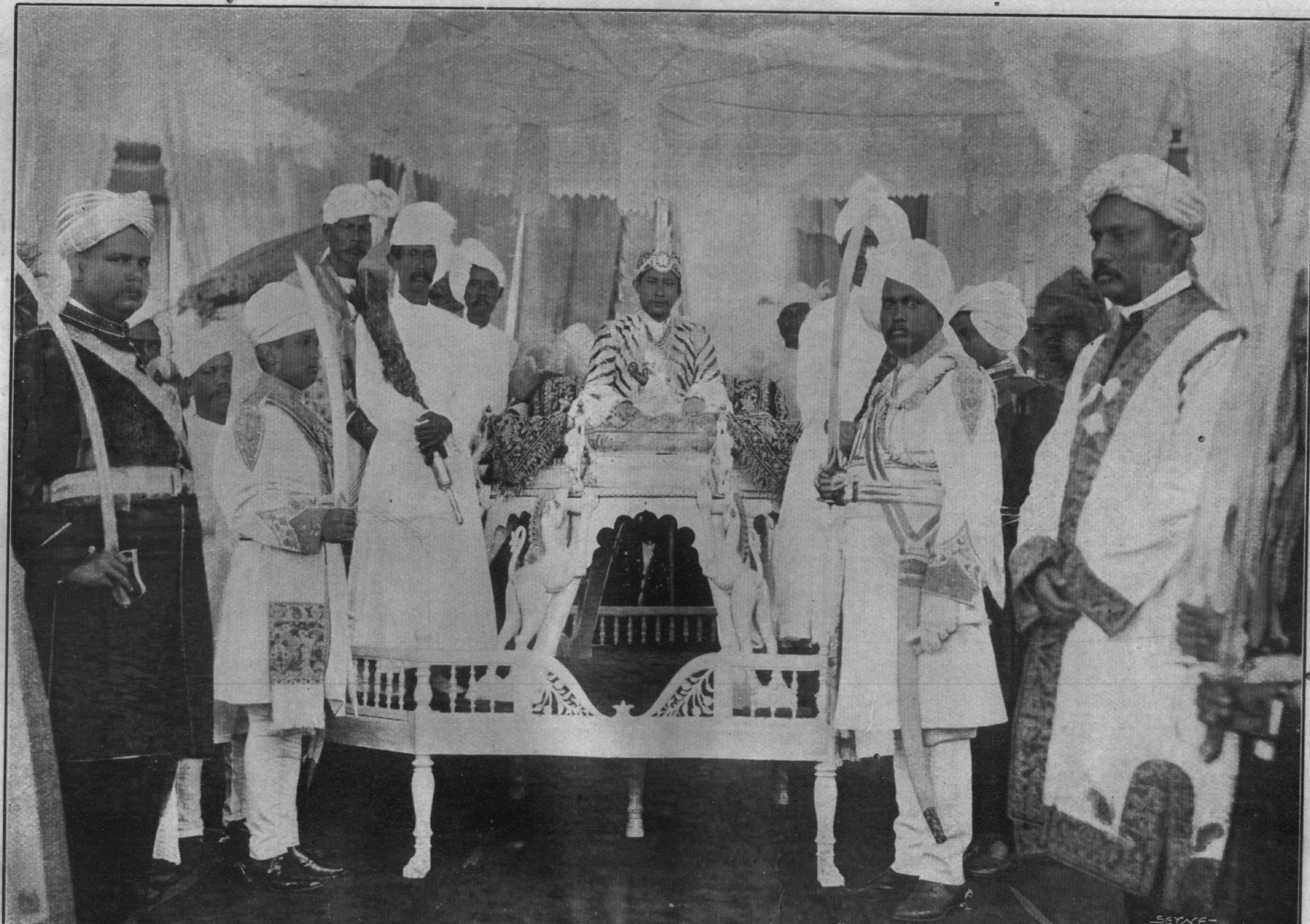
দয়ানন্দ সরস্বতী সম্বন্ধে আরও অনেক কথা বলিবার আছে। কিন্তু প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া পড়িল, এজন্য আজ এইখানেই উপসংহার করিলাম।

শ্রীবীরেশ্বর সেন।

স্বাধীন ত্রিপুরায় রাজ্যাভিষেক।

ত্রিপুরার নূতন রাজপ্রাসাদটি কলিকাতার গভর্ণমেণ্ট্ হাউসের অনুকরণেই গঠিত। মাঝে গম্বুজ, উচ্চ চূড়ার দুই পার্শ্বে সুন্দর খিলান করা বারান্দা তাহার মধ্যস্থলে সুসজ্জিত গৃহাবলী। নীচে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড স্ফটিক স্তম্ভের উপর গম্বুজটি রক্ষিত। সম্মুখের প্রাঙ্গণ হইতে উপরে উঠিবার জন্য সারি সারি অতি সুচারু রূপে গঠিত বিশাল সিঁড়ি উঠিয়াছে। সমস্ত বাড়িটি শুভ্রবর্ণ ইনামেলের পেণ্টে রঞ্জিত; তাহার রজত আভা সূর্য্যালোকে ও চন্দ্রোদয়ে বড়ই সুন্দর দেখায়। সম্মুখের দুইটি প্রশস্ত হ্রদে সেই ছবি প্রতিবিম্বিত হইয়া সে দৃশ্য বড়ই মনোহারী করিয়া তুলে।

এই দুইটি হ্রদের আয়তন প্রায় ৬ মাইল হইবে। চারিদিকের মহিমাময় দৃশ্য ইহার প্রশস্ত জলে প্রতিফলিত হইয়া—উপরের আকাশ ও শ্বেত অট্টালিকা ও ফুলময় উদ্যান দৃশ্যকে আরও উজ্জ্বলতর দেখায়। সামনে উপর্য্যুপরি অনেকগুলি তোরণের নীচে দিয়া ধারে ধারে সারি সারি গাছবিশিষ্ট প্রশস্ত রাজপথ সহরের ভিতর দিয়া চলিয়া গিয়াছে। সব রাস্তা প্যারীনগরের মত সোজা সোজা;



ত্রিপুরায় রাজ্যাভিষেক

তাহাতে মাবের অবিশগুলি সব সমান ও সরল ভাবে বিভক্ত। পুরাতন রাজ্যে এই সকল নূতন ভাবের সজ্জা যেন চিত্রপটে ছায়া আলোকের মধুর সম্মিলন!

এই রাজপ্রাসাদটির সম্মুখদেশে উক্ত সুবিস্তৃত ফুলময় উদ্যান ও হ্রদ শোভিত, আর একপাশে অন্দরমহলের উচ্চ উচ্চ প্রাচীর,—অন্যপার্শ্বে সেই হাস্যময় ধ্বজা পতাকা উড্ডীয়মান রাজ্যাভিষেকের নবগঠিত মণ্ডপ। পশ্চাতের বিস্তৃত মাঠ সিপাহীদিগের ড্রীল্ করিবার স্থান।

রাজপ্রাসাদের সিঁড়ি দিয়া উঠিয়াই একটি দালানে পড়া যায়—তার দুই ধারে সুসজ্জিত ঘর। ঘরের মধ্যেই লতাপতা ঘেরা একটি স্ফটিক উৎস শত প্রবাহে জল ধারা ছুটাইয়া শোভা পাইতেছে, ফোয়ারার দুই ধারে দুইটি সুন্দর শ্বেত প্রস্তর-মূর্ত্তি—একটি "Three graces" অর্থাৎ পুরাতন গ্রীশ দেশের কল্পিত বিভিন্ন ভাবের তিনটি নগ্ন রমণীমূর্ত্তি। সোনার আপেল পাইবার লালসায় "ভিনাস" "জুনো" ও "মিনার্ভা দেবী" যেরূপ ভাবে রাজপুত্র প্যারিশের কাছে দাঁড়াইয়া ছিলেন ইহাদিগেরও সেই ঠাট্। অপর দিকে "Venus and Psychic" অর্থাৎ শচীদেবী ও তাহার প্রণয়ী একটি স্বর্গীয় দূত। 'সাইকিক' আকাশ হইতে তীরবেগে মর্ত্ত্য-ভূমিতে উড়িয়া আসিয়া বিহ্বলভাবে ধরাশায়িতা শচীদেবীর—মুখ চুম্বন করিতেছেন।—তাহাতে উভয়েরই সমান আগ্রহ। স্বর্গীয় দূতটিই ("Psychic") মানব হৃদয়ের অনুরাগ, শচীদেবী সৌন্দর্য্য-রূপিণী। অনুরাগ সৌন্দর্য্য এই দুইটির অখণ্ড অনন্ত অক্ষয় নৈসর্গিক আকর্ষণ এই ছবিটিতে সুন্দর ভাবে দেখান আছে।

পাশের ঘরেই একটি অতি বৃহৎ সুন্দর লাইব্রেরী আছে। যে সকল পুস্তক জ্ঞানদায়ী ও মনের উন্নতি সম্পাদন করে সেই সব পুস্তকে ইহা পরিপূর্ণ—অন্যান্য লাইব্রেরীর মত নাটক নভেলে পূর্ণ নহে। এখানে একটি আলমারীতে "Reference" বই ঠাসা আছে। তাহাতে আধুনিক নানা বিষয়ের সুন্দর সূচীপত্র ছাপা। যে বিষয়ের আবশ্যক অতি অল্পক্ষণের মধ্যেই ইহাতে তাহার সন্ধান পাওয়া যায়। তবে দুঃখের বিষয় এমন সুন্দর লাইব্রেরিটি সর্ব্বদাই বন্ধ থাকিত। পড়িবার ও বুঝিবার লোকও বড় দেখিলাম না। আমি অনেক চেষ্টা করিয়াছি এক দিনও আলমারী খোলা পাই নাই। কেবল একটি আলমারীর একখানি ভাঙ্গা কাচের ভিতর দিয়া দুই একখানি বই দেখিয়াছি। তার পর বিলিয়ার্ড খেলিবার ঘর। তার এক পাশের একটি ঘরে সাক্ষাৎপ্রার্থী দর্শকদের সহিত মহারাজা আসিয়া সাক্ষাৎ করেন। নানারূপ আধুনিক ও পুরাকালিক ছবি আসবাব ও মণিমুক্তাখচিত সরঞ্জামে সে ঘরটি সাজান, পুরাতন ঢাল তরবার ও বর্ম্ম দেওয়ালে টাঙান আছে। তারই পাশে প্রশস্ত দরবার হল। মহারাজের নির্জ্জনে বসিবার প্রকোষ্ঠ আর এক প্রান্তে—অনেক ঘর অতি-ক্রম করিয়া সেখানে খালি পায়ে ঢুকিতে হয়।

কিন্তু এ সকল স্থায়ী মূল্যবান সৌন্দর্য্যকে অতিক্রম করিয়া দুইদিনের বাঁশ ও রঙ্গিন কাপড়ে নির্ম্মিত সেই প্রকাণ্ড পাণ্ড্যালটি তখন আরও সুন্দর দেখাইতেছিল। অতি মনোহর

কারুকার্য্যকরী বাঁশের বেড়া দিয়া স্থানটি ঘেরা। মধ্যস্থলে স্বর্ণজড়িত উচ্চ সিংহাসন ও আশে পাশে গণ্যমান্য কর্ম্মচারী ও পার্শ্বচরদের দাঁড়াইবার স্থান। আর দুই ধারে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের আসন নির্দ্ধারিত। বিস্তৃত তাঁবুটি উচ্চে নানা রকমের ধ্বজা উড়াইয়া বিভিন্ন রাজ্যের সমৃদ্ধি দেখাইতেছিল। সিংহ আঁকা ব্রিটিশের ধ্বজা, চাঁদ ও তারা-আঁকা ত্রিপুরার ধ্বজা পাশাপাশি বিরাজ করিতেছিল। এই স্থানেই রাজ্যাভিষেকের বিপুল আয়োজন—ব্যস্তসমস্ত ভাবে রাজ্যের কর্ম্মচারীরা সৈনিকের পোষাক পরিয়া চারিদিকে ঘুরিতেছিল। সকল দ্বারগুলি শানিত অস্ত্রধারী প্রহরীদের দ্বারা পরিলক্ষিত। ২৫শে নভেম্বর এই উৎসব সম্পন্ন হইল।

দুই দিন পূর্ব্বে ছোটলাট বাহাদুর "হেয়ার" সাহেব উচ্চ কর্ম্মচারীদের সঙ্গে "আগড়তলা" ষ্টেসনে আসিয়া গাড়িতেই সান্ধ্য-ভোজন ও রাত্রিযাপনান্তে পরদিন প্রাতে ৮টার সময় ত্রিপুরা রাজ্যের রাজধানী আগড়তলায় প্রবেশ করেন। ঠিক দুই রাজ্যের সীমানায় একটি সুন্দর তোরণ গাঁথা ও পথের ধারে ধারে ফুলের মালা, ধ্বজা-পতাকা ও দুই সারি এ দেশী সিপাহি শোভা পাইতেছিল। অল্প দূরে দূরে দণ্ডায়মান প্রজাগণের জয়োল্লাসের ও আনন্দ কোলাহলের মধ্য দিয়া মোটর গাড়ি চড়িয়া লাট বাহাদুর নির্দ্ধারিত আবাসে গেলেন।

সে স্থানটি খরস্রোতা একটি ক্ষুদ্র নদীর ধারে। পশ্চাতে উচ্চ পাহাড়, চারিদিকে নানারূপ ফুলের বাগান ও অন্যান্য নিমন্ত্রিত সাহেবদের তাঁবু। স্থানটি অতি মনোহর। এ গোলমালের দিনে পুলিস কর্ম্মচারীরা চারিদিকে সতর্কে পাহারা দিতেছিল। উৎসবের জন্য সমস্ত নগর অতি সুন্দরভাবে সজ্জিত। রাস্তায় রাস্তায় তোরণ, দুই ধারে লতাপাতার ও ধ্বজা পতাকার সজ্জা; রাজবাটির সম্মুখদেশ সর্ব্বাপেক্ষা সুসজ্জিত।

জনতার অবধি নাই কত দেশ দেশান্তর হইতে লোক আসিয়াছে। সকলেরই মুখ আনন্দ ও শুভ ইচ্ছা পূর্ণ। তাহারা নির্নিমেষ নয়নে—অদৃষ্ট পূর্ব্ব সে মহোৎসব—কাতার দিয়া দাঁড়াইয়া দেখিতেছে। নগরটিও তখন নানারূপ দোকান পসারে ভরা। সাধারণ লোকের জন্য নানা স্থানের নানা ভাবে নাচগানের আড্ডা তৈয়ারী হইয়াছিল। নর্ত্তকী গায়কী যাত্রা থিয়েটার সার্কাস ও অন্যান্য নানা তামাসার সমারোহ।

রাজ্যারোহণের শুভদিনে প্রাতঃকাল হইতেই—শাঁক ঘণ্টা তুরী ভেরী দুন্দুভি প্রভৃতি নানারূপ মঙ্গল বাদ্য যন্ত্র বাজিয়া উঠিল। নানা প্রকারের মঙ্গল গীতির আর অভাব ছিল না। প্রাতে আটটার সময়ে সভা। তার পূর্ব্ব হইতেই সকল নিমন্ত্রিত দর্শকবৃন্দ দরবারে আসিয়া নিজ নিজ স্থান দখল করিয়া বসিলেন। চারিদিকে চেয়ার। বাহিরে অজস্র লোক সংখ্যা। ভিড় ঠেলিয়া আসিবার যো নাই। সবাই রাজ্যাভিষেক দেখিতে পাগল। ঠেলাঠেলির সময় প্রহরীরা তাহাদের উপর দারুণ বেত্রাঘাত করিতে লাগিল। সেইটিই বড়ই কষ্টের দৃশ্য।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি,—মণ্ডপের মধ্যদেশে চন্দ্রাতপের তলায় সিংহাসন স্থাপিত তার

চারিপাশে কর্ম্মচারীদের দাঁড়াইবার স্থান। নিকটেই লাট বাহাদুরের বসিবার উচ্চ কাষ্ঠাসন। আশেপাশে গণ্যমান্য দর্শকবৃন্দের বসিবার আসন। আর চতুর্দ্দিকে লোকের জনতা। এক প্রান্তে লোবোর ব্যাণ্ডধারীগণ অন্য প্রান্তে লম্বা আলখাল্লাধারী মহামহোপাধ্যায় ও পুরোহিতগণ এবং ধারে ধারে সেদেশী খর্ব্বাকৃতি অথচ বলিষ্ঠ দেহ সৈন্যদল দাঁড়াইয়া। তাহারা দেখিতে অনেকটা গুরখা সৈন্য বা জাপানী সৈন্যের মত; যুদ্ধকার্য্যে পটু ও পাহাড়ে চড়িতে ক্ষিপ্রপদ। কত বিভিন্ন দেশের রাজরাজড়াও আসিয়াছিলেন; যথা মণিপুর, ভুটান, সিকিম নেপালের সৈন্যাধ্যক্ষ ইত্যাদি। নানা দেশের নানা প্রকারের লোক ও তাদের পোষাক দেখিলে—বিস্ময়ের আর সীমা থাকে না। আর দূরে সেই শ্বেতপ্রস্তর নির্ম্মিত রাজপ্রাসাদটির জানালার পরদা দিয়া অন্তঃপুরবাসিনী বন্দিনীদের দেখিবার স্থান নিরূপিত ছিল। সূর্য্যালোকে তখন চারিদিক হাসিতেছিল।

এমন সময় রাজনা বাজিয়া উঠিল। সমারোহ এই দিকেই আসিতেছে জানিয়া সকল দর্শকই দাঁড়াইয়া সেই দিকে দেখিতে লাগিলেন। জনতা আরও অসংযত ও কোলাহলময় হইয়া উঠিল। আরও ঘন ঘন বেত্রাঘাতও চলিতে লাগিল। এই সময়ে প্রথমে রাজপথে আঠারটি হাতির সারি দেখা গেল। স্বর্ণখচিত আবরণে তাহাদের গাত্র ঢাকা। কাহারও কাহারও দাঁত ও মাথাও সুসজ্জিত। উপরে মাহুত ও কোনও বড়লোক উপবিষ্ট। হাতির সাজের এই দৃশ্যটি বড়ই রোমাঞ্চকর।

পরে গাড়ি করিয়াও অনেক লোক আসিলেন।

লাটবাহাদুর রাজবাটীর সামনে অবতরণ করিয়া রাজাকে সঙ্গে লইয়া মণ্ডপে প্রবেশ করিলেন। সে সময়কার গোলমাল ও লোকের উত্তেজনা দেখে কে! চারিদিকে শঙ্খ দুন্দুভি বাজিয়া উঠিল। ব্যাণ্ড পূর্ব্ব হইতেই আগমন গীতি গাহিতেছিল। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল—পুরবালাদের অন্তরের ঐকান্তিক আগ্রহপূর্ণ হুলুধ্বনি। চিক্ ফেলা সেই রাজপ্রাসাদের জানালাগুলি হইতে সেই মধুর হুলুধ্বনি এখনও যেন আমার কাণে বাজিতেছে।

পরে লাট বাহাদুর অগ্রসর হইয়া মহারাজকে ব্রিটিশরাজের খেলাৎ দিলেন। ও প্রত্যুপহার স্বরূপ ১০১ টাকা উপঢৌকন পাইলেন। তার পর বক্তৃতা করিয়া মহারাজের হাত ধরিয়া ৭ বার সিংহাসন ঘুরাইয়া মহারাজকে সিংহাসনে বসাইয়া দিলেন। এই সময় আবার তুমুল কোলাহল। সাতবার এইরূপ প্রদক্ষিণ, ধান দূর্ব্বাদানে আশীর্ব্বাদের মত, একটি দেশী প্রথা।

আবার তুমুল কোলাহল আনন্দ ধ্বনি, শাঁকঘণ্টা ও হুলুধ্বনি বাজিয়া উঠিল। তাহা শুনিলে অঙ্গ শিহরিয়া উঠে। ময়ূর সিংহাসনের চারিদিকে নানারূপ অস্ত্র শস্ত্র ও নিশান লইয়া কর্ম্মচারীগণ দাঁড়াইয়া ছিলেন, সে সব আসবাব গুলি অতি পুরাকালিক ও বিস্ময়কর; দেখিতে কোনটি হাতের মত কোনটি বা চাঁদের মত ইত্যাদি।

ইহার পরেই পুরোহিতদের আশীর্ব্বাদ

তাঁহাদের বেদ গান ও আশির্ব্বচন গুলির গুরুত্ব বা গাম্ভীর্য্য আশাজনক হৃদয়গ্রাহী হয় নাই। তাঁহাদের মঙ্গলবারি সিঞ্চনে মহারাজের সর্দ্দি লাগিয়া গেল। তাঁহারা রাজার সন্নিধান সহজে কি ছাড়িতে চান। পরে দলে দলে গণ্যমান্য প্রজা জমীদার ও ভূম্যধিকারীরা রাজদর্শনে চলিলেন। আশ্চর্য্য এই, অধিকাংশই মুসলমান ভূম্যধিকারী। কি তালুকদার কি প্রজা তাঁহাদের তিনজন মুসলমান ও একজন হিন্দু। তবে হিন্দু মুসলমানে ইংরাজ রাজত্বে যেমন রেশারেশি বেশী হইয়াছে ও সব দেশে তা কিছুই নাই, বেশ সদ্ভাব। তাঁদেরও মুখে আনন্দ ধরে না। শুভাকাঙ্ক্ষাও অন্তর ভরা।

সেই দিন সন্ধ্যায় দরবার ও পর দিন রাজকীয় ভোজ (State dinner) সমাধা হইয়া গেলে লাট বাহাদুর ও অধিকাংশ ইংরাজ অতিথি চলিয়া গেলেন। যাইবার পূর্ব্বে উৎসবের দিনে রাত্রে লাট বাহাদুর ও অন্যান্য ইংরাজ ও মেমেরা একত্রে "বোসের সার্কাস" ও মিনার্ভা থিয়েটার দেখিতে গিয়াছিলেন। তখন সাধারণ দর্শকবৃন্দের সে পথ দিয়া যাতায়াতের হুকুম ছিল না। যাহারাও বা না জানিয়া বা একান্ত কৌতূহল পরবশ হইয়া সে পথে চলিয়াছিল তাহাদের কত নির্য্যাতনা সহিতে হইয়াছে। অনেক স্থানেই স্বচক্ষে দেখিয়াছি অতিথি সৎকারের সঙ্গে সঙ্গে আগন্তুকদের উপর বেত্রাঘাত ও তাড়না সমান হিসাবে চলিয়াছে। এই ঘটনাটিই কেবল সেই শুভদিনের কালিমার কথা।

উৎসব সংক্রান্ত আরও দু-একটি বিষয় বর্ণনা করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

কেবল ভীষণ অপরাধে দণ্ডিত কয়েকজন বন্দী ছাড়া সে দেশের জেলখানার প্রায় সকল কয়েদীকেই এই উৎসবে খালাস দেওয়া হইয়াছিল। কয়েদীদের মধ্যে ১৪ আনা মুসলমান ও যে সব অপরাধে তাহাদিগকে দণ্ডিত দেখিলাম সেগুলি সবই অতি নৃশংস গুরুতর অপরাধ। একজন গাঁজা খাইত বলিয়া তার হঠাৎ অস্থায়ীভাবে পাগলামী আসিত। গাঁজার এ দোষ চিরকালই আছে। সে সেই অবস্থায় আপনার তিনটি ছেলেকে হত্যা করিয়াছে ও পরে জ্ঞান হইলে এখন একান্ত সন্তপ্ত। তাছাড়া ইহাদের মধ্যে তিনটি গেরুয়া বসন পরা যুবা সন্ন্যাসীদের আবদ্ধ দেখিলাম। "এনার্কিষ্ট" সন্দেহ করিয়া তাদের গ্রেফতার করা হইয়াছে।

এইবার উৎসবের দিনের সন্ধ্যায় আলো ও আতসবাজির কথা বলি। তথায় এমন জায়গা ছিল না যে স্থান সারি সারি আলোকে না আলোকিত হইয়াছিল। বিশাল রাজ-প্রাসাদের প্রতিরেখায় নানা বর্ণের আলো চূড়া অবধি সাজান। সামনের রাস্তাগুলি ইলেকট্রিক আলোকে ও চীনে লণ্ঠনে ভরা। দুই ধারের হ্রদ চতুর্দ্দিকে আলোকিত হইয়া সকল স্থানের আলোক সজ্জা আপনার অঙ্গে প্রতিবিম্বিত করিয়া মাটির নীচে দ্বিতীয় রহস্য দেখাইতেছিল। আমি সেদিন গভীর রাত্রে একা এক প্রান্তে দাঁড়াইয়া সেই মহিমাময় দৃশ্য স্তম্ভিত হইয়া বহুক্ষণ ধরিয়া অবলোকন করিয়াছি।

আতস বাজির কারখানা সে অত্যন্ত লোমহর্ষক। পটকা ফুটিল, তুবড়ী ছুটিল, আকাশে বড় বড় ফানুস উঠিল, ও গাছে

আলোকের নানা রঙ্গের ফুল ফল ফুটিল। কামানের মত অভ্রভেদী নিনাদে বোমাগুলি আকাশে উঠিয়া নানা রঙ্গের তারকা সৃজন করিয়া আকাশপৃষ্ঠে ফাটিতে লাগিল। পড়িবার কালে তার প্রতি আলোকরেখাটি খানিকক্ষণ শূন্যে বিরাজিত থাকিয়া তবে পড়ে। শূন্যে ঢিল ছুড়িয়া এইরূপ উন্মত্ত হইয়া আগুন লইয়া খেলা আর থামে না। সবাই ভয়ে ত্রস্ত পাছে জলন্ত আগুন মাথায় পড়ে অথচ সবাই দেখিতেও মহা উৎসুক। অনেক দুর্ঘটনাও হইল। হাসপাতালে পর দিন গিয়া দেখি তিন জন লোক ঐ আমোদে পুড়িয়া গিয়াছে। ত্রিপুরায় অধিকাংশই চালা ঘর সহজেই আগুণ লাগে সেরূপ স্থানে এরূপ হাউই ছোঁড়া আমোদ বড়ই ভয়াবহ।

এইবার রাজভাণ্ডারের কথা। সে ভাণ্ডারে দেশ বিদেশ হইতে কত সুখাদ্য আনিয়া জমা ছিল। ঢাকার এক রকম ক্ষীর দেখিলাম সেরূপ কখনও দেখি নাই। বড় বড় মালসা করিয়া তাহা রক্ষিত; উপরের অংশটি বড়ই শক্ত হইয়া আছে—তার তলায় পাতলা ক্ষীর। এই আবরণের দরুণ এই ক্ষীর নাকি ১০।১২ দিনেও পচে না। যাঁহারা নিজে খাইয়াছেন তাঁহাদের মুখে শুনিলাম যে ইহা অতি সুস্বাদু ও খাইলে কোনও অসুখ হয় না। আমার ইচ্ছা ছিল খানিকটা সঙ্গে করিয়া কলিকাতায় আনিয়া অনুবীক্ষণ যন্ত্রের দ্বারা পরীক্ষা করি তাহাতে কোনও রূপ কীটাণু আছে কিনা। কিন্তু তাহা ঘটিয়া উঠিল না। যথার্থই যদি এরূপ ভাবে ক্ষীর রাখা চলে তাহা হইলে তো কলিকাতা সহরের দারুণ দুধের অভাব অনেকটা এইরূপ ক্ষীরের আমদানী দ্বারা পূরণ হইতে পারে। Swiss Milkও অনেকটা এই জিনিষ। আমাদের হাতে শত উপায় থাকিলেও আমরা তাহার সদ্ব্যবহার করিতে জানি না।

নিমন্ত্রণ খাওয়াইবার সময় যেরূপ খাওয়ান আমার প্রশস্ত বলিয়া মনে হইতে লাগিল তা এই। সকল জনতার স্থানে শুকনা শুকনা জিনিষ খাওয়ানই নিরাপদ কারণ তাহাতে শীঘ্র জীবাণু বা তাদের বিষদৃষ্টি তত সহজে পড়ে না। আর ঘাঁটা দলান জিনিষ অপেক্ষা লোকেও তাহা অনেক শ্রদ্ধার সহিত খায়। অল্প জিনিষ যেমন পরিতৃপ্তিকর রাশিকৃত জিনিষে তাহা হয় না। তাহা ছাড়া ইহা কত অপচয় নিবারক। এখনকার ব্যবস্থায় লোকের পাতের চৌদ্দ আনা দ্রব্যের মধ্যে তারা দুই আনা মাত্র খায়। আমাদের এমন গরীব ও দুর্ভিক্ষ পীড়িত দেশে কি ওরূপ অপচয় পাপ নহে? কত লোক আমাদের জানিত ও অজানিত ভাবে না খাইয়া মরে। তাহাদের কাছে ওই গ্রাসগুলি কতই দুষ্প্রাপ্য।

মাছ প্রভৃতি যে সব সামগ্রী সুখাদ্য অথচ অনেক দিন থাকে না সেগুলি পচিয়া গিয়া কতই অনিষ্ট করিতে পারে। সে সকল দ্রব্য আহার করিলেও যেমন রোগ হয়—তার দুর্গন্ধেও তেমনি রোগ আনে। অমন জনতার স্থানে সে সব দ্রব্য না আনাই ভাল। জীবন্ত পাঁঠাগুলি গলায় রজ্জুবদ্ধ হইয়া অতিনিষ্ঠুর ভাবে টানিয়া হিঁচড়াইয়া বধ্যস্থানে নীত হইতেছিল। তাদের করুণ রোদন বড়ই কষ্টকর। এমন আনন্দের দিনে নিম্নশ্রেণীর প্রাণীকে এমন কষ্ট দেওয়া কেন?

ত্রিপুরার হাসপাতালের ব্যবস্থা অতি সুন্দর। এখানে সব জাতির জন্য আলাদা আলাদা স্থান। আমি যদিও জাতিভেদ্র প্রথার উচ্ছেদই কল্যাণকর বিবেচনা করি, তথাপি দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় হাসপাতালের প্রতি দেশের লোকের শ্রদ্ধা আনিতে হইলে জাতি-বিচার রক্ষা একান্ত আবশ্যক। এখানে আর একটি যে মহতী ব্যবস্থা দেখিলাম সেটি আর কোথাও কখনও দেখি নাই। কোনও লোকের অসুখ হইয়া হাসপাতালে আসিলে দুই এক জন আত্মীয়ও তার সেবার জন্য তথায় থাকিতে পায়। তাহাদের থাকিবার স্থান ও আহার রাজ সরকার দেন। অসাধ্য রোগে আক্রান্ত অথচ অসহায় এমন লোক হইলে হাসপাতালে চিরদিনের জন্য তাকে স্থান দেওয়া হয়। ইংরাজ রাজত্বে এ দুইটির একটি ব্যবস্থাও নাই;—হইলে ভাল হয় বলা বাহুল্য।

এখানে আর একটি নূতন কীর্ত্তি—একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন। ইহার বাড়া সমাজের হিতকর অনুষ্ঠান ইহসংসারে আর কোথাও নাই। সকল তীর্থদর্শন ও দেবমন্দির প্রতিষ্ঠার ফল এই এক মহাব্রতে পাওয়া যায়। ইহকাল ও পরকাল উভয় কালেই সুখ সম্পদ একত্র আসে।

এইবার ছোটলাট বাহাদুর ও মহারাজের বক্তৃতার সম্বন্ধে দু একটি কথা বলিয়া আমি বিদায় গ্রহণ করিব।

ছোটলাটের বক্তৃতার এই কথাগুলি উল্লেখ যোগ্য—

১। ত্রিপুরার সঙ্গে আমাদের কারবার অনেকদিন হইতে। কিছুদিন হইতে একজন ইংরাজ "রেসিডেন্ট" এখানে আছেন। পূর্ব্বে প্রতি রাজ্যাভিষেকে কলেক্টর সাহেব উপস্থিত থাকিতেন। এ বছর উত্তরাধিকার সূত্র আমি চিরকালের জন্য দৃঢ় করিবার মানসে নিজে আসিয়া রাজ্যাভিষেক করিতেছি।

২। পুরাতন মহারাজা রাজ্যের অনেক উন্নতি করিয়াছিলেন—তাঁহার ১২ বৎসরের রাজ্যকালে দুই লক্ষ হইতে এগার লক্ষ মুদ্রা আয় বাড়ে। তিনি হাসপাতাল ও রাজকুমার কলেজ স্থাপনা করেন।

৩। আমাদের পরস্পরের এই বুঝা পড়া চাই যে, ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের মত লইয়াই উত্তরাধিকারী নিযুক্ত হইবে। কোনও নিকটতম আত্মীয় বা রাজা যার নাম করিবেন অথবা পূর্ব্বপুরুষ হইতে উদ্ভূত এমন যে কোনও লোক উক্তরাজ্যের অধিকারী হইতে পারিবেন।

৪। যতদিন আপনারা রাজভক্ত থাকিবেন ততদিন আমরা বন্ধু থাকিব। আজকালকার স্বাধীন রাজাদের সহিত ভিন্ন প্রণালীতে চলিবার ব্যবস্থা হইতেছে। বিশেষ না আবশ্যক হইলে তাহাদের দেশের ভিতরকার কার্য্যে হস্তক্ষেপ হইবে না। তবে সুশাসন চাই।

মহারাজের বক্তৃতা।—

১। আমরা সর্ব্বদাই রাজভক্ত থাকিব ভারতের সেই অবস্থাতেই সর্ব্বাপেক্ষা কুশল।

৩। আমি অতি অল্পবয়সে গুরুভার পাইয়াছি আমাকে উপদেশ দানে বাধিত করিবেন।

ছয়দিন পরমসুখে সেই রাজ্যে বাস করিয়া ও উৎসবাদি দেখিয়া দেশে ফিরিয়াছি। আমার মনে একই শুভ ইচ্ছা অহরহ জাগিয়াছে তাহা এই যে, আধুনিক উন্নতিশীল ও জ্ঞানবহুল সময়ের সৎদৃষ্টান্ত লইয়া পুরাতনের যতটা পরিবর্ত্তন আবশ্যক সেইটুকু অবাধে করিয়া রাজ্যের কুশল ও প্রজার সুখবৃদ্ধি করা হউক।

আর একটি কথা, দেশে রমণীজাতির

অবস্থা যত উন্নত হইবে দেশের শুভদিন ততই নিকটবর্ত্তী হইবে। এ সত্য ভূভারতে সকল জাতির পক্ষেই সমান। এই সত্য উপলব্ধি করা লোকপালক রাজার প্রথম কাজ। আশা করি আমাদের তরুণ মহারাজ ভিক্টোরিয়া বালিকাবিদ্যালয়ের ভিত্তি স্থাপনের সহিত চিরকাল একথাটি মনে রাখিবেন।

শ্রীইন্দুমাধব মল্লিক।

চিত্রব্যাখ্যা।

রাজা নহুষ সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় কর্ত্তৃক অঙ্কিত চিত্রের প্রতিলিপি।

রাজা নহুষ ত্রিভুবন জয় করিয়া ইন্দ্রানীকে লাভ করিবার জন্য মহাগর্ব্বে স্বর্গ যাত্রা করেন। তাঁহার আদেশে সহস্র ঋষি তাঁহার রথ আকাশ পথে বহন করিয়া লইয়া যাইতে-ছিলেন, হঠাৎ নহুষের পা অগস্ত্য ঋষির মাথায় ঠেকে, তাহাতে ঋষি প্রবর ক্রুদ্ধ হইয়া নহুষকে শাপ দেন। সেই শাপে নহুষের পতন হয়।

চয়ন।

উল্কাপাত।

পুরাকালে জনসাধারণ উল্কাপাতকে "স্বর্গ হইতে প্রস্তর পতন" বলিয়া কল্পনা করিতেন। বৈজ্ঞানিক গবেষণার পূর্ব্বে এইরূপ প্রস্তর পতন যে বিশেষ শ্রদ্ধা-ভক্তির সহিত পরিলক্ষিত হইত তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। আমরা আজ কয়েকটী দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিব।

খ্রীষ্টধর্ম্ম সম্বন্ধীয় যশুয়া পুস্তকে (Book of joshua) আমরা দেখিতে পাই যে, আমোরিতের পাঁচজন রাজা যশুয়ার নিকট যুদ্ধে পরাজিত হইয়া পলায়নপর হইলে ভগবান আকাশ হইতে বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড নিক্ষেপ দ্বারা উক্ত পাঁচজনকেই নিহত করেন। খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম পুস্তকে আমরা আরও কয়েক স্থলে এইরূপ প্রস্তর পতন দেখিতে পাই—এই সকল প্রস্তর উল্কাব্যতীত আর কিছুই নহে।

ইফিসাস নগরীর সুপ্রসিদ্ধ প্রতিমা ডায়নাও খুব সম্ভব একটী উল্কা-প্রস্তর। খ্রীষ্টের জন্মের ৪৫৬ বৎসর পূর্ব্বে ডায়নার মন্দির ভস্মীভূত হয় এবং ইহার পর-বৎসর হইতেই নূতন মন্দির নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ হয়। প্রবাদ এই যে, এই মন্দির নির্ম্মাণ করিতে ২২০ বৎসর লাগিয়াছিল। ইহার দৈর্ঘ্য চারিশত ফুট, প্রস্থ দুইশত ফুট এবং মার্ব্বেল প্রস্তরে নির্ম্মিত ইহার প্রত্যেকটী স্তম্ভের ব্যাস ৭ ফুট করিয়া ছিল। আট মাইল দূরবর্ত্তী প্রস্তরখনি হইতে এই সমস্ত পাথর গড়াইয়া গড়াইয়া মন্দির নির্ম্মাণ স্থলে নীত হইয়াছিল।

মক্কায় যে সুপ্রসিদ্ধ কৃষ্ণবর্ণের প্রস্তরখানি দেখিতে পাওয়া যায় তাহার সম্বন্ধে প্রবাদ এই যে, ঈশ্বর যখন আদমকে স্বর্গ হইতে দূরীকৃত করিয়া দেন তখন অন্যান্য মূল্যবান প্রস্তরসহ এখানিও আদম ও ইবের সহিত প্রেরিত হয়। জলপ্লাবনের সময় ইহা পুনর্ব্বার স্বর্গে লইয়া যাওয়া হয় ও পরে স্বর্গীয় দূত গেব্রিয়েল আব্রা-হামকে ইহা প্রত্যর্পণ করেন। লোক বিশ্বাস এইরূপ যে, ইহা পূর্ব্বে শ্বেতবর্ণের ছিল কিন্তু পরে পাপীদিগের চুম্বনে কৃষ্ণবর্ণ হইয়াছে। কার্ম্মেটিয়ান দেশবাসীগণ এই প্রস্তর বল পূর্ব্বক তাহাদের দেশে লইয়া যায় এবং অনেক প্রলোভন সত্বেও দ্বাবিংশ বৎসর ইহা প্রত্যর্পণ করে নাই। পরে যখন তাহারা দেখিল প্রস্তর তাহা-দের নিকট থাকা সত্ত্বেও যাত্রীগণ মক্কাতেই যাতায়াত করেন, তখন উহা ফিরাইয়া দিল। ভিয়েনা নগরীর যাদুঘরের প্রবীণ অধ্যক্ষ পল পার্থচ ইহাকে উল্কাজাত প্রস্তর বলিয়াই নির্দ্দেশ করেন।

ট্রয় নগরীতে একটী এইরূপ প্রস্তর ছিল। আকাশ হইতে পতিত হইয়াছিল বলিয়া ইহাকে সকলে অত্যন্ত ভক্তি করিত এবং এই প্রস্তরই নগরীকে অজেয় করিয়া রাখিয়াছিল। বস্তুতঃ এই বিশ্বাস এত দৃঢ়ীভূত ছিল যে ট্রয় যুদ্ধকালীন ওদেশাস ও ডাইওমিডিস ইহা হরণ করেন। গ্রীসে এরূপ আরও অনেক প্রস্তর ছিল এবং রোমে যুদ্ধযাত্রার পূর্ব্বে আকাশ হইতে পতিত প্রস্তর পূজা প্রচলিত ছিল।

ফিনিশিয়ানগণ প্রতিমার পরিবর্ত্তে উল্কাজাত প্রস্তরসমূহ মন্দিরে রক্ষা করিয়া পূজা করিত। অনেকের মতে ফিনিশিয়া দেশান্তর্গত পাফসের মন্দিরে যে কোণাকৃতি (conical) প্রস্তর ছিল উহা উল্কা ব্যতীত আর কিছুই নহে।

আসিয়া মাইনরের অন্তর্গত ফ্রিজিয়া প্রদেশে এইরূপ একটী প্রস্তর পূজিত হইত। খ্রীষ্টের জন্মের ২০৪ বৎসর পূর্ব্ব রাজা আটালাস দৈববাণী কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া ইহাকে রোমে লইয়া যান। তিনি শুনিলেন, এ প্রস্তর রোমে নীত হইলে যত দিন ইহা রোমে থাকিবে ততদিন রোমের সৌভাগ্য সূর্য্য অস্তমিত হইবে না।

খ্রীষ্টের জন্মের ৪৭০ বৎসর পূর্ব্ব থ্রেশ-দেশান্তর্গত ইসেপটামি সহরের নিকটেই একটী বৃহৎ উল্কা পতন হয়। প্লুটার্ক ইহার বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। কারসোনিসের জনসাধারণ ইহাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিত। প্রবাদ এই যে, ইহার পতনের পঁচাত্তর দিন পূর্ব্ব হইতে আকাশে অগ্নির এক বৃহৎ কুণ্ড দৃষ্ট হইত। প্লুটার্ক বলিয়াছেন যে এই আকাশজাত (heavealy bodies) বস্তুসকল কোন কারণে বিক্ষিপ্ত হইয়া নিম্নে পতিত হয় এবং অনেক সময়েই সমুদ্রগর্ভে নিপতিত হয় বলিয়া জনসাধারণ ইহার অতি অল্প সংখ্যাই দেখিতে পায়।

বুধগ্রহ।

প্রাচীন গ্রীকগণ এই গ্রহকে দুই নামে অভিহিত করিতেন। আপলো (God of day) এবং মার্কারী (God of thieves)। সম্ভবতঃ গ্রীকেরা ইহাকে দুইটী বিভিন্ন মণ্ডল বিবেচনা করিতেন।

রোমকগণ খগোল বিজ্ঞানে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন না। বাগ্মিপ্রবর সিসিরো বলিয়া গিয়াছেন যে বুধগ্রহ,—ভিনাস (শুক্র) ও মার্স (যুদ্ধ দেবতা মঙ্গল) এই দুই গ্রহের মধ্যে পরিভ্রমণ করে।

চীন দেশীয় জ্যোতিষীগণ ১১৮ খ্রীষ্টাব্দে এই গ্রহের পর্য্যবেক্ষণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ইজিপ্সিয়ানগণ এই গ্রহকে সেট ও হোরসে নামে অভিহিত করিতেন, আরবদেশে বুধ ওতারেদ নামে পূজিত হইতেন। আসিরিয়ান এবং বেবিলোন দেশীয় প্রস্তর লিপিতে দেখিতে পাওয়া যায় যে ইনি নেবো নামে কথিত। ইঁহার পত্নীর নাম অর্ম্মাৎ এবং ভিনাস পুত্রপদবাচ্য। খ্রীষ্টের জন্মের সার্দ্ধ ছয়শত বৎসর পূর্ব্বেও বুধগ্রহের উল্লেখ পাওয়া যায়। সুপ্রসিদ্ধ টলেমীর আলমাগেষ্ট (Almagest) নামক পুস্তকে খ্রীষ্ট জন্মের ২৬৫ বৎসর পূর্ব্বে এই গ্রহ পর্য্যবেক্ষণের বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ আছে।

শিলাবৃষ্টি ও ইটালি দেশীয় কুসংস্কার।

ইটালি দেশে প্রবাদ এই যে, পাপীর শাস্তির জন্যই ভগবান শিলাবৃষ্টি পৃথিবীতে প্রেরণ করেন। ক্রমাগত দুই বৎসর শিলাবৃষ্টি দ্বারা ফসল নষ্ট হওয়ায় ট্যাভার্ণিলের লোকের ধ্রুব বিশ্বাস জন্মিল যে দুই বৎসর এপ্রিলমাসে সেণ্টজর্জ্জের উৎসব বন্ধ রাখাই উক্ত দুর্ঘটনার কারণ। আর এক স্থানে মে মাসে শিলাবৃষ্টি হওয়ায় তাহারা মনে করিল যে চিরন্তনপ্রথানুযায়ী ঐ মাসের মিছিলটি বাহির না করায় এইরূপ হইয়াছে।

অনেক সময় শিলাবৃষ্টি-সয়তানের কার্য্য প্রতিরোধের জন্য দুঃটী উপায় অবলম্বন করা হয়। কাষ্ঠ অথবা বেত নির্ম্মিত ক্রুশে জলপাইয়ের দুটী ডাল বিদ্ধ করিয়া ভূমিতে প্রোথিত করা হয়। তাহাদের বিশ্বাস এই প্রক্রিয়া ২৯শে এপ্রিল হইতে ৩রা মের মধ্যে না করিলে কোন ফলদায়ক হয় না।

পেরুগিয়ায় যখন শস্য কাটা শেষ হইয়া যায় তখন কৃষকগণ কয়েকটী গমের গাছ লইয়া ক্রুসকে সুশোভিত করে। পরে এই সমস্ত ক্রুস বজ্র নিবারণের জন্য গোলাবাড়ীর উপর সুরক্ষিত হয়। আশ্বিয়ায় মন্ত্রপূতঃ

জলপাইয়ের এক ডাল ক্রুসাকারে, জলপাই ও অন্যান্য বৃক্ষের উপর বাঁধিয়া রাখা হয়। অধিবাসীদের বিশ্বাস যে এরূপ করিলে শিলাবৃষ্টিতে কোন ক্ষতি করিতে পারে না। অনেক সময় মেঘ দেখিলেই গির্জ্জার ঘণ্টা ধ্বনিত হইয়া উঠে। শুধু গির্জ্জায় নয়, ঐ প্রদেশে যতগুলি ঘণ্টা আছে সমস্তই সমকালে নিনাদিত হইতে থাকে। যদি ইহাতেও মেঘ দূরীভূত না হয় তাহা হইলে গৃহস্বামী নিজ বন্দুকে বর্ত্তিকাখণ্ড পুরিয়া তাহা মেঘের দিকে লক্ষ্য করিয়া ছাড়েন। তাঁহাদের বিশ্বাস যে ইহ তে মেঘ নিশ্চয়ই দূরীভূত হইবে। গৃহস্বামী যখন এই বন্দুক ছাড়িবার ব্যাপারে নিযুক্ত থাকেন তখন স্ত্রীলোকগণ কর্ষণোপযোগী অস্ত্রাদির দ্বারা দরজার চৌকাঠের উপরে ক্রুশ নির্ম্মাণ করেন। পরে সমবেত হইয়া ঈশ্বরের প্রার্থনা করেন। কোন কোন সময় প্রতিমূর্ত্তিগুলির সম্মুখে প্রজ্বলিত বর্ত্তিকা স্থাপিত করিয়া ধর্ম্মযাজকও উক্ত প্রার্থনায় যোগদান করেন।

কোন কোন সময় বাটীস্থ ছোট বালক বা বালিকা একহস্তে ক্রুস ও অপর হস্তে ক্ষুদ্র ঘণ্টা লইয়া বাটীর চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করে সঙ্গে সঙ্গে বাটীস্থ অন্য সকলেও যোগ দেন। পেরুগিয়া প্রদেশে একটি শিল প্রথমে শিশুকে খাইতে দেওয়া হয়। যদি ইহাতেও শিলাবৃষ্টি না থামে তাহা হইলে যে লৌহ শৃঙ্খলে কড়াই ঝুলাইয়া রাখা হয় উহা বাটীর বহির্দ্দেশে নিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে।

প্রতিমার অভিশাপ।

অনেকে মনে করেন আমাদের দেশের লোকেই কুসংস্কারের বশীভূত কিন্তু নিম্নলিখিত বৃত্তান্ত হইতে দেখা যায় কুসংস্কার বস্তুটা কেবল আমাদেরই একচেটিয়া সম্পত্তি নহে। সম্প্রতি বিলাতের কোন ধর্ম্মযাজক, সংবাদপত্রে জানাইয়াছেন যে দুই সহস্র বৎসরের পুরাতন কতকগুলি হিন্দুপ্রতিমা তাঁহার নিকট আছে এবং তাঁহার বিশ্বাস যে, এই প্রতিমাগুলি পুনরধিকারের জন্য একটী গুপ্ত সম্মিলিত চেষ্টা করিতেছে। যাজক মহাশয় বলিতেছেন যে এগুলি প্রত্যর্পণ জন্য তিনি ব্যগ্র এবং ষাট বৎসর পূর্ব্বে উত্তর ভারতের যে মন্দির হইতে এগুলি আনীত হইয়াছিল, সেই স্থানে ইহা পাঠাইতে পারিলে তিনি নিশ্চিন্ত হইতে পারেন।

এই ধর্ম্মযাজক ভারতবর্ষে ছিলেন এবং ইঁহার পিতা যখন সৈন্য দলে কাজ করিতেন তখন তিনি কোন যুদ্ধান্তে লুটের অংশস্বরূপ এইগুলি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ধর্ম্মযাজক মহাশয়ের পূর্ব্বে বিশ্বাস ছিল যে এগুলি তাঁহার পিতা ক্রয় করিয়াছিলেন কিন্তু পরে তিনি অবগত হয়েন যে এগুলি লুটেরই অংশমাত্র। বিলাতে ব্রিটিশ মিউজিয়ামের কর্ত্তৃপক্ষগণ উহার একটীর মূল্যস্বরূপ দ্বাদশ সহস্র মুদ্রা দিতে প্রস্তুত ছিলেন। এই প্রকার আরও কয়েকটী প্রতিমা ছিল। ধর্ম্মযাজক মহাশয় বলিতেছেন ;—

"এই প্রতিমা আমাদের যে কোন আত্মীয়কে দেওয়া হইয়াছে তাহারই সমূহ ক্ষতি হইয়াছে। আমার পিতা এই প্রতিমাদের জন্যই অনেক কষ্টভোগ করিয়াছেন। তিনি মৃত্যুকালে এইগুলি আমাকে দিয়া যান কিন্তু আমার অধিকারে আসা অবধি আমি নানাপ্রকার বিপদ ভোগ করিতেছি। দশ বৎসর পূর্ব্বে, আমার ভ্রাতা যখন লিওহাষ্ট সহরে ছিলেন, তখন একজন হিন্দু তাঁহাকে এই প্রতিমাগুলির কথা জিজ্ঞাসা করে। যখন হিন্দুটী তাঁহাকে বলে যে, এই প্রতিমাগুলি প্রত্যর্পণ না করিলে অশেষ বিপদ ভোগ করিতে হইবে তখন আমার ভ্রাতা অত্যন্ত হাসিয়াছিলেন। সেই হিন্দুটী আরো বলে যে দশ বৎসর পরে প্রতিমাগুলি কাহার নিকট থাকিবে তাহার ঠিক নাই। ঠিক দশ বৎসর পরে, আমার ভ্রাতা ভারতবর্ষ হইতে একখানি পত্র পান তাহাতে এই মাত্র লেখা ছিল যে "দেবতাদিগের দস্তের কথা স্মরণ কর।" ঠিক সেই সময়েই এবং সেই ডাকেই তিনি সংবাদ পান যে তাঁহার পত্নী গুরুতর পীড়ায় কাতর। আমার ভ্রাতার বিশ্বাস যে প্রতিমাস্বামীদের সংবাদ না দেওয়ার জন্যই তাঁহার স্ত্রীর ব্যারাম হয়। আমি এ সব কিছুই বিশ্বাস করি না কিন্তু পরিবারস্থ সকলেরই ধারণা যে এগুলি প্রত্যর্পণ না করিলে মঙ্গল নাই।

সম্ভবতঃ প্রতিমাগুলি জৈনদের এবং খৃষ্টের জন্মের ৩।৪ শত বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত। এগুলি ইষ্টকে প্রস্তুত এবং ইহাদের গাত্রে নানাপ্রকার খোদিতমূর্ত্তি। প্রত্যেকটী দৈর্ঘ্যে প্রায় দুই হস্ত পরিমিত।"

হ্যালির ধূমকেতু

হ্যালির ধূমকেতু লইয়া সভ্যজগতে হুলস্থুল পড়িয়াছে। এই ধূমকেতু ৭৫ বৎসর পরে পরে দেখা দেয়। ইতিপূর্ব্বে নিম্নলিখিত সময়ে ইহার আগমন লিপিবদ্ধ আছে।

খৃষ্টের জন্মের ৪৬৭ অব্দ পূর্ব্বে, যখন চীনদেশে টিংওয়াং সম্রাট ছিলেন তখন এই ধূমকেতু দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল। পুনরায় ২৪০ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে চীনদেশবাসীগণ ইহাকে দেখিতে পায়। ভারতবর্ষে তখন অশোক রাজচক্রবর্ত্তী ছিলেন এবং ঐ বৎসরেই তিনি বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বন করেন। মিশরে তখন তৃতীয় টলেমি রাজা ছিলেন এবং প্রথম পুনিকযুদ্ধ এই সময়েই ঘটিয়াছিল। সম্ভবতঃ ১৬৩ পূর্ব্বখৃষ্টাব্দে হ্যালির ধূমকেতু পুনর্ব্বার দৃষ্টিগোচর হয়। ৮৭ পূর্ব্বখৃষ্টাব্দে যখন রোমে মারিয়স ও সলার বিবাদ চলিতেছিল তখনও ইহা দৃষ্ট হইয়াছিল। পূর্ব্বখৃষ্টাব্দ ১১—১২ সনে পুনরায় ইহা দেখা দেয়, রোম ও চীনদেশীয় পুস্তকে ইহার উল্লেখ পাওয়া যায়। ৬৬ খৃষ্টাব্দে আবার ইহাকে দেখিতে পাওয়া যায়। চীন গ্রন্থকারগণ ইহার বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ১৪১ ও ২১৮ খৃষ্টাব্দে হ্যালির ধূমকেতুর বিবরণ মাটুয়ানলিন নামক প্রসিদ্ধ চীনগ্রন্থে পাওয়া যায়। ২৯৫, ৩৭০ ৪৫১, ৫৩০, ৬০৭, ৬৮৪, ৭৬০, ৮৩৭, ৯১৫, ৯৮৯ সনে ইহাকে দেখা যায়। ১০৬৬ খৃষ্টাব্দে—অর্থাৎ যেবার ইংলণ্ডে সেনলাকের যুদ্ধে নর্ম্মাণ ডিউক উইলিয়াম হ্যারল্ডকে পরাজয় করেন সেইবার ইংলণ্ডবাসীগণ ইহাকে দেখিতে পায়। পরে, ১১৪৫, ১২২২, ১৩০১, ১৩৭৮, ১৪৫৬, ১৫৩১, ১৬০৭ ১৬৮২ এবং ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে ইহা দেখা দেয়। শেষে বৎসরটীকে ইংরাজ ঐতিহাসিকগণ "Glorious 59" আখ্যা প্রদান করিয়াছেন,—কেন না, "when it was necessary every morning to ask what new victory there was, for fear of missing one." ইহার পরে আর একবারমাত্র অর্থাৎ ১৮০৫ সনে ইহাকে দেখা গিয়াছিল। পুনর্ব্বার ৭৫ বৎসর পূর্ণ হইয়াছে তাই আবার ইনি দেখা দিতেছেন।

পার্লিয়ামেণ্টে বেতনভুক সভ্য।

—অনেকেরই ধারণা যে পার্লিয়ামেণ্টের সভ্যমাত্রেই অবৈতনিক কিন্তু লর্ড ও কমন্সদিগের মধ্যে ৬৬ জন বেতনভুক সভ্য আছেন। ইঁহারা বাৎসরিক একুনে দশলক্ষ মুদ্রারও অধিক বেতন পান। এই সভ্যদিগের মধ্যে কয়েকজন কেরাণীর কার্য্য করেন। ইহাদের প্রত্যেকের বেতন বাৎসরিক ত্রিশ সহস্রমুদ্রা এবং ইঁহারা থাকিবার জন্য বাটীও পান। কয়েকজন সহকারী কেরাণী আছেন—ইহাদের কেহ কেহ ২২ হাজার কেহ ১৫ হাজার মুদ্রা বেতন স্বরূপ পাইয়া থাকেন। যিনি কমন্স সভার কার্য্যবিবরণী লিপিবদ্ধ করেন তিনি অষ্টাদশ সহস্র মুদ্রারও অধিক, অন্য একটী কর্ম্মচারী Sergeant of Arms) প্রায় অষ্টাদশ সহস্র এবং ইহার সহকারী দ্বাদশ সহস্র মুদ্রা, পুস্তকাধ্যক্ষ পঞ্চদশ সহস্র এবং লর্ড সভার একাদশটী কেরাণী প্রায় ষোড়ষ সহস্র মুদ্রা পাইয়া থাকেন। যিনি বক্তৃতাকারক (speaker) তিনি কমন্স সভার মুখপত্র; তিনি পঁচাত্তর হাজার টাকা বেতন পান। অবশ্য, অন্যান্য কর্ম্মচারীগণ যেরূপ জীবনান্ত কাল পর্য্যন্ত স্বপদে নিযুক্ত ইনি সেরূপ নহেন। প্রতি নির্ব্বাচনের সময় কোন সদস্যকে এইপদে বরিত করা হয়। স্পিকারের নির্ব্বাচন প্রথাও কিছু নূতন ধরণের। সদস্যগণ সমবেত হইলে, কমন্স সভার প্রধান কেরাণী দণ্ডায়মান হইয়া নিঃশব্দে একজন সদস্যের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করেন। এই সদস্য যাহাকে এই পদে বরিত করিবার প্রস্তাব উত্থাপন করেন—অন্য কেহ তাহার সমর্থন করিলে এবং কোনরূপ প্রতিবাদ না হইলে স্পিকার নির্ব্বাচন ব্যাপার শেষ হয়। স্পিকার মহাশয় তৎপরে নিজ আসন গ্রহণ করিলে, মহাসভার mace

(আশা সোটা) টেবিলের উপর স্থাপিত হয়। পর দিবস স্পিকার ও অন্যান্য সদস্যগণ সমবেত হইয়া লর্ডদের নিকট উপস্থিত হইলে তাঁহাকে রাজার সম্মতি জ্ঞাপন করা হয়। সম্মতি জ্ঞাপন সমাপন হইলে স্পিকার কমন্সদের অধিকারের বিষয় (স্বত্ব) লর্ড সভায় উপস্থিত করিয়া নিবেদন করেন যে, কমন্সগণ যদি কোন ভ্রম করেন তবে সে জন্য যেন কেবল মাত্র তাঁহাকেই দোষী করা হয়। লর্ড-চ্যান্সলার মহোদয় এই সকল বিষয়ে সম্মতি জ্ঞাপন করিলে স্পিকার মহাশয় ও অন্যান্য সদস্যগণ প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এ পর্য্যন্ত দুই বার মাত্র স্পিকার নির্ব্বাচনে মতভেদ হইয়াছিল।

বর্ষ-বিদায়।

মহাসমুদ্রের অনন্ত তরঙ্গের ন্যায় অসীম কালের এক একটি খণ্ডোর্ম্মি আসিয়া আমাদিগের এই ক্ষুদ্র জীবন-তীরে অবিরামই আঘাত করিয়া ফিরিতেছে। এই দুর্জ্জয় স্রোতের প্রবল আঘাতে আমাদের কোথাও ভাঙিতেছে, কোথাও গড়িতেছে, কোথাও উঠিতেছে, কোথাও পড়িতেছে। কি সমুদ্র-স্রোত, কি কাল স্রোত, এ বিশ্ব-সৃষ্টির ধর্ম্মই এই। একক ও বিচ্ছিন্ন ভাবে দেখিলে ভাঙ্গনের, হরণের, আঘাতের আর অন্ত নাই। কিন্তু তথাপি এই সমুদ্রমেখলা পৃথিবী চিরদিনই বনরাজিনীলা, চিরদিনই সুন্দর ও সুখময়। সৃষ্টিস্রোতের ধর্ম্মই এই—সে ভাঙ্গনের অন্তরালে গঠনে লিপ্ত, হরণের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিদানে উন্মুখ, আঘাতের মর্ম্মমধ্যে আশ্বাসের সান্ত্বনা-স্পর্শ লুকাইয়া রাখে।

বিগতপ্রায় বর্ষের তরঙ্গটি আমাদের কিছু ভাঙ্গিতে, কিছু হরণ করিতে, কিছু আঘাত দিতে ত্রুটি করে নাই। সে যাহা ভাঙ্গিয়াছে তাহা কতদিনে আবার গড়িয়া তুলিবে তাহা জানি না, সে যাহা কাড়িয়া লইয়াছে কতদিনে আবার তাহা ফিরিয়া পাইব তাহা বলিতে পারি না, সে যে আঘাতক্ষত সৃষ্টি করিয়াছে কতদিনে যে তাহা মিলাইবে তাহা কল্পনা করা কঠিন। আজ সে আমাদের দরিদ্রের রত্ন, দেশের গৌরব কতকগুলি শ্রেষ্ঠ পুরুষকে হরণ করিয়াছে। কর্ম্মবীর স্বদেশপ্রেমিক রমেশচন্দ্র, বাগ্মী স্বদেশসেবক লালমোহন, সুপণ্ডিত শাস্ত্রসেবী চন্দ্রকান্ত এবং শুদ্ধচেতা স্বজাতিসেবক ধর্ম্মানন্দ মহাভারতীকে আজ আমরা হারাইয়াছি। আরও ছোট বড় কত কর্ম্মী, কত সাধক, কত স্বদেশবৎসল পুরুষ আজ আমাদিগকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। আজ বঙ্গের সমিতিআইন ভারতময় ব্যাপ্ত, দেশবাসীর স্বদেশের কর্ম্মে সম্বদ্ধ হইবার, সভা সমিতি আহ্বান করিবার অধিকার টুকু পর্য্যন্ত খর্ব্ব, আজ ব্যক্তিগত উচ্ছৃঙ্খলতার অপরাধে আমাদের জাতীয় কর্ম্ম অবসন্ন, সংবাদ-পত্র সন্ত্রস্ত, জাতীয় সাধনা প্রতিহত; আজ আদর্শের বিবাদে আমাদের স্বধর্ম্মীগণ বিচ্ছিন্ন, স্বার্থের সংঘাতে আমাদের কর্ম্মবীরগণ বিক্ষিপ্ত, সহোদর হিন্দু মুসলমান বিভক্ত। আজ কর্ত্তব্যপরায়ণ রাজভৃত্যের রক্তপাতে হিন্দুর হস্ত কলুষিত, স্বদেশীর অবোধ অত্যাচারে স্বদেশ পীড়িত।

ইহা অপেক্ষা দুর্ভাগ্য আর কি হইতে পারে। কিন্তু এতগুলি আঘাত ও আক্ষেপের মধ্যেও বিধাতার আনন্দ আশ্বাসের অভাব নাই। মর্লির শাসন সংস্কার আজ কর্ম্মে পরিণত—শত দোষত্রুটি সত্ত্বেও তাহা যে আমাদিগকে রাজশক্তির সহিত সহযোগিতায় কতকটা অগ্রসর করিয়াছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

শাসন ও বিচারের বিশুদ্ধতাই ব্রিটিশ চরিত্রের যথার্থ গৌরব। অপক্ষপাত ন্যায়ধর্ম্মই রাজা ও প্রজার মধ্যে প্রবলতম বন্ধন। নববিধানের ব্যবস্থাপকসভার প্রথম অধিবেশনে রাজনীতিজ্ঞ সহৃদয় লর্ড মিন্টো ভারতবাসীর বর্ত্তমান চিত্তচাঞ্চল্যের প্রতি যেরূপ সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন ও দেশের শাসনবিধিকে ভারতের বর্ত্তমান অবস্থার অনুরূপ করিবার জন্য যেরূপ আন্তরিক ব্যগ্রতা দেখাইয়াছেন, তাহাদ্বারা অতীতের অনেক নিষ্ঠুর আঘাত-বেদনা দূর হইবে সন্দেহ নাই। সেদিন কলিকাতার বাণিজ্যসমিতির অধিবেশনে আমাদের প্রধান বিচারপতি জেঙ্কিন্স সাহেব যে উদার—

বিচারনীতি প্রচার করিয়াছেন, তাহাও আমাদের অন্তরে এক নব আশা সঞ্চারিত করিয়াছে। এবং আমরা অকুণ্ঠিতচিত্তে বলিতে পারি সকল রাজপুরুষ সকল বিচারক যদি ইঁহার নীতি আদর্শ গ্রহণ করেন তবে মুহূর্ত্তের মধ্যে প্রজার হৃদয় হইতে সকল প্রকার সন্দেহ দ্বন্দ্ব অন্তর্হিত হইয়া যায়, অন্তরের গূঢ়দেশ হইতে রাজভক্তি উথলিয়া উঠে।

বেকনের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া তিনি বলিয়াছেন "প্রজাসাধারণের প্রতি সদ্ব্যবহার কর, তাহাদিগকে ভালবাসিতে শিক্ষা কর এবং তাহাদিগকে ন্যায়বিচার দান কর। কার্য্যকালে কোনও ফলাপেক্ষী হইও না—খ্যাতি কি লাভের প্রতি দৃকপাত করিও না. ভদ্রলোকদিগের প্রতি তোমাদিগের উদ্ধত বা কঠোর হওয়া কর্ত্তব্য নহে। শক্তিতে তোমরা তাহাদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বটে, কিন্তু পদমর্য্যাদায় তোমরা তাহাদিগের সহিত বিশেষ বিভিন্ন নও। সর্ব্বদা এই কথাটি মনে রাখিও যে শক্তির প্রবলতম বল সেইখানেই থাকে, যেখানে আমরা তাহাকে ভদ্রভাবে ব্যবহার করিতে জানি। সাধুতাই বিচারপতির সর্ব্বপ্রধান গুণ এবং নির্দ্দোষ অপক্ষপাত বিচারনীতিই দেশের লোককে বাধ্য করিবার ও রাজশক্তির সহিত স্নেহবন্ধনে বদ্ধ করিবার সর্ব্বপ্রধান বন্ধন।"

এরূপ কথা আমরা অনেক দিন শুনি নাই। ইহা অপেক্ষা ইংরাজোচিত বাক্য আর কি হইতে পারে! মহামতি জেঙ্কিন্স্ বহুদিন এই প্রধান বিচারাসনে থাকিয়া তাঁহার জাতীয় গৌরব রক্ষা করিয়া দেশের শাসন-ভিত্তিকে সুদৃঢ় করুন ইহাই আমাদিগের প্রার্থনা।

নিজেদের দিকে দেখিলেও আমরা আনন্দ আশ্বাসেরই সংবাদ পাই। নবজীবনের মোহন স্পর্শে আজ দেশের আবালবৃদ্ধবনিতা সঞ্জীবিত। দেশের যুবকগণ পথ ও পাথেয় সংগ্রহের জন্য পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে আত্মসাধনে নিবিষ্ট। আজ আমাদের আত্মলাভের চেষ্টাচাঞ্চল্য, আমাদের সাহিত্য, সমাজ, শিল্প ও স্বদেশসেবার উদ্যম সহস্র পথে মুখরিত। আজ আমরা পরের অট্টালিকার বহির্দ্বারে একটু আশ্রয় মাত্র পাইবার জন্য লালায়িত না হইয়া, আপন কুটীরকে আপনার বাসোপযোগী করিতে বদ্ধপরিকর। সর্ব্বোপরি আজ আমাদের স্বদেশসেবক শুদ্ধচেতা নির্ব্বাসিত কৃষ্ণকুমার, অশ্বিনীকুমার, সুবোধচন্দ্র প্রভৃতি রাজকৃপায় পুনরায় আমাদিগের গৃহমধ্যে প্রত্যাগত!

একদিকে যেমন বেদনা আঘাত অপরদিকে তেমনি আনন্দ আশ্বাস। সৃষ্টির দিকে দেখিলে, অন্তরের দিকে দেখিলে এই সকল দুঃসহ বেদনা ও নিষ্ঠুর আঘাতকে বিধাতার আশীর্ব্বাদ ও বরণীয় বলিয়াই মনে হয়। বিদায়োন্মুখী বর্ষ এতদিন আমাদের বাহ্যিক শত সুখ দুঃখ, শত ঘাতপ্রতিঘাতের লাভ ক্ষতির সহিত জড়িত ছিল। আজ বিদায়ের দিনে সে তাহার বাহিরের সমস্ত কুৎসিত কঠোর আবরণ ত্যাগ করিয়া, আপনার অন্তরের শুদ্ধ সুন্দর পবিত্র মূর্ত্তিতে আমাদের সম্মুখে প্রকাশ পাইল। বিচ্ছেদের তীরে দাঁড়াইয়া আজ তাহাকে বিশ্বের ধন, বিধাতার দান বলিয়াই চিনিতেছি! আজ নতশিরে তাহার সমস্ত দান গ্রহণ করিয়া এ জীবনতীর হইতে তাহাকে চিরদিনের জন্য বিদায় দিলাম।

ভ্রম সংশোধন

ফাল্গুনের স্বরলিপি। পঞ্চম লাইনের শেষে আছে	তাহার স্থলে হইবে
I -প -া মা। { মা র্ধা না I	I -পা -া র্সা। র্সা র্ধা না I
০ ০ গ ড়ি তে ছে	০ ০ গ ড়ি তে ছে

ফাল্গুনের অগ্নি-পরীক্ষা প্রবন্ধে আছে ১০ই চৈত্র উকীল ইনষ্টিটিউশন প্রাঙ্গণে প্রদর্শনী হয়—তাহার স্থলে হইবে, ৩০শে চৈত্র।

কলিকাতা, ২০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কান্তিক প্রেসে শ্রীহরিচরণ মান্না দ্বারা মুদ্রিত ও ৪৪, ওল্ড বালিগঞ্জ রোড হইতে শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা প্রকাশিত।